[illegible] মুক্ত তাঁহাদের এই আবেদন অবজ্ঞাত হয় এবং আলাপ-আলোচনা দ্বারা ভারতীয় সমস্যার সমাধান করার জন্য রাষ্ট্রীয় সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে গবর্মেণ্ট ভারতীয় জনগণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন এবং যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণে যে সকল বিভীষিকার সৃষ্টি হয়, নিরস্ত্র ভারতে তদনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তোলেন। তিন বৎসর-কাল দেশের উপর যে ভয়াবহ অবস্থা চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহার ফলে দুঃখ-দুর্দ্দশা, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের দরুণ অগণিত লোকের মৃত্যু এবং ভারতের সমস্যা সমাধানে অপটু দুর্নীতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা দেশের বুকে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। তথাপি এই তিনটি বৎসরে ভারতীয় জনসাধারণ সরকারী উৎপীড়নের সম্মুখীন হইয়া অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে এবং পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষায় বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

"১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে নিঃ-ভাঃ সমিতি যে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনই তাহার পুনরুক্তি করিতেছেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বের শান্তির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। ভারতের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা আসিবে। ভারতের স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে হইবে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে ভারতকে স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা দিতে হইবে। বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই অন্যান্য জাতির সহিত সহযোগিতা করিবে।"

এশিয়ার স্বাধীনতা

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু উহার দীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছায়া এখনও পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা সম্পর্কেও অনেকে আলোচনা করিতেছেন। মারণাস্ত্ররূপে আণবিক বোমার আবিষ্কারের ফলে বর্ত্তমান জগতের দুর্নীতিদুষ্ট ও আত্মঘাতী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামো সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা যদি ইহার সাম্রাজ্য-বাদী মনোভাব পরিত্যাগ না করে এবং স্বাধীন জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মনোবৃত্তি এবং মানবের মর্য্যাদা রক্ষার নীতির উপর স্বীয় ভিত্তি স্থাপন করিয়া অগ্রসর না হয় তাহা হইলে উহা ধ্বংস হইয়া যাইবে। যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হওয়ার ফলে উপনিবেশ ও পরাধীন রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে নাই।

গত আগষ্ট সংখ্যা 'এশিয়া' পত্রিকায় শ্রীমতী পার্ল বাকও এশিয়ার পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার কথা লিখিয়াছেন। স্যান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটিয়াছে, পৃথিবীতে [illegible] স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অথবা পরাধীন দেশের বাস্তব [illegible] দৃঢ় করিয়া পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ [illegible] ইহার [illegible] সম্মেলনের প্রধান নায়কদের আসল অভিপ্রায় এ সম্বন্ধে [illegible] মনে সংশয় জাগিয়াছে। সান্‌ফ্রান্সিস্কো চার্টারে কোথায়ও গণ-স্বাধীনতা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল না, রাজ্যহারা সাম্রাজ্যবাদীদের লুপ্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং বড় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে পৃথিবীর ভাল ভাল দেশগুলির ভাগ-বাঁটোয়ারাই বড় কথা ছিল বলিয়া লোকে সন্দেহ করিয়াছে। এই সন্দেহই ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতেছে। ইউরোপে ও এশিয়ায় উভয় স্থানেই যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার পরাধীন দেশ-সমূহে পুরান সাম্রাজ্যবাদীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টা সুরু হইয়া গিয়াছে। আনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদ আবার যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় জাঁকিয়া বসিতে পারে তাহার জন্য ব্রিটেন সর্ব্ববিধ সাহায্যে তৎপর, আমেরিকাও ইহার সমর্থক।

এশিয়াবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশে যে সাহায্য প্রেরিত হইতে-ছিল তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ উঠায় অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিক গবর্মেণ্ট উহা বন্ধ করিয়াছেন। এবার সংবাদ আসিয়াছে ভারতীয় সৈন্যদলকে যবদ্বীপে নামানো হইয়াছে। অর্থাৎ ডাচ গবর্মেণ্টের হাতে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রত্যর্পণ না করা পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে তথাকার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন রাখা হইবে। ডাচ শোষণের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ডাচ ঈষ্ট-ইণ্ডিজে ডাচ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই কার্য্যে ভারতীয় সৈন্যদের নিযুক্ত করা হইতেছে।

আটলান্টিক চার্টার, মানবের স্বাধীনতা, পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বড় বড় নীতিকথা যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর দল পুনরায় পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য-বাদ বিস্তারে অগ্রণী হইয়াছে। ব্রিটেন ও আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবককে যুদ্ধে প্রাণ বলিদানে টানিয়া আনিবার জন্য যে সকল আদর্শের প্রচার করা হইয়াছে আজ আর তাঁহার প্রয়োজন নাই। তাই আজ সর্ব্বত্র সাম্রাজ্য উদ্ধার ও নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। এমন কি রাশিয়াও আজ তুরস্ককে পদানত করিয়া দার্দানেলিসের উপর কর্তৃত্ব দাবি করে। নিপীড়িত লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মানবের বন্ধু আজ আর কেহ নাই। তাই আজ দেখি পৃথিবীর পরাধীন দেশসমূহে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হইয়াছে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিসমূহ তাহাকে দমন করিতেছে। পরাধীন সমস্ত জাতি সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে ইহার প্রতীকার অসম্ভব। কংগ্রেস নেতারা দক্ষিণ এশিয়া ফেডারেশনের কথা তুলিয়াছেন। এই ফেডারেশন গঠন ও উহার সাফল্যের উপরই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত পরাধীন দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কোন সাম্রাজ্যবাদী জাতিই পরাধীন দেশের মুক্তি বহিয়া আনিবে না, জাপান আনে নাই, ইংরেজ আমেরিকা বা রাশিয়াও আনিবে না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতাই মুক্তির একমাত্র উপায়।

বড়লাটের নূতন প্রস্তাব

সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাত গিয়াছিলেন। গতানুগতিক ভাবে চুপ করিয়া [illegible]

থাকা আর চলিবে না ইহা তিনি বুঝিয়াছেন, ওদিকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভারও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কাজেই নূতন কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিবার প্রয়োজন তাঁহার হইয়াছিল।

নূতন প্রস্তাবে লর্ড ওয়াভেল নূতন কোন কথা বলেন নাই, শুধু ক্রিপস প্রস্তাবটিকে আরও একটু অস্পষ্ট করিয়া ভাষা বদলাইয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সারমর্ম এই: "ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতে বদ্ধপরিকর। আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে সাধারণ নির্বাচন হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, সমস্ত প্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

"ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যত শীঘ্র সম্ভব একটি রাষ্ট্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতি আহ্বান করিতে ইচ্ছুক। ইহার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৪২ সালের ঘোষণায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণযোগ্য কিনা অথবা অন্য কোন কিংবা কোন সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আমাকে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা চালাইবার ক্ষমতা দিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যগুলি কি ভাবে রাষ্ট্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতিতে যোগদান করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিতও আলোচনা করা হইবে।"

"গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন হইবে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাহার সর্ত্তাবলী বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু সেই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে ভারত-গবর্মেণ্টের কার্য চালাইতেই হইবে এবং জরুরী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া নূতন বিশ্ববিধান প্রণয়ন করিবার কাজে ভারতকে পূর্ণরূপে যোগদান করিতে হইবে। তাই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আমাকে প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবামাত্র একটি শাসন-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ক্ষমতা দিয়াছেন। শাসন-পরিষদটি এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে ইহা প্রধান প্রধান ভারতীয় দলগুলির সমর্থন পায়।

"ভারতের জন্য একটি নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন এবং তাহা কার্যকরী করা বেশ কঠিন কাজ। ইহার জন্য চাই সংশ্লিষ্ট সকলের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা এবং ধৈর্য। ইহার জন্য প্রথমে সাধারণ নির্বাচন শেষ করিতে হইবে। নির্বাচনের দ্বারাই ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার স্বরূপ বুঝা যাইবে। রাষ্ট্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতির আকার, ক্ষমতা এবং কার্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য নির্বাচনের পর আমি নির্বাচিত ব্যক্তিগণের এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।"

"১৯৪২ সালের খসড়া ঘোষণায় রাষ্ট্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতি গঠনের একটি পন্থার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী এবং জটিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এক্ষণে মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতির আকার নির্দ্ধারণ করিবার পূর্বে জনগণের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন।"

কংগ্রেস এই নূতন প্রস্তাবটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন নাই, ইহা এত অস্পষ্ট যে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কিছুই করা চলে না। প্রস্তাবটিতে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, উহার অস্পষ্টতা। বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান এমন ভাবে দ্ব্যর্থবোধক করিয়া রাখা হইয়াছে যে উহা সযত্নকৃত বলিয়া মনে হয়। ক্রিপ্‌স পরিকল্পনায় পাকিস্তান যাহাতে হইতে পারে তাহার একটা রাস্তা ছিল, এটাতে সে পথটিকে কুয়াসায় আবৃত করা হইয়াছে। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে রাষ্ট্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতির একটা স্পষ্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল, ইহাতে তাহাও নাই। আপোষ আলোচনা ফাঁসাইবার একটা বড় উপায়রূপে দেশীয় রাজাদের খাড়া রাখা হইয়াছে। বুদ্ধিমান ইংরেজ সমস্ত ব্যাপারটা নির্বাচনের ফলাফলের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। কংগ্রেস যদি সর্বত্র জয়লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে লীগকে বাদ দিয়া কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী দলের সহিত আপোষ করিবার দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রহিল। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের শক্তিবৃদ্ধি হইলে উহাদের সাহায্যে সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল করিবার উপায়ও খোলাই রহিল। প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত কি হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে নির্বাচনের পর কংগ্রেসের শক্তি কি দাঁড়াইবে তাহার উপর।

দ্বিতীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় সন্ধিপত্র রচিত হইবে এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি গঠিত হইবে। ভারতের রাষ্ট্রবিধি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বদলে ভারতীয় গণ-পরিষদে রচিত হইবে এবং ব্রিটেন তাহা মানিয়া লইবে এ কথা মুখেও অন্ততঃ বলা হইয়াছে। কাজে কি হইবে তাহা নির্বাচনের পর কূটনীতির খেলা দেখিয়া বুঝা যাইবে।

তৃতীয়, লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন বড় রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন লইয়া কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ গঠিত হইবে। চিরাচরিত প্রথানুসারে সাম্প্রদায়িক মিলনের ধুয়া এবার তিনি তুলেন নাই। ওদিকে মিঃ এটলি অবশ্য লর্ড ওয়াভেলের এই ত্রুটি সামলাইয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবাসীরা সকলে মিলিয়া এমন একটি রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করুন যাহা মেজরিটি এবং মাইনরিটি উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।" পৃথিবীর কোন দেশে সব লোক এক রাজনৈতিক মত অবলম্বন করিয়া একসঙ্গে কাজ করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি নাই; খাস ব্রিটেনেও নাই। পরাধীন দেশকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ স্বাধীনতা দানে যখন বাধ্য হইয়াছে তখন সে দেশের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের হাতেই রাজ্যশাসনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের বেলায়ই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের এই অন্যায় জিদ এখনও চলিতেছে। কারণ এখানে রাজনৈতিক প্রগতি ব্যর্থ করিবার জন্য দল খাড়া করিবার মত দেশদ্রোহী ক্রীতদাসের অভাব নাই।

লর্ড ওয়াভেলের নিকট দেশবাসী সকলের আগে যাহা শুনিতে চাহিয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি কথাটিমাত্র বলেন নাই।

সিমলা বৈঠক মুসলীম লীগের অন্যায় জিদের জন্য ব্যর্থ হইয়াছে, দেশের ও বিদেশের বহু চিন্তাশীল লোকেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ইঙ্গিতে লীগের হাতে এই ভিটো দেওয়া হইয়াছিল ইহাও বহু জনে সন্দেহ করিয়াছেন। কোন একটি বিশেষ দলের অন্যায় জিদে রাজনৈতিক প্রগতি বন্ধ থাকিবে না বড়লাট এবারও ইহা ঘোষণা করেন নাই এইটিই সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

অপ্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট ও তথ্যাদি প্রকাশের দাবি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ব্যবহারার্থ তথ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রকাশের জন্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট দাবি করিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,

"পরিকল্পনা কমিটির কাজে হাত দিবার গোড়া হইতেই নির্ভরযোগ্য তথ্য, সাংখ্যিক হিসাব ও নানা বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে অন্যান্য উপকরণের অভাবে আমাদের কাজ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় তথ্যের অনেকগুলির অস্তিত্বই নাই এবং যেগুলি আছে তাহাও জনসাধারণকে জানান হয় না। যুদ্ধের সময় এই অসুবিধাগুলি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তথাকথিত নিরাপত্তা বা মিতব্যয়িতার খাতিরে কয়েক বৎসর যাবৎ রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ আছে। যে সব রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে, সেগুলিরও কপি সংগ্রহ করা দুষ্কর।

"ভারত গবর্ন্মেণ্টের নিযুক্ত বিভিন্ন পরিষদ যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অবগত হইবার কোন রাস্তাই নাই। অথচ যথোপযুক্ত তথ্য ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং গবর্ন্মেণ্টের নিকট যে সকল অপ্রকাশিত কিম্বা অপ্রচারিত রিপোর্ট ও তথ্য রহিয়াছে, সেগুলি তাঁহাদের প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

"যে সকল রিপোর্ট জনসাধারণের নিকট চাপিয়া রাখা হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে একটি হইতেছে আমেরিকান গ্র্যাডি কমিটির রিপোর্ট। এই কমিটি ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে রিপোর্টটি চাপিয়া রাখিবার যে কারণই থাকুক, বর্তমানে নিশ্চয়ই তাহা আর থাকিতে পারে না। জনসাধারণের নিকট গবর্ন্মেণ্টের ইহা এখন প্রকাশ করা উচিত।

"নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের এরূপ একটি রিপোর্ট চাপিয়া রাখায় এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, রিপোর্টে এমন কিছু ছিল যাহাতে গবর্ন্মেণ্টের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না কিম্বা দেশে শিল্প-বিস্তারের জন্য কমিটি এমন সব সুপারিশ করিয়াছিলেন, যাহা গবর্ন্মেণ্ট চাপিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত নেহরু এই রিপোর্ট এবং গবর্ন্মেণ্টের হাতে অন্যান্য যে-সব রিপোর্ট ও তথ্য আছে সেগুলি প্রকাশের দাবি করেন। তিনি বলেন,—"একমাত্র জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রয়োজনেই যে এগুলি প্রকাশ করা কর্তব্য তাহা নহে, বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল পরিকল্পনা করা হইতেছে, সেগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্যও এগুলি প্রকাশ করা কর্তব্য। জনসাধারণ যদি এ সকল পরিকল্পনার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তবেই তাহাদের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। সুতরাং আমি আশা করি, যে, যে সকল উপাদান গবর্ন্মেণ্টের হাতে রহিয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট অবিলম্বে এবং সম্পূর্ণভাবে সেগুলি প্রকাশ করিবেন।"

ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সব তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্য ছিল, সে-সবই গত কয়েক বৎসর যাবৎ চাপিয়া রাখা হইয়াছে। এই গোপনতার এক কারণ দেখান হইয়াছে যুদ্ধ, অপর কারণ কাগজাভাব। অতি আবশ্যক বহু রিপোর্ট কাগজের অভাবে মুদ্রিত হয় নাই, অথবা এত কম ছাপা হইয়াছে যে উহা সংগ্রহ করিতে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের জন্য বৃহৎ পুস্তিকা অথবা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শাসন-পরিষদের সদস্য প্রভৃতির সচিত্র বক্তৃতা ও বিবৃতি মুদ্রণ করিতে কিন্তু কখনও কাগজের অজুহাতের কথা শোনা যায় নাই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়েই এ বিষয়ে সমান উৎসাহী ছিলেন। বাংলার দুইটি সম্পূর্ণ অত্যাবশ্যক সরকারী সাপ্তাহিক বুলেটিন কাগজের অভাবে বন্ধ হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

১৯৪১-এর সেন্সাসের পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও উহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট ছাপা হয় নাই। সংক্ষিপ্ত আকারে যে কয়েকটি প্রাদেশিক রিপোর্ট ছাপা হইয়াছিল তাহাও পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রাক্কালে সেন্সাস রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। ভারত-সরকার এ বিষয়ে একান্ত উদাসীন। তারপর দেশে যখন শিল্প ও অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে সেই সময় এই দুই বিষয় ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট ও তথ্যাদি সহজলভ্য হওয়া উচিত ছিল। ভারত-সরকার তাহাও করেন নাই।

ডাঃ জয়াকর কর্তৃক পাকিস্থানের ব্যাখ্যা

পুনায় এক জনসভায় ডাঃ এম. আর. জয়াকর বলিয়াছেন "পাকিস্থানের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষে কায়েম রাখা।" বক্তৃতায় ডাঃ জয়াকর পাকিস্থানের দাবি কি ভাবে ও কি কারণে উঠিয়াছে তাহার ইতিহাস বিবৃত করেন। মুসলমানদিগকে একটি পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করিবার কল্পনা ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজের জনৈক পঞ্জাবী আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের মাথায় ঢোকে। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতার নিকটও তিনি তাঁহার কল্পনাটি ব্যক্ত করেন এবং ঐ পত্রিকা মারফৎ উহা প্রচারিত হয়। ইহাকেই মিঃ জিন্না পরে বিশদভাবে বিবৃত করিয়া পাকিস্থান নামে অভিহিত করেন। পাকিস্থানের আবিষ্কর্তা উক্ত পঞ্জাবীটি ইহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই। সম্প্রতি পুনরায় কতকগুলি পুস্তিকা মারফৎ তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলাম শাসনের অধীনস্থ করিবার অভিপ্রায় প্রচার করিতেছেন। তাঁহার এই নূতন কল্পনা অনুসারে পাকিস্থানগুলি হইবে সমগ্র ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল। ভারতবর্ষের নূতন নাম তিনি দিয়াছেন "দীনিয়া"। জিন্না সাহেব এখনও পর্যন্ত

পাকিস্থানেই সন্তুষ্ট আছেন, দীনিয়ার ধুয়া এখনো তিনি তুলেন নাই।

পাকিস্থান সম্পর্কে মিঃ জিন্নার দাবির সারমর্ম—দুই জাতির নীতি। ধর্ম হইতে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত সবই তিনি পৃথক রাখিতে চাহেন। তাঁহার দাবি এই যে মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং ভারতবর্ষকে দুইটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করাই তাঁহার প্রধান কথা। তাঁহার এই পরিকল্পনা শুধু ব্রিটিশ ভারতেই প্রযোজ্য, দেশীয় রাজ্যসমূহের তিনি ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের যেখানে শাসনকর্তা মুসলমান সেখানে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য থাকিলেও তাহা মুসলমান রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইবে কিন্তু যেখানে মুসলমান প্রজার সাংখ্যাধিক্য সেখানে রাজা হিন্দু হইলে তাঁহাকে সিংহাসন ছাড়িতে হইবে। এত বড় উদ্ভট দাবি পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কখনও তুলিয়াছে বলিয়া জানি না, ইংরেজ ভিন্ন আর কোন জাতি উহাতে সায় দিয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত নহি। ক্রিপ্স প্রস্তাবে বৃটিশ ভারত সম্পর্কে জিন্না সাহেবের দাবির সারাংশ মানিয়া লওয়া হইয়াছে, দিন কয়েক পরে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তাঁহার কল্পনাকে বাস্তবরূপ দানে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অগ্রণী হইলে আশ্চর্য হইবার কারণ থাকিবে না।

পাকিস্থান দাবির মূল দুই জাতি থিওরীর আলোচনা করিয়া ডাঃ জয়াকর দেখাইয়াছেন উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বসবাস করিয়াছে। মুসলমানেরা যখন এদেশের শাসক ছিলেন তখনও এই থিওরী তাঁহাদের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসে নাই।

পাকিস্থানের যুক্তি সম্পর্কে ডাঃ জয়াকর বলেন, "এ দেশে মুসলমান বলিয়া যাহারা দাবি করে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৭ জনই পূর্বে হিন্দু ছিল। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জাতি হিসাবে তাহারা পৃথক নহে। কৃষ্টি, ভাষা ও রীতিনীতির দিক হইতেও ইতিহাস ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দিবে। এখনও পল্লী জীবনের দিকে তাকাইলে প্রমাণিত হইবে যে, লীগের এই দাবি নিতান্তই উদ্ভট। মুসলমানদের মধ্যে রাজপুত ও জাঠ মুসলমানরাও পাকিস্থান দাবিকে উদ্ভট বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে।

"পঞ্জাব নাকি তাহাদের মাতৃভূমি। স্মরণাতীত কালের ইতিহাস ঘাঁটিলে দেখা যাইবে পঞ্জাব মুসলমানদের আদি বাসভূমি নহে। শিখরা এই দাবি মানিয়া লইতে সম্মত নহেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে বলা যায়, আদমসুমারীর হিসাবেই দেখা গিয়াছে যে ১৮৮১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। ইহার পর মুসলমানদের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪১ সালে তাহা শতকরা ৫৩ জনে দাঁড়ায়। এ দিক হইতে পঞ্জাব মুসলমানদের মাতৃভূমি হইতে পারে না।

"আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নও নিতান্তই অবান্তর। কেন না, পৃথকভাবে সকলেরই এবং জাতি হিসাবেও প্রত্যেকের অধিকারই স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-নীতির জনক হইলেন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন। তাঁহার মতে এই নীতি চারিটি স্থলে প্রযোজ্য :—(১) বাক্-স্বাধীনতা হইতে কাহাকেও বঞ্চনা করা চলিবে না,—রাষ্ট্রে তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে, (২) দেশের সমগ্র জন-সংখ্যার প্রতি সব সময়েই লক্ষ্য রাখা হইবে, (৩) নূতন নূতন অনৈক্য কিছুতেই আমল দেওয়া হইবে না; পুরাতন যে সমস্ত মতভেদ আছে তাহারও অবসান ঘটাইতে হইবে, (৪) ঐক্য, নিরাপত্তা ও দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিপন্ন হয়, এরূপ ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। এমতাবস্থায় বর্তমানে এই নীতি প্রয়োগ করা হইলে ৪ কোটি ২০ লক্ষ অ-মুসলমানকে জোরপূর্বক পাকিস্থানে টানিয়া লওয়া হইবে—রাষ্ট্রে তাহাদের কোনরূপ অধিকার থাকিবে না।"

যে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বলে মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি উঠিতেছে, সেই নীতির বলেই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ পৃথক হইয়া তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি অবশ্যই তুলিতে পারে।

ইউরোপে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি

ইউরোপে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি কি ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং উহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে ডাঃ জয়াকর তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন উহার ফল ভাল হয় নাই। তিনি বলেন—ইহাতে ইউরোপের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় নাই বরং এই নীতি প্রয়োগের ফলে যে বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে বর্তমান যুদ্ধকে তাহার পরোক্ষ পরিণতি বলা চলে। নিজ নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় সকলেই সেই ভাবে এই নীতির ব্যাখ্যা করে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতির সমর্থকগণ রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখান। কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে ইদানীং যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হইয়াছে, তাহাতে সকল গ্রন্থকারই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ যদি নিষ্ক্রমণের অধিকার হয় তবে সোভিয়েট ইউনিয়নে উহা অর্থহীন। কারণ জাতীয় কৃষ্টি ও স্বায়ত্তশাসনের সকল বিধানই সমগ্র ইউনিয়নের অর্থনৈতিক নীতি ও সামরিক নিরপত্তা ব্যবস্থার অধীন। গ্রন্থকারদের অভিমত এই যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অন্ধ নিরপেক্ষ অধিকার নহে এবং কেবলমাত্র জাতির নিরাপত্তা, ঐক্য ও আর্থিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই অধিকার প্রয়োগ করা চলে।

এই সোভিয়েট রাশিয়াতেই দেখা গিয়াছে প্রথমে বলপূর্বক বিভিন্ন জাতিকে এক সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে কতকটা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, সম্পূর্ণভাবে তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে রাখা হয়। হোয়াইট রাশিয়ান ইউক্রেনিয়ান জর্জিয়ান প্রভৃতি জাতি এই বন্দোবস্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সরকার বিশেষ বলপ্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা ক'রে নাই। বর্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতি-সমূহ এক অখণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার পর তাহাদিগকে আলাদা হইবার

অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের এই মহামূল্য অধিকার লাভের পরও তাই এক জনও সোভিয়েট রাষ্ট্র ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই।

ওদিকে বলকানে গত মহাযুদ্ধের পর আত্মনিয়ন্ত্রণের এই অধিকার প্রয়োগ হইবার পর হইতে সেখানে আগুন জ্বলিয়াছে। সে আগুন আজও নিবিল না। হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে একদল করিয়া ভিন্ন জাতির মাইনরিটি জুড়িয়া দিয়া গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের নূতন মানচিত্র অঙ্কিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ধুয়া তুলিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা দুরূহ করিয়া তোলে। ইহাদের পরস্পর বিরোধিতা এবং শত্রুতারও এটা একটা বড় কারণ। হাঙ্গেরির কতক লোককে রুমানিয়ায় জুড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উস্কাইলে শুধু রুমানিয়ার শান্তিই নষ্ট হইবে না, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ায় শত্রুতার পথও প্রশস্ত হইবে। কোন জাতির সংখ্যালঘুতার সুযোগে অপর কোন জাতি সংখ্যাধিক্যের জোরে যাহাতে তাহার উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে না পারে, দুর্বলের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন তাহার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির আন্তর্জাতিক প্রয়োগ করিতে গিয়াছিলেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি উহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে এবং সম্প্রতি লীগওয়ালারা সম্পূর্ণ এক তরফা 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' চেষ্টায় ঠিক সাম্রাজ্যবাদেরই পথ লইয়াছেন।

গত মহাযুদ্ধের পর এই আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করিয়াই ইংরেজ তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ড করিতে চাহিয়াছিল। ভারতের গোঁড়া লীগওয়ালারা কথায় কথায় আমাদের আরব তুরস্কের কথা শোনান, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আরব ও তুরস্ক কিরূপে আপন স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখিয়াছে তাহার কোন উল্লেখ তাঁহারা কখনও করেন না। আরব, মিশর ও তুরস্ক প্রভৃতির মুসলমান নেতারা ভারতীয় লীগওয়ালা রাজনীতির নিন্দা কোন কোন ক্ষেত্রে করিবার পর আপাততঃ তাঁহাদের মুখে প্যান-ইসলামের কথা একটু কমিয়াছে।

জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজের ধামাধরা একদল সুবিধাবাদী মুসলমান যে উদ্ভট দাবি তুলিয়াছেন স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে তাহার বিপরীত ব্যাপারই আমরা দেখিতে পাই। ইহুদী-নিবাস স্থাপনের নামে আরব রাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন খণ্ডিত করিবার জন্য ইংরেজ যে চেষ্টা করিতেছে আরবেরা তাহাতে মোটেই রাজী হয় নাই। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিবার নামে অখণ্ড রাষ্ট্র খণ্ডিত করিতে আরব বা তুরস্ক দুজনেই সমান আপত্তি করিয়াছে। এখনও করিতেছে।

লীগের সীমাহীন দাবি

লীগের সীমাহীন দাবি কি ভাবে ধাপে ধাপে বাড়িতেছে, কি ভাবে লীগ-নেতারা নিজেদের সুবিধানুসারে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাও ডাঃ জয়াকর উপরোক্ত বক্তৃতায় বিবৃত করেন। তিনি বলেন,

"একদল লোক বলে যে, মুসলিম লীগ যখন পাকিস্থান চাহে তখন তাহাদের দাবি মানিয়া লইয়া তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াই ভাল। কিন্তু এই দাবি মানিয়া লইলেই মুসলিম লীগ সন্তুষ্ট হইবে মনে হয় না। পূর্বে মুসলমানদের তোষণের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে বিচ্ছেদের দাবি স্বীকার করিলেই স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হইবে মনে করিবার কোনও সঙ্গত যুক্তি পাওয়া যায় না। ভাই ভাই যেমন পৃথক বাস করে গান্ধীজী সেই ভাবে ভারত-ব্যবচ্ছেদে রাজী হইয়াছিলেন কিন্তু লীগ সভাপতি ঘৃণাভরে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। একথা কি বলা চলে যে লীগ সভাপতি উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানের সংযোগকারী একটি পথ দাবি করিবেন না এবং এই পথের নির্বিঘ্নতার জন্য স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি দাবি করিবেন না? সে অবস্থায় এই পথে মুসলমানদের অবাধ অধিকার বজায় রাখার জন্য চিরকাল একটি দখলকারী ব্রিটিশ বাহিনী মোতায়েন রাখিতে হইবে। সপ্রু কমিটি সার হোমী মোদী, ডাঃ জন মাথাই ও শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারকে লইয়া একটি সাবকমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সাবকমিটির প্রথমোক্ত সদস্যদ্বয় তাঁহাদের রিপোর্টে বলেন যে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বা যুদ্ধোত্তর দেশরক্ষা ও অন্যান্য ব্যয় করিবার আর্থিক সঙ্গতি প্রস্তাবিত পাকিস্থানের নাই। এইজন্য তাহাকে হিন্দুস্থানের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইবে কিন্তু হিন্দুস্থান যদি এই সাহায্যদানে সম্মত না হয় তবে তাহাকে ব্রিটেন অথবা অপর কোন বৈদেশিক শক্তির করুণাপ্রার্থী হইতে হইবে। ব্রিটেন এই সাহায্যদান করিলে তাহার বিনিময়ে গ্যারাণ্টি চাহিবে, ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। আর যদি কোন বৈদেশিক শক্তি এই সাহায্যদান করে তবে সে এই দেশের উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব দাবি করিবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে পর্যাপ্ত ও কার্যকরী রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে কিন্তু এই সব কথায় কাহারও ভ্রান্তি হওয়া উচিত নহে। যদি সাড়ে চার কোটি অ-মুসলমানের জন্য পাকিস্থানরাজ্যে এই রক্ষাকবচ কৃতকার্যতার সহিত প্রয়োগ করা যায় তবে ভারতের ৯ কোটি মুসলমানের জন্যই বা তাহা কেন নির্ধারণ করা যাইবে না?"

"যদি রক্ষাকবচ ভঙ্গ করা হয়, তবে সন্ধির বলে তাহা রোধ করা যায় না। কারণ সেই চুক্তির সর্তাবলী প্রয়োগ করিবে কে? আর ব্রিটেন যদি এই রক্ষাকবচ বলবৎ রাখিবার দায়িত্ব নেয় তবে সে নিজের জন্য কতকগুলি প্রতিশ্রুতি চাহিবে, সে ক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। লীগ-সভাপতি অবশ্য তাঁহার বক্তৃতায় মাঝে মাঝে এইরূপ ইঙ্গিত করেন। পাকিস্থান পরিকল্পনার ইহাই সব চেয়ে মারাত্মক সম্ভাবনা। আজ পাকিস্থানবাসীরা যাহাই বলুন না কেন পাকিস্থানের অর্থ ব্রিটিশ শাসন কায়েম করা। পাকিস্থান পরিকল্পনার পশ্চাতে রহিয়াছে প্রতিভূ করায়ত্ত রাখিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের পথ সুগম করিবার অভিসন্ধি। হিন্দুস্থানের দুই কোটি মুসলমানের প্রতি ব্যবহারের প্রতিভূ হিসাবে পাকিস্থান তাহার

অমুসলমান বিশেষ করিয়া হিন্দুদের হাতে রাখিবে। এই পরিকল্পনার অর্থ যে নিরবচ্ছিন্ন ঠোকাঠুকি, মনকষাকষি ও পরিশেষে যুদ্ধ ইহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির আবশ্যক হয় না। পাকিস্থানবাদীরা যাহাই বলুন না কেন ব্রিটিশরা যদি পাকিস্থান সৃষ্টি করিতে সম্মত হয় তবে তাহা গায়ের জোরেই সৃষ্টি করিতে হইবে এবং গায়ের জোরেই উহা বজায় রাখিতে হইবে।"

এইরূপ একটি অবাস্তব দাবি উত্থাপন করিয়া পাকিস্থানবাদীরা ইহাকে রাজনৈতিক দরকষাকষির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে চায়, এই সন্দেহ অনেকেই করিয়াছেন। এই অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া তাহারা কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে সমান আসন দাবি করিয়াছে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের বেলায়ও হয়ত শীঘ্রই এই দাবি তুলিয়া বসিবে। অমুসলমান জনসাধারণ যে দুর্বলতা এতদিন দেখাইয়াছে, বিশেষতঃ কংগ্রেস এ সম্বন্ধে যে মারাত্মক দুর্বলতাজনিত ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিয়াছে তাহার ফলে পাকিস্থানের মূল্য হিসাবে এই জাতীয় দাবী ক্রমেই চড়িতে চলিয়াছে, আরও চড়িবে। অত্যন্ত কৌশল সহকারে একটি একটি করিয়া এইসব দাবি উঠিয়াছে, একটি হজম হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দেখা দিয়াছে। অন্যায় জিদ ও দাবির বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও কংগ্রেস অবিলম্বে অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন না করিলে ইহার অবসান ঘটিবে না। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এখনও তাঁহারা ভারত-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে জোর গলায় কথা বলিতে সাহসী হন নাই ইহা দুঃখের বিষয়। পণ্ডিত জবাহরলালের কথাবার্ত্তায় তবু কতকটা দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস কি করিবে তাহারই আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি উঠে এবং পণ্ডিতজী তাহার জবাবে এই জটিল সমস্যা কংগ্রেস কি ভাবে সমাধান করিতে চাহে তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন :

"যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে লীগের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইহার প্রাধান্য তত বেশী নহে। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলটিকে বিশেষ ভাবে পাকিস্থান দাবির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কাশ্মীর বা বেলুচিস্থানে লীগের প্রভাব আরও কম। পঞ্জাবেও লীগের প্রভাব শহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, গ্রামাঞ্চলে নহে। সকলেই জানে যে, অন্যান্য দলের সহিত কোয়ালিশান না করিয়া মুসলিম লীগ পঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে না, কারণ সমস্ত দলই লীগের বিরোধী। খুব সম্ভবতঃ লীগ আগামী নির্বাচনে পঞ্জাবে শতকরা ২৫টি আসন লাভ করিবে। তাহাদের আরও কম আসন লাভ করিবার সম্ভাবনাও আছে।"

শুধু পঞ্জাবে নয়, বাংলা, আসাম, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রভৃতিতেও মুসলিম লীগ কখনও একবারের জন্যও কোয়ালিশন না করিয়া নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে গবর্মেণ্ট গঠন করিতে পারে নাই। বাংলায় কথায় কথায় শতকরা ৫৫ জন মুসলমানের অস্তিত্ব এবং লীগ কর্তৃক সমগ্র ভারতীয় মুসলমানসম্প্রদায়ের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের কাহিনী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। অথচ বাংলায় এই শতকরা ৫৫ জন মুসলমান একদিনের জন্যও লীগের পতাকাতলে সমবেত হয় নাই, হইতেও পারে না। ইহা অসম্ভব এবং অবাস্তব। সমস্ত হিন্দু, সমস্ত খ্রীষ্টানও সম্প্রদায় হিসাবে কোন এক বিশেষ দলের অধীনে কখনও আসিতে পারে নাই। বাংলায় লীগ কখনই কিছু হিন্দু এবং সমস্ত ইউরোপীয়ানকে সঙ্গে না লইয়া মন্ত্রিমণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। গত নির্বাচনের পর হইতে কৃষকপ্রজা দল সকল সময়ই ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছেন। কোন সময়েই ইঁহারা লীগভুক্ত হয়েন নাই, প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রিমণ্ডলে লীগের সহিত ইঁহাদের একটা কোয়ালিশন হইয়াছিল মাত্র।

পাকিস্থানের দাবি সম্পর্কে পণ্ডিতজী বলেন, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অধিকসংখ্যক মুসলমান পাকিস্থান চাহে এবং তাহাদের স্বয়ং নির্বাচিত পথে চলিতে দেওয়াও উচিত তবে তাহাদের এ সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা উচিত এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ভোট-গ্রহণের দ্বারা বাহির হইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু দক্ষিণ পঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গে যথাক্রমে শিখ ও হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য থাকায় উহা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। একটি সম্প্রদায়ের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবরদস্তি করিয়া একটি সম্প্রদায়ের অনিচ্ছুক জনগণকে পাকিস্থানের অংশ হইতে বাধ্য করিবার দাবি বিস্ময়কর। কাজেই পঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত না করিয়া পাকিস্থানের কথা ভাবা যায় না। ফলে উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাব প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদে দরিদ্র হইয়া পড়িবে। তাছাড়া হিন্দু, শিখ অথবা মুসলমান যে-কোন সম্প্রদায়েরই হউক না কেন, কোন পঞ্জাবী অথবা বাঙালী পঞ্জাব অথবা বাংলাকে বিভক্ত করিতে সম্মত হইবেন না।"

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির জোরে লীগওয়ালারা বাংলাদেশকে সমগ্রভাবে পাকিস্থানে পরিণত করিতে চাহেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু প্রধান জেলাগুলি ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে পৃথক হইতে চাহিলে তাঁহারা উহাতে সম্মত হইতে পারেন না। নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ জানাইয়াছেন বাংলার বর্ত্তমান সীমাকেই তাঁহারা পূর্ব পাকিস্থানের সীমারূপে নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছুক, ইহার মধ্যে কোন রদবদল তাঁহারা করিবেন না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি কথা বার বার বলিয়াছেন। মুসলমানেরা সমগ্র ভারতে শতকরা ২৫ জন, ইঁহারা শতকরা ৭৫ জন হিন্দুর সঙ্গে থাকিতে কিছুতেই রাজী নহেন, এর বেলায় তাঁহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই। বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৫, হিন্দু প্রায় ৪৫ ; ইহার বেলায় ৫৫ জন মুসলমান ৪৫ জন হিন্দুকে পদানত রাখিবে। ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা লীগ নায়কগণ কর্তৃক প্রচারিত এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক প্রকারান্তরে সমর্থিতও হইতেছে।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিতজী বাংলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও

আলোচনা করেন। তিনি বলেন ভারতের যে কোন প্রদেশের তুলনায় বাংলার সংস্কৃতি অনেক বেশী উন্নত ও সংহত। বর্তমানে অবশ্য বাংলায় ও পঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বড় বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুই প্রদেশকে অখণ্ড দেশরূপে বিবেচনা করিলে দেখা যায় লীগপন্থীরাও উহাদিগকে বিভক্ত করিতে প্রস্তুত নহে। অপরের দেশ জোর করিয়া ভাগ করিয়া উহার অংশ আদায় করিব কিন্তু নিজের দেশ অখণ্ড থাকিবে, মুসলিম লীগ রাজনীতির এই পরস্পর বিরোধী রূপ পণ্ডিতজী সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইসব অসুবিধার জন্যই লীগ পাকিস্থানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

নির্বাচন ও গবর্মেণ্ট

বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সভায় মৌলানা আবুলকালাম আজাদ আগামী নির্বাচনে সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির জন্য ১৯৪১ সালে যে-সব ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে সমস্ত প্রাদেশিক সরকারেরই একরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। গবর্মেণ্ট ইহা করেন নাই। মৌলানা সাহেব বলেন, বোম্বাই সরকার হাল তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন তালিকা সংশোধন করিয়া অন্যদের পথ দেখাইয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে মৌলানা সাহেব আরও বলেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়া, রাজনৈতিক সভা ও শোভাযাত্রা সংক্রান্ত যাবতীয় বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করিয়া এবং দুই বৎসরের অধিককাল কারাবাসের দরুন নির্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার হরণের বিধি বাতিল করিয়া সাধারণ নির্বাচনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় গবর্মেণ্টের কর্তব্য। উভয় গবর্মেণ্টই এ বিষয়ে কর্তব্য পালনে মনোযোগী হন নাই। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। ইঁহারা ভোটার তালিকা সংশোধনের সুযোগ সব চেয়ে কম দিয়াছেন। গত জুন মাসে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারামুক্ত হইবার পর হইতে কংগ্রেস সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে, বিশেষতঃ কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে সন্তোষজনক কোন সাড়াই পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেস-বিরোধিতাতেই বরং ইঁহাদের কাহারও কাহারও প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছে। মৌলানা সাহেব বলেন,

"আগামী নির্বাচনের দুইটি ভাগ আছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন। কংগ্রেস চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে, বর্তমানের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ সম্পূর্ণ অকেজো, তাহা ছাড়া উহার ভিত্তি অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনাধিকার প্রসৃত করিয়াছে; কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্যও আমরা উহা চাহিয়া আসিয়াছি।

"ভারত-সরকার ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য নির্বাচনাধিকার প্রাদেশিক আইনসভাগুলির অনুরূপ করিয়া দিতে পারিত। প্রাদেশিক গবর্ণরদের সম্মেলন হইয়া গেল কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কিছু করিলেন না। প্রাদেশিক নির্বাচনে আমাদের নামার অর্থ হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো অর্থ নাই ও তাহা ছাড়া শাসন-ব্যবস্থারও কোন অর্থ নাই। তবে কি ব্রিটিশ সরকার এক বলিতেছে আর ভারতের প্রগতিবিরোধী আমলারা তাহা নাকচ করিয়া দিতেছে।"

নির্বাচনাধিকার সম্প্রসারণের জন্য কংগ্রেস যে দাবি করিয়াছিলেন, গবর্মেণ্ট তাহাও গ্রহণ করেন নাই। বড়লাট বলিয়াছেন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া নির্বাচক তালিকা প্রণয়ন করিতে গেলে দুই বৎসর সময় লাগিত। দেশবাসী ইহা মানিতে পারে না। কংগ্রেস যেখানে এই ব্যাপারে সহযোগিতায় প্রস্তুত সেখানে অতি অল্প সময়েই ইহা করা চলিত। এই নির্বাচনই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে হইতে পারিত।

সরকারী কর্মচারী ও মুসলিম লীগ

কলিকাতার মেয়র এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দৈনিক ন্যাশনালিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপ আলোচনা করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে বাংলায় সরকারী কর্মচারীর দল এখন হইতেই লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কংগ্রেসকে বাধাদান এবং লীগকে সহায়তা করিবার জন্য সিভিলিয়ান দল এখন হইতেই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন এই অভিযোগ বিভিন্ন প্রদেশে ধীরে ধীরে উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও বোম্বাই হইতে ফিরিয়া বলিয়াছেন লীগ-ইউরোপীয়ান চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস উহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবে।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের সারমর্ম এই :

কুষ্টিয়া মহকুমার মুসলমান মুনসেফের দল সাম্প্রদায়িক ইন্ধনে অগ্নি সংযোগের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকাশ, ইঁহাদের উস্কানিতে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল স্কুল-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে গত ঈদ উপলক্ষে প্রকাশ্যে গো-কোরবানী করা হয় এবং প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন সাধারণের ব্যবহৃত পুষ্করিণীতে ঐ গো-মাংস ধৌত করা হয়। ইতিপূর্বে আর কখনও এরূপভাবে প্রকাশ্যে গোহত্যা হয় নাই। কয়েকদিন পরে একদল মুসলমান "হিন্দুদের জ্যান্ত কবর দাও", "আবুল কাসেম কি জয়" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। এই আবুল কাসেমটি জনৈক সরকারী বেতনভোগী মুন্সেফ। হিন্দুরা ইহাতেও ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই বলিয়া কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে নাই।

উক্ত মুন্সেফটি কোন্ দলের এবং কাহাদের জোরে তাহার এই বিক্রম নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা বুঝা যাইবে। স্থানীয় মাইনর স্কুলটির স্থলে একটি বড় পলিটেকনিক স্কুল খুলিবার প্রস্তাব হয়। স্কুলটিতে কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাইয়া হিন্দুরা উহার ব্যয় নির্বাহার্থ ১৫ হাজার টাকা তুলিয়া দেন, মুসলমানেরা মাত্র ৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইবার পর ৩রা অক্টোবর স্কুলটির উদ্বোধনের তারিখ নির্দ্ধারিত

হইয়াছে, স্থানীয় সদর মহকুমা হাকিমের নামে উহার নামকরণ হইয়াছে "সিরাজুল হক মুসলিম পলিটেকনিক স্কুল" এবং উহার উদ্বোধন উপলক্ষে কুষ্টিয়া চলিয়াছেন খাজা সর নাজিমুদ্দীন, মিঃ সহীদ সুরাবর্দী, মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ, মিঃ ফজলুল রহমান প্রভৃতি লীগ নেতার দল। বহু দূর হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া মুসলমান, বিশেষতঃ লীগওয়ালারা আসিতেছেন, স্থানীয় হিন্দুরা যাহারা টাকা দিয়াছেন তাঁহারা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

সর নাজিমুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসার, মুন্সেফ প্রভৃতি পদে বাছিয়া বাছিয়া লীগ-ওয়ালা মুসলমান লওয়া হইয়াছে, ফল এই দাঁড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় শুধু এই যে, ইহারা সর্বদা বিদেশী গবর্মেণ্টের নিকট হইতে এই শ্রেণীর ঘোরতর অন্যায় কাজ করিবার প্রশ্রয় পায়। এ দেশের গবর্মেণ্ট সিভিলিয়ানতন্ত্র। সিভিলিয়ানদের মধ্যে কতক ভারতীয় থাকিলেও সমগ্র ভাবে উহা এখনও সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ কর্মচারীদের অধীন। ভারত-সচিবের নির্দেশ মানিয়া উহাদিগকে চলিতে হয়। এ দেশের জনসাধারণের প্রতি ইঁহাদের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব বা দরদ নাই বলিয়া এই ধরণের ঘোরতর অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং নীচতা দেখিয়াও ইহারা বাধা দিতে আসে না, নীরব থাকিয়া বরং প্রশ্রয়ই দেয়। এই শ্রেণীর অত্যাচারকে ভারতবাসীর উপর ভারতবাসীর বা বাঙালীর উপর বাঙালীর অত্যাচার বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, ইহা ইংরেজের কতকগুলি গোলামের বেনামীতে বিদেশীর অত্যাচার। সরকারী শাসন যন্ত্রের সুনাম ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য যাহাদের হাতে ন্যস্ত, এই শ্রেণীর অত্যাচার নিবারণে তাহাদিগকে অগ্রণী হইতে না দেখিলে লোকে ইহাই মনে করিতে বাধ্য। মেয়র মহাশয় প্রতিকারের জন্য বাংলা-সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং কোন তদন্তের ব্যবস্থা হইলে সহযোগিতা করিবার আশ্বাসও দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এতটা ভরসা করিতে পারিতেছি না। বাংলা-সরকারের আসল কাঠামোর পরিচয় যাহাদের জানা আছে, রংপুর জেলার বৈদ্যের-বাজার গ্রামে পুলিসের নিষ্ঠুর অত্যাচারের সরকারী সাফাইয়ের কথা যাঁহাদের মনে আছে, কুষ্টিয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিকারের কল্পনা তাঁহারা করিতে পারেন কি?

জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতির উপর আক্রমণ

মুসলিম লীগের সহিত বিদেশী গবর্মেণ্টের কর্মাধ্যক্ষদিগের বন্দোবস্ত কি চমৎকার ভাবে হইয়াছে এবং দুই দলের মধ্যে কি সুন্দর একযোগে কাজ (team work) চলিতেছে, জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতি মৌলানা হোসেন আমেদ মাদানীর উপর আক্রমণ তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অমৃত বাজার পত্রিকা এ সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। সংবাদটি এই:

জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতি মৌলানা মাদানী তাঁহার শিষ্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডোমর হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় সৈদপুর পৌঁছিলে তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া মৌলানা সাহেবকে অভ্যর্থনা করেন। একদল মুসলিম লীগওয়ালা ষ্টেশনে গোল-যোগ বাধাইবার চেষ্টা করে ও মৌলানা সাহেবের প্রতি কটূক্তি করে। মৌলানা সাহেব ইহাতে বিচলিত না হইয়া লোকজন সহ ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া যান এবং তাঁহার জন্য রক্ষিত গরুর গাড়ীতে গিয়া ওঠেন। এবার লীগওয়ালারা মাত্রা অতিক্রম করে এবং ইঁট পাটকেল ছুঁড়িয়া ও লাঠি মারিয়া গরুর গাড়ীর চালককে আহত করে। মৌলানা সাহেবকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টাও তাহারা করে এবং তাঁহার টুপি কাড়িয়া লয়। তাঁহার শিষ্যবর্গ পুলিসকে খবর দেয় এবং লীগওয়ালা গুণ্ডাদের সায়েস্তা করিবার জন্য মৌলানা সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা করে। গুণ্ডাদল অপেক্ষা ইহারা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। মৌলানা সাহেব কিছুতেই তাহাদিগকে বলপ্রয়োগের অনুমতি দিলেন না। শত উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও মৌলানা সাহেবের অনুরোধে ইঁহারা শান্ত রহিলেন। পুলিস আসিয়া লীগওয়ালা গুণ্ডাদের সম্মুখে নির্জীব পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এই গুণ্ডামিতে স্থানীয় একটি লোকও ছিল না।"

আজাদ হিন্দুস্থান ফৌজ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হইয়াছিল, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল আজাদ হিন্দুস্থান ফৌজ তাহার বহু সহস্র সৈন্য ও অফিসার এবং রাণী ঝান্সী ফৌজ নামে যে নারীবাহিনী গঠিত হইয়াছিল তাহারও অনেককে বন্দী করা হইয়াছে। ভারত-সরকার জানাইয়াছেন ইহাদিগকে কোর্টমার্শাল করা হইবে। সমগ্র দেশ এই সংবাদে ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিবার অভিযোগে এই বাহিনীর অফিসার ও নরনারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইলে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া ইহা-দিগকে শাস্তি দেওয়া হইলে দেশব্যাপী তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে। প্রস্তাবটি এইরূপ: নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই কথা জানিতে পারিয়া উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন যে ১৯৪২ সালে মালয়ে এবং ব্রহ্মদেশে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হইয়াছিল সেই বাহিনীর বহুসংখ্যক অফিসার ও নরনারী এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের কিছু ভারতীয় সৈন্য বিচার অথবা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বর্তমানে ভারতবর্ষের এবং বিদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রহিয়াছেন। যে সময়ে এই বাহিনী গঠিত হয় সেই সময়ে এবং তাহার পরে ভারতবর্ষ মালয় ব্রহ্মদেশ এবং অন্যান্য স্থানে যেরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহার কথা এবং বাহিনীর ঘোষিত উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত অফিসার ও নরনারীর প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকের ও যুদ্ধবন্দীদের ন্যায় আচরণ করা এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আরও বহু সুদূরপ্রসারী কারণের কথা এবং

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এই কথা বিবেচনা করিয়া নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি দৃঢ়তার সহিত এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবার অপরাধে (যেরূপ ভ্রান্তপথেই হউক না কেন) যদি এই সমস্ত অফিসার ও নরনারীকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে।

প্রস্তাবটিতে আরও বলা হইয়াছে যে স্বাধীন ও নবীন ভারত গঠনের কাজে ইঁহাদের নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। এ যাবৎ ইঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, ইহার উপরও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইলে তাহা শুধু অযৌক্তিকই হইবে না, ইহার ফলে সংখ্যাতীত গৃহে এবং সমগ্র ভাবে ভারতবাসীর চিত্তেও বেদনার সঞ্চার হইবে, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে ব্যবধান আরও বিস্তৃত হইবে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া পণ্ডিতজী বলেন :

"ইংরেজেরা যখন সিঙ্গাপুর, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন সেই সময় ভারতীয় সৈন্যদলের যে সমস্ত সৈন্যকে তাহারা ঐ সমস্ত স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া আসেন সেই সমস্ত সৈন্য যেভাবে চলিলে ইংরেজদের সর্বোত্তম স্বার্থ সাধিত হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে (ভারতীয় সৈন্যগণকে) তাঁহারা (ইংরেজরা) সেইভাবে কাজ করিবার নির্দেশ দিয়া আসেন।

"জাপানীরা ঐ সমস্ত অঞ্চলে উপনীত হইলে তাহাদের উদ্যোগে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হয় এই সমস্ত ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে কেহ কেহ সেই জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন। এখন ইংরেজেরা সিঙ্গাপুর মালয় ও ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাইবার পর এই সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় আচরণ করা হইতেছে।

"আমরা দাবি করিতেছি যে, এই সমস্ত ভারতীয়কে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা এবং প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

"ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনী এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। তথাপি ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনীর লোকজনের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইতেছে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর লোকজনের প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হইতেছে না।

"ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যে সমস্ত চেক জার্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, বিগত মহাযুদ্ধের (প্রথম মহাযুদ্ধের) পর তাহাদিগকে যুধ্যমান বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। যে সমস্ত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত এই সমস্ত চেকের পার্থক্য কোথায়?

"পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে এই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, এই সমস্ত তরুণ বয়স্ক ভারতীয় যতই ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া থাকুন না কেন, স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই ইঁহাদের একমাত্র অপরাধ। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া ইঁহাদিগকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও এই সমস্ত লোকের আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে; কাজেই ইঁহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।"

বিদ্রোহীর সহিত সন্ধিস্থাপন ইংরেজের পক্ষে নূতন নয়। আইরিশ বিদ্রোহী নায়ক মাইকেল কলিন্সের সহিত লয়েড জর্জ ও উইনষ্টন চার্চিল এক টেবিলে বসিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী নেতা ডি ভ্যালেরাকে আয়র্লণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতেও হইয়াছিল। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বিচার উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই সত্য উপেক্ষা করিলে ভারতব্যাপী অনাবশ্যক তিক্ততার সৃষ্টি করিবেন।

গবর্মেণ্ট জনসাধারণের খাদ্য-সংস্থানের জন্য দায়ী

উডহেড কমিশন তাঁহাদের সম্পূর্ণ রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে সকলের খাদ্য-সংস্থানের চরম দায়িত্ব গবর্মেণ্টের, গবর্মেণ্টকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যু যাহাতে না ঘটিতে পারে গবর্মেণ্টকেই সে চেষ্টা করিতে হইবে। গত একশত বৎসর যাবৎ গবর্মেণ্ট ইহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু উডহেড কমিশনের মতে কেবলমাত্র অনশন বন্ধ করাই তাঁহাদের কর্তব্য নহে, আহার্যের উন্নতি সাধন এবং জনসাধারণকে সবল ও স্বাস্থ্যবান করিয়া তোলার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব যে গবর্মেণ্টেরই ইহা কখনও স্বীকার করা হয় নাই। ইহাতে অবশ্য ভারতবাসী মোটেই আশ্চর্য হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী নীতির কয়েকটি মূল সূত্র আছে। যথা, পরাধীন দেশের অধিবাসিবৃন্দকে যতদূর সম্ভব অভাবগ্রস্ত করিয়া তাহাদিগকে এমন ভাবে অন্নচিন্তায় ব্যস্ত রাখিতে হইবে যেন তাহারা কোনমতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ না পায়; অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদূর সম্ভব তীব্র করিয়া তুলিয়া দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে স্বার্থপরতা ও ঈর্ষার বিষ সঞ্চারিত করিতে হইবে; শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন করিতে হইবে যেন তাহারা নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলিয়া যায়, বিজিতের সভ্যতা, ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদকেই আদর্শ বলিয়া মনে করিতে এবং নিজস্ব সভ্যতাকে ঘৃণা করিতে শেখে। আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। গবর্মেণ্টকে তাঁহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার শত চেষ্টাতেও কোন কাজ হইবে না কারণ সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষীণতম আশাও যত দিন থাকিবে তত দিন কোন সাম্রাজ্যবাদী গবর্মেণ্ট তাহার অধীনস্থ দেশবাসীকে সবলতা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সচ্ছলতা দানের ব্যবস্থা করিতে পারে না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন গবর্মেণ্ট ভিন্ন এ কাজ কেহ করিবে না।

কমিশন আরও দু-একটি কথা বলিয়াছেন যাহা বিদেশী গবর্মেণ্টের মনঃপূত হইবার কথা নয়। প্রথমতঃ, তাঁহাদের মতে খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন সম্বন্ধে একচেটিয়া সরকারী ব্যবস্থাই একমাত্র সন্তোষজনক উপায়। দ্বিতীয়তঃ, ক্রীত খাদ্যদ্রব্য ভাল কি মন্দ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে সরকারী ব্যবস্থা থাকা দরকার। এদেশে গবর্মেণ্ট বলিতে

আমরা যাহা বুঝি ও দেখি তাহা বজায় থাকিতে এই দুইটি মূল নীতিগত প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। এ দেশে গবর্মেণ্ট মানে ইংরেজ সিভিলিয়ান। ভারতীয় সিভিলিয়ান ইংরেজ সিভিলিয়ানের ছাঁচে হুবহু সাহেব এবং ইংরেজের স্বার্থবাহী হইতে না পারিলে গবর্মেণ্টের পরিচালক চক্রে তাঁহাদের স্থান হয় না। এই চক্রে মন্ত্রীদেরও প্রবেশাধিকার নাই। যখন ভারত-সচিবের অধীনস্থ এই সিভিলিয়ান চক্রের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করা। ক্ষমতা ইহাদের অসীম হইলেও সংখ্যায় ইহারা অল্প, কাজেই দেশদ্রোহী ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া ইহাদের অনেক কাজ করাইয়া লইতে হয়, এবং সেই কাজের মূল্যকেই সাধারণ লোকে রাজনৈতিক ঘুষ বলে। যুদ্ধের সময় এই সকল ব্যাপারেও ব্ল্যাক মার্কেট হইয়াছে, দর অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ সরকারী তহবিল এখন আর ঘুষের এই টাকা যোগাইতে পারে না, কাজেই চাউল, কাপড় প্রভৃতির কারবার ফাঁদিয়া ইহাদের সহিত রফা করিতে হয়। বন্দোবস্তও চমৎকার, লাভের কড়ির সবই পাইবে ইহারা, লোকসান সম্পূর্ণ বহন করিবে দেশবাসী। উডহেড কমিশনই হিসাব করিয়াছেন শুধু দুর্ভিক্ষের কয় মাসে এই শ্রেণীর লোকে ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ১৫ লক্ষ লোকের—প্রকৃত পক্ষে ৫০ লক্ষের—প্রাণের বিনিময়ে এই টাকা ইহাদিগকে পাওয়াইয়া দিতে হইয়াছে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের মজুত মাল ধরিয়া সেগুলি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্ত উডহেড কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। বাংলায় মিঃ শহীদ সুরাবর্দি-চাউল খুঁজিতে গিয়া দেশব্যাপী যে খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন তাহার ফলাফলের কথা এখন সকলেই জানে সুতরাং গবর্মেণ্টের অর্থাৎ বিলাতী সিভিলিয়ান চক্রের এই মূলনীতি অব্যাহত থাকিতে উক্ত সুপারিশ অর্থহীন।

পুষ্টিকর খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে উডহেড কমিশন

উডহেড কমিশন মনে করেন যে ক্রমবর্ধমান জনগণের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্ভব তো বটেই, জনসাধারণের খাদ্যমানের উন্নতিসাধনও সম্ভব।

কমিশন স্বীকার করেন যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভারতবর্ষে অস্বাস্থ্য আধিব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাবল্য বর্তমান। কোনও কোনও খাদ্যের অভাবে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয়, ভারতবর্ষে ঐ সকল রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

কমিশন অনুমান করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও ভারতবর্ষের শতকরা ৩০ জন পর্যাপ্ত আহার পায় না এবং অবশিষ্টের মধ্যেও বহুলোকের খাদ্য স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী নহে। কাজেই ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মতালিকার একটি প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত পুষ্টিকর আহার্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। সুসমঞ্জস ও সন্তোষজনক খাদ্য-প্রস্তুত ব্যবস্থা করা জনসাধারণের একটি বিরাট্ অংশেরই সাধ্যাতীত; সুতরাং জীবনরক্ষার জন্ত অত্যাবশ্যক খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি না হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাইলে খাদ্যের উন্নতি-সাধন সম্ভবপর নহে। কমিশন মৎস্যকে উৎকৃষ্ট শরীরপোষক খাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; উহাতে মাংসের মতই প্রোটিন আছে, তাহা ছাড়া উহাতে কয়েকপ্রকার ভিটামিন ও খনিজ লবণও আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় যে দেশের লোকেরা গড়পড়তা মাংস ও দুগ্ধ খুব কমই পাইয়া থাকে সেই দেশে প্রধান খাদ্যশস্যসমূহে সীমাবদ্ধ অসমঞ্জস খাদ্যতালিকার পরিপূরক হিসাবে মৎস্যের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। বর্তমান সময়ে মৎস্যের সরবরাহ নিতান্ত অপ্রচুর। সমুদ্র, নদীর মোহানা ও দেশের অভ্যন্তরস্থ নদীনালায় মাছ-ধরা ও মৎস্যপালন ব্যবস্থার উন্নতি করা হইলে জনসাধারণের খাদ্যের উন্নতি হইবে।

পুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কমিশন চর্বি ও তৈল জাতীয় খাদ্য বর্তমান সময় অপেক্ষা দ্বিগুণ হইতে আড়াই গুণ বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন। দুগ্ধ সম্পর্কে কমিশনের মত এই যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের দরিদ্র জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য হিসাবে পাইতে পারে—এমনভাবে দুগ্ধোৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বর্তমানে নাই। দেশের কৃষি-অর্থনীতি ক্ষেত্রে গোল আলু, মিষ্টি আলু, শকরকন্দ আলু ও কলার স্থান পর্যালোচনা করিয়া কমিশন এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জমির উপর চাপ যখন খুব বেশী তখন কৃষিযোগ্য জমি হইতে যাহাতে সর্বাধিক লাভ পাওয়া যায়, সেই ভাবেই আবাদ করা উচিত। তাহা করার একটি উপায় হইল অধিক পরিমাণে গোল আলু প্রভৃতি আবাদ করা। কারণ, সবজি এবং ক্যালরি হিসাবে এই সকল ফসলের দাম প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলির উপরে বলিয়া এই সকল ফসল আবাদ করিলে কম জমিতেই সম পরিমাণ সজি ও ক্যালরির সংস্থান হয়। সুতরাং এই সকল ফসল আবাদের দিকে নজর দেওয়া হইবে, অন্যান্য ফসল, বিশেষ করিয়া শরীর রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক ফসল আবাদের জন্য অধিক পরিমাণ জমি পাওয়া যাইবে।

এদেশে যাহা যাহা নাই বলিয়া কমিশন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাছ সবজি দুধ কলা প্রভৃতি যে-সব দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন, ইংরেজ আগমনের পূর্বে স্বাধীন বাংলায় তাহার সবই ছিল। স্বাস্থ্য ও দেহপুষ্টির জন্ত এ সব খাদ্য দরকার বাঙালী ইহা জানে। এগুলি তাহার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। উহা হইতে দেখা যাইবে আধুনিক খাদ্যপ্রাণ, পুষ্টি, ক্যালরি প্রভৃতির সংবাদ রন্ধননিপুণা বাঙালী গৃহলক্ষ্মীদের জানা ছিল এবং বাঙালী সে সব উৎপাদন ও সংগ্রহ করিতে জানিত।

এই বাংলা দেশের খুল্লনা চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদ লাভ করিয়া স্বামীর তৃপ্তির জন্ত যাহা যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, কবিকঙ্কনের সেই বর্ণনার কিয়দংশ এই:

"দুধে লাউ দিয়া খণ্ড,
ছাল দিল দুই দণ্ড
সম্ভোলিল মহুরির বাসে।
মুগ সুপে ইক্ষু রস
কৈ ভাজা পণ দশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদা রসে॥"

খুলনা

"ভাজে চিথলের কোল
রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান বড়ি মরিচে ভুষিত,"

তার পর—

"করিয়া কণ্টক হীন
আম্রে শউল মীন
খর লুন দিয়া ঘন কাটি,
রাঁধিল পাঁকাল ঝস
দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাঁটি।
কলা বড়া মুগ সাউলি
ক্ষীর মোন্না ক্ষীর পুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে ॥"

ইহা বড়লোকের বাড়ীর উৎসবের 'মেনু' নহে, সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর নিত্য নৈমিত্তিক আহার। বাংলায় ইংরেজ আগমনের পর এই ঐশ্বর্য্য এই সমৃদ্ধি রসাতলে গিয়াছে, কেন গিয়াছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি, কেমন করিয়া গেল তাহা বলিবার স্থান ইহা নহে। গ্রামবাসী যে বাঙালী ছয় বৎসর আগেও চার পয়সা ছয় পয়সা সের দুধ পাইয়াছে, তিন চার আনা সের বড় বড় রুই কাতলা এবং এক টাকা পাঁচ সিকা সের ঘি কিনিয়াছে সেই বাঙালীর আজ দুর্দশার শেষ নাই। দুধ, ঘি, মাছ আজ সোনার মতই দুষ্প্রাপ্য ও বড়লোকলভ্য। গরীবের জন্য অবশিষ্ট রহিয়াছে শুধু কচুপাতা আর কলমী শাক।

বাংলার ফসলের অবস্থা

এবার অনাবৃষ্টিতে বাংলাদেশে ফসলের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়াছে গ্রাম সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই উহা বুঝিবেন। এ সম্বন্ধে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে আমরা তাহার সারমর্ম দিতেছি। আগামী বৎসর দুর্ভিক্ষের কি ভয়াবহ আশঙ্কা রহিয়াছে উহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। ষ্টেটসম্যান লিখিতেছেন :

"সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে সাধারণতঃ আমন ধান যাহা পাওয়া যায় এবার তাহার শতকরা ৮০ ভাগ এবং আউস ধানের শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যাইবে। কিন্তু বেসরকারী চাউল ব্যবসায়ী চাউল উৎপাদনকারী প্রধান জেলাগুলি সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় সরকারী হিসাব ভুল। বঙ্গীয় চাউল কল সমিতি বাংলা দেশের চাউল ব্যবসায়ের প্রতিনিধি, ইঁহাদের হিসাবে দেখা যায় অনাবৃষ্টি এবং বিলম্বে রোপণের দোষে এবারকার ফসল স্বাভাবিক অবস্থার অর্দ্ধেকের বেশী হইবে না। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে ফসল আরও অনেক কম হইবে, শতকরা ৩০ ভাগের বেশী হয়ত হইবে না। অথচ শেষোক্ত দুইটি জেলায় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর ধান উদ্বৃত্ত থাকে।

"আউস ধান কাটা হইয়াছে। কত ফসল ঘরে উঠিয়াছে তাহার সঠিক হিসাব জানা যায় নাই। তবে বে-সরকারী মহলের বিশ্বাস সাধারণ অবস্থার গড়পড়তা শতকরা ৬০ ভাগের বেশী ফসল উঠে নাই। বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হাওড়া প্রভৃতি কতকগুলি জেলায় জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইয়াছে, আবার পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি কতকগুলি জেলায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হইয়াছে।

"চাউলের দাম এখনই বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক জেলায় সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরের চেয়ে বেশী দামে চাউল বিক্রয় হইতেছে।

"বাঁকুড়ার সংবাদে প্রকাশ, আউদা, বড়জোড়া, সোনামুখী এবং ছাতুয়া থানার বহু গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বুভুক্ষু লোক গ্রামে চাউল না পাইয়া বাঁকুড়া শহরে উপস্থিত হইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চাউল চাহিয়াছে। বাংলা দেশের অন্যান্য স্থান হইতে চাউলের অভাবে লোকের দুর্দ্দশার সংবাদ আসিতেছে।

"সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বঙ্গীয় চাউল কল সমিতি অনেকগুলি জেলা হইতে ফসলের অবস্থা সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

জেলা	আমন ধান কত পাওয়া যাইতে পারে		আউস ধান কত পাওয়া যাইতে পারে	
দিনাজপুর	শতকরা	৮০	শতকরা	৬০
রংপুর	,,	৫০	,,	৬০
বগুড়া	,,	৬০ হইতে ৬৫	,,	১২॥
মালদহ	,,	৫০	,,	৫০
বরিশাল	,,	৭০	,,	৬৫
মৈমনসিংহ	,,	৭০	,,	৭৫
বর্দ্ধমান	,,	৩০	,,	১২॥
হুগলী	,,	২৫	,,	৫০
হাওড়া	,,	৫০	,,	...
বীরভূম	,,	৬৬	,,	৮০
মেদিনীপুর	,,	৫০	,,	১০ হইতে ১৫
২৪ পরগণা	,,	৩০ হইতে ৫০	,,	২৫

কলিকাতায় সরিষার তৈল রেশনিং

১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতায় সরিষার তৈল রেশনিং আরম্ভ হইয়াছে। তেলের কলের মালিকদের মতে এক টাকা দরে অনায়াসে খুচরা বিক্রয় করা যায়, গবর্ন্মেণ্ট সে স্থলে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এক টাকা ছয় পয়সা। বঙ্গীয় তেলকল সমিতি সম্প্রতি তাঁহাদের এক সভায় ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং সরকারের কার্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন এবং আমরাও দেখিতেছি জনসাধারণ এই অন্যায় মূল্য বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যুদ্ধের পর রেলগাড়ীর উপর চাপ কমিয়া গিয়াছে, অনেক লাইনে পূর্বের ন্যায় গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থাও হইতেছে। এখন বাহির হইতে আগের মত সরিষা বীজ আমদানীর সুযোগ দিয়া বাংলার তেলের কলগুলিকে চালু রাখিবার বন্দোবস্ত কেন করা গেল না জনসাধারণ তাহা বুঝিতে অক্ষম। তেল রেশনিং হওয়াতে সরিষা বীজ আমদানী কমিবে, কারণ সরকার কানপুর হইতে তেল আনাইবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে তেলকলগুলিকে

কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে এবং প্রায় দশ হাজার শ্রমিক বেকার হইবে। গবর্মেণ্ট এই সামান্য ব্যাপার বুঝেন না এতটা নির্বোধ তাঁহাদিগকে কেহই আশা করি মনে করিবেন না। লোকে শুধু জানিতে চায় বাংলার ঘানিগুলির সর্বনাশ সাধন করিয়া কানপুরের বড় বড় তেলের কলগুলিতে তেল ঢালিবার ব্যবস্থা কাহার স্বার্থে করা হইল, লাভের কড়িটা প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে কাহাদের মধ্যে ভাগ হইবে? অনেক খাঁটি চোঁয়াইয়া তেল আসিয়া ক্রেতার নিকট পৌঁছিতেছে—রেশনিং-এর প্রথম দিনেই তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে—বাজে তেল, ওজনে কম এবং ঝাঁজ তেলে নয় সরকারী মুদির জিহ্বাগ্রে।

কলিকাতা রেশনিংএ ২৫ টাকার চাউল

বাংলার বস্তি ও বাজার দরদী লাট মিঃ কেসি যখন ২৫ টাকায় উৎকৃষ্ট চাউল সরবরাহের কথা শুনিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন ১৬ টাকার চাউলই অতঃপর ২৫ টাকায় বিক্রয় হইবে, ১৬ টাকার চাউল খাওয়া দুষ্কর হইবে। হইয়াছেও তাই। ইহার পর ১৬৷০ টাকার চাউলের মূল্য কমাইয়া ১৫ টাকা করা হইয়াছে এবং পূর্বে ঐ দরে যে চাউল দেওয়া হইত এখন তাহাকেই বহুস্থলে সরু চাউল বলিয়া ২৫ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে। কলিকাতায় চাউলের দর একহিসাবে সের করা দুই পয়সা কমিবার বদলে চৌদ্দ পয়সা বাড়িয়াছে। বাংলার ইংরেজ পরিচালিত গবর্মেণ্ট কথায় কথায় কলিকাতা কর্পোরেশন ও ভারতীয় মন্ত্রীদের অকর্মণ্যতার ছল খুঁজিয়া ভারতে ও বিলাতে তাহা প্রচার করেন। খাস ইংরেজের পরিচালনায় এই অতি অপরূপ ব্যবহার কি কৈফিয়ৎ তাঁহারা দিবেন?

দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা

দামোদর একদিন পশ্চিম বঙ্গের প্রাণদাতা নদ ছিল, কিন্তু বাংলার হর্তাকর্তাদিগের সুবুদ্ধির ফলে গত একশত বৎসর যাবৎ সেই নদই পশ্চিম বঙ্গের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ দামোদরের জল ও শক্তি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে এবং সম্প্রতি ডাঃ আম্বেদকর এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দামোদর উপত্যকার উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। বাংলা ও বিহার সরকারের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে ডাঃ আম্বেদকরের উপস্থিতিতে এ সম্বন্ধে একটা কর্মপন্থাও নির্ধারিত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। ডাঃ আম্বেদকর প্রথমেই বলেন:

"বন্যা প্রতিরোধের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি? দামোদরের তটভাগ ও অববাহিকায় বন্যার তাণ্ডবলীলা প্রশমিত করা যে একান্ত প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই যত বাধাবিঘ্নই তাহাতে থাকুক। সুখের বিষয় এই সকল প্রতিকূল বাধার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই বর্তমান পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বন্যা নিবারণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ ও তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ ইহা হইতে হইবে। তাহা ছাড়া যথেষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তিও উৎপন্ন হইবে। সুতরাং পরিকল্পনাটি ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবেই সমর্থন করিয়াছেন। আশা করা যায় বাংলা ও বিহার গবর্ণমেণ্টও ইহাকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবেন। পরিকল্পনাতে যে-সকল বাঁধের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলিতে সর্বসমেত মোট ৪৭ লক্ষ একর ফুট জল ধরিয়া রাখা যাইবে এবং তাহার সাহায্যে বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে; তাহা হইতে জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাইবে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ, তাহা ছাড়া যে-সকল খাল কাটা হইবে তাহাতে নৌকা চলাচলেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে।"

অতঃপর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিরূপণ এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় ও পন্থা নির্ধারণ সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকর বলেন:

"দামোদর নদের জলস্রোত বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া কাজে লাগাইবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা বিবেচনার জন্য আমরা দ্বিতীয়বার মিলিত হইতেছি। প্রথম বারের সম্মেলনে আমরা প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছিলাম, এই পরিকল্পনা শুধু দামোদরের বন্যা নিবারণের জন্যই করা হইবে অথবা সেই বন্যাকে করায়ত্ত করিয়া জলস্রোতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, জলসেচ এবং জলপথে চলাচলের জন্যও নিয়োজিত করা হইবে। শেষোক্ত মতটিই গৃহীত হইয়াছে। তদনুযায়ী দামোদরের স্রোতকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা স্থির করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় সমস্ত বিষয়টি অতি পরিষ্কার ও বিশেষভাবে বুঝান হইয়াছে। তাহার সাহায্যে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করা খুব সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছে।"

কি ভাবে কাজ আরম্ভ হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন:

"পরিকল্পনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দামোদরের নিকটবর্তী ভূভাগের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে ইহার আর একটি উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধোত্তর পর্বে বেকার সমস্যার সমাধান। এই শেষোক্ত সমস্যা এত গুরুতর যে সেই দিক দিয়া বিচার করিলে দামোদর-বাঁধ-পরিকল্পনার কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা সর্বতোভাবে সমর্থন করেন এবং ইহা কাজে পরিণত করিতে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিবেন। এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য কর্মী সংগ্রহ এবং সংগঠন কার্যোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারই লইবেন। বাংলা ও বিহারের যুদ্ধোত্তর অন্যান্য পরিকল্পনা ব্যাহত না করিয়া যাহাতে এই কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে তাহার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিবেন। বাংলা দেশে ইঞ্জিনীয়ারের কাজে অভিজ্ঞ লোক অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া সামরিক বিভাগ হইতে এই বিষয়ে সাহায্যের কথা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

"সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণের এবং যন্ত্রপাতির সাহায্য পাওয়া গেলে প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদির কাজে অনেক সুবিধা হইবে।

এই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারই জোগাইবেন। তবে কল্পনাটি কাজে পরিণত হইলে তাহার কার্য্যকরী লভ্যাংশ হইতে ক্রমশঃ খরচের টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যকরী না হইলে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার খরচ অর্দ্ধেক বহন করিবেন। বাকী অর্দ্ধেক বহন করিতে হইবে প্রাদেশিক সরকার দুইটিকে।"

পরিশেষে ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে, এই পরিকল্পনার ফলে যে কল্যাণের সৃষ্টি হইবে, দামোদর নদের উপত্যকা বা সন্নিহিত এলাকার প্রত্যেকটি প্রাণী যেন তাহার অংশ লাভ করিতে পারে, কেহই যেন তাহা হইতে বঞ্চিত না হয়।

পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। অকারণ সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে কাজ সুরু হইবে বলিয়াও জানানো হইয়াছে। ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে শুনিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা বলিতেছেন, দামোদর এক দিন বাংলা ও বিহারের যে ক্ষতি করিয়াছে সুদ সহ শত গুণে এবার তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। দামোদরের জল হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া যে বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি হইবে তাহা নানা শিল্পের সহায়ক হইয়া দেশের শ্রী বৃদ্ধি করিবে। বৎসরের বারো মাস দামোদরের বাঁধগুলি যেমন পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করিতে পারিবে, তেমনি অনাবৃষ্টির সময় ভূমিতে জল সেচনের জন্য আবশ্যক জলেরও যোগান দিতে পারিবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চার জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া আনা হইবে। টেনেসি উপত্যকায় আমেরিকা ৪০ হাজার বর্গ মাইল অনুর্বর ও অস্বাস্থ্যকর ভূমিকে কি ভাবে উর্বর ও স্বাস্থ্যকর করিয়াছে তাহার বিবরণ আমরা পড়িয়াছি, ছবিও দেখিয়াছি। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারেরা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বিজ্ঞানের যুগে নদ নদীর দৌরাত্ম্য নিবারণ করা যেমন অসম্ভব নয়, তেমন হাজা মজা হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়া মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করাও কঠিন নয়। মিশরে সর উইলিয়ম উইলকক্সও নীল নদের উপর বাঁধ দিয়া উষর ভূমিকে শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ হইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা

প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশবাসী অগ্রসর হইয়াছেন, কিছু কিছু কাজও ইতিমধ্যে হইয়াছে। স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, রায় বাহাদুর বিজয়-বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী, ডাঃ নরেন্দ্র-নাথ লাহা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। এখন প্রতি দুই বৎসর অন্তর একজন বিশিষ্ট সাংবাদিককে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ-স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে এবং উক্ত টাকার সুদ হইতে তাঁহাকে পাথেয় দেওয়া হইবে। এই বক্তৃতার নাম হইবে "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেকচারশিপ" এবং উহা পুস্তকাকারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবে। প্রথম বক্তৃতার জন্য শ্রীযুক্ত সন্ত নিহাল সিংকে আহ্বান করা হইয়াছে। এই লেকচার-শিপকে বার্ষিক বক্তৃতায় পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এ বিষয়ে যাঁহারা সাহায্যদানে ইচ্ছুক তাঁহারা ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, কোষাধ্যক্ষ, রামানন্দ জয়ন্তী কমিটি, ৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইলে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

বিষ্ণুপুরে শ্রীযুক্ত রামনলিনী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে রামানন্দ কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবীসঙ্ঘের উদ্যোগে স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক জনসভা হয়। চিত্রটি আঁকিয়াছেন গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অতুল বসু। সভায় বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দের কয়েকটি বক্তৃতার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, রামানন্দবাবু এতগুণে বিভূষিত ছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিবেন না। তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কিন্তু সেই গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে তাঁহার সারল্য, ঔদার্য, ও অমায়িকতা প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি যোগী, তিনি ত্যাগী, তিনি ধ্যানী, দেশভক্ত ও কর্মবীর ছিলেন। তাঁহার বিষয়াসক্তি ছিল না। তিনি আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রচারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেন না। মতানৈক্য সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বরাবর অটুট ছিল। তিনি অল্প বয়স হইতেই সংবাদপত্রে লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় সাংবাদিক জগতে নূতন যুগের সূচনা হয়। তাঁহার তেজস্বিতা, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা আদর্শস্থানীয় ছিল।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, রামানন্দ বাবু যে শুধু সাংবাদিক ছিলেন তা নয়, তিনি সমাজ-সেবার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দুর্লভ। তিনি সমাজে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে সেই শূন্য আসন অন্য কাহারও দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। তিনি বাংলা সাহিত্যে নব ভাবধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মোক্ষ-মূলার ও সর জগদীশচন্দ্র বসুর উপরে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাহিত্যের দিক হইতে তাহা অতুলনীয়।

শ্রীযুত মাখনলাল সেন বলেন যে, রামানন্দ বাবুকে দেখিলে প্রাচীন যুগের ঋষি বলিয়া মনে হইত। তিনি ছিলেন তাপস। রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে সমস্ত জটিল প্রশ্নেরই তিনি অত্যন্ত নির্ভুল সমাধান করিতেন। তাঁহার এই ক্ষমতার পিছনে ছিল তপস্যা ও আজীবন সাধনা। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা লোকমত, প্রতিষ্ঠা, অর্থ ও লোভকে উপেক্ষা করিয়া অনুসরণ করিতেন। তিনি একজন সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। জাগতিক মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা

কখনই তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। তিনি ছিলেন মানব-দরদী, মানবতার দুঃখ গভীর ভাবে তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিত। অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার চেষ্টায় হয়। সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারে তিনি যে নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্তমান সংবাদপত্র-সেবীরা যদি তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলেন তাহা হইলেই তাঁহার স্মৃতি-বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা সার্থক হইবে।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বলেন যে, স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অনুপম চরিত্রই তাঁহাকে এইরূপ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। চারিত্রিক মহনীয়তার দিক হইতে তাঁহাকে শুধু মহাভারতের ভীষ্মদেবের সহিত তুলনা করা চলে। তেমনই নির্ভীক, সত্যবাদী ও সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁহার ছিল। তিনি অসাধারণ সংযমের সহিত লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী কখনই কোন ক্ষেত্রেই সংযমের বাঁধ অতিক্রম করে নাই।

তাঁহার প্রবন্ধাবলী ছিল যুক্তিতে ক্ষুরধার, তথ্য সংগ্রহে নিখুঁত কিন্তু তিনি কখনই বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া শালীনতার সীমা অতিক্রম করেন নাই। তিনি আদর্শ সাংবাদিক ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল না কিন্তু তাহার গরিমা তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র ছিল না। তিনি তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিদেশীয়দের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আমরা জানি যে, সূর্য্য আপন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে, তবুও ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য-সমাজে রামানন্দ বাবু সমধিক পরিচিত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন যে, ছাত্র-জীবনে প্রবাসীর শালীনতা, রুচিবোধ ও উন্নততর সাহিত্য উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস তাঁহাদিগকে রামানন্দ বাবুর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিকতার মোহ হইতে মুক্ত ছিলেন। তাঁহার সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আমৃত্যু অবিচলিত ছিল। তাঁহার চরিত্র এত নির্মল ছিল যে, তাঁহার সান্নিধ্যে একটি পবিত্রতর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত। সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রামানন্দবাবু যে আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক সংবাদপত্র-সেবীরই অনুকরণীয়।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি বলেন যে, রামানন্দবাবু তেজস্বিতা, চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নির্ভীকতা, আর্ত্তের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। ঐহিক সুখ সুবিধা ও বিলাসব্যসনের দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সত্যের প্রতি অসামান্য অনুরাগ ও সত্য কথা বলিবার সাহস রামানন্দবাবুর ছিল। তাঁহার লেখনী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছে। অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার হিন্দু আদর্শের তিনি প্রতীক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শে আমাদের অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

শিল্পাচার্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষট্‌সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ৩০শে ভাদ্র কলিকাতায় এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে প্রদত্ত এক মানপত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়:

শিশু সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য বাসর, কিশোর বাংলা, জাগরণী সংঘ, শ্রীরামপুর কিশোর সভা, ব্রজগোপাল বালক সংঘ, বেঙ্গল খ্যাশনাল ক্লাব, ভাইবোন ক্লাব, কিশোর সংঘ, ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব, বাঙালী ক্লাব, সুধীরমণি স্মৃতি পাঠাগার, আদর্শ বিদ্যামন্দির ও সঙ্গীত কলালয়, কৃষ্ণদাস পাল ইনষ্টিটিউট, জোড়াসাঁকো ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব, কিশোর কেন্দ্রী সংঘ, কেশব একাডেমী, নিরীক্ষণ পত্রিকা (বহরমপুর), বালিকা ব্যায়াম সমিতি, ভবানীপুর ব্যায়াম সংঘ, শিল্পপীঠ, বিবেকানন্দ কন্যা শিল্প পীঠ, জাতীয় ক্রীড়া সংঘ প্রভৃতি।

শ্রদ্ধেয় শিল্পাচার্যকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া মানপত্রে বলা হয়:

"ভারতীর তুমি বরপুত্র। ভারতমাতার অপরূপ রূপ তুমিই চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার দেশাত্মবোধ নব চিত্রকলায় অপূর্ব প্রেরণা দান করেছে। ভারতের সাধনার ধারা তোমার প্রবর্তিত শিল্প রীতির মধ্য দিয়ে অব্যাহত গতি লাভ করেছে। হে দেশের সুসন্তান, আমরা তোমায় অভিনন্দিত করি। তোমার রসসৃষ্টি শুধু শিল্পরচনায় শেষ হয় নি কাহিনী রচনা করে শিশু মনে যে আনন্দের সঞ্চার করেছ, তা অতুলনীয়। হে শিশুমনের অধিনায়ক, আমরা তোমায় অভিনন্দিত করি।"

মানপত্রের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেন:

"আজ আমার পক্ষে সুপ্রভাত মনে করি, কেননা নিজে যখন বালক ছিলাম, সমবয়সী যারা বালকবালিকা ছিল তাদের জন্য এই গল্পকাহিনী লিখেছিলাম, তাদের মন ভোলাবার জন্য। তখন ভাবিনি দেশে তার স্থান হবে। যে চিত্রকলার জন্য এত আদর দিচ্ছ তা করেছিলাম বড়দের জন্য। বড়রা তা নেয় নি তখন। নতুনরা আমার সেই পুরস্কার দিলে তখন যা পাই নি—তাই আজ আমার পক্ষে সুপ্রভাত।"

"শরীর ভেঙ্গেছে, মন অন্য দিকে গেছে। গল্প লিখব, ছবি আঁকব এমন মন নেই। যাদের ছোট দেখেছি, তারা আজ বড় হয়েছে, কি বলে যে ধন্যবাদ দিব তা বুঝতে পারছি না। আজ তোমাদের দেখে বড় আনন্দিত এইটুকুই বলি। বেশী সম্মান দিও না আমায়; চিরকাল ছেলেমানুষ আমি। ৭৫ বছর কাটিয়েছি আমি সুখে—বড় সুখে ছাত্রদের নিয়ে—ছেলেদের নিয়ে। আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, আশীর্বাদ করছি। তোমরা আমার চেয়েও বড় হও। আর্টে, গল্পে বাংলা ভাষাকে পৃথিবীতে উঁচু করে ধর। বাংলার ছেলে-মেয়েরা যেন প্রথম স্থান অধিকার করে পৃথিবীর মধ্যে, এই আমার কামনা। ভারতের ভাগ্যবিধাতা একদিন না একদিন বড় হবে।"

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২৫শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর) হইতে ৮ই কার্ত্তিক (২৫শে অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

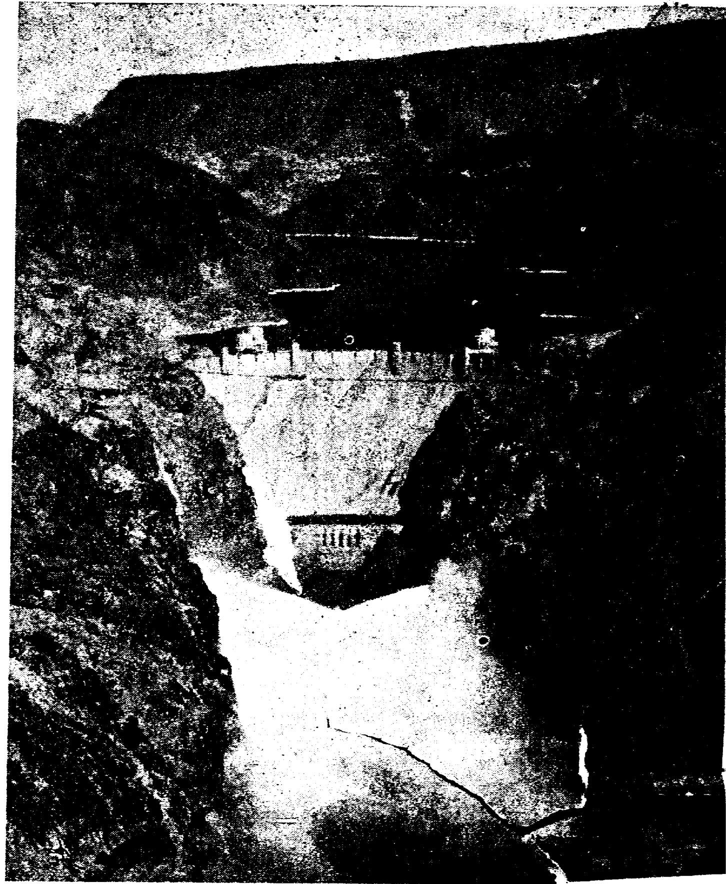


জাপানীগণ কর্ত্তৃক কুয়েলিনের সেতু ধ্বংস হইবার পর শাম্পানের জন্য প্রতীক্ষা-রত চীনাবাহিনী



কোরিয়ার রাজধানী কেইজোর একটি রাস্তা। পশ্চাতে নগরীর প্রধান রেলষ্টেশন

মুক্তরাষ্ট্রের ওরগন ষ্টেটের শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কংক্রিটের বাঁধযুক্ত
একটি সেচ-নালী



পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ৭২৭ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ। পশ্চাতে ১১৫ মাইল দীর্ঘ
পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ

চিম্‌নি শত্রু ধরিল

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

যে পর্ব্বতের ভিতরে আকাশবাহী সৈনিকেরা আস্তানা করিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার দক্ষিণেই শত্রুপক্ষের হাওয়াই জাহাজ-কেন্দ্রগুলি ছিল। পর্ব্বতের উত্তরে একটি গভীর অথচ শুধু কুড়ি-পঁচিশ হাত চওড়া পাহাড়ে নদী ও তাহার অপর পারে আর একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত। সেনাপতির আদেশ অনুসারে পাঁচ-ছয় জন সৈনিক ছোট নদীটি পার হইয়া অপর দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। আকাশবাহিনী যদিও এই প্রদেশের মানচিত্রাদি সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল এবং ভৌগোলিক ভাবে কোন কিছুই সেনাপতির অজ্ঞাত ছিল না, তবুও এই অঞ্চলে শত্রুর ঘাঁটি, গতিবিধি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার সকল সংবাদ যথাশীঘ্র জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। আকাশবাহিনীর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে এই প্রদেশ অধিকার করিয়া শত্রুকে হটাইয়া রাখা, যাহাতে অপরাপর আরও প্যারা-সৈনিক দল এই স্থলে অবতরণ করিয়া ক্রমশঃ এই স্থানে নিজ পক্ষের হাওয়াই জাহাজ-কেন্দ্রাদি গঠন করিয়া লইয়া পূর্ণ সামরিক শক্তির সমাবেশপূর্ব্বক শত্রুর উপর আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারে। চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। সেই জন্য প্রয়োজন ছিল শত্রুকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তর দিক শত্রুবিমুক্ত রাখা। সুতরাং আদেশ হইল যে পর্য্যবেক্ষণকারী সৈনিকেরা দুই-তিন দিক ধরিয়া মানচিত্র অবলম্বনে পূর্ণ এলাকা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবে যে, উত্তরে কোথাও শত্রু সমাবেশ আছে কিনা এবং থাকিলে তাহাদের শক্তি কি প্রকার ও কিরূপে তাহাদের বিনাশ-ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই পর্য্যবেক্ষণ দলের নেতা হইল একজন মারাঠা লেফটেনাণ্ট ও তাহার সঙ্গে চলিল একজন রাজপুত জমাদার, চিম্‌নি ও আরও দুই তিন জন কষ্টসহিষ্ণু সৈনিক।

নদীটি পার হইয়া এই ক্ষুদ্রবাহিনী অপর দিকের পর্ব্বতটি অতিক্রম করিয়া প্রথমত পূর্ব্বদিকে চলিল। উদ্দেশ্য দশ-পনর মাইল পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া পুনরায় উত্তরে চলিয়া, পরে পশ্চিমে কুড়ি-পঁচিশ মাইল গিয়া সর্ব্বশেষে দক্ষিণ মার্গে আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করা। প্রাতে যাত্রারম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহর নাগাদ তাহারা পূর্ব্বদিকে যতটা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন প্রায় ততদূর আসিয়া পড়িল। দলনেতা অতঃপর সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিলেন। সকলে একটা ঝরণার ধারে অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া স্নান করিয়া টিনজাত খাদ্যের সাহায্যে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিল। কোন প্রকার আগুন জ্বালাইয়া কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে বলিয়া তাহারা সঙ্গের বোতলের জল খাইয়াই কার্য্য সমাধা করিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট চিম্‌নির ইতিপূর্ব্বের কার্য্যকলাপ ও তাহার সরল চরিত্রের কথা জানিতেন। তিনি তাই সকলের চিত্ত-বিনোদনের জন্য চিম্‌নির সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "সন্তোষ, তোমার এত বুদ্ধি ত তুমি আইন-ব্যবসায় না করে পল্টনে নাম লেখালে কেন?"

চিম্‌নি বলিল, "আহা, আমি আবার কবে আইন পড়লাম যে ওকালতি করব? আমি ত [illegible] ঠিক করলাম মরে দেখতে হবে কোথায় যায়। আইন পড়লে কি আর মরা যায়?"

লেফ্‌টেনাণ্ট বলিলেন, "তা কেন যাবে না। এত উকিল ব্যারিষ্টার, জজ, সব মরছে আর তুমি বলছ আইন পড়লে মরা যায় না। বাঃ কি বুদ্ধি তোমার!"

"আহা, তারা ত বুড়ো হয়ে নয়ত অসুখ হয়ে মরে, আমি ত বুড়োও হই নি আর আমার অসুখও করে নি ত আমি মরতাম কি করে?

"হ্যাঁ, কিন্তু মরা না মরা ত কপালের লেখার উপর নির্ভর করে। এই ত তুমি পল্টনে এত দিন রয়েছ কই মরলে না ত?"

চিম্‌নি অবাকচক্ষে লেফ্‌টেনাণ্টের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যিই ত, মরিনি ত। আপনি ঠিক বলেছেন। আচ্ছা যারা মরে তাদের কপালে কি লেখা থাকে?"

"তা কি কেউ জানে? অদৃশ্য অক্ষরে ভগবান কি লেখেন তা কি মানুষে পড়তে পারে?"

"তা হলে ত বড় মুশ্‌কিল। এমনই লেখা যে কেউ পড়তে পারে না, আবার না পড়তে পারলে জানাও যায় না যে কে কবে মরবে। বড়ই মুশ্‌কিলের ব্যাপার।"

চিম্‌নি উদাসনেত্রে দূরের গাছগুলির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল যেন মৃত্যু তাহার পরম বাঞ্ছিত ও তাহার সহিত মিলনের আশা সুদূরপরাহত জানিয়া হৃদয় তাহার ব্যর্থতার ব্যথায় ভারাক্রান্ত।

লেফ্‌টেনাণ্ট রসিকতার পরিণাম এরূপ বিয়োগান্ত ভাব ধারণ করিবে ভাবিতে পারেন নাই। তিনি অবস্থা ঘুরাইবার জন্য বলিলেন, "আরে মরবে ঠিক, তার জন্য এত ভাবনা কেন? এই ধর না সৃষ্টির আরম্ভ থেকে কেউ কোন দিন না মরে বাঁচে নি।"

চিম্‌নি উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "সে কথা ঠিক, কেউ বাঁচে না। সকলেই শেষ অবধি মরে। তা'হলে আর ভাবনা কি।"

রাজপুত জমাদার কলিকাতায় বহুকাল ছিল বলিয়া বাংলা বলিবার জন্য সতত ব্যগ্র থাকিত। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কুছ ভাবনা নাহি আসে। বরা বাজিলে পর দাঁত মে দাঁত জরুর লাগবেই করবে, আউর মৌতভি আই-বেই করবে। তুম বে-ফিকির রহো। মা, দিদি, দিদিকা দিদি, দাদীকা দাদী সকল জনের সঙ্গে মুলাকাৎ হোবে।"

জমাদারের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল এবং চিম্‌নিও হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল। হাওয়াটা এইরূপে পরিষ্কার হইয়া গেল ও সকলে যদি অকস্মাৎ শত্রুরা আক্রমণ করে তাহা হইলে কি করা হইবে তাহার আলোচনা করিতে লাগিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট গা-ঢাকা দিয়া অগ্রসর হওয়া, কামুফ্লাজ বা

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া, নিঃশব্দে গমন করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি নানান্ কথা বলিলে পর চিম্‌নি প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, শত্রু যদি না থাকে তাহ'লে ত অত সাবধানে চলার দরকার হবে না।"

লেফটেনাণ্ট বলিলেন, "শত্রু আছে কি না আছে তা ত তুমি জান না, সুতরাং ধরে নিতে হবে যে শত্রু সর্বত্রই রয়েছে, আর তাই ভেবেই খুব সাবধানে চলতে হবে।"

চিম্‌নি বলিল, "তা হ'লে বন্দুক-টন্দুক পাশে নামিয়ে না রেখে হাতে নিয়ে বসাই ভাল।" বলিয়া সে নিজের বন্দুকটি তুলিয়া লইল। সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। অতঃপর আরও কিয়ৎকাল গল্প-গুজব করিয়া সকলে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় ঘণ্টাধিক কাল সকলে যথাসম্ভব অল্প আওয়াজ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে চলিতে সুরু করিল। শীঘ্রই জঙ্গলের ঘন বৃক্ষমালা ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ গা-ঢাকা দিয়া চলা আর সম্ভব রহিল না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তরুকুঞ্জের মধ্যে মধ্যে অনেকটা করিয়া অনতিদীর্ঘ ঝোপঝাড়ের আবির্ভাব হইল। সুতরাং স্থানে-স্থানে সকলকে নিচু হইয়া চলিতে হইল। ক্রমে কোথাও কোথাও কৃষিকার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতে লাগিল ও বহু দূরে এক-আধটা মানব-বাসস্থানও লক্ষিত হইল। এখন সকলে ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া এক-একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পুনর্মিলিত হইয়া পুনরায় বিক্ষিপ্ত হইয়া উক্তরূপে সর্ব্বদিক পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক আবার আর এক স্থলে মিলিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে চলার ফলে তাহাদের সন্ধ্যা অবধি খুব বেশী দূর পৌঁছান হইল না। সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল ও বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে তারকার ঝিকিমিকি জাগিয়া উঠিলেও অন্ধকার জমাট হইয়া চরাচরকে চাপিয়া ধরিল। জলপ্রপাতের নিরন্তর ঝর্ঝর নিনাদের মতই অবিশ্রাম ঝিল্লিরবে চতুর্দ্দিক মুখর হইয়া উঠিল। একটা উচ্চ টিলার অন্তরালে কয়েকটা গাছের মধ্যে সকলে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া স্বল্পতেজ টর্চ্চ-বাতির সাহায্যে ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া পালাক্রমে পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়া শুইয়া পড়িল। পাহারা দিবার প্রধান উদ্দেশ্য অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে নিদ্রার ঘোরে কেহ কোনপ্রকার শব্দ না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। ভোরের দিকে জমাদার সাহেব চিম্‌নিকে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "এইবার তুমহার পাহারা কাম আসে। নিন্দ করবে না আওর দুসমন দেখবে ত গোলি মারিবে না। আস্তেসে সবকো উঠাবে।"

চিম্‌নি, "আচ্ছা" বলিয়া বন্দুক কাঁধে লইয়া পায়চারি সুরু করিল। চতুর্দ্দিক তখনও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ আকাশে-বাতাসে রাত্রিশেষের আমেজ ধরিয়াছে বেশ বুঝা যায়। একটা সর্ব্বব্যাপী অবসন্ন ভাব, যেন ভোরের আগমন অপেক্ষায় দীর্ঘ রজনী জাগিয়া বসিয়া প্রকৃতি-রাণী নিদ্রাক্রান্তা। তারকারও যেন নিদ্রাজড়িত নয়নে নিষ্প্রভদৃষ্টি। বাতাসে ঈষৎ শৈত্যভাব। ক্রমশঃ সে গভীর অন্ধকারে একটা ধূসরতা লক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। দূরে এক একটা বৃহত্তর বৃক্ষকুঞ্জ ভৌতিকরূপ ধরিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে কুয়াশা নামিয়া আসিল। চিম্‌নি অবিশ্রাম পায়চারি করিয়া চলিয়াছে এবং সজাগ দৃষ্টিতে চারিদিক বারে বারে দেখিয়া লইতেছে। ঐ যে ঝোপের মত একটা কি, ওটা ঝোপই, না আর কিছু? ঠিক একই স্থানে রহিয়াছে ত, না ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে? না, ঠিকই আছে। এইরূপ জল্পনা করিয়া ও মধ্যে মধ্যে সঙ্গীদের ঘুমন্ত মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। জমাদার সাহেব মাঝে কি স্বপ্ন দেখিয়া "বহুত আচ্ছা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। অপর একজন বাঙালী সৈনিক তাহাতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "ব্যাটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হুকুম তামিল করছে।" চিম্‌নি বলিল, "এই চুপ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার হুকুম তামিল কি করে করবে, ও স্বপ্ন দেখছে।" সে লোকটি চিম্‌নিকে মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া বলিল, "তালগাছের ফলেরও ভিতরে কিছু থাকে; তোর মাথাটা একেবারে নিরেট।" চিম্‌নি ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর দিল, "একেবারে নিরেট কেন হবে, ও স্বপ্ন দেখল না ত আওয়াজ করল কেন?" অপর ব্যক্তি এই আলোচনার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক একটা ভঙ্গী করিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। চিম্‌নি পুনরায় পাহারার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল অন্ধকারে গুড়ি মারিয়া কে যেন আস্তে আস্তে বৃক্ষান্তরালে গা-ঢাকা দিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দূরে ঘন ধূসরের বক্ষে ভাসমান অপেক্ষাকৃত একটা জমাট কালো ছায়ামূর্ত্তি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের পার্শ্বে বারে বারে ফুটিয়া উঠিতেছে ও ঈষৎ আন্দোলিত গতিতে পুনরায় অপর বৃক্ষের আড়ালে অদৃশ্য হইতেছে। চিম্‌নি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল উহা কোন্ দিকে যায়। আকৃতি ও আয়তন বিচারে বোধ হইল উহা কোন মানব-মূর্ত্তিই, শুধু দেহ আনত করিয়া চলিতেছে। অল্পক্ষণেই সন্দেহভঞ্জন হইল ও চিম্‌নি বুঝিল লোকটা যথাসাধ্য গাছের আড়ালে থাকিয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ লেফ্-টেনাণ্টকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিল ও বলিল, "একটা লোক গুড়ি মেরে মেরে এদিকে চলে আসছে।" হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলেও লেফ্‌টেনাণ্ট নিমেষের মধ্যে সজাগ হইয়া উঠিয়া পড়িলেন ও চিম্‌নির নির্দ্দেশমত সেই সচল ছায়ামূর্ত্তিকে দেখিয়া জমাদার ও অপর সৈনিকদিগকে জাগাইয়া দিলেন। ফিস্‌ফাস্ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল ও ঠিক হইল যে দুইজন ঘাঁটি আগলাইয়া থাকিবে ও অপর সকলে দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আগমনকারীর অপেক্ষা করিবে। যাহার নিকট দিয়াই ও-ব্যক্তি যাইবে সে অবিলম্বে এবং বিদ্যুৎ-গতিতে তাহার উপর রবারের গদা চালাইয়া তাহাঁকে নিপাতিত করিবে। তৎপরে তাহাকে ঠিকমত কাবু করিয়া বন্দী করা হইবে। সকলে নিঃশব্দে মূর্ত্তিটার আগমন-পথের এধারে ওধারে লুকাইয়া পড়িল ও নিশ্চলভাবে নিজ নিজ স্থানে ওত পাতিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। জলস্রোতে চালিত অর্দ্ধনিমগ্ন বস্তু যেমন দূরে থাকিতে ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গিয়াও ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পূর্ণরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, এই ছায়ামূর্ত্তিও তেমনি ক্রমশঃ কাছে আসিয়া পড়িল ও তাহার গতিবিধি বেশ ভাল করিয়াই দেখা যাইতে লাগিল। যখন সে সৈনিকদিগের

আস্তানা হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে তখন সে হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মনে হইল যেন দেখিতেছে আশেপাশে কেহ আছে কি না। কিছুক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক্ষের আড়াল হইতে একটা ধাবমান অতিকায় ছায়ামূর্ত্তি প্রথম ছায়ামূর্ত্তির উপর হঠাৎ ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল ও আক্রান্ত ছায়ামূর্ত্তি একটা বিকট পাশবিক আওয়াজ করিয়া দৌড়াইতে সুরু করিল। আক্রমণকারী তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। অপর সকলে তীর-বেগে ছুটিয়া গিয়া উক্ত দুই জনের উপরে নিপতিত হইল ও কিয়ৎকালের জন্ম একটা ঝুটাপুটির শব্দ ব্যতীত আর কিছু শ্রুতিগোচর হইল না।

লেফ্‌টেনান্ট নিজ আস্তানায় দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া এই অভিনয় দেখিতেছিলেন। চিমনির মত অতবড় একটা মানুষকেও যে টানিয়া লইয়া যায় সে যে কি প্রকার শক্তিশালী পুরুষ তাহাই ভাবিতেছিলেন। এখন তিনি নিজস্থান ছাড়িয়া পিস্তল-হস্তে দ্রুত দৌড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি একাধারে বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া গেলেন। দেখিলেন চার বীরপুরুষে মিলিয়া একটা অশ্বতরকে পাড়িয়া ফেলিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ও উক্ত জীবটি প্রাণপণে নিজ জাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্ম লাথি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। পাছে কেহ ছাড়িলে অপরকে পদাঘাতে বিধ্বস্ত হইতে হয় এই ভয়ে কেহই জানোয়ারটাকে ছাড়িতে পারিতেছে না। লেফ্‌টে-নান্ট অগত্যা একটা রজ্জু সংগ্রহ করিয়া অশ্বতরটার পিছনের পা দুইটা বাঁধিয়া দিলেন, উক্ত পদদ্বয়ের অধিকারী সৈনিকেরা উহার সামনের পা দুইটা বাঁধিয়া ফেলিল। অতঃপর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। চিমনি অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিল, "ব্যাটা যে মানুষ নয় তা কি করে বুঝব? এক বাড়ি মারলাম ত কোথায় পড়ে যাবে, না হি হি করে মারলে এক লাথি। ভাগ্যিস ব্যাটার 'এম' ঠিক হয় নি নয়ত……"

একজন বলিয়া উঠিল, "নয়ত চিমনি এতক্ষণে বাগবাজারের বড় রাস্তায় পৌঁছে যেত।"

চিমনি বলিল, "যাঃ, এক লাথিতে কেউ অতদূর যেতে পারে, বেৎ।"

এই অপরূপ হাস্যকর ঘটনার পর সকলে আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া মুখহাত ধুইয়া কিছু খাইয়া ঈষৎ অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল। এই অঞ্চলে দেখা গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যতীত অপর কোনপ্রকার শহরাদি নাই। অল্প-স্বল্প চাষ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলে পূর্ণ। কোথাও শত্রুর কোট ঘাঁটি অথবা বিমানকেন্দ্র ইত্যাদি লক্ষিত হইল না। তাহারা বেশ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া মধ্যাহ্নকালে প্রায় পনর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রামের জন্য গমন স্থগিত করিল। সকলে কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িল, শুধু রাত্রের ন্যায় পাহারার ব্যবস্থা রহিল। রাজপুত জমাদার বলিল, "আরে চিমনি তুমহি যাদু জানে। একটা জিন্দা আদমিকে পাকড়িয়ে খচ্চর বানিয়ে দিলে। তুমহার দেখলেতো হামার ডর করে।"

চিমনি বলিল "দূর! ওটা আবার মানুষ ছিল নাকি? আমি ওকে এক লাঠি মারতেই হি হি করে ডেকে উঠল। আমি আবার যাদু জানলাম কি করে?"

জমাদার বলিল, "ওই একহি বাত আসে। তুম ওকে লাঠিসে মারলে আওর ও খচ্চর বনে গেল। তুমহার লাঠিমে যাদু আসে।"

চিমনি সন্দিগ্ধ নয়নে রবারের লাঠিটার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেৎ"।

ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম করিবার পর সকলে আবার যাত্রা করিল ও চার-পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতে আরম্ভ করিলে রাত্রিযাপনের জন্য শিবির স্থাপন করিল। এত পথ অতিক্রম করিয়াও কোন শত্রুর সাক্ষাৎ না পাইয়া তাহারা আগুন জ্বালিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিল। একটা ঘন বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে কয়েকটা মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে আগুন জ্বালা হইল যেন দূর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়। রাত্রে দূর হইতে ধোঁয়া দেখা যাইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। প্রায় দুই দিন পরে গরম গরম খাদ্য মিলিবে জানিয়া সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আগুনটা ঠিক মত জ্বলিতে আরম্ভ করিতেই সর্ব্বাগ্রে একজন চা বানাইয়া ফেলিল ও সকলে পরম তৃপ্তির সহিত চা পান করিয়া হৃষ্টচিত্তে নৈশ ভোজনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় নানা প্রকার আওয়াজ ও আগুন প্রভৃতি দেখিয়া একটা খরগোস নিজ বিবর ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইতে গেল। চিমনি "আরে, আরে" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে নিজ রবারের গদাটা তুলিয়া লইয়া সেই পলাতক খরগোসটার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সেই আন্দাজের মার কপালক্রমে অব্যর্থ সন্ধানে খরগোসটার উপরে গিয়া লাগিল ও খরগোসটা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল। জমাদার সাহেব এরূপ শিকার পড়িতে দেখিয়া মহোৎসাহে দৌড়িয়া গিয়া খরগোসটাকে তুলিয়া আনিলেন ও বলিলেন, "চিমনি দেখ, তুমহার লাঠিমে যাদু আসে কি না। এই দেখ লাঠিটো শিকারের পিছে পিছে গিয়ে ঠিক উসকো মারে ফেললে কি না।"

চিমনি একবার খরগোস ও একবার গদাটার দিকে চাহিয়া জমাদারের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তদ্বিচারে দোমনা ভাবে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল, "আরে না না, যাদু না ছাই। ওটা চোট লেগে পড়ে গেল।"

সকলে অতঃপর শিকারলব্ধ মাংস রন্ধন করিয়া ভোজনাদি সম্পন্ন করিতে লাগিয়া গেল। খাওয়াটা সেদিন ভালমতই হইল। পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় পাহারার ব্যবস্থা করিয়া ইহার পরে সকলে শুইয়া পড়িল। আজকার রাত্রে প্রথম প্রহরেই চিমনিকে পাহারার কার্য্যে লাগাইয়া দেওয়া হইল। চিমনি দুই জোয়ানের খোরাক একেলা খাইয়া ক্রমাগত হাই তুলিয়া পায়-চারি করিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা সে এইরূপে বায়ু-মণ্ডলে আন্দোলন সৃষ্টি করিবার পর, বাঙালী ছেলেটি উঠিয়া পড়িল ও তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। চিমনি জিজ্ঞাসা করিল, "আরে তুমি ঘুমোলে না যে?"

সে বলিল, "তুমি যে রকম বিরহী বিষধরের মত কোঁস

কোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ তাতে কোন মানুষের পক্ষে ঘুমোনো সম্ভব নয়।"

চিম্‌নি অবাক হইয়া বলিল, "দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম কখন আবার? হাই উঠছে ত কি করব?"

সে ছেলেটি বলিল, "হাই উঠছে? হাই না হাউই? হাই, হাইয়ার, হাইয়েষ্ট। এই যে আড়াই বিঘত হাঁ করে শোঁ শোঁ করে দম ছাড়ছ, ওর নাম হাই নয়, ও হ'ল হাইয়েষ্ট, মানে হাইয়ের ঠাকুরদাদা। দোহাই বাবা, তোমার পাহারার পালা শেষ হোক, তারপরে শুতে যাব। খালি স্বপ্ন দেখছি বাথরগঞ্জে কালবৈশাখীর ঝড়ে উকিল, মক্কেল, মুন্সেফ, পেয়াদাসুদ্ধ কাছারি-বাড়ি উড়ে গেছে, খালি একটা বটগাছতলায় তুমি একলা দাঁড়িয়ে হাই তুলছ।"

বক্তৃতাটা দিয়া ছেলেটি দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল আর নকল যন্ত্রণা-আর্ত্তনাদের অভিনয় করিতে লাগিল। চিম্‌নি বলিল, "আরে তোর হ'ল কি? অসুখ করছে নাকি?"

জমাদার সাহেবের এই সব আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে একটা বিকট হাই তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "আরে এত হল্লা হইসে কেন, কেউ মরিয়েসে নাকি।"

লেফ্‌টেনাণ্টের এবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রাগত কণ্ঠে, "এই, সব চুপ!" বলিতেই সকলে পুনরায় চুপচাপ নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং চিম্‌নিও নিজের পাহারার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

রাত্রি ভোর হইলে চা পান করিয়া আবার যাত্রা আরম্ভ করিল ও কিছুদূর উত্তরে গিয়া তৎপরে পশ্চিমে গমন সুরু করিল। মধ্যাহ্ন অবধি সকল স্থান উত্তম রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল ও বিশ্রামের পরেও সেই ভাবেই চলিল।

তৃতীয় রাত্রি আরম্ভ হইবার আগেই পশ্চিমে যতদূর যাওয়া প্রয়োজন তাহা শেষ হইল ও পর দিন সকলে আস্তানায় ফিরিয়া যাইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিশাযাপন করিতে নিরত হইল। এ রাত্রিতে এমন কিছু ঘটিল না যাহা লিপিবদ্ধ করা যায়। রাত্রি শেষ হইলে এই ক্ষুদ্র সেনাদল ভোজনাদি সারিয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে আস্তানা অভিমুখে যাত্রা করিল। মধ্যাহ্নকালে যখন তাহারা প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তখন দূরে বিমানের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। শীঘ্রই আকাশের দূর প্রান্তে চারটা বিমান লক্ষিত হইল ও সেগুলি কিছু নিকটে আসিতেই বুঝা গেল শত্রু-বিমান। ভারতীয় সৈনিকেরা অবিলম্বে গা-ঢাকা দিয়া নিশ্চল ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বিমানগুলি অধিক উর্দ্ধে ছিল না, কেবল পাঁচ-ছয় শত ফুট মাত্র। মনে হইল যেন চতুর্দ্দিক দেখিয়া-দেখিয়া চলিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানগুলি উপর দিয়া গভীর নিনাদে চলিয়া গেল ও সকলে উঠিয়া চলিতে সুরু করিল কিন্তু হঠাৎ একটা বিমান সুদূর চক্রবালের কোণ হইতে কাত হইয়া তীব্র বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আবার সকলে দ্রুতগতি এদিকে ওদিকে লুকাইয়া পড়িল। বিমানখানা উহারা যে স্থলে লুকাইয়াছিল তাহার উপরে পৌঁছিলে পর বিমানস্থ লোকেরা চতুর্দ্দিকে 'মেশিনগান' চালাইয়া গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। বেশ বুঝা গেল তাহারা কিছু একটা সন্দেহ করিয়াছে নতুবা এরূপ কার্য্যের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। মেশিন গানের শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল ও ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ধুলাবালি প্রস্তরখণ্ড উড়িয়া একটা ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। বিমানখানা তিনবার চারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া এইরূপে গুলিবর্ষণ করিয়া অবশেষে চলিয়া গেল। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতেই ক্রমাগত শত্রুবিমান চারিদিক হইতে আসিয়া উক্ত এলাকায় দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। ভারতীয় সৈনিকদলের এই কারণে অগ্রসর হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল ও প্রায় দিবাশেষেও তাহারা আস্তানার চার পাঁচ মাইলের মধ্যে আসিতে পারিল না। লেফ্‌টেনাণ্ট স্থির করিলেন রাত্রিকালে ভোজনাদি করিয়া পুনরায় চলিতে হইবে যাহাতে সেই রাত্রেই সকলে শিবিরে পৌঁছাইতে পারে।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল রাত্রিকালে নিঃশব্দে চলিয়া তাহারা শিবিরের নিকটে নদীর অপর পারে উপস্থিত হইল ও কয়েক ঘণ্টার জন্য শুইয়া পড়িল। প্রাতে অন্ধকার থাকিতেই উঠিয়া সকলে অপর পারের নিজ দলের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্প আলো হইলে পর পর্ব্বতের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত এক পাহারা-কেন্দ্রের প্রহরীরা ইহাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কেত করিল ও এই ক্ষুদ্র সেনাদল তখন নদীর দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। নদীর কিনারা অবধি আসিয়া যখন তাহাদের সর্ব্বসম্মুখের সৈনিক নদী গহ্বরে নামিতে উদ্যত হইল সেই সময়ে দূরের বালুকার উপরে ছড়ান কয়েকটা বড় বড় শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে কাহারা হঠাৎ মেশিন গান চালাইয়া গুলিবর্ষণ সুরু করিল। সে ব্যক্তি ঘটনাচক্রে বাঁচিয়া গেল কিন্তু অতঃপর নদী পার হওয়া অপেক্ষা অধিক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল এই গুপ্ত শত্রুদের সংখ্যা ও শক্তি নির্দ্ধারণ করা। শিবিরের এত নিকটে শত্রুসৈন্য কি করিয়া আসিল তাহাও ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অপর পারের লোকেদের সহিত সঙ্কেতে কথা চলিল এবং আদেশ হইল এই নূতন শত্রুদলের খবর লইয়া ও তাহাদের নিপাত করিবার ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে ফিরিয়া আসিতে। এই আদেশ অনুসারে সকলে গুঁড়ি মারিয়া শত্রুর আশ্রয়স্থল শিলাস্তূপগুলির ঠিক সামনাসামনি কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহু সাবধানে গাছের আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিয়া অবশেষে সেই শিলাস্তূপের প্রতিমুখে নদীর অপর পারের একটা ঘন বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে তাহারা উপস্থিত হইল। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব দূরবীন্‌ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন কত লোক কেমন ভাবে আছে সেখানে। এ বিষয়ে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল, কেননা, শিলাখণ্ডগুলি খুবই কাছে কাছে থাকায় তাহার আড়ালে কে আছে দেখা গেল না, শুধু এক স্থানে দুইটা পাথরের ফাঁক দিয়া একটা মেশিন গানের নল ঈষৎ বাহির হইয়া আছে। অতঃপর একজন কিছু দূরে সরিয়া গিয়া অপর পারে সঙ্কেতে এই খবর দিলে পরে হুকুম আসিল, "কত শত্রু থাকিতে পারে বিচার কর ও দেখ নিকটে অপরাপর স্থানে কোন শত্রুসৈন্য আছে কিনা। ইহাও দেখ যে কোন

উপায়ে এই গুপ্ত শত্রুদলকে বিনাশ করা যায় কি না।" লেফ্-টেনাণ্ট দুইজন সৈনিককে আরও ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতে বলিলেন আরও কোন শত্রু সৈন্য দেখা যায় কিনা। তাহারা চলিয়া গেল। তৎপরে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিতে লাগিলেন কোন উপায়ে ইহাদের মারা যায় কিনা। বোমা ফেলিয়া মারিতে হইলে খোলা জায়গায় বাহির হইয়া বোমা নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং শত্রুর গোচর হইলেই তাহারা গুলিবর্ষণ করিবে। সুতরাং কি উপায়? লেফ্টেনাণ্ট সকলকে প্রশ্ন করিলেন কাহারও কোন উপায় মনে হইতেছে কিনা, যাহাতে শত্রুদিগকে ধ্বংস করা যায়। জমাদার সাহেব বলিলেন, সকলে মিলিয়া বিভিন্ন দিক্ হইতে একজোটে আক্রমণ করিলে দুই একজন মরিবে হয়ত কিন্তু উহাদের উপর বোমা পড়িবেই দুই-চারিটা। অপর এক ব্যক্তি বলিল, দিনের বেলা কিছু না করিয়া রাত্রি অবধি অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। সে সময়ে শত্রুর পক্ষে কাহারও আগমন বা আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া গুলিবর্ষণ সহজ হইবে না। চিম্নি বলিল সে একেলাই দৌড়িয়া উহাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে। এ সকল পরামর্শের কোনটিই লেফ্টেনাণ্টের মনঃপূত হইল না। প্রথমতঃ বোমা ইত্যাদি দিবাভাগে চালাইলেই দূরে বৃহত্তর শত্রু সেনাদল থাকিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে ভারতীয়েরা কোথায় আছে এবং রাত্রিকালে ঐ প্রকার ঘটিলে ব্যাপারটা আরও প্রকট হইয়া উঠিবে। যত নিঃশব্দে এই শত্রুদলকে নিঃশেষ করা যাইবে ততই অধিক নিজেদের সুবিধা, কেননা, আরও অনেক ভারতীয় সৈনিক আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে শত্রুর সহিত বড় রকম সংঘর্ষ ঘটা সমীচীন নহে। কোন উপায় না দেখিয়া ও বোমা ব্যতীত অপর অস্ত্র ব্যবহার সম্ভব নয় জানিয়া অবশেষে স্থির হইল অপর পারের লোকেদের সহিত পুনরায় পরামর্শ করা। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল সঙ্কেতে আলাপ চলিল ও তৎপরে অপর পারের সেনাপতি একটা মতলব স্থির করিলেন ও এপারের লোকেদের তাহা জানাইলেন। অনতিবিলম্বেই অপর দিক হইতে এক ব্যক্তি একটা তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহিত একটা হাল্কা ও শক্ত সুতা এপারে পাঠাইল। সেই সুতাটা টানিয়া লইতে তাহার সঙ্গে একটা মোটা সুতা আসিল ও এই ভাবে ক্রমশঃ একটা মোটা কাছি আসিয়া পৌঁছিল। অতঃপর এই পার হইতে সরু সুতাটা একটা তীর-ধনুক তৈয়ার করিয়া অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ করা হইল ও ক্রমশঃ টানিয়া টানিয়া কাছিটার এক মোড় অপর দিকে পাঠান হইল। এই উপায়ে কাছিটা টানিয়া ছাড়িয়া উভয় দিকের পরস্পরের সহিত একটা অখণ্ড চলনশীল রজ্জুবন্ধনীর সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল। এর পর লেফ্টেনাণ্ট হুকুম দিলেন ছোট ছোট গাছ ও বড় বড় গাছের ডাল কাটিয়া কাছিটার সহিত সুক্ষ্মতর রজ্জুর দ্বারা ফাঁস-গিরা বাঁধিয়া লটকাইয়া দিতে। কাছিটা যেমন ঘুরিতে সুরু করিল তেমনি স্থানে স্থানে ফাঁস খুলিয়া গিয়া বৃক্ষ ও বৃক্ষকাণ্ড-গুলি নদীর বক্ষে রক্ষিত হইতে লাগিল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলে শত্রুকেন্দ্র শিলাস্তূপের সম্মুখে, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে ক্ষীণস্রোতা নদীর বালুবক্ষে একটা বিরাট শাখা ও বৃক্ষকাণ্ডের বাঁধ গড়িয়া উঠিল। তাহার অন্তরালে কি ঘটি-তেছে তাহা শিলাস্তূপের ভিতর হইতে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবে না। শত্রুরা এই মতলব বুঝিয়া এই শাখা-সেতুর উপরে ক্ষণে ক্ষণে ও যথাতথা গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছু-ক্ষণের মধ্যেই চিম্নি একটা স্থূলতর ও অনতিদীর্ঘ সরীসৃপের ন্যায় এই শাখা-স্তূপের অন্তরালে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ এক, দুই, করিয়া দুইটা বোমা শত্রুদের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পরে আরও দুই-তিন জন ঐ ভাবে বোমা ফেলিয়া শত্রুদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ পরেই শত্রুপক্ষের মেশিন গানটা থামিয়া গেল। তখন আর একটা বোমা ফেলিবার পরে এপার-ওপার উভয় দিক হইতে জন কুড়ি পঁচিশ সৈনিক দ্রুত-বেগে শিলা-স্তূপের উপর আক্রমণ করিল। কেহ কোনপ্রকার বাধা দিল না এবং সকলে অনায়াসে সেস্থলে পৌঁছিয়া দেখিল মাত্র চারজন শত্রুসৈন্য একটা মেশিন গান লইয়া সেখানে ছিল। ইহার মধ্যে দুইজন মৃত ও একজন মৃতপ্রায়। তৃতীয় ব্যক্তির দুই হস্তেই জখম ও সে যুদ্ধে অক্ষম। তাহাকে লইয়া সকলে নদীর পরপারে মূল আস্তানায় ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিতে না করিতেই ঘোর কলরোলে প্রায় পনর-কুড়িখানা শত্রুবিমান আসিয়া পর্ব্বতদেশে যথাতথা বোমাবর্ষণ আরম্ভ করিল ও কোথাও কিছুমাত্র সন্দেহ হইলেই সেস্থলে গুলিবর্ষণ করিয়া ধুলা উড়াইতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া বারে বারে তাহারা এই প্রকার আক্রমণ চালাইতে লাগিল এবং বিশেষ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাসত্ত্বেও ভারতীয়েদের মধ্যে কয়েকজন হতাহত হইল।

ভারতীয় শিবির হইতে অতঃপর ক্রমাগত বেতারে খবর পাঠান চলিতে লাগিল ও শীঘ্রই নিজেদের তরফের বিমান সমাবেশ সুরু হইল। দুই-তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত আকাশ-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই দুই চারখানা করিয়া বিমান হঠাৎ হঠাৎ আহত পক্ষীর মত ঘুরিয়া পাক খাইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। কখন কখন বৈমানিকেরা ডানা-ভাঙ্গা বিমান ত্যাগ করিয়া প্যারাসুট যোগে দুলিয়া দুলিয়া নামিয়া আসিয়া বন্দী অথবা সপক্ষে মিলিত হইতে লাগিল। চিম্নি বলিল, "ওরাই লড়াই করুক, আর আমরা খালি গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকি।"

তাহার সঙ্গী একজন বলিল, "বিনা পয়সায় তামাশা দেখছিস, তার আবার গদি-আঁটা চেয়ার চাস না কি?"

চিম্নি বলিল, "আরে তা নয়; লড়াই করতে হবে না? খালি গর্ত্তে বসে থাকব?"

সঙ্গী বলিল, "তা না বসতে চাস ত যা না ঘুরে বেড়িয়ে বেড়া। শুধু এক দমকা মেশিন গানের গুলি লাগলে চিম্নি চালুনি হয়ে যাবি।"

চিম্নি বলিল, "দুৎ, চালুনি হয়ে যাব কি করে? মানুষ আবার চালুনি হয়ে যায়?"

চতুর্থ দিবসে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ-ক্ষেত্র ক্রমশঃ এই অঞ্চল হইতে সরিয়া সরিয়া আরও সুদূর দক্ষিণে চলিয়া গেল। ভারতীয় বিমান-সৈনিকেরা বহু চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইল। যতক্ষণ তাহারা এই

অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছিল ততক্ষণ বাহির হইতে বিমানযোগে অপর সৈনিক আনয়ন অসম্ভব ছিল। যে বিমান-ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করা হইতেছিল, এখন সকল সৈনিক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহা শেষ করিয়া ফেলিল ও তৎপরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্তর-আসামের সুদূর প্রান্ত হইতে সৈন্যবাহী বিমানসকল আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র মালমশলা আসিয়া পড়িল যাহাতে আর পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন রহিল না। এই সকল নূতন সৈন্যদল প্রত্যহ উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এই প্রদেশ পূর্ণরূপে পুনরধিকার করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে পর দক্ষিণে অভিযান করা স্থির হইল।

এই দক্ষিণ অভিযান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শত্রুপক্ষ পর্ব্বত-শিবির হইতে দশ মাইল আন্দাজ দূরে কয়েকটা কামান আনিয়া বসাইল ও ভারতীয়দের অবস্থান না জানা সত্ত্বেও আন্দাজে গোলাবৃষ্টি সুরু করিল। তাহারা যদি বিমানযোগে গোলা কোথায় পড়িতেছে দেখিয়া লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিত তাহা হইলে ভারতীয়দের বিশেষ ক্ষতি হইত। কিন্তু ভারতীয় বিমানবাহিনী শত্রু-বিমানগুলিকে দূরে হঠাইয়া রাখায় সে সুবিধা তাহাদের হইল না ও আন্দাজে গোলা চালানোতে ভারতীয় সৈন্যদলের অল্পই ক্ষতি হইল। তথাপি হুকুম হইল যে তিন চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ত্রিশ-চল্লিশ জন সৈন্য রাত্রিকালে কামানগুলির সন্ধানে যাইবে ও সেগুলি ধ্বংস করিয়া আসিবে। চিম্‌নি ও অজয় এইরূপ একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হইল ও সেইদিন রাত্রে তাহারা সাব-মেশিনগান, বোমা ও অন্যান্য হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিল। সাধারণ ভাবে কামানগুলি কোন্ দিকে বসান হইয়াছে তাহা অনুমানে জানা ছিল ও সেই দিকেই রাত্রির অন্ধকারে অতি সাবধানে ইহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। ফিস্‌ফাস করিয়া গল্প চলিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে সকলে কিয়ৎকাল নিঃশব্দে স্থির হইয়া থাকিয়া দূরের আওয়াজ বিচার করিয়া লইয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিল।

অজয় বলিল "এই তুই নাকি একরকম কৌশল বের করে-ছিস খচ্চর ধরবার?"

চিম্‌নি বলিল, "ধোৎ, খচ্চর ধরতে যাব কেন? ওটাকে মানুষ ভেবে ধরেছিলাম।"

অজয় মন্তব্য করিল, "খচ্চরকে তুই যদি মানুষ ভাবিস তা হ'লে তোকে যদি কেউ জিরাফ ভাবে তাতে কি দোষ হবে?

'চিম্‌নি চিম্‌নি তুই যে রকম লম্বা
জিরাফের চেয়ে কোন অংশেতে কম বা।'"

চিম্‌নি চটিয়া উঠিয়া বলিল, "এই কি বকছিস? আমার নামে ছড়া কাটছিস কেন? আমার থলেতে বিস্কুট এনেছি তোকে দেব না।"

অজয় অনুতপ্ত সুরে বলিল, "না ভাই দিস, আর ছড়া কাটব না তোর নামে।"

ভোরের দিকে একটা জঙ্গলের মধ্যে একটু কিছু খাইয়া লইয়া তাহারা আবার চলিল। একবার চুপ করিয়া দাঁড়াইবার পর মনে হইল দূরে পদধ্বনি। দলপতি উত্তম রূপে শুনিয়া বলিলেন, "এই কয়েকটা লোক আসছে। সব এদিকে ওদিকে গাছে উঠে লুকিয়ে পড়।" সকলে অচিরাৎ বৃক্ষশাখায় আত্ম-গোপন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুই-চার মিনিটের মধ্যেই তিনজন শত্রুসেনা সেই পথে আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা বেশ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে চলিতেছিল কিন্তু চিম্‌নি ও অজয় যে গাছটায় উঠিয়াছিল সেই গাছটা পার হইয়াই একজন মাটির দিকে দেখাইয়া দুর্বোধ্য ভাষায় সঙ্গীদের কি যেন বলিতে লাগিল। অজয় ও চিম্‌নি দেখিল মাটিতে বুট-পরা পায়ের দাগ দেখাইয়া কথা বলিতেছে। অর্থাৎ ভারতীয়েরা যে সেই পথে আসিয়াছে তাহা তাহাদের পদচিহ্নে বুঝা যাইতেছে। লোকগুলা অতঃপর খুব সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। পায়ের দাগ দেখিয়া-দেখিয়া শীঘ্রই তাহারা চিম্‌নিদের গাছটার নিচে আসিয়া মাথা তুলিয়া বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মধ্যে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ একটা লোক চিৎকার করিয়া কি বলিয়া নিজের বন্দুকটা তুলিয়া উপরের দিকে তাক করিল। কিন্তু সে ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই গাছের উপর হইতে "এইও, খবরদার!" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া চিম্‌নি হুড়মুড় করিয়া ডালপালা ভাঙ্গিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল ও লাথি, চড়, ঘুষি মারিয়া তাহাদের ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। লোকগুলা গাছ হইতে এরূপ ভাবে কেহ লাফাইয়া পড়িবে আশা করে নাই ও চিম্‌নির দীর্ঘাকৃতি দেহ দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। চিম্‌নির সহিত উহাদের মারামারি চলিতে চলিতেই অজয় ও অপর এক বৃক্ষ হইতে আরও দুই-তিন জন লাফাইয়া পড়িয়া শত্রুদের কাবু করিয়া ফেলিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। লোকগুলাকে লইয়া কি করা হইবে তাহাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অবশেষে অপরাপর দলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের কয়েকজন রক্ষীর সহিত শিবিরে বন্দী অবস্থায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কামান কেন্দ্র-গুলি যে বেশ নিকটে তাহা এখন সহজেই বোধগম্য হইল। থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের গভীর গর্জ্জনে অরণ্যদেশ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ও দিক অনুমানে বুঝা গেল দুইটা বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কামান দাগা হইতেছে। সকলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল ও ক্রমশঃ একটা কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ ভাঙা জমির উপরিস্থিত বৃক্ষমালার অন্তরাল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে কামান দাগার অগ্নিস্ফুরণ পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। তখন সকলে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া সন্ধ্যার অপেক্ষায় সময় অতিবাহন করিতে লাগিল। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার শীর্ষে পাহারা বসান হইল যাহাতে শত্রুপক্ষের কেহ আসিলে সকলে সতর্ক হইয়া যাইতে পারে।

এক জায়গায় একটা খুব বড় গাছ ঝড়ে পড়িয়া ভূমিসাৎ হইয়াছিল। অজয় ও চিম্‌নি তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল ও পুরনো কথা আওড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। অজয় বলিল, "হাঁরে, তুই এই প্যারাট্রুপের দলে এলি কেন?"

চিম্‌নি উত্তর দিল, "আমি ত জানতাম না যে হাওয়াই

জাহাজের কাজ। সকলে নাম লিখছিল, আমি জিগ্‌গেস করলাম 'কি রে ?' ত বললে প্যারাট্রুপ। আমি বললাম, আমিও সেই খানে যাব, ত নাম লিখে নিলে। প্রথমে ত একটা ঘরের মধ্যে দড়ি ধরে লাফালাফি, দেয়াল টপকান, উপর থেকে লাফ দেওয়া। আমিও ভাবলাম সার্কাস শেখাচ্ছে। তার পরে শুনলাম হাওয়াই জাহাজ থেকে লাফাতে হবে। কত উপর থেকে তা জানতাম না। এখন ত বেশ লাগে।"

অজয় বলিল, "তোর বাবার চিঠি পাস না ?"

চিম্‌নি বলিল, "হ্যাঁ, লিখেছিলেন সৎপথে থেকে চলবে, এই সব। আমিও লিখেছিলাম যে আমি মিথ্যে কথা বলি না; কিন্তু কখন কখন বিস্কুট-টিস্কুট চুরি করতে হয়, নয় ত খাব কি ? বাবা মাঝে মাঝে কাশী যান কিনা তাই অনেক সময় উত্তর আসতে দেরি হয়।"

"ত বাবা যদি লেখেন যে তুই চুরি করে বিস্কুট খেয়েছিস, তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ত কি করবি ? বামুন, গোবর এ সব পাবি কোথায় ?"

চিম্‌নি চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, "বাবা যদি লেখেন ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ দেশে খুঁজলে বামুন আর গোবর পাওয়া যাবে না ?" তার পর উৎফুল্ল হইয়া "আরে ঐ সেই ট্যারা সুবেদার ওর নামত তেওয়ারী, ও ত বামুন, আর একটা গরু খুঁজে বের করা যাবে এখন।"

অজয় তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঢের গোবর পাওয়া যাবে, তুই কিছু ভাবিস নে।"

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীর মধ্যে দূত পাঠাইয়া ঠিক হইয়া গেল কে কোন্ দিক দিয়া কামানকেন্দ্রের উপর আক্রমণ করিবে, চিম্‌নিদের দল খাইয়া-দাইয়া রাত্রি অধিক হইবার পূর্ব্বেই একটা কামানকেন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার পিছনে চলিয়া গেল। শুধু তিনজন সম্মুখে দূরে দূরে খানা-খন্দর দেখিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রহিল। সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে পর সম্মুখের তিন ব্যক্তি নিজ নিজ গর্ত্তের ভিতর হইতে সবে মেশিন গান চালাইয়া কামান-কেন্দ্রটার উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থলের শত্রুসৈন্তরা তাহাদের উপরে অবিরল ধারে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। এই প্রবল প্রত্যাক্রমণে তাহারা গর্ত্তের বাহিরে মাথাটুকুও বাহির করিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। গুলি বর্ষণ কিছু কমা মাত্র আবার ঐ তিন জন সাব-মেশিন গান চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন শত্রুপক্ষ একটা ক্ষুদ্র মর্টার কামানে গোলা ভরিয়া তাহাদের উপর গোলা ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কিন্তু এ কার্য্য সফল হইবার পূর্ব্বেই ভারতীয় দলের মূল বাহিনী পশ্চাৎ হইতে কামানকেন্দ্রের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিল। শত্রুপক্ষ সম্মুখের লোকেদের লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে পিছনের আক্রমণের জন্ত তাহারা প্রস্তুতই ছিল না। সর্ব্বাগ্রে চিম্‌নি এক এক লম্ফে দশ-বার হাত পার হইয়া আসিয়া গোটা দুই ধূম্র-উৎপাদক বোমা ছুঁড়িয়া নিজেদের আগমন অল্লাধিক অদৃশ্য করিয়া দিল ও ধূম্রপ্রাকার ভেদ করিয়া যখন সকলে শত্রুর উপর পতিত হইল তখন তাহারা বিশেষ একটা যুদ্ধ করিতে পারিল না। বেশীর ভাগই দাঁড়াইয়া মরিল ও বাকি সকলে বন্দী হইল।

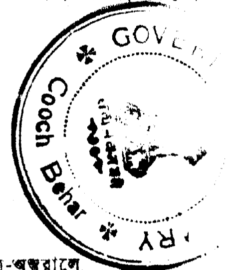
শত্রুপক্ষের লোকবল নিকটেই অধিক সংখ্যায় আছে জানিয়া দলপতি তাড়াতাড়ি কামানগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়া ও সেই স্থলে কয়েকটি বিলম্বে বিস্ফোরক বোমা স্থাপিত করিয়া সদলে পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্তরা কামানকেন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গভীর নিনাদে বোমাগুলি এক এক করিয়া ফাটিতে আরম্ভ করিল। ভারতীয়েরা ততক্ষণে দ্রুতগতি অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে ঢুকিয়া পড়িয়া শত্রুর প্রত্যাক্রমণের সীমানার বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে সকলে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে পর খবর পাইল যে স্থলপথে বহু সহস্র ভারতীয় সৈন্ত উত্তম অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে ও অতঃপর প্যারা-সৈনিকগণ দুই মাসের ছুটিতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। কয়েক দিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক সৈন্ত আসিয়া পড়িল ও ছুটির পালা সুরু হইল।

চিম্‌নি ও অজয় একটা সৈন্তবাহী বিমানে চড়িয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া চলিল। চিম্‌নি বলিল, "আরে লড়াইটা জমতে না জমতেই বাড়ি পাঠিয়ে দিল।"

অজয় বলিল, "চল না, বাড়ি গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।"

"চিম্‌নি বলিল, "ছুৎ।"



ঘুমায় নগরী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘরাত্রি আছি জাগি, ঘুমায় নগরী,
হয়তো ফুটিছে হেনা তোমার কাননে,
স্বপন সে হেনাগুচ্ছ, ঘুম সে কানন।
চন্দ্রিকা-পরাগে গেছে সর্ব অঙ্গ ভরি'
মুগ্ধ চাঁদ চেয়ে আছে মুক্ত বাতায়নে,
সে যেন আমারি দৃষ্টি করেছে হরণ।
গভীর গভীর ছায়া! সুরভি মঞ্জরী
ফুটিছে টুটিছে কত পত্র-অন্তরালে,
চঞ্চল সমীরে ভাসে মোহ-পরশন।
তোমারি রূপের মায়া নিরজনে স্মরি,
বাঁধা পড়িয়াছে মন তব মন্ত্রজালে,
কি যেন আবেশ-ভরে উঠিছে শিহরি'।
এমন নীরব নিশা সুপ্তি-নিমগন
নহে কি মধুরতম মিলন-লগন ?

সামবেদ

শ্রীবিমলাচরণ দেব

মহাভারত ৬.৩৪.২২ (চি) = গীতা ১০.২২-এ আছে—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি"। মহাভারত ১৩.১৪.৩২৩ (চি)তে আছে—"সামবেদশ্চ বেদানাম্।" দুই স্থলেই অপর যে সমস্ত উপমা দেওয়া আছে, সমস্তই প্রাধান্যদ্যোতক।

এ ধারে, চতুর্বেদ উল্লেখের চিরপ্রচলিত ক্রম হইতেছে—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। যেমন ছান্দোগ্য, ৭.১.২.—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্।" এরূপ স্থলে স্বতঃই মনে হয়—ক্রমানুসারে তৃতীয় সামবেদ, অপর তিন বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন? "ত্রয়ী" ধরিলেও এই কথা।

এই সামবেদের শ্রেষ্ঠতার কারণ সম্বন্ধে—গীতা ১০.২২-এর টীকায় নীলকণ্ঠ, বলদেব ও মধুসূদন, কিছু বলেছেন—বস্তুতঃ পক্ষে একই কথা তিন জনে বলেছেন। নীলকণ্ঠ বলেছেন—"সামবেদো গানেন রমণীয়ত্বাৎ।" বলদেব বলেছেন—"বেদানাং মধ্যে গীতমাধুর্য্যেণোৎকর্ষাৎ সামবেদোঽহম্।" মধুসূদন বলেছেন—"চতুর্ণাং বেদানাং মধ্যে গানমাধুর্য্যেণাতি-রমণীয়ঃ।" একই কথা। সামবেদের গান অতি মিষ্ট, এই জন্য সামবেদ অন্য সমস্ত বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বড় মনে লাগিল না।

এখানে শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, রামানুজ, হনুমান্, শ্রীধর বা বিশ্বনাথ—এই শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

যাহা হউক, মানিয়া লইলাম—সামবেদ শ্রেষ্ঠ; যে কারণেই হউক, পরে দেখা যাইবে।

কিন্তু—

(১) মনুসংহিতা—৪.১২৪-এ পাই—

ঋগ্‌বেদো দেবদৈবত্যঃ যজুর্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্যাঽশুচির্ধ্বনিঃ॥

(২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১০২, ১১৯-এ—

বিসৃষ্টৌ ঋঙ্‌ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তে চ তস্মাৎ তস্যাঽশুচির্ধ্বনিঃ॥

(৩) বিষ্ণুপুরাণ, ২.১১.১৩তে—

সর্গাদৌ ঋঙ্‌ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায় তস্মাৎ তস্যাঽশুচির্ধ্বনিঃ॥

তিন স্থানেই "তস্মাৎ তস্যাঽশুচির্ধ্বনিঃ" অর্থাৎ সামবেদের ধ্বনি অশুচি, এ বিষয়ে একমত। কারণ কি? এ বিষয়ে মনু এক রকম "কারণ" দিতেছেন এবং, অপর পক্ষে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ আর এক রকম দিতেছেন।

আবার, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে একটু প্রভেদ আছে পরে বলিতেছি।

যাহা হউক, কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিন স্থলেই ফল সম্বন্ধে মতভেদ নাই,—সামবেদের ধ্বনি অশুচি।

"বেদের ধ্বনি অশুচি" এরূপ কথা আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু মাত্রেরই মনে নানা কথা তুলিবে। সত্যই কি অশুচি? "অশুচি" শব্দের অন্য অর্থ আছে না কি? না উপরিউক্ত কারণ দুইটির মধ্যে কোনটিই ঠিক নয়, অন্য কারণ আছে?

সামবেদ সর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অশুচি। একটু খোঁজ করা আবশ্যক।

প্রথমেই মনুর টীকাগুলি দেখিলে নিম্নলিখিত ভাবে পাই—

(১) মেধাতিথি—মনুর প্রাচীনতম ভাষ্য, যাহা আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে—"নাহত্র তদীয়স্য ধ্বনেরশুচিত্বং পরমার্থতো বিজ্ঞেয়ম্। কিং তর্হি—যথাঽশুচিসন্নিধানে নাঽধ্যেতব্যম্, এবং তৎসন্নিধান ইতি সামান্যমশুচিত্বালম্বনম্।" অর্থাৎ, ঠিক আসলে অশুচি নয়। অশুচি সন্নিধানে যেমন বেদপাঠ নিষিদ্ধ, তেমনই সামধ্বনি হইলে নিষিদ্ধ।

(২) সর্বজ্ঞনারায়ণ—"তস্মাৎ পিতৃসম্বন্ধিনো দেবসম্বন্ধিনাং চাঽপেক্ষয়া অশুচিত্বস্য কর্মাদিষু দৃষ্টত্বাৎ।" অর্থাৎ দেবতাদের অপেক্ষা পিতৃগণ অশুচি, এইজন্য। কিন্তু ইহাতে "দেবদৈবত্য ঋগ্‌বেদ" পাঠের নিষেধের "কারণ" পেলুম। "মানুষ" যজুর্বেদের পাঠ কেন নিষেধ, সে সম্বন্ধে নীরব।

(৩) কুল্লূক—"সামবেদঃ পিতৃদেবতাকত্বাৎ পিত্র্যঃ। পিতৃকর্ম কৃত্বা জলোপস্পর্শনং স্মরন্তি। তস্মাৎ তস্যাঽশুচিরিব ধ্বনিঃ, ন ত্বশুচিরেব। অতস্তস্মিন্‌শ্রূয়মাণে ঋগ্‌যজুষী নাঽধীয়ীত" অর্থাৎ সামবেদ পিতৃসম্বন্ধী ব'লে অশুচির মত, প্রকৃতপক্ষে অশুচি নয়।

(৪) রাঘবানন্দ—ইনিও কুল্লূকের মত—"অশুচিরিতি অশুচি-রিব পিতৃপক্ষপাতিত্বাৎ, ন ত্বশুচিরেব।" এর পরই বলছেন—"বেদধ্বনেরশুচিত্বাভাবাৎ।" বেদধ্বনি কখনও অশুচি হ'তে পারে না।

(৫) নন্দন—"পিতৃকর্মানুষ্ঠায়িনোঽপ্যুপস্পর্শনস্মরণাৎ। শ্রাদ্ধকর্তৃ প্রতিগ্রহীত্রোরধ্যয়ননিষেধাচ্চ পিত্র্যস্যাঽশুচিত্বমুপপন্নম্। সামবেদশ্চাঽপি পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্য ধ্বনিরশুচিঃ। তেন সামাঽধীত্য তৎক্ষণমেবর্গযজুষী নাঽধীয়ীতেতি।"

ইনি আবার একটু অন্য রকম বললেন—পিতৃকর্মানুষ্ঠান করলে জলোপস্পর্শন করতে হয়। আর, শ্রাদ্ধকর্তা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই অনধ্যায়। সামবেদ পিত্র্য, কাজেই সামবেদ অধ্যয়ন যেন প্রায় পিতৃকর্মানুষ্ঠানের সমান। কাজেই সামবেদ "অশুচি।" সামবেদ অধ্যয়নের পরই ঋগ্‌যজুঃ অধ্যয়ন করিবে না।

মোট দাঁড়াল—মেধাতিথি বলেন, "আসলে অশুচি না হইলেও, অশুচি সন্নিধানে যেমন বেদপাঠ নিষেধ, সামধ্বনি হ'লেও তাই।"

কুল্লূক ও রাঘবানন্দ বলেন—"অশুচি নয়, অশুচির মত।" রাঘবানন্দ আরও বলেন—বেদধ্বনি অশুচি হ'তে পারে না।

তা হ'লে এঁরা তিন জন একমত—"অশুচি নয়, অশুচির মত।"

সর্বজ্ঞনারায়ণ ও নন্দন—এঁরা "অশুচি" বলেন।

এই ভাবে দুইটি দল দেখতে পাচ্ছি।

এই প্রশ্ন সমাধান করতে স্মৃতিচন্দ্রিকা (মহীশূরে সংস্করণ, আহ্নিক প্রকরণ, পৃ. ৫৯, পং ২৭) মনু ৪.১২৩ উদ্ধার করে

বলেন—"সামশব্দে তু ঋগ্ যজুষোরমধ্যায়ঃ। নাশুচ্যু। তদাহ মনুঃ (৪।১২৩) "সামধ্বনাবৃগ্ যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।" অর্থাৎ এই নিষেধের পরিসর ছোট, শুধু ঋক্ ও যজুঃ এই নিষেধের মধ্যে আসে। ঐ দুইটি মাত্র নিষেধ।

খটকা আরও বেড়ে গেল—সামবেদ যদি পিত্র্য ব'লে ধরা হয়, তাহ'লে "মানুষ" যজুর্বেদের অপেক্ষা অশুচি হয় কি ক'রে? কারণ, পিতৃলোক ত' মানুষ লোকের উপরে।

আবার—ঋগ্বেদ সম্বন্ধে সামবেদের অশুচিত্ব হয় কি ক'রে? ম ভা, ৯.৪৪.৩২ (চি)--"পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠাঃ দেবানামপি দেবতাঃ"—পিতৃগণ দেবতাদেরও দেবতা, তাহ'লে "দেব-দৈবত্য" ঋগ্ বেদের অপেক্ষা অশুচি কি ক'রে হয়?

এই ভাবে, ঋক্ বা যজুঃ কারোর সম্বন্ধেই সামবেদ "অশুচি" হতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত মনুসংহিতার কথা।

এই বারে মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেখা যাক। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐ এক কথা—"তস্মাৎ তস্যাঽশুচির্ধ্বনিঃ।" কিন্তু "কারণ" মনু থেকে খুব তফাৎ। এখানে হচ্ছে সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ঋঙ্ময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু যজুর্ময়, অন্তে অর্থাৎ প্রলয় বা সংহারকালে রুদ্র সামময়। সংহার-দেবতা রুদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে ব'লে সামবেদ "অশুচি।" মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোনও টীকা পাই নি।

বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোক প্রায় একই, একটু তফাৎ আছে, গোড়ায় "সর্গাদৌ" ও পরে "রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায়।" এই শেষ পার্থক্যটিই লক্ষ্য করিবার। এখানে শ্রীধরস্বামী তাঁহার আত্মপ্রকাশ টীকায় বলছেন—"যস্মাৎ সামশক্ত্যা রুদ্রোঽন্তং করোতি, তস্মান্নাশকরত্বাৎ তস্য সাম্নো ধ্বনিরশুচিঃ। অশুচিদেশকালাদিবদ্ বেদান্তরস্যা-নধ্যায়ত্বাপাদক ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সামশক্তি দ্বারা রুদ্র অন্ত অর্থাৎ সংহার বা প্রলয় করেন।

এখানে আত্মপ্রকাশ টীকায় একটা কথা পাচ্ছি—রুদ্র যে সংহার করেন, সেটা সামশক্তি দ্বারা। "সামশক্তি" নামে কোন শক্তি আছে, বা তাহা যে রুদ্রের সংহারশক্তি, এ কথা আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

মোট কথা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ মতে সংহারদেবতা রুদ্রের সহিত সম্বন্ধ আছে বলে সামবেদ অশুচি।

মনে লাগল না। রুদ্র ত্রিমূর্ত্তির একজন। তাঁর সম্বন্ধী কিছু অশুচি হবে, এটা আশ্চর্য, তাহা ছাড়া, ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর)—এ তিনের মধ্যে আপেক্ষিক বলাবল বিচার যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে রুদ্রই বলবত্তম। কারণ অন্তে তিনি সকলকেই গ্রাস করতে সক্ষম। এ অবস্থায় তাঁর সম্বন্ধী কোন কিছু অশুচি হয় কি করিয়া?

* * *

এই অবস্থায় আমার প্রশ্ন দুটি অনুত্তর রহিয়া যায়—

১। সামবেদ শ্রেষ্ঠ কেন?

২। সত্যই কি সামবেদ অশুচি?

কিছুকাল পরে "যদৃচ্ছাক্রমে" অর্থাৎ কোনওরূপ শোধ-সম্বন্ধী চেষ্টার ফলে নয়, কয়েকটি কথা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা থেকে বোধ হয় ঐ দুটি প্রশ্নের উত্তর হয়। উত্তর যথা-ক্রমে—

(১) সামবেদ চতুর্বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমাদের মনু-সংহিতা বা মার্কণ্ডেয় পুরাণ বা বিষ্ণু পুরাণ প্রোক্ত কারণে নহে, কারণ অন্য। (২) সামবেদ "অশুচি" নয়।

এক্ষণে যাহা পাইয়াছি, নিবেদন করি—(১) অথর্ববেদ, ১৪.২.৭১এ আছে—

পতি পত্নীকে বলিতেছেন—

"অমোঽহমস্মি সা ত্বং সামাঽহমস্ম্যৃক্ ত্বং
দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্।
তাবিহ সং ভবাব প্রজামা জনয়াবহৈ॥"

অর্থাৎ সামবেদ পুরুষ, শক্তিমান, অতএব সকলকে অভিভব করিতে সমর্থ। ঋক্ স্ত্রী। এই জন্যই সামবেদের প্রাধান্য।

এই কথাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৬.৪.২০তে—"অথৈনাম-ভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি।"

ঐরূপ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ১.৭.৬এ—"প্রদক্ষিণমগ্নিমুদকুম্ভং চ ত্রিঃ পরিণয়ন্ জপতি। অমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোহং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেব বিবহাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ সং প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ জীবেব শরদঃ শতম্ ইতি।"

এই সমস্ত স্থলেই সাম পুরুষ ও ঋক্ স্ত্রী। এই জন্যই সামের প্রাধান্য।

উপরি নির্দিষ্ট বৃ. আ. উ. ৬.৪.২০র আনন্দ-গিরিটীকাতে আর একটি কথা আছে, যাহাতে আর একপ্রকারে ঋকের উপর সামের শ্রেষ্ঠ্য সূচিত হয়। আনন্দগিরি বলেন—"ঋগা—ধারং হি সাম গীয়তে। অস্তি চ মদাধারত্বং তব।" ঋক্ সামের আধার। আধার অপেক্ষা আধেয়ই যে প্রধান, বলা বাহুল্য এজন্যও ঋক্ অপেক্ষা সাম শ্রেষ্ঠ।

আর একরূপে সামবেদের শ্রৈষ্ঠ্য সম্বন্ধে পাই—শতপথ ব্রাহ্মণ—৪.৬ অধ্যায়, ৭. ১-২—

"ত্রয়ী বৈ বিদ্যা। ঋচো যজূংষি সামানি···ইমমেব লোক-মৃচা জয়তি। অন্তরিক্ষং যজুষা দিবমেব সাম্না।"

অর্থাৎ ঋক্ দ্বারা এই লোক জয় করা যায়। এই লোকের উপরে যে লোক, অন্তরিক্ষ, তাহা জয় করা যায় যজুঃ দ্বারা। সর্বোপরি যে লোক, দ্যুলোক, তাহা জয় করা যায় সাম দ্বারা। যাহার দ্বারা সর্বোচ্চ লোক জয় হয়, তাহার প্রাধান্য অবিসম্বাদী।

এই কথাই আর এক ভাবে প্রশ্নোপনিষদে ৫ম প্রশ্নে বলা আছে। যদি যাবজ্জীবন কেহ ওঁকারের এক মাত্রা মাত্র ধ্যান করেন, তিনি ঋক্ দ্বারা জগতে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে আসেন। তিনি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে অনেক বিভূতি অনুভব করেন। যদি দ্বিমাত্র ধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি যজুঃ দ্বারা সোমলোকে উন্নীত হইয়া অনেক বিভূতি ভোগ করিয়া আবার মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসেন। আর যিনি এই ওঁকার ত্রিমাত্র ধ্যান করেন—"যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্ম-

লোকম্।" অর্থাৎ সাপ যেমন খোলস ছেড়ে দেয়, সেই রকম তিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে নির্মুক্ত হন, এবং সাম দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন।

আরও—"ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে। তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যৎ তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি।"

প্রশ্নোপনিষৎ ৫ম প্রশ্নের এই শেষ মন্ত্রে সমস্ত কথা শেষ ক'রে বলছেন—ঋক্ দ্বারা এই লোক (মনুষ্যলোক) পৌঁছান যায়, যজুঃ দ্বারা অন্তরিক্ষ, এবং সাম দ্বারা পৌঁছান যায় সেই লোক, যাহা কবি (অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী)গণ জানেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি সামকে জানেন তিনি পৌঁছান সেই শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও পর পুরুষে। সেখানে পৌঁছলে "ন পুনরাবর্ত্তন্তে ন পুনরাবর্ত্তন্তে।"

ঋক্ ও যজুঃ এই দুইয়ের অপেক্ষা যে সাম শ্রেষ্ঠ, ইহার সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাচীনতম মতে "ত্রয়ী"। অথর্ব বেদ যে তাহার পরের সন্দেহ নাই। যজুর্বেদ সম্বন্ধে—ঋক্ ও সাম ছাড়িয়া যজুর্বেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত"

ঋগ্. ১০.৯০.৯

এখন বোধ হয় বুঝা গেল—সামবেদ অন্য বেদ অপেক্ষা সত্যই শ্রেষ্ঠ ও কেন শ্রেষ্ঠ। আরও দেখি—আমাদের মনুসংহিতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণে যে কারণ দেওয়া আছে, সে কারণে নয়।

* * * *

(২) তার পরে—সামবেদ "অশুচি"। হিন্দুমাত্রেই অর্থাৎ যে লোক বেদকে অপৌরুষেয় বলবে, তার কাছে এ কথা অদ্ভুত ঠেকবে। রাঘবানন্দ মনু ৪.১২৪এর টীকায় বলেছেন —বেদধ্বনেরশুচিত্বাভাবাৎ"। তাহ'লে স্মৃতিচন্দ্রিকাকারের সামঞ্জস্য চেষ্টাও অযৌক্তিক বলে মনে হয়। এ অবস্থায় সমাধান কি?

আমার বোধ হয় পূর্ব উদ্ধৃত শ. প. ব্রা. ৪.৬ অধ্যায়. ৭. ১-২ ও প্রশ্নোপনিষৎ-এ এর উত্তর। সামের দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়ে যখন সে "এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং" দেখলে, যখন সে সেই "শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং"এ পৌঁছল, তখন তার কত নীচের অন্তরিক্ষ বা মনুষ্যলোকের সঙ্গে তার কি দরকার? না, তার মন তা চাইতে পারে? এইজন্য সাম দ্বারা ব্রহ্মলোকে পৌঁছলে অন্তরিক্ষসম্বন্ধী যজুঃ বা মনুষ্যলোকসম্বন্ধী ঋক্ তার নজরেই আসে না, যেন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সামবেদ অশুচি হওয়া দূরে থাক, এই ঋক্ যজুঃই যেন অশুচি হয়ে যায়। ঋক্ যজুঃ যে সামের অপেক্ষা কত নীচু স্তরের জিনিস।

এই থেকে হ'ল "উল্টা বুঝলি রাম"। সামে পৌঁছলে ঋক্ যজুঃর আর দরকার থাকে না। তা থেকে হ'ল—সামে পৌঁছলে ঋক্ যজুঃ পড়বে না। তা থেকে হ'ল—সামধ্বনি হ'লে ঋক্ যজুঃ পাঠ নিষিদ্ধ। কারণ সামধ্বনি অশুচি।

কি ক'রে এ রকম হ'ল বুঝা শক্ত নয়। সামে পৌঁছলে আর নিম্নতর স্তরের ঋক্ যজুঃ পড়ার আবশ্যকতা বা যৌক্তিকতা থাকে না। সেজন্য বিধি হ'ল—সামবেদ পড়বার পর ঋক্ যজুঃ পড়বে না। গতানুগতিক ধরণে এই বিধি চলতে লাগল, কালক্রমে কারণ ভুলে গেল। বহুকাল পরে লোকে কারণের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হ'ল। আর, কারণের "আবিষ্কার"! আসল আদি কারণ ভুলে গিয়ে সামবেদ "অশুচি" এই কারণ তৈয়ারি হ'ল।

আমাদের মনুসংহিতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ বা বিষ্ণু পুরাণ, অর্থাৎ এই সমস্ত বই আমরা যে আকারে পাই, সে সব যে তাদের আদি আকার নয়, বলা বাহুল্য। মাঝে কত বার কত recension, কত edition হয়েছে, ঠিকঠিকানা নেই। সাম্প্রদায়িক কারণ, শ্রেণীগত কারণ, লিপিকরপ্রমাদ প্রভৃতিতে মূলের কত পরিবর্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে, বলা যায় না। কাজেই এই রকম "অর্বাচীন" কারণ স্থান পাওয়া আশ্চর্য নয়।

এখন ঐ তিনটি পুস্তকে যে "কারণ" দেখতে পাচ্ছি, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখি, যে তিনটিতে পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ একটা সামঞ্জস্য আছে। তিনটিতেই তিন ভাগ, এবং তৃতীয় ভাগ অন্ত বা মৃত্যুর কথা বলে। মনুর "পিত্র্য" যেমন মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ও বিষ্ণু পুরাণের "অন্ত"ও তাই। শেষ বা মৃত্যু মানুষের অপ্রিয়, এই অপ্রিয় সাহচর্যই সামকে "অশুচি" করেছে।

আমার বোধ হয় এই তিন ভাগে ভাগ ও তৃতীয় ভাগ শেষ বা অন্ত, এই ভাবের মূল তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২-৯.১এ—"ঋগ্‌ভিঃ পূর্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে। যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ। সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে। বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্যঃ॥"

দিনের শেষ, সূর্যের অস্ত, মৃত্যু (ও তাহার পর পিতৃলোক), প্রলয়—সমস্তই অপ্রিয়, এবং তাহার সাহচর্যে সামবেদ। আসল কথা ভুলে সামবেদের অশুচিত্বের ধারণা এই ভাবে হয়েছিল এবং তাহার মূল তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে।

সামবেদ বস্তুতঃই সর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও কোন রকমে অশুচি নয়।

ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

—আমাদের বাড়িতে একবার আসবেন কি ?

সুমিত্রারা ফিরিয়া চাহিল।

—এই অবেলায় !

—এই তো গলিটার মধ্যে—এক মিনিটের পথ।

সমীর কহিল, আমায় মাপ করবেন।

মেয়েটি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, অন্ততঃ অনুপমবাবু যদি আসতেন।

—বেশ ত—অনুপম যেতে পারেন। সুমিত্রা কহিল।

অনুপম 'না' বলিতে পারিল না, যদিও এত বেলায় নূতন করিয়া আলাপ জমাইবার স্পৃহাটা তার তেমন প্রবল ছিল না। নূতন করিয়া আলাপ জমানোর মধ্যে কৌতূহল ও আনন্দ আছে এবং ঈষৎ ভয়ও আছে। হয়ত রুচিতে বাধিবে—হয়ত বিদ্যার পরিধিতে কিংবা সরস আলোচনার প্রবাহে আঘাত লাগিবে। তর্কের শাণিত অস্ত্র দিয়া ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষার মত মাঝে মাঝে আলাপকে মনে হয়।

গীতা (মেয়েটির নাম) বলিল, আপনাকে কষ্ট দিলাম শুধু শুধু। কিন্তু আপনার পরিচয় পেয়ে আলাপের লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

—না, না, কষ্ট কিসের : ভদ্রতার খাতিরে অনুপম আপত্তি করিল। এ ত আনন্দের কথা।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করে বাবাও কম খুশি হবেন না। তিনিও একজন লেখক।

—কি নাম তাঁর ?

—আজকাল ওঁর লেখা প্রায় ক্লাসিকের পর্য্যায়ে এসেছে। আর ত লেখেন না। হরিজীবন ঘোষের নাম—

—ওহো—উনি ! বেশ বেশ। ওঁর রোম্যান্টিক গল্পগুলি ছেলেবেলায় কি ভালই লাগত !

—কিন্তু আজকাল রোম্যান্সের আদর নেই। সত্যি বলতে কি আমিই পছন্দ করি না। মনে হয় না আমাদের মাটি নিয়ে কি জীবন নিয়ে লেখা। যেন বিদেশী কতকগুলি ফুল টবে সখ করে পোঁতা হয়েছিল একদিন। কাগজের ফুল।

অনুপম গীতার পানে প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। মেয়েটি মত প্রকাশে অকুণ্ঠ—বেশবাসেও স্বচ্ছন্দ। লজ্জা নিবারণের অতিরিক্ত প্রয়াস যেমন নাই—সজ্জার ভারে নিজেকে সাজাইবার অশোভনতাও তেমনই ওর কাছে বাহুল্য। সামান্য একখানি শাড়ী—করপ্রকোষ্ঠে অতি সাধারণ সোনার চিহ্ন—গলায় সূক্ষ্ম একগাছি চেন-হার এবং কানে ছোট্ট একটি দুল। চুল বাঁধার ভঙ্গিমা নাই—আভিজাত্য আছে। মধ্যাহ্ন-অভিমুখী সূর্য্যের আলোর মতই—সুস্পষ্ট ও অবারিত।

—আচ্ছা—কেন ভাল লাগে না বলুন তো ?

—নিজের আনন্দকে নিজে ভোগ করতে কেমন লজ্জাবোধ করে।

—ওটা কি ইজ্‌মের খাতিরে ?

—ইজ্‌ম্‌! না না,—তবে কিনা সত্য যদি চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দেয়—দৃষ্টি-কোণ কি বদলে যায় না।

—কি সত্য ?

—এই মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কারণগুলি দেখে—

—বেশ ত—কারণগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন বলেই মনের থেকে রোমান্সের অবসান ঘটবে—মনকে অমন একমুখী ভাববেন না। সর্ব্বদাই সে বর্জ্জন করছে আর গ্রহণ করছে। ভালোর প্রতি তার অপরিসীম লোভ—মন্দকেও সে নিঃসংশয়ে মন্দ বলে ধিক্কার দিচ্ছে না। ভালতে-মন্দতে মেশানো জিনিস-গুলি আনন্দকে তরল ও প্রচুর রসে ভিজিয়ে তুলছে।

গীতা অনুপমের পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর কহিল, আপনি বুঝি ইজ্‌মকে পছন্দ করেন না ?

অনুপম হাসিয়া বলিল, আমার লেখাই বা কতটুকু—মতেরই বা মূল্য কি।

—কিন্তু—

—মনোনীতবাবু যে পরিচয় দিলেন—তার মধ্যে 'অতি' অনেকখানি। কয়েকটা পত্রিকায় মাত্র লিখেছিলাম।

—তাতে কি। একটি লেখার দ্বারাই লেখক বিখ্যাত হন—পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

—হয়ত নেই। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে ভিড় বেশি। প্রতিভা ত ঘরে ঘরে—খ্যাতিও ভাগ-বাঁটোয়ারায় যৎসামান্য জোটে।

—ওকথা বলে ভোলাবেন না, আপনার লেখা আমি পড়েছি।

—কোথায় ?

—কেন—ঠিক মনে হচ্ছে না কোন্ পত্রিকায়; কিন্তু পড়েছি।

অনুপম মনে মনে হিসাব করিল—কোন্ পত্রিকায়। মাত্র তিনটি লেখা এ যাবৎ সে মাসিক পত্রিকার মারফৎ পাঠকের দ্বারস্থ করিতে পারিয়াছে। সে মাসিকগুলি আবার অভিজাত শ্রেণীর নহে—গতর-সর্ব্বস্বও নহে। সেখান হইতে অন্তত দশ-বারটি লেখা দুঃখ নিবেদনের সঙ্গে ফেরত আসিয়াছে। দলীয় কোন প্রভাবের দোষ এবং বৃদ্ধ সম্পাদকদের পুরাকালীন রস-বোধের পরিচয় হয়েতেই রীতিমত ক্ষুব্ধই হইয়াছে। ওই ঢাউস কাগজগুলি মারফৎ উঁহারা কি নূতন পথের যাত্রীদের উদ্যমকে নিরস্ত করিতে পারিবেন ? চীনের মহাপ্রাচীর আজ মূল্যহীন, যেমন মূল্যহীন অতি আধুনিক ম্যাজিনো লাইন। অগ্রগতির দুর্ব্বার বিক্রমকে—কোন ক্ষেত্রেই আটকাইয়া রাখা এই যুগে আর সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, খানিকটা আত্মপ্রসাদে সে স্ফীত হইল।

সিনেমা-ঘেঁষা কাগজগুলি প্রচার-গৌরবে আজকাল শীর্ষ-স্থানীয়। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়িয়া সুধী বিদগ্ধ পাঠকরা যে গল্প-উপন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়াছেন—সেও পরম সুলক্ষণ। কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়া দুঃখ-বেদনাকে মানুষের মনে পৌঁছাইয়া দেওয়া সত্যই সহজ। এবং সার্থকও বটে।

গীতাদের বাড়িতে পৌঁছিয়া যে আলাপ হইল—তাহাতে অনুপম কুণ্ঠা বোধ করিল না। কিসের কুণ্ঠা ? বিগত কাল মানকে চিরদিনই সন্দেহে নিরীক্ষণ করে। বিগত হইলেই

তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাদ নিষ্কাশিত হইয়া খাঁটি সোনাটুকু বাহির হয়। কিন্তু খাঁটি সোনা—ত খাঁটি সোনাই। ব্যবহারিক প্রয়োজন তার কতটুকু! ব্যাঙ্কের ব্যালান্স পূর্ণ করা ছাড়া—তার বস্তুমূল্য কোথায়!

হরিজীবন ঘোষকে বয়সের অনুপাতে বেশী শুষ্ক বোধ হইল। রস-সাহিত্যিকের এই প্রকার বিশুষ্ক ভাব অনুপম অন্তত আশা করে নাই। কিশোর কালে যাঁহার রচনার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে রসের প্রস্রবণ-ধারা বহিত—কল্পনায় যিনি সুন্দর বলশালী মধ্যযুগীয় সামন্তরাজতনয়প্রতিম নায়করূপে মনের সিংহাসনে শোভা-বর্দ্ধন করিতেন—তাঁর এই আভিজাত্যহীন আকৃতি—রীতিমত অসুন্দর ঠেকিল। ভাঙ্গা তোবড়ানো গাল, বার্দ্ধক্যের পীড়ন-চিহ্নে রঙ গিয়াছে পুড়িয়া—লোমশ হাতে অসংখ্য মোটা শিরা ও জীবনীরসহীন মুখে কুঞ্চন রেখা সুপ্রকট; বাঁধান ঝকঝকে দাঁত—বয়সকে শুধু ব্যঙ্গই করিতেছে—আর আধপাকা কুঞ্চিত চুলগুলিও শক্তিহীন সৌন্দর্য্যহীন অভিনেতার মর্য্যাদকে বহন করিতেছে না।

—নমস্কার, বসুন।—

যথারীতি পরিচয় করাইয়া গীতা চায়ের আয়োজনে কক্ষান্তরে গেল।

বৃদ্ধ কোঠরগত অনুজ্জ্বল চক্ষু দুটি একান্ত উদাসীন ভাবে অনুপমের মুখে বুলাইয়া কহিলেন, কতদিন থেকে লিখছেন?

—সামান্ত কিছুদিন থেকে।

—কোন্ কোন্ কাগজে বেরিয়েছে আপনার লেখা?

—এমন নামজাদা কোন কাগজে নয়।

আচ্ছা—আপনার মনে হয় না কি যে ওগুলি দলীয় কাগজ? জানা চেনা লেখক ছাড়া আর কারও লেখা ছাপাতে ওরা ভয় করেন? সত্যিকারের ভাল লেখা হলেও অবহেলা করে ছাপান না?

অনুপম এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সকলের মতের সঙ্গে সকলের মত মেলে না—এও হয়ত একটা কারণ?

কৌতূহলীর মত বৃদ্ধের চক্ষুতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, বটে!

তা ছাড়া দলীয় ব্যাপারও আছে বই কি।

হুঁ। আর কিছু?

অনুপম মনে মনে খুশি হইল না। ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, আপনার নিজেরই মনে সন্দেহ না এলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

হরিজীবন হাসিয়া উঠিলেন। খানিকক্ষণ ধরিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিয়া—কথাটা উপভোগ করিয়া যেন পরম তৃপ্ত হইলেন। অনুপম বিরক্তি চাপিতে না পারিয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইল।

হরিজীবন কহিলেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মানে এক সময়ে আমরাও ত শিক্ষানবিশী করেছি। অনেক ঘা খেয়ে পোড় খেয়ে—তবে বড় বড় মাসিকে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছি।

অনুপম রীতিমত আহত হইল। এই অধুনা-অবলুপ্ত লেখকের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিবার আগ্রহ তার কিছু মাত্র ছিল না।

হরিজীবন কহিলেন, সুরেশ সমাজপতিকে জানতেন না। বড় কড়া সমালোচক ছিলেন তিনি। রবিবাবু পর্য্যন্ত তাঁর হাত থেকে রেহাই পান নি—এমনি কড়া ধাতের ছিলেন তিনি। তাঁর 'সাহিত্য' কাগজে যখন লিখতে সুরু করি—

গীতা প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে অতীত-স্মৃতি-রোমন্থন হইতে নিষ্কৃতি দিল। অনুপম মনে মনে গীতার উপর প্রসন্ন হইল, প্রসন্ন হইল নাতি-আধুনিক অতিথি-সৎকারের সুষ্ঠু প্রথাটির উপর। এত বেলায় চা পান করিতে তাহার রীতিমত অনিচ্ছাই ছিল—কিন্তু অবিচ্ছিন্ন আলাপ-প্রবাহ হইতে মানুষকে পরিত্রাণ করিবার—এটি যেন দৈবদত্ত উপায়। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় হয়ত লাভ কিছু আছে—কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে মগ্ন হইবার সাধনা ত সকলের নহে।

গীতা বলিল, এত বেলায় চায়ের আয়োজন অবশ্য অশোভন—কিন্তু প্রীতি জানাবার এ ছাড়া পথই বা কোথায়!

অনুপম চায়ের কাপ হাতে লইয়া কহিল, এর মত চমৎকার প্রথা আর নেই।

হরিজীবন বলিলেন, চমৎকার! ট্যানিন অ্যাসিড।

খাবার সময় তোমার স্বাস্থ্যতত্ত্ব রাখ। ঘোলের সরবৎ খাবে—আর এক কাপ?

না। বার বার চা খাওয়া চলে—ঘোল খাওয়া ভাল নয়। বলিয়া নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্য করিলেন।

অনুপম হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিল—হাসিল না। ও রসিকতা অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া কৌতুক-বোধকে ঠিকমত উদ্দীপ্ত করে না।

চা ফুরাইলে গীতার অনুরোধে খাবারও কিছু মুখে দিল। হরিজীবনবাবুও অনুরোধ করিলেন, আরে ও কখানা সিঙ্গাড়া ফেলে রাখতে পারবে না বলছি। খেয়ে নাও। দেখ তোমাকে আর আপনি বলে খাতির করতে পারলুম না।

বেশ তো—বেশ তো। অনুপম মৌখিক হাসি হাসিল। মনের ক্ষোভ দূর হইল না। এ তো অন্তরঙ্গতা প্রকাশ নহে—অভদ্রতা।

আহার শেষ হইলে সে উঠিবার উপক্রম করিতেই হরিজীবন বসু কহিলেন, আরে বোস, বোস। দুটো কথা কই। হাঁ—তা বঙ্কিমবাবুর উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখবে। লেখা শেষ হলেই সঙ্গে সঙ্গে ছাপাতে দেবে না। কিছুদিন, অন্তত ছ'মাস ফেলে রাখবে—তারপর ছাপতে দিতে গেলেই দেখবে তাতে কত না অসঙ্গতি রয়েছে।

এ রকম হিসাব করে রুল-অফ্-থ্রি-র নিয়মে লেখা চলে কি? চললেও জীবনে কতটুকু লেখাই বা বেরুবে!

হিসাব সব জিনিষেরই ভাল। কতকগুলি যা তা রাবিশ দিয়ে সাহিত্যকে নাই বা ভরালে। বই বাড়লেই কি খ্যাতি বাড়ে? সাময়িক খ্যাতি বাড়লেই কি স্থায়ী আসন লাভ করা যায়?

স্থায়ী আসন লাভ করার দুশ্চিন্তা সকলের হয়ত থাকে না। তবে লেখবার প্রয়োজনটা কি! খ্যাতির জন্ত লিখবেন না

এ উপদেশ দেওয়া কেন জানো? খ্যাতিকে খেলো মনে করে যা তা উপায়ে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা চলে বলে। এই এতদিন ধরে লিখলাম—খ্যাতি অর্জ্জনের কাঙালপনা তো দেখাতে পারলুম না কোন দিন! শক্তি থাকে খ্যাতি আপনিই আসবে।

কিন্তু প্রচার না থাকলে খ্যাতি থাকে কি?

প্রচার! একি শাক মাছ বিক্রী। পচা জিনিষকে জিন্দা বলে ঢাক পেটা। না হে না, খ্যাতি অত সোজা বস্তু নয়। সমাজপতি একবার বলেছিলেন—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অনুপম বলিল, আপনার কি মনে হয় না—সে যুগের ধারার সঙ্গে এ যুগের মতবাদ মিলছে না?

হরিজীবন বলিলেন, তা মনে হয় না। শুধু মনে হয় এ যুগ রস-দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে। দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। সাহিত্যের আদর্শভ্রষ্ট হয়ে কদাচারী হয়ে উঠছে।

সাহিত্যের আদর্শবোধ—তাও কি সব যুগের সমান? পৃথিবীর এত বিপর্য্যয় সত্ত্বেও আমরা থাকবো অচল—আমাদের সমাজনীতিতে বাধবে না সংঘর্ষ—জীবনে জাগবে না প্রশ্ন?

কতটুকু তোমাদের জীবন হে? কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা! চাই সাধনা—সাধনা! তিনি সেই আত্ম-উপভোগের হাসিতে মগ্ন হইয়া পড়িলেন।

উঠি, নমস্কার।

আহা ব'স না! একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করব। বলছ—এক যুগের আদর্শ এক যুগে থাকে না। আমাদের যুগ থেকে তোমাদের যুগ আলাদা হ'য়ে পড়ছে।—কিন্তু আমার বইগুলির বিক্রী তো একটুও কমে নি। দিন দিন বরং বাড়ছে।

আপনার সৌভাগ্য।

তিনি হাসিয়া কহিলেন, এর দুটি কারণ। প্রথমটা যা সবাই বলে—যুদ্ধ। যুদ্ধের বাজারে নাকি অ-নামী বইও হু-হু করে কাটছে। সে ভাল কথা, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মানুষের রসবোধ। যার ভিত্তিতে সাহিত্যের প্রসার। জনকতক মিলে প্রচার করে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পশ্চিমী আব্‌হাওয়ায় সমাজকে ঢেলে সাজতে পরিশ্রম করছেন—সেটা কালের কষ্টি-পাথরে টেঁকে থাকতে পারছে না। তথাকথিত প্রগতিবাদ আমাদের বাংলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে নি।

অনুপম চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ কহিলেন, ওরা পরগাছা সাহিত্য তৈরি করছে তাই দেশের লোক নিচ্ছে না।

অনুপম সহসা মুখ ফিরাইয়া কহিল, কিন্তু যদি বলি আমাদের বাংলা দেশ বড় অদ্ভুত জায়গা। বিংশ শতাব্দীতে বাস করে তার লোকগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোভাব নিয়ে।

বৃদ্ধ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, মনে করলেও ওতে সান্ত্বনা তোমরা পাবে না। এই শতাব্দীতে আমরাও থাকবো না তোমরাও শেষ হ'য়ে যাবে। অথচ আমাদের লেখার আদর করবেন রসিকজন, তোমাদের লেখাকে বাঁচাবার জন্ত খরচ হবে জাপ্‌থালিন। যুদ্ধের বাজারে অনর্থক খরচ।

বহির্দ্বারে গীতা সহসা অনুপমের হাত ধরিয়া কহিল, আমায় মাপ করবেন।

—মাপ!—কেন?

গীতার চোখের কোণে জলরেখা চক্‌ চক্‌ করিতেছিল—আবেগে কণ্ঠও অবরুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে এই কথাই হয়ত আর একবার উচ্চারণ করিল।

অনুপম হাসিয়া কহিল, ওঁর কথায় আমি ব্যথা পেলেও—খুব দুঃখ বোধ করিনি, কেননা আমি জানি ওই বোধ না থাকলে ওঁরা এতদিন বাতিল হয়ে যেতেন।

—যেতেন? না অনুপমবাবু ওঁরা বাতিলই। নিজের সৃষ্টিতে নিজে বেঁচে থাকবার যে স্বপ্ন ওঁরা দেখছেন তাও বেশি দিন আর নয়। এই যুদ্ধ পর্য্যন্ত বড় জোর।

তাতেও কম সান্ত্বনা নয়। অনুপম হাসিয়া উঠিল, যাঁদের বইয়ের সংস্করণ হয়—তাঁরা বড় সাহিত্যিক নিশ্চয়ই।

গীতা কহিল, যে যুগ চলছে অবশ্য তার সবটা নয় খানিকটায় তাঁদের খ্যাতিতে তাঁরা আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, থাকা স্বাভাবিক।

অনুপম বলিল, অনাগতকাল কি আনবে, কার জন্ত কতটুকু কি দেবে—সে ভাবনা তো আমাদের নয়।

—বড় দুঃখিত হলুম অনুপম বাবু। গীতার স্বরে বিষন্নতা।

—আচ্ছা তাহ'লে আসি।

—অনুরোধ করলেও আর আসবেন না জানি—

—কেন আসব না! ওঁর কথায় আমি একটুও আহত হই নি।

—কেন আহত হন নি? গীতার স্বরে বিস্ময়।

—কারণ, লেখা আমার ব্যসন মাত্র—ব্যবসা নয়। আমি চাকরী করি—।

গীতা বলিল, এ কথায় আরও দুঃখিত হচ্ছি অনুপমবাবু। যাঁরা শক্তিমান তাঁদের কাছে লেখাটা ব্যসন নয়, ব্যবসা তো নয়ই।

জানি আপনি বলবেন প্রেরণা। প্রেরণা তো বটেই। যশের—অর্থের—

গীতা বলিল, আমরা প্রতিভার পূজা করতে পারি না বলেই প্রতিভাকে স্বীকার করব না এত বড় দুঃসাহস নেই।

—আমার মধ্যে প্রতিভা—

—আপনার কথা তো বলি নি। সাধারণ ভাবে কথাটি বলছি। তরুণ লেখক সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উঁচু।

—কারণ?

—কারণ তাঁরা যা নিয়ে লেখেন—তা হচ্ছে একান্তভাবে এ যুগের কথা অর্থাৎ আমাদের কথা। তাঁরা আমাদের মনের খবর ঠিকমত রাখেন—

—কিন্তু—

—তর্ক আমি করব না, শুধু পুরোনো লেখা বরদাস্ত করতে পারি না—তাই বলছি।

—আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাহ'লে—

গীতা দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল, তাঁর প্রভাব অস্বীকার করবার কোন উপায়ই যে নেই!

—অস্বীকার করতে পারলে বুঝি খুশি হতেন!

—নিশ্চয়ই। তাহার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যে কেউ খুশি হতেন। রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হোন—মানছি তিনি

সমুদ্র—মানছি তিনি আকাশ—তবু সীমায় এসে পৌঁছেচেন বলে—আজ নতুন সীমার সন্ধান আমাদের করতে হবে।

—সমুদ্র আর আকাশের সীমা আছে?

—আমাদের দৃষ্টিতে আছে। গভীর আর অনন্ত হলেও গতি আমাদের চাই। সীমানায় এসে ঠেকে যে জীবন—সেতো শেষ হয়ে গেল।

অনুপম গীতার পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। ভাবিল এই সাধারণ মেয়েটি এত কথা জানিল কোথা হইতে? জীবনের অর্থ সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নহে—জীবন-গতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রচুর অবসর বা গভীর চিন্তার সম্পদই বা কোথায়! জলের উপর ঢেউয়ের আঘাতে যেমন ফেনার ফুল অতি অনায়াসে ভাসিয়া চলে—তেমনই জীবন। ভাসিয়া চলার দায়িত্ব নাই—উদ্দেশ্য নাই। তবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে—

গীতা সলজ্জ দৃষ্টি নামাইয়া কহিল,—ভাবছেন মেয়েটি বড় জ্যেঠা—

—ভাবলেই বা ক্ষতি কি। সবাইকে সুশীলা ভাবতে কষ্ট হয়।

দুজনেই হাসিয়া উঠিল।

গীতা কহিল, যুগের দোষ। অথচ বাবা ওসব লক্ষ্য করেন না।

তবু আপনি কি করে এমন ভাবতে পারেন—

আশ্চর্য্য কি! চোখ বুজে ধ্যান আমরা পারি না। নিজেকে আমরা জানি না—কিন্তু সাহিত্যকে বড় ভালবাসি।

মুখে নিষ্ঠার অরুণরাগ—কণ্ঠে ভাবগদগদ সুর।

আচ্ছা আসি।

আবার দেখা হবে।

অনুপম ফিরিয়া কহিল, নিশ্চয়ই।

আজই দেখা হবে।

অনুপম মুখ ফিরাইয়া হাসিল। এতক্ষণে মনে হইল—মেয়েটি খেয়ালী। এই বয়সে সাহিত্যকে প্রাণের সম্পদ মনে করা—শুধু মনে করাই যাইতে পারে, তার বেশী নহে।

পথে পা দিয়া অনুপমের মনে সে চিন্তা আর রহিল না। রৌদ্রের প্রতাপ বাড়িতেছে। ভিখারীরা নানা কণ্ঠে পথচারীকে বিব্রত করিতেছে। এতটুকু সময়ের জ্ঞান উহাদের নাই। ছুটির দিনে মানুষের নানা প্রয়োজন। তবু সেই প্রয়োজনের তাগিদে সে ত্বরা বোধ করে না। পিছনে তাড়না নাই বলিয়া সমস্ত নিয়মকে উল্টাইয়াই তার আনন্দ। ক্ষুধার তাড়নায় ভিখারীগুলা চেঁচাইতেছে। নিরুদ্বিগ্ন আরামটুকু ওদের ওই অভদ্র চীৎকারে বিঘ্নিত। ওদের আছে অখণ্ড অবসর—তাই অখণ্ড চীৎকারে রাজধানী ক্ষতবিক্ষত করিতে ছাড়িতেছে না! দয়ার পরিবর্ত্তে মন বিমুখ হইয়া উঠে।

অনুপম কিন্তু বিরক্ত হইল না। ওদের দুঃখের পরিমাণ সে করিতে পারিবে না সত্য—ওদের প্রার্থনায় বিরক্তিই বা আসিবে কেন? আজ যে প্রভাতটি অখণ্ড অবসর লইয়া আসিয়াছে সে সব দিক দিয়াই সার্থক হউক।

পকেটে কয়েকটা খুচরা আনি ছিল ভিখারীদের দিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল।

সুমিত্রাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছে—একটি দ্বিতলের কক্ষ হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত কিছু আনাজপাতি কিছু বা তরল পদার্থ কতক ফুটপাথে পড়িল—কতক বা পথচারীদের গায়ে মাথায় জামা-কাপড়ে লাগিল। অনুপম দাঁড়াইয়া উপর পানে চাহিল। মেদভারবহুলা ও পর্য্যাপ্ত-অলঙ্কার-ভূষিতা একটি মহিলাকে খোলা জানালা দিয়া দেখা যায়। কণ্ঠস্বর তাঁর প্রখর।

ভিতরে কলহ চলিতেছে। কলহের ফলে আনাজপাতি ও দুধ পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোথায় ছিল কয়েকটা ভিখারী—ছুটিয়া আসিয়া আনাজপাতিগুলি কুড়াইতে লাগিল। মেয়েগুলা ফুটপাথের উপর গড়ানো দুধ ময়লা আঁচলে ভিজাইয়া কোলের ছেলেগুলার মুখে দিতে লাগিল। অপচয় মানুষের কল্যাণ করে, না—সঞ্চয় মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে?

সুমিত্রা বলিল,—এ আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন।

অদ্ভুত কিসে? যা আমরা একবার মেনে নিয়েছি—তাই সব সময়ে সত্য নয়। আমার কাছে যা সত্য—অন্যের কাছে তাই পরম মিথ্যা।

কিন্তু ভিখারীদের দিক থেকে না ভেবে গৃহস্থের দিক থেকে যদি ভাবেন—

তাতেও তো ক্ষতির দুঃখটা বুঝতে পারি না। যাঁদের ক্ষমতা আছে—তুচ্ছ মান-অভিমানের সামান্য মূল্যও কি তাঁরা দেবেন না?

মূল্য যাই দিন—ক্ষতিটা তো অস্বীকার করবেন না। একদিকে জমবে অনেক—আর একদিকে থাকবে না কিছুই—

মার্কসবাদ ছাড়ুন। জগৎ বুদ্ধিমানদের। আপনি লিখতে পারেন—আমি পারি না, আমার ব্যবসাবুদ্ধি আছে আপনার নেই—তা নিয়ে অভিযোগ করব কার কাছে। জন্মসূত্রে পাওয়া বুদ্ধিরই ভাগে যখন এত অসামঞ্জস্য—রুচিতে, বিদ্যাতে, প্রতিভায়, জ্ঞানে এত যখন বৈষম্য—তখন ধনের ক্ষেত্রে বৈষম্যটা অস্বাভাবিক ভাবছেন কেন?

ধনটা যে উপার্জ্জন করতে হয়—ওটা তো জন্মসূত্রে পাওয়া বলে দাবি চলে না।

কেন চলবে না? ধন উপায় করা—ধন রাখা সবেতেই বুদ্ধির দরকার—ক্ষমতার দরকার।

মানছি সবই আছে—কিন্তু যে ব্যবস্থা কু—তার উচ্ছেদ করার চেষ্টাই ভাল। নতুন সমাজ ব্যবস্থাই আমাদের সব স্তরকে বাঁচাবে।

ততদিন আমরা কি বাঁচব? সুমিত্রা হাসিল।

যুদ্ধের পরমায়ু আর কতদিনই বা। সোভিয়েট প্রাধান্য ত যুদ্ধের পর হবেই।

তাতে কি! সোভিয়েট তো তথাকথিত ডিক্টেটারীর কয়েকটি ধাপ বেশ নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে গেল। শক্তিমানদের প্রভাব দুর্ব্বলদের তাঁবেদার করে রাখবেই। তা সে ধনতন্ত্রেরই হোক আর জনতন্ত্রেরই হোক।

ধনতন্ত্রের প্রভাবে পুঁজিপতিদের কল্যাণ—আর গণতন্ত্র আমাদের? না অনুপম বাবু—আমরা শুধু আমরাই। আসুন, ভোজনে বসা যাক—সাড়ে এগারোটায় শো।

—স্নানটা সেরে নিই।

—বাথরুমে সব তৈরি। দশ মিনিটের নোটিশ দিলাম।

চমৎকার বাথরুম। সাবানের ও তেলের সুগন্ধে মনকে মুহূর্ত্তে বাস্তব-বিমুখ করিয়া দেয়। ছোটমত একখানি আরশি আছে—তার নীচেয় হুক আছে কাপড় জামা তোয়ালে রাখিবার জন্ত। এ ধারে ছোট ব্রাকেটে দাঁত মাজার সরঞ্জাম—সাবানের দু' রকমের বাক্স, টয়লেটের জন্ত কিছু কেস্‌ক্রীম পাউডার ও গন্ধ তেল। মধ্যবিত্ত ঘরে এর চেয়ে সুচারু ব্যবস্থা কি হইতে পারে। বাথ টবটা জলে ভর্ত্তি। ছোট মত দু'টি মগ রহিয়াছে মাথায় জল ঢালিবার জন্ত। মাথা আঁচড়াইবার চিরুণী তাও দু' চার রকমের আছে বৈকি। স্নানের সঙ্গে সঙ্গে দেহের গ্লানি দূর হইল—মনও হাল্কা হইয়া উঠিল।

মন যখন আরামে নিদ্রার কাছাকাছি পৌঁছে তুলনাটা স্বতঃই সেখানে উঁকি মারে। শ্যাওলা-পিচ্ছিল কলতলা, মেঝের খোওয়া সর্ব্বত্র নাই, মাথার উপরে নাই আচ্ছাদন। গ্রীষ্মের দিনে উপরের তিন-চার তলার বাড়ির আড়াল ঘুচাইয়া সূর্য্যের তীব্র কিরণ না-ই প্রবেশ করিল—বর্ষার বা শীতের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন উপায় নাই। কোন আব্রু নাই—; অঙ্গ মার্জ্জনায় নিজস্ব একটি অধিকার বা খেয়াল-খুশিরও খানিকটা মূল্য আছে, সে টুকুই বা কোথায়? রাস্তার কলে মাথা পাতিয়া স্নান করার মত ত্বরা ও নির্লজ্জতা—সব সময়েই প্রকট। ভাগ করা ভাড়া বাড়িতে জলের কল—শৌচাগার প্রভৃতির কৃপণতা যথেষ্ট—অকৃপণ শুধু ধোঁয়া। কাহারও আপিস, কাহারও ব্যবসা, নানা জাতীয় কর্ম্মসূচির ইন্ধন যোগাইতে চুল্লীদেবতা সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলন্ত। আর কোলাহল!—

জলের ধারায় মাথা পাতিয়া বেশ আরাম বোধ হইতেছে। এমন ভাবে—ঘুমানোও আশ্চর্য্য নহে।

—একটু তাড়া করুন—এগারোটা বাজে।

তাড়াতাড়ি গা মুছিয়া অনুপম বাহিরে আসিল। স্নান বা খাওয়ার বিলাস আজ চাখিয়া অনুভব করা থাকুক, সিনেমাটি না দেখিলেই চলিবে না। নূতন চাকরীর—নূতন দক্ষিণা, স্বাধীন ভাবে পয়সা খরচ করিবার সৌভাগ্যকে ঠেকাইবে কে।

আহারের আয়োজন মন্দ নহে, অনুপম তাড়াতাড়ি হাত চালাইল।

—আস্তে খান—সিনেমা তো পালিয়ে যাবে না।

—মানে—সাড়ে এগারোটা—

রিজার্ভ সীটে এত তাড়া কি! তা ছাড়া ঘড়িটা মিনিট-দশেক ফাষ্ট আছে। ক্রমশঃ

মাতৃমূর্ত্তি

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

মোর দেশ-মাতৃকারে দেখে এস কণ্ট্রোল-দোকানে।
না থাকিলে তাড়াতাড়ি ক্ষণেক থামায়ে গাড়ী,
নেমে গিয়ে কাছে বসে একবার বলো তার কানে,
সুজলা সুফলা তুমি হে জননী বঙ্গভূমি,
তোমার তুলনা মা গো, ত্রিভুবনে নাই কোনখানে!
না হয় পরনে নাই টেনা
মা বলে ত তবু যায় চেনা,
না হয় এগারো দিন এক মুঠো পাও নাই খেতে;
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
না হয় শরীরে তব প্রাণটুকু ধুঁকিছে কণ্ঠেতে।
করবালহীন হাতগুলি,
হা কপাল! যাও না সে ভুলি,'
কোটী-কণ্ঠে কলকল-নিনাদ শোনো না কান পেতে।

গড়িনি প্রতিমা মা গো, আঁকিয়াছি গুটি-কত ছবি।
নাই ঘৃণা, নাই স্তুতি, দু'চোখে পরমা দ্যুতি,
আশা নাই, ভাষা নাই, হাসিকান্না একাকার সবই;
মরিছ পথের পাশে, ভেবে চোখে জল আসে,
সে কথা আমারই মত ছন্দে গেঁথে বলে কত কবি!
দশ-প্রহরণ তব হাতে
জানি, নাই; হয়েছে কি তাতে?
বিরোধে বিরোধ বাড়ে, এতদিনে সে কথা শেখ নি?
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, বাহুতে তুমি মা শক্তি,
যে-বাহুতে আঁকি ছবি, যে-বাহুতে ধরেছি লেখনী।
হয়েছে এগারো দিন, আর
দিন-দুই, জোর দিন-চার,
হয়ত সকল জ্বালা নিজে হতে জুড়াবে এখনি।

আপন সন্তান বলে' চেনো কি গো, পড়ে কভু মনে,
কাছাকাছি আশেপাশে কেউ নাই ভালবাসে,
দূর, দূর, সর, সর, সব ঠাঁই করে সর্ব্বজনে;
তখনও আমরা আছি তোমারই যে কাছাকাছি,
আমাদের পানে চেয়ে তাই ভেবে কাঁদ নি গোপনে?
বলো নি কি দেবতারে ডেকে,
'কিছু মোর নাই সবই থেকে,
সে-সব তোমারই হাতে এদের লাগিয়া থাক্ জমা;
মরিতে যে ভয় পায়, জানি সে ত, তবু হায়
আমার সন্তান এরা, তাই বলে' কোরো তুমি ক্ষমা।'
মুদিল নয়ন তব, মাতঃ,
অভিশাপ দিয়ে গেলে না ত!
লুটাই চরণে শির ও গো দেবি, ও গো নিরুপমা!

দুর্গাপূজা ও প্রাচ্যসভ্যতা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে সভ্যতা গড়ে উঠেছে ; আবার মানুষেরই চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে এক সভ্যতা বিলীন হয়ে নূতন সভ্যতার আভাস দিয়ে এসেছে। কালের এই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে মানুষের কতই না সাধের প্রতিমূর্ত্তি, কতই না কল্পনার প্রতীক একে একে সময়ের অতল তলে ডুবে গেছে। মানুষ চায় গড়তে প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন জিনিস, তাই নিত্য নূতনের সন্ধানে সে ছুটে চলেছে অনাদি কাল থেকে। কিন্তু এই সমগ্র পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিতর লক্ষ্য করলে কয়েকটি জিনিসের অপরিবর্ত্তনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। যা সত্য তা যদি স্থায়ী হয়, তবে জগতের এই ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর দিয়ে যে তন্ত্রী কয়টি চিরদিন একই সুরে ঝঙ্কার দিয়ে আসছে, সে যে সত্য, সে যে সম্পূর্ণ, আর তার পশ্চাতে যে অনুস্যূত রয়েছে এক বিরাট্ তত্ত্ব সেই কথাই বারে বারে প্রকাশ পায়। পৃথিবীর কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে জন্ম নিয়েছিল গ্রীস, কার্থেজ ও মিশর, আর তাদের থেকে পালিত হয়ে উঠেছিল বীর্য্যশালী রোম। অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠল সভ্যতার আলোক-মালা, ঝিলিকের তীব্রতায় মুয়ে পড়ল অন্যান্য দেশ ; গ্রীস ও রোমের সভ্যতা বিদীর্ণ করে ফেলল অধিকাংশ দেশের কেন্দ্র-স্থল। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্য, সে সভ্যতা চিরস্থায়ী হয়ে রইল না।

কিন্তু পৃথিবীর আর এক দিকে যে ধ্রুবতারা একইভাবে আজও দীপ্যমান তার কাহিনী পৃথিবীর অন্ত পৃষ্ঠায়। তাকে বুঝতে হলে নূতন অধ্যায় খুলতে হবে, চিরাগত প্রথায় তার সন্ধান অসম্ভব। বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন ধারা এই স্বর্ণ-প্রতিমাকে কোন যুগেই ক্ষুন্ন করতে পারে নি। ধূলার আঁচড় কয়টি যখনই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, ভিতরের সেই উজ্জ্বল প্রতি-মূর্ত্তিটির চিরদিন একইভাবে উদ্ভাসন দেখা গিয়েছে। সূর্য্য চন্দ্র যেমন যুগ যুগ ধরে চিরপরিবর্ত্তনের মধ্যেও চির অপরিবর্ত্তনীয় রয়ে গেছে, ভারতবর্ষও তেমনি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আজও একই সূত্র ধরে এগিয়ে চলেছে।

ভারতবর্ষ সত্য তার রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, সভ্যতা, কৃষ্টি, সমুদয়ের ভিতরেই রয়েছে এক নিগূঢ় সত্য। তার কারণ এই—প্রতিটি সত্যের পশ্চাতে অধিষ্ঠিত রয়েছে এক একটি মহান্ তত্ত্ব।

মানুষের সভ্যতা তার কৃষ্টি তার চিন্তাধারা সমস্তই প্রকাশ পায় তার সমাজের ভিতর দিয়ে, তার জীবনযাত্রা-প্রণালীর ভিতর দিয়ে। মানুষ নূতনের দাস, নূতনের সঙ্গ তার চিরপুরাতন প্রার্থনা। প্রতিমুহূর্ত্তে বাস্তব হয়ে পড়ে তার কঠিন বোঝা, তাই ছোটে তার কল্পনা, তাই গড়ে ওঠে তার কাব্য। সে বোঝে দর্শনের সারমর্ম, সে বোঝে মৃত্যু-জরার কঠিন নিষ্পেষণ। এমনি ভাবেই বাস্তবের সৌন্দর্য্যে হয়ে ওঠে সে অতিষ্ঠ, সে ছোটে অপ-রূপের আশায়, কল্পনায় পায় সে অরূপের সন্ধান। এমনিভাবেই বাস্তবের শক্তি হয়ে উঠে পুরাতন, সে আবার ছোটে এক অপরূপ শক্তির সন্ধানে, কল্পনায় পায় সে বিশ্বশক্তির আধার। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সে খুঁজে পায় না পার্থিব কোন সান্ত্বনা, তাই কল্পনায় গড়ে ওঠে তার বিশ্বময়ী মাতৃমূর্ত্তি। এই ভাবে শক্তি, রূপ, সান্ত্বনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি অতৃপ্ত বাসনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের দেবতা, এমনিভাবেই গড়ে উঠেছিল এপোলো ও মিনার্ভা, এমনিভাবেই প্রস্তরমূর্ত্তিতে রূপ নিয়েছে আমাদের ব্রহ্মা ও ভগবতী।

ভারতবর্ষের দেবমূর্ত্তিতে, ভারতবর্ষের ধর্ম্মে সেই অরূপের কল্পনা থাকলেও নিছক পরিপূর্ণতার কল্পনা-কাঠামে সে মানুষের মনকে এই যুগ যুগ ধরে মরীচিকার মত ফাঁকি দিয়ে আসে নি। চোখ-ঝল্সানো কারুকার্য্য-খচিত সৌন্দর্য্য দিয়ে শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে গ্রীসের দেবী এথেনাকে গড়ে তুলল ; ভাস্কর্য্যের নিপুণতায় মুগ্ধনেত্রে গ্রীসবাসী প্রণাম করলে সেই সৌন্দর্য্যকে। তারপর এসে পড়ল সভ্যতার জটিলতা, ভাঙন-গড়ন সুরু হ'ল এই সভ্যতার উপর দিয়ে। কোথায় গেল এথেনা, কোথায় বা গেল ডায়না, মানুষের কল্পনার রূপ গেল বদলে। রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে এক সভ্যতা আর এক সভ্যতাকে দলন করে তার টুঁটি টিপে একেবারে নিঃশেষ করে তবে বিরাজ করতে লাগল অধীশ্বর হয়ে। ধর্ম্ম বদলাল, শিল্প বদলাল, মানুষের কল্পনার পর্দ্দার রং হ'ল পরিবর্ত্তিত তাই নিঃশেষ হয়ে গেল যা কিছু ছিল পুরাতন। নূতন রূপ, নূতন সভ্যতা, নূতন রং এসে অধিকার করলে মানুষের চেতনাকে।

কিন্তু পৃথিবীর আর এক কেন্দ্রে ঠিক এমনটি হয়ে উঠে নি। যে ভারতবর্ষের কথা বলছিলাম সেখানে আঘাত লেগেছে সত্য, সেখানে রক্তস্রোত যুগে যুগে বয়ে গেছে সত্য, কিন্তু তার আদি সভ্যতাকে নিঃশেষে এরূপ নির্ম্মমভাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে কেউ পারে নি। গ্রীক সৌন্দর্য্যের কল্পনার উদ্ভব হয়েছিল বাইরে থেকে। কিন্তু ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্য অতি স্বাভাবিক ভাবেই ধীরে ধীরে নিজেকে বিকশিত করেছিল। মানুষের প্রতিবিম্ব যেমন মানুষকে নিয়েই তৈরি, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও ধর্ম্মও তেমনি ভারতবাসীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

ভারতবর্ষের আর একটি বিশেষত্ব এর ধর্ম্মের প্রভাব। ভারতবর্ষের সভ্যতা অর্থেই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ; ধর্ম্মের প্রখরোজ্জ্বল আলোক-রশ্মির প্রতিবিম্বেই ভারতের সভ্যতার প্রকাশ। দেবদেবীর ভিত্তিকে এক একটি তত্ত্বের উপর স্থাপিত করে ভারতবর্ষ তার ধর্ম্মকে গ্রথিত করে তুলেছে, আর এই দেব-দেবীকেই এক একটি মণিমুক্তায় সজ্জিত করে ভারতবর্ষ তার সভ্যতার আলোকমালা জ্বালিয়েছে। সেই ভারতবর্ষেরই এক সুজলা, সুফলা প্রান্তের ভাববিহ্বল মানুষেরা যব ধান্য পুষ্পের প্রাচুর্য্যের মধ্যে অপূর্ব্ব আগমনীর সুরে একটি শুভ মন্ত্র গেয়ে উঠল, এক বিরাট্ কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল তাদের বিশ্বমাতৃরূপ। এই হ'ল বাংলার দুর্গোৎসবের গোড়ার কথা।

পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষের চিন্তাধারার একটি প্রধান প্রভেদ

এই যে ভারতবর্ষ যেমন অন্তরকেই চিরদিন বিকশিত করে এসেছে ইউরোপ তেমনি বাহিরকেই ক্রমাগত প্রকাশ করে এসেছে। তাই ইউরোপের বিশ্বমাতৃকার প্রকাশ সন্তান-ক্রোড়ে ম্যাডোনার জননী-রূপেতেই সমাপ্ত, কিন্তু ভারতবর্ষের রণরঙ্গিণী চণ্ডীর ধ্বংসকারিণী রূপের মধ্যে যে ভাবটি প্রস্ফুটিত রয়েছে, তা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক-রশ্মিতে বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট বিসদৃশ বলে প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষের প্রতি অনুযোগ যে, সে নারীজাতির উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে জানে না। কিন্তু এ অভিযোগ অমূলক। ভারতবর্ষে নারী-জাতির প্রতি ভক্তির বাহ্য প্রকাশ হ'ল তার অন্তরের দরদ দিয়ে গড়া দেবীর মূর্ত্তিতে; আর এই নারী জাতির চরম মর্য্যাদার কথা প্রকাশ পেয়েছে বাঙালীর ভগবতীর আরাধনায়। সাধক যে মায়ের সন্তান, মায়ের কাছে চাইতে তার আর লজ্জা কি, তাই ধন, মান, রূপ ও জনের আকাঙ্ক্ষায় সে কেবল মায়ের কাছে প্রার্থনা করে চলে। আত্মসমর্পণ ও ভক্তির ভিতর দিয়ে যে সব কিছু প্রাপ্য। এ যে শুধু ত্যাগ ও রিক্ততার মন্ত্র নয়—এ পরম সত্য কথা ভারতবর্ষ তার ভগবতীর পূজার ভিতর দিয়ে বারে বারে প্রকাশ করেছে। ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্য-কল্পনার সময়ও তার সেই অন্তর্দৃষ্টির কথাই এসে পড়ে। ভারতবর্ষ সর্ব্বদাই অন্তরের সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণ স্থান দেবার চেষ্টা করেছে। কালিদাসের কাব্য থেকে আরম্ভ করে ভারতের সভ্যতার প্রতিটি কণা অনুকণার ভিতরে এই কথাই বারে বারে প্রকটিত হয়। কুমারসম্ভবে বহিঃ-সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিতা ও পর্য্যাপ্ত যৌবনভারে অবনমিতা উমাকে ধূর্জ্জটি প্রত্যাখান করেছিলেন। কিন্তু পরে তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারা নিজের অন্তরের সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে যখন গৌরী এসে উপস্থিত হলেন তখন মহাদেব আর তাঁকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "যে ত্রিলোচন পূর্ব্বে বসন্ত পুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মুহূর্ত্তে প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, তিনি দিবসের শশীলেখার ন্যায় কর্শিতা, শ্লথলম্বিত পিঙ্গল-জটাধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন।"

ভারতবর্ষ যেমন এক দিকে ত্যাগের বাণী প্রচার করেছে, অন্য দিকে ভোগের কথা বলতেও সে ক্ষান্ত হয়নি। জীবনের একটি ধারা মানুষকে যেমন ত্যাগের মহাপ্রস্থানের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, অন্য একটি ধারাও তেমনিভাবে ভোগের শেষ সীমার সন্ধান দিয়েছে। প্রকৃত জীবন সেখানেই সফল, অরূপের রূপের আস্বাদ সেখানেই সম্ভব, যেখানে এই দুইটি বিসদৃশ ভাবের সমন্বয় হয়। ভগবতীর এক দিকে আসুরিক শক্তি, অন্য দিকে মাতৃমূর্ত্তি, এক দিকে দানবীয় শক্তির বিকাশ, অন্যদিকে তাকে দমন করার অপূর্ব্ব দেবত্ব—এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবগুলির একত্র সমাবেশ দুর্গা-প্রতিমাকে শুধু শিল্প-সৌন্দর্য্যের চরম-সীমায় নিয়ে যায় নি, মানুষের সভ্যতার প্রকাশক্ষেত্রেও পরিণত করেছে।

রিক্তের ব্যথা

শ্রীমহাদেব রায়

যে শ্যামলিমায় দিগ-দিগন্ত ভরি'
আসে ফিরে ফিরে 'শারদীয়া' উৎসব,
ম্লান হ'ল আজ স্নিগ্ধ কান্তি তার,
কলহংসের কণ্ঠে নাহি সে রব।
কাশের বসনে হ'ত সে শুভ্র কান্তি
কমলে শারদ হাসি নাহি অম্লান,
কাঁদে হিয়া যার পিপাসায় বরষায়,
সে ধরার আজি কণ্ঠাগত যে প্রাণ।
রস-গৌরবে কা'ল কদম্ব-নীপে
জাগে নাই প্রাণ জলদ-মহোৎসবে,
সপ্তচ্ছদে কুসুম-কান্তি তাই
ম্লান হ'ল আজ শরতে অগৌরবে।
অগ্রদূতীর পরশে যে সৌরভ
পায় নাই ক্ষিতি, আজ তার মধুরিমা
খুঁজিস কোথায়, ওরে প্রমত্ত কবি ?
ধরার বক্ষে বিষাদের নাই সীমা।
যে পূর্ণতার বিত্ত-বিভবে তোর
স্থলে, জলে, আর নভোমণ্ডলে শ্যাম-
রূপ রহে আঁকা, আজ তার ক্ষোভ চিতে—
গুমরি গুমরি শ্বসিছে সে অবিরাম।

বিস্মৃতি শয়নে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জনহীন এ অঙ্গনে ফুলেরা ঘুমায়—জোনাকীরা
জাগে। পড়ে মনে মোর, তুমি বসে আনন্দমদিরা
যৌবনের পাত্র ভরে ফাল্গুনের প্রণয়-বিলাসে
এমনি মাধবী রাত্রে করেছিলে পান। চারি পাশে
গোষ্ঠগৃহ হেথা ছিল আঁকা-বাঁকা পথ মাঝে কত।
উপেক্ষার মৃত্তিকায় আজ তুমি চির নিদ্রাগত
পল্লবের আবরণে। হীরাঝিল সম্মুখে আমার
স্মৃতি-ভরা। ভগ্ন সোপানের ধারে বনবীথিকার
নেমেছে লতিকা মৌন বেদনার সাথে। ছায়া দোলে,
সমাধি-মন্দির বুকে যেন কার উপচ্ছায়া কোলে
তোমার সমাধি প্রান্তে ব্যর্থ জীবনের ইতিহাস
চাঁদের কিরণে ফোটে। সেই দিন এমনি আকাশ
ছিল পূর্ণিমার। হীরাঝিলে মধুর সঙ্গীত নব।
আর আজ অর্দ্ধ রাতে মৃত্যুস্নাত গীতিকাব্য স্তব্ধ
বিস্মৃতি শয়নে। চলে যায় অবসন্ন যাত্রী সম
দিন অনন্তের পারাবারে। অনুরাগে অশ্রু মম
যাই রেখে তবে। যে দিন চলিয়া গেছে সে কি ফিরে।
চির ঘুম পেয়েছে যে জন, সে কি জাগিবে সমীরে ?

প্রাচীন হিন্দী ও আধুনিক বাংলা

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

যে বয়সে কীর্ত্তন গান যখন হইতে বুঝিতে শিখিয়াছি, মহাজন পদাবলীর সব শব্দের অর্থবোধ না হইলেও পদগুলির মোটামুটি ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াই তৃপ্তি পাইয়াছি, তখন সমঝদার বলিয়া যাঁহাদের মনে হইত, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইয়াছি,—এসব বুঝা কঠিন ; হিন্দী শব্দ আর ব্রজবুলি এতে যথেষ্ট। তখন এইটুকু উত্তরে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

এখন প্রাচীন হিন্দী-ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় হওয়ায় বুঝিতে পারিতেছি, ঐ সকল মহাজন পদাবলীর শব্দসমূহের মূল কোথায়। শুধু তাহাই নহে। দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি যে, এমন অনেক তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ শব্দ প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্যে আছে, যেগুলির সন্ধান আধুনিক হিন্দী-ভাষায়—লেখ্য বা কথ্য ভাষায়—বড় একটা পাইতেছি না। অথচ বাংলায় সেগুলির নিত্য ব্যবহার চলিতেছে।

তুলসীদাস, কবীর, গুরুনানক, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির রচনা হইতে বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখান যাইতে পারে। তুলসীদাসের কয়েকটি পদের উল্লেখ এখানে করিতেছি।

১। সাধুসঙ্গরূপ তীর্থে অবগাহনের ফল সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন :

মজ্জন-ফল পেখিয় ততকালা।
কাক হোহিঁ পিক বকউ মরালা॥
মুনি আচরজ করই জনি কোই।
সত-সংগতি-মহিমা নহিঁ গোই॥
বালমীকি নারদ ঘটজোনী।
নিজ নিজ মুখন কহী নিজ হোনী॥

আধুনিক ব্যাখ্যাকার হিন্দীগদ্যে এই পদ কয়টির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

উসমেঁ স্নান করনেকা অ্যায়সা তৎকাল ফল হোতা হ্যাঁয় কি কৌয়ে, কোয়ল, আওর বকুলে হংস হো জাতা হ্যাঁয়। ইয়হ সুনকর কিসীকো আশ্চর্য ন করনা চাহিয়ে ক্যোঁকি সৎসংগকী মহিমা ছিপী নহিঁ হ্যাঁয়। বাল্মীকি, নারদ আওর অগস্ত্যনে অপনী উৎপত্তি অপনে অপনে মুখোং যে কহী হ্যাঁয়।

বেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে, কাক হইল কৌয়া, বক হইল বকুলা (বগুলা) এবং নিজ হইল আপন। আধুনিক কোন হিন্দী গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে কাক, বক আর নিজ, এই তিনটি শব্দ আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। আমরা বাংলায় এই তিনটি শব্দ খুবই ব্যবহার করিতেছি।

২। বিরাধ রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়। শ্রীরাম তাহার কিরূপ গতি করেন, সে সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন :

তুরতহিঁ রুচির রূপ তেহি পাওয়া।
দেখি দুখী নিজধাম পঠাওয়া॥

এই পঠা ধাতুটি বাংলায় 'পাঠা' (প্রেরণ করা) হইয়াছে। আমরা সর্ব্বদা এই ধাতুটির ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু আধুনিক হিন্দী ভাষায় কোথায়ও ইহার প্রয়োগ দেখিতেছি না। প্রেরণার্থে সাধারণতঃ "ভেজ" ধাতুর ব্যবহারই চলিতেছে।

৩। দুষ্ট প্রকৃতির লোকে উপকারের বিনিময়ে অপকারই করে। কবি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

জে বিনু কাজ দাহিনেহু বাঁয়ে।

কাজ শব্দটি আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি ; কিন্তু লেখ্য বা কথ্য হিন্দীতে কাম ছাড়া কাজের ব্যবহার হয় না।

৪। দুষ্টের প্রকৃতি সম্বন্ধে উপমা দিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন :

বায়স পালিয় অতি অনুরাগা।
হোহিঁ নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা॥

"কাককে অতি অনুরাগের সঙ্গে পালন কর ; কিন্তু সে কি কখনও নিরামিষাশী হইবে ?"

কাক ও কাগ দুইটি শব্দই বাংলায় আমরা ব্যবহার করি। কবহু বাংলায় (পদ্যে) হইয়াছে কভু, আর হিন্দীতে চলিতেছে কভী। কি শব্দটি বাংলায় 'কি' রূপেই চলিতেছে, হিন্দীতে চলিতেছে ক্যা।

৫। নিজের দীনতা প্রকাশ করিতে কবি এক স্থানে বলিয়াছেন :

কবি ন হোউঁ নহিঁ বচনপ্রবীনু।
সকল কলা সব বিদ্যা হীনু॥

"আমি কবিও নই, বচন-চতুরও নই ; আমি সকল কলা ও সব বিদ্যাহীন।"

সকল কথাটি আধুনিক হিন্দী গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না।

৬। ভণিতায় আর এক স্থানে আছে :

মণি-মাণিক-মুকুতা-ছবি জ্যায়সী।
অহি-গিরি-গজ-সির সোহ ন ত্যায়সী॥

"মণি, মাণিক্য ও মুক্তা ছবিতে যেমন শোভা পায়, উহাদের উৎপত্তিস্থল সর্পমস্তক, গিরি-চূড়া বা গজ-শিরে তেমন শোভা পায় না।"

'ছবি' আধুনিক হিন্দী লেখায় কোথায়ও দেখি নাই। তসবীরের ব্যবহারই বেশী দেখা যায়। দুই একজন চিত্র ব্যবহার করেন।

৭। শিবের বন্দনায় কবি বলিয়াছেন :

সো মহেস মোহিঁ পর অনুকুলা।

সো শব্দটি বাংলায় সেই বা সে হইয়াছে ; আধুনিক বাংলায় সেই বা সে খুবই চলিতেছে। কিন্তু আধুনিক হিন্দী গদ্যে সো শব্দের ব্যবহার নাই। সো স্থানে 'বহ', 'বহী' ব্যবহার করা হয়।

৮। ইহার কিছু পরেই আছে :

জে এহি কথাহিঁ সনেহ সমেতা।

হিন্দীর এই 'জে' হইয়াছে বাংলায় 'যে' আর 'এহি' হইয়াছে 'এই' এবং ইহারা আধুনিক বাংলায় অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দীর 'জে' আর 'এহি' আধুনিক হিন্দীতে 'জো' আর 'ইস' রূপ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

৯। ভগবানের নাম আর রূপ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন :

কো বড় ছোট কহত অপরাধু।

"কে বড়, কে ছোট তাহা বলায় অপরাধ হয়।" কো, বড়, ছোট, এই তিনটি শব্দ আধুনিক হিন্দীতে কৌন, বড়া ও ছোটা এই রূপ পাইয়াছে। বাংলায় কিন্তু 'কো' হইয়াছে 'কে' বা 'কোন্' আর 'ছোট বড়' ছোট বড়ই থাকিয়া গিয়াছে। নিরক্ষর হিন্দুস্থানীর মুখে অবশ্য 'কৌন' অপেক্ষা 'কো' বেশী শুনা যায়।

১০। নাম-মহিমায় এক স্থানে কবি বলিয়াছেন:

কহউঁ নাম বড় রামতেঁ, নিজ বিচার-অনুসার।—এই যে অপেক্ষার্থে তেঁ শব্দের ব্যবহার, আধুনিক হিন্দীতে ইহা দেখা যায় না। কিন্তু বাংলায় অশিক্ষিত মহলে এই স্থানে তে শব্দের প্রচলন আছে। আমার মনে হয়, বাংলায় লেখ্য ভাষায় বা শিক্ষিতের মুখে অপেক্ষার্থে যে 'থেকে' শব্দের ব্যবহার হয়, তাহা এই 'তে' হইতেই আসিয়াছে।

১১। নাম মহিমায় আর এক স্থানে আছে:

ধ্রুব সগলানি জপেউ হরি-নাউঁ।
পায়উ অচল অনুপম ঠাউঁ॥

ঠাউঁ শব্দটি ঠাঁই হইয়া বাংলায় চলিতেছে। আধুনিক হিন্দীতে ইহার ব্যবহার দেখিতেছি না।

১২। নাম-মহিমায় অপর এক স্থানে আছে:

রাম-কথা কলি কামদ-গাঈ।

গাভী হইতে গাঈ হইয়াছে। বাংলায় 'গাই' দেখিতেছি, কিন্তু হিন্দীতে দেখিতেছি 'গায়'।

বাংলাদেশ ও রুশিয়ার নারী-শিক্ষার প্রগতি

শ্রীনীলিমা চৌধুরী

গত ১৯৪০ সালের সোভিয়েট রুশিয়ার তৃতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তৃতীয় বর্ষের ধারাবাহিক বিবরণী পড়তে পড়তে মনে হ'ল, ১৯১৮ সালের বিপ্লবের পর মাত্র বাইশ বৎসর সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সোভিয়েট নীতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

রহস্যাবৃত ও অলৌকিক বলে এখনো রুশিয়ার পরিচয়। গত সাতাশ বৎসরে রুশিয়া সম্পর্কে অজস্র প্রচার-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তবুও এই বিরাট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঠিক বিবরণের জন্য সকলের কৌতূহল বেড়েই চলেছে। কিন্তু দুনিয়ার দুর্নিবার সামরিক শক্তিকে চার বৎসরব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধে পরাভূত করা কিরূপ নৈতিক ও সামাজিক শক্তির প্ররোচনায় সম্ভবপর হয়েছে তা জানবার জন্য স্বভাবত আমাদের আগ্রহ হয়। মনে হয় এই বিপুল রাষ্ট্রীয় প্রগতির উৎস হচ্ছে রুশিয়ার শিক্ষিতা নারী-সমাজ এবং রাষ্ট্রশক্তির শিক্ষা-প্রসারের ব্যাপক অনুকূল ব্যবস্থা।

পরাধীন ভারতের সমস্যা নানাবিধ। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নতি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভিন্ন কখনই সম্ভবপর নয়। কিন্তু সর্বোপরি উপযুক্ত জাতীয় পূর্ণ আত্মচেতনাবোধ আমাদের জাগ্রত হয়েছে কিনা সেটাও প্রশ্নের বিষয়। এদেশে এখনও জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটাই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান সহজও নয়।

বাংলাদেশের নারীদের শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় আলোচনা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থার যে চিত্র আমরা পেয়ে থাকি তা পৃথিবীর যে-কোন সভ্যজগতের গ্লানিস্বরূপ। ১৯৪১ সালের সেন্সাসে দেখি বাংলাদেশে শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর মোট সংখ্যা শতকরা ১৬'১ এবং তার মধ্যে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ২'৬১ জন। এই ২'৬১ জনের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রাথমিক স্তরের। মাধ্যমিক স্তরের সংখ্যা ৮০০০ এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে মাত্র ২৬০০। বাংলাদেশের ছয় কোটি লোকের মধ্যে দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ নারী। তার মধ্যে এই উচ্চশিক্ষিতা ২৬০০ মেয়েকে নিয়েই যত-সব কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের রক্ষণশীল পুরুষ ও সংস্কারাবদ্ধ নারীসম্প্রদায় মাঝে মাঝে মতামত প্রকাশ করে থাকেন যে, বাংলাদেশের ছেলেরা শিক্ষিতা মেয়েদের বিবাহ করতে ভয় পান। এঁদের মতে শিক্ষিতা মেয়েরা রান্নাঘরের কাজ ও সন্তান পালনে অপারগ। স্নো, পাউডার, লিপষ্টীক ও ফ্যাশান করে শাড়ি পরা ও রকমারি অলঙ্কার নির্ব্বাচন করা ভিন্ন আর কোন রুচিবোধ তাদের নেই। স্বামীর আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের দিকে ঝোঁক বেশী এবং সাংসারিক কর্তব্যে অবহেলা করে সিনেমা ও থিয়েটারে আগ্রহ বেশী ইত্যাদি নানাবিধ পীড়াদায়ক দোষারোপ শুনতে পাওয়া যায়। অল্পবিস্তর পরিমিত প্রসাধন-চর্চা সুরুচি এবং পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক, সেটা বিশেষ কিছু দোষের বলে মনে হয় না, বিশেষত: এই উষ্ণপ্রধান দেশে। একথাও বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিলাস এবং অলঙ্কার-প্রিয়তার মোহ অল্পশিক্ষিতা অথবা অশিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেও কিছু কম দেখতে পাওয়া যায় না। আর যদি গুটিকয়েক ধনী ও শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়ে থাকে সে দোষ সেই সকল বিশিষ্ট পরিবারের শিক্ষার ধারার উপর। পারিবারিক প্রশ্রয় না পেলে এবং ঘরে সুশিক্ষার অভাব না হলে কোন মেয়েই ফ্যাশান-দুরন্ত বা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে না। এখনকার বিদ্যালয়ে যে মামুলি শিক্ষা দেওয়া হয় আর কিছু না হোক ফ্যাশান করতে কোন শিক্ষা দেয় না।

এতেই শেষ নয়, উচ্চশিক্ষিতা হলে বিয়ের বাজারে পাত্র যোগাড় করা নাকি আরো কঠিন। যুক্তিটা এই যে মেয়ে যদি বি-এ পাস করে থাকেন, এম-এ অথবা আরো উচ্চ ডিগ্রী না হলে কন্যা সম্প্রদান করা চলে না। অথচ বহু যুগ ধরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রীধারী পুরুষদের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিতা

নারীদের নিয়ে সংসারব্রত গ্রহণ করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়েছে বলে শুনতে পাওয়া যায় না। মেয়েদের শিক্ষার আবশ্যকতাও বিয়ের বাজার-দরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মেয়েকে শিক্ষা দিতে হবে কেবলমাত্র বিয়ের বাজারে সুবিধার জন্য। সুবিধা যদি কিছু না হয় তবে শিক্ষা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা শ্রেয়ঃ হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় পাত্র যোগাড় হলেই মেয়েদের আর পড়ানো হয় না।

আর একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষিতা মেয়েরা প্রাচীন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন। প্রাচীন ভারতের বিদুষী খনা মৈত্রেয়ী ও গার্গীর দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা-যাত্রা-পথের আদর্শবর্তিকা বলে উল্লিখিত হয়। বাঁধাধরা চিরাচরিত আদর্শের বাহিরে বর্তমান কালোপযোগী অন্য কোন নূতন আদর্শের বা ইঙ্গিতের সন্ধান দিতে দেখি না। সেযুগে যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ও আদর্শে সমাজ চলছিল তার পরিবর্তন করা উচিত কিনা ভেবে দেখবার সময় বোধ হয় উপস্থিত হয়েছে। বাংলাদেশের দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ স্ত্রীলোকের ভিতরে মাত্র দু'হাজার ছয় শ উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের মনে যদি কোনরকম ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া এসে থাকে তাতেই বা এত আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কি আছে? এই মুষ্টিমেয় সংখ্যা তো বিশাল সমুদ্রে বিন্দুমাত্র। এই দু'হাজার ছয় শ শিক্ষিতা মেয়েকে বাদ দিয়ে যে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা বিপুল নারীসমাজ রয়েছে তাদেরই কি বিংশ শতাব্দীর নারীত্বের চরম আদর্শ বলে মনে করব? এই বৃহৎ নারী সমাজকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত রেখে পরিবারের বা জাতির কোন মঙ্গলসাধন হয়েছে কি? রান্নাঘর ও সন্তানপালন নিয়ে যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ থেকেও গৃহস্থবাড়ীর পুরনো ধাঁচের শ্রীহীন রান্নাঘর—(১৯৪৫-৪৬ সালের রান্নাঘর বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত অভিনব ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে তা জনসাধারণের কল্পনার বাইরে)—ও বাংলার তরুণ-তরুণীর হৃত স্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ হার দেখলে বিস্মিত হতে হয়। পৃথিবীর সব জাতির আয়ুর হার যখন ক্রমবর্দ্ধমান, ভারতের অদৃষ্ট তখন অন্যরূপ কেন সে প্রশ্ন কারো মনে জেগেছে কিনা জানি না। যদি এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা মেয়ে অন্ততঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সামাজিক প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে তবে তো শিক্ষার প্রকৃত মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

বর্তমান যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের উপার্জনে বা অনেকস্থলে একের উপার্জনে এখন আর সংসার চলে না। অর্থের প্রয়োজন বেড়েছে, এত কালের পরনির্ভরশীলা নারীর ন্যায়সঙ্গত ভাবেই স্বাবলম্বী হবার স্পৃহা জেগেছে এবং তার প্রয়োজনও ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে। বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা বৃথা। যুদ্ধ উপলক্ষে পুরুষের বহু কর্মক্ষেত্রে সর্বদেশে নারী নিযুক্ত হয়েছে, এবং সে সকল ক্ষেত্রে তারা তাদের নিপুণ কর্মদক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। ভবিষ্যতেও হয়ত পুরুষের বহু কাজ নারীকেই করতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রঙ্গমঞ্চে যদি তৃতীয় মহাসমরের আশঙ্কা থাকে, হয়ত তখন ভারতীয় নারীদেরও হাতা, খুন্তি ছেড়ে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের যে পরিবর্তন অনিবার্য তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নারী শিক্ষার আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। বাহিরের কর্মজীবন অব্যাহত রেখে যে শিক্ষায় গৃহ ও সংসার-রচনা সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠতে পারে, সেই নূতন আদর্শেই শিক্ষার সংস্কার সাধন করতে হবে। যে শিক্ষা এখন দেওয়া হয়, তার সঙ্গে শুধু কয়েকটি রান্না, কিছু সেলাই এবং অল্পবিস্তর সঙ্গীত বা তদনুরূপ কয়েকটি বিষয় সংযোগ করে মেয়েদের গৃহ-রচনার বৃত্তির উপযোগী (?) শিক্ষা চলছে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, স্বাধীন চিন্তা ও সংসার-বন্ধনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে নারীশিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত পদ্ধতি পরিকল্পিত বা আলোচিত হয় নি। যে শিক্ষা এখন প্রচলিত আছে তা বর্তমান যুগের উপযোগী বা আধুনিক নারীর আশা ও আদর্শোপযোগী নয় তা অনেকেই উপলব্ধি করছেন। শিক্ষার পুনর্গঠনের সময় নিকটবর্তী, পুরুষের শিক্ষা-সংস্কারের সঙ্গে নারীশিক্ষাও যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করতে পারে তার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার এখনই প্রয়োজন।

নারীশিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও সার্বজনীন শিক্ষার যে আশু প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন মতভেদ আজ থাকা উচিত নয়। শিক্ষিতা নারীদের উপর দোষারোপ করেও নারীদের আর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভবপর হবে না। মুখে মুখে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও মনে মনে মতের বিশেষ পরিবর্তন আজও ঘটেনি, বিশেষ করে আমাদের রাষ্ট্রকর্তাদের—যাঁদের কার্যপন্থা দেখলে মনে হয় না যে এ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব বিশেষ বদলেছে। পর পর কোয়ালিশন মুসলিম লীগ ইত্যাদি মন্ত্রিসভা হয়েও আজ অবধি বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে কোন সদস্য, মহিলা সভ্য বা শিক্ষা মন্ত্রীকে বাংলার মেয়েদের শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যয়বরাদ্দের দাবি করতে শুনি নি। শিক্ষার জন্য অর্থাভাবের অছিলা শুধু এ পরাধীন ভারতেই সম্ভব। যুদ্ধের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা খরচ করেও শিক্ষার জন্য ব্যয়-সঙ্কোচ করতে পৃথিবীর স্বাধীন জাতির বাজেটে শোনা যায় নি। শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয় যে শিক্ষার জন্য রুশিয়ায় ১৯৪৪ সালের বাজেটে দেশরক্ষার থেকেও বেশী ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। রেড ক্রশের সাহায্যের জন্য স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুরকে লক্ষ লক্ষ টাকা এক একটি জেলা থেকে নজর দিতে দেখা যায়। এই গরীব দেশে সরকারী কর্মচারীরা কোন্ মন্ত্রবলে এত টাকার তোড়া উপহার দিতে পারেন সেটা তাঁদের কাছে আয়ত্ত করে নিতে পারলে কিছু উপকার হয়। রেড ক্রশের টাকা 'ন দেবায় ন ধর্মায়'—সেটা সেই সেই জেলার শিক্ষা-প্রসারে ব্যয় করলে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।

বহুকাল স্বাধিকারবিচ্যুত থাকার ফলে একদল শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও শিক্ষার ফল যে কখনও 'কু' হতে পারে না তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পৃথিবীর সকল সভ্য জাতি। রুশিয়ার নারীসমাজ আজ তার মধ্যে শীর্ষস্থান

অধিকার করেছে। কোন খ্যাতনামা লেখকের লেখায় পড়েছিলাম—"কোন দেশের উন্নতির মানদণ্ড সেই দেশের নারীদের প্রতি পুরুষের ব্যবহারের দ্বারা নিরূপিত হয়"—নারীশিক্ষা প্রসারের চলিত নীতি ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার নিয়ে যে অগ্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় আমরা পেয়েছি তা থেকে এই উক্তির তাৎপর্য খুবই সত্য বলে মনে হয়। শতকরা চৌদ্দ জন পুরুষ ও দুই জন নারী শিক্ষিতা বলেই আজ ধর্মের নামে মিথ্যা অন্ধ আবেগ ও গোঁড়ামি, সামাজিক নানা প্রচলিত কুসংস্কার ও দেশাচার সকল রকম সংস্কারের ঘোর পরিপন্থী। জনসাধারণ শিক্ষিত হলে উদারমতাবলম্বী হয়, তারা অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করে এবং সত্যানুরাগী হয়।

রুশ-বিপ্লবের পূর্বে জারের আমলের রুশিয়ার নারীসমাজের যে চিত্র আমরা পাই এ যেন বর্তমান যুগের বাংলার নারীসমাজের হুবহু প্রতিকৃতি। কিন্তু সমাজের এক প্রধান অংশকে চেপে রেখে কোন সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয় বলেই রুশিয়ার অক্টোবরের প্রসিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিপ্লব (The Great October Socialist Revolution) মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দিয়েছে। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের ১২২ নং নিবন্ধে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

"Women in the U.S.S.R. are accorded equal rights with men in all spheres of economic state, cultural, social and political life. The possibility of exercising these rights is ensured to women by granting them an equal right with men to work, payment for work, rest and leisure, social insurance, and education by state protection of the interests of mother and child, pre-maternity and maternity leave with full pay and the provision of a wide network of maternity homes, nurseries, and kindergartens".

শুধু এতেই শেষ নয়, রুশিয়ার মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে মনোনীত করা ও নির্বাচিত হওয়ার রাজনৈতিক অধিকার আছে। পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে মেয়েদের এতখানি স্বাধীনতা এই সমাজতান্ত্রিক দেশ ভিন্ন অপর কোন জাতি দিয়েছে বলে শোনা যায় না। যে দেশ মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করে তারা রুশিয়ার এই আদর্শ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। রুশিয়ার মেয়েরা সামাজিক নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে বলে মনে হয় না। মাত্র সাতাশ বৎসর—একটা জাতির অগ্রগতির ইতিবৃত্তে অতি অকিঞ্চিৎকর—এর মধ্যে রুশ-মেয়েদের প্রগতি দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথে অতি রক্ষণশীল ইংরেজ জাতিও নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে যার ফল আমরা ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে দেখলাম।

রুশ মেয়েদের শিক্ষা, সাহস, শৌর্য্য ও কর্মতৎপরতা কতখানি রুশ জাতিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তার বিবরণ একটুখানি তুলে দিচ্ছি। প্রসিদ্ধ মার্কিন সমর-সাংবাদিক এডগার স্নো তাঁর *Glory of Bondage* বইয়ে 'স্টালিনগ্রাড জয়ে'র যুদ্ধের বিবরণে লিখেছেন :

"Russian women was just as much a hero as Chuikov or any one there. All through the battle she had helped cook for other heroes now dead. She and hundreds of girls like her had carried hot food to the trenches, so that a man could die with a warm stomach, and in his mind the image of her fresh youth and fine dark eye the personification of his beloved Russia. Hundreds like her had perished in this war, carrying wounded back through the squalls of lead and steel and tending them in dressing stations where you could not hear your own shouts and doing the menial tasks of the sanitation corps. . . . How far away our American women seemed right then, with their inane talk of meatless days and "sacrifices" of gas and butter. How could they know what war meant to Russian girls?" . . . .

বাইরের কর্মজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের কাজ নারীকে যদি গ্রহণ করতে হয় তবে সোভিয়েট শাসনতন্ত্র যে রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা মেয়েদের দিয়েছে তা অবশ্যই দিতে হবে। সকল রকম বড় বড় কারখানায় রুশিয়ার মেয়েরা আজ কাজ করছে। সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, সমবায়-কৃষি, পূর্ত, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিমান-বাহিনী, রেলওয়ে, শাসনতন্ত্র, খেলাধুলা, ইমারত-নির্মাণ, ট্রাকটর-চালনা, ইত্যাদি যে-কোন রকম গঠন-মূলক কাজ রুশিয়ার মেয়েরা সম্পন্ন করেছে। সামান্য দু-চারটি সংখ্যার গুরুত্ব দ্বারা মেয়েদের কাজের ব্যাপকতা নিরূপণ করা যায়। সমগ্র রাশিয়াতে সর্বসমেত ১৩২,০০০ জন চিকিৎসক আছেন তার অর্দ্ধেকের বেশী নারী। ১৯৪৩ সালে শতকরা আশী জন নারী চিকিৎসক হয়েছেন। ১০০,০০০ এঞ্জিনিয়ার, ও যন্ত্র-শিল্পবিশারদ নিযুক্ত আছেন। সমবায় কৃষি-ক্ষেত্রে ১,৫০০,০০০ নারী ট্রাকটর-চালক আছেন। গত যুদ্ধের চার বছর রুশ নারী পুরুষের সাহায্য ব্যতীত সমগ্র দেশবাসীর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করেছে, যার ফলে এত বড় এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে রাশিয়াতে খাদ্যাভাব ঘটে নি। কোন রকম কায়িক পরিশ্রমে মেয়েরা পশ্চাৎপদ হয় নি।

"In the U.S.S.R. work is obligation and a matter of honour of every able-bodied citizen, in accordance with the principle 'He who does not work, neither shall he eat'."

সোভিয়েট রাষ্ট্রকর্তারা অজস্র নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করে শ্রমিক-মায়েদের রান্নাঘর ও সন্তান-পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ১৯৪০ সালে ৪২,০০,০০০ শিশুর উপযোগী ব্যবস্থা ছিল। সংখ্যাধিক্য দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। 'কর্ম ও মজুরির সমতা'—মূলনীতি অনুসারে রুশ নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবহারগত বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে বহন করে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজ হয়—আদালতে ব্যভিচার প্রমাণের দরকার হয় না—শুধু রাষ্ট্রের তরফ থেকে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কার কতখানি দেয় এবং সন্তান কার তত্ত্বাবধানে থাকবে নির্দ্ধারিত হয়।

পতিতাবৃত্তি যে সোভিয়েটতন্ত্রে নির্মূল হয়েছে তা উল্লেখ করলে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশের রাষ্ট্রধুরন্ধরদের লাল কালির খোঁচায় শহরের অলি-গলি পরিত্যাগ করে সদর রাস্তা বা ভদ্র-পল্লীতে ব্যবসা চালানোর প্রশ্রয় দেওয়া মানে নিরোধ করা নয়। রুশিয়াতে এ হীন পাপ ব্যবসা কেবল মাত্র পুলিস-আইন দ্বারা রদ করা হয় নি, তা কার্যকরী

হয়েছে মেয়েদের জীবনযাত্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক পরিমিত নির্বিঘ্নতায়।

সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে নারীর স্থানও ঘরে-বাইরে, তাদের কার্যকুশলী প্রতিভা 'নাৎসী' ও 'ফ্যাসিজম'বাদীর 'রান্নাঘরে ফিরে যাও' নীতি খর্ব করেছে।

সে দেশে নারীর ভীতা, অবলা রূপ দেখতে পাই না। কল্যাণময়ী, শক্তিরূপিণী নারী স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে বীর পদক্ষেপে দৃঢ় সুষ্ঠু ও সাবলীল ছন্দে মহিমময়ী রূপে অগ্রবর্তিনী হয়ে চলেছে। তা বলে কি নারীসুলভ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহজ স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিষ্পেষিত হয়েছে? বিবাহ, সন্তান, গৃহরচনা, পারিবারিক বন্ধন কোনটিতেই তাদের অনাসক্তির অথবা অপটুতার পরিচয় পাওয়া যায় না। শিক্ষার দীপ্তি, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য, পারিবারিক শান্তি ও দারিদ্র্য-মোচনের ব্যবস্থা না থাকলে এত বড় জাতের অগ্রগতি প্রতিহত হ'ত।

এর জন্য চাই উপযুক্ত ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা ও নূতন আদর্শ। তার সঙ্গে যুক্ত হবে পুরুষ-সম্প্রদায়ের প্রগতিমূলক ঐকান্তিক সহানুভূতি ও মমত্ব বোধ।

নারী সর্বদেশেই এক—রুশিয়ার মেয়ে ও বাংলাদেশের মেয়ের তফাৎ কিছু নেই। সে দেশের মেয়েরা যদি এত উন্নত হতে পারে আমরাও আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি এ দেশের মেয়েরাও তা পারবে।

উপসংহারে গত শতাব্দীর জনৈক প্রসিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক রুশ শিক্ষাবিদের উক্তি উদ্ধৃত করি:

"With what a true, powerful and penetrating mind nature has endowed woman, and this mind remains of no use to society, which spurns it, crushes it, smothers it, although the history of mankind would progress ten times as rapidly if this mind were not spurned and killed but more exercised."

রামানন্দ-প্রশস্তি

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

অসময়ে ডাকিয়াছি আয়োজন করি নাই কিছু,
কুণ্ঠাভরে শির করি নীচু
সজ্জাহীন অর্ঘ্যথালি কম্প্রকরে রয়েছি বাড়ায়ে
আজি তব সমুখে দাঁড়ায়ে,
যে কথা বলিব বলি কল্পনায় সেধেছি প্রয়াস
আজি তা' কহিতে গিয়া অশ্রুরুদ্ধ হ'য়ে আসে ভাষ,
মরমের কথা
সরমে বাহিরি আসে বাক্যহীন আর্ত্ত কাতরতা।

তীব্রস্বরে তব
নিত্য দিন লভিয়াছি রূপ অভিনব।
দাঁড়ায়ে তোমার সমুখে
হাসিতে কাঁদিতে ফেলি ভুলে যাই সমস্ত সঙ্গীত,
নেত্রপথে আবর্ত্তিয়া ছায়াসম গৌরব-অতীত
সুদূরে মিলায়ে যায়, আর্ত্ত হাহাকারে
বর্ত্তমান কাঁদিছে চীৎকারে।

বর্ত্তমান! শুধু বর্ত্তমান!
ময়নামতীর গীতি স্বপনের বাঁশরী সমান
দূর হ'তে পশে কানে; উদাস বাউল
দক্ষিণার মত আসি চিত্ত করি তোলে ভাবাকুল।
ক্ষণিকের তরে
আপনারে বিস্মরিয়া সেদিনের আনন্দের সুরে
মিলাই আপন সুর—মুহূর্ত্তের স্বপন বিলাস!
তারপর ধ্বনি ওঠে কর্ণতটে—রূঢ় পরিহাস
আঁখি মেলি চাহি!
স্তব্ধ মৌন নীরবতা কোন সুর কোন কথা নাহি!
জনহীন পল্লীবাট—রোগজীর্ণ মলিন পাণ্ডুর
কোনমতে ফেলে শ্বাস নরবুথ নিত্য ভয়াতুর,
শস্যহীন প্রান্তরের তীরে
দুর্ভিক্ষ হাসিছে হাহা শতজীর্ণ কুটীরে কুটীরে।

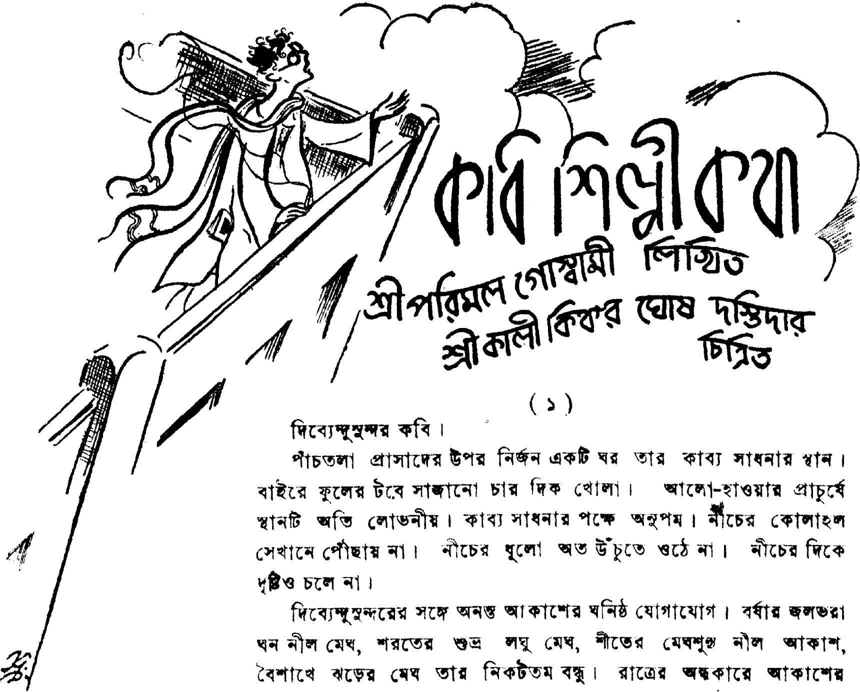
কোন সন্ধ্যা কালে
আঁখি আসে নিমীলিয়া ত্রিস্রোতার তরঙ্গ-কল্লোলে;
গাঢ় যবনিকা টুটি ওঠে ফুটি সারি সারি বীর
করাল গম্ভীর;
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার এলাইয়া দীর্ঘ কেশরাশি
মুখে দৃপ্ত হাসি
বজ্রজ্বালা চোখে জ্বালি দাঁড়াইয়া রাজরাজেন্দ্রাণী
দেবী দেবী রাণী।

পদতলে শির রাখি
বিহ্বল সন্তানসম বার বার 'মা' 'মা' ব'লে ডাকি।
চকিতে স্বপন টুটে কানে পশে কার আর্ত্ত বাণী।
কোথা দেবী রাণী!

তাহারি সাধনপীঠে লালসার বহ্নিজ্বালা জ্বালি
কামুক সে নিত্য আনে দেয় বলি;
আর্ত্তনাদে নিতি কাঁদে ভাগ্যহীন সর্ব্বহারা নারী;
সেথায় উৎসব-গীতি, ক্ষম মোরে, গাহিতে না পারি।
তাই দিনু আনি
আনন্দ-উৎসব মাঝে মোর দুটি অশ্রুলিপ্ত বাণী।
সকলের সাথে
অর্ঘ্য নিবেদিতে গিয়া কুণ্ঠাভরে দাঁড়ায়ে পশ্চাতে
তব করে করি সমর্পণ
বরষের শেষ গানে অন্তরের অশ্রুর তর্পণ।*

৩০শে চৈত্র ১৩৩৬

* পরলোকগত রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের অপ্রকাশিত রচনা। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে কবিতাটি রংপুর সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।



(১)

দিব্যেন্দুসুন্দর কবি।

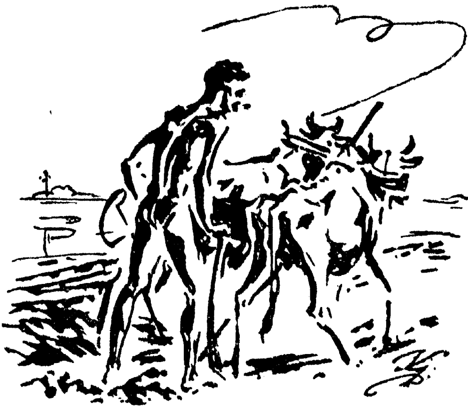
পাঁচতলা প্রাসাদের উপর নির্জন একটি ঘর তার কাব্য সাধনার স্থান। বাইরে ফুলের টবে সাজানো চার দিক খোলা। আলো-হাওয়ার প্রাচুর্যে স্থানটি অতি লোভনীয়। কাব্য সাধনার পক্ষে অনুপম। নীচের কোলাহল সেখানে পৌঁছায় না। নীচের ধুলো অত উঁচুতে ওঠে না। নীচের দিকে দৃষ্টিও চলে না।

দিব্যেন্দুসুন্দরের সঙ্গে অনন্ত আকাশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বর্ষার জলভরা ঘন নীল মেঘ, শরতের শুভ্র লঘু মেঘ, শীতের মেঘশূন্য নীল আকাশ, বৈশাখে ঝড়ের মেঘ তার নিকটতম বন্ধু। রাত্রের অন্ধকারে আকাশের বুকে যখন সহস্র নক্ষত্র-দীপ জ্বলতে থাকে তখন দিব্যেন্দুসুন্দরের কাব্য রচনা চলে মনে মনে। ঘর থেকে সে বাইরে এসে বসে। বিশ্বের রহস্যময় রূপটিকে সে তার চিত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে পেতে চায়, কিন্তু সেই নিঃসীম শূন্যতা তার চিত্তকে ব্যাকুল করে মাত্র, ধরা দেয় না। সে নিজের মধ্যে এক প্রবল অস্থিরতা অনুভব করে, অসীমের ধ্যান থেকে তার মন ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে। অন্ধকারে ধ্যান, আলোয় কাব্য সৃষ্টি।

(২)

শহরের পাষাণ পথ পার হয়ে আরও দূরে, বহু দূরে, পল্লী প্রান্তরের আর একটি দৃশ্য। সেখানে আর এক কবি মাটির শ্যামল বুকে আর এক কাব্য রচনা করছে।

কবি হলধর দাস।



নির্জন মাঠ। মাথার উপরে খোলা আকাশ। কাল-বৈশাখীর উদ্দাম ঝড়ের মেঘ, বর্ষার ঘন বর্ষণ, হেমন্তের হিম তারও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হলধর দাস জমি চাষ করছে। হালের ঘায়ে ঘায়ে বিরাট প্রান্তরের বুকে রচিত হয়ে চলেছে মাটির ছন্দ।

দেহে শক্তি নেই, শুধু আছে সৃষ্টির আনন্দ। দিব্যেন্দুর কাব্য যেখানে স্তব্ধ, হলধরের কাব্য সেখানে প্রাণচঞ্চল। সে কেবলই এগিয়ে চলে। চাষের পরে বীজ বপন, বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছ থেকে ফসল।

মাঠে তার অপূর্ব আনন্দ, গৃহে সে অন্নহীন, নিরানন্দ।

দুর্ভিক্ষ।

মাঠে ধানের বন্যা, ঘরে অন্ন নেই।

নদীর ধারে মহাজনের নৌকো এসে লেগেছে, সারি সারি নৌকো।

ক'দিন পর থেকেই ধান বস্তাবন্দী করার পালা। তার পর তা নিঃশেষ ক'রে তুলে দিতে হবে নৌকো বোঝাই ক'রে।

নৌকোর মাস্তুলগুলো যেন নির্মম নিয়তির নিষ্ঠুরতম ইঙ্গিত।

হলধর জ্বরে অবশ। সমস্ত হাত-পা কাঁপছে। তবু উপায় নেই। বাঁচতে হবে।

নৌকোয় ধান তুলে দিতে পারলে নগদ পয়সা পাওয়া যাবে, যা না হ'লে দিন চলে না।

দিতেই হবে সব ধান ?

এ যে তার নিজের হাতের সৃষ্টি। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তার যে সব আছে এর পিছনে। তার দুঃখের অশ্রু ঝরেছে এর উপর। তার মমতার রং মিশিয়ে আছে এর গায়ে। চাষ

করতে করতে, ফসল কাটতে কাটতে, কত গান সে গেয়েছে আপন মনে। তার সুর জড়িয়ে আছে এর প্রতিটি দানায়।

এরই আশায় সে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে জমি চাষ করেছে, চষা ভুঁইয়ে বীজ ছড়িয়েছে। তার পর হাওয়ায় হাওয়ায় যখন ফলন্ত ধানের শীষ নুয়ে নুয়ে সমস্ত ক্ষেতের উপর তরঙ্গায়িত হয়ে গেছে, তখন সেই তরঙ্গায়িত মাঠখানি কি আনন্দের দোলা দিয়ে গেছে তার মনে, তার সমস্ত সত্তায়, তা আর কেউ জানে না।

আজ সেই সোনার স্বপ্ন তার চোখের জলে বিদায় করতে হ'ল মহাজনী নৌকোয়। নৌকোর বহর পাল ফুলিয়ে ডাকাত-দলের মতো নদীর পথে উধাও হয়ে গেল।

তার পর যথা সময়ে সে ধান থেকে চাল হ'ল।

চাল উঠল শহরের পাঁচ তলায়। সেখানে সে সুগন্ধ বিস্তার করল সুগন্ধ ফুলের মতো। আর তার মোটা মুনাফার মূল নামল শহরের আর এক কেন্দ্রে মাটির নীচের সুরক্ষিত এক কক্ষে।

(৩)

কবি দিব্যেন্দুসুন্দর ধনী। সে যখন নৈশ ভোজন শেষ ক'রে উঠল তখন রাত এগারোটা।

তার কুকুরটিও মনের আনন্দে ভাত মাংস খেয়ে পরম তৃপ্ত হ'ল। দিব্যেন্দুসুন্দর কুকুরকে নিজ হাতে খাওয়ায়।

রাত এগারোটায় দিব্যেন্দুসুন্দর পাঁচ তলার কুটীরকুঞ্জে বসে স্নিগ্ধ বিদ্যুতের আলোয় কাব্য রচনায় মন দিল।

লিখল ভাঙা মেঘে-ঢাকা চাঁদের কবিতা। পৃথিবীর ধুলি-মলিন জীবনের উর্ধ্বে, বহু দূর আকাশের জ্যোৎস্না-প্লাবনের কবিতা। অসীম আকাশের রহস্যের কবিতা। আকাশ-সমুদ্রের বুকে লক্ষ কোটি আলোর দ্বীপপুঞ্জের কবিতা, অন্ধকারের বুকে কালো রেখা টেনে উড়ে-যাওয়া বাদুড়ের কবিতা।

(৪)

বৈকুণ্ঠপ্রসাদ শিল্পী। তার সৃষ্টির জগৎ পৃথক। বাস তার আকাশে নয়, মাটিতে নয়, মাটির নীচে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালপুরীতে, সেইখানে তার শিল্প সাধনা। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তার দখলে। প্রদীপ ঘর্ষণ মাত্র দৈত্যেরা এসে হাজির হয়। হলধরের চালের মুনাফা মাটির নীচে যে মূল বিস্তার করেছে, তারই মূলাধারে বসে আছে এই বৈকুণ্ঠপ্রসাদ।



তার শিল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত স্থূল। ধানের বস্তা আর কাপড়ের গাঁট।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চুপে চুপে নেমে আসে বস্তার পর বস্তা, গাঁটের পর গাঁট। দুদিন পরে আবার উঠে যায় তেমনি চুপে চুপে। এখানে সবই অত্যন্ত জরুরি—এখানে আলস্য নেই, জড়তা নেই, বিশ্রাম নেই। এখানে সবাই কর্মব্যস্ত, সবাই তৎপর। এখানে সবই ইসারা আর ইঙ্গিত। চেঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ, সবাই ফিসফিস কথা বলে। এখানে চাপা হাসি, চাপা কান্না। এখানে বহুজনের সর্বনাশের ভিত্তিতে বৈকুণ্ঠ-প্রসাদের প্রতিষ্ঠা। সে এখানে দেবতা, সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তার শিল্পের উপকরণ একখানি খাতা ও একটি কলম মাত্র। কলমের একটি আঁচড়ে কীটের মতো এক একটি অঙ্ক অতিকায় জীবের মতো চেহারা পায়।

বৈকুণ্ঠপ্রসাদ জাদুকর। তার জাদুদণ্ড-স্পর্শে সিসে সোনায় রূপান্তরিত হয়। এত বড় শিল্পী, এত বড় গুণী, অথচ নিরহঙ্কার। যেন একই ব্যক্তির চেহারায় দুটি বিভিন্ন ব্যক্তি। তার একজন নির্মম, নিষ্ঠুর, অতি প্রবল, অতি দুর্দাম, অতি ক্ষমতাপ্রিয়। তার একটি কথা বৃথা যাবে না, একটি কথা অবহেলিত থাকবে না; একটি আদেশে অধীনস্থ লোকেরা কাঁপবে। স্বর অতি কর্কশ। চোখে আগুন, চেহারায় বীভৎসতা।

এইটি হচ্ছে বৈকুণ্ঠপ্রসাদের শিল্পী মূর্তি। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সে ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক, সে পাতালবাসী দৈত্য।

আর একজন হচ্ছে মুক্ত আলোবাসী। অত্যন্ত দীনহীন, পরনে ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড়, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বগলে পুরনো ভাঙা ছাতা। ব্রাহ্মণের পায়ে সর্বদা নতমস্তক, গৃহদেবতার ভক্ত পূজারী। মুখে মৃদুহাসি, বিনীত মধুর ভাষা, চোখে নববধূর লাজুক দৃষ্টি।

(৫)

রত্নেশ্বরও কবি। তার জগৎ আরও সীমাবদ্ধ। সেও স্রষ্টা, কিন্তু তার বিষয়বস্তু মানুষ—যে মানুষ মাটির কাছাকাছি বাস করে, যাদের সে দেখে পায়ের চলার পথে, যাদের সে দেখে নীচের ধাপে। মানবতার দুঃখে, মানবতার অপমানে সে ক্ষুব্ধ হয়। মানুষের দুঃখে, মানুষের অপমানে সে গভীর বেদনা অনুভব করে। যারা পথের ধুলোয় পড়ে থাকে শীর্ণ কুকুরের পাশে, যাদের মানুষ ব'লে কেউ চিনতে পারে না, যারা নিজেরাই যে মানুষ ছিল ভুলে গেছে, তাদের মানুষের মূর্তিতে সে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তাদের মুখে সে মানুষের ভাষা দেয়, তাদের প্রাণে সে স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে।

পথের মানুষেরা কেউ কবিকে ভালবাসে, কেউ তাকে সন্দেহ করে, কেউ তাকে অবিশ্বাস করে। তারা যে মানুষ সে কথা শুনলে তারাই বিশ্বাস করে না, বলে কবির খেয়াল, যা প্রাণ চায় বলে।

রত্নেশ্বর সত্যই খেয়ালী, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায়। দুঃখী মানুষের হীনতম অস্তিত্বের কথা কি ছন্দে ফুটিয়ে তোলবার জিনিস? এমন অসাধারণ ছন্দ রচনার শক্তি যার, সেই কি না তার শক্তির এমন বৃথা অপচয় করে!

রত্নেশ্বর সে কথা কানে তোলে না।



সে নিপীড়িত মানুষের মনে জীবনের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। রত্নেশ্বর নিজে স্বপ্ন দেখে। এইখানে তার কাব্য সৃষ্টি হয় সার্থক। তারপর সে এই স্বপ্নের বাইরে এসে দাঁড়ায়। সে দাঁড়ায় জীবনের কারখানা-ঘরে। এখানে সে হয় শিল্পী। নিজ হাতে সে নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে লাগে।

রত্নেশ্বর জীবন শিল্পী। মানুষের জীবন খেলা নয়। সে সবাইকে ডাক দিয়ে ফেরে। সে দিব্যেন্দুসুন্দরকে ডেকে বলে, "ওগো কবি এসো নেমে মাটির ধুলায় যে মাটিতে চলছে জীবনের জয়যাত্রা, এসো তার পুরোভাগে। এগিয়ে চল, এগিয়ে নিয়ে যাও।" সে ছুটে যায় বৈকুণ্ঠপ্রসাদের কাছে। বলে, "নিয়ে এসো তোমার দান, যোগ দাও এসে জীবনের শোভা-যাত্রায়।" তারপর দেখা যায় তাকে শস্যক্ষেতে। সেখানে সে হলধরকে বলে, "তোমাকেও যোগ দিতে হবে নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে। সেখানে তোমারই দান সকল দানকে শ্রেষ্ঠ করবে। তোমাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। তোমার সকল ব্যর্থতা দূর ক'রে পরিপূর্ণ আনন্দের শরীক ক'রে নেব।"

হলধর সন্দেহের হাসি হাসে। কিন্তু তার মনে আশা জাগে।

দিব্যেন্দুসুন্দর বিদ্রূপ করে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে এক দিন ওর কথাই মানতে হবে।

বৈকুণ্ঠপ্রসাদ ওকে ভয় দেখায়। কিন্তু জানে ওরই হাতে আছে তার পাতালপুরী ধ্বংসের অস্ত্র।



একাকিনী চলেছিল
অন্ধকার রাতে,
শুষ্ক বিজন পথ
প্রদীপটি হাতে।

তুলীর আঁচড়ে তারে
তাড়াতাড়ি আঁকিলাম তাই।
মনে যাহা আঁকা আছে,
তার সাথে কিছু মেলে নাই।



দু' দুটো এম-এ পাস
অমূল্য গুপ্ত।
কলেজেতে মাষ্টারির
বড় উপযুক্ত।

তা না ক'রে ঝোঁক গেল
ছবি আঁকা শিখতে-
ছবি সে কেমন হ'ল
ভয় হয় লিখতে।

ব্রহ্মবাদিনী ঋষি বাক্

শ্রীরমা চৌধুরী

বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত শৌনক তাঁহার "বৃহদ্দেবতা" নামক ঋগ্বেদ বিষয়ক গ্রন্থে সাতাশ জন ব্রহ্মবাদিনী নারী ঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা, ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষদ্, নিষদ্, জুহু, অগস্ত্যভগিনী, অদিতি, ইন্দ্রাণী ইন্দ্রমাতৃগণ, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদী, যমী, শশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি ও সূর্য্যা। সুবিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়ণও ইঁহাদের নাম করিয়াছেন। কেহ কেহ উপরি-উক্ত নারী ঋষিদের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, উক্ত নামগুলির মধ্যে কয়েকটি পৌরাণিক নাম মাত্র—যথা, অদিতি, ইন্দ্রাণী, উর্বশী, যমী প্রভৃতি। কয়েকটি মানসিক ভাব, বা প্রাকৃতিক বস্তুর নাম মাত্র—যথা, শ্রদ্ধা, মেধা, নদী, রাত্রি প্রভৃতি। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, বৈদিক যুগে সত্যই কতিপয় মহীয়সী, সুকবি নারী ঋষির আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা শৌনক, সায়ণ প্রভৃতি মহামনীষিগণ অকারণে তাঁহাদের "ব্রহ্মবাদিনী ঋষি" নামে অভিহিত করিতেন না।

উপরি-উক্ত নারী ঋষিগণ ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের দ্রষ্ট্রী বা রচয়িত্রী ছিলেন। ইঁহারা নানা বিষয়ে ঋক্ রচনা করেন। যথা, বয়ঃপ্রাপ্তা রাজকুমারী ঘোষা অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট পতি প্রার্থনা করিতেছেন, অদিতি পুত্রের গুণ বর্ণনা করিতেছেন, ইন্দ্রাণী সপত্নীবিনাশের জন্য ওষধিলতা আহরণ করিতেছেন, প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে বাকের সূক্তটিই একমাত্র দর্শনমূলক। বাক্ ছিলেন অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা। তিনি বিশ্বচরাচরকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া সমগ্র জগৎকেই ব্রহ্মরূপে, আত্মরূপে দর্শন করিতেছেন। নারীও যে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া নিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, বাকের সূক্ত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্রহ্মাত্মভাবে অনুপ্রাণিতা হইয়া বাক্ বলিতেছেন (ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, সূক্ত ১২৫):—

"(১) আমি রুদ্রগণের সহিত, বসুগণের সহিত (তাঁহাদের আত্মা রূপে বিচরণ করি); আমি আদিত্যের সহিত এবং বিশ্বদেবগণের সহিত (তাঁহাদের আত্মা রূপে বিচরণ করি)। (ব্রহ্মরূপা) আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি; (ব্রহ্মরূপা) আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে (ধারণ করি); (ব্রহ্মীভূতা) আমি অশ্বিনীদ্বয়কে (ধারণ করি)। (২) আমি পেষণীয় সোমকে ধারণ করি। আমি ত্বষ্টা, পূষণ ও ভগকে (ধারণ করি)। হোমকারী, তর্পণকারী, সোমপেষক যজমানের জন্য আমি (যজ্ঞফল রূপ) ধন ধারণ করি। (৩) আমি (সমগ্র বিশ্বের) ঈশ্বরী, (উপাসকবৃন্দের জন্য) ধনসমূহের সংগ্রাহিকা, (ব্রহ্ম)জ্ঞা, যজ্ঞার্হগণের মধ্যে মুখ্যা। বহুভাবে প্রপঞ্চে আত্মা রূপে অবস্থিতা, বহু (ভূতসমূহে) অনুপ্রবিষ্টা আমাকে দেবগণ বহু দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন। (৪) যে অন্ন ভোজন করে, সে (ভোক্তৃশক্তি রূপা) আমার দ্বারাই তাহা করে; যে দর্শন করে, যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, যে কথিত (বাক্য) শ্রবণ করে (সে আমার দ্বারাই তাহা করে)। যাহারা (অন্তর্য্যামিনী রূপে স্থিতা) আমাকে অবগত নহে, তাহারা হীনতা প্রাপ্ত হয়। হে প্রখ্যাত (সখা!) যাহা শ্রদ্ধাযোগ্য, তাহা শ্রবণ কর। আমি তোমাদের জগতের ব্রহ্মাত্মকতা বলিতেছি। (৫) দেবগণ ও মনুষ্যগণের দ্বারা সেবিত এই (জগতের ব্রহ্মাত্মকতা) আমি স্বয়ং তোমাদের বলিতেছি। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে শক্তিশালী করি, তাহাকে (স্রষ্টা) ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুমেধা করি। (৬) ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, হিংস্র, (ত্রিপুরনিবাসী অসুর) হননের জন্য আমি (ত্রিপুরবিজয় কালে) মহাদেবের ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়াছি। (স্তবকারিগণের রক্ষার্থে) আমি (শত্রু) জনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। আমিই (অন্তর্যামিনী রূপে) স্বর্গমর্ত্ত্যে প্রবিষ্টা হইয়া আছি। (৭) পিতা স্বর্গকে আমি তাঁহার (অর্থাৎ, পরমাত্মার) মস্তকোপরি সৃষ্ট করি। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার উৎপত্তি। অতএব আমি সকল ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া, তাহাদের পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি, এবং দেহ দ্বারা স্বর্গলোক স্পর্শ করি। (৮) সকল ভূতজাত উৎপাদনকারিণী আমি বায়ুর ন্যায় প্রবাহিতা হই। (আমি) আকাশ হইতে, এই পৃথিবী হইতে (শ্রেয়সী)। আমার মহিমা নিরতিশয়।"

ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দুইটি দিক্ আছে—ভাবাত্মক (Positive) এবং অভাবাত্মক (Negative)। ভাবাত্মক দিক্ হইতে, ব্রহ্মজ্ঞানী সমগ্র জগৎকেই ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন; অভাবাত্মক দিক্ হইতে, তাঁহার নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই মিথ্যা মাত্র রূপে প্রতিভাত হয়। প্রথম দিক হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তিনিও স্বয়ং ব্রহ্ম, জীবজগৎও ব্রহ্ম; অতএব তিনি ও বিশ্বচরাচর অভিন্ন। দ্বিতীয় দিক্ হইতে, ব্রহ্মজ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তিনি স্বয়ং মিথ্যা, জীবজগৎও মিথ্যা; অতএব তিনি বিশ্বচরাচরের কিছুই নহেন। এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরবর্তী দর্শনে দুই প্রকারের একতত্ত্ববাদের উদ্ভব হয়—শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। প্রথম মতানুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কারণ জগৎ মিথ্যা; দ্বিতীয় মতানুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কারণ জগৎও ব্রহ্ম, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা একই—অর্থাৎ, কিরূপে বহু হইতে, দুই হইতে, একে উপনীত হওয়া যায়। উভয় মতবাদই 'ব্রহ্ম ও জগৎ' এই দুই তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এক তত্ত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহার দুইটি উপায় আছে—হয় দ্বিতীয় তত্ত্বটিকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করা, নয় উহাকে প্রথম তত্ত্বটির সঙ্গে একীভূত করা; হয় জগৎকে মিথ্যা মায়ামাত্রে পর্য্যবসিত করা, নয় উহাকে ব্রহ্মে পরিণত করা। কেবলাদ্বৈতবাদ প্রথম উপায়, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ দ্বিতীয় উপায়টিকে গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম মতবাদ বিবর্তবাদ, দ্বিতীয় মতবাদ পরিণামবাদ। প্রথম মতবাদানুসারে, যেরূপ সূর্য্য ও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দুই বিভিন্ন তত্ত্ব নহে, কিন্তু সূর্য্যই একমাত্র তত্ত্ব; যেরূপ রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে রজ্জু ও সর্প দুই ভিন্ন বস্তু নহে, কিন্তু রজ্জুই একমাত্র সত্য, কারণ সর্প মিথ্যা প্রতীতি মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগৎ দুই বিভিন্ন তত্ত্ব নহে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কারণ জগৎ আপাতদৃষ্ট মিথ্যা

মরীচিকা মাত্র। এক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানীর উপলব্ধি অভাবাত্মক—"নেতি নেতি"—আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুই নহি। দ্বিতীয় মতবাদানুসারে, যেরূপ মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় ঘট দুই বিভিন্ন তত্ত্ব নহে, কিন্তু মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, কারণ মৃন্ময় ঘটও মৃত্তিকা মাত্র, মৃত্তিকা ব্যতিরিক্ত অপর কোনো দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে; যেরূপ কুণ্ডলীকৃত সর্প ও প্রসারিত সর্প দুই ভিন্ন বস্তু নহে, কিন্তু সর্পই একমাত্র বস্তু, কারণ কুণ্ডল ও প্রসার একই সর্পের দুই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র, সেরূপ ব্রহ্ম ও জগৎও দুই বিভিন্ন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মই একমেবাদ্বিতীয়ম্, কারণ জগৎও ব্রহ্মই, ব্রহ্মের পরিণাম বা অভিব্যক্তি, ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন,—ব্রহ্মাতিরিক্ত, ব্রহ্মভিন্ন, অপর কোন দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে। এই ক্ষেত্রে, ব্রহ্মজ্ঞানীর উপলব্ধি ভাবাত্মক—আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই।*

ব্রহ্মজ্ঞা বাকের ব্রহ্মজ্ঞানও ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। তাঁহার নিকট জগৎ মিথ্যা, মায়া, মরীচিকা নহে; কিন্তু ব্রহ্মের পরিণাম বা কার্যরূপে ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মস্বরূপ। সেইজন্য তাঁহার এরূপ উপলব্ধি হয় নাই যে, তিনি (ব্রহ্ম) কিছুই নহেন, দ্রষ্টা, শ্রোতা, ভোক্তা, জীবজগৎ, কিছুই নহেন। উপরন্তু তাঁহার এইরূপই উপলব্ধি হইয়াছিল যে, তিনি (ব্রহ্ম) সকলই; রুদ্রাদি দেবগণ, দ্রষ্টা, শ্রোতা, ভোক্তা জীবগণ, ভূতসমূহ সকলই তিনিই; তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ; তিনিই সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বরী, সকল জীবের অন্তর্যামিনী, সমগ্র জগতে অনুপ্রবিষ্টা। কিন্তু জগৎ ওতপ্রোত ভাবে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও, জগতেই ব্রহ্মের শেষ নহে, তিনি জগতের বাহিরেও সমভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ, ব্রহ্ম কেবল জগল্লীন নহেন, জগদতিরিক্তও। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মই, কিন্তু সমগ্র ব্রহ্ম বিশ্ব নহেন, কারণ অনন্ত, অসীম, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র জগতে সম্ভবপর নহে। সুতরাং অনন্ত অসীম ব্রহ্ম ক্ষুদ্র, সসীম জগৎকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও জগতের বহির্ভূত। ব্রহ্মজ্ঞা বাক্‌ও এই গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বলিয়াছেন যে, তিনি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্তা হইয়াও আকাশ হইতে, পৃথিবী হইতে, সকল জীবজগৎ হইতে শ্রেষ্ঠা।

এইরূপে, বাকের নিগূঢ়া অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকৃত স্বরূপটি পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সেইজন্য তিনি জগৎকে মায়া-মরীচিকা বলিয়া তুচ্ছ করেন নাই, অজ্ঞানকলুষিত বা দোষদুষ্ট বলিয়া ঘৃণাও করেন নাই, হেয় বলিয়া জগতের প্রতি বিমুখও হন নাই। উপরন্তু এই ক্ষুদ্র ধরণীর ধূলিতেই তিনি নিষ্কল, নিরঞ্জন, মহান্ পুরুষকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এই মরজগতেই তিনি অমৃতের পূর্ণ প্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন; সীমার ভিতরই তিনি অসীমকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানব জাতির সেই সুবর্ণ প্রভাতে ব্রহ্মবাদিনী ঋষি বাক্ যে জ্ঞানরশ্মি বিকিরিত করিয়াছিলেন, তাহারই আলোক ভারতীয় নারীকে যুগে যুগে তমসাবৃত সংসার-মরুতে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সেই উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্ত্তী যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, উভয়ভারতী, খনা, লীলাবতী, মীরাবাঈ প্রমুখ মহীয়সী নারীগণ, শুধু ভারতের নহে, জগতের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। জাতির চরম দুর্গতির দিনেও ভারতে ধর্ম্মকুশলা নারী ঋষি ও সাধকের অভাব হয় নাই।

* অবশ্য বল্লভের নিজের মত এই বিষয়ে বিরোধদোষ-দুষ্ট। কারণ, তাঁহার মতে, দর্শনের দিক হইতে ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ কুণ্ডলীকৃত সর্প ও প্রসারিত সর্পের ন্যায় অভিন্ন হইলেও, ধর্ম্মের দিক হইতে জীব সর্ব্বদাই ব্রহ্মের ভক্ত ও দাস, অর্থাৎ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। মুক্ত জীবও নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন রূপেই উপলব্ধি করেন—গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে সেবা করাই মুক্তি।



গাল-ভাঙ্গা পিলে রুগী
একবড়ি কল্‌সে
ভুগেছিল বহুদিন
মরে নিক' তবু যে।

ঘর বেচে—থালি বেচে
প্রাণখানি বাঁচিয়ে
কাটায় সে গান গেয়ে
একতারা বাজিয়ে।

—শ্রীসুধীর খাস্তগীর

আমাদের ইংরেজী শিক্ষা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, এই পাঠ্য ছাত্রদের পক্ষে দুর্বিষহ হইয়াছে। আমি ইংরেজী শিক্ষা লইয়া কয়েকটি কথার আলোচনা করিতে চাই কারণ ছাত্র পড়াইয়া ও তাহাদের লেখাপড়া দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, ইংরেজী জ্ঞান ছাত্রদের ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে ও ভুল ক্রমে ক্রমে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। ভুল যদি দুই-একটি ক্ষেত্রে দেখিতাম তাহা হইলে বলা চলিত ইহা আকস্মিক কিন্তু ভুলগুলি ক্রমশই কায়েমী হইয়া উঠিতেছে।

কয়েকটি ভুলের উদাহরণ দিতেছি—এই বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন vanilla কথাটির এই বানান দিয়াছে: vinalla, vallina, vanila, velina, vanela, vianila। Literary কথাটির পরিবর্তে এই কথাগুলি পাইয়াছি literatural, literatutial, literal, lituratic, litural। Apostrophe-র অপব্যবহার he say's. Participle-এর অপপ্রয়োগ losting। ভবিষ্যৎ ও অতীতের জগাখিচুড়ি will satisfied; অনুরূপ ভুল could ruined, was died (অতি প্রচলিত)। Preposition-এর অপপ্রয়োগ behird of a bar, round of us। would-এর ভুল প্রয়োগ—would turned. Possesive-এর ভুল your's। ইহা ছাড়া tense-এর গণ্ডগোল মারাত্মক রকমের আছে। ভাষাজ্ঞানের নমুনা—বেড়াল ছানাটি কাল মারা গিয়াছে—The calf of the cat has died yesterday. ইংরেজীর নমুনা—Maney dead body were cat fox and dog Kali Prasanna was able to famous his life Huge quantity of man was died. The beasts were eaten the men. Parents ate rice except their children.

এই বিদ্যা অর্জন করিতে হয় দশ-এগার বৎসরের পরিশ্রমে ও যথেষ্ট কাঞ্চনমূল্য দিয়া। যে-দেশে এই বিদ্যালাভ হয় সে-দেশ, সেদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার বন্দোবস্ত, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই ধিক্। এ শিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার বিশেষ পার্থক্য নাই। সমস্ত খাতায় একটি নির্ভুল বাক্য লিখিতে পারে না এমন ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে আসে কেন, তাহাকে আসিতে দেওয়া হয় কেন? উত্তরে বলিবেন—না দিলে স্কুল উঠিয়া যাইবে, শিক্ষক খাইতে পাইবেন না। যেখানে শিক্ষার নামে অপশিক্ষার চেষ্টা চলে সে স্কুল উঠিয়া যাওয়াই ভাল; মাষ্টার মহাশয়েরা স্কুলে চাকরি ছাড়িয়া অন্যত্র রোজগারের পথ দেখুন।

২

ইংরেজী শিক্ষা এ যুগের দ্বিজত্ব প্রাপ্তির উপায় একথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন। যাহা না শিখিলে উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ তাহা ভাল করিয়াই শেখা ভাল। সুতরাং দেখা উচিত ইংরেজী শিক্ষার এমন অধোগতি কেন হইল।

যাঁহারা এদেশের গত দশ বৎসরের শিক্ষাব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই দশ বৎসরের মধ্যে এই অধোগতি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের পর হইতেই এই অধোগতি বেশ প্রকট হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় ২৫০ নম্বর করার কোনই প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি বই বাড়ান হইয়াছে; ছেলেরা শেষ করিতে শিক্ষকদের মতই দিশাহারা। স্বাধীন রচনার নম্বর কমাইয়া পুস্তক হইতে প্রশ্নের উপর নম্বর বেশী দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ৭৫ নম্বর দেওয়া হয় স্বাধীন রচনায় ও বাকি ১৭৫ নম্বর দেওয়া হয় পুস্তক হইতে। ইহার ফলও হইয়াছে অনুরূপ—ছেলেরা বই ছাড়িয়া নোট ধরিয়াছে ও মুখস্থ করিয়া পরীক্ষাসাগর পার হইতে চাহিতেছে। ইহার ফলে তাহাদের লিখিবার ও ভাবিবার ক্ষমতা কমিয়াছে। কলেজে আসিয়া তাহারা প্রবন্ধ রচনায় মোটেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না—আপনা হইতে তাহারা ভাবিতে পারে না; সত্য বলিতে কি, তাহারা ভাবিতে ভয় পায়।

দ্বিতীয় কারণ নোট ব্যবহারের আধিক্য; স্কুলে পড়াশুনা এমন ভাবে চলিতেছে যে বাড়ীতে মাষ্টার না রাখিলে চলে না। পাঠ্যপুস্তকও অসংখ্য; সুতরাং ছেলেরা ও মাষ্টার মহাশয়েরা নোট পড়ার পক্ষপাতী। নোট পড়া সাহায্য লাভের জন্য ভাল কিন্তু তাহা হইতে দাগ দিয়া মুখস্থ করা ও পরীক্ষার হলে তাহা উদ্গীরণ করা ভাল নয়। তাহাতে ছেলেদের লেখার শক্তি কমে, চিন্তাশক্তি কমে, গুছাইয়া ভাবিয়া লেখার শক্তি চলিয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, স্কুলের মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে সকলকার পড়াইবার যোগ্যতা নাই বা তাঁহারা মন দিয়া ছেলেদের পড়ান না। ইংরেজীতে অভিজ্ঞ শিক্ষক খুব কম; নীচের ক্লাসে অর্দ্ধশিক্ষিত মাষ্টার মহাশয় ছেলেদের মনে ইংরেজী শিক্ষাকে নীরস ও ভ্রমপূর্ণ করিয়া তুলেন। ভাষা-জ্ঞান যেমন তাঁহাদের অল্প, উচ্চারণ-রীতিও তেমনই দোষাবহ। অবশ্য উচ্চারণ-ভঙ্গী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই সমান না হউক কম-বেশি ত্রুটিপূর্ণ ও এইরূপ হইতে বাধ্য যদি না ইংরেজ শিক্ষক ইংরেজী শিক্ষার ভার লন।

'Speech training' বা 'oral drill' রীতিমত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক যদি শিক্ষিত ও উৎসাহী হন তবে direct method-এ পড়াইলে সমস্ত ছেলেই শিখিতে, বা লিখিতে ও পড়িতে পারিবে। ইংরেজী ক্লাসে বাংলা বলাটা দোষের। Class VI বা Class VII হইতে একেবারে ইংরেজী ব্যবহার করিতে হইবে ও প্রত্যেক ছাত্রকে সম্ভব হইলে প্রত্যহ পড়িতে ও ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে বাধ্য করিতে হইবে। যদি Class V হইতে ইংরেজী কথাবার্ত্তার দিকে ঝোঁক দেওয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত ছাত্রই কথাবার্ত্তায় দক্ষতা দেখাইবে অন্ততঃ Class VII হইতে। ইহার জন্য পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা কমান

দরকার, মাঝে মাঝে পাঠের পুনরাবৃত্তি হওয়া দরকার ও পাঠের অগ্রগতি অপেক্ষা ছাত্রদের উন্নতি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের লক্ষ্য থাকা দরকার।

ইহার জন্য রীতিমত শিক্ষিত (trained) শিক্ষক পাওয়া চাই। আমার মতে গবর্মেণ্টের উচিত ইংরেজ শিক্ষক কিছু আনয়ন করা। ইংরেজী যাহাদের ভাষা তাঁহারা সে ভাষা ভাল বুঝেন; তাঁহাদের কাছে যাহারা শিখিতে পায় তাহারা ভালই শিখিবে বলিয়া মনে হয়। আর trained শিক্ষক পাইতে হইলে ভাল মাহিনা দেওয়া প্রয়োজন যাহা দারিদ্র্যের ওজুহাতে আমরা দিতে চাহি না। কিন্তু ভাল শিক্ষা দিতে গেলে উপযুক্ত অর্থব্যয় করিতে হয় এ কথা জানা প্রয়োজন।

৩

চন্দননগরে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফরাসী শিক্ষার যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা ভাষা-শিক্ষার আদর্শ রূপে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ফরাসী ক্লাসে ছয় বৎসর ফরাসী শিখিয়া ছাত্রেরা চমৎকার ফরাসী লিখিতে পড়িতে ও কহিতে পারে। সে তুলনায় ইংরেজী ক্লাসের ছাত্রেরা দশ হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত ইংরেজী শিখিয়া তেমন পারদর্শী হইতে পারে না। ইহার কারণ ফরাসী শিক্ষা-বিভাগ প্রতিদিনকার প্রতি পাঠটি পূর্ব্ব হইতে ছকিয়া দেন, শিক্ষক বা স্কুল-কমিটির খেয়ালের স্থান ইহাতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম হইতে direct method অনুযায়ী পড়ান হয়; শিক্ষকগণ প্রথম হইতেই ফরাসীতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন ও ছেলেদের ফরাসীতে মুখ খুলিতে শেখান; উচ্চ শ্রেণীতে elocution বা বক্তৃতার ক্লাস আছে। পাঠ্যপুস্তক ও পড়াইবার ধরণ এমন যে ছাত্রেরা লেখাপড়া ও কথাবার্ত্তা বলা সকলই একসঙ্গে শিখিতে পায়; নিয়মমত পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি হয়। সমস্ত ক্লাসেই ফরাসী ভাষার সাহায্যে পঠনপাঠন চলে। তাহার ফলে তিন বছর যাইতে না যাইতে ছাত্রেরা বেশ ফরাসী বলিতে ও পড়িতে শেখে। বস্তুত direct method-এর সুষ্ঠু প্রচলনে এই ফরাসী ভাষা শিক্ষা চমৎকার হইয়া উঠে। তবে ফরাসী ভিন্ন অন্য ভাষায় এখানকার ছাত্রেরা পারদর্শী হইতে পারে না।

৪

ইংরেজী ভাষা ভাল করিয়া শিখাইতে গেলে প্রয়োজন প্রথম সহজ একটি পাঠ্যতালিকা, আধুনিক তালিকা হইতে কিছু কাটছাঁট করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত একটি শিক্ষার প্ল্যান ছকিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেই প্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষকগণ আপনা হইতে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাঁহাদের বিশেষ পরিশ্রম না করিলেও চলিবে। তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের উচিত শিক্ষিত ইংরেজ শিক্ষক কিছু নিয়োগ করা, ও যতদূর সম্ভব ইংরেজী ভাষার শিক্ষকদের তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইবে। চতুর্থতঃ, ইংরেজী শিক্ষকগণ বিশেষ ভাবে শিক্ষা না পাইলে যাহাতে স্কুলে পড়াইবার অধিকার না পান সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন ইংরেজী শিক্ষায় direct method এর প্রবর্ত্তন। যদি এই প্রথা চালান যায় তাহা হইলে ছাত্রদের দশ বৎসর ইংরাজী পড়িয়া ম্যাট্রিক পাসের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে না; পাঁচ বা ছয় বৎসর অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে পড়িলে তাহারা সে যোগ্যতা লাভ করিবে। মনে হয় Class V হইতে ইহারা ইংরেজী পড়া আরম্ভ করিলেও ক্ষতি হইবে না। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বাংলা লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে ভালই হইবে। আর শেষ কথা কলেজে ছাত্রেরা সাত চড়ে ইংরেজীর রা বাহির করিতে চাহে না; প্রথায় লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের মুখ খুলিবে। বক্তৃতা-শক্তির দিক দিয়া বাংলার ছাত্র ও শিক্ষকগণ অন্য প্রদেশের ছাত্র ও শিক্ষকগণ অপেক্ষা পিছাইয়া আছেন। আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব—বর্ত্তমান ম্যাট্রিকের পাঠ্যতালিকা লঘু করিতেই হইবে ও ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা এবং রচনার জন্য অবকাশ দিতেই হইবে। তাহা না হইলে বাংলাদেশের ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বিকাশসাধন হইবে না।

শেষ খেয়ায়

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

মাঝ জীবনে এসেই যেন পৌঁছে গেছি শেষ খেয়ায়,
চুকিয়ে দিলাম আজকে আমি যা-কিছু সব দেয়া-নেয়ায়।
নেবার যা তা সব নিয়েছি, দিলাম যাহা ছিল দেবার,
ক্লান্ত আমি আর পারি না, আর পারি না বইতে এ ভার।
বোবায় আমার বোঝাই করা কান্না এবং দুঃখ রাশি,
শূন্য আকাশ কইছে কথা, ডাকছে যেন 'আয় উদাসী'।
জীবনভোরই পেলাম শুধু ব্যর্থতা আর বিড়ম্বনা,
শ্রান্ত দেহ অবশ আজি মম হয়েছে আনমনা।

ভাল তো কই বাসল না কেউ, করলে নাকো একটু স্নেহ,
নিজের ব'লে আপন ক'রে ডাকলে না তো আজকে কেহ?
কুঁড়ি হ'য়ে ফুটেছিলাম এই গাছেতে হয়ত কবে,
পূর্ণ হ'য়ে ফোটার আগে অকালে আজ ঝরতে হবে?
অনাদৃত রয়েই গেলাম, রয়ে গেলাম অন্তরালে,
মৌমাছি কই এলো না তো মধুর লোভে গাছের ডালে?
অনেক আশাই করেছিলাম রঙীন নেশা জীবন ভরে,
দেখছি এখন মিথ্যে সবই প্রাসাদ গড়া বালুর চরে।
ছেড়েছি সব, মুক্ত আমি এখন আমার দিন কাটে,
জীবন-নদী-পারাপারের শেষ সীমানায় খেয়াঘাটে।

"আমার সোনার বাংলা"

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

অনেক কিছু নিয়ে বাংলা একদিন ভারতবর্ষের মধ্যে, এমন কি ভারতের বাইরেও, গর্ব্ব করতে পারত। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তার আজ আর সে দিন নেই। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ কারণ অনুসন্ধান করার সময় এটা নয় এবং তাতে বিশেষ ফলও কিছু নেই, কারণ কালের গতিতে জাতির এমন একটা উত্থান-পতন খুব অস্বাভাবিক নয়। তবে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা আঘাত খেয়েছে নানাদিক থেকে; তার একটা প্রধান কারণ ভারতে প্রদেশ বিভাগ হওয়ার গোড়ার দিকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম একসঙ্গে থাকার ফলে একটা ব্যাপক কৃষ্টির সুবিধা হয়েছিল বাঙালীর। তখন চারটে প্রদেশের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাঙালী তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করবার সুযোগ পেয়েছিল। তাছাড়া প্রথম দফায় ইংরেজের শিক্ষা-সভ্যতা এবং কর্ম্মতৎপরতার সংস্পর্শে এসে নিজেকে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে সারা উত্তর-ভারতে নানা স্থানে গিয়ে সম্মান অর্জ্জন করতে বঙ্গ-সন্তানরা সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাকে ভাগ করে ফেলা হ'ল, এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত। দুঃখ করবার কিছুই নেই, কারণ অন্য সব প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ—যারা মনে করছিল বাঙালীর কৃষ্টির সহিত সংযুক্ত হয়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা বসে থেকে তাদের আত্ম-প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চাইলে, আপত্তি করবার কথা নয়। কিন্তু বাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাঙালীর দেশপ্রেমিকতা এবং তার ব্যাপক প্রভাব ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা সহ্য করতে না পেরে বাংলার যে সকল প্রান্তিক অঞ্চলে বাংলাভাষী লোক বাস করে, যে-সকল স্থান বাঙালীর চেষ্টায় পরিচিতি লাভ করেছে তাদের পৃথক করে অন্য প্রদেশের সঙ্গে যোগ করে দিলে। এমনিভাবে মেদিনীপুর থেকে ময়ুরভঞ্জ, সিংহভুম; বর্দ্ধমান থেকে মানভুম; মুর্শিদাবাদ, বীরভুম থেকে সাঁওতাল পরগণা; মালদহ দিনাজপুর থেকে পূর্ণিয়া জেলা সৃষ্টি হয়েছে। ময়ুরভঞ্জ, সিংভুম, মানভুম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার এবং আরও দূরের অঞ্চলসমূহের অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙালী অর্থাৎ বাংলা ভাষা বলে এবং বাঙালীর আচার-ব্যবহার শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। ধলভুম, মানভুমের প্রধান অংশ। জাম-তাড়া, দুমকা, পাকুড়, রাজমহল ও কিষণগঞ্জে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর বাস। বঙ্গভাষা শিক্ষাদান-প্রচার সম্পর্কে ধলভুমের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে 'সংহতি' সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর সঙ্গে সদরে ও মফস্বলে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তাতে বলতে পারি, এর প্রায় সমস্ত অঞ্চলই বাংলার অঙ্গ। কিন্তু "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" আন্দোলনে আমরা সজাগ ছিলাম বলে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত হবার উপক্রম হয়েও হতে পারে নি, আর বর্ত্তমান ব্যাপারে আমরা চুপ করে থেকে আমাদের প্রদেশের প্রভূত সমৃদ্ধ অংশকে কেটে নিয়ে উড়িষ্যা ও বিহারের অন্তর্ভুক্ত করতে দিয়েছি।

বিহার এবং কতক পরিমাণে উড়িষ্যা আমাদের সঙ্গে কিরূপ ভদ্র ব্যবহার করেছে সে পরিচয় কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের আমলে আমরা কতকটা পেয়েছি। বাংলায়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙালীর প্রতি কি মনোভাব পোষণ করেন তার নমুনাও পাওয়া গেছে।

সারা ভারতের যে মহাপাপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, তা বাংলায় যত পরিস্ফুট, তত আর কোথাও নয়। অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যুঝতে হবে। মুসলিম লীগ তার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে কি করতে পারে, তার নমুনা আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরে পেয়েছি, রোলাণ্ড্স্ কমিটিও তাঁদের মতামত দিয়েছে, তাদের সঙ্গে সাম দান আর ভেদ নিয়েই চলেছে, দণ্ড দেবার ক্ষমতার বাইরে। তারপরে আছে বিদেশী শাসন, যার এক একটি ইঙ্গিতে বাঙালী জাতি বিপর্য্যস্ত, যার নির্য্যাতনে কারাগারের মধ্যে কত দেশভক্ত দেহত্যাগ করেছে, কত জন বন্দী থাকায় কত সংসার মরুভূমি হয়ে গেছে। এই সকল সম্মিলিত কারণে বাঙালী আজ নানা অসুবিধা ভোগ করছে।

বাংলার সম্পদ অন্য দেশ থেকে কম নয়; শিল্পেও বাংলা অন্য প্রদেশ থেকে অগ্রণী। বাংলার পাট জগতের এক মহা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, বহু দেশ পাট জন্মাবার জন্যে বহু যত্ন বহু আয়াস স্বীকার করেছে, কিন্তু উৎপন্ন করতে পারে নি। ভারতবর্ষে ১২'৫ কোটি গাঁট পাট উৎপাদন হতে পারে; তাকে আইন দ্বারা হ্রাস করে ৫৩ লক্ষ গাঁটে দাঁড় করান হয়েছে। বাংলা একা এর শতকরা ৮৬ থেকে ৯০ ভাগ উৎপাদন করে। ভারতবর্ষে ১০৬টি পাটকলের মধ্যে বাংলায় আছে সাতানব্বইটি; তিন লক্ষ মজুরের মধ্যে ২,৮২,০০০ জন বাংলায়। এই সাতানব্বইটা কলের মধ্যে অন্ততঃ নব্বইটার মালিক বিদেশী এবং তাদের বৃহদাকারের এক একটা কল হয়ত বাঙালীর দুই বা তিনটা কলের সঙ্গে সমান। মজুরের মধ্যে বিরাশি হাজার মাত্র বাঙালী, বাকী ভিন্ন প্রদেশীয় লোক। পাট উৎপাদনে পল্লী-অঞ্চলে আড়তজাত করা পর্য্যন্ত বাঙালীর আয়, অর্থাৎ পাঁচ ভাগের দু ভাগ মাত্র বাঙালীর, বাকী সব অবাঙালীর।

ভারতবর্ষে কাপড় যত উৎপন্ন হয়, তার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাঙালী ব্যবহার করে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্য করে বোম্বাই, আহম্মদাবাদে মিল গড়ে উঠল, বাঙালী ক্রেতা মাত্র। মোট ৩৯৬টা মিলের মধ্যে বাংলায় তেত্রিশটা, তার মধ্যে গোটা ছয় সাত বাঙালীর, বাকী অবাঙালীর। অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জন লোক বাঙালী হলেও শতকরা ১'৬টি মিল মাত্র বাঙালীর আয়ের পথ করে দিয়েছে।

চিনির কল আছে ১৬৬, তন্মধ্যে মাত্র এগারটি বাংলা-দেশে, এর তিনটিও বাঙালীর নয়; এবং এই তিনটির ভেতর আবার অবাঙালীর প্রচুর টাকা ন্যস্ত আছে আর বৎসরে যতটা সময় কল চলা উচিত আকের অভাবে তাও চলে না।

তুলা ও আকের চাষে বাংলাদেশ অনেকটা পশ্চাৎপদ কিন্তু ভাল করে চেষ্টা করলে দুইই প্রয়োজনমত উৎপাদন করা যেতে পারে। সেই চেষ্টার অভাব বাঙালীকে বিব্রত করেছে।

চাউল উৎপাদনে বাংলার স্থান প্রথম, ভারতের শতকরা ৩৭ ভাগ; মাদ্রাজ মাত্র ১৭। বাঙালীর খোরাকের উপযুক্ত চাল বাংলায় হয় না, এই বিষয় গত দুর্ভিক্ষে পরিস্ফুট হয়েছে। ব্রহ্মের চাল বাংলায় আসত প্রচুর পরিমাণে কিন্তু বাংলায় একটাও ষ্টার্চ ফ্যাক্টরী হ'ল না।

বাংলা ভারতবর্ষের মোট পরিমাণের সিকি চা উৎপাদন করে এবং তার দ্বারা নগদ বিক্রীতে বিদেশ থেকে যে পরিমাণ টাকা আমদানি হয় তার স্থান পাটের পরেই! কিন্তু এর সিকি ভাগও বাঙালীর নয়, অবাঙালী সব কারবারের মালিক, ম্যানেজিং এজেন্টস্ ইত্যাদি। ১৯৪০-৪১ সালে ৪২ কোটি পাউণ্ড চা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশে তামাক জন্মায় সবচেয়ে বেশী; মাদ্রাজেও প্রায় বাংলার কাছাকাছি অর্থাৎ মোট পাঁচ লক্ষ টনের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ২৫.৪ ও ২৪.৪ ভাগ। কেবল যে বাইরে রপ্তানি হয় আর অবাঙালী বণিকের ধনবৃদ্ধি হয়, তাই নয়, দেশের মধ্যে অনেকগুলি সিগারেট বিড়ির কারখানা হয়েছে বাঙালী এতে কোনও উদ্যম দেখায় নি।

শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী খুব তৎপরতা দেখাতে পারে নি, তার কারণ আবার অন্য রকম। কিন্তু শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বাঙালীকে নূতন প্রেরণা দিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন; তার পর অভ্যাসমত আর দাঁড়াতে পারে নি। অন্য প্রদেশের লোকেরা সে প্রেরণা নিয়ে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে অনেক শিল্প গঠন করেছে।

কিন্তু কোন কোন দিক দিয়ে বাংলার অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। সারা ভারতের যৌথ কারবারের মোট মূলধনের ৪০ ভাগ বাংলায় খাটছে। দিয়াশলাই, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, সাবান ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে বাংলার স্থান খুব উঁচুতে।

কেবল বৈদ্যুতিক শক্তি নয়, তাপ-শক্তিতে বাংলা অন্য প্রদেশ থেকে অনেক অগ্রগামী এবং সাগরগামী জাহাজ চলাচলের উপযোগী নদীর ওপর ভারতের এককালীন প্রধান নগরী অবস্থিত হওয়ায় বাংলায় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিহারের যে অংশে বেশীর ভাগ কয়লা উৎপন্ন হয়, যেখানে বড় লোহার কারখানা দাঁড়িয়ে, নিরপেক্ষ লোকে বলবে সেটা বাংলাদেশ। যাই হোক, এখনও বাংলা কয়লা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বিহারে দেড় কোটি টনের পর, বাংলার ৭৮ লক্ষ টনই প্রধান।

বাংলার শিক্ষা-কেন্দ্র, বাংলার শিল্প পরিচালনে তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি, বাংলার বাজার, বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশের সুযোগ-সুবিধা বহু অবাঙালীকে স্থান দিয়েছে, যারা নিজ চেষ্টায় শিল্প প্রভৃতির দ্বারা বাংলায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। বাংলার শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে যাঁরা স্ব-প্রদেশে গিয়ে যশস্বী হয়েছেন, তাঁদেরও কিছু বলবার আমাদের নেই। কিন্তু ক্ষোভ আমাদের সেইখানে যেখানে বাংলার সর্ব্বনাশ করেছে বিদেশী শাসকবর্গ। বাংলার স্বার্থহানি করছে বাঙালী মুসলমানের সাহায্য নিয়ে অবাঙালী মুসলমান, বাংলাকে হীন প্রতিপন্ন করছে অ-বাঙালী ভারতবাসী। বাঙালীর মজ্জাগত দুর্ব্বলতার সুবিধা নিয়ে বাংলার শোষণ-কার্য্য চলছে অব্যাহত গতিতে; বাঙালীর ধ্বংসের পথ ক্রমেই বেশী করে উন্মুক্ত হয়ে উঠছে। সোনার বাংলা বাঙালীর কাছে শ্মশানে পরিণত হচ্ছে।

স্মৃতির রঙ

শ্রীকরুণাময় বসু

গোধূলির রাঙা রঙ আঁকে কে যে তুলিতে,
স্মরণের ছবিগুলি পারি নাই ভুলিতে;
নয়নের নীলিমায় জেগেছিল যে ছবি,
জলভরা মেঘ এসে মুছে দিল সে সবি।

বেণীতে গুঁজিতে ফুল, কখনো বা খোঁপাটি,
অধরে মধুর হাসি হ'ত কি যে শোভাটি।
হাত ধরাধরি করে চলে গেছি সুদূরে,
উপলের উপকূলে বসে গাই বেসুরে।

চাঁদের নিদালি চোখে কুয়াশায় আসে ঘুম,
স্মৃতির মালিকা গাঁথি' ছিঁড়ে ফেলি সে কুসুম
মনের ঘুমানো নদী রাতে দোলে জোয়ারে,
এপারের ফুলগুলি ভেসে গেল ওপারে।

লালমেঘ নীল মেঘ ময়ূরের পালকে
এঁকেছিল রামধনু স্বপনের আলোকে;
সেদিনের ছবি, গান মুছে গেল কি রঙে,
হঠাৎ যে বেজে ওঠে স্মৃতি-জলতরঙে।

জোয়ার-ভাটা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ট্রেনের কামরার আলাপকে বৃষ্টির জলে বুদ্‌বুদ্‌-সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা চলে—আবার সাবানের ফেনার কথাও মনে জাগে, কিন্তু হরিসুন্দরী বলেন: ওসব কথার কথা। 'মানুষের কুটুম এলে গেলে—আর গরুর কুটুম চাট্‌লে-চুট্‌লে'—এই হ'লো গিয়ে সত্যি কথা। নইলে ওরাই বা কে—আর আমরাই বা কে! এক দেশে বাড়ি নয়—এক জাত নয়—কথা বলার ছিরি-ছাঁদই কি এক রকম! ওরা বলে—'থোও', আমরা বলি—রাখ ওখানে। আমাদের 'শেল', 'দেল', 'গোল' ওদের কাছে—'শেয়াল'—'দেয়াল'—'গোয়াল'। যা নিয়ে দিন-রাত্তির মানুষ বেঁচে আছে—যার অভাবে সংসার অচল সেই—'ট্যাকাকে' ওরা বলে কিনা 'টাকা'! তবু ওদের সঙ্গে ভাব জমে গেল এমন যা অতি বড় আপ্তজনের সঙ্গে জমে না। হাসচো তোমরা? শোন তবে।

ও-বাড়ির পিসিমা বলেন, উনুনে ঝোল চাপিয়ে ছুটে এনু একটা কাঁচকলার জন্যে। হরির আবার আম্বলের ব্যারামে শরীল পাত হয়ে গেল ভাই। কাল খুঁটিয়ে বাজার করেছে—গাঁদাল পাতা পর্য্যন্ত—আনেনি শুধু কাঁচকলা। অথচ কোব্‌রেজের ওষুদে পথ্যির ব্যবস্থা—

হরিসুন্দরী বলেন, এ তো আপনা-আপনির মধ্যে, নেবে তাতে লজ্জা কি ভাই। পরশু ময়রা-বৌ এসেছিল তেল ধার করতে। দিনু ভাই ছাপাছাপি একবাটি আজ এই মাত্তর শোধ দিয়ে গেলেন। সে বাটিও নয়—সে তেলও নয়। আচ্ছা ভাই—নাই বা দিতিস শোধ—ভারি তো একপো তেল!

পিসিমা বলিলেন, ওদের দশাই ওই। হান্দি খেতে গান্দ নেই তবু অংখারে মটমট করচেন। আচ্ছা ভাই ওবেলা শুনবো'খন তোমার গল্প—

একটি বউ গোটা দুই কাঁচকলা আনিয়া পিসিমার হাতে দিতেই তিনি বলিলেন, এরই কথা বলছিলে বুঝি ভাই। আহা—লক্ষ্মী বউ।

বউটি প্রণাম করিলে চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া তিনি হাসিলেন।

পিসিমা চলিয়া গেলে হরিসুন্দরী বলিলেন, তোমাদের ঘরে কাঁচকলা ছিল বুঝি বউমা?

বউটি হাসিমুখে বলিল, আপনার ভারি ভুলো মন—পরশু দেশ থেকে নিয়ে এলো না!

ওমা—তাই বটে! তা পাড়ার সকলকে দিয়েছ তো কিছু কিছু?

বাঃ রে, আমি জানি নাকি কাউকে! যা দেবার-থোবার আপনার সে ভার।

আচ্ছা—আচ্ছা সে হবে'খন। ঘরের জিনিস বলে লুটিয়ে দিতে হবে এমন কি কথা! কে দেয় কত মুঠো মুঠো আমাদের! একটু থামিয়া বলিলেন, আচ্ছা বউমা—তোমাদের সঙ্গে আলাপ আমাদের কত দিনের গা?

কত দিন আর। সেবার কোলকাতায় বোমা পড়বে এই হিড়িকে—

ঠিক কথা মা—ঠিক কথা। আমরা পালাচ্ছিনু কোলকেতা ছেড়ে—তোমরা যাচ্ছিলে ন'দে না কোথায়। শেলদয় শিমভান্তে হয়ে উঠনু গাড়িতে—প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন। কোথায় যাব—কি করব কিছুই জানি নি—চারদিকে অকূল পাথার। বুড়ো মানুষ দেখে বসতে দিলে পাশে—

বউটি মৃদু হাসিয়া বলিল, ওসব কথা আর বলবেন না—লজ্জা করে। সবাই যা করে আমরাও তাই করেছিলাম, সে আর বলার মত নয়—

বৈকালে বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া হরিসুন্দরী পানে-দোক্তায় মজা একটা পিচ ফেলিয়া পিসিমাকে সেই কথাই বলিতেছিলেন: এমন ভদ্দর আর এমন সজ্জন—নে গে তুললে নিজেদের বাড়িতে। তারপর ভাই সে কি সেবা—কি যত্ন! দুধ রে—মাছ রে—আনাজপাতি রে—এই এত এত। ওদের আবার দুটো বড় বড় আঁব বাগান ছেল। সে কত রকমের মিষ্টি আঁব—ক্যাটাল—জাম—জামরুল—একেবারে মোচ্ছব বসিয়ে দিলে। বেশ জায়গা ভাই পাড়াগাঁ। আর গঙ্গাচ্চানের সুখ কি। কোলকেতার মত ঘোলা নয়, তক্‌ তক্‌ করছে ফটিক জল—গলা ডুবুলে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত দেখা যায়। বেশ ছিনু ভাই!

পিসিমা বলিলেন, থাকতে হয় সেই দেশে দিব্যি একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে—

না ভাই—বর্ষা নামলে আর রক্ষে নেই। যা খাও হজম হবে না—আম্বলে বুক জ্বালা করে। প্যাচপেচে কাদা পথে—কেন্নো-মাছি-মশা-শোঁপোকা! আর ব্যাঙের ডাকই বা কি! গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাকছেই সারারাত। আর ভাই মা মনসার দৌরাত্মিও কম নয়—

বেশ করেছ চলে এসেছ দিদি—অমন জায়গায় মানুষ থাকে।

পান তখন গালে মজিয়াছে বেশ। হরিসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, গেছনু বটে দু'দিনের জন্যে—যত্ন আত্তি যা করেছে চির-দিন মনে থাকবে। তাই তো তুলনু নিজের বাড়িতে। বলি তোমরা এত করলে আর আমাদের বাড়ি থাকতে ভাড়া দিয়ে থাকবে অন্যের বাড়িতে! এসো।

ভাড়া নাও না বুঝি?

ভাড়া না নিলে কি রক্ষে আছে! ওরা জোর করে দেয়। আর ভাই বাড়ি তো আমার নামে নয়—ওনার নামেও ছেল না। সব দেবত্তর। বাণেশ্বর শিব রয়েছেন ঘরে—তাঁর নিত্যি সেবা পুজোর ব্যবস্থা এই বাড়ি ভাড়া থেকেই তো। ঠাকুরের সম্পত্তি আমি না নেবার কে ভাই।

তা তো বটেই।

তবে ভাড়া বাড়াইনি এক পয়সা। যা দিত আগের ভাড়াটেয়া ওরাও তাই দেয়।

পিসিমা বলিলেন, তোমার ভাগ্যি ভাল ভাই। বোমার হিড়িকে সেই যে লোক পালালে ভাড়াও ক'মে হ'লো আধাআধি। আমার ভাড়াটেরা ভারি বজ্জাত ভাই। জিনিস-পত্তরের দর একটু একটু করে চড়ছে তো—ভাড়া বাড়াবার কথা বললেই মুখ মচকে বলে—কোথায় পাব! এই বাজারে ভাড়া দেব, না পেটে খাব? আর আমাদের যেন পেট নেই সংসার নেই?

তুলে দ্যাও না খ্যাংরা মেরে—নতুন ভাড়াটে বসাও।

হরি বলে, সে ভারি ফ্যাসাদ পিসিমা। কি নাকি আপিস হয়েছে—আইন হয়েছে তারা তুলতে দেবে না ভাড়াটেকে। পোড়া কপাল আপিসের!

হরিসুন্দরী ঝাঁঝিয়া কহিলেন, ইস্—মগের মুলুক নাকি। আমার বাড়ি যাকে খুসি ভাড়া দেব—তুলবো—

না ভাই তা হবার জো নেই। কোর্ট ঘর করে পায়ের সুতো ছিঁড়বে তবু সুরাহা কিছু হবে না।

আচ্ছা জিগ্গেস করবো'খন মনিকে—ওরা তো মানুষ চড়িয়ে খায়।

তাই শুধিয়ো দিদি। পিসিমা উঠিলেন।

আইনের মর্ম্মার্থ জানিয়া হরিসুন্দরী মনমরা হইয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় মালা হাতে ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন বটে—মন পড়িয়া রহিল ওই প্রসঙ্গে। সত্যই তো জিনিসপত্রের দর দিন দিন চড়িতেছে। যুদ্ধ বাধিয়াছে চার বছর; চার বছরে মানুষের চারশো হাল করিয়া ছাড়িবে! দুর্লভ-দর্শন পয়সার কথা ছাড়িয়া দিলে রেজকিরও যেন পাখা গজাইয়াছে। ন'টে শাকের ভাগ আর এক পয়সায় পাওয়া যায় না। ছেলেরা ভাত কোলে করিয়া মহার্ঘ্য মাছের কথা তুলিয়া আধ-খাওয়া অবস্থায় উঠিয়া যায়। গোয়ালা দুধে জল ঢালে অসঙ্কোচে। অনুযোগ করিলে জবাব দেয়, দু'দিন পরে সাদা রং আর দেখতে পাবে না—মা-ঠাকরুণ; গরু কি আর ভারতে আছে! খোকাটার জ্বর হইয়াছিল—সারা শহরে নাকি সাগু পাওয়া যায় নাই। পাওয়া কি আর যায় নাই? আট টাকা সেরের সাগুদানা খাওয়াইয়া রোগীকে চাঙ্গা করিবার কল্পনা কে কবে করিয়াছে! উদ্ভট কল্পনা! তার চেয়ে সন্দেশ খাওয়া ভাল। কিন্তু তাহাতেও যে আগুন লাগিতেছে। এতটুকু মারবেলের গুলির মত সন্দেশ একবাটি জল না ঢালিলে গলা দিয়া নামানো দুষ্কর। সন্দেশ খাওয়া তো নয়—টাকার শ্রাদ্ধ। এই অবস্থায় বাড়িওয়ালাকে বধ করিতে প্রহ্লাদরূপী ওই আইনের হাঙ্গামা কেন বাপু?

মালা দ্রুত চলিতে লাগিল।

কাকীমা—একবার উঠবেন?

কেন গা বউমা?

দেশ থেকে আমার ভাসুরপো এসেছে। কিছু সন্দেশ খেতে দিয়ে গেল—তাই থেকে দুটি—

আহা—তা আবার আমাকে কেন বউমা। বেশ সন্দেশ তোমাদের দেশের—কাঁচাগোল্লা না কি? আর উঠবো না মা, কাচা কাপড় তো? তাহলে উই তেকাটায় টাঙিয়ে রাখ মা। নিত্যি নিত্যি এসব কেন মা! গেল হপ্তায় দিলে পটোল—

এবারও পটোল আর কাঁঠালের বিচি কিছু আছে।

কাঁঠালের বিচি! আহা, মনেটা বড্ড ভালবাসে খেতে।

আর ওলা একটা।

ওমা—আমার কি হবে! এতও ঋণী করে রাখচো মা।

ভারি তো জিনিস—

হরিসুন্দরী মালা জপ করিতে করিতে উঠিয়া আসিলেন।

ওমা—এ যে পেতে ভর্ত্তি জিনিস! আবার নেবুও এনেছ? তা ইদিকে এস ত বউ মা—ওই হাঁড়িটিতে কুলের আচার আছে—একটু তুলে নাও। না, না, এখুনি নাও। বলে তোমার নাম করে তৈরি করনু—

বউটি কুলের আচার লইয়া কহিল, আজ কিন্তু আর একটি জিনিস দিতে হবে কাকীমা—নইলে ছাড়ান নেই।

কি মা? তোমাকে দিই নি—হেন বস্তু ভূ-ভারতে কি আছে মা!

তেল—কেরোসিন—

কেরাচিন! তা নাও। চার বোতল মাত্তর আছে। পরশু গুবলুতে আর জবাতে গিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে এল তিনটি ঘণ্টায়। রাতে পা কামড়ানির জ্বালায় এ-পাশ ও-পাশ। সেই রাত্তিরে উঠনু—উঠে সরষের তেল গরম করে মালিশ করে দিই—তবে দু'টোতে ঘুমিয়ে বাঁচে।

শুনচি নাকি তেলের কার্ড হবে?

কে জানে মা—কালে কালে কতই দেখব! চালের অবস্থা দেখচ ত। আজ কুড়ি টাকা—কাল তিরিশ—

চালের কার্ডও হবে।

হলেই বাঁচি। কাঁড়ি কাঁড়ি ভিখারী দুয়োরে এসে হাঁকচে—না রেতে ঘুম—না দিনে সোয়াস্তি। মরতে শহরেই বা আসে কেন ওরা। পাড়াগাঁয়ে ত গেছনু—কেমন সবুজ ধান মাঠ ভর্ত্তি—কত আনাজপাতি—কি খাঁটি মিষ্টি দুধ।

সে পাড়াগাঁ আর নেই কাকী মা। এখানে দাম দিলে তবু চাল মেলে—ওখানে তাও না। আর যাদের পয়সা নেই—তাদের শহরই বা কি—পাড়াগাঁই বা কি!

তা হোক মা—শহরের লোককে উত্তম-খুস্তম করে মারা কেন? কত রোগ ওরা সঙ্গে করে এনেছে জান? মনি বলছেল এবার ম্যালোয়ারি যা হবে—

বউটি বলিল, ওরা ভাবে শহরে অনেক টাকা—অনেক ধান, বড়লোকেরা সবাই দয়াবান। হাত পাতলেই পেট ভরবে এই আশাই ত করে কাকী মা।

অত আশা ভাল নয় মা। কথায় বলে:

আশা রেখে ধম্ম
পিতৃলোকের কম্ম।

বউটি কুলের আচার জিভ দিয়া চাকিতে চাকিতে কহিল, চমৎকার হয়েছে কাকী মা। আর সুন্দর!

আ আবাগের বেটি—সব সকড়ি করে ফেললি, ছেলের জন্তে একটু রাখলি নি?

বেশ ত, কচি ছেলের জন্তে চিনি যদি তোর দরকার হয়ই নে না চেয়ে আমার ঠেঁয়ে। কাটান-ছেঁড়া করার কি দরকার ছেল!

পিসিমা চোখ টিপিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিলেন একটু।

সেদিন মণি জিদ ধরিল, টাকাগুলোর গতি কর মা, কোন্ দিন দর নেমে যাবে—

হরিসুন্দরী বলিলেন, বে'থার তত্ত্বে-তাবাসে দিতে ভাল দেখায় বলে রেখেছিলুম। তা তোরা যখন বলছিস—

মণি বলিল, গোটা চার পাঁচ রেখে দাও না হয়।

না, না, কিসের জন্তে রাখব।

হিতেনের ছেলের ভাতে—

পোড়া কপাল! কথায় বলে :

মা বিয়োলো না বিয়োলো মাসী—
ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপড়শী।

সুবাদ ত ওই পর্য্যন্ত। এই যে 'কাঠ'গুলো দু'মাস হ'ল নিয়েছে দিলে ফেরত? উদ্‌ভুটে ডাক্তারের উদ্‌ভুটে ব্যবস্থা! কচি ছেলেকে কে আবার বারো মাস দুধ-মিছরি খাওয়ায় শুনি?

ওদের কার্ড ওরা নিয়েছে—তাতে আমাদের কি মা। নিক গে।

গেঁজিয়া উপুড় করিয়া টাকাগুলি মেঝেয় ঢালিয়া দিলেন। পুরান টাকার আওয়াজ ভারি মিষ্ট। শব্দ হইলেই মনে হয় গানের সুর। কিন্তু গান মাত্রেই ত সুখের নহে—এ কথা আর কে না জানে!

ক্রমে ক্রমে বস্ত্র-সমস্যা উঁকি মারিল। সে যে অন্ন-সমস্যার মতই সঙ্গীন হইবে প্রথমটা কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

মণিদের বৈঠকখানায় তর্ক চলে, দু'মাস পরে কাপড়ে ছেয়ে যাবে বাজার। আমেরিকার জাহাজ ভর্ত্তি মাল প্যাসেফিকে পা বাড়িয়েছে।

ম্যানচেষ্টারও কি ছেড়ে কথা কইবে?

তখন কে কত পরবে কাপড়—

প্রকাশ উষ্ণ কণ্ঠে বলে, তাই পরো। তোমাদের লজ্জা নিবারণ হবে—দুঃখু ঘুচবে। সভ্য জগতে সভ্য থাকাটাই হ'ল গিয়ে আসল—স্বাধীনতা ত ফাউ।

বড্ড বাজে বকিস নেকা। চালের দুর্ভিক্ষ হ'ল আমাদের হাত ছিল কিছু? কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখছি তাতেই বা হাত কোথায়? এত সভাসমিতি—প্রতিবাদ অনুনয় বিনয়, হচ্ছে কিছুতে কিছু?

প্রকাশ উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠে, তরকারিতে মশলা দিয়েছ অনেক। অনেক তেল-ঘি-গরম মশলা,—নেই শুধু নুন। আমরা আবার বড়াই করি!

কোন্ তরকারি রে?

জানি না যাদের মুখের নেই স্বাদ—মনেতে নেই তৃষ্ণা—তারা আবার মানুষ! অত্যধিক ক্রোধ হইলে প্রকাশ সেখানে থাকে না—উঠিয়া যায়।

বাড়ির মধ্যেও সে ক্রোধের ধোঁয়াটা গাঢ় হইয়াছে। হরিসুন্দরী বকিতেছেন : একে কাপড়ের দুর্ম্মূল্য তায় এত বড় ফালা দিলে মানুষ বাঁচে। এমন দস্যি ছেলেপুলে—

হিতেনের বউ দোরগোড়ায় আসিয়া কহিল, ছেলেমেয়েদের দোষ নেই কাকী মা, তাড়াতাড়িতে আসছিলাম বালতিটা নিয়ে—কানায় খোঁচ লেগে—

হরিসুন্দরী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিলেন। সেই বিস্মিত প্রখর দৃষ্টির তলে চোখ তুলিয়া দাঁড়ান কঠিন।

হিতেনের বউ মুখ নামাইয়া বলিল, আমায় দিন কাকী মা, দুপুর বেলায় রিফু করে রাখব'খন।

হরিসুন্দরী দৃষ্টি-আগুনের উত্তাপ কণ্ঠে ঢালিয়া কহিলেন, রিপু করলেই ত নতুন করে দেয়া যায় না। দু'তিন ধোপের কাপড় একেবারে ফালানালা!

মণি বারান্দায় পা দিতেই বউটি চলিয়া গেল।

অবশেষে শোনা গেল—চাল আটা নুন চিনির মত কাপড়েরও রেশন হইবে। তবে সে ব্যবস্থা করিতে মাস দুই চার হইতে পারে। ইতিমধ্যে পাড়ার ওয়ার্ড-কমিটির মারফত বাড়ি-পিছু একখানি করিয়া কাপড় দেওয়া হইবে—অবস্থা সচ্ছল হইলে মাথা পিছু পাওয়া যাইতে পারে।

সকলের দেখাদেখি হিতেনও ফর্ম্ম পূরণ করিয়া দিল।

বউটি বলিল, কাপড় যদি পাও—কাকীমাকে একখানা দিও।

হিতেন হাসিল, দেবে ত একখানা—তার আবার কাকী-মাকে!

না গো, ওঁর কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে যা লজ্জায় আছি।

বুঝলাম। কাপড় ওঁকে দিলেও তোমার লজ্জা ঘুচবে?

তবু—

তবুর কিছু নেই। তুমি না হয় বাড়িতে আছ—ছেঁড়া-খোঁড়া পরে থাকবে; নিদেন পক্ষে লেপের ওয়াড়—গামছা কাগজ যা কিছু হোক। আমাদের আপিস করতে হয়—রাস্তার আইন বাঁচিয়ে চলতে হবে। দেখ সু, সচ্ছল অবস্থার দিনে যে ত্রুটি মানুষকে লজ্জা দেয়—আপৎকালে তাই তার ভূষণ। ওতে অপরাধ নেই।

বউটি অত বোঝে না, মনের দুঃখে চুপ করিয়া থাকে।

অনুসন্ধান-কমিটি হইতে যথাসময়ে হিতেনের নামে পারমিট আসিল। সে মণিকে সেটি দেখাইয়া বলিল, একখানা ধুতির পারমিট পেলাম দাদা।

মণি পারমিট দেখিয়া প্রসন্ন হইল না। কহিল, ভালই ত।

আপনি কি পেলেন? ধুতি না শাড়ি?

মণি অন্তরে জ্বলিতেছিল, মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, এক বাড়ি থেকে ক'জনকে পারমিট দেবে? এখনও ত ঢালাও দেবার অর্ডার হয় নি?

তাহ'লে আপনি পাবেন না?

মণি নীরস স্বরে কহিল, আচ্ছা হিতেন, যারা আপিস করে—খবরের কাগজ পড়ে—পাঁচ দিকের খবর রাখে—তারা বদিলোকা সাজে তাহ'লে কি ইচ্ছে হয় জান?

হিতেন দারুণ অপ্রস্তুত হইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি বলিতে গিয়া দেখে—মণি সেখানে নাই। মণির আক্রোশের হেতু বুঝিয়া তাহার অপরাধের বোঝা যেন হাল্কা হইয়া আসে। সে ত কমিটিকে বলিয়া শুধু নিজের কাপড় লওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। তাহাদের খেয়ালখুশী মত যাহার ভাগ্যে যেটুকু লাভ হইল তাহাতে হিংসাই বা কেন—ক্রোধই বা কিসের ?

ম্রিয়মাণ বউটির হাতে ধুতিখানি দিয়া বলিল, তুলে রাখ।

বাঃ—বেশ মিহি ধুতি ত। পাড়টিও খাসা।

হিতেন বলিল, কত লোক এই দেখে হিংসেয় ফেটে মরছে জান ?

হিংসে ?

হাঁগো—মণিদাকে দেখালাম, মুখ কাল করে চলে গেলেন।

ওঁরা পান নি ?

না, তাই ত রাগ।

এমন সময়ে ঘড় ঘড় ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতে লাগিল। দু'জনে ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া দেখে দেয়াল ঠেসান যে করোগেট টিনখানা এতদিন অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল—সেটিকে মণি, হরিসুন্দরী, তাহার পনর বছরের নাতনী দুলালী এবং সাত বছরের নাতি মণ্টু টানিয়া বারান্দায় তুলিতেছে।

হিতেন ও তাহার বউ বারান্দা হইতে সরিয়া গেল।

পরের দিন বৈকালে নিত্য অভ্যাস মত হরিসুন্দরী বারান্দার ওধারে বসিয়াছেন। কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল পিসিমা আছেন। আর কে আছেন না-আছেন—হিতেনের বউয়ের দেখার সুযোগ কম। কেন না, করোগেট টিনে বারান্দাটা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। হরিসুন্দরীর গলা পাওয়া গেল। কাহাকেও গোপন করিয়া নহে—যেন অপর পক্ষকে শোনাইবার জন্যই এই আলোচনা।

আর ভাই, আলাদা বাড়ি না দেখালে ফাঁকিতে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত। মণি ত বোঝে না—ভাবলে পরগাছাকে আপন করে নেবে। তা এক মালিক দেখিয়ে সব 'কাঠ' আমার বাকসোয় রাখত। ছেলের মিছরির ছুতো করে সেই যে 'কাঠ' নিলেন—সে হ'ল গিয়ে ছ'মাসের কথা। আবার কাপড়ের বেলাতেও দেখালেন ভু! বাড়ি পিছু একখান কাপড়—তা কম্মকত্তাদের সলিয়ে-কলিয়ে গবেবাজাত করলেন। অথচ আমি ভাই—

প্রথম পরিচয় হইতে আজ পর্য্যন্ত কত রকম এবং কি পরিমাণ জিনিস দিয়াছেন তাহার সুদীর্ঘ তালিকা নিখুঁত আবৃত্তি করিয়া হরিসুন্দরী প্যাচ্ করিয়া পানের পিচ ফেলিলেন।

পিসিমা বলিলেন, তা ভাই বেশ করেছ—বারান্দাটা ঘিরে আলাদা করে নিয়েছ। এখন বাড়ি আলাদা দেখাতে পারলে কাপড়ও পাবে আলাদা।

হরিসুন্দরী বলিলেন, তাই বলছিনু—তোরাই বা কে আমরাই বা কে। কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, এক জাত নয়—কথা বলার ছিরি ছাঁদই কি এক রকম! যার অভাবে সংসারে অচল সেই 'ট্যাকাকে' তোরা বলিস টাকা! তোদের সঙ্গে ভাব জমবে কোন্ সুবাদে শুনি ?

প্যাচ্ করিয়া আর একবার শব্দ হইল।

পিচ ফেলার শব্দে মনে হইল—অনেকখানি ক্রোধ ও ঘৃণা সেই সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

আয়েষার মুখটি ভার
হাসিখানি কেড়ে নিল কে যে
স্বামী তার ফেরে নাই
বহুকাল হয়ে গেল সে যে।

চুল সে ত বাঁধবে না,
তেল সে ত মাখবে না,
ভাবে খালি দিন রাত
সে কি ফিরে আসবে না ?

—শ্রীসুধীর খাস্তগীর





রাজগীর বা রাজগৃহ একই স্থান। মগধ রাজ্যের প্রথম রাজধানী হিসাবে 'রাজগৃহ' নাম হয়েছিল। রাজগীরের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। রাজগীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সরকারের আনুকূল্যে রাজগীর ও নালন্দা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, কোন এক সময় রাজগীরের মাটির নীচ থেকে মহাভারতীয় এবং পৌরাণিক যুগের বহু অপ্রকাশিত কাহিনী সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

রাজগীরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এক অন্ধকার রাত্রে। অপরিচিত স্থানে এসে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখি আমার পায়ের কাছ থেকে যেন এক বিরাট্ অন্ধকারের স্তূপ সোজা উপরে উঠে আকাশে গিয়ে মিশেছে।

বৈশাখ মাস। বেশ গরম। পাহাড়েও গরম বোধ হচ্ছে। মেঘের খেলা নেই, কুয়াসা নেই। আকাশের পটে অনন্তপ্রসারিত পর্ব্বতমালাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বিপুল তরঙ্গমালা বরাবর পূব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে। মাউণ্ট 'এভারেষ্টে'র শৃঙ্গে যত ফুট পর্য্যন্ত বরফ জমে, এখানে পাহাড়ের উচ্চতা তত ফুট হবে অর্থাৎ প্রায় হাজার বার-শ ফুটের কাছাকাছি। পর্ব্বতে এবং সমুদ্রে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখা যায়, তবে এখানে সেরকম কিছু নেই। কেবল মাঝে মাঝে ঝড় হয়, ঝড় আড়াই দিন একইভাবে থাকে। একবার আমি বিপুলাচলে একখানা ছবিতে চার ইঞ্চি জায়গা রং তিন ঘণ্টাতেও দিতে পারি নি। শুধু এলোমেলো প্রবল হাওয়ার ঝাপ্টা কানে, চোখে, নাকে লেগে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলে যে বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হ'ল। রাজগীরের উচ্চাবচ পার্ব্বত্য পথে পায়ে হেঁটে ছ-সাত মাইল দূরে চলে যেতাম। হিলিমিলি পায়ে-চলার পথগুলি এক একটি খেজুর অথবা তালগাছের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে। একই জায়গায় বহু পথে যাওয়া যায়। একলা অজানা অচেনা বনপথে বিচরণের সে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় অনুভূতি।

রাজগীর থেকে সাত মাইল উত্তরে নালন্দা। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্ বলেছেন বিকশিত রক্তকমলসমূহ নালন্দার বিরাট্ অট্টালিকাগুলির সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করত।



পরিব্রাজক ই-সিঙ বলেছেন নন্দ নামক মহানাগ এই স্থানে বাস করত বলে 'নাগ-নন্দ' থেকে নালন্দা নামের উৎপত্তি হয়। নালন্দার দ্বাররক্ষীর কাছে ন্যায় দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক জটিল প্রশ্নের জবাব ঠিকমত দিতে পারলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া যেত এরূপ প্রবাদ আছে।

তালগাছের ঝোপ, খেজুর গাছ, নাম-না-জানা ছোট-বড় নানা গাছ, ধানক্ষেত মধ্যে ভগ্ন সৌধসমূহ ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছে পুরাতনের আমেজটুকু যেন এখনও

এখানে লেগে রয়েছে। নালন্দা থেকে পাহাড় সেই সাত মাইল দূরে। ধূসর নীল হাল্কা বেগুনী রং, তালীবনের সবুজের সঙ্গে যেন সুসঙ্গতি রেখে চলেছে। দু-এক জন সুহৃদ্ বললেন, 'এই ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলি আগে এঁকে ফেলুন।' জবাব দিলাম, মাটির নীচে যে-সব ঘর পাওয়া গেছে সেগুলো আঁকা আর্টিষ্টের পক্ষে অনাবশ্যক, ড্রাফটস্‌ম্যানের হাতে পড়লে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণ করবার সুবিধা হতে পারে। আমি রাজগীরে এসেছি এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুন্দরের সঙ্গে অন্তরের গভীর যোগ স্থাপন করতে।



এখানকার প্রকৃতির মধ্যে প্রথমেই একটা জিনিষ আমার মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করল,—সেটি হচ্ছে এই যে, একই স্থানে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি চমৎকার ছবি যেন 'নেচারে'র মধ্যে 'কম্পোজ' করা আছে—শুধু দেখবার চোখ থাকলেই হ'ল। পাহাড় আকাশের গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। তালগাছ দাঁড়িয়ে যেন পাহাড়ের গায়ে চামর ব্যজন করছে। লাল, হলদে শাড়ি পরা মেয়েরা আকাশ, পাহাড়, টিলা ও সারি সারি গাছপালার মধ্যে যেন আরো একটুখানি বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এখন 'কম্পোজিশনে'র অর্থ খানিকটা বলে রাখি। একটা "বিষয়বস্তু" ঠিক করে তার 'ফার্ষ্ট ইন্টারেষ্ট'কে ছবির আয়তনের মধ্যে এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেন 'সেকেণ্ড ইন্টারেষ্ট' তাকে ক্ষুণ্ন না করে তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়তা করে। আর 'থার্ড ইন্টারেষ্ট'—সে নিজে থেকে আর দুটোকে সুন্দরতর করে তুলবে। আসলে "চার্ম" টুকু যেন কিছুতেই ক্ষুণ্ন না হয়। এই গোটা ছবিখানাকে রক্ষা করবে ফ্রেম। যেমন ট্রামে বসে জানলা দিয়ে রাস্তার এপার-ওপার দেখতে বেশ লাগে অথচ পায়ে হেঁটে হাজার বার দেখে গেছি তবু সেই চির পুরাতন দৃশ্যই আগ্রহ সহকারে দেখি। যখন হেঁটে যাই তখন দেহটা চলনশীল, অপঘাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সব সময় থাকতে হয় সতর্ক, কিন্তু বিশ্রাম করে নিরুদ্বিগ্ন মনে জানলার ভেতর দিয়ে চলন্ত ছবির মালা মনে নানা অনুভূতির সঞ্চার করে।

এদেশের পাহাড়ের বর্ণ-বৈচিত্র্য, ছবিতে রঙের প্রয়োগ সম্বন্ধেও শিল্পীর মনে নানা ভাবনার উদ্রেক করে। এ-দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের শিল্প-রচনার সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। আবহাওয়ার দরুন ভিন্ন ভিন্ন দেশের আকাশ, মাটি, গাছ, পাতা, ফুল ইত্যাদি সব কিছুরই বর্ণ বিভিন্ন। শীতের দেশের ছবিতে শিল্পীরা গাঢ়, লাল, কাল, সবুজ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে ভাল লাগে বলেই। কারণ রঙের গাঢ়তা তাদের চোখ ও মনের পরিতৃপ্তি সাধন করে। গরমের দেশ ঠিক তার উল্টো, ফিকে সবুজ, হলদে, নীল ব্যবহার করে। প্রকৃতির রাজ্যেও তাই—যেখানে বরফ পড়ে সেখানে গাছের দেহে পুরু বাকল থাকে। জলে যে গাছ হয় তার গায়ে শ্যাওলা পড়ে।



এখানে মনিয়ার মঠ এবং শোণভাণ্ডার যেতে যে বাঁশগাছ



দিয়ে তা শিল্পী এবং শিল্প-রসিকের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে।

ঠিক নদীর কূলের মতই পাহাড়ও সমতলভূমির সঙ্গে আঁকা-বাঁকা ভাবে একটা ছন্দ রেখে চলে যায়। নদীর বুকে নৌকা ভাসে, পাহাড়ের বুকে মেঘ ভেসে যায়। একখানা মেঘ পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভেসে গেল, মনে হ'ল যেন প্রখর সূর্য্য-তাপে উত্তপ্ত পর্ব্বত-গাত্রে একখানা কালো হাত সান্ত্বনার পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। এক পাহাড়ে সূর্য্যের আলো বাধা পেয়ে আর এক পাহাড়ে ছায়া বিস্তার করে—এক পাহাড় আলোকে উদ্ভাসিত হয়, আর এক পাহাড় হয় ছায়াবৃত।

সপ্তপর্ণীর পাশে বসে নীচে তাকিয়ে মনে হ'ল যেন উল্টো রাজার দেশে এসেছি। পাখীরা সব আমাকে উপরে রেখে নীচ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর ফিকে সবুজ, গাঢ় সবুজ, গাছগুলিকে মনে হয় যেন ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একত্রিত হয়েছে। একটু দূরে সবুজ ও সোনালী দিয়ে যেন দাবার কোট বিছানো আছে।

বিপুলাচল পাহাড়টি বিপুলই বটে। আকাশটাকে যেভাবে ও যে ভঙ্গিতে অধিকার করে আছে তা নীচের থেকে ওপরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। আবার ওপর থেকে নীচে তাকালে কত নীচে যে চলে গেছে তা টের পাওয়া যায়।

দু-চারখানা কুঁড়ে ঘর তাও ভাঙ্গা, রিক্ততার বুকে যেন কোন রকমে টিকে আছে। নীচে চারদিকে হলুদে-সবুজে ধু ধু করছে মাঠ—তার পরে গ্রাম, গ্রামের পরে পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট-বড় গাছ। এই স্নিগ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে যেন অগাধ শান্তি।

পশ্চিমের একখানা কালো মেঘ গর্জ্জন সুরু করে দিয়েছে। ভেসে আসছে কালি মাখাতে মাখাতে পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়ের কোলে। দেখতে দেখতে পাহাড়-দেশে ঢল নামল। ধানের ক্ষেতে কচি ধানগাছগুলোর সুরু হ'ল হাওয়ার তালে একই ছন্দে নৃত্য।

রাতে প্রায়ই পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। দেখে মনে হয় যে, পাহাড় অজস্র রক্তজবার মালা পরেছে অথবা কেউ যেন কালো দেহে সিঁদুর মাখছে। পাহাড়ীরা অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণু। জঙ্গলে গাছের পাতা পুড়িয়ে কাঠ কাটবে—বাজারে চাহিদা আছে ঢের।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আকাশের খানিকটা উঁচুতে বসে আছি। গয়া যাওয়ার যে প্রশস্ত পথ বাণগঙ্গার

দেখা যায় সেগুলো চার-পাঁচ হাতের বেশী নয় এবং সেগুলো ঝোপ বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম অনেক কিছু আছে যা শিল্পীর চোখে পর্য্যবেক্ষণ করলে আনন্দ পাওয়া যায়। গল্প শুনলাম ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে হেরে গিয়ে জরাসন্ধ যখন মৃতপ্রায় তখন এখানে শ্রীকৃষ্ণ মাটিতে বাণ মেরে তাকে জল খাইয়েছিলেন। সেই 'বাণ গঙ্গা' একটা অপূর্ব্বসুন্দর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। পাথরের রং রক্তাভ, পীত, শাদা, কালো, সিঁদুরে আভা-বিশিষ্ট। ছোট ছোট প্রস্তর-স্তর পালিশ করা হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে ঝরণার জলস্রোত পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে। যেখানে জল আছে সেখানে পাথর আরক্ত, পাশে ডান দিকে ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গেছে, রং একদম সাদা—মাঝে মাঝে হলুদে মেশানো, আরও নীচে কালো। পাথর এত রং কোথায় পেল? ফুলের পক্ষে বর্ণবৈভব স্বাভাবিক—জিনিষ-পত্রেও রঙের প্রলেপ দিতে হয়, ঘর বাড়ীতেও রং দিতে হয়। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই রঙের খেলা। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে যে সাদা গলিত তুষার নামে তাকে স্বর্ণবর্ণ বলে মনে হয় সূর্য্যরশ্মির জন্য। রাজগীর পাহাড়ে আধ মাইলের মধ্যে পাথরের এত বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখে মনে বিস্ময় লাগে।

গৃধ্রকূট বুদ্ধদেবের সাধনার স্থান। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা ছবির পরিকল্পনা মনে জাগল। প্রায় মিনিট দশেক ভাবলাম। আমাকে কেন্দ্র করে চক্রবাল পর্য্যন্ত বৃত্ত টেনে যে আধখানা বৃত্ত সামনে ও পেছনে দেখতে পেলাম তাতে শেষ পর্য্যন্ত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হ'ল যে, এদৃশ্য আঁকা সম্ভব হবে না। এত অস্পষ্ট যে কোন রেখার বন্ধনে ধরা দিতে চায় না, যেন সুদূরেই থেকে যেতে চায়; যেন কোন পুরনো আমলের ছবি বর্ষা-বাদলে ঝাপসা হয়ে গেছে। অথচ তার মধ্যে এমনি একটা মাধুর্য্য আছে যার আকর্ষণ গভীর। আজ দেখি ছবির পটভূমিকায় আছে বৃহত্তর ছবি, অফুরন্ত যার ঐশ্বর্য্য, টুকরো টুকরো ছবি

হইতে এই জন্মোৎসবের বিবরণ জানিতে পারা যায়। সেদিন সম্রাটের দৈহিক ওজন লওয়া হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর হইতে সম্রাটের ওজন বৃদ্ধি হইলে সে বৎসর উৎসবের অনুষ্ঠানাদি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইত। ওজন গ্রহণের পর সম্রাট্ সিংহাসনে উপবেশন করিতেন এবং তৎপর সুরু হইত রাজ্যের আমীর, ওমরাহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিবাদন ও উপহারের পালা। হীরা, মণিমাণিক্য, চুনী-পান্না প্রভৃতি মহার্ঘ রত্নরাজি হইতে সুরু করিয়া, বহু মূল্যবান বস্ত্রসম্ভার, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি যে-সমস্ত উপহার সম্রাট লাভ করিতেন তাহার মূল্য ২২,৫০,০০০ পাউণ্ডের অধিক।

টাভার্নিয়ে আওরংজেবের রাজকোষে সাতটি সিংহাসন দেখিতে পান। ইহার মধ্যে একটি আগাগোড়া হীরকে খচিত। অপর ছয়টি চুনী, মরকত, মুক্তা ইত্যাদি বিবিধ রত্নরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত। এই রাজকোষেই তিনি ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব-বিশ্রুত যে হীরকখণ্ড দেখিতে পান পরবর্ত্তী যুগে নাদির শাহ্ কর্ত্তৃক তাহা কোহিনুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। টাভার্নিয়ে যে সময়ে ইহা দেখিতে পান সে সময় তাঁহার মতে ইহার ওজন ছিল ৩১৯$\frac{1}{2}$ রতি অথবা ২৭৯$\frac{9}{16}$ ক্যারেট। কোহিনুর কোন্ সময়ে মোগল সম্রাটের অধিকারে আসে সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে ইহা পূর্ব্বে মালব রাজের অধিকারে ছিল। আলাউদ্দিন খিলিজি মালবের অধীশ্বর হইলে ইহা তাঁহার অধিকারে চলিয়া যায়। পরে ইহা গোয়ালিয়রের অধিপতি বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। মোগল সম্রাট্ বাবর তাঁহার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন এবং তদবধি ইহা মোগল সম্রাটদের অধিকারে ছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত ডবলিউ ক্রুক সম্পাদিত টাভার্নিয়ের ভারত-ভ্রমণবৃত্তান্তে কোহিনুরের একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহার অভিমতই মুখ্যতঃ গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার মতে এই রত্নের মোগল অধিকারে আসিবার ইতিহাস ভিন্নরূপ। ইহা গোলকুণ্ডার অন্তর্গত কল্পর খনিতে সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ইহাই তাঁহার অভিমত। আবিষ্কারের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই—তবে ১৬৫৬ অথবা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মীর জুমলা এই হীরকখণ্ড সম্রাট শাহজাহানকে উপহার দেন। এসম্বন্ধে অন্য ঐতিহাসিকের মতও উদ্ধৃত করা গেল :—

It was found by a miner working in the mines of Golconda in Bijapur. This was in 1656. The largeness of this stone attracted the attention of Mir Jumla, the Vezier of Golconda who exercising his authority over the miners obtained possession of it. He, as a token of sovereignty presented it to Shah Jahan, the emperor of Delhi.'—(B. Venkatavaradan.)

সম্রাট শাহজাহান যে সময়ে কোহিনুর লাভ করেন সে সময় উহার ওজন ছিল ৯০০ রতি অথবা ৭৮৭$\frac{1}{2}$ ক্যারেট। টাভার্নিয়ে যে সময় উহা আওরংজেবের রাজকোষে দেখিতে পান সে সময় উহার ওজন অনেক হ্রাস পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পালিশ করিবার সময় ইহার ওজন হ্রাস পাইয়া থাকিবে বলিয়া ঐতিহাসিকগণের অনুমান। শাহজাহানের মৃত্যুর পর আওরংজেব কি ভাবে ইহার অধিকারী হইলেন সে সম্বন্ধেও একটি ইতিহাস রহিয়াছে। সম্রাটের মৃত্যুর পর অন্যান্য বহুমূল্য রত্নরাজিসহ কোহিনুর তাঁহার কন্যা কর্ত্তৃক আওরংজেবের হস্তে সমর্পিত হয়। নূতন সম্রাট ইহাকে ময়ূর-সিংহাসনস্থিত ময়ূরের চক্ষুতে প্রোথিত করিয়া রাখেন। পারস্য হইতে আগত কোন দূত ইহা লক্ষ্য করিয়া কোন এক সুযোগে এই সিংহাসনটি স্থানান্তরিত করিয়া ইহার চক্ষুঃস্থিত রত্নখানি অপহরণ করিয়া পুনরায় সিংহাসন যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। সুচতুর আওরংজেব ইহাদের অভিপ্রায় পূর্ব্বাহ্ণে বুঝিয়া ফেলেন এবং পূর্ব্ব হইতেই একটি নকল কোহিনুর ময়ূরের চক্ষুতে প্রোথিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং সে যাত্রা কোহিনুর মোগল অধিকারচ্যুত হইতে পারিল না।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরংজেবের অযোগ্য বংশধর মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া যে বিপুল সম্পদ নাদির শাহ পারস্যে লইয়া যান তাহার মূল্য ৭০০০০০০০ অথবা ৮০০০০০০০ পাউণ্ড। মোগল সম্রাটের ময়ূর-সিংহাসন, টাভার্নিয়ে বর্ণিত সপ্ত সিংহাসন ও কোহিনুর সবকিছুই লুণ্ঠিত হইল। নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে নাদির শাহ কর্ত্তৃক দিল্লী হইতে আহৃত সম্পদের পরিমাণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে :

". . . Nadir Shah and his men took away all the treasures and jewels of Delhi, which had been heaped up by the Great Mogul emperors from the time of Babar. The Peacock Throne of Shah Jahan, the golden crowns and jewels, the best of the elephants and horses and cannon, the rich silks and muslins, and vast sums of money from the king's treasury and from all the rich men and Nobles of Delhi were carried away to Persia. The Shah had so much money that he did not know what to do with it. He gave three months' pay to every soldier, and for one whole year took no taxes from the people of Persia."—(E. Marsden.)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই সময় কোহিনুরও নাদির শাহের অধিকারে চলিয়া যায়। এই সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া নাদির শাহ ইহার কোহ্-ই-নুর বা "আলোক গিরি" (Mountain of Light) আখ্যা দেন। ফরাসী পর্য্যটক টাভার্নিয়েও ইহার যেরূপ উজ্জ্বল ছটার বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পরবর্ত্তী যুগে প্রদত্ত এই আখ্যা উপযুক্ত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

কোহিনুর আট বৎসর পর্য্যন্ত নাদির শাহের নিরাপদ অধিকারে থাকিতে পারিয়াছিল। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ নিহত হইলে তাঁহার পৌত্র শাহ রুখ যুগপৎ সিংহাসন ও কোহিনুর অধিকার করেন। আলা মহম্মদ (মীর আলম খাঁ) নিজ কোষাগারে বহু রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কোহিনুরের খ্যাতি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি শাহ রুখের নিকট হইতে ইহা হস্তগত করিতে মনস্থ করিয়া কৌশলে শাহ রুখকে বন্দী করিয়া কোহিনুর দাবি করেন। শাহ রুখ কোনক্রমেই কোহিনুর শত্রু-হস্তে দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহার উপর অকথ্য ও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চলিতে লাগিল এবং তাঁহার দুই চক্ষু উপ্ড়াইয়া ফেলা হইল। ইহা সত্ত্বেও শাহ রুখ কোহিনুর হাতছাড়া করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা মীর আলম খাঁ

তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। অন্ধ ও খঞ্জ শাহ রুখ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কোহিনুরের অধিকার ছাড়েন নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিজ বংশধরগণের পক্ষে ইহা রক্ষা করা অসম্ভব হইবে মনে করিয়া কাবুলের দুররাণি বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদ শাহকে তাঁহার পূর্বকৃত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ উপহার দিয়া যান। অতঃপর উত্তরাধিকারসূত্রে আহম্মদ শাহের পুত্র তাইমুর সিংহাসনসহ কোহিনুর লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ জামানের অধিকারে আসে। শাহ জামান ভ্রাতা মহম্মদ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁহাকেও অন্ধ করিয়া ফেলা হয় তথাপি শাহ জামান কোহিনুর হস্তচ্যুত করেন নাই। ইহার দুই বৎসর পরে ইহা তৃতীয় ভ্রাতা সুলতান সুজার হস্তগত হয়। যে কারাকক্ষে শাহ জামানকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল পরে তাহারই প্রাচীরাভ্যন্তর হইতে অন্যান্য রত্নরাজিসহ লুক্কায়িত এই রত্নখানিও আবিষ্কৃত হয়, ইহা এলফিনষ্টোনের অভিমত। মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিবার পর সুজা কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এলফিনষ্টোন সুজার বলয়স্থিত যে সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ড দেখিতে পান উহাকেই তিনি টাভার্নিয়ে বর্ণিত কোহিনুর বলিয়া মনে করেন। কিছু কাল পর মহম্মদ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। মহম্মদ কর্তৃক সুজা সিংহাসনচ্যুত হন।

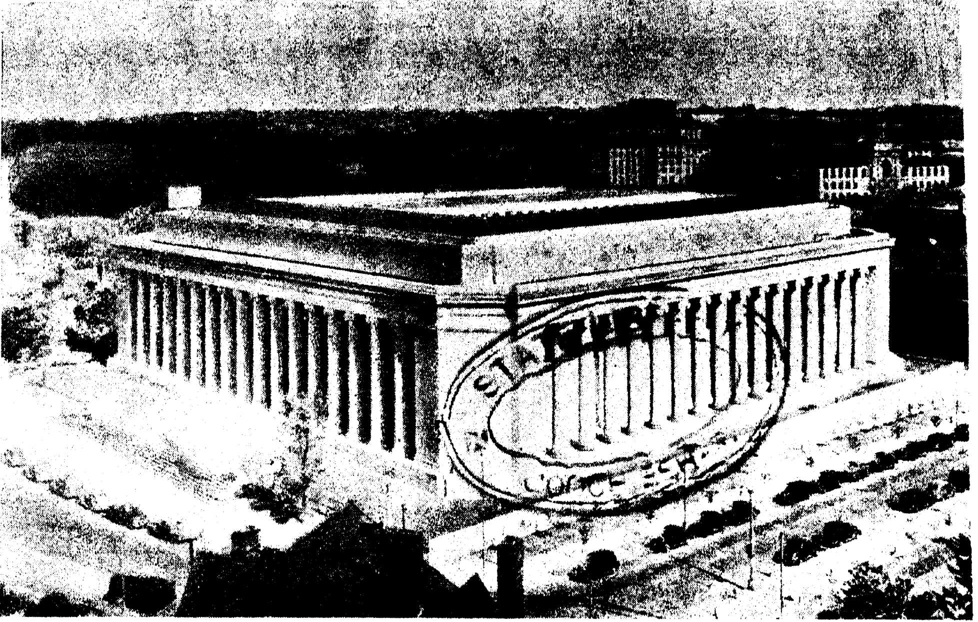
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শাহ জামান ও সুজার পরিবারবর্গ লাহোরে চলিয়া আসেন। তৎকালে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সুজার পত্নীর নিকট তাঁহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন; উপরন্তু তাঁহাদিগকে কাশ্মীর রাজ্যও প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। এই সকল সহায়তার বিনিময়ে কোহিনুর হীরকখণ্ড তিনি দাবি করেন। অতঃপর সুজা লাহোরে পৌঁছিলে রণজিৎ সিংহ কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে আটক করেন। সুজা কিছু কাল পর্য্যন্ত কোহিনুরের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব এড়াইয়া চলিলেন এবং ইহার মূল্যস্বরূপ যে পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রস্তাব চলিয়াছিল তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে রণজিৎ সিংহ শাহ সুজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মতান্তরে রণজিৎ সিংহ তাঁহার দরবারে শাহকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তৎকাল-প্রচলিত রীতি অনুসারে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ পাগড়ি বিনিময় হইল। শাহ সুজা সাধারণ সামরিক শিরস্ত্রাণ লাভ করিলেন এবং রণজিৎ সিংহ সুজার পাগড়িস্থিত অমূল্য কোহিনুর লাভ করিলেন। এইরূপে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সম্পদ ভারতে ফিরিয়া আসিল। ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সুজাকে পঞ্জাবের কিছু জায়গীর ও কাবুল উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। ইহার পর সুজা কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া ও অশেষ দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করিয়া লুধিয়ানায় চলিয়া আসেন। এখানে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা শাহ জামান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। তাঁহাদের জন্য যথোপযুক্ত বৃত্তির সুব্যবস্থা হইল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের পূর্ব্বে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের শাসনকালে শাহ সুজা ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুই বৎসর পর এই যুদ্ধে শোচনীয়রূপে ব্রিটিশের পরাজয় ঘটে। ব্রিটিশের কাবুলস্থিত অমাত্য এক অপমানকর সন্ধি স্থাপন করেন এবং শাহ সুজারও সিংহাসনচ্যুতি ঘটে।

রণজিৎ সিংহ এই প্রকারে যে হীরকখণ্ড লাভ করিলেন দিল্লী ও কাবুলের জহুরীদের অভিমতে এবং এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঐতিহাসিকের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই যে টাভার্নিয়ে বর্ণিত আওরংজেবের রাজকোষস্থিত হীরক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই হীরকখণ্ড যে সময় শাহ রুখ, শাহ জামান অথবা শাহ সুজার অধিকারে ছিল তৎকালেই ইহার ৮৩ ক্যারেট ওজন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহার অধিকারীগণ সম্ভবতঃ ইহার কিছু কিছু অংশ কাটিয়া অর্থের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকিবেন। রণজিৎ সিংহ তাঁহার জীবদ্দশায় দরবারে এই কোহিনুর ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ইহার জ্যোতিঃ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ইহা জগন্নাথের মন্দিরে জগন্নাথদেবের নিকট প্রেরণ করিবার অভিলাষ জানাইয়া যান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তকমণি মনে করিয়াই তিনি এই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন কিনা তাহা কে বলিতে পারে! কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহার নাবালক পুত্র দলীপ সিংহ তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা রত্নাগারেই রক্ষিত ছিল।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইলে নূতন বোর্ড অফ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ইহা অর্পিত হয় এবং তৎপর ইহা জন লরেন্সের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। একটি ক্ষুদ্র টিনের বাক্সের মধ্যে পুরিয়া লরেন্স ইহাকে জামার পকেটে এরূপ অন্যমনস্কভাবে রাখিয়াছিলেন যে অচিরেই ইহার বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যান। ইহার ছয় সপ্তাহ পর উহা বিলাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট পাঠানো সাব্যস্ত হইলে উক্ত ঘটনা লরেন্সের স্মরণ হয়। তিনি দ্রুতগতিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যকে সেই বাক্স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। সামান্য কাচখণ্ড মনে করিয়া ভৃত্য অনাদরে ইহা ফেলিয়া রাখিয়াছিল। যাই হোক্, অবশেষে এই মহামণি মহারাণী ভিক্টোরিয়া সকাশে নিরাপদে প্রেরিত হইল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের এক বিরাট প্রদর্শনীতে কোহিনুর প্রদর্শিত হয়। আমষ্টারডামের হীরক-কর্ত্তন-বিশারদের দ্বারা আটত্রিশ দিনে ৮০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে ইহা কর্ত্তিত হয়। তদবধি উহা ইংলণ্ডাধিপতির অধিকারেই রহিয়াছে।



পেনসিলভানিয়ার পিট্সবুর্গে গ্রীক্ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত মেলম ইন্‌ষ্টিটিউট

জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

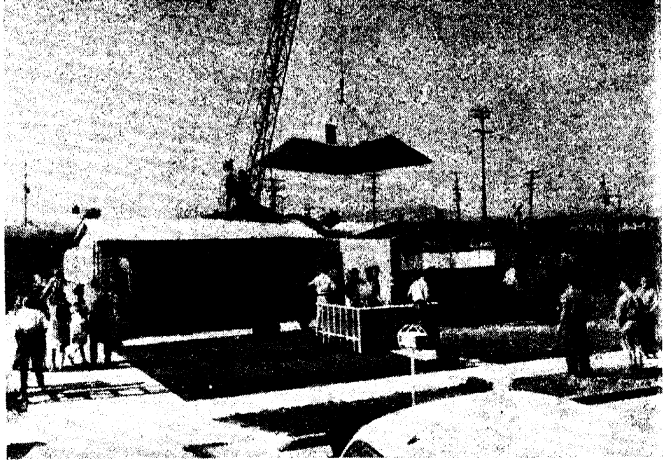
বিংশ শতাব্দীর মহাকুরুক্ষেত্রের অবসান হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের যে-সব সমস্যা ছিল, এই যুদ্ধের মধ্যে তাহার সমাধান তো সম্ভবপর হয়ই নাই উপরন্তু তাহা আরও গভীর ভাবে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। এই সকল ব্যাপকতর ও গভীরতর সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়কেরা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের দেশের শাসনভার আমাদের হাতে নাই। রাষ্ট্রের মারফত সমাজের সেবা বা কল্যাণসাধন আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি আমাদের জননায়কগণও বসিয়া নাই। তাঁহারা নিজ নিজ অভিরুচিমত নানাবিধ পরিকল্পনা রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বোম্বাই পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পনা প্রভৃতি লইয়া সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে লেখালেখিও চলিতেছে বিস্তর। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং যুদ্ধের মধ্যে জনকল্যাণকল্পে বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ কার্য্য করিয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর যুগেও এই দেশটি বিবিধ সমস্যার সমাধানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কিরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানে আমাদের জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। গৃহ-নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, হাসপাতালাদি প্রতিষ্ঠা, গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার, বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য-সংরক্ষণ, কৃষি ও শিল্প এবং এতদুভয়ের উন্নতিকল্পে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, জলসেচ ব্যবস্থা, বেগবতী নদী হইতে শক্তি আহরণপূর্ব্বক তাহা কৃষিকার্য্যে ও গৃহস্থের উপকারে লাগানো প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র-সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যে-সব সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখে, তাহা সমাধানকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের অবলম্বিত পন্থাগুলি আমাদেরও বিশেষ কাজে লাগিবে। এই সব বিষয়ই একে একে এখানে বলিতে চেষ্টা করিব। বলাবাহুল্য, আমেরিকা হইতে প্রচারিত কাগজপত্রের তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই এসব কথা বলিতে হইবে।

গৃহ-নির্ম্মাণ

প্রথমেই ধরা যাক্, গৃহ-নির্ম্মাণের কথা। এই মারাত্মক মহাসমরের মধ্যে আমরা বাঙালীরা কতই না সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। সিঙ্গাপুরে বোমা পড়িল, অমনি কলিকাতা জনশূন্য হইয়া গেল। আবার শত্রুকর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইয়া আসাম এবং পূর্ব্ব-বাংলা যখন আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইল তখন জনশূন্য কলিকাতা নগরী পুনরায় লোকে ভর্ত্তি হইয়া গেল। এই যুদ্ধের মধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী ইট, কাঠ, চূণ সুর্কি গবর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুদুর্লভ হওয়ায় সাধারণ গৃহস্থের বাসোপযোগী ইমারত বা ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারিতেছে না, ফলে বাড়্‌তি জনসঙ্ঘের বসবাসের অসুবিধার অবধি নাই। যুক্তরাষ্ট্রে অবলম্বিত পন্থাগুলি আংশিক ভাবে অনুসৃত হইলেও লোকের এতখানি কষ্ট ও দুর্ভোগ হইত না।

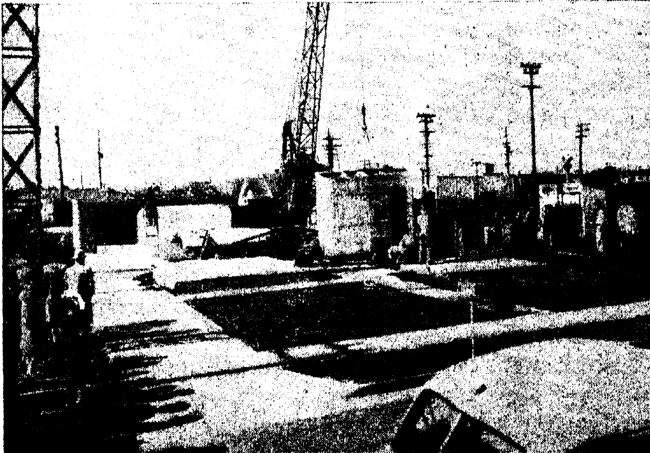
...এ তো কলিকাতার মত শহরের অবস্থা। এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নগরে ও গ্রামে বোমা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে ঘরবাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই। সে-সব স্থলে মানুষের বাসোপযোগী গৃহ পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তেমনি অজস্র মালমশলা ও জিনিষপত্রেরও আবশ্যক। বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলের গৃহাদি পুনর্নির্ম্মাণ কল্পেও যুক্তরাষ্ট্রের এই গৃহ-নির্ম্মাণ পদ্ধতি খুবই কার্য্যকর হইবে।

আমেরিকায় এক নূতন ধরণের গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে বাসস্থানের জন্য লোকের যে দুর্ভোগ ঘটিয়াছে ইহার দ্বারা যুদ্ধোত্তর যুগে তাহার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। যুদ্ধের ভিতরেই সামরিক কার্য্যে নিয়োজিত শ্রমিকদের বাসগৃহ সমস্যা ইহা দ্বারা অনেকটা মিটানো হইয়াছে।



গৃহ-নির্ম্মাণের প্রথম পর্ব্ব। রন্ধনশালা এবং স্নানাগারকে আনিয়া ভিতের উপর স্থাপন করা হইয়াছে

আমেরিকা যেমন আজব দেশ, তাহার কার্য্যও তেমনি অভিনব। এই গৃহ-নির্ম্মাণের মধ্যেও তাহা বেশ লক্ষণীয়। গৃহ বলিতে আমাদের মনের মধ্যে বা চক্ষের সম্মুখে কতকগুলি জিনিষ ভাসিয়া উঠে। ভিত্তি বা মেঝে, প্রাচীর, ছাদ, বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, দরজা, জানালা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। মার্কিনেরা এই সকল জিনিষই কন্‌ক্রিট, কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে আলাদা খণ্ডে খণ্ডে তৈরি করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ করিতেছে। ইতিমধ্যেই তাহারা ইহার কার্য্যকারিতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। সমরকার্য্যে নিয়োজিত শ্রমিকদের বাসস্থান সমস্যা সমাধানেই এইরূপ গৃহের উদ্ভব, কিন্তু ইহা যেরূপ সুলভ ও বাসোপযোগী করিয়া তোলা হইতেছে তাহাতে ইহা শীঘ্রই সাধারণের, বিশেষতঃ স্বল্প-আয়ের লোকের বিশেষ গ্রাহ্য হইবে। ধরুন একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কারখানায় ইহার মেঝে, প্রাচীর, ছাদ, দরজা, জানালা, আসবাব সব প্রস্তুত। কারিগরগণ এই সব জিনিস নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া যথাযথ ভাবে বসাইয়া চূণ সুর্কি কি অনুরূপ মশলার সাহায্যে বা পেরেক দিয়া আটকাইয়া দিবে। দেখা গিয়াছে, এইরূপ তিন প্রকোষ্ঠ ও স্নানাগার যুক্ত একখানি গৃহ করিয়া দিতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লাগে। ক্যালিফোর্ণিয়ায় একখানি পাঁচ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট গৃহের খণ্ডগুলি জোড়া-লাগানো মাত্র চৌত্রিশ মিনিটের মধ্যে সম্ভব হইয়াছ।



ছাতের প্রধান অংশ দেয়ালের উপর বসাইয়া গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করা হইতেছে

এই ধরণে প্রস্তুত 'চলমান' গৃহের সুবিধা অনেক। ইহার অগ্নিদগ্ধ বা জলপ্লাবিত হইবার সম্ভাবনা নাই। মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে এই ধরণের গৃহ বিশেষ সুবিধাজনক। প্রথমে সাড়ে ছয় হাজার টাকার মত এরূপ একখানি গৃহে খরচ পড়িবে। পরে এই পদ্ধতি অধিকতর গ্রাহ্য হইলে অধিক সংখ্যায় প্রস্তুত হইবে, ফলে খরচাও হাজারখানেক টাকার মত কমিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একখানি সাধারণ গৃহে তিনটি প্রকোষ্ঠ ও স্নানাগার থাকিবে। ঐ তিনখানির মধ্যে দুইখানি হইবে শয়নাগার

আর একখানি হইবে রান্নাঘর। গদি-আঁটা বড়-ছোট শয্যা দেওয়া থাকিবে শয়নঘরে। আর ইহার প্রাচীরে দেরাজ, প্রসাধন-সজ্জা এবং ভাঁড়ার আঁটা থাকিবে। ঘরগুলিতে বৈদ্যুতিক তার ও গ্যাসের নলও দেওয়া হইবে।

আবার এই গৃহ-খণ্ডগুলি জাহাজে করিয়া বিদেশে চালানও দেওয়া যাইবে। তের শত লোক বাস করিতে পারে এরূপ গৃহসমূহের বিভিন্ন খণ্ড একখানি জাহাজে বোঝাই করিয়াই বিদেশে চালানদেওয়া সম্ভব। শ্রমিকদের গৃহ-সমস্যা মিটাইতে মার্কিনেরা যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে তাহাতে তাহাদের একটি নূতন ব্যবসায়ের পথ খুলিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহাতে যুদ্ধোত্তর যুগে বিভিন্ন দেশের বিধ্বস্ত অঞ্চল আবার সহজেই গৃহ-পরিপূরিত হইয়া উঠা সম্ভব হইবে।



গৃহের অভ্যন্তর-ভাগ নির্ম্মিত হওয়ার পর প্রধান জানালাটিকে নামাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ

যুদ্ধের মধ্যেই এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হইয়া অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই গত দশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে গবর্ণমেণ্ট গৃহ-সমস্যা সমাধানের জন্য আর যে একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক। কলিকাতার মত বড় শহরে ঐ পন্থা অনায়াসে অবলম্বিত হইতে পারে।

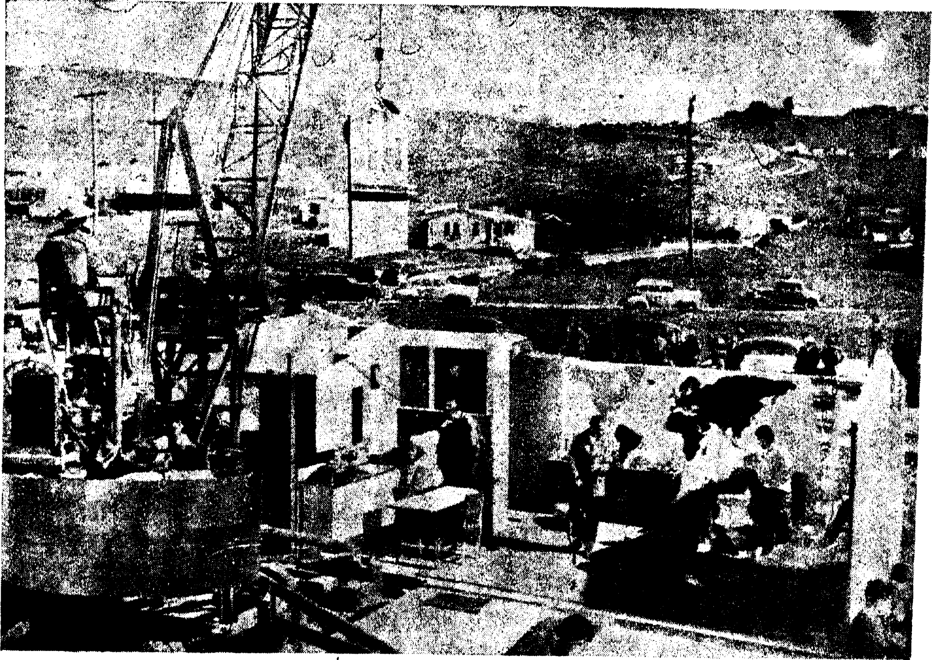
নিউইয়র্কে ১৯৪০ সালের সেন্সাস অনুসারে প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে দশ লক্ষ লোক ছোট ছোট অন্ধকার কুঠরিতে বাস করিত। এইরূপ কুঠরির ভাড়া ছিল মাসে কুড়ি টাকা। বলা বাহুল্য, স্বল্প-আয়ের লোকেরাই এই সব স্থানে বসবাস করিত। আলো-হাওয়াযুক্ত বাসোপযোগী একখানি প্রকোষ্ঠের ন্যূনতম ভাড়া ঐ সময় ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা নিরসনের জন্য জোর প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ সরকারী অর্থে স্বল্প আয়ের লোকেদের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ। এই কার্য্যে এক নিউইয়র্ক শহরেই সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হয়। আমেরিকায় ১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত সরকার বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক গৃহ-নির্ম্মাণের কোন আইন ছিল না। ঐ বৎসরেই নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে এইরূপ গৃহ-নির্ম্মাণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় দুই একর জমির উপরে একটি গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই গৃহে তিন শত চুরাশি জনের বাসোপযোগী এক শত তেইশটি প্রকোষ্ঠ আছে, এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের ভাড়া মাসে কুড়ি টাকা আট আনা ধার্য্য হয়।

কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বড় বড় বাড়ী তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। তেত্রিশ একর জমির উপরে কুড়িটি অংশে বিভক্ত একটি চারতলা বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। এই বাড়ীতে ১,৬২২টি প্রকোষ্ঠ এবং ইহার প্রত্যেকটির মাসিক ভাড়া সাতাশ টাকা চার আনা। এই বাড়ীতে ৫,৯৪২ জন বাস করে। গৃহখানি পূর্ব্ব-পশ্চিমে এরূপ ভাবে তৈরী যে, আলো-হাওয়া প্রতি প্রকোষ্ঠেই প্রবেশ করিতে পারে।



শ্রমিকগণ দরজাসম্বলিত প্রধান প্রাচীরটিকে ঘরের ভিতের সঙ্গে জোড়া দিতেছে



মেঝে, ছাদ ইত্যাদি পূর্ব্বে খণ্ড ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া পরে জোড়া দিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ

প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সঙ্গে একটি জানালাসংযুক্ত বহিঃপ্রকোষ্ঠ আছে। এখান হইতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও উদ্যানক্ষেত্র সম্যক দৃষ্টিগোচর হয়। এই গৃহ এবং ইহার মত অন্য যে-সব বড় বড় বাড়ী তৈরী হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে কাপড় ধোলাই কারখানা, শিশুনিকেতন, ক্লাবঘর, শিল্পাগার এবং শিশু-বিদ্যালয় আছে। এই ধরণের গৃহের প্রকোষ্ঠগুলি সাধারণতঃ এরূপ লোককে ভাড়া দেওয়া হয় যাহাদের আয় ভাড়ার অন্যূন পাঁচ গুণ।



নূতন গৃহে শিশুর সহিত ক্রীড়ারত দম্পতি। পিছনে একটি প্রকাণ্ড জানালার নিকটে সমবেত প্রতিবেশীগণ

উপরে যে গৃহের কথা বর্ণিত হইল তাহার আদর্শে অনুরূপ ভাড়ায় অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট বাড়ীও বিস্তর নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু যাহাতে প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ বা ঘরের ভাড়া আরও কম হয় এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের লোকের বসবাসের পক্ষে সুবিধাজনক হয় এজন্য নূতন ধরণের আরও গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩৯·৭৭ একর জমির উপর নির্ম্মিত একটি গৃহের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই ভবনটি পঁচিশটি অংশে বিভক্ত। ইহাতে মোট ২,৫৪৫টি ঘর বা প্রকোষ্ঠ আছে। এখানকার মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৯,৩৪৭ জন। প্রত্যেকটি ঘরের ভাড়া মাসে সাড়ে সতর টাকা। গৃহের মধ্যে পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি সবই আছে।

৩

নিউ ইয়র্কে সরকারী অর্থে এ পর্য্যন্ত

যত বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে সমাপ্ত একটি গৃহ সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বাড়ীটি ৬১.৯২ একর জমির উপর নির্ম্মিত। ইংরেজী 'y' অক্ষরের আকারে আটাশটি অংশে বিভক্ত। ইহাতে প্রকোষ্ঠ আছে ৩,১৪৯টি এবং বসতি করে ১১,০৬২ জন ; প্রতি প্রকোষ্ঠের ভাড়া মাসে সতর টাকা পনর আনা। যুদ্ধের পূর্ব্বেই এরূপ আর একটি গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের গতিকে শেষ হইতে পারে নাই। এই গৃহটি উপরোক্ত গৃহকেও হার মানাইবে। এই গৃহটি ৩,৫০১টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, এখানে ১৩,০৪০ জন লোক বাস করিতে পারিবে।

এতাদৃশ সরকারী অর্থে যে-সব গৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং যে-সব সম্পূর্ণ হইতে এখনও সামান্য বাকী আছে তাহার সংখ্যা মোট চৌদ্দটি। প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কোটি টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছে। এই সব গৃহে সাড়ে সতর হাজার প্রকোষ্ঠে সাতষট্টি হাজারেরও উপর লোকের বাসস্থানের সংকুলান হইয়াছে। আরও চৌদ্দটি এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে।

যুদ্ধের মধ্যে 'চলমান' গৃহ নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে তাহা যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন দেশে স্বল্প আয়ের লোকের পক্ষে যেমন হিতকর হইবে, নিউইয়র্ক শহরের উক্তরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের বাসস্থান সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হইবে। রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব ভারতবাসীর হস্তে এখনও আসে নাই। এদেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা কি মুনাফার অংশ কিঞ্চিৎ কমাইয়া স্বল্প ভাড়ায় বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণে অগ্রসর হইবেন না ?



যুক্তরাষ্ট্রের একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান

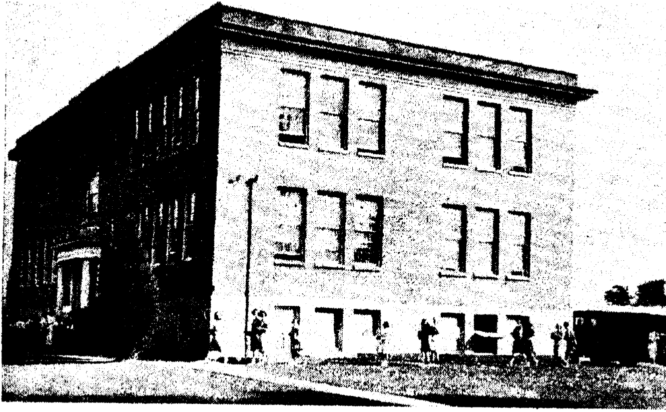
জনস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ

সম্প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, যুদ্ধ থামিয়া গেলেও সামরিক প্রয়োজনে যে-সব হাসপাতাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া না হয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে সরকারী কি বেসরকারী যতটুকু ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল, বঙ্গদেশে প্রতি চল্লিশ হাজারে একজন মাত্র চিকিৎসক আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপে সম্ভবে ? অন্যান্য বিষয়ের মত জনস্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে তাহাও সম্প্রতি জানা গিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পল্লীতে জনপদে সমবায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। এইরূপ হাসপাতালের একটি বিবরণ দিতেছি। টেনেসি জেলার আমহার্ষ্টে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র চারি জন লোকের মাথায় এই ধারণাটি উদিত হয় যে, স্বল্প পুঁজি বা স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য একটি সমবায় হাসপাতাল স্থাপন করা যায় কিনা। প্রথমে সামান্য পুঁজি লইয়া একটি গৃহে রঞ্জন-রশ্মি, সাতটি রোগীর শয্যা এবং অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র সহ এইরূপ হাসপাতাল খোলা হয়। ইহার এগার মাস পরে ১৯৪০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর এই গৃহের সঙ্গে আরও চৌদ্দটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইল। ইহার পরে ক্রমে সমগ্র বাড়ীটিই দ্বিতল করা হইয়াছে। শয্যাসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। চারিজন সদস্য লইয়া এই সমবায় হাসপাতালটি আরম্ভ হইয়াছিল,



উত্তর পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্কুলগৃহ। এ ধরণের গৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্য অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়



যুক্তরাষ্ট্রের একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়। ডানদিকে স্কুল-'বাস'

১০ই মে এই হাসপাতালটি স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। প্রথম প্রথম কেহ তাঁহাদের অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়াছে, কেহ বা করে নাই। কিন্তু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর যোগ্য চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসিত হইয়া যখন চাঁদাদাতা সভ্যগণ নিঃসন্দেহে উপকৃত হইতে লাগিল তখন সাধারণে ইহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। একটি ক্ষুদ্র জনপদে যেরূপ সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, ব্যাপক ভাবে তাহাতে আরও সাফল্যলাভ সম্ভব। আমাদের দেশে—যেখানে হাসপাতাল এবং ডাক্তার দুইয়েরই অভাব এবং যেখানকার লোকের জীবনযাত্রার মান নিতান্তই নিম্নস্তরের, সেস্থলের পক্ষে সমবায় হাসপাতাল একান্ত প্রয়োজনীয়। কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া আমহার্ষ্টের আদর্শে হাসপাতাল যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে সেখানে যোগ্য চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া রোগ প্রশমন এবং রোগের মূল কারণ বিদূরণ উভয় দিকেই দরিদ্র দেশবাসী উপকৃত হইতে পারিবে।

এ তো গেল একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের কথা। সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বিতীয় মহাসমরে সৈন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে-সব আয়োজন করিয়াছে তাহা হইতেও শিখিবার অনেক কিছুই আছে। এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরে মধ্য-আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহের জঙ্গলে পর্য্যন্ত সৈন্যদের যাইতে হইয়াছে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি যে-সব রোগ-বীজাণু ঐ সকল অঞ্চলে রহিয়াছে তাহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সামরিক বাহিনীর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যথাসময়ে

আর এখন এই হাসপাতালের চাঁদাদাতা সদস্যসংখ্যা হইয়াছে ১৪৭০ জন। পাঁচ বৎসরে একটি নাতিবৃহৎ জনপদে এতগুলি সদস্য কিরূপে ইহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিত হইল সে কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

ওকলাহামার এল্‌ক নগরীতে একটি সমবায় হাসপাতাল আছে। সেখানে গিয়া সমবায় হাসপাতাল পরিচালনা কিরূপে সম্ভব কোন কোন সদস্য তাহা দেখিয়া লইলেন। হিসাবপত্ররক্ষা, চাঁদা আদায় প্রভৃতি কার্য্য হইতে চিকিৎসকগণ মুক্ত। তাঁহারা রোগী চিকিৎসায়ই সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত। চিকিৎসকের উপর ভার দিয়া রোগী নিশ্চিন্ত। কারণ সে জানে অনাবশ্যক বোধে বা অর্থলোভে চিকিৎসক তাহার উপর কোনরূপ অস্ত্রোপচার বা অযথা ঔষধ প্রয়োগ করিবেন না। সাধারণ লোকে সমবায় হাসপাতালের দিকে এই কারণে বেশী ঝুঁকিয়াছে যে, মাসান্তে দেয় চাঁদা দিলেই চিকিৎসকের প্রাপ্য সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কি উপায়ে রোগের উপশম হইবে এবং কি উপায়েই বা তাহার মূল কারণ বিদূরিত হইবে চিকিৎসকগণ তাহার উপায় করিয়া দেন। সমবায় হাসপাতাল সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখিতে হইবে—(১) আর্থিক বা বৈষয়িক দিক সম্পূর্ণ অ-চিকিৎসকদের হাতে রাখিতে হইবে, (২) চিকিৎসা-বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য চিকিৎসকগণের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে।

আমহার্ষ্টে নয় জন সদস্য লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হয়। তাঁহারা সরকারে আবেদন করিয়া ১৮৪০,



ইণ্ডিয়ানা ষ্টেটে আধুনিক কালে নির্ম্মিত পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি রাজপথ

প্রতিষেধক পন্থা অবলম্বিত হওয়ায় সমূহ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। রোগ-বীজাণুবাহী মশা, মাছি ও নানারকম কীট-পতঙ্গের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই গবেষণা চলিতেছিল। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের একটি সঙ্কটপূর্ণ সময়ে এই সবের প্রতিষেধক 'ডিডিটি' নামক একটি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পদার্থটি দ্বারা মশা, মাছি, আর-পোকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ মারিয়া ফেলা যায়। ইহা একরূপ চূর্ণীকৃত গুঁড়া, কাপড়-চোপড়ে মিশাইয়া দিতে হয়। বিমান হইতে এই গুঁড়া জলে ফেলিয়া দিলে সেখানকার মশা মরিয়া যাইবে, আর ডিম পাড়িতে পারিবে না। পূর্ব্বকালে টাইফয়েড ব্যাধিতে সৈন্য-বাহিনীর সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান একারণ ব্যর্থ হয়। ১৯১৮ সালে সোভিয়েট বাহিনীর বিস্তর সেনা এই রোগে মারা যায়। কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বে নেপল্‌সে সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে টাইফয়েড আরম্ভ হইলে এই 'ডিডিটি'ই ধন্বন্তরির কার্য্য করিয়াছে, কারণ ইহা টাইফয়েড বীজাণুও ধ্বংস করে। যুদ্ধোত্তর কালে 'ডিডিটি' বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হইলে তথাকার অধিবাসিবৃন্দকে বহু রোগের হাত হইতে মুক্ত করিবে। সিফিলিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধকও এই যুদ্ধের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সব রোগ নিরাকরণে প্রযুক্ত হইতেছে। যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক এখন পর্য্যন্ত তেমন কিছু আবিষ্কৃত না হইলেও ইহার কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার প্রতিষেধক আবিষ্কারেও চিকিৎসকগণ লিপ্ত রহিয়াছেন।



আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যে একটি রাস্তার উপর কাঁকর বিছানো হইতেছে

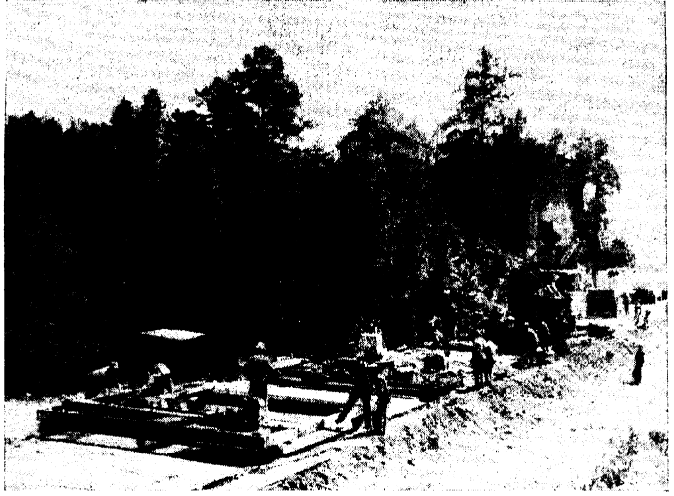
জনস্বাস্থ্যরক্ষার উপায় এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার ও প্রয়োগে রাষ্ট্র-সংঘ দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতা তখন সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইবার উপায় হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমর অন্তে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অভাব খুবই অনুভূত হইবে।

জনশিক্ষা

আধুনিক কালে শহর ব্যবসা-বাণিজ্যের মত শিক্ষা-সংস্কৃতিরও কেন্দ্রস্থল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সারস্বত-সমাজ শহরে কতই না আছে। অথচ পল্লীতেই জনসংখ্যার বেশীর ভাগ বাস করে। তাহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির কিরূপে উন্নতিসাধন করা যায় তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নায়কগণ এ বিষয়েও খুবই অবহিত হইয়াছেন। নিউইয়র্ক ষ্টেটের বিভিন্ন জেলায় এই জন্য যে-যে পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। সেখানে পূর্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় স্কুল ছিল। ইহাতে প্রতি জনপদের লোকসমষ্টির মধ্যে রেষারেষি দলাদলি লাগিয়াই থাকিত, আর অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষা-সরঞ্জাম কিছুই সংগ্রহ করা যাইত না। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন জেলার কথা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী প্রস্তুত করিবার জন্য দুই তিন মাইল, এমন কি এক মাইল অন্তরেও এক সময় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পাড়িয়াছিল। অথচ একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে হইলে মাসে যে পরিমাণ খরচ তাহার সামান্য অংশও দরিদ্র গ্রামবাসীর দিবার শক্তি নাই। এ কারণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনেক স্কুল উঠিয়া গিয়াছে, যেগুলি উঠিয়া যায় নাই সেগুলিও অর্থাভাবে জীবন্মৃত হইয়া আছে।

এই ধারা শুধু বঙ্গদেশে নহে অন্যান্য দেশেও আছে, এমন কি আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকাতেও আছে। তবে সেখানে ইহার প্রতিষেধকল্পে চেষ্টাও ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। নিউইয়র্কের পল্লী-অঞ্চলেও এইরূপ বহু বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু ছেলেদের সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিতে হইলে যেরূপ শিক্ষিত (trained) শিক্ষক এবং উপযুক্ত সরঞ্জাম আবশ্যক তাহা এ সব স্কুলে সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্য সেখানেও জেলায় জেলায় বহু গ্রাম ও পল্লী লইয়া কেন্দ্রীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। দূরবর্ত্তী ছেলেমেয়েরা বাসে বা অন্যবিধ যানবাহনে প্রতিদিন এখানে আসিয়া পড়াশুনা করে।

বিগত ১৯২৫ সাল হইতে নিউ ইয়র্কে এইরূপ কেন্দ্রীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। এই হিতকর পদ্ধতিটি এতই জন[illegible] হইয়া উঠিয়াছে যে কুড়ি বৎসরের মধ্যে চার হাজার স্কুল তিন শত এগারটি কেন্দ্রীয় স্কুলে পরিণত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের কোন বড় গঞ্জে বা বড় রাস্তার চৌমাথায় এইরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যাহাতে স্কুলের এলাকার মধ্যবর্ত্তী ছেলেমেয়েরা আসিয়া এখানে পড়াশুনা করিতে পারে। রাস্তাঘাটের প্রসার ও যানবাহনের উন্নতি এরূপ কেন্দ্রীয় স্কুল প্রতিষ্ঠায় কম সাহায্য করে নাই, দূরদূরান্ত হইতে ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসিয়া পড়াশুনা করিতে পারে।



মিসিসিপি ষ্টেটের দক্ষিণ অঞ্চলে কংক্রিটের দ্বারা রাস্তা নির্ম্মাণকার্য্য

ছেলেমেয়েরা কোন্ কোন্ স্কুলে পড়িবে তাহা আগে হইতেই ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। এক একটি স্কুলের এলাকাকে 'স্কুল ডিষ্ট্রিক্ট' বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কার্য্য সরকার-অনুমোদিত। এই সব স্কুলের পরিচালন-ভার স্থানীয় চাষী ও অন্যান্য লোকের উপর। বাহিরের লোকেরা তাহাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বহু গ্রাম মিলিয়া এই স্কুল স্থাপিত হওয়ায় ইহার আর্থিক সঙ্গতিও যথেষ্ট। সুদৃঢ় ইমারত, সুন্দর আসবাবপত্র, যোগ্য শিক্ষক, উপযুক্ত শিক্ষা-সরঞ্জাম—এ ধরণের স্কুলে কোনটিরই অভাব নাই। গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগার, অভিনয়-গৃহ, পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দোকান সবই এখানে রহিয়াছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থারও অভিনবত্ব আছে। আমাদের দেশের ন্যায় একটি কেন্দ্রীয়টি প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশমত, স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া, সকল স্কুলেই একই রকম পাঠ্যতালিকা অনুসরণের রেওয়াজ এই সব বিদ্যালয়ে নাই। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে অঞ্চলে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপযোগী বিশেষ শিক্ষাও এখানে দেওয়া হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ব্যবসা-বিদ্যা, শারীরচর্চ্চা, সেবা, কৃষি, সঙ্গীত, অভিনয়, পাঠাগার-পরিচালনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ও উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় স্কুল অঞ্চলে ছোট ছোট স্কুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে, তবে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে ইহারই অধীনে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কেন্দ্রীয় স্কুলের আদর্শে আমেরিকার অন্যত্রও 'শিক্ষা-জেলা' গঠনের আয়োজন হইতেছে। মার্কিনদের এই প্রচেষ্টা হইতে আমাদেরও অনেক কিছু শিখিবার আছে। এই ব্যবস্থা হুবহু অনুকরণের পক্ষে বিশেষ বাধা রহিয়াছে সত্য, কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত নাই, আবার কোন কোন অঞ্চল নদনদী-বহুল। এরূপ ক্ষেত্রে পঁচিশটি কি পঞ্চাশটি গ্রাম একত্র হইয়া এক একটি কেন্দ্রীয় স্কুল গঠন করা এখানে হয়ত সম্ভবপর নয়, তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, এই মূলনীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে অন্ততঃ দশটি গ্রাম লইয়াও আমরা এক একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি। তাহাতে যেমন সাধারণের অর্থভার লাঘব হইবে তেমনি স্কুলের সাজসরঞ্জামও পরিপাটী করিয়া লওয়া যাইবে। শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার, কেন্দ্রীয় স্কুল দ্বারা দুই-ই হওয়া সম্ভব।

কৃষিকার্য্য এবং কৃষি ও শিল্প গবেষণাগার

শিল্প-বাণিজ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও, আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিই তাহার উন্নতির মূল ভিত্তি। শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে গেলে কাঁচা মালের প্রয়োজন। ব্রিটেনে কাঁচা মাল নাই, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ তাহাকে ইহা জোগায়। কিন্তু বিপৎকালে, যেমন সদ্য গত মহাসমরের সময়ে, বিদেশের উপর নির্ভর করা সম্ভব নহে ও সমীচীনও নহে। আমেরিকাকে কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয় না। তাহার শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল সেদেশেই জন্মায়। এ দিক দিয়া প্রায় সকল প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের উপরই তাহার সুবিধা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কৃষি-বিভাগ আমাদের দেশের সরকারী কৃষি-বিভাগের মত নির্জ্জীব বা নিষ্ক্রিয় নহে। যুদ্ধের মধ্যে 'অধিক শস্য ফলাও' প্রভৃতি বিজ্ঞাপন মারফত কাগজ-পত্রে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে বটে, তবে শান্তির সময়ে তাঁহারা কি করেন তাহার পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগ কৃষককুলের প্রতিনিধিরূপে শস্যাদি উৎপাদনে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করেন। উন্নত ধরণের বীজ শস্য বিতরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হইয়া ইহাকে সুপক্ক অবস্থায় ঘরে আনিতে যত কিছু আয়োজন ও প্রচেষ্টা আবশ্যক, সকল ক্ষেত্রেই কৃষি-বিভাগ কৃষকদের সহযোগিতা করিয়া থাকেন।

জিনিষপত্র উৎপাদন ব্যবস্থার সাহায্য করিয়াই কৃষিবিভাগ তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন না, উৎপন্ন শস্য সংরক্ষণের পন্থাও তাঁহারা বাতলাইয়া দেন। ভূমি, জল, আলো শস্যোৎপাদনের পক্ষে যে তিনটি প্রধান আবশ্যক তাহার সম্বন্ধে গবেষণায় এই বিভাগ অগ্রণী। কৃষি-বিভাগ কৃষিবিষয়ক গবেষণা, পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং সংবাদ-সরবরাহ প্রধানতঃ এই চারিটি বিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কৃষি-

বিভাগের গবেষণা-কেন্দ্র মেরিল্যাণ্ডের বেলট্সভিলে অবস্থিত। কৃষি-বৈজ্ঞানিকগণ এখানকার গবেষণাগারে কৃষি-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের গবেষণায় রত থাকেন। বঙ্গদেশে কৃষির প্রধান অবলম্বন গো-মহিষ; সময় সময় মড়ক লাগিয়া ইহারা এত মারা যায় যে কৃষকের চাষবাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আমেরিকার চাষ-আবাদে গো-মহিষের ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও ইহাদের ব্যাধি প্রতিষেধক সম্বন্ধেও গবেষণা চলে। এই গবেষণা-কেন্দ্রে মানুষের গ্রহণোপযোগী খাদ্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। কি উপায়ে দোষবিমুক্ত ভাবে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তাহাও এখানকার গবেষণার বিষয়। অরণ্যানী সংরক্ষণও কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত। কাঠ কিরূপে বিভিন্ন উপায়ে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করা যায় তাহার গবেষণা এখানে হইয়া থাকে।

কৃষির সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ। যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা কৃষি সুনিয়ন্ত্রণে যেমন মনোযোগী, শিল্পের উন্নয়নেও তাহার চেয়ে কম অবহিত নহে। অতি কুৎসিত নগণ্য জিনিষ হইতেও তাহারা উপকারী মনোরম জিনিষ তৈয়ার করিয়া লয়। গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিলে এমনটি সম্ভব হইত না। তাহারা এজন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে কসুর করে না। তাহাদের এই কার্য্য সম্ভব করিয়া দিয়াছে পূর্ব্ব আমেরিকার পিট্সবুর্গস্থ বিখ্যাত শিল্প-গবেষণাগার মেলন ইনষ্টিটিউট। এই গবেষণাগারটির বিষয় জানিতে পারিলে মার্কিনেরা শিল্পোন্নয়নে কতখানি অবহিত সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইবে। এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন রবার্ট কেনেডি ডানকান নামে জনৈক রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। তিনি ১৯০৫-৬ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্প-কারখানা, গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়া বুঝিতে পারিলেন, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতিতে মামুলি প্রথা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের সাহায্য না লইলে উন্নতি অসম্ভব। ইহার পর বৎসর কান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে তিনি ইহার পরিকল্পনা রচনায় অগ্রসর হইলেন। এণ্ড্রু মেলন ও রিচার্ড মেলন—দুই ভ্রাতা ডানকানের এই পরীক্ষণ-কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও এই উদ্দেশ্যে এক দল যুবককে সুশিক্ষিত করার উপকারিতার কথা চিন্তা করিয়া মেলন-ভ্রাতৃদ্বয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মেলন ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন। চৌদ্দ বৎসর পিট্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত থাকিয়া ১৯২৭ সালে ইহা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বরাবর সহযোগিতা করিয়াই চলিতেছে।



মেলন ইনস্টিটিউটে মৃত্তিকা-সম্পর্কিত গবেষণা

১৯৩৭ সালে গ্রীক স্থাপত্যের আদর্শে ইহার নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। (ইহার চিত্র প্রবন্ধের আরম্ভেই দেওয়া হইয়াছে।) এইখানেই এখন গবেষণাকার্য্য চলিতেছে।

মেলন ইনষ্টিটিউটের কর্ম্ম-প্রণালী কিরূপ এখন দেখা যাক্। শিল্প-পরীক্ষণ, ভাবী শিল্পী-বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষাদান, ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ রসায়ন বিদ্যায় গবেষণা, বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ—মোটামুটি এই কয় ভাগে ইহার কার্য্যাবলীকে বিভক্ত করা চলে। শিল্পোৎপাদন কালে কোন কোম্পানী, [illegible]ষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের কোনরূপ বিঘ্ন বা সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহা সমাধানের জন্য এই গবেষণা-কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। ইনষ্টিটিউট একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহা সমাধান করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইনষ্টিটিউট



মেলন ইনস্টিটিউটের শিশু-খাদ্য গবেষণাগার



যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরণের যন্ত্র-সাহায্যে
কার্পাস গাছ হইতে তুলা সংগ্রহ

বিভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নিয়োজিত করিয়া এই সব বিষয় পরীক্ষা করান। এইরূপ বিজ্ঞানীর সংখ্যা সহকারীদের লইয়া মোট ৩৯৫ জন। গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা অবধি প্রায় চারি হাজার প্রতিষ্ঠানের খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া কাচ এবং ইস্পাত পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যার ইহা সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ইন্‌ষ্টিটিউট এরূপ অনেক উপায় বাতলাইয়া দিয়াছেন যাহার ফলে বহু নূতন শিল্প উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এখানে গবেষণার ফলাফল কিঞ্চিদধিক দুই হাজার পুস্তকে এবং বিভিন্ন পুস্তিকায় ও নানা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নূতন আবিষ্কারের জন্য প্রায় আঠার শ' পেটেন্টের মঞ্জুরি লাভ করিয়াছে। ধুঁয়া, ধুলি এবং দন্তরোগ, যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক সম্বন্ধেও ইন্‌ষ্টিটিউট দীর্ঘকাল গবেষণায় রত আছেন। মহাসমরকালে এখানকার বৈজ্ঞানিকগণ সিন্‌থেটিক রবারের গবেষণায়ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কারের কথা বলিতে গেলে আমাদের সুজলা নদীবহুলা বঙ্গভূমির কথা স্বতঃই মনে হয়। ডক্টর মেঘনাদ সাহা বাংলাদেশের নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার সম্বন্ধে বহু বর্ষ যাবৎ আলোচনা করিয়াছেন। "River Physics" বা নদী-বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্যও তিনি সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিছু কাল পূর্ব্বে ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গদেশের মদনদী সম্বন্ধে বক্তৃতাদান কালে বলিয়াছিলেন যে, নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কারের আশু ব্যবস্থা না হইলে বিশাল কলিকাতা নগরী একদা একটি নগণ্য জনপদে পরিণত হইবে। দুই বৎসর পূর্ব্বেকার দামোদর বন্যার সময় ডক্টর সাহা বলিয়াছিলেন যে, দামোদরের স্রোত যেরূপ ক্রমে নিম্নগামী হইতেছে তাহাতে কলিকাতা নগরী হয়ত একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে। নানা কারণে বঙ্গদেশের এক দিকে নদী মজিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে মারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জনপদ ধ্বংসপূর্ব্বক নরনারীকে গৃহহীন করিয়া সাগরে লীন হইতেছে। মজানদীর সংস্কার ও বেগবতী নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য এ যাবৎ কোনই উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই, অথচ দেশের গবর্ণমেণ্ট ইহার ভার না লইলে এ বিষয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বার চৌদ্দ বৎসর যাবৎ অবিরত চেষ্টা করিয়া কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অনেকেই অবগত আছেন, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিশ্বব্যাপী বাজার মন্দার সময় বেকার ও দারিদ্র্য নিরসনকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে যে-সব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল—নদীর জল সংরক্ষণ করিয়া শুষ্ক অনুর্ব্বর অনাবাদী লক্ষ লক্ষ একর ভূমিতে আবশ্যকমত সরবরাহ করা ও তাহাকে শস্যশ্যামল করিয়া তোলা এবং স্রোতস্বিনীর গতিবেগ ধরিয়া তাহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্ব্বক কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে এবং সাধারণের প্রয়োজনে তাহা লাগানো। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাঁহার আনুকূল্যে 'টেনেসী-ভ্যালি অথরিটি' গঠিত হয় এবং কংগ্রেসে ইহা পাস করাইয়া আইনসিদ্ধ করিয়া লন। এই টেনেসী ভ্যালি অথরিটি বা সংক্ষেপে 'টি ভি এ'র (TVA) বিষয় নদী-বিজ্ঞান গবেষণা-রত শ্রীমান্ কমলেশ রায় গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। টেনেসী নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণের ফলে লক্ষ লক্ষ একর জমি উর্ব্বরা হইয়াছে, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হইয়া কৃষি শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। নদীতে বার মাস জল থাকায় নৌকায় ও বাষ্পীয় পোতে জিনিষপত্র স্থানান্তরে চলাচলেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নদীর বিভিন্ন স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বড় বড় বাঁধ দিয়া জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। গত বার বৎসরের মধ্যে টেনেসী নদীতে ষোলটি বড় বড় বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। সাতটি ষ্টেটের ভিতর দিয়া এই নদী প্রবাহিত। কাজেই এই পন্থা অবলম্বনে সাতটি প্রদেশই বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছে।

নদী সংস্কারেও যুক্তরাষ্ট্র-সরকার সবিশেষ অবহিত। সেচ-বিভাগ এইরূপ বহু নদীর সংস্কার সাধন করিয়াছেন। কোলোরাডো নদীর বোল্‌ডার বাঁধ তাঁহাদের একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই বাঁধের দরুন ঐ অঞ্চলে প্লাবনে অন্যূন লক্ষ লোকের যে-সব ক্ষতি হইত প্লাবন বন্ধ হওয়ায় তাহা হইতে ইহারা রেহাই পাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কুড়ি লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার এক-তৃতীয়াংশে এখনই চাষাবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূল অঞ্চলে গৃহস্থ, শিল্পকর্ম্ম ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ হইতেছে এবং নদীর পলি সরাইবার জন্য প্রতি বৎসর যে দশ লক্ষ ডলার ব্যয় হইত

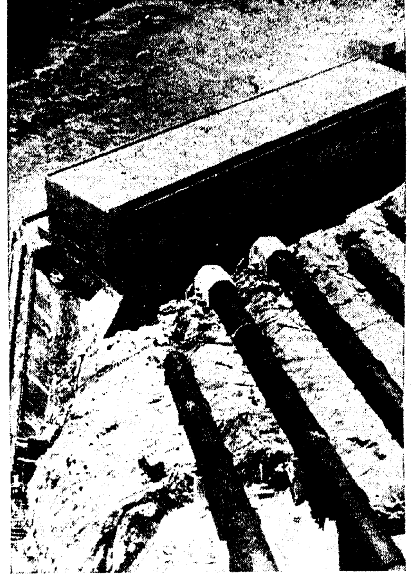
তাহার হাত হইতেও রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, জলযান চলাচল প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বোল্‌ডার বাঁধের মত দক্ষিণ-মধ্য ওয়াশিংটন প্রদেশে গ্রাণ্ড কুলি বাঁধ দ্বারাও ও-অঞ্চলের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। দশ লক্ষ একর শুষ্ক জমিতে জল সরবরাহ এই বাঁধ দ্বারা সম্ভব হইতেছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী শেষ হয়। প্রশান্ত মহাসাগর তীরে যুদ্ধের মধ্যে যে-সব সমর-শিল্প উৎপাদন করা হইয়াছে তাহার বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হইয়াছে এই বিরাট্ বাঁধের ফলে।

কুলি বাঁধের নিম্ন দিকে বনভিল বাঁধ দ্বারাও যুদ্ধকালে আমেরিকাবাসী বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। এখান হইতে যে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইতেছে তাহা এলুমিনিয়াম উৎপাদনে প্রযুক্ত হইতেছে।

মধ্য ক্যালিফোর্ণিয়ায় যে সেচ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে কুড়ি লক্ষ একর শুষ্ক জমিতে সম্বৎসর ধরিয়া জল সরবরাহ হইবে। এ অঞ্চলে ষাষ্টা বাঁধ ও ফ্রায়াণ্ট বাঁধ দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতে পারিবে। ষাষ্টা বাঁধ স্যাক্রামেণ্টো নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করে আর ফ্রায়াণ্ট নিয়ন্ত্রণ করে সান জোয়াকিন নদীর জল। ষাষ্টা বাঁধের ফলে ষাষ্টা পর্ব্বতের উপর একটি সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার ইহা থাকায় বার মাস নদীতে জলযান চলাচলের সুবিধা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নদী-সংস্কার ব্যবস্থা বহু দিনের। কিন্তু নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার জল দ্বারা কৃষি এবং জল-স্রোত হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি আহৃত হইয়া কৃষি শিল্প উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা বেশীর ভাগ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলেই হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে পৃথিবীর অন্যান্য নদীবহুল দেশেও যে তাহা অনুসৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের প্রায় সব



পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া ষ্টেটের ষাস্টা-বাঁধ

প্রদেশেই নদনদী আছে। কোন কোন প্রদেশে যেমন বিশেষ করিয়া পঞ্জাবে, সরকারী সেচ-বিভাগ নদী নিয়ন্ত্রণের দিকে কতকটা অবহিত হইয়াছেন, কিন্তু নদীমাতৃক বাংলায় ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবে আদৌ অবলম্বিত হয় নাই। সমগ্র জাতির যাবতীয় বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে নদী সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের দিকেও আমাদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। যুদ্ধবিরতির ফলে যে সাংঘাতিক বেকার সমস্যা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় নদী সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার অনেকটা লাঘব হইবে।

ঢাকা নগরীর নাম

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

কিছুকাল পূর্ব্বে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও লেখবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগন্নাথ আমাকে ঢাকা নামটির অর্থ ও প্রাচীনতা সম্পর্কে পত্রযোগে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছি, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পণ্ডিতসমাজের বিবেচনার জন্য উহাই উপস্থাপিত করিব।

গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তদীয় সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অর্থাৎ সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্র হিসাবে সমতট (নোয়াখালি ত্রিপুরা অঞ্চল) ডবাক, কামরূপ (গৌহাটি অঞ্চল), নেপাল এবং কর্তৃপুর (কুমায়ুন-গাঢ়োয়াল অঞ্চল) রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কেহ কেহ এই ডবাক নামের সহিত ঢাকা শব্দটির সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া উহাই ঢাকার প্রাচীন রূপ এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কেহই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন ডবাকরাজ্য বর্ত্তমান আসামের অন্তর্গত নওগাঁ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল যদিও এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগকে নিঃসন্দিগ্ধ করিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে। যাহা হউক, আজ-কাল কেহই আধুনিক ঢাকাকে গুপ্তযুগের ডবাকরাজ্য বলিয়া মনে করেন না।

সাধারণের বিশ্বাস, ঢাকা নগরীর সমৃদ্ধি ও গৌরব মুঘল-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। সত্যই হিন্দু আমলের কোন দলিলপত্রে ঢাকার উল্লেখ নাই। হিন্দুযুগের শেষভাগে ঢাকা অঞ্চলে অব-স্থিত সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর নগর পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায়। এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন,

প্রাচীন বিক্রমপুর নগর বহুকাল পূর্ব্বেই নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পূর্ব্বভারতে মুসলমান-অধিকার বিস্তারের অনেক দিন পরেও কিন্তু ঢাকা নগরীর অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাই না। এই সময়ে ঢাকার নিকটবর্ত্তী সমৃদ্ধ সোনারগাঁ নগর পূর্ব্ববাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্রের গৌরব লাভ করে। কেহ কেহ সোনারগাঁকেই মধ্যযুগের বৈদেশিকগণের উল্লিখিত "বঙ্গাল"নগরী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুঘল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শেখ আলাউদ্দীন ইস্‌লাম খাঁ (১৬০৮-১৩ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম খাঁ ঢাকা নগরীতে একটি ইষ্টকের দুর্গ এবং একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান এবং তৎকালীন মুঘল সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীর নগর। এই সময় হইতেই ঢাকার রাজনৈতিক গৌরব সূচিত হয়। কথিত আছে, বাংলার পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে উপদ্রবকারী মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন করাই ইস্‌লাম খাঁর রাজধানী পরিবর্ত্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

অতএব ঢাকানগরীর সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক গৌরবের সূচনা মুঘল আমল হইতে; কিন্তু প্রাক্-মুসলমান যুগেও সম্ভবতঃ স্থানটির কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। অন্ততঃ ঢাকা নামটি এই অনুমানের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। নামটি স্পষ্টই সংস্কৃত ঢক্ক শব্দের প্রাদেশিক রূপ। কহ্লণ পণ্ডিতকৃত রাজতরঙ্গিণী সংজ্ঞক কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ক্রমবর্ত্তাভিধানে স প্রদেশে প্রাপ্তবাংস্ততঃ।
ঢক্কং কাম্বুবনামানং যোঽস্থ শূরপুরেঽস্থিতঃ॥ ৩।২২৭

"অতঃপর তিনি (মাতৃগুপ্ত) ক্রমবর্ত্তপ্রদেশে পৌঁছিয়া কাম্বুবনামক ঢক্ক দেখিতে পাইলেন। উহা বর্ত্তমানে শূরপুরে রহিয়াছে।"

স্বকৃতে পত্তনবরে তেন শূরপুরাভিধে।
ক্রমবর্ত্তপ্রদেশস্থো ঢক্কোঽভূদ্ বিনিবেশিতঃ॥ ৫।৩৯

"তিনি (কাশ্মীরপতি অবন্তিবর্ম্মার মন্ত্রী শূরবর্ম্মা) শূরপুর সংজ্ঞক স্বনির্ম্মিত পত্তনে ক্রমবর্ত্ত প্রদেশের ঢক্ক সন্নিবেশিত করিলেন।"

ঢক্ক এবং ঢক্কা শব্দ মূলতঃ অভিন্ন মনে করা যায়। সুতরাং পণ্ডিতেরা সত্যই অনুমান করিয়াছেন যে, শূরপুরে (বর্ত্তমান হুরপোর) প্রাচীন কাশ্মীর রাজ্যের একটি "প্রহরিনিবাস"(watch station) অবস্থিত ছিল। শত্রুসৈন্যের আগমন অথবা অনুরূপ কোন বিশেষ ঘোষণা প্রকাশের জন্য ঐ স্থানে রক্ষিত ঢক্কা নিনাদিত হইত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রাজতরঙ্গিণীতে "প্রহরিনিবাস" অর্থেই ঢক্ক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, "প্রহরিনিবাসের ঢক্কা" অর্থে নহে। এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত; কিন্তু তাহা হইলে কাম্বুব শব্দটিকে স্থানের নাম হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ মাতৃগুপ্ত ক্রমবর্ত্ত প্রদেশের কাম্বুব নামক স্থানে যে ঢক্ক বা "প্রহরিনিবাস" দেখিয়াছিলেন, উহাই পরবর্ত্তী কালে উক্ত প্রদেশস্থিত শূরপুরে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং ঢক্ক শব্দের অর্থ স্থায়ী প্রহরিনিবাস। যুদ্ধকালে সেনাসন্নিবেশের সন্নিকটে এবং শত্রুর সম্ভাবিত আগমন-পথে সাময়িকভাবে প্রহরী স্থাপনের ব্যবস্থাও রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। গজনীর সুলতান মহমুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পঞ্জাবের শাহিরাজ ত্রিলোচন পাল কাশ্মীরেশ্বর সংগ্রামরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। কাশ্মীরের প্রবীণ সেনাপতি তুঙ্গ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়া তৌষীনদীর তীরে গিরিতটে সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তদীয় সেনাদলে প্রজাগর (night watch), চরন্যাস (posting of scouts) এবং শস্ত্রাভ্যাস (military exercise) প্রভৃতির কোন বন্দোবস্ত না দেখিয়া শাহিরাজ তুঙ্গকে তৎসম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন করিতে এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণের অপেক্ষায় নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে পরামর্শ দেন। উদ্ধত কাশ্মীর-সেনাপতি ত্রিলোচন পালের সুপরামর্শে কর্ণপাত না করার ফলে মুসলমান আক্রমণে অবিলম্বে বিশাল হিন্দুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কহ্লণপণ্ডিত তৌষীনদী-তীরের যুদ্ধের অতি মনোহর বিবরণ দিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ শাহিরাজের সামরিক প্রতিভার প্রশংসা এবং কাশ্মীর সেনাপতির নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণী, ৭।৪৭-৬৯ দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান ঢাকা প্রাচীনকালে হিন্দু রাজগণের একটি স্থায়ী প্রহরিনিবাস ছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং প্রাক্-মুসলমান যুগেও স্থানটির কিছু রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এই সম্পর্কে অপর একটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে আমি 'শাব্দিক পুরুষোত্তম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে পুরুষোত্তমবিরচিত 'প্রাকৃতানুশাসন' সংজ্ঞক প্রাকৃত-ভাষার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছি। বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলেও গ্রন্থখানি যে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার একখানি পাণ্ডুলিপি নেপালের নেওয়ার সংবতের ৩৮৫ বর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসে লিখিত হইয়াছিল।*

নেওয়ার সংবতের গণনা ৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়; সুতরাং উক্ত পুথির লিপিকাল ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। যাহা হউক, এই গ্রন্থে (১৮।২৩) কতকগুলি অপভ্রংশ বিভাষার বর্ণনা দেখা যায়; তন্মধ্যে একটির নাম ঢক্কভাষা। এই ঢক্কভাষার সহিত আমাদের ঢক্ক অর্থাৎ ঢাকার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাই বিবেচ্য। প্রাচীনকালে আধুনিক পঞ্জাবের শিয়ালকোট এবং বিপাশানদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি দেশের নাম ছিল টক্ক। প্রশ্ন এই যে, পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন টক্কদেশ এস্থলে ঢক্ক নামে অভিহিত হইয়াছে কি না। প্রাকৃতানুশাসনে (১৬।১) "টক্কদেশীয়া বিভাষা"র স্বতন্ত্র উল্লেখ হইতে কিন্তু এইরূপ ধারণা সমর্থিত হয় না। এদিকে ঢাকা ব্যতীত অপর কোন স্থানের সহিত পুরুষোত্তমের ঢক্ক-

* মৎকৃত *A Grammar of the Prakrit Language* (Calcutta University, 1943) 106 ff. দ্রষ্টব্য।

ভাষা সম্পর্ক অনুমান করাও কঠিন; কারণ অনুরূপ কোন স্থানের নাম আমাদিগের অজ্ঞাত। আবার ঢাকা অঞ্চলের ভাষা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঢক্ক ভাষা সংজ্ঞায় বিখ্যাত ছিল, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তিরও সঙ্গত কারণ আছে। কোন স্থানের নাম একটি ভাষার সহিত সংযুক্ত হইলে বুঝা যায় যে, দেশীয় সংস্কৃতিতে ঐ স্থানের একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা আছে। হিন্দু আমলে যখন নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুরে দেশের শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল, তখনও ঢাকার ঐরূপ কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নহে। তবে আমার বিবেচনায় উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে, কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও, পণ্ডিতবর পুরুষোত্তম সম্পর্কে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদতিরিক্ত দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে। গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৬৬) শ্রীযুক্ত বৃন্দাবননাথ শর্ম্মা উৎকলদেশীয় কিংবদন্তী এবং কবিচরিত সংজ্ঞক একখানি আধুনিক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী, একাক্ষরকোষ প্রভৃতি অভিধান-রচয়িতা পুরুষোত্তম উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় নরপতি কপিলেন্দ্রের পুত্র রাজা পুরুষোত্তম (আনুমানিক ১৪৭০-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যতীত অপর কেহ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রান্ত; কারণ ত্রিকাণ্ড-শেষ, হারাবলী প্রভৃতি অভিধান ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের "টীকাসর্ব্বস্ব" সংজ্ঞক অমরকোষটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। Th. Zachariae, *Ind. Woerterbuecher*; *Bezz. Beitr.* X, p. 122 ff: Kieth, *Hist. sans Lit*, p. 414; *Hist, Beng*, I, p. 35 ff. ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। পুরু-ষোত্তমকৃত উণ্মভেদ, দ্বকারভেদ, শব্দভেদপ্রকাশ প্রভৃতি নানা অভিধান-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর উৎকলরাজ পুরুষোত্তম সম্ভবতঃ অনুরূপ কোন কোষ-গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এবং সেইজন্যই স্বদেশীয় জনশ্রুতিতে তাঁহার নাম সুপ্রসিদ্ধ শাব্দিক পুরুষোত্তমের গ্রন্থাবলীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। উড়িষ্যার মারাঠা অধিকার-কালে উক্ত জনশ্রুতি মহারাষ্ট্র দেশে সংক্রামিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একাক্ষর কোষের বড্‌লীয়ন লাইব্রেরির পুথিতে গ্রন্থকারের নাম আছে পুরুষোত্তম দেবশর্ম্মা; সুতরাং এ ব্যক্তিকে "ওড়িশ্যা ক্ষত্রিয়" বলা যাইতে পারে না। বৃন্দাবন-বাবু ত্রিকাণ্ডশেষের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের নিতান্তই শোচনীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "জগন্নাথ মন্দিরে রাজা পুরুষোত্তম উপস্থিত থাকিয়া দেবতাগণকে বন্দনা করিতেছেন;" অথচ শ্লোকটিতে জগন্নাথ বা বিষ্ণুর উল্লেখ নাই, ইহা একেবারেই অসম্ভব। "সন্তঃ" শব্দের অর্থ কিরূপে "স্বজনবর্গ" হইতে পারে?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মনে করেন যে, ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তমের বেদবিরক্ত অনুগ্রাহক রাজা লক্ষণ-সেন মগধ বা পীঠীদেশের অধিপতি ছিলেন এবং তিনিই ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত লক্ষ্মণ সংবতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রাচীন লিপিতে এই সংবতের বর্ষ সাধারণতঃ "লক্ষ্মণসেনস্য অতীত রাজ্য সংবৎসরঃ" রূপে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, এস্থলে "অতীত" শব্দ হইতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের অতীততা বা বিগতত্ব বুঝিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক রায় চৌধুরীর সিদ্ধান্ত এই যে, "অতীত" শব্দে অব্দটির বিগত বর্ষ (expired year) বুঝাইতেছে। এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ এই যুগের লিপিমালায় 'বিক্রমাব্দ এবং শকাব্দের বর্ষও কখনও "অতীত" রূপে আবার কখনও বা "বর্ত্তমান" রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।



যোগানন্দ ভুগ্‌তো কেবল
স্নায়ুর পীড়ায়
রাগ ক'রে সে কাঁদ্‌তো
বড় কথায় কথায়।

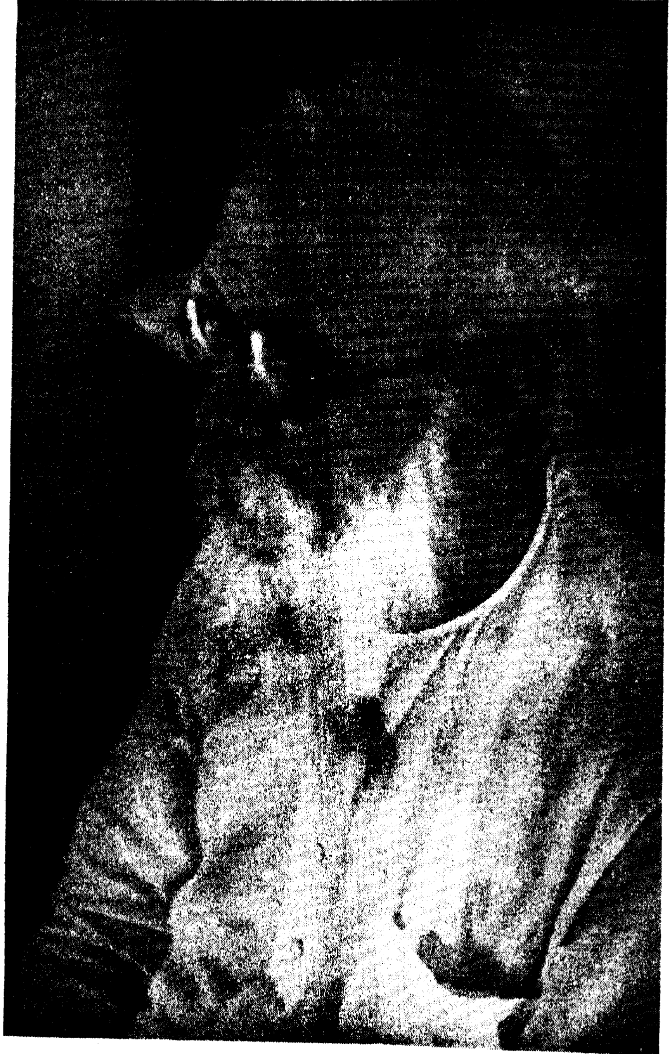
ভুরু কুঁচ্‌কে রইতো
সে দিনরাত,
তার পক্ষে বেঁচে থাকা
এ বড় উৎপাত।

-শ্রীসুধীর খাস্তগীর

মাসিকপত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে বাংলা মাসিকপত্রিকাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সুরুচিপূর্ণ মাসিক সাহিত্য তাঁর হাতেই প্রথমে গড়ে ওঠে। নূতন লেখকদের উৎসাহ দিয়ে তাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থান দেওয়া; কাব্য-বিচারের মান নিরূপণ ও মাসিকপত্রের প্রবন্ধ কবিতাদি নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছিল এবং কি লেখা উচিত এবং কি অনুচিত তারও নির্দ্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, উপরন্তু নূতন লেখকদের সাহিত্য-সাধনায় উৎসাহিতও করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত রীতি বহুদিন পর্য্যন্ত মাসিকপত্র সম্পাদকগণের আদর্শস্থল ছিল।



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তারপর বাংলা সাহিত্যে বহু মাসিকপত্রের উদ্ভব ও বিলুপ্তি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় বার আবির্ভাব হয় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদকতা করেন। কিছুকাল পরে যেন বঙ্গ-সাহিত্যে বান ডাকল—বহু ছোট-বড় মাসিকপত্র প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল। 'প্রবাসী'র আবির্ভাবের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত ও অনুসৃত বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা-পদ্ধতি সমুদয় মাসিকপত্র সম্পাদকগণের আদর্শস্বরূপ ছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁর মাসিকপত্র সম্পাদন নৈপুণ্যের কথাই আলোচিত হবে।

ক্যান্ট বলেছেন, সৌন্দর্য্য হচ্ছে এমন [illegible] যা সকলকে আনন্দ দেয় অথচ যাতে মানুষের [কোন] রূপ স্বার্থ নেই। সুতরাং তা হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ।

পৃথিবীতে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েছে ও মানব-জাতির মহা কল্যাণ সাধন করেছে তাঁদের জীবনী পড়লে দেখা যাবে যে সংসার তাঁদের সমগ্র মনটাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে নি; লাভ লোকসান, সাংসারিক উন্নতি-অবনতি, যশ মান ধন এ-সবের দিকে তাঁরা দৃক্‌পাত করেন নি।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত সাংবাদিক সন্ত নিহাল সিংহ রামানন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে দেখতে পাই কি মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রবাসী সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন। সংসার তাঁকে তাঁর কর্ত্তব্য

কঠিন বন্ধুর পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। ধীর স্থির শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি তাঁর নির্দ্ধারিত কাজ করে চলেছেন, সংসারের অভাব-অনটন এমন কি পত্নী ও সন্তানদের পীড়াও তাঁকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করতে পারে নি। লাভ কিছুতেই দাঁড়াচ্ছে না, সহায়কারী লোকের অভাব, অন্ন-বস্ত্রের ও সংসার প্রতিপালনের খরচ—সবই তাঁকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ থেকে একতিল বিচ্যুত হন নি। অতটা আদর্শবাদী না হলে তিনি পরম সুখে (সাংসারিক সুখ যে অর্থে বুঝায়) থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন অন্য পথ। তাঁর সমগ্র সাধনা নিয়োজিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় একটি আদর্শ মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা করার কার্য্যে এবং তাই তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আমরা বাংলায় পেলাম প্রবাসী, ক্রমে ক্রমে ইংরেজীতে মডার্ণ রিভিউ আর হিন্দীতে বিশাল ভারত প্রকাশিত হ'ল।

রামানন্দ-সম্পাদিত প্রবাসীর একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকে আগাগোড়া অনুধাবন করলে দেখা যাবে, মাসিকপত্র সম্পাদনে কি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত রীতি পরে প্রায় সমুদয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্য প্রাদেশিক ভাষার মাসিক-পত্র সম্পাদকগণ গ্রহণ করেন এবং তাতে করে মাসিক পত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

রামানন্দের প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা গিয়েছে প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ এবং মডার্ণ রিভিয়ুর Notes শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে। প্রবাসীর পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের চেয়েও তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির আকর্ষণ ছিল বেশী। বিবিধ প্রসঙ্গ এবং Notes রচনা করতে তাঁকে অপরিসীম পরিশ্রম করতে হ'ত। দেশের ও গবর্ণমেণ্টের দপ্তরের দৈনন্দিন খবর, দেশ-বিদেশের নানা তথ্যপূর্ণ সংবাদ, জনহিতকর প্রচেষ্টার বিবরণ সবই তাঁকে সংগ্রহ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অধ্যয়নপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছে।

শুধু কবিতা ও প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে নয়, মহিলা-মজলিস, ছেলেদের পাততাড়ি, বেতালের বৈঠক, কষ্টিপাথর, হারামণি শীর্ষক পল্লী-গীতির সংগ্রহ, আলোচনা ইত্যাদি নানা বিভাগের প্রবর্ত্তনে সম্পাদক হিসাবে তাঁর বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যা কদর্য্য, যে সাহিত্য পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে পড়া যায় না, যত কিছু অশোভন ও কুরুচিপূর্ণ লেখা সব তিনি নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করতেন।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের তিনি উপাসক ছিলেন। অসত্য, ভণ্ডামি ও কদর্য্যতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং নিজের সিদ্ধান্তসমূহকে যুক্তি-তর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ।

তাঁর রচিত ও ব্যবহৃত অনেক শব্দ, যেমন সাংবাদিক, ক্ষয়িষ্ণু, কর্ম্মিষ্ঠতা প্রভৃতি শব্দ আমরা এখন খুবই ব্যবহার করে থাকি। মাসিকপত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবর্ত্তিত আদর্শই বহুল পরিমাণে অনুসৃত হয়ে আসছে। তিনি আড়ম্বরহীন তথ্যপূর্ণ লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক নূতন লেখকের লেখা সংশোধন করে তাঁদের তিনি সাহিত্যের আসরে নামিয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম লেখনী পরিচালনা করতেন। তাকে অনেকে কঠোর সমালোচক বলতেন কিন্তু তারাও তাঁকে সত্যসন্ধ বলে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর লেখা খুব জোরালো এবং ওজস্বিতাপূর্ণ ছিল। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "...অবশ্য ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধনার্থ সাদা চামড়ায় কোনো লোক আমাদের দেশে আসিলেই, আমরা বুদ্ধিমান বলিয়া তাহাকে খুব আদর-যত্ন করিয়া থাকি।" আর এক জায়গায় লিখেছেন, "...কিন্তু একজন ফরাসী দেশের পাদ্রীকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পেন্সান প্রদান হইতেই বুঝা যায়, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত যোগ ছিল।"

বাঙালী কি 'ঘরকুনো', 'বাঙালী অবাঙালীর একটি প্রভেদ' প্রভৃতি সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহে তিনি স্বদেশবাসীকে নিজেদের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা ও জড়তা ত্যাগ করে কঠোর পরিশ্রমপূর্ব্বক জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন—'গ্রাম্য বাঙালীকে মধ্যে মধ্যে ঠাঁই নাড়া করিলে হয়তো তাহার কিছু উন্নতি হইতে পারে।'

'চরকা ও স্বরাজ' নামধেয় সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে বলিতেছেন—'পরোক্ষভাবে চরকার প্রচলন দ্বারা স্বরাজ লাভ হইতে পারে' ইহা আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি।...স্বরাজ জিনিষটি শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার নহে। উহা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব ত বটেই; পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্বও বটে।'

তাঁর একান্ত কাম্য ছিল এদেশের নারীদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ। সেজন্য তিনি অবিশ্রান্ত লেখনী পরিচালনা করেছেন এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁদের উন্নয়নের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের দেশে একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ না থাকলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পূর্ব্বেই বলেছি, শত বাধা-বিপত্তিতেও অচল অটল থেকে রামানন্দ স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপন করে গেছেন। যখন তাঁর যশ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তখন তাঁকে নানারূপ সর্ব্বজনীন হিতকর প্রচেষ্টায় সর্ব্বদা লিপ্ত থাকতে হ'ত এবং নানা সভা-সমিতিতে যোগদানও করতে হ'ত। কিন্তু যাতে তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত—সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যে তিলমাত্র ত্রুটি না ঘটে সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা ছিলেন সতর্ক ও সজাগদৃষ্টি।

দেশবিদেশের ইংরেজী মাসিকপত্রের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে 'মডার্ন রিভিয়ু' জগতের প্রধান কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর মাসিকের অন্যতম বলে গণ্য এবং দেশ-বিদেশে দিন দিন তার আদর বেড়েই চলেছে।

হিন্দীভাষীগণ 'বিশাল-ভারত'কে হিন্দী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর কাগজ বলে অভিহিত করেন। কাহারও কাহারও ম[illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী মাসিক।

মাসিকপত্রে ভারতীয় চিত্র-কলার প্রবর্ত্তন রামানন্দের আর একটি সার্থক প্রচেষ্টা। তাছাড়া কাঠ-খোদাই প্রভৃতি বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতির সহিত মাসিকপত্রের ভিতর দিয়ে বাংলার কলারসিকদের পরিচয় সাধন করিয়েছেন তিনিই। সঙ্গীত-কলা ও অন্যান্য সুকুমার-শিল্প প্রভৃতির প্রচারার্থে

বরাবরই তিনি যথাসাধ্য উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে গেছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত প্রাচ্য চিত্রকলাকে রামানন্দই সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে প্রচার করেছেন প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিয়ুর ভিতর দিয়ে। তাঁর এ সমস্ত বহুমুখী প্রচেষ্টা থেকে বুঝতে পারা যায়, সম্পাদক হিসাবে তিনি কত বিষয় চিন্তা করতেন এবং সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করতে কি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। মাসিকপত্রিকাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে রামানন্দের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক কঠোর-পরিশ্রমী সম্পাদকের একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্যের আদর্শ সমাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা—মাসিকপত্রের ভিতর দিয়ে এই কাজটি যাতে সুসম্পন্ন হয় প্রত্যেক সম্পাদকের তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ঝড়

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোথায় উঠেছে ঝড়
তারি শব্দ কানে এসে বাজে।
খুব বেশী দূরে নয়,
হয়ত বা নদীর ওপারে
নয়ত সমুদ্রসীমা অতিক্রমি' আসিতেছে ঝড়
তাহারি মত্ততা জাগে
গাছে গাছে পাতায় পাতায়,
জলে স্থলে তাহারি কম্পন ;—
সে কম্পন জাগিল কি প্রাণে ?
থম্থমে মেঘের কিনারে
চকিত বিদ্যুৎ-ছটা আনে
লালে লাল আলোর নিশানা,
মনে লাগে ভাঙনের দোলা।
পাষাণপুরীর পথ বাহি
উতরোল উঠেছে নিশ্চয় এতক্ষণে ;
বায়ুস্তরে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
জেগে ওঠে অজগরসম ;
কম্পন জেগেছে তাই
নিস্তরঙ্গ ইথার-সাগরে।

নতুবা এমন কেন হয় ?
অবসন্ন মনের কিনারে
চেতাইয়া ওঠে কেন ঢেউ
অস্থিরতা জাগে কেন
ছল ছল মৃত্যুস্রোত বেগে ?
আপনারে বিচূর্ণিত করি
সে ঢেউ আছাড়ি পড়ে
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গিমায়
ক্লেদ কর্দমাক্ত পঙ্কে
জটিল শৈবাল জটাজালে।
আমি জানি ঝড়ের আবেগ
আকাশে উৎক্ষিপ্ত তার
সীমাহীন দৃপ্ত অবাধ্যতা ;
সমুদ্রের কিনারে কিনারে
ভাঙ্গা মাস্তলের 'পরে
আঁকা তার আক্রোশের দাগ,
তাহারে ডাকিয়া আনে
বার বার মেঘের ডম্বরু ;
ডিমি ডিমি শব্দে তার
ঝড় ওড়ে প্রচণ্ড পাখায়,
তারি সাথে জেগে ওঠে
জীবনের অস্থির উল্লাস,
মুক্তির প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা
ধীরে ধীরে জেগে উঠে ঝড়ের আবেগে।
সে ঝড় কোথায় উঠিতেছে ?
আমার মনের বনে ?
তোমারও অস্থির চিত্তলোকে ?
সর্ব্বহারাদের প্রাণে
লাঞ্ছিতের অস্থিতে, মজ্জায় ?
সন্ন্যাসীর ধ্যানের মন্দিরে ?
অপ্রবুদ্ধ পাষাণের অন্ধকার অবচেতনায় ?
গ্রামান্তের শ্মশান-বহ্নিতে
হৃতশস্য মাঠে ও গোলায়
লাঙলের ফালের ডগায়
কাস্তের ইস্পাতে কিম্বা
নিড়ানীর তীক্ষ্ণ মুখে মুখে ?
জনহীন লোকালয়ে
রাখালের গরুচরা মাঠে ?
খেয়াঘাটে ? মস্জিদে ? মন্দিরে ?
গুণটানা নৌকায় নৌকায়
ধ্বংসোন্মুখ পল্লীতে পল্লীতে
জনতা-বহুল ধৃষ্ট শহরে শহরে ?
কারখানার কুলির ব্যারাকে
মজদুরের গাঁইতির লোহায় ?
—কোথায় উঠিল ঝড় ?
কঙ্কালের স্নায়ু-রন্ধ্র ভেদি'
সে ঝড় দিবে না আনি নূতন প্রভাত ?
নূতন দিনের ছন্দে গানে
আনিবে না আলোর তুফান
আনিবে না অকস্মাৎ
অন্ধকার বিদারিয়া সচকিয়া বিদ্যুৎ-আলোকে
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রত্যাশায়
জীবনের নব অভ্যুদয় ?

বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

বঙ্কিম লিখিয়াছেন, সকলেরই বিশ্বাস বাঙালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। যেরূপে বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙালীরও এই বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে বাঙালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

এই মিথ্যা লিখিবার কারণ আছে। বাংলার ইতিহাস বাঙালী লেখে নাই, লিখিয়াছে ইংরেজ। ষ্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, এলফিনষ্টোন, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতির বই মুখস্থ করিয়া আমরা ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস শিখি। কারণ উহা পড়িলে পরীক্ষায় পাস হয়, চাকরি হয়। ইংরেজের লেখা ইতিহাস সম্বন্ধে হাকিম বঙ্কিম রায় দিয়াছেন,—"ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শম্যান, লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকি তালে বাংলার ইতিহাস লিখে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রন্থেও বাংলার প্রকৃত ইতিহাস নাই।"

ভিনসেন্ট স্মিথের বই পড়িয়া ভারতবাসী শিখিয়াছে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিলেন। সুরু হইল ভারতবর্ষের ইতিহাস। তার পর একবার মুসলমান, একবার ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ চিরপরাধীন, কখনো গ্রীক, কখনো মুসলমান, কখনো ইংরেজের দাসত্বই যেন তাহার নিয়তি। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি যাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, শুধু তাহাদেরই নাম ইংরেজের লেখা ইতিহাসের এক কোণে সামান্য মাত্র স্থান লাভ করিয়াছে। অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত ভিনসেণ্ট স্মিথ কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু রাজত্বের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের (মহেঞ্জোদাড়োর খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী) ইতিহাস ২১৬ পৃষ্ঠা, সাত শত বৎসরের মুসলমান আমলের ঘটনাবলী ২৫২ পৃষ্ঠা এবং দেড় শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের কাহিনী ৩১৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। বাংলার অবস্থা আরও শোচনীয়। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খল্‌জী বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে বাংলার ইতিহাসের আরম্ভ,—ইংরেজের লেখা বাংলার ইতিহাসের ইহাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মিথ্যা শিক্ষিত ও ভদ্র ইং[illegible]রাও সকলে সহ্য করিতে পারেন নাই। মিনহাজ উদ্দীনের তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থের অনুবাদ কালে ইংরেজ অনুবাদক মেজর রাভের্টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্শম্যানের যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ান হইত তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন যে উহাতে সত্যের লেশমাত্র নাই (not an atom of truth) অথচ উহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ান হইতেছে। (তবকাৎ-ই-নাসিরি, ইং অনুবাদ, ৫৫৩ পৃঃ)।

বাংলার ইতিহাসের উপকরণের অভাবে প্রকৃত ইতিহাস রচনা অতিশয় কঠিন বটে, কিন্তু ইহা সত্য যে বাংলার ইতিহাস আছে, বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিবৃত্তও আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ মনীষিবৃন্দ পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা বাংলার ইতিহাস রচনার যে উপকরণ সমূহ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া ধীরে বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচনার আয়োজন ও চেষ্টা চলিতেছে।

মেগাস্থিনিস গঙ্গাহৃদি (Gangaridae) বা গঙ্গারাঢ় নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে ইহা কখনও কোন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তিসৈন্যের ভয়ে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া শতদ্রু অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধুনা প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে মেগাস্থিনিসের এই বৃত্তান্ত রূপকথা নহে, ঐতিহাসিক সত্য। ইহার সাক্ষী প্লুটার্ক, কার্টিয়াস, সোলিনাস, ডিওডোরাস প্রমুখ গ্রীক ও লাটিন ঐতিহাসিকবৃন্দ, প্রমাণ তাঁহাদের ভারত বিবরণ এবং টলেমির মানচিত্র। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী তাম্রশাসন হইতে জানা যায় মৌর্য্য বংশের রাজত্ব কালে পুণ্ড্র নগর সমৃদ্ধ ছিল। নগরের রাজকোষ প্রচলিত মুদ্রায় সতত পূর্ণ থাকিত; বন্যায়, অগ্নিদাহে বা অপর কোন বিপদে প্রজাপুঞ্জ বিপন্ন হইলে প্রজার দুর্দ্দশা মোচনে রাজকোষ উন্মুক্ত হইত। মহাস্থানগড়ে শুঙ্গ রাজত্ব কালের যে মৃন্ময় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় মৌর্য্য শাসন অবসানের পরেও পুণ্ড্রনগরীর সমৃদ্ধি অটুট ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল, ইহার বিবরণ তৎকালীন বণিকদের শ্রেষ্ঠ গাইড-বুক পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি ([illegible] of the Erythrean Sea) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজত্ব কালেও বাংলা দেশ সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী ছিল। দামোদরপুর, কোটালীপাড়া, সাভার প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত বহু তাম্রশাসনে ও মুদ্রায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বাঙালীর ভারত-বিজয়

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়াধীপ শশাঙ্কের আমল হইতে বাংলার ইতিহাস অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড় সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল এবং মগধ ছিল গৌড়ের অধীন ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। অল্পদিনের মধ্যে উৎকলও শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়। কনৌজের মৌখরিরা তখন উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশ, এই মৌখরিদের প্রতাপ চূর্ণ করিয়া শশাঙ্ক উত্তর-ভারতেও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হর্ষবর্দ্ধন কনৌজ উদ্ধার করিয়া উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। শশাঙ্ককে পরাজিত করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সংগ্রাম করিয়া শশাঙ্ক বাংলার শক্তি ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ এবং শশাঙ্ক ছিলেন শিব-উপাসক। উত্তর-ভারতে রাজ্য বিস্তারে হর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্ককে বৌদ্ধ লেখকেরা দুষ্ট, বিধর্ম্মী, নাস্তিক প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া লিখিয়াছেন তিনি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, গয়ার বোধিবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন, বুদ্ধমূর্ত্তি অপসারিত করিয়াছেন ইত্যাদি। ইহার কতটা সত্য, কতটা বা অতিরঞ্জন তাহা আজ বুঝিবার উপায় নাই। আমরা শুধু এইটুকুই বুঝি যে স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার উদ্যম ও সাধনা 'দুষ্ট' শশাঙ্কের হাতে অক্ষুণ্ন ছিল।

বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনায় একটা বড় জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলা যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়াছে; হিন্দু মুসলমান, বর্ণহিন্দু, তপশীলী, রাজবংশ বা অখ্যাত অজ্ঞাত বংশ কোন বিচার বাঙালী করে নাই। শশাঙ্কের বংশপরিচয় আমরা জানি না। শশাঙ্কের পর বাংলায় যে শক্তিশালী ভারত-বিজয়ী পাল বংশের অভ্যুদয় ঘটে তাহার প্রতিষ্ঠাতা গোপালও রাজবংশাবতংস নহেন। খলিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালের রাজত্ব কালের তাম্রশাসনে লেখা আছে বাংলায় মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ অরাজকতা ঘটিলে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক গোপাল রাজপদে নির্ব্বাচিত হন। গোপালের যে সামান্য বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ইহাই জানা যায় যে, কোন রাজবংশের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পাল বংশের শাসনকালে, বিশেষতঃ ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বে বাংলার প্রভুত্ব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের রাজত্ব পশ্চিমে সিন্ধু, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মুঙ্গের তাম্রশাসনে দেখা যায় তাঁহার পুত্র দেবপাল দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য রাজ্য জয় করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার দেবপালের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের এই বৃত্তান্ত অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না।

বাংলার গণতন্ত্র : কৈবর্ত্তরাজ নির্বাচন

পৃথিবীর কোন দেশেই শক্তিশালী রাজা বা শক্তিশালী রাজবংশ বেশী দিন থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সুখের পর দুঃখ আসে, জাতীয় জীবনেও তেমনি শান্তির পর অশান্তি, শৃঙ্খলার পর অরাজকতা অপরিহার্য্য। ভারত-বিজয়ী পাল-বংশের শাসনকালে বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির পর আবার বিপর্য্যয় ও অরাজকতা দেখা দিল। পালবংশেরই এক রাজা দ্বিতীয় মহীপালের ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহ করিল। এবার দিব্যোক নামে এক কৈবর্ত্ত জাতির লোক রাজপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। হর্ষ-বর্দ্ধনের সভাকবি যেমন শশাঙ্ককে রাক্ষস রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পালবংশীয় রামপালের সভা-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তৎকৃত রামচরিতে দিব্যোককেও তেমনি অসাধু জুয়াচোর প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। সর যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি রামচরিতের বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেখাইয়াছেন বাংলায় পুনরায় মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ সমবেত হইয়া দিব্যোককে রাজপদে নির্ব্বাচিত করে। ইহার ঐতি-হাসিক প্রমাণও তাঁহারা দিয়াছেন। জাতিবংশনির্ব্বিশেষে শুধু যোগ্যতা বিচারে জনসাধারণ কর্ত্তৃক রাজপদে নির্ব্বাচনের এরূপ ইতিহাস পৃথিবীতে অতুলনীয়। ইহা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর কথা। ইহার পর বাংলায় ও বাংলার বাহিরে সেন রাজাদের প্রতাপও বড় কম ছিল না। বাংলার ইতিহাসের সব চেয়ে বড় মিথ্যা, বখ্‌তিয়ার খল্‌জী ও সপ্তদশ অশ্বারোহীর "বঙ্গ-বিজয়ে"র কাল্পনিক কাহিনী। মিনহাজ-উদ্দীন ইহার রচয়িতা এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ইহার অতি উৎসাহী প্রচারকর্ত্তা। সপ্তদশ অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া অতর্কিত আক্রমণে বখ্‌তিয়ার খল্‌জী লক্ষ্মণাবতীর রাজপুরী দখল করিয়াছিলেন মাত্র, বহু সহস্র সশস্ত্র সৈন্য লইয়াও তিনি বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহার পরও বহুদিন সেন রাজারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছেন।

মুসলমান শাসনে বাংলার স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা

মুসলমান শাসনের ইতিহাসেও স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার আন্তরিক চেষ্টার বহু প্রমাণ আছে। দিল্লীর সম্রাটেরা গায়ের জোরে কখনও কখনও বাংলার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, আবার বাংলা সুযোগ পাইলেই অধীনতা পাশ ছেদন করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দিল্লীর দরবারে বাংলার বিদ্রোহ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। গৌড়ের নাম দেওয়া হইয়াছিল বলঘাকপুর, অর্থাৎ বিদ্রোহীর দেশ। সম্রাট্ গিয়াসু-দ্দীন বলবনের শাসনকালে বাংলার বিদ্রোহ বড় রকমের হইয়া-ছিল। বিদ্রোহী গবর্ণর তুঘ্রিল সম্রাটের সৈন্যের হস্তে অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। তারপর বিদ্রোহীদের শাস্তির পালা। গৌড়ের প্রধান রাজপথের উভয় পার্শ্বে প্রায় দুই মাইল পরিমিত স্থান জুড়িয়া কাঠগড়া খাটানো হয়। বিদ্রোহী গবর্ণরের পরি-বার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, এবং বিদ্রোহী সমর্থকদের ঐ সব কাঠগড়ায় চড়াইয়া তাহাদের গায়ের মাংস টানিয়া তোলা হয়। পাঁচ বৎসরের শিশুটিও এই হত্যাকাণ্ড হইতে বাদ পড়ে নাই।

বিদ্রোহী নবাবদের তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

ইহাদের প্রত্যেকের বিদ্রোহে বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী যোগ দিয়াছে। বিদ্রোহী নবাব বা গবর্ণরকে ধরিতে আসিয়া দিল্লীর সম্রাটকে গ্রামে গ্রামে ছুটিতে হইয়াছে, গ্রেপ্তার করা বড় সহজ হয় নাই। স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার চেষ্টা কখনও শিথিল হয় নাই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাংলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাংলার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবন সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিল; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা আরাকান রাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাংলার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"

বাঙালী কর্ত্তৃক মুসলমান রাজা নির্বাচন

কতকগুলি আবিসিনিয়ান হাবসী আসিয়া কিছুদিনের জন্ম বাংলার মসনদ দখল করিয়াছিল। ইহাদের অত্যাচারে বাঙালী অতিষ্ঠ হইয়া শেষ হাবসী সুলতান মুজঃফর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পাঁচ হাজার হাবসী ও তিন হাজার আফগান সৈন্য লইয়া মুজঃফর শাহ গৌড় দুর্গে আত্মরক্ষা করেন। চারি মাস তাহার সহিত জনসাধারণের যুদ্ধ চলে। শেষ পর্য্যন্ত সুলতান দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হন। মুজঃফর শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া জনসাধারণ হোসেন শাহ্‌কে রাজতক্তে অভিষিক্ত করে। এই হোসেন শাহই বাংলার বিখ্যাত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান। ইঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সঠিক জানা নাই। রিয়াজ-উস-সালাতিন ইঁহাকে আরবের সৈয়দ বংশোদ্ভূত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু তবকাৎ-ই-আকবরি বা ফিরিশতায় ইঁহাকে শুধু আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ বলা হইয়াছে, পিতৃপরিচয় কিছু দেওয়া হয় নাই। কিম্বদন্তী আছে, হোসেন শাহ্ রাখাল বালক-রূপে জীবন আরম্ভ করেন, পরে নিজ বুদ্ধিবলে হাবসী সুলতান মুজঃফর শাহের উজীর পদে নিযুক্ত হন। সুলতানের সহিত জনসাধারণের বিরোধ বাধিলে তিনি দেশবাসীর পক্ষে যোগদান করেন। ইঁহার উপর দেশের লোকের অটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়া দেশবাসী ইঁহাকেই সুলতান নির্ব্বাচিত করে। কথিত আছে, সিংহাসনে আরোহণের পর হোসেন শাহ্ তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু, যাঁহার রাখাল তিনি ছিলেন, তাঁহাকে এক আনা খাজনায় এক বিরাট্ জমিদারী দান করেন। গোপাল, দিব্যোক এবং হোসেন শাহের নির্ব্বাচনে দেখিতে পাই বাঙালী রাজতক্তে বসাইবার সময় বর্ণ হিন্দু তপশীলী হিন্দু বা মুসলমান ভেদাভেদ করে নাই, শুধু যোগ্যতা বিচার করিয়াছে এবং এই তিনটি ক্ষেত্রের একটিতেও বাঙালী ভুল করে নাই। রাজার স্বেচ্ছাচার বাংলার জনসাধারণ কখনও সহ্য করে নাই ইহা স্বীকার করিয়া মজঃফর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে মুইর তাঁহার বিখ্যাত *Annals of the Early Caliphate* গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

This sanguinary civil war in Bengal between the Royalists on one side and the people on the other, headed by the nobles, reminds one of a similar war between King John and his barons in England, and illustrates that the people of Bengal were not dumb, driven cattle, but that they had sufficient political life and strength and powers of organisation to control the monarchy, when its acts exceeded all constitutional bounds.

মোগলশাসন : বাংলার প্রকৃত পরাধীনতার আরম্ভ

রাজা ভিন্ন-জাতীয় হইলেই যে রাজ্যকে পরাধীন বলা যায় না, মোগল শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস তাহার প্রমাণ। মোগলের পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদের শাসনকালে বাংলার ধন বাংলায় থাকিত, বিদেশে যাইত না। ইঁহারা কখনও বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক স্বাভাবিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। পাঠানশাসনকালে বাংলার মানসিক দীপ্তি নির্ব্বাপিত হয় নাই। এইকালে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্য ও রঘুনাথ শিরোমণির নব্যন্যায়ের সৃষ্টি এবং শ্রীচৈতন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতির আবির্ভাব। এই সময়ে ধনীরা স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন এবং দেশের সর্ব্বসাধারণ সহজ ও সচ্ছল জীবনযাপন করিত। আকবরের শাসনে বাংলা প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর সম্রাটের পদানত হয়, সেই দিন হইতে বাংলার শ্রীহানির আরম্ভ। সেই হইতে বাঙালীর মানসিক স্ফূর্ত্তি নিবিয়াছে। বঙ্কিম লিখিয়াছেন, "যে আকবর বাদশাহের আমরা শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাংলার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে পরাধীন করেন। যেদিন হইতে দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া বাংলা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাংলার ধন আর বাংলায় রহিল না। দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি তখন কি কোন বাঙালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বাংলা তাহার অগ্রগণ্য? তখ্‌ত তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি তখন কি মনে হয়, বাংলার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ, সেকেন্দরা, ফতেপুরসিক্রি বা বৈজয়ন্ত তুল্য শাহজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে বাংলার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে নাদির শাহ্ বা মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুঠ করিল তখন কি মনে হয়, বাংলার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাংলার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে, সে পথে বাংলার ধন ইরাণ তুরাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাংলার সৌভাগ্য মোগল কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।"

স্বাধীনতার পতাকাবাহী বাংলার বারভূঁঞা

মোগল বাংলা জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙালীকে পদানত রাখা তাহাদের পক্ষেও সহজ হয় নাই। বাংলা দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন বাংলার জমিদার। সরকারী থানা পুলিস ছিল না। পাইক পিয়াদা লাঠিয়ালের সাহায্যে জমিদার শান্তি রক্ষা করিতেন। সম্পত্তিঘটিত এবং অন্যান্য দেওয়ানী মামলার বিচার করিত গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, গ্রামের স্মার্ত্ত পণ্ডিত পাঁতি দিতেন। ফৌজদারী অভিযোগের বিচারক ছিলেন

জমিদার। কৃষি ও কুটীর-শিল্প জমিদার রক্ষা করিতেন। কৃষকেরা বৎসরে একবার করিয়া নদী নালাগুলি সংস্কার করিয়া জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিত। বাংলার এই পুল-বন্দী প্রথার প্রশংসা বিখ্যাত সেচ বিশেষজ্ঞ সর উইলিয়ম উইলকক্সও শত মুখে করিয়াছেন। বড় জমিদারের সংখ্যা ছিল বারজন, ইঁহারাই বাংলার বারভুঁঞা নামে পরিচিত।

বারভুঁঞার প্রধান ভুঁঞা ছিলেন ঈশা খাঁ। মৈমনসিংহ জেলা এবং ঢাকার উত্তরাঞ্চল ছিল ইঁহার অধিকারে। বাংলার রাজ্যবিস্তারে ঈশা খাঁই আকবরকে সবচেয়ে বেশী বেগ দিয়াছিলেন। আবুল ফজল ইঁহার প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি সাহেব ঐতিহাসিকেরা ঈশা খাঁর নামোল্লেখও করেন নাই। অন্যান্য ভুঁঞাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে :

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য।
বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়।
ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক।
চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়।
ভূষণার মুকুন্দ রায়।

রালফ ফিচ নামক বিখ্যাত ইংরেজ পর্য্যটক ১৫৮৬ সালে শ্রীপুর ভ্রমণ কালে দেখিয়াছেন তথাকার চৌধুরী, "রাজা", আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। শ্রীপুর বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত। ফিচ শ্রীপুরের চৌধুরী "রাজা" বলিতে বিক্রমপুরের ভুঁঞাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন কিনা বলা কঠিন। ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিকের পুত্র বিজয় মাণিক আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, আবুল ফজল ইহার সাক্ষী। আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন, "ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য ; উহার রাজা বিজয় মাণিক। এখনকার রাজাদের সকলের নাম মাণিক।" ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্টুগীজ ও মগ প্রভৃতির উপদ্রব দমন করিয়া ভুলুয়ার ভুঁঞারা আপন স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাজা সীতারাম

ভূষণার রাজা সীতারামকে ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার ইতিহাসে ডাকাত বলিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সরকারী নথি-পত্র হইতে সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া (*Bengal Past and Present*, এপ্রিল-জুন, ১৯১০) দেখাইয়াছেন সীতারাম ডাকাত নহেন, বাংলার স্বাধীনতাকামী স্বদেশপ্রেমিকদেরই একজন। সীতারামের উপর সাহেবদের চটিবার কারণ আছে। ইংরেজের ধন লুঠ করিয়া কেহ সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় লইলে তাহাকে টানিয়া বাহির করা কোম্পানীর পক্ষে বড় শক্ত ছিল। সীতারাম ভূষণা পরগণায় নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম রাখেন মহম্মদপুর। প্রবাদ আছে, মহম্মদ আলি নামক জনৈক মুসলমান ফকির সীতারামের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সীতারামকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত দেখিয়া মুসলমান প্রজারা যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করে সেজন্য ফকির তাঁহাকে হজরত মহম্মদের নামে রাজধানীর নামকরণ করিয়া উদারতার পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এই প্রবাদের কথা লিখিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিখ্যাত "সীতারাম" উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। রাজা গণেশ, ঈশা খাঁ, সীতারাম প্রভৃতির নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার যত চেষ্টা হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটিতেই আমরা হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রয়াসের পরিচয় পাই। সীতারামের সৈন্যদল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল ; তাঁহার সেনাপতি মেনাহাতীর শৌর্য্য ও শক্তির কাহিনী আজও যশোহরের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মোগল নবাব ও ইংরেজ কোম্পানীর সহিত রাজসাহী দীঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম যোগ দিলেন। সীতারামের আর কোন আশা রহিল না। ইঁহাদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর সংগ্রামে মুসলমান প্রজারা সীতারামকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার লিখিতেছেন, সীতারামের মৃত্যু সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী আছে। কেহ বলেন তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ লইয়া গিয়া জীবিতাবস্থায় গায়ের চামড়া তুলিয়া হত্যা করা হয়। কেহ বা বলেন তিনি মুর্শিদাবাদের পথে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয় কিম্বদন্তীটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উহা এই—দুর্গরক্ষার যুদ্ধে সীতারাম সাংঘাতিক আহত হন। যে ফকির মহম্মদ আলির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি এই দুঃসংবাদ পাইয়া তাঁহার এক অনুচরকে দুর্গে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি আহত সীতারামের রাজপোষাক ও পাগড়ী পরিয়া সীতারাম সাজিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং সেখানে ধৃত ও নিহত হয়। ইতিমধ্যে ফকির স্বয়ং সীতারামকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইয়া তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা আরম্ভ করেন। পর দিন সীতারামের মৃত্যু হয়। রিয়াজ-উস-সালাতিনের অনুবাদক মৌলবী আবদুল সালাম বলিতেছেন, সীতারামের স্ত্রী ও সন্তানেরা কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া নবাবের ফৌজদারের হাতে সমর্পণ করে। কেহ কেহ বলেন ইঁহাদিগকে দাসদাসী রূপে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়।

বাংলার স্বাধীনতা হরণে সর্বশক্তি প্রয়োগ : স্বাধীনতাকামী জমিদারদের ধ্বংসসাধন

বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামে জমিদারেরাই যে দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ ও পরিচালিত করিতেন, মোগল সম্রাট ও ইংরেজ কোম্পানী উভয়েই তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। সব জমিদারই স্বাধীনতাকামী ছিলেন ইহা বলিতেছি না, দীঘাপতিয়ার দয়ারামের ন্যায় দেশদ্রোহী বা ভাওয়ালের গাজীদের ন্যায় স্বার্থপরও ছিল। বাংলার স্বাধীনতা প্রচেষ্টা রোধ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জমিদারদের প্রভুত্ব ও প্রতাপ খর্ব্ব করা আবশ্যক মোগল সম্রাটেরা ইহা জানিতেন। ঔরঙ্গজেবের আমলে মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথম বাংলার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়া বাঙালীকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া মোগলের পদানত রাখিবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেন। মা'সির-ই-আলমগিরিতে লেখা আছে, মুর্শিদ কুলি খাঁ কতকগুলি অন্ধকার কারাগার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দেন বৈকুণ্ঠ। সামান্য মাত্র ছল পাইলেই জমিদারদের ধরিয়া সেই 'বৈকুণ্ঠে' পাঠাইয়া তাঁহাদের উপর

অমানুষিক অত্যাচার করা হইত। বড় বড় জমিদারদের নবাবের সামনে দাঁড় করাইয়া রাখা, কথা বলিবার সুযোগ না দেওয়া এবং প্রকাশ্যে অপমান করা মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলেই আরম্ভ। ঔরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত ভৃত্য এই ব্যক্তি বাঙালীর স্বাধীনতাস্পৃহা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছেন, ইংরেজ ভিন্ন আর কেহ এমন করে নাই।

বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজকে আহ্বান : রাণী ভবানীর প্রতিবাদ

বিদেশী ইংরেজকে বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে, যে-সব বাঙালী সেদিন ইহা বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে রাণী ভবানীর নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য দানের প্রস্তাব করিলে রাণী ভবানী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, সিরাজ যতই অত্যাচারী হউন তিনি এ দেশেরই লোক। সিরাজকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে হইলে দেশের লোকেই তাহা করুক, বিদেশী ইংরেজকে যেন এই ঘরোয়া বিবাদে আহ্বান করা না হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী এই মহীয়সী নারীর সুপরামর্শে সেদিন কেহ কর্ণপাত করে নাই। সারাটা দেশ আজ তাহার ফল ভোগ করিতেছে। সিরাজকে ইংরেজ সহ্য করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ তিনি বাংলায় কারখানা স্থাপনের নামে দুর্গ নির্ম্মাণে প্রাণপণে বাধা দিয়াছেন। ইংরেজ কোথাও বাড়ী তৈরি করিলেই সিরাজ সেখানে পুলিশ মোতায়েন করিতেন যেন তাহারা কোন বাড়ী দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিবার সুযোগ না পায়। ইংরেজ ইহাতে হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল, কোম্পানীর মুখপত্র 'এশিয়াটিক জর্নালে' তাহার প্রমাণ আছে। প্রাণ দিয়া সিরাজকে ইংরেজ বিরোধিতার মূল্য দিতে হইল। সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজের সবচেয়ে বড় অপবাদ অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী। সিয়ার-উল-মুতাখ্খরীন সিরাজের সমসাময়িক ইতিহাস এবং উহার রচয়িতা নবাবের বহু কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। অথচ একটি স্থানেও তিনি অন্ধকূপ হত্যার কথা উল্লেখ মাত্র করেন নাই। মহারাজ নন্দকুমার প্রথমটা ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিলম্বে ভুল বুঝিয়া উহা সংশোধনের চেষ্টা করিলেন। ফাঁসিমঞ্চে তাঁহাকে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তার পর মীর কাসিম। দিল্লীর পুতুল বাদশাহের পরোয়ানার জোরে ইংরেজ বণিক বিনা শুল্কে সস্তায় বিলাতী জিনিষ বিক্রয় করিত, বাঙালীকে কুটির-শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার শুল্ক দিয়া বেশী দামে বিক্রয় করিতে হইত। মীর কাসিম ইংরেজের নিকট শুল্ক চাহিয়া উভয়ের দাম সমান করিতে চাহিলেন, ইংরেজ অস্বীকার করিল। নবাব তখন দেশী জিনিষের উপর শুল্ক তুলিয়া দিলেন। ইংরেজ চটিল। দেশবাসীর স্বার্থ চাহিয়া মীর কাসিমের এই ত্যাগস্বীকার কোম্পানী সহিল না। ফল উদয়নালার যুদ্ধ এবং মীর কাসিমের পরাজয়।

রাণী ভবানীর সর্ব্বনাশ সাধন

কোম্পানীর বণিকদের অত্যাচারে উৎপীড়িত লোকেরা রাণী ভবানীর জমিদারীতে আশ্রয় পাইত। এ দেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদও তিনি করিয়াছিলেন। রাণী ভবানী সহজেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্ষুশূল হইলেন। তাঁহার জমিদারীর উপর অসম্ভব চড়া হারে খাজনা ধার্য্য হইল। তার পর আসিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। রাণী ভবানীর জমিদারীর সর্ব্বত্র অন্নসত্র খোলা হইল, আদেশ হইল অন্ন বিনা একটি মানুষেরও যেন প্রাণহানি না হয়। তিন বৎসরব্যাপী মন্বন্তরে প্রজার ধ্বংস রোধ করিতে গিয়া রাণী ভবানীর রাজকোষের সমস্ত অর্থ ও অলঙ্কার নিঃশেষ হইল। সদর খাজনা ভাঙিয়া সেবাকার্য্যে ব্যয়িত হইল, খাজনা বাকী পড়িল, একের পর এক পরগণা নিলামে চড়িল। ভাল ভাল এলাকাগুলি হেষ্টিংসের বানিয়ান কান্ত মুদি কিনিয়া লইলেন। সর্ব্বস্বান্ত রাণী ভবানী নিঃস্ব অবস্থায় কাশীতে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র মাতার শ্রাদ্ধের জন্য কোম্পানীর নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাও প্রত্যাখ্যাত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : বাংলার স্বাধীনতালোপ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ণ সুযোগ ইংরেজ গ্রহণ করিল। দুর্ভিক্ষে পর্য্যুদস্ত বিপর্য্যস্ত প্রজার ঘাড়ে অত্যন্ত চড়া হারে খাজনা ধরা হইল। এক দিকে কোম্পানীর খাজনা অপর দিকে কোম্পানীর সাদা কালো ভৃত্যদের নিত্য নূতন আবওয়াবের দাবি। সাধ্যের অতিরিক্ত খাজনার হার, ক্রমাগত বাকি পড়িতে লাগিল। বাকি আদায়ের জন্য অত্যাচারও ধাপে ধাপে চড়িতে লাগিল। প্রজা ও জমিদার উভয়েরই এই অবস্থা। এই সময়েই সন্ন্যাসী বিদ্রোহে বাঙালীর স্বাধীনতা উদ্ধারের আর এক চেষ্টা দেখিতে পাই। ইহার পর আসিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদারের হাত হইতে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব কাড়িয়া লইল খাস ইংরেজের থানা পুলিস, বিচারের ভার পঞ্চায়েতের হাত হইতে গেল ইংরেজের আদালতে। জমিদারের একমাত্র কর্ত্তব্য হইল খাজনা আদায়। প্রজার প্রতি জমিদারের কোন দায়িত্ব আর রহিল না, নির্দ্দিষ্ট তারিখে সূর্য্যাস্তের মধ্যে কোন প্রকারে সদর খাজনা দাখিল করিয়া আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই বাংলার যে জমিদারশ্রেণী দেশের স্বাধীনতার শিখা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা খাজনা আদায়কারী ইংরেজের গোলামে পরিণত হইলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দীর অরাজকতা যে বাঙালীর স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই, অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাই সাধন করিল। বাঙালী স্বেচ্ছায় শান্তিকামনায় ইংরেজকে বরণ করিয়া লয় নাই, বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রের কয়েকটি প্রধান ব্যক্তিকে ঘুষের টাকায় ক্রয় করিয়া তাদের সহায়তায় এ দেশে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েম হইল। বাঙালী কৃষক ভিক্ষুক হইল। যে তাঁতির হাতের মসলিন পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, সে-ও এঁড়ে গরু কিনিয়া লাঙ্গল ধরিতে বাধ্য হইল। বাঙালীর অবস্থা তখন

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সুতা যাঁতা ফেলে অন্ন মেলা ভার।

কবি গাহিলেন—

দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে
খেতে শুতে বসিতে প্রদীপ জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নহে স্বাধীন।

এ দেশী শিল্প কিরূপে ধ্বংস হইতেছিল তাহার বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহে পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণে দেখি —হেমিল্টন কোম্পানী স্বর্ণকারের কারবার করাতে এ দেশী স্বর্ণকারদিগের অন্নাভাব ঘটিল। গিবসন কোম্পানীর দরজীর কারবারের ফলে সূচী ব্যবসায়ীরা সূচ্যগ্র ভূমি ক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল। রোল্ট কোম্পানীর আগমনে এ দেশীয় বাড়ুই মিস্ত্রীদের অন্নের অনটন হইয়াছে প্রভৃতি।

রাজা রামমোহন : স্বাধীনতা সংগ্রামের পুনরভ্যুদয়

বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কিন্তু এত আঘাতেও নিঃশেষে লুপ্ত হইল না। রাজা রামমোহন রায়ের কম্বুকণ্ঠে বাঙালী আবার স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার বাণী শুনিল। রামমোহন যে রাজনৈতিক নব প্রবাহের সৃষ্টি করিলেন তাহা অনুসরণ করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর জমিদারী সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এ দেশের মাটির সহিত স্বার্থ জড়িত থাকিলেই যে কেহ এই সভার সভ্য হইতে পারিত। সুতরাং ইহা শুধু জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ছিল না, কৃষকদের নিকটও ইহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ইহাই বাংলার প্রথম রাষ্ট্রিক সভা। ইহার পর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং উভয়ে মিলিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।

এই সময়ে ব্লাক-বিল বা কালা আইন আন্দোলন চলিতেছে। কোন ইংরেজ মফঃস্বলে অপরাধ করিলে সেখানে তাহার বিচার হইতে পারিত না, বিচার হইত কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে। জেলা আদালতে ইংরেজ অপরাধীর বিচার হইতে পারিবে এরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৪৯-এ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বেথুন সাহেব উপস্থিত করেন। ইংরেজেরা ইহাকেই 'ব্লাক-বিল' নাম দিয়া তীব্র আন্দোলন তোলে। ব্লাক-বিল শেষ পর্যান্ত প্রত্যাহৃত হয়। এই আন্দোলনেই ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মূল্য বুঝিতে পারে। বাংলার রাষ্ট্রনেতাদের মনে যে দাবি জাগিয়াছে তাহা যাহাতে সর্বভারতীয় দাবিরূপে গৃহীত হইয়া ঐ দাবিকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে, সেজন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম সেক্রেটারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপণে চেষ্টা করেন।

নীল-বিদ্রোহ : বাংলার প্রথম গণ-আন্দোলন

[illegible]াল আইন সঙ্গত আন্দোলন। গণ-নায়কের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনেও বাংলা অগ্রণী হইয়াছে। বাংলার পল্লীতে নীলকুঠি স্থাপিত হইবার পর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, এই অত্যাচার চরমে উঠে। নীলকরেরা জোর করিয়া ভাল ভাল জমিতে নীল বুনাইত, যাহারা আপত্তি করিত তাহাদিগকে কুঠিয়ালদের কয়েদখানায় বন্দী হইয়া অথবা শ্যামচাঁদের প্রহারে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত। বেতের উপর চামড়া দিয়া মোড়া এক প্রকার লাঠির নাম ছিল শ্যামচাঁদ, বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর ম্যানেজার লারমুর সাহেব ইহার আবিষ্কর্তা। রামমোহনের মন্ত্রশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত উহার রচয়িতা। নীলকরের বিরুদ্ধে বাঙালী হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রথম প্রকৃত গণ-আন্দোলনের বিশদ বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অত্যাচারিত প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমে দাঁড়াইলেন নদীয়া চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। ইঁহারা দুই ভাই। ইঁহাদের চেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে ছড়া ও গান রচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। চাষীদের পক্ষ হইতে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য মোক্তার নিয়োগ প্রভৃতির ব্যয় ইঁহারা বহন করিতে লাগিলেন। অত্যাচার ঠেকাইবার জন্য লাঠিয়াল নিযুক্ত করিয়া কুঠিয়ালগণের পাইকপেয়াদার সহিত হাঙ্গামা বাধাইতেও ইঁহারা পশ্চাৎপদ হন নাই। ইঁহাদের চেষ্টায় কৃষাণকুল সংগঠিত হইয়া উঠিল। বহু স্থানে নীল-হাঙ্গামায় কুঠিয়ালেরা বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই সময়েই মালদহ জেলার ওয়াহাবী নেতা রফিক মণ্ডলও কৃষাণবন্ধু হিসাবে সুপরিচিত হন। রফিক সম্বন্ধে রাটলিজ লিখিয়াছেন :

"Foremost in the indigo dispute, and spending both time and money in opposition to the exactions of the planters, fighting every battle to the bitter end, even in the High Court and before the Sudder Revenue Board of Calcutta, and never yielding a foot of ground while he was able to maintain it." (*English Rule and Native Opinion*, p. 70).

নীল-আন্দোলনে যোগদান করিয়া রফিক মণ্ডল সর্ব্বস্বান্ত হন। রফিকের পুত্র খলিফা আমিরুদ্দীন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে বন্দী হন। তিনিই প্রথম ওয়াহাবী বন্দী।

নীল-আন্দোলন বাংলার খাঁটি গণ-আন্দোলন। গ্রামে উহার আরম্ভ, পরে সংবাদ আসে কলিকাতায়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ চাষীদের পক্ষ হইয়া হিন্দু পেট্রিয়টে অনলবর্ষী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের প্রধান সহায় হইলেন ষোড়শ বর্ষীয় যুবক, উত্তরকালে কংগ্রেস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা মনোমোহন ঘোষ। ইঁহারাও রামমোহনেরই মন্ত্রশিষ্য। পেট্রিয়টের আন্দোলন সুরু হওয়ার পর নীলদর্পণ নাটকের আবির্ভাব। নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া লেখকের নামধামহীন অবস্থাতেই উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণ বাংলায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন : "কোন গ্রন্থবিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না।" নীল সম্বন্ধে দেশীয় মনোভাব ইংরেজদের গোচরে আনিবার জন্য পাদ্রী লং মাইকেল মধুসূদনকে দিয়া নীলদর্পণ অনুবাদ করাইয়া উহা প্র[illegible] করিলেন। এই অনুবাদ প্রকাশের পর শুধু নীলকরগণ কেন,

বাংলার প্রায় সমস্ত ইংরেজ ক্ষেপিয়া উঠিল। তাঁহাদের মুখপত্র হিসাবে ইংলিশম্যান সম্পাদক ব্রেটকে দিয়া পাদ্রী লং-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হইল। লং-এর এক মাস কারাবাস ও হাজার টাকা জরিমানার হুকুম হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ আদালতে জরিমানার টাকা দাখিল করিলেন।

এই সময়ে হিন্দু পেট্রিয়টে হরমণি নাম্নী এক সুন্দরী বালিকাকে অপহরণ করিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য হিল নামক নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট হার্শেল তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেন, হরমণিকে হরণ করা হইয়াছে সত্য কিন্তু তার বেশী কোন প্রমাণ নাই! পেট্রিয়ট-সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামে হিল মামলা করিল। মোকদ্দমা দায়ের হইবার পরই হরিশের মৃত্যু ঘটে। তথাপি তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া মামলা চলিতে থাকে। হরিশের বিধবা পত্নী মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন অসম্ভব জানিয়া এক সহস্র টাকা ব্যয় স্বরূপ দিতে অঙ্গীকার করিয়া মামলা আপোষ করিতে বাধ্য হন। এই সব দেখিয়া জনসাধারণ ইংরেজের আদালতের বিচারের উপরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া ওঠে। নীলকর ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্গীত রচিত হইয়া ঘরে ঘরে গীত হইতে থাকে—

নীল বাঁদরে সোণার বাংলা কল্লে ছারখার
অসময়ে হরিশ মোল লং-এর হোল কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

নীলের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি ক্রমাগত তীব্র হইয়া উঠাতে প্রজার প্রতি অত্যাচার অনেক কমিল, অল্প দিনের মধ্যে নীলকরদের প্রতাপ একেবারে বিলীন হইয়া গেল। ইংরেজ বণিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম রাষ্ট্রিক জয় নীল আন্দোলন।

বাংলার গণ-আন্দোলন: সর্ব্বভারতীয় সংগ্রাম

গণ-আন্দোলনের এই সাফল্য শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক নূতন বিপ্লবের সূচনা করে। কেশব চন্দ্র সেন ও বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যুদয়ে বাংলায় নব চিন্তা ও নব শক্তির বিকাশ ঘটিল। রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের স্বাদেশিকতা প্রচারে বাঙালী সাহেবিয়ানা হইতে মুক্ত হইয়া আবার নিজস্ব পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিল। নবগোপাল মিত্র কর্ত্তৃক ন্যাশানাল প্রেস স্থাপিত হইয়া তথা হইতে ন্যাশানাল পেপার নামে পত্রিকা বাহির হইল, ন্যাশনাল স্কুল খোলা হইল এবং ন্যাশনাল জিমনাসিয়াম নামে ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এইজন্য নবগোপালের নাম হইয়া গিয়াছিল ন্যাশানাল মিত্র। লক্ষ্য করিবার বিষয় বাংলার এই আন্দোলন ছিল সর্ব্ব ভারতীয় ইহার মূলে ছিল অখণ্ড ভারতবোধ।

ঠাকুর বাড়ীর সাহায্যে এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা বলিয়া একটি স্বদেশী ভাবোদ্দীপক মেলার অনুষ্ঠান করেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক। মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া গণেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহা[illegible]তিনি সর্ব্বপ্রথম আবেদন নিবেদনের পন্থা পরিহার করিয়া রাজনৈতিক উন্নতির জন্য জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ প্রদান করেন। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার সূত্রপাত এই হিন্দু মেলাতে হয়। হিন্দু মেলা সমগ্র দেশে স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যা বহাইয়া দেয়।

বাঙালীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা: ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা

১৮৭৬ সালে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানেও আমরা রামমোহনের প্রভাব দেখিতেছি। সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন ইঁহাদের সকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা। ১৮৭৮ সালে "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" লেখেন:—

"Brahmoism elevates people not only spiritually but socially, intellectually, physically, and politically." (March 21, 1878).

ইহার চার বৎসর পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ব-কৌমুদী লিখিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহা সাধারণ তন্ত্রের আয়োজন করিতেছেন।"

ইহাই বাঙালীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার যুগ। পণ্ডিত শিবনাথ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর শুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী, আনন্দ মিত্র, গগন হোম প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন ভক্ত অনুচরকে অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। এই দীক্ষার একটি প্রতিজ্ঞা ছিল এই: "স্বায়ত্তশাসনই আমরা এক মাত্র বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আইনকানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।" গান্ধীজী ১৯২০ সালে যে অসহযোগ নীতির প্রবর্ত্তন করেন, এই প্রতিজ্ঞায় তাহারই অঙ্কুর রহিয়াছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই শিবনাথ সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছিলেন, এই অগ্নিমন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষা লইয়াছিলেন তাঁহারাও কেহ সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। ইতিমধ্যে বরিশাল হইতে দুর্গামোহন দাস আসিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে রায়ত ও শ্রমিকের প্রবেশ

ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার পর এই সভা চতুর্দ্দিকে রায়ত-সভা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইলেন। রায়ত-সভা প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথ ছিলেন সকলের অগ্রণী। ইঁহাদেরই চেষ্টায় কংগ্রেসে রায়ত ও শ্রমিকেরা প্রথম প্রবেশাধিকার পায়। জীবন বি[illegible] দ্বারকানাথ ভারতসভার পক্ষ হইতে আসামের চা বাগানে প্রবেশ করিয়া কুলীদের উপর অত্যাচারের বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। সঞ্জীবনীতে "আসামে লেগ্রির সন্তান" ও বেঙ্গলীতে Slave Trade in Assam নামে তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ আরম্ভ হইলে দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ মাদ্রাজ কংগ্রেসে কুলিদের সম্বন্ধে এক

প্রস্তাব আনিতে চাহেন। উহা প্রাদেশিক প্রশ্ন বলিয়া প্রস্তাবটি তুলিতে দেওয়া হইল না। কৃষ্ণকুমার মিত্র দেখাইলেন যে বিষয়টি মোটেই প্রাদেশিক নহে। কারণ আসামের কুলিদের শতকরা ২৭ জন পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ এবং পাঁচ জন মাদ্রাজ হইতে সংগৃহীত হইত। আসামে তখন ১৫ হাজার মাদ্রাজী এবং ৬ হাজার বোম্বাইবাসী কুলি ছিল দ্বারকানাথ তাহার প্রমাণ দিলেন। তথাপি কংগ্রেস ইঁহাদিগকে প্রস্তাবটি আনিতে দিল না। দ্বারকানাথ, কৃষ্ণকুমার, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি দমিবার পাত্র নহেন; ইঁহারা এ আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। দশ বৎসর পরে রহিমতুল্লা সিয়ানীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেস হয় তাহাতে সর্বপ্রথম কুলিদের দাসত্ব মোচনের দাবি জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের এই আন্দোলনে শেষ পর্য্যন্ত সরকারের টনক নড়ে। সর হেনরি কটন আইন করিয়া কুলিদের অবস্থার অনেক উন্নতি করেন।

গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতির প্রয়োগ

গণ-আন্দোলনের ভিত্তিতে ভারতসভার প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার অগ্নি মন্ত্রের প্রসার দেখিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইলেন। বাংলার এই গণ জাগরণ বন্ধ করিবার জন্য প্রথমেই দুইটি অস্ত্র প্রযুক্ত হইল—প্রেস আইন ও অস্ত্র আইন। মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য ১৮৭৮ সালে ভার্ণাকুলার প্রেস আইন পাস হইল। সোমপ্রকাশ, নব বিভাকর ও সাধারণী প্রতিবাদস্বরূপ প্রকাশ বন্ধ করিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হইল। লর্ড লিটন অস্ত্র আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করিলেন। ইংরেজের তৃতীয় মারণাস্ত্র ভেদনীতির প্রয়োগ শুধু বাকি রহিল।

বাঙালী ইহাতে ভীত হইল না। ১৮৮৩ সালে ভারত সভার উদ্যোগে কলিকাতায় প্রথম সর্ব্ব ভারতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বের এই সম্মেলনই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রিক সম্মেলন। বাংলার ইতিহাসে এত বড় ঘটনার কথা প্রায় প্রত্যেক ইতিহাস রচয়িতাই লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া যান। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে এই সম্মেলনের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রামতনু লাহিড়ী, দ্বিতীয় দিন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত খ্যাতমামা উকীল কালীমোহন দাস এবং তৃতীয় দিন ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগির। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অন্নদাচরণের দৌহিত্র। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

[illegible] সময়ে ইলবার্ট বিল আন্দোলন চলিতেছিল। লর্ড রিপনের আইন সচিব সর কোর্টনে ইলবার্ট দেশীয় বিচারকেরা যাহাতে সাহেব আসামীদের বিচার করিতে পারেন সেই অধিকার দানের জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি কেন্দ্রীয় পরিষদে উপস্থিত করেন। ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ইহাতে ক্ষেপিয়া যায়। ব্রানসন নামক জনৈক এংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যারিষ্টার প্রকাণ্ড জনসভায় এক বক্তৃতায় বলেন, দেশীয় বিচারক কর্ত্তৃক সাহেব আসামীর বিচার the jack ass kicketh at the lion-এরই সমতুল্য। লালমোহন ঘোষ ইহার জবাবে বলেন—When the pitiful car chooses to cover its recreant limbs with the borrowed hide of lion, the kick of the jack ass is its fit retribution. এই সময়েই জাষ্টিস নরিসকে অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও ব্যাপক ভাবে দ্বিতীয় কনফারেন্সের আয়োজনে মাতিয়া উঠিলেন। ১৮৮৫ সালে কলিকাতাতেই এই সম্মেলনের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। এই সময়েই কংগ্রেস সৃষ্টির আয়োজনও গোপনে আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের জন্ম সম্বন্ধে একটু রহস্য নিহিত আছে। আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির রাজনৈতিক প্রভাব ও কার্য্যকলাপ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরেজ সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে ইঁহারা রাজদ্রোহাত্মক মনে করিতেন এবং নেতৃবৃন্দকে sedition monger বলিয়া অভিহিত করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় একটি বিদ্রোহের আশঙ্কাও যে তাঁহারা না করিতেন এমন নয়। রাজদ্রোহাত্মক আন্দোলন হইতে ভারতবাসীর মন ধীর মন্থর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যেই বড়লাট লর্ড ডাফরিনের পরামর্শানুযায়ী হিউম শিক্ষিত ভারতবাসীদের দাবি দাওয়া ধীর ভাবে জ্ঞাপনের জন্য একটি বাৎসরিক সম্মেলনের কল্পনা করেন। ইহারই নাম দেওয়া হইল কংগ্রেস। হিউম, ফিরোজশা মেটা প্রভৃতি এই কংগ্রেসে ইংরেজ সমাজে রাজদ্রোহীরূপে পরিচিত সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন না। কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের যে সময় স্থির হইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন আহূত হইল। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে বাদ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বাংলার প্রভাব অস্বীকার করা গেল না, ডব্লিউ সি বোনার্জ্জিকে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইল।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল কলিকাতায়। বাংলা দেশে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন প্রভৃতিকে বাদ দিয়া চলা অসম্ভব হিউম, মেটা, ওয়াচার দল তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই অধিবেশন সত্য সত্যই জাতীয় অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশন হইতেই কংগ্রেসের জাতীয় মহাসভা নাম সার্থক হয়। ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্বানের স্বতন্ত্র প্রয়োজন আর রহিল না। ভারত সভার নেতৃবৃন্দ এখন হইতে কংগ্রেসের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিলেন।

কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধিতে ইংরেজের আশঙ্কা : ভেদনীতির আরম্ভ

কংগ্রেসের এই শক্তি বৃদ্ধিতে এবং রাজদ্রোহীরা কংগ্রেসে স্থান লাভ করাতে গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরেজ সম্প্রদায়

হইয়া উঠিলেন। এবার সুরু হইল ভেদনীতির খেলা। সর সৈয়দ আমেদ তখন বৃদ্ধ। তাঁহার বার্দ্ধক্যের এই সুযোগ লইয়া আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেব অতি চতুরতার সহিত সর সৈয়দকে কংগ্রেস বিরোধিতায় অবতীর্ণ করিলেন। সর সৈয়দের যৌবনের কর্ম্মসহচর জাতীয়তাবাদী মুসলমান ধর্ম্মনায়ক আল্লামা সিবলি নোমানি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—ভারতীয় ও শ্বেতকায়দিগের বসিবার ভিন্নতা দর্শনে যাঁহার মনে জাতির প্রতি অপমানজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছিল, যিনি আগ্রা দরবার হইতে ঘৃণাভরে চলিয়া আসিয়া জাতির মর্য্যাদা একদিনের জন্যও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই, সেই সর সৈয়দ কি করিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্র ও প্রবল করিয়া তুলে। ১৮৯৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর চেষ্টায় এক বিরাট শিল্প প্রদর্শনী হয়। বিংশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবী চৌধুরাণী "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" নামে স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খোলেন। দেশায় শিল্পে উৎসাহ দানের যে প্রয়াস হিন্দু মেলায় আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা তাহারই পরিণতি এবং ইহা হইতেই বাংলার বিরাট স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯০৩ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এবং সর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি (Dawn Society) স্বদেশীমন্ত্র প্রচারে ব্রতী হয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' এবং ডন সোসাইটি হইতে 'ডন' পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতেন। যে সব ক্ষেত্রে ইংরেজের অত্যাচারের যোগ্য প্রত্যুত্তর এদেশবাসীরা দিতে পারিতেন তাহার বিশদ বিবরণ "বিদেশী ঘুষি বনাম দেশী কিল" শিরোনামা দিয়া ভারতীতে প্রকাশিত হইত। বাংলায় এই ভাবে যখন স্বদেশীর স্রোত বহিয়াছে, সেই সময় লর্ড কার্জ্জন বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন।

বঙ্গ-বিভাগ ও রাখী-বন্ধন

৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইল। সেদিন সমস্ত দোকান পাট বন্ধ ছিল। বাংলার কোন চুল্লীতে সেদিন আগুন জ্বলে নাই। প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। শহরতলীর চটকলের মজুরেরাও সেদিন কাজে যায় নাই। অপরাহ্নে প্রায় পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোক জনসভায় সমবেত হয়। রোগশয্যা হইতে আনন্দমোহনকে চেয়ারে করিয়া সভাক্ষেত্রে আনা হয়। সভায় যুক্ত বঙ্গের শীলমোহরাঙ্কিত আনন্দমোহনের স্বাক্ষরযুক্ত এক ঘোষণাপত্র পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার বঙ্গানুবাদ করেন—

"যেহেতু বাঙালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

আনন্দমোহনের অভিভাষণটি সুরেন্দ্রনাথ পাঠ করেন। এই সভাতেই বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দের প্রথম আগমন।

বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ হইল এই আন্দোলনের মূল মন্ত্র। জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় শিল্প উভয়ের প্রতিই সমান মনোযোগ দেওয়া হইল। জাতীয় শিক্ষা প্রচারে রাজা সুবোধ মল্লিক লক্ষ টাকা দান করিলেন। এত টাকা দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। তথাপি তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। জাতীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সর্ব্বস্ব দান করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে পাওনাদারের বন্দী হইয়া জীবন কাটাইতে হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই বিপ্লববাদের পথে ধাবিত হইল। সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্ ও যুগান্তর অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতে লাগিল। আবেদন-নিবেদনে এবং গবর্ণমেণ্টের শুভ ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারাইয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বাঙালীকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে বিদেশী দ্রব্যের বহ্ন্যুৎসব সুরু হইল। বরিশাল কনফারেন্স, মজঃফরপুরের ঘটনা এবং মানিকতলার বোমার কারখানার ইতিহাস এখানে আলোচনা করিতে চাই না। বাংলার বিপ্লবী যুবকদের কর্ম্মপন্থা ভ্রান্ত কি সত্য তাহার বিচারের স্থান ইহা নহে; দেশবাসী শুধু এই কথাই অন্তরের মণিকোঠায় গাঁথিয়া রাখিবে যে স্বাধীনতা লাভের অদম্য পিপাসাই বাংলার তরুণ দলকে বিপ্লববাদের কণ্টকময় পথে টানিয়া আনিয়াছিল। জননীর শৃঙ্খল মোচনে আত্মবলি দানে ইঁহারা মুহূর্ত্তের তরে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

ভেদনীতির সাফল্য : মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

স্বদেশী আন্দোলন বাঙালীর কোন মর্ম্মস্থলে গিয়া সাড়া জাগাইতেছিল, ধূর্ত্ত ইংরেজের দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বগুড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার আবদুল শোভান চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি বহু মুসলমানকে যোগদান করিতে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ভীত হইল। ঢাকার নবাবজাদা খাজা আতিকুল্লা ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, "আমি আপনাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে চাই পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে এ কথা মিথ্যা। কয়েকজন মাত্র মুসলমান বড়লোক নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইহা [illegible] করিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত ঘটনা। ইংরেজ এবার ভয় পাইল, হিন্দুতে মুসলমানে এবং মুসলমানে মুসলমানে ভেদ সৃষ্টির জন্য প্রবল চেষ্টা সুরু হইল। ১৯০৬ সালেই ইংরেজের প্রিয়পাত্র আগা খাঁ বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট মুসলমানদের জন্য কয়েকটি বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করিয়া আসিলেন। রাতারাতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়া ফেলিল এতদিন নাকি মুসলমানদের প্রতি ন্যায়

বিচার হয় নাই। চাকুরি ও নির্ব্বাচনে পক্ষপাতিত্বের আশ্বাস লইয়া আগা খাঁ ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই ঢাকার নবাব সলিমুল্লা মুসলিম লীগ গঠন করিলেন, বিনিময়ে পাইলেন ইংরেজের নিকট হইতে দশ লক্ষ টাকা সাহায্য। বাংলায় সুয়োরাণী রাজনীতির ইহাই সূত্রপাত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার স্থান

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার স্থান সকলের উচ্চে। প্রাচীন ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া আধুনিককালেও দেখিতে পাই বাংলায় ভারত সভা কংগ্রেসের অগ্রদূত; বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের জীয়নকাঠি স্পর্শে সারা ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শিল্পোন্নতির সূচনা। ১৯৪২ সালের ভারতীয় বিপ্লবে দেখি বাংলার বিপ্লববাদের ব্যাপক গণরূপ। স্বদেশীযুগের বিপ্লব আন্দোলন,গান্ধীজীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন, গত আগষ্ট আন্দোলন কোনটিতেই বাংলা পশ্চাৎপদ থাকে নাই হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া বাঙালী স্বাধীনতার বহ্নিশিখা অম্লান রাখিয়াছে। স্বাধীনতাকামী বাঙালী প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখিয়াছে রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী—"আমাদের নিজেদের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করিব না। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একটি মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।" বাঙালী জানে—

> "কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী বিক্রমে নবীন
> রহিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন।"

স্বপ্ন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সৃষ্টি যেখানে স্বপ্ন সেখানে, মনের মাঝে
সীমাহীন এক স্বপ্ন-বেদনা জাগিয়া আছে।
রৌদ্রপ্রখর দিবস, কঠিন রুক্ষ ধরা,
তার মাঝখানে চোখ দুটি তোর স্বপ্ন-ভরা।

অতল গভীর দুখের পাথারে সাঁতারি মরি,
বিরতিবিহীন বেদনা যে বাজে জীবন ভরি।
যদি রাত নামে, নিবিড় আঁধারে হয় সে হারা,
তবু জেগে রবে আকাশে ও-দুটি স্বপ্ন-তারা।

জানি বাস্তব স্পষ্ট কঠোর কঠিন খাঁটি,
আকাশ শূন্য অসীম সুদূর, এখানে মাটি।
তবু জানি শুধু বস্তুতে নয় সৃষ্টি গড়া,
স্বপ্নের ঘোরে ঘুরে মরে এই বসুন্ধরা।

তোমার নয়নে আমার স্বপ্ন উঠিল ফুটে,
দুঃখেও তাই এত আনন্দ বক্ষে লুটে।
যা ছিল শান্ত হ'ল চঞ্চল লভিল গতি,
চারিদিকে মরু, মাঝখানে বয় অশ্রু-নদী।

ভাষা নাই তাই হয় নাকো সব ব্যক্ত ব্যথা,
হৃদয়ে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত সে কত-না কথা।
ঘুমে জাগরণে জীবন জড়ানো, জানি গো জানি
রূপ যাহা পায় সে বাণী যে হয় স্বপ্ন-বাণী।

স্বপ্ন যে কত নব রূপ ধরে শিল্পী জানে,
সে যে অপরূপ রূপে দেখা দেয় ঋষির ধ্যানে।
ভেসে আসে কত স্বপ্ন অজানা—গানের সুরে,
আনাগোনা করে স্বপ্ন নিকটে, স্বপ্ন দূরে।

ঊর্দ্ধে নিবিড় স্বপ্ন মাখানো আকাশ-নীলে,
স্বপ্ন—স্নিগ্ধ পরশ-বুলানো মন্দানিলে।
চন্দ্রালোকে কি অলোক-স্বপ্ন এ-লোকে হেরি,
আমার মনের স্বপ্ন ঘনায় তোমারে ঘেরি।

স্বপ্নে জাগি যে—স্বপ্নে হাসি ও স্বপ্নে কাঁদি,
আকুল আবেগে স্বপ্নে প্রিয়েরে বক্ষে বাঁধি।
প্রতিদিবসের পাষাণখণ্ডে আখর খচি'
চিরদিবসের স্বপ্নবেদনা-কাব্য রচি।

চট্টগ্রামের কথ্যভাষা

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

যুদ্ধবিগ্রহের সূত্র ধরে চট্টগ্রাম আবার সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে পড়েছে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষার দুর্বোধ্যতা পূর্বে যেমন, এখনও তেমনি, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতূহল সমান জাগিয়ে রেখেছে। সুন্দর প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত এই দেশ পূর্বসীমান্ত রূপে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে বহুকাল ধরে; এদেশের অধিবাসীরা পরিমার্জিত শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির সূত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে সংযুক্ত; অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মতই উত্তরাধিকারসূত্রে তারা পেয়েছেও অনেক। সর্ব ব্যাপারে জাগ্রত বাঙালীর মিলনক্ষেত্র কলিকাতা মহানগরীতে তারাও গিয়ে সমবেত হচ্ছে। কথাবার্তার বেলায়ও দেখা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিরা (অবশ্য যাঁরা কিছুটা সামাজিক এবং ব্যবহারচতুর ব্যক্তি) ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে নিজেদের কথ্যভাষা এবং তার বাচনভঙ্গির প্রভাব অতিক্রম করে মহানগরীর কথ্যভাষাও আয়ত্ত করে নিতে পারেন। অপর দিকে মধ্য-পূর্ববঙ্গবাসীদের কথায় বিশেষ টান ও ভঙ্গিগুলো যদি বা কিছু থেকে যায় তাতেও এমন ক্ষতি হয় না এই কারণে যে তাঁদের অঞ্চলের বিশেষ উপভাষা সর্বত্র বোধগম্য তো বটেই, উপরন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনায় তা বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপভাষা এত অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য যে তা চট্টগ্রামের বাইরের লোকের কাছে কৌতুকের খোরাক জোগায়; বাংলাদেশের অন্যত্র প্রচলিত অল্পবিস্তর বোধগম্য কোন উপভাষার সঙ্গে তার সামান্য সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় এক সহৃদয় বন্ধু তো একবার সরল ভাবেই বিস্ময় প্রকাশ করে আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন—চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্বামী-স্ত্রীরা প্রীতিভাষণ ও বিশ্রম্ভালাপ এই ভাষাতেই করে থাকে কিনা। প্রশ্নটি অত্যন্ত কৌতুককর সন্দেহ নেই। তাঁর ধারণা হয়ত বা এই ছিল যে মধুর রসালাপ এত দুর্বোধ্য ভাষায় হতেই পারে না। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, যেমন—চীনদেশে বা উত্তরমেরু প্রদেশেও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের মতই হৃদ্য ও মাধুর্যপূর্ণ, নিজ নিজ দেশের বিশেষ ভাষায় প্রণয়যুক্ত মনের আবেগ প্রকাশ করতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে একটি প্রশ্ন জাগে চট্টগ্রামের উপভাষাটির কি কোনই সম্পর্ক নেই মূল বাংলা ভাষার সঙ্গে? যদি থাকে, তবে অস্পষ্ট হলেও সেই যোগসূত্র খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

চট্টগ্রামীয় উপভাষার দুর্বোধ্যতার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা খুব শক্ত নয়। আর্যভাষার অভ্যাগমের পূর্বে সমস্ত বাংলাদেশই যে কোন ভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং সেই আর্যেতর ভাষাই যে এখানে প্রচলিত ছিল, এই কথা ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। আর্যদের ভাষা ও সভ্যতা প্রসারের সময় হতে [illegible] পর্যন্ত সর্ববিধ উপদ্রব থেকে এই চট্টগ্রাম অঞ্চল আত্মরক্ষা করতে পেরেছে বহুদূরে অবস্থিত থাকার জন্যে। এই বহিঃপ্রভাবমুক্ততা হেতু এখানকার ভাষায় আর্যেতর দেশজ শব্দ বহুল পরিমাণে এখনও রক্ষিত আছে। তা ছাড়া এর নিকট-প্রতিবেশী পার্বত্য-চট্টগ্রামের চাকমা এবং আরাকানী ভাষারও অনেক প্রভাব আর সংমিশ্রণ এতে ঘটে গিয়েছে নিশ্চয়ই। চট্টগ্রামে মুসলমানেরাই জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ। চট্টগ্রাম সমুদ্রোপকূলবর্তী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী স্থান বলে এদেশীয় ও বিদেশীয় মুসলমান নাবিকদের মধ্যে ভাব ও ভাষার আদান-প্রদান চলতে থাকে অনেককাল ধরে, সুতরাং আরবী, ফারসী শব্দের আধিক্য এই ভাষায় থাকা খুবই স্বাভাবিক। একসময়ে পর্তুগীজরাও এখানে কম আসে নি, তাই এই ভাষার শব্দভাণ্ডারে তাদেরও দান কিছু থাকা অসম্ভব নয়? মুসলমানী আচার-ব্যবহারের সূত্র ধরে উর্দুর মাধ্যমে বহু হিন্দুস্থানী শব্দও কখন এ ভাষার কায়েমী হয়ে বসেছে তাই এতকাল ধরে এত মেশামিশিতে একটা খিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়া এ ভাষার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

লেখ্য ও কথ্যভাষার সঙ্গে এর যোগাযোগ নির্ণয় করতে গিয়ে অনুসন্ধিৎসুরা দেখবেন, এ ভাষায় তদ্ভব শব্দ-সংখ্যা অল্প নয়, এবং তাদের রূপও ভাষাতত্ত্বসম্মত। বৈদিক ভাষা থেকে উদ্ভূত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলো কয়েকটি মধ্যবর্তী পরিবর্তন স্তর অতিক্রম করে তবে বর্তমান রূপ পেয়েছে। প্রধান পরিবর্তন তার ঘটে প্রাকৃত স্তরে। দেখা যায় প্রাকৃতে পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়ে নিজ নিজ স্থানে স্বরধ্বনি মাত্র চিহ্ন রেখে গিয়েছে; এবং নাসিক্য-ব্যঞ্জনগুলিও লোপ পাবার সময় একটা অনুনাসিক ধ্বনি রেখে গিয়েছে। যেমন: আর্য > অজ্জউত্ত; অপর — অবর — আঅর — আর; কেতক — কেঅঅ — কেয়া; খাদতি — খাঅই — খাই; নবনীত — নবনীঅ — নঅনী — ননী; সন্ধ্যা — সাঁঝ; চন্দ্র — চাঁদ ইত্যাদি। চট্টগ্রামীয় ভাষায় প্রাকৃতের এই বিশেষ পরিবর্তন-রীতি খুবই কাজ করেছে এবং এটা স্বাভাবিক। প্রাকৃতের নিয়মটিও তো কেউ ধরে বেঁধে করে দেয় নাই; প্রাকৃতজনের উচ্চারণে স্বরধ্বনির প্রতি প্রবণতা থাকেই। কথ্যভাষায় সরলতা এবং দ্রুততাগুণ প্রয়োজন, নইলে কাজ চালানো দায় হয়ে পড়ে। প্রাকৃতেও এইজন্যেই সরলতা সম্পাদিত হয়েছিল ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ করে। চট্টগ্রামে এই ধ্বনিলুপ্তি সর্বত্রই ঘটে গেছে। যেমন: গোশালা — গোয়াইল; গোস্বামী — গোসাঁই — গোয়াই; অঙ্গুরীয়ক — অঙ্গুরীঅঅ — অঙ্গুরী — আঙ্গট — হাঁওড়ি; কুম্ভীর — কুমীর — কুঁইর; কর্পট — কাপড় — কাঅর; প্রক্ষালিয়া — পাআআলি; তীর্থকগতি — তেইরগ্যা; ঠাকুরাণী — ঠাউরাইন্; উপবাস — উপাস — উআস; তুমি, আমি — তুঁই, আঁই; তিনি — তাইন্ — তাঁই; হিঃ সুপারি — সোয়ারি; কাঃ চাকর — চাঅর, ইত্যাদি।

ত্রিপুরা অঞ্চলেও ধ্বনিলুপ্তিঘটিত রূপান্তর লক্ষণীয়। যেমন—ধনপতিখোলা — ধনৈন্তলা।

শব্দের আদিতে বর্ত্তিত শ-ষ-স তিনটির নির্বিবাদে 'হ'তে রূপান্তরিত হওয়া পূর্ববঙ্গের সব কয়টি উপভাষারই লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। শ্বশুর সম্বন্ধসূচক গালাগালির শব্দটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ-ছাড়া শ্বশুর — হোউর; সম্বন্ধ — হম্বন্ধ; শিয়াল — হিয়াল; সকল — হকল; ষষ্ঠী — হষ্ঠী; শ্যামরায়ের হাটখোলা — হাঁওরাহাট্‌কলা; সমান — হোঁয়ান, ইত্যাদি।

কর্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তিতে তোমাকে আমাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলা-কাব্যের প্রয়োগানুরূপ তোমারে — তোঁয়ারে; আমাকে — আঁআরে; তাকে — তারে প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তিতে দুইটি লক্ষণীয় প্রয়োগ দেখা যায়। 'হইতে, থেকে' এই অর্থে 'থুন' কথাটি 'স্থান হইতে' এই কথারই সংক্ষিপ্ত রূপ। উত্তরস্থান হইতে — উত্তরথুন; কোনস্থান হইতে — কোঁডেথুন; উপরস্থান হইতে — উঅরথুন। সপ্তমীর 'তে' বিভক্তির 'এ' চট্টগ্রামের ভাষায় লোপ পেয়ে যায় এবং 'ত' অত্‌ (হলন্ত) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: দোকানেতে —দোআনত্‌; কোন্‌স্থানেতে — কন্‌নত্‌; ঘরেতে — ঘরত্‌; আকাশেতে — আঁআশত।

ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এই যে অনার্যভাষা থেকেই সহকারী ক্রিয়াসমূহের (auxiliary verbs) প্রয়োগরীতি বাংলাভাষায় চলে এসেছে। চট্টগ্রামের ভাষায় সহকারী ক্রিয়ার প্রয়োগ কিন্তু অপরিহার্য। ঘটমান বর্তমানকালে: আমি খাইতে রহিয়াছি — আঁই খাইর্‌; যাইতে রহিয়াছি — যাইর্‌; তুমি কি করিতে রহিয়াছ — তুঁউ কিরর্‌; সেই তিনি যাইতে রহিয়া গিয়াছে — হিতে যার গৈ। (এখানে 'সে'-র সঙ্গে 'তিনি' প্রয়োগ সম্মানসূচক নয়, এটিও একটি বিশিষ্ট বাক্‌রীতি) পুরাঘটিত বর্তমানকালে:—সেই তিনি গিয়া গিয়াছে — হিতে গেইয়ে গৈ; সে তিনি করিয়া গিয়াছিল — হিতে কোর্‌গিল। কতকগুলো ক্রিয়া রূপবিকৃতি সত্ত্বেও মূলরূপের আভাস দেয়। যেমন: আঁই করি তুই কর, হিতে করে। আঁই গেলাম তুই গেলা, হিতে গেল্‌। আঁই কোইর্‌তাম, তুই কোইরত্যা হিতে কোইরতো। আঁই কোইরতাম্‌ আছিলাম; তুঁই কোরত্যা আছিলা; হিতে কোইরতো আছিল্‌। আঁই কোর্‌গিলাম; তুই কোরগিলা; হিতে কোরগিল্‌। সাধারণ ভবিষ্যৎ আর অনুজ্ঞায় রূপ বিভিন্ন হয়ে যায়। আঁই কোইর্‌গোম্‌, তুই কোরিবা, হিতে কোরিবো, অনুজ্ঞা—কোইরগো।

তা' ছাড়া, মধ্য-পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার বহু শব্দ একটু-আধটু উচ্চারণগত পার্থক্য নিয়ে এখানেও বেশ প্রচলিত আছে।

চট্টগ্রামীয় উপভাষার একটি বিশিষ্ট ধর্ম অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে তার শব্দোচ্চারণের সুবিধাজনিত দ্রুততা (swiftness)। এখানকার লোকেরা পরস্পর এত দ্রুত কথা বলে যায় যে তা শুনে অনভ্যস্ত ব্যক্তিরা বৈদিক ঋষিদের মত হয়ত তাদের "বয়াংসি" অর্থাৎ পাখী বলতে ইচ্ছা করবেন, কেননা হঠাৎ তা পাখীর কিচিরমিচিরের মতই শোনায়। এর কারণও সেই প্রাকৃতরীতিসম্মত মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির লোপপ্রবণতা। প্রত্যেক ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা ও মূর্ধা কিছু না কিছু পরস্পরকে আঘাত করে। তাতে প্রতিটি উচ্চারণ বারে বারে বাধা পায় এবং সময় নেয়। কিন্তু স্বরবর্ণ উচ্চারণে সে বালাই নেই বলে মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর পরিবর্তে সব স্বরধ্বনির উচ্চারণ করতে স্বল্প আয়াস ও কম সময় লাগে; প্রতিটি শব্দ তাই সঙ্কুচিত (contracted) হয়ে আসে। এইজন্যে অল্প সময়ে এরা এত দ্রুত কথা বলে যেতে পারে। আবার ব্যঞ্জনবর্ণের বারম্বার বাধা দ্বারা জিহ্বা জড়তাপ্রাপ্ত হয় না বলেই এখানকার লোক কিছুদিন চেষ্টা করে অন্য উপভাষাকে সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারে।

প্রারম্ভে চট্টগ্রামের ভাষার উপর যে-সব প্রভাবের কথা বলেছি, তার যথাযথ আলোচনা প্রয়োজন। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করলে সাধু ও প্রচলিত বাংলাভাষার সঙ্গে এর বহুবিধ সাদৃশ্য এবং এর স্বকীয়তা সুন্দররূপে প্রকটিত হতে পারে—এই ইঙ্গিতটুকু দেবার জন্যেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

পুস্তক-পরিচয়

জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

একদা যে প্রতিষ্ঠান হইতে দেশপ্রেমের মন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হয় তাহা হিন্দু মেলা। সে হইল প্রায় আশী বৎসরের কথা। ১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। গোড়ার দিকে চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া প্রথম তিন বৎসর ইহা চৈত্র মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু রচিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র ইহার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জোগায়। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে সেই আদর্শ কার্য্যে পরিণত হয়। দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলার গুরুত্ব নানাদিক দিয়া প্রত্যক্ষ করি। স্বদেশী শিল্পের প্রচলনে, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে, স্বদেশীর প্রচারে ভারতবর্ষের মধ্যে এই মেলাই প্রথম উদ্যোগী। ইহারই প্রেরণায় প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের জন্ম। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি,' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান,' গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি ক'রে' প্রভৃতি সঙ্গীত জাতীয় মেলার জন্যই রচিত এবং জাতীয় মেলায় গীত হয়। এই মেলার অন্যতম উৎসাহী পরিচালক মনোমোহন বসু এই সময়েই 'দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন' গানটি তাঁহার 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের জন্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা জাতীয় মেলায় পাঠ করেন। জাতীয় মেলা শুধু ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতির অগ্রদূত নয়, যে ভাবের প্রচারে কংগ্রেসের মত জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়, জাতীয় মেলা হইতে সেই ভাব-ধারার উৎপত্তি। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "জাতীয়তার নবমন্ত্র" হিন্দু মেলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ১৮৬৭ হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এ মেলার এগারটি অধিবেশন হয়। পরে ইহার আরো কয়টি অধিবেশন হয়। সবগুলির বিবরণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের সহিত জাতীয় মেলার সংস্রবের কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থে ন্যাশন্যাল স্কুল, ন্যাশন্যাল সোসাইটি, 'মহা ব্যায়াম প্রদর্শনে'র কথাও আছে। মেলায় গীত জাতীয় সঙ্গীতগুলি পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বইখানি সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র হইতে এই সকল তথ্য সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে যথেষ্ট

সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকে জাতীয় মেলার নেতৃস্থানীয় দশ জনের দশখানি ছবি ছাপা হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্রখানি যথাযথ মুদ্রিত হইয়াছে।

জয়ন্তী মৌচাক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

'মৌচাক' সুপরিচিত শিশু-পত্রিকা। পঁচিশ বৎসরের 'মৌচাক' হইতে রচনা আহরণ করিয়া এই 'জয়ন্তী-মৌচাক' প্রকাশিত হইয়াছে। বহু প্রখ্যাতনামা লেখকের লেখা গল্প, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। সুপরিকল্পিত প্রচ্ছদপট পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। বইখানি সুমুদ্রিত এবং সুচিত্রিত। ইহা শিশুদের মনোহরণ করিবে।

সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতাগুলি একত্রে প্রকাশিত করিয়া প্রকাশক শুধু শিশুদের উপকার নয়, পাঠক-সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। 'পাল্কীর গান', 'জ্যৈষ্ঠী মধু', 'দূরের পাল্লা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিতা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছবিগুলি শিশুচিত্তের আনন্দ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ধূমকেতু—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। কমলা বুক ডিপো। ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷০।

ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী জানাইয়াছেন, 'সবুজ পত্রে'র নব পর্য্যায়ে ধূমকেতুর কতক অংশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও 'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়ামে'র কবিযশ কান্তিচন্দ্রের গল্প-রচনার কৃতিত্বকে এতদিন ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। অনেক পাঠকই হয়তো কবি কান্তিচন্দ্রের এই নূতন প্রয়াস সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না।

কতকগুলি গল্প ও কণিকা লইয়া ধূমকেতুর সৃষ্টি। গল্পগুলিতে প্লটের নূতনত্ব, ঘটনা-সংস্থান, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ইত্যাদির বাহুল্য নাই; ছবির রং কোথাও ঘোরালো নহে; পটভূমিকায় ও প্রতিবেশে বিস্তীর্ণ জগতের আভাস মনে জাগে না, তবু এগুলি শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার কৌতূহল বজায় থাকে। ইহার কারণ লেখকের গল্প বলার সহজ ভঙ্গি। এই ভঙ্গিকে জীবনের অভিজ্ঞতা ও বৈদগ্ধ সরস ও উপভোগ্য করিয়াছে। কয়েকটি কথিকাও আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

মরণোৎসব—শ্রীসরলা বসু রায়। সংহতি পাব্লিশিং হাউস। ৭নং, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পড়িয়া মনে হয়, পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি লেখিকার প্রথম প্রচেষ্টা। কয়েকটি গল্পে রস-পরিবেশনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লেখিকা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

চাওয়া ও পাওয়া—শ্রীঅমলা দেবী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

পশ্চিম বঙ্গের কোন একটি গণ্ডগ্রামে অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সূত্রপাত, পাঁচই মাঘের রাত্রি একটায় তাহার পরিসমাপ্তি। নায়ক সদ্য পাস-করা তরুণ ডাক্তার পরেশ; তার জীবনে আসিয়াছে রবি, কমলা ও আরতি নাম্নী তিনটি মেয়ে। পল্লীর পারিপার্শ্বিকে আরো অনেকে ভিড় করিয়া ইহাদের চাওয়া ও পাওয়ার কাহিনীকে বর্ণে ও বর্ণনায়—কৌতুকে ও বেদনায় নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

স্বাতী, সুধার প্রেম, মনোরমা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী বাংলার পাঠক-মহলে অপরিচিতা নহেন। তাঁহার বাস্তবনিষ্ঠা, চরিত্র-চিত্রণে নির্ভীকতা, গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টিতে দক্ষতা এবং ভাষার সরসতা প্রভৃতি বিদগ্ধমহলেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানির এইসব গুণের অধিকাংশ থাকা সত্ত্বেও ইহা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা এই প্রশ্ন মনে জাগে। ইহার চরিত্রগুলি বহুব্যবহৃত এবং রঙের পোঁচ বেশী গাঢ় হইয়াছে। শিক্ষকমণ্ডলীর আলাপ-আলোচনাতেও স্থূল রসিকতার প্রভাব বেশী। এগুলি না থাকিলে চাওয়া ও পাওয়ার সত্যকার ট্র্যাজেডিকে সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে বাধিত না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কল্কি—বনফুল। মূল্য এক টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী বনফুল-রচিত এই নাটকখানি বর্ত্তমান যুগের ভাব-ধারার সহিত অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের রক্ষণশীল সমাজের বিরোধ এবং বর্ত্তমানকে মানিয়া লইবার ইঙ্গিত। ব্যঙ্গের মধ্যে গভীর কথা প্রকাশ করা বনফুলের নিজস্ব। এই নাটিকাখানিতে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। চরিত্র-গুলি অল্প পরিসরের মধ্যেও সজীব এবং সাবলীল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতা পুরন্দর, পুত্র ক্ষিতীশ এবং ভাবী বধূ কল্কির (সুলতা) সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া যে ঔদার্য্যের এবং সহনশীলতার [illegible] দিয়াছেন তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ রক্ষণশীল সমাজের পরিবর্ত্তিত রূপ [illegible] হইয়াছে।

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জেনারাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাংলা ছোট গল্প যে কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইখানি তাহার নিদর্শন। লেখক বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প দান করিয়াছেন। মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখকের রচনায় চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। সুমনার স্বপ্ন, তথাগত এবং তৃষ্ণা এই গল্প তিনটি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বাংলা গল্পসাহিত্যে লেখকের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

সাম্প্রতিক সাবান সমাচার—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিউ ভ্যায়াইট পাবলিশার্স, ৫নং, হাজরা লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

নাম দেখিয়া এবং মলাটের রূপালি রং দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, ইহা সাবান-প্রস্তুত সম্বন্ধীয় বই হইবে, কিন্তু পড়িতে গিয়া দেখি, ইহা ব্যঙ্গাত্মক রসরচনা। এ বিষয়ে লেখকের হাত আছে, সব কয়টি গল্পেই তাঁহার রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে।

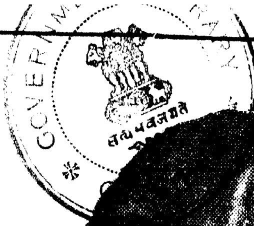
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস—রমেশচন্দ্র দত্ত। অনুবাদক—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা ৭১, মূল্য ।০।

এই পুস্তক বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৩০শ গ্রন্থ। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিতেছিলেন তখন বহু পরিশ্রম করিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়মের ও সরকারী গ্রন্থাগার হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দুইখণ্ডে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) প্রণয়ন করিয়াছেন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাঁহার সরল ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। রমেশচন্দ্রের উপরি-উক্ত গ্রন্থ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে অথচ ইহা না পড়িলে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে বহু লেখক এই গ্রন্থদ্বয় হইতে বহু তথ্য আহরণ করিয়া নিজেদের পুস্তকে চালাইয়াছেন তথাপি এই মূলগ্রন্থ পাঠের আবশ্যকতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কোম্পানীর আমল হইতে ইংরেজ-শাসন ভারতের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, সমাজ এক কথায় ভারতীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গ কি ভাবে ধ্বংস করিয়াছে এই অর্থনৈতিক আলোচনার ইতিহাসে তাহাই প্রকট হইয়াছে। এদেশের রাজশক্তি যখন ইংরেজের করায়ত্ত হয় তখন বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান ছিল কিন্তু ক্রমে তাহা দরিদ্র, কৃষিপ্রধান ও কাঁচামালের দেশে পরিণত হইল। অনেক সহৃদয় ইংরেজ রাজপুরুষ এই ক্রমবর্দ্ধমান শোষণ-নীতি রোধ করিতে পারেন নাই। ফলে ভারত-শাসন ব্যাপারে সকল সময় ইংলণ্ডের স্বার্থই রক্ষিত হইয়াছে। তাই দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা ভারতের নিত্যসহচর হইয়াছে। যখন সেচকার্য্য বাড়ান উচিত ছিল তখন ইংরেজ-স্বার্থ ভারতে রেল লাইন প্রসারিত করিয়াছে। ভূমিরাজস্ব ও করনীতির নিষ্ঠুর অপপ্রয়োগে দেশীয় শিল্পের মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। রমেশচন্দ্র ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন না। কিন্তু তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে কোন জাতির স্বার্থ বিদেশী শাসনদ্বারা রক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। রমেশ-চন্দ্রের পুস্তকের সমস্ত মালমশলা ইংরেজ-দপ্তর ও ইংরেজ লেখকের পুস্তক হইতেই সংগৃহীত।

এই পুস্তকের অনুবাদ দ্বারা লেখক বাংলা সাহিত্যের বহুদিনের একটি অভাব দূর করিলেন। বলা প্রয়োজন যে হিন্দী ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত





...মেঘবরণ কেশ'



শুনতে যেমন ভাল "মেঘবরণ কেশ" কিন্তু বজায় রাখা তেমনই কঠিন। "লক্ষ্মী-বিলাস"ই ' শতাব্দীর উপর আপনার কেশ-সৌষ্ঠব ও প্রসাধনে সাহায্য করে এসেছে।

সর্ব্বজন সমাদৃত

মহোপকারি সুবাসিত তৈল

লক্ষ্মীবিলাস

এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা

পটভূমিকা—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—রমেশ ঘোষাল, ৩৫ বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

ছোট গল্পের বই। আমাদের চারিদিকে নিত্য প্রবহমান দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে অহরহ যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে সাধারণ লোকে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করে না, কিন্তু একজন কলাকুশলী শিল্পী তাঁহার দরদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে এই সকল সাধারণ ঘটনার মধ্যেই একটু অসাধারণত্ব ও অভিনবত্ব আবিষ্কার করিয়া দক্ষ তুলিকার সাহায্যে তাহাতে রং ফলাইয়া পাঠককে সচকিত ও মুগ্ধ করেন। তাঁহার সৃষ্ট রচনা পাঠকের চিত্তে স্বতই বিস্ময়-কৌতুক ও আনন্দ-বেদনা উৎসারিত করিয়া সার্থকতা লাভ করে। এই হিসাবে রামপদবাবুর গল্পগুলি চমৎকার ও উপভোগ্য। 'দিল্লী এক্সপ্রেসে' এক তরুণ দম্পতির প্রাণরসে উচ্ছল প্রণয়কাকলি, 'জীবন-চরিতে' একটি আদর্শ-চরিত্র (?) জমিদারের অন্তর্নিহিত কদর্য্য-চরিত্রের স্বরূপোদ্ঘাটন, 'তীর্থের ফলে' সামান্য কাঞ্চনের বিনিময়ে তীর্থযাত্রিণীদের অক্ষয় পুণ্যার্জ্জনের লোভ, 'জলমিশ্রিত দুগ্ধে' গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্বার্থসর্ব্বস্ব নিস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি প্রভৃতি চিত্রগুলি কৌতুকজনক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

প্রবাসে (২য় সং)—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থকার, পোঃ গড়িয়া, জিলা ২৪ পরগণা। মূল্য ৩৲।

ইহাতে ভূপর্য্যটক গ্রন্থকার বর্ম্মা, মালয়, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য দেশগুলিতে তাঁহার ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক সময় বৃহত্তর ভারতের সহিত ঐসকল দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, বর্ত্তমান কালেও উহাদের সহিত ভারতের নানাপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তদুপরি যুধ্যমান দুইটি প্রধান জাতি চীন ও জাপানের সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে। নিজের দেশকে চিনিতে হইলে বাইরের দেশগুলিকেও চেনা ও জানা দরকার। কি কি কারণে উহাদের উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে উহাদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, ইহা জানিলে আমরাও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি। এই বিষয়ে লেখকের শিক্ষিত মননশীল দৃষ্টি বইখানিকে মূল্যবান ও সুপাঠ্য করিয়াছে। গ্রন্থের ভাষা বেশ রুচিকর, কিন্তু পদ্যে ব্যবহৃত 'সাথে' শব্দটির অপপ্রয়োগ মাঝে মাঝে শ্রুতিপীড়া উৎপাদন করে।

হিমাচলের স্বপ্ন—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। কুলজা সাহিত্য-মন্দির, সি ৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

ছেলেদের সচিত্র উপন্যাস। একটি বাজিকরের ভালুক অনাথাবস্থায় ধৃত হইয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বন্দী হয়। সেখানে সে পিঞ্জরায় শুইয়া জন্মস্থান হিমালয়ের বুকে স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখিত, অবশেষে একদিন দ্বার খোলা পাইয়া সে বাহির বিশ্বে বাহির হইয়া পড়ে। পথিমধ্যে সে বহু রকমারি আবেষ্টন ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, অবশেষে ঘটনাচক্রে ধৃত হইয়া পুনরায়

চিড়িয়াখানায় প্রেরিত হয়। গল্পটি পড়িয়া ছেলেরা প্রচুর আমোদ লাভ করিবে।

আচ্ছা ফ্যাসাদ—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। কুলজা সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। মূল্য ৮৹।

ছড়া ও গল্পের বই। বড় বড় টাইপে পুরু কাগজে ঝরঝরে ছাপা। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি আছে। ছেলেদের কবিতা ও ছড়া রচনায় সুনির্ম্মল বাবু সিদ্ধহস্ত, গল্পগুলি সুলিখিত। ছোট ছেলেদের উপহারের উপযোগী বই।

জন্মদিন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। সহুরে মামা—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। প্রত্যেকখানির মূল্য ॥৹।

প্রথমটি ছেলেদের অভিনয়োপযোগী নাটক। দ্বিতীয়টি প্রহসন। বড়লোকের ছেলে উৎপল জন্মদিনে বন্ধুদের সহিত গ্রামের উদ্যানবাটিকায় বেড়াইতে আসিয়া পথ হারাইয়া এক দরিদ্র পরিবারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া দরিদ্রের বন্ধুরূপে 'জন্মদিনে'র সার্থকতা সম্পাদন করিল। 'সহুরে মামা' গুণধর ভৃত্য লম্বেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া পল্লীগ্রামে আসিয়া অতিরিক্ত চাল দেখাইতে গিয়া পাড়াগেঁয়ে ভাগ্‌নের হাতে বেচাল ও বেসামাল হইল। বই দুখানি অভিনয় করিয়া ছেলেরা তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিবে। সুদৃশ্য বাঁধাই ও চিত্রসংযোগে বই দুখানি ছেলেদের উপহারের উপযোগী করা হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

জগৎ কোন্ পথে—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স। ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য ১৷৹ আনা।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী কর্ত্তৃক পোলাণ্ড আক্রান্ত হইবার পর, দেখিতে দেখিতে যে বিশ্বব্যাপী মহাসমরের সূচনা হয়, সম্প্রতি জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে তাহার অবসান হইয়াছে, কিন্তু ইহার জের এখনও মেটে নাই। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, বিজিত দেশসমূহের ভাগ-বাঁটোয়ারা ইত্যাদি সম্পর্কে জগতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কগণ এখনও মাথা ঘামাইতেছেন। সামান্য একটা উপলক্ষ্য লইয়া এই আন্তর্জ্জাতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব কেন হইল, তাহা বুঝিতে হইলে দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের আদর্শ এবং লক্ষ্য কি, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্কই বা বিদ্যমান এ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। 'জগৎ কোন্ পথে'র লেখক বহু আয়াসে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সংস্থান, অতীত ইতিহাস, শাসন-তন্ত্র, বিভিন্ন [illegible] আদর্শের সংঘাত ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সং[illegible] পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অতীত ইতিহাস এবং রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যোগেশবাবু বিশেষভাবে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্যই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকও ইহা পাঠে চলতি দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হইতে পারিবেন। আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় লিখিত এ ধরনের বিশ্লেষণাত্মক ও তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বিরল।

মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে যে বইয়ের (গল্প-উপন্যাস নয়) চারটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে, বাজারে তাহার চাহিদা যে কত বেশী সে কথা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। পরিবর্দ্ধিত পঞ্চম সংস্করণে সান ফ্রানসিস্কো ও পটস্‌ডাম সম্মেলন, জাপানের আত্মসমর্পণ, ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে লর্ড ওয়াভেলের পুনরায় বিলাতগমন প্রভৃতি আধুনিকতম ঘটনাসমূহের বিবরণ দেওয়ায় ইহার মূল্য বাড়িয়াছে এবং পুস্তকখানা বিশেষ সময়োপযোগীও হইয়াছে।

অরসিকেষু—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই প্রথম পুস্তকেই ব্যঙ্গ-গল্প রচনায় লেখকের স্বকীয়তার পরিচয় পাইলাম। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে নিত্যসংঘটিত অতি সাধারণ ব্যাপারসমূহ হইতেই তাঁহার রস-রচনার উপকরণ সংগৃহীত। জাল সাহিত্যিক নন্দবাবু, ফুলগাছের বাতিকগ্রস্ত রায়সাহেব প্রভৃতি অধিকাংশ চরিত্রই যেন আমাদের অতি-পরিচিত, লেখকের রসিকতাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তাঁহার মধুর পিছনে হুল নাই, তাঁহার পরিবেশিত হাস্যরস স্নিগ্ধ অনাবিল শুভ্র এবং সংযত। বিবাহ-বার্ষিকী গল্পটিতে মেঘবিচ্ছুরিত রবি-রশ্মির মত, বর্ত্তমান সঙ্কট-সময়ের বিড়ম্বিত জীবনের বেদনার কৃষ্ণচ্ছায়া বিদীর্ণ করিয়া বিমল হাস্যচ্ছটা বিকীর্য্যমান। এই বিচিত্র-মধুর রসালো গল্পগুলি যদি পাঠকমহলে সমাদৃত না হয় তাহা হইলে বাস্তবিকই বুঝিব যে লেখকের 'রহস্য-নিবেদন' 'অরসিকেষু' হইয়াছে।

জ্যোতির্গময়—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। জ্যোতি প্রকাশালয়, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের তপোবনে ঋষিকণ্ঠে উদ্গীরিত হইয়াছিল আধ্যাত্মিকতার বাণী। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালস্থিত এক চৈতন্যময় বিরাট্ সত্তার দিব্যানুভূতি লাভ করিয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষি জরাব্যাধিপ্রপীড়িত মৃত্যুভয়কাতর মনুষ্য-জাতিকে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। সেই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া অধ্যাত্ম-সাধনা দ্বারা অমৃতত্বের পথেই ভারত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু আজ জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তীব্র রশ্মিচ্ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া আমরা সে মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও পশ্চিমের আমদানি তথাকথিত উৎকট এবং উগ্র বাস্তবতার ঢক্কানিনাদ আধ্যাত্মিকতার সুরকে ছাপাইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্র, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা এবং উন্নত আদর্শবাদই ফাল্গুনীবাবুকে জ্যোতির্গময় নামক উপন্যাসখানি রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ইহাতে ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে লেখকের বহুবিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মুগ্ধ হইতে হয় নীরস ও জটিল তত্ত্বসমূহকে রসবস্তুতে পরিণত করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া। উপন্যাসটি বিষয়বস্তু এবং চরিত্রসৃষ্টি উভয় দিক দিয়াই অভিনব। দৃশ্যমান সসীম জগৎ আর তাহার অন্তরালস্থিত অদৃশ্য অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ইহার ঘটনাস্থল। নায়িকা উজ্জ্বলা (জলা) দিব্যদেহ-ধারিণী অতীন্দ্রিয়-লোকের অধিবাসিনী হইয়াও মর্ত্ত্যের স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন কাটাইতে পারে না, মাটির মায়ায় নিঃসীম জ্যোতির্লোক হইতে মাঝে মাঝে নামিয়া আসে ধূলিধূসর ধরণীর কোলে। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি লেখকের আছে বলিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা তাঁহার রচনায় এমন একান্ত ভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা পাঠকের মনকে বাস্তবের ধূলিমলিন পরিবেশের ঊর্দ্ধে সুদূর কল্পলোকে টানিয়া লইয়া যায়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি

কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর চারি বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের আধারস্বরূপ ছিলেন। আমাদের জাতীয় চেতনা তাঁহারই মধ্যে পূর্ণতম প্রকাশলাভ করিয়াছে। কাব্য সঙ্গীত চারুকলা শিক্ষা ও লোকসেবা—জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্য সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁহার শ্রম, শক্তি ও প্রতিভাকে উৎসর্গ করিয়া নব নব সম্পদে ভরিয়া দিয়াছেন। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের নিপীড়িত জীবনকে সকল বন্ধন ও গ্লানি হইতে উদ্ধার করিবার স্বপ্ন তিনি দেখিতেন। তাঁহার কাছে আমরা কতভাবে ঋণী সেকথা যেন কদাপি বিস্মৃত না হই।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্যে আজও আমরা জীবনযাপন করিতেছি। তাঁহার নিকট হইতে যে অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি, তাহারই কৃতজ্ঞতার স্মারক-ব্রতটুকু পালনের পুণ্য আয়োজনে আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি। এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য 'নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতি' দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে তৎপর হইয়াছেন।

উক্ত সমিতি এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া কবির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করিবেন :

(১) বিশ্বভারতীর আর্থিক সঙ্গতি পুষ্ট করিতে হইবে।

যে বিশ্ব-সংস্কৃতির আদর্শ কবির ধ্যানস্বরূপ ছিল, বিশ্বভারতী তাহারই প্রতীক। বিশ্বভারতীকে অর্থাভাব হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বভারতীর সাধনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পারিলে আমরা কবির আর[illegible] পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া মনে করি। (ক) পল্লী-উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, (খ) নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার বিস্তার, (গ) কারুশিল্প এবং কৃষি সম্বন্ধে গবেষণামূলক কার্য্য।

(২) জোড়াসাঁকোতে অবস্থিত কবির জন্ম-মৃত্যুর স্থান এবং পৈতৃক বাসভবনকে একটি সংস্কৃতি অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে হইবে।

বাংলা তথা ভারতের নূতন সাংস্কৃতিক জাগরণের তিন পুরুষব্যাপী সাধনার ইতিহাস জোড়াসাঁকো ভবন ও ঠাকুর-পরিবারের জীবনে গ্রথিত রহিয়াছে। এই ভবনগুলিকে জাতীয় স্মৃতিসম্পদরূপে পরিণত ও রক্ষা করিবার জন্য উক্ত স্থানে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাংস্কৃতিক পরিষদ স্থাপিত করিতে হইবে: (ক) জাতীয় প্রত্নশালা, (খ) জাতীয় চিত্রশালা, (গ) জাতীয় নাট্যশালা, (ঘ) জাতীয় সংগঠন ও উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য বিবিধ বিষয়ক একটি গবেষণাগার, (ঙ) আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও সৌহার্দ্যের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি বিশ্বভারতী সভাভবন ও জনসেবা প্রতিষ্ঠান।

(৩) যে কোন ভারতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রচনা অথবা মৌলিক গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুরস্কার দিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা।

আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, জাতির শ্রেষ্ঠ কবির ভাবসম্পদ ও সাধনার ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত তাঁহারই দেশবাসী এই স্মৃতিরক্ষার আয়োজনে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিবেন।

তেজবাহাদুর সপ্রু
সভাপতি

সুরেশচন্দ্র মজুমদার
সাধারণ সম্পাদক

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য সকল সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয়: সম্পাদক, নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। অথবা, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অবনীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গত ৩০শে ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় মহাশয়ের মারফত একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র পাই,—তা শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের পঞ্চ-সপ্ততিতম জন্মতিথি উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ-পত্র। রায় মহাশয় খবর দিলেন যে, এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেছেন কিশোরদের কয়েকটি সভা ও সমিতি। আসরে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, অনেক কিশোর-কিশোরী হাজির হয়েছেন। কিছু পরেই শিশু-সাহিত্য-পরিষদ, বালক-সঙ্ঘ, ভাই-বোন ক্লাব, কিশোর-সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে আচার্য্যকে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানিয়ে প্রশস্তি ও অভিভাষণ পাঠ এবং নানা উপহারাদি নিবেদিত হ'ল। 'বড়দের' বা প্রাপ্তবয়স্কদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও প্রশস্তি পঠিত হ'ল। সভায় অল্পবয়স্ক অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্তদের সংখ্যাই বেশী মনে হ'ল। এই সংখ্যা দেখে আমার মনে প্রশ্ন উঠছিল, কিশোরদের অনুষ্ঠানে এত বয়স্কদের ভিড় কেন? আমার মনে হ'ল যে, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জন্মতিথির আয়োজন করে অল্পবয়স্কেরা পরিপক্ক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে এবং

এই সুযোগে বয়স্কদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবার জন্য অনেক বয়স্ক মানুষ উক্ত সভার শোভা-বর্দ্ধন করেছিলেন। অন্যের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু আমি সেদিন শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের নিকট যে শিক্ষালাভ করে ঘরে ফিরি তা এই যে, বাংলার, ভারতের, তথা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রূপ-বিৎ ও রূপ-কৃৎকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে বাংলার বয়স্ক ব্যক্তিরা এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। অবশ্য, আমরা যদি একথা বলি যে, শিল্প-বিষয়ে আমাদের দেশ এখনও সম্পূর্ণ নাবালক এবং অবনীন্দ্রনাথ ভারত-শিল্পের ভাণ্ডারে কি সম্পদ দান করেছেন আমরা তার মূল্য নির্দ্ধারণ করতে অক্ষম, তা হলে 'অক্ষম' ও 'নাবালকদের' কোনও কর্ত্তব্যই থাকে না।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা এখন শোচনীয়। এমতাবস্থায় একটা কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হবে। "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতের কৃষ্টির ক্ষেত্রে [সাহিত্যে এবং শিল্পে] বহুমূল্য দান দিয়ে ভারতের গৌরব ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছেন এবং এই দানের ঋণ-স্বীকার উপলক্ষে বিপুল সমারোহে অবনীন্দ্রনাথের "জয়ন্তী"র অনুষ্ঠান করা দেশবাসীর অবশ্য-কর্ত্তব্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, অমল হোম প্রভৃতি, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলীকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হবার জন্য এক অনুরোধ-পত্র পাঠিয়েছিলেন। মাত্র দুই একজন অবনীন্দ্র-শিষ্যের নিকট সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলাপ করে জেনেছি যে উপযুক্ত সমারোহের সহিত অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য "জয়ন্তী"-অনুষ্ঠানের জন্য অর্থের অভাব হবে না। নানা কারণে, বিশেষতঃ তাঁর শিষ্যবর্গের উৎসাহের অভাবে শিল্পাচার্য্যের "জয়ন্তী" আজও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু আর বিলম্ব করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। আশা করি, দেশের উদ্যমশীল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সত্বর এ বিষয়ে তৎপর হয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য পালন করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যা সম্ভব আমি তা অকাতরে ও কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করতে প্রস্তুত আছি। আমার ভরসা আছে যে, আচার্য্যের শিল্প-গোষ্ঠীর গণ্ডীর বাইরেও কর্ম্মীর অভাব হবে না।

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম-এসসি, পিএইচ-ডি

শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পশু-পুষ্টি ও জৈব রসায়ন-শাস্ত্রে (Biochemistry and Animal Nutrition) গবেষণা করিয়া পিএইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা[illegible] বিষয় ছিল 'গো-মহিষাদি পশুর দেহে ফ্লোরিনের বিষ-[illegible]তি' (Fluorine intoxication in cattle)। ডক্টর মজুমদারই ভারতবর্ষে এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম গবেষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার গবেষণা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে যে সহস্র সহস্র গো-মহিষাদি পশু দীর্ঘদিন সঞ্চিত ফ্লোরিন বিষের ক্রিয়ায় অকর্ম্মণ্য কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা সম্পূর্ণ নিবার্য্য।

ডক্টর মজুমদার বেরেলী আইজট নগরস্থিত 'ইম্পিরিয়াল ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র একজন সহকারী গবেষক। তিনি ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে কোন্নুর নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরীতেও কাজ করিয়াছেন।

ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মণ্ডলাই গ্রামে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। ইনি পরলোকগত রাধাবল্লভ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্দ্র ইলছোবা মণ্ডলাই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কায়স্থ পাঠশালা হইতে এফ্-এ পাস করেন। কায়স্থ পাঠশালার তদানীন্তন অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯০৫ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া ডিগ্রী লাভ করেন এবং এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইয়া পেশোয়ারে গমন করেন। সেখানে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে, ১৮১৮ ইংরেজীর ৩নং রেগুলেশ্যনে তাঁহাকে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৯২৯-৩০ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত



চারুচন্দ্র ঘোষ

প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। ১৯৩১ সালে আবার তাঁহার কারাদণ্ড হয়। সবশুদ্ধ তিনবার তিনি সীমান্ত প্রদেশ হইতে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পেশোয়ার হইতে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস-অনুমোদিত সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদে তিনি 'হিন্দু টেম্পল-রিফর্ম বিল' উত্থাপন করেন। সেটি এখনো সিলেক্ট কমিটিতে আছে। হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইতে পারেন নাই এবং সেজন্য উহা পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। গত ১৩[illegible] সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড 'কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



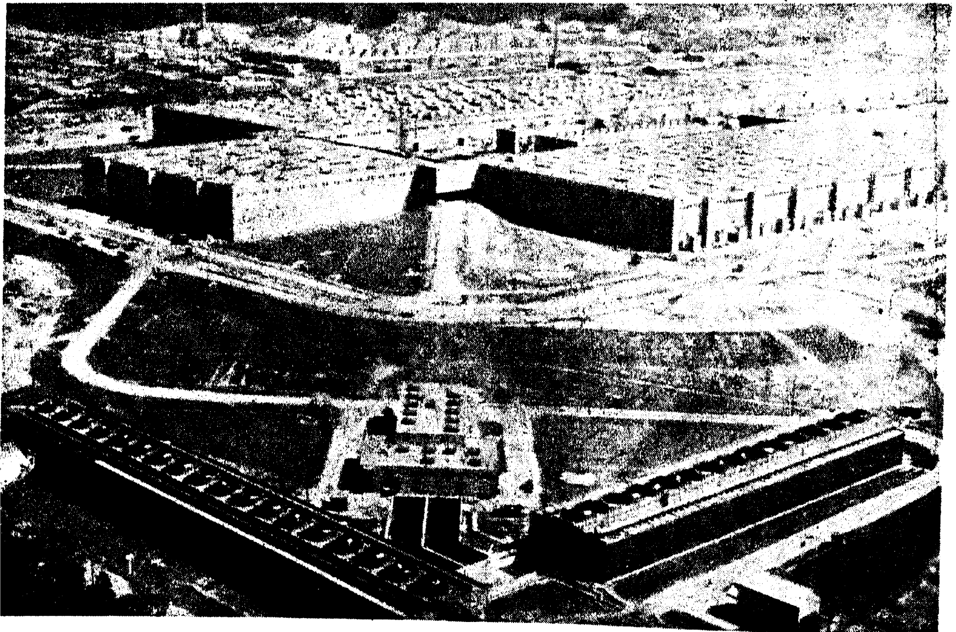
আরতি

শ্রীনিশীথকুমার মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



নিউ ইয়র্কের সমুদ্রোপকূলস্থ 'জোনস বিচে' ডিডিটি প্রয়োগ দ্বারা মশা মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গাদি বিনাশ



টেনেসি ভ্যালির 'ওকা রিজে' যুক্তরাষ্ট্রের এটম বোমা প্রস্তুতির অন্যতম কেন্দ্র ক্লিণ্টন এঞ্জিনীয়ার ওয়ার্কস

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালী কোথায় চলিয়াছে ?

বাঙালীর সম্মুখে অসংখ্য বিপদ এবং অশেষ বাধাবিপত্তি রহিয়াছে। এতদিন এদেশের জনসাধারণ সে সকলের কথা চিন্তা করিয়া এবং নিজেদের অসহায় অবস্থার জন্ম আক্ষেপ করিয়া ভাগ্যের উপর দোষ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনই প্রতিকার নাই বলিয়া ভাবিত। সামান্য কয়জন যাহাদের মনে আশার আলো নিবে নাই একমাত্র তাহাদেরই ভরসা ছিল যে একদিন-না-এক দিন রাত্রির অন্ধকার কাটিবে এবং দিনের আলোকেরই মত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উদ্দীপনা আসিয়া জাতীয় জড়তা দূর করিবে এবং দেশে নূতন প্রাণের চেতনা আনিয়া দিবে। কঠিন অর্থনৈতিক দুর্গতি, বিষম দারিদ্র্যের চাপ এবং অতি কঠোর দমননীতি অনুযায়ী শাসন এই ত্র্যহস্পর্শের ফলে নিস্তেজ বাঙালী ভবিষ্যতের চিন্তা ছাড়িয়া বর্তমানের বিষম সমস্যা লইয়াই হিমসিম খাইতেছিল তাহার পরিত্রাণ কোন্ পথে তাহা নির্দেশ করিবার জন্যও কেহই সুদীর্ঘকাল অগ্রসর হয় নাই। অর্ধ কোটি লোক, হিন্দু মুসলমান, পথে ঘাটে পড়িয়া মরিল, তাহাদের এই মরণের ফলে আক্ষেপের দীর্ঘনিঃশ্বাস ভিন্ন আর বিশেষ কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ শোনা যায়, "সোনার বাংলা"র সম্পদ, বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর দীক্ষা ভারতে অতুলনীয়। কোন্ দোষে, কাহার পাপে, কাহার বা কাহাদের বুদ্ধির অভাবে বাংলার ও বাঙালীর এই চরম দুর্দশা আসিয়াছে তাহার সত্য বিচারের সময় কি এখনও আসে নাই ? রোগী প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এখনও কি চিকিৎসার প্রমাদই ঘটিবে, এখনও কি ব্যাধি নির্ণয়ের কোনও প্রকৃত চেষ্টা হইবে না ?

এই ঘোর দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, আত্মকলহে পূর্ণ, আত্মঘাতী দেশের লোকের পরিত্রাণ ও প্রতিকারের জন্য দুই শ্রেণীর লোক এখন আসরে নামিয়াছেন, একদল সরকারী, অন্যেরা বিভিন্ন বে-সরকারী দলভুক্ত। সরকারী দলের যে নক্সা এখন সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত সে নক্সার কথা সময়ান্তরে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু সম্প্রতি এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, সরকারী চাকুরের দল আরও পুষ্ট হইলেই বা কাঁপতি টাকার ধনীর আরও টিকা জুটিলেই দেশের সকল সমস্যার পূরণ হওয়া অসম্ভব। যে[illegible]নক্সা গঠিত হইয়াছে তাহাতে দূর ভবিষ্যতে দেশের[illegible]দিগের উপকার হইলেও হইতে পারে কিন্তু রোগের আশু উপশমের কোনও সম্ভাবনা নাই। কেননা, যেখানে প্রকৃত ব্যাধি নির্ণয়ই হয় নাই সেখানে ঔষধের ফল কি করিয়া ফলিবে?

সুতরাং দেশের আশা-ভরসা এখন বেসরকারী দলভুক্ত নেতৃবর্গের উপর। দেশে এখন পুনর্বার আশার ক্ষীণ আলো দেখা দিয়াছে, লোকে ভাবিতেছে যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহারা যখন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই অতি শীঘ্রই স্রোতের ধারা ফিরিবে। প্রতিকারের ব্যবস্থা তাঁহাদেরই হাতে ছাড়িয়া দিয়া দেশবাসী এখন ক্ষণিক আশ্বস্ত হইয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় দেশের নেতৃবর্গের কর্তব্য অতিশয় গুরুতর। তাঁহাদের প্রতিপদে প্রতি কথায় দেশের শুভ-অশুভ ঘটিবে। তাঁহারা কি এ বিষয়ে অবহিত আছেন ? তাঁহারা কি বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই তিন বৎসরে পৃথিবীতে একটা প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে যাহার ফলে প্রতি দেশের এবং প্রতি জাতির জীবনে সঙ্কিক্ষণ উপস্থিত ? তাঁহারা কি ইহা সম্যক্ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের অতীতের কর্মপন্থা দেশকে কোথায় লইয়া গিয়াছে ? বিশেষতঃ বাংলাদেশ এখন অতীতের কার্যফলে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একথা কি তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ? এখনও চতুর্দিক বিপদাচ্ছন্ন, অতি সন্তর্পণে ও সুচিন্তিতভাবে প্রত্যেকটি কাজ করিতে হইবে, পুরাতন বিরোধ মিটাইতে হইবে এবং নূতন বিরোধ সৃষ্টি যাহাতে না হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে একথা তাঁহারা না বুঝিলে বাংলার বিষম বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার

কংগ্রেস তাঁহাদের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে মূলতঃ নিম্নলিখিত বারটি বিষয়ের [illegible] করা হইয়াছে :—

(১) কংগ্রেস ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ও সমান সুবিধা চায়, (২) কংগ্রেস সমস্ত সম্প্রদায় এবং ধর্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বদ্ধপরিকর, তাহাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও শুভেচ্ছাই কংগ্রেসের কাম্য, (৩) জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা ও প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা কংগ্রেস

করিবে, (৪) বৃহত্তর ভিত্তির উপর নিজের জীবন ও কৃষ্টির উন্নতিকল্পে কংগ্রেস প্রত্যেকটি দলের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে, (৫) কংগ্রেস ভাষা ও কৃষ্টির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশ-পুনর্গঠনের পরিকল্পনা পোষণ করে, (৬) সামাজিক উৎপীড়ন ও অবিচার যাহারা সহ্য করিতেছে, তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের জন্য অসাম্যের সমস্ত রকম অন্তরায় কংগ্রেস বিদূরিত করিবে, (৭) ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক যাহাতে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা পায়, তাহার জন্য একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। (৮) কংগ্রেস প্রত্যেকটি ইউনিটের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার বজায় রাখিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী, (৯) কংগ্রেস ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সমস্যা অর্থাৎ দারিদ্র্যের অভিশাপ বিদূরণ ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, (১০) আধুনিক পদ্ধতিতে দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতিবিধান, সমস্ত রকম সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং ভারত যাহাতে একটি সমবায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে পরিণত হয়, তাহার ব্যবস্থা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, (১১) আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কংগ্রেস স্বাধীন জাতিসমূহের একটি বিশ্ব রাষ্ট্র-সংঘ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল, (১২) কংগ্রেস দাস জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করিবেন।

নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেস এবার স্বাধীন ভারতে প্রদেশ বিভাগের প্রণালী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে কংগ্রেস নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের সমানাধিকারের পক্ষপাতী। সকল সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল দলের ঐক্য ও পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা কংগ্রেসের কাম্য। স্ব-স্ব অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্ত দেশবাসী যাহাতে একটি অখণ্ড জাতিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে কংগ্রেস তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক প্রদেশ যাহাতে বৃহত্তর অখণ্ড রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ আদর্শ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী বাড়িয়া উঠিতে পারে কংগ্রেস সে দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছে। উল্লিখিতরূপে অখণ্ড রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের উন্নতি বিধান করিতে হইলে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগ করা প্রয়োজন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনা প্রস্তাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করিয়া আবছা রাখা হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা উহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন, নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের পর তাঁহাদের সে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। 'ভারতবর্ষ খণ্ডিত [illegible]না অখণ্ড রাষ্ট্রই থাকিবে' কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন [illegible] স্বীকার করিয়া লইয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছে। অখণ্ড রাষ্ট্রের মধ্যে প্রদেশসমূহকে ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব তাহা দেওয়া হইবে, কিন্তু রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে আপত্তির কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, কানাডায় ঠিক এই ধরণের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দেশের পক্ষে কল্যাণের কারণ হইয়াছে বলিয়াই দেখা গিয়াছে। বর্তমান যুগে আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে মূল রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করিয়া পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র দেশে পরিণত করিলে দুর্বল ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে আত্মরক্ষাই দুরূহ হইয়া উঠে ইহা দেখা গিয়াছে। আবার অখণ্ড রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত করিতে গেলে ডিক্টেটরীর সৃষ্টি হইয়া দেশের ও পৃথিবীর অশেষ অমঙ্গলের কারণ ঘটে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুইয়ের মাঝামাঝি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, যত দূর সম্ভব প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন সমেত অখণ্ডিত শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনই সকলের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। প্রদেশগুলিকে যত দূর সম্ভব ভাষার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিলে গোলযোগের সম্ভাবনা অনেক কম হইবে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে কংগ্রেস প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতেই ভাগ করা হইয়াছে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইবে কংগ্রেস এখনই তাহা জানাইয়া দিয়াছেন।

আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলালের মন্তব্য

আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে বোম্বাইয়ে পণ্ডিত জবাহরলাল যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে নির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব সুপরিস্ফুট হইয়াছে। বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,

শুধু নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলেই স্বাধীনতা লাভের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হইবে না। আমি কেবল ইহারই জন্য আপনাদের দ্বারে করাঘাত করিতে আসি নাই। নির্বাচন অপেক্ষা এক মহত্তর আদর্শলাভের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি। পরাধীন ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীর কর্তব্য বিদ্রোহ করা এবং স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত বিদ্রোহ চালাইয়া যাওয়া। যে সকল দেশ বিদেশী শাসকের দ্বারা শৃঙ্খলিত, সেগুলির প্রত্যেকেরই বিদ্রোহ করা অবশ্যকর্তব্য।

বহু চিন্তা করিয়া আমি 'বিদ্রোহ' শব্দটি ব্যবহার করিতেছি। বিদ্রোহ করিতে হইলে, কিভাবে এবং কোন্ শুভমুহূর্তে করিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যে জাতি বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না সে জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। যে বিদেশী কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

গত ২৫ বৎসর যাবৎ আমরা প্রকাশ্য ভাবে বিপ্লবের পন্থায় চলিয়া আসিতেছি। তাহার পূর্বে আমরা লুকাইয়া বিপ্লবের কথা আলোচনা করিতাম। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভ্যুত্থান হয় ১৮৫৭ সালে। তাহার পরে আরও ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটে।

গত ২৫ বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিয়াছে। সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফৎ আন্দোলন স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক একটি পর্যায়। আমাদের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মা[illegible] লইয়াছি বলিয়া যে আমরা শত্রুর নিকট মাথা নত করিব, একবার

কোনও যুক্তি নাই। স্বাধীনতার প্রশ্ন দিন দিন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

৪০ কোটি লোক বড় সামান্ত শক্তি নয়। এই ৪০ কোটিকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা সহজসাধ্য নয়। তাই সকলকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিচালিত করা অতি কঠিন ব্যাপার। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে কখনও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে নাই এমন নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে, আমাদের বিদ্রোহের পতাকাকে আমরা কখনও অসম্মানিত বা নত হইতে দিই নাই এবং ভবিষ্যতেও দিব না।

বিপ্লব ও নির্বাচন একসঙ্গে চলে না। নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়, এই কথাই আমরা বার বার বলিয়াছি। আমাদের আসল কাজ গ্রামে, ক্ষেত্রে, কারখানায়, এবং বস্তি অঞ্চলে। কিন্তু তথাপি এবার আমরা গবর্মেণ্টের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া নির্বাচন-দ্বন্দ্বে নামিয়াছি। তাই আমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখিতে চাই যে বিপ্লবের পতাকাধারী কংগ্রেস পদপ্রার্থীরা কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। আমাদের পতাকার মর্যাদাহানি ঘটিলে আমি আঘাত পাইব। ভোট দিবার অধিকার যদি আমার থাকে তাহা হইলে আমি কংগ্রেসী-প্রার্থী-কেই ভোট দিব। কেন আপনারা কংগ্রেসকে ভোট দিবেন সে কথা আপনারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া দেখুন। একথা আপনারা জানিয়া রাখুন যে. কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অর্থ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মেয়াদকে আরও দীর্ঘ করা।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন

জনৈক রুশ পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়া কংগ্রেস-প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইতে দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন তাঁহাদের দেশে নাকি এরূপ হয় না, সেখানে কোন কেন্দ্রে একজন মাত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করিলেও তাঁহার পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট লওয়া হয়। ইহাতে স্থানীয় জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দাঁড় করানো দলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কথাটা শুনিতে ভালই, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে উহা খাটে না, বিপ্লবের যুগে রাশিয়াতেও খাটে নাই। রুশ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠনের সময় কম্যুনিষ্ট দলের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা ছিল, নির্বাচন প্রভৃতি তো ছিলই না। ১৯৩৭ সালের পর হইতে রাশিয়ায় ব্যালট ভোটে প্রকাশ্য নির্বাচন সুরু হইয়াছে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ত কম্যুনিষ্ট দল বিরোধীদের দলে দলে গুলি করিয়া মারিতেও দ্বিধা করেন নাই। যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগকে সাময়িক কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, দেশের আপামর জনসাধারণ তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার পর আর এরূপ কঠোরতার প্রয়োজন হয় নাই। ধীরে ধীরে সাধারণ নির্বাচন প্রবর্তন করিয়া জন-সাধারণের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। বিপ্লবের যুগে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যাহা করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রনায়কেরা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

আমাদের দেশেও ইহাই ঘটিতেছে। আইন-পরিষদে প্রবেশ আজও আমাদের নিকট প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠে নাই এইজন্ত যে এখনও দেশের সংগ্রামের কাল উত্তীর্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্ত একমাত্র কংগ্রেসই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং ইহার জন্ত সর্বস্ব পণ করিয়া কংগ্রেসসেবীরা কার্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আইন-পরিষদ দখল করা এখনও এই ব্যাপক সংগ্রামেরই অঙ্গ মাত্র। কাজেই স্থানীয় নির্বাচক-মণ্ডলীর সেবা অপেক্ষা আইন-পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব এখনও অনেক বড় ও ব্যাপক। এখনও এমন সদস্যই নির্বাচন করা উচিত যিনি নতমস্তকে কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চলিবেন। প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব এখনও কংগ্রেসের প্রধান নায়কদের হাতেই থাকা দরকার, তবে উহার মধ্যে যত দূর সম্ভব যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের চেষ্টা হওয়া উচিত। প্রার্থী একজন মাত্র হইলে তাঁহাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইতে না দিয়া ভোট গ্রহণে বাধ্য করিবার সময় এখনও আসে নাই। কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপর কোন দল বা ব্যক্তি বহুক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতেই সাহসী হয় না, হইলে পরাজিত হয়—ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

মিঃ জিন্নার বক্তৃতা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ

মিঃ জিন্না সম্প্রতি কোয়েটায় এক বক্তৃতায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে বিষোদ্গার করিয়াছেন। এই বক্তৃতা-তেই তিনি বলিয়াছিলেন, ছাগলের স্থায় চুপ করিয়া পুলিসের লাঠি সহ্য করিতে, জেলে যাইতে এবং জেলে গিয়া অসুস্থতার দোহাই দিয়া কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। প্রয়োজন হইলেই তিনি বুক পাতিয়া বন্দুকের গুলি গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। ভারতবর্ষে এই বক্তৃতার যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। ব্রিটেন-প্রবাসী মুসলমানেরাও জিন্না সাহেবের এই সব উক্তিকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাডফোর্ড হিন্দুস্থানী মজদুর সভার সম্পাদক মিঃ ফজল হুসেন এ সম্বন্ধে সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"মিঃ জিন্নার বিবৃতি আত্মপ্রত্যয়হীনের অভিব্যক্তি মাত্র। ইহাতে তাঁহার মানসিক অস্থৈর্যের প্রকাশ অতি স্পষ্ট। মিঃ জিন্না জানেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁহার মুস্লিম স্বার্থ সংরক্ষণের ভাঁওতায় ভুলিবার পাত্র নহে ; তিনি ইহাও জানেন যে, ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শের প্রতি যাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আছে তিনিই মিঃ জিন্নার এই জাতীয় কাণ্ডজ্ঞানহীন সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্যে ভুলিবেন না। ভারতীয় মুসলমানগণ [illegible] নহে, মূর্খও নহে। তাহারা জানে, জাতীয় মুক্তির জন্ত [illegible] শত নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া আসি-তেছে সেই কংগ্রেস কখনো প্রকৃত ক্ষতির কারণ হইতে পারে না। তাহাদের প্রকৃত ক্ষতি করিবে সেই সব মুসলমান নেতারাই যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সংগ্রাম না করিয়া বার বার জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়া তাহার সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।"

মিঃ ফজল হুসেনের উক্তি সমর্থন করিয়া ভারতীয় লীগ-নেতৃ

ইউনিয়নের প্রতিনিধি মিঃ সুরত আলিও এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে ভারতীয় জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে না। আমাদের সংগ্রাম অন্যায় অত্যাচার ও অভাব হইতে মুক্তির সংগ্রাম। মিঃ জিন্না যদি ভাবিয়া থাকেন যে এই জাতীয় উক্তির দ্বারা তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ভুলাইতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি খুবই ভুল করিয়াছেন। কারণ ভারতীয় মুসলমানেরা এত নির্বোধ নহে। মিঃ সুরত আলি খুব জোর দিয়া বলেন, "মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি যে অদূর-ভবিষ্যতে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে সমাধি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।"

লণ্ডন স্বরাজ ভবনের সম্পাদক মিঃ মহীউদ্দীন বলেন, "জাতির মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু এবং মৌলানা আজাদ যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন মিঃ জিন্না তাহার শতাংশের একাংশও করেন নাই।" বস্তুতপক্ষে ভারতে ইংরেজ বনাম দেশী মুসলমানের স্বার্থে যখন সংঘর্ষের প্রশ্ন আসে সে সময় মিঃ জিন্না এবং তাঁহার দলের লোক মৌনব্রত অবলম্বন করেন। বিদেশী মুসলমানের পক্ষ লইয়া ইরাণ সম্পর্কে একবার মিঃ জিন্না কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন শুনা যায় কিন্তু ইংরেজের রোষদৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার মনের কথা মনেই রহিয়া যায় এইরূপ কাণাঘুষাও হইয়াছিল।

ব্রিটিশ স্বার্থবাহী লীগ ইসলামের মঙ্গলসাধনে অক্ষম—অহ্‌রর নেতার উক্তি

অহ্‌রর নেতা মৌলনা হবিবুর রহমান অমৃতসরে এক মুসলিম সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "যে ক্ষেত্রে কংগ্রেস 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখিতে চাহিতেছে।" সমবেত জনতাকে তিনি প্রগতি বিরোধীদের পরিবর্তে স্বদেশের স্বাধীনতাকামী পদপ্রার্থীদের ভোট দিতে অনুরোধ করেন, কারণ তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ কামনা করে। শেষে তিনি মুসলিম জনতাকে প্রশ্ন করেন, "আজ ইসলামের ঘোর দুর্দিনে নবাব এবং খাঁ বাহাদুর পুঙ্গবগণ আপনাদের ত্রাণ করিবেন, এই আশা আপনারা করেন কিরূপে? বাংলা ও সিন্ধুতে যে লীগ মন্ত্রিসভা মদ্য ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই সেই লীগের উপর কি ভাবে আপনারা আস্থা স্থাপন করিতেছেন?"

লীগের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অভ্যুদয়ে মিঃ জিন্না শঙ্কিত হইয়াছেন ইহার কিছু কিছু পরিচয় মিলিতেছে। সে দিন তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে লীগ সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবি করে একথা তিনি কখনও বলেন নাই। অথচ তাঁহার এই অসঙ্গত জিদের জন্যই সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছিল। [illegible] নির্বাচনে যে সব স্থানে যুক্তনির্বাচন আছে তাহার [illegible] মিঃ জিন্না লীগপ্রার্থী দাঁড় করাইতে ভরসা পান নাই। নিছক সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি তাঁহার একমাত্র মূলধন, যুক্তনির্বাচনের প্রতি ভীতি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মিঃ জিন্না কথায় কথায় কংগ্রেসকে এই বলিয়া দোষ দিয়াছেন যে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কংগ্রেসের চেয়ে মিঃ জিন্না বরং অনেক বেশী পরিমাণে করিয়া থাকেন তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আগামী নির্বাচন উপলক্ষে সিন্ধুতে পুনরায় এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সিন্ধু প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মিঃ সৈয়দ এবং বহু লীগ নেতা ও কর্মী একত্র হইয়া প্রাদেশিক নির্বাচনে মিঃ জিন্নার হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বহু মুসলমান নেতা লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতেছেন ইহা সুলক্ষণ।

মেদিনীপুর জেলা বিভাগ

তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস মেদিনীপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

"মেদিনীপুর জেলাবাসীদের সুশাসনের জন্য জেলাকে ভাগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সরকার আগামী বৎসরেই উহাকে হিজলী ও মেদিনীপুর এই দুইটি জেলায় ভাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, অথচ জেলাবাসীদের এ সম্পর্কে কিছু জানান হয় নাই, তাহাদের মতামত জানিবার কোন চেষ্টা সরকার করেন নাই।

"মেদিনীপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে, উহা কোন স্বাভাবিক সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত করা যায় না। এই জেলার মধ্যে একটি ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও সামাজিক ঐক্য আছে। বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তে থাকায় ইহাকে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া চলিতে হয়। একই জমিদারের জমিদারী জেলার নানাস্থানে ছড়ান আছে, দুই তিনটি মহকুমার মধ্যে একই মহল বিভক্ত আছে। জেলা বিভক্ত হইলে মহলগুলি পুনরায় ঢালাই করিতে হইবে, ফলে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থারও পরিবর্তন দরকার হইবে।"

দেশবাসী এবং মেদিনীপুর জেলাবাসী কাহাকেও কিছু না জানাইয়া শুধু সরকারী হুকুমনামার জোরে এই কার্য সাধিত হইলে তাহা ঘোর অসন্তোষের কারণ হইবে। নির্বাচন আসন্ন, নূতন ব্যবস্থা পরিষদ শীঘ্রই গঠিত হইবে। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কার্য নূতন পরিষদের অনুমোদনক্রমেই হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ সাংবাদিকের সতর্কবাণী

লণ্ডনের অবজার্ভার পত্রিকায় 'ভারতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অভ্যুদয়' শীর্ষক এক প্রবন্ধে উহার দিল্লীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,

"ভারত আজ এক বিরাট বারুদের গুদামে পরিণত হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইঙ্গ-ভারত ইতিহাসে এইরূপ বিদ্রোহের সম্ভাবনা আর দেখা যায় নাই। অতীতে বহু ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ তথাকার অর্দ্ধ প্রকাশিত বিরোধ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়া সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে অচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের সামান্য দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বোধ আছে তাঁহারা দিনের পর দিন কংগ্রেসী সংবাদপত্রে ও কংগ্রেস নেতাদের উক্তিতে তাঁহাদের প্রতি যে ক্রমবর্দ্ধমান ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইতেছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারেন না।"

"আরও দুই কারণে পরিস্থিতি তীব্রতর আকার ধারণ করিতেছে। একটি হইল, যবদ্বীপের জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ, অপরটি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিচার। শেষোক্ত বিষয় লইয়া কংগ্রেস

যেরূপ প্রচারকার্য্য করিতেছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই ভারতীয় ও ব্রিটিশের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়া গিয়াছে।"

অবস্থা পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে সংবাদদাতা ভুল করিয়াছেন মনে হয় না। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের মুখোস খুলিয়া প্রকাশ্যে ডাচ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত স্বাধীনতাকামী স্থানীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। এশিয়াবাসী মাত্রেই এই কার্যকে ঘোরতর অন্তায় বলিয়া মনে করে এবং এই কার্যে ভারতীয় সেনা নিয়োগে ভারতবর্ষে গভীর বিক্ষোভের সঞ্চার হইতে বাধ্য। ভারতবাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম দমনে ভারতীয় সৈন্ত নিয়োগ বন্ধ করেন নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারও ভারতবাসী নিজের সন্তানের বিচার বলিয়া মনে করে। সেইজন্তই বিচার আরম্ভের আগেই উহার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ প্রতিবাদ করিয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিচার স্থগিত করেন নাই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এই দুই মহাভ্রম ভারতবর্ষকে কোন্ পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে একমাত্র ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তাহা বলিতে পারিবে।

সিংহলে ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থা

সিংহলের রবার এবং চা-বাগানে বহু ভারতীয় শ্রমিক আছে। ইহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ সিংহল ও ভারতে মন-কষাকষি সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। যে-সব শ্রমিক সিংহলে গিয়াছে তাহারা সেখানে স্থায়ীভাবেই বসবাস করিতেছে। কিন্তু এখনও ইহারা সেখানে নাগরিক অধিকার পায় নাই। সিংহল-প্রবাসী ভারতীয়েরা দুঃখ কষ্ট ও অধিকার বিহীন অবস্থাতেই বাস করিতেছে। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সিংহলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অবস্থিতিই ইহার জন্ত দায়ী। ভারতীয় নেতারা সিংহলের রবার ও চা-বাগানের শ্রমিকদের সহিত কথা বলিতে গেলেও তাহাতে বাধা দেওয়া হয়। বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইবার পরেও এই ব্যাপার চলিতেছে।

পণ্ডিত জবাহরলাল সিংহল ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সিংহলবাসী এবং ভারতবাসী উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতানুসারে সিংহল নেতারা অগ্রসর হইলেই অতি সহজেই এই দুই দেশের মনোমালিন্ত দূর হইয়া যাইবে। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ভাষাগত, কৃষ্টিগত, আত্মিক ও বাণিজ্যিক বন্ধন রহিয়াছে তাহা রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দরুণ নষ্ট হইতে পারে না।

"ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে যে তফাৎ সিংহলের সহিত তফাৎ তাহার বেশী নয় এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া এই দুইটি দেশের দেশরক্ষা এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরে এক হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অবশ্য দুইটি দেশ নিজেদের স্বাধীন সত্তার উপর দাঁড়াইয়া এবং পরস্পরের স্বাধীন ইচ্ছায় [illegible] এই সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিবে।

"ভারতবর্ষের পক্ষে নিজ লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের জোরে শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া শক্ত নহে, কিন্তু সিংহলের পক্ষে সহযোগিতার অতীব প্রয়োজন রহিয়াছে। কিছুদিন যাবৎ ভারতবাসী এবং সিংহলীদের মধ্যে গোলমাল হইতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় এবং যাহারা গোলমাল বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে তাহারা নিজ নিজ মাতৃভূমি এবং অপরের প্রভূত ক্ষতি করিতেছে। তবে এই অবস্থা বেশী দিন থাকিবে না বলিয়া মনে হয় এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতা দৃঢ় করিবার জন্ত এই পথের সর্বপ্রকার বাধা আমাদের দূর করিতে হইবে। সিংহল প্রবাসী ভারতবাসীরা সিংহলকে তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিবে এবং সিংহলবাসীরাও তাহাদের নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিবে।

"সিংহলবাসীরাই তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবে এবং ভারতবাসী তাহা সমর্থন করিবে। তবে মত-বিরোধ ঘটিলে ভারতবাসীদের উচিত সিংহলবাসীদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাইয়া তাহার মীমাংসা করা। পৃথিবীর অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষ শীঘ্রই স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তৃতীয় কোন পক্ষের হস্তক্ষেপের অপেক্ষা না করিয়া এই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া সিংহল ও ভারতবর্ষ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে।"

দক্ষিণ-আফ্রিকার মনোভাব সিংহলের পক্ষে কোন ক্রমেই শোভা পায় না। উহা সিংহলেরই প্রভূত ক্ষতির কারণ হইবে।

বাংলা-সরকার কর্তৃক ইলেকট্রিক সাপ্লাই ক্রয়ের প্রস্তাব

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন সম্বন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা-সরকারের যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। আলোচনার ফলে সর্বজনীন প্রয়োজনে আবশ্যিক বিধায় বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করা সম্পর্কে বাংলা-সরকার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। সাময়িক এই চুক্তিতে এই শর্ত আছে যে, সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে ১৯৫০ সালের পয়লা জানুয়ারী অথবা অন্তথায় কুড়ি বৎসর পরে ক্রয়ের প্রথম অধিকার বাংলা-সরকারের থাকিবে।

২২শে অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলার গবর্ণর মিঃ আর জি কেসি ইহা ঘোষণা করেন। ১৯০৭ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ১৪টি পৃথক লাইসেন্স বলে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতেছে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলা-সরকার এইগুলির প্রত্যেকটিই কিনিতে পারিবেন। ক্রয়ের সময় উপযুক্ত [illegible]রের উপর শতকরা ২৫ টাকা বেশী দিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করা যাইবে বলিয়া লাইসেন্সগুলিতে উল্লেখ ছিল। লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী পাঁচটি এলাকায় বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে, ৭টি এলাকায় বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে, একটি এলাকায় বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং আর একটি এলাকার বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান

১৯৮০ সালের নবেম্বর মাসে ক্রয় করা যাইবে। এই সমস্ত লাইসেন্স বলে হুগলী নদীর উভয় তটবর্তী স্থানসমূহের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। এই সমস্ত অঞ্চলে তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে ভাগে ভাগে ক্রয় করিতে গেলে শাসনতান্ত্রিক ও কলকব্জা সম্পর্কিত নানা অসুবিধা দেখা দিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে যে পৃথক পৃথক চৌদ্দটি লাইসেন্স বাতিল করিয়া সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি একটি লাইসেন্স বলে পরিচালনা করিতে দেওয়া হইবে এবং ইহার ফলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকেই একসঙ্গে চুক্তির বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী সময়মত একই সময়ে ক্রয় করা যাইবে।

পাঁচ বৎসর পরে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি বাংলা-সরকারের হইবে কিনা অথবা ক্রয়ের জন্য টাকা ধার করা হইবে কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করা হইলে গবর্ণর মিঃ কেসি বলেন যে, প্রাদেশিক রাজস্বের টাকা দিয়া ক্রয় করা সম্ভব হইবে না, উহার জন্য টাকা ধার করিতে হইবে।

গবর্মেণ্ট যদি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করেন তবে উহা গবর্মেণ্টের কোন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইবে, না, কোন আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর উহার পরিচালনার ভার দেওয়া হইবে জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণর বলেন যে, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ইলেকট্রিসিটি বোর্ড নামে প্রায় বেসরকারী অরাজনৈতিক কোন বোর্ডের উপর পরিচালনার ভার দেওয়া যায় কিনা ক্রয়ের পূর্বে গবর্মেণ্ট তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এই রকম বোর্ডে কলিকাতা শহরের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কোন শেয়ার থাকিবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণর বলেন যে গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য ইলেকট্রিক কর্পোরেশনকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, মিউনিসিপালিটি বা কর্পোরেশনের কর্তৃত্বাধীন করা নহে, সুতরাং কর্পোরেশনের কোন শেয়ার উহাতে থাকিবে না।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা ট্রাম বাস প্রভৃতি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান বিদেশী গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে যাওয়া কোম্পানী পরিচালনার চেয়ে অনেক খারাপ হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। টেলিফোনের ব্যাপারে ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। ইলেকট্রিক ও ট্রাম গণ-কর্তৃত্বাধীন যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল কিন্তু বর্তমান গবর্মেণ্টের হাতে উহা আসা আমরা গণ-কর্তৃত্ব বলিয়া মনে করিতে অক্ষম। বর্তমান গবর্মেণ্ট খুব ভাল করিয়াই প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহাদের হাতে জনসাধারণের স্বার্থ নিরাপদ নহে। জনকল্যাণকর কোন একটি কাজের ভার লইয়া [illegible] উহা ভালভাবে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। [illegible]র গৃহহারা লোকদের স্বগৃহে ও স্বগ্রামে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বড় বড় প্ল্যান দেশবাসীকে শোনান হইয়াছে কিন্তু কার্যত কিছুই করা হয় নাই। সেদিন মিঃ টাকনেল ব্যারেট বলিয়াছেন তাঁহারা এবার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। যুদ্ধের নামে কৃষককে পৈত্রিক ভিটামাটি হইতে বিতাড়িত করিতে যাহারা এক দিন বা দুই দিনের বেশী সময় দেয় নাই, মানুষকে বাস্তভিটা হইতে উচ্ছেদ করিবার সময় যাহাদের তৎপরতার অন্ত ছিল না, তাহারা গত দুই বৎসরেও এই হতভাগ্যদের স্বগ্রামে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিবার সময় পাইল না। ইহাদের হাতে জনসাধারণের কোন স্বার্থই নিরাপদ নহে।

বাংলা-সরকারের জীপগাড়ী ক্রয়ের উদ্দেশ্য

এদেশের গবর্মেণ্টের উপর দেশবাসীর অবিশ্বাস ও অনাস্থা এত বেশী বাড়িয়াছে যে, ইহাদের প্রত্যেক কাজই লোকে আজকাল সন্দেহের চোখে দেখে। এক সংবাদে প্রকাশ, বাংলা-সরকার ১৬০খানি জীপগাড়ী ক্রয় করিয়াছেন, বাংলার যেসব দুর্গম গ্রামে গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যান যাইতে পারে না, সরকারী কর্মচারিগণ অতঃপর জীপে চড়িয়া সে-সব স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন। "সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের মূষিকের মতই চঞ্চল এবং কৌশলী, সতর্ক এবং আক্রমণপরায়ণ" এই ক্ষুদে ধূসর গাড়ীগুলির সাহায্যে সরকারী কর্মচারীরা গ্রামে প্রবেশ করিলে কি ব্যাপার ঘটিবে আনন্দবাজার পত্রিকা সে সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেশের মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়াছে। উহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন (২৮শে কার্তিক) :

"জিজ্ঞাস্য এই—জীপারোহী কর্মচারিগণ দেশের অগম্য স্থানে প্রবেশ করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিবেন? আবার সেই গণেশের মূষিকের কথা না তুলিয়া উপায় নাই। ইঁদুর যেমন ধানের গোলায়, তক্তপোষের তলে, ভাঁড়ারের অলক্ষ্য কোণে ঢুকিয়া পড়িয়া চাল-ডালের কণা টানিয়া বাহির করে, বাহির করিয়া উদর পূরণ করে, এই জীপারোহীরাও ঠিক সেই কাজটি করিবেন। যুদ্ধের ফলে সার্বভৌম কণ্ট্রোল স্থাপন করিতে গিয়া সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এদেশ ঐশ্বর্যের খনিবিশেষ, কিন্তু দুর্গম খনি। পথঘাট এদেশে এত বিরল, আর যেগুলি আছে তাহাদেরও এমন আদিম অবস্থা যে দেশের শেষ তণ্ডুল কণাটি টানিয়া স্বায়ত্তে আনা এক কঠিন ব্যাপার। গরুর গাড়ীর উপরে নির্ভর করিলে কোনকালে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। এই কারণেই সরকারকে মাঝে মাঝে পথঘাট তৈয়ারীর কথা বলিতে শোনা যাইত। কিন্তু এমন সময়ে দুর্গমের ব্যূহ-ভেদকারী 'জীপে'র অভ্যুদয়। পথ তৈয়ারীর অপেক্ষা 'জীপ' রাখে না। তাই যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র সরকার এই বস্তুটিকে লুফিয়া লইয়াছেন। এবারে এই ক্ষুদে ইঁদুরগুলি বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে ঢুকিয়া চাল-ডাল,শস্য-বস্ত্র টানিয়া বাহির করিবে—কলিকাতায় বসিয়া দূরতম পল্লীবাসীর হাঁড়ির খবর রাখিতে সরকারের আর কোন অসুবিধা হইবে না। সিদ্ধিদাতা বাহনই বটে। তবে সে সিদ্ধি সরকারের পক্ষে, গৃহস্থের পক্ষে তণ্ডুল-কণা নাশ ছাড়া আর কিছু নয়। জীপের নূতন ব্যবহার আবিষ্কারের জন্য গবর্মেণ্টকে বুদ্ধিমান বলিতেই হইবে।"

সত্তর বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে বাংলার কবি মনোমোহন বসু লিখিয়াছিলেন :

> তুরুদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
> সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
> দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভুষী শেষে,
> হায় গো রাজা কি কঠিন।

কবির এ আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই বাঙালী তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছে। জীপ সম্বন্ধেও অনুরূপ আশঙ্কার কারণ সেইজন্যই বাঙালীর মনে উদ্ভূত হইতেছে।

বাংলায় কৃষির উন্নতি

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খাঁর উপর বাংলার কৃষির উন্নতির ভার প্রদত্ত হইয়াছে। আপাততঃ তিনি বাংলাদেশের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং কৃষি সম্বন্ধে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় তিনি বাংলার চাষীদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে দরদ দেখাইয়াছেন এবং তাহাদের অবস্থা ফিরাইয়া দিবার জন্ত তিনি কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তাহার কতক পরিচয় দিয়াছেন। চাষীকে লোকে 'চাষা' বলে, লাঙ্গল না ছাড়িলে সে ভদ্রলোক হয় না—এই ব্যবস্থাটি নাকি তাঁহার বড় প্রাণে লাগিয়াছে। খাঁ সাহেব বাঙালী নহেন, সীমান্ত প্রদেশীয়। বাংলার গ্রামের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকিলে একথা বলিতেন না। বামুনের ছেলেও এদেশে বয়োবৃদ্ধ মুসলমানকে চাচা, জ্যাঠা, দাদা প্রভৃতি না বলিয়া শুধু নাম ধরিয়া ডাকিতে পায় নাই। শুধু মুসলমান কেন, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি প্রবীণদেরও তাহারা অনুরূপ ভাবে আত্মীয়তাপূর্ণ সম্বোধন করিয়াছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ভিন্ন একটা পবিত্র হৃদ্যতাপূর্ণ গ্রাম-সম্পর্ক বাংলার প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যমান ছিল। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের বিপদে আপদে প্রত্যেকে পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছে, সম্পদের দিনে একত্র আনন্দ করিয়াছে, পরস্পরের পূজা-পার্বণে পরস্পর যোগ দিয়াছে। চাষীকে চাষা বলিয়া অবজ্ঞা খাঁটি বাঙালী কস্মিন কালেও করে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মেকী বিলাতী সভ্যতা ইহার জন্ত দায়ী এবং খাঁ সাহেবের ন্তায় যাহারা দেহে ভারতীয় এবং অন্তরে ফিরিঙ্গি এই পাপ বিস্তার তাহাদের দ্বারাই ঘটিয়াছে। চাষীর জন্ত দরদে আজ খাঁ সাহেবের চোখে সাঁতার পানি খেলিতেছে, কিন্তু মেদিনীপুরের কৃষককুল যেদিন প্রকৃতির তাণ্ডবে হাজারে-হাজারে মরিতেছিল সেদিন এই ব্যক্তিই উহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য না দিয়া শিক্ষা দিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

খাঁ সাহেব বলিয়াছেন, বাংলার কৃষি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত হইবার কোন উপায় নাকি নাই, কাজেই আমাদের কৃষির অনেক সমস্যাই আমাদের অজানা রহিয়া গিয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজ আগমনের পরে এদেশে এগ্রিকালচারাল কমিশন, ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিশন প্রভৃতি যে-সব কমিটি বসিয়াছে তাহাদের রিপোর্টে বিশেষভাবে কমিশনগুলির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণগুলির অনেকটিতে প্রচুর তথ্য নিহিত আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে লিখিত কোলব্রুকের "বাংলার কৃষি" (*Husbandry of Bengal*) নামক ছোট বইখানিতেও এদেশের কৃষি সম্বন্ধে অমূল্য তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জমি জরীপ সম্বন্ধে যে সব পাকা রিপোর্ট (Final Report of settlement operations in Bengal Districts) আছে সেগুলিতেও বাংলার কৃষি ও গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এই সব রিপোর্টের উপর কাজ হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে তথ্যের অভাব আছে একথা কিছুতেই বলা যায় না। ভারত-সরকারের নিকট প্রদত্ত ডাঃ ভোয়েলকারের রিপোর্ট ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।

ভারতীয় কৃষি শিখাইবার জন্ত ভারতীয় ছাত্রকে বিলাতে ও আমেরিকায় পাঠাইতে হয় ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে গভীর লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। আমাদের দেশে একটিও ভাল কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র নাই। ভারতীয় কৃষি প্রাচীন পদ্ধতিতেই চলিতে থাকুক ইহা আমরা চাই না; বর্তমান জগতে কৃষি-কার্যে যে সব উন্নতি হইয়াছে তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের দেশেও কাজে লাগান নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু এজন্ত নিজেদের দেশেই কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্ত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আনা যাইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হউক নিজের দেশ। ব্রিটেন বা আমেরিকা নিজের দেশেই কৃষিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার উপযুক্ত কেন্দ্র গড়িয়া লইয়াছে, অপর দেশের উপর এজন্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে নাই। বাংলায় একটি বড় কৃষি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব অনেকবার হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে একটা কমিটিও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত উহার কাজ অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। বরং কমিটির কোন কোন সদস্যের আগ্রহ সত্ত্বেও ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়িয়াছে বলিয়াই আমাদের সন্দেহ হইতেছে। খাঁ সাহেবের প্ল্যানিঙেই এই অত্যাবশ্যক বিষয়টিকে সামান্ত স্থান দেওয়া হইয়াছে। ঢাকার কৃষিশিক্ষা কেন্দ্রটিকে একটু বাড়াইবার প্রস্তাবমাত্র তিনি করিয়াছেন। এই বিষয়টির প্রতি আরও অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়া দরকার।

কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা

ডিরেক্টর খাঁ সাহেব বলিয়াছেন বাংলার কৃষির উন্নতির জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন গবেষণার ব্যবস্থা, ভারতের বাহিরে বিলাতে ও আমেরিকায় ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞ বানাইয়া আনা, ট্র্যাক্টর প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিতে কৃষককে শিক্ষা দেওয়া, কৃষি বিভাগে আরও কতকগুলি কীটপতঙ্গবিশারদ লোক নিযুক্ত করা, বীজ ও গবাদি পশুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সরকারী কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি। অত্যন্ত আনন্দের সহিত খাঁ সাহেব সভায় ঘোষণা করেন যে ৭০ জন ছাত্রকে বিদেশে প্রেরণের বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই তাঁহারা করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ইহারা সকলেই ন্যূনপক্ষে বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট। অন্তান্ত ব্যবস্থাগুলিও নাকি অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। এই সংবাদে চাষীরা উৎফুল্ল হইতে পারিবে বলিয়া আমরা কিন্তু মনে করিতে পারিতেছি না। সরকারী 'প্ল্যানিং'-এর [illegible] এখানে দেওয়া গেল।

কাঁচড়াপাড়ার নিকট হরিণঘাটায় একটি গবাদি পশু সম্বন্ধে গবেষণা ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং তাহার জন্ত ব্যয় হইবে পাঁচ বৎসরে ৯১ লক্ষ টাকা—৫৫ লক্ষ টাকা ঘরবাড়ী তৈরির জন্ত এবং অবশিষ্ট ৪৫ লক্ষ কর্মচারী প্রভৃতির বেতন বাবদ। কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে নিম্নোক্তরূপ—

উচ্চপদ		বেতন মাসিক টাকা
(১) একজন কর্মচারী		৩০০—১০০০
(২) দশজন	প্রত্যেকে	১৫০— ৬৫০
(৩) সাতজন সুপারভাইজার	"	১১০— ২০০
(৪) নয়জন গবেষণার সহকারী	"	১৪০— ২৫০
(৫) পনের জন সহকারী সুপারভাইজার	"	৫০— ১১৫
(৬) চারজন স্টোরের হিসাব রক্ষক	"	৩৪— ৮০
(৭) ষোলজন ক্ষেত্র ও গরু পরিদর্শক	"	২৫— ৫০
(৮) একজন মেকানিক	"	৭৫— ১২৫
(৯) দুইজন মিস্ত্রী	"	৫০— ৭৫
(১০) কুড়িজন ট্র্যাক্টর ও মোটর ড্রাইভার	"	৫০— ৭৫
(১১) কুড়িজন ড্রাইভারের সহকারী	"	৪০— ৬০
(১২) একজন হেডক্লার্ক	"	১১০— ২০০
(১৩) ছয়জন কেরানী	"	৪০— ৯০
নিম্নপদ		
(১) বারজন পিয়ন এবং চৌকিদার	"	১৩— ১৭
(২) দুইশত নব্বইজন ভৃত্য	দৈনিক	১০ হইতে ১॥০

প্ল্যান রচনার জন্য খাঁ সাহেব অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু চাষী শুধু তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিবে —যে দেশের গরু আহার পায় না, এমন কি লবণটাও পর্যন্ত যাহার জোটে না সে দেশের গরুর অবস্থার উন্নতির জন্য এই দরাজ বন্দোবস্ত কোন কাজে লাগিবে? পাঁচ বৎসরে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই যে বিপুল কর্মচারীর দল পোষণ করা হইবে রিপোর্ট লেখা ছাড়া তাহাদের আর কি কাজ হইবে? সরকারী দপ্তর-খানায় আর যাহারই অভাব থাকুক রিপোর্টের অভাব কখনও হয় নাই, কাজে লাগাইলে উপকার হয় এমন রিপোর্ট যথেষ্ট আছে। সরকারী দপ্তরখানায় রিপোর্টের যে সমাধি ক্ষেত্র আছে সেখানে আরও রিপোর্ট পাঠাইয়া লাভ কি এবং ইহার জন্য কর ও ঋণভারপ্রপীড়িত দরিদ্র কৃষককুল কেনই বা আরও টাকা দিবে? কৃষিকার্য বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যে গবর্মেণ্ট গবাদি পশুর খাদ্য তো দূরের কথা, সামান্য লবণের ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত করিতে অক্ষম তাহার উপর কৃষক নির্ভর করিতে পারে না। বাংলার গবাদি পশুর বর্তমান দুর্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী খাদ্য ও লবণের অভাব—শুধু গবেষণার অভাব নয়।

বাংলার কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্র আমদানী

খাঁ সাহেব কৃষি মেকানাইজেশনের কথা বলিয়াছেন। আমেরিকা কৃষি মেকানাইজ করিয়াছিল কিন্তু তাহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই। যন্ত্রের সাহায্যে রাতারাতি চাষ বাড়াই-বার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের চোটে বহু জমি বেশ কিছু চিরতরে অনুর্বর হইয়া গিয়াছে। শুধু এমোনিয়াম সালফেট ভাল ফল দিলেও পরিণামে উহা জমির সর্বনাশই সাধন করে। আমাদের দেশের জমিতে চিরকাল সার দেওয়া হইত, কোলব্রুক হইতে ভোয়েলকার পর্যন্ত সকলেই তাহা মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। যে পদ্ধতিতে আমাদের কৃষক সার দিত তাহাকেই ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা 'কম্পোষ্ট' নাম দিয়াছেন এবং ইংরেজী কাগজে উপদেশ ছাপাইয়া কৃষককে উহাই নূতন করিয়া শিখাইতে চাহিতেছেন। আমাদের দেশে কোন্ স্তরের জমি কিরূপ সে সব তথ্য সংগ্রহ না করিয়াই গভীর ভাবে লাঙ্গল চালাইবার জন্য ট্রাক্টর আমদানীর কথা হইতেছে। ১৮৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারের মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিলাতের হাউস অফ কমন্সে যে তদন্ত কমিটি বসে তাহার সম্মুখে সাক্ষ্য দান কালে কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ ওয়ালিক বলিয়াছিলেন, "ইউরোপীয়েরা বাংলার কৃষির অনেক জিনিষই বুঝে নাই। কৃষির উপায়গুলি অত্যন্ত সরল ও প্রাচীন বলিয়া লোকের ধারণা বাংলার কৃষি বুঝি খুব নিম্নস্তরের কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি হঠাৎ কোন নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে গেলে তাহাতে কখনো ভাল ফল হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারি, বাংলার প্রাচীন লাঙ্গলের পরিবর্তে ইউ-রোপীয় লোহার লাঙ্গল ব্যবহার শিখানো হইয়াছে। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? ভূমির উপরের স্তরের যে মাটিটুকু ফসল বুনিবার জন্য দরকার, দেশী লাঙ্গলে শুধু সেইটুকুই খুড়িয়া লওয়া হইত। বিলাতী লাঙ্গলে নীচের জমি খুড়িয়া উপরের মাটির সহিত মিশিয়া যাওয়ায় সমস্ত জমিটাই নষ্ট হইয়াছে।" কৃষি মেকানাইজেশনের ফল অন্যান্য দেশে কি হইয়াছে এবং এদেশের জমিতে তাহা কি প্রকারে কতটা চলিতে পারে এ সব তথ্য ভাল করিয়া না জানিয়া ভারতবর্ষে কলের লাঙ্গল আমদানী ক্ষতিকর হইবারই সম্ভাবনা। সব দিক দেখিয়া এবং সকল অবস্থার ব্যবস্থা রাখিয়া যন্ত্রকৃষিতে অগ্রসর হইলে তবে সুফল পাওয়া যাইতে পারে এবং সেরূপ ব্যবস্থার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন এক জন প্রকৃত বুদ্ধিমান ও আগ্রহশীল কর্মঠ লোককে কৃষি বিভাগের ভার দেওয়া।

কর্মচ্যুত সৈন্যদের জন্য কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা

বাংলা-সরকারের কৃষি সম্পর্কিত প্ল্যানগুলির মধ্যে সর্বা-পেক্ষা ব্যয়বহুল ৬নং প্ল্যানটি। ইহাতে কর্মচ্যুত সৈন্যদের জন্য কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার জন্য খরচ ধরা হইয়াছে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। এই টাকায় দশ হাজার সৈন্য ও লস্করকে চাষ-আবাদে মন দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে। ইংরেজের যুদ্ধে এবং সম্ভবতঃ ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ব্রিটিশ ও ডাচ সাম্রাজ্যের স্বার্থে যে সৈন্যদল লড়িয়া আসিতেছে তাহাদের দশ হাজার জনের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে প্রায় ৫ কোটি টাকা অর্থাৎ জন প্রতি পাঁচ হাজার টাকা; আর বাংলার ইংরেজ শাসকদের অযোগ্যতার ফলে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে তাহাতে ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দুর্ভিক্ষের বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৩,২৯,৫৬,২২৮ টাকা। অর্থাৎ জনপ্রতি দশ টাকা। ইংরেজের প্রয়োজনে ও দেশের প্রয়োজনে তফাৎ কতখানি ইহা হইতে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যাহাই হউক, এই দশ হাজার দেশের লোকে যদি ঐ সমস্ত টাকার উপকার পায় তবে আমাদের ততটা আপত্তি নাই। কিন্তু যদি বাংলা-সরকারের পুরানো গোয়াল পরিষ্কার করার জন্য নূতন ঝাঁটার ব্যবস্থা না করা হয় তবে ঐ টাকারও অধিকাংশ অকর্মণ্য অত্যাচারী বা ঘুষখোর সরকারী চাকুরের পোষণে ও শোষণে নষ্ট হইবে।

বাংলার কৃষির আসল সমস্যা

ডিরেক্টর খাঁ সাহেব বাংলার কৃষির সব সমস্তাই আলোচনা করিয়াছেন, বাদ দিয়াছেন তার আসলগুলি। ভাল সার ভাল বীজ দেওয়ার একটা পরিকল্পনা কাগজে কলমে হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকে জানে সরকারী সার কিনিবার সামর্থ্য সাধারণ কৃষকের নাই আর সরকারের দেওয়া বীজে ঋণ যত বাড়ে ফসল তত গজায় না। কৃষকের আসল সমস্যা তাহাকে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ দান ও ফসল বিক্রয়ের সময় যাহাতে সে অর্থগৃধ্নু দালালদের হাতে পড়িয়া সর্বস্বান্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা; এই দুইটি সম্বন্ধেই বাংলার কৃষি বিভাগ কোন কাজ করেন নাই। ঋণ সালিশী আইন, মহাজনী আইন প্রভৃতি জারী করিয়া পুরানো মহাজনকে ফাঁকি দেওয়ার পথ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; হয়ত হিন্দুর কিছু সাময়িক ক্ষতি ইহাতে হইবে। কিন্তু কৃষককে ঋণ দানের সুবন্দোবস্ত না করিয়াই এই সব আইনজারি করিবার ফলে তাহার ঋণপ্রাপ্তির সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়াছে। জলের অভাবে সাত শত বর্গমাইল জমি পতিত রহিয়াছে এগুলি উদ্ধারেরও কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই।

প্রাদেশিক পরিকল্পনা

ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশই এক একটি বিরাট্ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিকল্পনায় জন্ত বহু কোটি টাকার হিসাব ধরা হইয়াছে। টাকা কোথা হইতে আসিবে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। পরিকল্পনাগুলি প্রকাশ করিবার সময় কোন কোন প্রদেশে একটি করিয়া পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। উড়িষ্যায় কংগ্রেসসেবী এবং প্রাক্তন অর্থসচিব পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র গবর্ণরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে কংগ্রেস তো ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার নোটিশ দিয়াছে; কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিলে এই পরিকল্পনার কি অবস্থা দাঁড়াইবে?

বর্তমানে ব্রিটিশ ভেদনীতির দ্বিতীয় প্রয়োগক্ষেত্র হইয়াছে প্রাদেশিক দলাদলি। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ধার ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। মুসলমান তপশীলী হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বহু জনে ভেদনীতির কুফল বুঝিয়া জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আপাততঃ প্রদেশে প্রদেশে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। ভারতশাসন আইনে নিয়ম আছে কোন প্রদেশ অপর প্রদেশ হইতে মাল আনিতে বা নিজ প্রদেশের মাল অপর প্রদেশে প্রেরণে বাধা দিতে পারে না। আইনের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও গত দুই তিন বৎসর যাবৎ প্রত্যেক প্রদেশকে আন্তঃপ্রাদেশিক আমদানী-রপ্তানীতে বাধা-নিষেধ আরোপে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। যে বিহার বাংলাকে বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না, বাংলার কারখানায় কাজ করিয়া দেশে টাকা মণি অর্ডার করিলে যাহাদের পরিবার-পরিজনের অন্ন জোটে, বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পৎশালী জেলাগুলি পাইয়া যাহার ক্ষমতাবৃদ্ধি সেই বিহারও বাংলার দুর্ভিক্ষে চাউল রপ্তানীতে এবং বর্তমানে সব্জিরপ্তানীতে বাধা দিয়াছে, এখনও দিতেছে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিজের আইন চোখের সামনে থাকিতেও এই গুরুতর অত্যাচারের প্রতিকারে অনিচ্ছুক। প্রদেশে প্রদেশে এইভাবে সুকৌশলে বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা হইতেছে। ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও আন্তরিকতা বিহীন প্রাদেশিক পরিকল্পনাগুলিও প্রত্যেক প্রদেশকে আলাদা ভাবে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিতেই উৎসাহ দিবে, অপর প্রদেশকে দোহন করিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিলেই গবর্মেণ্টের সহায়তা লাভ করিবে।

সংক্রামক রোগ নিবারণ

অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথের অধ্যাপক ডাঃ আর, বি, লাল সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় ব্রিটেন আমেরিকা ও রাশিয়ায় রোগ নিবারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রিটেন হইতে কলেরা, প্লেগ ও টাইফয়েড জ্বর একেবারে দূর হইয়াছে, একটি লোকও সেখানে আর এই তিন রোগে আক্রান্ত হয় না। জনস্বাস্থ্যের জন্ত ব্রিটেন বৎসরে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা ব্যয় করে। আমেরিকা হইতেও পীত জ্বর ও কলেরা একেবারে বিতাড়িত হইয়াছে, রাশিয়া শুধু কলেরা দূর করিতে পারিয়াছে। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় যত লোক বসন্তে ও টাইফয়েড রোগে মারা যাইত, বর্তমানে তাহার তুলনায় বসন্তে শতকরা মাত্র একজন ও টাইফয়েডে ২৫ জন মরে। আমেরিকায় প্রধানতঃ বেসরকারী চেষ্টায় এই কার্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রিটেনে ও রাশিয়ায় গবর্মেণ্টের চেষ্টাতেই উহা ঘটিয়াছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহায্য করিয়াছে এই মাত্র।

আর আমাদের দেশ? ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য রোগে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে, গবর্মেণ্ট এখানে নির্বিকার দর্শক মাত্র। বড় জোর দুই দশ লাখ টাকা খরচ করিয়া কিছু কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া ও প্রচারকার্য চালাইয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হয়। বাংলা-সরকার তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় স্বীকার করিয়াছেন যে ছয় কোটি লোকের জন্ত হাসপাতালে মোট ৬৪০০ শয্যার ব্যবস্থা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহা বাড়াইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াও তাঁহারা মোট আর ২৫০০ শয্যায় বেশী বাড়াইবার কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ইহার জন্ত তাঁহারা দেখাইয়াছেন ব্যয় হইবে নিম্নোক্তরূপ:

ঘর বাড়ী তৈরির ব্যয়	—৫০ লক্ষ টাকা।
বাৎসরিক ব্যয়	—৭৫ লক্ষ টাকা।
মোট	১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

শাসনযন্ত্রের বজ্রমুষ্টি দৃঢ় রাখিবার জন্ত কিন্তু টাকার অভাবের কথা শোনা যায় না। এই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাতেই শুধু পুলিসের জন্ত ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে নিম্নোক্ত[illegible]

পুলিসের বাড়ী তৈরির ব্যয়—	৬৪ লক্ষ টা[illegible]
কলিকাতা পুলিসের জন্ত বাড়ী—	৫২॥ লক্ষ টাকা
কলিকাতা পুলিসের সংখ্যাবৃদ্ধি—	৮৫ লক্ষ টাকা
মোট	২ কোটি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

পরাধীন দেশে মানুষের প্রাণের চেয়ে পুলিসের স্বাচ্ছন্দ্য গবর্মেণ্টের নিকট অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

নৌকা নিলাম

বাংলা-সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন পাকা শাল ও অপর শক্ত কাঠ দিয়া তৈরি নূতন দেশী নৌকা সাজসরঞ্জাম সমেত নিলাম হইবে। ঐ সঙ্গে জানান হইয়াছে নিলামের নৌকাগুলি কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের বোট সার্ভেয়ার পরীক্ষা করিয়া লাইসেন্স দিয়াছেন।

১৯৪২-এ সিঙ্গাপুর জাপ কবলিত হওয়ার পর এদেশের সিভিলিয়ানতন্ত্র ধরিয়া লইয়াছিলেন জাপান আসাম ও বাংলা আক্রমণ করিবে। ফলে তৎকালীন মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই গবর্ণর সর জন হার্বার্ট সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাসমূহ হইতে সমস্ত নৌকা, সাইকেল, হাতী প্রভৃতি যান-বাহন এবং চাউল সরাইবার হুকুম দেন। হুকুমজারির পর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই উহা কার্যে পরিণত করা হয়। সরকারী হিসাবে প্রায় ২৬ হাজার নৌকা মাঝিদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। এই কার্যে সরকারী তৎপরতা এত বেশী হইয়াছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নদীর অপর তীর হইতে কৃষকের মজুত ধান নৌকা করিয়া সরাইয়া আনিবার সময়টুকুও দেওয়া হয় নাই। নৌকা কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার পর সেই ধান তাহার চক্ষের উপর পচিয়াছে। এই সব নৌকার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে সত্য কিন্তু উহার কতটা নৌকার মালিক পাইয়াছে আর কতটা গিয়াছে পুলিসের দারোগা প্রভৃতি ক্ষতিপূরণ-বিতরণকারীদের পকেটে তাহার সন্ধান কেহ করে নাই।

যে সব নৌকা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্যে সরকারী হিসাবে ৯৪৩৫টি নৌকা জ্বালানী কাঠ হিসাবে বিক্রয় করা হইয়াছে। সামান্য কিছু ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ২৬ হাজার নৌকার অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। নৌকাগুলি "নিরাপদ" এলাকায় যে ভাবে রাখা হইয়াছিল তাহাতে সেগুলি যে কোন দিন আর কাজে লাগিবে না তাহা সহজেই বুঝা গিয়াছে। তারপর নূতন নৌকা তৈরির পালা। ১৯৪৪-এ প্রায় আড়াই কোটি এবং ১৯৪৫-এ প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইল। ১৯৪৫-৪৬ এর বাজেটে দেখা গেল জঙ্গলে কাঠ কিনিবার জন্য এক কোটি টাকা আগাম দেওয়ার বরাদ্দ হইয়াছে। দৈনিক বসুমতী লিখিলেন—মন্ত্রী সাহাবুদ্দীনের জঙ্গল হইতে কাঠ আসিতেছে, সরকার তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। বাংলাদেশের যে শিল্প বিভাগের কার্যকলাপ লোকে সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে, যাহার ডিরেক্টরের ধাপ্পাবাজীর বিশদ বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বিভাগ ও সেই ব্যক্তির উপর নৌকা তৈরির ভার অর্পিত হইল। দুইজন ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়, একজন চেক ও একজন হাঙ্গেরীয়—নৌকা তৈরির সহিত পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল না—তাহাদের উপর এই কার্যের ভার দেওয়া হইল। মাড়োয়াড়ী কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত হইল। ইহাদের বিরুদ্ধে দৈনিক বসুমতীতে অনেক অভিযোগ প্রকাশিত হইল, গবর্মেণ্ট তাহারও কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

গত ২১শে কার্তিকের যুগান্তর পত্রিকায় নৌকা তৈরি সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আরও গুরুতর। ইহারও কোন প্রতিবাদ এখনও পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। কয়েক দিন পূর্বে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল যে কলিকাতার অনেকগুলি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর গৃহে খানাতল্লাসী হইয়াছে, ইহার সহিত নৌকার ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা জানা যায় নাই। যুগান্তর লিখিতেছেন :

> যুদ্ধের দৌলতে রেল-ষ্টীমারে জায়গা নাই, নৌকাগুলিরও সদ্‌গতি করা হইয়াছে। কর্তারা বলিলেন, ভাবনা কি? বড় বড় কিস্তী নৌকা তৈয়ারী করিতেছি। "বোট-বিল্ডিং কনট্রাক্ট" ঘোষণা করা হইল। চার কোটি টাকার নৌকা তৈয়ারী হইবে। সরকারী ঠিকাদারেরা সকলেই সকল বিষয়ে পারদর্শী; নৌকা তৈয়ারী আর এমন কি কঠিন ব্যাপার! তাহা ছাড়া সরকার কাঠ দিবেন, পেরেক কব্জা সমস্তই দিবেন—কেবল জোড়াতালি দিয়া নৌকা দাঁড়করানো—মোটা লাভ। নৌকা তৈয়ারী আরম্ভ হইল—সরকারী ঘোষণায় বলা হইল—১২ হাজার নৌকা তৈয়ারী হইতেছে। নৌকা তৈয়ারী হইতে বিলম্ব হইল না, করিৎকর্মা ঠিকাদারেরা বিদ্যুৎ-গতিতে নৌকা তৈয়ার করিয়া তাক লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু তৈয়ারী নৌকাগুলিকে জলে নামাইলে দেখা গেল, সেগুলি কলঙ্কিত দেহ লইয়া জলে ভাসিতে রাজী নহে—সেগুলি ডুবিতে আরম্ভ করিল। বাধ্য হইয়া তখন কর্তারা সেগুলিকে ডাঙ্গায় তুলিয়া আনিলেন। তাঁহারা অনেক গবেষণা করিয়া নৌকাগুলিকে জলে ভাসাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। ছোট কর্তাদের কীর্তি এবং ঠিকাদারদের এই ভোজবাজির কাহিনী রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না, অবশেষে বড়কর্তার কানেও কথাটা পৌঁছিল। একদিন যিনি সরল বুদ্ধিতে (?) নৌকা নির্মাণ পরিকল্পনাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি স্তম্ভিত হইলেন। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তদন্ত আরম্ভ হইল, কিন্তু লালফিতার রহস্য ভেদ করা কি সহজ! চার কোটি টাকার এই কেলেঙ্কারীর আসল রহস্য উদ্ধার করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞগণ ঘামিয়া উঠিলেন—এত টাকার এই পরিণতির কারণ কি—এই প্রশ্নের কে উত্তর দিবে?

বাস্তবিক কেহ উত্তর দিতে পারেন নাই। সরকারী প্রচার বিভাগও নীরব। এই অবস্থার মধ্যে বোট সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্ট হইতে দেশী নৌকার নিলাম ঘোষণা করা হইয়াছে। কু-লোকে বলিতেছে যে, পাছে কেঁচো তুলিতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়ে, তাই নৌকা নির্মাণের সেই কেলেঙ্কারীকে ধামা চাপা দিয়া জলে ভাসিতে অনিচ্ছুক নৌকাগুলিকে মেরামত করিয়া নিলামে চড়ান হইতেছে। এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে চাই না এবং নৌকার ঠিকাদারদের নামের তালিকার সহিত রেডক্রশ ভাণ্ডারের মহানুভব চাঁদাদাতার নামের তালিকা মিলাইয়া দেখিতে বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কিন্তু সেই চার কোটি টাকা মূল্যে তৈয়ারী নৌকাগুলির কি হইল সে কথা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার সকলেরই আছে এবং নিলামের নৌকাগুলির সহিত সেই নৌকার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, না থাকিলে আবার কি প্রয়োজনে নৌকা-

তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন কি? পোর্ট কমিশনারের বোট-সার্ভেয়ারের পরীক্ষায় যে-সমস্ত নৌকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেগুলি জলে না ভাসিবার কারণ নাই, কিন্তু সেই চার কোটি 'জলে ভাসিতে অনিচ্ছুক' নৌকা কোন্ যাদুমন্ত্রে দুর্নীতির দরিয়া পার হইয়া গেল, বাংলা-সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন কেন?

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৎসরে ৫০ লক্ষ হিসাবে বাড়িতেছে এই সংবাদ পাওয়ার পর হইতে গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার আর অন্ত নাই। যাক, বিলাতী মুরুব্বী হইতে সুরু করিয়া এদেশের ফিরিঙ্গী সংবাদপত্র পর্য্যন্ত ইহা লইয়া মাতামাতি করিতেছেন এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজের সুশাসনে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিতেছে বলিয়াই এই হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে। রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সর্ববিদ্যাবিশারদ সিভিলিয়ান, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ইংরেজের নিকটই যেন ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি মর্মপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদল আবার বলিতে সুরু করিয়াছেন যে এই হারে লোকসংখ্যা বাড়িলে দেশের দারিদ্র্য আরও বাড়িবে, অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ কর।

অধ্যাপক হিল শারীর-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে ভারত-সরকারের টাকায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের পিকচার পোষ্ট নামক পত্রিকায় তিনি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন:

"১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা সম্ভবত: ১০ কোটি ছিল, ১৭৫০ সালে উহা বাড়িয়া ১৩ কোটি, ১৮৫০-এ ১৫ কোটি এবং ১৯০০ সালে প্রায় ৩০ কোটি হইয়াছে। বর্তমানে উহা ৪০ কোটির উপর এবং প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িতেছে।"

১৬০০ হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত জনসংখ্যার হিসাব অধ্যাপক হিল কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তিনি বলেন নাই। অতিশয় ধূর্তের ন্যায় শুধু একটি "সম্ভবত:" শব্দের সাহায্যে পাশ কাটাইবার রাস্তা খোলা রাখিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি ১৮৭২ সালের পূর্বে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা নির্ধারণের কোন ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। কোন কোন জেলার জনসংখ্যা নির্ণয়ের কিছু চেষ্টা হইয়াছিল এবং প্রধানত: অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই করা হইয়াছিল। ১৮৫০ হইতে ১৯০০ সালের মধ্যে ৫০ বৎসরে লোকসংখ্যা কেমন করিয়া দ্বিগুণ হইতে পারে, ১৫ কোটি লোক পঞ্চাশ বৎসরে কিরূপে ত্রিশ কোটি হয় তাহারও কোন কারণ বা যুক্তি তিনি দেখান নাই। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা অবিশ্বাস্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সর্ উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক এবং হ্যামিলটন-বুকানন বাংলাদেশের জনসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের হিসাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথানুসারে হয় নাই বলিয়া ইঁহাদের প্রদত্ত তথ্য প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয় না।

উপরোক্ত অপূর্ব হিসাব দাখিল করিয়া হিল সাহেব তাঁহার সিদ্ধান্ত টানিতেছেন নিম্নোক্তরূপ:

"আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এক শত বৎসরে জনসংখ্যা পনর কোটি হইতে চল্লিশ কোটি হইবার একমাত্র কারণ আমাদের সুশাসন, যানবাহন, সংবাদ আদানপ্রদান, সেচ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি এবং দুর্ভিক্ষ ও মড়ক নিবারণ। ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম সমগ্র দেশ এক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি সুগঠিত শাসনযন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।"

অসত্যভাষণেরও একটা সীমা আছে, ইংরেজ চরিত্র দেখিবার পরও এ ধারণা যাঁহারা এখনও পোষণ করেন, হিল সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যে আশা করি তাঁহাদের ভ্রম ভাঙিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমেরিকার প্রিন্সটন আপিস এবং আমেরিকান একাডেমি অফ পলিটিকাল ও সোশ্যাল সায়েন্স অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় গত তিন শত বৎসরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা চতুর্গুণ বাড়িয়া ৫০ কোটি হইতে ২০০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম হইয়াছে আধুনিক সভ্যতার গরিমাদৃপ্ত ইউরোপে এবং সবচেয়ে বেশী হইয়াছে দরিদ্র এশিয়ায়। কিন্তু ১৮৮১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত কয়েকটি দেশের শতকরা বৃদ্ধির হার এইরূপ—

ইংলণ্ড—	৫০
হল্যাণ্ড—	৯০
আমেরিকা—	১৮৬
জাপান—	৭৪
ভারতবর্ষ—	৩৫

কাহারও তুলনায় ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বা অত্যধিক বলিতে পারা যায় না। সুশাসনের পরিবর্তে কুশাসনই অনেক সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হয় ইহার প্রমাণ ভারতবর্ষে মিলিবে। সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা গিয়াছে প্রত্যেক পরিবারে অন্যান্য স্থানের তুলনায় লোকসংখ্যা বেশী। ইহার দুইটি কারণ আছে। থানা পুলিস অধিকাংশ গ্রাম হইতেই বহু দূরে, উহার সংখ্যা খুব কম এবং যাতায়াত অত্যন্ত কঠিন। পারিবারিক জনবলই এখানে প্রধান সম্বল। দ্বিতীয়ত:, এই অঞ্চলের বহু স্থান বর্ষাকালে দ্বীপে পরিণত হয় এবং সেখানে যাতায়াত কষ্টকর।" অথচ উহা আবাদের স্থান। কাজেই অনেক চাষী ঐ সব দ্বীপে বিবাহ [illegible] সংসার পাতিয়া পুত্রদের সাহায্যে ঐ এলাকায় সম্পত্তি [illegible]। সুন্দরবন অঞ্চলে বহু বিবাহ প্রথার এইরূপ একটা অর্থনৈতিক কারণ আছে। সাধারণ চাষীর পক্ষে মজুরি দিয়া লোক নিয়োগ করা অপেক্ষা ক্ষেত-খামারে পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি নিয়োগ অনেক সুবিধাজনক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া চাষীর পরিবারে লোকবলই বড় বল। প্রাণিবিজ্ঞান অনুসারেও দেখা যায়, যে-জীব যত নিম্নস্তরের, সন্তান-উৎপাদন তাহার তত বেশী।

দারিদ্রের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্ত দারিদ্র্য বৃদ্ধি—এই মায়াজালে জড়াইয়া পড়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ইংরেজ আমলে ক্রমাগত জনসংখ্যাবৃদ্ধি সুশাসনের পরিচয় নয়, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যেরই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ। তবে রক্ষা এই যে, অন্যান্ত দেশে যে হারে লোক বাড়িতেছে ভারতবর্ষে তাহা হয় নাই।

ভারতে ইংরেজের কৃতিত্ব

দেশে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যুর হারই বরং গবর্মেণ্টের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই দুইটিই চেষ্টা করিলে অনেক কমাইয়া আনা যায়, সভ্য দেশ মাত্রেই ইহা করিয়াছেও। পৃথিবীতে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার আজও সর্বাপেক্ষা অধিক। যথা :

	প্রতি সহস্রে শিশুমৃত্যু	প্রতি সহস্রে প্রসূতিমৃত্যু	গড়পড়তা পরমায়ু
আমেরিকা	৫৪	৮·৫	৬২
ইংলণ্ড	৫৮	৪	৬৩
ভারতবর্ষ	১৬২	২৪·৫	২৭

ভারতবর্ষে শিশু ও প্রসূতিমৃত্যুর হার ব্রিটেন ও আমেরিকার তিন গুণ এবং গড়পড়তা পরমায়ু মাত্র ২৭ বৎসর। ব্রিটেন ও আমেরিকায় ৬০ বৎসরের নীচে লোকের মৃত্যু অস্বাভাবিক, আর ভারতবর্ষে ২৭ বৎসরের বেশী কেহ বাঁচিয়া গেলে তাহা ভগবানের দয়া বলিয়া মানিতে হয়। ইংরেজের সুশাসন এতই চমৎকার যে এদেশে বৎসরে ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য রোগে মরে। চিকিৎসা হইলে ও পথ্য পাইলে এই সব রোগে খুব কম মানুষ মরে। ইংরেজেরা এদেশে বৎসরে ৫০ লক্ষ লোক বাড়িতে দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গভীর চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ লোককে প্রতি বছর মরিতে দেখিয়া কথাটিমাত্র বলেন নাই। ম্যালেরিয়ায় লোকের কর্মশক্তি কমিয়া যায় ; হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ইহার ফলে আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় ১০৬ কোটি টাকা লোকসান হয়। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্ভব হইলে বর্তমান অবস্থাতেই আরও ১০৬ কোটি টাকার সম্পদ উৎপন্ন হইতে পারিত। ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন। ভারতবর্ষে কুইনানের চাষ হইতে পারে। কিন্তু ডাচ ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা মিলিয়া এ দেশে কুইনাইনের চাষ বন্ধ রাখিয়া ভারতবর্ষে অত্যন্ত চড়াদরে জাভায় উৎপন্ন কুইনাইন চালাইয়াছে। বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্মেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। [illegible] সাম্রাজ্যবাদের সহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের [illegible] ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে আরও ভাল করিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

হিল সাহেব এদেশে রেলওয়ে বিস্তারের জন্ত বাহবা লইতে চাহিয়াছেন। সত্য বটে ইংরেজ আগমনের পর ভারতবর্ষে রেল হইয়াছে কিন্তু ইহার কৃতিত্ব কি একা ইংরেজের? আধুনিক যুগে রেল সব দেশেই গিয়াছে, যে জাপানে কোন শ্বেত জাতি পদার্পণ করিবার অধিকার পাইত না সেখানেও রেলপথ বিস্তার হইয়াছে। চীনের রেলপথ বিস্তারে ইংরেজের সাহায্য কতটুকু? সেখানেও রেল হইয়াছে। আমেরিকা হইতে ইংরেজ বিতাড়নের পর সেখানে রেল চলিয়াছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হইলে আমরাই রেল খুলিতাম, তাহার জন্ত ইংরেজকে ডাকিবার প্রয়োজন হয়ত হইত না। ভারতে রেল-পথ বিস্তারে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, এই টাকার প্রায় সবটাই লুঠ করিয়াছে ইংরেজ কোম্পানীরা। এদেশের রেল কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে চলে না, উহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ইংরেজের পণ্য ও সৈন্ত বহন। রেল পরিচালনের উপর ভারতবাসীর কোন হাতই নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের কর্তৃত্বাধীন। গত যুদ্ধে ভারতবাসীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া ভারতীয় রেলপথ উপড়াইয়া তুলিয়া সেই সব লাইন এবং বহু ইঞ্জিন ও গাড়ী মধ্য-এশিয়ায় ইংরেজের প্রয়োজন সাধনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল। গত দুর্ভিক্ষেও দেখা গিয়াছে আমাদের রেল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সৈন্ত ও পণ্য বহনেই ব্যস্ত, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু নিবারণের জন্ত আহার্য আনিবার তাগিদ তাহাদের নাই।

অধ্যাপক হিল দুর্ভিক্ষ ও মড়ক নিবারণের কথা বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ব্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ষে এই দুইটিই নিবারিত হইয়াছে। এই উক্তি কত বড় অসত্য প্রত্যেক ভারতবাসী তাহা মর্মে মর্মে জানে। মড়ক ও রোগ ভারত-বাসীর নিত্যসঙ্গী। তারপর দুর্ভিক্ষ। ১৭৭০, ১৭৮৪, ১৮০২, ১৮২৪ এবং ১৮৩৭ সালের দুর্ভিক্ষগুলি কোম্পানীর আমলে ঘটিয়াছে বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানের দুর্ভিক্ষগুলি খাস ব্রিটিশ-শাসনে ঘটিয়াছে এবং উহাতে বহু লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইয়াছে :

১৮৬০—উত্তর-পশ্চিম ভারত।
১৮৬৫—উড়িষ্যা (দশ লক্ষ মৃত)।
১৮৬৮—রাজপুতানা।
১৮৭৩—বিহার।
১৮৭৬—দক্ষিণ-ভারত (৫২ লক্ষ মৃত)।
১৮৯৬ এবং ১৮৯৯—সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষভাবে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ।
১৯০৭—যুক্তপ্রদেশ।
১৯১২, ১৯১৮ এবং ১৯২০—আহমদনগর।
১৯৪৩—বাংলা (৫০ লক্ষ মৃত)।

এক হিসাবে দেখা যায় ১৭৯৩ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত ১০৭ বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে মোট ৫০ লক্ষ লোক মরিয়াছে, আর একমাত্র ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষে ১৮৭৬ হইতে ১৯০০ এই ২৫ বৎসরে মোট ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া অন্নকষ্ট এদেশে চিরন্তন। আট-নয় কোটি লোকের বৎসরে এক দিন পেট ভরিয়া আহার জোটে না, এক বেলা শুধু লবণ-ভাত খাইয়া দিন কাটায় এমন লোকের সংখ্যা এদেশে বহু কোটি।

অধ্যাপক হিল বলিয়াছেন, ইংরেজ শাসনেই নাকি ভারতবর্ষ প্রথম একটি সুগঠিত গবর্মেণ্টের অধীনে আসিয়াছে। ইংরেজের লেখা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের সঙ্গেও যার পরিচয় আছে [illegible] এত বড় ভুল কথা বলিতে দ্বিধা করিত। বিশ্ববিখ্যাত নোবেল-প্রাইজ

প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক না জানিয়া এত বড় ভুল কেমন করিয়া উচ্চারণ করিলেন তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। তবে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ওকালতি করিতে গেলে অবশ্য এমন কথা বলিবার দরকার হইতে পারে। হিন্দু আমলে মৌর্য এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য আয়তনে বর্তমান ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা অনেক বড় এবং অনেক সুগঠিত ছিল। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে লোকে ঘরে তালা দিত না ইহা প্রাকপর্যটকেরাই বলিয়া গিয়াছেন। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণের জন্য ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের যে-কোন স্থান হইতে আগত যে-কোন লোককে সম্রাট্ অশোকের সহিত দিবারাত্রি সকল সময়ে সাক্ষাতের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের স্থানান্তরে বদলী করিবার প্রথা ইংরেজ আমলে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমাদের কথায় কথায় শোনান হয়। ইহাও ভুল। সম্রাট্ অশোকের আমলে এই প্রথা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়। তখনকার যানবাহনের অসুবিধার দিনে শাসনযন্ত্রের এতবড় সংস্কার যে বিরাট্ দূরদর্শিতা ও দক্ষতার পরিচয় বহন করিতেছে আজিকার যুগে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলমান রাজত্বে সম্রাট্ শের শাহের আমলেও দেশে চোরডাকাতের উপদ্রব ছিল না। অসহায়া বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত মাঠের মধ্যে গাছতলায় সোনার তাল সঙ্গে লইয়া নির্ভয়ে রাত্রি কাটাইতে পারিত। আর আজ ইংরেজের সুশাসনে বাহিরের চোরডাকাতের কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম, শাসনযন্ত্রের মূল ঘাঁটিতে পর্যন্ত চোর ও ঘুষখোরের অভাব নাই। সরকার চোখ বুঁজিয়া থাকায় চোর ও জুয়াচোর আজ সমাজের সকল স্তরে নির্ভয়ে বিচরণ করে। আকবর ও ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের আয়তন ও শাসন তো সেদিনের কথা, তাহার দীর্ঘ ও বিস্তৃত ইতিহাস অনেক আছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অধ্যাপক হিলের ওকালতি

অধ্যাপক হিলের মূল বক্তব্য এই :

"আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। আজ যে কোটি কোটি লোক ভারতবর্ষে বাঁচিয়া আছে, আমরা সেখানে না গেলে ইহারা বাঁচিত না। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পরিত্যাগ করি এবং ধরুন ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া আসি তাহা হইলে দলাদলি ও বিশৃখলা শুরু হইবে এবং ভারতবর্ষ এক অখণ্ড দেশে পরিণত হইবার পূর্বে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই আবার দেখা দিবে ইহা জোর করিয়া বলা যায়।"

চার্চিল-আমেরীর মুখের এই বাঁধা গৎ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের মুখে বেদনাদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের মনের কথা। ইংরেজ যখন প্রথম এ দেশে আসে তখন ভারতবাসী তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনাই করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বহু নেতাই ইংরেজের সততায় ও আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনও বহু দিন ধরিয়া ব্রিটেনের রাজনীতিবিদদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখিয়া আবেদন-নিবেদনের পথেই অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার হইতে দেখিয়া ব্রিটেনের উপর ভারতবাসীর বিশ্বাস টলিতে আরম্ভ করে। ইহার পরই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি এবং ভারতবর্ষ পরিত্যাগের চরম পত্র। যে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সহিত বন্ধুত্ব বাঞ্ছিত বস্তু বলিয়া তাহার সততায় নির্ভর করিতে চাহিয়াছিল, ১৯২৮ সালেও যে দেশ ইংরেজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা উচ্চারণ করিতে চাহে নাই, সেই ভারতবর্ষে আজ ব্রিটেনের প্রকৃত মিত্র একজনও নাই। এই পরিবর্তনের জন্য একমাত্র দায়ী ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের অদূরদর্শিতা, ব্রিটিশ বণিকদের দুর্জয় লোভ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যা প্রচারকার্য।

বাংলার শাসন-সংস্কার

বাংলার গবর্ণর মিঃ আর, জি, কেসি সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ২২শে অক্টোবর তারিখে বাংলা-সরকারের দপ্তরখানায় বিরাট্ সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে বাংলায় যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা সংস্কার করিয়া পরবর্তী মন্ত্রিসভার হাতে এক উন্নততর শাসনব্যবস্থা অর্পণের উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে। এই সকল সংস্কারের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর বিভাগ নামে একটি নূতন বিভাগ স্থাপন এবং রাজস্ব বোর্ডের হস্তে করধার্যের আইনসমূহের পরিচালন ভার ও ভূমি-রাজস্ব ও সেস আদায়ের ভার অর্পণ প্রধান। বঙ্গীয় শাসন তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে উক্ত তদন্ত কমিটি বাংলা-সরকারের দপ্তরখানা সংস্কারের জন্য যে সকল সুপারিশ করেন তদনুযায়ী বর্তমানে দপ্তরখানায় নিম্নলিখিত ১৩টি বিভাগ থাকিবে :—(১) প্রধান মন্ত্রীর বিভাগ (২) স্বরাষ্ট্র বিভাগ (৩) অর্থ বিভাগ (৪) বিচার ও আইন বিভাগ (৫) ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব (৬) কৃষি, বন ও মৎস্য বিভাগ (৭) বাণিজ্য শ্রম ও শিল্প বিভাগ (৮) শিক্ষা বিভাগ (৯) স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ (১০) সমবায় ঋণদান ও সাহায্য বিভাগ (১১) পূর্ত্ত ও বিল্ডিং বিভাগ (১২) সেচ ও জলপথ (১৩) অসামরিক সরবরাহ বিভাগ।

গবর্ণর বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর বিভাগের প্রধান কার্য হইবে গবর্মেণ্টের প্রত্যেক বিভাগের কার্যের সমন্বয় সাধন। প্রধান মন্ত্রীর বিভাগের জাতিগঠন বা উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী জনৈক উন্নয়ন কমিশনারের হস্তে অর্পিত হইবে। এই কমিশনার অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারীর পদমর্যাদা লাভ করিবেন। প্রধানমন্ত্রীর বিভাগে জনৈক চীফ সেক্রেটারীর আপিস থাকিবে। ইহার কার্য হইবে গবর্মেণ্টের অন্যান্য কার[illegible] সমন্বয় বিধান। চীফ সেক্রেটারীর আপিসের মধ্যে সং[illegible] থাকিবে। এই শাখার কার্য হইবে অল্পসংখ্যক লোকের সাহায্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করা।

প্রশ্ন করা হয় যে, মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংস্কার স্থগিত রাখা সম্ভব কিনা। তদুত্তরে গবর্ণর বলেন, "আমাদের সম্মুখে বড় বড় কার্যসূচী রহিয়াছে। সেইজন্য

আমাদের আর অপেক্ষা করা চলে না। আমি বহু শাসন-ব্যবস্থাই দেখিয়াছি এবং বাংলাদেশে আসিবার পূর্বে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, বাংলা শাসনব্যবস্থার মত এত দীর্ঘসূত্রতা থাকিতে পারে। সামান্য একটা বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগের পর বিভাগে যেভাবে আলোচনা চলে তাহাতে দ্রুত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনই সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে।"

বড় বড় জেলাগুলিকে বিভক্ত করিবার কোন পরিকল্পনা গবর্মেণ্টের আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে মিঃ কেসি বলেন যে, ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা আছে। বাংলা শাসন ব্যবস্থা ঠিক করিতে ২০ বৎসর সময় লাগিবে। সবেমাত্র কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরখানার পর জেলাসমূহের সংস্কার করা হইবে।

শাসন-সংস্কারের অর্থ

শাসন-সংস্কার বলিতে সিভিলিয়ান কর্তৃপক্ষ বুঝেন দপ্তরের এবং কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। সিভিলিয়ান কর্মচারী পরিচালিত বাংলা-সরকারও ইহাই বুঝিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি। বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রোল্যাণ্ড কমিটি যে রিপোর্ট দেন তাহাতে প্রধানতঃ তিন প্রকার সুপারিশ ছিল। প্রথমতঃ, গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক কায়দায় তাঁহারা বলিয়াছেন যে কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়াইতে হইবে এবং দেশের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলের প্রভাব হইতে শাসনযন্ত্র যাহাতে মুক্ত থাকিতে পারে তাহার পথও তাঁহারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে জনসাধারণের সহিত সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার অত্যন্ত অসঙ্গত হইতেছে; ইহা দূর না হইলে সরকারের উপর লোকের আস্থা ফিরাইয়া আনা কঠিন হইবে। তৃতীয়তঃ, তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ, চুরি ও দুর্নীতি অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং উহা রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নস্তরের অস্থায়ী কর্মচারীদের ঘাড়েই তাঁহারা বেশী দোষ চাপাইয়াছেন বটে তবে উচ্চপদস্থ এবং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নির্দোষ বলিতে পারেন নাই। দুর্নীতি দমনে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভীরুতা ও অনিচ্ছা উহার প্রসারের একটি বড় কারণ দেশবাসী ইহা বহুদিন বলিয়াছে, রোল্যাণ্ড কমিটিও তাহাই মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন যে, ঘুষ লওয়াকে পুলিস-গ্রাহ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হউক। বর্তমানে কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আসিলে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আনিবার পূর্বে সরকারের অনুমতি লইতে হয় এবং তিনি যে ঘুষ লইয়াছেন অভিযো[illegible] তাহা প্রমাণ করিতে হয়। রোল্যাণ্ড কমিটি [illegible] যে, এই দুইটি নিয়মই বদলানো দরকার। কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আসিলেই পুলিস যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে এবং তিনি যে উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই তাহা সপ্রমাণের ভারও অভিযুক্ত কর্মচারীর উপরেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা আরও একটি গুরুতর কথা বলিয়াছেন। কোন সরকারী কর্মচারীর স্বনামে বা বেনামে যদি এমন কোন অর্থ বা সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায় যাহা ঐ চাকুরি করিয়া তাঁহার পক্ষে সঞ্চিত করা অস্বাভাবিক, তাহা হইলে সেই কর্মচারীকে ঐ অর্থ কেমন করিয়া তাহার হস্তগত হইল তাহা প্রমাণ করিতে বাধ্য করিবার উপযুক্ত আইন থাকা উচিত—কমিটি সুস্পষ্টভাষায় ইহা বলিয়া গিয়াছেন। মিঃ কেসির সিভিলিয়ান গবর্মেণ্ট এই সব ভাল সুপারিশগুলি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই, শুধু প্রথমটি কার্যে পরিণত করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আগামী নির্বাচন সম্পর্কে যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান মিলিয়া বাংলার মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারিবে এরূপ ঘটা আদৌ অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ ইহা বুঝিয়াই বাংলার সিভিলিয়ান শাসকবৃন্দ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে শাসন-সংস্কারের নামে সরকারী বিভাগগুলিকে ভাবী জাতীয়তাবাদী মন্ত্রীদের ক্ষমতার বাহিরে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা ক্রমেই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সিভিলিয়ান শাসকদের অদূরদর্শী কার্যকলাপের ফলে সমগ্র দেশে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্যই সরকারের সর্বাগ্রে চেষ্টা করা উচিত ছিল। এ দেশে রেশনিং দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে অতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়াছে। কলিকাতায় দরিদ্র জনসাধারণকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে চড়া দরে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে বাধ্য করা হইতেছে। সরিষার তৈলের দাম এবং পরিমাণ উভয়ই লোকের অসুবিধার কারণ হইয়াছে। কাপড় লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে তাহা কেলেঙ্কারি ভিন্ন আর কিছু নহে। সপ্তাহের খোরাক একসঙ্গে ক্রয় করা কয়জনের সাধ্য আছে এবং এই নিয়ম কত সহস্র লোকের অসীম ক্লেশের কারণ হইয়াছে, সরকার তৎপ্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করেন নাই। সরিষার তৈল মাসে একবার ক্রয় করিতে হয়। অথচ দরিদ্র এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার চিরকাল সামর্থ্যানুযায়ী দৈনিক অল্প অল্প করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছে। দিন-মজুরদের ত ইহা ভিন্ন উপায়ই ছিল না। মফস্বলের দুঃসহ অবস্থার অবসান আজও হয় নাই। কেরোসিন এবং কুইনাইন গ্রামাঞ্চলের এই দুটি অপরিহার্য দ্রব্য এখনও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। কোটি কোটি লোক সরকারের অকর্মণ্যতার জন্য এই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষেই তাহা মঙ্গলজনক হইতে পারে না। রামরাজ্য এবং চন্দ্রগুপ্ত বা অশোকের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম, ইংরেজ আগমনের প্রাক্‌কালে ঔরঙ্গজীবের শাসনেও দেশের আপামর জনসাধারণ গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করে তাহা জানিবার ও জানিয়া উহার প্রতিকারের বহু উপায় ছিল। গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ মাত্রই সিডিশন ছিল না, অভিযোগ ন্যায্য অথবা অসঙ্গত তাহা নির্ধারণের চেষ্টা আন্তরিকতার সহিতই করা হইত। ইংরেজ রাজত্বেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট জনসাধারণ হইতে দূরে সরিতে আরম্ভ করে, গবর্মেণ্টের পরিচালকবৃন্দ দেশের মঙ্গল অপেক্ষা আত্মস্বার্থচরিতার্থ করিতেই বেশী ব্যস্ত থাকেন এবং গবর্মেণ্টের কার্যের সমালোচনা [illegible] সিডিশনে পরিণত হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া আজ

এত ভয়াবহভাবে ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে যে, বিরাট্ শক্তিশালী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষেও উহা সামলান দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের অভিযোগ দূর না করিলে শুধু প্রচার বিভাগ বাড়াইয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া অথবা দেশের লোককে জেলে দিয়া সরকারের উপর আস্থা ফিরাইয়া আনা যায় না এই সামান্য সত্যটিও এ দেশের শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানতন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম।

যদি এদেশের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ সত্যই শাসন-সংস্কারে ইচ্ছুক থাকিতেন তবে সর্বপ্রথমে তাঁহাদের উচিত ছিল পুলিসের কেন্দ্রীয় একটি বিভাগ করিয়া তাহাতে মার্কিন দেশের F. B. I. পুলিসের কার্যপন্থার অনুরূপে বিশ্বস্ত নূতন লোক—যাহারা ইতিপূর্বে কখনও পুলিসের ছায়া মাড়ায় নাই—নিয়োগ করিয়া সরকারী কর্মচারীর দুর্নীতির প্রতিকারের চেষ্টা করা। এখন দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, প্রায় সকল সরকারী বিভাগের উচ্চতম অংশেও ঘুষ ও দুর্নীতি ঢুকিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বেও কতকগুলি বিভাগ ঘুষ ও অত্যাচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেগুলির আদ্যোপান্ত সংস্কার প্রয়োজন, নহিলে কোন কাজই সম্ভব নহে। সেই বিভাগের মধ্যে নূতন লোক গেলেও হয় সে ঐ দোষেই দুষ্ট হইবে নহিলে অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে। সুতরাং এখন প্রয়োজন এই যে কেন্দ্রে উচ্চতম অধিকারীবর্গের তত্ত্বাবধানে সেই সকল বিভাগের নূতন অংশ গঠন করা এবং ক্রমে সেই অংশে পুরাতন বিভাগের বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করা, আর সর্বপ্রথমে পুলিস বিভাগে এই সংস্কার প্রয়োজন।

সমস্ত ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের নিয়মাবলীর পরিবর্তন এখন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অকর্মণ্য, অত্যাচারী বা ঘুষখোর কর্মচারীর শাস্তির ব্যবস্থা তো এখন নাইই, উপরন্তু কর্মঠ এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী অশেষ অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়া শেষ পর্যন্ত দেখে যে তাহার ফলে সে বিশেষ পুরস্কার তো কিছু পায়ই না, উপরন্তু ঘুষখোর বা অত্যাচারীরই উন্নতি দ্রুত হয়। ইহার ফলে সমস্ত সার্ভিস অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত বিভাগের অবনতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিলাতী সম্মানের মূল্য

যে-সব বৈজ্ঞানিক আণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়াছেন, সর সি ভি রমন তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিয়া বেজওয়াদায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ঐ জঘন্য কার্যের সহিত আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। আমি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হওয়ার পূর্বে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করিতাম; কিন্তু এখন আমি ঐ সোসাইটির সদস্য থাকিতে ঘৃণা বোধ করিতেছি। আণবিক বোমার ন্যায় ভয়াবহ মারণাস্ত্র যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, রয়্যাল সোসাইটি তাঁহাদের পুরস্কৃত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সত্য ও অহিংসার পূজারী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কোনও অবস্থাতেই তাঁহাদের সরকারের খেয়াল মত পরিচালিত হওয়া উচিত নহে। বৈজ্ঞানিককে স্বীয় বিবেকের আজ্ঞা অনুযায়ী চলিতে হইবে।"

বিলাতে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া যে-সব ছাত্র প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাহাদের সম্পর্কেও সর চন্দ্রশেখর বলেন,'ঐ অর্থব্যয় অর্থের অপব্যয় এবং ঐ অপব্যয়ের জন্য শুধু যে মাতাপিতারা দায়ী তাহাই নহে, সরকারও দায়ী। ঐ অর্থ বিদেশে ব্যয় না করিয়া স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যদি দান করা হইত তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিলাতের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য হইতে পারিত। তাহা ছাড়া বিলাতে ভারতীয় ছাত্রগণ শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় না।"

অধ্যাপক রমনের এই উক্তি প্রত্যেক ছাত্রেরই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকিলে এদেশের বিজ্ঞানাগারসমূহেই বড় বড় গবেষণা হইতে পারে তাহা দেখা গিয়াছে। সর চন্দ্রশেখর যে গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাহা কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে বসিয়াই তিনি করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের ল্যাবরেটরীতেও অনেক উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়াছে। ভারতবর্ষের মাছ, পোকামাকড় প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য বিলাতে ও আমেরিকায় ধাবিত হওয়ার সার্থকতা কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়। সরকারী বিবরণেই প্রকাশ, বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ১৯৪২ সালে গড়পড়তা মাসিক ৯ টাকা হিসাবে বেতন পাইয়াছেন। গুরুট্রেনিং পাস শিক্ষকেরা বড় জোর ১২ টাকা করিয়া পাইয়াছেন। যাঁহার কপাল খুব ভাল তাঁহার ভাগ্যে ১৬ টাকা পর্যন্ত জুটিয়াছে। যে বাংলা-সরকার আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা বেতনের সিভিলিয়ান কর্মচারীদের ট্রাভেলিং এলাউয়েন্স, ওভারসী এলাউয়েন্স, হউস এলাউয়েন্স প্রভৃতি রকমারি ভাতার উপরও কয়েক শত টাকা করিয়া মাগ্গি ভাতা দিবার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের হাত দিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নয় টাকা বেতনভোগী শিক্ষকের জন্য মাসিক তিন টাকার বেশী মাগ্গি ভাতা বাহির হয় নাই। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বাংলা-সরকার সঙ্কল্প করিয়াছেন, যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন নিম্নোক্তহারে বাড়াইবেনই—

গুরুট্রেনিং ও ম্যাট্রিক পাস শিক্ষক—	মাসিক	৩০ টাকা
গুরুট্রেনিং পাস নন-ম্যাট্রিক শিক্ষক—	"	২২ "
অন্যান্য শিক্ষক—	"	১৮ "

সরকারী বা বেসরকারী যে কোন আপিসের চাপরাশীর বেতনও ইহার চেয়ে বেশী।

সম্প্রতি শিক্ষকদের এক সম্মেলনে নিম্নলিখিত দাবিগুলি প্রস্তাবাকারে জানানো হইয়াছে—

(১) শিক্ষকতার শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষকগণের এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত নহেন এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষকগণের নিম্নতম বেতন যথাক্রমে ৫০ ও ৪০ টাকা। (২) প্রত্যেক স্কুলে অবিলম্বে প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের ব্যবস্থা। (৩) প্রতি মাসে মণিঅর্ডার কমিশন বাদ না দিয়া নিয়মিত বেতন দিবার ব্যবস্থা। (৪) এক মাসের নোটিশ

এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান করাইয়া চাকুরী হইতে জবাব দেওয়া। (৫) বরখাস্ত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। (৬) সরকারী নিয়মানুযায়ী ছুটির ব্যবস্থা। উপরোক্ত বেতনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ১৫৲ টাকা বিশেষ বেতন এবং উক্ত অনুপাতে মাগ্‌গি ভাতা দিবার দাবি করিয়াও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষার আইন সংশোধন করিয়া স্কুলবোর্ডে প্রত্যেক মহকুমা হইতে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষকগণের একজন প্রতিনিধি লইবার দাবি করা হয়। উক্ত আইন সংশোধন করিয়া কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিতেও নিখিল-বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক এসোসিয়েশন হইতে একজন প্রতিনিধি লইবার প্রস্তাব করা হয়।

সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত দাবিগুলি গৃহীত হয়: (১) পুরুষ প্রাথমিক শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য আরও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, (২) প্রত্যেক জেলায় শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষার জন্য অন্ততঃ একটি জুনিয়র শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন।

এই সব দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হইলেও বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়া তো দূরের কথা, বিবেচিত হইবে কিনা তাহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে।

ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক মূলধন

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু রসভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতীয় শিল্পে অবাধে ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বিঘ্ন অপসারণের জন্য ভারতবর্ষের শিল্প বিস্তারে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের বিষয় অবিলম্বে বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কমিটি উক্ত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন:

(১) ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ভারতবর্ষের কৃষি, খনি ও শিল্পে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ করিতে থাকার ফলে বিদেশীরা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকখানি কর্তৃত্ব অর্জন করিয়াছে। ইহাদ্বারা জাতির উন্নতি একাধারে বিপথগামী ও ব্যাহত হইয়াছে।

(২) ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে-সকল শিল্প জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশীরা যাহাতে সে সকল শিল্পের মালিক ও পরিচালক না হইতে পারে, সেজন্য এখন হইতে সাধারণ[illegible]তীয় শিল্পে বিদেশীদিগকে মূলধন নিয়োগ করি-[illegible]তে দেওয়া হইবে না।

(৩) আগামী কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষের বিপুল পরিমাণে মূলধন আবশ্যক হইবে এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য বৈদেশিক মূলধনেরও আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু এই মূলধন রাষ্ট্রের দ্বারা বা রাষ্ট্রের মারফৎ একমাত্র ঋণস্বরূপই গৃহীত হইবে। অপরিহার্য শিল্পের জন্য বিদেশ হইতে মূলধন যদি সংগ্রহ করিতে হয়, তবে একমাত্র ঐ সর্তেই তাহা করা যাইবে।

(৪) ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যে বিশেষ রক্ষামূলক বিধিব্যবস্থা আছে, তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

(৫) ভারতবর্ষের যে কয়েকটি অপরিহার্য শিল্পে প্রধানতঃ বৈদেশিকদের স্বার্থ সিদ্ধ হইতেছে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই সকল শিল্পকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনিতে হইবে। যে সকল কোম্পানী এই সকল শিল্পে মূলধনরূপে ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়াছে, সেই সকল কোম্পানীকে ইংলণ্ডে সঞ্চিত ভারতবর্ষের প্রাপ্য ষ্টার্লিং হইতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ভারতবর্ষে বহু বিলাতী কোম্পানী আসিয়া কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছে এবং ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী কারখানার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে টিঁকিয়া থাকাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে দেশে বহু প্রতিবাদ হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদেও অনেক আন্দোলন হইয়াছে। গবর্মেণ্ট ইহার প্রতিকার তো করেনই নাই, অধিকন্তু ভারতশাসন আইনে অনেকগুলি ধারা সংযোজন করিয়া ইহাদিগের বনিয়াদ আরও পোক্ত করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন।

যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যে-সব কলকারখানা গঠিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেগুলি ভাঙিয়া না দিয়া উহাদিগকে দেশের শিল্পোন্নতিকল্পে ব্যবহার করাই কর্তব্য। দক্ষতার সহিত যাহাতে এই কার্য সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাবও তাঁহারা করিয়াছেন। কমিটি স্পষ্টভাবে ইহা জানাইয়াছেন যে, এই সমস্ত কলকারখানা কোনক্রমেই অ-ভারতীয় মালিকদের হাতে বা অ-ভারতীয়দের পরিচালনাধীনে দেওয়া চলিবে না। যুদ্ধের প্রয়োজনে যে-সব শিবির হাসপাতাল গুদাম প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে সেগুলির কোন প্রয়োজন এখন আর নাই। এই সব গৃহ ভাঙিয়া না দিয়া জনহিতকর কার্যে নিয়োগ করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। এই বাড়ীগুলি পাইলে পরিকল্পনা কমিটির প্রাথমিক কার্যে বিশেষতঃ গ্রাম্যজীবনের উন্নতি বিধানে ও অনেকগুলি গ্রামের পুনর্গঠনে সাহায্য হইবে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশের মূল্য আছে এইজন্য যে আগামী নির্বাচনের পর প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট গঠিত হইলে অনতিবিলম্বে উহার অনেকগুলিই কার্যে পরিণত হইতে পারিবে। অবশ্য কেন্দ্রে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না। ভারতীয় শিল্পের উপর বৈদেশিক প্রভুত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে কংগ্রেস দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন এবং পণ্ডিত জবাহরলাল ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন।

সীতার পরীক্ষা

শ্রীরাজশেখর বসু

বাল্মীকি-রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে আছে, রাবণবধের পর সীতার সঙ্গে দেখা হ'লে রাম তাঁকে অসতী সন্দেহ ক'রে কটু বাক্যে প্রত্যাখ্যান করলেন, অবশেষে অগ্নিপরীক্ষার পর আবার তাঁকে নিলেন। উত্তরকাণ্ডে আছে, অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাম সীতার সঙ্গে সুখে কালযাপন করছিলেন, কিন্তু প্রজারা সীতার অপবাদ রটাচ্ছে শুনে তাঁকে বনে বিসর্জন দিলেন। বার-তের বৎসর পরে রাম অশ্বমেধযজ্ঞের সভায় কুশ-লবকে দেখে তাদের নিজের পুত্র বলে বুঝতে পারলেন এবং বাল্মীকিকে অনুরোধ জানালেন সীতা যেন যজ্ঞভূমিতে এসে সকলের সমক্ষে নিজের নিষ্পাপতা প্রমাণ করেন। সীতা এলেন, প্রমাণও দিলেন, কিন্তু রামের সঙ্গে পুনর্মিলিত না হয়ে ভূগর্ভে তিরোহিত হ'লেন।

অতীত কালের অতি প্রাচীন সমাজের আদর্শ অনুসারে যে আখ্যান রচিত হয়েছে আধুনিক মানদণ্ড দিয়ে তার বিচার চলে না। রামের পত্নীত্যাগ ও রাজ্যরক্ষা এবং অষ্টম এডোয়ার্ডের রাজ্যত্যাগ ও পত্নীবরণ—এই দুই ব্যাপারের ন্যায়-অন্যায় একই সামাজিক অবস্থা ও ধর্মনীতি অনুসারে বিচার করলে প্রচণ্ড মূঢ়তা হবে। রবীন্দ্রনাথ সাবধান ক'রে দিয়েছেন—'রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য আলোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নয়। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে, সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।'

সমস্ত ভারতবর্ষ রামচরিত্রকে লোকোত্তর রূপেই গ্রহণ করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নতুবা রাম প্রজানুরঞ্জক ধর্মনিষ্ঠ নরপতি, করুণাময়, পতিতপাবন প্রভৃতি আখ্যা পেতেন না, আদর্শ রাজ্যের নাম রামরাজ্য হ'ত না। রামায়ণের লক্ষ লক্ষ পাঠক ও শ্রোতা রামচরিত্রের ত্রুটি বা অসংগতি গ্রাহ্য করে নি, আখ্যানকার রামের যে প্রশস্তি করেছেন তাই ভক্তিভরে মেনে নিয়েছে। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ মুখ্যত কাব্যগ্রন্থ, পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্র নয়, সেজন্য আমরা তার রসগ্রহণের সময় বিচারবুদ্ধি একবারে দমন করতে পারি না। আমাদের মনে এই প্রশ্ন ঠেলে ওঠে—বাল্মীকি রামকে দারুণ কর্তব্যনিষ্ঠ রূপে দেখাতে চান উত্তম কথা, কিন্তু দু-দু বার সীতাকে নিগৃহীত করবার কি দরকার ছিল? শুধু রাবণবধের পর বা অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর একবার সীতাবিসর্জন দেখালেই কি যথেষ্ট হ'ত না? এই আপত্তির একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, বর্তমান বাল্মীকি-রামায়ণের সবটা একজনের বা এক সময়ের রচনা নয়, কতক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উত্তরকাণ্ড। যুদ্ধ কাণ্ডের শেষে রামায়ণমাহাত্ম্য আছে, তাতেই প্রমাণ হয় যে মূল গ্রন্থ সেইখানেই সমাপ্ত। মহাভারতের অন্তর্গত রামোপাখ্যানে সীতার অগ্নিপরীক্ষা আছে কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশ নেই। অতএব বাল্মীকি দুবার নিষ্ঠুরতা করেন নি, কঠোর রাজধর্মের আদর্শ দেখাবার জন্য শুধু একবার সীতার অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মূল কাব্য মিলনান্ত, অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর রাম-সীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল এমন কথা বাল্মীকি লেখেন নি। সীতার বনবাস আর পাতালপ্রবেশের জন্য তিনি দায়ী নন।

A. Berriedale Keith তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন—'Valmiki and those who improved on him, probably in the period 400—200 B.C., are clearly the legitimate ancestors of the court epic.' বাল্মীকির কাল যাই হ'ক, এ কথা নিশ্চিত যে মূল গ্রন্থে যিনি সীতার নির্বাসন প্রভৃতি জুড়ে দিয়েছেন তিনিও অতি প্রাচীন এবং তাঁর কবিত্বও সামান্য নয়। তিনি মূল রামায়ণ 'improve' করবারই চেষ্টা করেছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখেন নি, তাঁর রচনা বাল্মীকির রচনার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে সমস্তই এখন বাল্মীকির নামে চলে। এই প্রক্ষেপ কার্যে যত জনেরই হাত থাকুক, আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা যুদ্ধকাণ্ড-রচয়িতাকে 'পূর্বকবি' এবং উত্তরকাণ্ড-রচয়িতাকে 'উত্তরকবি' বলব।

পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা ক'রেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, কিন্তু উত্তরকবি তাঁকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন। এ কি নিষ্ঠুরতা না উৎকট আদর্শপ্রীতি? আমার মনে হয়, উত্তরকবির উদ্দেশ্য মহৎ, তিনি আপাতনিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি সীতার অগ্নি-পরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে উত্তরকবি তুষ্ট হন নি, তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃত করেছেন। পূর্বকবির রচনা মিলনান্ত, কিন্তু তিনি অগ্নিপরীক্ষায় যে বিবরণ দিয়েছেন তা আমাদের আধুনিক রুচিকে পীড়িত করে। উত্তরকবির বিবরণ শোকাবহ, কিন্তু পীড়াকর নয়। তিনি রাম-সীতার মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই দেখাতে চেয়েছেন—

> 'সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
> কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
> কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
> সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম।'

সীতার অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্ত বোধ হয় কালিদাসেরও রুচি-কর হয় নি, তিনি রঘুবংশে শুধু এক লাইনে একটু উল্লেখ করে-ছেন, কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিস্তারে দিয়েছেন।

যুদ্ধকাণ্ডে অগ্নিপরীক্ষার যে বিবরণ আছে তা সংক্ষেপে এই।—রামের আদেশে হনুমান অশোকবনে [illegible] সীতাকে রাবণবধের সংবাদ দিলেন এবং ফিরে এসে রামকে [illegible] 'যাঁর জন্য আমাদের এই উদ্যম, যিনি আমাদের সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ, সেই শোকসন্তপ্তা সীতাকে তোমার এখন দেখা উচিত। তিনি তোমার বিজয়সংবাদ শুনে আকুলনয়নে বলেছেন—আমি ভর্তাকে দেখতে ইচ্ছা করি।'

এই কথা শুনে রাম সহসা চিন্তান্বিত হলেন, তাঁর চক্ষু সজল

হ'ল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিভীষণকে বললেন, 'তুমি সীতাকে স্নান করিয়ে অঙ্গরাগ ও আভরণে ভূষিত ক'রে নিয়ে এস।' সীতা যেমন ছিলেন সেই অবস্থাতেই আসতে চাইলেন, কিন্তু বিভীষণের উপদেশে রামের ইচ্ছানুসারে সজ্জিত হলেন এবং শিবিকারোহণে চললেন। রামের কাছে এসে বিভীষণ সমবেত সকল লোককে সরিয়ে দেবার আজ্ঞা দিলেন। রাম রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি কেন আমার মত না নিয়ে এই সকল লোককে কষ্ট দিচ্ছ? এদের উদ্‌বিগ্ন ক'রো না, এরা আমার স্বজন। গৃহ বস্ত্র প্রাচীর বা লোকাপসারণ নারীদের আবরণ নয়, এ সকল রাজকীয় আড়ম্বরমাত্র, চরিত্রই নারীর আবরণ। সীতা বিপদ্‌গ্রস্ত ও কষ্টে পতিত, এখন তাঁর দর্শনে দোষ হবে না। তিনি শিবিকা থেকে নেমে পদব্রজে আসুন, এই সকল বনবাসী বানর ভল্লুকাদি আমার সমীপে তাঁকে দেখুক।'

রামের কথায় বিভীষণ লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও হনুমান চিন্তান্বিত ও ব্যথিত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা বুঝলেন যে রামের অভিপ্রায় ভাল নয়। লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হয়ে সীতা রামের সম্মুখে এসে বিস্ময়ে হর্ষে ও স্নেহে পতিমুখ নিরীক্ষণ করলেন। তখন রাম মনোগত ভাব ব্যক্ত ক'রে বললেন, 'আমি শত্রু জয় ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে। তুমি রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলে, সেই দৈবকৃত দোষ আমি ক্ষালন করেছি।'

সীতা মৃগীর ন্যায় বিস্ফারিত ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাইতে লাগলেন। হৃদয়প্রিয়াকে দেখে রামের হৃদয় লোকনিন্দার ভয়ে দ্বিধা হ'ল। তিনি সকলের সমক্ষে সীতাকে বললেন,

বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জতা॥
প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া॥...
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্ মহৎ॥
যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি॥
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎকৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ॥
ন হি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়ত্যচিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্॥

—তোমার মঙ্গল হ'ক। তুমি জেনো, এই রণপরিশ্রম — সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি — এ তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্ররক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন, এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি ক'রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির করে বলছি — লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে নি।'

বহু লোকের সমক্ষে এই রোমহর্ষকর অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সীতা ঘোর লজ্জায় যেন নিজের গাত্রে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি অশ্রুজল মুছে গদ্‌গদ স্বরে বললেন, 'নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে তুমি আমাকে সেইরূপ বলছ কেন? যখন হনুমানকে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলে তখন আমাকে বর্জনের কথা জানাও নি কেন? আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতাম, তোমাদের অনর্থক কষ্ট পেতে হ'ত না। পরাধীন বিবশ অবস্থায় রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত নয়।—

মদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিংকরিষ্যাম্যনীশ্বরী॥
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥...
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তং চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলং চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্॥

— আমার অধীন যে হৃদয় তা তোমারই ছিল; কিন্তু যখন আমি নিজের কর্ত্রী নই তখন পরায়ত্ত দেহ সম্বন্ধে কি করতে পারি? আমাদের দীর্ঘকাল সংসর্গ হয়েছে, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, এতেও যদি তুমি আমাকে না বুঝে থাক তবে আমার পক্ষে তা চিরমৃত্যু। আমার জানকী নামের অর্থ এ নয় যে জনক থেকে আমার জন্ম, বসুধাতল থেকে আমার উৎপত্তি; তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার মহৎ চরিত্রের সম্মান করলে না। যে প্রতিজ্ঞা ক'রে বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করেছিলে তা মানলে না, আমার ভক্তি চরিত্র সবই পশ্চাতে ফেলে দিলে।'

তার পর সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, 'তুমি চিতা প্রস্তুত কর, স্বামী অপ্রীত হয়ে সর্বসমক্ষে আমাকে ত্যাগ করেছেন, আমি অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব।' লক্ষ্মণ সরোষে রামের দিকে চাইলেন, কিন্তু তিনি বা আর কেউ কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করতে সাহসী হলেন না। চিতা রচিত হল। অধোমুখে উপবিষ্ট রামকে প্রদক্ষিণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে সীতা যুক্তকরে অগ্নিকে বললেন, 'আমি যদি শুদ্ধচরিত্রা পতিব্রতা হই তবে অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন।' সীতা অগ্নিপ্রবেশ করলেন, সকলে আর্তস্বরে হাহাকার ক'রে উঠল। তখন দেবতারা এসে রামকে বললেন, 'তুমি সর্বলোকের কর্তা ও জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ হয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় কেন বৈদেহীকে

উপেক্ষা করছ?' মূর্তিমান অগ্নিদেব সীতাকে কোলে নিয়ে চিতা থেকে উঠে বললেন, 'তুমি এই নিষ্পাপা বিশুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীকে অসংকোচে গ্রহণ কর।' রাম ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, 'সীতা রাবণগৃহে দীর্ঘকাল ছিলেন সেজন্য এঁর শুদ্ধি আবশ্যক, নতুবা লোকে বলবে দশরথপুত্র রাম মূর্খ ও কামুক। আমি জেনেছি সীতা অনন্যহৃদয়া, নিজের তেজেই রক্ষিতা, রাবণ মনে মনেও এঁকে ধর্ষণ করতে পারে নি। নিজের কীর্তির ন্যায় সীতাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি না। আপনারা সকলে যে হিতবাক্য বললেন তা আমি অবশ্যই পালন করব।' রাজা দশরথ স্বর্গ থেকে নেমে এসে সীতাকে বললেন, 'পুত্রী, তুমি রামের উপর রুষ্ট হয়ো না, তোমার হিতকামনায় এবং শুদ্ধির নিমিত্তই ইনি তোমাকে ত্যাগের কথা বলেছিলেন।' এই রকমে মিটমাট হয়ে যাবার পর রাম 'অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং লজ্জমানাং মনস্বিনীম্'—লজ্জমানা মনস্বিনী বৈদেহীকে অঙ্কে নিয়ে, লক্ষ্মণ সুগ্রীবাদির সঙ্গে পুষ্পকরথে উঠে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন।

এই বর্ণনায় আমরা দেখছি, রাম অহংকৃত অভদ্র বাক্যে সীতাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের মর্যাদারক্ষা এবং নিজের অপবাদখণ্ডনই তাঁর লক্ষ্য, সীতার দশা কি হবে তা তিনি মোটেই ভাবলেন না। এপর্যন্ত সীতার কোনও নিন্দা রামের কর্ণগোচর হয় নি, তথাপি তিনি আগে থাকতেই সীতাকে ত্যাগ করিতে চান। তিনি নিজেও সন্দেহ করেন যে সীতার চরিত্র নষ্ট হয়েছে। দীর্ঘ বিরহের অবসানে সহসা রামের এই বিকার হয়তো মনোবিদ্যার সূত্রসম্মত, কিন্তু আমাদের কাছে তা নিতান্তই অরামোচিত বোধ হয়। তাঁর তুলনায় সীতা মহীয়সীরূপে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মনে হয় শেষকালে তিনিও একটু অস্বাভাবিকতা দেখিয়েছেন। অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা তাঁর লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন রামের কোলে ব'সে পুষ্পকরথে অযোধ্যাযাত্রা করলেন। তাঁর পতিভক্তি অপরিসীম, তাঁর সহিষ্ণুতা আর ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এতটা অপমানের পর তাঁর মনে কি একটুও গ্লানি ছিল না? পূর্বকবি তার কিছুমাত্র আভাস দেন নি।

এখন উত্তরকাণ্ড থেকে সীতার নির্বাসন আর পাতাল-প্রবেশের বিবরণ সংক্ষেপে তুলে দিচ্ছি। রাম সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে গল্প করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভদ্র-নামক একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা আমাদের সম্বন্ধে কি কথা বলে?' ভদ্র অপ্রিয় সংবাদ চেপে রাখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অবশেষে রামের নির্বন্ধে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, 'মহারাজ, পুরবাসিগণ চত্বরে হট্টে পথে এবং বন-উপবনে এই জল্পনা করে—রাম দুর্ধর্ষ রাবণকে বধ করে সীতার উদ্ধার করেছেন এবং বিদ্বেষ পশ্চাতে রেখে তাঁকে পুনর্বার স্বগৃহে এনেছেন। সীতার প্রতি তাঁর কি প্রবল আসক্তি! রাবণ যাঁকে ক্রোড়ে তুলে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, যিনি রাক্ষসের বশে ছিলেন, সেই সীতাকে রাম কেন ঘৃণা করেন না? যদি আমাদের স্ত্রীদের সেই দশা হয় তবে আমাদেরও সয়ে থাকতে হবে, কারণ রাজা যা করেন প্রজা তারই অনুকরণ করে।' রাম কাতর হয়ে সুহৃদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কথা কি সত্য?' সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, 'সমস্তই সত্য, এতে সংশয় নেই।'

রাম তাঁদের বিদায় দিয়ে ভ্রাতৃগণকে ডেকে আনালেন। তিনি সজলনয়নে সীতা সংক্রান্ত জনরবের কথা জানিয়ে বললেন, 'রাবণবধের পর আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল সীতাকে পুনর্বার গৃহে নেওয়া উচিত কিনা। তিনি আমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্নিপ্রবেশ করেছিলেন। তারপর দেবতা ও ঋষিগণের সমক্ষে অগ্নিদেব বললেন যে সীতা অপাপা। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে সীতার চরিত্র শুদ্ধ। কিন্তু এখন এই ঘোর অপবাদ শুনে আমি শোকাভিভূত হয়েছি। যত কাল কোনও লোকের অকীর্তি রটিত হয় তত কাল তার নরকবাস ঘটে। সীতার কথা দূরে থাক, অপবাদের ভয়ে আমি নিজের জীবন এবং তোমাদের সকলকেও ত্যাগ করতে পারি। আমি শোকসাগরে পতিত হয়েছি, এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর হতে পারে না।'

তার পর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞায় সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমের নিকট বর্জন করলেন। সীতা বহু বিলাপ করলেন, কিন্তু রামকে ভর্ৎসনা করলেন না। বললেন, 'লক্ষ্মণ, তুমি সেই ধর্মনিষ্ঠ নৃপতিকে জানিও — আমি শুদ্ধচরিত্রা, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী, তা তুমি জান। তুমি আমার পরম গতি, তোমার অপবাদ যাতে না হয় তা আমার অবশ্যকরণীয়।' অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে লক্ষ্মণ দেখলেন, রাম অশ্রুপূর্ণনয়নে বসে আছেন। লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি শোকবিহ্বল হন তবে যে অপবাদের ভয়ে মৈথিলীকে ত্যাগ করেছেন সেই অপবাদই আবার পুরমধ্যে প্রচারিত হবে।' অর্থাৎ লোকে বলবে রাম কলঙ্কিনী স্ত্রীর প্রতি এখনও অনুরক্ত।

রাম বলেছেন, 'আমার অন্তরাত্মা জানে যে সীতার চরিত্র শুদ্ধ।' তথাপি তিনি তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজারঞ্জক নরপতির কর্তব্যবোধে সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। অগ্নিপরীক্ষার প্রসঙ্গে পূর্বকবি রামচরিত্র যে ভাবে দেখিয়েছেন তা আমাদের অপ্রীতিকর, কিন্তু উত্তরকবির বিবরণে আমাদের মন রামের প্রতি বিমুখ হয় না।

সীতার নির্বাসনের পর তাঁর কাঞ্চনী প্রতিমা পার্শ্বে রেখে রাম ধর্মকার্য করতে লাগলেন। কুশ-লবের জন্মকালে শত্রুঘ্ন ঘটনাক্রমে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি সীতার সঙ্গে দেখা করেন নি, কারণ রামের আদেশ ছিল না। শত্রুঘ্ন রামকে পুত্রজন্মের সংবাদ দিলেন এ কথাও রামায়ণে নেই। বার-তের বৎসর পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, সশিষ্য বাল্মীকি সেখানে গেলেন। কুশ-লবের মুখে রামায়ণ-গান শুনে এবং তাদের আকৃতি দেখে রাম [illegible] তারা সীতারই পুত্র। তিনি দূত পাঠিয়ে বাল্মীকিকে [illegible] জানালেন যে সীতা যদি শুদ্ধচারিণী পাপহীনা হন তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন, কাল প্রভাতে যজ্ঞ-পরিষদে সকলের সমক্ষে সীতা শপথ করুন। বাল্মীকি উত্তর পাঠালেন—তাই হবে।

রজনী প্রভাত হ'লে রাম যজ্ঞশালায় গিয়ে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র দুর্বাসা ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণকে আহ্বান করলেন। নানা

দেশ হ'তে আগত বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং রামের মিত্র রাক্ষস ও বানরগণ সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে সমবেত হলেন।

তদা সমাগতং সর্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্‌মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥
ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥

—সমাগত সর্বজন পাষাণবৎ নিশ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন শুনে মুনিবর বাল্মীকি সত্বর সীতাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। সীতা অধোবদনে কৃতাঞ্জলি হয়ে বাষ্পাকুলনয়নে রামকে ধ্যান করতে করতে মহর্ষির পশ্চাতে এলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদবিদ্যার ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাতে সীতাকে আসতে দেখে সভায় মহান্ সাধুবাদ উত্থিত হ'ল। অনন্তর বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে শোকে আকুলিত হয়ে তুমুল কোলাহল করে উঠলেন।

বাল্মীকি রামকে বললেন, 'এই সেই পতিব্রতা সীতা যাঁকে আমার আশ্রমের নিকট ত্যাগ করা হয়েছিল। এখন আজ্ঞা কর ইনি তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দ্বারা সীতাকে শুদ্ধাচারিণী পতিব্রতা জেনেই গ্রহণ করেছিলাম। লোকাপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত হয়েছিল তাই তোমার প্রিয়তমাকে শুদ্ধা জেনেও তুমি ত্যাগ করেছিলে।'

রাম ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বললেন,

শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে॥

—'জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ'ক,' অর্থাৎ সকলের বিশ্বাস হ'ক যে সীতা শুদ্ধস্বভাবা, সকলের সম্মতিক্রমেই আমি সীতাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করতে চাই।

সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎপ্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্‌মুখী॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

—সকলে সমাগত হয়েছেন দেখে কাষায়বসনধারিণী সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে অধোবদনে নিম্নদিকে চেয়ে বললেন, 'যদি আমি রাঘব ভিন্ন আর কাকেও মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাকি, যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা ক'রে থাকি, রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি সত্য ব'লে থাকি, তবে মাধবী দেবী (অর্থাৎ পৃথিবী) বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।'

সহসা এক আশ্চর্য দিব্য সিংহাসন ভূতল থেকে উত্থিত হ'ল। ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণে সীতাকে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁকে দুই বাহু দ্বারা ধারণ ক'রে সিংহাসনে বসালেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল, সীতা রসাতলে প্রবেশ করছেন দেখে দেবতারা ধন্য ধন্য বলতে লাগলেন, স্থাবর জঙ্গম রোমাঞ্চিত হ'ল, কেউ ধ্যান করতে লাগল, কেউ জ্ঞানশূন্য হয়ে রামসীতাকে দেখতে লাগল, সমস্ত জগৎ যেন সম্মোহিত হ'ল। রাম নতমস্তকে দীনমনে বাষ্পাকুলনয়নে বহুক্ষণ রোদন করলেন। তার পর শোকে ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'দেবী বসুধা, তুমি আমার শ্বশ্রূ, সীতাকে ফিরিয়ে দাও নয়তো বিদীর্ণ হয়ে আমাকে পথ দাও। তুমি সীতাকে আন, তাঁর জন্য আমি উন্মত্ত হয়েছি।' তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ এসে রামকে শান্ত করলেন।

এই বিবরণে উত্তরকবি দেখিয়েছেন, সীতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য রাম অত্যন্ত ব্যগ্র, তিনি কেবল যজ্ঞসভায় সমবেত জনগণের সম্মতি চান। স্বামীর অপযশ নিবারণের জন্য সীতা তাঁর নির্বাসন মেনে নিয়েছিলেন, কোনও কটু কথা বলেন নি। বহু বৎসর পরে রামের অনুরোধে তিনি যজ্ঞসভায় সকলের সমক্ষে শপথও করলেন। কিন্তু এবারে তিনি স্বাতন্ত্র্য আর আত্মসম্মান বিসর্জন দিলেন না, একান্ত পতিব্রতা হয়েও পুনর্মিলন কামনা করলেন না। হয়তো তাঁর অন্তরে গূঢ় অভিমান ছিল, অযোধ্যার যে প্রজাবর্গ তাঁর দুঃখের মূল তাদের রাজমহিষী হ'তেও তাঁর ঘৃণা ছিল। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন—আমি নিজের অপবাদ খণ্ডন ক'রে স্বামীর যশ গ্লানিমুক্ত করছি, তাঁর বংশধর দুই পুত্রকে কিশোর বয়স পর্যন্ত পালন করে তাঁকে দিয়ে যাচ্ছি, ভার্যার কাছে যা প্রাপ্য তা তিনি পেয়েছেন, আর আমার থাকবার প্রয়োজন কি? উত্তরকবি এসব কিছুই বলেন নি, তথাপি আমরা এই সর্বংসহা ধরণীতনয়ার মনোভাব কল্পনা করতে পারি।



ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

খাওয়াটা টেবিলের উপরেই চলে। এসব কোয়ার্টারে এঁটো-কাঁটা লইয়া বিচার বিবেচনার বালাই কম। ঠাকুর সময়মত রান্না করিয়া দেয়। লম্বা মত একটা টেবিল—চওড়া বারান্দায় পাতা আছে, তার চার ধারে খানকতক চেয়ার সাজান আছে, সময়মত যে যখন বসিয়া হুকুম করে—ঠাকুর ভাতের থালা সেই টেবিলে সাজাইয়া দেয়। খাওয়া শেষ হইলে চাকর থালা উঠাইয়া টেবিলে শুকনা ন্যাতাটা বুলাইয়া লয়। গোবর বা জলের কোন হাঙ্গামা নাই। টেবিলের মাঝখানে একটি ফুলদানি আছে; নানাজাতীয় রঙীন এবং সুগন্ধ ফুল মাঝে মাঝে সেটার শোভাবর্দ্ধন করে। টেবিলে কখনও করলা চাদর বিছান হয়—কখনও খালি টেবিলেই খাওয়া চলে। নাতি-অভিজাত বলিয়া—চাদরের বা ফুলদানির সজ্জা-বৈলক্ষণ্য, কিংবা প্লেট-ডিস্-চামচ ইত্যাদির বিশৃঙ্খলা লইয়া অভিযোগ উঠে না। একসঙ্গে শুকনা জায়গায় এই ভাবে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া খাওয়াটাও বেশ রুচিবর্দ্ধক।

সুমিত্রার পিতা খুঁতখুঁতে ধরণের লোক। সর্ব্বক্ষণ খাওয়ার বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই আছেন। কত ক্যালোরি খাদ্যে কি পরিমাণ ফ্যাট, ষ্টার্চ, ভিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদি থাকা দরকার—সেদিকে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। নিজের খাওয়া এবং অন্যের খাওয়া—সব বিষয়েই তাঁর নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

ওহে—ডালটা ফেল না—আজকালকার দিনে প্রোটিন বলতে আর কোন খাদ্যে নেই বললেই চলে। আলু আমাদের চলে না—বয়স বেড়েছে ত, তোমরা কিছু বেশি খেতে পার। পালং শাকটা রোজ চালিয়ে যেও—

সুমিত্রা বলিল, অনুপমবাবু কিছুই খেলেন না ত! আর একটু মাংস দিই—

না, না, অনুপম আপত্তি করিল।

সুমিত্রার পিতা বলিলেন, থাক মিত্রা, সব চেয়ে বড় কথা হ'ল রুচি। সে যদি না থাকে ত—

না বাবা, রুচির কথা নয়—উনি সবেতেই অমন আপত্তি করেন। কোন দিন কিছু চেয়ে খেতে তো দেখলাম না।

অনুপম হাসিল, সে অবসর পাই না যে।

না বাবা, খাওয়া নিয়ে চক্ষুলজ্জাটা ভাল নয়।

সুমিত্রা বলিল, এক বাটি মাংস তুলে রেখেছি, পানু বাবুদের দিয়ে আসব?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সমীর বলিল, একদিন মাংস খাওয়ালে তাদের কি উপকারটা হবে!

তাহার পিতা কহিলেন, উপকার নয়—কিন্তু জিনিস না ফেলে কাউকে দেয়া ত খারাপ নয়। যদিও আমি অপচো ভালবাসি না।

সমীর বলিল, পরকে দেয়া আর ডাষ্টবিনে ফেলা এক নয় কি? গৃহস্থের পক্ষে দুই ত ক্ষতি!

তাহার পিতা মাথা নাড়িয়া অল্প হা[illegible]তা ঠিক নয়। যাতে লোকের প্রাণ বাঁচে—

প্রাণ যদি বাঁচতো তো এমনিতে এত লোক মরতো না—বাবা। রোজ ডাষ্টবিনে ত কম জিনিস পড়ছে না।

ওই খাওয়া! কত রকম রোগের জার্ম—না, না, ওতে মানুষ বাঁচে না। ওকি হাত গুটিয়ে উঠলে যে! একটু থামিয়া বলিলেন, ওঃ—সিনেমায় যাবে? দেখ এ সম্বন্ধে আমার একটা অদ্ভুত ধারণা আছে—

সুমিত্রা গল্পে কান না দিয়া এক বাটি মাংস হাতে বারান্দার অন্য প্রান্তে যাইতেই একটি বারো বছরের মেয়ে কোথা হইতে সেখানে আসিয়া হাজির হইল। দারিদ্র্যের ছাপ মেয়েটির বেশবাসে—তার মুখে-চোখে। তাহার কাপড় জামা তত ময়লা নহে—চুল রুক্ষ নহে, কিংবা অনাহারজনিত মুখের ভাবও ক্ষুধাশীর্ণ নহে। তথাপি চোখের দৃষ্টি ও চলনে যে লালসা ও সঙ্কোচ তাহাই দারিদ্র্যকে অবারিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। মাংসের বাটি হাতে পাইবামাত্র চোখ দুটি তাহার আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল।

সবটা যেন তুমি খেও না।

মেয়েটি ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, খেতে দিলে ত। ওরা সবাই মিলে যা কাড়াকাড়ি লাগায়—আমি হয়ত এক টুকরোও পাব না।

তাহ'লে একটা ডিসে ক'রে খানিকটা আলাদা করে দিই—এখান থেকে খেয়ে যাও।

মেয়েটি ভোজন-টেবিলে উপবিষ্ট অনুপমদের পানে চাহিয়া সসঙ্কোচে কহিল, না। তার পর দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মেয়েটি কে?

অনুপমের প্রশ্নে সমীর বলিল, এই বাড়ির ছোটমত একটা পোরশন আছে—তারই ভাড়াটে। বাবা চাকরি করে, সামান্য মাইনে, অনেকগুলি পোষ্য। মাংস বড় একটা জোটে না বলে—সুমিত্রা আমাদের—দয়ার অনুশীলন করে বর্ত্তে যান।

কথাটা সুমিত্রার কানে গেল। ঘাড় ফিরাইয়া সে কহিল, দাদা—সব বিষয় নিয়ে তোমার ঠাট্টা মানায় না।

সুমিত্রার পিতা কহিলেন, তা দয়াধর্ম্ম মেয়েদের ভাল—ওতে বিদ্রূপের কিছু নেই।

তিনি উঠিয়া গেলে সমীর চুপি চুপি বলি[illegible] যখন সত্যিকারের ধর্ম্ম—তখন ভাল হয় ত। কিন্তু দু[illegible] দেওয়ার দাবিতে খানিকটা ওপরে উঠলেই তো মুশকিল।

কে ওপরে ওঠে?

দয়াই উঠুক আর মনই উঠুক।

দয়া! অনুপম বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

ওঠে না? ভাবে ভরা আর বাষ্পে জমা—যে জিনিস

সে ত মাটিতে নামতেই চায় না। মাটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কম।

নামে বইকি—মেঘ থেকেই ত বর্ষণ হয়।

তবু মেঘ উঁচুতে থাকে। সে জানে পৃথিবীকে ধন্য করে দেওয়াই তার ধর্ম্ম।

তাতে পৃথিবীর উপকার হয় কিনা ?

সমীর হাসিল। মেঘ আর পৃথিবীর সঙ্গে যে সম্পর্ক—মানুষের সঙ্গে মানুষের ঠিক তা নয়। এখানে শুধু উপকার করবার ভাবটি থাকলেই ঠিকমত উপকার করা যায় না। ধন্য হওয়ার মনোভাব না এলে—

সমীর, তুমি কি কার্ল মার্কস বেশি পড় ?

একবার মাত্র পড়েছি—তাও সবটা ভাল লাগে নি।

ভাল লাগে নি, না বুঝতে পার নি ?

একই কথা। সব জমিতেই সব গাছ কিছু লাগে না। ওর গোড়ার কথাটি বেশ—কিন্তু মাঝের কথাগুলো বড় গোলমেলে।

কেন ?

সে অনেক কথা। হিংসাকে বাদ দিয়ে মার্কসের নীতি গ্রহণ করা খুব শক্ত নয় কি ?

হিংসার কথাটা কি হ'ল ?

সমীর হাসিয়া বলিল, মানুষের মন ত।

সুমিত্রা টেবিলের সামনে আসিয়া বলিল, তোমরা কি উঠবে না—দাদা। সিনেমা—

হাঁ—সিনেমাটা ভুলব কেন। মার্কস নেহাতই অবান্তর এসে পড়লেন কিনা।

মার্কস !

উঠছি রে উঠছি। নতুন করে তর্কে শান দেবার ইচ্ছে আমার নেই। সমীর কক্ষান্তরে অদৃশ্য হইল।

আপনি ইজি চেয়ারটায় একটু গড়িয়ে নিন—আমি শাড়ীটা বদলে আসি।

এই নিয়ে তিনবার। ওঘর হইতে সমীরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বেশ। মেয়েছেলে—ডোকলার মত পথে বার হতে পারে না—সে জ্ঞানটুকুও তোমার নেই।

সে কথা অনুপম অস্বীকার করে না। শ্রী জিনিস মেয়েদের নিজস্ব বলিলেই হয়। প্রসাধনে যে আর্ট তাহার চমকারিত্ব উঁহারাই প্রকাশ করিতে পারেন।

সমীর তর্ক করে। তাহলে প্রাণী-জগতের ধারা হ'তো উল্টো। ময়ূরীর থাকতো পেখম—সিংহীর কেশর—হস্তিনীর সুদীর্ঘ [illegible] স্ত্রী-পাখীদের পালকের বর্ণবৈচিত্র্য।

তুমি কি বলতে চাও—মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কম বলেই প্রসাধনে অনুরাগ বেশি ?

সমীর উচ্চরবে হাসিয়া উঠে। প্রকৃতি যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—মানুষ কুতর্কে তা অস্বীকার করে। সেক্স অ্যাপীল জিনিষটাকে আর্টের পর্য্যায়ে ফেল ক্ষতি নেই—ওকে সর্ব্বস্ব করো না—দোহাই।

কিন্তু তর্ক সুমিত্রার সম্মুখে হয় নাই। সমীরের তাহাতে আপত্তি ছিল না—শুধু সুমিত্রা অসহিষ্ণু হইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

কথাটা সমীরের হয়ত মিথ্যা নহে—শুধু কথা বলার ভঙ্গিটা ওর তেমন সুষ্ঠু নহে। যে বিষয়বস্তু আজকালকার ছবিতে—যে ফ্যাশানের শাড়ী—চুল—অঙ্গসজ্জার চমৎকারিত্ব রূপালী পর্দায় চোখ ধাঁধাইয়া দিতেছে—তাহা হয়তো প্রেক্ষাগৃহেও প্রতিফলিত। ছবি অনুকরণ করিতেছে প্রেক্ষাগৃহকে, কি প্রেক্ষাগৃহ ছবিকে অনুকরণ করিতেছে—সে প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই। সে প্রশ্ন সমীর কোন দিন করে নাই—অনুপমও না। হয়ত দর্শকদের কেহই নয়। জোয়ার-স্ফীত জলের স্রোত তীব্র হইলে ধ্বনিটা তুচ্ছ হইয়া যায়। তবু চোখ আর কান কখনও কখনও একসঙ্গে কাজ করে—মন অন্তরালে লুকাইয়া থাকে।

ছবিটা নাকি ভাল। সুমিত্রা মন্তব্য করিল।

সমীর বলিল, পূর্ব্বরাগের দ্বৈত গান, সিঁড়ি, চায়ের মজলিশ, কানের দুল, সুট আর শাড়ীর বাহার, ড্রয়িং-রুম আর মোটর থাকলেই বাঁচি। এর চেয়ে ভাল বাংলা ছবি আর কি হতে পারে।

দাদা—এটা তোমার বৈঠকখানা নয়।

সমীর বলিল, সেইজন্যই তো চুপি চুপি বলছি।

অনুপম বাবু—আপনি এই সিটটায় সরে বসুন তো।

ভাবছিস—জোরে বলতে ভয় পাব। সমীর হাসিল।

না, লোককে চটিয়েই তোমার আনন্দ।

অনুপম এ পাশে সরিয়া বসিল। উপক্রমণিকায় একটা যুদ্ধের টুকরা ছবি দেখানো হইল। যুদ্ধ প্রচেষ্টার কতকগুলি দৃশ্য—বাজে হাসি-মস্করার চেয়ে ভাল। ডিজনীর মিকি মাউস আজকাল পর্দায় পরিবেশিত হয় না—কার্টুনের ভাঁড়ামিও নয়। যদিও সমীরের মতে কার্টুন বলিতে সব ছবিতেই হাল্কা ভাঁড়ামির রস নাই। যুদ্ধ প্রমোদ-সূচিতেও খানিকটা গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিয়াছে।

অনুপমের মতে—একটা দেখিবার সময়ে আর একটার অভাব তেমন তীব্র বোধ হয় না। যেটা দেখা গেল—সেইটির রস লইয়াই বস্তুর বিচার—অন্যটিকে একক্ষেত্রে টানিয়া তুলনা করা অবান্তর।

সুমিত্রা বলে, ছবি দেখতে বসে ওসব কথা ভাববই বা কি করে। যা চলছে তাই তো সব চেয়ে ভাল। দাদা অত্যন্ত সিনিক—ওর কথা ছেড়ে দিন।

অনুপম হাসিয়া বলে, ছেড়েই দিলাম—কেন না—ওঁর কথার মূল্য থাকলে উনি সেই সিঁড়ি, শাড়ী, চুল আর মোটর দেখতে আসবেন কেন।

তুমিও ভুল করলে অনুপম। দেখতে আসাটার সঙ্গে তুলনাটার অসঙ্গতি কোথায় ? কোথায় আমাদের তথাকথিত গতি বা জীবন—সেও তো কম কৌতূহলের বিষয় নয়।

সে তো দু' চারখানা বই দেখলেই বুঝতে পার।

পারি। আরও দেখতে ইচ্ছা করে যে। বই দেখি—

তার কঠিন সমালোচনা পড়ি, ভাবি পরবর্তী ছবিতে সে দোষ আর থাকবে না।

কতকটা কেটে যায় তো।

কই আর যায়। যাতে নাকি পয়সা আসে তা অপরি-ত্যাজ্য।

এইবার আসল ছবি আরম্ভ হবে।

হোক—চোখ বুজেও আমি তার রস উপভোগ করতে পারব।

কেন, বৈঠকখানায় বসেও তো পারতেন। ওপাশ হইতে চাপা কণ্ঠে কে জবাব দিল।

কে? তিন জনেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে পরস্পরের পানে চাহিল।

আমি—পাশে নয়—পেছনে।

সুমিত্রা মুখ ফিরাইয়া কহিল, গীতা।

নমস্কার অনুপমবাবু।

নমস্কার। কৈ—তখন বললেন না তো—

না, হঠাৎ খেয়াল হলো। বাবা বললেন, দেখে আসি চ। কোথায় তিনি?

লেখক মানুষ—খাতিরই আলাদা। ওপরে নিয়ে গেল।

আপনি কেন গেলেন না?

আপনাদের দেখতে পেলুম যে।

চুপ—ছবি আরম্ভ হয়েছে।

গীতা ঠিক অনুপমের পিছনেই বসিয়াছিল। ওর উষ্ণ নিশ্বাস কাঁধে আসিয়া লাগিতেছে। সেই মৃদু অথচ মিষ্ট সৌরভ হয়ত ওরই প্রসাধনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। পরদায় প্রতিফলিত যেটুকু আলোয় ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে—সে আলোর কাছে পাশের মানুষের মুখচোখ অস্পষ্ট ঠেকিবার কথা নয়। উপভোগের ঔজ্জ্বল্যে খুশীতে দুঃখে—মোট কথা ভাবাবেগে সর্ব্বক্ষণই মানুষ ভাসিতেছে। দৃষ্টিতে তার সেই মনোসংলগ্নতার ছটা।

প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে কোন জগৎ আছে কি? আকাশ আর মাটি, বর্ষা—কিংবা তাপ, কোন ঋতুর অস্তিত্ব? ছায়া-লোকে যে কাহিনী দ্রুত ঘটনাবিস্তারে অগ্রসর হইতেছে—তাহারই মোহে—আচ্ছন্ন জনতা। চক্ষু ও কর্ণের সঙ্গে মনও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভাল লাগছে? অনুপমের কাঁধের কাছে হাত রাখিয়া গীতা প্রশ্ন করিল।

আপনার?

মন্দ কি। আমাদের নতুন সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান খানিকটা পাওয়া যায়।

সবটা নয় কেন?

সবটা তো শেষের কথা। সে আমি ভালবাসি না।

অনুপমের কিন্তু ভালই লাগিতেছে। সমীরের তীব্র মন্তব্য সত্ত্বেও ভাল লাগিতেছে। ছবির আনন্দ—ছবির বিলাস সে কি বাস্তব হইতে পৃথক নহে? ছবির যে দুঃখ সে মনে ঠাঁই পাইলেই তো মুশকিল। ছবির সমাজবাদ-ঘেঁষা বিপ্লবী-সংলাপ বেশ কর্ণরোচক। কর্ণরোচক বলিয়াই করতালির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়। ধনীদের শ্লেষ করিয়া যে বাক্যবাণ—তা ধনী দরিদ্র সমান ভাগেই উপভোগ করে। ধনীরা তরলহাস্যে সেই সংলাপকে সম্বর্দ্ধনা দেয়—গরীবরা হয়ত অক্ষম ঈর্ষার সামান্যতম প্রতিশোধ-গ্রহণ-আনন্দে মাতে। মোট কথা ক্ষণিক বিস্মৃতির মুহূর্ত্তে—ছবিকে কোন শ্রেণীই আসল বলিয়া মনে করে না হয়ত। ছবির অরণ্য যেমন একটুও ভয়ের উদ্রেক করে না—বরং পথভ্রান্ত কোন নায়ক নায়িকার দুঃখের চেয়ে বন-সৌন্দর্য্যে মনকে বেশি করিয়া মগ্ন করে। ব্যাদিতবদন সিংহ, ব্যাঘ্র বা উদ্যতশৃঙ্গ মহিষের রোষদৃপ্ত ভঙ্গিতে আনন্দ তার উপচাইয়া পড়ে। যত দুর্গম ভয়াল ভীষণ দৃশ্যই হউক মন আনন্দে ছুটিয়া চলে সেই দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে। তেমনই ছবির দুঃখ বা সমস্যার গভীর রূপ মনকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণকালীন উপভোগ-মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে—এবং মনেই মিলাইয়া যায়। রাত্রির স্বপ্ন দিনের আলোয় জীয়াইয়া রাখা কঠিন—ছবির জগৎও তেমনই বাহিরের জগতে স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে ছবির সঙ্গে যে স্বপ্নবীজ মনে উপ্ত হয় বাহিরের জগতে তত শীঘ্র তা বিলীন হয় না। অবসর-মুহূর্ত্তে তাকে লালন করা ও কুসুমিত করাই মনের ধর্ম্ম।

ইস্—বইয়ের ট্রিটমেণ্টটা কি চমৎকার। গীতা অনুপমের কাঁধে ঈষৎ চাপ দিয়া মন্তব্য করিল।

ভালই লাগছে।

কেন গান—ঘটনা-সৃষ্টির কৌশল? ডায়ালগ? প্রত্যেক বারেই কাঁধে ঈষৎ ঠেলা দিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে—প্রত্যেক বারেই অনুপম সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেছে। ছবি ভাল লাগিতেছে বলিয়া ওর এই প্রশ্নগুলিতে মনোনিবেশ করা কঠিন। কিন্তু দু'বার দেখা ছবি সম্বন্ধে গীতা ততটা মোহগ্রস্ত নয়। কাহিনী সে জানে। সমালোচনার ভঙ্গিতে—সে নিজে যে রস উপভোগ করিতে চায় অন্যকেও মগ্ন করিতে চায় সেই আনন্দে। ক্রমে ওর প্রশ্নে ও স্পর্শে ছবি ছাড়িয়া অনুপমও আলোচনায় মগ্ন হইল। মায়ামঞ্চে যে জিনিস এত সুন্দর ফুটিতেছে—জীবন-মালঞ্চেও তা অনায়াসে ফুটিতে পারে। ওর শোভা আছে—গন্ধ নাই, এর গন্ধের মধ্য দিয়াই সৌন্দর্য্য কায়ালাভ করিতেছে।

আজকাল ইণ্টারভ্যালে আসল ছবি খণ্ডিত হয় না। কিন্তু অনুপমের মনে হইল আগেকার প্রথাটাই ছিল ভাল। ছবির খানিকটা লইয়া আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাইত এবং অল্প পরিচয়ের রঙটাও সেই অবকাশে গাঢ় হইত।

সুমিত্রা বলিল, ছবি আপনার ভাল লাগছে না বুঝি?

ভালই লাগছে তো।

কই—ছবি আর কতটুকু দেখলেন!

লজ্জিত অনুপম মুখ ফিরাইল।

গীতা বলিল, ছবি দেখার চেয়ে আলোচনায় আন[illegible]

তাই নাকি! সুমিত্রার হাসিমাখা প্রশ্নে অনুপম মাথা নামাইল।

তারপর ছবি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে পরদার দিকেই চাহিয়া রহিল।

সকলের মুখেই পরিতৃপ্তির আভাস। ছবিটা ভাল ভাবেই

উৎরাইয়াছে। কিন্তু এ আলোচনা কতক্ষণ চলিবে? ছবি-ঘরের লনটুকু পার হওয়া পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন ভাবটা থাকে। একটানা বসায় দেহের ক্লান্তি, পর্দায় প্রতিহত আলোয় দৃষ্টির ক্লান্তি—রস-কৌতুকেভরা গল্পের বিষয়বস্তুতে মনের ক্লান্তি—সব মিলাইয়াই এই আচ্ছন্ন ভাবটা। তার পর ট্রামে বাসে অথবা পদচারণায় ছবির ভালমন্দ ও অভিনেতৃবৃন্দের কলা-কুশলতা লইয়া আলোচনা—এবং সে আলোচনা বাড়ির বৈঠকখানা বা অন্তঃপুর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া বড় জোর ঘণ্টাখানেকের মামলা। তারপর স্থূল আহার নিদ্রা আর কর্ম্মের চাপে ছবির ভাল ভাল কথা—বড় বড় সমস্যা—ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৃশ্য—সমস্তই কোথায় তলাইয়া যায়। অর্থহীন ছবি মনোহীন স্মৃতির কুয়াশায় অস্পষ্ট দূর চক্রবালরেখায় একটু মাত্র লাগিয়া থাকে। হয়ত নবতর ফ্যাসানের তাগিদে—হয়ত বাসনা-প্রমত্ত চঞ্চল রক্ত-কণিকায় তার রেশটুকু লাগিয়া থাকে। তার পর—

অনুপমের হাতখানি নরম মুঠায় চাপিয়া গীতা বলিল, কাল আসবেন ত?

কাল?

না হয় আজ সন্ধ্যেবেলা। আপনাদের সাহিত্য-সভা শেষ হ'লে—

অনুপম সহসা উৎফুল্ল হইয়া কহিল, আসব।

হাতখানায় অল্প দোলা দিয়া গীতা মাথা নাড়িল।

সুমিত্রা গীতার পানে চাহিয়া কহিল, সাহিত্য-সভায় যাবে না?

নাঃ। ছবিটা এত ভাল লেগেছে যে তর্কের কচকচি সহ্য হবে না।

তাই নাকি! আমরা কিন্তু আসব—সভা-ফেরত। চা তৈরি থাকে যেন।

আমার সৌভাগ্য। খানিক অগ্রসর হইয়া গীতা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি সাহিত্য-সভায় গেলে তোমরা খুশী হও?

নিশ্চয়ই। কি বলেন অনুপমবাবু?

অন্যমনস্ক অনুপম মাথা নাড়িয়া সে কথা স্বীকার করিতেই সুমিত্রা হাসিয়া উঠিল।

হাসছেন যে।

ভাবছি—ওখান থেকে এসে গীতা কি চায়ের মজলিশ বসাতে চাইবে।

গীতা কহিল, মিনার্ভা গ্রীল রয়েছে কি জন্য! আর সাহিত্য-সভা সরস রাখবার ব্যবস্থাও রীতিমত আছে।

আশ্বস্ত হলাম।

পথ চলিতে চলিতে বলিল, আশ্বস্ত হওয়ার কথা নয় কি?

[illegible] অন্যমনস্কে বলিল, সমীর কোথায় গেল?

[illegible]লেন না—রেখা বোস বোধ করি পাকড়াও করেছেন।

তিনি কে?

এম্পায়ারে ওঁর নাচ দেখেন নি? উদয়শঙ্করের সাকরেদী করেছিলেন দিনকতক। ওঁর নাচে দক্ষিণী মুদ্রার প্রভাব বড় বেশি।

ভাল লাগে না বুঝি?

ওর সঙ্গে গুজরাটি বা মণিপুরী নৃত্যের চালটা মেশালে বেশ মোলায়েম হ'ত। কিন্তু এও ভাল।

আচ্ছা নাচের দেহভঙ্গির মধ্যেই ত মনের কথাটি ফুটিয়ে তোলার অবকাশ আছে।

নাচের মধ্যে আছে একটি কাহিনী। নৃত্যছন্দে সেটির রূপ দেওয়া প্রয়োজন। তাই বলে জিমন্যাসিয়ামকে নৃত্য বলব না। বাইরের চাঞ্চল্য অন্তরের প্রশান্তির সঙ্গে মিশে চোখের দৃষ্টিতে—আঙুলের মুদ্রায়—করের লীলায়িত ভঙ্গিতে বা পায়ের ছন্দে সে সুর ফুটিয়ে তোলে—

উঃ মাগো—,

অনুপম সুমিত্রার হাত ধরিয়া এধারে আনিল।

সুমিত্রা কাতর কণ্ঠে কহিল, আহা! বড্ড লেগেছে মেয়েটির, ওকে কিছু দিয়ে আসি। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, একটা দু'আনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আচ্ছা বলতে পারেন কত দিনে রেজকি-সমস্যা ঘুচবে?

বলা কঠিন।

কিন্তু মেয়েটার বড্ড লেগেছে, খালি কাঁদছে। দু'আনিটা তুলে নিলে বটে—মুখে কিছু বললে না। কিছুদূর আসিয়া কহিল, হাই হীলের চাপটা বড় বেশি। পা কেটে যায়—নয়?

না থেঁতলে যায় হয়ত।

তাই-বা কম কষ্ট কি। আহা! একটু থামিয়া বলিল, এমন পথ-ঘাট শহরের যে, জুতো পায়ে না দিয়ে চলার জো কি!

আপনার দোষ কি। বেরিয়েছেন চোখ-ধাঁধানো আলোর রাজত্ব থেকে, আর ময়লা কাপড় পরে ওরাও শুয়ে থাকে এমন—

সুমিত্রা বলিল, দোষ আমারই। অতঃপর সে নীরবে পথ চলিতে লাগিল। হয়ত বা আত্ম-অনুশোচনায় নীরবেই দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনুপম কহিল, চলুন রেস্তরাঁয় বসে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

ভাল লাগছে না।

না, না, চলুন। পাশের ছোট সুসজ্জিত একটা রেস্তরাঁয় গিয়া বসিল। বহু সুবেশ নরনারী নাতিপ্রশস্ত কক্ষটিতে ভিড় জমাইয়াছে। আলাপের মৃদু গুঞ্জন, পুষ্পসারসৌরভমাখা হাওয়া, রসনালোলুপকারী আহার্য্যের গন্ধ—সবটাতেই মনকে উৎফুল্ল করে। ছোট টেবিল ঘিরিয়া পরদার ব্যবস্থা আছে,—নির্জ্জন আলাপের জন্য কাঠের পার্টিশন দেওয়া কামরাও আছে।

আঃ—আপনি ভারি দুষ্টু।

না, না, পাক করা জিনিসকে অত ভয় কিসের। মাইল্ড ডোজে এক সিপ—

কাচের গ্লাসে ঠুনঠুন করিয়া আওয়াজ হয়—মিঠা হাসির আওয়াজে তা মিশিয়া যায়।

অমিতার বড় অহঙ্কার—আই মীন গরব।

ওরা অ্যারিষ্টোক্র্যাট বলে রীতিমত প্রাউড।

থাকবে না, মিস্ তরফদার—থাকবে না। ও সবকিছুরই

ভিক্টোরিয়ান যুগের—ওল্ড ফসিলরা ও নিয়ে মাথা ঘামাক গে।

কিন্তু সব যুগেই ত প্লুটোক্রাট্দের জয়-জয়কার। তারাই চালায় রাষ্ট্র—তারাই বাধায় যুদ্ধ—তারাই সৃষ্টি করে জন্মভূমির গৌরব।

আমরা তাতে আর ভুলব না। এই যুদ্ধ আমাদের অনেক শিক্ষা দিচ্ছে, আর ভুল হয়ত আমরা করব না।

বিচার ত ভুল করবার পরেই আরম্ভ হয়। ভুলটা যে ভুল এ বোধ জন্মানো কঠিন।

আঃ—পাকটা ভাল হয় নি বুঝি?

চমৎকার। নাচের আসরে রেবাকে দেখেছিলেন কোন দিন? মার্ভেলাস!

চলুন উঠি। কালচার-মাখান ইতর রসিকতা আমি সহ্য করতে পারি না।

বিলটা মিটাইয়া দুজনে পথে নামিয়া আসিল, আজকালকার গ্রীলগুলোয় এইসব সস্তা আলোচনা জমে ভাল।

অনুপম অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। শুষ্ককণ্ঠে কহিল, রেস্তরাঁ আমিও পছন্দ করি না—কিন্তু চা পান করবার—

আমার সন্দেহ হয় ওতে নিজের কতটুকু লাভ।

সুমিত্রার সাময়িক উত্তেজনার হেতু অনুপম বুঝিল না। প্রমোদশালায় ওর এই ভাবের বিতৃষ্ণাবোধ সে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। এও কি সুমিত্রার একটা পোজ? কি জানি সে মনে মনে সুমিত্রার প্রতি বিশেষ প্রীতি বোধ করিল না।

ডাঃ চৌধুরীর বাড়ি একটু দরকার আছে। যদি কিছু মনে না করেন—

বেশ ত—বেশ ত—আমিও হাজরা রোডে অনিলদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।

আসবেন তো?

নিশ্চয়ই।

ক্রমশঃ



ট্রেণের সাথী, রায় বাহাদুর
বিশ্বনাথ ধাপুর
লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে নিলেন
সারা সকাল দুপুর।

গ্রালিন ফেশান
গোঁফ জোড়াটি তাহার,
ঢুলু ঢুলু চোখের
আর চুলের সে কি বাহার!



বি. এ. পাস লীলা রায়
মাষ্টারী করে সে।
সাজ-গোজ নাই তার
বড় সাদাসিধে সে।

মেয়েদের পড়ানো
হয়েছে বাতিক তার,
ট্রেণিং পরীক্ষাটা
দেবে সে যে এইবার।

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

মার্কণ্ডেয় পুরাণে সঙ্গীতের কথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ব্যাস যিনি আঠার পুরাণ রচনা করেছেন(১) তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছেন। বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন তিনি মার্কণ্ডেয়, বৃহদ্ধর্ম, বায়ু ও বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে। এদের ভেতর মার্কণ্ডেয়ে আছে সামান্য ইঙ্গিত, বিষ্ণুধর্মোত্তরের ১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়ে আর বায়ুপুরাণের ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায়ে ও বৃহদ্ধর্মে ১৪শ অধ্যায়ে আছে একটু বিশেষ রকমের আলোচনা। কিন্তু এছাড়া অপরাপর পুরাণেও সঙ্গীতের সামান্য সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতে ও হরিবংশেও সঙ্গীতের কথা আছে, আর রামায়ণে আছে কম।

বেদব্যাস যে সঙ্গীতাচার্য্যদের ভেতরও একজন একথা সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা আবার উল্লেখ করেছেন। যেমন দেখা যায়, ভাবপ্রকাশকার সারদাতনয় বলেছেন:

> "অষ্টাঙ্গমেকং ভরত: দ্বাবষ্টাবিতি কোহল:।
> ব্যাসাঞ্জনেয়গুরব: প্রাহুরঙ্গত্রয়ং যথা॥"

সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব ও সঙ্গীতদর্পণে দামোদরও ব্যাসের নাম উল্লেখ করেছেন।(২)

ব্যাস-প্রণীত পুরাণগুলিতে (৩) সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাদের ভেতর বিশেষ ক'রে মার্কণ্ডেয়, বৃহদ্ধর্ম, বায়ু ও বিষ্ণুধর্মোত্তরে "গান্ধারগ্রাম"-এর উল্লেখ আছে।(৪)

নারদীশিক্ষা ও সঙ্গীতমকরন্দের মত বায়ুপুরাণে আবার অলঙ্কারাদির কথাও বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত কিন্তু গান্ধারগ্রামের কথা উল্লেখমাত্রও করেন নি। তিনি দু' গ্রামের কথাই মাত্র বলেছেন, যেমন: "দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি।"(৫) দত্তিল তবুও দেবলোকের কথা উল্লেখ করেছেন। ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকারদের তো কথাই নাই, তাঁরা গান্ধারগ্রামের কথায় একেবারেই চুপ। কেউ কেউ আবার পৃথিবীর সমাজে একে obsolete ব'লে স্বর্গলোকের কথা উল্লেখ করেছেন—যদিও স্বর্গলোকের অবস্থিতি এখনও ঠিক ঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি। এদিক দিয়ে পুরাণকারের উল্লেখ স্পষ্ট। তিনি গন্ধর্ব্বদের বিশেষ ক'রে হাহা, হুহু, তুম্বুরু ও নারদ প্রভৃতিকে "ষড়্জমধ্যম গান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদা:" বলেছেন। গন্ধর্ব্বদের বাড়ী ছিল নাকি গান্ধার দেশে (কান্দাহার) আর গান্ধারগ্রামের আদি প্রচলনও ছিল ওখানেই। কাজেই ষড়জ ও মধ্যম ছাড়াও গান্ধারগ্রাম যে গন্ধর্ব্বদের প্রিয় ছিল একথা অনুমান করা অবশ্যই যেতে পারে। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য ও তার টীকাকারদেরও অনেকে দেখেছি এরকম কথাই বলে গেছেন।

পুরাণগুলির ভেতর শুধু সঙ্গীতের কেন, অনেক কিছু জিনিষের মালমশলাই প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, পুরাণ old ও obsolete-এই অজুহাত দেখিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এদের আলোচনা থেকে আমরা এক রকম সরেই দাঁড়িয়েছি। বৈদিক সভ্যতা ও ইতিহাসের অনেক কথাই বোধ হয় যোগসূত্রের আকারে এগুলিতে পাওয়া যেতে পারে। যাহোক মার্কণ্ডেয় পুরাণে সঙ্গীত সম্বন্ধে যতটুকু আছে তার আলোচনাই আমরা এ প্রবন্ধে করব।

মার্কণ্ডেয়ে যে সঙ্গীতের উল্লেখ আছে তা হ'ল নাগরাজ অশ্বতর, তাঁর ভাই কম্বল ও দেবী সরস্বতীর(৬) উপাখ্যানকে অবলম্বন ক'রে। এই অশ্বতর ও কম্বলের নাম সঙ্গীতগ্রন্থে ও মহাভারতেও উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে (১২১০-১২৪৭ খ্রী:) "অশ্বতরগুপ্ত" (১।১৬) ব'লে উল্লেখ করেছেন। দামোদরের সঙ্গীতদর্পণেও তাই। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৩৫ অ° ১০ শ্লোক°) বলা হয়েছে: "কম্বলাশ্বতরৌ চাপি নাগ: কালীয়কস্তথা।" রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব আবার নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের ছাড়াও ভিন্ন একটি মত উল্লেখ করবার সময়ে কম্বল ও অশ্বতরের নামোল্লেখ করেছেন, যেমন: "এতদন্যমুনিগাস্বাহু: কম্বলাশ্বতরাদয়:। অন্যদ্বিশ্রুতিকে রাগভাষাদাবপি তন্মতম্।"(৭) এ থেকে বোঝা যায় যে, কম্বল ও অশ্বতর

(১) ব্যাস যিনি চার বেদের বিভাগ করেছেন তিনিই যে পুরাণগুলির রচয়িতা এসম্বন্ধে পণ্ডিতদের ভেতর যথেষ্ট মতভেদ আছে। বেদ ও পুরাণের ব্যবধানে ভাষা ও ছন্দের পরিবর্ত্তন যথেষ্ট ঘটেছে। ঐতিহাসিকদের সন্দেহ এজন্য এখনও ঠিক সমানভাবেই রয়েছে।

(২) ঐ ঠিক একই প্রশ্ন। বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসই যে শার্ঙ্গদেব ও দামোদরের উল্লিখিত সঙ্গীতশাস্ত্রের রচয়িতা ব্যাস [illegible] মীমাংসা এখনো হয় নি।

(৩) শার্ঙ্গদেব ও সারদাতনয় এঁরা ব্যাসের সঙ্গীতগ্রন্থের অস্তিত্বের কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন—তা তিনি যে ব্যাসই হোন।

(৪) মহাভারত ও হরিবংশেও কিন্তু গান্ধারগ্রামের কথা উল্লেখ আছে। সে সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করব।

(৫) নাট্যশাস্ত্র (কাশী° স°) ২৮।২২ দ্র°

(৬) দেবী সরস্বতীর কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করবার আমাদের ইচ্ছা রইল। মকরন্দকার ও শার্ঙ্গদেব যদিও উল্লেখ করেছেন: "সামগীতিরতো ব্রহ্মা বীণাসক্তা সরস্বতী।" তবু বিকাশবাদী ঐতিহাসিকরা কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ছাড়বেন না যে, কেমন ক'রে সেই বৈদিক যজ্ঞের 'সোম'—ওম্, ইড়া, স্বাহা, স্বধা, গায়ত্রী, বাক্ প্রভৃতির ক্রমসোপান দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে একেবারে 'বীণাপুস্তকধারিণী' দেবী সরস্বতীতে পরিণত হলেন। এর ইতিহাস অবশ্য চমকপ্রদই বটে। ঋগ্বেদে যদিও সরস্বতীকে জায়গায় জায়গায় নদী ব'লেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বেশীর ভাগই সে কথায় সায় দিয়ে গেছেন তাহলেও একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, সরস্বতী দেবীর বিকাশের শেষ পরিণতি কিন্তু অন্তত: নদী নয়, ভারতীয় দৃষ্টভঙ্গীতে রূপ তার ভিন্ন।

(৭) সঙ্গীতরত্নাকর ১।৭।২২

দু'জনেরই সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ অবশ্যই ছিল, তা না হলে শার্ঙ্গদেব কখনো "তন্মতম্" অর্থাৎ "ভরতাদীনাং সম্মতং" ব'লেও কম্বল ও অশ্বতরের মত নজির হিসাবে উল্লেখ করতে পারতেন না। তারপর একথাও সত্য যে, কোহল ও দত্তিলের নাম এবং নারদ ও তুম্বুরুর নাম যেমন এক সঙ্গেই প্রায় দেখা যায়, অশ্বতর ও কম্বলের নামও তেমন 'বৃদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য' হিসাবে একসঙ্গেই অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়ে থাকে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের উপাখ্যানটি হ'ল : নাগরাজ অশ্বতর কঠোর তপস্যা ক'রে দেবী সরস্বতীকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। দেবীও তুষ্টা হয়ে অশ্বতরকে বর দিতে চাইলেন এই ব'লে :—"এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জিহ্বা সরস্বতী।" সরস্বতীর স্বরূপ পুরাণকার বিষ্ণুর জিহ্বারূপিণী ব'লে উল্লেখ করেছেন। এখানে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে পুরাণকারের বর্ত্তমানের যোগসূত্র রাখবার আকূতিকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না।(৮)

দেবী সরস্বতী বললেন :

"বরং তে কম্বলভ্রাতঃ প্রযচ্ছাম্যুরগাধিপ।
তদুচ্যতাং প্রদাস্যামি যৎ তে মনসি বর্ত্ততে॥"

হে নাগরাজ অশ্বতর, আমি তোমায় বর দেব। তোমার অভিরুচি অনুসারে যে বর প্রার্থনা করবে আমি তোমায় সে বরই দান করব। অশ্বতর দেবীর কথা শুনে উত্তর করলেন :

"সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্ব্বং কম্বলমেব মে।
সমস্তস্বরসম্বন্ধমুভয়োঃ সম্প্রযচ্ছ চ॥"(৯)

হে দেবি, প্রথমে ভাই কম্বলকে আমার সহায়রূপে নিয়োজিত করুন, তারপর আমাদের দু'জনকেই সমস্ত স্বরজ্ঞান দান করবেন।

দেবী সরস্বতী নাগরাজের কথা শুনে বললেন—তথাস্তু, তাই হবে। তারপর অশ্বতর ও কম্বলকে তিনি বর দিলেন এই ব'লে,

"সপ্তস্বরাঃ গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম।
গীতকানি স সপ্তৈব তাবতীশ্চাপি(১০) মূর্চ্ছনাঃ॥
তালাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ(১১) তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ভবান্ গাতা(১২) কম্বলশ্চ তথানঘ॥(১৩)
জ্ঞাস্যসে মৎপ্রসাদেন ভুজগেন্দ্রাপরং তথা।
চতুর্ব্বিধং পদং(১৪) তালং(১৫) ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্॥
যতিত্রয়ং(১৬) তথা তোদ্যং(১৭) ময়া দত্তং চতুর্ব্বিধং।

* * * *

তস্যাভ্যন্তরগতমায়ত্তং স্বরব্যঞ্জনসম্মিতং।(১৮)
তদাশেষং ময়া দত্তং ভবতঃ কম্বলস্য চ॥"

হে নাগশ্রেষ্ঠ, তোমরা উভয়েই সাত স্বর, সাত গ্রামরাগ(১৯), সাত রকমের গীতি(২০), সাত মূর্চ্ছনা(২১), একোনপঞ্চাশ তান, তিনগ্রাম—এ সমস্ত আয়ত্ত করতে পারবে। চার রকমের পদ, তিন তাল, তিন লয়, তিন যতি ও বার শ্রেণীর তোদ্য তোমাদের দিলাম। আমার প্রসাদে এ সকল ও এদের

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার যে, দেবী স্বর ও ব্যঞ্জন বিভাগ, গ্রামরাগ, মূর্চ্ছনা, তিনগ্রাম, ইত্যাদি সব কথাই বললেন, কিন্তু বৈদিক উদাত্তাদি স্বরত্রয় বা তার পরেরও প্রথমাদি সপ্ত স্বরের কথা কিছু উল্লেখ করেন নি। পৌরাণিক যুগে বৈদিক স্বর যে লোপ পেয়েছিল এটা তারই ইঙ্গিত মাত্র। অথচ বেদের সোমহরণের প্রসঙ্গে এটাই প্রকাশ পায় যে, দেবী সরস্বতী গন্ধর্ব্বদের দেবলোকের স্বরসামগ্রীই দান করেছিলেন, অথচ গন্ধর্ব্বদের তথা মনুষ্যসমাজ থেকে বৈদিকরীতি কিভাবে লুপ্ত হয়ে গেল একথাই বিশেষ ক'রে ভাববার বিষয়।

---

(৮) বিষ্ণু হলেন বৈদিক আদিত্য। পরে যজ্ঞের অগ্নিরূপে তিনি আবির্ভূত হলেন নাম ও রূপের সামান্য পরিবর্ত্তন নিয়ে। দেবী সরস্বতী যজ্ঞের অগ্নিশিখারই যে প্রতিমূর্ত্তি এ নিয়েও ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আমাদের ইচ্ছা রইল।

(৯) এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সরস্বতী স্বরশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য স্বর, গীত বা গান্ধর্ব্বগানের সঙ্গে দেবী সরস্বতীকে কেন সংযুক্ত করা হ'ল ব্রাহ্মণগ্রন্থে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.২.৪.২-৭ দ্রষ্টব্য।

(১০) পাঠভেদ—'ভাবত্যশ্চাপি।'

(১১) ঐ —'তানাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ।'

(১২) ঐ —'বেত্তা'

(১৩) ঐ —'কম্বলশ্চৈব তেঽনঘ।'

(১৪) ঐ —'পরং।'

(১৫) ঐ —'কালং।'

(১৬) ঐ —'গীতত্রয়ং।'

(১৭) ঐ —'কালং।'

(১৮) ঐ —'স্বরব্যঞ্জনয়োশ্চ যৎ।'

(১৯) গ্রামরাগ পাঁচ রকমের একথা সঙ্গীতরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে : 'পঞ্চধা গ্রামরাগাঃ স্যুঃ।"

(২০) 'গীতয়ঃ পঞ্চ শুদ্ধাদ্যা ভিন্না গৌড়ী চ বেসরা। সাধারণীতিঃ।' রত্নাকর গীতি পাঁচ রকমের বলেছেন, যেমন—শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণ। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ কিন্তু বলেছেন : 'সপ্ত গীতির্মনোহরাঃ।' বৃহদ্দেশীকারের মতে সাত রকমের গীতি হ'ল—শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা।। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য যাষ্টিক আবার তা স্বীকার করেন না। দুর্গাশক্তির মতে—'গীতয়ঃ পঞ্চ,' যেমন—শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়া ও সাধারিতা। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ও দত্তিল কিন্তু বলেছেন গীতি চার রকমেরই, যেমন—মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা। এগুলি সম্পূর্ণ গানের রীতিই বলা যায়। যাষ্টিকের মতে 'তিস্রস্তু গীতয়ঃ,'—ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষিকা। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য শার্ঙ্গলের মতে গীতি মাত্র একটি এবং তা ভাষাগীতি। এরকম মত-[illegible] আর অন্ত নাই।

(২১) 'গ্রাম ভেদে মূর্চ্ছনা ভিন্ন ভিন্ন। নারদীশিক্ষা ও সঙ্গীতমকরন্দে ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার—এ তিন গ্রামেই সাতটি ক'রে মূর্চ্ছনার কথা বলা আছে। দত্তিল ও ভরত মাত্র ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনার কথা বলেছেন, গান্ধারগ্রামের মূর্চ্ছনার কোন উল্লেখই করেন নি। সঙ্গীতমকরন্দে মূর্চ্ছনার নাম ১।৫৭-৫৯ দ্রষ্টব্য।

অন্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জনযুক্ত আর যা-কিছু আছে তাও তোমরা দুজনে জানতে পারবে। আমি তোমাকে ও কম্বলকে সমস্তই দান করলাম।

এ প্রসঙ্গস্থলে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির ভেতর কোথাও 'সঙ্গীত' শব্দটি কিন্তু পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই বলা হয়েছে 'গীত', 'গীতি' বা 'গান্ধর্ব্ব।' ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বা দত্তিলেও তাই। কিন্তু তাহলেও নাট্যশাস্ত্রের ভেতরই এর বীজ নিহিত আছে এটা বেশ বোঝা যায়। কেননা ভরত যখন বলেছেন: "এবং গানং চ নাট্যং চ বাদ্যং চ বিবিধা শ্রয়ম্,"(২২) বা গান্ধর্ব্বের পরিচয় দিতে গিয়ে যখন তিনি উল্লেখ করেছেন: "গান্ধর্ব্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্,"(২৩) তখন পরবর্ত্তী সময়ের নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয় 'সঙ্গীত'-এর রূপ যে ক্রমশই ঘনীভূত হয়ে উঠছিল একথা বুঝতে আর বিলম্ব হয় না।

এখানে "তন্ত্রীলয়সমন্বিতৌ"—তন্ত্রী শব্দের উল্লেখও পাওয়া যায়। তা ছাড়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১০৬-তম অধ্যায়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে আরো কিছু বলা হয়েছে। যেমন,

"ততো হাহাহুহুশ্চৈব নারদস্তুম্বুরু স্তথা।(২৪)
উপগায়িতুমারব্ধা গান্ধর্ব্বকুশলা রবিম্॥
ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ।
মূর্চ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সপ্রয়োগৈঃ সুখপ্রদম্॥
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্ব্বশ্যথ তিলোত্তমা।
মেনকা সহজন্যা চ রম্ভাশ্চাপ্সরসাং বরাঃ॥
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ।
হাবভাববিলাসাঢ্যান্ কুর্ব্বন্তোঽভিনয়ান্ বহুন্॥
প্রাবাদ্যন্ত ততস্তত্র বেণুবীণাদিদর্দ্দরা।(২৫)
পণবাঃ পুষ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ।
দেবদুন্দুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
গায়দ্ভিশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
তূর্য্যবাদিত্রঘোষৈশ্চ সর্ব্বং কোলাহলীকৃতম্॥"

মার্কণ্ডেয় মুনির এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, হাহা, হুহু, তুম্বুরু ও নারদ—এঁরা গন্ধর্ব্ব ছিলেন। মহাভারতের উল্লেখও তাই। তবে নারদ অধিকাংশ স্থলেই মুনি বা ঋষি ব'লেই অভিহিত হয়েছেন। এখানে ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার—এ তিন গ্রামের স্পষ্ট উল্লেখও আছে। মূর্চ্ছনা ও তালের কথা ২৩শ অধ্যায়েই বলা হয়েছে। তা ছাড়া পুরাণের যুগে যে নৃত্য ও বিভিন্ন রকমের তার ও তাঁতের বাদ্য প্রচলিত ছিল এ কথারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, সহজন্যা ও রম্ভা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা অপ্সরারা হাব ও ভাব সহকারে অভিনয় সম্বন্ধেও বিশেষ কুশলা ছিল—"কুর্ব্বন্তোঽভিনয়ান্ বহুন্।" নাট্যের রূপ তখন সুপরিস্ফুটই ছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে তিলোত্তমা সকলে কশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী কপিলার কন্যা এবং এদের সেখানে নাম করা হয়েছে—অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই তের জনের(২৬)। কূর্ম্মপুরাণে আছে যে, তিলোত্তমা এরা নৃত্যগীত দিয়ে সূর্য্যের অর্চ্চনা করত। যাহোক, পুরাণের যুগেও যে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের কোন অভাব ছিল না এটাই হ'ল পুরাণকারের বোঝাবার উদ্দেশ্য। বেণু, বীণা, দর্দ্দর, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ ও দেবদুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের প্রচলনও তখন বিশেষভাবেই ছিল।

(২২) নাট্যশাস্ত্র ২৮।৭

(২৩) নাট্যশাস্ত্র ২৮।৮

এ ছাড়া নাট্যশাস্ত্রে ২৭ অধ্যায়ের ৬৮, ৮০, ৯১, ৯৮ শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য।

(২৪) মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৬৫ শ্লোক) আছে যে, কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী কপিলা থেকে অতিবাহু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু—এঁরা সব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তুম্বুরুকে আবার গন্ধর্ব্বরাজ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণও (অযোধ্যাকাণ্ড ৪৬ শ্লোক) দ্রষ্টব্য।

(২৫) পাঠভেদ—'দর্দ্দরাঃ।'

(২৬) রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৪৫-৪৭) দেখা যায়, মুনি ভরদ্বাজের ইঙ্গিতে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরারা নৃত্য করছেন। ১৭ শ্লোকে, বিশ্বাচী এদের নামও করা হয়েছে।

আদিগ্রন্থ

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]হেব' বা 'আদিগ্রন্থ' শিখ সম্প্রদায়ের সুপরিচিত ধর্ম্মগ্রন্থ। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। বাংলা ভাষায় গ্রন্থসাহেবের অনুবাদ নাই, তাই বাঙালী এই মহাগ্রন্থে সঞ্চিত মধুর ভক্তিরস পানে বিমুখ। ইংরেজীতে গ্রন্থসাহেবের দুইটি অনুবাদ আছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষাসমূহের অধ্যাপক ডক্টর আর্নেষ্ট ট্রাম্প ভারত-সচিবের পৃষ্ঠপোষকতায় আদিগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে আগমন করেন এবং কয়েকজন শিখ গ্রন্থীর সহায়তা গ্রহণ করেন। অনুবাদ-কার্য্যে এবং ভূমিকা-রচনায় এই জার্ম্মান পণ্ডিত অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আদিগ্রন্থের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি ভূমিকায় বলিয়াছেন যে গ্রন্থখ

"incoherent and shallow in the extreme, and couched at the same time in dark and perplexing language, in order to cover these defects."

এই মন্তব্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তিনি শিখদের ধর্ম্ম-তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মেকলিফ সত্যই বলিয়াছেন যে ট্রাম্প সুযোগ পাইলেই শিখগুরুগণের এবং শিখ ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মতত্ত্ব অপেক্ষা ভাষা-তত্ত্বের প্রতিই ট্রাম্পের বেশী আকর্ষণ ছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে,

"The chief importance of the Sikh Granth lies in the linguistic line, as being the treasury of old Hindui dialects."

ট্রাম্পের গ্রন্থ প্রকাশের বহুদিন পরে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্স আর্থার মেকলিফ প্রণীত The Sikh Religion নামক ছয়খণ্ডে বিভক্ত বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মেকলিফ শিখগুরুগণের জীবনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আদিগ্রন্থ ও শিখধর্ম্ম সংক্রান্ত অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থের (যথা—গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রণীত 'বচিত্র নাটক') অনুবাদ করিয়াছেন। ট্রাম্পের অনুবাদ অপেক্ষা মেকলিফের অনুবাদ অনেক বেশী মূল্যবান। মেকলিফ শিখ গ্রন্থীগণের সহায়তায় অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি ট্রাম্পের ন্যায় শিখ ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে মেকলিফের গ্রন্থ শিখ সম্প্রদায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত। সম্ভবতঃ সেইজন্যই তিনি সকল ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। শিখগুরুগণের জীবনী বর্ণনায় মেকলিফ বহু অনৈতিহাসিক এবং অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের সময়েই গুরু নানকের রচিত বাণীসমূহের সংগ্রহকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তৃতীয় গুরু অমর দাসের সময়ে এই কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হয়। কথিত আছে, গুরু অর্জ্জুন যখন আদিগ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন তখন গুরু অমর দাসের পুত্র মোহন প্রথম তিন গুরুর রচিত বাণীসমূহ তাঁহাকে প্রদান করেন। মোহনের পুত্র সন্তরাম অমর দাসের বাণীসমূহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, গুরু অর্জ্জুনের নায়কত্বেই যে আদিগ্রন্থের সঙ্কলন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রকৃত নাম 'গ্রন্থসাহেব', কিন্তু 'দশম পাদশাহ্ কা গ্রন্থ' (অর্থাৎ গুরু গোবিন্দ সিংহের রচিত গ্রন্থ) হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহা 'আদিগ্রন্থ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গুরু অর্জ্জুনের মৃত্যুর বহুদিন পরে নবম গুরু তেগ বাহাদুর এবং দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের রচনা আদিগ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছিল।

আদিগ্রন্থের প্রথম অংশ 'জপজী' গুরু নানকের রচিত। ইহাকে 'জপ' এবং 'গুরুমন্ত্র'ও বলা হয়। ইহাতে চল্লিশটি শ্লোক বা 'পৌরী' আছে। ধর্ম্মপ্রাণ শিখগণ প্রত্যহ প্রভাতে ইহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। 'জপজী' প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত। প্রবাদ আছে যে প্রশ্নকর্তা গুরু অঙ্গদ এবং উত্তরদাতা গুরু নানক।

আদিগ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ 'সো দার' সান্ধ্য উপাসনায় আবৃত্তি করা হয়। ইহাও গুরু নানক কর্তৃক রচিত; কিন্তু গুরু রামদাস, গুরু অর্জ্জুন এবং সম্ভবতঃ গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত কয়েকটি পংক্তি ইহাতে সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা প্রকৃত-পক্ষে 'রাগ আসা' এবং 'রাগ গুজরী' হইতে সঙ্কলন মাত্র।

আদিগ্রন্থের তৃতীয় অংশ 'সো পুরখ'। ইহা 'রাগ আসা' হইতে সঙ্কলিত।

আদিগ্রন্থের চতুর্থ অংশ 'সোহিলা'। ইহা 'রাগ গউড়ী', 'রাগ আসা' এবং 'রাগ ধনাসরী' হইতে সঙ্কলিত। ইহা রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে উপাসনায় ব্যবহৃত হয়। ইহাও গুরু নানক কর্তৃক রচিত; কিন্তু গুরু রামদাস, গুরু অর্জ্জুন এবং সম্ভবতঃ গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত কয়েকটি পংক্তি ইহাতে সংযোজিত হইয়াছিল।

আদিগ্রন্থের পঞ্চম অংশ একত্রিশটি 'রাগ'—রাগ সিরী, রাগ মাঝ, রাগ গউড়ী, রাগ আসা, রাগ গুজরী, রাগ দেবগন্ধারী, রাগ বিহাগ্রা, রাগ বড়হংস, রাগ সোরঠি, রাগ ধনাসরী, রাগ জৈতসিরী, রাগ তোড়ী, রাগ বৈরাড়ী, রাগ তিলঙ্গ, রাগ সুহী, রাগ বিলাবল্, রাগ গৌড়, রাগ রামকলী, রাগ নটনারায়ণ, রাগ মালীগউড়া, রাগ মারু, রাগ তুখারী, রাগ কেদারা, রাগ ভৈরঁ, রাগ বসন্ত, রাগ সারঙ্গ, রাগ মলার, রাগ কানরা, রাগ কলিয়ান, রাগ প্রভাতী, রাগ জৈজয়ন্তী। প্রায় প্রত্যেক রাগেই একাধিক গুরু ও 'ভগত' বা ভক্তের রচনা আছে। দশ জন গুরুর মধ্যে মাত্র সাত জনের রচনা আদিগ্রন্থে পাওয়া যায়—নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুন, তেগ বাহাদুর, গুরু গোবিন্দ সিংহ। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরুর (হরগোবিন্দ, হর রায়, হরকিষণ) রচনা গ্রন্থসাহেবে নাই। গুরু হরকিষণ মাত্র আট বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সম্ভবতঃ ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করা সম্ভব হয় নাই। ষষ্ঠ ও সপ্তম গুরুর রচিত কোন বাণী বা সঙ্গীত আদিগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

শিখগুরু এবং শিখ ভক্তগণের রচিত ধর্ম্মসঙ্গীত এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক বাণী গ্রন্থসাহেবের প্রধান উপজীব্য, কিন্তু শিখ সম্প্র-দায়ের বহির্ভূত পঞ্চদশজন* খ্যাতনামা ভক্তের বাণীও ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। শিখ ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতার বা প্রাদেশি-কতার স্থান ছিল না। গুরু অর্জ্জুন জানিতেন যে ভক্তের চরম পরিচয় ভক্তিতে, তাই তিনি ভক্তবাণী সংগ্রহে স্থানকালপাত্র উপেক্ষা করিয়া ভক্তিকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। যে পঞ্চদশ ভক্তের বাণী তিনি সাদরে গ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই জন মুসলমান। তাঁহাদের নাম সেখ ফরিদ ও সেখ ভিখন। বাঙালী ভক্তদের মধ্যে জয়দেবের দুইটি বাণী গ্রন্থসাহেবে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই দুইটি বাণী লক্ষ্মণসেনের সভাসদ, গীতগোবিন্দের অমর কবি জয়দে[illegible]রচনা নহে, জয়দেব নামধারী অপর কোন ভক্তের রচনা। ম[illegible] ভারতব্যাপী ধর্ম্মান্দোলনের আদি পুরোহিত ছিলেন রামানন্দ।

* আমি মেকলিফের অনুসরণ করিয়াছি। কানিংহাম উনিশ জন এবং ট্রাম্প চৌদ্দ জন ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থসাহেবের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় এইরূপ মতভেদের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাঁহার রচনাও গ্রন্থসাহেবে স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। কবীরের শত শত দোঁহা গ্রন্থসাহেবে পাওয়া যায়। কবীর ব্যতীত রামানন্দের আরও চারি জন শিষ্যের রচিত বাণী গ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধন্না ছিলেন জাঠ, রাজপুতানার অধিবাসী। পীপা মধ্য ভারতের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। সঈন রেওয়ার রাজদরবারে ক্ষৌরকারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রুইদাস ছিলেন চর্ম্মকার। মারাঠী সাধু নামদেবের রচিত কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্গীত গ্রন্থসাহেবে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও দুইজন মারাঠী ভক্তের বাণী গ্রন্থসাহেবে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম ত্রিলোচন ও পরমানন্দ। ইঁহারা সকলেই মহারাষ্ট্রের ভক্তিকেন্দ্র পন্ধরপুরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সধনা নামক সিন্ধুদেশবাসী এক ভক্তের বাণী গ্রন্থসাহেবে পাওয়া যায়। তিনি কসাই ছিলেন—মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বেণী নামক অপর এক ভক্তের বাণী গ্রন্থসাহেবে স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। গ্রন্থসাহেবে সুরদাস নামক যে ভক্তের বাণী পাওয়া যায় তিনি প্রসিদ্ধ অন্ধ কবি সুরদাস নহেন; তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক, জাতিতে ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন প্রদেশবাসী বিভিন্ন জাতীয় ভক্তগণের বাণী গ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গুরু অর্জ্জুন শিখধর্ম্মকে এক উদার সর্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।

আদিগ্রন্থের ষষ্ঠ অংশের নাম 'ভোগ' বা সমাপ্তি। ইহাতে কয়েকজন শিখ গুরুর রচনা ব্যতীত কবীর, সেখ ফরিদ এবং কয়েকজন শিখ ভক্তের রচনা আছে। শিখ ভক্তগণ বিভিন্ন গুরুর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। 'ভোগ' অংশে গুরু নানক এবং গুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে বলিয়া কানিংহাম মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রাম্প বলিয়াছেন যে এই শ্লোকগুলি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতে রচিত নহে—গুরু নানক এবং গুরু অর্জ্জুন সংস্কৃত জানিতেন না। গ্রন্থসাহেবের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ভোগের পর 'ভোগ কা বাণী' নামক আর একটি অংশ পাওয়া যায়।

আদিগ্রন্থ একজন লেখক কর্ত্তৃক একই সময়ে রচিত হয় নাই—ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন লেখক কর্ত্তৃক রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতের সঙ্কলন মাত্র। সুতরাং ইহার বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত ভাষার প্রকৃতি বিভিন্ন। গ্রন্থসাহেবে যাঁহাদের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ নামদেবই প্রাচীনতম। তিনি ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। জয়দেব যদি প্রকৃতই গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব হন তবে তিনি নামদেব অপেক্ষাও প্রাচীনতর। রামানন্দ ও তাঁহার কবীর প্রভৃতি [illegible] রচনায় উত্তর-ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষার তৎকালীন রূপ পাওয়া যায়। নানক প্রভৃতি শিখগুরুগণও পঞ্জাবের কথ্যভাষা ব্যবহার না করিয়া উত্তর ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। কানিংহাম বলিয়াছেন,

"The language used is rather the Hindee of Upper India generally, than the particular dialect of the Punjab."

ট্রাম্প বলিয়াছেন,

". . . Nanak and his successors employed in their writings purposely the Hindui idiom, following the example of Kabir and the other Bhagats, who had raised the Hindui to a kind of standard for religious compositions, and by employing which they could make themselves understood to nearly all the devotees of India, whereas the proper Panjabi was only intelligible to the people of the Panjab."

আদিগ্রন্থ পদ্যে রচিত। ইহাতে নানাপ্রকার ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। দুপদা, চৌপদা এবং অষ্টপদী ছন্দঃই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

"দশম পাদশাহ্ কা গ্রন্থ" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শিখেরা গুরুকে 'সাচ্চা পাদশাহ্' বলিত। এই জন্যই গুরু গোবিন্দ সিংহ 'দশম পাদশাহ্' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামে পরিচিত গ্রন্থের সকল অংশ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রচিত নহে। গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশও আদি গ্রন্থের প্রথম অংশের ন্যায় 'জপজী' নামে অভিহিত। ইহা গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক রচিত, এবং গুরু নানকের রচিত 'জপজী'র ন্যায় ইহা ধর্ম্মনিষ্ঠ শিখগণ প্রভাতে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ 'অকাল স্তুতি' (ঈশ্বরের স্তুতি) নামে পরিচিত। ইহাও গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক রচিত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশ 'বচিত্র নাটক'। ইহা গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকে গুরুর আত্মজীবনীর এক অংশরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা চতুর্দ্দশটি শাখায় বিভক্ত। সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শাখা পর্য্যন্ত গুরু গোবিন্দের যুদ্ধসমূহের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। গুরু গোবিন্দের জীবনী রচনার জন্য 'বচিত্র নাটকে'র ন্যায় মূল্যবান সমসাময়িক উপাদান আর নাই। মেকলিফের গ্রন্থে ইহার আংশিক অনুবাদ আছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ঐতিহাসিক অংশের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।*

"দশম পাদশাহ্ কা গ্রন্থের" চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে চণ্ডীচরিত্র ও চণ্ডী কর্ত্তৃক দৈত্যবধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ নানাবিধ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। শেষাংশে দ্বাদশটি কাহিনী ফারসী ভাষায় রচিত, কিন্তু গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে আদিগ্রন্থের ন্যায় উত্তর-ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

* *B. C. Law Volume*, Part I.

রেড ক্রশ ও গৃহ-প্রত্যাগত মার্কিন সৈন্যগণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য প্রত্যেক দেশেই আবার নূতন প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। এবারকার মারণ-যজ্ঞে ধ্বংসকার্য্য হইয়াছে যেরূপ বিপুল, জগতের বিভিন্ন দেশের লোকও ইহাতে লাগিয়াছে বিস্তর। বিভিন্ন রণক্ষেত্রে কত লোক আত্মাহুতি দিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশের সময় হয়ত এখনও আসে নাই। কিন্তু যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছে,



একজন রুগ্ন সৈনিককে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক কার্ড তৈরী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে

বিকলাঙ্গ হইয়া বা অক্ষত দেহে প্রত্যাগত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা অগণিত। প্রতিটি দেশে তাহাদের জন্য নানারূপ ব্যবস্থার আয়োজন চলিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু বিষয়েই অগ্রণী। সেখানকার সরকার এই দিকে বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন। কি করিয়া রণক্লান্ত বি ·াঙ্গ সৈনিকদের পুনরায় গৃহধর্ম্মে ফিরাইয়া আনা যা· তাহাই হইল সমস্যা।

যাহারা মহাসমরে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে শান্তি সময়ে তাহাদিগকে সমাজের সেবায় কিরূপে লাগানো যাইতে পারে মার্কিন অর্থনীতিবিদ্‌গণ, সামরিক ও বে-সাম[illegible]ক চিকিৎসকগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই বিষয়ে চিন্তা [illegible]তে-ছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কি কি উপায় অবলম্বনে[illegible] আয়োজন করিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ভারতবাসীরাও তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে নিজ কর্ত্তব্য সাধনের নির্দ্দেশ পাইতে পারেন।

উক্ত কার্য্যের একটি অঙ্গ মার্কিন রেড ক্রশ সৃষ্ট বিশেষ 'ভলানটিয়ার রিক্রিয়েশন ইউনিট'। রণক্লান্ত ও দীর্ঘকাল পীড়িত সৈনিকদের ক্লেশ, জড়তা লাঘব কল্পে এই ইউনিটটি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় সামরিক হাসপাতালের স্বেচ্ছাসেবকগণ সদ্য-রোগমুক্ত সৈনিকদের কতকগুলি বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন।

শিল্পী ও কারিগরশ্রেণীর মধ্য হইতেই এই স্বেচ্ছাসেবকগণ অর্থাৎ রেড ক্রশ নিয়োজিত শিক্ষকগণ গৃহীত। তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা করিয়া উক্ত ব্যক্তিদের বিবিধ বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা দিতেছেন।



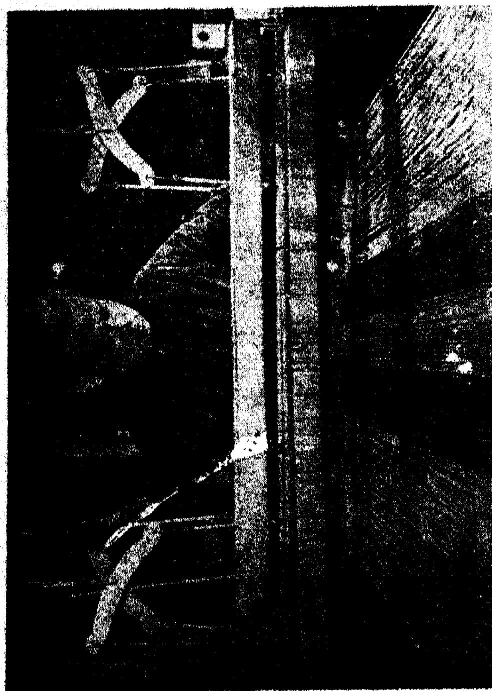
চা-দানী নির্ম্মাণে লিপ্ত মার্কিন সেনানী

মার্কিন রেড ক্রশের প্রথম রিক্রিয়েশন ইউনিটের কার্য্য পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ হয় নিউ ইয়র্কের একটি [illegible]তালে যুদ্ধ শেষ হইবার বহু পূর্ব্বে। বিভিন্ন বিভাগের পঞ্চাশ জন শিল্পী ও কারিগর শিক্ষাদান-কার্য্যে নিয়োজিত হন। পূর্ব্বেকার মার্কিন সামরিক হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা ও শারীর সংক্রান্ত কার্য্যের সঙ্গে ইদানীন্তন কার্য্যের মিল নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমানে যে কার্য্যসূচী অনুসৃত হইতেছে তাহাতে মনের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়া থাকে। হাসপাতালের ব্যাধিমুক্ত



সামরিক হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবিকা সৈনিককে সূচীকর্ম শিক্ষা দিতেছেন





বয়ন-রত সৈনিক



সৈনিকদের রিক্রিয়েশন ইউনিট ক্লাসে যোগ দিতে সাক্ষাৎভাবে অনুরোধ করা হয় না ; তাহাদিগকে একথা বলাও হয় না যে, ক্লাসে যে-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিবে। তবে তাহারা যখন অন্যকে কাজ করিতে দেখে তখন তাহারা আপনা হইতেই সেই কাজে লাগিয়া যাইতে আগ্রহান্বিত হয়।

ইউনিট আমেরিকার বড় বড় শহরে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ছোট ছোট শহরে এমন কি গ্রামান্তর্গত হাসপাতালসমূহেও যাহাতে ঐরূপ কাজ সুরু করিতে পারা যায় তাহার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। যে অঞ্চলে হাসপাতাল অবস্থিত সেই অঞ্চলে উৎপন্ন শিল্পাদি শিক্ষাদানের প্রতিই বেশী নজর দেওয়া হয়। এখানে ব্যবহৃত জিনিষপত্রও প্রায়ই ঐ অঞ্চলেই উৎপন্ন। ধরুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে কতকগুলি হাসপাতাল আছে। সেখানকার রুগ্ন সৈনিকদের মাছধরার কায়দাগুলি শিখানো হইতেছে। কেননা, ঐ অঞ্চলের লোকেদের মাছ-ধরা একটা প্রধান ব্যবসায়। সৈন্তরা কতকটা সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে দলে দলে মাছ ধরিতে পাঠানো হয়। ইহাতে তাহারা যেমন মাছ ধরার কায়দা আয়ত্ত করে তেমনি প্রচুর আনন্দও পায়। উত্তর-পশ্চিম উপকূলের হাসপাতালসমূহের রোগী সৈনিকদের দেবদারু গাছের পাতা দিয়া মাদুর তৈরি শিখানো হয়। ঐ অঞ্চলের কোন কোন ষ্টেটে দেবদারু গাছ প্রচুর জন্মে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে রৌপ্যের কাজ যথেষ্ট হয়, কারণ ইহা এ অঞ্চলের একটি প্রধান শিল্প। পূর্ব্ব-উপকূলে ফ্লোরিডা ষ্টেটে সৈনিকগণ সামুদ্রিক মুক্তা দিয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেছে। যে-সব অঞ্চলে হাঁড়ি কলসী তৈরি হয়, সে-সব অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে ইহাও শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়, বহু রুগ্ন সৈনিক আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিবার কালে একটি-না-একটি বিদ্যা বা কর্ম্মকৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। এই সব বিদ্যা তাহাদের জীবিকার্জ্জনে সহায় হইবে।



পরিহাস

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শুদ্ধ ভাষায় নাম তাহার যাহাই হউক না কেন লোকে তাহাকে ডাকে বকু বলিয়া। আমি তাহাকে ডাকি মিস্ বকু নামে।

বলিলে বিশ্বাস করা কঠিন তবুও না বলিয়া পারা যায় না—তার মত চঞ্চল সরল উচ্ছল হাস্যময়ী মেয়ে আমি জীবনে কমই দেখিয়াছি। দেহ তাহার যতটুকু না হইলে নয় ততটুকু, মনটি তাহার আকাশের মত উদার ও বিস্তৃত। পরকে আপনার করিয়া লইতে, মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলিতে এমন স্ত্রীলোক পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই।

সন্দেহ করিবার কিছু নাই—পরিচয় তাহার সহিত অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। সে আমার জনৈকা বান্ধবীর বোন—যখন পরিচয় তখন তাহার বয়স হইবে চৌদ্দ আর আমার ত্রিশ,—বিবাহিতই নয় পুত্রকন্যার পিতাও বটে। তবুও তাহাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। শ্বশুরবাড়ীর দেশের কুমারী কন্যা অতএব সম্পর্কটি মধুর করিয়াই লইয়াছিলাম।

শ্বশুরবাড়ীর কর্ম্মহীন দিনগুলির মাঝে ওদের বাড়ীতে সকাল সন্ধ্যা আড্ডা দেওয়া ও চা পান করাটাই প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। বকুর কার্য্য ছিল চা দেওয়া, মাঝে মাঝে ফরমায়েসী গান করা। এই সেবার প্রতিদানে আড্ডা দেওয়ার অধিকার তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

একটি দিনের কথা মনে হয়—আমি একটু-আধটু লিখি তাই সে তাহার আয়ত চোখ দুটি মেলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—আপনি লেখেন কেমন করে ?

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, বড্ড শক্ত প্রশ্ন করেছ—উত্তর দেওয়া কঠিন।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয় কিন্তু তার এই সরল প্রশ্নটি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে বান্ধবী চলিয়া গেলেন, [illegible] আমার যাইতে তখনও কয়েকদিন দেরি ছিল। তাহার দিদি চলিয়া গেলেন। সে অকস্মাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল, কাল আসবেন না ত ?

—কেন ? আসব না কেন ?

—দিদি চলে গেল, আমাদের অনুরোধে কি আর আসবেন ?

—অনুরোধ করেই দেখ না।

উজ্জ্বল চোখ দুটির দৃষ্টি মুখের উপর রাখিয়া কহিল, সত্যিই আসবেন ?

—তোমরা বললেই আসতে পারি। কিন্তু কি দেবে বল ত।

—চা।

—আর ?

বকু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই কহিলাম, গান।

—আমার গান ত তেমন ভাল নয় তবে বললে গাইতে পারি।

—তবে অবশ্যই আসব।

—আসবেন কিন্তু সন্ধ্যায় [illegible] বাইরের ঘরেই থাকব, কেমন ?

—হাঁ থেক। বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় কিন্তু মনে মনে সন্দিহান হইয়া [illegible] ক্ষুদ্র একটি বালিকার আমন্ত্রণে, কুটুম্বের দেশে আমার পক্ষে অন্যের বাড়ী যাওয়াটা সমীচীন হইবে কিনা ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এক পায়ে দুই পায়ে বকুদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। বকু বাস্তবিকই বাহিরে ছিল, আমারে অভ্যর্থনা করিল, বলিল, ভাবছিলুম, আর বুঝি এলেন না।

—কেন ?

—আপনার আসবার সময় ত অনেকক্ষণ চলে গেছে। যাক্, বসুন চা এনে দি।

চা আসিল। বকুকে বলিলাম, গান শোনাও।

কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সে সুরযন্ত্র লইয়া আসিল। আমি পরিহাস করিলাম, এমন একটা গান কর, যাতে আমার প্রতি তোমার ভালবাসা আছে সে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

বকু গাহিল। কি গান এতদিন পরে মনে নাই তবে তাহার অর্থ ঐ রূপই হইবে সেটা মনে আছে। তাহার দাদা ও অন্ত আর এক দিদিও ইতিমধ্যে আড্ডায় যোগ দিয়াছে।

গান শেষ হইলে আমি পরিহাস করিলাম, আমাকে তা হ'লে সত্যিই ভালবাস।

বকু সগর্বে কহিল, নিশ্চয়ই নইলে আসতে বলব কেন?

বুঝিলাম—ভালবাসা কথাটার গূঢ় অর্থ সে এখনও বুঝিয়া উঠে নাই। আর একটু পরিষ্কার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু আমি ত বুড়ো মানুষ—

—তাতে কি হ'ল? বয়স বেশী হলে বুঝি আর ভালবাসা যায় না—

—খুব যায় তবে সেটা তোমার ইচ্ছা মাত্র।

এইরূপ পরিহাসের একটা ইতিহাস আছে। [illegible] দিদি [illegible] ভাইফোঁটার দিনে আমাকে ফোঁটা দিতে চাহিলে আমি জবাব দিয়াছিলাম, এটা আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ এখানে ভাইফোঁটা নেওয়াটা সঙ্গত নয়, যদি একান্তই দিতে হয় তবে সেটা আমার শালাকে দেওয়া উচিত।

একটা হাসির রোল উঠিয়াছিল এবং বান্ধবী বলিয়াছিলেন, আহা, শহরসুদ্ধ লোকই আপনার বড়কুটুম্ব নাকি তা হলে—

—লোকসান নেই এইটুকু জানি।

এই ঘটনার পর হইতেই আমার দাবিটা ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া পন্থান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কাজেই বকুকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠা ছিল না এবং বয়সের পার্থক্যটাও অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই।

আরও অনেক অবান্তর কথার পর বকু শিশুসুলভ আবদারের সুরে অনুরোধ করিয়াছিল, আমার নামে একটা গল্প লিখে দিতে হবে।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াই আসিয়াছিলাম। তবে মনে মনে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করি নাই।

বছর দুই পরের কথা। [illegible]লাম শীঘ্রই শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে, বকুর প্রতিশ্রুতি [illegible] রাখিলে সেখানে কোন জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্লট মাথায় আসিয়া [illegible]মিস বকুর নামে একটা গল্প লিখিয়া ফেলিলাম [illegible] প্রকাশিত হইয়া গেল। একবার ভাবিয়াছিলাম, যে বয়সে বকু গল্প লিখিতে বলিয়াছিল সে বয়স এখন আর তাহার নাই, কাজেই তাহার নামে প্রেমমূলক কোন গল্প লিখিলে আজ সে নিশ্চিতই লজ্জিত হইবে তাই গল্পে সংযমের অভাব ছিল না।

মফস্বল শহর। গভীর রাত্রিতে শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়াছিলাম এবং পরের দিন স্বগ্রামবাসী জনৈক ভদ্রলোকের গোপন ও জরুরি একটা সংবাদ দিতে গিয়াছিলাম। গায়ে ট্রেনের ময়লা জামা, মাথার চুল অসমান, এবং মুখ দাড়ি-সমাচ্ছন্ন। বকুদের বাড়ীর অনতিদূরে তার দাদার সঙ্গে দেখা, তিনি লইয়া গেলেন।

বকুদের বৈঠকখানায় ঢুকিতেই একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল—দেখি আড্ডা সরগরম। জন সাত-আট স্ত্রীপুরুষ সমবেত ভাবে কি যেন একটা আলোচনা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া বান্ধবী বলিলেন, যার কথা বলছ, তিনিই এসে গেছেন হৈচৈটা তারই প্রত্যুত্তর।

অনুমানে বুঝিলাম উক্ত গল্পটি লইয়াই একটা কিছু আলোচনা হইতেছিল। বকু কহিল, চা নিয়ে আসি—কেমন?

জবাব দিলাম, সেটা তোমাদের ভদ্রতা। ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে চা দেওয়াটা যদি তোমাদের উচিত মনে হয় তবে দিতে পার।

বকু কহিল, ও বাবা!

চা আনিয়া দিয়া বকু প্রশ্ন করিল, কেমন হয়েছে?

এক চুমুক পান করিয়া বলিলাম, বেশ চা হয়েছে।

বকু সহাস্যে কহিল, তবে যে লিখেছেন, নাচিয়ে মেয়ের চা দেখেই চিনলাম—জলবৎ তরলং।

গল্পের মাঝে অমনই একটা কথা সত্যিই ছিল কিন্তু আমার ভুল হইয়া গিয়াছিল তাই বলিলাম, একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি সেটি হচ্ছে কদাচিৎ ভালও হয়।

সকলেই হাসিল। বান্ধবী প্রশ্ন করিলেন, কবে এলেন।

বকু বলিল, আমি বলতে পারি। কাল রাত্রি সাড়ে বারটার গাড়ীতে এসেছেন।

—কেমন করে বুঝলে?

—জামায় ট্রেনের ময়লা, দাড়ি কামান হয় নি, চুল এলো-মেলো, অর্থাৎ গাড়ী থেকে নেমে এখনও জিরুতে পারেন নি।

সস্নেহে বকুর হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলাম, একেই বলে ভালবাসার কাণ্ড, দেখেছেন বকু কতখানি লক্ষ্য করেছে—সত্যিই কাল রাত্রে এসেছি। গাড়ী লেট ছিল, দু'টায় বাসায় পৌঁছেছি।

বান্ধবী কহিলেন, আমরা লক্ষ্য করি নে বুঝলেন কি করে?

—আপনাদের কথা শুনে।

বকু সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল, এরা সব এতক্ষণ আমার সঙ্গে লেগেছিল, কেউ বলেন, আপনি আমার নামে কেন গল্প লেখেন, কেউ বলেন তুমি নিশ্চয়ই তাকে ভালবাস, কেউ বলেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসেন।

—তুমি কি জবাব দিলে?

—আমি বললাম, ভালবাসি বেশ করি। তাতে তোমাদের কি? কি অন্যায় বলুন ত, যে গুণীলোক তাকে কে না ভালবাসে।

আমি হাসিয়া কহিলাম, ঐটা লিখে দিতে হবে। কথার দাম নেই—আমি যে গুণীলোক, একথা পৃথিবীর এই দু'শ কোটি লোকের মধ্যে প্রথম তুমি স্বীকার করলে।

বন্ধু নিরস্ত না হইয়া কহিল, আমি যদি ভালবাসি তাতে ওদের কি ? আর তাতে অন্যায়ই বা কি ?

আমি পরিহাস করিলাম, ভালবাসাটা খারাপ নয় আর সেটা আয়ত্তের মধ্যেও নয় তবে সেটা স্বীকার করাটা সর্ব্বদা সঙ্গত নয়।

—কেন ? ওর মধ্যে গোপন করার কি আছে ? মানুষ কাউকে না কাউকে ভাল ত বাসবেই।

—বটেই ত, তবে ওদের প্রথম আপত্তি তুমি সেটা প্রকাশ করেছ, আর দ্বিতীয় আপত্তি যদি ভালবাসলেই তবে ওদের মত গুণী ব্যক্তিকে ভাল না বেসে আমার মত মূঢ় ব্যক্তিকে ভাল বাসলে কেন ?

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বেলা হইয়াছে অজুহাতে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলিলাম, কিছু মনে করো না। আমাদের যে ভাব তা গোপন থাক, প্রকাশ করো না। আর একটা কথা, এমন উদাহরণ বিরল নয় যে, কোন ব্যক্তিকে নিয়ে কোনও মেয়ের ঠাট্টা করতে করতে দেখা গেছে যে সত্যিই মেয়েটির মনে ঐ ব্যক্তিটির ওপর দুর্ব্বলতা রয়েছে। ওদের এই ঠাট্টার উদ্দেশ্য সেরূপও হতে পারে।

বন্ধু কহিল, ঠাট্টা আবার কিসের ? আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পর্য্যন্ত ওরা ভয়ঙ্কর সন্দিহান।

অন্য সকলে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। আমি কহিলাম, যাক্ আমি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি না। আমাদের নিবিড় সম্পর্কটা নিবিড়তম হোক কিন্তু গোপন থাক।

হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম। বয়সের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু মনের ওর পরিবর্ত্তন একেবারেই হয় নাই। ভালবাসা শব্দটা আজিও তাহার জীবনে একই অর্থ বহন করিয়া চলিয়াছে। বন্ধুর এই সারল্য ও আমার প্রতি সত্যিকার একটি স্নেহকে সেদিন মনে মনে সাধুবাদ না দিয়া পারিলাম না। কলুষিত জগতের মাঝে এমন একটা মন কেমন করিয়া নিষ্কলুষ রহিয়া গেল ?

অচেনা জায়গা। লাইব্রেরিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম—যে-কোন নূতন স্থানে গিয়া লাইব্রেরিতে যাওয়া আমার একটা ব্যাধি। নিত্যই যাই, নিত্যই কাগজ পড়ি। শহরে কত লোক, কাজেই কেহ কোন দিন পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নাই।

সেদিনও তেমনি পড়িতেছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম পার্শ্বে এক ভদ্রলোক বসিয়া সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত আমারই একটা গল্প পড়িতেছে। কাগজ পড়িতে পড়িতেও লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম, গল্পের শেষাংশ যে পাঠককে বিচলিত করিয়াছে তাহা বেশ বুঝিলাম। চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, দ্রুত শ্বাস পতনের শব্দ বেশ স্পষ্ট। গল্পটা শেষ করিয়া ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অকারণ পাতা উল্টাইলেন, পরে সঙ্গী এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—এই গল্পটা পড়েছিস্ ?

—কোন্‌টা—

—এই "টুকরো কাগজ"।

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগল ?

—বেশ, শেষের দিকে আর চোখের জল সাম্‌লানো যায় না। এঁর লেখা কিন্তু বেশ লাগে। গল্পগুলো যতটুকু না হলে নয় ততটুকু, ভাষাকে শক্তিশালী করবার জন্য কোন কসরৎ নেই অথচ বেশ বেগবান। গল্পের বিষয়বস্তুও বেশ সুন্দর।

—কিন্তু মাঝে মাঝে ওঁর লেখায় যেন একটু অস্বাভাবিকতা থাকে।

—না না।

মানে, যেন কল্পনার আধিক্যে স্বাভাবিকতাটা ডুবে যায়।

একটা অপূর্ব্ব আনন্দে সমস্ত অন্তরাকাশ ছাইয়া গিয়াছিল—প্রশংসাবা[illegible] লাভ করিয়া নয়। যে লোকটির সম্বন্ধে তাহারা আলাপ [illegible]রিতেছে ঠিক সেই লোকটি যে তাদের সম্মুখেই বসিয়া আছে [illegible]া ওরা জানে না চিন্তা করিয়াই মনটা পুলকে ভরিয়া উঠিতে[illegible]। অতএব লুব্ধভাবে বসিয়াই রহিলাম। জানিতাম সাহিত্য [illegible]চনার পরেই সাহিত্যিকের চরিত্র সম্বন্ধে গবেষণা হয়, সে[illegible] জানিবার কৌতূহল দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল—কিছুক্ষণ পরে উঁ[illegible] আবার আরম্ভ করিলেন—

—শু[illegible]ছি, এ ভদ্রলোক নাকি খুব পণ্ডিত।

—হঁ[illegible]া পণ্ডিত ! ওর বই পড়ে ত মনে হয় যে মাতাল চরিত্রহীন [illegible] কোন ফিল্ম-তারকার বাহন।

—না না, সেরকম অসংযম এর লেখায় অন্তত কোনদিন পাইনি।

—যারা প্রকৃতই অসংযমী তাদেরই কলমে সংযমের কথা বেশী থাকে।

অনেকক্ষণ প্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বহু আলোচনা চলিল। বসিয়া বসিয়া শুনিয়া তাহাদেরই পিছন পিছন চলিয়া আসিলাম। বন্ধুদের আড্ডায় কথাটা না বলিয়া আর পারা যায় না তাই তৎক্ষণাৎ তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

চা প্রভৃতি সহযোগে যখন সেদিনকার এই চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করিলাম তখন সকলেই সেটাকে লইয়া বেশ আলোচনা আরম্ভ করিল।

বন্ধু বলিল, ইস্, বড্ডো ভুল করেছেন। কথায় কথায় যদি পরিচয়টা [illegible] তবে [illegible]রা কি বেকুবই হ'ত।

আমি [illegible]লিলাম, বে[illegible] হয়ত তারা হ'ত কিন্তু আমার আনন্দটা [illegible]মন হ'ত না। [illegible] তাদের সমালোচনা থেকে বঞ্চিত হ[illegible]াম। তাই ঠিক ক[illegible] এ শহরে আর ঠিক পরিচয় দেব না। তোমাদের এখানে যারা [illegible] তাদের এখন বারণ করা দরকার।

[illegible]কুর দিদি বলিলেন, সত্যিই একটা চমৎকার [illegible] সৃষ্টি [illegible]ছে ; ওঁকে গোপনই রাখব।

আমি বলিলাম, ধরো বন্ধু, এমন যদি হয় কোনো লোক আমার প্রতি তোমার ভালবাসার প্রসঙ্গে আমারই সামনে যদি তোমাকে হিতোপদেশ দেন তবে কেমন মজাটা হবে।

বন্ধু উৎফুল্ল হইয়া কহিল, ঠিক, তাই করতে হবে। সেদিন মহুদি আমাকে কত বোঝালে, দেখ—সে ভদ্রলোকের বিয়ে

হয়েছে তাকে ভালবেসে লাভ কি। তোর এমন মতি হ'ল কেন ? ইস্ সে সময় গেঁড়ুদার মত আপনিও যদি সামনে থাকতেন।

—দেখো ত কি সাংঘাতিক মজাই হ'ত। যাক্, ভবিষ্যতে সকলে মিলে তোমার মহুদিকে আর একদিন উপদেশ দিতে বাধ্য করা যাবে।

সকলেই যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে রাজী হইয়া গেল। যে কেহই বকুর হৃদয়দৌর্ব্বল্য লইয়া কোন কথা বলিবে তাহাকেই আমরা উৎসাহিত করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইব।

পরদিন লাইব্রেরিতে আরও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। অন্য দিনের মতই পড়িতেছিলাম। দুইটি যুবক, সম্ভবতঃ কলেজের ছাত্র, হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া লাইব্রেরিয়ানকে প্রশ্ন করিল, অমুক মাসের অমুক পত্রিকাখানা আছে ?

ঐ সংখ্যায়ই মিস্ বকুর গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছি[illegible]। কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিলাম। পুস্তকখানি [illegible]র মধ্যে লইয়া তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে ঐ গ[illegible]র স্থানে আসিয়া একজন কহিল, আছে রে আছে। হাঁা এই[illegible] আমাকে ইস্যু করে দিন ত।

পুস্তক লইয়া তাহারা বাহির হইল, পিছন পিছ[illegible] অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া আমিও তাহাদিগকে অনুসরণ করিল[illegible]। একজন বলিল, শুনলাম বকু নাকি ঐ লোকটিকে সত্যিই ভালবাসে।

—শুনছি ত। আবার শুনি লেখক নাকি এখানকার জামাই—তা হ'লে নিশ্চয়ই বিবাহিত। বকু কি শেষে একটা বিবাহিত লোককে ভালবাসল ?

—প্রেমের দেবতা অন্ধ। লাভক্ষতি বিচার করে ত লোকে ভালবাসে না। মানুষ এমন অবস্থায় পড়ে যখন ভাল না বেসে তার আর গত্যন্তর থাকে না। ভালবাসাটা উভয়তঃই হতে পারে। গল্পে নাকি সে কথা স্পষ্টই লেখা রয়েছে।

—যদি তাই হয় তবে বিবাহও হতে পারে, তা হ'লে বকুরই বা কি হবে আর সেই ভদ্রমহিলা যিনি হয়ত এর কিছুই জানেন না, স্বামীপরিত্যক্তা হয়ে তারই বা কি বিষময় জীবন হবে !

—এমনটা একেবারে না হয় তেমন নয়। জগতে এমন বহু [illegible]না আছে তার সঙ্গে এটিও যুক্ত হবে মাত্র। বহু অনাথিনী আছে, জগতে তার সংখ্যা[illegible] ড়বে।

—না, এই জন্যেই মেয়েদের [illegible]রোধ-প্রথাই [illegible]। বকুরা বড্ড মেলামেশা করে তার ফ[illegible]গতে হবে এবার। [illegible]ধু আপ-টু-ডেট হলে ত হয় না, [illegible] রক্ষা করবার বুদ্ধি অর্জ্জন করা দরকার।

—ওটা [illegible] কথা, কতকগুলো মানুষেরই এমন [illegible]মতা আ[illegible]র আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারে না, তারা অনি[illegible]র্য্য ভাবে আর এক জনের জীবন গড়ে তোলে।

—ও ভদ্রলোকের শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাই বা কি বেকু[illegible] জামাইকে এমন ভাবে ছেড়ে দেয় কেন ?

—বুদ্ধিটা তুমি দিয়ে এস।

মনে মনে আজ আরও খুশি হইয়াছিলাম—এমন সময় একটা মোড়ে আসিয়া পড়িলাম। ভদ্রলোকদ্বয় ডাইনে গেলেন আমি বাঁয়ের দিকে ঘুরিয়া বকুদের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আজকার কাহিনী শুনিয়া সকলে আরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম—যাক্ বকু, একটু চা দাও।

বকু কহিল—তাদের চিনলেন না।

—যদি চিনতামই তবে কি তারা আমার সামনে এ সব বলে ? তবে আজকাল এই শহরের বেশীর ভাগ যুবকেরই দুশ্চিন্তা আমাদের প্রেম নিয়ে, এইটেই সবচেয়ে উপভোগ্য সংবাদ। আমরা লোকচক্ষে আজ যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছি। তোমার এই খ্যাতির মূলে আমি, অতএব তাড়াতাড়ি চা নিয়ে এস এবং একটি গান শোনাও।

বকু চলিয়া গেল। ব্যাপারটা লইয়া সকলেই বেশ উপ-ভোগ্য মন্তব্য করিতে লাগিলেন। বকুর দিদি বলিল—ওদের এত মাথা ঘামানো কেন ? বকুর কি হ'ল তা দিয়ে ওদের কি দরকার।

—দরকার আছে বই কি ? বকু নাচিয়ে মেয়ে, শহরে দু'দশ জন এবং সব যুবকই তাকে চেনে। এহেন বকু আজ তাদের সকলকে ফেলে আমার মত দুর্জ্জনকে ভালবাসবে এটা তাদের অসহ্য। নইলে শহরে কত ঘটনা ঘটছে কে তা নিয়ে মাথা ঘামায় ?

বকু চা আনিতে আনিতে কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছিল তাই বলিল—যে ভালবাসবে পছন্দটা ত তারই, আর দশ জনের মত নিয়ে কি মানুষে ভালবাসবে নাকি। আর সকলের এ নিয়ে কি দরকার ?

—দরকার অবশ্যই আছে—তা নইলে মস্তিষ্কের অপচয় লোকে কেন করবে। তুমি শহরের একটা খ্যাতিসম্পন্না কুমারী, তোমার গুণগ্রাহী ব্যক্তির অভাব নেই।

—আপনারও ত তাই, আপনার লেখা নিয়েও ত কত লোকে আলোচনা করে।

—করে সেটা আনুষঙ্গিক—তোমাকে কেন্দ্র করেই আজ শহর সরগরম, আমি সেই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘূর্ণমান একটি অস্পষ্ট তারকা মাত্র।

হঠাৎ একজন অপরিচিতা মহিলা ঘরে ঢুকিয়া আমাকে দেখিয়া যেন একটু থমকিয়া গেলেন। বকুর দিদি বলিলেন—একজন আসুন মহুদি—ওঁকে দেখে সমীহ করবার কিছু নেই, আমার বন্ধু মাত্র।

মহুদি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বকু চল ভেতরে যাই।

বকু ও দিদি সমস্বরে কহিলেন—ভেতরে যাবার দরকার নেই। ইনি খুবই নিকট বন্ধু, ওঁর সামনেই সব কিছু বলতে পারেন।

মহুদি খুব সম্ভব আমার মুখে একটা বিশ্বাসযোগ্য সরলতা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাই নির্ভয়ে বলিলেন—এ সব কি শুনছি বকু ?

বকু সবিস্ময়ে কহিল—কি ?

—তোমরা জান না। শহরে যে কান পাতার যো নেই, বকু নাকি কোন এক লেখককে ভালবেসেছে, সে আবার গল্প [illegible]খেছে—এ সব কি কাণ্ড বল ত ? হ্যাঁরে বকু, সে লোকটার না[illegible] বিয়ে হয়েছে তবুও এ সব কি !

বকুর দিদি কহিলেন—কই, এ সব ত কিছু শুনি নি।

—শোন নি? আরে সর্ব্বনাশ, এ কথা দেখি শহরময় রাষ্ট্র। সে গল্প আমিও পড়েছি, তাতে স্পষ্ট বুঝেছি সে লোকটাও মরেছে। এখন এর একটা বিহিত না করলে ত আর চলে না। সে মুখপোড়া নাকি আবার এসেছে এখানে।

আমি সবিনয়ে কহিলাম, আগেই ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? বকু ত রয়েছে তার কাছেই ব্যাপারটা শুনে তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থা হলেই ত সেটা ভাল হবে।

মন্টুদি সহসা একটা কর্ত্তব্য পাইয়াছেন এমনিভাবে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা বকু, যা শুনছি এসব কি সত্যি? তুই-ই বল দেখি।

বকু নীরব।

ভয় নেই তোর। তোদের বয়সে মানুষ ত ভুলভ্রান্তি করেই থাকে।

বকুর দিদি কহিলেন, ভয়ের কি আছে? সত্যি কথা বলছি রোগের লক্ষণ না পেলে যেমন চিকিৎসা চলে না, এ ব্যাপারেও তেমনি।

বকু কহিল, কতকটা সত্যি।

মন্টুদি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ও সব পেঁচোয়া কথা রাখ্, হ্যাঁ কি না তাই বল্। মন্টুদি বকুর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী। যে সমস্ত মহিলার বয়স কখনই পঁচিশের উর্দ্ধে যায় না, এবং আপ-টু-ডেট হইবার দুর্জ্জয় বাসনা যাহাদিগকে বহির্ম্মুখী করিয়াছে এবং স্বল্পশিক্ষাকেই যাহারা শিক্ষার চরম বলিয়া মনে করিতেছে মন্টুদি সেই দলের লোক। অধিকন্তু শহরের সকল বয়সের মহিলার সঙ্গেই প্রাণখোলা বন্ধুত্ব সৃষ্টির জন্য তাহার একটা খ্যাতি ছিল। তিনি পুনরায় ধমক দিয়া কহিলেন,—বল্ না।

বকু বহুকষ্টে হাসি সংবরণ করিয়া কহিল, হ্যাঁ।

—কিন্তু সে লোকটা বিবাহিত, তার নাকি ছেলেপুলে আছে সে সব খবর জানিস্?

—জানি।

—তবে কেমন করে, কেন তাকে ভালবাসিস? আর পরিচয়ই বা হ'ল কি করে? সে মুখপোড়া নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলেছিল তোর কাছে। কোথায় পরিচয়?

—এখানেই।

—সে কি এই বাড়িতেই? আর তোরা লক্ষ্য করিস নি?

বকুর দিদি কহিলেন, লক্ষ্য করে কি এ সব ঠিক করা যায়।

—সে লোকটা নাকি এখানে এসেছে, তোদের বাড়ী এবার এসেছে।

বকুর দিদি কহিলেন, এসেছিল ত সেদিন, বকুর সঙ্গে গল্প করে চা খেয়ে গেল। এখানকার জামাই তাই বেশী কিছু ত বলতে পারি না।

—বকু, তুই কি বল্লি।

—কি আর বলব? গল্প করলুম।

—সে কি বলে ঐ সব প্রসঙ্গে?

—বলেন, এখানে আসতে খুব ভাল লাগে; ত[illegible]র হাতের চা খেতে ভাল লাগে, গান শুনতে ইচ্ছে করে।

—ছিঃ ছিঃ, লজ্জা করে না তার এমনিভাবে কথা[illegible]তে।

আমি এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিলাম। বলিলাম, অনেক লোক ভয়ঙ্কর নির্লজ্জ থাকে, তারা নাছোড়বান্দা, অপমান করলেও ঘুরে ঘুরে আসে।

—হ্যাঁ, আসবে আবার। এমন সব কথা শুনিয়ে দেব যে বাড়ীর চতুঃসীমানায় পা দিতে বুক ধড়ফড় করবে।

আমি বলিলাম, এমনও হতে পারে বকুই হয়ত তাকে বলেছে যে তিনি না এলে ওর ভাল লাগে না। সারা বিকেল বাইরে বসে তার পথ চেয়ে থাকে।

বকু কহিল, না অমন কথা আমি বলি নি।

বকু এতক্ষণ একরূপ ছিল কিন্তু এইবার সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল। এতক্ষণ হাসিটা কোনমতে চাপিয়া ছিল এবং অভিনয়ও করিয়াছিল মন্দ নয় কি[illegible] শেষ পর্য্যন্ত হাসিয়াই ফেলিল।

[illegible]দি বলিলেন, এর মানে? এমন সিরিয়াস একটা কথার মধ্যে [illegible]সির কি আছে।

[illegible]মি গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিলাম, আজকালকার মেয়েদের ঢংই, [illegible]। ভালবাসাটাও যেন একটা তামাশার জিনিষ।

[illegible]দি কহিলেন, প্রথমে তামাশাই থাকে পরে সেটা বিশ্রী রকম[illegible] নেয়। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছে ছিল সেই লোকটাকে একব[illegible] সামনে পেলে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম এ সব ব্যাপা[illegible]র অর্থ কি?

ব[illegible] দিদি বলিল, আর কি করতেন?

ম[illegible] বকুকে ডাকিলেন। বকু পুনরায় আসিয়া বসিল। মন্টুদি [illegible]হিলেন, সেই লোকটার সঙ্গে আমায় একটু দেখা করিয়ে দিতে পারিস?

—[illegible]্যা।

—[illegible]ব?

—ত[illegible]ই পারি।

—ক[illegible]?

—এখ[illegible]।

মন্টুদি স[illegible]নয়ে কহিলেন, তার মানে?

বকু আম[illegible]কে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া কহিল,—ঐ ত তিনি। বকু [illegible]বার হাসিয়া উঠিল। আমি নমস্কার করিয়া কহিলাম [illegible] আমিই সেই গল্পলেখক।

ম[illegible]নমস্কার করিয়া কহিলেন,—নম[illegible]। এবং অত্য[illegible]াকস্মিক [illegible] চলিয়া গেলেন।

[illegible]রের মধ্যে আম[illegible] তিনটি প্রাণী অনেকক্ষণ বসিয়া কেবল হা[illegible]াম। অত্যন্ত শ্রান্ত [illegible] আর এক কাপ চায়ের আদেশ হ[illegible]।

তার পরে আরও কয়েক দিন এ[illegible] আনন্দ ও রহস্যালাপের [illegible]ধ্যে কাটাইয়া দিবার পর বিদায়ের দিন [illegible] হইল।

বকুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় সাগ্রহে তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া বলিলাম—সত্যিই এ ক'টা দিন কি আনন্দেই না কাটল।

বকু কহিল—সত্যিই। আপনি সামনের ছুটিতে আবার আসবেন, কেমন?

—সংসারী লোক যারা তারা কি আসা সম্বন্ধে কথা দিতে পারে? তবে এ আনন্দ ভুলবার নয়, এর মোহ আছে—তাই আবার আসতে হবে। তোমাদের স্নেহপ্রীতি, আন্তরিকতার কথা জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বকু বলিল—আর আমাদের? কাল আপনি আসবেন না, সন্ধ্যায় বাড়ীটায় কেউ আর হাসবে না।

বকু মুখ তুলিয়া চাহিল, চোখ দুইটি যেন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত স্নেহকোমল কণ্ঠে কহিল—আবার আসবেন, ভুলবেন না।

বিদায়-দিনে বকুর এই অনুরোধ সত্যই বার-বার সেখানে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইবার ব্যবস্থানটাও [illegible]ড়িতে থাকে। কয়েক বছর যাওয়া হয় নাই, তাহার পর [illegible]কবার গিয়াছিলাম—বকুর সহিত কয়েক মিনিটের জন্য মা[illegible] দেখা হইয়াছিল।

বছর পাঁচ ছয় পরের কথা—পুরাতন পরিচয়ের [illegible]রেই বকুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। বকু সহাস্যে [illegible]থনা করিয়া কহিল—আসুন।

পরিচয়ে জানিলাম সে বি-এ পাস করিয়া স্থান[illegible] স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছে। পুরাতন পরিচয়ের সূত্রেই সে [illegible]সিকতা করিল—আপনি ত বুড়ো হয়ে গেছেন।

—খুবই সম্ভব, বয়স এগোয়, কিছুতেই পেছোয় [illegible] যাক একটু চা, নাচিয়ে মেয়ের হাতের নয়, শিক্ষয়িত্রীর [illegible]তের চা ইচ্ছা করি।

চা পান করিতে করিতে শুনিলাম, তাহার দিদি[illegible] বিবাহ হইয়া যে যাহার পতিগৃহে রহিয়াছেন, এখন সে [illegible]একাই এ বাড়ীতে আছে। মা-ভাইরা কেহ কেহ কখ[illegible]র কখনও থাকেন।

আমি পরিহাস করিলাম—কিন্তু তুমিই বা [illegible] কারও কণ্ঠে বরমাল্য না দিয়ে এমন ভাবে একলা রয়ে গেলে কেন?

—কেন? ক্ষতি কি?

—যথেষ্ট ক্ষতি! তোমার মত রমণীর[illegible] জগতে কারও কণ্ঠে বরমাল্য দিলে না, এর চেয়ে পরিতাপের আর কি হতে পারে!

বকু তেমনি ভাবে একটু হাসিয়া কহিল—আমি দিলেই ত হবে না, যাকে দেব তারও ত সেটা গ্রহণ করা চাই।

—নিশ্চয়ই করবে, কেন করবে না? জগতে এমন কোন্ পাষণ্ড নরাধম আছে যে তোমার বরমাল্যকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

—যথেষ্ট আছে।

—কিছুতেই হতে পারে না। সে নরাধমকে আজই আমি ধরাধাম থেকে নির্ব্বাসিত করব।

বকু ম্লান হাসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল এবং অবনত চোখে বলিল—সে নরাধমকে নির্ব্বাসিত করা আপনার সাধ্যাতীত।

—যদি তাই হয় তবে বরমাল্য গ্রহণে বাধ্য করব।

—তাও পারবেন না।

—কেন? কোন্ সে দুরাচার, তার নামটাই বল না।

বকু একটু ম্লান মুখে কহিল—যদি বলি আপনি।

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম। তবুও কহিলাম—বাল্যকালের সে পরিহাসের অভ্যাস ত তোমার যায় নি দেখছি।

বকু টেবিলের উপর দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করিয়া কহিল—সেটা পরিহাস ছিল আপনাদের কাছে, আমার কাছে সেটা ত কোন দিনই পরিহাস ছিল না।

আমি ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম—তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবেসেছিলে? বকু জবাব দিল না। তেমনি করিয়াই মাথা নীচু করিয়া রহিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম—বকু চোখ দুইটির দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিতেই চোখের প্রান্ত বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কি যেন একটা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু বলিতে পারিল না।

আমি অপরাধীর মত একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তাহার মত্তুদি যেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল তেমনি আকস্মিকভাবে চলিয়া আসিলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিবার সাহস হইল না। হয়ত বকু টেবিলে মাথা রাখিয়া কেবলই কাঁদিতেছে।

[illegible]দেশ ১৯৪৫

[illegible]শলেন্দ্র বিশ্বাস

প্যাগোডার দেশ, বুদ্ধে[illegible] বর্ম্মা আজ,
রণ-দাবানলে ছাই[illegible] গেছে মরুর মত,
বিলাতী জাপা[illegible] গোলা-বারুদের ধোঁয়ার জালে
ঢাকা [illegible] গেছে গত দিবসের গর্ব্ব যত।

[illegible]থে পথে ফেরে ভিখারী ও চোর,—পুরুষ-নারী,
লজ্জা ঢাকিতে এতটুকু টেনা অঙ্গে নাই,
ধ্বংসদেবের অতি অভিনব মূর্ত্তি শুধু
চোখে জেগে ওঠে, সমুখে পিছনে যেদিকে চাই!

বোমার টুকরা, মৃতদেহ যত সৈনিকের,
সাঁজোয়া গাড়ীর ভগ্নাবশেষ পথের 'পরে
পড়ে আছে, আর তার পাশে শত শকুন-চিল
ভোজন-বিলাসে লড়াই করিছে পরস্পরে।

গলিত শবের গন্ধে গন্ধে বাতাস ভারী,
পথে অজস্র কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ,
জীবনের আশা এতটুকু যেন কোথাও নেই,
[illegible]ানুষ এখানে সাপের চেয়েও ভয়াল জীব।

[illegible]জ তোমারে যোগী উদাসীন, হে তথাগত!
[illegible]হাভারতের নির্ব্বাণ-লাভে বাকি কি আর?
[illegible]ম্ম-শরণ বুদ্ধ-শরণ সফল হ'ল,
[illegible]-শরণে মিলেছে চরম পুরস্কার!

ঋগ্বেদের যুদ্ধ-বিগ্রহ

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চৌধুরী

আর্য্য ও অনার্য্যে, এবং আর্য্য ও আর্য্যে, এই দ্বিবিধ সংঘর্ষে ঋগ্বেদের ভারত প্রকম্পিত হয়।(১)

অ-শ্বেত অনার্য্যের প্রতি ঋগ্বেদের শ্বেত আর্য্যের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ঋগ্বেদে অনার্য্য দাস-দস্যু-অসুরগণ কৃষ্ণকায় হীন অসভ্য অর্দ্ধনগ্ন দুর্ব্বোধ্যবাচা অদ্ভুত শব্দকারী, চেপ্টা-নাসিকা-যুক্ত কুৎসিত কদাকার, প্রকাণ্ড ঘোরদর্শন ইত্যাদি। তাহারা অমানুষ, মানুষের মধ্যেই নয়। এক ঋকে আছে 'দস্যুদিগকে দ্বিখণ্ডিত কর, এরূপ অদৃষ্টভোগের জন্যই তাহাদিগের জন্ম।' কিন্তু যে-দাসদস্যু আর্য্যপ্রাধান্য স্বীকার ও আর্য্যসংস্পর্শ বাঞ্ছা করে, তৎপ্রতি আর্য্য বিশেষ প্রীত। এক ঋকে দৃষ্ট হয় যে, দুইটি দাস-প্রধান আর্য্যভাষায় কথা বলিতে শিক্ষা করিয়াছে ও তাহারা আর্য্যগণকে ভোজে আমন্ত্রণ করিয়া গো-বধ(২) পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছে। যেরূপ আর্য্যগণ দস্যু-অসুরদিগের প্রতি, তদ্রূপ দস্যু-অসুরগণও আর্য্যদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরিতায় পূর্ণ। তাহারা আর্য্যদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে ও আর্য্যদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে যত্নবান, তাহারা আর্য্যদিগকে কূপে নিমজ্জিত করিয়া, তুষাগ্নিতে বা জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া, 'পীড়াযন্ত্রগৃহে' পীড়া প্রদান করিয়া ও অপর বিবিধ উপায়ে নিধন করিতে সচেষ্ট। রেভ ঋষি দস্যুকর্ত্তৃক কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া দশ দিন দশ রাত্রি সেখানে থাকিয়া মৃতপ্রায় হয়। দেব-ভিষক্ অশ্বিনদ্বয় রেভ ঋষিকে কূপ হইতে উত্তোলন করিয়া ও ঔষধ প্রদান করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। অসুরেরা একশত দ্বারবিশিষ্ট প্রকাণ্ড পীড়াযন্ত্রগৃহে অত্রি ঋষিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়। অশ্বিনদ্বয় 'হিমজল দ্বারা' অত্রি ঋষিকে রক্ষা করেন। অনার্য্যের উৎপীড়নের এরূপ বহু উক্তি ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়।

ধনুর্ব্বাণ আর্য্যদিগের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। অপর যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ঋষ্টি স্রক শক্তি বর্ত্তনী (প্রভৃতি নিক্ষেপাস্ত্র), স্বধিতী কুঠার পবির অসি কর্পাণ বাঁশী (প্রভৃতি ছেদনাস্ত্র), এবং মুদ্গর চক্র বজ্র(৩) প্রভৃতি অপর অস্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্য্যযোদ্ধার উষ্ণীষ শীপ্র হস্তঘ্ন খাদি অংকা-অংসত্রা দ্রাপী কটক প্রভৃতি আপাদমস্তকের বিভিন্নাংশের বর্ম্ম ও রক্ষাবরণ। তাহার হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে ইষুধি, ও স্কন্ধ ও কটিতে ঋষ্টি স্রক শক্তি অসি কর্পাণ প্রভৃতি অস্ত্রসজ্জা। আর্য্যদিগের তেজস্বী বলিষ্ঠ দ্রুতগতি সুশিক্ষিত সমরাশ্ব, 'দধিক্রা'। তাহাদিগের সুদৃঢ় সুশোভিত দ্রুতগমনশীল যুদ্ধ-রথ। ঋগ্বেদে ত্রিকোণবিশিষ্ট, ত্রিচক্রযুক্ত, ষড়চক্রযুক্ত, উচ্চ পতাকাসমন্বিত, চর্ম্মমণ্ডিত, উৎকৃষ্টরূপে আচ্ছা[illegible], স্বর্ণরত্নমণ্ডিত, কারুকার্য্যখচিত, নানা বর্ণানুরঞ্জিত, সুদৃঢ়, [illegible]শোভন প্রভৃতিরূপ রথ বর্ণনা(৪) আছে। আর্য্যদিগের প্রধান [illegible]স্ত্র ধনুর্ব্বাণ বিষয়ে ঋকে আছে—'আমরা ধনু দ্বারা গাভী [illegible] করিব, ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করিব, ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্ম[illegible]না বধ করিব। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক। আমরা [illegible]নুদ্বারা সর্ব্বদিক জয় করিব। এই ধনুসংলগ্ন জ্যা সংগ্রাম[illegible]লে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া যেন প্রিয়বাক্য বলিবার [illegible]ন্যই ধনুর্দ্ধারীর কর্ণের নিকট আগমন করে, এবং স্ত্রী যেরূপ [illegible]প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বাণ[illegible] আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে। সেই ধনুকোটিদ্বয় অনন্যমনা [illegible]স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় মা[illegible]বে পুত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা করুক। এই তূণীর বহুতর [illegible]ণের পিতা, অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র। বাণ তুলিবার [illegible]ময় এই তূণীর 'চিশ্বা' শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে [illegible] থাকিয়া যুদ্ধকালে বাণ প্রসবপূর্ব্বক সমস্ত সেনা জয় করে। [illegible]বাণ সুপর্ণ (পক্ষী, অর্থাৎ পক্ষীর পক্ষ) ধারণ করে। [illegible]হস্তঘ্ন জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শরীরের [illegible]রা হস্তের প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে। যাহা দিগ্ধা (অর্থাৎ [illegible]ধ হয় বিষযুক্ত), যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহ[illegible] মুখ লৌহময়, সেই বৃহৎ ইষুদেবতাকে এই নমস্কার। হে [illegible]র দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত হিংসাকুশল ইষু! তুমি বিস[illegible]তিত হও, গমন কর এবং আমত্রদিগকে প্রাপ্ত [illegible] ঋগ্বেদে মৃত ধনুর্দ্ধারীর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠা[illegible]তের হস্তে [illegible]র্ব্বাণ প্রদানপূর্ব্বক তৎপর সংকারের পূর্ব্বে [illegible] ধনুর্ব্বাণ মৃতের [illegible] হইতে পুনঃ গ্রহণ করা হইত। তদ্বিষ[illegible]ক ঋক্ মন্ত্রে আছে, [illegible]রা এক্ষণে মৃতের হস্ত হইতে ধনু[illegible] গ্রহণ করিলাম, ইহাতে [illegible]দের তেজঃ ও বল লাভ হই[illegible]। আর্য্যদিগের বলিষ্ঠ সুসজ্জিত [illegible]মরাশ্ব 'দধিক্রা'। [illegible]ক্রার বিপুল তেজঃ। দধিক্রার তেজোবলে [illegible] অনার্য্য-[illegible]লনে সমর্থ। দেব দধিক্রা ঋগ্বেদের ঋকে অর্চ্চি[illegible]

---

(১) মহানদী-সিন্ধু, এবং তদীয় পঞ্চশাখা (বিতস্তা অসিক্লী পরুষ্ণী, বিপাশ ও শুতুদ্রী) নদীগণ, এবং পবিত্রতোয়া সরস্বতী নদী—এই সপ্তসিন্ধুবিধৌত 'সপ্তসিন্ধু' দেশ প্রধানতঃ ঋগ্বেদের ভারতের আর্য্যদিগের অবাসভূমি। ঋগ্বেদোক্ত আর্য্যভূমি-বাচক 'পঞ্চকৃষ্টি', 'পঞ্চক্ষিতি', 'পঞ্চজন', 'পঞ্চকর্ষণ্য' প্রভৃতি বাক্যসমূহও এবং পরবর্ত্তী পঞ্চনদ ও পঞ্জাব বাক্যদ্বয় এতৎপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। ঋগ্বেদে মহানদী সিন্ধু সপ্তসিন্ধুর 'মাতৃস্থানীয়া' এবং বেগবতী সরস্বতী নদী সপ্তসিন্ধুর 'সপ্তমস্থানীয়া'। আর্য্য-গণের পরমারাধ্যা পুণ্যসলিলা যজ্ঞ-মুখরিতা সরস্বতী দেবী ঋগ্বেদে মন্ত্র ও বাক্যে দেবী, বাগ্দেবী।

(২) ঋগ্বেদের আর্য্যদের সময়েই বোধ হয় কাল[illegible]ম গো-বধ অসঙ্গত বলিয়া গণ্য হয়। ঋগ্বেদের শেষাংশে[illegible] এক ঋকে 'অঘ্ন্যা' বলা হইয়াছে।

(৩) ইন্দ্রের বজ্র অস্ত্রের রাজা। উহা অব্যর্থ ও অতুলনীয়। বজ্র ইন্দ্রের সহচর ও সহজাত। ইন্দ্রের বজ্র দধীচির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত।

(৪) এক ঋকে পলাশ ও শাল্মলী কাষ্ঠে নির্ম্মিত রথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

যুদ্ধে আর্য্য দুর্দ্ধর্ষ। ঋগ্বেদে জনবল পরম বল। ঋগ্বেদে বীর্য্যবান পুত্রপৌত্রাদিরূপ প্রজাবত্ত সবিশেষ কাম্য। এক ঋকে আছে, 'হে অগ্নি! আমরা শূন্যগৃহে বাস করিব না··· আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য। আমরা তোমার পরিচর্য্যা করতঃ প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করিব।' ঋগ্বেদে বেতনভোগী সৈন্য ছিল দৃষ্ট হয়। এক ঋকে আছে, 'অগ্নি দ্বারা যজমান ধনলাভ করেন। সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয় ও তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।' আর্য্যযোদ্ধা সোম পানান্তর রণমদে মত্ত হইয়া সংগ্রামসাগরে প্রবিষ্ট হইত। যুদ্ধে শত্রুসংহার বিষয়ে এক ঋকে বলা হইতেছে, 'অঙ্কুশতাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করিয়া শত্রুসংহার কর।' ইন্দ্রাদি দেবগণ, দেবভক্ত ও যজ্ঞকারী আর্য্যগণে[illegible], বন্ধু, ও দেবদ্রোহী ও যজ্ঞবিরোধী দস্যু অসুরকুলের শত্রু। [illegible]আর্য্যগণ দৈবকৃপায় ও দৈববলে বলীয়ান্। দেবপতি বজ্রধ[illegible]রশ্রেষ্ঠ মহান্ ইন্দ্রের 'ঐন্দ্র' বলে বলীয়ান্ হইয়া লোকে যুদ্ধে[illegible]য়লাভ করে।

ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যের বৈরিতার ও সংঘর্ষে[illegible] উক্তি দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের অনার্য্য দস্যু-অসুরগণও (৫) সবি[illegible]ষ বল শালী। ঋগ্বেদে পরাক্রান্ত দস্যুরাজা ও রাজ্যসমূহ ছিল[illegible] এ স্থলে আর্য্য-অনার্য্যের সংঘর্ষের কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক[illegible] হইল। শম্বর দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্জয় অসুর। আর্য্যগণ দীর্ঘকালব্যাপী [illegible] সংগ্রাম করিয়াও শম্বর অসুরকে জয় করিতে পারে নাই। [illegible]পরিশেষে আর্য্য ভরতবংশীয় পরাক্রমশালী নৃপতি দিবোদাস তুমু[illegible] সংগ্রামে উদব্রজ নামক প্রদেশে পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি শম্বরকে[illegible] অস্ত্রাঘাত করেন এবং শম্বর ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নশিরে ভূতলে প[illegible]ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। শম্বরের মিত্রশক্তি [illegible] সহযোদ্ধা বর্চি নামক অসুরও ভরত-রাজ দিবোদাস [illegible]র্ত্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হয়। শম্বরের শতসহস্র সৈন্য যুদ্ধে বিদারি[illegible] হয়, তাহার বহু ধনরত্ন দিবোদাসের করতলগত হয় এবং [illegible]ার 'একশত প্রস্তরপুরী' বিধ্বস্ত, বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। [illegible]রা যেরূপ রূপ বিনাশ করে, দিবোদাস তদ্রূপ শম্বরের [illegible]রসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন।' দিবোদাস-রাজা করঞ্জ, প[illegible]য়, পণিপরাবত, বৃসয় প্রভৃতি অপর দুর্দ্দমনীয় অসুরগণকে[illegible] সংহার করেন। রাজা দিবোদাসের পুত্র (অন্যমতে পৌত্র)[illegible] হবে[illegible] ভরত-রাজ সুদাসও দস্যু-অসুর নিহন্তা মহা[illegible] সুদাস-[illegible] অংহ্য, যুধ্যামধি, ভেদ প্রভৃতি মহাবলশালী [illegible]রগণকে নিপা[illegible] করেন। ভেদ অসুরের সহিত সংগ্রামে [illegible] ভেদের পশ্চাদ্ধাবম[illegible] হইয়া বেগবতী যমুনা নদীর পূর্ব্বে[illegible]কে বিনাশ করেন। [illegible]কীকট রাজ্যের (৬) সহিত[illegible]দাসের সংঘর্ষ হয়। আর্য্য পুরু-[illegible]শর প্রতাপান্বিত কুৎস (বা পুরুকুৎস) রাজাও অনার্য্য দাস-দস্যু-হননকারী বীর ছিলেন। পুরুকুৎসের পুত্র, এসদস্যু। পুরুরাজা 'এসদস্যু,' দস্যুজগতের ত্রাসসঞ্চারকারী। এসদস্যু দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত দস্যুনিধনকারী মহাবীর (৭)।

ঋগ্বেদে আর্য্যদের পরস্পরের মধ্যেও বহু তুমুল সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আর্য্যে-আর্য্যে সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এস্থলে কতিপয় যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা উদ্ধৃত করা হইল। ঋগ্বেদের ভারত আর্য্য রাজা ও রাজ্যসমূহে সমাকীর্ণ ছিল। অনু, দ্রুহ্যু, পুরু, যদু-তুর্ব্বসু ও ভরত—এই পঞ্চ আর্য্যবংশ এবং তদধিকৃত পঞ্চ আর্য্যরাজ্য ঋগ্বেদে সমধিক প্রসিদ্ধ। গন্ধার, আর্জীক, গুঙ্গু, চেদি, বৃষ্ণি প্রভৃতি অপরাপর আর্য্য রাজ্যের উল্লেখও ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত অনু, দ্রুহ্যু, যদু-তুর্ব্বসু, পুরু ও ভরত প্রভৃতি পঞ্চরাজ্যের অন্যতম পুরুরাজ্যের রাজা পূর্ব্বোক্ত পুরুকুৎসের সহিত অসিক্লী-প্রদেশবাসী আর্য্যগণের ঘোরসংগ্রাম হয়। তদ্বিষয়ে ঋকে আছে, 'হে অগ্নি! তুমি যখন পুরুর শত্রুপুরী বিদীর্ণ ও ভস্মীভূত করিয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিক্লী-প্রজাগণ ভোজন ত্যাগ করতঃ আগমন করিয়াছিল। অনু দ্রুহ্যু ইত্যাদি পঞ্চ আর্য্যবংশের মধ্যে ভরত-বংশই বোধ হয় সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ বংশ। ভরত-বংশের জনশক্তি ও সমৃদ্ধি ভারতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়(৮)। ঋগ্বেদের ভরতগণ 'তৃৎসু' নামেও অভিহিত। ভরত (তৃৎসু)-রাজগণ অতিশয় প্রতাপান্বিত। ভরত-রাজবংশে প্রাগুক্ত দিবোদাস ও সুদাস নৃপতিদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভরতরাজ দিবোদাসের সহিত যদু-তুর্ব্বসু রাজ্যের সংঘর্ষ হয় এবং দিবোদাস যদু-তুর্ব্বসুগণকে রণে পরাজিত করেন। দিবোদাসের পুত্র প্রাগুক্ত অমিতবিক্রম সুদাস রাজা 'সহস্রস্তু' যজ্ঞ (পরবর্ত্তী অশ্বমেধ যজ্ঞের স্বরূপ) করিয়াছিলেন। সুদাসের পুরোহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মন্ত্রে এক ঋকে আছে, 'সুদাসের অশ্বকে ছাড়িয়া দাও। সুদাস উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে শত্রু জয় করুন।' সুদাস-রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে দিগ্বিজয়ী বীরের অতুল মর্য্যাদা। ভরত-রাজ সুদাস আর্য্যজগতে বহুবার সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। আর্য্য অনু, দ্রুহ্যু ও যদু-তুর্ব্বসু রাজ্যের সহিত সুদাসের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এক সময়ে দশ জন পরাক্রান্ত রাজা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সুদাসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এই দশ রাজার সহিত সুদাসের যে তুমুল সংগ্রাম হয় তাহা ঋগ্বেদে 'দশ রাজার যুদ্ধ' নামে প্রকীর্ত্তিত। কথিত আছে, সুদাস একদা এক যুদ্ধকালে এক খরস্রোতা নদীর তীরে সৈন্যসমাবেশ করেন। নদীর তীরে উচ্চ বাঁধ ছিল। চয়মানের পুত্র বিপক্ষ-নেতা কবি অতর্কিতে আসিয়া নদীর বাঁধ কাটিয়া দিয়া সুদাসের সেনাসমাবেশ ও সমরসম্ভার বন্যার জলে ভাসাইয়া দিয়া সুদাসকে সুকৌশলে পর্য্যুদস্ত করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সুদাস তৎপূর্ব্বে ভীমবেগে কবির উপর পতিত হন। কবি সুদাসের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আসিয়া তাহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করে। জলে স্থলে চতু-[illegible]কে সুদাসের বহু যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। অনু, দ্রুহ্যু ও যদু-তুর্ব্বসু-প[illegible] সুদাসের হস্তে পরাজিত হয়। 'দশ রাজা' রণে সুদাস

([illegible]) অসুর অর্থে বল, তজ্জন্য দেবগণও ঋগ্বেদের স্থলে স্থলে 'অসুর' বলিয়া কথিত।

(৬) কীকট অনার্য্য রাজ্য—পরবর্ত্তী মগধরাজ্য বলিয়া কাহারও কাহারও অনুমান।

(৭) এসদস্যুর কীর্ত্তি বিষয়ে এক ঋকে এসদস্যুর পুত্র কুরু-শ্রবণকে বলা হইতেছে, 'হে কুরুশ্রবণ! যাঁহার কীর্ত্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থল, তুমি তাঁহার পুত্র।'

([illegible]) মহাভারতের প্রারম্ভাংশে একস্থলে আছে, 'ভরত-[illegible]শীয়দিগের [illegible]প্রাই মহাভারত।'

বিহারের লোক-সঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

বিবাহ-সঙ্গীত

বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। গানগুলির রচনা অধিকাংশ স্থলে মনগ্রাহী—সুরও ভাল। সুষ্ঠুভাবে গাওয়ার অভাবে কখনও কখনও ভাল লাগে না শুনতে। গায়িকাদলে—দু-চারজন সুকণ্ঠী থাকেন—যাঁরা ব্যতিক্রম তাঁরাও হয় গাওয়ার আনন্দে আর নয় সুলক্ষণ বিধায় সমবেত সঙ্গীতে যোগদান করেন।

বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রথমটি গ্রাম্য ভাষায় 'ছেঁকা' অর্থাৎ আশীর্বাদ—তার পর হয় 'তিলক'। তিলকে টাকা অলঙ্কার বাসন ইত্যাদি কন্যার পিতা দেন বরের গৃহে গিয়ে। তার পর হয় 'লগ্ন বন্ধন'—এতে বরের পিতা আসেন কন্যার গৃহে। লগ্ন বন্ধনের পর বিবাহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত চলে বিবাহের জের—তা কখনও মাসাবধি কাল কখন দুদিনও হতে পারে। চলতে থাকে অসময়ে প্রচুর হরিদ্রা তৈল সহযোগে স্নান, উপবাস এবং অমিতাহার—অসংখ্য ছোট বড় 'নেক' নিয়ম। বিবাহে আছে 'বটপূজা'। মণ্ডপ রচনা করা হয়, হরিদ্রা রঞ্জিত কলস, মাটির হাতি ইত্যাদি থাকে, বাঁশ রোপণ, কদলী বৃক্ষ স্থাপন—এসব আছে। বিবাহে যে হোম হয় তার নাম ঘি ঢাবী।

প্রথমে বরযাত্রীসহ বর দ্বারে পৌছালেন পালকী বা মোটরে; কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে একবার তাঁর বস্ত্রাঞ্চল বরের আসন স্পর্শ করাবার জন্য। তার পরে কন্যা ফিরে আসেন—আরম্ভ হয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অকথ্য গালি বর্ষণ বরকে এবং বিশেষ ভাবে তাঁর উৰ্দ্ধতন দু-পুরুষকে; বর চলে যান, তার পরে আবার ফেরেন, এবার তাঁকে মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। বিবাহের পর 'কোহবার'—বাসর ও ফুল শয্যার মিশ্রিত রূপ এই কোহবার।

'আর্য্য সমাজি' বিবাহ সংযোগ কিন্তু সুন্দর ব্যবস্থা। বিবাহে চার জন অগ্নির সম্মুখে সুললিত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে থাকেন—বরবধূ হোম করেন। এরূপ সুন্দর পাঠ আর কোথাও শোনা যায় বলে মনে হয় না, বঙ্গভূমিতে তো নয়-ই। শুধু নিখুঁত উচ্চারণ নয়—সঙ্গে আছে স্বরগ্রামের বৈচিত্র্য, গম্ভীর modulation, শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যায়। তবে আর্য্য-সমাজি বিবাহ কদাচিৎ হয়ে থাকে বিহারে।

বিবাহে অসংখ্য সঙ্গীত আছে। প্রথমে একটির নমুনা দিচ্ছি। এ সঙ্গীতে মহা পাষণ্ডেরও হৃদয় স্পর্শ করে। কৃষ্ণ রাধার নামে সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর কাহিনী। স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে চলেছেন—প্রথমা বলছেন যে তিনি সঙ্গে যাবেন। দ্বিতীয় বিবাহ যেন স্বাভাবিক, তাতে তাঁর কিছু বলার কারণই যেন থাকতে পারে না—কিন্তু শেষ মুহূর্তে চক্ষুর জল আর বাধা মানে না—

"যবে কৃষ্ণ চলল বিহায়ন্—
রাধা—হমহু লোন্দিনী বনি যৈবৈ
কৃষ্ণ—সুয়ে তুঁহু লোন্দিনীয়া বনি যৈবে
তব সভ আভরণ খুল ধরু লে"

যব কৃষ্ণ চলল বাগিচা বিচে
লোন্দিনী বিনিয়া ডোলারে
লোন্দিনী হেই বড়ি সুন্দরী।
যব কৃষ্ণ আয়ল পোখারি বিচে
লোন্দিনী পালকী সওয়ারে,
লোন্দিনী হেই বড়ি সুন্দরী—।
যব কৃষ্ণ আওল দুয়ারী—
লোন্দিনী নয়না সওয়ারে
য[illegible] কৃষ্ণ উতরল মাড়োয়া বিচে
[illegible]ন্দিনী মৌরিয়া সওয়ার
[illegible]ন্দিনী হেই বড়ি সুন্দরী
[illegible] কৃষ্ণ চলল কোহবার বৈসে
[illegible]ন্দিনীকে নয়না ঝর ঝর
[illegible]ন্দিনীয়া হেই বড়ি অসহরণ।

কৃষ্ণ—[illegible]ত শাণ্ড বলি কু বলিয়া
[illegible] হৈ নহিলে বিহায়ন।

শ্বশ্রূ [illegible]ত জো জানতু রাধিকা ধিয়ারা মোর আয়ত
[illegible] চন্দন সে অঙ্গন নিপতুঁ, রাধিকা পৈর পরত।

যখন স্বামী [illegible]তীয় বিবাহে চলেছেন—প্রথমা বলছেন তিনি দাসী হয়ে সঙ্গে [illegible]বেন। স্বামী বলছেন—তাহলে অলঙ্কারাদি খুলে রাখতে হয় [illegible]। স্বামী যখন বাগানে বিশ্রাম করতে বসেছেন, স্ত্রী পাখার ব[illegible]াস করছেন—দর্শকরা বলছে লোন্দিনী 'বড় সুন্দরী বড় ভাল।' [illegible] পরে স্ত্রী কখনও পালকী সাজাচ্ছেন কখনও বা স্বামীর নয়[illegible]াজল পরাচ্ছেন, কখনও বা মাথার মুকুট নিখুঁত করে পরিয়ে দি[illegible]ন—সকলেই সুখ্যাতি করছে। কিন্তু যখন বিবাহ শেষে স্বাম[illegible] তার নববধূকে নিয়ে বাসরে চললেন—তখন তাঁর অশ্রু আর বা[illegible] মানে না—তা দেখে শ্বশ্রূ বলছেন—দাসীটা বড় অসহিষ্ণু বড় [illegible]ক। শুনে স্বামী বলছেন—একে এমন করে কুকথা [illegible] আমার প্রথম বিবাহিতা পত্নী। শ্বশ্রূ অমনি স্নে[illegible] বলছেন—'যদি জানতাম আমার রাধা কন্যা [illegible]ন তবে [illegible] চন্দন-লিপ্ত করে রাখতাম—তাঁর চরণ প[illegible] চন্দনের ওপর!'

স[illegible] আড়ম্বরহীন ভাষায় এ [illegible]টিয়ে তোলার শক্তি দেখে বিস্মি[illegible] হতে হয়—এ সঙ্গীতের র[illegible] হয়ত সেই দুঃখিনী 'রা[illegible]'র কোন সখী অথবা জননী।

কন্যা—"কঁহা পৈসী খোজবা হো বাবা চন্দন কে চৌ[illegible]
কঁহা পৈসী খোজবা হো বাবা পণ্ডিত জামাইয়া—"
পিতা—কোন বন খোজ বৈ চন্দন চৌকিয়া
দেশ পৈসী খোজ বৈ পাণ্ডিত জামাই
কন্যা—'কঁহা বিছাবে বাবা চন্দন চৌকি
কঁহা বৈঠাবে বাবা পণ্ডিত জামাইয়া।

পিতা—মণ্ডপ বিছবৈ বেটী চন্দন কে চৌকি

কোহবার বৈঠৈবে বেটী পণ্ডিত জামাই।

গানটি চন্দনের চৌকিতে পাণ্ডিত জামাইকে বসাবার বিষয়ে। কোন বিশেষ অর্থ আছে বলে মনে হয় না—কিন্তু গানটি জনপ্রিয়।

"সীয়াকে সুমঙ্গল শুনি ভূপ সব আওল

রাজ রাজ ভাবে রাণী উদয় গিরি (?)

'আবু সীও রহল কুঁআর'—ধনুহা না টুটে

ধনুহা টুটল—জনক পুর অব গিয়ে দল সাজু।

এক মাঙ্গন মাঙ্গিহে জো বিধ হুরৈ

মাঙ্গিহে কৌশল্যা শাশু—শশুর রাজা দশরথ

লছমন—দেবর—মাঙ্গিয়ে রামচন্দ্র কান্ত।"

"সীতার বিবাহ শুনে রাজারা এসেছেন—ধনুর্ভঙ্গ [illegible] না। রাণী সখেদে বলছেন—'আর বুঝি আমার সীতার বিব[illegible] হ'ল না। তার পর ধনুর্ভঙ্গ হ'ল—'। এটি হ'ল ভূমিকা—এর [illegible] কন্যাকে প্রার্থনা করতে শেখান হচ্ছে—"বিধি যদি যাচ্ঞা প[illegible]রেন তবে যেন কৌশল্যার মত শশ্রূ, দশরথের মত শ্বশুর, লক্ষ্ম[illegible] মত দেবর আর রামচন্দ্রের মত স্বামী লাভ হয়—"।

কন্যা বলছেন—

বাবা কাহেলা লৈলা ইন্দর শোভা,

কাহে লৈলা মাণিক দিয়ারা।

পিতা—

তোহার লাগি বেটী ইন্দর শোভা—

ইজোর মাণিক দিয়ারা।

কন্যার বিবাহে ইচ্ছা নাই বলছেন—

বাবা হাথ জোরি—উঠহ হে ইন্দর শোভ[illegible]

পটক সে নিবাওয়া মাণিক দিয়ারা—

নিরুপায় পিতা বলছেন—

কৈ সে বেটী রাখুঁ অব তোহারি বা[illegible]

বিহা ন হোয় যব দুষে জাতিয়া—

"কেন এত শোভা কেনই বা এত আলোক [illegible] তোমার জন্যই এ সব। হাতজোড় করে কন্যা বলছেন—উঠি[illegible] দাও ঐ ইন্দ্র শোভা—নিভিয়ে দাও দীপাবলী। পিতা বল[illegible]—বিবাহ না দিলে যে জাতভাইরা অপরাধী করবে আমায় [illegible] হবে[illegible] [illegible]ভই হবে।"

আর একটি গান আছে—বিপরী[illegible]

"লাল হে ফটক কে রা[illegible]

উপর মাণিক [illegible]পরে

বেটী বৈসী জা[illegible]

'বাবা ক[illegible]শোয়ল?

[illegible]ত নিন্দে শোয়ল?

[illegible] বাগিয়া মে উতরল শশুর কে পুত

কুছ দাহে চাহি ওয়াকে—"

পিতা বলছেন—

"সোনাওয়া দেলুঁ বেটী রূপাওয়া দেলুঁ

হাথিয়া দল কে দাহেজ—

নহি দেবৈ বেটীয়া—ন দেবৈ

মোর মন্দির শূনা হোবৈ"

কন্যা পিতা ও ভ্রাতাকে সচেতন করছেন। শশুর-পুত্র এসেছেন—তাঁকে তো কিছু দেওয়া চাই। পিতা বলছেন—"সোনা রূপা দিয়েছি—হস্তী দল দাহেজ (দান) দিয়েছি—কন্যাকে দিতে পারব না, আমার গৃহ যে শূন্য হয়ে যাবে"। প্রকাশ-ভঙ্গীর সংযম এই ধরণের গানগুলির অন্যতম বিশেষত্ব।

'পরছন'—শব্দের অর্থ বরণ

রুনু ঝুনু বাজন বাজে সখী সব মঙ্গল গাওয়ে

কোন হি বর পরছন যাঁউ

শ্যাম বরণ, কুণ্ডল কানই—কণ্ঠ কণ্ঠ শোভায়

এ হি সে সুন্দর বর—পরছন যাঁউ"

বিবাহে 'দাহেজ'এর রেওয়াজ যথেষ্ট

"মৌরি যা শোভৈ হীরক মাণিকে

মোতিয়া পুরব শোভে কেশরে

সোনাওয়া সে দেলৈ রাজা রূপাওয়া অনৈর

দেহলা যুতলা রাজা মোতিয়ে জড়ায়।

হাথিয়া, ঘোড়াওয়া দেলে থারিয়া লোটাওয়া

ছল ওয়াকে দেলৈ রাজা মোতিয়ে জড়ায়"

এর অপর দিকে আছে—

"সোনাকে পালঙ্গ রূপা লাগাল চারো পাস

সমধিয়া বৈঠি খেলে পাশ (-শা)

কৌন হারৈ কৌন জিতৈ।

বেটী হারল—বেটী বাপ জিতল

ঝর ঝর কান্দে দুলারী বেটীয়া

বাপ মোর হারল জায়।"

"সোনার পালঙ্কে বসে দুই বৈবাহিক পাশা খেলছেন—কে জেতে কে হারে—কন্যার পিতা হারলেন—বরের পিতার হ'ল জয়। আদরিণী কন্যা কেঁদে আকুল হলেন পিতার পরাজয় দেখে।"

পর্ব্ব সঙ্গীত

'করমা' বিহারের মেয়েদের একটি বিশেষ পর্ব্ব। একাদশীতে উপবাস করে করম গাছের শাখা পূজা করা হয় বলে এর এই নাম। এটি বিশেষ ভাবে ভাইদের মঙ্গলার্থে বোনেদের পূজা। ভাদ্র মাসে এই পর্ব্ব। রাত্রে নারীরা একত্রিত হয়ে গান করেন। একটি বিশেষ গানের আমি পরিচয় দিচ্ছি—

"ভরি ভাদো ফুটলৈ ফুলওয়া বেলাঙ্গন

ঘোড়া চঢ়কে আওয়ে মোর ভাইয়া

অহে—সবহি কে ভাইয়া—"

"ভরা ভাদ্র, ফুল ফুটে আছে—ঘোড়ায় চড়ে আসছেন আমার ভাই, শুধু আমার কেন, সকলেরই ভাই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন।"

ভাই বলেন—

"লেহু হে বহনি—ফুলওয়া বেলাঙ্গন হে"

ভগ্নী বলেন—

"কেয়সে লিও হে ভাইয়া ফুল বেলাঙ্গন—

মোর গোদে বালক গদাধর—"

ভাই বলেন—

"বালক সুতাও বহনি—সোনাকে খাটোল মে
লেহি লেহু ফুল বেলাগুন।"

এই গানটির করুণ রস উপভোগ্য। বালকবালিকা খেলা করে ফুল নিয়ে, ভাইয়ের সঙ্গিনী হলেন ভগ্নী—তারপর পূর্ণ অবসরের পূর্ব্বেই বালিকা জননীর পদে অধিষ্ঠিতা হন—কিন্তু খেলার লোভ থেকেই যায়। ভাই যখন ফুল নিয়ে এসে বলেন চল খেলা করি—ভগ্নী বলেন—ফুল কোথায় গ্রহণ করি—আমার কোলে যে শিশু গদাধর। একটু নিরুপায় সুর যেন ধরা পড়ে—বালক গদাধরকে ফেলে কিছু ফুল নিয়ে খেলা করা চলে না। ভাই কিন্তু বলেন—"সোনার খাটে তোমার শিশুকে শয়ন করাও—ফুল গ্রহণ কর।"

'জিতিয়া' আর একটি পর্ব্ব। জিতাষ্টমী, আশ্বিনে এই পর্ব্ব। এটি বিশেষ করে জননীরা করেন সন্তানের মঙ্গলার্থে। অবশ্য এই দিনেই পূর্ব্বপুরুষদের জল তর্পণ কার্য্যও হয়ে থাকে।

জননী উপবাস করে গান করেন—

"ছান ছান অমৃত ছাঁছি
নস্তা পরল বাসি—
থোর এ ভাবলে।
সব বালক গৃহ আইলি
মোর লাল কঁহা রহলে।"

"কখন থেকে অমৃত ক্ষীর তৈরি করে ঢেকে রেখেছি। সকলের বাছারাই ঘরে ফিরে এল—আমার বাছার এত বিলম্ব কেন।" তারপর সন্তানকে ভোজন করিয়ে জননী কিছু গ্রহণ করেন সমস্ত দিন উপবাসের পর।

'তিজ' পর্ব্ব ভাদ্র মাসের—দিন রাত্রি উপবাস করে সধবা সোহাগিনীরা পূজা করেন—প্রতিবেশিনীরা মিলে চলে সমস্ত রাত নৃত্যগীত। পূজা হয়, ব্রতকথা শোনেন মেয়েরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত অথবা বৃদ্ধাদের কাছে।

এই গানটি তিজ পর্ব্বে প্রচলিত—

"মহাদেব ভিঁজল থৈয়া থাকিত রে রাম—
গৌরী কে শিরে নাহি পান-(নি) রে
বারি পইস কে কড়র নাহি ভাঙ্গলু এ রাম
ওহি বিধি শিরে নাহি পানি পান রে।
শাশীকে নিপলা পৈর নহি ধরলুঁ
বড় জেঠকে তুকার না মারলুঁ এ রাম
ওহি বিধি শিরে নাহি পান রে।"

"মহাদেব বারি বর্ষণে সম্পূর্ণ সিক্ত হয়েছেন—কিন্তু গৌরীর শিরে জলমাত্র নেই। কারণ আর কিছুই নয়—গৌরী বাগানের নব অঙ্কুরগুলি অসাবধান চরণাঘাতে ভেঙে ফেলেন নি—শ্বশ্রূ মহাশয়া কর্ত্তৃক গোময়লিপ্ত স্থানগুলিতে পা দিয়ে অমঙ্গল করেন নি—বয়োবৃদ্ধ এবং সম্মানিতদের বিষয়ে অসম্ভ্রম করেন নি—এই জন্যই পূর্ণ বর্ষণে মহাদেব সিক্ত হলেন কিন্তু গৌরীর শির শুষ্ক।" উত্তম ও অধম ব্যক্তি হাতে হাতে স্বকীয় কার্য্যের ফল লাভ করেন।

'ছট' পর্ব্ব হয় কার্ত্তিক মাসে—এ বড়ই আত্মপীড়নের পর্ব্ব। প্রায় দুদিন এক রাত্রি উপবাস করতে হয়, দিনের পর দিন নিষ্ঠাচারে থাকতে হয়—এই পর্ব্বে ব্রতচারিণীকে স্বহস্তে প্রসাদের গম বেছে পিষে পিঠা তৈরি করতে হয়—এ ছাড়াও আছে ফলাদির নির্ব্বাচন এবং বিশেষ বিশেষ 'নেক' নিয়ম। এ পর্ব্ব কখনও কখনও গ্রামে পুরুষও করে থাকেন, তবে তা কদাচিৎ। সূর্য্য দেবতাকে [illegible]র্ঘ্য দেওয়া হয় আকণ্ঠ শীতল জলে দাঁড়িয়ে—প্রথম অ[illegible] অস্তগামী, দ্বিতীয় অর্ঘ্য উদীয়মান সবিতাকে, সুতরাং কার্ত্তিকে[illegible]তল সন্ধ্যা এবং প্রভাত দুই-ই শীতল অবগাহনের প্রশস্ত [illegible] ছটে বহু সঙ্গীত আছে—আমি একটির নমুনা দিচ্ছি—

[illegible]জাড়ে নারিয়ারে বোজালি সোরি নৈয়া
কে নৈয়া পার উতারে হে—
[illegible]ম থে বৈয়া কৃষ্ণ বোজ রৈয়া
হরি কৃষ্ণ পার উতারে হে।"

তারপর প্র[illegible] হতে থাকে—

[illegible] কে জনমল দেবর বর রহতৈ রে
হাসতে খেলতে নৈয়া পার হে
[illegible]য়া কে জনমল ভাইয়া বর রহতৈ রে
হাসতে খেলতে নৈয়া পার হে

গানটির আর[illegible] যাই হোক শেষকালে এসে ঠেকেছে সম্পূর্ণ মেয়েলি ঘরে[illegible] কামনা-বাসনাগুলিতে। অবশ্য 'নৈয়া পার' বলতে জটিল দ[illegible]র কোন গূঢ় তত্ত্ব কিছু নেই হয় ত—কেবল মাত্র জীবনকে [illegible]বাহিত করে চলা। ভাই এবং দেবর প্রিয় পাত্র—এঁরা জীব[illegible] আনন্দ বর্দ্ধন করেন। রাম কৃষ্ণ খেয়া পার করেন বটে, কিন্তু [illegible] দেবর ও ভাইগুলির প্রয়োজন কিছু কম তো নয়।

এই [illegible] আছে—অনন্ত বন্ধন, রাখী বন্ধন পর্ব্ব, আছে ব[illegible] করা—[illegible] পূজায় ষষ্ঠী, অষ্টমী করা ইত্যাদি। সঙ্গীতা[illegible]লে প্রায় সবেতে[illegible] বিশেষ পর্ব্ব-সঙ্গীতই গাওয়া হয় ছোটখা[illegible] পর্ব্ব-উৎসবে। এই[illegible] সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে অতি সহজে[illegible]কটি সরল জাতীয় জীব[illegible]মূলে পৌছান যায়, আর কো[illegible]পায়ে এই পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় [illegible]।



নতুন-বৌ

শ্রীসাধনা কর

নিঃশব্দে বড়বৌ সুবীরদের ঘরের বন্ধ দরজায় কান পাতল। অস্পষ্ট গানের রেশ, হাসির আভাস, চুড়ি-বালার রিনিঝিনি। একটুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ। পরক্ষণেই মৃদু চাপা-গলার আলাপন। বড়বৌর মনে একটা তীব্র স্পন্দন খেলে গেল। এ ঘরের রহস্য তার জানা, একান্ত করেই জানা। দুটি নবীন প্রাণের প্রথম পরিচয়—পরম আশ্চর্য, অনন্ত মাধুর্যে ভরা। ওরা ভুলে গেছে বাইরের জগৎ। ভুলে গেছে—বাইরে রোদ উঠছে, বেলা বাড়ছে, পথে পথিক ছুটে চলেছে, দিনের কাজ অনেকক্ষণ সুরু হয়ে গেছে। সেখানে চলছে নিন্দা-প্রশংসা, হিস[illegible]-নিকাশ নিক্তি ওজনে। কোনো খেয়াল ওদের নেই। শু[illegible] দু'জনের মান-অভিমান, হাসি গান, আনন্দ নিয়ে রচিত যে [illegible] একটি জগৎ, সেই জগতের একমাত্র প্রাণী ওরা, নিগূঢ় রসে [illegible]ভোর। বড়বৌ একটু হাসল, বছর-বারো-চোদ্দ আগেকা[illegible]নগুলি তার চোখে সুস্পষ্ট ফুটে উঠল। বড়বৌর বয়েস তখ[illegible]ঠারো, অতীন ত্রিশ পেরোয় নি। সে ছিল নবোঢ়া, অতীনে[illegible]ৎসুক্য, আগ্রহ, আনন্দ ছিল অপরিতৃপ্ত, অসীম। ওদেরই [illegible] ভোর হলেও রাতের নেশা তাদের ফুরোতে চাইত না, বা[illegible]রের জগৎ থাকত অস্তিত্বহীন। কি কাণ্ডই যে তারা করত, এ[illegible] চকিত আভা ঝলকে উঠল বড়বৌর মুখে—যেমন ঝলকে ও[illegible] কুয়াশা-ছিন্ন অরুণ আলো হেমন্তের প্রভাতে; যেমন হাসে [illegible]ন্ধ্যাতারা শুকতারার আলোর আভাসে। নতুন বৌ সুষমা[illegible] বড়বৌ ডাকতে এসেছিল, কিছুতে ডাকতে পারলে না।

নীচে নামতেই শাশুড়ী, দিদি-শাশুড়ী, মা[illegible]মা অর্থাৎ সুবীরের মা হেঁকে ধরলেন।—নতুন-বৌ উঠল [illegible]?—ওমা! এসব আজকালকার কি ব্যাপার। বাড়িভরা [illegible]ক, গুরুজন রয়েছেন কত। এখনো নতুন-বৌর ঘরের দর[illegible] বন্ধ, লজ্জা-সরম নেই! পাড়াপড়শী জানতে পারলে [illegible]নিন্দের ঢি ঢি পড়ে যাবে। আগে এসব মা খুড়িমারাই বা[illegible]র বাড়ি থেকে শিখিয়ে দিত। আজকাল তো আর সে স[illegible]র বালাই নেই, তাই যত অনাছিষ্টি।

সন্ত্রস্ত হয়ে বড়বৌ আর একবার উপ[illegible] হবে[illegible]ও থমকে গেল। জেগেই তো রয়েছে ওরা, ই[illegible]চ্ছ না। ডাকবার তবে দরকার! নতুন-বৌ[illegible] খেয়াল নেই [illegible] তার শ্বশুরবাড়ি। পরের কাছে তার [illegible]ম্মান থাকা উচি[illegible] খাক বকুনি, একটু চৈতন্য হোক।

অর্ধেক সিঁড়ি থে[illegible]বৌ এল নীচে নেমে।—[illegible]রোজ রোজ ডাকতে বা[illegible]জ্জা করে! বৌ তো কচি খুকী নয় [illegible] চলতে পা[illegible] না? বাপের বাড়ি থেকে নয় একটা ঝি আন[illegible] রোজ ভোরে ডেকে তুলত।

বলতে বলতে বড়বৌ রান্নাঘরের কাজে চলে গেল। খানিক পরেই শুনলে বেশ বকাবকি চলছে বারান্দায়। বুঝলে সুষমা নিশ্চয় নেমে এসেছে। হাতের কাজ আপনা থেকে গেল বন্ধ হয়ে। বড়বৌর মনে অতীত দিনের কথা ভীড় করে এল। কম বকুনি খেয়েছে সে? ভোরে তবু উঠে আসতে পারত না, কোনোদিন ভাঙত না ঘুম, বেশীর ভাগ দিনই বাধ সাধত অতীন। বড়বৌর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বাইরের কোলাহলটা কমে যেতে কৌতুহলে সে এল বেরিয়ে। দেখলে, সিঁড়ির গোড়ায় সুষমা অত্যন্ত লজ্জিত বিব্রত জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে, মনটা উঠল ব্যথিয়ে। একেবারে আনকোরা ছেলেমানুষ নতুন-বৌ, চারদিকের হাব-ভাব বুঝে সমঝে চলতে পারে না। বড়বৌ এগিয়ে এসে সস্নেহে সুষমার কাঁধে হাত রেখে বললে—রাত ভোর হ'ল? তার-পরে, বকুনিটা লাগল কেমন?

সুষমা মুখ নিচু করলে। বড়বৌ বললে—পাগলি, নতুন-বৌ এসেছিস, কত বকুনি খেতে হবে। কত বকুনি আমরা খেয়েছি, সকালে কি আমরাই উঠতে পারতাম ছাই!

সমব্যথী পেয়ে মুহূর্তে সুষমার চোখ ছল ছল করে উঠল, আমি তো কখনই উঠে আসতে চাইছিলাম!

মাঝপথেই থেমে গিয়ে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, বড়বৌ হেসে ফেলে বললে,—"ঠাকুরপো আসতে দিলে না বুঝি? আমাদের অবস্থা কিছু ওরা বুঝতে পারে? আমাদের এদিকেও জ্বালা, ওদিকেও কষ্ট।" বলতে বলতে আবার বড়বৌ হেসে ফেললে, সুষমাও না হেসে পারলে না। চোখের সামনে এখনো সুবীরের নীরব মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি জ্বল জ্বল করছে। সুষমা যে তাকে ফেলে কিছুতে আসতে পারে নি তাই তো এত বেলা। সুষমা মুখ নিচু করে হাসলে, বড়বৌ তখন আপন স্মৃতিতে অন্যমনস্ক, সেদিনের স্মৃতিই তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে—অতীন আজকাল বছরে একবার দেশে আসে কিনা সন্দেহ। তার এখন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের ভাবনা, টাকা জমাবার আশা, কাজের উন্নতির চেষ্টা! তার "বাস্থর" জন্যে ঔৎসুক্য, আনন্দ, উদগ্রীবতা কোথায়? সুবীরের বিয়েতে আসবার জন্যে কত করে সে চিঠি লিখেছে, একটা প্রগাঢ় আশা নিয়ে রয়েছে, অতীন না এল, না দিল চিঠির উত্তর। বড়বৌ বুকভরা দীর্ঘ-শ্বাস চেপে ফেললে, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে দেখলে সুষমা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বড়বৌ তার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বললে—হাসছিস্ যে বড় সত্যি বলি নি···ওমা, কে!

বাড়ির গেট পেরিয়ে মচ মচ শব্দে একজন লোক আসছিল। সে যে অতীন, চিনতে বড়বৌর দেরি লাগল না। সুষমাকে টিপে দিয়ে বললে—তোর ভাসুর, সরে আয়।

দেখতে দেখতে বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে গেল, অতীনের আসাটা একান্ত অপ্রত্যাশিত। বিয়ের চিঠি অবশ্য তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু না আসাটাই লোকে ধারণা করে নিয়েছিল, হঠাৎ সে একমাসের ছুটি নিয়ে সোজা মামার বাড়ি এসে উপস্থিত, সবাই অত্যন্ত খুশী, কথাবার্তা শেষ করে বিশ্রাম নিতে নিতেই অতীন উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠল—বিয়েতে তো আসতে পারলাম [illegible] কেমন হ'ল বৌ, দেখি।

সুবীরের মা নতুন-বৌ নিয়ে এলেন। বললেন—অতীনকে প্রণা[illegible]ও বৌমা।

সুবীরের পিসীমা অতীনের মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—দূর থেকেই প্রণাম দিও গো, বুঝলে, আজকাল তো আবার দাদা বলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা রীতি হয়েছে। কতই ঢঙ দিনে দিনে দেখলাম। সুষমা দূর থেকেই মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম জানালে। বউ দেখে অতীন উচ্ছ্বসিত—এ তো বেশ বউ হয়েছে, চমৎকার বউ। রূপে লক্ষ্মী, গুণেও বৌমা আমার নিশ্চয় নিপুণ, কি বলব মামিমা, বৌমা কাজকর্ম রান্নাবান্না জানে তো ?

আমতা-আমতা করে সুবীরের মা বললেন—ইস্কুলে বোর্ডিঙে থেকে পড়ত, পড়াশুনা, সেলাই, বাজনা এসব তো ভালই জানে, তবে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজও জানে বলেই শুনেছি।

মুখ বাঁকিয়ে সুবীরের ঠাকুরমা বললেন—একটু-আধটু পড়া-শুনা, সেলাই, বাজনা ওই তো হয়েছে আজকালের ফ্যাসান। ঘর-সংসার রান্নাবান্নাতে তবে গা বাঁচিয়ে চলা যায়। বিয়ের আগে কতই শুনলাম,—মেয়ে কাজকর্ম জানে, ভাল রান্না করতে পারে, এখনো তার নমুনা তো দেখলাম না।

লজ্জায় সুষমার কান উঠল গরম হয়ে। সবার সামনে, বিশেষ করে যে ভাসুর তাকে এত প্রশংসা করছেন তাঁর সামনে এমন করে বলাতে সুষমার মাথা নিচু হয়ে গেল। সকালে দেরি করে ওঠাতে এরা সবাই আজ তার উপরে অসন্তুষ্ট। তখনো দিদিশাশুড়ী এমনি সব কথাই বলেছিলেন। সুষমা কাজকর্মে সত্যিই একটু গা বাঁচিয়ে চলে, এখানে সে নতুন-বৌ। কি যে করবে, কি যে না করবে, কেন যে ত্রুটি আর কিসে প্রশংসা, এখনো সুষমা সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। তাই কাজ করতে সে পিছু-হটা। অচেনা অজানা লোকের মধ্যে, নতুন পরিবেশে ভয়ে লজ্জায় সংকোচে যথেষ্ট আড়ষ্ট। নয় তো সে কি কাজকর্ম রান্নাটান্না জানে না, না, গুছিয়ে করতে পারে না। এ তো অযথা নিন্দা, ভারী রাগ ধরল সুষমার।

অতীনও সুষমার পক্ষ নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—এ দিদি তোমার ভুল-কথা। কখখনো নয়, নিশ্চয় বৌমা ভাল রান্না-বান্না, ঘর-সংসারের কাজকর্ম জানে। নতুন এসেছে, তাই ভয় পাচ্ছে। দাও তো বৌমা রান্না করে আজ সবাইকে তাক লাগিয়ে, মা-মাসীর দল থ' বনে যাক্।

ঘোমটার মধ্যে সুষমার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল, মনে মনে সে জিদ ধরলে—রান্না করে নিজ হাতে পরিবেশন করে সে সবাইকে খাওয়াবে। অপমানের, নিন্দার নেবে প্রতিশোধ।

*   *   *

বড়বৌ মনে মনে একটু হাসল, নতুন-নতুন সব কাজেই উৎসাহ লাগে খুব। সেও একদিন এমনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে, একা-একা রান্নাবান্না, ঘর-গুছোনো, সেবা-শুশ্রূষা করতে আনন্দ পেয়েছিল। সেদিন এমনিতরো সবার সপ্রশংস দৃষ্টি, উৎসাহ-বাণী পাওয়া যেত। আজ সুষমার সেই দিন, মহা উৎসাহে শাশুড়ী-জা সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সে রান্না করতে ব্যস্ত। বৌমা রান্না করবে,—ভাসুর গিয়ে বাজার থেকে এনেছে তিনটে-চারটে ইলিশ মাছ, কইমাছ, পাঁচ [illegible] সের দুধ। পায়েসটা অবশ্য জিয়াজিয়থরে রান্না হচ্ছে। মাছের ঘরেও আয়োজন প্রচুর। সুষমা আনন্দে গর্বে উদ্বেল। তার কাপড়ে লেগেছে হলুদের ছোপ, মশলার দাগ, মাথার ঘোমটা বার বার যাচ্ছে খলে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আগুনের তাতে রাঙা করসা সুন্দর মুখ যেন রোদের তাপে ঝামরে-আসা সাদা স্থল-পদ্ম। সুবীর ঘুর ঘুর করে ঘুরে ঘুরে গেল আশেপাশে। সুষমার নতুন মাধুরী তার চোখে লেগেছে অপরূপ, নেশা লাগিয়েছে মনে। তাদের চোখে-চোখে বার বার যে চলছে দৃষ্টি-বিনিময়, বড়বৌর সেটা চোখ এড়াল না। একবার সে একটা স্বল্প টিপ্পনী কাটতেই সুবীর লজ্জা পেয়ে সদরে পালিয়ে গেল। মামীশাশুড়ী সুবীরের মা হেঁসেলের দরজায় বসেই আছে। এটা ওটা উপদেশ দিচ্ছেন, সস্নেহ তিরস্কার [illegible]রছেন। সুবীরের বাবা টিকে ধরাবার ছলে বৌয়ের কাজ [illegible] যাচ্ছেন, আঁটঘাট গোছানো কাজের প্রশংসা করছেন। [illegible]দি-শাশুড়ী পিসী-শাশুড়ী সবারই দৃষ্টি আঁস রান্নার ঘরে। [illegible]ছ করেই বড়বৌ একটু তফাৎ রইল। করুক না কাজ, [illegible] যাক নতুন বৌয়ের কত গুণ। একা একাই কেমন সব কর[illegible] পারে। সকাল থেকে বড়বৌর মনটা বিকল হয়ে গেছে। [illegible]যমাকে দেখে-দেখে কি যে একটা ব্যথা কেবলই মনে গুম[illegible] উঠছে, বড়বৌ বুঝতে পারছে না; অতীত বছরের টুকরোটা[illegible]। স্মৃতি, দু-দশটা কথা, হয় তো এক একটা ঘটনা, কেবলই ম[illegible] ভেসে বেড়াচ্ছে। বিবশ হচ্ছে বড়বৌ। ছেলে ঘুম পাড়া[illegible] ছল করে সে কিছুতে দুপুরে পরিবেশন করতে গেল না। [illegible]রে রইল শুয়ে।

আপ[illegible] চিন্তায় মগ্ন হয়ে কখন তার চোখে এসেছিল তন্দ্রা, হঠাৎ রান্না[illegible]র ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনে চমকে জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে [illegible]একটা চাপাহাসির ধ্বনি, বড়দের সমবেত কণ্ঠ—আহা, হা, [illegible] গেল। কোথায় লাগল। জল দাও, রগড়ে রগড়ে দাও। [illegible]কর্ণ হয়ে উঠল বড়বৌ। ভাত দিতে গিয়ে কিছু একটা কাণ্ড [illegible]য়েছে। বড়বৌর আর শুয়ে থাকা হ'ল না। দ্রুতপায়ে রান্না[illegible]রের দিকে আসতে আসতে শুনলে, অতীন রাগত স্বরে বলছে—তোমাদের সবার বুদ্ধি দেখে আমি অবাক। এই ছেলেমানুষ ব[illegible] এতবেলা অবধি রান্না করছে, আবার সেই একা-একা ভাত দি[illegible] এতগুলি লোককে। কেন, বাড়িতে কি আর [illegible] কেউ কি এসে একটু সাহায্য করতে পারে না[illegible]

সুবী[illegible]র পিসীমা অত[illegible] মা কাছেই ছিলেন বসে, খাওয়া তদারক [illegible]করছিলেন, তীক্ষ্ণ ক[illegible]লে উঠলেন—বড়বৌয়ের সে বুদ্ধি [illegible]গালে তো। নতুন-[illegible] এসে না সাহায্য করলে সে [illegible] দিতে-থুতে পারে কি ?—

[illegible]ড়বৌ গিয়ে হেঁসেলে ঢুকল। গুমরে [illegible] বললে [illegible]হাদুরি করে খুব একা পরিবেশন করুক। আ[illegible] [illegible]লুম না সাহায্য করতে। সরিয়ে দিলে কেন। এখন বড়-বৌর যত দোষ, নতুন-বৌর তো সাত খুন মাপ।

মুখ ভার করে ভ্রূ কুঁচকে বড়বৌ পরিবেশন করতে শুরু করলে। সুষমা ততক্ষণে সেখান থেকে পালিয়েছে।

সবকিছু ঠিক করে এনে খাটের কাছে নৌকাডুবি, বেলা বাজে একটা দেড়টা। সকাল থেকে এতক্ষণ যে সুষমা কত

আনন্দে রান্না-বান্না করছিল, তা সেই জানে। নিজের উৎসাহেই রান্না শেষ করে তড়িঘড়ি স্নান সেরে সে তাড়াতাড়ি গিয়েছিল ভাত দিতে। কিন্তু তাল ঠিক রাখতে পারলে না। ঘরে খেতে বসেছিলেন শ্বশুর, ভাসুর। বারান্দায় সুবীর, পাশের বাড়ীর ছেলে অনীত, আর দেবরদের দল। সমবয়সী অজিতকে সুবীরই কখন গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিল। যা ফাজলামি আর ঠাট্টা-মস্করা তারা করছিল। ভয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে, উদ্বেগে সুষমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। বুকে সজোরে ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে লাগল। শাশুড়ী, পিস্-শাশুড়ী দুয়ারে বসে তদারক করছেন। কখনো বলছেন আঁচলটা ঠিক করে নাও বৌ, খসে পড়ছে যে। কখনো বলছেন—আহা, হাতাটা আর একটু উঠিয়ে দিও, পাতের ছোঁয়া হয়ে যাবে [illegible]। সুষমা এমনিতেই জবুথবু, আরো গেল ভড়কে। স্থি[illegible] বুদ্ধিতে কিছু যেন করতে পারলে না। বারান্দায় অজিতকে [illegible]নী দিতে গিয়ে চারদিকের কলরব চাতুরী, ফাজলামিতে [illegible]নী দিয়ে ফেললে সুবীরের পাতে। একটা প্রচণ্ড হাসির [illegible] উথলে উঠল। থতমত খেয়ে অপ্রস্তুত সুষমার ত্রস্তে পা[illegible] যেতে যেতে হঠাৎ পা গেল পিছলে। মাথা ঘুরে পড়তে [illegible]ত টাল সামলে নিলে, কিন্তু হাত থেকে পড়ে গেল থালা[illegible], হাতাটা ছিটকে পড়ল অদূরে। থালাতে চাট্‌নী অবশ্য [illegible] ছিল না, বাটি থেকে কিছুটা মাত্র ঢেলে এনেছিল। কিন্তু [illegible]জায় সুষমা কাঠ! চারদিক থেকে হাসি, সমবেদনার রব [illegible]ঠতেই সে অচেতন হয়ে কোনোমতে হেঁসেলে এল পা[illegible]য়ে। থপ করে বাসনটা নামিয়ে রেখে একেবারে সেখান থে[illegible] অন্তর্ধান। আর কি সে মুখ দেখাতে পারে!

পূবের কোঠার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সুষ[illegible] লজ্জায় মরে যাচ্ছিল, পেছন থেকে ডাক এল—নতুন-বৌ[illegible] ও নতুন-বৌ।

পরনে রঙীন শাড়ি, হাতে যার লাল শ[illegible], কপালে যার টিপ, নতুন যে মানুষটি এল বাড়িতে, স[illegible] তাকে ডাকে নতুন-বৌ। দু-তিন বছরের ছোট ছে[illegible] অতি বিস্ময়ে গম্ভীর আগ্রহে তাকে দেখে। একটু আ[illegible]ল আড়ালে থেকে কচি মিঠে গলায় ডাকে—নতুন-বৌ [illegible] নতুন-বৌ, নতুন-বৌ।

বড়জায়ের আর সব ছেলেদে[illegible] মধ্যে [illegible]লেটিকে সুষমার ভারি ভালো লাগে, [illegible] আধময়লা রঙ[illegible] ফুটফুটে চেহারা, চোখে মুখে দুষ্টুমি[illegible] চক্‌মক্ করছে যেন ক[illegible] ধানের নতুন শীষ, নবীন আ[illegible] ভাসে প্রাণ-চঞ্চল। [illegible] করে সুষমা তাকে কো[illegible] তুলে নিলে। ছুটতে গিয়ে অপা[illegible] হয়ে অপ্রতিভ [illegible] দুহাতে মুখ ঢাকলে। সুষমার মন উছলে [illegible]। [illegible]ল ছোট ভাইটির কথা, বাড়ির কথা, মা-বা[illegible] কথা। দাদার তাকে নিতে আসবার কথা ছিল, এলেন [illegible] তো। এ দুদিনেই কি তাকে তাঁরা ভুলে গেলেন; আঘাত-প্রাপ্ত মন অভিমানে দুঃখে ভরে গেল। বাড়িতে কত দিন কত দোষ ত্রুটি সে করেছে, মায়ের বকুনি খেয়েছে, বাপের সস্নেহ উপদেশ শুনেছে! এখানকার সঙ্গে সেখানকার দোষ-ত্রুটির কত তফাৎ। এমন লজ্জা-ভয়-অপমান কখনো লাগে নি। চোখে তার জল উপচে উঠল। কখন সবার অজান্তে সুবীর এসে দাঁড়িয়েছিল সুষমার পাশে, হেসে সুষমার মুখ তুলে ধরলে—ঈস্, গঙ্গাতে যে বান ডাকল! বোকা মেয়ে, সবাই রান্নার খুব প্রশংসা করছে, ওটুকু ব্যাপারে চোখে জল আসবার কিছু হয়নি!

সুবীরের আদরে সুষমা সচকিত হয়ে চোখের জলের ভিতরে সলজ্জ হাসলে। বললে—তোমাদের জন্যেই তো এ কাণ্ড। পরের মেয়ে, অপদস্থ করতেই চাও। দয়ামায়া কিছু নেই।

কথাটা শুনে বোধ হয় নীলুর মজা লাগল। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে—কিট্টু নেই, কিট্টু নেই।

সুবীর সুষমা হেসে উঠল। নীলু মুখ লুকালে। সুবীর গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—ভারী সুন্দর লাগছে সু, ওকে কোলে নিয়ে, এমন মানিয়েছে।

কি ছিল সুবীরের কথার সুরে, চোখের চাওয়ায়, সুষমা রাঙা হয়ে উঠল—ধ্যেৎ। তুমি ভারি ইয়ে। যাও যাও!

—বেশ তাই যাচ্ছি। কিন্তু ভারি সুন্দর লাগছে সু···।

বাইরে অতীনের গলা শুনে সুবীর চকিতে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। সুষমা হাসলে। কি ছেলে, বাবাঃ। দাদার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে! কি যে সব বলে—যাঃ।

কোথায় ভেসে গেল সুষমার অভিমান, অপমান, দুঃখ, লজ্জা। আনন্দে পুলকে নিবিড় স্বপ্ন ঘনিয়ে এল মনে। আষাঢ়ের দুপুরে মেঘ আর রৌদ্রে অনবরত অপরূপ মনোহর খেলা চলছিল। দুরন্ত হাওয়া ছুটছিল দামাল ছেলের মত। ক্ষণে ক্ষণে পশলা পশলা ঝরছিল জল, ক্ষণে ক্ষণে মেঘের আড়াল সরে গিয়ে ঝিকিমিকি খেলছিল রোদ। সুষমা সে দিকে তাকিয়ে আপনা ভুলে গিয়েছিল। নীলু ডাকলে—তোমাকে যে মা ডাকছেন নতুন-বৌ, এই নতুন-বৌ।

স্বপ্ন-বিভোর সুষমার মনে হ'ল—এমন সুখে-দুঃখে-ভয়ে-লাজে-মেশানো আশ্চর্য অপূর্ব দিনে এ ডাকটাই যেন সব থেকে তাকে মানায়। নতুন, নতুন, সব কিছু তার নতুন। নতুন জন্ম, সে নতুন-বৌ।

বড়জায়ের ডাক শুনে সুষমা বাইরে বেরিয়ে এল। অতীন বললে—কতটা বেলা হয়েছে, এবার বৌমাকে নিয়ে খেতে যাও।

বড়বৌ পান দিচ্ছিল, সুষমার দিকে হেসে তাকিয়ে অতীনকে খোঁচা দিয়ে বললে—খুব যে বৌমার উপর দরদ দেখা যাচ্ছে। রান্নার প্রশংসায় তো একেবারে পঞ্চমুখ!

অতীন হাসিমুখে বললে—সত্যি বৌমার রান্না বেশ হয়েছে। এমন রান্না অনেক দিন খাইনি।

বড়বৌ আবার সুষমার দিকে তাকিয়ে হাসল। দুজনের চোখে চোখে একটু ইসারা হ'ল। বড়বৌ মুখ টিপে হেসে বললে—একদিনে অত তেল ঘি দিয়ে রান্না করলে আমাদের [illegible]রান্নাও বেশ হয়, কি বলিস্ সুষমা!

[illegible] সঙ্গে সঙ্গে অতীন হেসে বলে উঠল—তবু এমন স্বাদ হলে

তো [illegible]

ব[illegible] আর সহ্য করতে পারলে না। নিজের অজান্তেই

বিকল মনের নিগূঢ় ব্যথাটা এল বেরিয়ে। স্বাদ নয় গো, স্বাদ নয়। বৌমা যে তোমার নতুন? তাই তো তার সাত খুন মাপ। তাস্তরের এত খোঁজখবর। তার ভাইটির এত ঘুর ঘুর অন্দর মহলে। যাক দু' দিন, তখন আর বছরের শেষে বাড়ি আসবার কথা মনে পড়বে না। চাকরীর ছুটি পাওয়া যাবে না। রান্নার স্বাদ হবে না। অস্বীকার করলে কি হবে? বুঝি গো, সবই বুঝি। একদিন তো আমরাও নতুন ছিলাম এখনই না হয় পুরোনো হয়ে গেছি। চল্ সুষমা, খেতে চল্। চাপাহাসি মুখে নিয়ে অতীন তাড়াতাড়ি নেমে গেল। সুষমা একটু অবাক হয়ে বড় জায়ের দিকে চাইলে—দিদি কি বলেন। এমনও হয় না কি।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী

ভারতের সমাজসংস্কারকগণের কথা স্মরণ করিতে বসিলে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম সর্ব্বশেষে পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার গৌরবদীপ্ত স্মৃতি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর উপর এমন সুদূর ও সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে তাঁহার কথা সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য হইয়া পড়ে। তাই বোধ হয় ফরাসী দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁ—যিনি এক দিন শ্রেষ্ঠ মানবরূপে আদৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও দয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে হইয়াছে :

"শঙ্করাচার্য্যের পর বেদের এত বড় পণ্ডিত আর জন্মে নাই। ইহা খাঁটি সত্য কথা যে তিনি (দয়ানন্দ) ব্রাহ্মসমাজ এমন কি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাবকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় চেতনার পুনর্জ্জন্ম ও পুনরুদ্বোধনের দিনে এই পরাক্রান্ত সন্ন্যাসী দেশবাসীকে কি যে এক দুর্জ্জয় শক্তি দ্বারা উত্তোলন করিয়াছেন তাহা দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য বার বার বলিয়াছি।"

এই উক্তিটিতে দেখা যাইতেছে যে দার্শনিকপ্রবর দয়ানন্দের কথা বার বার বুঝাইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। বাস্তবিকই এই প্রয়োজন আমাদের নিকট রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। পরতন্ত্রতার বীজ ভারতের যে যে স্থলে যত বেশী শিকড় গাড়িয়াছে সেই সেই স্থলেই দয়ানন্দের খ্যাতি ততটা প্রসারিত হইতে পারে নাই, বোধ হয় এই কারণেই যে দয়ানন্দের জীবনেতিহাস শুধু একটা বিপ্লবের কাহিনীবিশেষ—অবিদ্যা ও অসত্যের সহিত প্রবল সংগ্রামের ইতিহাস মাত্র। তিনি ভারতীয় তথা প্রত্যেক মানবসম্প্রদায়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ ভ্রান্তি ও মিথ্যার প্রবল এবং অকাট্য প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দাসত্বের বৈচিত্র্য এমন যে ইহা জীবনের উপর সকলপ্রকার নির্ম্মম অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবার শক্তি আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বাগত ব্যবস্থা অর্থাৎ গতানুগতিক পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম সহিবার শক্তি দান করে না। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলা, আসাম, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে দয়ানন্দের নাম সুপ্রচারিত হইতে পারে নাই। এই সক[illegible] স্থানের মধ্যে বাংলার কথা সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। অন্যত্র দয়া[illegible] সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ কোন ধারণাই জন্মে নাই। কিন্তু ব[illegible]য় তাঁহার সুখ্যাতি প্রচারের পরিবর্ত্তে অখ্যাতির ঘোষণা বেশী করিয়া হইয়াছে এবং অদ্যাপি তাহা বন্ধ হয় নাই। এমন [illegible]পণ্ডিত ও শিক্ষিত [illegible]জও স্বামী দয়ানন্দের সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতে অগ্রণী [illegible]

য[illegible]উক, দয়ানন্দের মত একজন ব্রহ্মচারী ও দিব্যতেজসম্পন্ন [illegible] পুরুষ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা কিংবা মিথ্যা প্রচার [illegible] কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। তাঁহার বিষয় অনে[illegible] অজ্ঞ রহিয়াছেন বলিয়া এরূপ অসত্য প্রচার সম্ভবপর হইতে[illegible]

স্বা[illegible]য়ানন্দ গুজরাট প্রদেশে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক[illegible]ন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আজমীঢ় শহরে পরলোকগমন করেন। [illegible]মার অবস্থায় কিশোর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি অশেষ ত[illegible], অমানুষিক শারীরিক ক্লেশ এবং কঠোরতাপূর্ণ তপস্বী জীবন অ[illegible]বাহিত করিয়া যান। ভারতীয় বিভিন্ন সমাজের সহিত তাঁহার [illegible]দীর্ঘ জীবনব্যাপী যে তুমুল সঙ্ঘর্ষ চলিয়াছিল, তাহার চরম পরি[illegible] রূপে তাঁহাকে দুষ্টজনপ্রদত্ত বিষপানে আত্মাহুতি দিতে হয়। [illegible] সেজন্য তিনি একটুও ভীত বা বিচলিত হন নাই। অসীম ধৈ[illegible] সহিত আপন জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া যান।

উত্তর-ভা[illegible]তর প্রায় সর্ব্বত্র এবং বোম্বাইপ্রদেশে তিনি বেদ ও বৈদিক ধর্ম্মে[illegible] প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বেদের ভাষা ভিন্নরূপ। ভাষ্য ব্যতীত [illegible] বুঝিতে পারা যায় না। প্রামাণিক বেদভাষ্যগুলি প্রায় স[illegible]ই বিলুপ্ত। যেগুলি কালের প্রচণ্ড আবর্ত্তেও টিকিয়া গিয়াছি[illegible] সেগুলি ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এই বিকৃত ব্যাখ্যা[illegible]তে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ায় ভারতে[illegible] অধঃপতনে[illegible] সুগম হইয়া গিয়াছিল। বেদের প্রতি অশ্র[illegible] বাড়িয়া উঠিয়াছে[illegible] বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কার[illegible] অথচ বেদই আর্য[illegible] (হিন্দুদের) নিকট সর্ব্বপ্রধান এবং অপ[illegible]হার্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ। একটা [illegible]ম সুসভ্য জাতির পক্ষে ইহা [illegible]ক্ষা মহা অনিষ্ট আর কি হইতে পা[illegible] এই দুর্গতি নিবারণ[illegible] স্বামী দয়ানন্দ বেদভাষ্য প্রণয়ন করেন। [illegible]হার বেদভাষ্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত এইরূপ :

"অন্তে যে ভাষ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হউন না কেন স্বামী দয়ানন্দই সর্ব্বাগ্রে পূজিত হইবেন কারণ তিনিই ভাষ্যের প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশৃঙ্খলা, অবিদ্যা, অন্ধকার ও বহুশতাব্দীর ভ্রমজালে জনতা আবদ্ধ ছিল। তাঁর দৃষ্টিই ইহা ভেদ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল।"

বেদভাষ্য ব্যতীত ঋগ্বেদাদির ভাষ্যভূমিকা, সত্যার্থ-প্রকাশ, সংস্কার-বিধি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। এতদ্দ্বারা যুগযুগান্তরের ভ্রমজাল ও কুহেলিকা স্তূপের উপর যে কি প্রবল আঘাত লাগিয়াছে তাহা সম্প্রতি সিন্ধুপ্রদেশের সত্যার্থ-প্রকাশের কতকাংশ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে। প্রকৃত শক্তিমান না হইতে পারিলে সত্য ও ন্যায়কে সহজভাবে স্বীকার করা যায় না, একথা পুনরায় প্রমাণিত হইল।

স্বামী দয়ানন্দের সময়ে ভারতে তথাকথিত সনাতনী হিন্দু-দিগের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। একমাত্র বেদই হিন্দুর নিকট সনাতন বলিয়া হিন্দুরা কথায় আপনাদিগকে বেদপন্থী অর্থাৎ সনাতন পন্থীরূপে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ বহুদিন হইতে বেদের সহিত সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং [illegible]বদবিরুদ্ধ আচার ও ধর্ম্মকেই সনাতনপন্থা বা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহ[illegible] করিয়া-ছিলেন। এজন্য দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদ সম্বন্ধে [illegible]নীস্তন ধুরন্ধর পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রবিচারের প্রয়োজন বো[illegible]রেন। সর্ব্বপ্রথম কাশীনগরীতে কাশীনরেশের সভাপতিত্বে [illegible] বিরাট বিচার-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচার-সভায় কাশীর [illegible] মহো-পাধ্যায় বালশাস্ত্রী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, বাংলার তারাচ[illegible] তর্করত্ন প্রভৃতি তখনকার শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত দয়া[illegible]নন্দের যে শাস্ত্রবিচার ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে অনেকেই ভ্রান্তধা[illegible] পোষণ করিয়া প্রচার করেন যে দয়ানন্দ ঐ বিচারে পরাজিত [illegible]। কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত "দয়ানন্দচরিত এবং ঋষীন্দ্র[illegible]ন" এই দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিবরণ পাওয়া [illegible]। গ্রন্থ দুইখানিতে লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বিচার-স[illegible] স্বামী দয়ানন্দের সহিত পণ্ডিত তারাচরণের সামান্য প্রশ্নো[illegible] চলিবার পর, শেষে পণ্ডিত তারাচরণ দয়ানন্দের প্রশ্নের কো[illegible] উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব হইয়া যান। তখন বালশাস্ত্রী [illegible]খ পণ্ডিত-গণের সহিত দয়ানন্দের অনেকক্ষণ শাস্ত্রবিচার [illegible]লে। কিন্তু পরিশেষে দয়ানন্দের নিকট সকলেই পরা[illegible] হন। ১৭ই জানুয়ারি, ১৮৭০ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহা[illegible] এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :

"The Vedas says he (Dayanand[illegible] entirely ignor idol-worship, and he challenged the[illegible] to meet him in argument. Sometime ago [illegible]ja of Benares held a meeting in which [illegible] great Pandits and elite of Benares. A[illegible]ous and p[illegible]acted *logomachi* took place between Dayananda S[illegible]swati and the Pandits, but the la[illegible] notwithstandin[illegible] their boasted learning and deep [illegible]nt into the Shastr[illegible] met with a signal discomfitu[illegible]

তৎকালীন কলিকা[illegible] 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'লাহোরের [illegible]ন প্রদায়িনী পত্রিকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রেও উল্লিখিত বিবরণ সমর্থি[illegible] [illegible]রি সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কাশীর বিচার-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁহার নিজের মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন যে দয়ানন্দ কাশীর শাস্ত্র-বিচারে বিজয়ী হন। কাশীর বিচারের কয়েক মাস পরে বাংলা-দেশের চুঁচড়া শহরে প্রাগুক্ত কাশীরাজপণ্ডিত তারাচরণের সহিত দয়ানন্দের আর একবার উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রার্থ বিচার হয়। এই চুঁচুড়ার বিচার সম্বন্ধেও অদ্যাপি অনেকে এই ভ্রান্ত মত প্রচার করেন যে উক্ত বিচার-সভায় তারাচরণের উপস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া দয়ানন্দ আর বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই অর্থাৎ দয়ানন্দ যেন ভয়েই পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরি লিখিত জীবনীগ্রন্থ দুইখানিতে এ সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ বর্ণনা এইরূপ যে চুঁচড়ার তর্কসভায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণ উপস্থিত ছিলেন। মূর্ত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ নহে তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন এবং দয়ানন্দ তাহা খণ্ডন করেন। দয়ানন্দের তর্কজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া তর্করত্ন মহাশয় পরস্পরবিরোধী, অশুদ্ধ এবং অপ্রাসঙ্গিক উক্তি করিতে করিতে শেষকালে বলিয়া বসেন—"উপাসনামাত্রেব ভ্রমমূলম্।" তাহাতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীজন বলিতে লাগিলেন—"তারাচরণ মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করিতে আসিয়া নিজেই তাহা খণ্ডন করিয়া গেলেন।" সভার অন্তে দয়ানন্দ সদ্ভাবের সহিত জিজ্ঞাসা করিলে তারাচরণ সর্ব্বসমক্ষেই বলিয়াছিলেন—"মূর্ত্তিপূজা ত মিথ্যাই বটে, তবে উদরান্নের জন্যই উহা সমর্থন করিয়া থাকি। ইহা না করিলে কাশীরাজ যে অবিলম্বেই বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।" উল্লিখিত দয়ানন্দজীবনী দুইখানি অনেকদিন পূর্ব্বেই বাংলায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত তাহাতে লিখিত কোন বিবরণেরই প্রতিবাদ বাহির হয় নাই, তথাপি কাহারও কাহারও মনোভাব বর্ত্তমানে এতদূর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে কল্পিত প্রাধান্যজ্ঞাপনার্থে জাজ্বল্য-মান মিথ্যার আশ্রয় লইয়াও নিন্দাপ্রচার করিতে আর কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ হয় না। কিন্তু ইহাতে যে পরিণামে নিজেদেরই ক্ষতি হয়, এটুকু বুঝিবার সামর্থ্যও আজ নাই। পরাধীনতার চরম কুফল যদি হইয়া থাকে তবে তাহা এইখানেই।

স্বামী দয়ানন্দ এইভাবে প্রায় দশ বৎসর কাল ধরিয়া বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এবং অবৈদিক মতবাদের খণ্ডন করিতে করিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের মত উদ্দামগতিতে ভারতের নানা স্থানে প্রচারকার্য্য করেন। তাঁহার এবম্প্রকার বিপ্লবাত্মক কার্য্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তথা রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন যে এক দিকে তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য, যশ, প্রতিপত্তি আদি দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করেন, অন্যদিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁহার প্রাণহানি করিবারও প্রয়াস পান। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই দয়ানন্দ শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবনকে বলিদান দিলেও, একমাত্র সত্য ও ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার শক্তিতেই আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হন। শুধু বিচার ও বক্তৃতা দ্বারা দেশের বা সমাজের স্থায়ী কোন উপকার হইতে পারে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া পরিশেষে তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে সর্ব্বপ্রথম 'আর্য্যসমাজ' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহার কিছুকাল [illegible] লাহোরে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আর্য্যসমাজই হই[illegible] তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁহার মৃত্যুর [illegible]রে আর্য্যসমাজ এক দিকে ভারতের নানা স্থানে গুরুকুল বা ব্রহ্মচ[illegible] বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন

করিয়াছে, অন্য দিকে সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানেও প্রসারলাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিয়া জয়লাভ করায় এক্ষণে ইহার কথা ভারতের জনসাধারণের নিকট সুবিদিত। শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার, অনাথ ও দুঃস্থ সেবা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে আর্য্যসমাজের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতামত উল্লেখ করিলে বিষয়টি সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে।

পঞ্জাব-কেশরী লালা লজপত রায় বলিয়াছেন,

"স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আমার গুরু, আমার ধর্ম্মপিতা এবং আর্য্যসমাজ আমার ধর্ম্মমাতা।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন :

"আর্য্যসমাজের সিদ্ধান্ত ও দেশ-সেবাকে আন্তরিক প্রশংসা করি।"

মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য এইরূপ :

"তিনি (দয়ানন্দ) ভারতের আধুনিক ঋষি, সংস্কারক ও মহাপুরুষদের মধ্যে অন্যতম। মাতৃভূমির প্রয়োজন অনুসারেই তিনি সং[illegible] পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

সর্ব্বশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধানিবেদন উদ্ধৃত হইল :

"যাঁহার দৃষ্টি ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একতা ও সত্যের সন্ধান পাইয়াছিল, যাঁহার মনোবল ভারতীয় সর্ব্ব অঙ্গকে প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছিল, যাঁহার আহ্বান ও বাণী ভারতকে অবিদ্যা, আলস্য ও ভ্রমজাল হইতে মুক্ত করিয়া সত্য ও পবিত্রতায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং অতীত গৌরবকে উজ্জ্বলতা দিয়াছিল সেই মহান্‌গুরু স্বামী দয়ানন্দকে আমি প্রণাম করি।"

ইহা বলা বাহুল্য যে, উপরি-উক্ত মহামনীষীগণের মতামত পাঠ করিলেই দয়ানন্দ স্বামীর চরিত্র ও মহত্ব সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারা যায়। তিনি যে ভারতের জাতীয় চেতনার অগ্রদূত ছিলেন, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। সহস্রাধিক বৎসর হইতে এই অতীত মহিমান্বিত ভারতবর্ষ যে পুঞ্জীভূত অবিদ্যা ও অসত্য সঞ্জাত মোহাচ্ছন্নতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল,—আবর্জ্জনা-সঙ্কুল গতানুগতিক পন্থার প্রতি যে একটা শোচনীয় আসক্তি পরিলক্ষিত হইতেছিল,—অদম্য আত্মশক্তির প্রতি [illegible] হারাইয়া যে প্রকার তুচ্ছ পরানুকরণ-প্রবৃত্তি সমুদ্ভূত [illegible]য়াছিল,—যাহা অপেক্ষা কোন জাতির জীবনের পক্ষে মারাত্মক [illegible]র কিছু হইতে পারে না, সে সকলের মূলে স্বামী দয়ানন্দ [illegible]সা যেন ভীষণ উল্কাপাতের মতই প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন। [illegible] দেখা যায় যে তাঁহার তিরোধানের ক্ষণেই ভারতের জাতীয় [illegible]গ্রেস জন্মলাভ করিল। এই জন্যই কি শ্রীমতী খদিজা বেগম, [illegible]এ, মহোদয়া বলিয়াছেন—"যদি তিনি (দয়ানন্দ) ভারতবর্ষে [illegible]না জন্মিতেন তবে মনে হয় মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক ও [illegible]লা লজপত রায়ের ন্যায় দেশভক্তদিগকে আমরা পাইতাম [illegible]।"

এইরূপ [illegible]কজন পুণ্যশ্লোক মহামানবের কথা যতই আমরা শ্রদ্ধার স[illegible] স্মরণ করিতে সমর্থ হইব ততই আমাদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত [illegible]ইবে, একথা কে অস্বীকার করিবে?

উর্দু ভাষার ক[illegible]

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌ[illegible]

যে ভাষার ইতিহাসে যত বেশী বড় কবির উদ্ভব হয়েছে সে ভাষার বনিয়াদ তত বেশী দৃঢ়। পদ্যময় বাণীর প্রভাব জনসাধারণের মনে বহুকাল স্থায়ী থাকে এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও লোকের মুখে মুখে তা বহমান হয়ে কালজয়ী হয়।

উর্দু ভাষা বেশী দিনের নয় তা অনেকেরই জানা আছে। আকবর বাদ্‌শা এই ভাষার গোড়াপত্তন করেন এবং বহু হিন্দু ও মুসলমান এই ভাষার চর্চ্চা করে তাকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করেছেন।

হিন্দী এবং উর্দু ভাষার মূলগত ব্যবধান আক্ষরিক এবং কিয়ৎপরিমাণে শাব্দিক। হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দের ও উর্দুতে ফারসী ও আরবী শব্দের সমধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান কালে মীর দর্দ, মির্জা গালিব, চকবস্ত্ ও ইকবাল উর্দু ভাষায় কবিতা লিখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছাড়াও বহু কবি ও লেখক এই ভাষায় কবিতা ও গদ্যর[illegible] করে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের অন্যতম [illegible]ষ্ঠ ব্যবহারজীবী সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুও উর্দু ভাষার এ[illegible] খুব উঁচুদরের লেখ[illegible] ও কবি। কেবলমাত্র উর্দু সাহিত্য চর্চ্চায়ই যদি তিনি তাঁর [illegible]য় ও শক্তি নিয়োজিত করতেন তাহলে হয়ত তিনি ঐ ভাষার [illegible]শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে পরিচিত হতেন।

যে দুই [illegible] প্রতিভার কিরণ-সম্পাতে উর্দু সাহিত্য-জগৎ স[illegible] তাঁরা হচ্ছেন চকবস্ত্ ও ইকবাল। তাঁদের [illegible] নাম [illegible]-পণ্ডিত বৃজনারায়ণ চকবস্ত্ ও সর্ মহম্মদ [illegible]বাল।

উ[illegible] আর একজন বড় [illegible] হচ্ছেন আজাদ। তিনিই উর্দু [illegible]ষার নব যুগের প্রবর্ত্তক[illegible] কবিতায় নূতন ধরণের ভা[illegible]চনা-শৈলী ও নব নব ছন্দের প্র[illegible] করেছেন। তাঁর স[illegible] বলা হয়েছে :

"The same path of wine, flowers, youth a[illegible] beauty [illegible]s traversed by many a poet but no one had the [illegible]ourage to shake off this spell and like Wordsworth in English poetry, to begin a new era in Urdu poetry save and except Azad and then he being followed by Akbar, Chakbust and Iqbal.

কবি আকবর আজাদের প্রবর্ত্তিত ধারাকে বিস্তৃততর করে তোলেন আর তার পরেই ইকবাল ও চকবস্ত্ তাকে সুদূর-

প্রসারী করে সর্ব্বজনসমাদৃত হন। তাঁদের প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে উর্দু কাব্য-সাহিত্য অভিনব লাবণ্যশ্রীতে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আকবর, চকবস্ত্‌ ও ইক্‌বাল এই তিনজনই হচ্ছেন উর্দু ভাষার সেরা কবি।

আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত তিন জন কবির কবিতা নিয়েই আলোচনা করব।

দেশহিতৈষণা ও সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা আকবরের রচনায় ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে।

উর্দুতে পূর্ব্বে অনেক আদি রসাত্মক অশ্লীল কবিতা রচিত হ'ত কিন্তু আকবর, চকবস্ত্‌ ও ইক্‌বাল নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করে উর্দু সাহিত্যকে আবর্জ্জনামুক্ত করেন।

তথাকথিত স্বার্থপরায়ণ ভণ্ড দেশনেতাদের কবি আকবর বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করেছেন। একটি কবিতা[illegible] তিনি বলেন—

"কৌম্‌ কে গম্‌ হঁয়···
খাতে হঁয় হক্কা মেঁ। কে সাথ
গম্‌ লাভার কো বহুত হয়
মগর আরাম কে সাথ

দেশের নেতা সরকারী আমলাদের সঙ্গে খানাপি[illegible] করেন ও নিজের আরামের দিকে সর্ব্বদা সজ[illegible] দৃষ্টি রা[illegible]ন কিন্তু মুখে বলেন জনসাধারণের উপকারের জন্যেই তাঁ[illegible] এ সব করছেন।

কবি আকবর বোঝাতে চেয়েছেন যে বিনা স্বার্থ[illegible]াগে, শুধু ফাঁকা কথায় নেতা হওয়া যায় না। নেতা বলে তা[illegible]ই সবাই মেনে নেয় যিনি দেশের জন্যে সর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ [illegible] দিতে প্রস্তুত আছেন। মিথ্যা সম্মান ও পদবীর মোহ [illegible]ান কোন দেশনায়ককে যে সময় সময় বিভ্রান্ত করেছে তা [illegible]কে দারুণ পীড়া দিয়েছে; তাই তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী স্বদে[illegible]সীকে এই মিথ্যা মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করতে নিয়োজি[illegible]য়েছিল।

অবশ্য এ কথা মেনে নিতে হবে যে তাঁর [illegible]েের রচনায় তীক্ষ্ণতার চেয়ে হাস্যরসের সমাবেশ বেশী।

আকবরের কবিতা অতি উচ্চ ভাব[illegible]—তাতে মনে অনেক রকমের ভাবনার উদয় হয়।

এক জায়গায় বলছেন:

আয় স ভী বাগ মে [illegible]
তেরা অমল [illegible] ভাবাহ,
হঁস দিয়ে গুলমে[illegible]
ইয়া[illegible]ন হো গয়ে।

অবাধ বায়ু ফুলের [illegible] এসে সব ফুলকে প্রস্ফুটি[illegible] করে হাসিয়ে খেলিয়ে [illegible] একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আবা[illegible]লেছেন—

খুসামদ ইস বাত সাফাক কী,
কিস্‌কো বহাতী হয়,
কোই ক্যা শৌক্‌সে করতা হয়,
মজবুরী করাতী হয়।

এর মর্ম্মার্থ হ'ল—বায়ু এলোমেলো ভাবে বহে কিন্তু তাকেও এক ঐশী শক্তি জোর করে পথামর্দেশ করে দেয়।

ইক্‌বালের শৈশবের ও কৈশোরের লেখা বড়ই সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। যৌবনে তিনি দেশভক্তি ও দেশহিতৈষণা নিয়ে অজস্র কবিতা রচনা করেন, সেগুলিও উচ্চাঙ্গের। পরিণত যৌবনে তিনি সুফী ধর্ম্মের আদর্শে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। লাহোর কলেজের ছাত্র ইক্‌বাল ও পরিণত বয়সে রাজনৈতিক খ্যাতিসম্পন্ন সর্ মহম্মদ ইক্‌বাল যেন আমাদের নিকটে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইজন মানুষ রূপে প্রতিভাত হন। যৌবনে যাঁর কণ্ঠ মুখরিত হয়ে উঠেছিল দেশপ্রেমের জয়গানে, তাঁকে পরিণত বয়সে আমরা দেখতে পাই এক প্রবীণ ও পরম প্রাজ্ঞ সুফী রূপে। শেষজীবনে তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন তখন বিশেষ ভাবে গোঁড়া সুফীদের একজন প্রিয় কবি ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের বাণীপ্রচারক।

শেষবয়সে ইক্‌বাল উর্দু ছেড়ে ফারসীতে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর গ্রন্থরাজি প্রধানতঃ ফারসী ভাষাতেই রচিত হয়েছে।

ইক্‌বালের সমর-সঙ্গীত 'হিন্দুস্থান হমারা'-কে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত বলে গণ্য করা হয়। এ গানটির সহিত ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রীর যোগ স্থাপিত হয়েছে—এতে সন্দেহ নেই। এক ইংরেজ সমালোচক বলেছেন:

Iqbal has done much for the enlightenment of Indians in particular and the Muslims throughout the world in general.

মানবতার পূজাই কবির ধর্ম্ম, কিন্তু ইক্‌বাল শেষ পর্য্যন্ত সে আদর্শ মেনে চলতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা সুফী ধর্ম্মের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে তিনি নিয়োগ করেছিলেন এবং তাই তিনি উর্দু ভাষা ছেড়ে ফারসী ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

Iqbal's claim to greatness as a mystical poet is indisputable and his knowledge of the Sufi doctrines is wide and thorough together with unrivalled proficiency in Persian language.

তাঁর জীবনীতে এ কথাও বলা হয়েছে:

Iqbal's early poetry breathes one both for the Hindus and Muslims although later he declared that he would be content to be a poet of Islam.

পণ্ডিত ব্রজনারায়ণ চকবস্ত্‌ তাঁর উর্দু কবিতায় যে আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন তা উর্দু ভাষাভাষীর পরম সমাদরের ও গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে। অন্ধগোঁড়ামি, কষ্টকল্পনা, কথার মারপ্যাঁচ অণুমাত্র তাঁর রচনায় নেই। তাই তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

There is, however, not much similarity between Iqbal and Chakbust, while the former is one-sided, the latter has an attraction for, and appeals to, all alike in India . . . Chakbust is very broadminded—he is a patriot as also a nationalist.

তিনি স্বদেশ ও স্বদেশবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে [illegible]লেখনী ধরেছিলেন এবং আজীবন কাব্য-সরস্বতীর একাগ্র স[illegible]না করে গেছেন; রাজনীতি বা অন্য কোন আকর্ষণ তাঁকে তাঁর [illegible]র্দিষ্ট পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। ইক্‌বালের ন্যায় [illegible] বিদেশে যাওয়া হয়ে ওঠে নি, তাঁর কাব্যগ্রন্থ উর্দু

ছাড়া অন্ত ভাষায় খুব কমই অনুবাদিত হয়েছে। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে উর্দু ভাষাভাষীর নিকটে তিনি চিরদিন পরম সমাদৃত হয়ে থাকবেন।

তাঁর সম্বন্ধে এক সমালোচক বলেছেন:

Chakbust paints 'Azadi' in words which thrill everyone and presents before his readers a glimpse of the bright future which is India's well-deserved right.

দেশসেবা ও দেশহিতৈষণার চেয়ে জগতে অন্ত কোনো কিছুই বড় নয়—এ কথাই তিনি বহু কবিতায় বোঝাতে চেয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কবিতা রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি কিন্তু দুঃখবাদী বা নিরাশাবাদী ছিলেন না; অফুরন্ত নির্ম্মল আনন্দ সর্ব্বদা তাঁকে ঘিরে থাকত এবং মহা বিপৎপাতেও তিনি ধৈর্য্যহারা হতেন না। তাঁর কবিতা পাঠকদের চিত্তে উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

চকবস্তের কবিতায় বর্ণিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা-দুঃখ, বেদনা ও অন্তর্দাহ সবই তাঁর নিজস্ব—তাতে কৃত্রিমতা নেই। জীবনে তিলে তিলে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, সুখে-দুঃখে তাঁর অন্তরে যে ভাবধারার উদ্ভব হয়েছিল, তাঁর কবিতায় তাই রূপ পরিগ্রহ করেছে। জীবনের আলো-আঁধারের ছবিই তিনি এঁকে গেছেন, তাই তিনি বলছেন:

এহ জোস-এ পাক
জমানা দবা নহী সকতা,
রগো মে খুন হরাবত
মিটা নহী সকতা,
এই আগ ও হয়
যো পানী বুঝা নহী সকতা
দল বুঁ মে আকে
এহ আরমান দা নহী সকতা।

একটা যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় জাতির অন্তরে যে আত্ম-বলিদানের প্রেরণা জাগে তা কেউ দমিয়ে দিতে পারে না, এ জলন্ত আগুন বাতাসে নিভাতে পারে না। এই যে আত্ম-ত্যাগের শক্তি তা চিরদিন অজেয় হয়ে থাকে।

দেশ স্বাধীন না হলে দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হয় না, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হতে পারে না। তাই স্বরাজ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক লোকের মনে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে।

চকবস্ত্ বলছেন:

দিল তড়প্ তা হয় ক্যা
স্বরাজ পয়গাম মিলে,
কাল মিলে, আজ মিলে,
সুবহ মিলে, সাম্ মিলে।

স্বরাজ পেয়েছি এই মহা শুভ সংবাদের জন্তে সর্ব্বদা সতৃষ্ণ হয়ে আছি। আজ পাই, কাল পাই, প্রাতে পাই কি সন্ধ্যায় পাই—সব সময়ই তা পাবার জন্তে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

এই আকুতিকে কবি তাঁর অপূর্ব্ব ও মধুর ছন্দে যে রূপ দিয়েছেন, অন্ত ভাষায় তা বোঝান অসম্ভব।

আর একজন সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে বলছেন:

Chak[illegible]ust does not usually point out those defects which a[illegible] likely to make a man pessimistic; he only gives a [illegible]ar lead towards the goal of his desire. . . . he is a[illegible]ys clear.

তাঁ[illegible] অনেক সময় সমাজ সংস্কারকের কাজও করতে হয়েছে। [illegible]মাজের প্রাচীন ও নবতম পরিবর্ত্তনের সমন্বয় করতে তাঁকে [illegible]সর হতে হয়েছে কিন্তু কখনও তাঁর মধ্যে নৈরাশ্য-বাদের [illegible]ণ দেখা যায় নি। প্রতিকূলতার সম্মুখে কখনও তিনি নিজেকে [illegible]রুপায় বলে মনে করেন নি। কারণ তিনি অপরাজেয় পে[illegible]যে, অসীম মনের বলে ও সাহসের দৃঢ়তায় একান্ত ভাবে আ[illegible]শ্বাসী ছিলেন। তারই সঙ্গে আর একটা বিশেষ গুণ ছিল [illegible], সেটি হচ্ছে সরলতা।

ইকবা[illegible] ও চকবস্ত্ দু'জনেই পরলোকগত হয়েছেন কিন্তু তাঁদের [illegible] অবদান, তাঁদের কাব্য ও ভাবধারা দেশবাসীর হৃদয়ে চি[illegible]ন জাগরূক থাকবে ও পরাধীন জাতির অন্তরে আশার বা[illegible]বহন করবে।

অন্তান্ত [illegible] কবি, যাঁদের অবদানে উর্দু ভাষার কাব্যজগৎ গৌরবান্বিত [illegible]র নাম হচ্ছে—বলী, আবরু, মজমুন, নাজী, য়করং, হাতি[illegible] আরজু, ফুগাঁ, মজহর, সৌদা, খোজ্, যুরঅত, হসন, ইন্সা, ম[illegible]ফী, নজীর, নাসিম, আতিশ, যৌক, গালিব, নসীম, অসীর, হ[illegible] ইত্যাদি।*

* এ প্রবন্ধ লি[illegible] হিন্দী কবিতাকৌমুদী (রামনরেশ ত্রিপাঠী প্রণীত) চতুর্থ ভাগ [illegible]য়েছি। ইকবাল ও চকবস্ত্ সম্বন্ধে সকল উদ্ধৃতি Allahab[illegible] Magazine (December, 1938) থেকে নেওয়া হ[illegible]।

অভিযাত্রী

শ্রীসত্যব্রত

নিবিড় আঁধারে দশদিশি ঘেরা দীর্ঘ দুপুর রাত্রি,
জনহীন পথ স্তব্ধ নীরব নাহি চলে কোন যাত্রী।
নবীন আশার অঞ্জন মাখি নয়নে,
অভিযানে চলি তমসাবৃত গহনে,
আহ্বান-লিপি পাঠায়েছে মোরে আজ
চলিয়াছি তাই ফেলে রেখে সব কাজ।

নির্ভীক প্রাণ শঙ্কা না মানে,
চলিয়াছি রাতে অজানার টানে
উদয়-অচল-তীর্থের পানে
আমি যে গো অভিযাত্রী
দুর্ব্বার বেগে ছুটে চলিয়াছি
দীর্ঘ তামসী রাত্রি।

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে"

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

প্রায়ই শোনা যায় যে গণতন্ত্রের স্থাপন এবং সংরক্ষণ ইংলণ্ডের অনুসৃত আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য। নিজের দেশের বাহিরে ইংরেজ যেখানেই গিয়াছে সেখানেই নাকি অশ্বেতকায় জাতিসমূহকে সুসভ্য করিয়া তুলিবার ব্রত সে গ্রহণ করিয়াছে।

ইহা যে কত বড় মিথ্যা কথা তাহার প্রমাণ মিলিবে দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনুসৃত ইংরেজ নীতিতে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা বর্ণ-বৈষম্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষের একটি প্রধান কেন্দ্র। সে দেশের শ্বেতকায় শাসক গোষ্ঠী মনে [illegible]রেন যে তাঁহারা অনন্যসাধারণ। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে তিনটি [illegible]ভ্যতার সম্মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি সর্ব্বোদ্ধত [illegible]শ্চাত্ত্য (ইউরোপীয়) সভ্যতা, দ্বিতীয়টি শান্ত এবং অহি[illegible] প্রাচ্য (ভারতীয়) সভ্যতা এবং তৃতীয়টি স্থানীয় বাণ্টু-সভ্[illegible]। এই শেষোক্তটিকে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন আখ্যাই দেওয়া [illegible]ল না।

রাষ্ট্রক্ষমতা কবলিত করিয়া শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশি[illegible]র দল স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট এবং [illegible]বেমান-মার বোঝা চাপাইয়া দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেন না[illegible] নিজের দেশে তাঁহারা "Hewers of wood and d[illegible]wers of water."

দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি [illegible] মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। স্ব-সম্প্রদায়ের আধিপত্য বজায় রা[illegible]বার জন্য শ্বেতাঙ্গগণ অশ্বেত জাতিদিগের সম্বন্ধে ভীতির উদ্[illegible] করিয়া তাহা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি ক[illegible]তেছে না।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় আনুমানিক ৬৫,৯৬,৬৮৯ [illegible]দিম অধিবাসীর বাস। এই সংখ্যা শ্বেতকায় অধিবাসী[illegible]র সংখ্যার তিন গুণ। একদা স্বাধীন আদিম অধিবাসিগ[illegible] অদৃষ্টবৈগুণ্যে দাসত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতব[illegible] হরিজনদিগের সহিত তাহাদের অবস্থার তুলনা চলিতে পা[illegible]। ভারতবর্ষে কোন কোন অঞ্চলে হরিজনদিগের জন্য পৃথক [illegible]বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্ব্বত্রই অনুরূপ [illegible]বস্থা রহিয়াছে। তাহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলগুলিকে [illegible] হবে [illegible] (Reserve) বা 'লোকেশন' (Location) বলা [illegible]। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ই দক্ষিণ-আফ্রিকাতে যাবতী[illegible]পারে নিরঙ্[illegible]ক্ষমতার অধিকারী। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়[illegible]নীরবে তাহাদের [illegible]আদেশ প্রতিপালন করিতে হয়। [illegible]বস্থা গণতন্ত্রের পরিপ[illegible]।

"ভার্ডিক্ট অন সা[illegible]আফ্রিকা'র (*Verdict on S[illegible]uth Africa*) লেখ[illegible]প. এল. যোশী বলেন,

"The [illegible]history of South African natives is a b[illegible]k [illegible] inhumanity and injustice perpetrated by [illegible] minority over the majority; a narrative of namele[illegible] horrors practised by the strong over the weak."

স্থানীয় অধিবাসীদিগের শিক্ষায় প্রতি সরকার একেবারেই উদাসীন। শ্বেতকায়দিগের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অশ্বেতকায়দের শিক্ষার জন্য নামমাত্র অর্থ সাহায্য করিয়াই সরকার নিজ কর্ত্তব্য পালন হইল বলিয়া মনে করেন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা কিছু চেষ্টা প্রকৃত প্রস্তাবে মিশনরীগণই করিয়াছেন এবং করিতেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রতি শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের শিক্ষার জন্য বার্ষিক সরকারী ব্যয় জনপ্রতি ১৬ পাউণ্ড ৭ শিলিং ৬ পেন্স। পক্ষান্তরে প্রতি দেশীয় ছাত্রের জন্য ব্যয় হয় ৫ শিলিংয়েরও কম। প্রায় ১০ লক্ষ কৃষ্ণকায় বালক এবং কিশোরের শিক্ষার কোন সরকারী ব্যবস্থা নাই। মিশনরী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। দেশীয় লোকদের উচ্চতর শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবলমাত্র ফোর্ট হেয়ার কলেজ (Fort Hare College) তাহাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দেশীয় শিক্ষকদিগকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাতে তাঁহাদের দিন চলা ভার।

শ্বেতাঙ্গ প্রভু ইচ্ছা করিলে তাঁহার কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যকে বেত্রদণ্ড দিতে পারেন। অবশ্য এইজন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি প্রয়োজন। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কিন্তু ভৃত্য কোন সময়েই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। স্থানীয় অধিবাসীদিগের ছাড়পত্র ব্যতীত গৃহের বাহিরে যাইবার উপায় নাই। এই জাতীয় বহু আইন রহিয়াছে। ইহাদিগকে বলবৎ রাখিবার জন্য অর্থ ব্যয়ে সরকারের কার্পণ্য নাই।

ট্রান্সভালের শাসনবিধিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সাম্য থাকিবে না। তুলনীয়—

"There shall be no equality between white and black either in Church or State.")

দুই একটি ভিন্ন দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ে অ-শ্বেতকায়দিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি এশিয়া মহাদেশীয় (Asiatic) বলিয়া একবার ডার্বানের একটি গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। স্বর্গত সি. এফ. এণ্ড্রুজ (C. F. Andrews) আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,

"In such an act of refusal I felt that Christ himself had been denied entrance in his own church, where his own name was worshipped. Those who knew the fact best told us that such things were constantly happening in South Africa."

দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার সযত্নে বর্ণ-বৈষম্যকে জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে সে দেশের আইনের মধ্যে শতকরা ৯০টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণ-বৈষম্যের প্রশ্রয় দেয়। জাতি সাম্যের কল্পনাতেও সে দেশের [illegible]সমাজ, রাজনীতি-ধুরন্ধর ও রাষ্ট্রপরিচালকগণ শিহরিয়া উঠেন।

ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিতে নিজেদের পোষা কুকুর অপেক্ষাও এ[illegible]জন কৃষ্ণাঙ্গের জীবনের মূল্য কম। প্রথমোক্তগণকে একথাও বলি[illegible] শোনা গিয়াছে যে সহস্র কৃষ্ণকায় ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা একটি [illegible]দের জীবন অধিকতর মূল্যবান।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কোন শ্বেতাঙ্গ আজ পর্য্যন্ত কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। আদিম অধিবাসীর শ্বেতকায় হত্যাকারী কোন শাস্তি পায় নাই বা নামমাত্র দণ্ড পাইয়াছে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

স্থানীয় অধিবাসীদিগের উদ্যান, চিত্রশালা, যাদুঘর বা সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ, ট্রেনে তাহাদের জন্য পৃথক কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। বহু জায়গায় তাহাদিগের ট্রামে বসিবার অধিকার নাই। কোন কোন স্থানে আবার তাহাদিগের বসিবার জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে! কোথাও বা আবার তাহাদের জন্য পৃথক ট্রামই রহিয়াছে। শহর বা শহরতলীতে ব্যবসায়ের অধিকার তাহাদিগের নাই। কেবল মাত্র ভৃত্যরূপে তাহারা নগর অঞ্চলে অবস্থান করিতে পারে। ছুটির দিনে অথবা রাত্রিতে স্ব-স্ব প্রভুর নিকট হইতে বিশেষ ছাড়পত্র ব্যতীত কোন কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারে না। এই ছাড়পত্র এবং খাজানার দাখিলা চাহিবা মাত্র দেখাইতে হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাদের কোন কথাই গ্রাহ্য হয় না। নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আন্দোলনও তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক। স্ব-সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যাহারা আন্দোলন করে আইনের বলে তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা ছাড়া রাজদ্বারে লাঞ্ছনা এবং অর্থদণ্ড ত আছেই।

ইউরোপীয় সভ্যতা কৃষ্ণাঙ্গদিগের পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। এই বিপর্য্যয়ই তাহাদিগের নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী। আর এই নৈতিক অধোগতিরই অপরিহার্য্য অশুভ পরিণাম স্বরূপ আসিয়াছে ঘোরতর আর্থিক দুর্গতি। শ্বেতকায়দিগের অর্থনৈতিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ বুয়র ট্রেকার (Trekker)-গণ তাহাদিগের মৃগয়া করিবার অঞ্চলগুলি জোর করিয়া অধিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। আর তাহাদিগের অধিকাংশ জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকার তাহাদের সর্ব্বনাশের যাহা বাকী ছিল তাহা সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করে দারিদ্র্যের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যেই সে বর্দ্ধিত এবং প্রতিপালিত হয় আর এই দারিদ্র্যের মধ্যেই তাহার জীবনের দেনা-পাওনার হিসাব শেষ হয়। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অধঃপতন এবং অপরিচ্ছন্নতা তাহার চির-সহচর।

কৃষ্ণাঙ্গদিগকে শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১০ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ৪০টিরও বেশী আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই জাতীয় আরও বহু আইনের প্রস্তাব এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

১৯০৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেপ (Cape) প্রদেশে আদিম সাম্যের নীতি অনুসৃত হইত। বর্ণ এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করিত। কিন্তু ১৯০৯ সালের সাউথ আফ্রিকান এ্যাক্ট (South African Act) দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গদিগের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কৃষ্ণাঙ্গগণ সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত। বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাহাদের বীরত্ব এবং সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯১২ সালের ডিফেন্স য়্যাক্টের (Defence Act) একটি ধারার বলে তাহারা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাঙ্গগণ এতই দরিদ্র যে কোন প্রকার খাজানা দেওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব যোগাইতে হয়। পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া তাহাদের পক্ষে বিধাতার আশীর্ব্বাদ। দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম অধিবাসীর দৈনিক আয় গড়ে ২ শিলিঙের বেশী নহে। এই আয়ে অন্নের স[illegible]ান অসা[illegible] না হইলেও দুঃসাধ্য। এই অবস্থায় শিক্ষা এ[illegible] আমোদ-প্রমোদের কথা উঠিতেই পারে না। এই আর্থিক [illegible]তিরই অপরিহার্য্য পরিণাম নৈতিক অধঃপতন, অজ্ঞতা [illegible] শিশু-মৃত্যু।

বর্ণ[illegible]ষের উৎকট এবং বীভৎস অভিব্যক্তির জন্য দক্ষিণ-আফ্রিক[illegible] ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ১৯২৬ সাল চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। [illegible]ই বৎসর 'কয়লার বার য়্যাক্ট'(Colour Bar Act) এবং মা[illegible] এ্যাণ্ড সার্ভেণ্টস ল্যাণ্ড দি ট্রান্সভাল এণ্ড নাটাল—এ্যামেণ্ড[illegible] য়্যাক্ট (Masters and Servants Land—The Tr[illegible]svaal and Natal Amendment Act) নামে দুই[illegible] আইন প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমটির বলে কেবলমাত্র ইউরোপী[illegible]ই যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করিবার অধিকারী হয়। অপর[illegible] দ্বারা শ্বেতাঙ্গ প্রভুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া কৃষ্ণাঙ্গ ভৃ[illegible]কে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ইহা[illegible] ফলে ক্ষেতের মজুর এবং ইজারাদারের অবস্থা প্রায় ক্রীতদা[illegible]র পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। দশ বৎসর পরে ১৯৩৬ [illegible] 'নেটিভ ট্রাষ্ট এণ্ড ল্যাণ্ড য়্যাক্ট' (Native Trust and [illegible]nd Act) দ্বারা ২০,০০,০০০ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে ৪১,৭[illegible]৮ বর্গমাইল এবং ৬৬,০০,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীকে মাত্র ৫[illegible]৬৬ বর্গমাইল জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

রাষ্ট্র এবং প্র[illegible]ী শ্বেতাঙ্গ সমাজের উৎপীড়ন মুখ বুজিয়া সহ্য করা [illegible] সম্প্রদায়ের গত্যন্তর নাই। অবস্থা তাহাদে[illegible] কতকভাবে তাহারা প্রপীড়িত। তাহাদে[illegible]শিক্ষার প্রতি [illegible] একেবারেই উদাসীন। একমাত্র খ্রীষ্টান [illegible]নারীগণ এ বিষ[illegible] কথঞ্চিৎ অবহিত। শ্বেতাঙ্গ ঔপনি[illegible]শিকের দল স্থানীয় সং[illegible] ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু ধ্বংস[illegible] এই সংস্কৃতির শূন্যস্থান পূ[illegible]বার কোন ব্যবস্থাই ক[illegible]াই। অজ্ঞতা তাহাদের অপরিসীম। [illegible]স্থ্যের অবস্থাও [illegible] শোচনীয়। কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে শিশু-মৃত্যুর হা[illegible]র কথা [illegible]নে করিতেও গা শিহরিয়া উঠে। কোন কোন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এই হার হাজারে ২০০ হইতে ৫০০-এর মধ্যে। ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কৃষ্ণাঙ্গদিগের নাই। আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত।

বর্ণবৈষম্যের জন্যই খ্রীষ্টধর্ম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সত্ত্বেও

দক্ষিণ-আফ্রিকার সমাজে জাতিভেদের সূচনা হইয়াছে। ইতি-মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপীয়, এশিয়া মহাদেশীয়, অশ্বেত-কায় এবং স্থানীয় অধিবাসী এই চারিটি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ইউরোপীয়গণ মনে করেন তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত এশিয়া মহাদেশীয়গণ আবার মনে করেন যে তাঁহারা অশ্বেতাকায় এবং স্থানীয় অধিবাসিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অশ্বেতকায়গণ মনে করেন যে দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই জাতি-বিভাগ বর্ণবৈষম্যেরই পরিণাম। এই বৈষম্যের ফলেই সমগ্র দেশের উন্নতি বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে এবং তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সমাজের অস্পৃশ্যস্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগকে [illegible]দ দিলে কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার জীবনযাত্রা অচল হইয়া [illegible]ড়িবে। তত্রত্য সমাজের তাহারা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কেহ কেহ বলেন যে কৃষ্ণাঙ্গদিগের স্বাভাবিক [illegible]মতাই (Inherent inefficiency) তাহাদের অধঃপতনে[illegible] একমাত্র কারণ। এই মত যুক্তিসহ নহে। শ্বেতাঙ্গ সংস্পর্শে [illegible]সিবার বহু পূর্ব্বেই দক্ষিণ-আফ্রিকার বাণ্টু-জাতি সম্পূর্ণ নিজ[illegible] সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকা ব্যতীত আফ্রিকা[illegible] অন্যান্য অঞ্চলের নিগ্রোগণ বেশ উন্নত। ফরাসী-অধিকৃত [illegible]ঞ্চলসমূহে বর্ণ-সাম্য আছে বলিয়াই তাহারা উন্নতি লাভ ক[illegible]ছে এবং যোগ্যতার সহিত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য [illegible]রিচালনা করিতেছে। আর্থিক অবস্থাও তাদের বেশ উন্নত বলা যাইতে পারে। বর্ণ-বৈষম্য সত্ত্বেও পূর্ব্ব-আফ্রিকার নিগ্রো-সমাজ দক্ষিণ-আফ্রিকার নিগ্রো-সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সুখী, সুস্থকায় এবং অবস্থাপন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের ১,২০,০০,০০০ নিগ্রো-অধিবাসীর মোট ৫২,০০,০০,০০০ ডলার মূলধন আছে। তাহারা সর্ব্বসাকুল্যে ৭০০০ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং ৫০টি ব্যাঙ্কের মালিক। যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২২,০০,০০০ নিগ্রো বিদ্যার্থী আছে। সে দেশের নিগ্রোদের মধ্যে ৪০০০ চিকিৎসক; ২০০০ দন্ত-চিকিৎসক, ৫০০০ শিক্ষক এবং সহস্র সহস্র ধাত্রী এবং ব্যবহারাজীব আছেন। একাধিক নিগ্রো শিল্পী এবং কবি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমেরিকার নিগ্রো সুর-শিল্পী পল রোবসনের (Paul Robeson) নাম সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মানবসভ্যতা এক সঙ্কটময় যুগ-সন্ধিকালে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের চোখের উপর প্রাচীন রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছে। বহু চিন্তানায়ক বলিতেছেন যে আগতপ্রায় যুগে অধিকার-সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ-গঠনই একমাত্র কল্যাণের পথ। কথাটা উপেক্ষা করিবার মত নহে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গকে তাহার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টার সময় বহুপূর্ব্বেই আসিয়াছে। সে চেষ্টা করা হইবে কি ?

জাগরণী

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

অন্ধকারের পথ বেয়ে আজ, কোন্ আ[illegible]কের ধারা
নাম্‌লো এসে এই ধরণীর তীরে[illegible]
বিশ্ব-প্রেমের মন্ত্র লয়ে রাঙিয়ে আঁধ[illegible] কারা
জাগিয়ে দিল নিখিল-বিশ্ব[illegible] হবে[illegible]
বাঁচিয়ে তোলার নতুন [illegible]নে,
ভীতির মাঝে বিপুল [illegible]র্ণ আনে,
শিরায় শিরায় জাগায় [illegible], মর্ম্মে তোলে সা[illegible]
আশার আ[illegible]র ভুবন ঘিরে।

সর্বহা[illegible] ঘুচিয়ে ব্যথা, জানায় অভয় বাণী—
জীবন, শুধু নয়কো দুখের বোঝা;
সজাগ হয়ে না রয় যদি আপন দৃষ্টিখানি
মুক্তা-মাণিক বৃথাই হবে খোঁজা।

এই জীবনে আছে অনেক আশা,
আছে দরদ, গভীর ভালবাসা
নীড়-রচনার মধুর নেশা, ওরে অসাবধানী!
জীবনকে তোর চালিয়ে নেবে সোজা।

আপনাকে তোর চিন্‌তে হবে আপন আঁখি দিয়ে,
ধরায় যে তোর আছে বাঁচার দাবি;
ভাগ্যহারা ওরে পথিক, অসীম সাহস নিয়ে
খুলতে হবে ভাগ্যদ্বারের চাবি।
পারবি কি তুই? সাহস আছে বুকে?
বেতাস্ কেন শুষ্ক-মলিনমুখে?
পারিস্ যদি চেষ্টা করে দেখ না ছুটে গিয়ে
খাঁটি রতন সেইখানেতেই পাবি।

আমাদের বেকার-সমস্যা

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

জনৈক বন্ধুর সওদাগরী আপিসে বাংলার সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুষ চুরি ও দুর্নীতির আলোচনা হইতেছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সাহেব, তিনজন বাঙালী। সাহেব বাংলা বুঝেন, বলিতে পারেন না। কিছুক্ষণ নীরবে আলোচনা শুনিয়া সাহেব একটি গল্প বলিলেন। গল্পটি এই :

ইরাণের সরকারী ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজারের পদ খালি হইয়াছে। উহার জন্য প্রার্থী আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। বহু আবেদনকারীর মধ্যে তিনজনকে বাছাই করিয়া ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাকা হইয়াছে। প্রথম প্রার্থী ফরাসী, অনেকগুলি ডিগ্রীধারী, ব্যাঙ্ক পরিচালনে অভিজ্ঞ। ম্যানেজার তাঁহাকে বসিতে বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, চার আর চারে কত হয়?

স্মিতমুখে প্রার্থীটি পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া অঙ্ক কষিলেন, দুইবার পেন্সিল কামড়াইলেন, তারপর বলিলেন—আট।

—সে কি মহাশয়! এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার কাগজ পেন্সিল দরকার হইল?

তেমনি স্মিতমুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন,—দেখুন, আমি এত বড় একটা ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজারের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে চলিয়াছি। আমার পক্ষে একটি ছোট হিসাবও মুখে মুখে করা উচিত নয়। কারণ আমার সামান্য ভুলে ব্যাঙ্কের প্রকাণ্ড ক্ষতি হইতে পারে।

ম্যানেজার চমৎকৃত! তবে তো ইনিই উপযুক্ত প্রার্থী, এই ভাবিয়া ইঁহাকেই সুপারিশ করিবেন বলিয়া তিনি স্থির করিলেন।

অতঃপর প্রবেশ করিলেন দ্বিতীয় প্রার্থী—ইংরেজ। ম্যানেজার ইঁহাকেও সেই একই প্রশ্ন করিলেন,—বলুন তো দেখি, চার আর চারে কত হয়?

পকেট হইতে একটি বাঁধানো বই বাহির করিয়া চট করিয়া একটি পাতা খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া তিনি জবাব দিলেন,—আট।

—এই সামান্য প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আপনাকে বই দেখিতে হইল কেন?

গম্ভীর মুখে ইংরেজ প্রার্থী বলিলেন—দেখুন, একটি বড় ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজারের পদ আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে। কোন হিসাবই আমার মুখে মুখে করা উচিত নয়, কাগজ-পেন্সিলে করারও বিপদ আছে, ভুল হইতে পারে। সব চেয়ে ভাল উপায় পাকা ফর্ম্মুলা মিলাইয়া দেখা। ইহাতে ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে না।

ম্যানেজার বিস্মিত। ইনিই তো তবে যোগ্যতম ব্যক্তি।

অতঃপর তৃতীয় প্রার্থীর প্রবেশ। ইনি স্থানীয় লোক তদুপরি দেশী ও বিলাতী ডিগ্রীধারী এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনে অভিজ্ঞ। ম্যানেজার ইঁহাকেও সেই একই প্রশ্ন করিলেন।

অমায়িক ভাবে হাসিয়া প্রার্থী বলিলেন,—এ প্রশ্নের জবাব [illegible] সহজে দেওয়া যায় না। আমাকে আগে দেখিতে হইবে কে খাতক, কি সিকিউরিটি দিবে, ভবিষ্যতে তাহার সহিত কারবার চলিবে কিনা ইত্যাদি। সব দিক বিবেচনা করিয়া তবে তো ঠিক করিব চার আর চারে আট হইবে, কি ষোল হইবে।

ম্যানেজার স্তব্ধ। একে স্থানীয় লোক, তায় সর্ব্বগুণসমন্বিত, তার উপর এত বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ। ইনিই যে শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইবেন ইহাতে ম্যানেজারের সন্দেহ রহিল না। তিনি তিন জনেরই সহিত সাক্ষাতের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়া দিলেন।

এবা[illegible] সাহেব সওদাগরটি জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন তো দেখি ম[illegible]রা চাকুরিটা কে পাইল? আমি বাজি রাখিতেছি, যিনি ঠি[illegible] উত্তর দিবেন তাঁহাকে দু'শ' টাকা দিব।

ক[illegible] প্রশ্ন। বন্ধুবর সাহস করিয়া বলিলেন—দেখুন, প্রার্থী [illegible]জন, আমরাও তিন জন। আমরা তিন জনে তিন জনের [illegible] অবলম্বন করিলে এক জন জিতিবেই, কিন্তু আপনি তো হা[illegible]ন?

হাসি[illegible] সাহেব বলিলেন—না গো মশাই, অত সোজা নয়। চাকরিটা [illegible]াদের একজনও পান নাই—পাইয়াছেন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পর[illegible]য় সন্ত-ফেল-করা আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শ্যালক।

সুযো[illegible]ীর সহিত সম্পর্কের জোরে অযোগ্য লোককে উচ্চপদে [illegible]তিষ্ঠিত করিবার যে চোরাই পথের সন্ধান ব্যামফিল্ড ফুলার দিয়[illegible] গিয়াছেন, সাহেবের গল্পটি তাহারই বর্ত্তমান পরিণতির প্রতি[illegible] কটাক্ষ ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের নিকট ইহা আপা[illegible]তঃ অপ্রীতিকর ও কিছু লাঞ্ছনার কারণ হইলেও দেশের আস[illegible] সমস্যা ইহা নহে। এ দেশে ইংরেজ আগমনের পর হইতে যে [illegible]সতুতো ভাই তোষণ নীতি সুরু হইয়াছে—আমাদের সর্ব্ব[illegible]শের উহাই প্রধান কারণ। ইংরেজের খোরাক যোগাইতে গিয়া [illegible]ারতের শিল্প বাণিজ্য রসাতলে গিয়াছে। পশুর পর্য্যায়ে [illegible]মিত চাষীর একমাত্র কাজ এখন কোনমতে নিজের [illegible]মান রাখিবার চেষ্টা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে মা[illegible] বাঁচে ভারতীয় কৃষক তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত [illegible] প্রকৃতির স[illegible] মাত্র অনিয়ম ঘটিলে[illegible] কৃষকের সম্মুখে [illegible]ত্যু ভিন্ন অন্য কো[illegible] পথ থাকে না।

[illegible]মানে ভারতবাসীর স[illegible] বড় সমস্যা বেকার-সমস্যা। যুদ্ধে[illegible] সময় যাহারা কাজ পাইয়া[illegible]াহারা ক্রমে ক্রমে কর্ম্মচ্যু[illegible]ত হইতেছে। বেকার-সমস্যা সমাধানে[illegible] ভারত-সরকার [illegible] প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কাগজ কলম লইয়া বসিয়া [illegible]গিয়াছেন। বড় বড় রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে, সব[illegible] ঐ এক কথা—যুদ্ধের পর যাহাদের চাকুরি গিয়াছে তাহাদের উপায় কি হইবে? যেন, ইংরেজের যুদ্ধে যে সৈন্য শ্রমিক ও কেরাণী সাহায্য করিয়াছে তাহাদের একটা কোন বিলিব্যবস্থা করাই বেকার-সমস্যা সমাধানের একমাত্র লক্ষ্য। বাংলা-সরকার জানাইয়াছেন, বাংলায় ৪ লক্ষ ১৫ হাজার লোক বেকার

হইবে, তার মধ্যে ৯২,৫৫৫ জনের কাজের সংস্থান সরকার করিতে পারিবেন।

ইংরেজের যুদ্ধের অবসানে যে সৈন্ত, শ্রমিক ও কেরাণী কর্মচ্যুত হইল তাহাদের কাজ জুটাইয়া দেওয়াই কি বাংলার বেকার-সমস্তার সমাধান? ইহাদের মধ্যে কয়জন বাঙালী? গবর্মেণ্ট যে ৯২,৫৫৫ জনকে কাজ দিবার ভরসা দিয়াছেন তাহাদের মধ্যেই বা কয়জন বাঙালী থাকিবে?

বাংলার বেকার সমস্তা অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক ও অনেক তীব্র। মোট ৬ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৫ কোটি কৃষক, বৎসরে বড় জোর তিন মাস ইহারা কাজ করে, বাকি নয় মাস বেকার। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ইহাদের এ অবস্থা ছিল না। এক দিকে কৃষি অপর দিকে কুটির শিল্প এই উভয়ের আয়ে তাহারা সচ্ছল জীবন যাপন করিত। হোরে[illegible] হেম্যান উইলসন লিখিয়াছেন, ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের [illegible]াপড় ও সিল্ক খাস বিলাতের বাজারে ব্রিটেনে তৈরি কাপড়[illegible] সিল্কের চেয়ে শতকরা ৫০।৬০ টাকা সস্তায় বিক্রয় হইয়াছে। [illegible]ারতীয় কাপড়ের উপর শতকরা ৭০।৮০ টাকা রক্ষণ শুল্ক [illegible]পাইয়া বিলাতী বস্ত্রশিল্পকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। শুধু [illegible]াপড় ও সিল্ক নয়, ভারতীয় পশম এবং চিনিও ইউরোপের বা[illegible]রে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইত। কোন কোন বিদেশী পর্য্যটক এদেশের চিনি খাইয়া দেশে ফিরিয়া গল্প করিয়াছে[illegible] "ভারতে সাদা সাদা দানাদার একরকম মধু পাওয়া যায়; দা[illegible]গুলি মুখে দিলেই গলিয়া যায় আর ভারি চমৎকার মিষ্টি লাগে[illegible]" মাদ্রাজের গবর্ণর সর টমাস মানরো একটি ভারতীয় শাল [illegible]ত বৎসর ব্যবহার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহার সহিত তুল[illegible] হইতে পারে এমন একটি ইউরোপীয় শাল আমার নজরে[illegible]ড়ি না। ইউরোপের তৈরি শাল আমাকে বিনা পয়সায় [illegible]লেও আমি গায় দিই না।" মসলিনের কথা তো ছাড়ি[illegible] দিলাম। মসলিন, সিল্ক ও চিনি এই তিনটিই ছিল বাংলা[illegible]ধান সম্পদ, বাঙালী কৃষকের অতিরিক্ত উপার্জ্জনের তিনটি [illegible]ট পন্থা।

বাঙালী কৃষক তিন মাস কাজ করে, নয় মা[illegible] বসিয়া থাকে। এই নয় মাস তাহাকে কাজ দেওয়াই বাং[illegible] বেকার-সমস্তা সমাধানের সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন। কৃষককে বা[illegible]দিয়া শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত বেকার-সমস্তার সমাধান হয় [illegible] হবে[illegible] অবস্থা ভাল হইলে সে নূতন নূতন জিনিষ কি[illegible] তাহার চাহিদা মিটাইবার জন্ত নূতন নূতন[illegible]ের সৃষ্টি [illegible] এবং এইরূপ শিল্প প্রসারে মধ্যবিত্ত এবং [illegible]মিক শ্রেণীও স[illegible] সঙ্গে লাভবান হইবে। বাংলার [illegible]াটি কৃষকের অবস্থা [illegible]চ্ছল হইলে ৫০ লক্ষ মধ্যবিত্ত [illegible] শ্রমিকের অবস্থা আ[illegible]নিই ফিরিবে। তার জন্ত আলাদা চেষ্টা না করিলেও চলিবে।

কৃষকের অবস্থা ভাল করিতে হইলে কৃষি ও কুটিরশি[illegible] [illegible]দিয়া তাহাকে সাহায্য করা চাই। কৃষকের উন্নতি বলিতে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বুঝেন সরকারী কৃষি বিভাগে আরও কিছু কর্মচারী নিয়োগ, সরকারের খরচে কতকগুলি কৃষি অনভিজ্ঞ লোককে বিলাতে ও আমেরিকায় পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ বানাইয়া আনা এবং যে কৃষক লিখিতে পড়িতে জানে না তাহার জন্ত ভাল ভাল উপদেশ ও সরকারী কৃতিত্বের কাহিনী ইংরেজী কাগজে ছাপা। বিশেষজ্ঞের দল দেশে ফিরিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাহাতে ইঁহাদিগকে বিশেষ-অজ্ঞ বলাই বোধ হয় ভাল।

কৃষির উন্নতি বলিতে আমরা বুঝি এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে কৃষক সহজে ও অল্প সুদে চাষের জন্ত ঋণ, সস্তায় ভাল বীজ ও সার কিনিবার সুযোগ এবং উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের সময় দেশী ও বিলাতী, সরকারী ও বেসরকারী দালালদের শোষণ হইতে রক্ষা পায়। পাটের বেলায় দেখা গিয়াছে ধাপ্পা দিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিতে পাট বুনানো হইয়াছে, ফলে পাটের দাম বাড়িতে পারে নাই এবং ভারত-সরকারের সাহায্যে আমেরিকা এ দেশে সস্তায় চট ও থলে যুদ্ধের নামে কিনিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার চিনি-ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়াছে।

বাংলার পাটকে সোনার আঁশ বলা হয়। সোনার আঁশের সবটা সোনা যায় বিদেশীর পকেটে, চাষীর ভাগ্যে অবশিষ্ট থাকে শুধু ম্যালেরিয়া। এই চমৎকার বিলি-ব্যবস্থায় সাহায্য করেন ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকার।

দুর্ভিক্ষের সময় ইস্পাহানী কোম্পানী মুরুব্বী বাংলা-সরকারের জোরে কি দরে কৃষকের নিকট চাউল কিনিয়া কি দরে বেচিয়াছে তাহা আজও অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

কৃষিবিদ্যায় ভারতীয় কৃষক পৃথিবীর কোন দেশের চাষীর চেয়ে কম নয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৮৯ সালে ডাঃ ভোয়েলকার নামক জনৈক কৃষি-বিশেষজ্ঞ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইনি বিলাতের রয়েল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির রসায়নবিদ্। ভারত-সরকারকে প্রদত্ত রিপোর্টে ইনি লিখিয়াছেন, "একটি বিষয় সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। বিলাতের লোকের একটা ধারণা আছে এবং এটা তাঁরা জোর গলায় প্রচারও করেন যে ভারতীয় কৃষি মান্ধাতার আমলের প্রথায় চলে বলিয়া অনেকে পিছাইয়া আছে এবং ইহার উন্নতির জন্ত কিছু করাও হয় নাই। এই ধারণা একেবারে ভুল। ভারতীয় রায়ত ইংরেজ কৃষকের সমকক্ষ তো বটেই কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক ভাল। ভারতীয় কৃষকের দুর্দ্দশার কারণ এই যে, কৃষির উন্নতি সাধনের কোন উপায় তার নাই। প্রধানতঃ জল ও সারের অভাবেই সে ফসল উৎপাদন বাড়াইতে পারে না। কৃষিকার্য্যে এত যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আমি যে সব দেশ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহার কোনটির কৃষকের মধ্যে দেখি নাই।"

ভোয়েলকার স্পষ্টই বলিয়াছেন ভারতীয় কৃষক ইংরেজ চাষাকে চাষ শিখাইতে পারে। ইংরেজ চাষা গম গজাইতে শিখিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষক গমের চাষ করিয়াছে।

বাঙালী কৃষক আজ জলের জন্ত হাহাকার করে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি তো দূরের কথা দেরিতে বর্ষা নামিলেই অনাহারে [illegible]ত্যুর জন্ত প্রস্তুত হয়। অথচ ইংরেজ আগমনের সময়েও [illegible]মাদের দেশের কৃষক এত অসহায় ছিল না। বাংলার নদনদী[illegible]গুলির অবস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিখ্যাত সেচ-বিশেষজ্ঞ সর উইলিয়াম উইলকক্সের ধারণা হইয়াছিল এগুলি স্বাভাবিক নদী নয়, ভাগিরথী এবং দক্ষিণ-বঙ্গের নদীগুলি মানুষের কাটা

খাল। বাংলায় ভগীরথ নামে নিশ্চয়ই এমন কোন রাজা ছিলেন যিনি সেচ-বিজ্ঞানের মূল সূত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ভাগীরথী নদী তাঁহারই সৃষ্টি—সর উইলিয়ম ইহা জোর গলায় বলিয়া গিয়াছেন। ঐ সঙ্গে আমরা ইহা দেখি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজ নিজ এলাকার নদী নালা খাল বিল পুকুর পরিষ্কার রাখা প্রত্যেক জমিদারের দায়িত্ব ছিল এবং গ্রামের প্রতিটি লোক এই কার্য্যে সাহায্য করিত। সমাজরক্ষা, প্রজারক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার জমিদারের হাতে ছিল। ইংরেজের বিলি-ব্যবস্থায় উহা ইংরেজের আদালত ও থানা পুলিসের হাতে গিয়াছে, ফলে নদী শুকাইয়া মাঠ হইয়াছে, পুকুর মজিয়া ম্যালেরিয়া ও কলেরার জীবাণু বিস্তারের ডিপো হইয়াছে, আর কৃষকের যা অবস্থা হইয়াছে তাহা তো চোখেই দেখিতেছি। পশ্চিম বঙ্গে দামোদর অববাহিকার সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকর যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতেও ভরসার বিশেষ কোন কারণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

তারপর কৃষকের দ্বিতীয় আয়ের কথা কুটীরশিল্প। আমাদের দেশ বিরাট্, গ্রামের সংখ্যা বহু এবং লোকও অনেক। কাজেই আমাদের পক্ষে সেই শিল্প-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ যাহা দ্বারা গ্রামের কৃষক গ্রামের কুটীরে বসিয়া নিজের ও অপরের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করিতে পারিবে। ইহার জন্ত গ্রামের কুটীরে কুটীরে বিদ্যুৎ পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার। কৃষকের কুটীরে বিদ্যুৎ পরিচালিত অটোম্যাটিক তাঁত থাকিলে কৃষক-গৃহিণী তাঁত চালাইয়া দিয়া রান্না করিতে পারে। সূতা ছিঁড়িয়া গেলে ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁত বন্ধ হইয়া যাইবে, গৃহিণী ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া আসিয়া আবার সূতা জোড়া দিয়া তাঁত চালাইয়া দিতে পারিবে। জাপান, সুইডেন, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশ এইভাবে বিদ্যুৎ-পরিচালিত কুটীরশিল্প গড়িয়া কৃষকের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

কুটীরশিল্প বাঁচাইতে হইলে বৃহৎ শিল্প, কয়লা ও বিদ্যুৎ এবং যানবাহনের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্প বা বিদেশী বণিক যেন কোন মতেই কুটীর শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা না করিতে পারে। টাটা কোম্পানী লাঙ্গলের ফাল তৈরি অথবা বিলাতী ম্যানেজিং এজেণ্ট উহা আমদানী করিতে আরম্ভ করিলে গ্রামের কামার বাঁচিতে পারে না। বৃহৎ কারখানা ইস্পাতের পাত তৈরি করুক কিন্তু কুটীরে যে পণ্য তৈরি হয় তাহা যেন উহারা তৈরি করিতে না পায়। এখানে মূল নীতি এই হওয়া উচিত যে বৃহৎ কারখানা উৎপন্ন দ্রব্য হইবে কুটীরশিল্পের কাঁচামাল, বড় কারখানা কুটীরশিল্পের প্রতিযোগী হইবে না, উহার পরিপূরক ও সহায়ক হইবে। আমাদের দেশের জনসংখ্যা আমরা জানি, গড়পড়তা প্রতি জনের কোন কোন জিনিষ কি পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাহাও জানা যায়, সুতরাং কোন দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন করা উচিত তাহার হিসাব করা কঠিন নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ কুটীরে উৎপন্ন হউক, কুটীরে যাহা তৈরি করা সম্ভব নয় তাহাই শুধু বড় কারখানায় নির্ম্মিত হউক।

কিন্তু ইহা কি আমরা করিতে পারি? ইংরেজ এদেশে থাকিতে অবশ্যই পারি না। কারণ কুটীরশিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্ত প্রয়োজনীয় যাহা কিছুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কোনটির উপরই আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই। বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া উহা কুটীরে কুটীরে ছড়াইয়া দিবার উপায় নাই, কয়লার খনিতে ও রেল গাড়ীতে তালা বন্ধ, চাবি ইংরেজের হাতে। বিলাতী পণ্য আমদানীর পথ খোলা, সে পথ বন্ধ করিবার উপায় নাই। গত মন্দার বাজারের সময় ইংরেজের বাণিজ্য যখন সর্ব্বত্র খারেজ হইতেছে তখন ভারতবর্ষে একটি ছোট্ট ব্যাপার ঘটে। ভারত-সরকার হুকুম দেন শিলিং ও টাকার বিনিময় হার টাকায় ১৬ পেন্সের বদলে টাকায় আঠারো পেন্স হইবে। আপাত দৃষ্টিতে হুকুমটি অতিশয় নিরীহ, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের উপর ইহার ফল হইয়াছে মারাত্মক। এই হুকুমের আগে যে বিলাতী সাবান কলিকাতা [illegible] বন্দরে পৌঁছাইতে মোট ব্যয় পড়িত এক শিলিং, তাহা বি[illegible] করিতে হইত বারো আনায়; এবার তাহা এগারো আনায় [illegible] করিয়াই বিলাতী বণিকের পুরো শিলিংটি মিলিয়া গেল। [illegible]ণ শিলিঙের দাম আগে ছিল বারো আনা, নূতন বিনিময় [illegible] উহা হইল এগারো আনা। দেশী সাবানের কারখান[illegible] কারবার কিন্তু টাকায়, শিলিঙে নয়। শিলিঙের দাম যখন [illegible]রো আনা ছিল তখন যে কারখানার উৎপাদন ব্যয় সাড়ে [illegible]গারো আনা পড়িত সেও কোন রকমে বাজারে টিকিয়া থা[illegible]তে পারিত। নূতন বিনিময় হার চালু হওয়ায় ইহারা তো [illegible]ঠিয়া গেলই, এগারো আনা যাহার খরচ পড়িত তাহারও দ[illegible] বন্ধ হইল। এই অতি অন্যায় ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ ক[illegible]গ্রেস তো করিয়াছিলই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম গবর্ণর সর [illegible]বোর্ণ স্মিথও ইহার প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া [illegible]ান। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ও ভারত-সরকার অবশ্য এ সব প্রতিব[illegible] কর্ণপাত করেন নাই, কারণ এই কৌশলে বিলাতী জিনি[illegible] দেশে কিছু বেশী বিক্রয় হইতেছে।

ইহার উপ[illegible] ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নামক আর এক ফন্দী আছে। [illegible]নাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়[illegible]গুলি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর যে কোন দেশের সহিত [illegible]জনৈতিক বা বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি করিতে পারে। [illegible]রতবর্ষ তাহা পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের [illegible]হুরে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধনের আইনগত [illegible] যে-সব আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হয় তা[illegible]তে ভারতবর্ষকে [illegible]থেষ্ট তোয়াজ করা হয়; এই সব চুক্তিনাম[illegible] সহি দিবার [illegible] ভারতীয় ক্রীতদাসের অভাব কখনো হয় না। অটোয়া চু[illegible] এমনি ধরণের একটি বড় রকমে[illegible] বন্ধ। ইম্পিরিয়াল প্রে[illegible] মূল কথা এই যে, ভা[illegible]র্ষ ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়নগুলিকে [illegible] দেশের চেয়ে যথাসম্ভব সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহ [illegible]রিবে, নিজে যথাসম্ভব কম শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিবে এবং যতদূর সম্ভব নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য ব্রিটেন ও ডোমিনিয়নসমূহ হইতে ক্রয় করিবে। অষ্ট্রেলিয়া যদি ভারতবাসীকে ঢুকিতে না দেয়, দক্ষিণ-আফ্রিকা যদি তার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করে, ব্রিটেন যদি এই সব অত্যাচার দেখিয়া চুপ করিয়াও থাকে তবুও ইহাদেরই মুখ চাহিয়া

ভারতবাসীকে চিরদারিদ্র্য বরণ করিয়া ইংরেজের কাঁচামাল সরবরাহকারী হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে। অটোয়া চুক্তি আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিলে বড়লাটের বিশেষ হুকুমনামার বলে সেই ব্যবস্থাই জোর করিয়া বহাল রাখা হয়।

এই দুইয়ের উপর আর এক বিপদ জুটিয়াছে "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" কোম্পানী। বিলাতী কোম্পানী এদেশে আসিয়া কারখানা কাঁদিয়া বসিতেছে, ইহাদের মূলধনের কতকাংশ এদেশী হইলেও কর্ত্তৃত্বের সবটাই বিলাতী, ডিভিডেণ্ডের চেয়ে কারবার পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব ও দালালী বাবদ উপরি রোজগারটাই প্রধান। ভারতীয় কোম্পানীর সকল সুবিধা ইহারা ভোগ করে, ইহাদের অসম ও অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে ভার[illegible]য় শিল্পকে বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। ভারত-শাসন আইনে [illegible]নেকগুলি ধারা সংযোগ করিয়া ইহাদিগকে সুরক্ষিত করা [illegible]ইয়াছে।

ভারত-রক্ষা আইনের জোরে কয়লার খনিতে [illegible]প পড়িয়াছে। ইংরেজ কয়লা কমিশনারের বিলিবন্দোবস্ত [illegible] নিয়মেই চলিয়াছে। কয়লার অভাবে শত শত ছোট দেশী [illegible]র কারখানা বন্ধ হইয়াছে, কাঁচের কারখানা অশেষ লাঞ্ছনা [illegible]হিয়াছে, এমন কি কাপড়ের দুর্ভিক্ষের দিনে কয়লার অভা[illegible] কাপড়ের কলও বন্ধ থাকিয়াছে। কিন্তু কয়লার অভাবে ই[illegible]রজ পরিচালিত কারখানার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমর[illegible]নি নাই। কয়েক বৎসরে গত প্রত্যেকটি দেশী কারখানা ক[illegible]র অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত হইয়াছে ইহা বলিলে অত্যুক্তি [illegible]হবে না।

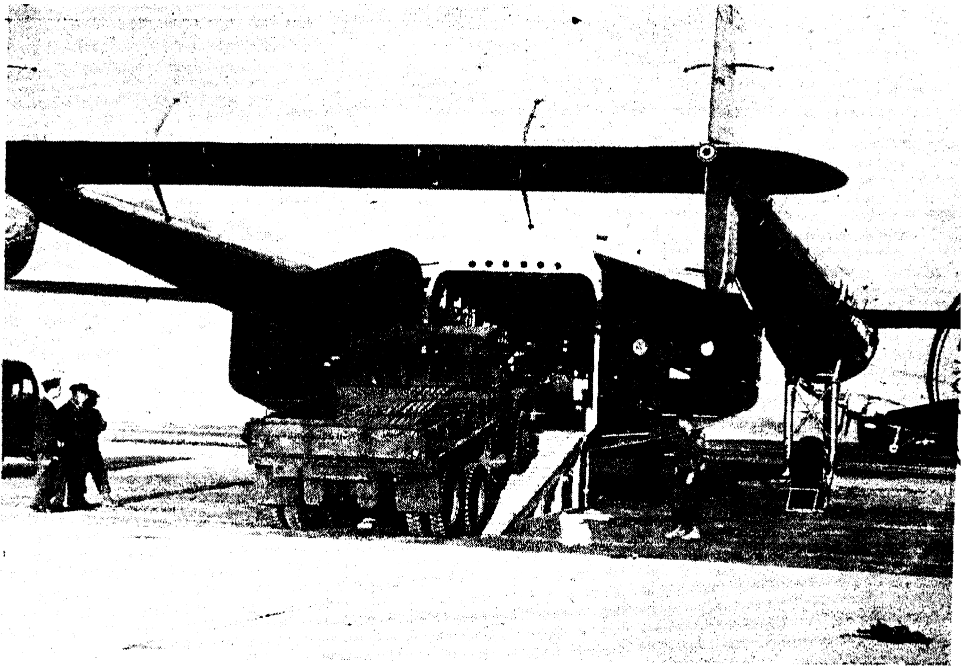
তারপর রেল। আমাদের দেশের হাজার [illegible]ক মাইল রেল তৈরিতে প্রায় আটশো কোটি টাকা লাগিয়া[illegible]। ভারতে রেলপথ বিস্তারের ইতিহাস যাঁহাদের জানা [illegible]ছে তাঁহারা জানেন এই টাকার অধিকাংশই লুঠ করিয়াছে [illegible]রেজ বণিক, আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে বাৎসরিক বারো [illegible] টাকা সুদ সমেত এই বিপুল দেনা। আমাদের রেল [illegible]রজের প্রয়োজনে ইংরেজের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আ[illegible]তেছে। রেল-পরিচালনায় আমাদের স্থান নাই, প্রতি বৎস[illegible] রেলের জন্য যে বহু কোটি টাকার সরঞ্জাম কেনা হয় তার [illegible]উপরও আমাদের হাত নাই, রেলের মাশুল নির্দ্ধারণের বেল[illegible]। আমাদের কথা কেহ শোনে না। ইংরেজ বণিক এ দে[illegible] হবে[illegible] কিনিয়া বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কর[illegible] প্রভৃতি [illegible]র উহা পৌঁছাইবার জন্য যে ভাড়া দেয় [illegible]শী কারখানা[illegible] অপর প্রদেশ হইতে কাঁচামাল আ[illegible]ত গেলে তার চে[illegible] অনেক বেশী ভাড়া দিতে বাধ্য হয়[illegible] যুদ্ধে দেখা গিয়াছে এ[illegible]দেশের রেলের প্রথম ও প্রধা[illegible]য়িত্ব ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজের [illegible]সৈন্য ও পণ্য বহন ; খাদ্য আমদানীতে সাহায্য করিয়া ভারতব[illegible]র [illegible] রোধ করিবার দায়িত্বও তাহার নিকট পরোক্ষমা[illegible] অজুহাত ইঞ্জিন নাই, মালগাড়ী নাই। অথচ এদেশে ইঞ্জি[illegible] ও মালগাড়ী দুই-ই তৈরি হইতে পারে। করিতে দেওয়া হয় নাই। বহু আন্দোলনের পর ১৯৪০ সালে ভারত-সরকার ঠিক করিলেন এদেশে ইঞ্জিন তৈরি করা যায় কি না তাহার সন্ধান লওয়া হইবে। মিঃ হামফ্রিজ ও মিঃ শ্রীনিবাসন এই দুইজনকে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। বরাবর বলা হইত ভারতে তৈরি ইঞ্জিন খারাপ হইবে, বিলাতী ইঞ্জিনের চেয়ে দাম বেশী পড়িবে এবং বছরে যত ইঞ্জিন তৈরি হইলে কারখানা চালানো লাভজনক হয় ততগুলি এদেশে দরকার হয় না। হামফ্রিজ ও শ্রীনিবাসন রিপোর্ট দাখিল করিয়া এই তিনটি অপবাদেরই নিরসন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ভারতে তৈরি ইঞ্জিন বিলাতীর চেয়ে খারাপ হইবে না, খরচ অনেক কম পড়িবে এবং বছরে আমাদের যত ইঞ্জিন দরকার হয় তাহা তৈরি করিলে কারখানা বেশ ভালভাবেই চলিবে। ঐ সঙ্গে ইঁহারা আরও বলিলেন যে ইঞ্জিন তৈরি যুদ্ধের মধ্যেই আরম্ভ করা যায় এবং করা উচিত। রিপোর্টটি যে ভারত-সরকারের মনঃপূত হয় নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। উহা প্রকাশের পর ভারত-সরকার বিদেশে প্রধানতঃ কানাডা, ব্রিটেন ও আমেরিকায় বহু শত ইঞ্জিনের অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৪২-এর জানুয়ারী হইতে ১৯৪৫-এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরে ২৭৭টি ব্রড-গেজ এবং ৩৪৩টি মিটার-গেজ ইঞ্জিন ও ৮৮৮০টি মালগাড়ী আমদানী হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে আরও ৫৫০ ব্রড-গেজ ও ৭০টি মিটার-গেজ ইঞ্জিন আমদানী হইবে। অর্থাৎ আগামী বছর পাঁচেক আর আমাদের ইঞ্জিন তৈরির নাম করিবার উপায় থাকিবে না। জাহাজ ও মোটর গাড়ীর অবস্থাও তদ্রূপ। উহাও আমাদের নাই, কারণ তৈরি করিতে দেওয়া হয় নাই।

শিল্প বিস্তারের দ্বারা দেশের লোকের কর্ম্ম সংস্থানের পথে ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিরাট্ অন্তরায় আছে, একটি কণ্ট্রোল অপরটি নূতন কোম্পানী গঠনে বাধা। কণ্ট্রোলের কণ্টকজালে প্রত্যেকটি লোক গত কয়েক বৎসর যাবৎ যেভাবে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে দেহে ও মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্যবসায়ে সততা একেবারে রসাতলে গিয়াছে, যে যত অসৎ তাহার উন্নতি তত দ্রুত ও বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কণ্ট্রোল। ঘুষ ও অসাধুতা ভিন্ন কোন কাজই সিদ্ধ করা কঠিন। এটা অবশ্য ভারতবাসীর জন্য ; ইংরেজের জন্য নয়। টেলিফোনে ইংরেজ বণিকের কার্য্য সিদ্ধি হয়, ঘুষও লাগে না অথবা সময়ও নষ্ট হয় না। আয়কর, অতিরিক্ত লাভকর প্রভৃতিতেও সাদায় কালোয় এই প্রভেদ সুপরিস্ফুট।

ভারত-সরকারের বিনা অনুমতিতে নূতন কোম্পানী গঠন ও পুরানো কোম্পানী বাড়ানোর বিরুদ্ধে হুকুমজারী হয় ১৯৪৩-এর ১৭ই মে তারিখে। এই হুকুমনামাটি একেবারে নিরর্থক মনে করা কঠিন। যুদ্ধের মধ্যে জাপানী যুদ্ধের পরেও এদেশে কলকারখানার সংখ্যা বাড়িতেছিল। ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিও দ্রুত ফিরিতেছিল, যুদ্ধের মধ্যেই ভারতীয় শিল্প দ্রব্য রপ্তানী বাড়িতে সুরু করিয়াছিল। নীচের অঙ্কগুলি হইতে উহা বুঝা যাইবে—

আমদানীর শতকরা হার

	১৯৩৮-৩৯	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩
খাদ্যদ্রব্য	১৫·৭	১৫·২	১৬·১	৫·৩
কাঁচামাল	২১·৭	২৬·৮	২৮·৮	৪৭·৩
শিল্পদ্রব্য	৬০·৮	৫৭	৫৫·১	৪৪·৫



চতুষ্কোণ ফিউসিলেজযুক্ত মালগাড়ীবাহী সি-৮২ মার্কিন বিমান



চুংকিং বিমান ঘাঁটিতে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মাও-সে-তুং (বামে) ও চীনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত পেট্রিক জে হার্লি



টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নির্ম্মিত ফণ্টানা বাঁধের দুইটি সুড়ঙের ভিতর দিয়া প্রবাহিত জলরাশি



ওয়েস্টিং হাউস আলো-বিভাগের জি. হিবেন উত্তাপহীন আলো (জোনাকি পোকার মত) প্রস্তুত-পদ্ধতি প্রদর্শন করিতেছেন



যুক্তরাষ্ট্রের রিংলিং ব্রাদার্স সার্কাস পার্টির একটি হস্তীর বৃংহিতের উচ্চতা নিরূপণ



একটি বালিকা একটা বিরাট্‌কায় নির্বিষ বোয়া সর্পকে শব্দ-পরিমাপক যন্ত্রের নিকট ধরিয়া রাখিয়াছে

রপ্তানীর শতকরা হার

খাদ্যদ্রব্য	২৩·৩	২১·৩	২৩·৮	২৫·১
কাঁচামাল	৪৫·১	৩৪·৪	২৮·৯	২৩·১
শিল্পদ্রব্য	৩০	৪৩·১	৪৫·৫	৫০·৩

অনুমতি দেওয়ার সময় সরকার পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া দেন যে নূতন কারখানার ভাল-মন্দের কোন দায়িত্বই তাঁহারা লইতেছেন না। যেন শুধু বাধা দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

এইরূপ যেখানে অবস্থা সেখানে বেকার-সমস্যা সমাধান কিরূপে হইবে? এই সব আইন-কানুন বিধিবন্দোবস্ত বজায় থাকিতে ভারতীয় শিল্পের মাথা তুলিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এমনি ধরণের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের সহায়তায় ভারতীয় শিল্প অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধানের চেষ্টাও করিয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে বেকার-সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান প্রায় অসম্ভব।

আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিষ্কার

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তি বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে যতটা সুপ্রকট হইয়াছে ততটা বোধ করি আর কখনও হয় নাই। যুদ্ধের সূচনা হইতেই সমররত জাতিসমূহ নব নব মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া যে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিল তাহার পূর্ণাহুতি হইল আণবিক বোমার আবিষ্কারে। মাত্র কয়েকটি বোমা বর্ষণে হিরোশিমা আর নাগাসাকির বুকের উপর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হইল, লক্ষ লক্ষ নিরীহ নাগরিক মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইল। সম্প্রতি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে আর একটি মহাসমর অনিবার্য্য এবং তাহাতে সমগ্র জগতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হইবে। বর্ত্তমান দুনিয়ার হালচাল লক্ষ্য করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভা আজ অধিকতর শক্তিশালী আণবিক বোমার আবিষ্কারে নিয়োজিত বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে। আণবিক বোমা জলেও যাহাতে কার্য্যকরী হয় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। এই সমস্ত আয়োজন দুনিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে বই কি!

কিন্তু এই ধ্বংসের রূপই আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র রূপ নয়। পৃথিবীব্যাপী এই ধ্বংসলীলার মধ্যেও বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর কল্যাণ-মূর্ত্তি মাঝে মাঝে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আণবিক বোমার পরীক্ষণ এবং প্রস্তুতিতে সাফল্য লাভ করিয়া যে আমেরিকা বিপুল ধ্বংস-যজ্ঞের আয়োজন করিল, সেখানেই দেখি বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আজ গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের অশেষ উন্নতি বিধান করিতেছে। নদীজল নিয়ন্ত্রণ করিয়া সে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ আজ ঊষর ক্ষেত্রকে শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, সুদূর পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোক সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিয়া মানুষ নিজের সুখসুবিধাটুকু ষোল আনা আদায় করিয়া লইতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আমেরিকার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ প্রদান করিব। বৈজ্ঞানিক শক্তিদ্বারা আমেরিকার জন-সমাজের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহার কতকটা আভাস ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। কোন্ কোন্ পরীক্ষণের তাৎপর্য্য কি তাহা সাধারণের বোধগম্য হয়ত হইবে না, শুধু বিজ্ঞানের কারবারীরাই তাহা বলিতে পারিবেন। যেমন,



শব্দ-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে গারগানটুয়া নামক গরিলার আওয়াজের উচ্চতা নিরূপণ

সার্কাসের জানোয়ারদের আওয়াজের উচ্চতা নিরূপণ

সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত রিংলিং ব্রাদার্স-বারনাম বেইলির সার্কাস পার্টির প্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র জন্তুর গলার জোর প্রদর্শনীর সকল জানোয়ারের চেয়ে কম। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কিত বহু ব্যাপারে ব্যবহৃত একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক ধ্বনি-পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা টোটো এবং গারগানটুয়া এই দুইটি ভয়ঙ্কর গরিলার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কিচিরমিচির শব্দকারী



১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে প্রাথমিক পরীক্ষাকালে ফন্টানা বাঁধের উৎক্ষিপ্ত জলরাশির দৃশ্য

কেনারি পক্ষী অপেক্ষা তাহাদের ধ্বনির তীক্ষ্ণতা (intensity) সামান্ত কম। তাহাদের আওয়াজের উচ্চতার পরিমাপ ৭৩ ডেসিবেল মাত্র। (ডেসিবেল হইতেছে শব্দের উচ্চতার ইউনিট বা সর্বনিম্ন মান)। অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেনারি পক্ষীর কিচির-মিচির ডাকের উচ্চতা ৭৭ ডেসিবেল। পশুরাজ সিংহ কিন্তু কণ্ঠস্বরের দিক দিয়া তাহার রাজ-মহিমা হারাইতে বসিয়াছিলেন শেষে এক ডেসিবেলে কোনো মতে তাহার ইজ্জৎ রক্ষা হইয়াছে। গজেন্দ্র টবি ১০৯ ডেসিবেলের এক বিকট বৃংহিত ধ্বনি দ্বারা তো পশুরাজকে দস্তুরমত চ্যালেঞ্জ করিল, সিংহ কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও তাহার সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারিল না। শেষে পশুকুলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্যই যেন মরিয়া হইয়া ১১০ ডেসিবেলের এক প্রচণ্ড গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুই ফুট (৬০ সেন্টিমিটার) ব্যবধানে বসিয়া চারিজন লোক একটা ইস্পাতের প্লেটে হাতুড়ি পিটাইলে যে ধরণের শব্দ হয় ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চ নিনাদের তীক্ষ্ণতা তদনুরূপ। জিরাফ তো বোবা। সুতরাং তার কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে, সার্কাসের যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে বিরাটাকৃতি বোয়া-সর্পের কণ্ঠস্বরই সকলের চেয়ে ক্ষীণ। দুই ফুট ব্যবধানে তার ফোঁসফোঁসানির পরিমাপ হইল ৬০ ডেসিবেল মাত্র, খুব মৃদুকণ্ঠের কথাবার্ত্তার চেয়ে উচ্চ নয়। 'বেঙ্গল টাইগার'কে সাধারণত: গর্জ্জনের দিক দিয়া সিংহের পরেই স্থান দেওয়া হয় কিন্তু ধ্বনিপরিমাপক যন্ত্রে দেখা গেল যে, তাহার গর্জ্জনের উচ্চতার পরিমাপ মাত্র ৮৯ ডেসিবেল।

চতুষ্কোণ ফিউসিলেজযুক্ত মালগাড়ীবাহী বিমান

ছবিতে যে মালগাড়ীবাহী অভিনব মার্কিণ বিমানটি দেখা যাইতেছে তাহা দি ফেয়ারচাইল্ড সি-৮২ প্যাকেট নামে অভিহিত। ইহার ভিতর একটি আড়াই টন আর্মি-ট্রাকের অনায়াসে স্থান হইতে পারে। সি-৮২ ট্রেনের মালগাড়ীর কামরার ধরণের একটা প্রকাণ্ড মালগাড়ীতে করিয়া ৯-সর্ট (৮ মেট্রিক) টন মাল অনায়াসে বহন করিতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থানে ভারী এবং প্রকাণ্ড মালগাড়ীসমূহ লইয়া যাওয়ার জন্যই ইহার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। ইহার চলাচলের পথের বিস্তৃতি চার হাজার মাইল। সমুদ্রের উপর দিয়া ইহা ঘণ্টায় দু'শ-মাইল (৩২০ কিলোমিটার) বেগে যাইতে পারে। সম্পূর্ণ সাজসরঞ্জামসহ ৪২ জন বিমানবাহিত পদাতিক সৈন্যের চলাচলের যান-স্বরূপ অথবা এম্বুলেন্স বিমানরূপেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণ ফিউসিলেজগুলি গোলাকার কিন্তু ইহার সহিত যে ফিউসিলেজটি সংযুক্ত আছে তাহা চতুষ্কোণ বলিয়া তাহাতে বেশী মাল ধরিতে পারে। আকাশ-পথে চলাচলের উপযোগী উক্ত শকটের প্রচুর মাল বহন করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার পিছন দিককার দরজা দিয়া মাল বোঝাই অথবা খালাস করা যাইতে পারে। উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিলে প্রবেশ-পথের পরিধি হয় ৮×৮ ফিট (২॥×২॥ মিটার)। বিমানটির মেঝে সমতল বলিয়া ট্র্যাক হইতে ইহাতে সরাসরি অনায়াসে মাল বোঝাই করা যাইতে পারে। বাঁ-দিকে আর একটি ছোট দরজা থাকায় যুগপৎ উভয় দিক দিয়াই মাল বোঝাই করা যায়।

'ডিডিটি'র সাহায্যে সমুদ্রোপকূলে কীটপতঙ্গাদির বিনাশ সাধন

ডিডিটির কীটপতঙ্গাদি ধ্বংস করিবার শক্তি অপরিসীম। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বহু রণাঙ্গনে, কীটপতঙ্গাদি দ্বারা সংক্রামিত ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে ইহা প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে। শত্রুকবলমুক্ত এবং অধিকৃত বহু অঞ্চলের জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নয়নে ইহার অসীম কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ব্যাপারে ইহা দ্বারা কতদূর সুফল লাভ করা যায় সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূল 'জোন্স বিচে' তাহার পরীক্ষণ হইয়াছে। সেখানে ডিডিটি দ্বারা মশা-মাছি এবং অন্যান্ত রোগ-বীজাণুবাহী কীটপতঙ্গাদি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক বিভাগের কুয়াশা-উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ঐ যন্ত্র কৃত্রিম কুজ্ঝটিকার আবরণ সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধজাহাজসমূহ এবং সৈন্যদের শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পরীক্ষাকারীগণ উক্ত যন্ত্রসাহায্যে কীটপতঙ্গ ধ্বংসকারী ডিডিটি দ্রবকে (liquid) কুয়াশার আকারে পরিণত করিয়া প্রতি মিনিটে এক একর (২॥ মিনিটে এক হেক্‌টেয়ার) জমির উপর সবেগে নিক্ষেপ করেন। মিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট এই তরল বিন্দুর দরুন সমুদ্রোপকূলে বহুকাল আর কীটপতঙ্গাদি জন্মিতে পারিবে না বলিয়া পরীক্ষাকারীগণ মনে করেন।

উত্তাপহীন আলো

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকমহলে উত্তাপহীন আলো উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ছবিতে দেখা যাইতেছে ওয়েষ্টিং হাউস আলোক বিভাগের অ্যাপ্লায়েড লাইটিং-এর ডিরেক্টর সামুয়েল জি, হিবেন বক্তৃতা প্রদানকালে উক্ত বিষয়টি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তধৃত জলপাত্রটিকে জোনাকি পোকার আলোকের মত উত্তাপহীন আলো দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। অনুপ্রভ (phosphorescent) দ্রব (liquid)সমূহ মিশ্রিত করিয়া জলপাত্র এবং কাচের গ্লাস ভর্ত্তি উত্তাপহীন আলো উৎপাদন করা



খনিতে এবং রাস্তা-ঘাট ও গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত 'বাকেটের' একটি মডেল

হইয়াছে। মার্কিন আলো-বিভাগের এঞ্জীনিয়ারগণ যদি বৈদ্যুতিক আলোকের কন্দে (bulb) উত্তাপহীন আলো ব্যবহার করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী কৃত্রিম আলো বলিয়া গণ্য হইত। আলোক হইতে উত্তাপ এবং অন্যবিধ বিকিরণের দরুন শক্তির (energy) যে অপচয় হয় এতদ্দ্বারা তাহারও নিবারণ হইত। প্রকৃতির স্বাভাবিক "দীপাবলী" যে অদৃশ্য অতি-বেগনি আলো উৎপাদন করে তাহাতে শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হয় না এবং তৎসমুদয় হইতে সামান্য মাত্র উত্তাপও বিকিরণ হয় না। মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত আধুনিকতম আলো-কন্দেও (light bulb) কিন্তু শক্তি এবং উত্তাপ এই দুইটিই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জোনাকির দেহ হইতে বিকীর্ণ পদার্থের মধ্যে নবম-দশমাংশ ভাগ আলোময়।

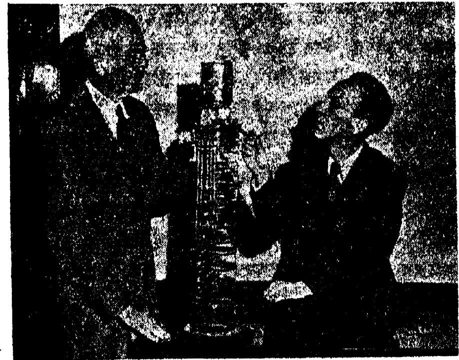
ফণ্টানা বাঁধের জলনিয়ন্ত্রণের অভিনব ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে নবনির্ম্মিত ফণ্টানা বাঁধের জলরাশি যাহাতে সরাসরি প্রচণ্ড বেগে নদীতে পড়িয়া বাঁধের অনিষ্ট না করিতে পারে সেইজন্য অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথমে, ৩৪ ফুট (সাড়ে দশ মিটার) ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া জলধারাকে প্রবাহিত করানো হইয়াছে। পর্ব্বতগাত্রের মাঝখান দিয়া প্রবহমান এই উদ্দাম জলরাশি যদি সরাসরি নদীতে আসিয়া পড়িত তাহা হইলে নদীবক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিয়া বহুযত্নে নির্ম্মিত বাঁধটিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত। সেইজন্য এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে দুইটি জলধারাই ঠিক নদীর মুখে আসিবামাত্র একটি সচ্ছিদ্র বিরাট্ জলাধারে পড়িতে পারে। সেই প্রকাণ্ড আধারটি জলরাশিকে নদীগর্ভে পড়িতে না দিয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। বর্ত্তমানে এই বিষয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা মাত্র চলিতেছে, তাহা সত্ত্বেও সুড়ঙ্গগুলি হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ২০০,০০০ কিউবিক ফুট (৫,৫০০ কিউবিক মিটার) জল নির্গত হইতেছে এবং প্রতি সেকেণ্ডে তাহা ১৫০ ফুট (৪৬ মিটার) পথ অতিক্রম করিতেছে। টি-ভি-এর জল-সম্বন্ধীয় (hydraulic) গবেষণাগারে স্কেল-মডেলের সাহায্যে এই অভিনব জলনিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত গবেষণাকার্য্য সম্পন্ন হয়।

মার্কিন এঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যার্থে প্ল্যাণ্ট এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মডেল

স্কেল-মডেল, প্ল্যাণ্ট অথবা যন্ত্রপাতির মডেলসমূহ মার্কিন এঞ্জিনীয়ারদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, এগুলি তাহাদের মনে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করে। মডেল যদি স্বচ্ছ জিনিষের হয় তাহা হইলে তো কথাই নাই। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং কারখানা ইত্যাদি নির্ম্মাণে এই মডেলগুলি তাহাদের কত যে কাজে আসে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পেন্‌সিলভ্যানিয়ার অন্তর্গত পিটসবুর্গের ব্ল-ক্নক্স কোম্পানী নামক এঞ্জীনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানটির উপরে যখন পাঁচটি বিভিন্ন কোম্পানির জন্য পাঁচটি সিনথেটিক রবার পাইলট প্ল্যাণ্টের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ভার দেওয়া হইয়াছিল তখন এই ধরণের মডেলের উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইয়াছিল।

ইহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতি লইয়া নানা ধরণের পরীক্ষণ। বার-বার ইহাদের গঠনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে হইত। সেজন্য পাঁচটি প্ল্যাণ্টের বিভিন্ন অংশ এমনভাবে সাজানো দরকার হইয়াছিল যাহাতে খরচ বেশী না পড়ে এবং এগুলি অনায়াসে ইচ্ছামত ভাঙিয়া ফেলা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় মডেল তাহাদের বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে মডেলটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহারা কি ভাবে কাজ করিতে হইবে তাহা স্থির করিত। মডেলের মেঝে, ছাত এবং দেয়ালের জন্য এক ধরণের স্বচ্ছ নরম জিনিষ



ব্ল-ক্নক্স কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কষ্টিলাইজারের একটি স্বচ্ছ মডেল। কাগজ-শিল্প প্রভৃতিতে আর্দ্র চূণ ইত্যাদি ময়লা পরিষ্করণার্থে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়

ব্যবহার করা হইয়াছিল। বাসন-কোসন পাম্প ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিষসমূহ কাঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মেঝেগুলিকে ইচ্ছামত সরানো যাইত এবং অন্যান্য অংশসমূহকেও দরকারমত বিশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা ছিল।

যন্ত্রতাদিবদ্ধন মডেলের প্রত্যেকটি অংশ স্পষ্টভাবে দেখা যাইত এবং কি নূতন ব্যবস্থা করণীয় তাহা বুঝাও সহজসাধ্য হইয়া উঠিত।

এই যন্ত্র মডেলের কল্যাণে কোম্পানীর অনেক সময় বাঁচিয়া ছিল এবং অযথা অর্থব্যয়ের হাত হইতেও তাহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন। বিশেষ উন্নত ধরণের প্ল্যাণ্ট নির্ম্মাণেও তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে এই কোম্পানী নিজেদের কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে আরও নানা মডেল তৈরি করিয়াছেন।

বিজ্ঞান শুধু ধ্বংসের পথেই জগৎকে টানিয়া নিতেছে না, ইহা মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের ব্যবস্থাও করিয়া দিতেছে। দেশের ধন-সম্পদ শ্রী বৃদ্ধিকল্পে মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগদ্বারা যে সকল সুফল লব্ধ হইতেছে তাহা আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সমাধান

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব্ব

১

শ্রীমান্ রাজীবলোচন কক্ষে একাকী বসিয়া আছে। সম্মুখে দোয়াত কলম, খাতা, অঙ্কের বই; হাতে স্লেট পেন্‌সিল। ভাইবোনেরাও ঘরে দাপাদাপি করিতেছে, মা রান্নাঘরে রাত্রির আহারের আয়োজনে নিযুক্ত; বন্ধু ইতিমধ্যে বারচারেক আসিয়া খেলার সময় বহিয়া যায়, ইহা জানাইয়া গিয়াছে।

শ্রীমানের সম্মুখে অতি জটিল সমস্যা। কাহাকেও কিছু না বলিয়া যেদিকে দু'চোখ যায়, সেই দিকে চলিয়া যাইবে, না, ঘরে বসিয়া শুধু টাকা আনা পাই-এর যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি করিতে থাকিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না।

আজ সকালে পিতা পুত্রের গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন। যথারীতি কর্ণমর্দন, চপেটাঘাত প্রভৃতি মহৌষধ প্রয়োগেও যখন পুত্রের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইল না তখন তিনি দ্বাদশ অধ্যায়ের সমস্ত অঙ্কগুলি দ্বিপ্রহরে করিয়া রাখিতে হইবে, এই আদেশ দিয়া আপিসে গমন করিয়াছেন।

কিন্তু আদেশ দান এবং আদেশ পালনে পার্থক্য আছে। যাহাদের আদেশ দিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের বিবেচনা-বুদ্ধির উপর, যাহাদের আদেশ পালন করিতে হয়, তাহাদের চিরকালের অশ্রদ্ধা। বিশেষতঃ নিরুপায় হইলে অন্যায় আদেশ পালন করিতে হয়; অসম্ভব আদেশ হইলে তাহা পালন না করায় শাস্তি চোখ বুঁজিয়া গ্রহণ করিতে হয় অথবা আদেশদাতার সংস্রব ত্যাগ করিতে হয়। শ্রীমান্ রাজীবলোচনও নিরুপায়, প্রদত্ত আদেশও অন্যায় এবং তাহা পালন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই হয় তাহাকে [illegible]হণ করিতে হইবে, না হয় পিতার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টি চিত্তাকর্ষক হইলেও কাজে খাটান সহজ নহে, শ্রীমান্ রাজীব শিশু হইলেও এবং অঙ্কে তাহার মাথা না থাকিলেও, এই সহজ জ্ঞানটুকু তাহার আছে। পিতার নিশ্চিন্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের প্রতি ধাবিত হইতে তাই সে পারিল না।

রাজীবলোচনের পিতা হরিমোহন বাবু জমিদারী কাছারিতে বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। তিনি জমিদারের একজন কর্মচারী। জমিদারবাবু আদেশ দিয়াছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে জমিদারী-সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব শেষ করিয়া দিতে হইবে। কি কি বিষয়ে কত আয় এবং সে আয় বৃদ্ধি করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে কি না, কি কি বিষয়ে কত ব্যয় এবং সে ব্যয় কমাইতে পারা যাইবে কি না, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা তাঁহাকে জন্মাইয়া দিতে হইবে। সেই জন্য প্রতিদিন কর্মচারীদিগকে কয়েক ঘণ্টা করিয় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে, ইহাই জমিদারবাবুর আদেশ। এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে হরিমোহনবাবু কি করিবেন তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। আজই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সকাল দশটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত খাটিতেছেন। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে দু-এক দান দাবা না খেলিলে তাঁহার ক্লান্তি দূর হয় না; যথাসময়ে চা না পাইলে মাথা ধরে।

একবার ভাবিলেন, এ ছাই চাকরি ছাড়িয়া দিই, এই অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য হয় না। কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এমনি করিয়াই কাটিয়াছে। যে খাওয়ায় (হোক্ না শ্রমের বিনিময়ে) তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেই হইবে, অন্ততঃ যত দিন পর্য্যন্ত অন্য অন্নদাতা না জোটে। এই ভাবিয়া তিনি এইবারের মতও কর্মে ইস্তফা না দেওয়াই স্থির করিয়া টাকা আনা পাই-এর মধ্যে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। ঘড়িতে তখন সাড়ে ছয়টা।

৩

জমিদার নিখিলনাথ চৌধুরীকে মহা চিন্তান্বিত দেখাইতেছে। ওয়ার-ফণ্ডের জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহাকে তুলিয়া দিতে হইবে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এই অনুরোধ আসিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধ মানেই আদেশ এবং সে আদেশ পালন না করাটা নিখিলনাথ বাবুর সুবিবেচনার পরিচায়ক হইবে না। কিন্তু এত টাকা সংগ্রহ করিবেনই বা কিরূপে? তাঁহার নিজের কর্মচারীরা জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতার

জন্ত অভাব-অনটনে কাল কাটাইতেছে। অবশ্য তিনি বলিলে তাহারা না খাইয়াও দু'দশ টাকা আদায় করিয়া দেয়। আর আছে প্রজারা। তাহাদের কাছ হইতে আর কত আদায় হইবে? যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটই তখন তাহার উপর উন্টা চাপ দিবেন। অথচ টাকা আদায় তাহাকে করিতেই হইবে। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে চটাইলে আখেরে জমিদারীর ভাল হইবে না। তাছাড়া, তিনি নিজে যদি মোটা টাকা আদায় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দেয় টাকার অঙ্কটা কম হইলেও চলিবে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া চাই কি রাজাবাহাদুর খেতাবটাও জুটিয়া যাইতে পারে। এইরূপ নানা দিক ভাবিয়া কাগজ কলম লইয়া একটা তালিকা প্রণয়নে মন দিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

১

রাজীবলোচন মরিয়া হইয়া খাতা পেন্‌সিল গুটাইয়া রাখিয়াছে। সময় অতীত হইয়া গেলেও পিতা আসিলেন না দেখিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল এবং অঙ্কের খাতা দেখিতে চাহিলে সে কিরূপে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে মনে মনে তাহাই ঠিক করিতে লাগিল।

২

না, এইবার যোগে ভুল হইতেছে। একটা হিসাব সাত বার করিয়াও ঠিক হইতেছে না। মাথার শিরাগুলা দপ দপ করিতেছে। হরিমোহনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি আজ আর কাজ করিতে পারিবেন না। তাহাতে জমিদার বাবু চটিয়া যান, তাড়াইয়া দেন সেও ভাল। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে ছাঁকিয়া ধরিল, বলিল, "অন্য সব চাকুরেরা মাগ্‌গি ভাতা পাচ্ছে। আমাদের মাগ্‌গি ভাতা পাওয়া তো দূরের কথা, নিয়মিত মাইনেও পাই না। তার ওপর না খেয়ে-দেয়ে আবার যদি এই অতিরিক্ত খাটতে হয়, তাহলেই ত গেছি। আপনি এর প্রতিকার করুন।"

হরিমোহন বাবুও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ঠিক কথা। চললাম আমি বাবুর কাছে।"

৩

পাঁচ প্যাকেট সিগারেটের ধোঁয়া ও সাত কাপ চা উদরস্থ এবং বার ফর্দ কাগজ নষ্ট করিয়া যখন কাগজে-কলমেও চাঁদার অঙ্ক পাঁচ হাজারের উর্দ্ধে উঠাইতে পারিলেন না, তখন বাধ্য হইয়াই চৌধুরী মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর চটিয়া উঠিলেন। এই অন্যায় আদেশ তিনি পালন করিতে পারিবেন না, তাহাতে তাঁহার জমিদারীর অদৃষ্টে যাহাই থাকুক। এই বলিয়া তিনি কাগজ কলম দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কিরূপ চোখা-চোখা কথা শুনাইবেন, তাহাই পাঁয়তাড়া ভাঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় হরিমোহন নিরীহ মেষশাবকের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চালনে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং জমিদারপুঙ্গবকে আভূমি প্রণাম করিয়া বিনীত কণ্ঠে অপর কর্মচারীরা কি বলিতেছে তাহাই নিবেদন করিলেন।

নিখিলনাথ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "ব্যাটাদের আবদারের আর অন্ত নেই। সরকার-বাহাদুর মাগ্‌গি ভাতা দিচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন? না, তাড়ায় তাড়ায় নোট ছাপান হচ্ছে। দু'দশখানা করে কর্মচারীদের দিতে তাঁর আর আটকাবে কেন? ব্যবসায়ীরা মাগ্‌গি ভাতা দিচ্ছে, কেন? না, এক টাকার জিনিষে তারা একশ টাকা পাচ্ছে, তার থেকে দু'চারটা দিতে তাদের আটকাবে কেন? আর জমিদারদের বেলায় কি হচ্ছে? একটি পয়সা খাজনা আদায় হচ্ছে তাদের? কিন্তু খরচ কেমন বেড়েছে দেখছ তো? তারপর আবার চাঁদা। চাঁদা দিতে দিতেই যে জমিদারী নীলামে চড়বে সে খবর রাখ কেউ?"

হরিমোহন সবিনয়ে সমস্ত ব্যাপার স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কর্মচারীদের এইরূপ অন্যায় আবদার যে স্পর্দ্ধারই নামান্তর তাহা অকপটে প্রকাশ করিলেন।

নিখিলনাথ কহিলেন, "তুমি পুরাতন এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী বলেই বলছি, কর্মচারীদের কাছ থেকে ওয়ার-ফণ্ডের জন্ত কিছু চাঁদা তুলে দিতে হবে। আর বুঝিয়ে শুঝিয়ে প্রজাদের কাছ থেকেও মোটা রকম চাঁদা আদায় করে দেওয়া চাই, বুঝলে? তা না হ'লে আমার আর মান থাকে-না। হাজার-পঞ্চাশেক যদি আদায় করে দিতে পার তবে তোমার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করা হবে। তোমার নামে যে চাঁদাটা ধরবে সেটা আমার কাছ থেকেই নিও।" এই বলিয়া কর্মচারীদিগকে জল খাইবার জন্ত একখানা দশ টাকার নোট তিনি হরিমোহনের হাতে দিলেন। হরিমোহন দশ টাকার নোটটি রাখিয়া পাঁচ টাকার নোট একটি পকেট হইতে বাহির করিলেন এবং সেই টাকা দিয়া নিমকি আনাইয়া কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

উপসংহার

নিখিলনাথ বাবু রাজা-বাহাদুর হইতে পারেন নাই, কিন্তু রায় বাহাদুর হইয়াছেন। হরিমোহনের গৌরব বৃদ্ধি না হইলেও আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। রাজীবলোচনের গণিত-শাস্ত্রে জ্ঞান বৃদ্ধি না হইলেও তাহার জন্ত একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনি তদ্‌বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

পল্লীগাথা—দস্যু কেনারাম

শ্রীসুলতা কর

বাংলাদেশে কতকগুলি প্রাচীন পল্লীগাথা আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের সরল পল্লীবাসীরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনের আনন্দে এই গাথাগুলি রচনা করেছে। শিক্ষিত কবির শব্দাড়ম্বর, বাক্যালঙ্কার, ছন্দনৈপুণ্য এগুলিতে নাই বটে, কিন্তু ভাবের গম্ভীরতায়, কাব্য-সৌন্দর্য্যে, প্রাণের মাধুর্য্যে পল্লীবাসীদের এই রচনাগুলি বাংলার কাব্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে।

এই গাথাগুলির ভিতর দিয়ে বাংলা মায়ের প্রাণের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতার আবেষ্টনী থেকে, কৃত্রিমতার বন্ধন থেকে বহু দূরে চলে এসেছি; বাংলা-মায়ের শ্যামল প্রান্তরে বসে রাখালের বাঁশী শুনছি।

পল্লীকবিদের পাশে দাঁড়িয়ে পল্লীর মহিলা কবিরাও এই কাব্যভাণ্ডারে সম্পদ দান করেছেন। মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর লেখা দস্যু কেনারামের কাহিনী পল্লীগাথার একটি অমূল্য সম্পদ।

ময়মনসিংহের দুর্দান্ত দস্যু কেনারাম কেমন করে চন্দ্রাবতীর পিতা ভক্ত বংশীদাসের সংস্পর্শে এসে সাধু কেনারামে পরিণত হ'ল তাই এই কাহিনীটির বিষয়বস্তু।

চন্দ্রাবতীর রচিত কাহিনীটি এই—খেলারাম নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে মনসাদেবীর আরাধনা করে এক পুত্র লাভ করেন। পুত্রের নাম রাখেন কেনারাম। পরম আদরে বৃদ্ধ দম্পতি পুত্রকে লালন-পালন করতে থাকেন। কিন্তু জন্মাবধি দুর্ভাগ্য কেনারামের সাথী। যখন তার বয়স মাত্র সাত মাস তখন তার মা মারা গেলেন, পিতা দুঃখে-শোকে মুহ্যমান হয়ে শিশু কেনারামকে মাতুলালয়ে রেখে সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। মাতুলালয়ে বাসও কেনারামের অদৃষ্টে বেশী দিন ঘটল না। দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কেনারামের মামা পাঁচ কাঠা ধানের পরিবর্ত্তে ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ডাকাত হালুয়ার কাছে কেনারামকে বিক্রী করে দিলে।

এর পর থেকে ঘটনাগুলি দ্রুত নাটকীয় রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। তৃতীয় দৃশ্যে দেখি গরীব ব্রাহ্মণের অনাথ ছেলে কেনারাম ডাকাত হালুয়ার হাতে মানুষ হয়ে দুর্দান্ত দস্যুতে পরিণত হয়েছে। তার শরীর মন দুই-ই বদলে গেছে। গারো পাহাড়ের নীচে বনখাগড়ায় পরিপূর্ণ বিরাট্ জঙ্গলে সে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। তখন তাকে দেখতে হয়েছে—

"হাত পায় গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্ব্বত প্রমাণ।
রাবণের মত হৈল অতি বলবান॥"

তার স্বভাব হয়েছে—

"পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনারাম।
স্ত্রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম॥
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন।
হনন অন্তরে পারে ধনের কারণ॥"

চতুর্থ দৃশ্যে দেখি ডাকাত কেনারামের বিচরণ-ভূমি সেই বিস্তৃত অরণ্যের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভক্ত সাধু বংশীদাস শিষ্যদলকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান গান গাইতে গাইতে চলেছেন। ভগবানের নাম গানে তিনি এমনই মত্ত যে দস্যুভয়, নির্জ্জন প্রান্তর কিছুই তাঁর মনে নাই।

এমন সময় দস্যু কেনারাম সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মত দলবল নিয়ে তাঁর পথ আটকালে। বংশীদাসের ভক্তেরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধুর নির্ম্মল অন্তরে পার্থিব ভয়ের স্থান নাই।

দস্যুর উদ্যত খাঁড়ার নীচে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন—"আমার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে মার তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তার আগে বল তুমি কি জন্য নরহত্যা করে এত পাপ সঞ্চয় করছ। যে ধন তুমি উপার্জ্জন করছ তা নিয়ে তুমি কি কর?"

মৃত্যুভয়হীন সন্ন্যাসীর এই প্রশ্নে দস্যু চমকে উঠল। সে ত এ ভাবে কোন দিন ভেবে দেখে নি। ছোটবেলা থেকে সে পশুর মত জঙ্গলে জঙ্গলে নরহত্যা করে বেড়াচ্ছে। সে পাপ-পুণ্য জানে না, হিতাহিত জানে না। তারও অন্তরে যে সুপ্ত সাধু-প্রবৃত্তি আছে এ কথা আজ সন্ন্যাসী তাকে প্রথম স্মরণ করিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলল—

"দারা পুত্র কিছু মোর নাই।
মানুষ মারিয়া আমি বড় সুখ পাই॥
ধনে নাহি প্রয়োজন টাকায় নাহি কাম।
মানুষ মারিয়া মোর হইল সুনাম॥"

সন্ন্যাসী বললেন—"কিন্তু টাকা নিয়ে তুমি কি কর?"

দস্যু উত্তর দিল—"টাকা সে মাটির গর্ত্তে লুকিয়ে রাখে। ভোগ করে না পাছে বিলাসী হয়ে পড়ে এই ভয়ে; দান করে না পাছে অপরে তার সমান ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে এই ভয়ে।"

সন্ন্যাসী তাকে অনেক উপদেশ দিলেন। বললেন—"এমন ধন নিয়ে তোমার কি লাভ আছে বল। এর জন্য কেন তুমি নরহত্যা করে পাপ সঞ্চয় করছ।"

সন্ন্যাসীর অগ্নিময়ী বাণী দস্যুর অন্তঃকরণকে বার-বার জাগিয়ে তুলতে চাইলেও পাপ প্রবৃত্তিগুলি সহজে পরাজিত হতে চায় না। কেনারাম ঠাকুরকে বললে—"ঠাকুর ওসব পাপ-পুণ্যের কথায় তুমি আমায় ভোলাতে পারবে না। মানুষ মেরে আমার সুখ—আমি তাই করব।" এই বলে বংশীদাসকে কাটবার জন্য খাঁড়া উচু করে দাঁড়াল।

তখন বংশীদাস বললেন—"কেনা, আমি শেষবার ভগবানের নাম গান করব, আমায় মারবার আগে সেইটুকু সময় দাও।" কেনারাম বলল, "আচ্ছা, তাই হোক্।"

পঞ্চম দৃশ্যে দেখি সেই বিরাট্ অরণ্যের মাঝে একদিকে বংশীদাস দলবল নিয়ে মনসার ভাসান গান গাইতে বসেছেন আর অপর দিকে কেনারাম দস্যুর দল নিয়ে বসে গান শেষ হবার পর তাঁকে হত্যার জন্য অপেক্ষা করছে। বংশীদাস গান আরম্ভ করলেন। সে কি গান, কি তার সুর, কি ভাব! সে

গানের সুরে বিরাট্ অরণ্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভক্তের অন্তরের স্পর্শে ভগবান যেন মর্ত্যে নেমে এলেন। সে গান শুনে—

"আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশু পাখী।
কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা রাখি॥
উড়িয়া যায় পাখী আসি বসিল ডালেতে।
মনসা ভাসান গায় অগ্রনার সুতে॥"

গান যেমন পর্দায় পর্দায় উঠতে লাগল, কেনারামের কঠিন অন্তঃকরণও তেমনি স্তরে স্তরে দ্রব হতে লাগল। সে গানের সুর দস্যুর অন্তরে প্রবেশ করে এতদিনের জমাট কাঠিন্য দূর করে দিলে। হৃদয়ের ঘোর অন্ধকারে সূর্য্যোদয় হ'ল।

—"গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে।
সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে।"

গান শেষ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে কেনার পাপজীবনও শেষ হ'ল। অনুশোচনায় অধীর হয়ে বংশীদাসকে গুরুর পদে বরণ করে নিয়ে দস্যু পাপজীবন ছাড়তে চাইল। কিন্তু আজীবন পাপ করে সে বুঝতে পারে না কেমন করে পুণ্যপথে চলবে। তাই ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখি সে বংশীদাসকে বলছে—"ঠাকুর আজ পর্য্যন্ত মানুষ মেরে যত ঘড়া ঘড়া ধন রোজগার করে মাটির তলায় পুঁতে রেখেছি সে সব তোমায় দিচ্ছি, তুমি আমায় সুপথে চলবার উপদেশ দাও।"

বংশীদাস বললেন—"মানুষ মেরে তুমি যে পাপের ধন উপার্জ্জন করেছ তা নিয়ে আমি কি করব। আমি যে ধন পেয়েছি সে কি তুমি কখনও পাবে?

"সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন।
মাণিকের কাছে যেন ছিসের মতন।"

আরও বললেন—"কেনা, সারাজীবন শত শত নরহত্যা করে তুমি যে পাপ করেছ সে সব তোমার সঙ্গে যাবে, সেকথা স্মরণ করো।"

তখন অনুশোচনায় অধীর হয়ে কেনারাম ঘড়ার পর ঘড়া ধন নিজ হাতে তুলে নিয়ে নদীর জলে বিসর্জ্জন দিলে। তারপর উদ্যত খাঁড়া মাথার উপর তুলে বংশীদাসকে ডেকে বলল—

"কত পাপ করিয়াছি লেখা জুখা নাই।
আমার মতন পাপী ত্রিভুবনে নাই॥
কত লোক মারিয়াছি এই খাণ্ডা দিয়া।
আপনি মরিব আজি দেখ দাঁড়াইয়া॥"

এতক্ষণে কেনার অনুশোচনার পাত্র পূর্ণ হ'ল। অন্তরের পাপ অনুশোচনানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গুরু তাকে ডেকে বললেন—"কেনা আর কার্য্য নাই।"

স্নান কইরা আস তুমি মুক্তি মন্ত্র দেই।"

বংশীদাস তাকে দীক্ষামন্ত্র দিলেন। দুর্দ্দান্ত দস্যু কেনারাম সাধু বংশীদাসের একান্ত ভক্ত হয়ে পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে লাগল। তার এমন পরিবর্ত্তন হ'ল যে—

"যারে দেখ্যা দেশের লোকে আগে পাইত ভয়।
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয়॥
যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ।
শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ॥"

পল্লীগাথাগুলির অধিকাংশই নরনারীর প্রেমকে বিষয়বস্তু করে রচনা করা হয়েছে, সুতরাং তাদের কাব্যরূপ সহজেই ফুটে উঠেছে। চন্দ্রাবতী এই গাথাটিতে প্রচলিত আদর্শ গ্রহণ করেন নি, নরনারীর প্রেম এই গাথায় স্থান পায় নি, বিষয়বস্তু অনেকটা নীরস, তবুও সমগ্র গাথাটিতে কত সুন্দর কাব্যরূপ কত সহজে ফুটে উঠেছে।

আড়ম্বরশূন্য দু'একটি সরল কথায় চন্দ্রাবতী গাথাটির মাঝে মাঝে কত বিচিত্র চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কেনারামকে ডাকাতের হাতে বিক্রী করবার সময় দেশে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল চন্দ্রাবতী মাত্র একছত্রে তার কত সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

"এক মুষ্টি ধান্য নাহি গৃহস্থের ঘরে।
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে॥
আগে ত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন।
তাহার পর গাছের পাতা করিল ভক্ষণ॥
পরে ত ঘাসে ত নাহি হইল কুলান।
ক্ষুধায় কাতর হৈল যত লোক জন॥
গরু বাছুর বেচিয়া খাইল হালিধান।
স্ত্রী পুত্র বেচে নাহিগো গণে কুলমান॥"

অতি সামান্য দু-এক কথায় কবি ডাকাত কেনারামের রূপগুণ ফুটিয়ে তুলেছেন—

"হাত পায় গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্ব্বত প্রমাণ।
রাবণের মত হৈল অতি বলবান॥
শিশুকাল হতে সে না জানে দেবতায়॥
ভালমন্দ ভেদ নাই তার সীমানায়॥
পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনারাম।
স্ত্রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম॥
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন।
হরষ অন্তরে মারে ধনের কারণ॥
বাঘ যেমন মারে জন্তু খেলিয়া খেলিয়া।
এহি মতে মারে দুষ্ট মানুষ ধরিয়া॥"

সাধু বংশীদাসের ছবিখানিও অল্প কথায় সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। নলখাগড়ার বিস্তৃত জঙ্গলে সন্ধ্যার অন্ধকারে সাধু বংশীদাস চলেছেন—

"শ্রী অঙ্গেতে নামাবলী সন্ন্যাসীর বেশ।
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ॥
ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয়।
আগে আগে যান পিতা পাছে শিষ্যচয়॥
প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গলা ধরে।
কেহ বা অশ্রুতে ভাসি পড়ে ধরা 'পরে॥
না জানে কোথায় তারা গান গাইয়া যায়।
কোথায় আইল নাহি চক্ষু তুলে চায়॥

দৃশ্যের পর দৃশ্যে চন্দ্রাবতী যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছেন তাও অপূর্ব্ব। প্রায় প্রতি দৃশ্যে এক-একটি চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। ঘটনায় আবর্তে

ভাসতে ভাসতে পাঠকের মন এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে পারে না, কাহিনীর কেন্দ্রীভূত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

প্রথম দৃশ্যের মাতুলালয়ে পালিত অনাথ বালককে পরের দৃশ্যে পাঠক দেখতে পায় দুর্দ্দান্ত ডাকাত-দলের সর্দ্দারের বেশে, নলখাগড়ার বিরাট্‌ জঙ্গলে হাসিমুখে নরহত্যা করে বেড়াচ্ছে।

"হইল ডাকাত কেনা দুর্দ্দান্ত এমন।
তাহার তরাসে কাঁপে নলখাগড়া বন ॥
সুগুদ হইতে সেই জালিয়া হাওর।
ঘুরিয়া বেড়ায় কেনারাম নিরন্তর ॥
নৌকা বাহিয়া সাধু ভাটি গাঙ্গে যায়।
ধন রত্ন কাড়ি লইয়া সায়রে ডুবায় ॥

তার পরের দৃশ্যে পাঠক আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখে সাধু বংশীদাস নামগানে বিভোর হয়ে সেই বিভীষিকাময়ী জঙ্গলে চলতে চলতে পড়েছেন দস্যুর উদ্যত খাঁড়ার নীচে।

"গাইতে গাইতে আইলা জালিয়া হাওরে।
চারি দিক বেড়িয়াছে নলে আর খাগরে ॥
মানুষের নাই নাম গন্ধ অষ্ট প্রহর জুড়ি।
নল আর খাগরে সব রহিয়াছে বেড়ি ॥
দূরেতে উঠিল ধ্বনি জয় কালী নাম।
সম্মুখে দাঁড়াল আসি দস্যু কেনারাম ॥
পাছু হইয়া খাড়া রয় দস্যুগণ যত।
কমর বান্ধা মালকোচা খাণ্ডা লইয়া হাত ॥"

এক মুহূর্ত্ত পরেই বুঝি সাধুর মাথা অন্ধকার জঙ্গলে লুটিয়ে পড়ে—হঠাৎ দৃশ্য বদলে গেল, পাঠক বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখল সেই গভীর জঙ্গলে বিস্তৃত তৃণাসনে বসে সাধু নামগান করছেন। মাথার উপর অসংখ্য তারাভরা আকাশ চাঁদোয়া হয়েছে, উড়ন্ত পাখীরা গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে ডালে এসে বসেছে, দস্যু কেনারাম হাতের খাণ্ডা মাটিতে ফেলে তন্ময় হয়ে সে গান শুনছে, তার চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়াচ্ছে।

সবশেষ দৃশ্যে পাঠক দুর্দ্দান্ত দস্যু কেনারামকে দেখতে পায় সাধু বংশীদাসের একান্ত ভক্তরূপে। পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে নামগান করতে করতে ভিক্ষা চাইছে।

"মৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে।
কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি 'মুক্তি ভিক্ষা চাই।
এক মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই ॥'
গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল।
নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল ॥"

দৃশ্যের পর দৃশ্য এমনি সব নাটকীয় ঘটনার অবতারণার ফলে গাথাটি প্রাণবান হয়ে উঠেছে, কোথাও নীরস এক-ঘেঁয়েমি স্থান পায় নি।

এছাড়া চন্দ্রাবতী দস্যুর জটিল মনস্তত্ত্বের যে সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন, তার চরিত্রে কঠোর কোমলের সমাবেশের যে নিপুণ ছবি এঁকেছেন তাতে তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলে গণ্য হবেন।

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবসমাজের সংস্রবহীন দস্যুর আলয়ে পালিত হয়ে কেনারামের অন্তর এমন বিবেকশূন্য হয়ে উঠেছিল যে পাপ-পুণ্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম কাকে বলে তাই সে জানত না। তার ধনমানে লোভ নাই, স্ত্রী পুত্র নাই অথচ খেয়ালের বশে প্রতিদিন নরহত্যা করত। কেন যে নরহত্যা করছে তা সে নিজেই জানত না। এ এক অদ্ভুত মনোভাব।

এই কঠিন পাষাণ-মনের ভিতরেও যে কোমলতার স্নিগ্ধ নির্ঝর লুকিয়ে আছে তা সাধু বংশীদাস বুঝেছিলেন। তিনি কি ভাবে সেই পাষাণ-মনকে গলিয়ে দস্যুকে পরমভক্ত পরিণত করলেন চন্দ্রাবতী তার সুন্দর ছবি দিয়েছেন। সাধু বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের ভিতর দিয়ে আমরা প্রথম দস্যুর মনস্তত্ত্বের সন্ধান পাই। মৃত্যুভয়হীন প্রশ্নে কি ভাবে দস্যুর জড় অন্তরের চেতনা হ'ল, অন্তরের সাধুপ্রবৃত্তিগুলি জেগে উঠল, কি ভাবে সাধু ও অসাধু ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হ'ল, চন্দ্রাবতী তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। শেষ দৃশ্যে সাধুর অমৃতময় নামগান দস্যুর কঠোর অন্তরের পাপপ্রবৃত্তিগুলিকে যে ভাবে দমন করল, পুণ্য প্রবৃত্তিগুলি জাগিয়ে তুলল তাহা পড়ে আমাদের মনে হয় চন্দ্রাবতী মানব-চরিত্রের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তার জটিল মনোভাবের যে অপূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ করেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও এমন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

অতীতকালে যখন পল্লীগায়ক ভাবুক পল্লীবাসীদের মাঝখানে বসে ভাবগম্ভীর সুরে এই গাথা গান করতেন তখন সরল পল্লীবাসীদের হৃদয় কোন্‌ স্বর্গরাজ্যেই না উঠে যেত। এই গাথা শুনতে শুনতে কতশত ভাবই না তাদের হৃদয়ে খেলে যেত। অনাথ বালকের দুঃখে তারা কখনও বা অশ্রু বিসর্জ্জন করত, কখনও বা নরহত্যাকারী দুর্দ্দান্ত দস্যুর কার্য্য-কলাপ শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠত, কখনও বা গভীর জঙ্গলের মধ্যে সাধু বংশীদাসের মনসা-ভাসান গান শুনে ভক্তিতে বিগলিত হয়ে যেত।

পল্লীগাথাগুলি যে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এ কথা বিংশ শতাব্দীর সুধীসমাজও স্বীকার করেন।

রবার ও রসায়ন

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

ব্রেজিল, মালয়, ইষ্ট ইণ্ডিজ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে রবার বৃক্ষ জন্মে। উহাদের গায়ে আঘাত করিলে এক প্রকার কষ বাহির হয়। উহাই প্রকৃতপক্ষে রবার। এই কষটি প্রথমে দেখিতে ঠিক দুধের মত, তখন লেটেক্স (latex) নামে অভিহিত হয়। লেটেক্স প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক জলযুক্ত রবার। এসেটিক বা ফরমিক এসিডের সাহায্যে ইহাকে জলমুক্ত করা হয়। এই জলমুক্ত রবারই কুচুক (Caoutchouc) নামে পরিচিত। কুচুককে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলিয়া ব্যবহারোপযোগী রবার প্রস্তুত হয়।

কুচুক সঙ্কোচন-প্রসারণশীল নয় এবং সামান্য তাপ বা জলীয় হাওয়ায় আঁঠালো হইয়া উঠে। এই সমস্ত দোষ সংশোধনের জন্য ভালকানিজেশন (Vulcanisation) নামক একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। কাঁচা রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশ্রণ পদ্ধতিকে ভালকানিজেশন বলে। গন্ধকের পরিমাণ নির্ভর করে বাঞ্ছিত রবারের গুণাগুণের উপর। গন্ধক যত বেশী দেওয়া হয় রবার তত শক্ত হয়। ইবনাইটে (Ebonite) গন্ধক অত্যন্ত বেশী পরিমাণে থাকে। গন্ধক ছাড়া আরও কয়েকটি পদার্থ রবারের সঙ্গে সংযোগ করা প্রয়োজন হয়। উহারা কখনও রবারের স্থায়িত্বের দিক দিয়া, কখনও মূল্য বা বর্ণের দিক দিয়া সহায়তা করে। কার্ব্বন ব্ল্যাক (Carbon black) কালো, জিঙ্ক অক্সাইড (Zinc oxide) সাদা, আয়রণ অক্সাইড (Ironoxide) লাল বর্ণ উৎপাদন করে।

আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চার্লস্ গুডইয়ার রবার সম্বন্ধে যথোপযুক্ত গবেষণা করিয়াছেন। ভালকানিজেশন প্রণালীটা তাঁহারই দান। আজ সমস্ত জগৎ ঐ দান গ্রহণ করিয়াছে।

রবারের কিছু-না-কিছু প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলেই অনুভব করি। কিন্তু ইহার বিরাট চাহিদার মূলীভূত কারণ মোটর যানবাহন। রবার টায়ার, রবার টিউব দুনিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই প্রধান চাহিদাকে বাদ দিলে অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। ইহার অত্যাশ্চর্য্য কয়েকটি গুণ ইহাকে মনুষ্যজাতির পরম সম্পদ করিয়া রাখিয়াছে। রবার সঙ্কোচন-প্রসারণশীল, নমনীয়, মজবুত ও স্থায়ী। ইহা বিদ্যুৎবাহক নহে, কিন্তু জল-অভেদ্য বায়ু-অগম্য (airtight) এবং এসিড-গ্রাহক। এতগুলি গুণবিশিষ্ট রবার আমাদের নানা কাজে আসিতেছে। ইহা দ্বারা গরম জলের ব্যাগ, বরফ ব্যাগ, পাদুকা, জল-অভেদ্য কোট, অশ্ব-পাদুকা, দস্তানা, জলবাহক নল, মেঝে ঢাকনী, নকল চর্ম্ম, স্পঞ্জ বা শোষক, খেলনা, রবার ব্যাণ্ড, রবার কুশন, গ্যাসবাহক নল ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে।

রবার বৃক্ষ সকল দেশে জন্মে না। প্রকৃতির বিধানে দেখা যায় সকল দেশ সকল প্রকার বৃক্ষে সমৃদ্ধিশীল হয় না। কোন দেশে সিনকোনা, কোন দেশে বেলেডোনা, কোন দেশে ইক্ষু, কোন দেশে রবার, এরূপ ভাবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সম্পদে ভরপুর থাকিয়া দেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। বর্ত্তমান সভ্যতা কিন্তু ভৌগোলিক বিধান মানিতে রাজী নয়। যে রবার মালয়ে জন্মে তাহার প্রয়োজন জার্ম্মেনীও অনুভব করে। পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বর্ত্তমান সভ্যতার ধাতসহ নয়। বিচক্ষণ রাসায়নিক প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। একবার একটি পদার্থ পরিশুদ্ধাবস্থায় হস্তগত হইলে উহাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলিয়া বিশ্লেষণ করা ও উহার গঠন-কৌশল অবগত হওয়া বর্ত্তমান রাসায়নিকের পক্ষে খুব কঠিন নয়। ইংরেজ রাসায়নিক প্রথমতঃ রবার হইতে আইসোপ্রিন নামে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত রবারের মূলীভূত পদার্থটি উদ্ধার করেন এবং প্রমাণ করেন যে এই আইসোপ্রিনের অণু-গুলিই নিজেদের মধ্যে যোগসাধন করতঃ রবার-রূপ ধারণ করে। ইংরেজের পন্থা অনুসরণ করিয়া জার্ম্মেনী, রাশিয়া ও আমেরিকা গভীর গবেষণায় রত হয় এবং উহারা প্রত্যেকে কিছু কিছু কৃত্রিম রবার প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিতে সফলকাম হয়। বলিতে কি, বৃক্ষরস হইতে যে রবারের জন্ম ও প্রসার, তাহা এখন প্রত্যেকটি রসায়নাগারের অমূল্য সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রম রবার কিছু দিন হইতে বাজারে চালু ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক রবারের চেয়ে কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট হইলেও মূল্যে সমকক্ষতা স্থাপন করিতে পারে নাই। মালয়, ঈষ্টইণ্ডিজ মিত্রপক্ষের হস্তচ্যুত হওয়াতে ঐ অচল জিনিষই যথেষ্ট সচল হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মেনী ও রাশিয়া সম্ভবতঃ যুদ্ধের সূচনায়ই কৃত্রিম রবার সম্বল করিয়া আসরে নামিয়াছিল। আমেরিকাতে কিছু প্রাকৃতিক রবার জন্মে সত্য, কিন্তু যুদ্ধ প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইয়া উঠিলে উক্ত সামান্ত সম্বলে কুলাইবে কেন? এ সময় তাহাকেও কৃত্রিম সম্পদের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়।

কৃত্রিম রবার প্রস্তুতির কয়েকটি প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি প্রণালীর প্রধান উপাদান অঙ্গার, চূণাপাথর, লবণ ও জল। সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রথাটি অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে অঙ্গার ও চূণাপাথর প্রচণ্ড বিদ্যুৎ তাপে প্রথমতঃ ক্যালসিয়াম কারবাইড রূপ ধারণ করে। কারবাইড হইতে জল সংযোগে এসিটিলিন গ্যাস পাওয়া যায়। এই এসিটিলিনই নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া রবারে পরিণত হয়। প্রকৃত পক্ষে এসিটিলিনকে রবারের উৎপাদক বলা যায়। আমেরিকায় যেখানে এসিটিলিনের প্রাচুর্য্য সেখানেই রবার প্রস্তুতের বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এজন্ত পেট্রোলিয়ামের খনি ও কয়লার খনির নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি রবারের জন্মভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

অপর একটি প্রথামতে কোন কোন দেশে এলকহল বা সুরাসার হইতে রবার প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাসায়নিক ব্যাপারটা এখানেও জটিলতায় পূর্ণ। তবে একথা বলিলে ভুল হয় না যে চাউল, আলু, ভুট্টা, গম ইত্যাদি শ্বেতসারবাহী

পদার্থ এবং শর্করাদি রবারের উৎপাদক হইবার উপ-যোগী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রবার সভ্যতার একটি অঙ্গ। ব্যবহার ক্ষেত্রে ইহা বৈচিত্র্যময়। যুদ্ধকালীন রসায়নবিদ্যা যেমন ইহার প্রচুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিয়াছে তদ্রূপ ইহার ব্যবহারের নূতন নূতন সংকেতও সৃষ্টি করিয়াছে। তরুণ তরু-বাটিকাতে (Nursery) জোড়াকলম সৃষ্টির জন্য এক প্রকার রবার-বন্ধনীর সৃষ্টি হইয়াছে কাজ সারা হইলে যাহা দুই এক সপ্তাহের মধ্যে শিথিল হইয়া যায় এবং বাগানের মালিকের কোন হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। আমাদের দেশে কচি গাছ, লতা, গাছপালার নূতন কুঁড়ি অনেক সময় পোকায় নষ্ট করিয়া ফেলে কিন্তু মার্কিন দেশে রবারের কৃপায় সে ভয় দূরীভূত হইয়াছে। একপ্রকার রবার আছে যাহার দ্রব গাছের উপর ছড়াইয়া দিলে অতি সুন্দর হাল্‌কা একটি জাল গাছকে ছাইয়া ফেলে, তখন পোকা-মাকড়ের সাধ্য নাই যে গাছের উপর পতিত হয়।

গবেষকগণ সেদিন একটি নূতন রবার আবিষ্কার করিয়া-ছেন। ইহা বিদ্যুৎবাহক। এই রবারের দ্বারা বহুদিনের কতকগুলি সমস্যা বিদূরিত হইয়াছে। বিদ্যুৎচালিত কারখানায় বেষ্টনীগুলি (belt) হইতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ঐ সমস্ত বেষ্টনী বিদ্যুৎবাহক না হওয়াতে উহাদের শরীরে প্রায়শঃ বিদ্যুৎ জমিয়া থাকে। কোন কর্ম্মচারী অতর্কিতে উহাকে স্পর্শ করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আজ এ দুর্ভাবনা হইতে শিল্পপতিগণ রক্ষা পাইয়াছেন। বহু উড়োজাহাজের চাকা আজকাল সম্পূর্ণ উক্ত রবারে তৈয়ারি হয়। তৈলবাহী নল, হাসপাতালের মেঝে, পাদুকার তলদেশ প্রভৃতি এই রবারের আবরণ পাইলে বিদ্যুৎ বা অগ্নিভয় অনেকটা উপশম হয়।

ফ্লোরিডাতে পাথরের রাস্তা দুরমুশ করিবার জন্য রবার-বেষ্টিত রোলার ব্যবহৃত হয়। ইহাতে চাপ পাইয়া পাথরগুলি সুন্দর জমাট বাঁধে অথচ লোহার রোলারের সংস্পর্শে না আসাতে পাথরগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয় না।

পুস্তক-পরিচয়

গল্পসংকলন—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। কবিতাভবন, ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ৩০৯ পৃ.। মূল্য ৫৲ ও ৬৷০।

গ্রন্থকারের নাম সাহিত্যসমাজে সুবিদিত, তাঁর সপক্ষ আর বিপক্ষ সমালোচকগণ যেন সহযোগিতা ক'রে তাঁর খ্যাতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যে অতিশয় শক্তিমান লেখক তাতে বোধ হয় কারও সন্দেহ নেই। তথাপি তাঁর লেখা অনেকের অপ্রিয়, তার কারণ, তিনি ভাষা ভাব আর বিষয় নিয়ে বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে পরীক্ষা করেছেন তা অনেক সময় প্রচলিত পদ্ধতি আর সংস্কারকে লঙ্ঘন করেছে। আমার ধারণা, তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষার ফল সকল ক্ষেত্রে ভাল হয় নি তা তিনি নিজেও বুঝেছেন এবং সেজন্য তাঁর লেখনীকে ক্রমশঃ বশে এনে নিজের প্রতিভার উপযুক্ত পথের সন্ধান পেয়েছেন। প্রথম থেকেই তাঁর রচনায় অসামান্যতা ছিল, কালক্রমে তা পরিণতি লাভ করে পরিমার্জিত অনুগ্র ও শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি যত গল্প লিখেছেন তা থেকে কতকগুলি বেছে নিয়ে এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন বয়সের রচনা হলেও সব গল্পেই দক্ষতা ও মনীষিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আধুনিক বা 'সাম্প্রতিক' যাই হন, তাঁর এই গল্পসংকলনে কোন দলগত উগ্র লক্ষণ নেই। দুই-এক স্থানে কিঞ্চিৎ রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গী পাওয়া যায়, তা জেনেই বোধ হয় লেখক তাঁর এক নায়িকাকে দিয়ে আক্ষেপ করিয়েছেন—'রবীন্দ্রনাথ একেবারে আমাদের মাথা খেয়েছেন।'

এই সুদৃশ্য সুখপাঠ্য নানা রসোজ্জ্বল বইখানি পড়লে সকলেই তৃপ্তিলাভ করবেন।

শ্রীরাজশেখর বসু

শতাব্দী—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭।৭ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

বিস্তীর্ণ এক পটভূমিকায় এই উপন্যাসের কাহিনী বিচিত্রিত। বাংলার বিলান অঞ্চলের একটি ছোট গ্রাম মঞ্জরীতে স্বদেশী যুগেরও বহু পূর্ব্বে নমঃশূদ্র ও হিন্দু মুসলমান কৃষকদের লইয়া ইহার গল্প। জমি-জমা চাষ-আবাদ কলহ-সখ্য ইত্যাদি সে গ্রামের সম্পদ; মানুষগুলি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হাসিকান্না সুখদুঃখ লইয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে স্বদেশী আন্দোলন—সন্ত্রাসবাদ; একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠে মঞ্জরী। কংগ্রেসের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন নবযুগের বাণী, স্বদেশীযুগের সন্ত্রাসবাদ নূতন বিপ্লবের বহ্নিতে রূপান্তরিত হয়। আসে রাশিয়ার আদর্শে সাম্যবাদের ঢেউ—শ্রমিক আন্দোলন। ক্ষুদ্র মঞ্জরীতে এ সবের স্পর্শ লাগে, মঞ্জরী শহরের অভিমুখে আগাইয়া চলে। চলচ্চিত্রের মত অসংখ্য নরনারী আর বহুতর ঘটনা শতাব্দীর একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মিছিল সাজাইয়া চলে। তার মধ্যে অটল মহিমায় মাথা উঁচু করিয়া আছে প্রধান চরিত্র রাজেশ্বর। আরও কয়েকটি মহীরুহ এই বনস্পতির পাশে দেখা যায়। ত্রিগুণা, বৃন্দাবন, জ্যোৎস্নানাথ,

মহেশ্বর, টগর, অমলা, জবা, নরেশ্বর। বৃহৎ পটভূমিকায় এই চরিত্রগুলির কোনটিই অনুজ্জ্বল নয়।

ছোট গল্প লেখায় লেখকের খ্যাতি আছে। স্বল্প পরিধির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক ও সরল প্রকাশ তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। আনন্দের বিষয়—বহু চরিত্র সমন্বিত এই বৃহৎ উপন্যাসখানিতেও তাঁর সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ আছে। অত্যন্ত সহজ ভাবেই চরিত্রে ও ঘটনায় মিশাইয়া জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ বিকশিত করিতে গেলে আরও কয়েকটি খণ্ডের প্রয়োজন হইত। লেখক সে চেষ্টা করেন নাই। রাষ্ট্রীয় চেতনার কয়েকটি স্তর দ্রুত অতিক্রম করিতে হইয়াছে বলিয়া কাহিনীর সঙ্গে কতকগুলি চরিত্রকে বাধ্য হইয়া তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু মূল চরিত্র ও উদ্দেশ্য কোথাও ব্যাহত হয় নাই, এইজন্য উপন্যাসখানি ভালই লাগিয়াছে।

স্বর্গাদপি গরীয়সী—(২য় খণ্ড)। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি দ্বিতীয় খণ্ডেও শেষ হয় নাই। বাংলা হইতে মিথিলায় বালিকা-বধূ গিরিবালার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। নূতন পরিচয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে মনের প্রসার বাড়িতেছে; নূতন রূপে নূতন আনন্দে ও নূতন চেতনায় বালিকা মা কিশোরী মায়ে রূপান্তরিত হইতেছেন। স্থান কাল পরিবেশ প্রভৃতির সঙ্গে মাতৃমহিমাকে নিখুঁত খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়া প্রগাঢ় নিষ্ঠায় লেখক অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। পরবর্ত্তী খণ্ডের জন্য রস-পিপাসু পাঠক সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কীর্ত্তন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কীর্ত্তন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত এই পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা কীর্ত্তনের স্বরূপ, ইতিহাস, প্রকারভেদ এবং ধর্ম্ম ও সঙ্গীতের দিক হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য ও গৌরব প্রভৃতি বিষয় যথাসম্ভব সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিলে কীর্ত্তন সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল ও অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পদচিহ্ন—শ্রীসুশীল জানা। ঈগল পাবলিশার্স, ৩০৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৫১, মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে তেরটি গল্প স্থান পেয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ছোট শহর, তার বন্দর, ক্যানেলের ধারের গঞ্জ,—তার ক্ষেতখামার এই গল্পগুলির পটভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্প্রতিক মন্বন্তর বাংলার সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপর্যয় এনেছে—'দাগ', 'কুকুর', 'অসুখ', 'সাল তামামি' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে লেখক তারই মর্ম্মন্তুদ আলেখ্য আঁকতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। অন্যান্য

গল্পগুলির মধ্যে 'ছায়া' ও 'জননীর জন্ম' নামক গল্প দুটি পাঠকের মনে বিশেষ দাগ রেখে যাবে।

লেখকের ভাষা একটু কাব্যধর্মী ও উচ্ছ্বাসময়,—এই দোষটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে তাঁর গল্প ভবিষ্যতে আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে।

শ্রীতারাপদ রাহা

শ্রীশ্রীকালিকাকল্পনামৃতম্—শ্রীমদ্ ভৈরবানন্দনাথ সম্পাদিত। হাওড়া, পোঃ বেলুড় মঠ—কালিকাশ্রম। মূল্য দুই টাকা।

১৪২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকাপূজাপদ্ধতি, বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য কালিকাস্তব এবং সানুবাদ কালিকোপনিষৎ স্থান পাইয়াছে। শ্যামারহস্যাদি গ্রন্থের ন্যায় ইহাও শক্তিসাধনপন্থীদের বেশ প্রয়োজনে লাগিবে। গ্রন্থারম্ভে সহস্রারবাসিনী পরমশিব-সঙ্গিনী ইষ্টমূর্তির আলেখ্যটি সত্যই সাধকানন্দবর্দ্ধিনী!

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যারা ছিল দিগ্বিজয়ী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৵০।

এই বইখানির প্রচুর চিত্রযুক্ত বহিঃসৌন্দর্য্য ইহার ভিতরের কাহিনীগুলিকে এক অনবদ্য রূপদান করিয়াছে। ভারতের ও বাংলার কয়েকজন দিগ্বিজয়ী বীর ও বীরাঙ্গনার গৌরবময় বীরত্বের কাহিনী ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'দিগ্বিজয়ী' গল্পে বাঙালী রাজা ধর্ম্মপালের উত্তরাপথে বিজয়াভিযান ও সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ, 'বাঙালীর বলে' গৌড়রাজ কুমারপাল ও মন্ত্রী বৈদ্যদেবের নিকট কামরূপ ও কলিঙ্গরাজের পরাজয়, বীরভূবনের বীর গোস্বামী আনন্দচাঁদের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদলন, মেঘনার বুকে শ্রীপুরের কেদার রায়ের সহিত ভীষণ নৌ-যুদ্ধে মোগল সৈন্যের পরাজয় প্রভৃতি কাহিনীগুলি পড়িয়া বাঙালী বীরের জাতি নহে এই অপবাদ মিথ্যা মনে হয়। মুসলমানগণ যখন এদেশকেই মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া স্বদেশরক্ষার জন্য সর্ব্বস্বপণ করিত সেই সময়ের গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্বাধীন সুলতানগণের অপূর্ব্ব শৌর্য্যের কাহিনী 'বাঙালী সুলতান' ও 'দুর্গ একডালা'য় বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যাবলম্বনে লিখিত এই বীরত্বগাথাগুলি কিশোরদের চিত্তে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিবে।

সোনার বাংলা—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ও শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

আমরা গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করি, এমন কি পৃথিবীর দূরদূরান্তের দেশবিদেশের ইতিহাসও কৌতূহলের সহিত পড়িয়া থাকি, কিন্তু যে মায়ের কোলে আমরা জন্মিয়াছি সেই সোনার বাংলা সম্বন্ধে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান বাংলার ছেলেদের অতি অল্প ও সীমাবদ্ধ। গৌড় পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তি, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানগুলির ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত কতশত স্থান বাংলার চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে আমরা তাহার কতটুকুই খবর রাখি। এই গ্রন্থে বাংলাকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া ইহার প্রত্যেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরী ও গ্রামগুলির ভৌগোলিক সংস্থান ও পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেক খণ্ড পৃথক আকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি নহে, বর্ত্তমান কালের সমস্ত বিখ্যাত নগরী ও স্বনামধন্য গুণীগণের জন্মস্থানসমূহেরও বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সচিত্র গ্রন্থখানি বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দিলে তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে।

হিং টিং ছট্—শ্রীদেড়কড়ি শর্ম্মা ওরফে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০

হাসির কবিতার বই। কবিতাগুলির চিত্ররূপ দিয়াছেন শিল্পী অখিল নিয়োগী, 'পরিচয়ে' কবিতায় ইহার প্রশস্তিপত্র লিখিয়াছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস। নূতনত্বের জন্য শিশু-সাহিত্যে এই বইটি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে। হাস্যরসের বর্ণচ্ছটার সহিত এরূপ চটুল অনুপ্রাসের ঘটা খুব বেশী চোখে পড়ে না। দু-এক পঙ্‌ক্তি নয়, দীর্ঘ গোটা কবিতা ব্যাপিয়া এক এক রকমের অনুপ্রাসের ফুলঝুরি যেরূপ অবলীলাক্রমে ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। দুই একটি নমুনা তুলিয়া না দিয়া পারিলাম না। যথা :—

"টঙ্গা চেপে গঙ্গাতে যায় গোবরা গণেশ গঙ্গো
লুঙ্গী পরা ফুঙ্গি বাবা ধর্‌লো তাহার সঙ্গ।

* * * * *

রেঙ্গুনেতে ডেঙ্গু জ্বরে পঙ্গু হল অঙ্গ!
চাঙ্গা হতে তাইতো শেষে পালিয়ে এল বঙ্গ।

অথবা— মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয়ে গোষ্ঠ সৃষ্টিছাড়া,
শিষ্ট হয়ে গোঁফটি ধরে লাগলো দিতে চাড়া।

অথবা— সঙ্গী তাহার ফটকে ছোঁড়া কসকে বকাটে ভারী।
মটকা মেরে পটকা ছুঁড়ে সটকে পড়ে বাড়ী।"

ঈশপের গল্প :—শ্রীতারাপদ রাহা। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা। মূল্য ৸০।

বিদ্যাসাগরের কথামালার দৌলতে ঈশপের নীতি-কথাগুলির সহিত সকল বাঙালী ছেলেই সুপরিচিত। ইহার কতকগুলি গল্প গ্রন্থকার নূতন ভঙ্গীতে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য লিখিয়াছেন। যাহাতে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া অতি ছোটরাও সহজেই বুঝিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে চলিত সহজ ভাষায় তিনি গল্পগুলি বলিয়াছেন। বইটি হাতে পড়িলে ছোটরা আগ্রহের সহিত গল্পগুলি পড়িয়া ফেলিবে। পুরু কাগজে বড় বড় টাইপে ছাপা, ছবিগুলি উজ্জ্বল কালিতে মুদ্রিত।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

যে দেশে যেতে মানা—শ্রীতারাপদ রাহা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা চার আনা।

এই শিশুপাঠ্য উপন্যাসে লেখক রীফ-নেতা আব্দুল করিমের দেশে বাঙালী ডিটেকটিভ শেখর রায়ের দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে শিশুপাঠ্য সস্তা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর অভাব নাই, কিন্তু তারাপদ বাবুর বইখানি ঠিক সে জাতীয় নহে। লেখক কতকগুলি আজগুবি ব্যাপারের বর্ণনা করিয়া সস্তায় বাজিমাত করিবার প্রয়াস পান নাই, আধুনিক কালের ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় তিনি কাহিনীটিকে সুষ্ঠু ভাবে এবং বিশ্বাসযোগ্যরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নায়কের অভিযান-পথের খুঁটিনাটির বর্ণনা এমন দক্ষতার সহিত তিনি করিয়াছেন যে বইখানি পড়িয়া পড়িয়া শিশু-পাঠকেরা একাধারে উপন্যাস এবং ভ্রমণ-কাহিনী পাঠের আনন্দলাভ করিবে। ডন আমিগোর প্রাসাদ, মেলিল্লার দৃশ্য, মুরদের প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদির চিত্তাকর্ষক বর্ণনা শিশুদের কল্পনাকে বিশেষভাবে নাড়া দিবে। আফ্রিকার মুরদের দেশের নৈসর্গিক দৃশ্যচিত্রও জায়গায় জায়গায় লেখকের হাল্‌কা তুলীর টানে সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবন বিপন্ন করিয়া শেখর রায় কিভাবে নিষিদ্ধ দেশে পৌঁছিয়াছিলেন ক্রমবর্দ্ধমান কৌতূহলের সহিত শিশুরা সে কাহিনীর অনুধাবন করিবে।

বাংলা বর্ষলিপি—১৩৫২। শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭নং পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা

সংস্কৃতি বৈঠক গত বৎসর হইতে তথ্যসমৃদ্ধ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইয়ার বুক প্রকাশিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যের একটি অভাব পূরণ করিয়া আসিতেছেন। শিশিরবাবুর সম্পাদিত ১৩৫১ সালের বর্ষলিপি প্রকাশিত হইবামাত্র সাময়িক পত্রসমূহে প্রশংসিত হয় এবং পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁহার সম্পাদনা-নৈপুণ্যে বর্ত্তমান বৎসরের (১৩৫২) বর্ষলিপিটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উপরন্তু 'বর্ত্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী' নামক অধ্যায়টিতে এবার বহু নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দিন পঞ্জিকার ন্যায় ঘরে ঘরে এই পুস্তকের স্থান হওয়া উচিত।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

কৃষ্ণনগর কলেজের শতবর্ষ পূর্ত্তি-উৎসব

আগামী ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগর কলেজের শতবর্ষ পূর্ত্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির পুণ্যস্মৃতির সহিত বিজড়িত। এই বিদ্যালয়েই উমেশ দত্তগুপ্ত, রামতনু লাহিড়ী, মনোমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পূর্ণ বা আংশিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক পূর্বযুগের বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রস্থল নদীয়ার এই প্রতিষ্ঠানে শতবর্ষ পূর্তি-উৎসব যাহাতে যথোপযোগী হইতে পারে সেজন্য কর্তৃপক্ষ অবহিত ও সচেষ্ট হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমরা আশা করি, কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ও তাঁহাদের বংশধরগণ এবং নদীয়ার শিক্ষানুরাগী জনগণের সমবেত সহায়তায় এই উৎসব পূর্ণাঙ্গ ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে কলেজের কর্তৃপক্ষ যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন সাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহার আভাস এই প্রসঙ্গে দিতেছি।

(ক) ছাত্র সূচীসহ কলেজের ইতিহাস প্রকাশ।

(খ) শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, বিগত শতবর্ষে বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র পরিণতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের রচিত বহু প্রবন্ধ এই গ্রন্থে থাকিবে।

(গ) একটি সাহিত্য সম্মিলনীর অনুষ্ঠান।

(ঘ) শতবর্ষ স্মারক ছাত্রবৃত্তি প্রবর্ত্তন।

(ঙ) ক্রীড়াপ্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ।

(চ) ছাত্রদের বিশ্রাম-কক্ষের গ্রন্থাগার পরিপুষ্টি।

পরলোকে দেশকর্ম্মী ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী ও ব্যবসায়ী এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে কার্ত্তিক পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

ডাঃ চারুচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার তকীপুর গ্রাম-নিবাসী স্বর্গত ডাঃ ৺অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। লণ্ডন মিশনারী স্কুলে শিক্ষা সমাপান্তে তিনি মাত্র ১৫ টাকা বেতনে এক চাকুরীতে নিযুক্ত হন। শেষে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায় সুরু করেন। ১৯১০ সালে ইষ্টার্ণ জাপান ট্রেডিং কোং নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া জাপানের সহিত আমদানী রপ্তানীর কার্য্য সুরু করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে তিনি পূর্ণ স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরী, কলিকাতা পটারীস (অধুনা বেঙ্গল পটারীস), বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, গঙ্গা গ্লাস ওয়ার্কস, স্বর এনামেল এণ্ড ষ্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস, ওগেল গ্লাস ওয়ার্কস প্রভৃতি বহু কারখানার সহিত সোল এজেণ্টরূপে সংশ্লিষ্ট হন।

১৯৩২ সাল হইতে তিনি কলিকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গৃহসমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ যত্নবান হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মাগনীরাম বাঙ্গুড় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক একটি "ল্যাণ্ড ডিপার্টমেণ্ট" প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার অংশীদার হিসাবে কার্য্য সুরু করেন। তিনি অত্যন্ত সুবিধাজনক শর্ত্তে কলিকাতা ও শহরতলী নানাস্থানে বহু লোকের নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান টালীগঞ্জ এবং লেক-পল্লীর বহু অঞ্চল তাঁহারই সৃষ্টি এবং চারু এভেনিউ, চারু পার্ক ও চারু মার্কেট প্রভৃতি তাঁহার কীর্ত্তির নিদর্শন।



ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ ও লোকহিতৈষী ছিলেন। বহুদিন যাবৎ তাঁহার টালীগঞ্জস্থ বাটীতে অন্নদা দেবী দাতব্য চিকিৎসালয় নামে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিয়া প্রত্যহ ১০০।১৫০জন রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদি দিতেন। লেক রোডস্থ অভয়চরণ বিদ্যামন্দিরের তিনিই স্থাপয়িতা ও সভাপতি ছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি প্রাথমিক খরচা বাবদ ৫০০০ টাকা দিয়াছেন। দক্ষিণ-কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি ও ফরোয়ার্ড ব্লক, যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল ও জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রেসিডেন্সি মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতাল, নারীকল্যাণ আশ্রম, সাউথ ক্যালকাটা অরফ্যানেজ, ভারত-

সেবাশ্রম সঙ্ঘ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষরূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালী

শ্রীযুক্ত অনন্তদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া সম্প্রতি বাষট্টি বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। যে কয়জন বাঙালী যুক্তপ্রদেশের কলেজসমূহে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছেন অনন্তবাবু তাঁহাদের অন্যতম। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মালিপাড়া গ্রামে আদি নিবাস হইলেও ইঁহার পিতা স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী কর্ম্মসূত্রে রাঁচীতে স্থায়ী ভাবে বাস করেন এবং ঐখানেই অনন্তবাবুর কৈশোর অতিবাহিত হয়। কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে কয়েক বৎসর বিহার প্রদেশে ওকালতী করিবার পর তিনি কানপুর ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে সুখ্যাতির সহিত আট বৎসরকাল ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। উক্ত কলেজে সুপণ্ডিত ডক্টর বেণীপ্রসাদ তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে ডি-এ-ভি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল পদে নিযুক্ত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেরাদুনে আসেন এবং তদানীন্তন অধ্যক্ষ লালা কল্যাণপ্রসাদ, এম-এ, মহাশয়ের পরলোকগমনের পর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। নয় বৎসরের অধিক কাল উক্ত পদে যোগ্যতার সহিত সমাসীন থাকিয়া তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে কলেজের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বায়োলজি ও কমার্স এই দুইটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং রসায়নাগারের জন্য গ্যাস প্লাণ্ট বসান হইয়াছে। তিনি ব্যায়ামচর্চ্চায় চিরদিন অনুরাগী; ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ব্যায়ামশালা এবং লৌহজালবেষ্টিত দুইটি টেনিস কোর্ট নির্ম্মিত করাইয়া দেহানুশীলনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি বহুকাল স্থানীয় করণপুর আর্য্যসমাজের সভাপতি ছিলেন। দেরাদুনে প্রবাসী বাঙালী সমিতির সকল অনুষ্ঠানেই তিনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পুত্রেরাও সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া প্রবাসী বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।



শ্রীঅনন্তদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিলনে বিরহ আর বিরহে মিলন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রথম প্রেমের রাত্রি স্মরণের গন্ধ ভারাতুর,
আধো আলো-আঁধারের মায়াজালে মৃদু গুঞ্জরণ
বসি মুক্ত বাতায়নে কণ্ঠে তব সঙ্গীত মধুর
শুনেছিনু উৎকর্ণয়—দুলেছিল দেবদারু বন।
রাতের বাতাস ভরা ভেসে-আসা মহুয়া সুবাস,
মনের দুয়ারে মোর ফুটায়েছে লঘু হাসি তব;
অলস ক্লান্তির 'পরে আন্দোলিত ক্ষুদ্র পরিহাস
প্রাণের প্রণয়ে প্রিয়া উন্মাদনা এনেছিল নব।

মিলনে বিরহ আর বিরহে মিলন—বুঝি নাই
সেদিনের আনন্দের আহরণে তব হৃদি হ'তে;
দুর্লভ সুযোগ লয়ে কত ছলে কত গান গাই,
নিলে মোরে শিহরণ টেনে এনে কামনার স্রোতে।
দুরন্ত মেঘের খেলা তারাহারা সুনীল আকাশে
বিজলী চমকে, আর পড়ে মনে সে রাতের কথা;
একা আমি—তুমি দেখা দিলে নাকো—ঘুম নাহি আসে,
ছায়ামাখা গৃহখানি দীর্ঘশ্বাসে বহিতেছে ব্যথা।

তবু যেন মনে হয় বিচ্ছেদের রিক্ত পাত্র ভরে
মিলনের স্বর্ণ সুধা ঢালিতেছে পরিপূর্ণ করে।

শূন্যের জ্যোতিলোকে

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অবসান কলরোল
অবসান কোলাহল।
হিমগিরি-পর্ব্বতে নিথর মৌন শুধু—
দোসর-বিহীন ভূমা জাগে চির-অচপল।

শূন্যের জ্যোতিলোকে ভাস্কর জ্যোতিহীন,
চন্দ্র তারার মালা গ্রহদল তমোলীন,
সর্পিল বিদ্যুৎ মসীরেখা সম স্থির,
পাংশু-মলিন ত্রাসে নিঃশিখ কালানল।

শূন্যের জ্যোতিছায়া ভাস্করে মিল কায়া,
মৃন্ময়ী ধরণীতে তারই অপরূপ মায়া;
কণ্ঠে কাঁপিছে মোর লহরী সে-আলোকের,—
সেই জ্যোতি-যমুনায় ফুটে মম-শতদল।*

"...তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"—কঠোপনিষৎ, ৫ম বল্লী

১২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পার্ব্বত্য পথে

শ্রীবিমল রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



মার্কিন পররাষ্ট্র-সমিতির চেয়ারম্যান সল ব্লুম ও উহার মহিলা প্রতিনিধিগণ (বাম দিক হইতে)—ফ্রান্সেস পি বল্টন, এডিথ নউর্স রজার্স, হেলেন গাহাগন ডগলাস ও এমিলী টাল্ক ডগলাস

নিউ ইয়র্কের ফিফ্থ এভিনিউর উপর দিয়া ভোটাধিকার-প্রার্থিনীদের শোভাযাত্রা। উনিশ শ' সালের কাছাকাছি সময়ে গৃহীত ছবি

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ



৪৫শ ভাগ ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৫২ | সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধীর আগমন

আহত ও মুমূর্ষু লোকে যেরূপে চিকিৎসকের প্রতীক্ষা করে, দুঃখভয়ক্লিষ্ট লোকে যেরূপে রাত্রির অন্ধকারের পর দিবালোকের আশায় চাহিয়া থাকে সেইরূপে বাংলাদেশ আজ কয়মাস যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছিল মহাপুরুষের আগমনের। যে বঙ্গভূমি বিগত সার্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে ভারত মুখোজ্জ্বলকারী যুগ-প্রবর্তক পুরুষ-রত্নের জন্মদান করিয়া রত্নগর্ভানামে খ্যাত হইয়াছিল, তাহার দৈন্য এখন বিদেশীর করুণার উদ্রেক করে। রামমোহন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সূর্য-প্রভ মহারত্ন চতুষ্টয়ের আবির্ভাবে যে দেশ উজ্জ্বল হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বাগ্মী. কৃষ্ণকুমার ও অশ্বিনীকুমারের ন্যায় ত্যাগী দেশসেবক, আশুতোষের ন্যায় জনশিক্ষাপ্রবর্তক, শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় তত্ত্ববিদ, দাতাকর্ণ মণীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ ও রাসবিহারীর ন্যায় মুক্তহস্ত বিদ্যোৎসাহী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় তেজস্বী রাষ্ট্রনেতা, শিশিরকুমার ও রামানন্দের ন্যায় নির্ভীক সাংবাদিক এবং পুরুষ সিংহ সুভাষচন্দ্রের ন্যায় সর্বত্যাগী গণনায়ক যে দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন আজ সেই দেশ বিদেশীর কূটনীতিপাশে বদ্ধ, নেতৃহীন, বন্ধুহীন, সম্বিৎহীন, "গত গৌরব হৃত আসন", অসহায়। যে দেশ ছিল সারা ভারতের পথ নির্দেশকারী এখন সে নিজেই হইয়াছে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যশূন্য আত্ম-কলহ বিভক্ত নিরুদ্দেশ যাত্রী। অদৃষ্টের কি কঠোর পরিহাস!

মহাত্মা গান্ধী আজিও প্রকৃতপক্ষে বাংলায় শুভাগমন করেন নাই। কেননা কলিকাতা বাংলা নহে, উপস্থিত কালে উহা বাংলার রক্তশোষকদিগের এবং তাহাদের দেশী ও বিদেশী শিবাদলের লীলাভূমি যেমন দুষ্টক্ষতকে প্রাণিদেহের অংশ বলা চলে না সেইরূপ কলিকাতাকেও বাংলাদেশের অংশ আর বলা চলে না এই নগরীতে বাংলার কৃষ্টি ও বাংলার ভাব-ধারা সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টাই চলিতেছে এবং এখানে এখন বাঙালীর সর্বনাশ, স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা ধ্বংস এবং প্রত্যক্ষ ভাবে বাঙালী হিন্দুর ও পরোক্ষভাবে অন্য সকল বাঙালীরই সর্বনাশের কার্য চালিত হইতেছে। বিদেশী এবং ভিন্নপ্রদেশীর "ব্ল্যাক-মার্কেট" চালকগণের প্রধান কেন্দ্র এই কলিকাতা এখন মহামারীর দেহে কর্কটরোগ-ক্ষতের (cancer) ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য ইহা ঠিক যে গান্ধীজী কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে রহিয়াছেন, কলিকাতায় নহে। কিন্তু সে দিকেও আমরা বলিতে বাধ্য যে সোদপুরের আশ্রমকে বাস্তব জগতের অংশ বলা কঠিন, এবং মহাত্মাজীর আসন্ন গন্তব্যস্থল শান্তিনিকেতনও সম্প্রতি প্রায় সেই পর্যায়েই পড়ে মহাত্মাজীর বাংলাদেশ দেখা আরম্ভ হইবে সেই দিন যখন তিনি মেদিনী-পুরের মহাশ্মশানে আর্ত ও উৎপীড়িতদের সম্মুখে যাইবেন এবং জনসাধারণের কথা স্বকর্ণে শুনিয়া এবং তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া বাংলার ও বাঙালীর রোগনির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন। সোদপুরে থাকিয়া গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি এতদিন যাহা করিয়াছেন তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্র-গতির পথ হয়ত বা কিছু সরল হইয়াছে কিন্তু বাংলার উন্নতি বা বাঙালীর প্রগতির কোনও নির্দেশ সেখান হইতে এখনও আসি-য়াছে বলিয়া আমরা কিছু অবগত নহি। সে সবকিছুই এখনও বাকী রহিয়াছে ইহাই আমরা সহজ বুদ্ধিতে বিবেচনা করি।

মেদিনীপুর

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের পর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমায় গবর্মেণ্ট যে সমস্ত উৎপীড়ন ও অত্যা-চার করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টটি এসোসিয়েটেড প্রেস মারফৎ প্রচারিত হইয়াছে এবং সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সেক্রেটারির নির্দেশক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক এই রিপোর্ট প্রণীত হইয়াছে। সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, তমলুক, মহিষাদল ও ময়না এই ছয়টি থানার ঘটনার বিবরণ এই রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ :

(১) ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত পুলিস ও সৈন্যদল মোট ২২টি স্থানে গুলী চালাইয়াছে। গুলীর আঘাতে মোট ৪৪ জন নিহত, ১৯৯ জন আহত এবং ১৪২ জন সামান্য আহত হইয়াছে।

(২) এই সময়ের মধ্যে মোট ৭৩ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩১ জন স্ত্রী-লোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করা হয় এবং ১৫০ জন স্ত্রীলোককে প্রহার ও তাহাদের শ্লীলতাহানি করা হয়।

(৩) জনতা সুতাহাটা থানা আক্রমণ করিলে নিরস্ত্র লোকদের উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করা হয়।

(৪) ৪২২৬ জন লোককে ভীষণ প্রহার করা হইয়াছে—১৮৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ৫০৭৬ জনকে বে-আইনী ভাবে আটক রাখা হইয়াছে, ৯ জনকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী করা হইয়াছে এবং ৪০১ জনকে স্পেশাল কনেষ্টবল করা হইয়াছে।

(৫) ১২৪টি বাড়ী আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই অগ্নিকাণ্ডে অনুমান ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫ শত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ৪৯টি বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ক্ষতি হইয়াছে ৮০৭৫ টাকা। ১০৪৪টি বাড়ী হইতে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৭ শত ৯০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। ১৩,৭৩০টি বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং ২৭টি বাড়ী পুলিস ও সৈন্তেরা দখল করিয়াছে।

(৬) ২৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

(৭) ৭৩ বৎসর বয়স্কা একটি মহিলা কর্মী যখন শোভাযাত্রা লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি গুলীর আঘাতে নিহত হন। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছয়টি বালকও গুলীর আঘাতে নিহত হয়। একটি শিশুকে বুট জুতা দিয়া মাড়াইয়া পিষিয়া ফেলা হয়।

"বিপ্লব" দমনের নামে গবর্মেণ্টের আদেশে সৈন্ত ও পুলিস দল কর্তৃক এই অমানুষিক অত্যাচার চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, ঘূর্ণিবাত্যায় এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ বিধ্বস্ত হইলে তাহাদের সাহায্যে যাহারা অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের উপরও জুলুম চলিয়াছে এবং দুর্গত নর-নারীর নিকট কোনরূপ সাহায্য যাহাতে পৌঁছিতে না পারে তাহার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে। তখনো (১) ক্ষতির পরিমাণ গোপন রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, (২) প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার সংবাদ যথাসময়ে দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হয় নাই, (৩) রিলিফ কমিটিগুলিকে আর্তত্রাণে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় নাই, (৪) গবর্মেণ্ট সাহায্য বিতরণ আরম্ভ করিলে সরকারী কর্মচারী গবর্মেণ্টের ধামাধরা মোসাহেববৃন্দ প্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, যাহারা অনুগত নহে তাহারা প্রকৃত দুর্গত হইলেও কোনরূপ সাহায্য গবর্মেণ্টের নিকট পায় নাই। সর্বপ্রকার সাহায্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া সাজা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিন পর বাংলা-সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়া এক প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে,

যানবাহনাদির সংখ্যাল্পতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তমলুক মহকুমায় ব্যাপকভাবে বে-আইনী কার্য্যকলাপ চালান হয়। ঐ স্থানে যথেষ্টসংখ্যক পুলিস না থাকায় শান্তি স্থাপনার জন্ত গবর্মেণ্ট সৈন্তবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রদত্ত বিবরণীর অভিযোগাবলীর যে সারাংশ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন অথবা অতিমাত্রায় বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগসমূহ সম্পর্কেই একথা বিশেষভাবে বলা যায়। সৈনিকদের সম্পর্কে উক্ত প্রকার অভিযোগ করা হইলে পর গবর্মেণ্টের আদেশক্রমে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত করেন। লুঠতরাজ ও বিমান হইতে বোমাবর্ষণের কাহিনীর সরাসরি প্রতিবাদ ভারত গবর্মেণ্ট ইতিমধ্যেই করিয়াছেন।

অতঃপর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে উল্লিখিত অঞ্চলের উপর যে ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায় সে সম্পর্কে বা তাহাতে যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইতে না দিবার কারণ সম্পূর্ণ সামরিক। সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই সে সময় উক্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় নাই। টেলিগ্রামের যোগাযোগ বিনষ্ট হওয়ায়, জলপথে গমনাগমন করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় এবং পোষ্ট আপিসসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উপযুক্ত সময়ে ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সত্বর কোন প্রকার সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হয় নাই।

মেদিনীপুরের অত্যাচারের তদন্ত

মেদিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনী নূতন নয়। তিন বৎসর পূর্বে উহা ঘটিয়াছে, প্রেস সেন্সরের জন্ত এতদিন প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহা লইয়া দুই বার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-সব সাংঘাতিক অভিযোগ পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা উপেক্ষা করা চলে না। তিনি আশ্বাস দেন যে এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির দ্বারা অনুসন্ধান করা হইবে। ইহা আজ সর্বজনবিদিত যে সর জন হার্বার্ট এই তদন্ত হইতে দেন নাই। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া গবর্মেণ্ট এই সব মারাত্মক অভিযোগ এখনও উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদেরই একজনের রিপোর্টে এই গুরুতর অভিযোগের অবসান ঘটিবে না। সরকারী প্রেস-নোটের পর তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত, মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এডভোকেট শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস এবং তমলুক থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের সহযোগিতায় বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন উহাতেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রিপোর্টে বর্ণিত সমস্ত অভিযোগের পুনরুক্তি করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনের দ্বারা অনুসন্ধান না হওয়া পর্যন্ত শুধু সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্টে লোকে কংগ্রেস কর্মীদের রিপোর্ট অবিশ্বাস করিতে চাহিবে না, উহা অতিরঞ্জন বলিয়াও মনে করিবে না।

মেদিনীপুরে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন তন্মধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন বাংলার অর্থসচিব সেই সময়ে মেদিনীপুরে এই সব অত্যাচার ঘটে। সঠিক সংবাদ জানিবার সুযোগ তাঁহার ছিল এবং তিনি উহার প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। ঘূর্ণিবাত্যার পর তিনি স্বয়ং মেদিনীপুর যান এবং সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন, সরকারী কর্মচারীদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীও স্বয়ং দেখিয়া এবং স্বকর্ণে শুনিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু গবর্ণর সর জন হার্বার্ট ও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাধায় কোন প্রতিকার করিতে অক্ষম হন। অতঃপর বাধ্য হইয়া তিনি পদত্যাগ করেন। ১৩৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহার পদত্যাগপত্র পঠিত হয়। উহাতে মেদিনীপুরের কাহিনী সম্বন্ধে যে-সব কথা ছিল তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন,

"আইন অমান্ত এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দমনের জন্ম আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন আছে ইহা বুঝা যায়। কিন্তু মেদিনীপুরের কতক লোক সরকারী কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল বলিয়া স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দ দোষী নির্দোষী বিচার মাত্র না করিয়া ক্রমাগত লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছেন এবং সভ্য শাসন পদ্ধতির মূলনীতি পর্যন্ত ভঙ্গ করিয়াছেন এরূপ অভিযোগ আসিয়াছে। নির্দোষ নর-নারীর উপর গুলিবর্ষণ, সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠন, এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করা, নারীর উপর লাঞ্ছনা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ বিভিন্ন সূত্র হইতে আমাদের নিকট আসে; যাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের সহিতই কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে, পুলিস ও মিলিটারীর দ্বারা অথবা তাহাদের নির্দেশে যে-সব বাড়ী চড়াও অথবা ভস্মীভূত হইয়াছে তাহার তালিকাও আমরা পাইয়াছি। ১৬ই অক্টোবর ঘূর্ণীবাত্যার দিন আমি এরূপ একটি দীর্ঘ তালিকা স্বরাষ্ট্র-বিভাগের উচ্চতম কয়েকজন কর্মচারীকে দিয়া বলিয়াছিলাম যে, এই সব বর্বরোচিত কার্য (barbarous acts) যেন অবিলম্বে বন্ধ করানো হয়। তারপর আসিল সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপদের পর আমি উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তরের কতকগুলি সরকারী কর্মচারীর যে হৃদয়হীনতা দেখিয়াছি তাহা কোন সভ্য শাসনযন্ত্রে সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। আমরা শুনিয়াছি নাৎসী বর্বরতা ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু গত পাঁচ মাসে (অর্থাৎ ঘূর্ণীবাত্যার পরবর্তী পাঁচ মাসে) ব্রিটিশ শাসনে বাংলায় যে ভয়াবহ অত্যাচার আমরা চোখে দেখিয়াছি তাহার সহিত নাৎসী-অধিকৃত দেশের অত্যাচারের ব্রিটিশ প্রচারিত কাহিনীর খুব ভাল তুলনা চলিতে পারে।

"আমার প্রথম অভিযোগ, ১৬ই অক্টোবরের ধ্বংসলীলার সংবাদ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে জেলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক কুকার্যের প্রতিশোধ লইবার জন্ত সরকারী সাহায্য বন্ধ করা ত উচিত-ই, এক মাসের মধ্যে কোন বেসরকারী সাহায্য সমিতিও যাহাতে সেখানে যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।"

জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত গবর্মেণ্ট মেদিনীপুরে সাহায্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। এই সাহায্য দান সম্বন্ধে যে ব্যাপার ঘটে তাহার সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা এই :"গবর্মেণ্ট দিনে সাহায্য দান এবং রাত্রিতে ঘরে চড়াও হইয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উন্মত্ত এবং জঘন্য ব্যাপার অনেক দিন চলিয়াছে। অনেক ভাবিয়াই আমি এই অভিযোগ করিতেছি যে সুপরিকল্পিত ভাবে ঘূর্ণীবাত্যার আগে ঘরবাড়ী লুঠ ও পোড়ানো হইয়াছে; আমি বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছি যে ঘূর্ণীবাত্যার পরও গবর্মেণ্টের নিষেধ সত্ত্বেও এই ব্যাপার চলিয়াছে। আমি নিজে এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছি, ঘূর্ণীবাত্যার পূর্বে ও পরে যাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা আমার নিকট আছে। উহার নকল আমি নিজে উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হাতে দিয়াছি। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যাহারা এই সব অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের বর্বরতা বন্ধ করিবার জন্ত কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই।...সর্বশেষে আমি বলিতে চাই যে একমাস পূর্বেও আমরা গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ অত্যাচারের অভিযোগ পাইয়াছি। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অসহায়া নারীদের লাঞ্ছিত ও তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে তাহার অনেক শোচনীয় দৃষ্টান্ত ঐ সব অভিযোগেরই মধ্যে ছিল। যাহাদের উপর এই সব অত্যাচার হইয়াছে তাহাদেরই বিবৃতি আমার নিকট আছে, এ দেশের গবর্মেণ্টের পক্ষে উহা ঘোরতর কলঙ্কের কথা। পুলিস ইহাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে নাই, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের এই অত্যাচার হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন উপায় ছিল না।"

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই সব অভিযোগকে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 'পোলিটিক্যাল এজিটেটারে'র অসতর্ক উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের বহু সদস্য ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর্কে যে-সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি কংগ্রেস কর্মীদের রিপোর্টে হইয়াছে। একজন সদস্য বলেন :

"কাঁথিতে আমি নিজে গিয়েছি। কাঁথির সবডিভিসনাল অফিসারের যে বাংলো তা অনেক উপরে। আর নীচে শহর ও গ্রাম। সেই কাঁথিতে যখন ৩৫ ফুট উঁচু হয়ে জল এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন সেখানকার একজন রায় বাহাদুর অবন্তী মাইতি সবডিভিসনাল অফিসারের পায়ের নীচে পড়ে বলেন যে, 'সাহেব। নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে, সেটা ছেড়ে দাও, নৌকা পেলে অনেক লোককে বাঁচাতে পারব। তখনও লোক গাছে ঝুলে প্রাণ বাঁচাচ্ছিল। অবন্তীবাবু দারোগাকে বলে চুপি চুপি দুবার নৌকা পাঠান। তৃতীয়বার নৌকা পাওয়া গেল না, নৌকা ডাক-বাংলোয় বেঁধে রাখা হ'ল, দেওয়া হ'ল না। অবন্তী মাইতি আমাকে বলেছিলেন যে সেই একখানা নৌকা যদি আমরা পেতাম তাহলে পাঁচশো লোকের জীবন আমরা বাঁচাতে পারতাম। সেটা কখন জানেন? রাত্রিতে নয় অন্ধকারে নয়

(৩) জনতা সুতাহাটা থানা আক্রমণ করিলে নিরস্ত্র লোকদের উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করা হয়।

(৪) ৪২২৬ জন লোককে ভীষণ প্রহার করা হইয়াছে—১৮৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ৫০৭৬ জনকে বে-আইনী ভাবে আটক রাখা হইয়াছে, ৯ জনকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী করা হইয়াছে এবং ৪০১ জনকে স্পেশাল কনেষ্টবল করা হইয়াছে।

(৫) ১২৪টি বাড়ী আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই অগ্নিকাণ্ডে অনুমান ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫ শত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ৪৯টি বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ক্ষতি হইয়াছে ৮০৭৫ টাকা। ১০৪৪টি বাড়ী হইতে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৭ শত ৯০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। ১৩,৭৩০টি বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং ২৭টি বাড়ী পুলিস ও সৈন্যেরা দখল করিয়াছে।

(৬) ২৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

(৭) ৭৩ বৎসর বয়স্কা একটি মহিলা কর্মী যখন শোভাযাত্রা লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি গুলীর আঘাতে নিহত হন। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছয়টি বালকও গুলীর আঘাতে নিহত হয়। একটি শিশুকে বুট জুতা দিয়া মাড়াইয়া পিষিয়া ফেলা হয়।

"বিপ্লব" দমনের নামে গবর্মেণ্টের আদেশে সৈন্য ও পুলিস দল কর্তৃক এই অমানুষিক অত্যাচার চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, ঘূর্ণিবাত্যায় এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ বিধ্বস্ত হইলে তাহাদের সাহায্যে যাহারা অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের উপরও জুলুম চলিয়াছে এবং দুর্গত নর-নারীর নিকট কোনরূপ সাহায্য যাহাতে পৌঁছিতে না পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে। তখনো (১) ক্ষতির পরিমাণ গোপন রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, (২) প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার সংবাদ যথাসময়ে দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হয় নাই, (৩) রিলিফ কমিটিগুলিকে আর্তত্রাণে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় নাই, (৪) গবর্মেণ্ট সাহায্য বিতরণ আরম্ভ করিলে সরকারী কর্মচারী গবর্মেণ্টের ধামাধরা মোসাহেববৃন্দ প্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, যাহারা অনুগত নহে তাহারা প্রকৃত দুর্গত হইলেও কোনরূপ সাহায্য গবর্মেণ্টের নিকট পায় নাই। সর্বপ্রকার সাহায্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া সাজা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিন পর বাংলা-সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়া এক প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে,

...যানবাহনাদির সংখ্যাল্পতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তমলুক মহকুমার ব্যাপকভাবে বে-আইনী কার্য্যকলাপ চালান হয়। ঐ স্থানে যথেষ্টসংখ্যক পুলিস না থাকায় শান্তি স্থাপনার জন্য গবর্মেণ্ট সৈন্যবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রদত্ত বিবরণীর অভিযোগাবলীর যে সারাংশ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন অথবা অতিমাত্রায় বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগসমূহ সম্পর্কেই একথা বিশেষভাবে বলা যায়। সৈনিকদের সম্পর্কে উক্ত প্রকার অভিযোগ করা হইলে পর গবর্মেণ্টের আদেশক্রমে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত করেন। লুঠতরাজ ও বিমান হইতে বোমাবর্ষণের কাহিনীর সরাসরি প্রতিবাদ ভারত গবর্মেণ্ট ইতিমধ্যেই করিয়াছেন।

অতঃপর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে উল্লিখিত অঞ্চলের উপর যে ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায় সে সম্পর্কে বা তাহাতে যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইতে না দিবার কারণ সম্পূর্ণ সামরিক। সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই সে সময় উক্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় নাই। টেলিগ্রামের যোগাযোগ বিনষ্ট হওয়ায়, জলপথে গমনাগমন করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় এবং পোষ্ট আপিসসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উপযুক্ত সময়ে ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সত্বর কোন প্রকার সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হয় নাই।

মেদিনীপুরের অত্যাচারের তদন্ত

মেদিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনী নূতন নয়। তিন বৎসর পূর্বে উহা ঘটিয়াছে, প্রেস সেন্সরের জন্য এতদিন প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহা লইয়া দুই বার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-সব সাংঘাতিক অভিযোগ পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা উপেক্ষা করা চলে না। তিনি আশ্বাস দেন যে এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির দ্বারা অনুসন্ধান করা হইবে। ইহা আজ সর্বজনবিদিত যে সর জন হার্বার্ট এই তদন্ত হইতে দেন নাই। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া গবর্মেণ্ট এই সব মারাত্মক অভিযোগ এখনও উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদেরই একজনের রিপোর্টে এই গুরুতর অভিযোগের অবসান ঘটিবে না। সরকারী প্রেস-নোটের পর তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত, মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এডভোকেট শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস এবং তমলুক থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের সহযোগিতায় বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন উহাতেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রিপোর্টে বর্ণিত সমস্ত অভিযোগের পুনরুক্তি করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনের দ্বারা অনুসন্ধান না হওয়া পর্যন্ত শুধু সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্টে লোকে কংগ্রেস কর্মীদের রিপোর্ট অবিশ্বাস করিতে চাহিবে না, উহা অতিরঞ্জন বলিয়াও মনে করিবে না।

মেদিনীপুরে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন তন্মধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন বাংলার অর্থসচিব সেই সময়ে মেদিনীপুরে এই সব অত্যাচার ঘটে। সঠিক সংবাদ জানিবার সুযোগ তাঁহার ছিল এবং তিনি উহার প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। ঘূর্ণিবাত্যার পর তিনি স্বয়ং মেদিনীপুর যান এবং সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন, সরকারী কর্মচারীদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীও স্বয়ং দেখিয়া এবং স্বকর্ণে শুনিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু গবর্ণর সর জন হার্বার্ট ও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাধায় কোন প্রতিকার করিতে অক্ষম হন। অতঃপর বাধ্য হইয়া তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহার পদত্যাগপত্র পঠিত হয়। উহাতে মেদিনীপুরের কাহিনী সম্বন্ধে যে-সব কথা ছিল তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন,

"আইন অমান্য এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দমনের জন্য আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন আছে ইহা বুঝা যায়। কিন্তু মেদিনীপুরের কতক লোক সরকারী কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল বলিয়া স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দ দোষী নির্দোষী বিচার মাত্র না করিয়া ক্রমাগত লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছেন এবং সভ্য শাসন পদ্ধতির মূলনীতি পর্যন্ত ভঙ্গ করিয়াছেন এরূপ অভিযোগ আসিয়াছে। নির্দোষ নর-নারীর উপর গুলিবর্ষণ, সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠন, এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করা, নারীর উপর লাঞ্ছনা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ বিভিন্ন সূত্র হইতে আমাদের নিকট আসে; যাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের সহিতই কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে, পুলিস ও মিলিটারীর দ্বারা অথবা তাহাদের নির্দেশে যে-সব বাড়ী চড়াও অথবা ভস্মীভূত হইয়াছে তাহার তালিকাও আমরা পাইয়াছি। ১৬ই অক্টোবর ঘূর্ণীবাত্যার দিন আমি এরূপ একটি দীর্ঘ তালিকা স্বরাষ্ট্র-বিভাগের উচ্চতম কয়েক-জন কর্মচারীকে দিয়া বলিয়াছিলাম যে, এই সব বর্বরোচিত কার্য (barbarous acts) যেন অবিলম্বে বন্ধ করানো হয়। তারপর আসিল সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপদের পর আমি উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তরের কতকগুলি সরকারী কর্মচারীর যে হৃদয়হীনতা দেখিয়াছি তাহা কোন সভ্য শাসনযন্ত্রে সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। আমরা শুনিয়াছি নাৎসী বর্বরতা ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু গত পাঁচ মাসে (অর্থাৎ ঘূর্ণীবাত্যার পরবর্তী পাঁচ মাসে) ব্রিটিশ শাসনে বাংলায় যে ভয়াবহ অত্যাচার আমরা চোখে দেখিয়াছি তাহার সহিত নাৎসী-অধিকৃত দেশের অত্যাচারের ব্রিটিশ প্রচারিত কাহিনীর খুব ভাল তুলনা চলিতে পারে।

"আমার প্রথম অভিযোগ, ১৬ই অক্টোবরের ধ্বংসলীলার সংবাদ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে জেলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক কুকার্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য সরকারী সাহায্য বন্ধ করা ত উচিত-ই, এক মাসের মধ্যে কোন বেসরকারী সাহায্য সমিতিও যাহাতে সেখানে যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।"

জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত গবর্মেণ্ট মেদিনীপুরে সাহায্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। এই সাহায্য দান সম্বন্ধে যে ব্যাপার ঘটে তাহার সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা এই: "গবর্মেণ্ট দিনে সাহায্য দান এবং রাত্রিতে ঘরে চড়াও হইয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উন্মত্ত এবং জঘন্য ব্যাপার অনেক দিন চলিয়াছে। অনেক ভাবিয়াই আমি এই অভিযোগ করিতেছি যে সুপরিকল্পিত ভাবে ঘূর্ণীবাত্যার আগে ঘরবাড়ী লুঠ ও পোড়ানো হইয়াছে; আমি বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছি যে ঘূর্ণীবাত্যার পরও গবর্মেণ্টের নিষেধ সত্ত্বেও এই ব্যাপার চলিয়াছে। আমি নিজে এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছি, ঘূর্ণীবাত্যার পূর্বে ও পরে যাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা আমার নিকট আছে। উহার নকল আমি নিজে উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হাতে দিয়াছি। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যাহারা এই সব অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের বর্বরতা বন্ধ করিবার জন্য কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই।...সর্বশেষে আমি বলিতে চাই যে একমাস পূর্বেও আমরা গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ অত্যাচারের অভিযোগ পাইয়াছি। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অসহায়া নারীদের লাঞ্ছিত ও তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে তাহার অনেক শোচনীয় দৃষ্টান্ত ঐ সব অভিযোগেরই মধ্যে ছিল। যাহাদের উপর এই সব অত্যাচার হইয়াছে তাহাদেরই বিবৃতি আমার নিকট আছে, এ দেশের গবর্মেণ্টের পক্ষে উহা ঘোরতর কলঙ্কের কথা। পুলিস ইহাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে নাই, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের এই অত্যাচার হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন উপায় ছিল না।"

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই সব অভিযোগকে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 'পোলিটিক্যাল এজিটেটারে'র অসতর্ক উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের বহু সদস্য ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর্কে যে-সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি কংগ্রেস কর্মীদের রিপোর্টে হইয়াছে। একজন সদস্য বলেন:

"কাঁথিতে আমি নিজে গিয়েছি। কাঁথির সবডিভিসনাল অফিসারের যে বাংলো তা অনেক উপরে। আর নীচে শহর ও গ্রাম। সেই কাঁথিতে যখন ৩৫ ফুট উঁচু হয়ে জল এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন সেখানকার একজন রায় বাহাদুর অবন্তী মাইতি সবডিভিসনাল অফিসারের পায়ের নীচে পড়ে বলেন যে, 'সাহেব! নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে, সেটা ছেড়ে দাও, নৌকা পেলে অনেক লোককে বাঁচাতে পারব। তখনও লোক গাছে ঝুলে প্রাণ বাঁচাচ্ছিল। অবন্তীবাবু দারোগাকে বলে চুপি চুপি দুবার নৌকা পাঠান। তৃতীয়বার নৌকা পাওয়া গেল না, নৌকা ডাক-বাংলোয় বেঁধে রাখা হ'ল, দেওয়া হ'ল না। অবন্তী মাইতি আমাকে বলেছিলেন যে সেই একখানা নৌকা যদি আমরা পেতাম তাহলে পাঁচশো লোকের জীবন আমরা বাঁচাতে পারতাম। সেটা কখন জানেন? রাত্রিতে নয় অন্ধকারে নয়

বেলা ১২টার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে কাঁথির সাবডিভিসনাল অফিসার পরম নির্বিকারভাবে সেই হত্যার দৃশ্য দেখেছিলেন উপভোগ করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মহাশয়! এখন ঘর বাড়ী পোড়ান হয়? বললেন না, এখন পোড়ান হয় না। অর্থাৎ আগে হ'ত তা স্বীকার করলেন। সেখানে পাঁচশো লোক মারা গেছে। শালমলের মামার বাড়ী দেখে এলাম ধু ধু করছে শ্মশানের মত। এক একটি গ্রাম শেষ হয়ে গেছে। আমরা ৮ই ডিসেম্বর গিয়ে দেখেছি তখনও শত শত মৃতদেহ পড়ে আছে, দুর্গন্ধে সেখান দিয়ে যাওয়া যায় না, শকুনি চিল খাচ্ছে। এই অবস্থা সেখানে দেখেছি।"

বিতর্কের পর প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক পরিষদে ঘোষণা করেন যে মেদিনীপুরের অত্যাচারের অভিযোগসমূহ সম্বন্ধে হাইকোর্টের জজদের সমকক্ষ লোকের দ্বারা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে তদন্ত হওয়া উচিত মন্ত্রিমণ্ডল ইহা স্বীকার করেন। সারা দেশ এই তদন্ত চাহিয়াছিল। সর জন হার্বার্ট ও ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারীর দল উহা হইতে দেন নাই। সর জন হার্বার্টের চক্রান্তে মৌলবী ফজলুল হক প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারিত হইলে নূতন প্রধান মন্ত্রী সর নাজিমুদ্দীন জানান যে প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলের কোন প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিতে তিনি আইনতঃ বাধ্য নহেন। এইখানেই তদন্তের দাবির পরিসমাপ্তি ঘটে। মৌলবী ফজলুল হক তাঁহার পদত্যাগের পরবর্তী বিবৃতিতে মেদিনীপুরের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মাসের পর মাস ধরিয়া তাগাদা দিয়াও সরকারী কর্মচারীদের নিকট হইতে মেদিনীপুরের ব্যাপারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিনি সর জন হার্বার্টকে লিখিয়াছিলেন, "স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারীদিগের নিকট আমি মেদিনীপুর সম্পর্কে গবর্মেণ্টের বক্তব্য জানিতে চাহিতেছি। একখানি খাপছাড়া অতি সংক্ষিপ্ত নোট ছাড়া আর কিছুই তাঁহারা দেন নাই। গত কল্য ব্যবস্থা-পরিষদে বিতর্কের সময় মিঃ পোর্টার এই সংক্ষিপ্ত নোট আমার হাতে দিয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদে অভিব্যক্ত অভিযোগসমূহের কোন উত্তর উহাতে নাই।"

মৌলবী ফজলুল হককে সর জন হার্বার্ট লিখিয়াছিলেন, "এই ব্যাপারের তদন্ত যে আমার অভিপ্রেত নহে, তাহা আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন।"

একজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টের জোরে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবৃতি উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। ইহাতে সরকারী বিবৃতির প্রতি লোকের অনাস্থা আরও বাড়িবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনীই এই জেলার বিচিত্র ইতিহাসের পূর্ণ বিবরণ নহে। বাংলার এই একটি জেলা ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪২ সালের জাতীয় আন্দোলনে যে অপূর্ব ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে তাহা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। সরকারী ক্রোধের যে বর্বর রূপ গত তিন বৎসরে এই জেলায় প্রকটিত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণই স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর আত্মোৎসর্গ। ১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর্কে প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছিলেন যে মেদিনীপুর জেলায় সরকারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে দৃঢ়তা ও সঙ্ঘবদ্ধতা দেখা গিয়াছিল তেমন আর কোথাও হয় নাই। তিনি বলেন, "ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সরকারের ক্ষমতালোপ করাই জেলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্য ছিল এবং কোন কোন অংশে উহারা সম্পূর্ণ সফলকামও হইয়াছিল।" কোন স্থানে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র বা সফলকাম হইয়াছে বলিয়া তথাকার সমগ্র অধিবাসীর উপর স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের উপর অত্যাচার করিতে হইবে এরূপ বিধান পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে আছে বলিয়া আমরা জানি না। মেদিনীপুর, অষ্টি-চিমুর, সাতারা প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রিটিশ শাসনের গভীর কলঙ্কস্বরূপই হইয়া থাকিবে। লোকে শুধু এইটুকুই মনে রাখিবে যে বর্বর ও নৃশংস অত্যাচার সত্ত্বেও এই সব স্থানের অধিবাসিবৃন্দ জাতীয় পতাকার মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই।

মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীদের বিবরণ হইতে একটি ঘটনা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে দেখা যাইবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা চিরকালের ন্যায় ১৯৪২ সালেও সকলের পুরোভাগেই ছিল। ঘটনাটি এই:

> ৭৩ বৎসর বয়স্কা মহকুমার প্রবীণ কংগ্রেস সেবিকা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার পরিচালনায় আর একটি শোভাযাত্রা উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ভট্টাচার্যের পরিচালনাধীন সৈন্যদের সম্মুখীন হয়। 'বাণপুকুর' এর পাশে সঙ্কীর্ণ স্থানে সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা কিছু দূর সরিয়া যায়। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক একটি বালক সৈন্যদের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া একজনের বন্দুক কাড়িয়া লয়। সৈন্যরা তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। অতঃপর আমাদের স্বাধীনতার বীর সৈনিকরা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে আবার সরকারী সৈন্যদের সম্মুখীন হয়। সৈন্যরা বহুক্ষণ পর্যন্ত গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দৃঢ় হস্তে জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। সরকারী সৈন্যরা প্রথমে তাঁহার দুই হাতে গুলী মারে। তাঁহার হস্তদ্বয় নত হইল কিন্তু জাতীয় পতাকা তিনি তখনও ধরিয়া রাখিলেন এবং আগাইয়া চলিলেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যদের অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়। উত্তরে আসিল একটি বন্দুকের গুলী, উহা তাঁহার কপাল ভেদ করিল। তাঁহার মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। তাঁহার রক্তে ধরণীর ধূলি পবিত্র হইল। দেহ নিষ্প্রাণ, কিন্তু তখনও তাঁহার হাতের জাতীয় পতাকা সগৌরবে পতপত করিয়া উড়িতেছে। একজন সরকারী সৈন্য দৌড়াইয়া গিয়া লাথি মারিয়া জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলিয়া দিল। তাঁহার নিকট হইতে কয়েকপদ পিছনে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩), পুরীমাধব প্রামাণিক (১৪), নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ও জীবনচন্দ্র বেরার মৃতদেহ পড়িয়া। বহু লোক আহত হইয়াছে। কয়েকজন

আহত লোককে তাহাদের সঙ্গীরা সরকারী হাসপাতালে লইয়া গেল। এখানেও সৈন্তরা আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসায় বাধা দিল। একজন স্ত্রীলোক একজন আহত বিপ্লবীর শুশ্রূষা করিতেছিল। লোকটি 'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি নিকটবর্ত্তী পুকুরে শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া তাহার জন্ত জল আনিল। কিন্তু একটা পশুস্বভাব সৈন্ত তাহার দিকে বন্দুক তুলিয়া জল দিতে মানা করিল। স্ত্রীলোকটি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে খুন করিতে পার, আমি তোমার হুমকির কাছে নতি স্বীকার করিব না।" সৈন্তটা তাহাকে গুলী করিতে সাহস করিল না। আর একটি শোভাযাত্রা আসিল দক্ষিণ হইতে শোভাযাত্রা শঙ্কর-আরা পুলে পৌঁছামাত্র সরকারী সৈন্তরা গুলীবৃষ্টি আরম্ভ করে। ফলে নিরঞ্জন জানা (১৭) তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং পূর্ণচন্দ্র মাইতি (২২) আহত হইয়া দুই দিন পরে হাসপাতালে মারা যায়। বহুসংখ্যক বিপ্লবী আহত হয়। শোভাযাত্রায় যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা আহত ব্যক্তিদিগকে জল দেয়। কয়েকজন সৈন্ত এই সকল শুশ্রূষাকারিণীকে তাড়া করে। এই সব সাহসী নারী একটি বঁটি ও এক বাটি জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহারা চীৎকার করিয়া সৈন্তদের বলে, "যদি আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষায় বাধা দাও তবে এই বঁটি দিয়া তোমাদের কাটিয়া ফেলিব।" ইহার পর আর তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। গুরুতরভাবে আহত কয়েকজন লোককে শোভাযাত্রাকারীরাই শহরের হাসপাতালে বহন করিয়া লইয়া যায়। অনেককে বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে তিন হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা কাঠের পুল দিয়া শহরে প্রবেশ করে। সেখানকার সৈন্তদের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত অপূর্ব ঘোষ শোভাযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যাহারা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্ত গুলীর সম্মুখীন হইতে পারিবে, তাহারাই যেন অগ্রসর হয়।" যে সকল কংগ্রেসী বিপ্লবী শোভাযাত্রা চালনা করিতেছিল, তাহারা দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়। তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল। তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাকী শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি চালনা হইল। ধৃত ব্যক্তিদের দারুণ লাঠিপেটা করা হয়। তারপর সাত জনকে রাখিয়া বাকী লোকদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহাদের আটক রাখা হয়, তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও ছিল। পরে তাহাদের প্রত্যেকের দুই বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

পশ্চিম হইতে প্রায় এক হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা থানার দিকে অগ্রসর হয়। প্রচণ্ডভাবে লাঠি চালনা করিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে প্রায় ২০ হাজার নিরস্ত্র ও অহিংস লোক বীরের মত সরকারী বাহিনীর সম্মুখীন হয়। অবিরাম গুলী বর্ষণে তাহাদিগকে যখন পিছনে হটিতে হইয়াছে, তখনও তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার লোক গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত পুনরাক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সরকারী বাহিনী অবিরাম শহরে আসিতে থাকে এবং শহরটি সুরক্ষিত করিয়া রাখে। ফলে জনতাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে হয়। নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়া মৃতদেহগুলি দাবি করে। কিন্তু তাহাদিগকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

তমলুকে নৌকা ও সাইকেল অপসারণের প্রতিক্রিয়া

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্ত প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাঁহাদের রিপোর্টে তমলুক মহকুমার বহু স্থান হইতে নৌকা ও সাইকেল প্রভৃতি অপসারণের কাহিনী বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে গবর্মেণ্ট বাংলার বহু অঞ্চল হইতে অশোভন ও অহেতুক ব্যস্ততার সহিত নৌকা, সাইকেল ও চাউল প্রভৃতি সরাইয়াছেন, ফলে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ অসহনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নৌকা কাড়িয়া লওয়ায় দুর্ভিক্ষে তাহারা সপরিবারে মরিয়াছে। সরকারের এই denial policy জনসাধারণের পক্ষে অবিমিশ্র লাঞ্ছনা ও দুর্দশার কারণ হইলেও বহু সরকারী কর্মচারী ও মুনাফাখোর দালালের পক্ষে কল্পনাতীত অর্থ সঞ্চয়ের সোপান-স্বরূপ হইয়াছে। নৌকা লইয়া যে কোটি কোটি টাকার অপচয় চলিতেছে গবর্মেণ্ট আজও তাহা বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া জানান নাই যাহাদের নৌকা প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নামে সরকারী তহবিল হইতে যে টাকা বাহির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই গিয়াছে ঘুষখোর কর্মচারী ও দালালদের পকেটে, গত তিন বৎসর যাবৎ লোকে এই অভিযোগ করিয়াছে, কিন্তু গবর্মেণ্ট নির্বিকার। ভারত-সরকারের অডিটার-জেনারেল বলিয়াছেন যে কয়েক কোটি টাকার হিসাব বাংলা সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। তিনি বলিয়াছেন যে অবস্থাটা এমন দাঁড়াইয়াছিল যেন যে-কেহ ট্রেজারীতে গেলেই লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। বাংলা সরকার ট্রেজারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার বলে যে কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ইচ্ছামত টাকা লইতে ও ব্যয় করিতে পারিয়াছে। এই টাকার অতি সামান্ত অংশই ক্ষতিগ্রস্ত লোকে পাইয়াছে। কি ভাবে নৌকা ও সাইকেল প্রভৃতি সরানো হইয়াছে, এবং কি ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ আলোচ্য রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিবরণ বলিয়া মনে করা চলে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বিভিন্ন বিতর্কে যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সহিত রিপোর্টে বর্ণিত বিবরণের মিল আছে। নিরপেক্ষ এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন ট্রিবিউনাল পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিয়া ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত লোকে কংগ্রেস নেতাদের রিপোর্টকেই বিশ্বাস করিবে। উক্ত রিপোর্টের দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল :

জাপানী অভিযানের আতঙ্কে মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য অঞ্চলসহ তমলুক মহকুমাকেও বিপজ্জনক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অধিকাংশ মোটর যান মহকুমা হইতে সরাইয়া

ফেলা হয়। বাকী যে কয়খানি মোটর চলিত সেগুলিও যথেষ্ট তৈল পাইত না। আতঙ্কগ্রস্ত কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য দেখাইলেন। মোটর বাসের অভাবে তাহাদের দুর্গতির সীমা রহিল না।

১৯৪২ সালের ৮ই এপ্রিল আর একটি আদেশ আসিল। দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষ সকল শ্রেণীর নৌকা সরাইয়া ফেলিতে চাহিলেন, পাছে জাপানীরা ঐগুলি ব্যবহার করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিলেন, সমগ্র কাঁথি মহকুমা এবং তমলুক মহকুমায় নন্দীগ্রাম ও ময়না থানার এলাকা হইতে সব রকম নৌকা ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরাইয়া ফেলিতে হইবে, নৌকাগুলি ৩০ হইতে ৯০ মাইল দূরে নেওয়ার আদেশ হইল। এই অসম্ভব আদেশ পালন করা অসাধ্য। ইহাতে শুধু দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের ঘুষের দরজা খুলিয়া গেল। শত শত নৌকা পুড়াইয়া ফেলা হইল, নষ্ট করা হইল। অসংখ্য লোক জীবিকার একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হইল। বাংলা গবর্মেণ্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু সেখানে গিয়া সরকারী নীতির সমর্থন করিলেন এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হওয়া দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামমাত্র হইয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মোটেই দেওয়া হয় নাই।

তাহার পরে আর একটি আদেশ আসিল—এবার সাইকেল সরানোর আদেশ, পূর্বের আদেশের মত পীড়নমূলক। সমগ্র নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ময়না থানা এবং তমলুক ও পাঁশকুড়া থানার বেশীর ভাগ অঞ্চল হইতে সমস্ত সাইকেল সরাইয়া ফেলা হয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নামমাত্র। সাইকেল মালিকদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন পান ৮ আনা হইতে ৫ টাকা এবং শতকরা ৫০ জন পান ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা। গড়ে ১২ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। অনেকে এত কম লইতে অস্বীকার করেন। এই সকল অর্থহীন বঞ্চনা নীতিতে আর কিছু লাভ হয় নাই, কেবল যে শাসন-ব্যবস্থা এই সকল দুর্গতির কারণ, লোকের মনে তাহাকে লোপ করার সঙ্কল্পই বর্দ্ধিত হয়। জাপ অভিযানের আতঙ্কে অভিভূত দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষ লোকের দুর্গতির দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বঞ্চনা নীতি চালান।

ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এক বিবৃতিতে এই অভিযোগের জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে নৌকা, সাইকেল প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে, ইহাতে তাঁহাদের কোন হাত ছিল না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহুসংখ্যক নৌকা সরাইয়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। বিবৃতিতে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যেন তিনি প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন [illegible]নেতারাও ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত দুর্গতেরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইল কি না তাহা দেখিবার অবসর তাঁহার হয় নাই ইহা সুস্পষ্ট। তিনি নিজেই তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ দানের ভার স্থানীয় কর্মচারীদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কর্মচারীরা অধিকাংশ টাকা নিজেরা রাখিয়া অতি সামান্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিতেছে এই অভিযোগ প্রথম হইতেই উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ইহা জানিতেন না ইহা অবিশ্বাস্য। ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিবার পর আর একবার মেদিনীপুর গিয়া তিনি স্বয়ং টাকা দেওয়ার নমুনাটা যাচাই করিতে চাহিলেন না কেন? সরকারী তহবিল হইতে ক্ষতিপূরণের নামে কত টাকা বাহির হইয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্তেরা প্রকৃতপক্ষে কত টাকা পাইয়াছে ইহা সেই সময়েই যাচাই করা চলিত, আজ উহার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত কঠিন হইবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় যে টাকার রসিদ লেখাইয়া লওয়া হইয়াছে তাহার অনেক কম টাকা দেওয়া হইয়াছে, অশিক্ষিত ও অসহায় গ্রামবাসীর পক্ষে এরূপ রসিদ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, এরূপ বহু অভিযোগ ঐ সময়েই উঠিয়াছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রীমহাশয় নিজেই বলিতেছেন, "অন্যায় ভাবে অত্যন্ত কম করিয়া ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া মাঝে মাঝে অভিযোগ আসিলে আমাকে উহা দেখিতে হইত।" এই সব অভিযোগকে ব্যক্তিগত বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া উহার ব্যাপক তদন্ত করিলেই ক্ষতিপূরণ দানের নমুনা তখনই ধরা পড়িত। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর বিবৃতিতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ক্ষতিপূরণের নামে কি ঘটিতেছে তাহা তিনি জানিতেন; সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে মন্ত্রিত্ব টেকা দুষ্কর হইতে পারে হয়ত এই ভাবিয়াই তিনি অনুসন্ধান করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। সরকারী কর্মচারীদের বর্বর অত্যাচার ও শোষণ হইতে দেশবাসীকে বাঁচানো অসম্ভব ইহা বুঝিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন পদত্যাগ করেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন নাই লোকে ইহা ভুলিবে না।

নির্বাচনে গুণ্ডামি

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলমান নির্বাচনকেন্দ্রে গুণ্ডামির সংবাদ আসিতেছে। গুণ্ডামির অভিযোগ সর্বত্রই মুসলীম-লীগের বিরুদ্ধে। লীগের মুখপত্র দৈনিক 'ডন' পত্রিকা কয়েক মাস পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে লীগের বিরুদ্ধে যাহারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, সকল স্থানের এক এক দল অতি উৎসাহী লীগভক্ত এই ইঙ্গিত কার্যে পরিণত করিতেছে। লীগ নায়কেরা এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার, আজ পর্যন্ত এক বারের জন্যও তাঁহাদের একজনও এই সব গুণ্ডামির প্রতিবাদ করেন নাই। গবর্মেণ্টও অতিশয় ভাসা ভাসা মৌখিক সদিচ্ছা-পূর্ণ দুই-একটি সদুপদেশ বিতরণ ভিন্ন আর কিছু করেন নাই। বাংলাদেশেই গুণ্ডামি চরমে উঠিয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যও এখানে হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস বহু ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতেছেন না, তাঁহারা প্রকাশ্যে ও গোপনে মুসলীম লীগ ও তাহাদের গুণ্ডাদের সহিত হাত মিলাইয়াছেন এরূপ অভিযোগ নেতারা অনেকেই করিয়াছেন। ইহা কল্পনা-প্রসূত অসঙ্গত উক্তি নহে, অভিজ্ঞতার তিক্ত ফল। বর্তমান নির্বাচনী প্রচারকার্যে কংগ্রেসকর্মী অথবা জাতীয়তাবাদী মুসলমানকর্মীরা কোন প্রকার অসঙ্গত আচরণ করিয়াছে ইহার

কোন প্রমাণ নাই, সর্বপ্রকার গুণ্ডামি লীগ ও উহার সাঙ্গ-পাঙ্গদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সর আবদুল হালিম গজনবী, মৌলবী ফজলুল হক প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতাদের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ হইয়াছে এবং শুধু প্রস্তর নহে, লাঠি এবং রামদাও লইয়া গুণ্ডারা আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই গুণ্ডামির প্রশ্রয়দাতা কাহারা ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। গত কয়েক বৎসরে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে বহু লীগভক্ত মুসলমান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘুষের টাকায় লাভবান হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, দুই জন লীগনায়ক মন্ত্রীর গৃহ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে খানাতল্লাসী হইয়াছে। চাকুরি ও কণ্ট্রাক্ট এই দুই পথ দিয়াই নিরবচ্ছিন্ন ঘুষ চলিয়াছে এবং উহাতে যাহারা লাভবান হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই মুসলিম লীগের লোক। দেশবাসীকে শোষণ করিয়া অর্থসঞ্চয়ের যে পথের সন্ধান ইহারা একবার পাইয়াছে সেই পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য ইহারা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া পুনরায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের চেষ্টা করিবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহারা জানে একবার মন্ত্রীর গদীতে সমাসীন হইতে পারিলে ঘুষ ও চুরির সদর দরজা খোলাই থাকিবে, দেশবাসী ইহার প্রতিবাদ করিলেও ইংরেজ সিভিলিয়ানতন্ত্র কিছু বলিবে না। ঘুষ ও চুরি বন্ধের সুপারিশটি বাদে রোলাণ্ড কমিটির অন্য সমস্ত পরামর্শ বাংলা-সরকারের ইংরেজ সিভিলিয়ানেরা গ্রহণ করিয়াছেন।

লীগগুণ্ডামি স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্রয়ের দ্বারা বাড়িয়া চলিয়াছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। গত কয়েক বৎসরে বহু অযোগ্য মুসলমানকে শুধু সাম্প্রদায়িক কারণে এবং লীগভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। লীগের প্রচার-কার্য এবং লীগনায়কদের সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন ইহাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা লীগের স্বার্থ ইহাদের নিকট অনেক বেশী আপন। এই শ্রেণীর কর্মচারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বহু সমালোচনাও হইয়াছে কিন্তু ফল কখনও ইহাদের প্রতিকূলে যায় নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে এই শ্রেণীর মুসলমান কর্মচারীর পদোন্নতিই হইয়াছে। ইংরেজ সিভিলিয়ানেরা ইহাতে কখনও বাধা দেন নাই। ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহকেরা এসব ক্ষেত্রে বাধা দিতেও পারেন না। এই শ্রেণীর কর্মচারীদের কার্যের দ্বারা শাসনযন্ত্রের অবনতি ঘটিলেও বর্তমান অবস্থায় ইহারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় মিত্র।

গবর্ণর মিঃ কেসি পুলিস প্যারেড উপলক্ষে বলিয়াছেন যে তিনি নাকি জেলা কর্মচারীদের আদেশ দিয়াছেন যেন তাঁহারা নির্বাচনে গুণ্ডামি বন্ধ করেন। ইহার পর সরকারী এক প্রেস-নোটেই সরকারের এই শুভ ইচ্ছার সংবাদ দেশবাসীকে শুনান হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার পরও গুণ্ডামি বন্ধ হয় নাই, অবাধেই উহা চলিতেছে এবং এখনও ক্রমাগত সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্বের সংবাদ আসিতেছে। গুণ্ডামি বন্ধ করিবার জন্য একজনও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তৎপর হইয়াছেন এরূপ সংবাদ আজ পর্যন্ত আসে নাই। মিঃ কেসির সদিচ্ছায় আমরা সন্দেহ করিতেছি না, কিন্তু দেশবাসী একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে কোন সদিচ্ছাই তিনি কার্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন না, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানচক্রের নিকটই তিনি অসহায় ভাবে আত্ম-সমর্পণ করেন। এদেশের সিভিলিয়ানতন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা সাধারণ লোকের পক্ষে উপলব্ধি করা দুরূহ, ভারতীয় শাসনতন্ত্র যাঁহারা গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা উহা জানেন। বিলাতের এক সংবাদে প্রকাশ, শুধু মিঃ কেসি কেন, ভারত-সচিব পেথিক-লরেন্স, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল অকিনলেকও সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচার আরম্ভের ইচ্ছা ইঁহাদের ছিল না, সিভিলিয়ান কর্মচারীদের চাপে পড়িয়াই তাঁহারা উহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে এই সংবাদ জানাইয়াছেন। ভারতীয় শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনও অভিজ্ঞতা আছে এ সংবাদ অবিশ্বাস করিবার কারণ তাঁহাদের নাই। মিঃ কেসি গুণ্ডামি বন্ধ করিবার জন্য যে আদেশ দিয়াছেন তাহা ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মনঃপূত হইতেছে কি না অথবা তাঁহার প্রকাশ্য আদেশের পরে হালেট সার্কুলারের ন্যায় কোন গোপনীয় সার্কুলার গিয়াছে কি না কর্মচারীদের কার্যকলাপের ফলে এরূপ আশঙ্কাই জনসাধারণের মনে দৃঢ়মূল হইবে।

বাংলার লীগ মন্ত্রীদলের নৌকাবিলাস

যে সময় লীগ মন্ত্রীদের দলে ভাঙন ধরিয়াছে এবং বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে তাহার পরিস্থিতি টলটলায়মান ঠিক সেই মুখে হঠাৎ শোনা গেল যে মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের পরামর্শদাতাদিগের সহিত বিস্তর গবেষণা করার ফলে নূতন এক নৌবহরের সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে ইতিপূর্বে সদাশয় সরকার বাহাদুরের বঙ্গদেশস্থ প্রধান কার্যচালক সর জন হার্বার্ট এবং তাঁহার সহযোগী মন্ত্রীদল প্রায় ৪০০০০ বা ততোধিক নৌকা ধ্বংস করিয়া নদীমাতৃক বাংলার বিশেষ দুর্গতির ব্যবস্থা করেন। এই "ডিনায়েল পলিসি", যাহা দেশ পোড়ানোর ছদ্মনাম, এতই প্রখর ভাবে সাধিত হয় যে নদীমাতৃক বাংলায় লোকজনের চলাচল ও খাদ্য-দ্রব্যের সরবরাহের পথ একেবারে বিকল হইয়া যায়। উপরন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মুসলমান ও তপশীলভুক্ত লোকের—তাহাদের অন্নবস্ত্র উপার্জনের এই একমাত্র উপায় নষ্ট হইয়া যাইবার ফলে—অসহায় অবস্থায় নিজের ও পরিবার-পরিজনের চরম দুর্দশা দেখিতে দেখিতে অন্তিমকালের দিন গণনা করা ভিন্ন অন্য কিছুই রহিল না। সরকার বাহাদুর ধ্বংসকার্যে প্রবল তৎপরতা দেখাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, নৌকাধ্বংসের ফলে নদীমাতৃক অঞ্চলের জনসাধারণের কি হইবে তাহা ভাবিবার সময় পাইলেন না, লীগ মন্ত্রীদল এবং তাহাদের সহকর্মিবৃন্দও সে বিষয়ে বিশেষ খোঁজখবর করা প্রয়োজন মনে করিল না। তাহার পর আসিল দুর্ভিক্ষ যাহার ফলে দরিদ্র নৌকাজীবীদের অধিকাংশের জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইল মৃত্যুর ক্রোড়ে এবং সেই সঙ্গে গেল নদীমাতৃক অঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক—যাহাদের

অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের—যাহাদের অনেকেই বাঁচিত যদি সময়মত খাদ্যের সরবরাহ এবং জলপথে তাহা বিতরণের ব্যবস্থা হইত। বলা বাহুল্য লীগ মন্ত্রীদল সে দিকে কিছুই করিলেন না।

কিছু দিন পরে যখন ব্যবস্থাপক সভায় লীগের দলে গোলমাল উপস্থিত এবং দলের লোকের মধ্যে অনেক প্রকার অদলবদলের ব্যবস্থা চলিতেছে তখন শুনা গেল যে হঠাৎ সরকার বাহাদুর ও মন্ত্রীদল নদীমাতৃক অঞ্চলের বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং অতি শীঘ্রই নৌকার বহরে বাংলার নদনদী ছাইয়া যাইবে। সাধারণে বুঝিল এবার বুঝি নৌকাজীবীদিগের দুঃখের শান্তি হইবে এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশে চলাফেরার ও সরবরাহের পথ আবার খুলিবে। দরিদ্র মুসলমান ও তপশীলভুক্ত নৌকাজীবী এবং তাহাদের সহযোগী নৌকা গড়াই-বাঁধাইকারী মিস্ত্রী যাহাদের অধিকাংশই মুসলমান, তাহাদের অবস্থার উন্নতি কত দিনে হয় তাহার প্রতীক্ষা চলিল।

দেখিতে দেখিতে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়া গেল। কিন্তু নৌকা নির্মাণের ফরমাইস দেওয়া যখন আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে, সরকারের এই ব্যবস্থা দরিদ্র মুসলমান বা তপশীলীদিগের দুঃখমোচনের জন্য নহে। সরকারী ফরমাইস হইল ১০,০০০ নৌকার যাহা ১০০ হইতে ১০০০ মণ মাল বহিবার জন্য এবং উপরন্তু কয়েকটি ২০০০ মণের ছোটখাট জাহাজ। নৌকা ধ্বংসের ফলে ম'রল দরিদ্র মুসলমান, জেলে কৈবর্ত ইত্যাদি, কিন্তু টাকা ছড়াইবার বেলা পাইল অন্য আর এক প্রকারের জীব। মেছো-নৌকা বা খেয়া-নৌকার বদলে এরূপ ব্যবস্থা কেন করা হইল, পাছে সেই কথা দুষ্ট লোকে তোলে সেই জন্য বলা হইল এ সকল বড় নৌকা সত্বর প্রয়োজন সিভিল সাপ্লাইয়ের চাল বহিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য। একথাও কিন্তু মিথ্যারই সামিল, কেননা যে সময়ে এইরূপ ছয় কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা হইল ঠিক সেই সময়েই সিভিল সাপ্লাই বিভাগে বহু বড় নৌকার ঠিকাদারেরা অভিযোগ করিতেছিল যে তাহাদের নৌকা সবই কাজের অভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বড় নৌকা ভাড়া লইয়া বসাইয়া রাখা হইল এক দিকে, অন্য দিকে ছয় কোটি টাকার নৌকা নির্মাণের ঠিকা দেওয়ার জন্য পড়িয়া গেল হুলস্থুল।

যাহা হউক, কেহ কেহ ভাবিল নৌকা চালাইয়া দরিদ্রেরা না খাইতে পাক, নৌকা গড়িয়া বেশ কিছু পাইবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ। নৌকার মিস্ত্রী কারিগরের বেশ কিছু সংস্থান ত হইবে। কাজের বেলা দেখা গেল ইহাও মিথ্যা আশা। ছয় কোটি টাকা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল মন্ত্রী সাহাবুদ্দিনের বিভাগে তিন কোটি এবং সিভিল সাপ্লাইয়ের কর্ণধার মেজর-জেনারেল ওয়েকলির হাতে তিন কোটি। সাহাবুদ্দিনের বিভাগের দরুন ঠিকা বিতরণের ভার লইলেন লীগের বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত সতীশ মিত্র। বড় বড় নৌকার খরচ ধরা হইল গড়ে ছয় হাজার টাকা এবং ২০০০ মণের নৌকার দাম ধরা হইল ২৩০০০ টাকা। বলা বাহুল্য, এইরূপ মোটা টাকার ব্যবস্থা হইল যেখানে সেখানে যে সকল গরীব-দুঃখ, মিস্ত্রী-কারিগর বাপ-দাদার আমল হইতে ছোটবড় নৌকা-বজরা ভড় তৈরি ও মেরামত করিতে সিদ্ধহস্ত তাহাদের কোনই ঠাঁই হইল না। ঠিকাদার হইলেন অনেক অপরূপ ব্যক্তি, যাঁহাদের একজনও কস্মিনকালে নৌকা নির্মাণ স্বপ্নেও করেন নাই। এক মারবাড়ী রায়বাহাদুর বিভিন্ন ছদ্মনামে দশ দফা ঠিকার ব্যবস্থা করিলেন। বিভিন্ন নামের কি প্রয়োজন ছিল তাহা তিনি নিজে, সতীশ মিত্র মহাশয় এবং মন্ত্রীবর সাহাবুদ্দিনই জানিতে পারেন, অন্যের উহা বোধগম্য নহে। খাজা সাহাবুদ্দিনের সাক্ষাৎ শ্যালক দালিম সাহেব প্রমুখাৎ বহু ব্যবস্থাপক সভার লীগ সদস্যের মধ্যে ঠিকারূপ পারিতোষিক বিতরণ করা হইল, এবং আরও পাইল অনেকে, পাইল না শুধু যাহাদের ব্যবসা নৌকা-নির্ম্মাণ করা। মোটা টাকার ব্যবস্থা সব দিকেই হওয়ায় সকলে সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু নৌকা নির্মাণের বেলায় দেখা গেল আরও লাভের পথ রহিয়াছে। ঠিকা দিবার বেলায় কথা ছিল নৌকাগুলি অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসরের পোক্ত শালকাঠের হইবে। নির্মাণের বেলা কর্তারা অনুমতি দিলেন শালের বদলে আম, আস্‌না ইত্যাদি সস্তার বাজে কাঠ চালাইবার নৌকা নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী, ভাল শালকাঠের জন্য অপেক্ষা ক'রলে চলিবে না এই হইল তাঁহাদের যুক্তি। কিন্তু দামী পোক্ত শাল কাঠের বদলে সস্তার বাজে কাঠ দিলে দাম কমান উচিত একথাটা তাঁহারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনিলেন না। ঠিকাদারের দল ভাবিল আরও কিছু ব্যবস্থা করিলে হয়ত আরও কিছু লাভ হইতে পারে, সুতরাং বাজে কারিগর এবং অনুরূপ মজুর নিয়োগ করা হইল, এবং নৌকার আয়তনেও অনেক প্রকার ইতরবিশেষ করা হইল। ফলে যে নৌকার ১০০ মণ বোঝা বহিবার কথা সেটা অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়াইল ৭৫ মণের। এখন ধাপার খালে (ধাপ্পার খাল নহে) ঐরূপ অপরূপ নৌকার যে বহর দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে দেখা যায় আয়তনে কম'ত, গড়নে বাজে কারিগরীর নমুনা এবং কাঁচা কাঠের ছড়াছড়ি।

গৌরী সেনের টাকা দু-হাতে ছড়াইয়াও কিন্তু লীগ ম'ন্ত্রত্ব টিঁকিল না। টাকা যথানির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতেই তাহা ভাঙিয়া গেল। রহিল হাজার হাজার বাজে নৌকা যাহার রক্ষণাবেক্ষণে এখন মাসে লক্ষাধিক মুদ্রা খরচ চলিতেছে যদিও তাহাদের ব্যবহার কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়—বোধ হয় নৌকাডুবির ভয়ে। সরকার এখন অর্ধেক দামে ঐসব নৌকা বেচিতে চাহেন কিন্তু সে দামেও ঐ বাজে কাঠের ভাসমান প্যাকিং কেস কিনিবে কে? দুই-চারিটি নৌকার খরিদ্দার জুটিয়াছে বটে, কিন্তু বাকী নৌকা শুধু অচল নহে বিপজ্জনকও বোধ হয়, কেননা অতি সস্তায় ভাড়া দিবার ব্যবস্থাতেও কোনও কিছু তেমন ফল হয় নাই। নৌকা নির্মাণ সম্পর্কে দিল্লী হইতে ব্রিগেডিয়ার আম্‌স্‌কে পাঠানো হইয়াছিল তদন্তে এবং শুনিয়াছি তাঁহার রিপোর্ট হইয়াছে অত্যন্ত কড়া, কিন্তু তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

লীগ মন্ত্রীসভার এক দল তো এইরূপে এক দান "কিস্তীমাৎ" করিয়া রঙ্গভূমি হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন সরকারী চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে এই সম্পূর্ণ ছয় কোটি টাকাই ভরাডুবি না হয়। বলা বাহুল্য, লুঠের বেলায় যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রক্ষণের বেলায় নাই।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা

এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে ভারত-সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্সও মামুলী কায়দায় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উভয়ের বক্তৃতার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই; তবে ওয়াভেলের কথা যেন আর একটু স্পষ্ট। একটি বিষয়ে দুজনেরই সম্পূর্ণ মিল আছে, দুজনেই বলিয়াছেন রাজনৈতিক আন্দোলনে বলপ্রয়োগের কোন চেষ্টা তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন না এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমান, একমত না হইলে ভারতবাসীর হাতে তাঁহারা শাসনভার ছাড়িয়া দিবেন না।

কথাটা নূতন নহে। সর সামুয়েল হোর, মিঃ উইনষ্টন চার্চিল, মিঃ আমেরী প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নায়কবৃন্দ এতকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, শ্রমিক মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর সমাজতান্ত্রিকরূপে পরিচিত প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী এবং ভারত-সচিব পেথিক-লরেন্সও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বড়লাটের বক্তৃতাতেও এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

বড়লাটের বক্তৃতায় দুইটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ তিনি ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক অধিকার দানের প্রচলিত শর্তটিকে আর একটু অস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, শুধু হিন্দু মুসলমান মিলন হইলেই চলিবে না, দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টেরও সম্মতি প্রয়োজন হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলিয়াছেন, এক বা একাধিক গবর্ন্মেণ্ট গঠন ভারতবাসীর হাতে। এতকাল লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক একত্ব নষ্ট করিবার বিরুদ্ধেই সোজা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবারকার এই অতিশয় দ্ব্যর্থবোধক উক্তিকে মিঃ জিন্না তাঁহার মতের অনুকূল বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন।

লর্ড ওয়াভেলের এই বক্তৃতার পর গান্ধীজি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে মিঃ কেসির সহিত তাঁহার চারি বার সাক্ষাৎ হইয়াছে। পেথিক-লরেন্স বা ওয়াভেলের বক্তৃতা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয় নাই। গান্ধী-ওয়াভেল সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ সম্বন্ধে বিরূপ আলোচনা না করাই সঙ্গত বোধ করিতেছি। "কুইট ইণ্ডিয়া" বিষয়ে লর্ড ওয়াভেলের বক্তব্য যাহা তাহার অর্থ এই যে 'কুইট ইণ্ডিয়া' সিসেমের যাদুমন্ত্র নহে যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই আলিবাবার রত্নগুহার দ্বার উন্মুক্ত হইবে। 'কুইট ইণ্ডিয়া' হাতুড়ে ডাক্তারের বড়ি বা কাল্পনিক কাহিনীর যাদুমন্ত্র নয়, ইহা ভারতবাসী জানে। 'কুইট ইণ্ডিয়া'র অর্থ এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান। ইহার জন্য মূল্য দিতে হইবে ভারতবাসী তাহাও জানে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মবলিদানে ভারতবাসী কোন দিন কুণ্ঠিত হয় নাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তচক্ষু দেখিয়া তাহারা ভীত বা কুণ্ঠিত হইবে এরূপ সম্ভাবনাও আমরা দেখিতেছি না।

ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র পৃথিবীর শান্তির জন্যই একান্ত আবশ্যক। ছলে বলে কৌশলে এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করিলে ভারতবাসীর অন্তরে ধূমায়মান বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবারই সহায়তা করা হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নির্বাচনী ইস্তাহার

কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পাঁচ দিনে কমিটির নয়টি বৈঠক বসে, তন্মধ্যে তিনটিতে গান্ধীজি উপস্থিত থাকেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসকর্মীরা যাহাতে কোন কারণেই অহিংসার লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হন কংগ্রেসের এই নির্দেশের পুনরুক্তি করিয়া কমিটিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, গান্ধীজি স্বয়ং উহার খসড়া করিয়া দেন। ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচনী ইস্তাহারও প্রচার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি সংক্ষিপ্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়; সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে উহা গৃহীত হয়। তখনই কথা ছিল পরে প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে একটি বিস্তৃত ইস্তাহার প্রকাশ করা হইবে। কলিকাতা বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তই কার্যে পরিণত করিয়াছেন। নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আর কোন অধিবেশন সম্ভব হইল না বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি প্রণীত এই ইস্তাহারকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মালয় ও ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার সংবাদে কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে ঐ দুই স্থানে গিয়া ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ও তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ভারত-সরকারের। তাঁহারা এই কর্তব্য পালনে অক্ষম হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় নাই। এক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটির হস্তক্ষেপ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারটিতে দেশের প্রধান সমস্যাগুলি উল্লিখিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। অল্প সময়ে ও স্বল্প পরিসরে উহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে, ভবিষ্যতে উহা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইস্তাহারটিতে প্রথমেই কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ও কর্মনীতির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, কংগ্রেসের গত ৬০ বৎসরের ইতিহাস ভারতের জনসাধারণেরই ইতিহাস—যে শৃঙ্খল ভারতবর্ষের সর্বসাধারণকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়াছে সেই শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য আমরণ সংগ্রামের ইতিহাস। কংগ্রেসের ইতিহাস এক দিকে যেমন জনকল্যাণ ও গঠনমূলক কার্যে সমৃদ্ধ অন্য দিকে তেমনই স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রামে পরিপূর্ণ। এই সংগ্রামে কংগ্রেসকে অসংখ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং এক বিরাট সাম্রাজ্যের অস্ত্রবলের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করিয়া ক[illegible] এই সমস্ত সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। গত তিন বৎসর পূর্বেকার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান এবং নির্মমভাবে তাহা দমনের পর কংগ্রেস পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ভারতের সকল

অধিবাসীর সমান অধিকারের দাবি কংগ্রেস করিয়াছে ; সকল সম্প্রদায় ও ধর্মগোষ্ঠীর একতা এবং তাহাদের মধ্যে সদিচ্ছা ও পরস্পরের মতৈক্য চাহিয়াছে।

প্রাদেশিক সীমা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা প্রদেশকে নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার অধিকার দেওয়া হইবে কিন্তু এক অখণ্ড জাতি ও দেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারা এই অধিকার লাভ করিবে। এই অধিকার যাহাতে সকলে ভোগ করিতে পারে সেজন্য কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা পুনর্নির্ধারণ করিতে প্রস্তুত। নির্বাচনী ইস্তাহারের এই ধারাটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক অধিকারের সীমারেখা নির্ধারণের জন্য কংগ্রেস যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে বর্তমান ইস্তাহারের এই অংশটিই সবচেয়ে স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির সংস্কৃতি ভাষা ও বর্ণমালা রক্ষার দাবি স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু ঐ সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে এক জাতি ও এক দেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এই অধিকার ভোগ করিতে হইবে (freedom of each group and territorial area *within the nation*)। কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচনী ইস্তাহারের চার নম্বর ধারাটির চেয়েও এই সংজ্ঞা অনেক বেশী স্পষ্ট। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করা চলে যে ভারত বিভাগের দাবির অবাস্তবতা কংগ্রেস নেতৃবর্গ এতদিনে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাষায় উহা প্রকাশ করিতেছেন। সর্দার বল্লভভাই পটেল এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সম্প্রতি যে-সব বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতেও মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের অযৌক্তিক দাবির সহিত আপোষরফার আর কোন চেষ্টা হইবে না বলিয়াই দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সব উক্তির সহিত নির্বাচনী ইস্তাহারের উপরোক্ত অংশের এই ভাষ্যই করা চলে যে কংগ্রেস প্রাদেশিক সীমা পুনর্গঠন করিয়া এক রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের মধ্যে উহাদের নিজ নিজ ধর্ম সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষা করিবার সুযোগ দিবেন। এই অধিকার এক ও অখণ্ড ভারতীয় মহাজাতিরূপেই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে, পৃথক জাতীয়ত্বের দাবি চলিবে না।

আমরা ভারত-বিভাগ চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরোধী। কংগ্রেসের লীগতোষণ নীতির প্রতিবাদ আমরা সর্বদাই করিয়া আসিয়াছি। মুসলমানদের মনে তাহাদের ধর্ম ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে ভয় কারণে হউক বা অকারণে হউক প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা দূর করিবার সর্ববিধ চেষ্টা হউক ইহা আমরা চাই, কিন্তু তাহার জন্য স্বদেশকে ভাঙিয়া টুকরা করিতে হইবে এ যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারিত হইলে এবং সর্বত্র যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মগোষ্ঠী পরস্পর মিলিবার ও পরস্পরের ক্ষুদ্র সমস্যার উর্ধ্বে জাতীয় সমস্যাকে স্থান দিতে শিখিবে। সাম্প্রদায়িক কলহ দূর করিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া আমরা মনে করি। নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই প্রশ্নটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলা হইয়াছে, সকলের প্রধান প্রধান অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া অখণ্ড গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই রাষ্ট্র হইবে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসিত হইবে, কিন্তু উহাদিগকে মূল অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে নির্বাচিত হইবে। যে-সব বিষয়ে সমস্ত প্রদেশের স্বার্থ জড়িত আছে সেগুলি পরিচালনার অধিকার থাকিবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতে, এরূপ ক্ষমতার পরিমাণ যত কম হয় তাহারই চেষ্টা করা হইবে। প্রদেশগুলি ইচ্ছা করিলে অবশ্য আরও বেশী ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সর্বসম্মতিক্রমে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।

কলিকাতার ছাত্র-আন্দোলন

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি নিরস্ত্র ছাত্র-শোভাযাত্রার উপর পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে কলিকাতায় ২১শে, ২২শে ও ২৩শে নবেম্বর যে ব্যাপার ঘটিয়াছে জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা রক্তাক্ষরে লেখা থাকিবে। এই উপলক্ষে বাংলার ছাত্রছাত্রীরা যে অপূর্ব সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছে তাহা দেশের আপামর জনসাধারণ এবং নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের বিচারের প্রতিবাদে এক জনসভা হয়। পূজার ছুটি উপলক্ষে স্কুল কলেজ তখন বন্ধ ছিল, ছাত্রছাত্রীরা সকলে ঐ সভায় যোগ দিতে পারে নাই। নিজেদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য তাহারা স্থির করে যে বিচার পুনরারম্ভের দিন, ২১শে নবেম্বর সভা করিয়া ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের প্রতিবাদ জানাইবে।

২১শে নবেম্বর কলিকাতার ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কলেজে না গিয়া দ্বিপ্রহরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়। সেখানে ছাত্র-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভা হয়। প্রকাশ, বহুসংখ্যক পুলিস ও সার্জেণ্ট সেখানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু সভার কার্যে তাহারা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই।

সভা ভঙ্গের পর অপরাহ্নে তিন অথবা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় একদল ছাত্র স্থির করে যে তাহারা মিছিল করিয়া এসপ্লানেড ও ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে যাইবে। এই সময়ে শোভাযাত্রা ডালহৌসি স্কোয়ার অতিক্রম করিলে যানবাহন চলাচলের বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটিত না, কারণ অপরাহ্ন ৫টার পর আপিস প্রভৃতি ছুটি হইয়া ভীড় বাড়িবার বহু পূর্বেই শোভাযাত্রা ডালহৌসি স্কোয়ার পার হইয়া চলিয়া যাইত। ছাত্রছাত্রীরা ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরিয়া ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হইলে ম্যাডান ষ্ট্রীটের মোড়ে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয়। পুলিস সেখানে রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। ছাত্রেরা সম্পূর্ণ শান্ত ও নিরস্ত্র ছিল। তাহারা অগ্রসর হইতে চাহিলে পুলিস তাহাতে আপত্তি করে। তখন ছাত্রেরা রাস্তার উপর বসিয়া পড়ে। এই ঘটনার পর পুলিসের সাফাই গাহিয়া যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহাতে প্রকাশ—এই সময় ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ শত।

সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্যন্ত ছাত্রদল ও পুলিস দলে ধৈর্য

পরীক্ষা চলে। ইতিমধ্যে ছাত্রেরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে সংবাদ প্রেরণ করে। শ্রীযুক্ত বসুকে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়েই সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না। সন্ধ্যার সময় পুলিস অধৈর্য হইয়া উঠে। প্রথম পথে উপবিষ্ট ছাত্রদের উপর লাঠি চালানো হয়। ছাত্রেরা অচঞ্চল থাকে। তার পর তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্ম তাহাদের উপর অশ্বারোহী পুলিস ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অশ্বপদতলে পিষ্ট হইয়াও ছাত্রেরা সঙ্কল্পে অবিচল থাকে। এই সময়ে পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী ও জাতীয়তাবিরোধী সর্বপ্রকার সংবাদপত্রে যে-সব রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঢিল ছোঁড়ার জন্ম ছাত্রগণকে কেহই দায়ী করিতে পারে নাই। জাতীয়তাবিরোধী এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রটি লিখিয়াছিল যে ছাত্রদের গণ্ডীর বাহিরে রাস্তার লোকের ভিড়ের মধ্য হইতে ঢিল আসিয়াছিল। ছাত্রেরা এ পর্যন্ত সারাক্ষণ রাস্তায় বসিয়াছিল, তাহাদের হাতে ঢিল বা লাঠি কিছুই ছিল না। কিন্তু এই সামান্য ঢিল ছোঁড়া উপলক্ষ্য করিয়া ধৈর্যচ্যুত পুলিস সার্জেণ্টরা ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ সুরু করে। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিল বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক এবং অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির নীচে। এই সব অল্পবয়স্ক বালকের উপর যে ভাবে ও যে অবস্থায় গুলি চলিয়াছে তাহাকে বর্বরতা ভিন্ন আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। পৃথিবীর কোন সভ্য গবর্মেণ্ট পুলিসের এই জঘন্য কাপুরুষোচিত কার্য সহ্য করিত না।

গুলি চলিবার অব্যবহিত পরেই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তথায় উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অপরাহ্ণ পাঁচটায় বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়াও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ছাত্রগণকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলে ছাত্রেরা দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলে যে রাজপথ তাহাদের রক্তে সিক্ত হইবার পর আর তাহারা লক্ষ্যচ্যুত হইবে না, ডালহৌসি স্কোয়ারে তাহারা যাইবেই। চক্ষের উপর বন্ধুদের গুলীর আঘাতে নিহত ও আহত হইতে দেখিয়াও ছাত্রেরা কিছু মাত্র ভীত হয় নাই বরং তাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আরও বাড়িয়া যায়।

গুলি চালাইবার আদেশ কে দিয়াছিল, জনসাধারণের প্রবল দাবি সত্ত্বেও তাহা আজও জানা যায় নাই। সরকারী প্রেস-নোটে শুধু বলা হইয়াছে, "একটি ছোট দল জনতা কর্তৃক অভিভূত হইবার বিপদ আছে এই কথা মনে করিয়াছিল বলিয়া গুলি চালাইয়াছে।" গবর্মেণ্ট এ কথা বলিতে পারেন নাই যে পুলিস সার্জেণ্টরা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্ম গুলি চালাইয়াছে, এই কাপুরুষোচিত গুলিবর্ষণ ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টদের দ্বারাই ঘটিয়াছে—এ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গত আগষ্ট আন্দোলনের সময়েও ইহারা এইরূপ বেপরোয়া ভাবে গুলি চালাইয়াছে এবং তাহার জন্ম সরকারের প্রশ্রয় পাইয়াছে। জনতা হইতে বহু দূরে ইউনিফর্ম-পরিহিত টেলিফোন কোম্পানীর এক কর্মচারী টেলিফোনের তার মেরামত করিবার সময় জনৈক পুলিস সার্জেণ্টের গুলিতে নিহত হইয়াছিল লোকে ইহা ভুলে নাই। সশস্ত্র সার্জেণ্ট একক ও নিরস্ত্র এই লোকটির পরিচয় দাবি করিতে অথবা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া সে উহাকে পিছন হইতে অতর্কিতে গুলি করিয়া হত্যা করে। ধর্মতলা ষ্ট্রীটেও সে দিন সন্ধ্যায় এই শ্রেণীরই ঘৃণ্য ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

রাত্রি প্রায় দশটায় গবর্ণর মিঃ কেসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। আন্তরিক সদিচ্ছা লইয়া কোন কার্যে অগ্রসর হইলেও দেখা গিয়াছে মিঃ কেসি শেষরক্ষা করিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলার শাসনকর্তা সামান্য পুলিসী মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিলেন না ইহা অতি বিচিত্র ব্যাপার। রাত্রির নীরবতায় জনশূন্য ডালহৌসি স্কোয়ারে ছাত্রদলকে যাইতে দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িত না ইহা নিশ্চিত, পর দিন ছাত্রেরা ডালহৌসি স্কোয়ার অতিক্রম করিবার পর উহা ভাঙেও নাই, কিন্তু মিঃ কেসি পথ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। ডালহৌসি স্কোয়ার সংরক্ষিত অঞ্চল—পুলিসের এই বুলি সমর্থন করিয়াই অসহায়ভাবে বাংলার লাট নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। গবর্মেণ্টের যে প্রেষ্টিজ মিঃ কেসি বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি তাহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। আন্দোলনের এই তিন দিনে বাংলা-সরকারের প্রেষ্টিজ যে স্তরে নামিয়া গিয়াছে তাহার উদ্ধার প্রায় অসম্ভব।

গুলীবর্ষণে বিক্ষুব্ধ কলিকাতা

ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইবার পর কলিকাতা ও শহরতলীর বহু নাগরিক উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ট্রাম ও বাস চালকেরা ধর্মঘট করে, ফলে শহরের সমস্ত ট্রাম ও বাস বন্ধ হইয়া যায়। জনবিক্ষোভ অতিশয় তীব্র হইলেও প্রথম দিকে উহার কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাই। বৃহস্পতিবার প্রাতে বেপরোয়া গতিতে ধাবমান একটি মিলিটারী লরী চাপা পড়িয়া ভবানীপুর অঞ্চলে জনৈক পথচারী নিহত হয়। এই দুর্ঘটনায় স্থানীয় জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও লরীটিকে তাড়া করিয়া ধরিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করে। এই ঘটনার পরও পুলিস বা সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে মিলিটারী লরীর গতি সংযত করিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। লরীগুলিকে কনভয় করিয়া একসঙ্গে পাঠাইবার কোন চেষ্টাও সেই সময় হয় নাই। এই ধরণের সতর্কতা অবলম্বন না করায় আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। সারা বৃহস্পতিবার উত্তেজিত জনতা মিলিটারী লরী আটক করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে থাকে। বহু স্থলে ইহার ফলে গুলি চলে। পুলিস গোলযোগ বাধাইয়া পরে প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে।

শুক্রবার দিন কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং ছাত্রেরা নিজেরাই সর্বত্র লরী পোড়ান বন্ধ করিবার জন্য প্রচারকার্য সুরু করে। ইহাতে ঐ দিনের মধ্যেই শহর শান্ত ভাব ধারণ

করে। আক্রান্ত বহু লরীকে কংগ্রেসকর্মী এবং ছাত্রেরা রক্ষা করে। শনিবার শহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার সারা শহরে যে তাণ্ডবনৃত্য চলিয়াছে তাহার জন্য ছাত্রদিগকে কোনক্রমেই দায়ী করা চলে না। বুধবার সন্ধ্যায় ছাত্রেরা শোভাযাত্রার পথে বাধা পাইয়া রাজপথে বসিয়া থাকে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে লক্ষাধিক ছাত্র ও নাগরিক ঐ শোভাযাত্রায় আসিয়া যোগ দেয় এবং জনতার চাপে পুলিসব্যূহ তাসের কেল্লার ন্যায় উড়িয়া যায়। শোভাযাত্রীদল সম্পূর্ণ শান্তভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত তাহাদের লক্ষ্যস্থল ডালহৌসি স্কোয়ার অতিক্রম করে। লরী পোড়ানো বা ট্রেন আটকানো প্রভৃতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কলিকাতার এই ছাত্র-আন্দোলনে যে অপূর্ব সংযম ও সংহতির পরিচয় মিলিয়াছে তাহা দেখিয়া রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ দেশনায়কবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছেন এবং এই শক্তির অপচয় না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও আশা করি বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদল শান্ত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভবিষ্যতের কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত হইবে। অন্যথা এই শক্তির অপব্যয়ই চলিতে থাকিবে।

নির্বাচন ও হিন্দু মহাসভা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসপ্রার্থীরা জয়লাভ করিয়াছেন, হিন্দু মহাসভাপ্রার্থীরা পরাজিত হইয়াছেন। ভাই পরমানন্দ, শ্রীযুক্ত খাপর্দে প্রভৃতি হিন্দু সভানায়কদের অনেকের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহারা প্রদত্ত মোট ভোটের এক অষ্টমাংশও পান নাই। এই নির্বাচন উপলক্ষে হিন্দু মহাসভা এবং উহার নেতৃবর্গ যে প্রচারকার্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। প্রাদেশিক নির্বাচন আসন্ন, এখানেও হিন্দু মহাসভা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সাভারকর ২০শে নবেম্বর তারিখে বোম্বাই হইতে একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুর পক্ষে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া রাজনৈতিক পাপ। হিন্দুমহাসভাপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া প্রত্যেক হিন্দুর পবিত্র ধার্মিক এবং রাজনৈতিক (holiest dharmic and politic duty) কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে হিন্দু ছাড়া খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতি ভোটদাতাও আছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে দুইটি পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র হইয়াছিল, মুসলমান ও অ-মুসলমান। ভারতীয় খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতি শেষোক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই কেন্দ্রে হিন্দুমহাসভাপ্রার্থী হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ধার্মিক কর্তব্য হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইলে খ্রীষ্টান ও পার্শীর পক্ষে তাঁহাকে ভোট দেওয়া অসম্ভব। ইহারা হিন্দু মহাসভার সদস্য হইতে পারে না। হিন্দুমহাসভার প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে যে ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ, সেই ধর্মের লোকই হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইবে এবং কেবলমাত্র তাহাদেরই পক্ষে হিন্দুমহাসভার সদস্য হইবার অধিকার আছে। এই সংজ্ঞা দ্বারা বৌদ্ধ ও জৈন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টান ও পার্শী পারে না। অথচ ভারতবর্ষের এই দুটি সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বহুবার জানাইয়াছেন যে তাঁহারা পৃথক নির্বাচন চাহেন না। ধার্মিক কর্তব্য হিসাবে কোন হিন্দু এই সব নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইলে খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতিকে প্রকারান্তরে পৃথক নির্বাচন দাবি করিতেই বলা হয়। সুতরাং যে হিন্দুসমাজ পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিতেছে তাহাদেরই মুখপাত্রের দাবি লইয়া হিন্দুমহাসভা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে ইহা উপলব্ধি করা আবশ্যক।

হিন্দুমহাসভা তাঁহাদের এই কার্যের দ্বারা মিঃ জিন্নার দুই-জাতি থিওরীকে দৃঢ়মূল করিতেও সাহায্য করিতেছেন। হিন্দুমহাসভাপ্রার্থীরা ভারতবর্ষের সমস্ত সাধারণ নির্বাচনকেন্দ্র হইতে যদি জয়ী হইতেন, তবে কি ঘটিত? কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের তখন শুধু দুইটি দল থাকিত—হিন্দু এবং মুসলমান। ইহা দ্বারা মিঃ জিন্নার দুই জাতি থিওরীই প্রমাণিত হইত। কিন্তু কংগ্রেস যে ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধিদের শুধু হিন্দুর প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না। ইঁহারা রাজনৈতিক কার্যক্রম লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন, হিন্দুর ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য ইঁহারা নির্বাচনে অবতীর্ণ হন নাই। কাজেই খ্রীষ্টান, পার্শী, এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সকলেই ইঁহাদিগকে বিনা দ্বিধায় ভোট দিতে পারিয়াছে। ইঁহারা শুধু হিন্দুরই প্রতিনিধি নহেন, ইঁহারা খ্রীষ্টান-পার্শী প্রভৃতিরও প্রতিনিধি।

হিন্দুমহাসভা প্রচার করিয়াছেন, "শুধু হিন্দু আসন দখল করিবার চেষ্টা করিয়া কংগ্রেস নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। কংগ্রেস যে হিন্দু প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের এই দাবি ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।" এই প্রচারকার্য সত্য নহে। লীগের প্রধানতম ঘাঁটি বাংলা দেশেই ছয় জনের মধ্যে দুই জন মুসলমান কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কংগ্রেস সমর্থিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সরকারী সাহায্যপুষ্ট লীগের বিরুদ্ধে উহার উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডামির মুখে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে মুসলমান প্রকাশ্য নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছেন ইহা দ্বারা এই কথাই প্রমাণ হয় যে মুসলমান সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। হিন্দু সমাজেও কংগ্রেসের প্রভাব এক দিনে দৃঢ়মূল হয় নাই, ইহার জন্য অর্দ্ধশতাব্দীর ত্যাগ ও সেবার প্রয়োজন হইয়াছে। মুসলমান সমাজের সেবাতেও কংগ্রেস অনুরূপ নিষ্ঠার সহিত অবতীর্ণ হইলে তাঁহাদের মধ্যেও কংগ্রেসের প্রভাব অল্পদিনের মধ্যেই দৃঢ়মূল হইবে ইহা মনে করিবার মত অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। লীগ-গবর্মেণ্ট যোগাযোগ যত দিন বিদ্যমান আছে, লীগ গুণ্ডামি যত দিন পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্রয় পাইবে, ততদিন কংগ্রেসপ্রার্থী মুসলমান বা জাতীয়তাবাদী মুসলমানপ্রার্থীর জয়লাভের আশা কম থাকিতে পারে; কিন্তু এই অসাধু যোগাযোগ চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এক দিন ইহা ভাঙিবেই। সেদিন কংগ্রেসী মুসলমানপ্রার্থীকে কেহ

বাধা দিতে পারিবে না। কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র গ্রাম, মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা যেখানে সেখানেই কংগ্রেস। যেদিন গ্রামবাসী মুসলমান দেখিবে যে তাহার অন্নসংগ্রহে, বস্ত্রসংগ্রহে, ঔষধসংগ্রহে, কর্মসংস্থানে সে কংগ্রেসের সাহায্য পায়, কংগ্রেস তাহাকে সেবা করে, তাহাকে শোষণ করে না, সেই দিন সে দ্বিধাহীন চিত্তে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আগাইয়া আসিবে। কংগ্রেস এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে চলিয়াছে ইহা একটি ভরসার কথা।

বহু মুসলমান কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন কিন্তু নির্বাচন কেন্দ্র পৃথক হওয়ায় ইহাদের পক্ষে আপন অভিমত ব্যক্ত করা কঠিন হয়। যৌথ নির্বাচনকেন্দ্র পুনঃপ্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অসুবিধা দূর হইবে। কেন্দ্রীয় পরিষদে দিল্লীতে যৌথ নির্বাচন আছে, এই কেন্দ্রে কংগ্রেস মুসলমানপ্রার্থী দাঁড় করাইয়াছে। মিঃ আসফ আলি বহু মুসলমান ভোট পাইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে লীগ সমর্থিত মুসলমানপ্রার্থী অধিকাংশ মুসলমান ভোটই পান নাই। মুসলিম লীগ কোন যৌথ নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করাইতে সাহসী হয় নাই ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কংগ্রেস যে হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয়, যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হইলে যে-কোন একটি মাত্র নির্বাচনেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

স্বদেশী শিল্পসংরক্ষণে কংগ্রেসের প্রস্তাবে ইংরেজ বণিকদের আপত্তি

প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ইংরেজ বণিক সভাসমূহের একটি মিলিত অধিবেশন হয় এবং বড়লাট উহাতে বক্তৃতা করেন। এ বৎসরও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। গত ১০ই ডিসেম্বরে এই সভা হইয়াছে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল উহাতে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং সর রেনউইক হাড্রো সভাপতিত্ব করিয়াছেন। ভারতবর্ষে অবস্থিত বিলাতী কোম্পানীগুলির অন্যায় এবং অসম প্রতিযোগিতায় স্বদেশী নূতন কোম্পানী মাথা তুলিতে পারে না, এই অভিযোগ বহু কাল যাবৎ হইতেছে। বর্তমান ভারতশাসন আইনে অনেকগুলি ধারা সংযোগ করিয়া এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যেন প্রদেশে বা কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলেও বিলাতী কোম্পানীগুলির কার্যপন্থায় কোন বাধা হইতে না পারে। পৃথিবীর প্রত্যেক গবর্মেণ্ট নিজ নিজ দেশের নবগঠিত শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য সুযোগ দিয়া থাকে। এজন্য তাহাদিগকে হয় অর্থসাহায্য করা হয়, নতুবা বিদেশী কোম্পানী বা আমদানীর উপর কর বাড়াইয়া স্বদেশী শিল্পকে গড়িয়া উঠিবার সময় ও সুযোগ দেওয়া হয়। ভারতবর্ষই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যেখানে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই, জনমত যখন অতিশয় তীব্র হইয়াছে তখন বাছিয়া বাছিয়া দুই-চারিটা শিল্পকে কিছু দিনের জন্য সাহায্য করা হইয়াছে এই মাত্র। লোহা, চিনি প্রভৃতি শিল্প এই সাহায্য পাইয়াছে, তাহারা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ আমদানী বিদেশী দ্রব্যের উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসাইয়া এই সুযোগ দেওয়া হয়। এই সংরক্ষণ শুল্ক এড়াইবার জন্য বহু বিলাতী কোম্পানী এ দেশে আসিয়া কারখানা ফাঁদিয়া বসিয়াছে এবং ইহাদের প্রস্তুত দ্রব্য 'ভারতে প্রস্তুত' বলিয়া বিক্রীত হইতেছে। অথচ ইহাদের পরিচালনা সম্বন্ধে ভারতবাসীর কোন হাত নাই, ইহারা বহুক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্পের বিরুদ্ধে অন্যায় প্রতিযোগিতা করে। এই অন্যায় আচরণ বন্ধ করিবার কোন উপায় আমাদের হাতে নাই।

সম্প্রতি কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিলাতী কোম্পানীর কারবার ভারতবাসীরা কিনিয়া লইবে, যে-সব বিলাতী মূলধন এদেশে খাটিতেছে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। প্রস্তাবটি ইংরেজ বণিকদের মনঃপূত হয় নাই ইহা বলাই বাহুল্য। ইঁহাদের বার্ষিক সভায় সর রেনউইক হাড্রো তাঁহাদের মনোভাব ভাল করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য এই :

"ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শিল্প-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি না। এই সকল প্রস্তাব হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কংগ্রেস ভারত হইতে বিদেশী মূলধনসমূহ দূর করিয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের সত্যবাদিতা প্রশংসার্হ; কিন্তু এই প্রস্তাবের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যে-সকল ভারতীয় মূলধন খাটিতেছে, তাহা গুটাইয়া আনিতেও তাঁহাদের সমান আগ্রহ থাকা উচিত। বিশেষ করিয়া আমি পূর্ব ও দক্ষিণ-আফ্রিকা, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের কথা বলিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মূলধন খাটান সম্পর্কে যে নীতি চলিতেছে তাহার পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহি। কংগ্রেসের প্রস্তাব কার্যকরী করা হইলে ভারতের পক্ষে ক্ষতি হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মদেশের চাউলের কলগুলিতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে টাকা খাটাইতে দেওয়া না হইলে তাহাতে ভারতের পক্ষে যেমন ক্ষতি ব্রহ্মদেশের পক্ষেও তেমনই ক্ষতি।"

কংগ্রেস বার বার এই কথাই বলিয়াছে যে ভারতবর্ষ প্রয়োজন হইলে বিদেশী মূলধন গ্রহণ করিবে, কিন্তু উহা খাটাইবার সম্পূর্ণ ভার থাকিবে ভারতবাসীর হাতে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করিবার জন্য যে-সব কারখানা দরকার হইবে তাহার জন্য বিলাতী মূলধনের প্রয়োজন নাই। তবে কোন কোনও ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন আবশ্যক হইবে কিন্তু এই মূলধন খাটাইবার ভার বিদেশীকে দেওয়া হইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে বিদেশী মূলধন খাটে, দুই-একটি অনগ্রসর দেশ ভিন্ন সর্বত্রই এই নীতি প্রযুক্ত হয়। ভারতবর্ষে এই কথা বলিবামাত্র ইংরেজ বণিকেরা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন কারণ ইহা দ্বারা তাঁহাদের শোষণের পথ অনেক সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

বাঁকুড়া জেলায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশা

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমা পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ঐসব স্থানের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া উহা বিবৃতি আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে

তাঁহার বিবরণ বস্তুতঃই মর্ম্মন্তুদ। অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে নিদারুণ লোকক্ষয় ঘটিবে ইহা নিঃসন্দেহ। পণ্ডিত কুঞ্জরু বলিতেছেন,

"অল্প বৃষ্টিপাতের জন্য বাঁকুড়া জেলার কতক স্থানে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, অন্ততঃ ৪টি থানায় অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। ইন্দপুর থানা ও তৎসংলগ্ন বাঁকুড়া ও ছাতনা থানার গ্রামগুলিতে আমি গিয়াছিলাম। ঐ সকল গ্রামে চাষ সামান্যই হয়। দরিদ্র জনসাধারণের মুখ দেখিয়াই বুঝা যায় যে, ঐ সকল স্থানে অত্যন্ত দুর্দশা চলিতেছে। নারী ও শিশুদের মধ্যে দুর্দশার ছাপ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। লোক ইতিমধ্যেই শীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, দুই-তিন মাসেই অবস্থা আরও খারাপ হইবে।"

দুঃস্থরা যাহাতে দৈনিক এক সেরের কিছু বেশী চাউল কিনিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে কাজ দিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে পথঘাট ও জলাশয় সংস্কার করা হইতেছে। এই কাজের জন্য যে অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ দুই লক্ষ টাকার কম বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা। এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সরকার পক্ষ হইতে জানানো হয় নাই। দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়া থাকিলে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলিয়াই বিবেচিত হইবে। উল্লিখিত স্থানগুলির স্থায়ী উন্নতি হয় এমন কাজ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করা উচিত এবং যাহারা কাজ করিতে অক্ষম তাহাদের জন্য খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা দরকার। নিম্নমধ্যবিত্ত লোকদিগকেও সাহায্য দেওয়া আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্যের অভাব ত আছেই, যাহাদের চাউল জুটিতেছে তাহাদের পক্ষে সরিষার তৈল ও কাপড় সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ বলিতেছেন যে বাঁকুড়া শহরে যে দামে তেল বিক্রয় হয় গ্রামের দর তার চেয়েও বেশী; বস্ত্র নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীলোকেরা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া চলাফেরা করে।

জেলার এই দুর্দশার মধ্যেও গবর্মেণ্ট সেখানে কি ভাবে চাউলের কারবার চালাইয়াছেন তাহার পরিচয় দিয়া পণ্ডিত কুঞ্জরু বলিতেছেন,

"বাঁকুড়ায় একটি অভিযোগ আমি প্রায়শঃই শুনিয়াছি যে, গবর্মেণ্ট বাঁকুড়া জেলা হইতে প্রায় দুই তিন লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী করিয়াছেন এবং নিরেস চাউল দ্বারা এই ঘাট্‌তি পূরণ করিতেছেন। আমি আরও একটি অভিযোগ শুনিয়াছি যে, বাঁকুড়ায় প্রায় ১২ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া কলিকাতায় তাহা ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইতেছে। কলিকাতা-বাসীরা অভিযোগ করিতেছেন যে, সরকারী দৃষ্টিতে মিহি বলিয়া বিবেচিত যে চাউল তাঁহারা ২৫ টাকা মণ দরে কিনিতে বাধ্য হইতেছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে মাঝারি ধরণের চাউল।"

১লা ডিসেম্বর এই বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। লিখিবার তারিখ (১২ই ডিসেম্বর) পর্য্যন্ত বাংলা-সরকারের বিরাট্‌ প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক ইহার কোন প্রতিবাদ আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। কলিকাতায় কিছু দিন পূর্ব্বে ১৬৷০ আনা দরে যে চাউল দেওয়া হইতেছিল তাহাই বর্ত্তমানে ২৫ টাকায় বিক্রয় হইতেছে ইহা সর্বজনবিদিত সত্য, এ সম্বন্ধে অভিযোগও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গবর্মেণ্ট এ বিষয়েও নির্বিকার।

বাঁকুড়া বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা। বড় বড় জেলার ন্যায় এখানেও ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব প্রভৃতি ইম্পিরিয়াল কর্মচারী পর্য্যাপ্ত সংখ্যাতেই আছে। তৎসত্ত্বেও বাঁকুড়ার অধি-বাসীদের দারিদ্র্য মোচন বা স্বাস্থ্যের উন্নতির অথবা শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

বাঁকুড়ার অধিবাসীদের দুর্দশা মোচনের জন্য সরকারের মুখ চাহিয়া থাকা বৃথা। সেবা সমিতিগুলির পক্ষে আর্ত্তত্রাণ কার্য্যে অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথি মহকুমাদ্বয়ের অবস্থাও খুবই খারাপ, কিন্তু পণ্ডিত হৃদয় নাথের মতে বাঁকুড়ার উল্লিখিত থানাগুলির অবস্থা আরও খারাপ।

বাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা

গত দুর্ভিক্ষের পর বাংলার গ্রামাঞ্চলের যে দুর্দশা হইয়াছে তাহার প্রতিকারের কোন আন্তরিক চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। বাংলা-সরকার চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক কায়দায় পুনর্গঠন বিভাগ গঠন করিয়াছেন, উহাতে কতকগুলি উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে এই মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিভাগের পক্ষ হইতে ইংরেজ সিভিলিয়ান মিঃ টাফনেল-ব্যারেট বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা অত্যন্ত সতর্কভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য প্ল্যান রচনা হইতেছে। সরকারী প্ল্যানের বহু পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে, এ ক্ষেত্রেও তাহারা উৎসাহিত হইবার কোন কারণ পায় নাই। দৈনিক কৃষকে (৫ই অগ্রহায়ণ) হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উদ্বেগজনক। মেদিনীপুর জেলার ন্যায় আরামবাগ মহকুমার অধিবাসিবৃন্দও বহুবার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া প্রকৃত ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং মেদিনীপুরের ন্যায় ইহারও উন্নতি-বিধানে সরকারের আগ্রহের অভাব স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানকার যে বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে দেশবাসী তাহাতে উদ্বিগ্ন না হইয়া পারে না।

স্থানীয় লোকদের অনুমান, এ বৎসর আরামবাগ মহকুমায় শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী ধান হইবে না। অনাহারে আত্মহত্যা ও সন্তান বিক্রয়ের সংবাদ ইতিমধ্যেই পাওয়া যাইতেছে। ইহার উপর অসময়ে বৃষ্টিতে রবিশস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সর-কারের সরবরাহ ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত চাউল ও আলুবীজ সেখানে পৌঁছায় নাই। জেলার সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই। সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থার গুণে মাথাপিছু তিন গজ কাপড়ও আজ পর্য্যন্ত আরামবাগের কৃষককুলের ভাগ্যে জোটে নাই। এই জেলায় হাজার হাজার তাঁতি আছে, সুতা পাইলে ইহারা কাপড় বুনিয়া স্থানীয় অভাব অনেকটা পূরণ করিতে পারে কিন্তু সুতা কণ্ট্রোল হওয়ায় সুতার অভাবে ইহারা বেকার বসিয়া রহিয়াছে। চরকায় সুতা কাটিবারও উপায় নাই, তুলা কণ্ট্রোল। খাদি কেন্দ্রগুলির

জন্ত তুলার পারমিট প্রয়োজনানুসারে মিলিতেছে না। কণ্ট্রোল দরে চামড়া, লোহা, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া যায় না বলিয়া সহস্র সহস্র কারিগর বেকার হইয়াছে এবং চূড়ান্ত দুর্দশা ভোগ করিতেছে। দুর্ভিক্ষে বহু সহস্র গরিব চাষী তাহাদের জমি হারাইয়াছে এবং ক্ষেতমজুরে পরিণত হইয়া কাজের অভাবে চরম সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। ইহাদিগকে সমাজ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সরকারপক্ষ হইতে কোন চেষ্টাই হয় নাই।

ইহার পর সংবাদদাতা অতি গুরুতর অভিযোগ করিয়া জানাইতেছেন যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ফুড কমিটিগুলি বাতিল করিয়া সরকার পুরানো দুর্নীতিপরায়ণ ফুড কমিটিগুলিকে চালু রাখিতেছেন। চোরা কারবারীদের সাজা দিবার ব্যবস্থাও ক্রমশঃই চাপা পড়িয়া যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া উচিত।

মেদিনীপুর বিভাগের পরিকল্পনা

মেদিনীপুর জেলাকে ভাঙিয়া দুই ভাগ করিবার জন্ত বাংলা-সরকার গোপনে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের এই কার্যে বাধাদানের জন্য মেদিনীপুর বিভাগ বিরোধী কমিটি নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। উহার অধিনায়ক শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিটির কতকাংশ এই:

"অনেকেই সম্ভবতঃ জানেন না যে মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করার এক পরিকল্পনা এত গোপনে করা হইয়াছে যে, মেদিনীপুরেরই খুব কম লোক এ বিষয় অবগত আছেন। কিন্তু ইহা একটি সত্য ঘটনা। অনেকে বলেন, আগামী বৎসরের পূর্বেই এ পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা হইবে।

"এই বিষয়ে মেদিনীপুরের লোকদের কোন মতামত গ্রহণ করা হয় নাই অথচ এই পরিকল্পনার ফল তাহাদেরই ভোগ করিতে হইবে। এমন কি তাহাদের প্রতিনিধিদেরও এই বিষয়ে কিছু জানান হয় নাই।"

সরকারের এই কার্য অতিশয় আপত্তিজনক। রোলাণ্ড কমিটি বাংলার বড় জেলাগুলিকে ভাঙিয়া ছোট করিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। বাংলা-সরকার উহারই উপর নির্ভর করিয়া অত্যন্ত অশোভন ব্যস্ততার সহিত উহা কার্যে পরিণত করিতে চলিয়াছেন ইহা দুঃখের বিষয়। রোলাণ্ড কমিটি যে-সব সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মনঃপূত হইয়াছে কতকগুলি হয় নাই। যে-সব ক্ষেত্রে কমিটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন সেগুলি অতি তৎপরতার সহিত কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। জেলাগুলিকে ভাঙিয়া ছোট করিলে নূতন কতকগুলি সিভিলিয়ান নিয়োগের পথ ত হইবেই, তাহা ছাড়া জেলার দূরতম অঞ্চলেও সরকারের ক্ষমতা বিস্তারের সুবিধা হইবে। মন্ত্রীদের ক্ষমতা কমাইয়া সিভিলিয়ান কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির যে-সব পরামর্শ কমিটি দিয়াছেন তাহাও অতি দ্রুত পালন করা হইতেছে। শুধু সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ, দুর্নীতি ও জনসাধারণের সহিত অসদ্ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্ত কমিটি যে-সব কথা বলিয়াছেন সেগুলি পালনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে না।

নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনের পর বাংলায় নূতন গবর্মেণ্ট গঠিত হইবে এবং উহা জাতীয়তাবাদী গবর্মেণ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। নবগঠিত ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মতিক্রমে দেশবাসীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নূতন গবর্মেণ্ট মেদিনীপুর বিভাগের আদেশ দিলে দেশবাসীর বলিবার কিছু থাকিবে না, কিন্তু ইহার পূর্বে ইংরেজ সিভিলিয়ানমণ্ডলী কর্তৃক দেশবাসীর মতের বিরুদ্ধে এই কার্য সাধিত হইলে দেশ তাহা সহ্য করিবে না ইহা বলাই বাহুল্য।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডার

৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে আজাদ হিন্দ ফৌজ সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে এক জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন এবং সর্দার বল্লভভাই পটেল ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা করেন। সভায় যে জনসমাবেশ হইয়াছিল তাহা অতুলনীয়। ইতিপূর্বে কলিকাতার কোন সভাতেই এরূপ জনসমাবেশ হয় নাই। সর্দার বল্লভভাই বলিয়াছেন তিনি জীবনে কখনও এত বৃহৎ জনসমাবেশ দেখেন নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের বিচারে সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বহু স্থানে এই বিক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ, পেথিক-লরেন্স, ওয়াভেল এবং অকিনলেক কেহই এই বিচার চাহেন নাই, সিভিলিয়ান কর্মচারীদের চাপে পড়িয়া তাঁহারা ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। যদি তাই হয় তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের বিচারের ব্যবস্থা হইল কেন?

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে ভারতের বিশিষ্ট নেতারা বক্তৃতা করিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তাঁহারা অন্তরের অবিমিশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। ইহার পরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, তাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ সহ্য করিবেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে কংগ্রেস তাহার আদর্শচ্যুত হইয়া সুভাষচন্দ্র-প্রদর্শিত বিপ্লববাদের পথ অনুসরণ করিতে চলিয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কলিকাতা অধিবেশনে এই ভুল ধারণা দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের বিচারে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের আয়োজন বা ফৌজের সৈন্যদলকে সাহায্য দান করিতে গিয়া কংগ্রেস আদর্শ-বিরোধী কোন কাজ করে নাই। সুভাষচন্দ্রের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বদেশপ্রেম, একতা এবং শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেশবাসী আপন অন্তরে গ্রহণ করিতে চায়। দেশের স্বাধীনতা-লাভের জন্ত কংগ্রেস যে পথ নির্দেশ করিবে দেশবাসী সেই পথেই অগ্রসর হইবে। সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ এই প্রেরণাকে আরও দীপ্ত করিয়া তুলিবে।

পরলোকে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে ভারতবর্ষের নারী-আন্দোলনের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে

পূরণ হইবার নহে। কলিকাতার ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম শহীদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দিতে যাইবার সময় পথে এক মিলিটারী লরীর সহিত সংঘর্ষে তিনি সাংঘাতিক আহত হন ; হাসপাতালে এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেশের কাজে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশসেবা শুধু বাংলার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এমন কি সিংহল হইতেও যখনই আহ্বান আসিয়াছে তখনই তিনি তাহাতে সাড়া দিয়াছেন। নারীশিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে তাঁহার দান অতুলনীয়। ভারত ও সিংহলের বহু নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। অথচ দেশের ডাক আসিবামাত্র তিনি সব ছাড়িয়া আসিয়া কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। সিংহলের বৌদ্ধ ছাত্রী কলেজের অধ্যক্ষ রূপে তিনি যখন কাজ করিয়াছেন সেই সময়ে তথাকার জাতীয় আন্দোলনেরও তিনি প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। সিংহলের জাতীয় আন্দোলন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট বহুলাংশে ঋণী। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্কল্প গ্রহণের জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইলে তিনি সিংহলের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহারই নেতৃত্বে সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের অধীনে নারী স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী গঠিত হয়। তাঁহার অপূর্ব সংগঠনী প্রতিভা ও ক্ষমতা দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। বিপদের মুখে তাঁহার অচঞ্চল দৃঢ়তার জন্য কলিকাতার বহু সংবাদপত্র তাঁহাকে দেবীচৌধুরাণী আখ্যায় ভূষিত করে।

কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি লালা লজপত রায় তাঁহার সংগঠনী ক্ষমতায় এত মুগ্ধ হন যে তাঁহাকে জলন্ধর কন্যামহাবিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এই বিদ্যালয়টিকে তিনি গড়িয়া তুলেন। কটকের রাভেনশ ছাত্রী কলেজে তিনি বহুদিন কাজ করেন।

১৯৩০ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে তিনি তখন সিংহলে। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় বার সিংহল গমন। এবারও তিনি দেশের ডাক উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আন্দোলনে যোগ দিলেন। দেশবন্ধুর ভগ্নী উর্ম্মিলা দেবীর সহিত একযোগে তিনি নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গড়িয়া তুলিয়া আইন অমান্যের জন্য দলে দলে স্বেচ্ছাসেবিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে অনুষ্ঠান হয় তিনি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে সুভাষচন্দ্র বসু শোভাযাত্রা সহকারে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য ময়দানে আসিলে অশ্বারোহী পুলিস সার্জ্জেণ্টরা তাঁহাকে [illegible]য়া ফেলে এবং সুভাষচন্দ্রের মস্তকে বেটনের দ্বারা দারুন ভাবে প্রহার করিতে থাকে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সংবাদ পাইয়া মাঠের অপর স্থান হইতে ছুটিয়া আসেন এবং আরও কয়েকজন নারীকর্ম্মীর সঙ্গে অশ্বারোহী পুলিসবাহিনী ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সুভাষচন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আঘাত হইতে রক্ষা করেন। প্রতি আন্দোলনেই দেখা গিয়াছে বিপদ যেখানে সবচেয়ে বেশী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া সেখানেই ছুটিয়াছেন।

কলিকাতার ছাত্রদের উপর ২১শে নবেম্বর সন্ধ্যার পর যখন গুলিবর্ষণ চলিতে থাকে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তখন সেখানে উপস্থিত। সারা রাত্রি জননীর স্নেহে তিনি ছাত্রদের ঘিরিয়া রাখিয়াছেন, বিপদের মুখে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম লইতেও তিনি যান নাই। পর দিন পুলিসের গুলিতে নিহত একটি ছাত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনিও নিহত হন। এই মহীয়সী নারীর উদ্দীপনাময়ী বাণী দেশবাসী আর শুনিবে না, কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রেম, কর্ম-নিষ্ঠা এবং অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ভারতবাসী চিরকাল শ্রদ্ধানত চিত্তে স্মরণ করিবে।

পরলোকে কালীনাথ রায়

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকগণের অন্যতম লাহোরের দৈনিক ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সব বাঙালী তাঁহাদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার গুণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের আসন অতি উচ্চে। তাঁহার দক্ষতায় সাংবাদিকদের মর্য্যাদা বহু ঊর্দ্ধে স্থান লাভ করিয়াছে এবং বাংলার বাহিরে বাঙালী সাংবাদিকের সম্মান অনেক বাড়িয়াছে।

ছাত্রাবস্থাতেই শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের সাংবাদিক প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। সর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করেন এবং লাহোরের 'পাঞ্জাবী' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চার বৎসর উহাতে কাজ করিবার পর তিনি লাহোরের বিখ্যাত দৈনিক 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। নির্ভীক সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য তিনি দেশবাসীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা অর্জন করেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই নির্ভীকতা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি 'ট্রিবিউনে' যে তীব্র মন্তব্য করেন তাহার জন্য তিনি দণ্ডিত হন। লাহোরের 'ট্রিবিউন'কে তিনি আজীবন সাধনার দ্বারা ভারতের একটি বিশিষ্ট শক্তিশালী সংবাদপত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্বে তিনি 'ট্রিবিউন' হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু উহার ট্রাষ্টীগণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে পত্রিকাটির ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া পুনরায় তাঁহাকে 'ট্রিবিউনে'র দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি পুনরায় লাহোর গিয়াছিলেন। লাহোরের শীত সহ্য হইবে না বলিয়া শীতকালটা দেশে কাটাইবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বহু দিন যাবৎ হাঁপানি রোগে ভুগিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং উহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

বৈদিক আর্যগণ কি সেমিটিক ?

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

একদল পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন যে, বৈদিক আর্যগণের কৃষ্টির মূলে কতকটা সেমিটিক প্রভাব রহিয়াছে। কেহ কেহ আবার বৈদিক আর্য কৃষ্টির উপর সেমিটিক প্রভাবের কথায় জোর না দিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, বৈদিক আর্য জাতির মধ্যে সেমিটিক রক্তের মিশ্রণ রহিয়াছে। এই মতবাদের উৎসাহী সমর্থক আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে দেখা যায়। এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, কোন মতবাদ যদি বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা আমরা বরণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও গ্রহণ করিতে বাধ্য। উপরের এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি প্রকারের, এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইবে।

গোড়ায় বলিয়া রাখা দরকার যে, বৈদিক আর্য জাতি বলিতে কাহাদের বুঝায়, ঋগ্বেদে আর্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে ও আর্য পদের যে সকল প্রয়োগ দেখা যায় তাহা বিচার করিলে ঋষিকুল ও যজমান গোষ্ঠি উভয়কেই আর্য জাতীয় বলা চলে কি না—এ সকল আলোচনা এ প্রবন্ধের এলাকায় পড়ে না। এই আলোচনা স্থগিত রাখিয়া বর্ত্তমানে এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদে দাস ও দস্যু বলিয়া বর্ণিত "অনার্য" শত্রুগণ ছাড়া আর সকলেই, ঋষিকুল ও যজমান গোষ্ঠিসমূহ, উভয়েই আর্য বটেন। ইহাই প্রচলিত মতবাদ।

যাঁহারা বৈদিক আর্যগণের উপর সেমিটিক প্রভাব আছে স্বীকার করেন তাঁহাদের মতবাদকে দুই অংশে ভাগ করা চলে: সেমিটিক রক্তের মিশ্রণ ও সেমিটিক কৃষ্টির প্রভাব। সেমিটিক রক্তের মিশ্রণের কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মত এই যে, সেমিটিক রক্তের মিশ্রণের ফলে দেখা যায় যে শ্বেতকায়, বাদামি কেশ ও নীল চক্ষু আর্যগণের মধ্যে শ্যামবর্ণের আর্যগোষ্ঠিসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। আর্যগণের সহিত সেমিটিকদিগের এই মিশ্রণ ঘটিয়াছিল সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায়। "The Aryan immigrants from Mesopotemia must have absorbed a good deal of Semitic blood in their Syrian homes and were probably dark like the Semites."—(রমাপ্রসাদ চন্দ, *Indo-Aryan Races.*) অন্য দলের কথা এই যে, সেমিটিক প্রভাবের ফলে দেখা যায় যে বৈদিক কৃষ্টির মধ্যে আসিরীয়-বাবিলোনীয় সভ্যতার ছাপ আসিয়াছে। "আসিরীয়-বাবিলোনীয় জাতির বিরাট্ বিরাট্ ইমারত, এদের (বিশেষতঃ আসিরীয়গণের) শৌর্য্য ও নিষ্ঠুরতা আর্য্যদের অভিভূত করে। আর্য্যদের মধ্যে আসিরীয় রীতি নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যন্ত্র ও গৃহ নির্ম্মাণে দক্ষ, দেবতা বিরোধী অসুর বা দানবের কল্পনাতে, ভারতে আসিবার পরে আর্য্য জাতির মনের মধ্যে নিহিত অসুর জাতির স্মৃতির পরিণতি ঘটে।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—হিন্দু সভ্যতার পত্তন)। বাবিলোনীয় আসিরীয় সভ্যতা সেমিটিক জাতির কীর্তি বলিয়া পরিচিত।

আর্যজাতি রক্তে ও কৃষ্টিতে সেমিটিক জাতির নিকট এই ঋণ গ্রহণ করেন এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ায়, অর্থাৎ ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্বে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ঋগ্বেদের রচয়িতাগণ, ঋগ্বেদের ঋত্বিক ও যজমানগণ পুরাপুরি আর্য নহেন, তাঁহারা *Semtised Aryans*

আর্যজাতির সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক এ প্রশ্নের উত্তর খানিকটা পাওয়া যায়। আর্যভাষা ভাষী ও বৈদিক আর্যদেবতার উপাসক বিভিন্ন মনুষ্য গোষ্ঠি অতি প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয় পরে বলা হইতেছে। আর্যজাতি কোন্ সময়ে মেসোপটেমিয়ায় উপস্থিত হইয়া কি ভাবে সেমিটিক জাতির নিকটে এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

সাইরাস কর্তৃক বাবিলোন বিজয়ের পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কয়েকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও পতন হয়। এই উত্থান-পতনের ইতিহাসে চারটি যুগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগে প্রথম সারগণের অধীনে আক্কাদ প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় যুগে সুমেরগণ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তৃতীয় যুগে বাবিলোন প্রবল হইয়া উঠে। চতুর্থ যুগ আসিরীয় সাম্রাজ্যের যুগ। পণ্ডিতগণের মতে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল সুমের জাতি। তাহাদের নামানুসারে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার নাম হয় সুমের (বাইবেলের Shinar)। সুমের জাতি ও সিন্ধু উপত্যকার তাম্র যুগের প্রাচীন অধিবাসীদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্কের বিষয় অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সে সকল কথা অবান্তর। প্রাচীন সুমের জাতি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচলিত তাহার মধ্যে একটি মত এইরূপ যে মধ্য-এশিয়া হইতে খ্রীঃ পূঃ অনুমান পঞ্চম সহস্রকে সুমের জাতি দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় যখন সুমেরীয় সভ্যতা পুষ্ট হইতেছিল সিরিয়া ও আরবের মরু অঞ্চল হইতে সেমিটিক জাতি বাবিলোনের উত্তরে আক্কাদে উপনিবিষ্ট হইয়া ক্ষমতা বিস্তার করিতে থাকে। আক্কাদীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া ক্রমে সুমের গ্রাস করিয়া লয়। আক্কাদীয় সভ্যতা পুরাপুরি সেমিটিক সভ্যতা নহে, ইহা সুমেরীয় ও সেমিটিক সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। ('The Akkandian culture is usually considered as a mixture of Semitic and an older Sumerian factor.")

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে প্রথম যুগকে সাধারণতঃ আক্কাদীয় বলা হইলেও কেহ কেহ আসিরীয় নাম ব্যবহার করেন। আসিরীয় ইতিহাসকে ইঁহারা প্রাক্‌সেমিটিক ও সেমিটিক এই দুই অংশে ভাগ করেন। আশির ও আক্কাদ টাইগ্রিসের দক্ষিণ ও উত্তর তীরে অবস্থিত নগর। আক্কাদীয়

শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সুমেরীয়গণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। সুমের, আক্কাদ্ এলাম, সুবর্ত্ত ও আমুরু (Cappadocia) এই নূতন সুমেরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তারপর উত্তর বাবিলোনের সেমিটিকগণ নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাবিলোনের প্রথম রাজবংশ (First Dynasty) প্রতিষ্ঠিত করিল। এই বংশের হাম্মুরাবির নাম প্রসিদ্ধ। বাবিলোনের এই সেমিটিকগণ সেমিটিকভাষা-ভাষী ছিল, কিন্তু বাবিলোনীয় সভ্যতা প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠে। সুমেরীয় ভাষাকে বাবিলোনের সেমিটিকগণ দেব ভাষা বলিয়া মনে করিত এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

"These Semitic Babylonians ... regarded Sumerian as a sacred language. They kept Sumerian names for Gods and temples and used Sumerian words in a modified form for many things besides those directly connected with religious rites."

ইহার পরে দেখা যায় উত্তর-সিরিয়ার হিটাইট জাতি বাবিলোন আক্রমণ করিয়া হাম্মুরাবির বংশকে রাজ্যচ্যুত করিল খ্রীঃ পূঃ ১৯২৬ অব্দে।

হিটাইটগণ সেমিটিক নহে। তাহাদিগকে আর্মেনীয় টাইপের গোলমুণ্ড (brachycephalic) গোষ্ঠি বলা হয়। সেমিটিকগণ বিশেষতঃ উত্তর আরবের খাঁটি সেমিটিক জাতি লম্বা মুণ্ড গোষ্ঠি (dolichocephalic)। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হেডনের (Haddon) মতে হিটাইটগণ আধুনিক আর্মেনীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ। আর্মেনী জাতি আর্যভাষা-ভাষী। হিটাইটগণের আদি বাসস্থান উত্তর মেসোপটেমিয়া ও তরাস পর্বত অঞ্চলে—এইরূপ অনুমান করা হয়। ক্রমে তাহারা সিরিয়া ও দক্ষিণ জেরুজালেম পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। সিরিয়ার হিটাইটগণ প্রবলপ্রতাপশালী হাম্মুরাবির বংশকে পরাজিত করে খ্রীঃ পূঃ ১৯২৬ অব্দে। দেখা যায় যে ইহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরেও হিটাইট সম্রাট্ খেতাসরের (Khetasar) সঙ্গে মিশরের দ্বিতীয় রামেশিশের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের পরে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাহা El-Karnak-এ খোদিত রহিয়াছে। খেতাসরকে এই সন্ধিপত্রে "the Greak King" বলা হইতেছে। হিটাইটগণ সেমিটিক না হইলেও তাহাদের মধ্যে ক্যাপাডোশিয়ায় সেমিটিক ভাষা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতগণের মত এই যে হিটাইট জাতির শাসকগোষ্ঠি আর্যভাষা-ভাষী ছিলেন। "The Indo-European element is now considered to have been the dominant caste." [*Cambridge Ancient History*]। হিটাইটগণের সামরিক শক্তি যেরূপ প্রবল ছিল তাহাদের সভ্যতাও ছিল সেইরূপ বহু বিস্তৃত। এশিয়া মাইনর, উত্তর সিরিয়া ও সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় এই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

"Peoples who shared in the Hittite civilisation ... most of the peoples of southern, Cappadocia, Phrygia, Lydia and Cilicia, in fact, al the peoples of inner Asia Minor, all the peoples of northern Syria and all Mesopotamian peoples. [*Cambridge Anc. Hist.* 2/252.]

বাবিলোনীয় সভ্যতার প্রভাবের কথা যখন বলা হয় তখন হিটাইট সভ্যতার প্রভাবের কথা মনে রাখিতে হইবে।

হিটাইটগণের আঘাতে বাবিলোনের প্রাচীন সেমিটিক রাজশক্তি ভাঙিয়া পড়ে। তারপর খ্রীঃ পূঃ ১৭৪৬ অব্দে কাসাইট জাতি বাবিলোন অধিকার করিয়া তৃতীয় রাজবংশ (Third Dynasty) প্রতিষ্ঠিত করে। এই বংশ প্রায় ৬০০ বৎসর কাল বাবিলোনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল (১৭৪৬-১১৬৯)। বাবিলোন অধিকার করিবার পূর্ব্বে খ্রীঃ পূঃ ২০৭২ অব্দে তাহারা একবার বাবিলোনে হানা দিয়াছিল। কাসাইট জাতির আদিম বাসভূমি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় বাবিলোন ও মিডিয়ার মধ্যবর্ত্তী পার্বত্য অঞ্চলে পরবর্তীকালে যে কশেই (Cossaei) জাতি বাস করিত কাসাইট ও তাহারা অভিন্ন। কেহ কেহ মনে করেন কাসাইটগণ হিটাইট-গোষ্ঠির জাতি। তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে শাসকগোষ্ঠি সম্ভবত আর্যভাষা-ভাষী ছিল।

আসিরীয়ার প্রথম টিগলাথ পাইলেসর (Tiglath Pileser) খ্রীঃ পূঃ ১১০০ অব্দে বাবিলোন অধিকার করেন। নিনেভে নগরীতে নূতন সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইল। নেবুকড্‌নেজার, সারগন, সেনাচেরিব, এসারহেডন, অশুর-বানি-পাল প্রভৃতি আসিরীয়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্রাটের আমলে আসিরীয় রাজশক্তির প্রতাপ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে বিস্তৃত হয়। মিড ও পারসীকগণের আক্রমণে নিনেভে ধ্বংস হয় খ্রীঃ পূঃ ৬১২ অব্দে। তারপর বাবিলোন আসিরিয়া সাইরাসের পদানত হয়। আসিরিয়ার প্রসঙ্গে মিটানী-জাতির উল্লেখ করা আবশ্যক।

এইরূপ মত প্রকাশ হইয়াছে যে আসিরিয়ার রাজশক্তি স্থাপন করে মিটানীগণ। আসিরিয়ার প্রাচীন রাজাদিগের কয়েক জনের নাম যথা Ushpia, Kikia প্রভৃতি সম্ভবতঃ মিটানী (*Cam. Anc. Hist.* 1/409) ইহাদের পরে সেমিটিক নামের রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, অসুর বা আসিরিয়ার প্রাচীন অধিবাসী অর্থাৎ প্রাক্‌সেমিটিক যুগের মিটানী বা মিটানী-গোষ্ঠীয় ছিল। এইরূপ অনুমান করা হয় যে গ্রীক লেখকদিগের উল্লিখিত Matieni জাতি, যাহারা দক্ষিণ পশ্চিম মিডিয়ায় বাস করিত, তাহারা ও মিটানী জাতি অভিন্ন, মিটানীগণ উত্তর সিরিয়ায় এডেসা ও হারাণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। কাহারও মতে মিটানীগণ হিটাইট জাতির একটি গোষ্ঠি ("Probably racially akin to the Hittites") এবং কাসাইটদিগের সহিত সম্পর্কিত। হেডনের মত এই যে মিটানীগণ সম্ভবত Armenoid (গোলমুণ্ড) এবং তাহারা আর্য জাতি নহে, কিন্তু শাসক গোষ্ঠি, Kharri (খারী), সম্ভবত আর্যগোষ্ঠীয় ছিল। আজারবাইজানের পথে তাহারা মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। আসিরীয় ইতিহাসে মিটানীদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য Khani বা Khanigalbat নামে পরিচিত। এই রাজ্য বাবিলোনের হাম্মুরাবির সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ-

ধানীর নাম Washukkani। খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মিটানীগণ এতদূর পরাক্রান্ত হইয়া উঠে যে আসিরিয়া অধিকার করিয়া তাহারা বাবিলোন পর্যন্ত আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করে। আসিরিয়ার রাজধানী অসুর হইতে তাহারা বৃহৎ স্বর্ণনির্মিত তোরণ এবং বাবিলোন হইতে প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি-সমূহ আপনাদের রাজধানীতে লইয়া যায়। মিটানীগণ প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে সুপরিচিত। খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর পরে মিটানীগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক কালের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিক্‌সস-দিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহারা সম্ভবত সিরিয়ায় উপনিবিষ্ট সেমাইট ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। খ্রীষ্ট পূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে তাহারা মিশর অধিকার করে। হিকসসগণ (Hyksos) মিশরে অশ্ব ও অশ্ববাহিত রথের প্রচলন করে এইরূপ বলা হয়। অশ্ব ও অশ্বরথের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, এই দুইটির ব্যবহার আর্যজাতি কর্তৃক প্রচলিত হয় এইরূপ বলা হইয়া থাকে: হিকসসগণের মধ্যে হিটাইট ও আর্যগোষ্ঠির লোক ছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এ. বি. কীথের মতে তাহাদের মধ্যে "there may have been Aryan rulers"

মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তিনটি জাতির—হিটাইট, কাসাইস ও মিটানীদিগের—উপরে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস মনে রাখা প্রয়োজন। আর্যজাতির সেমিটিক ঋণ সম্পর্কে আলোচনায় ইহাদের কথাই উল্লেখ করিতে হইবে।

বৈদিক আর্যগণের সেমিটিক ঋণ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহার মূলে আছে প্রধানতঃ দুইটি প্রসিদ্ধ আবিষ্কার—Tell-el-Amarna ও Boghaz Keui Tablets। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর মিশরের Tell-el Amarna নামক স্থানে কতকগুলি মাটির লেখন (tablets) পাওয়া যায়। অধিকাংশ লেখন-'cuneiform' অক্ষরে বাবিলোনীয় ভাষায় লিখিত পত্র। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের রাজা মিশরের রাজাকে এই পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন। বাবিলোন, আসিরিয়া ও মিটানী হইতে লিখিত কতকগুলি পত্রও ইহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। Pteria জেলার Boghaz Keui নামক স্থানে অনুরূপ লেখন পাওয়া গিয়াছে, এইগুলি মিটানী হইতে হিটাইট রাজাদিগের নিকট পত্র। এই সকল লেখনে কতগুলি ব্যক্তি ও স্থানের নাম, সংখ্যাবাচক শব্দও দেবতাদিগের নাম ও অন্যান্য শব্দ পাওয়া গিয়াছে যাহার সহিত প্রাচীন ইরাণী ভাষা ও বৈদিক সংস্কৃতের সাদৃশ্য আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Mironov কাসাইট, মিটানী, হিক্‌সস ও হিটাইট লেখন হইতে এই জাতীয় "আর্য" ভাষার শব্দগুলি সঙ্কলন করিয়া তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

মিটানীদিগের লেখন (Boghaz Keui tablets) হইতে জানিতে পারা যায় যে মিটানী-রাজারা অন্যান্য দেবদেবীসহ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্যের উপাসনা করিতেন, অন্ততঃপক্ষে এই সকল বৈদিক দেবতাদিগের নাম তাঁহাদের পরিচিত ছিল। কাসাইটগণের দেবতাদিগের মধ্যে সূর্য্য (Surias) ও মরুতের (Marutas) নাম পাওয়া যায়। লোকের নামের মধ্যে কাসাইট লেখনের Abirattasকে বৈদিক সংস্কৃতের অভিরথে, Suzigasকে সুজিগে, হিক্‌সস্‌দিগের Apakhnanকে সংস্কৃত অপঘ্নে, Amrita khadaকে অমৃতঘটে, Sutekh (দেবতা)কে সুতেজসে, Amarna লেখনের Artamanyaকে ঋতমন্যে, Arzauriaকে আর্জবে বা ঋজুতে, Biriamazaকে বীর্যবাজে, Biridaswaকে বৃহদশ্বে, Dasraকে দস্রুতে, Indarutaকে ইন্দ্রোতে, Rusamanyaকে রুচিমন্ততে, Satiyjaকে সত্যে, Subanduকে সুবন্ধুতে, Sumittaকে সুমিত্র বা সুমেধে, Suwardaকে স্বর্দাতে, Turbaznকে তুর্বসু বা তুর্বশে, মিটানী লেখনের Artasumaruকে ঋতাস্মরে, Artatamaকে ঋত-ধামনে, Saussatarকে সৌক্ষত্রে রূপান্তরিত করা যায় Mironov এইরূপ দেখাইয়াছেন। Boghaz Keui লেখনের aika, tera, hanza, satta, nava ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য স্পষ্ট (A. B. Keith, *Aryan Names in Eary Asiatic Records*)। ভাষাতাত্ত্বিক এই সকল প্রমাণ এবং ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক আর্যগণের উপাস্য দেবতার নাম হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় এককালে আর্যজাতি বাস করিতেন। এই সিদ্ধান্ত হইতে এ কথা বলে যাইতে পারে যে,যাহাদের লেখন হইতে এই সকল ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহারা, অর্থাৎ হিটাইট, কাসাইট, মিটানী ও সম্ভবত হিক্‌সস আর্যজাতীয় ছিলেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রচলিত মত এই যে সম্ভবতঃ এই সকল জাতির শাসকগোষ্ঠি আর্য ছিলেন, অপর সাধারণ আর্য জাতীয় নহে। সাধারণের ব্যবহৃত কথা আর্য ভাষার নহে—ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

এখন প্রশ্ন উঠিবে বৈদিক আর্যগণের সঙ্গে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার এই সকল আর্যগোষ্ঠীয়দের সম্বন্ধ কি ভাবে নির্ণয় করা হইয়াছে।

এ প্রশ্নের আলোচনা করিবার আগে জানা প্রয়োজন সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার এই আর্যগোষ্ঠীয়গণ কোথা হইতে ও কোন সময়ে এই সকল অঞ্চলে আসিয়াছিলেন।

ভাষাতাত্ত্বিক ও অন্য প্রকার প্রমাণের সাহায্যে এই মত দাঁড় করান হইয়াছে যে উল্লিখিত আর্যগোষ্ঠীর জাতিগুলি ককেসাস পর্বত অঞ্চল হইতে দক্ষিণ বরাবর এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করেন। আর্যজাতির আদিম বাসভূমি দক্ষিণ রুশিয়ার ভলগা ও নীপার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অথবা উরাল পর্বতের পূর্বে ও দক্ষিণে উত্তর কিরঘিজ অঞ্চলে। এই অঞ্চল হইতে কতকগুলি দল পশ্চিমে পোলণ্ড অভিমুখে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট দলগুলির মধ্যে কতকগুলি ককেসাস অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে আরম্ভ করে। ইহারাই Kretschmer-এর মতে ইন্দো-ইরাণীয়ান। কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহারা, অন্ততঃ হিটাইটগণ, ককেসাস অতিক্রম না করিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়া যায় ও উত্তর গ্রীস হইয়া কৃষ্ণ সাগরের তীর ধরিয়া এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। হিটাইট জাতি যে এতটা পথ ঘুরিয়া এশিয়া মাইনরে প্রবেশ

করিয়াছিল তাহা অনুমান করিবার কারণ এই যে ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে হিটাইটগণের ভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার সহিত বেশী ঘনিষ্ঠ এবং তাহাদের লেখন হইতে গ্রীসের সহিত যে তাহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল তাহা প্রকাশ পায়। Meyers-এর মতে হিটাইটগণ অনুমান খ্রীষ্ট জন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্বে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। কীথ এই মত প্রকাশ করেন যে মিটানী প্রভৃতি অন্যান্য আর্যগোষ্ঠীয় জাতিগুলিকে পুরাপুরি 'এসিয়াটিক' জাতি বলিয়া ধরিতে হইবে ("whose provenance was Asiatic.")

হিটাইটগণের লেখনের সময় মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-১২০০ সনে করা হয়। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ১৯২৬ অব্দে তাহারা হাম্মুরাবির বংশকে পরাজিত করে। কাসাইটগণের লেখনের সময় খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০-১১৭০, হিক্‌সসগণের খ্রীঃ পূঃ ১৮০০-১৬০০ ও মিটানীগণের খ্রীঃ পূঃ ১৪১০-১২৮০ অনুমান করা হইয়াছে। অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট এই সকল আর্যগোষ্ঠীয় জাতি প্রায় ৬০০ বৎসর কাল এই সকল অঞ্চলে বাস করিবার পরেও (যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহারা সম্ভবতঃ এক সময়েই ককেসাস অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইয়াছিল) এমন কতকগুলি প্রমাণ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয় যাহা হইতে তাহাদিগকে আর্যগোষ্ঠীয় বলিয়া চিনিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছে। অবশেষে এই সকল আর্য গোষ্ঠী সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত মিশিয়া গিয়া ইতিহাস হইতে লুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের উপাস্য দেবদেবী সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা হইতে দেখা যায় প্রত্যেক জাতির নিজস্ব দেবদেবী ছিল এবং মিটানী লেখনে উল্লিখিত মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য এবং কাসাইটদিগের Surias ও Marutas ব্যতীত বৈদিক আর্যদিগের উপাস্য দেবদেবীর সহিত এই সকল দেবদেবীর কোন সাদৃশ্য নাই এইরূপ বলা হয়।

বৈদিক আর্যদিগের সহিত এই সকল আর্যগোষ্ঠির সম্পর্ক কিরূপ সে সম্বন্ধে দুই প্রকারের মত প্রচারিত হইয়াছে দেখা যায়।

প্রথম মত এই যে এই সকল আর্য গোষ্ঠি প্রাক্-বৈদিক আমলের আর্য। "এরা যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষা হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাচীন ইরানীর, এই দু'য়ের জননী।—এদের যে ধর্ম্ম ছিল আর যে সব দেবতা এরা পূজা করত, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে এদের ধর্ম্ম ও দেবতালোকই ভারতে গিয়ে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক দেবতালোকে পরিণত হয়।—এরা বেদ-পূর্ব্ব আর্য্য; ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্মের পত্তন এদের মধ্যে, আর এদের অন্য অন্য যে সব গোত্র পূর্ব্বে পারস্যের দিকে এল তাদের মধ্যে ঘটতে থাকে।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সভ্যতার পত্তন)। যাঁহার রচনা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাঁহার ব্যাখ্যা মতে এই সকল আর্যদের নিজেদের দেবতা সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্র খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ কি ১৫০০তে মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে রচিত হয় তাহারই কিছু কিছু ভারতবর্ষে পৌঁছে এবং খ্রীঃ পূঃ ১০০০ ৯০০র দিকে বেদসংহিতায় গৃহীত হয়।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ায় এই সকল আর্যের ভাষা প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-ইরাণীয়, ইহার অর্থ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে, অর্থাৎ যখন হিটাইটগণ এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে (Meyers এর মতে) তখন হইতে খ্রীঃ পূঃ ১২০০ পর্যন্ত ইহাদের ভাষা প্রাক্-বৈদিক প্রাক্-ইরানীয় স্তরে থাকিয়া যাইতেছে বা আদি আর্য ভাষা হইতে ঐ স্তরে পৌঁছিতে এতটা সময় লাগিয়াছিল। তারপর ২০০ বৎসর মধ্যে উহা ইরাণীয় ও বৈদিক সংস্কৃতে পরিণত হইয়া গেল। আরও দাঁড়াইতেছে যে, জাতিতে এই সকল আর্য ও ইরাণীয় এবং বৈদিক আর্য এক গোষ্ঠীয় (of one racial stock)। এখানে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে হয় ৬০০ বৎসর মেসোপটেমিয়ায় সেমিটিকগণের মধ্যে বাস করিয়া এই সকল জাতি রক্তে সেমিটিক হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বদিকে চলিয়া আসে তাহারা আর্য ব'লয়া বর্ণিত সেমাইট মাত্র অথবা আর্য গোষ্ঠির কতকগুলি দল এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ায় রহিয়া যায় ও কতকগুলি দল সোজা পূর্ব দিকে ইরাণ ও ভারতবর্ষের দিকে চ'লয়া আসে। এই দ্বিতীয় অনুমানের মূল্য কিরূপ পরে দেখা যাইবে। হিটাইট, কাসাইট ও মিটানীদিগের দেবদেবী সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা হইতে তাহাদের ধর্ম ও দেবতালোক বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক দেবতালোকে পরিণত হইয়াছে এ কথা বলা একেবারে অসম্ভব। Boghaz Keui লেখনে Shubbiluliuma ও Mattiuazaর মধ্যে সন্ধিপত্রে (Mitanni version) Mitrassil, Ur (u) vanassil, Indura ও Nashatiannaর নাম ছাড়া তাহাদের ধর্ম ও দেবতালোক সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা হইতে দেখা যায় যে সুমেরীয় বাবিলোনীয় ধর্ম ও দেবতালোক হইতে উহা অভিন্ন নহে। সুমেরীয় বাবিলোনীয় ধর্ম মেসোপটেমিয়া হইতে এশিয়া মাইনরের উপকূল ও ঈজিয়ান দ্বীপসমূহ এবং মিশরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ইহার প্রভাবে আসিয়াছিল। আসিরীয় অভ্যুদয় যুগে ইহা পূর্বে ইরাণ ও পশ্চিমে ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। যে সন্ধিপত্রের উল্লেখ করা হইল তাহাতেই সুমেরীয় বাবিলোনীয় মহাদেবী Ishtarএর নাম মিটানীরাজ অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন। কাসাইট লেখনের উল্লিখিত সূর্য ও মরুতের নাম হইতে তাঁহাদিগকে আর্যদেবতা উপাসক মনে করা হয় কিন্তু যেভাবে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (Sagarakti-Surias, Nazimaruttas) তাহা হইতে কোন কোন পণ্ডিত নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই যে উহা বাস্তবিক বৈদিক আর্য দেবতার নাম কিনা।

ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের বলে পণ্ডিতগণ হিটাইটদিগকে ইন্দো-এরিয়ান বা Eastern Aryans দল হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন। কাসাইটদিগের আর্যত্ব সন্দেহের বিষয় মনে করা হয়। একমাত্র মিটানীদিগের আর্যত্বের প্রমাণ অপেক্ষাকৃত প্রবল। সে যাহা হউক, মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট আর্যজাতিই যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, অর্থাৎ তাহারাই যে বেদ-পূর্ব-আর্য বা Proto-Indian আর্য এই মতবাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। সপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে তাহার মূল কথা এই যে, আর্যদিগের আদি

বাসভূমি হইতে ককেসাস ডিঙাইয়া বা পাশ কাটাইয়া ভারতবর্ষে আসিতে মেসোপটেমিয়ার পথ ও কাস্পিয়ান সাগরের বা মধ্য এশিয়ার পথ আছে। মেসোপটেমিয়ার আর্যভাষা-ভাষীও বৈদিক আর্যদেবতার উপাসক, সুতরাং আর্য গোষ্ঠির জাতির উপস্থিতির প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব সহজেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে আর্য জাতি মেসোপটেমিয়ার পথে আসিয়াছিলেন। তারপর বৈদিক আর্যগণের ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে মেসোপটেমিয়ায় যাইবার প্রমাণ নাই কিন্তু বৈদিক দেবতার উপাসক আর্যভাষা-ভাষী জাতির মেসোপটেমিয়ায় উপস্থিতির ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং বৈদিক আর্যগণ যে মেসোপটেমিয়ায় এই আর্য জাতি হইতে উদ্ভূত ও বৈদিক দেবতার উপাসনা যে মেসোপটেমিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহা সিদ্ধান্ত না করিয়া উপায় কি ?

এই মতবাদের বিপক্ষে যাঁহারা তাঁহাদের যুক্তি কিরূপ দেখা যাউক। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী লিখিতেছেন,

"The Aryans reached Iran directly from the north (Airyana-Vaego) and afterwards persued to divergent paths, one towards the west and the other to the east. The western branch absorbed Proto-Semitic populations (they were on the middle Euphrates in IV mille B. C.). To this branch may be assigned Mitanni, probably related to the hittites, who must have chronologically preceded them." (*Giuffrida Ruggeri.*)

অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভাষা-তত্ত্ববিজ্ঞানীর মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও হিটাইট জাতি হইতে মিটানীদিগকে আলাদা করিয়া দিতে চাহেন যদিও 'racially' উভয়ে একগোষ্ঠীয় ইহা দুই দলেই স্বীকার করিতেছেন। মিটানীদিগের বৈদিক আর্যদেবতার উপাসনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া ইহাকে বলিতে হইতেছে যে,

"The Aryan religion had been elaborated far in the north ; from the north it had been carried into the south of Asia by migratory waves."

পণ্ডিত Stein Konow এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ঋগ্বেদসংহিতার অধিকাংশ ভাগের রচনা সমাপ্ত হইবার পরে ইন্দো-এরিয়ান সভ্যতা মেসোপটেমিয়ায় প্রবিষ্ট হয়, এবং ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশগুলি যে মিটানী সন্ধিপত্রে বৈদিক দেবতাদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। (*The Aryan Gods of the Mitanni People.*) Bogha Keui-এর মিটানী লেখন, বিশেষ করিয়া অশ্ব সম্বন্ধে আলোচনার যে অংশে aika, satta, panza, nava প্রভৃতি যে সকল সংখ্যাবাচক শব্দের উল্লেখ আছে তাহার আলোচনা করিয়া কীথ মত প্রকাশ করিতেছেন, "they strengthen the view that *Indian speech proper* may have existed in the lands in question!" 'Indian speech proper' বলিতে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইরাণীয় হইতে যাহা পৃথক রূপ পাইয়াছে সেইরূপ বৈদিক ভাষা বুঝেন। কীথ একটি নূতন প্রশ্ন তুলিয়াছেন ; তিনি বলেন যে মিটানী লেখনে যে সকল আর্যদেবতার নাম পাওয়া যায় তাহারা যে ভারতীয় বৈদিক দেবতা ('Indian gods') এবং আর্য জাতির কোন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠির দেবতা নহে তাহা কি করিয়া প্রমাণ করা সম্ভব ? এই যুক্তিকে কূটতর্ক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। তিনি মিটানী প্রভৃতিকে বিচ্ছিন্ন আর্যগোষ্ঠির উপনিবেশ বলিয়া মনে করেন এবং মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট আর্যজাতি যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহা মনে করেন না। ইহার কারণ, আর্যজাতি দক্ষিণ রুশিয়া বা কিরগিজ অঞ্চল হইতে মধ্য এশিয়ার পথে (Jaxartas ও Oxus হইয়া) ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এই মত তিনি পোষণ করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যদিও মিটানী সন্ধিপত্রের বয়স খৃঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দীর বেশী নয় তথাপি আর্যজাতি ভারতবর্ষ বা ইরাণ হইতে উত্তর-মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিলেও করিয়া থাকিতে পারেন দুই এক জন ছাড়া এরূপ কল্পনা কেহ করেন না। এক জনের মত উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাহা হইলে মেসোপটেমিয়ায় আর্যজাতির উপস্থিতি ও বৈদিক আর্যদিগের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যাইতেছে ; আর্যজাতি আদি বাসভূমি হইতে মেসোপটেমিয়া হইয়া ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ; আর্যজাতি মধ্য-এশিয়ার পথে ইরাণে পৌঁছিলে তাঁহাদের কয়েকটি দল পশ্চিম মুখে মেসোপটেমিয়ার দিকে চলিয়া যান। মেসোপটেমিয়ার আর্যগোষ্ঠিগুলি আর্যজাতির বিচ্ছিন্ন উপনিবেশ মাত্র।

এখন মেসোপটেমিয়া হইতে আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন যাহারা এই মতের সমর্থক তাঁহাদের মতে আর্যগণ কোন্ পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন দেখা যাউক।

এ সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। একটি মত এই যে, মেসোপটেমিয়া হইতে আর্যজাতি স্থলপথে ইরাণ হইয়া বেলুচিস্থানের সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করেন। Kretschmer এই মতের একজন সমর্থক। মিটানীদিগের মধ্যে যে আর্যগোষ্ঠির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই আর্যগোষ্ঠির লোক ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এই মত মানিয়া লইলে আর্যগণের ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় যতটা আধুনিক দাঁড়ায় (খ্রীঃ পূ ১১শ হইতে ১০ম শতাব্দী) উহা ততটা আধুনিক বলিয়া অনেকে মানিয়া লইতে রাজি নহেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যাঁহারা আর্যগণের ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় খ্রীঃ পূঃ ১০০০-৯০০ বলিয়া মনে করেন তাঁহারা এই মত প্রচার করিয়া থাকেন যে ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্র মেসোপটেমিয়া ও ইরাণে রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যে কারণেই হউক ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা তাঁহারা সমীচীন মনে করেন না। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে এই প্রাচীনত্বের সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ দাঁড় করান হয় না, খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দীর মিটানী সন্ধিপত্র ছাড়া। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশগুলিও যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে রচিত হইয়াছিল ইহার

পরিষ্কার প্রমাণ—Hillebrandt-এর অনুমান অপেক্ষা যুক্তি-সহ প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মতানুসারে মেসোপটেমিয়া হইতে আর্যগণ সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সমুদ্রপথ মানে আরব সাগর। এই মতের সমর্থকদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী রমাপ্রসাদ চন্দের নাম করিতে হয়।

এখানে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া হইতে স্থলপথে ইরাণের মধ্য দিয়া আর্যগণ সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, এবং মধ্য এশিয়ার পথে সুচাদা ও বাল্‌খ হইয়া আর্যগণ সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হইয়াছিলেন যাঁহারা বলেন তাঁহারাও বৈদিক আর্যগণকে এক গোষ্ঠির (Racial stock) লোক বলিয়া মনে করেন, বৈদিক আর্যগণ যে মিশ্র টাইপের ছিলেন বা তাঁহাদের মিশ্র টাইপের হওয়া সম্ভব এরূপ কথা বলা হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী অবশ্য বলিয়াছেন যে ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় আর্যগণের সঙ্গে শ্যাম বা কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় ও অন্যান্য গোষ্ঠির সহিত রক্তের মিশ্রণ হইয়াছিল। এই অনুমানের মূল্য যাহাই হউক আর্যজাতির মধ্যে যে একাধিক টাইপের গোষ্ঠি থাকা সম্ভব এরূপ কথা তিনি বলেন না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে দুই শত বৎসর সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় সেমিটিক-দিগের মধ্যে বাস করিবার পরে যে আর্যজাতি প্রথমে ইরাণ ও তারপর ভারতবর্ষে আসেন বলিয়া মনে করা হয় জাতি (race) হিসাবে তাঁহাদের পক্ষে আর্য থাকা (যদি আর্য বলিতে 'race' বুঝায়) কতখানি সম্ভবপর, মিটানী প্রভৃতিকে যাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে বেদপূর্ব আর্য বলিয়া দাবি করেন তাঁহারা সে কথা বিবেচনা করেন নাই।

এই সমস্যা রমাপ্রসাদ চন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং তিনি ইহার একটি মীমাংসা খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া হইতে যে সকল আর্য সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসেন তাঁহারা হইলেন ঋগ্বেদের যজমান গোষ্ঠি। সেমিটিক রক্তের মিশ্রণের ফলে ইঁহারা সেমিটিকদিগের মত শ্যামবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। শ্বেতকায়, উজ্জ্বল কেশ, নীল চক্ষু আর্য ছিলেন ঋষিকুল। উত্তর পশ্চিম কিরঘিজ অঞ্চল হইতে মধ্য এশিয়ার পথে তাঁহারা অনেক আগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বৈদিক আর্যগণের মধ্যে এই দুইটি racial type-এর লোক ছিল—খাঁটি আর্য ও মিশ্র আর্য। বৈদিক ধর্মের বিকাশ হয় ঋষি কুলের মধ্যে। যজমান গোষ্ঠিগুলি যখন পরে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন তাঁহারা ঋষিকুলগুলির নিকট এই ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। যজমান গোষ্ঠিগুলির মধ্যে যে শ্যামবর্ণের গোষ্ঠি ছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদের সঙ্গে যে ভাবেই হউক এই মতবাদের একটা সামঞ্জস্য সাধন করা যায়।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট আর্যগণ যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লইলেও বৈদিক ধর্মের উৎপত্তি যে মেসোপটেমিয়ায় হইয়াছিল এই মত অগ্রাহ্য করা হইতেছে। অর্থাৎ মিটানীদিগের মধ্যে আর্য-গোষ্ঠির লোক ছিল বটে, কিন্তু এই আর্যগোষ্ঠি বেদ-পূর্ব-আর্য নহেন, ইঁহাদের ধর্ম ও দেবতালোক ভারতবর্ষে আসিয়া বৈদিক ধর্ম ও দেবতালোকে পরিণত হয় নাই। কিন্তু মিটানী সন্ধিপত্রে উল্লিখিত ইন্দ্র,বরুণাদি দেবতাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে চন্দ মহাশয় তাহার কোন ইঙ্গিত করেন নাই।

তাঁহার মত এইরূপ যে মেসোপটেমিয়া হইতে যে সকল আর্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ঋগ্বেদের যজমানগোষ্ঠি।

"With peoples of Aryan speech worshipping Indra, Varuna and Nasatyas in upper Mesopotemia in the fifteenth century B. C, it is not inconceivable that some among them should have found their way to Kathiwar through Eridu which had an immemorial coasting trade with India."

তারপর অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যে সম্পর্ক ছিল তাহার একটি প্রমাণ হিসাবে নাগপুর সেণ্ট্রাল মিউজিয়ামে রক্ষিত খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের একটি বাবিলোনীয় সিলের উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ মহাশয়ের এই পুস্তক (*Indo-Aryan Races*, ১৯১৬) লিখিবার পরে এই জাতীয় আরও প্রমাণ সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকলের আবিষ্কারের দ্বারা তাঁহার বক্তব্য কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় না। সিন্ধু উপত্যকায় মোহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পা আবিষ্কৃত প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে সংযোগের এই সকল প্রমাণের বলে ডক্টর হার্টন ও অন্যান্য পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার বাহকগণ মেসোপটেমিয়া হইতে আরব সাগর ডিঙ্গাইয়া সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, চন্দ মহাশয় আরও অগ্রসর হইয়া এই আর্যভাষা-ভাষী জাতি-সমূহকে (Peoples of Aryan speech) ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠি-গুলির হইতে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি মনে করেন মেসোপটেমিয়া হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা রক্তে অনেকখানি সেমিটিক হইয়া গিয়াছিল। এই সেমিটিকৃত আর্য-গোষ্ঠিগুলির নাম পুরু, অনু, দ্রুহ্য, যদু, তুর্বশ। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে এই সকল ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠিরক্তে সেমিটিক, আর্য-ভাষা-ভাষী ও আর্যদেবতার উপাসক। আর্যপদের তাহা হইলে কোন ethnic সংজ্ঞা নাই এইরূপ দাঁড়ায়। যাহা হউক চন্দের এই অভিমতের ভিত্তি যদু ও তুর্বশ গোষ্ঠি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে কয়েক-বার সমুদ্রের উল্লেখ। এইটুকু মাত্র প্রমাণ এত বড় একটা মত-বাদের উপযুক্ত ভিত্তি হওয়া উচিত কিনা তাহা বিচারের বিষয়। এ বিচারের স্থান এখানে নাই।

চন্দের এই অভিমতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যেরূপ হউক না কেন দেখা যাইতেছে যে তিনি দুই পক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা মধ্য-এশিয়ার পথে আর্যরা আসিয়াছিলেন বলেন তিনি তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়াছেন এই বলিয়া যে ঋষিকুল, অর্থাৎ প্রকৃত আর্যজাতি, ঐ পথেই আসিয়াছিলেন। যাঁহারা হিটাইট ও কাসাইট লেখনী ও মিটানী

সন্ধিপত্রের প্রমাণের বলে বলেন যে আর্যরা মেসোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়াছেন এই বলিয়া যে ঋগ্বেদের যজমান গোষ্ঠীর আর্যগণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বটে। চন্দের অভিমতের মধ্যে যাহা অন্যান্য পণ্ডিতের অভিমতের মধ্যে নাই, লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই অভিমতের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখা যাইতেছে। ঋগ্বেদের ঋষিকুল ও যজমানগোষ্ঠি যে এক racil stock-এর নহে, এইরূপ একটা অনুমান ঋগ্বেদের মধ্য হইতে তিনি পাইয়াছেন। অবশ্য এই অনুমানকে যে ভাবে তিনি রূপ দিয়াছেন তাহার সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন।

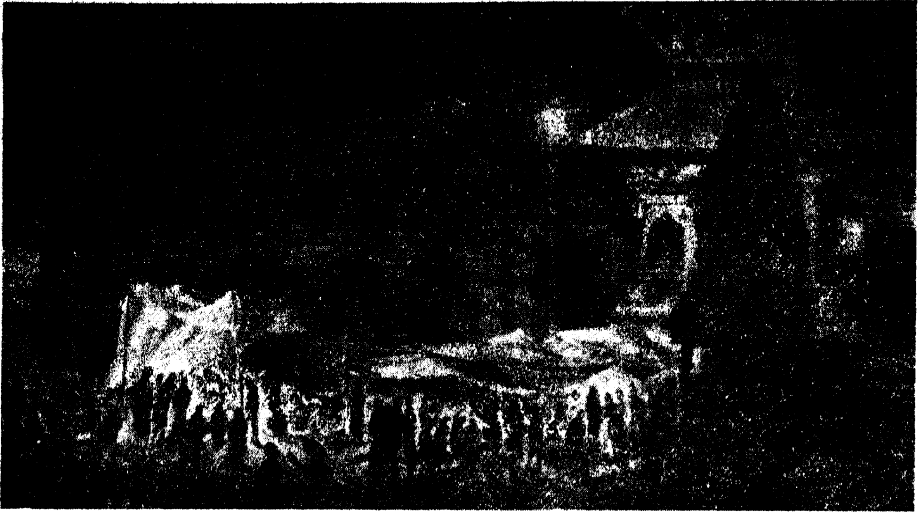
সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এই অভিমতের আলোচনা করা হইল। যাঁহারা এই অভিমত মানিয়া লন তাঁহাদের পক্ষে চন্দ মহাশয় যাহা বলেন, অর্থাৎ এই মেসোপটেমিয়ার আর্যগণ রক্তে সেমিটিক হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা কঠিন যখন দেখা যায় যে বাবিলোনীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় হইতে খ্রী: পূ: ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত অনুমান ৬।৭ শতাব্দী বা তাহারও অধিককাল মিটানীগণ মেসোপটেমিয়ায় ছিল। যদি বলা যায় যে কয়েকটি আর্যগোষ্ঠি মেসোপটেমিয়ার এই সকল অঞ্চলে রহিয়া গিয়াছিলেন ও কয়েকটি গোষ্ঠি অপেক্ষা না করিয়া পূর্বদিকে ইরাণ ও ভারত অভিমুখে চলিয়া আসেন তাহা হইলেও যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আর্য কৃষ্টির উপরে আসিরীয়-বাবিলোনীয় সভ্যতার প্রভাবের কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আসিরীয়-বাবিলোনীয় সভ্যতার কেন্দ্রে দীর্ঘকাল বাস না করিলে এই প্রকার প্রভাব কি ভাবে কার্যকরী হইতে পারে? তারপরে জিজ্ঞাস্য, আসিরীয়-বাবিলোনীয় সভ্যতা কোন্ সময়ে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল প্রথম যুগের আসিরীয় (বা আক্কাদীয়) সভ্যতা সুমের সভ্যতার উত্তরাধিকারী। প্রাক্-সেমিটিক যুগের আসিরীয় রাজ্য পত্তন করে মিটানীগণ এইরূপ বলা হয়। তারপর Agade বা Akkad-এ প্রথম সারগণ রাজ্য স্থাপন করেন। সুমেরীয় শক্তি পুনরায় মাথা তুলে। ইহার পর খ্রী: পূ: ২৩০০ অব্দে বাবিলোনের First Dynasty স্থাপিত হয়। কাসাইটগণ Third Dynasty (তৃতীয় রাজবংশ) স্থাপন করে খ্রী: পূ: ১৭৪৬ অব্দে। খ্রী: পূ: ১১৬৯ অব্দ পর্যন্ত এই বংশের প্রভাব ছিল। ইহার পরে যে আসিরীয় সাম্রাজ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহার অভ্যুদয় হয়। অতঃপর মিটানী কাসাইট প্রভৃতি ইতিহাস হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

যাহাদের কৃষ্টির উপর আসিরীয়-বাবিলোনীয় প্রভাবের ছাপ পড়িয়াছিল সেই সকল আর্যগোষ্ঠি কোন্ সময়ে এশিয়া-মাইনর ও মেসোপটেমিয়া হইতে ইরাণের দিকে চলিয়া আসে মনে করিতে হইবে? যাহাদের জাতভাই বা (যাহারা) ছয় শত বৎসর বা তাহারও বেশী মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার পরে কি কারণে একেবারে ডুবিয়া গেল! যাহারা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস উপত্যকায় প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিল তাহারা ইরাণের মালভূমি ও সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া কি হেতু কেবল ধর্ম-প্রচারকে পরিণত হইল? জেন্দ আবেস্তা ও ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি কি আসিরিয়া বিজেতা ও সেমিটিক Shamash ও Ishtar-এর ভক্ত মিটানী রাজের বংশধর বা জ্ঞাতি ভ্রাতার রচিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে?

বৈদিক আর্যগণের সম্পর্কে সেমিটিকবাদের কোন অংশের যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখা যায় না এবং কোন অংশই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এই মতবাদের মূলে রহিয়াছে—একথা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে—বৈদিক আর্যগণ বাহির হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এইরূপ ধরিয়া লইয়া আর্যভাষা-ভাষী ও কয়েকটি বৈদিক দেবতার উপাসক উত্তর মেসোপটেমিয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিল এইরূপ কয়েকটি জাতির সহিত বৈদিক আর্যগণের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি সহজ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা। যে সকল মতবাদের উপরে সমালোচনা করা হইল সেগুলি অগ্রাহ্য করিলে এই সম্বন্ধে দুইটি ইঙ্গিত করা যায়।

প্রথম ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে মিটানী সন্ধিপত্রে উল্লিখিত এই সকল দেবতা আর্যজাতির জাতীয় দেবতা অর্থাৎ ইঁহারা প্রাক্-ঋগ্বেদীয় আর্য দেবতা। মিটানী সন্ধিপত্রে ইঁহাদের উল্লেখে এইমাত্র প্রমাণ হয় যে মিটানীদিগের মধ্যে সেমিটিক দেবতার সহিত আর্যদেবতার উপাসনাও প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের মধ্যে আর্যগোষ্ঠির সম্প্রদায় ছিল, ঋগ্বেদ বা বৈদিক আর্যগণের সঙ্গে এই আর্যগোষ্ঠির সম্প্রদায়কে যুক্ত করিবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে আর্যগোষ্ঠির লোক ভারতবর্ষ বা ইরাণ হইতে মেসোপটেমিয়া এবং সম্ভবত সিরিয়ায় গিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে এই দুই অভিমতের বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থানাভাব। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে দুইটি অভিমতের সমর্থকদলের মধ্যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আছেন এবং প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহাদের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।



তেহার মেলা [চিত্রকর—লেখক

নেপালের পথে

শ্রীসুনীলকুমার পাল

হিমালয় আমার আজন্মের বিস্ময়। ভারতের পূর্ব্বদিগন্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে জটাভার এলিয়ে বসেছে ধূর্জ্জটি—গগনস্পর্শী সেকি অপরূপ তার মহিমা। গঙ্গোপকূলবর্ত্তী বঙ্গসমতটের সন্তান আমি, হিমালয়ের বিগলিত স্নেহধারায় প্রতিপালিত। একটা আবেগ, একটা স্পর্শ অনুভব করেছি সেই বিরাটের, গিরিরাজ-চরণবিধৌত গঙ্গার অকূল সমুদ্র পানে প্রবাহোচ্ছ্বাসে। বহু-বিচিত্র আখ্যানে, বহুবিচিত্র চিত্রে যে হিমালয়ের আভাসমাত্র পরিচয়ে এতদিন অতৃপ্ত ছিলাম, অকস্মাৎ তাকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ এল। তারপর দেখে এলাম হিমালয়, দেখে এলাম মহাভারতের ধ্যান-মৌন প্রতীক।

শীতের গোধূলি। রাক্সৌলে ট্রেন এসে লাগল। নামবার খানিক আগে হতেই আমার চোখে পড়ল, যেন উত্তর দিগ্‌বলয় পরিব্যাপ্ত করে ঘিরে রয়েছে এক অস্ফুট মাধুরী। ওকি হিমালয়! মায়া কিম্বা কায়া বোঝা গেল না, দিনের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে গেল। রাক্সৌল ভারতের উত্তর সীমা। ভৌগোলিক সংস্থানে ভারতের শেষ নেপালের সুরু। অতি সঙ্কীর্ণ একটা নদীকে মাঝে রেখে এই ব্যবধান। নইলে, একই হাওয়া বইছে, একই আলো ঝরছে। ভারতবর্ষের এপার থেকে নেপালের ওপারে পৌঁছে দেখলাম কিছুই বদলায় নি।

রাক্সৌল হতে আমলেখ্‌গঞ্জ এই বিশ-পঁচিশ মাইল পথ নেপাল-সরকারের ছোট রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। পরদিন প্রভাতে ট্রেন ছাড়ল। সমতল পথ, আমাদের চোখে নূতন নয়, কিন্তু এক নীল নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমার সমস্ত কৌতূহল। বহুদূরে ময়ূরকণ্ঠী গিরিশ্রেণী, সম্মুখে তরাইয়ের নীল বনরাজি। ওই বন অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে আমলেখ্‌গঞ্জ। শীতের শুষ্ক প্রান্তর পার হয়ে গাড়ী এল অরণ্যের ছায়ায়। নিমেষে হারিয়ে গেল আমার পৃথিবীর আবাল্য পরিচিত রূপখানি। কোথাও শ্যামলতার এতটুকু আভাস নেই; চারিদিকে অগণিত বৃক্ষকাণ্ড উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে। তাদের রুক্ষ-পিঙ্গল বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত অবরুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ বাহু নিক্ষেপে গগন সমাচ্ছন্ন। কোথাও-বা সূর্য্যরশ্মি পত্রান্তরালে প্রবেশ পথ পেয়েছে, এঁকে দিয়েছে শুষ্ক বিদীর্ণ ধূসর মৃত্তিকায় সুবিশাল শাখা-প্রশাখার কৃষ্ণচ্ছায়া—যেন ধরিত্রীর কঙ্কাল রেখা। বহুক্ষণ পরে, বহু আঁকা-বাঁকা পথে সহসা দেখি ট্রেন এসে থামল এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। ঊর্দ্ধে আকাশ, সম্মুখে হিমালয়ের প্রথম পাদ-পীঠ। এই আমলেখগঞ্জ।

জায়গাটির একটা মোহ আছে। তটভূমি ও সমভূমির সন্ধিস্থলে অবস্থিত এই আমলেখগঞ্জ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমতল। তার দক্ষিণ বাহুর উদার দাক্ষিণ্যে দিগন্ত উন্মুক্ত, উত্তরের হিমশীতল তর্জ্জনী-সঙ্কেতে সে নিরুত্তর। অল্পপরিসর জায়গায় দোকান-পাট বসানো। বিহার ও নেপালের অধি-বাসীদের বেচা-কেনায়, লোকজনের ওঠা-নামায় একটু কল-মুখরিত। নেপাল উপত্যকায় যাবার এই প্রধান প্রবেশ-দ্বার। এখান থেকে মোটর-যানের বাঁধা পথ গিয়ে পৌঁছেছে ভীমফেদি। আর রেল নেই, মোটর চলল।

অল্প পথ সোজা গিয়ে গাড়ী ঘুরতেই এক বাঁকের মুখে লাগল আচম্‌কা নেশা, যেন খাম খুলতেই পেয়ে গেলাম অতি প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত লিপি। সুন্দর যে এত অযাচিত ভাবে



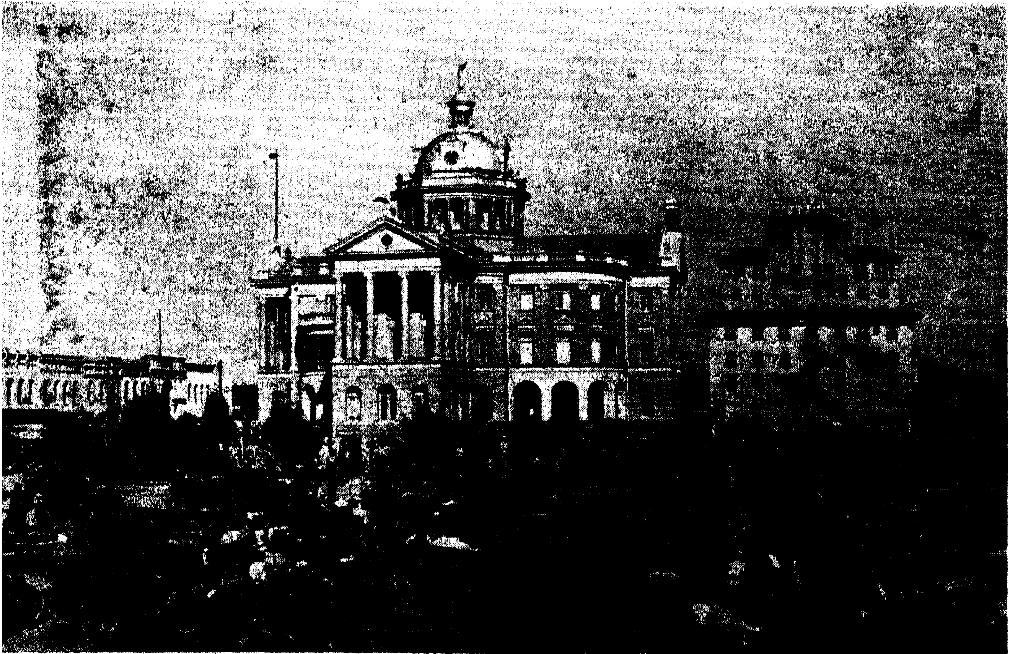
গৌরীশঙ্কর [চিত্রকর—শ্রীসুনীল পাল



প্রিয়পুরী [চিত্রকর—শ্রীসুনীল পাল



সি-১৪ গ্লোবমাস্টার নামক চারিটি এঞ্জীনবিশিষ্ট পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলগামী যাত্রী-বিমান



যুক্তরাষ্ট্রের একটি ছোট শহরের 'কাউন্টি-কোর্ট'। আদালত-প্রাঙ্গণস্থ শকটগুলি লক্ষণীয়

মানুষের পথের দুয়ারে আসন পেতেছে কে জানত! অথচ কাকে দেখি, কাকে ভুলি। সময় ত স্থির হয়ে বসে থাকে না, গাড়ীর চাকার মত ধুলো উড়িয়ে চলে যায় সব পিছনে ফেলে। নূতন ঢাকা পড়ল নূতনে—আরও নূতনে। একের পর এক অতিক্রম করে চলেছি নব নব শোভা। নদীর কূল ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে পথ ক্রমশঃ উপরে উঠছে নামছে। আপন খুশিতে যেখানে ইচ্ছা চলছে। অকৃপণ প্রকৃতি আমার দুচোখের সম্মুখে দানসত্র খুলে দিয়েছে, এ পাত্রটিতে যতটুকু ধরেছে তার চেয়ে ঢের বেশী উপচে পড়েছে। এমনি করে হিমালয়ের পাদপরিক্রমণ করতে করতে উঠে এলাম উন্নত সানু-দেশে। নীচে নাতিদীর্ঘ একটি উপত্যকা। অল্পস্বল্প লোকালয়, দীনদরিদ্রের গ্রাম, কিন্তু একটা স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতায় মার্জ্জিত ও উদ্ভাসিত। প্রতি গৃহেই মকাইয়ের কাটা ফসলগুলি সুসজ্জিত রয়েছে মন্দিরচূড়ার আকারে। গ্রামখানি যেন একটি পরিপূর্ণ ছবি। একপাল মহিষ তাড়িয়ে চলেছে একটা রাখাল ছেলে। গিরিকন্দরে এই প্রথম বসতি চোখে পড়ল। হিমালয়ের ধীর স্থির মৌনকান্তি যেন ওই রাখালছেলের পদক্ষেপে এতক্ষণে নড়ে উঠল।

উপত্যকা পার হয়ে এলাম এক বনে। শ্যামলে শ্যামল তার রূপ। একটা পরিতৃপ্তি, একটা সম্পূর্ণতা রয়েছে এই বনাঞ্চলে। ঋজুকায় দীর্ঘ তরুরাজি সমুন্নত শাখাবাহু বিস্তারে জানিয়ে রেখেছে অসংখ্য প্রণতি। পৃথিবীর শ্যাম শোভাকে নিবেদন করছে গগনের নীলিমার পায়। দেওদার বন পার হয়ে গভীর খাদে নেমে এলাম এক নূতন নদীর কিনারায়। এই নদীর মুখে এক প্রাচীন গ্রাম। ঘন এর বসতি। কোন্ আদি যুগ থেকে পথ আগলে বসে আছে যেন! জীর্ণ এর গৃহের প্রাচীর, হেলে পড়েছে তার অলিন্দ; কারুখচিত গবাক্ষ ধুলায় ধোঁয়ায় ভিতরের অন্ধকারের সঙ্গে রয়েছে মিশে। বুদ্ধের দল মন্দির-মণ্ডপের পাশে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করে নিস্তেজ ভঙ্গীতে ইষ্টনাম জপ করছে। বলি হয়ে গেছে, পায়ে-পায়ে রক্ত-মাখা সারা আঙিনা, ধুলোয় রক্তে পথের কাদায় একটা বীভৎস ভাব। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কালো দৈত্যের মত প্রকাণ্ড পাহাড়খানা সমস্ত সূর্য্যালোক আড়াল করে রেখেছে। অন্য দিকে জলধারার গর্জ্জন আর সেই নদী-পথ বেয়ে বইছে শন্ শন্ শীতের হাওয়া। সমস্ত মিলে-মিশে একটা কালীঢালা হিম-শীতল নিষ্প্রাণ আবহাওয়া। সঙীনধারী সেপাই এসে আমাদের দেখে শুনে রেহাই দিল।

ভীমফেদি পৌঁছে মোটরের পথ ফুরোল। যানবাহনের নূতন ব্যবস্থা হ'ল এইখানে। তানজাম্ ইজিচেয়ারও নয়, কাঠের বাক্সও নয় ঠিক, এ দুই মিলিয়ে এক বসবার আসন। পাল্কীর মত করে বাহকেরা কাঁধে তুলে বয়। এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম, দেখে কৌতুক লাগল। সকলেই ভাড়া করা তান্জামে চার বেহারার কাঁধে ভর করল। জীবদ্দশায় মানুষের কাঁধে চাপতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল। বাহকদের সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে সুরু করলাম। সম্মুখে একটা মরানদী অতিক্রম করে ওপারে খাড়া পাহাড়ের একটা ঘোরালো পথ নিলাম। রাত্রের প্রথম প্রহরেই পৌঁছতে হবে চিসা-গোড়ি। সূর্য্য অস্ত গেল। রাত্রির আঁধারে মগ্ন হ'ল পৃথিবী। অন্ধকারের যে একটা চিক্কণ-মসৃণ মাধুরী, গগন ভূতল একাকার করা একটা নিবিড় ব্যাপ্তি, গভীরতার যে একটা অবর্ণনীয় রূপ আছে, আজ এই গিরি-গাত্রে রাত্রির আপন স্বরূপে তাকে উপলব্ধি করলাম উপভোগ করলাম। আলো চলেছে আলোর পথে, আঁধার আঁধারের পথে। এ উভয় সৌন্দর্য্যকে একই চেতনায় সম্ভোগ করা সম্ভব। উঠতে উঠতে দেখি ছোট শহর ভীমফেদির একটি দুটি করে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠল। ক্রমে রাত্রি ঘন হ'ল। কোন রাজকন্যার মাণিকে গাঁথা মালা ভাসছে নিস্তরঙ্গ আঁধারের স্রোতে।

অল্প পরে গোড়ি এসে পৌঁছলাম। ছোট একটা বৃত্তাকার দুর্গ আছে এখানে, সেটা ফেরার পথে লক্ষ্য করেছিলাম। এই গোড়ি সুরক্ষিত। এখানে ছাড়পত্র দেখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাত্রীকে পরীক্ষা করে তবে ছেড়ে দেয়। আমিও ছাড়পত্র দেখালাম। নেপালের সরকারী কাজে চলেছি বিদেশবাসী; গোড়ির রক্ষক আমার আরাম-বিরামের ব্যবস্থা করে দিয়ে উপকার করলেন। নেপালের পথে হিমালয়ের গিরিগাত্রে এই প্রথম রাত্রি যাপন। শীত ক্রমশঃ জমে উঠছে। গরমের দেশের মানুষ আমি, হঠাৎ নূতন আবহাওয়ায় এসে কষ্ট হতে লাগল। ঘরে আগুনের পাত্র দেবার জন্যে বলেছিল, কিন্তু প্রথম রাত্রে তার প্রয়োজন অনুমান করতে না পেরে নিষেধ জানিয়েছিলাম। প্রহর যত বাড়তে লাগল শীতের আক্রমণও তত তীব্র হয়ে উঠল। বাঙলো ঘরের চাল দিয়ে হিম নামছে, দেয়াল দিয়ে হিম আসছে, মেঝে দিয়ে হিম উঠছে। দেহের তাপটুকু ছাড়া আর সব শীতল। শীতবস্ত্রে সমস্ত দেহ আবৃত রেখেছি, তবু শীতের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায় না। কি তীক্ষ্ণ সে স্পর্শ। এই ভাবে রাত পোহাল। প্রভাতের কনক কিরণে শীতের দাপট মন্দীভূত হয়ে এল। ঘন কুয়াশা ছিন্নভিন্ন হয়ে লক্ষ্মী-ছাড়ার মত এখানে ওখানে পালিয়ে পাহাড়ের আঁধার খুঁজে আত্মরক্ষা করতে লাগল। আমি আমার লোকজনদের নিয়ে গোড়ির সঙ্কট-পথ অতিক্রম করে এলাম।

পথ ক্রমশঃ বন্ধুর, উত্তুঙ্গ হতে লাগল। নিম্নে গভীর গহ্বর পাতালে গিয়ে মিশেছে। উর্দ্ধে পর্ব্বত-চূড়া আকাশ স্পর্শ করেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে চড়াই পথ বেয়ে উপরে উঠছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করছি হয়ত আগের চূড়ায় পৌঁছলেই দেখতে পাব গিরিরাজের তুষার-কিরীট। পা দুটোর বিশ্রাম নেই, দু' চোখের বিরাম নেই। পাছে কিছু হারাই, পাছে নগাধিরাজের প্রথম দর্শনে বিলম্ব ঘটে তাই উৎসুক হয়ে আছি। সম্মুখের ওই দেওদার-বন পার হয়ে পাব তাঁর দেখা। আজ তারই উদ্দেশ্যে মনপ্রাণ এই নির্ম্মল প্রভাত বেলায় পরিপূর্ণ সুধায় ভরে উঠেছে। চড়াইটুকু অতিক্রম করে দেওদার বনের প্রান্তে এসেছি, এবার উতরাই।

এতক্ষণ আমার দৃষ্টি সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে পর্ব্বত-গাত্রে প্রতিহত হয়ে ফিরছিল। বন্দী হয়ে ছিলাম প্রকৃতির দুর্গ-প্রাকারে, উতরাই-এর মুখে এই স্থানটিতে এসে, প্রবেশ করলাম যেন প্রকৃতির অন্তঃপুরে। সর্ব্বাভরণভূষিতা প্রকৃতি ডালায় ডালায় সজ্জিত রেখেছে তার ঐশ্বর্য্যের প্রচুর নৈবেদ্য। স্তরে স্তরে নীল পর্ব্বত শ্রেণী উত্তর সীমায় গিয়ে মিশেছে, তারও পরে

তুষারকান্তি হিমালয়। ভূধরের চঞ্চল তরঙ্গমালা মহামৌনীর চরণ প্রান্তে পরম সমাধিতে যেন এইমাত্র স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ছুঁতে রঙের ফিকে আকাশ, তার গায়ে শুভ্র মেঘমালা। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে আষাঢ়ে যে উপঢৌকন এসেছিল এ তার অবশেষ।

এই পাহাড় ওই পাহাড়ের সঙ্গমে গভীর নিম্নে ক্ষীণ এক রজত-রেখা,—কুশেখানি নদীর শাণিত হাসির বঙ্কিম বিলাস। ধীরে ধীরে ওই নদীর কূল লক্ষ্য করে নামতে লাগলাম। অল্প পরে তুষারশৃঙ্গ আড়াল পড়ল ওই সম্মুখের পাহাড়টায়। সঙ্গে রইল কুশেখানি আর তার নৃত্যসঙ্গিনী শত সহস্র ঝরণাধারা। ঝম্-ঝম্ ঝম্ ঝম্ প্রতিধ্বনিতে নদী-উপত্যকা মুখরিত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে সেকি উচ্ছ্বসিত বাণী-বিনিময়। এক প্রহরকাল এই নদীর কূল ধরে পথ চলেছি, দেখেছি, বিচিত্র তার গতি-ভঙ্গিমা। কোথাও স্তিমিত বেগে তটিনী চলেছে পায়ে পায়ে, যেন প্রচুর তার অবসর। কোথাও বা উন্মাদিনী ভীমা কূলে-কূলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভৈরব গর্জ্জনে এক উপলখণ্ড হতে আর এক উপলখণ্ডে। মহাশক্তির সে অট্টহাসে কাঁপে গিরি-গাত্র। কুশেখানির মায়া পিছনে পড়ে রইল। জটায় জটায় কোথায় সে ঘুরে মরছে কে জানে?

নদীকে দক্ষিণে রেখে পোড়ামাটির পাহাড়ে উঠল পথ। প্রকৃতির সামঞ্জস্যহীন সৃষ্টি এটি। চতুর্দ্দিকের শ্যামসুন্দর তরু-আচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণীর সুচারু শোভার মাঝে ও যেন এক উদ্ধত বিদ্রোহ। তার কিছু নেই; তৃণহীন, গুল্মহীন নিষ্ফল রুক্ষ অহঙ্কার শুধু ধূলি উড়িয়ে বেড়ায়। মনে হয়, যেন ওর একাগ্র আহ্বানে কখনও কখনও পাংশুল নভ থেকে ছুটে আসে ঝড়, মেঘ থেকে খসে পড়ে বজ্র। এই সর্ব্বনাশ যেন ওর খেলা।

এই পাহাড় পার হয়ে আর এক স্তর। সুবিস্তৃত উন্নত প্রান্তর ছোট ছোট আবাদের ক্ষেত ধাপে ধাপে ঊর্দ্ধে উঠে গেছে। চাষী ছেলে-মেয়ে মাটি কাটছে। পথ দিয়ে কে আসে কে যায়, ফিরেও চায় না তারা। কাজ করে আর মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ তানে গানের এক একটা কলি গায়। সমস্ত প্রান্তর উদাস হয়ে যায় সেই মূর্চ্ছনায়। তপ্ত-মধুর দ্বিপ্রহরের বেলাখানি যেন অকস্মাৎ মানুষের সুরে কথা বলে ওঠে। দূরে দূরে এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত গ্রাম্য কুটীর, ধবলে গৈরিকে রঞ্জিত। পাহাড়ের গায়ের এই ঘরগুলি যেন এক-একটা বিরাম-নিকেতন। এই সুদূরপ্রসারিত গ্রামখানির নাম চেৎলাঙ্। গ্রামখানি পায়ে রেখে ঋজুগতিতে বহু উচ্চে উঠে গেছে চন্দ্রগিরির সুদৃশ্য চূড়া। ওই চূড়া অতিক্রম করলে দেখা যাবে নেপাল উপত্যকা, আর দেখা যাবে আদিঅন্তহীন দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়।

জয় শম্ভু! চন্দ্রগিরির চূড়ায় উঠে এসেছি। সন্ধ্যা হয়ে এল। দিনের শেষ-বিদায়ের রক্তিম আভাটুকু যাই-যাই করছে। বড় বিধুর বড় স্নিগ্ধ এই সন্ধ্যাখানি। নিম্নে প্রশস্ত নেপাল উপত্যকা। ভোলানাথের বিলুণ্ঠিত জটাজুট যেন এখানে সযত্নে সম্বৃত, যেন উদাত্ত অনুদাত্তের মধ্যখানটিতে বিলম্বিত অবকাশ। গোদাবরী, চন্দ্রগিরি শিবপুরী—এ তিনটি পর্ব্বতমালার সস্নেহ আবেষ্টনে নেপাল মহিমান্বিত। উপত্যকার দূর প্রান্তরের হরিত-হিরণের উপর এখনও আলো চিক্-চিক্ করছে; কাঠমাণ্ডোর ওই হর্ম্ম্যশির, ওই অগণিত দেউল-চূড়া অলকার স্বপ্ন-রেখা সৃজন করে রেখেছে। সন্ধ্যার ছায়ায় উপত্যকা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল, ঊর্দ্ধাকাশে এখনও রয়েছে আলো; তুষারের শৃঙ্গে শৃঙ্গে চলেছে অস্তরবির তরঙ্গহিল্লোল। সর্ব্বশেষে গৌরীশঙ্করের অভ্রভেদী ললাটে কম্পমান আলোকের শেষ স্পর্শখানি রেখে অতি চুপি চুপি সূর্য বিদায় নিলে। এই মুহূর্তে যেখানে আলোর উৎসব চলেছিল, সেই তুষারমালার জ্যোতি হ'ল নিষ্প্রভ, তপঃরত ভস্মাচ্ছন্ন সন্ন্যাসীর নিমীলিত নয়নযুগল ফুটে উঠল হিমালয়ের মৌন স্তব্ধ পরিবেশে।

ভারতের পূর্ব্বদিগন্ত হতে পশ্চিম প্রান্তে জটাভার এলিয়ে বসেছে ধূর্জ্জটি—গগনস্পর্শী সেকি অপরূপ তার মহিমা!

কবে?

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বর্ষ কি কালের মাপ? চ'লে-যাওয়া কালের লক্ষণ?
সেদিন বিগত নাকি যেদিনের তীব্র আর্ত্তধ্বনি
ব্যথিত বাতাসে আজো থেকে থেকে ওঠে রণি রণি?
বর্ত্তমান ভেদি ওঠে বুককাটা কালের ক্রন্দন।
সেদিনের স্মৃতি ঘেরি' আবর্ত্তিছে জাতির জীবন:
কঙ্কালবিকীর্ণ পথ শস্যশূন্য বিশুষ্ক ধরণী,
শেষের আশ্রয় হ'ল কাহাদের নগর-সরণী!
অন্তর্গূঢ় ব্যথা তার তপ্ত চিত্তে দহে অনুক্ষণ।

এ প্রশ্নের সমাধান একদিন—একদিন হবে।
রুদ্ধ বেদনার স্রোত মুক্তি পাবে সব বাধা দলি।
দুঃখস্মৃতি ভস্ম করি কোন্ বহ্নি উঠিবে প্রজ্বলি!
বিনিদ্র রজনী যাপি সেদিনের প্রতীক্ষায় সবে।
সেই ভবিষ্যৎ ভাবি প্রাণ আজ উঠিছে উচ্ছলি,
সেদিন আসিবে জানি, হে দেবতা, কবে—বল কবে?

ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

খানিক পরে অনুপম একটা গলিতে ঢুকিয়া পদ্মপুকুরের পথ ধরিল। আজ সুমিত্রার সঙ্গ ওর ভাল লাগিতেছে না। ও যেন অনেকখানি ব্যবধান রচনা করিয়া চলিতেছে। যে আলাপকে ভালগার মনে করিতেছে—তাহাতেই গত সপ্তাহে ওর রুচি ছিল বলা যায়। ওইমত একটা রেস্তর্াঁয় বসিয়া ঠিক ওই ধরণের না হউক—যে আলাপ চলিয়াছিল তাহাকে ঠিক প্রাণখোলা বলা যায় না। ত্রুটি সে আলাপে ছিল কিন্তু আনন্দও তো ছিল। থাক—সুমিত্রা, গীতার কথাই বার বার মনে পড়িতেছে। মেয়েটির সাহিত্য-প্রীতি আছে। সিনেমার টেক্‌নিক, টেম্পো, সংলাপ, ইঙ্গিত, পরিচালনা সম্বন্ধে রসজ্ঞের মতই আলোচনা করিয়াছে। ও যে কালের মেয়ে সে কালকে শ্রদ্ধা করে। ভাবালুতার দ্বারা অতীতকে ভাল বলিয়া প্রশংসা-গদ্‌গদ্‌ হওয়া ওর স্বভাব নয়। যে কাল চলিয়া গেল তার ভালমন্দে আগামী কালের কতটুকু লাভক্ষতি। সংস্কৃতির মূল অনুসন্ধান করুন নৃতত্ত্ববিদ্‌রা। চিন্তাশীলতার মূল্য স্বীকার করুন না পণ্ডিতজনেরা। তরুণ বয়সে তরল রসটাই সুপথ্য। দেহের এবং মনের সে পরম রসায়ন। না, না, ভালই লাগিয়াছে সিনেমা। অনর্থক জটিল সমস্যায় পীড়িত নহে, গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত নহে। সিচুয়েশন ক্রিয়েট করিবার জন্য যতটুকু দুঃখের দরকার ততটুকুই ঠিক আছে। গরম গরম সমাজবিপ্লবী কথাগুলির দাম যথেষ্ট। ভালবাসার মশলায় ওগুলিকে কর্ণ ও চক্ষু-রোচক করিয়া পাক করিয়াছেন যে সুপকার তাঁহাকে ধন্যবাদ।

গীতাদের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার খেয়াল হইল—এ সময়ে আসাটা অসঙ্গত হইল কিনা। ফ্যাসান-দুরস্ত সমাজ। বিনা নোটিশে—অসময়ে দেখা করিতে আসাটা ভদ্ররীতিসম্মত নয়। অতি আগ্রহে শালীনতার হানি—সে তো সর্ব্ব সময়ে সুশোভন নহে।

হ্যালো—অনুপম।

অনুপম পিছনে কাহাকেও দেখিতে পাইল না—। এ পাশে ঘাড় ফিরাইতে না ফিরাইতে একখানি ময়লা জামা মোড়া হাত আসিয়া তাহার কাঁধে ন্যস্ত হইল।

কিরে—চিনতেই যে পারিস নে ?

সুবলের মত চেহারা না ? গলার স্বরটাও—

আমি সুবল—স্কটিশে একসঙ্গে পড়তাম। সে ও তো এমন বেশি দিন নয়।

তা শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুরে ?

উমেদারি ! এ আর কতটুকু দূর, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে রাজী আছি।

আয়, আয় এদিকে। তাহার হাত ধরিয়া অনুপম একরূপ টানিয়াই বাড়ির পিছন দিকে আনিল। আসিবার সময় ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল দুয়ারে চাকর বা ঝি দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিল কিনা।

আঃ—এমনভাবে টানছিস—যেন চুরি করতে এলেছি আমরা !

না—ওখানটায় রোদ বলে ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম।

বাড়িটা বুঝি তোর চেনা ? ওর মধ্যেই যেন ঢুকতে যাচ্ছিলি ?

সে কথায় কান না দিয়া অনুপম প্রশ্ন করিল, কিসের উমেদারি ?

চাকরির—আবার কিসের।

তা এই যুদ্ধের বাজারে অভাব কি রে। কেউ তো বেকার আছে বলে শুনছি নে। নিদেনপক্ষে অধমতারণ এ-আর-পিতেও তো জায়গা করে নিতে পারতিস।

পারতাম—তবে যোগাযোগটা তেমন সুবিধের হয় নি। কলকাতায় বাড়ি নয়—দেশ বলে কোন বালাই নাই। চির-কেলে ভাড়াটে—আর চিরকেলে গরীবদের পথ তো খুব চওড়া নয়। একটা পরিচয়ের খড়-কুটো পেলেও না হয় কূলে উঠবার ভরসা থাকত।

আচ্ছা—সাপ্লাই আপিসে দিস্ একখানা অ্যাপ্লিকেশন।

দেখিস কাগজ কালি অপচো না হয়। যে বাজার !

নারে—আমিও মাসকয় হ'ল ঢুকেছি কিনা ?

চেহারার চেকনাইয়ে তাই বুঝলুম বলেই তো দুঃসাহসে পাকড়াও করলুম রে। নইলে পালিশ করা দরজায় ঢুকছিস দেখেও—

আচ্ছা—ওই কথা রইল তাহলে।

আমায় বিদেয় করবার জন্য অত ছট্‌ফট্‌ করছিস কেন ? এই তো বললি—

একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে কিনা—তাই।

বেশ, বেশ ! কাজের লোকের চেহারাই আলাদা ! তোরাই সুখী অনুপম।

সুবলের নিশ্বাসটা কানের কাছে বিশ্রীভাবে বাজিল। অনুপম তাহার হাতখানি ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, হাঁ সুখী বইকি। চাকরি পেলে তুইও সুখী হবি।

সুবল ললাটে তর্জ্জনী রাখিয়া ঈষৎ হাসিল।

সুবলের সামনে গীতাদের বাড়িতে প্রবেশ করিতে অনুপমের সঙ্কোচ বোধ হইল। স্কটিশ চার্চ—সে অনেক দিনের কথা, ধরিতে গেলে বিস্মৃত যুগের, কিন্তু সুবলকে তার পরেও সে কত দিন দেখিয়াছে। সারা শরীরে দারিদ্র্যকে বহন করিয়া ও যেন গৌরব বোধ করে। হয়ত নিরুপায় মানুষের এই অক্ষম গৌরবেই পরম সান্ত্বনা। ওর বাড়ির মধ্যে চন্দ্রসূর্য্য কোন দিন প্রবেশ করে না—নগ্ন নোনা-ধরা দেওয়াল অন্ধকারের প্রলেপ মাখিয়া বাসিন্দাদের চোখে সম্পূর্ণ সুসহ হইয়া গিয়াছে—কষ্টের নিম্নতম পর্য্যায়ে নামিয়া কষ্টবোধটুকু হয়ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু অনুপমদের বাড়িটাকেও সেই সঙ্গে ভুলিবার যো কি ! একটু কম অন্ধকার—ঈষৎ উন্নত তার অবস্থান। ক্লাইভের

আমল হইতে আদি সুতানুটি গোবিন্দপুরের প্রত্নতত্ত্বের প্রলেপ তার দেওয়ালে ও খাটো ছাদের বাসভূমিতে মাখানো। চন্দ্র-সূর্য্য লাঞ্ছিত সেই পুরীতে বাস করিয়াও সৌন্দর্য্যবোধ তাহার বিলুপ্ত হইল কই? দক্ষিণ-কলিকাতার এই আকর্ষণে ঘর তাহার তুচ্ছ হইয়া গেল। এই আলো-সৌন্দর্য্যের রাজত্বে—মিষ্ট হাসি শিষ্ট আচারের জরি-সলমা-চুমকির দীপ্তিতে—দুঃখ অস্বীকৃতির স্বচ্ছন্দ হাওয়ায় জীবন তরল হইয়া ভাসিয়া চলুক না।

আয়—একটু চা খেয়ে নেয়া যাক।

চা খাওয়াবি?

আয় না। বিস্মিত তাহাকে পাশের একটা সস্তামত কেবিনে টানিয়া লইয়া গেল।

ডিমের অমলেট—ডবল ডিম, আর চা দু কাপ।

ডবল ডিমের অমলেট—এ যে হঠাৎ বাদশাহী রে।

চুপ করে খেয়ে যা। ফাউল কারি চলবে কোয়ার্টার ডিস?

সুবলের লোভার্ত্ত চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। পথের ধারে যাহারা হাত পাতিয়া ভিক্ষার বুলি আওড়াইতেছে—চকচকে আনি, দুয়ানি দাতার হাতে দেখিলে তাহারাও লোভের আনন্দে এমনই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। অনুপম বন্ধুকে খাওয়াইয়া আনন্দ বোধ করিল না—রীতিমত ঘৃণা হইল তার মনে।

সুবলের পানে ফিরিয়া কহিল, তা হলে ওঠা যাক।

সাহসী সুবল কহিল, পান খাওয়াবি না?

আচ্ছা পয়সা নিয়ে কিনে নিগে। আমি তো পান খাই নে। ডবল পয়সা না থাকাতে একটা আনিই তাহার হাতে দিল।

সুবল আনি শুদ্ধ হাতখানি চাপিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে কহিল, থ্যাঙ্কস্।

অনুপম দোকান হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

গীতাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া একবার পিছনে চাহিল, তখনও সুবল অনুপমের গতিপথের পানে চাহিয়া আছে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিল, ন্যুইসেন্স। তারপর মোড় ফিরিতেই বাড়িটার আড়ালে সুবলকে আর দেখা গেল না।

এতক্ষণে অনুপম কিছু সুস্থ বোধ করিল। গীতাদের সদর দরজার সামনে আসিয়া একবার ভাবিল এই মধ্যাহ্নে বিশ্রামের অবসর ক্ষণটিতে সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে ভদ্রতায় বাধিবে কিনা। কিন্তু সে চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। মনের মধ্যে কিসের একটা উচ্ছ্বাস অনবরত তাকে সেই দিকেই ঠেলিতেছিল। সে সিনেমার প্রভাব কি রেস্তরাঁর প্রভাব বলা কঠিন।

মৃদু কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম-মাখা অপ্রসন্ন চোখে একটা ঝি আসিয়া দাঁড়াইল সম্মুখে এবং ভাল করিয়া না চাহিয়াই বলিল, রাতদিন ভিখিরীদের উৎপাতে জ্বালাতন—

কথা তার শেষ হইল না—নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, কি চান বাবু?

অনুপম বিব্রত হইয়া কহিল, তোমাদের দিদিমণি—মানে গীতাদেবী বাড়ি আছেন?

ঝি চোখ চাহিয়া যেন অধরপ্রান্তে অল্প একটু হাসিয়াও কহিল, আপনার নাম?

এই কাগজখানা দাও গে।

কাগজ লইয়া ঝি চলিয়া যাইতেই অনুপমের ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পালায় এখান হইতে। অন্তরের দৈন্য সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে। প্রথম পরিচয়-দিনে—এত কি ত্বরা অযাচিত ভাবে সাক্ষাৎ করিবার!

প্রসন্ন মুখে ঝি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আসুন।

প্রায়ান্ধকার বৈঠকখানা। গীতা একা বসিয়া নাই—কৌচে অর্দ্ধমগ্ন দেহে কে একজন সুবেশ যুবকও যেন রহিয়াছে। গীতা দুয়ার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল, আসুন।

কৌচের সান্নিধ্যে আসিয়া কহিল, আপনারা বোধ হয় পরস্পরকে জানেন না। ইনি মিষ্টার চৌধুরী—অরুণ চৌধুরী—আধুনিক গানের একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার। অনুপম বসু—তরুণ সাহিত্যিক।

চৌধুরী উঠিয়া সাগ্রহে করমর্দ্দন করিল। হাসিয়া বলিল, ভারি আনন্দ হ'ল।

অনুপম অন্তরে তেমন প্রীতি অনুভব করিল না। এই নির্জ্জন অবসর মুহূর্ত্তে অবাঞ্ছিত চৌধুরীকে ও আশা করে নাই, তথাপি মাথা নাড়িয়া ও হাসিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে হইল।

দুই জনকে বসাইয়া গীতা বলিল, চৌধুরীর সঙ্গে আধুনিক সঙ্গীত নিয়ে একটু আলোচনা হচ্ছিল। উনি যদিও ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ভক্ত—আধুনিক গানকে অপাংক্তেয় করতে চান না।

অনুপম মনে মনে কহিল, আধুনিক গানের সৌভাগ্য! প্রকাশ্যে শুধু কহিল, তাই নাকি?

চৌধুরী কহিল, গান মানে শুধু সুরের কসরৎ নয়,—বাণী-মূর্ত্তির মধ্যে সুরকে প্রতিষ্ঠিত করা। বাণী তার দেহ—সুর হচ্ছে প্রাণ। রাগ রাগিণী তো কুস্তি-কসরতের প্যাঁচ নয়—

গীতা সশব্দে হাসিয়া কহিল, ঠিক বলেছেন—বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অনুপম কহিল, কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে যে ধারা চলে আসচে—যে মর্য্যাদা ক্লাসিক্যাল গানকে আমরা দিচ্ছি তা কিছু না বলে উড়িয়া দেওয়া চলে না।

চৌধুরী কহিল, অনেকে ভুল করে ক্লাসিকাল গানকে আর্ট পর্য্যায়ে ফেলেন, কিন্তু আসলে ও হ'ল বিজ্ঞান। কতকগুলি বাঁধা ফরমুলার দাগে দাগ মিলিয়ে চলা। একটু থামিয়া বলিল, ওর মর্য্যাদাকে অস্বীকার করবো কেন—শুধু আবেদনটা যাতে গভীর হয় মনের আনন্দবৃত্তিকে যাতে জাগিয়া তোলা যায়—তারই জন্য সৃষ্টি আধুনিক গানের। অর্থহীন সুরের কসরত—কায়াহীন দেবতার আরাধনার মত।

অনুপম কহিল, কায়ার বাঁধন শেষ করে অসীমে যিনি পৌঁছতে পারেন তিনিই তো—

গীতা বাধা দিয়া কহিল, আমাদের কায়াই ভাল। আপনারও বোধ হয় তত বেশি বয়স হয় নি কিংবা এত বড় সাধক হন নি যাতে কায়ার বাঁধন কাটিয়ে—ধোঁয়ার মোহে মিষ্টিক হয়ে উঠবেন। অন্তত আপনার লেখা পড়ে তা ত মনে হয় না।

অনুপম ঈষৎ হাসিল।

চৌধুরী কহিল, দুঃখের বিষয় আপনার লেখা একটিও আমি পড়ি নি।

সুখের বিষয় বলুন। অনুপম হাসিল।

মিছকে বিনয়ে নরম করুন—খাটো করবেন না। গীতার

মন্তব্যে অনুপম আরক্ত মুখখানি নামাইল। গীতা কহিল, জানেন মিষ্টার চৌধুরী—ওঁর সেই 'কে বলে জীবন ছেলে খেলা নয়' যদি পড়েন—

নিশ্চয় পড়বো আপনার কাছে যদি বইখানা থাকে—

গীতা বলিল, বই আকারে এখনও বেরয় নি—শীঘ্রই বেরুবে।

তবে ম্যাগাজিনখানার নাম বলে দিন সংগ্রহ করে নেব।

পড়লে ভাববেন তরুণ বয়সে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি। আধুনিক যুগকে উনি ঠিকমত চিনেছেন।

চৌধুরী উঠিয়া কহিল, আজ তাহলে আসি। তিনটার পর আমার নিশ্বাস ফেলাবার ফুরসত থাকে না।

এখন কোথায় যাবেন ?

যাব রায় বাহাদুর প্রভাত মাইতির বাড়ি সাদার্ণ এভিনুয়ে। সেখান থেকে হিন্দুস্থান পার্কে বিখ্যাত কন্‌ট্রাক্‌টার এ, সি, বাসুর ওখানে। তারপর মিউজিক ক্লাস সাড়ে বারটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত। তারপর জি, পি, সিনহার ফ্ল্যাটে চৌরঙ্গীতে, সেখান থেকে—

গীতা বলিল, এত জায়গায় ঘোরেন বলে—বলতে সাহস পাই না। অবশ্য জানি না—আমার গলায় গানের আবেদন ঠিকমত জমে কিনা—

মার্ভেলাস্। আপনার গলায় দানা আছে—কণ্ঠের স্বর মিষ্ট আর জোরালো। ক্ল্যাসিকাল গানের সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতি মিশিয়ে একটা নতুন জিনিস পরিবেশন করবার আশা করি। গমক গিটকারি, মীড়-কর্ত্তব ইত্যাদি মিশিয়ে—

গীতা সলজ্জে মাথা নামাইয়া কহিল, লজ্জা দেবেন না। আমি যা নই তা নিয়ে—

চৌধুরী তাহার হাতখানি টানিয়া গভীর দরদ মাখানো স্বরে বলিল, আপনি যে কি তা আপনি জানেন না। আপনার আসল পরিচয় যেদিন জন-সমাজে দিতে পারব—এবং আশা করি শীঘ্রই তা পারব। চৌধুরী গীতার হাত বুকের কাছ বরাবর তুলিয়া অল্প একটু দোলা দিয়া ছাড়িয়া দিল। নমস্কার—মিঃ সাহিত্যিক।

অনুপমের চোখমুখ আর একবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

গীতা কহিল, চমৎকার লোক মিঃ চৌধুরী—মানে হি ইজ এ জীনিয়াস।

অনুপম নিরুৎসাহ কণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়।

গীতা কহিল, আজ ও বেলাই তো শুনেছেন আমার গান। উনি যা আশা করেন তাই কি সম্ভব ?

গীতার উজ্জ্বল চোখের তারায় স্বপ্নসমাহিত দৃষ্টি। অনুপম সে দিকে চাহিয়া কহিল, উনি যা আশা করেন তার চেয়েও বেশী হয়তো—

যান—নটিবয় ফ্ল্যাটারার। গীতা চক্ষুর অপরূপ ভঙ্গি করিয়া সোফায় আসিয়া বসিল।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে ক্লক ঘড়িটা শুধু টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছে। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ ; নীল রঙের কম শক্তির একটি বিদ্যুৎ-বাতি সুদৃশ্য আধারে জ্বলিতেছে আর গীতার প্রসাধন-সমৃদ্ধ দেহ হইতে নরম গন্ধের একটা দামী এসেন্স বদ্ধ ঘরের বায়ুস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অনুপম কহিল, আজ যাচ্ছেন তো সাহিত্যবৈঠকে ?

নিশ্চয়। কিন্তু বাবা সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

অসুস্থ !

হাঁ—মানে ওঁর নার্ভগুলো বড় নরম, অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

উত্তেজনার কারণ কি ঘটল ?

কারণ তো বাইরে নয়—মনে। কোন কল্পিত নায়কের দুঃখে হয়তো মুহ্যমান হয়ে পড়লেন, কোন ঘটনাকে কি ভাবে সাজাবেন ঠিক করতে না পেরে মাঝে মাঝে এমন অস্থির হয়ে ওঠেন।

তাই নাকি !

বা রে—আপনি লেখক আপনি জানেন না। সেন্সিটিভ না হলে লেখা আসে কখনও।

অনুপম কহিল, মাপ করবেন একটা কথা মনে পড়ল।

বেশ তো নির্ভয়ে বলুন।

মেয়েরা তো যখন তখন সামান্য বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—অনেকে অতিরিক্ত সেন্সিটিভনেসের দরুণ মূর্চ্ছাও যান কিন্তু তাঁদের তো লেখক খ্যাতি আছে বলে—

শোনেন নি ? তা শুনবেন কি করে। লেখা যদি তাঁদের আসতো তো সেই পথ দিয়েই ভাবকে বার করে দিতে পারতেন —উপায় নেই বলেই তো মূর্চ্ছা রোগের সৃষ্টি।

অনুপম হাসিয়া কহিল, চেষ্টা করলে আপনি বোধ হয় লিখতে পারেন।

কেন—আপনার কি ভয় না হলে আমার মূর্চ্ছা রোগ জন্মাবে। গীতা উচ্চ হাসিয়া সোফার উপরে ঢলিয়া পড়িল। অনুপম তার দেহের অপরূপ ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল সেই দিকে। পাশাপাশি সোফা; গীতার বিক্ষিপ্ত হাতখানি আসিয়া অনুপমের দেহে যে কোন মুহূর্ত্তে সংলগ্ন হইতে পারে। যে কোন মুহূর্ত্তে স্নায়ুতে রক্তে ঘনিষ্ঠতার উত্তেজনা প্রখর হইয়া এ ঘরখানিকে রসাতলে নামাইয়া দিতে পারে। অনুপম মনে মনে সে কামনা করিল। গীতার ঈষৎ বিস্রস্ত বেশবাসে যে অসংযম—উগ্রগন্ধী লাল মহুয়া ফুলের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করা অত্যন্ত সহজ। রাত্রির মত মেদুর এই নীল আলোকদ্যুতিময় কক্ষ—রাত্রির নির্জ্জনতার স্বাদ এর পরিমণ্ডলে। হয়ত বিভ্রম—খানিকটা আত্মসচেতনাও হইতে পারে—অনুপম নিজেকে সোফা সমেত অত্যন্ত সন্তর্পণে গীতার দিকে আগাইয়া দিল। গীতাও যেন হাসির মোহে অসম্বৃত হইয়া স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হইয়া লীলাকৌতুকে মাতিয়া উঠিল। অসাবধানী লীলা-চঞ্চল হাত নির্ভুল অঙ্কের হিসাবমত অনুপমের হাতে আসিয়া লাগিল—বাহির অসাবধানী অ[illegible] অন্তর-সচেতনায় তাহা মৃদুকরপীড়নের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। মূর্চ্ছা যাওয়ার বিস্মৃতক্ষণটি দুইজনের কাছেই পরিস্ফুট হইল।

গীতা কহিল, মাপ করবেন। কিন্তু অনুপমের হাত হইতে হাতখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল না।

অনুপম কহিল, মাপ আমারই চাওয়া উচিত কিন্তু চাইব না।

কেন।

সকালে আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। হয়ত একদিন না একদিন আসতাম। কিন্তু এত শীঘ্র কেন এলাম—সে কথা আপনিও জানেন বলে।

আমি কৈ কিছুই তো জানি নে। গীতা কপট বিস্ময়ে অনুপমকে আহত করিল।

অনুপম বলিল, জানেন। আমার মন চুপি চুপি সে কথা আমায় বলে দিয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক মন। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় গীতা গ্রীবা হেলাইল।

হাঁ—ওর বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত আপনার বিশ্বস্ত হতে পেরেছি। অনুপম হাসিল।

গীতা বলিল, মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কতদিন সুরু করেছেন?

ভেটার্ণ হতে পারলাম কৈ। একটিই মাত্র মন—

কিন্তু আপনার লেখা পড়ে মনে হয় আপনি অত্যন্ত চালাক।

চালাক! বলেন কি?

হাঁ—তরুণ মনের কোথায় কিছুকোনো আছে আপনি তা দিব্য সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে লেখার হরপে টেনে আনেন।

ভুল করেছেন—ওটা আমার চালাকী নয়—অনুভূতি।

যাতে আপনার অভিজ্ঞতা নেই—

হাসালেন—অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো অনুভূতির অহিনকুল সম্বন্ধ। যা জানি তা লেখায় তেমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। যা সবটা জানি না খানিকটা জানি তাইতো সুন্দর করে বলা যায়।

ওঃ—লেখার কারবারে বুঝি কল্পনাটা মূলধন।

নিশ্চয়। ফটোগ্রাফিতেও আলো-ছায়ার প্রপোরশন ঠিকমত চাই—নইলে ছবি ওঠে না।

আচ্ছা—আলো ভাল—না ছায়া?

গীতার এই সিদ্ধান্ত ছেলেমানুষি প্রশ্নে অনুপম মুগ্ধ হইল। হাসিয়া বলিল, যার যেটা সহজলভ্য—তার তাই ভাল।

ঘড়িতে টং করিয়া একটি শব্দ হইল।

গীতা বলিল, ক'টা বাজল?

সাড়ে তিনটে বোধ হয়।

দেওয়ালের পানে মুখ ফিরাইয়া গীতা কহিল, উহুঁ—সাড়ে চার।

সোফা হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া অনুপম কহিল, বলেন কি!

বাজলই বা। আপনি অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে!

অভ্যাসবশতই অনুপম ব্যস্ত হইয়াছিল। গীতার কথায় অপ্রতিভ হইয়া আসন গ্রহণ করিল। কক্ষে তখনও রাত্রির আমেজ আছে—আলোয় আছে স্বপ্নময়তা। নূতন লেখক বলিয়া যে গৌরব গীতা তাহাকে দিয়াছে—তাহাও অসামান্ত। মৃদু-ক্রিয় সুরার মত তাহা বৃত্তিগুলিকে ঈষৎ উত্তেজিত করিতেছে। বহুবাজারের কোন্ অখ্যাত গলির প্রান্তসীমায় চন্দ্রসূর্য্যলাঞ্ছিত একখানি চুণ-বালি-খসা ভাড়াটে বাড়ির কথা সে ভুলিয়াছে। সে যে সাপ্লাই অফিসের ন্যূন বেতনের নূতনতম কেরানী—তাহাও ভুলিয়াছে। কলিকাতার পথে গলিতে যে আবর্জনা—দারিদ্র্যের নগ্ন-রূপ মনকে প্রতিনিয়ত বিমুখ করিয়া দেয় তাহাও প্রসন্ন মনের কোণে লাগিয়া নাই। এই মৃদু আলোকিত ঘরখানির সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতার সঙ্গে কখন সে অদ্ভুতভাবে মানাইয়া গেছে। ধনের প্রশ্নটা এখানে অবান্তর—প্রতিভার মর্য্যাদায় সে আপাতত প্রদীপ্ত।

অপরাহ্নিক চা এবং লঘু জলযোগ সারিয়া অনুপম বিদায় গ্রহণ করিল।

বিদায় গ্রহণকালে গীতা বলিল, আবার আসবেন কবে?

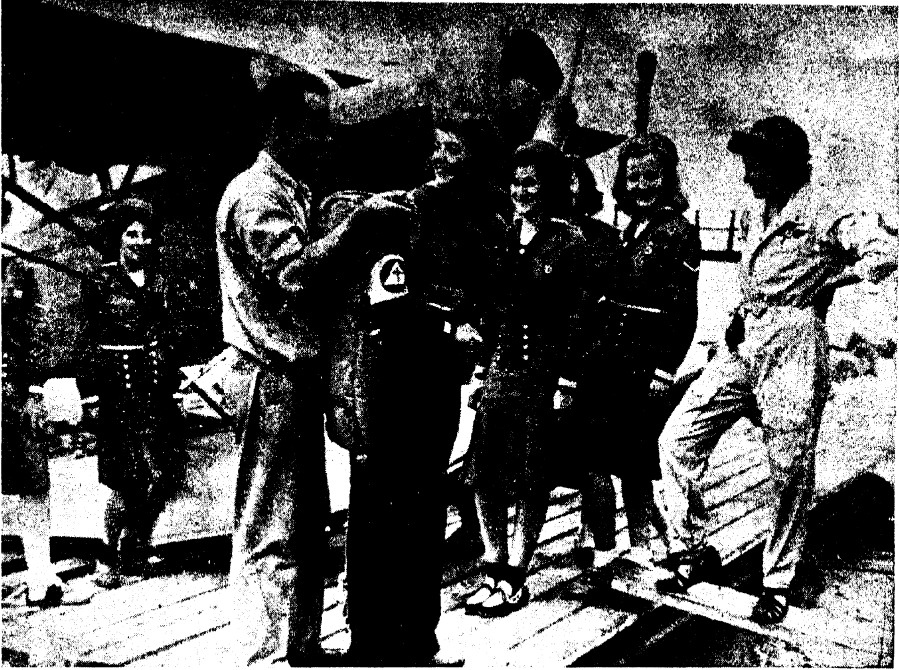
আসব। প্রণয়ীসুলভ স্মিতহাস্তদ্বারা অনুপম তাহাকে আশ্বস্ত করিল। (ক্রমশঃ)

আমেরিকায় বালক-বালিকাদের সঙ্ঘ-জীবন

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কৃষি শিল্প বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকার অগ্রগতি আজ সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আমেরিকার আজ অপ্রতিহত প্রতাপ। কিন্তু আমেরিকা শুধু নিজের দেশের সমস্তা লইয়াই মাথা ঘামায় না, পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি-আন্দোলনে তাহার সমর্থন ও সহানুভূতির পরিচয়ও যে পাওয়া যায় নাই তেমন নহে। আমেরিকারই মনীষী সাণ্ডারল্যাণ্ড *India in Bondage, her right to freedom* নামক পুস্তকে বিশ্বের দরবারে ভারতের স্বাধীনতার দাবির কথা জানাইয়া গিয়াছেন। ওয়েণ্ডেল উইল্কি 'এক দুনিয়ার' যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন তা আদর্শবাদী মাত্রকেই মানব-জাতির ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আশান্বিত করিয়া তোলে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমেরিকায় গণতন্ত্রের আদর্শ আজও সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত হয় নাই এবং একথা অনস্বীকার্য্য যে পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের আদর্শ পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। সাময়িক স্বার্থের খাতিরে আমেরিকার গণতান্ত্রিকতাকে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত মিতালি করিতে হইতেছে। সেইজন্যই আমেরিকার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিকে Commercial Imperialism (বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ) আখ্যায় অভিহিত করা হয়।



যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গার্ল স্কাউট সমিতির উইং স্কাউটদের বিমানের গঠন-কৌশলাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ

কিন্তু তাই বলিয়া একথা ভুলিলে চলিবে না যে, 'এহ বাহ্য'। সাময়িক বিভ্রান্তি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিকতার উন্নত আদর্শের কথা আমেরিকা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত না হয়, পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহ ইহাই কামনা করিতেছে।

আশার কথা এই যে, আধুনিক কালে আমেরিকার বালক-বালিকাদিগকে গণতন্ত্র এবং জনহিতৈষণার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য জোর চেষ্টা চলিতেছে। সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশ জুড়িয়া অগণিত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সমস্ত সঙ্ঘের সভ্যেরা শৈশবকাল হইতেই বৃহত্তর জনসমষ্টির জন্য ভাবিতে শিখিতেছে। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই আদর্শ ছোটবেলা হইতেই তাহাদের মনে সুদৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। তরুণ বয়সে ইহাদের হৃদয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শবাদের যে বীজ উপ্ত হইতেছে হয়ত কালে তাহা একদিন বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হইয়া শুধু তাহাদের নিজের দেশেরই নয়, সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করিবে। উইল্কির স্বপ্নও হয়ত সেদিন সফল ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

সঙ্ঘ-জীবনের প্রতি আমেরিকার এই যে অনুরাগ তাহা নূতন নহে। শতাব্দী কাল পূর্ব্বে ডি টকোভিল নামক জনৈক ফরাসী লেখক ভ্রমণ ব্যপদেশে আমেরিকায় আসেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সকল বয়স, সকল অবস্থা এবং সকল স্তরের আমেরিকানরাই অনবরত সঙ্ঘ গঠন করিয়া থাকে।" এই উক্তি তখন যেমন এখনো ঠিক তেমনি সত্য এবং তরুণ ও বয়স্ক সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য।

বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আট হইতে অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক বালক-বালিকাদের শত শত সঙ্ঘ আছে। তাহারা নিজেরাই অগ্রণী হইয়া এগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষাধিক সভ্য সমন্বিত বিরাট্ জাতীয় সঙ্ঘ হইতে সুরু করিয়া এক এক পাড়ার মাত্র ১০।১৫ জন বালক-বালিকা লইয়া গঠিত ছোট ছোট ক্লাব পর্য্যন্ত আছে। এই ছোট সঙ্ঘগুলি নিজেদের সভ্যমণ্ডলীর অর্থ-সাহায্যেই পুষ্ট, বাহির হইতে কোনো রকম আনুকূল্য সেগুলি পায় না।

নাগরিকের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ, চাষবাসের উন্নত প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বালক-বালিকারা সঙ্ঘ গঠন করিয়া থাকে। কতকগুলি সঙ্ঘ আমেরিকার বয়স্কাউট, অথবা ইয়ং ম্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি জাতীয় কিম্বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কতকগুলি আবার বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠান, গির্জ্জা, স্কুল ইত্যাদি অথবা স্বায়ত্ত-শাসন এবং শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত জড়িত সমিতি-সমূহের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত।

প্রত্যেকটি সঙ্ঘেরই প্রতিষ্ঠার মূলে থাকে কতকগুলি বিশেষ আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প। কোনটির লক্ষ্য সভ্যদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং দেহানুশীলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে



আমেরিকার একটি এয়ার স্কাউট ক্যাম্পে জনৈক বয়স্ক নেতার নিকট দুইজন বয়-স্কাউটের শিক্ষা গ্রহণ

তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তোলা। কোনটিতে জন-নায়কত্ব ও নাগরিকের কর্ত্তব্য ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাহাদের হাতেখড়ি হয়। কর্ম্মপন্থা বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটি সঙ্ঘেরই কিন্তু আদর্শগত ঐক্য আছে, তাহাদের মূলনীতি হইল বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণসাধন। সঙ্ঘগুলির সভ্যদের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক আদর্শের অনুসরণ পূর্ব্বক আত্মোন্নয়ন।

ক্লাবের সভ্যগণ নিজেরাই কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন এবং সভার কার্য্যাদি পরিচালনা করে। বিষয়-নির্ব্বাচনী-সমিতির অধিবেশনাদিও তাহাদেরই নির্দ্দেশানুযায়ী হয়, উপরন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করিয়া তাহারা প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। এমনিভাবে গণতান্ত্রিক কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগিতা, বিভিন্ন সঙ্ঘের কর্ম্মীদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ভাব বিনিময়, পরমতসহিষ্ণুতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসঙ্ঘের দাবি মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির মূল্য যে কত বেশী তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে। ক্লাবগুলি এক দিকে যেমন তরুণ-তরুণীদের নাগরিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করে, অন্য দিকে তেমনি তাহাদিগকে পৌর অধিকার এবং সুখসুবিধাসমূহ আদায় করিতেও উৎসাহিত করে। তরুণ-তরুণীরা স্থানীয় জনহিতকর প্রচেষ্টায় সাক্ষাৎভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া নাগরিকের কর্ত্তব্য কিরূপে পালন করিতে হয় তৎসম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে। উপরন্তু নগর এবং জেলাসমূহের শাসন ব্যাপারে কিছুকালের জন্য পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করায় এবিষয়ে তাহাদের শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ়তর হয়।

হাই স্কুল ক্লাব—সম্প্রতি আমেরিকার কতকগুলি ষ্টেটে, ন্যাশনাল ওয়াই-এম-সি-এর কর্ত্তৃত্বাধীনে হি-ওয়াই অর্থাৎ বালকদের 'হাই স্কুল ক্লাব' নামে যে কতকগুলি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলিতে বিশিষ্ট এক ধরণের শিক্ষা-পদ্ধতির ভিতর দিয়া সভ্যদের নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ইহার আসল উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্র এবং স্থানীয় শাসন-পরিষদসমূহের কার্য্য পরিচালনা কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ ব্যবস্থাপক সভা (Model legislature) গঠন করা হইয়াছে। ইহার কার্য্যনির্ব্বাহে অংশ গ্রহণ করিয়া তরুণ ছাত্রেরা দেশের শাসন-প্রণালী, কর-নীতি, শিক্ষা-পদ্ধতি, দুর্নীতি দমনে সরকারী প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হইয়া উঠে, উপরন্তু দেশের শিল্প এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থা, যুদ্ধ-প্রচেষ্টা, দেশরক্ষা এবং অনুরূপ বহু রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

সমগ্র ষ্টেটের হি-ওয়াই ক্লাবসমূহ মডেল ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য বালক সিনেটর এবং বালক-সদস্য নির্ব্বাচন করে। ষ্টেট যুনিভার্সিটি বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ইহার একটি অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে বালক-সদস্যগণ কি নিয়মে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা হয়, কি ভাবে আইনসমূহের খসড়া তৈরি হইয়া তাহা বিধিবদ্ধ হয়, জনগণের দাবি মিটাইবার পদ্ধতিই বা কি এ সমস্ত বিষয়ে যুনিভার্সিটী ফ্যাকাল্টির সদস্যদের এবং অন্যান্য জননায়কদের বক্তৃতা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে।

উক্ত অধিবেশনের পর প্রতিনিধিগণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য হি-ওয়াই ক্লাবের সভ্যদের সহযোগিতায় ব্যবস্থা-পরিষদের দ্বারা কোন্ কোন্ সমস্যার সমাধান জনগণের কাম্য তৎসম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের সংগৃহীত তথ্যকে ভিত্তি করিয়া ক্লাবসমূহ আদর্শ ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে 'বিল' প্রণয়ন করে। অবশেষে বালকেরা রাজধানীতে একটি বিশেষ প্রতিনিধি-বৈঠক আহ্বান করে। আসল সিনেটর এবং সদস্যের মতই তাহারা ব্যবস্থা-পরিষদে আসন পরিগ্রহ করে এবং দুই দিন ধরিয়া দস্তুরমত ব্যবস্থা-পরিষদের ধরণেই রুটিন-মাফিক দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনা করে। তাহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই নির্ব্বাচিত বালক-গবর্ণর, সিনেটের প্রেসিডেণ্ট, ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার এবং অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই অধিবেশন-সমূহে সভাপতিত্ব করেন।

বালকদের তৈরী বিলগুলি সম্বন্ধে কমিটির মিটিঙে যখন আলোচনা হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ তখন পরামর্শ-দাতারূপে কাজ করিয়া থাকেন। বিলগুলি শেষে সিনেটে উপস্থাপিত করা হয় এবং এ সম্বন্ধে বিতর্কের অবসান হইলে পর বালক-সদস্যগণ তৎসমুদয়কে কার্য্যকরী করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

এই অধিবেশন উপলক্ষে দেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্র-নীতিবিদ্‌দের প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রবণে তাহাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এমনি ভাবে মডেল ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্য পরিচালনা দ্বারা বালকেরা এক দিকে যেমন নেতৃত্বের শিক্ষা লাভ করে অন্য দিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মূলনীতিসমূহও তাহাদের অধিগত হয়। আদর্শ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন

শেষ হইবার পর যখন তাহারা দেশে ফিরিয়া আসে তখন তাহাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা যাহাতে ব্যাপক ভাবে কার্য্যকরী হয় সেই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের সংগৃহীত বৃত্তান্ত এবং তথ্যসমূহ বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে প্রচার করে। ক্রমে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সেগুলি দেশের বৃহত্তর জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রচারিত হয়।

ইহাই হইল আমেরিকার হাই স্কুলসমূহের হি-ওয়াই ক্লাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াই-এম-সি-এর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত উক্ত ক্লাবের সংখ্যা ৭,৫০০টি।

এ ছাড়া আমেরিকায় বালক-বালিকাদের আরো নানা ধরণের ক্লাব আছে। নিম্নে সংক্ষেপে সেগুলির কথাও বলা হইতেছে।



৪-এইচ ক্লাবের সভ্যেরা বিশেষজ্ঞদের নিকট বনসম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করিতেছে

আমেরিকার ৪—এইচ ক্লাব—Head (মস্তক), Heart (হৃদয়), Hand (হাত) এবং Health (স্বাস্থ্য) এই চারিটির উৎকর্ষ-সাধন ৪—এইচ ক্লাবের উদ্দেশ্য। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী-অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবগুলির সভ্য-সংখ্যা মোট ১,৭০০,০০০ জন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের-কৃষি-সম্প্রসারণ বিভাগ কর্ত্তৃক গ্রামাঞ্চলের বালক-বালিকাদের জন্য এই বিশেষ শিক্ষা-দান প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল। জেলা কৃষি-সম্প্রসারণ এজেন্ট এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে ক্লাবসমূহ গঠিত এবং পরিচালিত হয়। তরুণ-সম্প্রদায় নিজেরাই সঙ্ঘের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন, সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং বার্ষিক কর্ম্মপদ্ধতি প্রণয়ন ইত্যাদি করে। সাধারণতঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সঙ্ঘ-নায়কের পদে বৃত হন। ক্লাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের দায়িত্ব-ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হয়।

প্রধানতঃ সাধারণ কৃষি-সম্প্রসারণ প্রোগ্রামের ভিতর দিয়া পল্লীর জনমণ্ডলীর সঙ্গে ৪—এইচ ক্লাবের কর্ম্মীদের গভীর যোগ স্থাপিত হয়। ৪—এইচ ক্লাবের সভ্য হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক বালক-বালিকাকে একটি মাত্র শর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয়। পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি, গৃহস্থালির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য এক বৎসর কাল কিছু না কিছু কাজ করিতে তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এই সংবৎসরব্যাপী কার্য্যকালের মধ্যে তাহাদিগকে আয়-ব্যয় মজুরি ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিতে হয়।

বালিকাদের কাজ হইল প্রধানতঃ পরিবারের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী তরিতরকারির বাগান করা এবং যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে সেগুলিকে টিনজাত করিবার ব্যবস্থা করা। বালকদের কার্য্য, একাধিক একর তুলা বা অন্যান্য শস্য উৎপাদন হইতে সুরু করিয়া শূকরাদি জীবজন্তু ক্রয় এবং প্রতিপালন ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর পর নিয়মিত ভাবে ৪—এইচ ক্লাবের যে সমস্ত সভার অধিবেশন হয়, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যগণ আইনসম্মত ভাবে সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সভায় উপস্থাপিত কার্য্য-বিবরণী হইতে তাহাদের বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ম্মীদিগকে কার্য্য-ক্ষেত্রে যে-সকল অসুবিধায় পড়িতে হয় সভায় তৎসম্বন্ধেও আলোচনা হয়। অবশেষে ক্ষেত্র এবং উদ্যানজাত শস্য, তরিতরকারি ইত্যাদি প্রদর্শিত হইলে পর সভ্যবৃন্দ নৃত্য গীত ও আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে। সঙ্ঘ-নেতার অধিনায়কত্বে পরিচালিত এই সমস্ত অনুষ্ঠানে সভ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য কাউন্টি এক্সটেনশ্যন এজেন্ট উপস্থিত থাকেন।

বালক এবং বালিকা স্কাউট—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত 'গার্ল স্কাউটে'র সভ্য-সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষেরও অধিক। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সঙ্ঘ-জীবন, স্বাস্থ্য, চারু ও কারুশিল্প, সাহিত্য ও নাট্যকলা, নৃত্য-গীত প্রকৃতি পরিচয়, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদি বিভিন্ন এবং বিচিত্র বিষয়ের চর্চ্চা হইয়া থাকে। যে-সমস্ত বালিকার মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহারা স্কাউটের সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সভ্যদের ধর্ম্ম-জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে সচেতন।

"দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" আদর্শই আমেরিকার তরুণ-সম্প্রদায়কে সঙ্ঘ গঠনে উৎসাহিত করে। কাজের সঙ্গে-সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ উপভোগের ব্যবস্থাও এই সমস্ত ক্লাবে আছে। বস্তুতঃ আমেরিকার সঙ্ঘসমূহে কাজ এবং খেলা এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। তাই দেখা যায়, সভার কাজ শেষ হইবার পরই সভ্য-



৪-এইচ ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক গো-মহিষাদির পরিচর্য্যা

জুনিয়ার রেডক্রশের সহযোগিতায় তাহারা হাসপাতালে রুগ্ন শিশুদের সেবাশুশ্রূষার ভারও গ্রহণ করিয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য—অব্যবহৃত কাগজ, সৈন্যদের জন্য পুস্তক-পত্রিকা, লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড রবার, নানা প্রকার ধাতুখণ্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া বয়স্কাউটরা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র দুই মাসের মধ্যে স্কাউটরা পুনর্ব্যবহারের জন্য এক লক্ষ টন বাজে কাগজ যোগাড় করিয়াছিল।

৪-এইচ ক্লাবের সভ্যদের কোনো কোনো কাজে তাহাদের সহজাত সৌন্দর্য্যবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের অধ্যুষিত

গণ খেলাধুলায় মাতিয়া উঠে, কিম্বা সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া চড় ইভাতি করিতে যায়। কখনও বা তাহারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ পরিভ্রমণ করিতে বাহির হয়, সময় সময় সখের নাট্যাভিনয়ও করিয়া থাকে।

প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করে, তন্মধ্যে অধিকাংশই সঙ্ঘসমূহের সভ্য। উন্নত পর্ব্বত, হ্রদ, এবং সমুদ্রতীর অথবা মরুভূমিতে দীর্ঘ অবকাশ যাপন করায় প্রকৃতির সঙ্গে হয় তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। প্রকৃতির রম্য নিকেতনে, নাট্যাভিনয় এবং সঙ্গীতমুখরিত তাহাদের সাময়িক আবাসগুলিতে আনন্দের ফোয়ারা যেন সহস্রধারায় উৎসারিত হইতে থাকে। গার্ল স্কাউটের অন্তর্ভুক্ত বালিকারা মুক্ত জীবনানন্দ উপভোগ করিবার জন্য অশ্বারোহণে, দ্বিচক্রযানে অথবা পদব্রজে প্রকৃতির রমণীয় অঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হয়। দীর্ঘ পথ পর্য্যটনের পর মাঝে মাঝে তাহারা তারাভরা আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রান্তরে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন হয়।

প্রত্যেক ষ্টেটের গ্রামাঞ্চলের তরুণ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের গবেষণাকার্য্য এবং ইহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাজধানী ওয়াশিংটনে জাতীয় ৪-এইচ ক্লাবের এক বিরাট্ সম্মেলন হয়। ইহাতে যোগদান করিয়া দেশের এই সমস্ত ভাবী জননায়কেরা এক দিকে যেমন তাহাদের জাতীয় গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, অন্য দিকে তেমনি কৃষি সম্প্রসারণ কার্য্যকে কি ভাবে ব্যাপকতর করা যায়, সম্মেলনে সমবেত সমগ্র দেশের বালক-বালিকাদের সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে পারে।

গার্ল স্কাউটরা ফরেস্ট-রেঞ্জারের সাহায্যকারিণীরূপে জাতীয় অরণ্য-সম্পদ-সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতেছে। তাহাদের উদ্যোগে জায়গায় জায়গায় শিশুমঙ্গল-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,

অঞ্চলের শোভাবৃদ্ধিকল্পে তাহারা স্কুল-প্রাঙ্গণে, টাউনহলে এবং পথিপার্শ্বে ফুলগাছের চারা রোপণ এবং লতাকুঞ্জ রচনা করে। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি এবং কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে উত্তমরূপে গো-পালনাদির জন্য সমগ্র দেশব্যাপী যে বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও তাহারা যোগদান করিয়া থাকে।

কৃষিকর্ম্মে সহায়তা—যুদ্ধের সময় কৃষিকর্ম্মে সহায়তা করিয়া আমেরিকার তরুণ-সঙ্ঘসমূহ দেশের কত যে উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেশের অগণিত কৃষিজীবী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য হওয়ায় কৃষিকার্য্যের জন্য অতিরিক্ত সাহায্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ফসল পাকিলে পর এই প্রয়োজনীয়তা অধিকতর উপলব্ধ হয়। তখন গ্রীষ্মাবকাশে তরুণ সম্প্রদায় দলে দলে পল্লীগ্রামে চলিয়া যায় এবং শস্যক্ষেত্রে গিয়া ফসল-কাটায় রত হয়। ইহাতে এক দিকে তাহারা লাভ করে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিবার আনন্দ, তার উপর পল্লীজীবন সম্বন্ধে যে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় সেটুকু ত তাদের উপরি-পাওনা।

গার্ল স্কাউটরাও তরিতরকারি ইত্যাদি উৎপাদন করিয়া কৃষিকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে। কোন এক ক্যাম্পের গার্ল স্কাউটরা নিকটবর্ত্তী এক কৃষিজীবীকে এই মর্ম্মে পত্র লেখে যে, যদি সে ক্যাম্পের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত তরিতরকারি উৎপন্ন করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা শুধু সেগুলি ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, তাহার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রত্যহ 'সিনিয়র সার্ভিস স্কাউট ইউনিট' হইতে কুড়িজন করিয়া সাহায্যকারীও পাঠাইবে। কৃষক ইহাতে রাজী হইল এবং প্রচণ্ড উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য বারের দ্বিগুণ তরিতরকারি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল।

কৃষি এবং খাদ্য-সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে ডাক পাঠাইয়া

ছিয়াছিল কিন্তু ৪-এইচ ক্লাবের সভ্যগণ। সমগ্র দেশে লক্ষাধিক তরুণ, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে "১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক জন সৈনিককে খাওয়াইব" মনে মনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অধিকতর খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে ব্রতী হয়। ৪-এইচ ক্লাবের এই সমস্ত বালক-বালিকারা সাকুল্যে ৬,০০০,০০০ বুশেল (এক বুশেল প্রায় সাড়ে নয় সের) তরিতরকারি উৎপাদন, ৯,০০০,০০০টি মুরগী, এবং ৬০০,০০০টি গবাদি পশুপালন এবং ১৬,০০০,০০০টি আধার ভর্ত্তি খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ঋতুতে, শস্য কর্ত্তন কালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলে ক্যাম্প করিয়া তরুণ-তরুণীরা এক সঙ্গে কাজ করিয়াছিল। এই সমস্ত ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'বয় এবং গার্ল স্কাউট' ও 'ওয়াই এম সি-এ' এবং 'ওয়াই ডবল্যু সি'-এর উদ্যোগে। সারাদিন তরুণ-তরুণীরা ক্ষেতে অথবা ফল-বাগানে কাজ করিত। কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য সকলে একত্র সমবেত হইত, নাচগান, হাসিহল্লা এবং বাজি পোড়ানোর ধুম পড়িয়া যাইত, সমুদ্রতীর মুখরিত হইয়া উঠিত তরুণ কণ্ঠের আনন্দ-কলরব আর সঙ্গীতধ্বনিতে।

ওঁ মণিপদ্মে হুঁ

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

ভারতবর্ষে হিন্দুগণের নিকট বেদোক্ত গায়ত্রী মন্ত্র যেরূপ পবিত্র, তিব্বত নেপাল চীন ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধগণের নিকট 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রটিও সেইরূপ পবিত্র। তিব্বতের যেখানেই যাওয়া যায় সেইখানেই এই মন্ত্র-অঙ্কিত চক্রধ্বজাদি দেখা যায়। তিব্বতীয়দের বিশ্বাস যে এই মন্ত্রজপে দেবতার প্রসন্নতালাভ ও মহাপুণ্য অর্জ্জন হয়। তিব্বতের নগরে গ্রামে পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে এই মন্ত্র-লিখিত অসংখ্য প্রার্থনাচক্র দৃষ্ট হয়। পথচারীরা তাহা ঘুরাইয়া মন্ত্রজপের ফললাভ করেন। মন্ত্রজপের এই অভিনব পন্থা তিব্বতীরাই আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চক্র-ঘুরানো লইয়া অনেক সময়ে দুই প্রতিযোগী ভক্তদলের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়া যায়। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ তাঁহার *Buddhism* গ্রন্থে এই বিষয়ে এক মজার গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "জনকতক ফরাসী খৃষ্টান মিশনরি একদিন এক বৌদ্ধমঠের নিকটস্থ একটি মন্ত্রচক্রের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন দুইজন লামার মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। ব্যাপার এই যে, তাঁহাদের একজন চাকা ঘুরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছেন হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখেন আর একজন লামা সে চাকা থামাইয়া নিজেরটিতে পুণ্যের ঝোঁক পাড়িবার অভিপ্রায়ে চাকা ঘুরাইয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরিয়া তার চাকা বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার আপনি ফিরাইয়া দেয়। এ বলে আমি ঘুরাইব, আমার চাকায় তুমি কেন হাত দাও? ও বলে আমি ঘুরাইব, তুমি কেন হাত দাও? ক্রমে উভয়তঃ গালাগালি, শেষে গালাগালি হইতে মারামারি। অবশেষে একজন বৃদ্ধ লামা বিবাদস্থলে আসিয়া উভয় পুণ্যকামীর কল্যাণার্থ স্বহস্তে চাকা ঘুরাইয়া উহাদের কলহ মিটাইয়া দেন।"

ডাক্তার রামদাস সেন লিখিয়াছেন,—"বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। এক সময় "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।"*

নেপাল ও ভুটানের বৌদ্ধগণ আমাদের দেশের নগর-কীর্ত্তনের মত বাদ্যভাণ্ডসহকারে পথ দিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যায় তাহা এই 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রেরই একটি ভিন্ন রূপ বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রটি এই—

ওমে গুরু পেমে হু
পেমে গুরু ওমে হু।

বৌদ্ধদের এতাদৃশ সুপবিত্র মন্ত্রের নিগূঢ় অর্থ যে কি, তাহা অস্মদ্দেশের পণ্ডিতগণ ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই প্রার্থনা মন্ত্র রচিত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'পদ্মে মণি' এই দুই শব্দের যে কি নিগূঢ় অর্থ তাহা তাঁহারাই জানেন। এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ধর্ম্মপাল মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন।"* সত্যেন্দ্রনাথ নিজে এই মন্ত্রের অর্থ অনুমান করিয়াছেন—"হৃৎপদ্মে ধর্ম্মের মণি।"*

ডাক্তার রামদাস সেন লিখিয়াছেন;—"পদ্মমধ্যে মণির আধারে বুদ্ধদন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ"—এই বৌদ্ধমন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।"† এই সম্পর্কে তাঁহার 'বুদ্ধদেবের দন্ত' প্রবন্ধে এই বিবরণটি লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। "দাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সাতান্ন শ্লোকে লিখিত আছে; ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংহের দন্ত তাঁহার নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশের দন্তপুর নগরাধিপ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্র করী এবং সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে দন্তপুরে অপর রাজগণের শাসন পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। দন্তপুরাধিপ গুহশিব বুদ্ধদন্তের বিবরণ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না। একদা তিনি নগরমধ্যে মহাসমারোহ দর্শনে প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য কি

* ঐতিহাসিক রহস্য, ২য় ভাগ 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন' প্রবন্ধ।

* সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম, ২২৬ পৃঃ।

† ঐতিহাসিক রহস্য, ২য় ভাগ, 'বুদ্ধদেবের দন্ত' প্রবন্ধ।

নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে ?" তাহাতে একজন বৌদ্ধঋষির ক্ষেমাচার্য্যের আনীত বুদ্ধদন্তের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধ-চরিত্রের প্রকৃত মহিমা অবগত হওয়ায় তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল এবং তিনি স্বরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষবাদিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ এইরূপে দন্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলিপুত্রাধিপ পাণ্ডুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অধীন নৃপতি চৈতন্তকে গুহসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পাটলিপুত্রে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চৈতন্ত অসংখ্য সৈন্ত সমভিব্যাহারে দন্তপুরে প্রবেশ করিলে, গুহসিংহ তাঁহাকে বন্ধুর ন্তায় আলিঙ্গন করিয়া রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনান্তর বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্মিল। গুহসিংহ চৈতন্তকে বুদ্ধদন্ত দেখাইলে তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ দন্তের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্ত ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাব বিস্মৃত হইয়া সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতন্তের সমভিব্যাহারে বৈরভাব পরিত্যাগ করতঃ মাণিক্যময় পাত্রে বুদ্ধদন্ত লইয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডু, চৈতন্ত ও তাঁহার সৈন্তগণের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং যে দন্তপ্রভাবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দন্তখণ্ড প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে দন্ত ভস্ম না হইয়া রথচক্রের ন্তায় বৃহৎ পদ্মমধ্যে মণিমাণিক্য আধারে কুন্দপুষ্পের শোভা ধারণ করিয়া রহিল।"

উপরোক্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার রামদাস সেন অনুমান করিয়াছেন যে, পদ্মমধ্যে মণির আধারে দন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' বৌদ্ধ-মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

কেহ বলেন, তিব্বতের রাজা স্রোমংসন-গম্পো নিজে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই মন্ত্র প্রচলিত করেন ও জপবিধি শিক্ষা দেন।* এই রাজারই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজা খি-স্রোম্ ভারত হইতে শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আনয়ন করেন।

'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রের 'ওঁ' অংশটি বেদ হইতে গৃহীত। উহা ব্রহ্মের বাচক প্রণব। শেষের 'হুঁ' অংশটি তান্ত্রিক বীজ। গুহসমাজ বা তথাগত-গুহক নামে তন্ত্রটি সর্ব্বপ্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া সুধীসমাজে পরিচিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ যোগাচার মত প্রবর্ত্তক অসঙ্গ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। এই প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্রে 'ওঁ' 'হুঁ' প্রভৃতি বীজ-মন্ত্রের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যথা—

"হুঁকারং চ ওঁকারং চ পঁকারং চ বিকল্পয়েৎ।
পঞ্চরশ্মি সমাকীর্ণং বজ্রপদ্মং চ ভাবয়েৎ ॥"

"ওঁকারং জ্ঞানহৃদয়ং কায়বজ্র সমাবহম্।"
"হুঁকারং কায়বাক্‌চিত্তং ত্রিবজ্রাভেদ্যমাবহম্।"
"ওঁকারং বুদ্ধকায়াগ্র্যং আঃকারং বাক্‌পথস্তথা ॥"
"হুঁকারং চিত্তজ্ঞানৌঘং ইদং বোধিনয়োত্তমম্।"
"হুঁকার কীলকং ধ্যাত্বা পঞ্চশূল প্রমাণতঃ।
বজ্রকীলং কৃতং তেন হৃদয়ে তদ্বিভাবয়েৎ।"
॥সর্ব্বধর্ম্মোত্তমো নাম সমাধি ॥
"ওঁকারগুটিকাং ধ্যাত্বা চণকাস্থিপ্রমাণতঃ।"
"হুঁকারগুটিকাং ধ্যাত্বা চণকাস্থিপ্রমাণতঃ।"
ততোমানি হৃদয় মন্ত্রাক্ষরপদানি।
হুঁ হঃ আঃ ঐঃ
হুঁকারে বজ্রসত্ত্বাত্মা হঃকারে কায়বজ্রিণঃ।
আঃকারে ধর্ম্মধরো রাজা ইদং গুহ্যপদং দৃঢ়ম্ ॥
ঐঃকারং ক্ষোভনং প্রোক্তং ভ্রমং কম্পনং স্মৃতম্।
এযো হি সর্ব্বস্তোভানাং রহস্যোঽয়ং প্রগীয়তে ॥*

এতদ্দৃষ্টে সিদ্ধান্ত এই হয় যে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রটি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যোগিগণের সমাধিসাধনার একটি মন্ত্রবিশেষ। 'মণি-পদ্ম' দেহমধ্যস্থ মণিপুর (নাভি) পদ্ম বা চক্র।† হিন্দুতন্ত্রে ও সহজিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেহতত্ত্ব সাধনার ষট্‌চক্রকে ষট্‌মণি নামেও অভিহিত করা হয়। 'মণিপদ্ম' শব্দে দেহমধ্যস্থ পদ্ম বা চক্রকে নির্দ্দেশ করিতেছে। হিন্দুতন্ত্রেও লিখিত আছে যে হুঁকার বীজ দ্বারা মূলাধার পদ্ম হইতে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ সাধন করিবে। (এইজন্ত শাস্ত্রান্তরে কুণ্ডলিনীকে 'হুংকারবীজোদ্ভবাম্' বলা হইয়াছে।) যথা—

"মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঁকারেণৈব কুণ্ডলীম্।
উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাঞ্চ তাম্।
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিয়োজয়েৎ।"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র, পঞ্চমোল্লাস)

'ভূয়স্তস্যোপরি ধ্যায়েৎ ঠকারচ্ছেতপঙ্কজম্।
পুনস্তস্যোপরি ধ্যায়েদ্ হুঁকারং নীলসন্নিভম্।'
(নীলতন্ত্র, ৪র্থ পটল)

এখানে নীলপদ্মে হুঁ বীজের কথা বলা হইয়াছে। হিন্দু-তন্ত্রমতে মণিপুর-চক্রেই নীলপদ্ম বিরাজিত। যথা 'দশপত্রং নীলবর্ণং সজলং ব্যোমরূপকম্'।‡ এই মণিপুর চক্র মণিগ্রন্থি নামেও অভিহিত। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এই মণিগ্রন্থি ভেদ করেন বলিয়া 'মণিগ্রন্থিভেদিনী' নামে পরিচিতা। যথা—

"বিজয়া কুলবীজস্থা তবর্গং তিমিরাপহা।
চন্দ্রাত্মিকা মণিগ্রন্থি ভেদিনী পাতু সর্ব্বদা।
ভগমালা ভৃগুসুতা পাতু মাং নাভিবাসিনী।"
(রুদ্রযামল, উত্তরখণ্ড, কুণ্ডলিনী কবচম্)

* বিশ্বকোষ, 'তিব্বত' শব্দ।

* শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রম্, Editor—B. Bhattacharyya, Gaekwad's Oriental Series, vol. LIII.

† বর্ত্তমানে তিব্বতের সাধারণ বৌদ্ধগণ দেহমধ্যস্থ চক্রের কথা ভুলিয়া গিয়া বাহিরে চক্র নির্ম্মাণ করতঃ উহাতে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' লিখিয়া ঘুরাইতেছে ও পুণ্যার্জ্জন করিতেছে।

‡ প্রাণতোষণী তন্ত্র, বসুমতী সংস্করণ, ৪৪২ পৃ.।

মণিসদৃশ ভিন্ন বলিয়া এই পদ্ম মণিপদ্ম বা মণিপুর নামে খ্যাত। যথা—

"মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে।"

হিন্দুতন্ত্রমতে মূলাধার কিংবা নাভিপদ্ম-মণিপুর হইতে 'কুণ্ডলিনীর জাগরণ' সাধন করা হয়।* তবে যোগীরা বলেন যে ষট্চক্রের যে কোন চক্র বা পদ্ম হইতেই 'কুণ্ডলিনীর জাগরণ' সাধন করা যায়।

এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রের মণিপদ্ম এবং হিন্দুতন্ত্রের মণিপুর বা মণিগ্রন্থি এক ও অভিন্ন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ হুঁ মন্ত্রে এই মণিপদ্ম বা মণিগ্রন্থি হইতে 'কুণ্ডলিনীর জাগরণ' সাধন করিতেন। বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগিগণের মধ্যে যে কুণ্ডলিনী সাধনা প্রচলিত ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধতান্ত্রিক কৃষ্ণাচার্য্যের পদে ষটচক্রসাধন সম্পর্কীয় ব্রহ্মনাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়।† এতদ্ব্যতীত গোরক্ষনাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ষট্চক্র সাধনসম্পন্ন যোগিগণ নেপাল, তিব্বতের বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের নিকট সিদ্ধগুরু বলিয়া পরিচিত। তিব্বতে তাঁহারা ৮৪ সিদ্ধ মহাজনের অন্তর্গত। বৌদ্ধ গুহ্য সমাজতন্ত্রেও কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পর্কীয় রাহস্যিক আলোচনা আছে। উক্ত তন্ত্রে এই শক্তি অগ্নি নামে অভিহিত। যথা—

তদ্যথা অপি নাম কুলপুত্রাঃ কাণ্ডং চ মথনীয়ং চ পুরুষ হস্ত ব্যায়ামং চ প্রতীত্য ধূমঃ প্রাদুর্ভবতি। অগ্নিমভিবর্ত্তয়তি স চাগ্নির্ণ কাণ্ডস্থিতো ন মথনীয়ীয়স্থিতো ন পুরুষহস্তব্যায়ামস্থিতঃ এবমেব কুলপুত্রাঃ সর্ব্বতথাগতবজ্রসময়া অনুগন্তব্যাঃ। গমনা-গমনাদ্যেরিতি।

"For instance, Oh Kulaputras, it is well-known that smoke originates from the combination of three factors: namly, the churning rod (Kanda), the churning pot (Mathaniya), and the efforts made by the hands of a person (purusa-hasta-vyayama). From that smoke fire is generated. That fire does not reside either in the churning rod or in the churning pot or in the effort made by the hands of a person. Thus, O Kulaputras the conduct of the Tathagatas should be understood, i, e, constant coming and going.

বৌদ্ধ গুহ্যসমাজতন্ত্রের এই অগ্নি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—

'The fire in the above example is the Kundalini power, which is independent of the Yogi or the Sakti, just as the fire is independent of the churning rod or the churning pot.'*

প্রবাদ, তিব্বতের রাজা স্রোন্‌ৎসন্‌-গম্পো 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সম্বলিত খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন এবং উহার জপবিধি জনসমাজে প্রচলিত করেন। রাজা থি-স্রোণ নিজে একজন যোগী ছিলেন। ভারতের পদ্মসম্ভব নামে একজন যোগী রাজাকে যোগ-শিক্ষা দেন। রাজা ও ছাব্বিশজন শ্রমণ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। তৎপরে ধর্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতে যান। ধর্ম্মকীর্ত্তি বজ্রধাতুযোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুপ্তরহস্য শিক্ষা দেন।

নেপালে যে বৌদ্ধতান্ত্রিক মত প্রচলিত রহিয়াছে, কেহ কেহ বলেন যোগাচার মতের প্রবর্ত্তক অসঙ্গই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যোগসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃকই নেপাল এবং তিব্বতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মতের প্রচলন হইয়াছিল। নাগার্জ্জুনের মতে গো নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত কর্ত্তৃক তিব্বতে সমাজগুহ্যমত প্রচারিত হয়। এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতন্ত্রানুসারে সমাজগুহ্যমত, মাতৃতন্ত্রানুসারে মহামায়া অনুষ্ঠান, বজ্রহর্ষ এবং সম্বর-অনুষ্ঠান-বিধি প্রচলিত করেন। যে স্রোন্‌ৎসন্‌-গম্পো নামক তিব্বতরাজ সর্ব্বপ্রথমে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা দেন, তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ-নামক আচার্য্য-দ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন করেন। ইঁহার পাঁচ পুরুষ পরে রাজা থি-স্রোন্ প্রথমে শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। তৎপরে তন্ত্রমত শিক্ষাদানার্থ শান্তরক্ষিতের অনুরোধে পদ্মসম্ভবকে আনানো হয়। শান্তরক্ষিত দুল্ব (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন। পদ্মসম্ভব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারত হইতে তিব্বতে গমন করেন। তিনি তদানীন্তন তিব্বতরাজকে তন্ত্রসূত্র সকল শিক্ষা দেন। এইরূপে ভারত হইতে বহু পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছিলেন।

কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেন যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত ভগবান বুদ্ধদেবের অনুমত নহে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র যাঁহারা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে বুদ্ধোপদিষ্ট অনাপানসতি প্রক্রিয়া তন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম পদ্ধতি ব্যতীত অন্য আর কিছু নহে। ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক তন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম পদ্ধতিরই একটি অঙ্গ। এই ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক সহায়ে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়, এ বিষয় তন্ত্রে উল্লিখিত রহিয়াছে। মহাসত্যক সূত্রে বুদ্ধদেব 'অনাপানসতি' ও 'অপ্রাণক' ধ্যানের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে উহা যথা-

* ভোজদেব বিরচিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রবৃত্তিতে বলিয়াছেন 'উদ্ঘাতো নাম নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভিহননম্ (সাধনপাদঃ, ৫০ সূত্র)। এই 'উদ্ঘাত'কে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রাজযোগ গ্রন্থে 'কুণ্ডলিনীর জাগরণ' বলিয়াছেন।

† বৌদ্ধ গান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত।

"নগর বাহিরিরে ডোম্বি (কুণ্ডলিনী) তোঁহারি কুড়িয়া, ছুই ছোই যায় গো বাহ্মনাড়িয়া"

* শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রম্, Introduction, XXIV-XXV

ক্রমে তন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম ও তন্ত্রাখ্য কুম্ভকের বর্ণনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।*

এই জন্যই ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন, "But one thing is cerain that Buddha knew some of the Tantric practices and gave lessons on them to his favourite disciples." (C. H. I., vol. II, 209)

আর এইজন্যই তারাতন্ত্রে বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠ উভয়কেই তান্ত্রিক মুনি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যোগতন্ত্রমার্গেই নির্ব্বাণ বা শূন্যতত্ত্ব লাভ হয়, এই কারণে আগমতত্ত্ব বিলাসে নির্ব্বাণকে যোগক্রিয়াবিশেষ বলা হইয়াছে। অন্যত্র নির্ব্বাণ 'অপ্রাণক' ধ্যান বা কুম্ভক নামেও অভিহিত। যথা—"নির্ব্বাণং কুম্ভকং বিদুঃ" বৌদ্ধশাস্ত্রে যে 'শূন্যতা সমাপত্তি' 'শূন্যতা সমাধি' প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই যোগতন্ত্রোক্ত ধ্যানসমাধিমার্গেই উপলব্ধি করা যায়। দার্শনিকের যুক্তির সাহায্যে এ তত্ত্বলাভ হয় না। হিন্দুতন্ত্রেও নির্ব্বাণকে যোগক্রিয়াই বলা হইয়াছে। যথা—

"অথ বক্ষ্যামি নির্ব্বাণং শৃণু সাবহিতানঘে।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুদ্ধরেৎ।
ততো মূলং মহেশানি ততো বাগ্‌ভবমুদ্ধরেৎ।
মাতৃকান্তে সমস্তান্তে পুনঃ প্রণবমুদ্ধরেৎ।
এবং পুটিতমূলন্তু প্রজপেন্মণিপূরকে॥"
"মণিপূরে তু নির্ব্বাণং মহাকুণ্ডলিনীময়ং।"
(প্রাণতোষণীতন্ত্র, বসুমতী সংস্করণ, ২২৪, ২২৫ পৃ)

শূন্যতত্ত্ব যে এই যোগতন্ত্রমার্গেই উপলব্ধি করা যায়, ইহারও যথেষ্ট উল্লেখ হিন্দু যোগতন্ত্র শাস্ত্রে আছে। যথা—

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েৎ শূন্যং অহর্নিশং।
অয়মেকোঽপিসঙ্কেত আদিনাথেন ভাষিতঃ।
নাসাগ্র দৃষ্টিমাত্রেণ পরমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শিরপদ্মে তু ভর্গস্য ধ্যানং মৃত্যুঞ্জয়ঃ পরঃ॥ হুঁ॥
(প্রাণতোষণী, ৪৪০ পৃ.)

এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার বুদ্ধদেব গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন;—"শূন্যই যোগীর পরম ধ্যেয় পদার্থ...বুদ্ধদেব এই পদার্থের বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন—'অনক্ষরস্য ধর্মস্য শ্রুতি কা দেশনা চ কা।' আর বেদ যে পদার্থের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—সেই পদার্থ শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

যোগতন্ত্র মার্গেই এই শূন্যতত্ত্ব লাভ হয়। পদ্মকর্প নামে তিব্বতের একজন লামা (খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) বলিয়াছেন—"যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ত্ব অবগত নহে, সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সন্দেহ নাই। ভগবান্ বজ্রসত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট মার্গের বহু দূরে সে বিচরণ করে।"*

ভারতের সাধিকা সহজীবাঈও বলিয়াছেন—

'ন সুখ বিদ্যাকে পড়ে না সুখ বাদ বিবাদ।
সাধ সুখী সহজী কহে লাগী শূন্য সমাধ॥'

বিদ্যা লাভে সুখ নাই, বাদ বিবাদেও সুখ নাই। সহজী বলেন, কেবল সাধুই সুখী; কেন না তিনি শূন্যে সমাধি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে পবিত্র যোগতান্ত্রিক সাধনার নামে ধর্ম্মে বিস্তর আবর্জ্জনার প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। তান্ত্রিকাচার্য্যগণের জ্ঞানদীপ্তিতে ও অলৌকিক শক্তির দিব্য বিভায় সমগ্র এশিয়াখণ্ড একদিন আলোকিত ছিল। কালবশে ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইয়া সকলই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

* এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে মৎপ্রণীত 'বুদ্ধলীলামৃত' ২য় খণ্ডের মুখপত্র ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

* E. Schlagintsweit's *Buddism in Tibet*, p. 49.

ত্রিবেণী

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

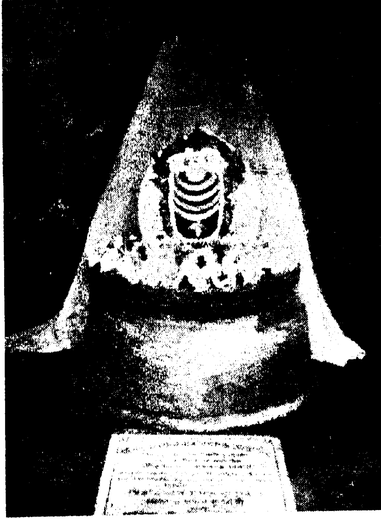
বর্ত্তমানে ত্রিবেণী হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি সামান্য স্থান হইলেও সুদূর অতীতকাল হইতে ইহা ভারতের একটি প্রধান বন্দর এবং হিন্দুদিগের নিকট একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর মিলনস্থান বলিয়া ইহা ত্রিবেণী নামে পরিচিত—"ত্রিস্রো বেণ্যঃ বারি[illegible] বিযুক্তা সংযুক্তা বা যত্র।" এলাহাবাদেও গঙ্গা, যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতী মিলিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত স্থানও ত্রিবেণী বলিয়া অভিহিত; তবে উহাকে 'যুক্তবেণী' বলে এবং এই স্থানে নদী তিনটি মুক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'মুক্তবেণী' বলে। প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই 'ত্রিবেণী' নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"ন মাধব সমো দেবো ন চ গঙ্গা সমা নদী।
ন তীর্থরাজসদৃশং ক্ষেত্রমস্তি জগত্রয়ে।"

অর্থাৎ মাধব সদৃশ আর দেবতা নাই, গঙ্গা সদৃশ আর নদী নাই এবং ত্রিজগতে ত্রিবেণী সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আর কোথাও নাই। পণ্ডিত রঘুনন্দনও তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে' লিখিয়াছেন—

"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামো খ্যা,
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ।"

দশম শতাব্দীতে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস 'মনসামঙ্গল' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে ত্রিবেণীর যে বিবরণ আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

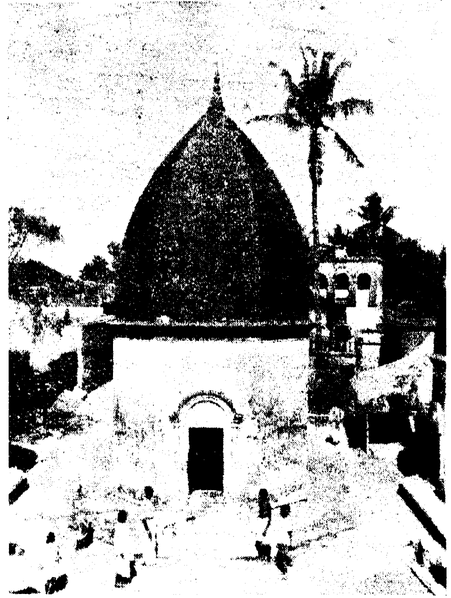


ত্রিবেণীর বেণীমাধবের মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ
[ফটো—শ্রীসুধীর মিত্র

"দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গা চাঁদরাজা মনে রঙ্গা
কুলেতে চাপায় মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ
ভক্তিভরে পুজে মহেশ্বর॥
তীর্থ কার্য্য সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥"

বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ ত্রিবেণীকে—ত্রিপানি, তারবানি, ত্রিভেণী, তিরপুর্ণী, ত্রিপিনা প্রভৃতি বহু নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—"The Portuguese, Ptolemy and the natives now call it Tripina but incorrectly." (*Calcutta Review*, 1846, page 408) অর্থাৎ পর্ত্তুগীজগণ, টলেমি এবং দেশীয় ব্যক্তিগণও এই স্থানকে অশুদ্ধ ভাবে ত্রিপিনা বলিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাযাত্রা' নামক কবিতায় ত্রিবেণীকে "তিরপুর্নি" বলিয়া একটি পল্লী বালকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। একটি বালক গঙ্গায় একখানি নৌকা দেখিয়া তাহার মায়ের নিকট বলিতেছে যে, যদি সে ঐ নৌকাখানি পায় তাহা হইলে সে বহু স্থানে বেড়াইতে যাইবে এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কোলে শুইয়া সেই সমস্ত গল্প তাঁহাকে বলিবে। নিম্নে 'নৌকাযাত্রা' হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল :

"দুপুরবেলা তুমি পুকুর ঘাটে
আমরা তখন নূতন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপুর্ণির ঘাটে
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠে



ত্রিবেণীর বেণীমাধবের মন্দির। এই মন্দিরের ডানদিকে তিনটি এবং বামদিকে তিনটি অনুরূপ মন্দির আছে
[ফটো—শ্রীসুধীর মিত্র

ফিরে আসতে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'চণ্ডীতে' লিখিয়াছেন—

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
গর্ভে বসে শিবপূজা করে কোন জন।
ব্রাহ্মণের সাথে কেহ করয়ে তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে॥"

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবতেও ত্রিবেণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"কথোদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবীর সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম॥"



বিশালকায়া সরস্বতী নদীর বর্ত্তমান অবস্থা

[ফটো—শ্রীবিষ্ণুপদ কর

'আইন-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফজল ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হেজ (William Hedges) এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্রাভোরিনাস্ (Stravorinus) ত্রিবেণী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ডু-বারো (De-Barros) এবং ব্যালেভ (Balev) তাঁহাদের মানচিত্রে ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'পবন-দূতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যে এবং 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থে ত্রিবেণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"The maps also agree with Abul Fazel's statement in the *Ain*, that at Tribeny there are three branches, one of the Saraswati, on which Satgaon lies, the other the Ganga now called the Hugli and the third the Jan or Jabuna (Jamuna). De-Barro's and Blaev's maps show the three branches of almost equal thickness." (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1873, p. 214)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সমান গভীরতা ছিল।

সপ্তগ্রামের সহিত ত্রিবেণী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ; সপ্তগ্রাম ভারতের অন্যতম প্রাচীন শহর ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ-সকল সপ্তগ্রাম যাতায়াত কালে ত্রিবেণীতে নোঙর করিত তাহা প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়া গিয়াছেন।

"That the ships near the Godaveri sailed from thence to Cape Palimerus, thence to Tennigale opposite Fulta, thence to Tribeni and thence to Patna."

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ও পরবর্ত্তী গ্রন্থ-কারদের গ্রন্থ হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যস্থান ছিল ; কিন্তু ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গঙ্গার গতির পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই জন্ত সরস্বতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ মজিতে আরম্ভ করে। সেইজন্ত সরস্বতী তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভেও ত্রিবেণীর খ্যাতি যে যথেষ্ট ছিল, তাহা নিম্নের কয়েক ছত্র হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"Tribeni retained its fame in the early Muslim period and is still one of the most sacred spots of Bengal." (*History of Bengal*, R. C. Mazumdar. P. 33)

পশ্চিম বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত পূর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী এই চারিটি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল ; এই চারিটি স্থানকে তৎকালে চারিটি সমাজ বলিত। ত্রিবেণীতে যে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, সেই কেন্দ্রে ত্রিশটির অধিক টোল ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে মকর-সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ, বিষ্ণু সংক্রান্তি, দশহরা, বারুণী, অর্দ্ধোদয় যোগ, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত এবং তদুপলক্ষে মেলা বসিত। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন একটি যোগে একমাত্র উড়িষ্যা হইতেই ত্রিশ হাজার যাত্রী ত্রিবেণীতে সমাগত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ত্রিবেণী মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে জাফর খাঁ সর্ব্বপ্রথম রাজত্ব করেন। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাফর খাঁ সপ্তগ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। জাফর খাঁ বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপাদান হইতে পাঁচটি গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। এই মসজিদের পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীরে জাফর খাঁ এবং তাঁহার পুত্রগণের সমাধি দৃষ্ট হয়। যে স্থানে তিনি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি মন্দির ছিল। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মসজিদের মধ্যে আটখানি শিলালিপি আছে। উক্ত শিলালিপির পিছনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ তুর্কীজাতীয় ছিলেন, বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিবার জন্য ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে জাফর খাঁ বঙ্গেশ্বরের সৈন্তাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সপ্তগ্রাম অভিযানের পূর্ব্বে ইনি দেওকোট শাসন করিতেন।

জাফর খাঁ পাণ্ডুয়ার গো-হত্যা ঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহ্ সুফির পিতৃব্য হইতেন। জাফর খাঁর সহিত ভুদিয়ার রাজার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে, তাঁহার নির্ম্মিত মসজিদের প্রাঙ্গণে তাহাকে সমাহিত করা হয়। জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বরখান গাজী হুগলীর রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন ; উক্ত রাজকন্যার সমাধিও এই স্থানে থাকায় ইহা হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। মসজিদটি দুইটি প্রাচীরে বেষ্টিত। বাহিরের প্রথম প্রাচীরটি সুবৃহৎ বাসাল্ট প্রস্তরে (basalt stone) নির্ম্মিত এবং হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া যে পাথরগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গার ধারে প্রাচীরগাত্রের পাথরগুলিতে বহু হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মূর্ত্তি ও পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপাদির মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরগাত্রে ভূমি হইতে প্রায় আট ফুট উর্দ্ধে একটি লৌহদণ্ড প্রোথিত আছে—উহা জাফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্রের হাতল ছিল ; উক্ত লৌহ-দণ্ডকে "গাজীর-কুড়ুল" বলিয়া অভিহিত করা হয়। লৌহ-দণ্ডটি নাড়াইলে নড়ে, কিন্তু প্রাচীর হইতে পড়িয়া যায় না বলিয়া প্রবাদ আছে যে "গাজীর কুড়ুল নড়ে-চড়ে, পড়ে না।"

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্রাভোরিনাস ত্রিবেণী পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

About an hour before we came to Terbonee, we entered another wood, into which having advanced a little, we met with an ancient building, of large square stones, which seemed as hard as iron; for whatever pains we took, we could not, with a hammer, break any pieces off. The building was an oblong square 30 feet in length and 20 in breadth. The walls were 13 or 14 feet in height. It had no roof, and within it were three (?) tombs, four feet above the ground, made of a blackish kind of stone and polished, with here and there some Persian character engraved upon them. About 40 paces further was a large but very ruinous building, the roof of which consisted in fine domes or cupolas which has been adorned with sculptured imagery, but which was much obliterated.

প্রথম বেষ্টনীর মধ্যে কুড়ি ফুট লম্বা ও তের ফুট চওড়া একটি বেদীর উপর চারিটি সমাধি আছে, কিন্তু ষ্ট্রাভোরিনাস তিনটি সমাধির উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ একটি সমাধি তাঁহার পরিদর্শনের সময় জঙ্গলাবৃত ছিল বলিয়া তিনি দেখিতে পান নাই। এই সমাধিগুলির মধ্যে প্রথমটি জাফর খাঁ গাজীর তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী, এবং অন্য দুইটি বর খাঁ গাজীর দুই পুত্র রহিম খাঁ গাজী এবং করিম খাঁ গাজীর। এই স্থানে একটি স্ত্রীলোকেরও সমাধি আছে কিন্তু উহা যে কাহার সমাধি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যেও চব্বিশ ফুট লম্বা ও পনর ফুট চওড়া একটি বেদীর উপর জাফর খাঁ গাজী, তাঁহার দুই পুত্র জয়েন খাঁ গাজী, ও গাঁয়েন খাঁ গাজী এবং বর খাঁ গাজীর হিন্দু স্ত্রীর (হুগলীর রাজকন্যা) সমাধি আছে। সমাধির উপর আরবী ভাষায় লিখিত একখানি কৃষ্ণবর্ণের শিলালিপি রক্ষিত আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্চাতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপিখানি পূর্ব্বে দেওয়ালের সহিত গাঁথা ছিল, বর্ত্তমানে উক্ত দেওয়াল ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় বোধ হয় উহা এই সমাধির উপর রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বেষ্টনীর মধ্যে "সীতা বিবাহঃ","শ্রীরামাভিষেক","চাণুর বধঃ", "কংস বধঃ", প্রভৃতি সংস্কৃত লিপি পাথরে খোদাই করা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু সংস্কৃত লেখা গাঁথুনি করিবার সময় উল্টাইয়া গাঁথা হইয়াছিল বলিয়া কয়েকটি সংস্কৃত লিপি উল্টা ভাবে আছে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডি, মনি নামক একজন ইংরেজ পরিব্রাজক ত্রিবেণী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও জাফর খাঁ গাজীর দরগায় সংস্কৃত শিলালিপি দেখিতে পান। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে একটি হিন্দু মন্দিরকে "জাফর খাঁ গাজীর দরগা"য় পরিণত করা হয়। দরগার যে অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, সেই অংশ একটু সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে উহা একটি হিন্দু মন্দিরের অন্তরালভাগ। প্রত্যেক দ্বারের উপরের খিলানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বহু কারুকার্য্য খোদিত আছে, তন্মধ্যে বহু হিন্দু মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ দিকের দ্বারে মূর্ত্তিগুলি চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে—কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম দ্বারের মূর্ত্তিগুলি এখনও সুস্পষ্ট আছে। কক্ষটিতে যে সকল সংস্কৃত শিলালিপি আছে তাহা উক্ত কক্ষে মহাভারত ও রামায়ণের দৃশ্যগুলির পরিচয়জ্ঞাপক



জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ—ত্রিবেণী

বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। দরগার উত্তর পূর্ব্বে ও উত্তর-পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ "সীতা বিবাহঃ", "শ্রীরামেণ রাবণ বধঃ", "খরত্রিশিরসো বধ," "শ্রীরামাভিষেকঃ", "ভরতাভিষেকঃ" "শ্রীসীতা নির্ব্বাসঃ" প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী অঙ্কিত ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

মহাভারতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে "ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনয়োর্যুদ্ধম্" "চাণুরবধঃ" "কংসবধ" প্রভৃতি চিত্র ও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে। মুসলমানেরা এই হিন্দু-মন্দিরের উপরিভাগ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা উহা দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটি সাধুর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি, ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তিও এই দরগায় আছে। যে স্থানে রুকনুদ্দিন-শাহের শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) খোদিত আছে, তাহার সম্মুখদিকে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। উহার পদদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উল্লিখিত হিন্দু মূর্ত্তিগুলি সম্ভবতঃ মুসলমানদের নিকট আপত্তিজনক হয় নাই বলিয়া দরগার শোভা বর্দ্ধনের জন্য থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দরগার সম্মুখে একটি প্রস্তরের উচ্চ মিনার ছিল, মিনারটি বর্ত্তমানে পড়িয়া গেলেও তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যে পাথরখানি পড়িয়া আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে আট ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট; ইহা ছাড়া একখানি গোল ঢাকনার ন্যায় পাথর (পরিধি চার ফুট) লম্বা মিনারটির সম্মুখে পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ মিনারটির উপর পূর্ব্বে উক্ত গোল পাথরখানি রক্ষিত ছিল।

ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া ব্লকম্যান সাহেব যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

The first which lies near the road leading along the bank of the Hughli, is built of large basalt stones said to have been taken from an old Hindu Temple, which Zafar Khan destroyed. Its east wall, which faces the river shows clear traces of mutilated Hindu idols and dragons, and fixed into it, at a height of about six feet from the ground, is a piece of iron said to be the handle of Zafar Khan's battle-axe." (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1870, p. 222)

সম্রাট আকবরের শাসনকালে সোলেমান কররাণী বাংলার



জোয়ারের সময় ত্রিবেণীর ঘাটের দৃশ্য

[ফটো—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কর

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মির্জ্জা নজৎ খাঁ সপ্তগ্রামের ফৌজদার ছিলেন। এই সময় বাংলার পাঠানদিগের সহিত মোগল সম্রাট্ আকবরের বিরোধ চলিতেছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় স্বাধীন হিন্দু রাজা হরিচরণ মুকুন্দদেব রাজত্ব করিতেন। তিনি আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে পাঠান রাজত্ব কিছুকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গবিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গার উপর তিনি একটি ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ত্রিবেণীতে রাজা মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিস্তৃত ঘাট অদ্যাপি তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তির সাক্ষ্যদান করিতেছে। এতগুলি সোপানবিশিষ্ট ঘাট কাশী ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'কালাপাহাড়' নাটকে রাজা মুকুন্দদেবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, 'হিন্দু রাজ্য-চিহ্নে'র জন্য ত্রিবেণীতে এই ঘাট নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। নিম্নে 'কালাপাহাড়' হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল।

"তিনশত বর্ষ বঙ্গ বিধর্ম্মীর করে।
দেবতার বরে অর্দ্ধ-বঙ্গ আজি পুন
হিন্দু অধিকারে, হিন্দু রাজ্য চিহ্ন এই
সোপান নির্ম্মাণ। রম্য দেবস্থান শুভ
দিন আজি, তাই কল্পতরু সুরধুনী—
তীরে, আমি উড়িষ্যার স্বামী অর্দ্ধবঙ্গ-
ভূমি অধিকারী আজি হউক প্রচার।"

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পর্য্যটন করিয়া 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামক পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন: মসরাইয়ে বাজার আছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া ত্রিবেণীর বাঁধাঘাট ঝাউতলাতে বাজার। মুক্তবেণী—দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পশ্চিমমুখে সরস্বতী, পূর্ব্ব মুখে যমুনা এই স্থানে মুক্ত হইয়াছেন। এখানে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।

জাফর খাঁ বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং গঙ্গার স্তবমালার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে যে স্তবটি আছে তাহা জাফর খাঁ (ওরফে দরাফ খাঁ) রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। জাফর খাঁর গঙ্গা-ভক্তির কারণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী হুগলীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত রাজকন্যার গঙ্গা-ভক্তির জন্যই জাফর খাঁ এবং তাঁহার পুত্রগণ গঙ্গাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হুগলীর রাজকন্যা গঙ্গার আরাধনা করিয়া বহু অলৌকিক কার্য্য করেন, তাহা দেখিয়া জাফর খাঁও গঙ্গাদেবীর পূজা করিতেন। তাঁহার রচিত স্তবের আরম্ভ এইরূপ—

"যৎত্যক্তং জননী-গণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
র্যস্মিন্ পান্থ দিগন্ত সন্নিপতিতে তৈ স্মর্য্যতে শ্রীহরি।
স্বাক্তে মজ্জ তদীদৃশং বপুরহো সংনীয়তে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসু ভাগীরথী।"

বহু প্রাচীনকাল হইতে ত্রিবেণী হিন্দুদিগের একটি মহাতীর্থ রূপে পরিচিত ছিল বলিয়া মুসলমানদের দৃষ্টিও ইহার উপর পতিত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলস্বরূপ কাশী প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলির ন্যায় এই স্থানের যাবতীয় বিধ্বস্ত হিন্দু-মন্দিরের উপাদান হইতে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে একমাত্র বেণী-মাধবের মন্দির অবশিষ্ট আছে। ত্রিবেণীর ঘাটের অনতিদূরে অবস্থিত এই মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে, ভাস্তাড়ার জমিদার রঘু-রাম সিংহ ১২৪৮ বঙ্গাব্দে উক্ত মন্দিরটিকে সংস্কার করিয়া উহার দুই দিকে তিনটি করিয়া আরও ছয়টি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত ছয়টি মন্দিরের গাত্রে "শকাব্দ ১৭৬৩—২০শে মাঘ" এই তারিখটি উৎকীর্ণ আছে, সুতরাং ঐ তারিখেই শিবস্থাপনা করা হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

ত্রিবেণীতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেকের বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করা সম্ভব না হইলেও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না বলিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। তাঁহার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 'জগন্

রাথ পিতার নিকটহইতে অল্প বয়সেই মুখে মুখে বহু শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থাকায় শ্রুতিধর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাল্যে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না বলিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য রাজা, মহারাজা ও জমিদারবৃন্দ তাঁহাকে বহু অর্থ ও ভূমি দান করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হিন্দু আইন প্রণয়নের বিশেষ ভার তিনি লইয়াছিলেন। ইনি 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ' এবং 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে বহু অর্থ পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎকালে ইংরেজ বিচারকের পার্শ্বে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিচার কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য বসিতেন। জগন্নাথ উক্ত কার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে 'জজ পণ্ডিত' বলিত। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০১ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ভাঙনের পর

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

প্রসাধন-টেবিলের বড় আরশিতে সুপর্ণার সুন্দর মুখের ছায়া দুলে উঠল।

আরাম করে হাই তুললে সুপর্ণা—এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। রবিবারের দুপুরটা না ঘুমিয়ে শুধু বই পড়ে, কি গল্প করে কাটানো……ভারি একঘেয়ে মনে হয় সুপর্ণার।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুপর্ণা তির্য্যক ভঙ্গীতে, এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগছে। অবিন্যস্ত খোপাটা একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে, চোখ মুখে তখনো জড়িয়ে আছে ঘুমের ছাপ। বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল সুপর্ণা অদ্ভুত, অপরূপ স্বপ্ন যার কোন মানে হয় না, আর মানে বোঝাতে গেলে নিজে জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পায় না, তবু প্রতিটি সপ্তাহে প্রতিটি ছুটির দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে সুপর্ণা, অথবা স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। দিবা-স্বপ্নের এমনি দুর্ব্বার আকর্ষণ।

সৌরভে আর স্বপ্নে ঘরের বাতাসে যেন মিষ্টি একটা আমেজ জড়িয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে এলে মেয়েদের ভারি সুন্দর দেখায় এমনি এলোমেলো পোশাকে, অসংলগ্ন চিন্তায়।

'সৌন্দর্য্যের রাণী'—উনিশ শ আটত্রিশ ইংরেজীর 'বিউটী কুইন' সুপর্ণা রায়—কথাটা আপন ক্ষোভেই যেন তার মনে প্রতিধ্বনি তুলল—সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণার ভঙ্গী কাঠিন্যে ঋজু ও প্রস্তুত হয়ে এল। না, এত বেশি তীক্ষ্ণ হলে তাকে মানায় না। চট্ করে শাড়ীটা জড়িয়ে নিলে, খোঁপাটা বাঁধলে। চুলের কাঁটা কোথায়—হেয়ার পিন্? কিন্তু, কিন্তু…নিজের অজ্ঞাতসারেই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সুপর্ণার। সত্যিই তার বয়স বাড়ছে—তার কোমল মুখে বয়স নির্ম্মম ছাপ রাখতে শুরু করেছে। তার মসৃণ গালে কুঞ্চন-রেখা—হ্যাঁ, খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। কাজল দিয়েও চোখের কোণের কালিকে ঢেকে ফেলা সহজ নয়—স্নো, ক্রীম, পাউডার, সেন্ট—প্রসাধনের সব অঙ্গরাগ দিয়েও সময়ের আঁচড়কে মুছে ফেলতে পারছে না সুপর্ণা। তারাকিশোর রায়ের কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করে, বাসর-শয্যার ফুল দল পায়ে দলে যে মেয়ে বুক ঠুকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, শুধু আত্ম-প্রত্যয়ের জোরে, সে এমনি করে, আপনার অজ্ঞাতসারে সময়ের করাল গহ্বরে অসহায় শিশুর মত নিজকে সঁপে দিচ্ছে।…সুপর্ণা আর ভাবতে চায় না—এ ভাবনার শেষ নেই। তার পথ সেই বিশেষ দিনটিতেই চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে গেছে।

কেন এমন হয়। নিজের ইচ্ছার পুতুল করে গড়ে তুলবারই যদি সাধ ছিল, তবে বাবা কেন তাকে মিশনারী স্কুলে পাঠিয়েছিলেন—কেন তাকে আপন খুশীর আনন্দে অ-সাধারণ হয়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছিলেন। '১৯৩৮ সালের বিউটী কুইন'—কাগজে কাগজে তার ছবি ছাপা হ'ল—বাবা নিজেই ত সকলকে ভোজে ডেকে আনলেন—ঘটা করে উৎসব হ'ল। তার বাবা হয়ত ভেবেছিলেন—ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত মেয়েরা তো নেহাতই নাবালিকা—তা করুক না দু'চার দিন হৈ-হুল্লোড়। তারপর বিয়ের আগে রাশ টেনে দিলেই চলবে। শাসন আর দণ্ডের প্রতীক তিনি, মানুষের মনকে হুকুম দিয়েই নিজের ইচ্ছামত চালনা করে এসেছেন চিরকাল, মেয়ের মতামতকে তাই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি। আর সুপর্ণা!

আপনার অসামান্য রূপের গৌরবে অকস্মাৎ সে একদিন স্ফীত হয়ে উঠল। তার স্বাধিকারপ্রমত্ততার উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত সে কি নীরবে সইতে পারে?

বহু পুরুষের মনে যার অপরূপ রূপের ছায়া—পুরুষের স্তব-গানে যার যৌবন হয়ে উঠল স্মরণীয়—তার বিয়ে হ'ল মফস্বলের এক উকীলের সঙ্গে—ছি, ছি, ছি,—সেই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়লেও তার গা রাগে রি রি করে উঠে। মানুষের একগুঁয়েমি আর অহমিকার এর চেয়ে উৎকট দৃষ্টান্ত আর কিছু হতে পারে না।

সুপর্ণার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক্ষুণি হয়ত টেলিফোনের আসবে। ভাল লাগুক আর নাই লাগুক রবিবার দিন অফিসার-দের ক্লাবে তাকে যেতেই হবে। একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত, না হয় পোশাকি বক্তৃতা—সেই প্রতিবারের পুনরাবৃত্তি—সেই ন্যাকামি ঢঙে নমস্কার, মিহিসুরে কথা বলা, শব্দহীন একটুখানি হাসি। অর্থহীন আলোচনা—যুদ্ধ, আবহাওয়া আর কলকাতার বাড়ী-

সমস্যা নিয়ে খুচরো মন্তব্য—অসুখের অজুহাতেও পালাবার উপায় নেই। মিঃ জানা পারেন ত গোটা ডাক্তারখানাটাই বাড়ীতে এনে হাজির করবেন।

টেলিফোনটা বেজে উঠল।

সুপর্ণা ঠিক জানত। এদের কক্ষনো ভুল হয় না। 'হ্যালো, কে, মিঃ জানা?'

'না, আমি, মানে, মিঃ পালিত স্পিকিং।'

হায় ভগবান! মিঃ জানা যদি একদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন মিঃ পালিত। তাকে খুশি করবার জন্যে এদের রেষারেষি সবচেয়ে কৌতুককর। বলবে নাকি—বড্ড মাথাব্যথা। থাক্, না গেলে আবার মাথাব্যথা সারাবার জন্যে বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। তার চেয়ে জ্বালাতন সইতে হয়—ক্লাবেই ভাল।

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মিঃ পালিত।'

'গাড়ী পাঠাব?'

'থ্যাঙ্ক্স, তার দরকার হবে না। আমি ট্রামেই যাব।' আর দেরি নয়, দিনটা সন্ধ্যার মরা আলোয় হারিয়ে যাচ্ছে। এবার সুপর্ণাকে তৈরি হতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

ক্লান্তির একটা বঙ্কিম রেখা ফুটেছে শরীরময়—অবসাদ আর আলস্যে নিজেকে শ্লথ করতে চাইলে সুপর্ণা। সন্ধ্যাটা সে নিজের খুশিমত হেলা-ফেলা করে কাটাবে—তার জো আছে নাকি। তার ঠোঁটে হাসির চমক ফুটল—বেদনা, না বিদ্রূপের? অতীত দিনের ঘটনাগুলো ছবির মত ভেসে ওঠে তার মনের পর্দায়। বিবাহ, বাসরশয্যা, পিতা ও সমাজকে উপেক্ষা করে সুপর্ণা সোজা চলে এল কলকাতায়—তার আই-সি-এস্ মামার বাড়ীতে। পিঠ চাপড়ে মামা শুধু তাকে উৎসাহই দিলেন না, বি-এ পর্য্যন্ত পড়ার খরচও দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

নিজেকে আপন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা সেদিন থেকেই শুরু হ'ল সুপর্ণার।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অনার্সে বি-এ পাস করার পরই প্রথম মফস্বলের একটা স্কুল সুপর্ণা রায়কে লুফে নিলে—'শিক্ষাব্রতে' হ'ল তার হাতে খড়ি। 'শিক্ষাব্রত'—মন্দ কি! অন্ততঃ মন্দ তো শোনায় না—দশজনের কাছে মুখরক্ষা করা চলে।...

"ঘরের সঙ্কীর্ণ সীমায় নারীকে বন্দিনী করে যাঁরা জাতীয় মুক্তির কথা জোরগলায় ঘোষণা করেন, তাঁরা শুধু দুষ্টক্ষতের মত সমাজদেহের অন্ধতা আর কুসংস্কারের পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে জাতির পতনকেই আসন্ন করে তুলছেন। সমাজের একটা অঙ্গ যদি আড়ষ্ট হয়ে পড়ে তাহ'লে গোটা সমাজটাই পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই আজ নারীকে পুরুষের সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজকে স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, সজীবতায় প্রাণচঞ্চল করে তুলতে হবে। সেই প্রাণবন্যা ধুয়ে মুছে দেবে আমাদের যুগ-সঞ্চিত পাপ আর গ্লানি। পরাজয় ও পরনির্ভরতা..."

এই বক্তৃতার পরই সুপর্ণা রায়ের নাম সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। তার বক্তৃতায় মেয়েদের চেয়ে মুগ্ধ হ'ল বেশী যুবকদল। তাল ঠুকে তারা বললে—মিস্ট্রেস্ অনেক দেখছি, কিন্তু মেয়ে দেখলাম এই প্রথম।

সেদিন থেকে 'হেড্ মিস্ট্রেসে'র কাছে তার কদর অনেক বেড়ে গেল। সুপর্ণাকে তিনি শুধু সমীহ করেই চলতেন না প্রতিটি বিষয়ে সুপর্ণার পরামর্শ তাঁর চাই-ই।

'মিস্ সুপর্ণা'—হেড্ মিস্ট্রেসের কর্কশ কণ্ঠস্বর যদিও সুপর্ণার কানে মধুবর্ষণ করত না, তবু 'মিস্ সুপর্ণা' ডাকটা সে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে উপভোগ করত। এই তার সত্যিকার পরিচয়—এই কৌমার্য্য তার নিজের সৃষ্টি, এই সৃষ্টিতে তার মন্ত্র-পড়া বিয়ের পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি, তার বিদ্রোহের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

'মিস্ সুপর্ণা' সুরটা তাঁর গম্ভীর—রাগে, না চিন্তার চাপে—কোন সময়ই তা আঁচ করা যায় না।

'প্রাইজের দিনে একটা কিছু করা চাই ত—এই ধরুন, নাচ, গান, ঋতু-উৎসব, কি বলেন?' বলবার কিছু নেই—পরিকল্পনা তিনি আগে থেকে ঠিক করে রাখেন। শুধু একটা জোরালো সমর্থন চাই।

'একটা কিছু করা ত চাই-ই। তাহ'লে ঋতু-উৎসবই হোক।'

'কিন্তু গানগুলো আপনাকে শেখাতে হবে—এবার যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গলা ফাটিয়ে গাইতে কোন মেয়েকে শুনি—আমি দেন এণ্ড দেয়ার ফাংশন বন্ধ করে দেব।'

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশুদ্ধতারক্ষা, মেয়েদের ক্রমবর্দ্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব, এই ধরণের একটা না একটা অভিযোগ আর সমস্যা নিয়েই তিনি সব সময়ই ব্যস্ত।

'ডিসিপ্লিন, স্কুলের ডিসিপ্লিনই ত সব, পড়াশুনা ত বাড়ীতেও বসে যে কেউ চালাতে পারে, বিলেতের স্কুলে কিন্তু প্রথম শেখানো হয় ডিসিপ্লিন—'

'আজকাল কিন্তু মতটা বদলাচ্ছে' দুর্ব্বল ভঙ্গীতে প্রতিবাদ করে সুপর্ণা—'রাশিয়ার শিক্ষা-নীতিতে...'

হা হা করে উঠেন হেড্ মিস্ট্রেস্।

'ওসব রাশিয়া-ফাশিয়ার নজির টানবেন না। ওদের সবই আজগুবি। দেখুন না বসে বসে মজাটা কি হয়। জার্ম্মানী ওদের ফোঁসফোঁস থামিয়ে দেয় কিনা—তাই দেখতে দু'চার দিন অপেক্ষা করুন।'

সুপর্ণা প্রতিবাদ করা ছেড়ে দিয়েছে—চাকরি করতে হ'লে ছোটখাটো কথা নিয়ে ঠোকাঠুকি করলে চলে না।

হেড মিস্ট্রেস্ থাকুন তাঁর ডিসিপ্লিন শিক্ষা আর রুষ-বিদ্বেষের জ্বালা মাথায় নিয়ে—এগারো হাত শাড়ী কেন কন্ট্রোল-রেটে পাওয়া যায় না—এ নিয়ে মিস্ট্রেস্ মহলে রোজ ক্ষোভের তরঙ্গ উঠুক। কিন্তু পিতার স্নেহ, রাগ আর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, সমাজের অপবাদ মাথায় নিয়ে, মার বুক খালি করে যে মেয়ে সগর্বে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে দিলে তার সার্থকতা কোন্ মহৎ ব্রতের উদ্‌যাপনে, কোন্ অভিশাপ মোচনের জয়তিলক কপালে ধারণ করে?

সুপর্ণার অদৃষ্ট নিয়ে আরো কৌতুক বাকি ছিল বিধাতার। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর গবর্ণমেণ্টের হঠাৎ মনে পড়ল দেশের

বাকি লোকদের অন্তত আরো কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখা উচিত। অমনি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট জেঁকে উঠল—ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েদের মধ্যে চাকরির হরির লুট ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এর পরেও যদি কেউ বলে—রান্নাঘরে দেশের অর্দ্ধেক শক্তিকে অপচয় করবার ষড়যন্ত্র করছে পুরুষ-জাত তবে সে মিথ্যে বলবে। 'নারীকে পুরুষের সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার' মহৎ আদর্শের এক ধাপ, এক দুর্ভিক্ষের ঠেলায়ই এগিয়ে গেল দেশ।

সুপর্ণা রায় বি-এ। মোটা মাইনেতে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টকে আলো করে জুড়ে বসল।

বেতের গোল টেবিলে খানকয়েক চিঠি ও সান্ধ্য পত্রিকা। চিঠিগুলো না খুলেই তার প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ভুল ভাবে বলতে পারে সুপর্ণা। একখানা নিশ্চয়ই মার লেখা। সত্যি মার জন্য দুঃখ হয়। কত দিন মার সঙ্গে দেখা হয় নি। বাবার বিরুদ্ধাচরণ করার দিন থেকেই বাড়ীর দরজা ইহজীবনের মত তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। মার অশ্রুময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করে সুপর্ণার চোখও ঝাপসা হয়ে ওঠে—তার বিদ্রোহের অনলভরা বুকও মুহূর্ত্তের জন্য একটা না-বলা ব্যথায় কাঁপতে থাকে।

অন্য চিঠিটা লিখেছে দেবু—তার ছোট ভাই। ছেলেমেয়েদের তরফ থেকে তার বাবাকে অনেক আঘাত সইতে হয়েছে। তিনি শক্ত মানুষ তাই টলেন নি। নইলে দেবু কেন আই-এ পড়তে পড়তে হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নে মেতে উঠবে। বিশ্ববিপ্লবটা এমন কিছু আটকাচ্ছিল না দেবুর সাহায্যের অভাবে। এদের ভাল কথা শোনানোও দায়। চোখা-চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করবার জন্য এরা তৈরি হয়েই থাকে। একরাশ তর্কের তুবড়ি জ্বালালেই দেশোদ্ধার হয় না।

মাকে দেবুর মনে না পড়লেও দিদিকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে, যখনই টাকার দরকার হয়। তাও আবার দাবির সুরে। 'দেশের জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে নিজেকে যে বিলিয়ে দিয়েছে, দিদির এটা মহৎ কর্ত্তব্য…' ইত্যাদি।

ভাইবোনদের মধ্যে দেবুকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে সুপর্ণা। সুতরাং এসব অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার না করলেও, সুপর্ণা দেবুর আব্দার এড়াতে পারত না।

আর এই সান্ধ্য পত্রিকা। শেষের পৃষ্ঠাটা নিশ্চয়ই রেশন কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী, হঠকারিতা, অনাচার ও অযোগ্যতার অভিযোগে ভর্ত্তি। পরদিন এগুলোর জবাব লিখতে লিখতে তাকেই প্রাণান্ত হতে হবে। এর উপর আছে জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় মন্তব্য।

'সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে যোগ্যতার নিম্নতম মানদণ্ড পর্য্যন্ত রহিত করিয়া যেভাবে নির্ব্বিচারে মেয়েদের নিয়োগ করা যাইতেছে, তাহাতে এই বিভাগের কর্ম্মদক্ষতা সম্পর্কে আমরা শঙ্কা বোধ করিতেছি। স্কুলের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের নাচ, গান, ভূগোল, ইতিহাস, সহজ সেলাই শিক্ষা, আমের মোরব্বা আর আনারসের জেলী প্রস্তুত-প্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় নিরীহ কর্ত্তব্য হইতে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ বিভাগে মহিলাদের নিয়োগে আমলাতান্ত্রিক মোটাবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়…'

তৃতীয় কাগজের সম্পাদকের বুলি:

'সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের আত্মীয় পোষণ-নীতির বিরুদ্ধে আমরা বহু প্রতিবাদ এই স্তম্ভেই প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এইবার অভিযোগ গুরুতর। এই বিভাগের মহিলাদের প্রতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অশিষ্ট আচরণ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা এই বলিয়া গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে অবিলম্বে এ ব্যাপারে জড়িত রুইকাতলাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সমস্ত মহিলা কর্ম্মচারীদের আমরা একযোগে পদত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব। জীবিকার দায়ে আমাদেরই মা-বোনেরা গবর্ণমেন্ট আপিসে চাকুরি করিতেছেন, তাঁদের সম্মান রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের।

সুপর্ণার কান দুটো লাল হয়ে উঠল—মাথাটা আর চিন্তা স্রোতকে বহন করতে পারছে না। সমাজের প্রতি তারাকিশোর রায়ের কঠোর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, মার বুকভরা ভবিষ্যতের ব্যর্থ আশা, দেবুর বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন, সুপর্ণার সমাজদ্রোহ—সব, সব একসঙ্গে জট পাকিয়ে গুলিয়ে গেল।…

টেলিফোনটা বার বার তাড়া দিচ্ছে। সুপর্ণা আচম্বিতে পাউডার কেস্‌টা টেনে নিলে। আজ আর প্রসাধনের সময় নেই। একটুখানি পাউডার মেখেই বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একজন আগন্তুক পুরুষের সঙ্গে তার মাথার ঠোকাঠুকি হ'ল—ছায়াতে ছায়াতে—আরশিতে।

'এক কাপ চা দিতে পার, গরম এক কাপ চা—আদার রস দিয়ে।'

কোন ভূমিকা না করেই শ্রীনন্দন ঝপ্‌ করে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

সুপর্ণা এতটা আশা করে নি—শ্রীনন্দনের চেহারার প্রতি যত বিরাগই থাক, তার পৌরুষকে সে বরাবরই সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে। কিন্তু আজ তার সে ভুল রূঢ় ভাবে ভাঙল নাকি!

'চা না হয় থাক—তার চেয়ে বরং এক গেলাস জলই দাও—ঠাণ্ডা জল।' শ্রীনন্দনকে বড্ড ক্লান্ত ও দুর্ব্বল মনে হচ্ছে।

সুপর্ণা প্রতিবাদ করলে না। এমন কি শ্রীনন্দনের আকস্মিক অভ্যাগম সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করতে পারলে না। মন্ত্রচালিতের মত এক গেলাস জল গড়িয়ে দিলে।

'বারি দানে অনেক পুণ্য। তোমাদের জীবনে এমন সুযোগ বড় একটা ঘটে না। সে অঘটনটার জন্যেও ধন্যবাদ দাবি করতে পারি নিশ্চয়ই।'

এবার কথা কইলে সুপর্ণা। বেশ স্পষ্ট এবং জোর গলায়:

'ভূমিকার আসল উদ্দেশ্যটা জানতে পারি কি?' বিরক্তিতে, সন্দেহে সুপর্ণার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

'আসল কারণটা কি বলে তোমার সন্দেহ হয়?'

'সন্দেহ করবার যখন যথেষ্ট কারণ থাকে তখন আমি সন্দেহ করি বৈকি। কিন্তু নতুন কোন উৎপাত আমি সইব না, এ আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই।'

'সে জানার কি আর বাকী আছে? বিয়ের রাত থেকে স্বামীর সঙ্গে ননকোঅপারেশন—মফস্বলের একটা নগণ্য উকীলের

সাধ্য কি তোমার উপর জোর খাটায়। কিন্তু তার আগে একটা কৌতূহল প্রকাশ করতে পারি কি? তোমার সিঁথিতে সিঁদুর কেন সুপর্ণা—বিবাহের এতবড় কলঙ্ক-চিহ্ন? জিজ্ঞেস করতে পারি কি—এটা অভিমান না অভিযোগ?'

'যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই স্বীকার করিনি তার উপর অভিমান করবার মত ন্যাকামি আমার নেই, আর অভিযোগ, তা হ'লে ত গোটা বিয়েটাকেই স্বীকার করে নিতে হয়। সিঁদুরটা সত্যিই আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বিয়ের কলঙ্ক-রেখা। কিন্তু থাক্ ওসব আলোচনা। তোমার এই হঠাৎ আগমনের হেতু?'

'যদি বলি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি গ্রামে।'

'আমি অবাক হয়ে শুধু ভাব্‌ব—এমন আস্পর্দ্ধা তোমার হ'ল কি করে?'

'যে আস্পর্দ্ধার জোরে লোকগুলো গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে নিজের অধিকার দাবি করেছিল আমি তাদেরই একজন—তাদেরই ভাষা আমার কণ্ঠে।'

সুপর্ণা এবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। বন্দীজীবনের লাঞ্ছনার ছাপ পড়েছে স্পষ্ট রেখায়—শ্রীনন্দন কি তবে......?

'তুমি নিশ্চয়ই জান আমি গবর্ণমেণ্টের চাকরি করি।'

'তাই ত মনে হচ্ছে। বাবার হোটেলেও নয়, স্বামীর বন্দীশালায়ও নয়, এর পর বাকী থাকে গবর্ণমেণ্টের গোলামখানা...'

'রাজনীতির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখতে নেই।'

'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নেহাত দায়ে পড়েই আমাদের কতকটা যোগাযোগ রাখতে হয় বৈ কি। রাজনীতি নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদের ছায়া না হয় নাই মাড়ালে, কিন্তু গ্রামের লোকগুলোরও দু'বেলা না হোক অন্তত একবেলা পেটভরে খাওয়া চাই—তার জন্যে নিয়মিত চাল, ডাল, তেল নুনের চালান চাই ত। শুনলাম তুমি নাকি সাপ্লাই-ডিপার্টমেণ্টের বড়কর্ত্তার ডান হাত—তোমার কথা ওখানে বিকোয়, তাই জ্বর গায়ে নিয়েই ছুটে এসেছি।'

'গ্রামের কি দরকার আর কি নেই, সে জবাবদিহি আমাকে করতে হবে নাকি?'

'না না, বিয়ের রাতেই যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছ, তার কাছে তোমার কোন কৈফিয়তের দায়িত্ব নেই। আমি সেই হতভাগ্য লোকগুলোর তরফ থেকেই একটা সুব্যবস্থার অনুরোধ নিয়ে এসেছি সুপর্ণা।'

'যথাযোগ্য স্থানে তোমার অনুরোধ পৌঁছে দিলেই পার।'

'তাতে কোন ফল হয় না। গ্রামের চীৎকার শহরে পৌঁছতে এখনো ঢের দেরি।'

'তাহ'লে কাগজে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই পার—'রেশন কর্তৃপক্ষের অনাচার' হেডিং দিয়ে কাগজওয়ালারা হামেশাই ছাপছে।'

'ও চিঠিচিটিতে কর্ত্তাদের টনক নড়বে না। পরদিনই তোমরা সেই কাগজেই বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেবে—ছোলা দিয়ে কি করে চমৎকার খাবার তৈরি করা যায়, চালের চেয়ে ঘাসের রুটির উপকারিতা কত বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি। খাবার তৈরির এমন সব অন্ধি-সন্ধি জানত না বলেই এতগুলো লোক বেঘোরে মারা গেল। দুর্ভিক্ষের ফাঁড়া কাটিয়ে যারা এখনও ক্ষীণ প্রাণটুকু বুকে নিয়ে ধুঁকছে—এমন সব চমৎকার উপদেশের জন্যে তোমাদের কাছে তারা আজীবন কেনা হয়ে থাকবে। সত্যি, আর কিছু না থাক্ সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপনের বাহাদুরি আছে মানতেই হবে।'

'আমাকে বাইরে বেরুতে হবে। যা-তা প্রলাপ শুনবার সময় আমার নেই।'

'নেই-ই ত। প্রাণ ধরে এত বড় অপবাদ কান পেতে শুনবে তুমি—মিস্ সুপর্ণা রায়? বাসরঘর থেকে বাসে চড়ে মহত্তর জীবনের সন্ধানে যার অভিযান! কিন্তু মুশকিল কি জান, তেল নুন ডালের অভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অমানুষের মত যাদের বাঁচতে হচ্ছে, মাথাটা সব সময় তাদের ঠিক থাকে না। অভাব অনটনের জ্বালায় প্রলাপও তারা মাঝে মাঝে বকে। দালান-কোঠায় বসে বহাল তবিয়তে হাসিঠাট্টা করতে করতে মেজাজ-মর্জ্জিমত লেখা তোমাদের সব ভাল ভাল বিজ্ঞাপন তাদের চোখে বড্ড বেয়াড়া ঠেকে—তাই তারা বিগড়ে গিয়ে সময় সময় একটা কাণ্ড বাধায়।'

'কিন্তু তবু তারা অসহায়, সত্যি অসহায়' আপন মনেই স্বগতোক্তি উচ্চারণ করলে শ্রীনন্দন।

'তুমি একটুখানি বসবে? চা দিতে বলি। আমার আবার ছ'টায়......'

"না, আমি যাচ্ছি। আরাম করতে আমি এখানে আসি নি, আমি জানতাম—সত্যিকার কাজে তোমার কোন সাহায্যই আমি পাব না। তবু ভেবেছিলাম—না, এ বলেও কোন লাভ নেই। তোমাদের মত মেয়েরা ভ্যাংচাতে পারে, ভাঙতে পারে, কিন্তু সইতে জানে না, গড়তে পারে না। গৃহহীন, অন্নহীন, আশাহীন অগণিত জনসঙ্ঘ—কিন্তু এরা মানুষ নয়। নইলে কাঙালের মত ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে কলকাতার পথে পথে, অলিগলিতে ভিড় জমাত না—'বলতে বলতে শ্রীনন্দন উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার চোখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

'এরা ভেঙে চুরমার করে দিত—গোটা শহরটাকে গঙ্গার বুকে ডুবিয়ে দিত......'

বলতে বলতে হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে এল, শরীরটা অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

উত্তেজনায় জ্বরের প্রকোপটা হঠাৎ বেড়েছে।

কয়েকটা দিন কেমন করে কেটেছে শ্রীনন্দন নিজেই জানে না। বড্ড অদ্ভুত লাগছে। এসেছিল গরীবদের জন্যে চাল ডালের একটা সুরাহা করতে—কে জানত শেষে সুপর্ণার সেবায়ই তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আজ জ্বরের উপশম হয়েছে। শরীরটা এখনো দুর্ব্বল—চলাফেরার পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়। শ্রীনন্দনের ইচ্ছা আজই গ্রামে চলে যায়। সুপর্ণা রোগীকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে

রাজী নয়। কিন্তু তার ইচ্ছার উপর সুপর্ণার কিসের জোর, কিসের দাবি।

শ্রীনন্দন জেদ ধরলে 'আজ আমাকে যেতেই হবে—সবাই আমার জন্তে অপেক্ষা করে বসে আছে।'

'অসুখের উপর ত তোমার নিজের কোন হাত নেই।'

'গ্রামের অবস্থা ত তুমি জান না। একদিন ওষুধ নিয়ে যেতে দেরি মানে জনকয়েক লোকের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু। সারা দেশ জুড়ে চলছে দুঃখদারিদ্র্য, আধিব্যাধি আর মহামারীর তাণ্ডব-লীলা। আমাদেরই কথায় গ্রামবাসীরা একদিন স্বরাজ লাভের নেশায় মেতে উঠে চরম ত্যাগস্বীকার করেছিল। আজ জাতির এ দুর্দ্দিনে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব যে আমাদেরই।'

সুপর্ণা পরিপূর্ণ দৃষ্টি শ্রীনন্দনের মুখ পানে তুলে ধরলে। আপন-হারা উন্মাদনায় একদল যারা সারা দেশের বুকে বিক্ষোভের তুফান তুলেছিল, এই কি সেই বিপ্লবীদের একজন। এরও চোখে কি সেই বিপ্লবের তীব্র বহ্নিশিখা। এই আগুন কি আহরণ করে আনতে পারে না সুপর্ণা, যাতে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে তার বাবার গোঁড়ামি, হেড্‌মিসট্রেসের রুষ-বিদ্বেষ, সাপ্লাই-ডিপার্টমেন্টের অনাচার······

'আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না' মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে সুপর্ণা, 'তোমার এখনও গা-গরম।'

'থাক গা-গরম। জ্বর নিয়েই আমি এসেছিলাম, জ্বর গায়ে নিয়েই আমি ফিরে যাব।'

'আমার বাড়ী থেকে তুমি অসুস্থ শরীরে চলে যাবে? না, না সে কেমন করে হয়। আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।'

'এ কর্ত্তব্য নয়—কৃপা। রোগীর প্রতি করুণা। আমি তোমার করুণা চাই না মিস্ সুপর্ণা রায়, আমি বেশ যেতে পারব।'

'কিন্তু লোকে শুনলে বলবে কি?'

'লোকমতকে তুমি আবার আমল দাও নাকি সুপর্ণা!' শ্রীনন্দনের ঠোঁটে এক ঝলক বাঁকা হাসি চমকাল। 'সমাজকে কেয়ার করো না বলেই, তোমাদের সর্ব্বত্র জয়জয়কার—কাগজে কাগজে তোমাদের ছবি বেরোয়। সভায় দাঁড়িয়ে চোখা-চোখা ভাষায় সব কিছুর মুণ্ডপাত করতে পার বলেই না তোমরা প্রগতি-শীলা। তোমার মনে যদি আজ হঠাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি জেগে ওঠে তবে তোমাদের প্রগতির গৌরব থাকে কোথায়? তা ছাড়া আমার জন্তে তোমার আপিস কামাই হচ্ছে—তোমার স্থান ত ঘরে নয়—তোমার কর্ত্তব্য ত সেবা নয়।'

এর জবাব কি দেবে সুপর্ণা! শুনিয়ে দেবে নাকি দু'চারটে শক্ত কথা চলে যেতে হয় যাক—আটকে রাখবার জন্যে কি তার এত গরজ। একদিন গ্রামের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, আজ হাসপাতাল খুলেছে, কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোলা হচ্ছে, সেবা-কেন্দ্র গড়া হচ্ছে—শ্রীনন্দনের মত মাথা-পাগলারা এমনি ধরণেরই।

তবু তার রোগক্লিষ্ট মুখে একটা গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের স্থির জ্যোতি, একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। সুপর্ণা জীবনে অনেক মেয়েলি পুরুষ দেখেছে, কিন্তু সত্যিকার পুরুষ দেখলে এই প্রথম। শ্রীনন্দনের গোঁ ভাঙা সহজ নয় সুপর্ণা তা বেশ জানে। তাই নীরবে শ্রীনন্দনের সন্নিহিত হ'ল সুপর্ণা—মুখটাকে ওর বুকের খুব, খুব কাছে সরিয়ে আনলে, তার আতপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করছে শ্রীনন্দন।

সুপর্ণার মনে হ'ল, শ্রীনন্দনের সত্তার সৌরভে স্নান করে সে যদি সহজ হতে পারত, সুন্দর হতে পারত।

খুব কাছে মুখ এনে বললে সুপর্ণা—তার কথা গান হয়ে বেজে উঠল শ্রীনন্দনের কানে—"১৯৩৮ সালের 'বিউটী-কুইন'কে জবরদস্তি করে বিয়ে দিয়ে বাবা আমার রূপের গর্ব্বকে সেদিন ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আজ বাকিটুকু তুমি কেড়ে নাও, তুমি আমাকে জোর করে ছিনিয়ে নাও, আমাকে তুমি নাও।"

বুলবুল

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

(Harold Monro : *The Nightingale Near The House*)

কাননবীথির পরে শব্দহীন দেবদারু তরু
কানপাতি তব গান শোনে,
দীর্ঘবক্ষ বৃক্ষসার, অচঞ্চল সরোবর, শশী—
মৌনমূক—মায়াজাল বোনে।
তুমি গাও, সে সঙ্গীত আকাশ প্লাবিয়া কাঁপি উঠে,
পূর্ণ হয় নিশীথের প্রাণ,
ছায়াময় তরুপুঞ্জ, সৌধচূড় পারে প্রতিধ্বনি—
সারারাত্রি তুমি কর গান।

পুষ্পসম স্বপ্নে মম তুমি হ'লে মধুপ ভ্রমর,
তন্দ্রাহীন রাত্রি পুরে গানে,
মনে তারি প্রতিচ্ছবি, লই এঁকে, ছায়ায় তবুও-
জ্যোৎস্নালোক চামেলিবিতানে।
মর্ম্মরিয়া উঠে সুর যেন শ্বেত মর্ম্মর প্রাসাদ,
অগ্নি কভু, কভু বা তুষার,
স্বপ্নকুহেলি তারি, তারপরে সাদা হয়ে যায়—
পূর্ব্বাচলে উদয়ে উষার।

খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি

শ্রীগণেশচন্দ্র কর্ম্মকার

আহার না করিয়া কোন জীব বাঁচিতে পারে না। অবশ্য সকল জীবেরই আহার্য্য এক প্রকার নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ সকল খাদ্যই কাঁচা খাইত। তারপর কবে যে অগ্নিপক্ব খাদ্যের প্রচলন হইল তাহা সঠিক জানা নাই। খাদ্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করিবার জন্য দিনের পর দিন মানুষ রন্ধনের কত প্রণালীই আবিষ্কার করিয়াছে। ভোজনবিলাসীদের কল্যাণে রন্ধন-ব্যাপার একটা কলাবিদ্যায় পরিণত হইয়াছে।

খাদ্য কি তাহা সকলেই জানে, তবু ইহার একটি নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার প্রয়োজন। যে দ্রব্য আহার করিলে কোন প্রাণীর শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় এবং দেহে উত্তাপ সৃষ্টি হইয়া কর্ম্মশক্তির সঞ্চার হয় তাহাকেই আমরা খাদ্য বলিতে পারি। কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একেবারে সাম্প্রতিক ব্যাপার। বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানুষ জানে যে, খাদ্যের গুণাগুণের উপরই ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য নির্ভর করে। তাই খাদ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখন জৈবরসায়ন-বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত।

উনবিংশ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব্বে খাদ্যের উপর দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন এখনকার মত এত বেশী ছিল না; তাহার কারণ লোকে তখন স্বভাবজাত খাদ্য বেশী ব্যবহার করিত এবং খাদ্য হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি নষ্ট হইবার বা বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা বেশী ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যযুগে খাদ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া দুষ্কর এবং সম্প্রতি আমরা এমন অনেক কৃত্রিম খাদ্য খাই যাহা প্রস্তুত করার অনেক দিন পর পর্য্যন্ত খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং আমাদের খাদ্যে যে কোন বিশেষ উপকরণের অভাব হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে খাদ্য আমাদের দেহ গঠন করে, রক্ষা করে এবং কোন রোগ হইতে বাঁচায় সেই খাদ্যই গ্রহণীয়। খাদ্য কেবল পরিমাণে যথাযথ হইলেই চলিবে না, খাদ্য সুষম হওয়াও আবশ্যক। খাদ্যের মধ্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিক পরিমাণে থাকিলে তবেই খাদ্য সুষম হয়। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্ব্বোহাইড্রেট, খনিজ পদার্থ এবং জল এই কয়টি উপকরণেই শরীরের প্রয়োজন মিটিয়া যায়; কিন্তু পরে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন যেগুলিকে বলা হয় খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন। ভাইটামিন খাদ্যে অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, কিন্তু এইগুলির অভাব হইলে নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

খাদ্যের আর একটি দিকও দ্রষ্টব্য, সেটি উত্তাপ। আমরা যে পরিশ্রম করি তাহার ফলে দেহের খানিকটা উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। এমন কি যখন আমরা বসিয়া থাকি, কোন কাজকর্ম্ম করি না তখনও আমাদের দেহের উত্তাপ নষ্ট হয়। তাহার কারণ আমাদের দেহের তাপ সাধারণতঃ বাহিরের তাপ অপেক্ষা বেশী। তাহা ছাড়া আমরা বসিয়া থাকিলেও আমাদের দেহের কোন কোন অংশ সর্ব্বদাই কাজ করিতে থাকে—হৃৎপিণ্ড ধুক্ ধুক্ করে, বক্ষের পঞ্জর উঠা-নামা করে, এবং রক্ত চলাফেরা করে, ইত্যাদি। প্রাণীর শরীরে খাদ্য দগ্ধ হইয়া উত্তাপ সৃষ্টি করে—এই তথ্য ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে৷ প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। সেই যুগের মূর্খতা ও কুসংস্কার ল্যাভয়সিয়োর এই আবিষ্কারের যথাযোগ্য মূল্য ত দিলই না, উপরন্তু তাঁহার প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিল।

কয়লা ইঞ্জিনকে শুধু উত্তাপ দেয়, কিন্তু খাদ্য দেহকে কেবল উত্তাপ দেয় না—ইহা দেহ গঠন করে, দেহের যে অংশের ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করে এবং বহিঃশত্রু, রোগ প্রভৃতির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিবার শক্তি দেয়। এক কথায় খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখে এবং দেহের বিভিন্ন অংশকে কর্ম্মক্ষম করে। এইজন্যই খাদ্য যথোপযুক্ত হওয়া চাই; অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই। ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যোপকরণ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উত্তাপ সম্বন্ধে কিছু বলা করা যাক।

উত্তাপ

কেবল প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্ব্বোহাইড্রেট, খনিজ পদার্থ এবং জল হইলেই আমাদের খাদ্য যথোচিত হয় না; খাদ্য হইতে রাসায়নিক দাহে যে উত্তাপ জন্মে তাহা আমাদের প্রয়োজনমত হইল কিনা তাহা দেখাও দরকার, কারণ যাহারা বেশী দৈহিক পরিশ্রম করে তাহাদের বেশী উত্তাপের প্রয়োজন। প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও কার্ব্বোহাইড্রেট যখন এইরূপে দগ্ধ হয় তখন ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন পরিমাণে দরকার। শিশুদের দেহ ছোট বলিয়া তাহাদের কম উত্তাপের প্রয়োজন। বৃদ্ধ লোকেরা বেশী পরিশ্রম করে না বলিয়া তাহাদেরও কম উত্তাপের আবশ্যক। আবার প্রসূতি, গর্ভবতী এবং চাষী, কুলি, মিস্ত্রি প্রভৃতি শ্রমিক সম্প্রদায়ের বেশী উত্তাপের প্রয়োজন এবং যেখানে একই রকমের কাজ হয় সেখানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের বেশী উত্তাপ দরকার। ইহা ছাড়া দেশের জল, বায়ু, আবহাওয়ার বিভিন্নতা অনুযায়ী আমাদের উত্তাপের প্রয়োজন কম-বেশী হয়। যে সমস্ত অবস্থার উপর উত্তাপ-প্রয়োজন নির্ভর করে সেইগুলিকে নিম্নে মোটামুটি ভাবে দেওয়া গেল :

১। বয়স এবং দেহের ওজন ও মাপ ;

২। পুরুষ বা স্ত্রীলোক ;

৩। দেহের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, বিশ্রাম, নিদ্রা, কাজকর্ম্ম ইত্যাদি ;

৪। অসুখের বিভিন্ন অবস্থা ;

৫। পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

উত্তাপের পরিমাণ বুঝিবার জন্য একটি মাপকাঠির দরকার।

এই মাপকাঠি হইতেছে—১ হাজার গ্রাম* (প্রায় ১ সের) জলকে ১ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) গরম করিতে যতটা উত্তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে এক ক্যালরী বলে। নিম্নে উত্তাপ-প্রয়োজনের একটি তালিকা দিলাম :

১ নং তালিকা

কাহার কতটুকু উত্তাপের প্রয়োজন

দেহের বা কর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা	ক্যালরী
শিশু ১ হইতে ২ বৎসর বয়স	৮৪০
,, ২ ,, ৩ ,, ,,	১০০০
,, ৩ ,, ৫ ,, ,,	১২০০
,, ৫ ,, ৭ ,, ,,	১৪৪০
,, ৭ ,, ৯ ,, ,,	১৬৮০
,, ৯ ,, ১১ ,, ,,	১৯২০
,, ১১ ,, ১২ ,, ,,	২১৬০
বালক, ১২ এবং তদূর্দ্ধ	২৪০০
যাহারা দিনে ৮ ঘণ্টা হাল্কা কাজ করে	৩০০০
যাহারা দিনে ৮ ঘণ্টা মাঝারি রকমের কাজ করে	৩৪০০
যাহারা দিনে ৮ ঘণ্টা কঠিন কাজ করে	৪৬০০
যাহারা অত্যন্ত কঠিন কাজ করে	৬০০০ এবং তদূর্দ্ধ
গর্ভবতী স্ত্রীলোক	২৪০০
প্রসূতি	৩০০০

ঘর-সংসারের কাজ, কেরাণীর কাজ, বইবাঁধাই প্রভৃতি হাল্কা কাজের পর্য্যায়ে পড়ে ; জমি চাষ করা এবং অন্যান্য সাধারণ বাহিরের কাজকর্ম্ম মাঝারি রকমের কাজকর্ম্মের পর্য্যায়ে পড়ে ; কারখানার মিস্ত্রিদের কাজকর্ম্মকে কঠিন কাজ বলিয়া ধরা হয় ; খেলাধুলাকে (যেমন, ফুটবল খেলা প্রভৃতি) অত্যন্ত কঠিন কাজ বলা হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে বয়সের উপর ও কাজকর্ম্মের উপর আমাদের দৈনিক কতটা উত্তাপের প্রয়োজন তাহা নির্ভর করে। ইহা হইতেই উত্তাপ-প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা যায় না। একই রকমের স্বাস্থ্যবান লোক উষ্ণমণ্ডল ও হিমমণ্ডলে থাকিয়া একই কার্য্য করিলেও জলবায়ুভেদে তাহাদের উত্তাপ-প্রয়োজন বিভিন্ন হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উত্তাপ-প্রয়োজন জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করে।

প্রোটিন

আমাদের শরীর নির্ম্মাণকার্য্যে প্রোটিন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রতি গ্রাম প্রোটিন রাসায়নিক দাহের ফলে ৪·১ ক্যালরী উত্তাপ দেয়। মাছ ও মাংসে প্রোটিন আছে, গাছপালা হইতেও পাওয়া যায়। প্রোটিনের প্রকারভেদ বিস্তর। পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী ও গাছপালা আছে প্রায় তত রকমের প্রোটিন আছে। বিবর্ত্তনের ক্রমিক ধারায় যে বহুবিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে সম্ভবতঃ তাহার কারণ এই প্রোটিনের বৈচিত্র্য। কিন্তু আমরা যে সমস্ত প্রোটিন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি তাহাদের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

প্রোটিন প্রাণীর শরীরের মধ্যে পরিপাক হইবার পর এমিনো এসিড নামে কতকগুলি বস্তুতে পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রয়োজন মত কতকগুলিকে লইয়া দেহের বিভিন্ন অংশের ক্ষয়পূরণ ও গঠনকার্য্য চলে, বাকিগুলি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। নিম্নে কয়েকটি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের একটি তালিকা দেওয়া গেল :

২ নং তালিকা

প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় এমিনো এসিড

প্রয়োজনীয়

১। আরজিনিন (arginine)
২। হিস্‌টিডিন (histidine)
৩। আইসোলেন্‌সিন (isolencine)
৪। লিউসিন (leucine)
৫। লাইসিন (lysine)
৬। মেথিওনিন (methionine)
৭। ফিনাইল এলানিন (phenyl alanine)
৮। থ্রিওনিন (threonine)
৯। ট্রিপটোফেন (tryptophane)
১০। ভ্যালিন (valine)

অপ্রয়োজনীয়

১। এলানিন (alanine)
২। এস্‌পারটিক এসিড (aspertic acid)
৩। সাইট্রুলিন (citrulline)
৪। সিস্‌টিন (cystine)
৫। গ্লুটামিক এসিড (glutamic acid)
৬। গ্লাইসিন (glycine)
৭। হাইড্রক্সি গ্লুটামিক এসিড (hydroxy-glutamic acid)
৮। হাইড্রক্সি প্রোলিন (hydroxy-proline)
৯। নর্‌লিউসিন (norleucine)
১০। প্রোলিন (proline)
১১। টাইরোসিন (tyrosine)

আরজিনিন প্রভৃতি কয়েকটি এমিনো এসিডের প্রয়োজনীয়তা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটি এমিনো এসিড কি ভাবে কাজ করে তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। এগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এখনও বহু গবেষণা চলিতেছে। কোন এমিনো এসিড প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় তাহা ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীকে খাওয়াইয়া স্থির করা হইয়াছে মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন হইতে এই সকল এমিনো এসিড ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়। যে প্রোটিন হইতে প্রয়োজনীয় এমিনো এসিড যত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় সেই প্রোটিন তত বেশী উপকারী। সাধারণতঃ প্রাণীজ প্রোটিন হইতে প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডগুলি বেশী পরিমাণে এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হইতে কম পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রোটিনের দিক হইতে ডাল-রুটি অপেক্ষা মাছ-মাংস বেশী উপকারী।

আমাদের দৈনিক কতটা পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন খাদ্য-

* ৫৭ গ্রামে ১ ছটাক হয়।

গবেষণার প্রারম্ভ হইতেই বিজ্ঞানবিদ্গণ সে বিষয়ে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভয়েট ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থির করিলেন যে, এক জন মানুষের দৈনিক ১১৮ গ্রাম, অর্থাৎ প্রায় আধপোয়া প্রোটিনের প্রয়োজন; এবং যাহারা বেশী পরিশ্রম করিবে তাহাদের জন্য ১৪৫ গ্রাম, অর্থাৎ প্রায় আড়াই ছটাক প্রোটিনের প্রয়োজন। পরে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ধার্য্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য খুব বেশ। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে যে, কম প্রোটিন খাইয়াও মানুষ বাঁচিতে পারে এবং তখন তাহার শরীরযন্ত্র এই কম প্রোটিনে অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই কম পরিমাণ হইতেছে এক ছটাক। কিন্তু এই পরিমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, কারণ যে প্রোটিন আমরা খাই তাহা হইতে প্রয়োজনীয় এমিনো এসিড কতটা পাওয়া যাইবে তাহা আমাদের সকল সময়ে জানা থাকে না। সুতরাং যাহাতে বিশেষ কম না পড়ে সেজন্য খানিকটা বেশী করিয়া খাওয়া দরকার। এ বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations, 1936) মত এই যে, প্রতি কিলোগ্রাম* অর্থাৎ প্রায় ১ সের দেহের ওজনের পক্ষে এক গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। ১ মণ ২০ সের অর্থাৎ ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের ৬০ গ্রাম অর্থাৎ এক ছটাকের একটু বেশী প্রোটিনের দরকার। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অর্দ্ধাংশ অবশ্য মাছ মাংস হইতে হইলেই ভাল হয়। এই পরিমাণ নির্দ্ধারণ ইউরোপের লোকের পক্ষে হয় ত ঠিক হইয়াছে কিন্তু আমাদের পক্ষে নয়, কারণ আমাদের দেশের জলবায়ু ও আহারবিহার প্রণালী ভিন্ন প্রকারের। উপরন্তু ইউরোপের লোকেরা যতটা পরিমাণ মাছ মাংস খায় আমাদের দেশের লোক ততটা খাইতে পায় না। শাকসব্জী, তরিতরকারি, ভাত প্রভৃতি হইতে আমরা বেশীর ভাগ প্রোটিন গ্রহণ করিয়া থাকি এবং এই সকল খাদ্যে প্রয়োজনীয় এমিনো এসিড কম পরিমাণে থাকে। সুতরাং পরে স্থির করা হইয়াছে যে প্রায় প্রতি সের দেহের ওজনের জন্য ১.৫ গ্রাম প্রোটিন হইলেই ঠিক হয়। কিন্তু শিশু ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের দেহে গঠনকার্য্য বেশী চলিতে থাকে বলিয়া তাহাদের প্রয়োজন আরও বেশী। আবশ্যক প্রোটিনের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :

৩ নং তালিকা

শিশু ও প্রসূতিদের কি পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন

বয়স	গ্রাম, প্রতিসের দেহের ওজনের জন্য
১ হইতে ৩ বৎসর	৩.৫
৩ ,, ৫ ,,	৩.৫
৫ ,, ১২ ,,	৩.০
১২ ,, ১৫ ,,	৩.০
১৫ ,, ১৭ ,,	২.৫
১৭ হইতে ২১ বৎসর	২.০
২১ ,, ঊর্দ্ধে	১.৫
গর্ভাবস্থা ০-৩ মাস	১.৫
,, ৪-৯ মাস	২.০
প্রসূতি	২.৫

* ১০০০ গ্রামে এক কিলোগ্রাম হয়।

এমিনো এসিডগুলি ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে থাকে বলিয়া সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমরা নানা প্রকার খাদ্য হইতে প্রোটিন গ্রহণ করি। তাহা হইলে কোন একটি প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের অভাব হইবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকিবে না।

এমিনো এসিডগুলি রক্তে মিশ্রিত হইবার পর দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। তখন তাহা হইতে আমাদের দেহের চর্ম্ম, মাংসপেশী প্রভৃতি গড়িয়া উঠে। দেহের যে সমস্ত 'কলা'র (tissue) প্রোটিনের ক্ষয় হইয়াছে এই নূতন প্রোটিন হইতে তাহার পূরণ হয় এবং বর্দ্ধমান শিশুদের দেহে নূতন করিয়া ইহার সৃষ্টি হয়। সুতরাং শিশুদের যেমন দেহগঠনের জন্য প্রোটিনের দরকার তেমনি বড় হইলে দেহের যে সমস্ত অংশ ক্ষয় হইয়া যায় তাহার পূরণের জন্যও প্রোটিনের দরকার হয়। কতকগুলি এন্‌জাইম এবং হরমোনও প্রোটিন হইতে তৈরি হয়। ইহা ভিন্ন রাসায়নিক দাহের সময় প্রোটিন আমাদের শরীরকে উত্তাপ দেয়।

খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হইলে প্রতিনিয়ত দেহের মধ্যে যে কলাক্ষয় হয় (tissue wastage) তাহা পূরণ না হওয়ায় শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলি যাহাতে চলিতে পারে সেজন্য শরীরের নানা অংশের কলা হইতে অপ্রয়োজনীয় এমিনো এসিডগুলিই প্রথমতঃ যথাসম্ভব এই কার্য্যে ব্যয়িত হয়। অনেক সময় এমন হয় যে যদিও সমস্ত প্রোটিনের পরিমাণ ঠিকই আছে তথাপি খাদ্যে কোনও একটি প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের হয়ত অভাব। সাধারণতঃ এই প্রকারের অভাব স্থানবিশেষের উপর নির্ভর করে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খাদ্য বিভিন্ন রকমের এবং সেই জন্য কোনও একটি প্রধান খাদ্যে প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের অভাব থাকা সত্ত্বেও অভ্যাসবশতঃ তাহা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসে। এশিয়া মহাদেশে সাধারণতঃ এই প্রকার অভাবজনিত রোগ বেশী দেখা যায়। অবশ্য প্রোটিনের আধিক্য হইলেও নানা প্রকার রোগ হইয়া থাকে।

মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি প্রোটিন পাইবার পক্ষে প্রশস্ত খাদ্য। এই সকল উপকরণে আমাদের দেহগঠনের উপযুক্ত বস্তু বেশী পরিমাণে থাকে।

স্নেহদ্রব্য

স্নেহদ্রব্য আমাদের প্রধান প্রধান খাদ্যোপকরণের মধ্যে একটি। ঘি, তেল, মাখন, চর্ব্বি প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য। এক গ্রাম স্নেহদ্রব্য রাসায়নিক দাহের ফলে ৯.৩ ক্যালরী উত্তাপ দেয়। সুতরাং সম ওজনের স্নেহদ্রব্য প্রোটিনের চেয়ে দ্বিগুণের বেশী উত্তাপ দেয়। ভাইটামিন এ, ডি, ই, এফ স্নেহদ্রব্যে দ্রবীভূত হয়; সুতরাং স্নেহদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া খাইলে ঐ ভাইটামিনগুলি শরীরে শোষিত হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, খাদ্যে স্নেহদ্রব্য না থাকিলে দেহ ভালভাবে পুষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞানীরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের দৈনিক প্রায় ১০০ গ্রাম অর্থাৎ আধপোয়ার একটু কম স্নেহদ্রব্যের প্রয়োজন। এই পরিমাণ ইউরোপের বিজ্ঞানীরা স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহাদের

দেশের লোকের পক্ষে ইহা হয়ত ঠিক। কিন্তু আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্নেহদ্রব্যের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। এখানে মাথাপিছু দৈনিক ৬০-৭৫ গ্রাম অর্থাৎ একছটাক বা তাহার কিছু বেশী স্নেহদ্রব্য যথেষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই পরিমাণের অর্দ্ধেক অবশ্য প্রাণীজ হওয়া উচিত। প্রাণীজ স্নেহদ্রব্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড বেশী থাকে এবং সেইজন্য প্রাণীজ স্নেহদ্রব্য উদ্ভিজ্জ স্নেহদ্রব্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

খাদ্যে স্নেহদ্রব্যের অভাব হইলে দেহে ঐ অভাবজনিত কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন—(১) মাথার চুল উঠিয়া যায়, (২) কর্ণ, গলদেশ, বক্ষ এবং বাহুতে চর্ম্মরোগ হয়, (৩) ওষ্ঠকোণ ও জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত হয়, (৪) পশুর লেজের বিকৃতি ঘটে, ইত্যাদি।

স্নেহদ্রব্যের অভাবে মানুষের শরীরে একপ্রকার কাউর ঘা (eczema) হয়, বিশেষতঃ শিশুদের। ইহার অভাবে ক্যালসিয়ামও আমাদের দেহে ভালরূপে শোষিত হইতে পারে না।

স্নেহদ্রব্য হজম হইবার পর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তাহার পর শরীরের বিভিন্ন স্থানে যায়। চর্ম্মে যে স্নেহদ্রব্য থাকে তাহা আমাদের শরীরকে বাহিরের ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করে, তাহার কারণ স্নেহদ্রব্যের উত্তাপ পরিচালনা-শক্তি খুব কম। যাহাদের দেহে চর্ব্বি কম শীতকালে তাহাদের বেশী ঠাণ্ডা লাগে।

স্নেহদ্রব্য আমাদের পাকস্থলীতে খুব কমই হজম হয়। পরিপাক ক্রিয়াটি চলে প্রকৃতপক্ষে গ্রহণীতে। স্নেহদ্রব্য অন্যান্য খাদ্যের পরিপাকে অসুবিধার সৃষ্টি করে। খাদ্যকণাগুলিকে এই উপকরণটি একটি পাতলা পর্দ্দা দিয়া ঢাকিয়া রাখে, সুতরাং এগুলি পাকস্থলী হইতে নিঃসৃত রসের সংস্পর্শে আসিতে পারে না এবং ঠিকমত পরিপাক হয় না। অতএব আমরা যে স্নেহদ্রব্য খাই তাহা যত ছোট ছোট কণাতে বিভক্ত থাকে ততই ভাল, কারণ তখন অপর খাদ্যকণাকে ইহা আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না এবং নিজেও তাড়াতাড়ি হজম হইবে। এই কারণে দুধ আমাদের আদর্শ খাদ্য। একটি আলপিনের মাথায় যে পরিমাণ দুধের ফোঁটা থাকে তাহাতে প্রায় ১৫০০ স্নেহদ্রব্যের কণা থাকে। নবজাত শিশুরা দুধ হজম করিতে পারে কিন্তু কোনপ্রকার তৈলাক্ত খাদ্য হজম করিতে পারে না—ইহার কারণও এই। এ তথ্যটি জানা নাই বলিয়া অনেকে মনে করে যে স্নেহদ্রব্য গুরুপাক।

যে সকল স্নেহদ্রব্য বাহিরের স্বাভাবিক বায়ুর তাপে তরল অবস্থায় থাকে সেগুলি সহজপাচ্য। অত্যধিক স্নেহদ্রব্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে।

মাখন, ঘি, দুধ, চর্ব্বি প্রভৃতি খাদ্য স্নেহদ্রব্য পাইবার প্রশস্ত উপাদান। ইহা ভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈলেও স্নেহদ্রব্য মিলে। যে কারণেই হউক ভারতবাসীদের খাদ্যে স্নেহদ্রব্যের অভাব বেশী এবং এ বিষয়ে তাহারা সতর্ক না হইলে সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

কার্ব্বোহাইড্রেট

কার্ব্বোহাইড্রেট আমাদের আর একটি প্রধান প্রয়োজনীয় খাদ্যোপকরণ। আমাদের দেহকে উত্তাপ দেওয়া প্রধানতঃ ইহার কাজ। এক গ্রাম কার্ব্বোহাইড্রেট রাসায়নিক দাহের ফলে ৪.১ ক্যালরী উত্তাপ দেয়। চাল, চিনি, শাকসব্জি প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই সকল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া লোকে বেশী পরিমাণে খায়। কার্ব্বোহাইড্রেট দগ্ধ হইবার সময় যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহাতে স্নেহদ্রব্য দগ্ধ হয়। প্রয়োজনীয় উত্তাপের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট হইতে পাওয়া গেলে স্নেহদ্রব্য পরিপাকে সুবিধা হয়। নতুবা পাকস্থলীতে স্নেহদ্রব্য হইতে এসিটোন নামে একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহাই শেষ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া এসিডোসিস (acidosis) রোগ সৃষ্টি করে। সুষম খাদ্যে কার্ব্বোহাইড্রেট সাধারণতঃ এমন পরিমাণে থাকা উচিত যাহাতে আমরা উত্তাপের শতকরা ৬০ ভাগ ইহা হইতে পাইতে পারি। কার্ব্বোহাইড্রেটের মধ্যে (প্রধানতঃ তরকারির খোসায় ও শাকসব্জিতে) সেলুলোজ নামে একটি পদার্থ থাকে। এই সেলুলোজ আমাদের পাকস্থলীতে প্রায় হজম হয় না বলিলেই চলে। কিন্তু ইহা মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ইহার অভাব হইলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়। সেইজন্য চপ, কাটলেট বা অন্য কোন আমিষ জাতীয় খাদ্য খাইবার সময় কিছু কাঁচা বা সিদ্ধ শাকসব্জি খাওয়া উচিত।

কার্ব্বোহাইড্রেট হজম হইয়া শেষ পর্য্যন্ত 'গ্লুকোজ' নামক শর্করা জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই গ্লুকোজ প্রোটিন এবং স্নেহ-পদার্থ হইতেও পাওয়া যায়। গ্লুকোজ ভিন্ন আরও দুই প্রকার শর্করা, যথা ফ্রাক্টোজ এবং গ্যালাক্টোজও কিয়ৎ পরিমাণে কার্ব্বোহাইড্রেট হইতে তৈয়ারি হয়। এই জাতীয় শর্করা ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিবার পর আমাদের রক্তে চলিয়া আসে। ইহার এক অংশ প্রয়োজনমত শরীরের উত্তাপ সৃষ্টিতে ব্যয়িত হয় এবং অপর অংশ যকৃতে পৌঁছিয়া গ্লাইকোজেন নামক এক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া সঞ্চিত থাকে। সুতরাং আমাদের রক্তে যে চিনি থাকে তাহার পরিমাণ আহারের পর বৃদ্ধি পায়।

কার্ব্বোহাইড্রেটের উপকারিতা সম্বন্ধে জানিতে হইলে উহা হইতে যে সমস্ত শর্করা প্রস্তুত হয় সেগুলির পরিণাম জানিলেই চলিবে। কার্ব্বোহাইড্রেট হইতে বেশীর ভাগ গ্লুকোজ হয় এবং এই গ্লুকোজ শেষে রক্তে গিয়া পৌঁছায় এ কথা বলা হইয়াছে। রক্তে এই গ্লুকোজ হইতে গ্লিসারোল ও ফ্যাটি এসিড নামক পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং এই দুই পদার্থের সংমিশ্রণে স্নেহদ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই, খাদ্যে বেশীর ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট থাকিলেও কোন প্রাণী বেশ মোটা হইয়া উঠিতে পারে। প্রসূতিদের স্তনদুগ্ধে যে চিনির অংশ থাকে তাহার নাম ল্যাক্টোজ এবং ইহাও গ্লুকোজ হইতে প্রস্তুত হয়।

শরীরের মাংসপেশীগুলি রক্ত হইতে গ্লুকোজ গ্রহণ করে এবং সেটিকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে। যখন কোন মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ যখন আমরা কোন কাজকর্ম্ম করি, তখন তাহার মধ্যে যে গ্লাইকোজেন থাকে তাহা ল্যাক্টিক এসিড নামক এক প্রকার এসিডে পরিণত হয়। এই ল্যাক্টিক এসিডের শতকরা ৮০ ভাগ পুনরায় গ্লাইকোজেনে

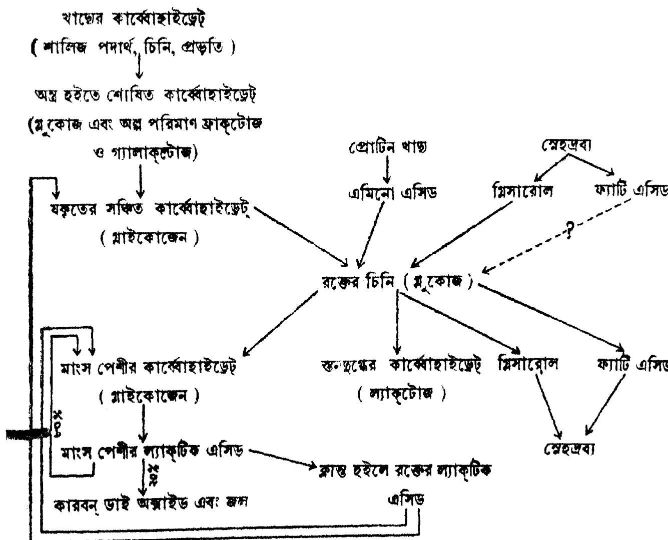
পরিবর্ত্তিত হইয়া মাংসপেশীতে থাকিয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা আমরা বাকি ২০ ভাগ ল্যাকটিক এসিড হইতে পাই। এই ২০ ভাগ ল্যাকটিক এসিড রক্ত হইতে অক্সিজেন গ্যাস লইয়া কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড নামক গ্যাস ও জল প্রস্তুত করে। রক্ত এই কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করিয়া ফুসফুসে গিয়া পরিশোধিত হয়। সুতরাং রক্ত আমাদের দুই প্রকারে সাহায্য করে—প্রথমতঃ, ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্যাস লইয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে যোগান দেয় এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে যে কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত হয় তাহাকে ফুসফুসে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। ফুসফুস শ্বাসপ্রণালীর সহায়তায় তাহা বাহিরের বাতাসে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। সুতরাং আমরা যত বেশী পরিশ্রম করিব তত বেশী অক্সিজেন গ্যাস রক্তকে দিতে হইবে এবং কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ফিরাইয়া লইতে হইবে। সেই কারণে খুব পরিশ্রমের পর আমাদের হাঁপাইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং তাহা আমাদের দেহের কর্ম্মশক্তি বাড়াইয়া দেয়। অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিবার পর যখন রক্ত আর পারিয়া উঠে না তখন ল্যাকটিক এসিড বেশী পরিমাণে জমা হইতে থাকে এবং কিছু কিছু করিয়া রক্তেও প্রবেশ করিতে থাকে। রক্তে ল্যাকটিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে আমরা ক্লান্তি বোধ করি এবং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিশ্রামের সময় ল্যাকটিক এসিড রক্ত হইতে প্রচুর অক্সিজেন গ্যাসের যোগান পায় এবং ধীরে ধীরে গ্লাইকোজেনে পরিণত হইয়া মাংসপেশীতে ফিরিয়া যায়।

সুতরাং দেখা গেল যে, যে গ্লুকোজ কার্ব্বোহাইড্রেট হইতে প্রস্তুত হইয়া রক্তে আসে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত খরচ হইয়া যায়। যখন আমরা উপবাস করি অর্থাৎ যখন আমরা কিছু আহার করি না তখন আমাদের রক্তে নূতন গ্লুকোজও আসে না। সেই সময়ে রক্ত যকৃৎ হইতে গ্লাইকোজেন (যে গ্লাইকোজেন গ্লুকোজ হইতে প্রস্তুত হইয়া যকৃতে সঞ্চিত ছিল) লইয়া আসিয়া তাহাকে গ্লুকোজে পরিণত করিয়া কাজ চালায়। শেষে যকৃতের সঞ্চয়ও ফুরাইয়া যায়। এই কারণেই ডাক্তারেরা নিয়মিত পানাহারবঞ্চিত রোগীকে গ্লুকোজ খাইতে দেন। রোগের সময় সহজপাচ্য কার্ব্বোহাইড্রেট খাইলেও প্রোটিনের অভাব হেতু আমাদের দেহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। গ্লুকোজ হইতে আরও কত কি পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহার সবিশেষ বর্ণনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়।

গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করিবার জন্য ইনসুলিন (insulin) নামক এক প্রকার পদার্থের প্রয়োজন হয়। ইহা আমাদের দেহেই প্রস্তুত হয়। ইনসুলিনের অভাব হইলে মধুমেহ রোগ (diabetes) দেখা দেয়—অর্থাৎ তখন গ্লুকোজ আর গ্লাইকোজেনে পরিণত হইতে পারে না বলিয়া রক্তে ইহার অংশ বাড়িয়া যায়। সেই কারণে ডাক্তারগণ মধুমেহ রোগীদের ভাত, চিনি ইত্যাদি বেশী কার্ব্বোহাইড্রেট যুক্ত খাদ্যের পরিবর্ত্তে কম কার্ব্বোহাইড্রেট খাইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং ইনসুলিন সূচি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে ফল খুব আশাপ্রদ হয় না। তাহার কারণ এই যে রোগ বৃদ্ধি পাইলে প্রোটিন এবং স্নেহদ্রব্য হইতে পর্য্যন্ত গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়। মধুমেহ রোগীদের খাদ্যে কার্ব্বোহাইড্রেটের অংশ কম হইলে লাভ হয় এই যে, রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, অথচ কার্ব্বোহাইড্রেট কম হইলে স্নেহদ্রব্য হজমের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং এ রোগে আক্রান্ত হইলে নিস্তার পাওয়া দুঃসাধ্য।

খাদ্যে কার্ব্বোহাইড্রেটের অংশ বেশী হইলে হাতে-পায়ে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে জলসঞ্চয় বশতঃ ফুলিবার সম্ভাবনা থাকে। অপর দিকে খাদ্যে কার্ব্বোহাইড্রেট কম হইলে বিপরীত ফল ফলে। যাহাদের হাতপা ফুলিয়াছে তাহাদের কম কার্ব্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য দিয়া চিকিৎসা করা হয়। চিনি খুব বেশী খাওয়া উচিত নয়। ইহা হইতে উত্তাপ বেশী পাওয়া যায় সত্য কিন্তু ক্ষুধা কমিয়া যায়, ফলে আমাদের দেহে যথোপযুক্ত প্রোটিন ও স্নেহদ্রব্যের অভাব ঘটে।

'কার্বোহাইড্রেট' খাদ্যের পরিণতি



সাঁতারের কথা

শ্রীশান্তি পাল

নদীমাতৃক বাংলাদেশে এককালে অবগাহন স্নান বাঙালীদের ছিল নিত্যকৃত্যের অন্যতম। যে সকল পল্লীতে কূপ ছাড়া অন্য কোনরূপ জলাশয় ছিল না এবং নদী খাল প্রভৃতি দুই-তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, সেখানকার বালক-বালিকারা, যুবক-যুবতীরা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারাও অবগাহন-স্নানের লোভে নিত্য চার-পাঁচ মাইল পথ হাঁটিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। টিউব-ওয়েলের প্রাচুর্য্যে ও উৎসাহের অভাবে সে প্রথা বহুস্থলে তিরোহিত হইয়াছে। তদুপরি বহু ছোট ছোট শহরেও আজকাল কলের জলের প্রবর্ত্তন হওয়াতে পুকুর কিংবা নদীতে নামিয়া স্নানের অভ্যাস একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। প্রাচীন কালে অবগাহন-স্নানের প্রথা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সভ্য দেশেই প্রচলিত ছিল। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্নানের আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়া যায়। উন্মুক্ত জলাশয়ে সকল সময়ে স্নানের অসুবিধা হওয়ায় চতুর্দ্দিকে 'বাথ' বা স্নানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, রোম এবং উহার উপকণ্ঠে এক সময়ে আট শত হইতে নয় শত সাধারণ স্নানাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল স্নানের জায়গা এত বৃহৎ ছিল যে, একসঙ্গে এক হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারিত। ঐ সকল স্নানাগার রাজপুরুষ, অভিজাত ও ভদ্রবংশের লোকেরা (patricians) ব্যবহার করিতেন। শীতকালে সকাল আটটায় এবং গ্রীষ্মকালে নয়টায় ঐ স্নানাগারগুলি খোলা হইত। কিন্তু স্নানের প্রধান সময় ছিল দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। স্নানার্থীরা গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত সুবাসিত তৈল ব্যবহার করিতেন। অবগাহন-স্নান ভারতীয়দের মত প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের খুব প্রিয় ছিল। রোমক যুবকগণ উচ্চাঙ্গের সন্তরণ-কুশলীও ছিলেন।

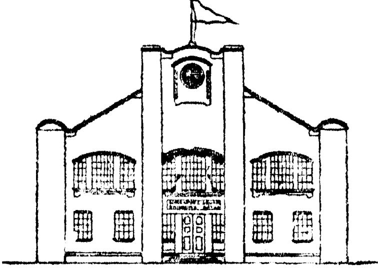
কথিত আছে, রোমীয় সম্রাট ক্যারাকেলা কর্ত্তৃক এক বিরাটাকার স্নানাগার ২১৭ খ্রীষ্টাব্দে রোম-নগরে নির্ম্মিত হয়। ঐ স্নানাগারে প্রায় ১৫,০০০,০০০ 'গ্যালন' জল ধরিত। স্নানাগারের মূল সৌধটি ৭১৬ ফুট লম্বা, ৩৬৭ ফুট চওড়া ছিল। স্নানাগারের খানিকটা অংশ ১৬৪ ফুট অর্দ্ধবৃত্তাকারে পিছনের দিকে প্রসারিত ছিল। সেখানে অন্যান্য ব্যায়ামের বন্দোবস্ত ছিল। স্নান করিবার জায়গায় অতি প্রশস্ত দুইটি প্রবেশ-পথ কাঁচ দিয়া ঢাকা থাকিত। এই স্নানাগারে ১৬০০ লোকের বসিবার স্থান বহু অর্থব্যয়ে সুন্দর ভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই স্থানে রোমক যুবকেরা সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইতেন। এই ধরণের রোমক স্নানাগারগুলিকে থ্যারমো বলা হইত। তাহাতে শীতল বা উষ্ণ জলের বন্দোবস্ত থাকিত। সন্তরণের স্থান, বল খেলার স্থান, ব্যায়ামের স্থান, পড়িবার ঘর, বক্তৃতামঞ্চ, আলোচনা-কক্ষ এবং পেশাদার সাঁতারুদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রভৃতিও ছিল। এই সকল স্নানাগারে প্রচুর তৈল, পাউডার ও অন্যান্য সুগন্ধি প্রসাধনদ্রব্য ক্রীড়ামোদীদের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার এবং স্নানার্থীদের সুখ-সুবিধার জন্য অনেক ক্রীতদাস নিযুক্ত থাকিত। রোমকগণ এই বদ্ধ জলে স্নান করিবার পদ্ধতি গ্রীকদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইউরোপের সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান-সম্মত সন্তরণের পুনঃপ্রবর্ত্তন হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুল কর্পোরেশন সাধারণের জন্য প্রথম স্নানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎসম্পর্কিত আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয়। সেই বৎসর লিষ্টার স্কোয়ারে মহা আড়ম্বরের সহিত আর একটি স্নানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহাদের উন্মুক্ত জলাশয়ের সুযোগ গ্রহণের সুবিধা নাই কিংবা যাহারা ইহা ভালবাসে না, তাহাদের পক্ষে এই সকল স্নানাগারে স্নান করা কিংবা সাঁতার কাটা এক আমোদজনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। দলে দলে লোক সেই সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে লাগিল, সাঁতার শিক্ষা দিবার ও রীতিমত সাধনা করিবার সুবিধা ইহাতে বেশী থাকার জন্য অনেকে ইহাতেই সাঁতার শিক্ষা বেশী পছন্দ করিতে লাগিলেন। উন্মুক্ত জলাশয়ের কথা অনেকেই ভুলিতে বসিলেন।

যাহা হউক, উন্মুক্ত জলাশয়ে সাঁতার কাটা অনেক বেশী বাহাদুরি ও সাহসের পরিচায়ক। উন্মুক্ত জলাশয়ে স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে স্নান করিলে বা সাঁতার কাটিলে শরীর যে ভাল থাকে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, উন্মুক্ত জলাশয়ের জলের উপরকার বাতাস খুব পরিষ্কার ও নির্ম্মল। এখানে প্রচুর অক্সিজেন আছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, এখানকার বাতাসে রোগবীজাণুর সংখ্যা খুব কম। সাঁতারে শ্বাস-ঘটিত ব্যায়াম যথেষ্ট হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া অবগাহন-স্নান কিংবা সাঁতারের আর একটি মস্ত বড় গুণ আছে। তাহা এই যে, ঘন ঘন জলে ডুব দিবার সময় কিংবা সাঁতারের সময় জলের ঘর্ষণে লোমকূপের মুখগুলি পরিষ্কার হইয়া যায়। চামড়ার অব্যবহিত নিম্নে প্রচুর রক্তস্রোত চলাচলে সাহায্য করে। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে এই সত্যটি আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছে যে, উন্মুক্ত জলাশয়ে নিয়মিত সাঁতার কাটিলে সহজে কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। নিয়মিত সাঁতার কাটিলে দেহের উপরকার চামড়া বেশ সতেজ থাকে। চামড়ার অকালকুঞ্চন, কঠিনতা ও বিবিধ চর্ম্মরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

সকলের পক্ষে সকল সময়ে পুকুর, নদী বা সমুদ্রে স্নান করিতে কিংবা সাঁতার কাটিতে যাওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদের বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় সন্তরণচর্চ্চা দিন দিন যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে স্নানাগারের প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন। কলিকাতায় যে কয়টি অতিক্ষুদ্রাকার 'সুইমিং-পুল' আছে তাহার প্রায় সবগুলিই বিদেশীয়েরা ব্যবহার করেন। সেই সকল স্নানাগারে দেশীয় ব্যক্তিদের স্থান মোটেই নাই। আমাদের দেশে সাধারণ প্রতিযোগিতাগুলি সাধারণতঃ পুকুরে হয়। কিন্তু ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় সাধারণতঃ প্রতিযোগিতাগুলি বাথে অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য উন্মুক্ত জলাশয়ে বিভিন্ন দূরত্ব-সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া আমাদের দেশের মত প্রতিযোগিতা আহ্বান করিবার অথবা নদী ও সমুদ্র-বক্ষে দীর্ঘপথ সন্তরণে উৎসাহ

দিবার রীতিও বহু স্থলে প্রচলিত আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক জল-ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে বাথের জলে সন্তরণের বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন ও আয়ত্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে এই অভাব উপলব্ধি করিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা সুইমিং এণ্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যেরা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এইরূপ একটি বাথ বা স্নানাগার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বটে,



ক্যালকাটা সুইমিং এ্যাণ্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পরিকল্পিত সন্তরণ-মঞ্চ

কিন্তু অর্থাভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। লাহোর, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে নাগরিকদের নিজস্ব বাথ আছে। সেখানে মেয়েরাও পৃথকভাবে সন্তরণ অনুশীলন করিবার সুবিধা পান। তাঁহারা বিজ্ঞান-সম্মত সাঁতারে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতার ন্যায় এত বড় শহরের মধ্যে আমাদের একটি নিজস্ব বাথ নাই, যেখানে ইচ্ছামত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইতে পারে বা স্ত্রী-পুরুষ পৃথকভাবে সাঁতারের অনুশীলন করিতে পারেন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মেয়েদের, বিশেষ করিয়া পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশের মেয়েদের মধ্যে সন্তরণ-প্রিয়তা ও শিক্ষার উদ্যোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই বাংলাদেশে—যেখানে সাঁতারের গৌরব চিরদিনই ছিল, এমন কোন সাধারণ স্নানাগার নাই, যেখানে মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সন্তরণের কলা-কৌশল শিখিতে ও প্রতিযোগিতার জন্য সর্ব্বাংশে প্রস্তুত হইতে পারেন। উপযুক্তরূপে সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা করিলে এদেশের নারীরাও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন। আমি এ বিষয়ে ভারতের, বিশেষ-ভাবে বাংলার প্রধান প্রধান শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণের ও গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ দেশের দানশৌণ্ড ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলেই নারীদের জন্য বৈজ্ঞানিক আদর্শ-সম্মত স্নানাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে মুক্তহস্ত হইতে পারেন। নারীর স্বভাবসুলভ সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য সাঁতারে যেরূপ রক্ষিত হয়, শত ব্যায়ামচর্চ্চা ও মূল্যবান প্রসাধন-সামগ্রীতে তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য জাতীয় উন্নতিমূলক পরিকল্পনায় নারীদের সন্তরণ-শিক্ষার সুব্যবস্থা একটা প্রধান স্থান পাওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে মেয়েদের সাঁতার শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে মেয়েদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত অব-হেলিত। নবযুগের নূতন আলোয় সমস্ত বাংলাদেশ মাতৃ-জাতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। দেশ চায় স্বাস্থ্যবতী জননী। সীমাহীন দারিদ্র্যে ও শত সহস্র সামাজিক প্রতি-বন্ধকতার নিপীড়নে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার উপর রেশনের কাঁকর-মেশানো চাউল, পচা আটা ও ভেজালমিশ্রিত তেল ঘি খাইয়া এবং ম্যালেরিয়ার দুরন্ত অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ত দূরের কথা, উহা অটুট রাখাই একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

একথা সকলে স্বীকার করেন যে, মানুষের শারীরিক গঠন ও শক্তি প্রধানতঃ জননীর স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। ইহার উপরেই আমাদের শক্তি, সাহস, বল, বীর্য্য, শিক্ষা ও সাধনা সমস্তই নির্ভর করিতেছে। দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য আমাদের এখন বর্ত্তমান ও নিকট ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কাজ করিতে হইবে। মাতৃজাতিকে মনন-ক্ষেত্রে ও শারীর-চর্চ্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। স্বাস্থ্যচর্চ্চার দ্বারা শক্তিসম্পন্না করিয়া মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার পথ সুগম করিয়া দিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে নানা অস্বাভাবিক কারণে আমাদের সমাজ-শৃঙ্খলার যে অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, নাচ গান ও জলসার মাতামাতিতে যাহার ভয়াবহ প্রকাশ আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই, স্বাস্থ্যচর্চ্চা সুপ্রচারিত হইলে এই উদ্দামতা অনেকটা প্রশমিত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। স্বাস্থ্যচর্চ্চার মধ্যেই জাতির প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। যে জাতি যত স্বাধীনতাপ্রিয় সেই জাতির মধ্যেই ব্যায়াম-চর্চ্চা ব্যাপক ও তত প্রবল। যে জাতি শক্তিতে যত বড় সে জাতির প্রাধান্যও তত বেশী। আমরা দৈহিক বিষয়ে অবনত বলিয়া জগতের অন্যান্য সভ্য ও স্বাধীন জাতির নিকট হেয় ও উপহাসাস্পদ হইয়া রহিয়াছি। এই নিন্দার হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় ব্যাপকভাবে নানাবিধ ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন ও প্রচার করা—সে যে কোন ব্যায়ামই হউক না কেন। আমরা সকল রকম ব্যায়ামের পক্ষপাতী। সকল রকম ব্যায়ামের একটা না একটা উপকারিতা আছে। ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে লব্ধ স্বাস্থ্য স্বদেশ, সমাজ ও জাতির শক্তি বৃদ্ধি করে।

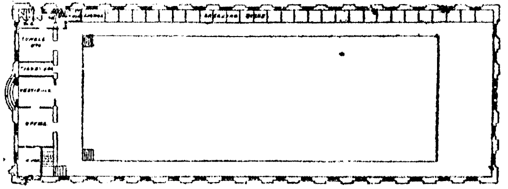
কি কি ব্যায়ামের দ্বারা মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং তৎসঙ্গে লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের বিষয় নহে। আমরা কেবল বলিতে চাই যে, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যচর্চ্চার একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইল এই সাঁতার। সাঁতারের উপকারিতার বিষয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার। কিন্তু নারীর বিশেষভাবে কিশোরীদের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধির পথ সাঁতার কেমন করিয়া সুগম করিয়া দেয় সে সম্বন্ধে এতদিন বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। সাঁতারের দ্বারা কিরূপে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করা যায় সেই বিষয়ে এখানে কিছু বলিতেছি।

সাঁতারের স্থায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যায়াম নাই বলিলেই চলে। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে এবং শরীরের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা সতেজ করিয়া তুলিতে ইহার জুড়ি নাই। সাঁতার যে বিশেষ করিয়া মেয়েদের পক্ষে অন্যান্য ব্যায়াম-পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ একথা আজ চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক ও ব্যায়ামবিদ্ একবাক্যে স্বীকার করেন। নারীদেহের সৌন্দর্য্যের সুসমঞ্জস বিকাশ সাঁতারে ব্যাহত ত হয়ই না বরং তাহাকে সর্ব্বাংশে দ্রুত লাবণ্যময়ী করিয়া তুলে। ইহা দীর্ঘায়ুদানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে পূর্ণ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার ও অনায়াসে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিবার শক্তি দান করে। সাঁতারে বয়সের কোন তারতম্য নাই। যে-কোন বয়সে ইহা শিক্ষা করা যাইতে পারে, ইহাতে ব্যয় নামমাত্র বলিলে চলে। ইহার জন্য সাজসরঞ্জাম কিনিতে হয় না। খেলার মাঠও প্রস্তুত করিতে হয় না। উন্মুক্ত আকাশতলে বিশ্বপ্রকৃতির ঔদার্য্যে যেখানে সেখানে জল ছড়ান আছে, ইচ্ছা করিলেই মানুষ মনের আনন্দে তাহার বুকে ভাসিতে পরেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাঁতার প্রত্যেক নরনারীর শিক্ষা করা দরকার—বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মহিলাদের সাঁতার না শিখিলেই চলে না। কারণ অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদিগকে জলপথে যাতায়াত করিতে হয়, আকস্মিক বিপদের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাঁহারা যদি সাঁতারের কতকগুলি সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আয়ত্ত করিয়া রাখেন তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে বহুক্ষণ জলে ভাসমান থাকিতে পারিবেন। সাঁতারের কলা-কৌশল ভাল জানা থাকিলে শুধু যে বিপদের সময় আত্মরক্ষা করা যায় তাহা নহে, নিমজ্জমান ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিবার সৎসাহস বুকে আসে। আমাদের বিবেচনায় আত্মরক্ষার্থে, স্বাস্থ্যরক্ষার্থে এবং বিপন্নকে সাহায্যার্থে সকলেরই এই বিদ্যাটি অনুশীলন ও অধিগত করা দরকার। যাঁহারা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করেন, তাঁহারা অবগত আছেন, এই নদীবহুল বাংলাদেশে কত নরনারী সন্তরণ শিক্ষা ও সাহায্যের অভাবে সলিল-সমাধি লাভ করিতেছেন। সামান্য যত্ন ও চেষ্টায় এই ভয়াবহ মৃত্যুর কবল হইতে যদি আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি এবং বিপন্নকে রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের স্বাস্থ্যচর্চ্চা সার্থক হইবে।

স্বাস্থ্য অটুট না থাকিলে কোন কার্য্যে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, সোজা হইয়া পথ চলিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই বলিলেই হয়, বিশেষতঃ মেয়েদের ত কথাই নাই। গৃহলক্ষ্মীরা যেভাবে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এখানে আমরা শহরের মেয়েদের কথাই বলিতেছি। প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের প্রত্যেকেই মুক্ত আলো ও বাতাস হইতে তাহাদের প্রাণশক্তি আহরণ করিতে চায়। তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। জীবন-সংগ্রামে নিত্য সংঘর্ষজনিত ক্ষয়ের পরিপূরণের জন্য মানুষকেও স্বাস্থ্যচর্চ্চা করিতে হয়।

তাই সুলভ সহজসাধ্য ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বলিয়া এই সন্তরণ-চর্চ্চার মধ্য দিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টা আজ সভ্য দেশের সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। সন্তরণ অভ্যাস বহু দেশের নারীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজ সন্তরণকুশলী কয়েকটি বাঙালীর মেয়ে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সন্তরণ-ক্রীড়ায় বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েদের সাঁতার শিক্ষা দিবার তেমন কোন ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত এদেশে হয় নাই। পুরুষদের অনেকগুলি সন্তরণ-প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু সেখানে বার বৎসরের অনধিক বয়স্কা বালিকারা কেবল মাত্র সাঁতার দিতে পারেন। আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য বয়স্কা



স্নানাগারের একটি পরিকল্পনা

মেয়েদের জন্য ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়া—যেখানে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সন্তরণ-চর্চ্চা করিতে পারেন। সামাজিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকের জন্য এদেশে সহ-সন্তরণ সম্ভব নহে। স্ত্রী ও পুরুষের সন্তরণ অভ্যাসের পদ্ধতিও পৃথক হওয়া উচিত। তাহা না হইলে স্বাস্থ্যহানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের মধ্যে বালিকাবয়সে কেহ কেহ সন্তরণ বা ক্রীড়াপটু হইলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাভ্যাস অনুযায়ী তাঁহাদের প্রকাশ্যে সন্তরণ করা নানা কারণে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

দেশের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে কেহ কেহ বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতার জন্য দুঃখ করিয়া বলেন যে, সাঁতারের দ্বারা এই সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই! মেয়েদের মধ্যে সন্তরণ প্রচলনের জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই। তবে কলিকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলার প্রাণপণ চেষ্টায় হেদুয়ায় কিছুদিনের জন্য সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সন্তরণ যে স্বাস্থ্যপ্রদ সহজসাধ্য ব্যায়াম একথা তাহারা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিমল আনন্দদায়ক জলক্রীড়ার সাহায্যে মেয়েদের নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকটি অনিবার্য্যকারণে তাঁহাদের প্রচেষ্টা অল্প দিনেই বিনষ্ট হয়। যাহাতে এই শুভ উদ্যোগ পুনরুজ্জীবিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষীদের সমবেতভাবে চেষ্টা করা উচিত। দেশের সর্ব্বত্রই যাহাতে প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে একটি দুইটি করিয়া মেয়েদের সন্তরণ-সমিতি গড়িয়া উঠে তৎসম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন বালক-বালিকাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন, সেইরূপ যদি মহিলাদের উপযোগী ব্যায়াম ও সাঁতারের চর্চ্চা করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহা হইলে মহিলাদের যথার্থ হিতসাধন করা হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন বালক-বালিকাদের জন্য ২০ × ১৬ × ১॥০ ফুট নির্মল জলসমন্বিত ছোট ছোট 'জলাশয়' প্রত্যেক পার্কেই স্বচ্ছন্দে তৈয়ারী করাইয়া সেগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারেন। দেশের প্রত্যেক পৌর-প্রতিষ্ঠান ও জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগের উচিত বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষার স্পৃহা সর্বত্রই জাগাইয়া তোলা।

কমন রুম

শ্রীতারাপদ রাহা

কমন-রুম।

ঘরটা বড়ই,—একদিন পঁয়তাল্লিশটা ছেলে বসিয়ে স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষা করে ক্লাস করা যেত; কিন্তু তখন ছিল এটা ক্লাস: পূব-উত্তর-দক্ষিণের খোলা জানালা দরজা দিয়ে প্রচুর আলো-হাওয়া আসত। এখন এটা টিচার্স কমন রুম। পূব-উত্তর-দক্ষিণে জানালা ছাড়িয়ে ব্যাফল-ওয়াল তোলা, পশ্চিমে পার্টিশান ওয়াল। ক্লাস করা আর যায় না। দক্ষিণের ব্যাফল-ওয়াল আর ঘরের দেওয়ালের মাঝে একটু সরু প্যাসেজ আছে, সেই প্যাসেজ দিয়ে গেলে কমন রুমে ঢুকবার একটা দরজা পাওয়া যায়।

দরজা খুলে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে প্রথমে কিছুই চোখে পড়বে না আপনার। নতুন লোক হলে খুবই ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকতে হবে আপনার, কারণ ঘরে ঢুকে দু-পা এগুলেই ডাইনে বাঁয়ে পড়বে কতকগুলি ভাঙা চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড। ছেলেরা দুরন্তপনা করে ভেঙেছে এগুলি; এখন এগুলি মাষ্টারদের বসবার আসন, খাতা দেখবার টেবিল। ভাঙা বেঞ্চের গায়ে গায়ে ঠেসান দিয়ে আছে ছেলেদের সাইকেল—অন্তত খান দশ-বার। বাইরে রাখলে চুরি হয়ে যেতে পারে তাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এগুলি টিচার্স কমন রুমে রাখা হবে। লিজার পিরিয়ডে মাষ্টারদের চোখে চোখে থাকবে তবু এগুলি, পাহারার কাজ হবে।

গ্রীষ্মকাল হলে একখানা তালপাতার পাখা হাতে করে ঘরে ঢুকবেন, নইলে বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারবেন না। বৈদ্যুতিক পাখা অবশ্য একখানা আছে, কিন্তু সেখানা চলে না। টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে ছাতা দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে কিছুটা ঘোরে বটে, তবে তাতে বাতাস হয় না।

একবার সারানো হয়েছিল টিচার্স কমন রুমের একখানা পাখা, সঙ্গে সঙ্গে সেখানা ছেলেদের একটা ঘরে চালান হয়ে গেল, সেখানে যে অচল পাখাটা ছিল সেটা এল কমন-রুমে। হেডমাষ্টারের মধ্যস্থতায় সেক্রেটারীকে খবর পাঠানো হয়েছিল নালিশের মত করেই। জবাব এল ফ্যান ফি ছেলেরাই দিয়ে থাকে, সুতরাং আরামে বাতাস খাবার দাবি নেই মাষ্টারদের।

—শুনে মাষ্টারমশায়েরা দুদিন একটু চেঁচামিচি করলেন—তার পর কমন ফাণ্ড থেকে খানকয়েক তালপাতার পাখা কিনে নিলেন। সেগুলিও অবশ্য কমন-রুমে এখন খুঁজে পাওয়া যায় না, দরকার হলে মাষ্টারমশায়রা ছেলেদের হোম-টাস্কের খাতা দিয়ে বাতাস খান।

হাওয়ার অভাবে গ্রীষ্মে যেমন গরম, রৌদ্র-আলোর অভাবে শীতে তেমনি ঠাণ্ডা এই ঘর।

এ ছাড়া আরও আছে: ঘরের এক কোণের বেঞ্চিতে আছে একটা জলের কলসী—পাশে, নীচে এক গামলা। হাত মুখ ধোবার জল ফেলে কুলকুচা করে, গেলাস আর পেয়ালা ধুয়ে—পানের পিক আর ছিবড়ে ফেলে—সেটাকে ভর্তি করে ফেলতে দেরি হয় না বেশি, তারপর আলো-আঁধারে কোন অসাবধানীর পায়ের ধাক্কা লেগে সেটা যায় উল্টে, অথবা ভর্তি হয়ে উপচে পড়ে। তাই ঘরের মেঝে শুকনো পাওয়া ভার।

কিন্তু এতেই বা ভয় পাবার কি আছে, সমুদ্রে দ্বীপ আছে, আর কমন রুমে আছে বেঞ্চ। কোন রকমে জুতো পায়ে একবার বেঞ্চে এসে বসতে পারলেই হ'ল, বাস্। লম্বা টেবিলে খবরের কাগজ আছে পড়ো, টেবিলে খাতা রেখে কারেক্ট কর, বেশি লোক না থাকলে শুয়ে পড়।—যা খুশি।

বিনয় বাবু লিজার পিরিয়ডে ঘরে ঢুকেই অন্য লোক থাকলে বলে ওঠেন, ভাল লাগে না, কাঁহাতক আর পারা যায়, দুর ছাই। খবরের কাগজ অনাদরে টেবিলে পড়ে থাকে, বিনয় বাবু বেঞ্চের উপর পা তুলে উবু হয়ে বসে ড্রয়ার থেকে বিড়ি বের করেন: চার দিন পরে এই লিজার পেলাম, কাঁহাতক পারা যায়, ভাল লাগে না—ছাই।

কেউ বা তার কথায় উত্তর দেয়, কেউ বা দেয় না, বিনয় বাবু একটার পর একটা বিড়ি বের করে কড়িকাঠের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে ফুঁকে যান।

ধীরেন বাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলেন, ও মশায়, বিনয় বাবু, খুব ত কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বিড়ি ফুঁকে চলেছেন, এদিকে কাল মিটিঙে কি আইন জারি হয়েছে শুনেছেন?

না, কি হ'ল আবার?

মাষ্টারমশায়দের কে কে—দুএক মিনিট দেরি করে স্কুলে আসেন, সে সব আর চলছে না, মশায়, এক মাসে কারো তিন দিন লেট আটেণ্ডান্স হলে—that will be counted as one day's absence.

বিনয় বাবু মুখ চোখ বিকৃত করে বলেন, ভাল লাগে না, ছেড়ে দেব।

শুধু এই নয়—আরও আছে।

বিরক্তিতে বীভৎস হয়ে ওঠে বিনয় বাবুর মুখ: আবার কি হ'ল?

'ক্যাজুয়াল লিভে'র দরখাস্ত অনেকে দেরি করে দেন, সে

সব আর চলছে না, আগে দরখাস্ত না দিয়ে কামাই করলে—'কনটিনিউটি অব্ সারভিস্' 'ব্রেক্' করবে।

ছেড়ে দিন সব ছেড়ে দিন—ভাল লাগে না।

টিফিনের ঘণ্টা বাজল, একে একে মাষ্টারেরা আসতে লাগলেন কমন রুমে, তরুণ আর মধ্যবয়স্ক মাষ্টারের দল। বুড়োরা বসেন হেডমাষ্টারের ঘরের পাশে, লাইব্রেরি ঘরে।

একসঙ্গে ঊনবিংশতি কণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠল কমন রুম।

চা—চা—হয়েছে—ও মাদার? হাঁক ছাড়লেন বিপ্রদাস বাবু।

মতিবাবু সবে ষ্টোভ ধরাবার জোগাড় করেছেন। এঁরই কৃপায় স্কুলের কুড়ি-বাইশজন শিক্ষক টিফিনের সময় গরম জলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেন। টি ক্লাবের মেম্বারেরা আদর করে এঁর নাম রেখেছেন 'মাদার'। 'ফাদার' হচ্ছেন বিনয়-বাবু—মাদারের অবর্ত্তমানে তিনিই চা করেন, তাছাড়া চায়ের জোগাড়যন্তর কেনাকাটা—।

অন্য দিন টিফিনের আগেই বিনয়বাবু ষ্টোভটা জ্বেলে চায়ের জলটা চাপিয়ে রাখেন, আজ তাঁর মন ভাল নেই, তিনি আর জল চাপান নি। বিপ্রদাস বাবুর কথার জবাবে মতিবাবু মুখ ভার করে বললেন—এই ত আপনাদের 'ফাদার' লিজার পেয়েছিলেন—ষ্টোভটা ধরিয়ে জলটা চাপালে কি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিনয় বাবু বললেন, ভাল লাগে না, ছাই—

ভাল না লাগে চা ছেড়ে দিলেই ত হয়।

চায়ের কথা বলছি নাকি আমি?

তবে কি?

মাষ্টারি করতে আর ভাল লাগে না।

ও ত শুনছি কত কাল ধরে, ছেড়ে দাও না কেন?

সহসা বিনয়বাবু কৌতুকামোদী হয়ে ওঠেন: ছাড়ি না শুধু তোমার হাতের এক কাপ চায়ের জন্যে—আর কি সুখ এখানে আছে।

কি কি হ'ল, বিনয়বাবু?—বলে ঘরে ঢুকল সুশোভন। সঙ্গে সঙ্গে এল অরূপ, মুখে তার বিলিতি গানের সুর, লা—লা—লা—লা—লা; লা—লা—লা। এল সুখেন্দু গান গাইতে গাইতে, উষার উদয় ক্ষণে—তুমি আসিলে…

সরগরম হয়ে উঠল কমন রুম। ওদিকে চলেছে মতিবাবুর জ্বালা ষ্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ। মধ্যবয়সী নিবারণ বাবু, শৈলেনবাবু টেবিলের উপর খোলা খবরের কাগজ ফেলে রেখে উত্তেজিত হয়ে তখন চেঁচামেচি সুরু করেছেন: ইট্ ইজ ইনসালটিং,—আমাদের কি স্কুলের ছাত্র পেয়েছেন নাকি, যে তিন দিন লেট হলে একদিন অ্যাবসেন্ট ধরা হবে? কেউ দেরি করে আসেন, হেডমাষ্টার মশায় তাঁকে একবার ডেকে—গোপনে সাবধান করে দিলেই পারতেন, বাস্। দেরি করে আমরা আসব না, কেন না, সেটা 'অনারেবল' নয়। শাস্তির ভয়ে ঠিক সময়ে আসতে হবে?

সুশোভন বিনয় বাবুর উত্তরের প্রতীক্ষা না করে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে: কি ব্যাপার কি?

নিবারণ বাবু বললেন, আরে মশায়, কালকের মিটিং-এ কমিটি পাস করেছেন একমাসে তিন দিন লেট হলে—That will be counted as one day's absence.

ছুদিনের বেশি হলে হবে না ত?

না।

বেশ ত, সবাই ঠিক করুন—প্রত্যেক দিন ঠিক সময়ে এসে on the last two days of every month আমরা সবাই চল্লিশ মিনিট দেরি করে আসব।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। বিনয়বাবু এতক্ষণ এক বেঞ্চিতে শুয়েছিলেন—হঠাৎ তিনি উঠে বসে বললেন, ঠিক বলেছ ভায়া, ঠিক সাহিত্যিকের মতই কথা বলেছ, স্কুলের ছেলেদের মত শাস্তি দিবার ব্যবস্থাই যখন হ'ল আমাদের তখন স্কুলের ছেলেদের মত হতে দোষ কি? সম্মান যখন রইলই না।

নগেনবাবু ঘরের এক কোণে এক বেঞ্চের উপর শুয়ে চোখ বুজে পড়েছিলেন, শৈলেন বাবু ইঙ্গিতে সেইদিকে সুশোভনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। লোকটা নাকি সেক্রেটারীর চেলা, টিফিন পিরিয়ডে এসেই চোখ বুজে বেঞ্চের উপর পড়ে থাকেন, মাঝে মাঝে নাকও ডাকে। সবার ধারণা এমনি করে ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে উনি মাষ্টারদের সব আলোচনা শুনে গিয়ে সেক্রেটারীকে লাগান।

শৈলেন বাবুর ইঙ্গিতে সুশোভন ত থামলেই না, বরং আরও জোরে জোরে আরম্ভ করলে, আপনারা এ করুন আর নাই করুন—আমি ত মশায় মাসের শেষ ছুদিনে একেবারে ঘড়ি দেখে চল্লিশ মিনিট দেরি করে আসব।

নিবারণ বাবু বললেন, আর শুনেছেন ত আর এক ফ্যাসাদ করে বসেছে যে এদিকে!

জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল সুশোভন।

ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত আগে না দিলে লিভ গ্রাণ্ট ত হবেই না—তারপর আবার কনটিনিউটি অব সার্ভিস ব্রেক করবে। কি ফ্যাসাদ বলুন ত—বিপদ আপদ দরকার কি মানুষের সব সময়েই জানিয়ে আসে? একটার ত ব্যবস্থা দিলেন আপনি, এটার কি করা যায় বলুন ত?

কথাটা শুনে একটুখানি কি জানি—ভাবলে সুশোভন—তার পর বললে, কিছু কিছু করে চাঁদা দিতে রাজি আছেন আপনারা?

তা আছি, কিন্তু কেন বলুন ত?

ক্যাজুয়াল লিভের একটা ড্রাফ্ট করে—কয়েক হাজার য়্যাপ্লিকেশন ছাপিয়ে রাখতে চাই আমি। কারণটার ওখানে শুধু গ্যাপ থাকবে, আর নামের জায়গায়। পনের খানা করমে সবাই সই করে রাখবেন, আর কামাইয়ের কারণটার জায়গায় নানা রকমের নানা কথা লিখে রাখবেন। যিনিই যেদিন কামাই করুন না কেন, এই কমন রুম থেকে দরখাস্ত পেশ করে দেওয়া হবে হেডমাষ্টারের কাছে।

যাঁর কাছে দরখাস্ত থাকবে তিনিই যদি কামাই করেন?

সুশোভন উত্তর দিলে, সই করা দরখাস্ত থাকবে তিন চার জনের ড্রয়ারে।

এ দিকে চা হয়ে গেছে—মতিবাবু ডাকছেন, কাম্ অন্

সাবিজ—ইয়োর টি ইজ রেডি। চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে সব যুক্তি করুন।

সবাই পেয়ালা হাতে এগিয়ে এলেম, সুশোভনের গায়ের ঝাল মেটে নি, সে পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়েই বলতে লাগল, আর কি সব যুক্তি দেখুন—ধরা গেল একজনের দুদিন লেট হয়েছে, তৃতীয় দিন লেট হবার সম্ভাবনা থাকলে আসবে কেন সে স্কুলে দেরি করে, সেদিন এলেও একদিনের কামাই ধরা হবে, না এলেও তাই—

তাইত, তাইত! কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠলেন। টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। কয়েক জন সিগারেট আর বিড়ি ধরালেন।

ঘণ্টা যে বেজে গেল মশায়?

তা যা'ক, এখন দেরি করে গেলে ত আর অ্যাবসেণ্ট মার্ক করা হবে না, অনায়ের কোশ্চেন যখন উঠেই গেল!

মুখে বলেন অবশ্য অনেকেই এ কথা, কিন্তু কাজের বেলায় বিড়িতে দু-এক টান দিয়েই সব ক্লাসে ঢোকেন। অনেক দিন মাষ্টারি করে করে প্রতিশোধ নেবার শক্তি এঁরা হারিয়ে ফেলেছেন, অথবা ভাবেন প্রতিশোধ নেব আমরা কার উপর—গাত্রদাহ আমাদের কমিটির উপর—রাগ করে ছেলেদের ক্ষতি করে লাভ কি—তাদের কি দোষ?

টিফিনের ছুটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কমন রুম নিঝুম হয়ে যায়। যে দুই-একটি মাষ্টার নিজার পান তাঁদের মাঝে সম্প্রীতি থাকলে স্কুলের ব্যাপার বা পারিবারিক জীবনের গল্প সুরু হয়, গল্প আর কি, কথা: দুঃখ, অভাব, আর নির্যাতনের কথা! মাষ্টারের জীবনে আর কি আছে?

সপ্তাহের মাঝে কোনও কারণে কোন দিন যদি সুশোভন, অরূপ আর সুখেন্দুর নিজার একসঙ্গে পড়ে যায় তবে কমন রুমের হাওয়া একেবারে বদলে যায়। রুদ্ধ বদ্ধ অন্ধকার কারাকক্ষের মাঝে নেমে আসে স্বর্গের আলো বাতাস সুর। আসেন বীটোফেন, ওয়াগনর, মোৎসার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, টলষ্টয়, শেকভ, ন্যুট হামসুন, রেলেন্ডা, পার্ল বাক।

কোন দিন সুখেন্দু নিজের লেখা কবিতা শোনায়, অনুবাদ শোনায় শেকভের ডার্লিং-এর, ব্যালজাকের 'প্যাশান ইন্ দি ডেসার্টে'র। সুশোভন নিজের লেখা গল্প শোনায়, পড়ে নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

মাঝে মাঝে প্রেমের প্রসঙ্গ ওঠে, অরূপ বলে, সুশোভন-দা, বিয়ে করবেন না?

সুশোভন হাসে: মনের মানুষ পেলাম কই ভাই, আগে পাই…

আচ্ছা সুশোভন-দা,—প্রেমে পড়েছেন কোন দিন?

এমন মানুষ জগতে কে আছে, ভাই, যার জীবনে এ সব ব্যাপার কিছু-না-কিছু না ঘটেছে, কারও বা সফল হয়, কারও বা হয় না।

সুখেন্দু বলে, কবি সাহিত্যিকদের জীবনে ওদিকটা সফল না হলেই ভাল, ভাল কবিতা আর সাহিত্য সৃষ্টি হয়।

ম্লান হেসে সুশোভন বলে, সব জায়গাতেই খাটে না, ভাই, ব্রাউনিং-এর বেলায় কি হ'ল, তা ছাড়া সত্যিকার মনের মানুষ যদি কারো মেলে জীবনে—কবিতা বা সাহিত্য সৃষ্টি না হলেও বুঝি ক্ষোভ থাকে না।

—বলতে বলতে মন কাঁচা হয়ে যায় সুশোভনের। একে একে পুরান স্মৃতির পুঁটলি খুলে দেয় সে দুই তরুণ বন্ধুর কাছে। বলা শেষ হলে ম্লান হেসে স্বচ্ছন্দ ভাব আনবার চেষ্টা করে সে বলে, আমার কথা ত শুনলে, এবার তোমাদের। সুখেন্দু, আগে তোমার কথা বল।

কথা শুনে সুখেন্দু দুষ্টামির হাসি হাসতে হাসতে গান ধরে—

উষার উদয় ক্ষণে—তুমি আসিলে মৃদুল বায়
আমি জাগিয়া সারাটি রাতি—শেষে ঘুমায়ে পড়িনু হায়…

গলাটা সুখেন্দুর এতই মিষ্টি যে গানের মাঝে আর তাকে বিঘ্ন করতে সাহস পায় না সুশোভন। গান থামলে হেসে বলে, কিন্তু এ ত উর্বশীর কথা! কোন মানবী প্রিয়ার কথা বল।

সুখেন্দু বলে, এই উর্বশীই আমার মানসী, মানবীর মাঝেই মানসী খুঁজে বেড়াই সুশোভন-দা, দেখা পাই নি এখনও, পেলে বলব…

এইটুকু মাত্র বলে সুখেন্দু হাসতে হাসতে অরূপের দিকে তাকিয়ে বলে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন, ও ওর মানসীর দেখা পেয়েছে।

কেমন?—জিজ্ঞাসু নেত্রে চায় সুশোভন।

বলব?—সুখেন্দু তাকায় অরূপের দিকে। অরূপ হাসতে থাকে: সুশোভন-দার কাছে আর গোপন রাখার কি দরকার আছে?

সুখেন্দু অরূপের আপত্তি নেই জেনে বলে, ভায়াটি আপনার প্রেমে পড়েছেন।

কোথায়?

সন্ধ্যাকালে ও একটি মেয়েকে পড়ায় জানেন ত? আই-এ পড়ছে মেয়েটি, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার ঠিক করে দিয়েছেন, বড়লোকের মেয়ে—বাড়িতে পিয়ানো আছে, আরও আছে বেহালা, বুঝলেন না? ছ' দিন হয় পড়ানো আর রবিবার হয় সঙ্গত। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ!

সুশোভন হেসে বলে, বুঝলাম, কিন্তু ওদিককার খবর কি,—প্রেম এক তরফা নয় ত?

পাগল হয়েছেন, অমন চেহারা যার—সে আবার বেহালা বাজাতে পারলে মেয়েদের মাথা ঘুরে যায় না?—তা ছাড়া ওর ইংরেজীর উচ্চারণ ভাল,—এম-এ, বি-টি। অরূপের বাড়ির অবস্থাও ত মন্দ নয়—সে কথা ওর পোষাক দেখেই কি বুঝে নেয় নি মেয়েটি?

নাম কি মেয়েটির?

মীরা, মীরা—কি সুন্দর নাম, নয় অরূপ?

পিরিয়ড ওভার হয়ে গেল—সুশোভন অরূপের দিকে চেয়ে বললে—মীরাকে ত খুব বাজনা শোনাচ্ছ, আমাদের একদিন তোমার বীটোফেন, ওয়াগনার শোনাও না!

শোনাব সুশোভন-দা—শোনাব—নিশ্চয় শোনাব, এই

কমন রুমেই শোনাব, মতিবাবু, সতীশ বাবুও শুনতে চেয়েছেন।

* * *

কমন রুমের মজলিস সবচেয়ে বেশি জমে ওঠে—শুক্রবার আর শনিবার। শুক্রবার নমাজের দিন—এক ঘণ্টা পনের মিনিট টিফিন। মুসলমান ছেলের সংখ্যা অবশ্য অতি কম, সমস্ত স্কুলে কুড়িয়ে ছয়-সাতটির বেশি হয় না। তারা নমাজ পড়বারও ধার ধারে না, লম্বা টিফিনের ছুটি পেয়ে হিন্দু-ছেলেদের সঙ্গেই চীনে বাদাম চানাচুর আর হাপিবয়ের কাছ থেকে কেনা আইসক্রীম খেতে খেতে চেঁচামেচি আর ছুটাছুটি করে। শুক্রবারের টিফিন তবু এক ঘণ্টা পনের মিনিট।

*মাষ্টারেরা বলেন, যথা লাভ। টাকা পয়সা যখন নেই—তখন যতক্ষণ গলাবাজি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মেজাজ যখন ভাল থাকে তখন আলোচনা হয় ধর্ম্ম, রাজনীতি, দেশ-বিদেশের কথা। আলোচনায় মাঝে মাঝে অনেক গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে মনের ক্ষত স্থানে আঘাত লাগলে মুখের রাশ আলগা হয়ে যায় অনেকের।

শনিবার স্কুলের ছুটির এক ঘণ্টা পরও কমন রুম গম গম করছিল একদিন, ভাদ্র মাসের শেষাশেষি। আগের দিন কমিটির মিটিং হয়ে গেছে, মাস্টার মশায়েরা দরখাস্ত করে-ছিলেন—কিছু পূজা বোনাসের জন্ত। আবেদন মঞ্জুর হয় নি। সেক্রেটারি বলেছেন—পাঁচ টাকা ডিয়ারনেস দেওয়া হচ্ছে—গবর্ণমেণ্ট দিচ্ছেন পাঁচ টাকা—আবার কেন?

কমিটিতে শিক্ষকদের যে দুই জন প্রতিনিধি থাকেন—তার একজন সতীশবাবু। সতীশবাবু সাধারণতঃ উপরে বসেন। আজ তাঁকে নীচে কমন রুমে ডেকে আনা হয়েছে?

শৈলেন বাবু সতীশবাবুকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা প্রতিবাদ জানালেন না কেন? টাকা ত যথেষ্ট আছে—ছাত্র ত বেড়েছে।

আপনারা মনে করেন কি আমাদের? প্রতিবাদ বেশ ভাল করেই করা হয়েছে। ওঁরা বলেন, টাকা আছে—খরচও অনেক আছে: শীতকাল আসছে, মাঠে মাটি ফেলতে হবে, লাইব্রেরির বই কিনতে হবে, কিছু চেয়ার বেঞ্চি ব্লাকবোর্ড কিনতে হবে, তা ছাড়া সিঙ্কিং ফাণ্ডে টাকা রাখতে হবে, একবার দুর্দশায় পড়ে মাস্টারদের মাইনে কাটতে হয়েছিল, আবার যে দুর্দশা আসবে না—তা কে বললে?

নিবারণবাবু অমনি জবাব দেন, এর চেয়ে দুর্দশাও আবার আছে না কি, পেট ভরে দুটি ভাত খেতে পাইনা, ছেলেপিলেদের খাওয়াতে পারি না, অথচ টাকা থাকতে টাকা দেবে না এরা, এমন হলে পারে কি করে লোকে?

সতীশবাবু উত্তর দেন, তাও বলা হয়েছিল, তাতে ওঁরা বলেন, যার না পোষায় ছেড়ে দিন তিনি।

শৈলেনবাবু অমনি ফোঁস করে উঠেন: ছেড়ে ও দিক না। আমরা ছাড়তে যাব কেন? পনের বিশ বছর করে আমরা এক এক জন মাষ্টারি করছি এখানে, আমরা ছাড়তে যাব কেন? নিজেদের রক্ত জল করে স্কুলে মানুষ করছি আমরা। কিসের জন্তে এসেছে এখানে, মান ত ছাই, মাস্টারেরা কেউ মধুর সম্ভাষণ না করে জল খায় না, কিসের লোভে এসেছে এখানে?

মতি বাবু মৃদু হেসে বলেন, কিসের জন্তে আমি জানি।

কি, কি, সবাই প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করে ওঠেন।

মতিবাবু গম্ভীর হয়ে ধীর কণ্ঠে বলেন, যে দিনকাল পড়েছে, ঝি চাকর পাচ্ছেন আপনারা?

আরে মশায় যে-সব মাইনে তাতে আবার ঝি চাকর রাখব।

নিবারণবাবু বলেন, তারাই এখন আমাদের রাখতে পারে। আরে মশায় বলব কি, অমূল্য বলে একটা ছেলে আমাদের বাড়িতে কাজ করত—মাইনে ছিল পাঁচ টাকা, সেদিন দেখি সে জুতা হাফপ্যাণ্ট পরে এক মোটরে বসে আছে: কি অমূল্য খবর কি, তুমি এখানে? তুই বলতে আর সাহস পেলাম না। সে বললে, আমি এখন মিলিটারির ড্রাইভার।...মাইনে কত? বললে, একশো টাকা।...বুঝুন। সে এখন আমায় রাখতে পারে, আমি রাখব কি তাকে?

মতিবাবু বললেন, যাক, চাকর আমরা রাখতে পারি না, রাখতে পারলেও পাই না, কিন্তু আমাদের সেক্রেটারি বিনি মাইনেয় চাকর পান।

কেমন?

আপনাদের স্কুলের মালী নাথো যে এত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, কাজ করে না; ওর ভাগনে রামানন্দ যে মুখে মুখে জবাব করে, কাজ করতে বললে মুখের উপর 'না' বলে দেয়, ওদের নামে নালিশ করলেও ওদের চাকরি যায় না, এর কারণ কি?

আপনার হেঁয়ালি রেখে আসল কথা বলুন।

আসল কথা এরা সেক্রেটারির বাড়িতে বিনি পয়সায় বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর পোঁছে, ছুটির দিনে বাগানে সবজী করে। অনন্ত বলে যে চাকরটা—আগের সেক্রেটারির আমলে যে কাজ করে গেছে, স্মার্ট আর কাজের লোক বলে এত রেকমেণ্ড করলেন আপনারা, তবু তার চাকরি হ'ল না কেন—না, সে ও বাড়িতে বিনি পয়সায় চাকরের কাজ করতে রাজি হয় নি।

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন অবনীবাবু, বছরের প্রথম দিকে ইনি এখানকার চাকরিতে রেজিগনেশান দিয়ে গেছেন।

এক সঙ্গে কয়েক জন মাস্টার চীৎকার করে উঠলেন, আসুন, আসুন আমাদের অবনীবাবু আসুন। আপনার বন্ধুর কথাই হচ্ছে।

মৃদু হেসে অবনীবাবু বললেন, কে, সেক্রেটারি?

হাঁ, তিনি ছাড়া আর কে আপনার বন্ধু আছেন এখানে?

ঠাট্টা করবেন না আপনারা, সত্যিই তিনি মস্ত বড় বন্ধুর কাজ করেছেন, একদিন কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আসব।

সবাই কথাটা বুঝতে না পেরে অবনীবাবুর মুখের দিকে চাইলেন।

অবনীবাবু বললেন, ওর জন্তই ত স্কুল ছাড়লাম আমি, নইলে

ত পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর পাঁচ টাকা—ভিয়ারনেসে পচে মরতে হ'ত।

তা এখন বোধ হয় কিছু মোটা মাইনে—

তা এখানকার তুলনায় খুব ভালই বলতে হবে : সওয়া শো টাকা আর পঞ্চাশ, পৌষে তুশোতে মিলে ঢুকেছিলাম, মাস তিনেক হ'ল ওখান থেকে টেকস্‌টাইলে এসেছি, এখানে পাচ্ছি সাড়ে চারশো।

মাষ্টার মশায়দের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের শক্‌ লেগে যায় : সা-ড়ে চা-র-শো, তাদেরই সেই পঞ্চাশ টাকার অবনীবাবু সাড়ে চারশো।

ঘরের স্তব্ধভাব লক্ষ্য করে সুশোভন হেসে অবনীবাবুকে বলে, তা'লে আমাদের একদিন খাওয়াচ্ছেন ত, আমাদেরই একজন ছিলেন ত একদিন ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, কবে খেতে চান বলুন, পূজার ছুটির আগেই একটা দিন ঠিক করুন।

আসছে শনিবার ?

বেশ তাই।

কমন রুমে দুজন নতুন টিচার দেখে অবনীবাবু বললেন, কই এদের সঙ্গে ত পরিচয় হ'ল না।

সঙ্গে সঙ্গে সুশোভন অরূপকে দেখিয়ে বললে, আপনার বদলে এসেছেন ইনি, অরূপ ব্যানার্জি, ইংলিশের এম-এ, বি-টি, সব চেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে ইনি খুব ভাল ভায়োলিন বাজাতে পারেন,…আর ইনি হচ্ছেন সুখেন্দু রায় চৌধুরী, বাংলার এম-এ, কবি ও ভাল গাইয়ে।

পরস্পর নমস্কার বিনিময় হ'ল। অবনীবাবু বললেন, ভায়োলিন আর গান শুনতে লোভ হচ্ছে যে বড়।

সুশোভন বললে, বেশ আসছে শনিবারেই ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল অরূপ, সুখেন্দু ?

বেশ ত। উনি খাওয়াবেন, আর আমরা একটু গানবাজনা করতে পারব না ? অরূপ উত্তর দিলে।

অবনীবাবু একটু থেমে বললেন, যেখানেই যাই আপনাদের এ কমন রুমের কথা আর ভুলতে পারি না। পৌণে দুটো বাজলেই মনে হয় কমন রুমটা থেকে একবার ঘুরে আসি, যেন নেশার মত টানতে থাকে।

অবনীর কথাবার্ত্তা শুনে বেশ লাগছিল অরূপের, সে সুশোভনকে জিজ্ঞাসা করলে, উনি ছেড়ে গেলেন কেন ?

সুশোভন মৃদু হেসে বললে—উনি ত রয়েছেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর না ?

কথাটা অবনীবাবুর কানে গেলে তিনিও হাসলেন, হেসে বললেন, বঁধুর আমার অনেক গুণ, বলতে গেলে একটা ছোট-খাটো মহাভারত হয়ে দাঁড়ায়—আমার আবার সাড়ে চারটেয় এক জায়গায় এনগেজমেণ্ট আছে। তবে শুনতে চাইছেন সংক্ষেপে একটু আধটু বলে যাচ্ছি আমি—

রেঙ্গুনে বোমা পড়লে কলকাতার লোকজন সব কমে গেল, স্কুলের ছেলেও অসম্ভব কমে গেল। অর্দ্ধেক মাষ্টারদের ছুটি নেয়ানো হ'ল। ক্লার্ক দুটি যুদ্ধের কাজে চাকরি নিয়ে সরে পড়ল। আমাকে শিক্ষকতা থেকে কেরাণীর পদে ট্রান্সফারড করা হ'ল—টাইপ করতে জানি, অ্যাকাউণ্ট্যান্সি কিছু জানি সুতরাং—

স্কুলের চাকর চলে গেছে—শুধু দারোয়ান, আমাকে স্কুলে পাহারা দিবার জন্ত স্কুলের একটি ঘরে এসে থাকতে বলা হ'ল। মেস ছেড়ে উঠে এলাম স্কুলে।…গ্রীষ্মকাল দারুণ গরম। একটা টেবলফ্যান ষ্টোর রুমে পড়ে থেকে মরচে ধরছিল। স্কুলের সব জিনিষই যখন আমার চার্জে, তখন ওটা আনিয়ে চালাতে গেলাম আমি।…দেখি বিগড়ে রয়েছে পাখা, সারাতে দিলাম স্কুলের ইলেকট্রিক গুডস সারায় যারা তাদের কাছে, রসিদও আনলাম। দিন পনের পরে—ফ্যান আনতে গিয়ে শুনি ওরা ফ্যান স্কুলে ফেরত দিয়ে গেছে, বেয়ারার কাছে ফেরত দিয়েছে, রসিদ পরে আমার কাছ থেকে নেবে। দরোয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম—সে বলে ফ্যান তার কাছে দেয় নি। দারোয়ানের অনেক বন্ধুবান্ধব এসে মাঝে মাঝে স্কুলে বসত, তাদের কারো কাছে দিতে পারে। যে লোকটা ইলেকট্রিকের দোকান থেকে এসে ফ্যান দিয়ে গেছে, সে-ও আর কাজ করে না ওখানে, কোথায় চলে গেছে।

দেখি পরে যদি কোন সন্ধান হয়, ভেবে কথাটা তখনকার মত চাপাই রাখলাম। এদিকে বোমার প্রথম হিড়িক কেটে গেলে সেক্রেটারির ফেমিলি সব রাজসাহী থেকে ফিরে এলেন। মেয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা,—মাষ্টার নেই। সেক্রেটারি ডেকে পাঠালেন ; অবনীবাবু আপনার সময় হবে ? খুকুকে যদি সন্ধ্যাকালে একটু পড়িয়ে যান। কি করব,—সেক্রেটারির অনুরোধ রাজি হয়ে গেলাম। দক্ষিণার কথা আর উঠল না। ভাবলাম শিক্ষা বিভাগের লোক, দেবেন, বিবেচনা মতই দেবেন। প্রথম প্রথম ঘণ্টাদেড়েক পড়াতাম,—একদিন সেক্রেটারির গিন্নী এসে বললেন, দেখুন মাষ্টার মশায়, বাইরে গিয়ে খুকুর পড়া বড় কামাই হয়ে গেছে, এবার ম্যাট্রিক দেবে ও, একটু বেশি সময় যদি—

পর দিন থেকে আড়াই ঘণ্টা ব্যয় করতে লাগলাম। মাস কাবার হয়ে গেল,—আরও পনের দিন কাটল—দক্ষিণার নাম নেই। ছাত্রীকে একটু মনে করিয়ে দিতে—পরের দিন তার মা পনেরটা টাকা এনে পড়ার টেবিলের উপর রাখলেন। রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল। আরও কিছুক্ষণ ছিলাম বটে, কিন্তু পড়াতে আর আমি পারলাম না। টাকা টেবিলেই পড়ে রইল, পরের দিন থেকে আর আমি পড়াতে যাই নি।

পড়াতে আরম্ভ করার কয়েক দিন পরই টেবিল ফ্যানের কথা বলেছিলাম সেক্রেটারিকে, বললেন, সে হবে 'খন।

মেয়ে পড়ানো ছেড়ে দেওয়ার পরেই ষ্টকের হিসাব চাওয়া হ'ল আমার কাছে। ফ্যানের কথা কাজে কাজেই উঠল। করেস্‌পণ্ডেন্স চলল : জবাবদিহি কর—ফ্যানের জন্ত কেন আমি দায়ী হব না।

এর পর অবনীবাবু—সতীশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, এর পরের কথা উনিই ভাল বলতে পারবেন। টিচার্স রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌স না বললেও কানে এল—ফ্যান নিয়ে অনেক কথা হয়েছে মিটিং-এ, ওরা বুঝেছেন ফ্যান চুরি করে আমি বিক্রী করে

দিয়েছি। আমার মাইনে থেকে ফ্যানের দাম আশি টাকা কেটে নেওয়া হবে। কমিটি অবশ্য দয়া করে বলেছেন টাকা একবারে দিতে হবে না, মাসে মাসে দশ টাকা করে কাটা হবে মাইনে থেকে।

এর পরের কথা অতি সংক্ষিপ্ত। আশি টাকা একবারেই দিয়ে আমি দরখাস্ত করলাম, এমন কমিটির অধীনে আমি কাজ করতে রাজি নই, সেই কারণেই রিজাইন দিচ্ছি।

সতীশবাবু আমতা আমতা করে কমিটির পক্ষাবলম্বন করে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, অবনীবাবু বাধা দিয়ে বললেন—তবে আমিও বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, স্কুলের মস্ত বড় একখানা সিলিং ফ্যান চলেছে এখন কমিটির এক বিশিষ্ট মেম্বারের বাড়িতে। স্কুলের কাজ করবার অজুহাতে বোতল বোতল কালি যায়, রিম ধরে কাগজ যায়, পেনসিল যায় সে বাড়িতে। স্কুলের চাকর গিয়ে বাসন মাজে, ঘর পোছে, বাগান করে। আরও অনেক খবর আছে,—সে আর এখানে বলব না, সে আমার ব্রহ্মাস্ত্র, যথা সময়ে প্রয়োগ করা হবে।

আজ আর নয়, চলি—আসছে শনিবারে দেখা হবে, আমার পক্ষ হয়ে সবাইকে থাকতে বলবেন, অরূপবাবু বেহালাটা আনতে ভুলবেন না যেন—বলে অবনীবাবু হাত ঘড়িটা একবার দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

পরের শনিবার বেলা আড়াইটার সময় টিচার্স কমন রুম একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। অবনীবাবু আপিসের ছুটি বেয়ারা দিয়ে বড় বড় চার চুপড়ি খাবার আনিয়েছেন। পাশের এক চায়ের দোকানে ভাল চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। বিলিতি গৎ বই দেখে বাজাতে হয় বলে ঘরে একটা ইলেকট্রিক আলো লাগানো হয়েছে সেদিন। ছেলেদের ঘর থেকে কয়েকখানা ভাল বেঞ্চিও আনা হয়েছে, হেড মাষ্টার, এসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার ও অন্যান্য প্রাচীন উপরের মাষ্টার বসবেন বলে।

খাওয়া দাওয়া পরে হবে, আগে গান বাজনা।

হেডমাষ্টারের উপস্থিতিতে আজ আর ঘরে হুল্লোড় হ'ল না, অনেকটা শান্তভাবে নিয়ম বেঁধে কাজ। প্রথমে সুখেন্দু নিজের রচিত কয়েকখানা গান গাইল, তারপর রবীন্দ্রনাথের। সবাই তারিফ করতে লাগলেন, বেশ বেশ—মাঝে মাঝে এ সবের ব্যবস্থা করলে ত বেশ হয়।

সতীশবাবু বললেন, সঙ্গে কিছু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা থাকলে সোনায় সোহাগা।

সবাই তাকালেন এবার অরূপের দিকে: এবার তার বেহালা।

ভাঁজ করা লোহার ষ্ট্যাণ্ডটা খুলে তারপর স্বরলিপির বই রেখে বেহালাকাঁধে নিয়ে হয়ে দাঁড়াল অরূপ।

এ কি—দাঁড়িয়ে কেন, বসেই হোক না।—সতীশবাবু বলে উঠলেন। সুশোভন বললে, বিলিতি গৎ দাঁড়িয়ে বাজাবারই নিয়ম, এতে সুবিধে অনেক।

অরূপ স্বরলিপির বইয়ের দিকে তাকিয়ে পা দিয়ে একবার তাল দিয়ে নিলে। পর মুহূর্তে পাতলা কাঠের বাক্স থেকে বেরুতে লাগল অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুর। শ্রোতারা চির চেনা বাংলা দেশ ছেড়ে যেন সুদূর কোন অচেনা রহস্যপুরীতে গিয়ে হাজির হয়েছেন। সেখানকার গন্ধর্ব্ব কিন্নরদের সুর ঠিক বোঝেন না তারা, তবুও মধুর লাগে, অন্তরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নতুন মাধুর্য্যের ঝঙ্কার তোলে।

অরূপ প্রথম বাজনা শেষ করে বললে, যে সুরটা বাজালাম এর নাম 'ব্লু ড্যানিয়ুব' রচয়িতা জোহান ষ্ট্রাউস,—জার্ম্মান।

চমৎকার চমৎকার—আরম্ভ করুন আবার।

অরূপ দ্বিতীয় বাজনা শেষ করে বললে, এটার নাম 'ওভার দি ওয়েভ্‌স'।

বেশ, বেশ,—আর একখানা···

এর পরের গানের সুরটা শুনে সবাই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বাজনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে—সুশোভন জিজ্ঞাসা করলে—এটার নাম কি—ভাই?

এটাকে বলে—Menuett in G.—রচয়িতা বীটোফেন—জার্ম্মান।

জানি, জানি বীটোফেন জার্ম্মান—জানি, বীটোফেনের আর একখানা হোক।

অরূপ সঙ্গে সঙ্গে—Turkish March সুরু করলে। এর পর আর একখানা মাত্র বাজাল অরূপ—নাম ট্রয়ারি।

বাজনার শেষে কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। মিনিটখানেক পরে অবনীবাবু ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—এমন সব সোনার চাঁদ ছেলে—এসে সব পচে মরছে পঞ্চাশ-ষাট টাকায়—বিদেশ হলে—এরা সব ফেলে ছেড়ে হাজার টাকা কামাই করত মাসে।

—একটু থেমে তিনি আবার বললেন—কিন্তু আমার যে বড় চাকরি ফেলে আবার ফিরে আসতে ইচ্ছা হচ্ছে—সুশোভন বাবু!

উত্তরে সুশোভন শুধু মৃদু একটু হাসলে। মতিবাবু সগর্ব্বে মুখ উঁচু করে বললেন, যেখানে যান না, অবনীবাবু যত বড় চাকুরিই করুন, আমাদের এ কমন রুমের কথা ভুলতে পারবেন না কোন দিন।

বেলা পড়ে এসেছিল, খাবারও জুড়িয়ে যাচ্ছে—দেখে এবার খাওয়ার আয়োজন করা হ'ল। দোকান থেকে কেটলী ভরতি চা এল, পেয়ালা এল।

খেতে খেতে অবনীবাবু হেডমাষ্টার ও দুইজন টিচার্স রিপ্রেসেণ্টেটিভের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছাত্র ত শুনছি অনেক বেড়েছে—সামনের বার বোধ হয় আরও বাড়বে, কলকাতার জনসংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। মজুর পায় দু'টাকা রোজ, ছেলেদের মাইনে কিছু বাড়িয়ে টিচার্সদের মাইনে বাড়ান, নইলে আমারই মত সবাই ছিটকে পড়বে।

হেডমাষ্টার রসগোল্লা মুখে পুরতে পুরতে আমতা আমতা করে বললেন, দেখি, দেখা যাক কি হয়···মাষ্টারদের কিছু দিতে চায় না—ব্যা···, এদিক ওদিক চেয়ে···টারা আর শেষ করলেন না তিনি।···ওঁরা বলেন, শিক্ষকদের ত সন্ন্যাসীর জীবন, ত্যাগ স্বীকার করতেই ত—এ লাইনে—এসেছেন তাঁরা।

অবনী হেসে বললে, কি সব ভণ্ডামি দেখুন: কমিটির মেম্বারদের মাঝেও অনেক বড় বড় কলেজের অধ্যাপক আছেন,

ত্যাগ স্বীকার করতে তাঁরাও মাষ্টারদের মত বেতন নিতে রাজি আছেন ত ?

হেডমাষ্টার শুধু মৃদু হাসলেন, আর অনেকে কথাটা শুনে বললেন, ঠিক—ঠিক—নিজের বেলায় আঁটি-সাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি—

খাওয়া দাওয়ার শেষে অবনীবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আর সবাই একে একে চলে যেতে লাগলেন। অরূপ সুশোভনকে বললে, একটু থেকে যাবেন, ...সুখেন্দু একটু থেকে যেও ভাই, কথা আছে।

আর সবাই চলে গেলে তিন বন্ধু পথে বেরুল। একটু খানি চলবার পর অরূপ সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে বললে, সুশোভন-দা, একটা যুক্তি জিজ্ঞাসা করতে চাই—আপনাদের দুজনার কাছে—

ভূমিকা ছেড়ে চটপট বলে ফেল না, ভাই—

ভূমিকার একটু দরকার আছে, মানে মীরার কথা কি না!

ওঃ—মীরার কথা হলে ভূমিকা দরকার হয়, তবে কর ভূমিকা!

অরূপ অসহায়ের মত চেয়ে বললে, বাড়িতে এদিকে বিয়ের চেষ্টা চলেছে, কনে দেখতে বার বার পীড়াপীড়ি করছেন তাঁরা।...কিন্তু আপনারা দু'জনেই ত জানেন আমার সব: মীরাকে ছাড়া আমি আর কাউকে—বিয়ে করতে পারব না, মীরাকে পাই ভাল, নইলে বিয়ে করবই না জীবনে।

সুশোভন ও সুখেন্দু দু'জনেই বুঝলে ব্যাপারটা, বুঝে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসলে।

সুখেন্দু অরূপের কথার জবাব দিয়ে বললে, সাব্যস্ত যখন নিজেই করে রেখেছে—তখন আবার যুক্তি নেওয়ার কি আছে ?

যুক্তি নেওয়া মানে—আমি প্রপোজ করতে চাই—মীরার বাবার কাছে।

মীরার মত নিয়েছ ?

হ্যাঁ, সে-ও ত হাত ধুয়ে বসে আছে, বলছে তার বাবার কাছে কথা তুলতে।

সুশোভন একটু চুপ করে থেকে বললে, বিয়ে করতে হলে এক দিন ত তোমার তাঁর কাছে কথা তুলতেই হবে। সুতরাং দেরি আর কেন ? আর না হবারই বা কি আছে, তোমার বাড়ির অবস্থা ত বেশ ভালই, তা ছাড়া রূপ আছে, গুণ আছে।

অরূপের মুখে লাল আভা ফিরে এল, বললে, তা'হলে কালই গিয়ে কথাটা তুলি, কেমন ?

বেশ, তোল।

অরূপ এর পর বাড়িতে বেহালা রেখে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমবয়স্ক দুই বন্ধুকে নিয়ে লেকে গেল। সেখানে মীরা ও তার প্রেমের জন্ম থেকে পরিবর্দ্ধমান বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে যেতে লাগল—

মিলনটা বেশ হবে, সুশোভন-দা, কি বলেন ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অর্জ্জুন গাছের ছায়ায় আঁধারে বসে অরূপের কাণ্ড দেখে সুখেন্দুর ইচ্ছা হচ্ছিল, সে এবার গান ধরে,—উষার উদয় সনে...

পরের সোমবারে স্কুলে এসে সুখেন্দু আর সুশোভন দেখলে, অরূপের মুখ একেবারে কালি হয়ে গেছে।

কি, ব্যাপার কি, দু-জনাই প্রায় এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

অরূপ দু'জনকে কমন রুমের এক কোণে নিয়ে গিয়ে বললে, ওর বাবা রাজি হলেন না, একটি কথা আমার কানের কাছে এখনও ঝন ঝন করে বাজছে, বলেন, মাষ্টারের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে!

বলতে গিয়ে ছল ছল করে এল অরূপের চোখ। সুখেন্দু কিছু সান্ত্বনার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই স্কুলের সেকেণ্ড বেল পড়ে গেল: হৃদয়বৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়ে এবার সব ক্লাসে যাবার পালা।

পরে অবশ্য আরও কয়েক বার দেখা হ'ল অরূপের সঙ্গে, কিন্তু দুই বন্ধুর কেউই কোন সান্ত্বনা দিতে পারলে না অরূপকে। তাদের কেবল ফিরে ফিরে অবনীবাবুর কথাই মনে পড়তে লাগল: এমন সব সোনার চাঁদ ছেলে!

পরের দিন স্কুলে এল না অরূপ। পূজার বন্ধের আগে আর দিন তিনেক স্কুল হয়েছিল, এর মাঝে আর অরূপের মুখে হাসি দেখা যায় নি।

পূজার বন্ধের পরে স্কুলে এসেই সুখেন্দু আর সুশোভন খোঁজ করেছে অরূপকে। অরূপ স্কুলে আসে নি।...ক্রমে খবর পাওয়া গেল অরূপ 'রেজিগনেশান' দিয়েছে।

দিনের চাকা ঘুরে চলতে লাগল। ক্রমে ইংরেজী বৎসর শেষ হয়ে নতুন বৎসর আরম্ভ হ'ল। স্কুলে ছেলে বাড়ছে খুব, স্কুলের ফি-রেটও বাড়ানো হয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসে শুনা গেল, স্কুলের এখন যা ছাত্রসংখ্যা হয়েছে তাতে গত বৎসরের মত শিক্ষকদের বেতন, ডিয়ারনেস দিয়ে অন্যান্য খরচ করবার পরও বাঁচবে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

কমন রুমে দিন রাত ঐ কথা: এবার বড় রকমের একটা ইনক্রিমেণ্ট না হয়ে আর যায় না!

মতিবাবু বলেন, একটা দরখাস্ত করা যাক সবাইকে কুড়ি টাকা করে ইনক্রিমেণ্ট আরও কুড়ি টাকা ডিয়ারনেস।

সতীশবাবু বলেন, উহুঁ, যা রয় সয়—তাই করা ভাল: পনের টাকা করে লিখুন, তা'লে আমাদের কাইট করার সুবিধা হয়।

বিনয়বাবু বলেন, চাওয়া যাক না বেশি, চাইলেই যে দেবে এমন কি কথা: কথায়ই বলে, চন্দ্র লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত যে শর...

কমন রুমে মাষ্টারে মাষ্টারে দেখা হলেই ঐ এক কথা ইনক্রিমেণ্ট, দরখাস্ত!

এক দিন টিফিন-পিরিয়ডে সবাই যখন এই আলোচনা নিয়ে ভীষণ চেঁচামিচি সুরু করে দিয়েছেন তখন নগেনবাবু তার চিরাভ্যস্ত নিদ্রাসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে চোখ রগড়ে বললেন, আমি একটি কথা বলতে চাই...

নগেনবাবুর অকস্মাৎ এবম্বিধ উক্তিতে সবাই চুপ করে তার মুখের দিকে তাকালেন।

নগেনবাবু মৃদু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, আপনারা বোধ হয় জানেন, বর্ত্তমান সেক্রেটারির সঙ্গে আমার একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে, সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁর সাথে

আমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দেখাশুনা হয়ে যায়।...দিনতিনেক আগে তাঁর সাথে আমার দেখা হলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মাষ্টার মশায়দের এবার কিছু কিছু দিচ্ছেন ত ?—উত্তরে হেসে বললেন—বিশেষ আশা নেই।

কেন ?

ছেলে বাড়ছে—ঘর বাড়াতে হবে—চারটে না হোক—অন্তত দুটো।

শুনবামাত্র মাষ্টারেরা সব এক সঙ্গে হাহা করে উঠলেন : এই বাজারে ঘর ?—ইটের দাম যখন—ষোল থেকে একেবারে আশি—লোহার দাম দশগুণ—সিমেন্ট পাঁচগুণ ?...এই বাজারে হবে ঘর—অথচ মাষ্টারেরা না খেয়ে মারা যাবে !

মতিবাবু তেরিয়া হয়ে বলে উঠলেন—হবে না—যে তেলে জলে মিশ খায় না—এ বোঝে না—সে বুঝবে মাষ্টারের দুঃখ !

তেলে জলে মিশ খায় না—সে আবার কি ?

জানেন না ?—মিস্ত্রী এসেছে ঘর চুণকাম করতে—দেয়ালে নীচের দিকে আছে—সবুজ তেল রঙ লাগানো—ছেলেরা সাদা দেয়ালে যা তা ছবি আঁকে বলে কর্ত্তা বললেন—দাও সব চুণকাম করে। মিস্ত্রী বলে—বাবু :—এ যে তেল রঙ। বাবু বলেন—হোক—টানো চুণের পোঁচ।...এর পর দেখেছেন ত ?—কোথায় গেল যে সবুজ রঙের উপরকার হোয়াইট ওয়াশ—ছেলেরা হাত দিয়ে ঘসে মেজে এ ওর মুখে মাখিয়েছে।...তেলে জলে মিশ খায় না—পাগলে বোঝে—এ বোঝে না।...আরে বাপু রে—ঘর বাড়াবি—এ দিকে চার চারটি ঘর যে তোর ব্যাফল ওয়ালে আটকা পড়ে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে—ব্যাফল ওয়াল ভাঙলেই—যে—খোদার দেওয়া রোশনাই।

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে যায়। মাষ্টারেরা নগেনবাবুর কথা শুনে—মনমরা হয়ে বেড়ান।

দরখাস্ত যায় তবু—সকল মাষ্টারের সই নিয়ে—বিশ টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট আর বিশ টাকা মাগ্‌গি ভাতার।

মার্চ্চের শেষাশেষি কমিটির মিটিং হয়ে গেল। কমিটি মাষ্টারদের কৃপা করেছেন : পাঁচ টাকা ভিয়ারনেস আগেই ছিল—তার পর আর দুটাকা বেড়েছে। ইন্‌ক্রিমেণ্ট এক টাকা থেকে চার টাকা—গুণের তারতম্য অনুসারে।

পরের দিন কমন রুম একেবারে আগুন হয়ে উঠল। যার যা মুখে আসছে গালাগালি দিচ্ছে সেক্রেটারিকে—নগেনবাবুর সামনেই। কেউ চেঁচাচ্ছেন—আমাদের রিপ্রেসেণ্টেটিভদের বেরিয়ে আসতে বল কমিটি থেকে—চাই না আমরা আমাদের প্রতিনিধি পাঠাতে—কি করে ওরা ?

বিনয়বাবু চেঁচাচ্ছেন—স্কুলের দরোয়ান—রাম সিং—পেল চার টাকা—হীরেন বাবু আর আমি পেলাম এক এক টাকা—ভাল লাগে না, ছাই—ছেড়ে দেব।

হীরেনবাবুর দুঃখ একটুও কম লাগবার কথা নয়—তবুও ওঁর কেমন অভ্যাস দুঃখ পেলেই উনি হাসেন বেশি। হীরেনবাবু বিনয়বাবুর কথা শুনে মৃদু হেসে বলেন—আসুন বিনয়-দা আমরা দু'জন স্কুলের দারোয়ানের পদের জন্য দরখাস্ত করি ওতে প্রসপেক্ট আছে বেশি।

হাসি পাচ্ছে আপনার—পোড়া কপাল !

মাষ্টারি করতে যখন এসেছি তখন পোড়া কপাল ছাড়া আর কি !

দিন যায়—মহাকালের স্পর্শে মাষ্টারদের হৃদয়ে বেদনারও উপশম হয়। কমন রুমে মাষ্টারেরা আবার আগের মত হাসি তামাসা আরম্ভ করেন।

সুখেন্দু আর সুশোভনের মনে শুধু অরূপের অভাবের বেদনা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

একদিন—শুক্রবার—লম্বা টিফিনের সময় সুশোভন আর সুখেন্দু কমন রুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে অরূপের কথাই বলছিল—এমন সময় পিছন থেকে কে ডেকে উঠল—সুশোভন-দা—

চমকে উঠে পিছন ফিরে সুশোভন বলে উঠল—আরে—তুমি !...অনেক দিন বাঁচবে তুমি অরূপ : সুখেন্দুর সঙ্গে তোমার কথাই হচ্ছিল।

সুখেন্দু অরূপের হাত ধরে—তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—ভারি যে হাসি খুশি—ব্যাপার কি—চেহারাও ত অনেক ইম্‌প্রুভ করেছে।

হাসতে হাসতেই অরূপ বললে—কারণ ঘটেছে

মানে ?

মানে—বিয়ে করেছি।

কোথায়, কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল—জানলাম না ত আমরা !

বিয়ে বেনারসে হ'ল—মীরার সঙ্গেই।

মাষ্টারের সঙ্গেই বিয়ে দিলেন শেষে—মীরার বাবা ?

সাবেক দিনের প্রাণখোলা হাসি হেসে—অরূপ বললে—মাষ্টার আর আমি নই সুখেন্দু, এখন আমি বিজনেস্‌ম্যান।

মানে—কি করছ তুমি এখন ?

এখন আমি এক 'বাটা'র দোকানের ম্যানেজার—তা ছাড়া ডাক্তারিও করছি।

সুশোভন অবাক্ হয়ে বললে—এর মাঝে আবার ডাক্তারি শিখলে কবে ?

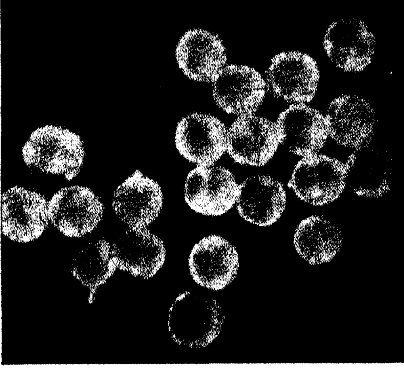
হাঁ—সে বেশি কিছু নয়—কিছু টাকা দিলে ঐ 'বাটা' কোম্পানীই শিখিয়ে দেয়—পায়ে কড়া-টড়া হলে যাবেন আমার ওখানে।...হাঁ—মীরারা দিন পনেরর মাঝেই আসছে এখানে। মিষ্টিমুখ করতে ডাকব—যাবেন কিন্তু অতি অবশ্য ...সুখেন্দু যেও কিন্তু ভাই...আমি একবার হেড মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি—বলে অরূপ কমন রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

সুশোভন আর সুখেন্দু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

কাঁকড়ার অভিব্যক্তির ইতিহাস

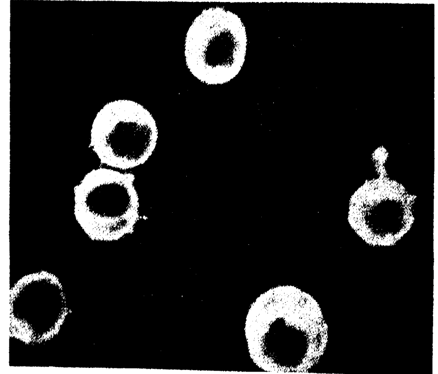
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অনেকেই জানেন—কাঁকড়া ও চিংড়ি জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে একটা জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ এই দুইটি প্রাণীর আকৃতিগত এমন কোন সাদৃশ্য নাই যাহাতে ইহাদিগকে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে উভয়ের এই জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক নির্দ্ধারণের উপায় কি?



কাঁকড়ার ডিম

প্রাণিজগতে যৌবন-কাল বা প্রজননক্ষম বয়সের দৈহিক আকৃতিটাকেই আমরা বিভিন্ন জাতীয় জীবের দৈহিক আকৃতির মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় জীবের বিভিন্ন বয়সের দৈহিক আকৃতির মধ্যে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য থাকিলেও পার্থক্যটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ময়ূরের পুচ্ছ বা হরিণের শৃঙ্গ একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মানুষের জীবনেও শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যে আকৃতির পরিবর্ত্তন সুপরিস্ফুট। কাজেই পরিণত বয়সের দৈহিক আকৃতিটাকেই বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের সহজবোধ্য পন্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহাতেও অসুবিধা আছে অনেক। কারণ জীব-জগতের বৈচিত্র্য অগণিত। সর্ব্বক্ষেত্রেই যে পরিণত বয়সের আকৃতি একই রকম হইবে ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ র‍্যাক্সলোটল নামক এক প্রকার অদ্ভুত জীবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। র‍্যাক্সলোটল শৈশব হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত জলেই বাস করে। দেখিতে অনেকটা লেঠা-মাছের মত; কিন্তু শরীরটা চ্যাপ্টা। ইহা তাহাদের শৈশব অবস্থার রূপ হইলেও পরিণত বয়সে একমাত্র আয়তন বৃদ্ধি ছাড়া আকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কিন্তু তাহাদের পরিণত বয়সের বাস্তব রূপ নহে। যাহা হউক, এই অবস্থায়ই তাহারা ডিম পাড়ে। কিন্তু কোন গতিকে জলের বাহিরে আসিয়া পড়িলে খাদ্যের পরিবর্ত্তনে অথবা থাইরক্সিন নামক গ্রন্থি-নির্য্যাস প্রয়োগে অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা টিকটিকি জাতীয় প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ স্থলচর জীবে পরিণত হয়। তাছাড়া বয়োবৃদ্ধির সহিত উচ্চতর প্রাণীদের দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে নিরবচ্ছিন্নভাবে, অতি ধীরে ধীরে। অর্থাৎ এক রূপ হইতে অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইবার মধ্যে কোন বিরতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে বারকয়েক এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায় যাহার ফলে একই প্রাণীকে বিভিন্ন বয়সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী ছাড়া আর কিছু মনে করিবার উপায় থাকে না। প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি প্রাণীরা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রজাপতির বাচ্চা এবং কিশোর বয়স্ক পুত্তলীর সহিত প্রজাপতির আকৃতি বা প্রকৃতির কোনই সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। ইহারা খোলস পরিত্যাগ করিয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হয় বটে; কিন্তু শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করে। চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীদেরও অনেকটা এই ধরণেই অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ভ্রূণের বিভিন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্তি, অভিব্যক্তির ধারায় ঐ জাতীয় জীবের দীর্ঘস্থায়ী বিভিন্ন অবস্থার দৈহিক গঠনের একটা সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি বলিয়াই মনে হয়। কাজেই কাঁকড়ার জন্ম-রহস্য অনুসন্ধান করিলে চিংড়ির সহিত তাহাদের সম্বন্ধের বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে জানা যাইতে পারে।



কাঁকড়ার ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইতেছে

চিংড়ির দৈহিক গঠন জল এবং ডাঙ্গায় বিচরণকারী উভচর প্রাণীরই উপযোগী। অন্যান্য উভচর প্রাণীদের তুলনায় দৈহিক গঠনে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইলেও কিছুমাত্র অস্বাভাবিকত্ব নাই। এই হিসাবে কাঁকড়ার শারীরিক গঠন অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। চিংড়ি ডাঙ্গায় বিচরণ করিতে পারিলেও তাহাতে তেমন দক্ষতা পরিলক্ষিত হয় না। কাঁকড়া কিন্তু জলে স্থলে সর্ব্বত্রই সমান দ্রুতগতিতে বিচরণ করিতে পারে। কাঁকড়া জলে স্থলে সর্ব্বত্রই শিকার ধরিতে পারে; কিন্তু চিংড়ি ডাঙ্গায় উঠিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কাঁকড়ার

শরীর বলিতে, ভেলার মত একটা গোলাকার মস্তক ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। চোখ দুটিও অদ্ভুত, লম্বা বোঁটার মাথায় স্থাপিত দুটি পেরিস্কোপের মত। ইচ্ছামত আবার চোখ দুটিকে প্রসারিত করিতে বা খাঁজে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। চিংড়ি, ডাঙ্গায় সম্মুখের দিকে এবং জলে, সামনে ও পিছনে উভয় দিকেই চলিতে পারে। কিন্তু কাঁকড়ার চলনভঙ্গী চিংড়ির মত তো নয়ই বরং সাধারণ প্রাণীদের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা চলে পাশের দিকে। ডাঙ্গায় বিচরণকালে কোন রকম বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই চক্ষের নিমেষেই ইহারা ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। পাশের দিকে চলিয়াও ইহারা কিরূপে এত দ্রুত ছুটিতে পারে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। চিংড়ি উভচর হইলেও একটানা অনেকক্ষণ ডাঙ্গায় থাকিতে পারে না; কাঁকড়া কিন্তু জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই যতক্ষণ খুসী অবলীলাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য যাহাই থাকুক



কাঁকড়ার বাচ্চা সবেমাত্র ডিম হইতে নির্গত হইয়াছে

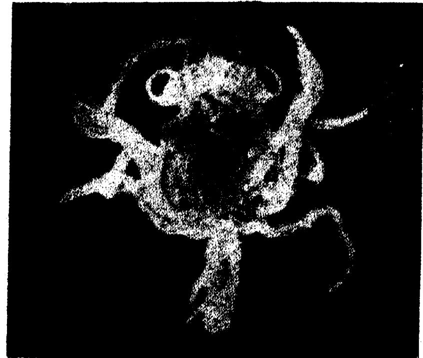
না কেন, সম্বন্ধ নির্ণয়ে আকৃতিগত সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তাই সর্ব্বাধিক। আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু চিংড়ি ও কাঁকড়ার মধ্যে আকৃতিগত সামঞ্জস্য অপেক্ষা অসামঞ্জস্যই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় রকমারি কাঁকড়ার সকলেরই দৈহিক গঠন এক রকমের নহে। রাজ-কাঁকড়া, গেছো-কাঁকড়া ও সন্ন্যাসী-কাঁকড়ার দীর্ঘ প্রসারিত লেজ রহিয়াছে এবং এই লেজগুলিকে তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা সাধারণ পরিচিত কাঁকড়ার বিষয়ই আলোচনা করিতেছি, ইহা হইতেই দুই-একটি ব্যতিক্রমের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

শক্ত খোলায় আবৃত, মস্তকসর্ব্বস্ব কাঁকড়াগুলিও বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তবে বাচ্চা প্রতিপালনের ব্যাপারে ইহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি কাঁকড়া জলের মধ্যে ইতস্তত: ডিম ছাড়িয়া দেয় আবার কতকগুলি ডিম বুকে করিয়াই ঘোরাফেরা করিয়া থাকে। বাচ্চা ফুটিবার পরও সেগুলি মায়ের বুকের মধ্যেই কিছুদিন অপেক্ষা করে। তারপর দুই-একটি করিয়া ধীরে ধীরে মায়ের বুক হইতে বাহিরে আসিয়া স্বাধীন জীবনযাত্রা সুরু করিয়া দেয়। মোটের উপর, মায়ের বুক হইতে কাঁকড়ার আকৃতি ধারণ করিয়া বাহির হইলেও কাঁকড়ারা সকলেই অণ্ডজ প্রাণী; জলে ডিম পড়িবার কয়েকদিন পরেই লম্বাটে ধরণের বাচ্চা বাহির হয়।



ডিম হইতে নির্গত হইবার কয়েকদিন পরের অবস্থা

ডিম ফুটিবার ব্যাপারে আমরা সাধারণত: দেখিতে পাই—ডিমের খোলাটার সঙ্গে বাচ্চার কোন সম্পর্ক থাকে না। বাচ্চা বাহির হইবার পর খোলাটা পড়িয়া থাকে। খোলাটা একটা আবরণ মাত্র। কিন্তু ইহাদের ডিমের সেরূপ কোন পৃথক আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। লম্বা বাচ্চাটাই যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া ডিম্বাকারে অবস্থান করে। ফুটিবার সময় হইলেই ডিমের ভিতরে একটা দ্রুত স্পন্দন লক্ষিত হয়। তারপর গোলাকার মস্তকটার সহিত সংলগ্ন ধনুকের মত লেজটা আলগা হইয়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাচ্চা তাহার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া সক্রিয় হইয়া উঠে। বাচ্চার এই অবস্থায় তাহাকে 'জোইয়া' বলা হয়। জোইয়ার আকৃতি কতকটা চিংড়ির মত; কিন্তু চোখ দুইটা প্রকাণ্ড আর লেজটা ধনুকের মত বক্র। মুখের কাছে সামান্য কয়েকটা অপরিণত উপাঙ্গ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। লেজ এবং চোয়ালের পাশের উপাঙ্গগুলির সাহায্যেই জোইয়া দিব্যি সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। কিছুকাল পরেই তাহার মস্তকের দিকটা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে।



কাঁকড়ার বাচ্চার শেষ অবস্থা। মেগালোপা

[চোখ দুইটা কিন্তু পূর্ব্বের মতই পিটপিট করিতে থাকে। মুখের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত উপাঙ্গগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই



পরিণতবয়স্ক কাঁকড়া

মাথার উপরের দিকে লম্বা কাঁটার মত একযোড়া পদার্থ আত্মপ্রকাশ করে। এই উপাঙ্গগুলিই ক্রমশঃ সুগঠিত হস্তপদে রূপান্তরিত হয়। আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর কাঁকড়ার বাচ্চা দাঁড়া, পা, মাথা ও সুগঠিত লেজ সমেত পরিষ্কার চিংড়ির মত আকৃতি ধারণ করে। কাঁকড়ার বাচ্চার এই অবস্থায় তাহাকে 'মেগালোপা' বলা হয়। কাঁকড়ার মেগালোপা দেখিয়া কিছুতেই তাহাকে চিংড়ি ছাড়া আর কিছুই মনে হইবে না। কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিবার পর মেগালোপা তাহার লেজটাকে গুটাইয়া আমাদের পরিচিত কাঁকড়ার আকৃতি ধারণ করে। ইহাদের বুকের দিকে ঠিক মধ্যস্থলে একটা খাঁজকাটা স্থান রহিয়াছে। লেজটা সেই খাঁজের মধ্যে বেমালুম বসিয়া যায়। কাজেই এই ভাবে লেজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়। একমাত্র গোলাকার মস্তকটি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য অনেককাল অব্যবহারের ফলে লেজের অগ্রভাগের পাতলা পাখনাগুলিও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরিণতবয়স্ক একটা কাঁকড়ার বুকের খাঁজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত লম্বা ও পাতলা ফলকখানি উত্তোলন করিলেই তাহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে। মাথা ও লেজের আয়তনের



পরিণতবয়স্ক ক্রফিস

কিছুটা অসামঞ্জস্য থাকিলেও ইহারা যে ছদ্মবেশী চিংড়ি একথা অনুধাবন করিতে কষ্ট হইবে না।

জীব-জগতের বিবর্ত্তনের পিছনে অনেক কিছুর প্রভাব রহিয়াছে। মুখ্যতঃ ইহাদের মধ্যে বংশানুক্রম এবং পারিপার্শ্বিকের কথাই আলোচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোমল মাংসপিণ্ডের মত জীবেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া একসময়ে তাহাদের শরীরকে শক্ত খোলায় আবৃত করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বংশবিস্তার করিতে করিতে তাহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। নূতন পরিবেশের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল; কিন্তু কেহ কেহ আকৃতি বা প্রকৃতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বাঁচিয়া রহিল। এইরূপে একই জীব হইতে বংশবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন রকমারি জীবের আবির্ভাব কিছুমাত্র অদ্ভুত ঘটনা নহে। এককালে চিংড়ি জাতীয় প্রাণীরাও এই ভাবেই প্রথম পৃথিবীতে



মাকড়সার মত আকৃতিবিশিষ্ট ক্রফিসের বাচ্চা

আবির্ভূত হইয়াছিল। চিংড়িদের প্রথমাবস্থায় জল ছাড়িয়া ডাঙার উঠিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়েই হউক, কি কোন কারণে খাদ্যাভাবের দরুণই হউক, একসময়ে হয়ত কোন চিংড়ি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ফলে প্রাণ বাঁচাইবার আকুল আগ্রহে কেহ কেহ ডাঙায় বিচরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও হয়ত দুই-একটা মাত্র শ্বাসযন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। অভিব্যক্তির ভাষায় যে ব্যাপারটিকে মিউটেশ্যন বলা হয়—হয়ত সেরূপ কোন ব্যাপারেই এইরূপ একটা নূতন বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চিংড়ির বংশধরেরাই কালক্রমে আবার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে যাহারা আবার ভিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারা ক্রমশঃই স্থলে বিচরণ করিবার সুবিধাজনক কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। লেজ থাকিলে

…লে বিচরণ করা সুবিধাজনক নহে, কাজেই চিংড়িরই এক গোষ্ঠীর কেহ লেজ গুটাইয়া কাঁকড়ার আকৃতি পরিগ্রহ করিল। এই নূতন অর্জিত বৈশিষ্ট্য, বহুকাল ব্যবহারের ফলেই হউক, কি মিউটেশনের ফলেই হউক আধুনিক কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীর দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু ক্রফিস নামক চিংড়ি জাতীয় এক প্রকার প্রাণীর শৈশবাবস্থার রূপে একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। বাচ্চা অবস্থায় ইহাদের আকৃতি থাকে কতকটা মাকড়সার মত। সম্পূর্ণ শরীরটা চেপ্টা এবং স্বচ্ছ দেখায়। কয়েক বার খোলস বদলাইবার পর ইহারা স্বাভাবিক ক্রফিসের আকৃতি ধারণ করে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সাধারণ চিংড়ি ও ক্রফিস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

"জয় হিন্দ্"

এ. এন. এম বজলুর রশীদ

গভীর তমিস্রা ভেদি' ঋষিকণ্ঠ উচ্চারিল বাণী,—
আঁধারের পরপারে সুমহান পুরুষেরে জানি,
আমি যে জেনেছি তাঁরে দিব্য কান্তি জ্যোতির্ময় তিনি,
পরম একাকী তাঁরে আজি যেন চিনি, তাঁরে চিনি।
সে মন্ত্র ধ্বনিল গঙ্গা-যমুনার তীর-তপোবনে,
হিমাদ্রির শৈলশিরে, সমুদ্রের তন্দ্রাজাগরণে
তপ্তাম্র বালুবুকে—শতাব্দীর নিদ্রা ভঙ্গ করি'
তিমির বিদারি' শত মানবের প্রাণপাত্র ভরি'
বর'ষিল অমৃতের আনন্দের নব মধুরিমা;
অমৃতস্য পুত্রাঃ তাই অন্তহীন সত্যের মহিমা
জ'াগিল অখণ্ডরূপে। ভারতের সেই একদিন—
পরম একের পায়ে সমর্পিয়া ছিল সে আসীন।
তারপর মরুপ্রান্ত হ'তে এলো আর এক সুর
'লা-শরিকালাহু' সত্যের দোসর নাহি · ওরে তন্দ্রাতুর
চেয়ে দেখ্ ক্ষমা আর করুণার প্রেমপাত্র তাঁর
ফুলে ফলে তরুদলে প্রসারিত, শ্যামশষ্পভার
বহন করিছে সেই অসীমের মোহন পরশ—
সৃষ্টির লীলায় তাঁর পরিব্যাপ্ত প্রাণের হরষ।
সে সুর বীণার তারে এক হ'য়ে মিলে গেল আসি—
পূর্ব আর পশ্চিমের শঙ্কাহীন ভালবাসাবাসি।
জানিত ভারত কভু সত্যমূলে নাহিক বিরোধ,
প্রকাশ বহুধা বটে মর্মে তার ভাব এক বোধ।
সার্থক জনম তার—সীমাহীন দেশকাল মাঝে
যে দেখে অখণ্ডরূপে সত্য তাঁর সর্ব চিন্তা কাজে।
আজি তার জয় হোক্, সেই মুক্ত পূর্ণ ভারতের
মানুষের ভালবাসা কাম্য হোক্, প্রীতি মরমের
বেঁধে দিক্ শত প্রাণ; কোটি কণ্ঠে মিলিত ভৈরবী
বেজে ওঠে 'জয় হিন্দ্'—নবজাগরণ প্রাতে রবি,
বিদ্বেষতমসাজাল দীর্ণ করি, দূর করি দিক্—
বিস্মিত পৃথিবী রবে তার দিকে চাহি অনিমিখ্।



দুর্গত বাংলা
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

রাষ্ট্রের সেবায় মার্কিন নারী

ভোটাধিকার আন্দোলনের এক অধ্যায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালে—ভোটাধিকার লাভের পঁচিশ বৎসর পরে—মার্কিন নারীগণ গবর্ণমেন্টের উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। বার্নার্ড কলেজের ডীন ভার্জিনিয়া সি. গিল্ডারস্লিভ সান ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিমণ্ডলীভুক্ত হন। ফ্রান্সিস পার্কিন্‌স গত ২৩শে মে পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার শ্রম-স‌চিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এখানকার অন্যতম আইন-সভা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভেও নয় জন মহিলা সদস্য আছেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আজ সহস্র সহস্র নারী মিউনিসিপালিটি, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গত সভাপতি নির্ব্বাচনকালে ভোটদাতাদের মধ্যে অর্দ্ধেকই ছিলেন মার্কিন মহিলা।

রাষ্ট্র-সেবায় এই অধিকার মার্কিন দেশের মহিলাদের এক দিনে লব্ধ হয় নাই। ইহা বহু শতাব্দীর অবিরাম আন্দোলনেরই ফল। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মেরিল্যাণ্ডে মারগারেট ব্রণ্ট রাষ্ট্রের সেবায় নারীর অধিকার দাবি করেন। কিন্তু তখন তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। পুরনো নথিপত্র হইতে জানা যায়, ভার্জিনিয়া কলোনীতে ভূমির অধিকারিণীরা ভোটাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই কিন্তু নারীর ভোটদানের অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কথা উঠে। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট জন এডাম্‌স যখন কংগ্রেসের বৈঠকে যোগ দেন সেই সময় তাঁহার পত্নী আবিগাইল এডাম্‌স তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, নূতন শাসন-তন্ত্রে যেন নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হয়, নহিলে তাঁহারা ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন না, এমন কি তাঁহারা বিদ্রোহ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। মানব-মিত্র টমাস পেনও নারীর অধিকার-সাম্যের সমর্থনে লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসে যে শাসন-তন্ত্র রচিত হয় তাহাতে এ সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। শাসন-তন্ত্র রচয়িতারা বিভিন্ন ষ্টেটের উপরেই এরূপ বিতর্কমূলক বিষয়ের মীমাংসার ভার দেওয়া সমীচীন মনে করিলেন। নিউ জার্সিতে নারী ভোটাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের এই অধিকার আবার বিলুপ্ত হয়।

সেকালে মার্কিন ভূম্যধিকারিণীগণ এবং মনস্বিনীগণের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় অধিকারমূলক প্রচেষ্টা আরব্ধ হইল। তখন লোকসংখ্যা বিরল ছিল, যাতায়াতেরও বিশেষ অসুবিধা ছিল; কাজেই কোন বিষয়ে নারীদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা সম্ভব ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে যখন স্থানান্তরে যাতায়াতের সুবিধা হইল এবং যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়া কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল তখন হইতে নারীদের মধ্যেও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইল। স্বগৃহ ও পরিবার-পরিজন হইতে দূরে কারখানার কাজে নারীগণ আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের হিতকল্পে বিবিধ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। নারীগণ যে ভোটাধিকার লাভে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করিতে উদ্বুদ্ধ হন তাহার মূলে রহিয়াছে এবম্বিধ জনহিতৈষণার প্রেরণা।

প্রথমে এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসেন আর্নেষ্ট রোজ নাম্নী জনৈক ইহুদীকন্যা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্য্যটন করিয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এলিজাবেথ ষ্টাণ্টন, পলিনা ডেভিস ও লুক্রেশিয়া মট এই ত্রয়ীও ভোটাধিকার আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইহাকে ব্যাপক করিয়া তোলেন। মারগারেট ফুলার নাম্নী জনৈক লেখিকা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে *The Great Law Suit, Man vs. Woman* এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে *Woman in the Nineteenth Century* লিখিয়া নারীদের মনে এই আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুপ্রাণনা জাগান।

এই সময় সর্ব্বত্র ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ, মানবের সাধারণ অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা দেশে আন্দোলন উপস্থিত হয়। নারীর অধিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলেও এই আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যেই তাহার সফলতাও অনেকটা নির্ভর করিয়াছিল বুঝা যায়। কেননা ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ বিষয়ে আন্দোলন করিয়া যাঁহারা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই পরে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধেও আন্দোলন সুরু করেন। তবে একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে ক্রীতদাস-প্রথা বিরোধী সম্মেলন হয় তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে আগত আট জন নারী-প্রতিনিধিকে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

নারী-আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী লুক্রেশিয়া মট ছিলেন কোয়েকার-পন্থী। কোয়েকারগণ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন। মটের মতবাদে এলিজাবেথ ষ্টাণ্টন বিশেষ অনুপ্রাণিত হন এবং কোয়েকারদের একটি বার্ষিক সম্মেলনে তিনি কয়েকজন মহিলার সহযোগে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সাধারণ সভা আহ্বানের প্রস্তাব করেন। তাঁহারা আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদর্শে "Declaration of Sentiments" নামে একটি ঘোষণা-পত্র রচনা করেন। রাষ্ট্র-সেবায় ও পৌর-কার্য্যে মার্কিন নারী বর্ত্তমানে যে সব অধিকার ভোগ করিতেছেন তাহার প্রায় প্রত্যেকটিরই উল্লেখ ইহার মধ্যে ছিল।

এই সভা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফল্‌সে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঘোষণা-পত্র এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ বিবিধ প্রস্তাবের আকারে গৃহীত হয়।

সভার অনুষ্ঠাত্রীদের মধ্যে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা হইয়াছিল যে, তাঁহারা রচেষ্টার শহরে গিয়া সভার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করাইলেন। তখন নানা দিক হইতেই তাঁহাদের কার্য্যের নিন্দা হইতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট টমাস জেফার্সন যেমন এক সময় বলিয়াছিলেন—নারীরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইলে ভোট গ্রহণ কালে পুরুষের সঙ্গে ভিড় জমাইবে এবং ইহার ফলে নানারূপ দুর্নীতির উদ্ভব হইবে, এ বারে তেমনি লোকে ধুয়া তুলিল—"নারীদের স্থান গৃহাভ্যন্তরে"। তাহারা এক বার ভাবিয়াও দেখে নাই যে, হাজারে হাজারে নারী তখন জীবিকার অন্বেষণে কলকারখানার সামান্ত আয়ে অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টনীর মধ্যে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু উক্ত সভার কার্য্য অন্ততঃ খানিকটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক ষ্টেট আইন সংশোধন করিয়া স্বামীর সঙ্গে পত্নীকে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইহার পরে ভোটাধিকার আন্দোলন ব্যাপক ভাবে সুরু হইল। প্রথমে কংগ্রেসে আইন করাইয়া লইবার চেষ্টা হয়, পরে বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিষয়ে আন্দোলন চলে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথ ষ্টান্টন সুসান বি. এন্টনি নাম্নী এক মহিলাকে উৎসাহী সহযোগী ও কর্ম্মীরূপে পাইলেন। তাঁহারা একযোগে অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের নিজেদের সভাকে লুসি ষ্টোন ও জুলিয়া ওয়ার্ড হো'র সভার সঙ্গে মিলাইয়া 'ন্তাশনাল আমেরিকান উইমেন সাফ্রেজ এসোসিয়েশ্যন' প্রতিষ্ঠা করিলেন। এলিজাবেথ ষ্টান্টন হইলেন ইহার সভানেত্রী। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা 'সাফ্রোজিস্ট' বা নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনকারিণী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে তাঁহারা তাঁহাদের দাবি পেশ করিয়াছেন। বিগত ১৯১৯ সালে তাঁহাদের এই ভোটাধিকার আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এই সময়ের নারী-নেত্রীবর্গের মধ্যে আমেরিকার প্রথম নারী-চিকিৎসক এলিজাবেথ ব্লাকওয়েল, এন্টনিয়েট এল. ব্রাউন, হেনরিয়েট বীচার ষ্টো, ক্লারা বার্টন, ফ্রান্সেস ই. উইলিয়ার্ড, জেন এডাম্স এবং কোর চ্যাপমান ক্যাটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রত্যেকে কোন-না-কোন জনহিতকর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হেনরিয়েট বীচার ষ্টো ক্রীতদাস-প্রথাবিরোধী উপন্তাস 'আঙ্কল টমস্ কেবিনে'র রচয়িত্রী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্ত সমানাধিকার পার্টি (Equal Rights Party) কর্ত্তৃক প্রার্থী মনোনীত হইয়াছিলেন ভিক্টোরিয়া সি উডহাল নাম্নী জনৈক মহিলা। এই মহিলা কংগ্রেসের নিম্নতন পরিষদে নারী-জাতির ভোটাধিকার সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ফলে কিন্তু তাঁহার নিজেরই ভোটাধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে ভোটাধিকার আন্দোলনের বিশেষ সাফল্য লাভের আশা নাই দেখিয়া নেত্রীবর্গ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ষ্টেটে আন্দোলন চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা সব সময়েই রাজনীতিক দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কাজ করিতেন। তাঁহারা আইন-সভার সদস্তগণের মধ্যে পুস্তকাদি প্রচার করিয়া এবং জনসভায় বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহাদের ভোটাধিকারের দাবি সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল আন্দোলনের পর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উইওমিং প্রদেশে এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উটা প্রদেশে নারীগণ ভোটাধিকার লাভ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে উইওমিং এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উটা—ষ্টেটের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের শাসন-তন্ত্রে নারীর ভোটাধিকারসূচক ধারা সন্নিবেশিত হয়। নারীগণ কোলোরাডো প্রদেশে ১৮৯৩, ইডাহোতে ১৮৯৬, ক্যালিফর্নিয়ায় ১৯১১, কানসাস, ওরেগণ ও আরিজোনায় ১৯১২, আলাস্কায় ১৯১৩ এবং নাভাডা ও মন্টানায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভোটাধিকার লাভ করেন।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেটে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে ইহা মোটেই অনুকূল ছিল না। এখানকার আইন-সভায় নারীদের পক্ষ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই আবেদন করা হইতেছিল। ১৯১৭ সালে এই ষ্টেটের নারীগণ বিশেষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হন। এই বৎসর একুশ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক দশ লক্ষ পনর হাজার নারী স্বাক্ষর করিয়া ষ্টেট-সরকারের নিকট ভোটাধিকার দাবি করিয়া আবেদন করিলেন। এবারে কিন্তু ষ্টেট-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দাবির নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। আইন-সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে নারীর ভোটাধিকার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট নারীদের দাবি মানিয়া লওয়ায় অন্তান্ত ষ্টেটও শীঘ্রই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ১৯১৯ সালের মধ্যে ত্রিশটি ষ্টেটের নারীই প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার লাভ করিলেন। ঐ বৎসরেই যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব বেনব্রিজ কলবি নারীর ভোটাধিকারের দাবি গ্রহণ করিয়া এই মর্ম্মে যুক্তরাষ্ট্র গঠন-তন্ত্রের উনবিংশতিতম সংশোধনী করিবার প্রস্তাব ঘোষণা করিলেন যে, নারীপুরুষ নির্ব্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিভিন্ন ষ্টেটে সকলেরই ভোটাধিকার থাকিবে এবং নারীর ভোটাধিকার কখনও অস্বীকৃত বা সঙ্কুচিত করা হইবে না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস এই সংশোধনী গ্রহণ করিলেন।

ভোটাধিকার লাভের পর নারীগণ যাহাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন করিতে পারেন তজ্জন্ত আন্দোলনের নেত্রীবর্গ অতঃপর সচেষ্ট হইলেন। রাষ্ট্রের প্রধান দলগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে এক একটি নারীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভোটাধিকার সম্পর্কে নারী-জাতিকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্তে দলনিরপেক্ষভাবে "ন্তাশনাল লীগ অফ উইমেন ভোটারস" নামে একটি নারী-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ষাট হাজার সদস্ত। পঁয়ত্রিশটি ষ্টেটে ইহার ছয় শত শাখা-সমিতি আছে। বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি দ্বারা সাধারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাসমূহের সমাধানকল্পে সর্ব্ববিধ সাহায্য দানে এই প্রতিষ্ঠান রত রহিয়াছেন।

শিক্ষার সংস্কার

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে-সময় পুরোনো সমাজ বদলে নতুন সমাজ গঠিত হতে থাকে সে সময় খোলস বদলানোর কাজটা খুব সহজে হয় না, তার জন্ত সময় চাই, তার কিছু বেদনাও আছে। নবজন্মটা সহজে হয় না, তার জন্ত কিছু কষ্ট সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। তা ছাড়া সমাজের নবজন্মের ঠিক বাঁধা রাস্তা নির্দেশ করে দেওয়া সহজ নয়। ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভবিষ্যৎ নির্দেশ সহজ হয় বটে, কিন্তু সামাজিক পটভূমিকায় অতীত ইতিহাসের নির্ভুল ব্যাখ্যা এবং বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করা অত্যন্তই কঠিন। তার উপর এসব ঘটনা প্রত্যেকের পক্ষেই এত গুরুতর, বিশেষতঃ যারা সমাজ-সচেতন তাদের পক্ষে সমাজের ভবিষ্যৎ এতই গুরুত্বপূর্ণ, যে তার আলোচনায় ব্যক্তিত্বের প্রভাব এড়ানো দুষ্কর। তার উপর খোলস বদলাবার সময় সমাজের গভীরতম তলদেশ পর্য্যন্ত ঘুলিয়ে ওঠে, তাতে শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজের বিভিন্ন দলও আবর্ত্তে ভেসে ওঠে, তাদের মধ্য দিয়েই বিভিন্নমুখী চেতনা ধীরে ধীরে জাগরিত হতে থাকে। সুতরাং এ সময় ব্যক্তির সংঘর্ষ বা বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ নানা কারণে ঘটতে পারে, কিন্তু এ কথাও সত্য যে এগুলির তাৎকালিক কারণের একটি দীর্ঘকালব্যাপী সার্থকতা থাকে, কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

সেইজন্ত আজকাল প্রত্যেক দিকেই যে ভাঙন দেখা যাচ্ছে এবং যার সংস্কার আশু প্রয়োজন, এই কথাটা প্রবল ভাবে অনুভূত হচ্ছে তার পিছনে আছে এই অদৃশ্য সংগ্রাম। সাহিত্যক্ষেত্রে মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গীর বদল হওয়া দরকার অনুভব করে যে সমস্ত তরুণ সাহিত্যিক নতুন ভঙ্গীতে নতুন কথা বলতে চাচ্ছেন তার মধ্যে অনেক সময়েই হয়ত নতুন ভঙ্গী শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না, কোথাও বা শুধু আঙ্গিক নিয়েই বাড়াবাড়ি হয়, তবু এ সমস্ত আঁকুপাঁকুর মধ্য দিয়ে তাঁরা যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হ'ল এই যে, আগেকার মত গজমোতিমিনারের কাব্য আর চলবে না, তার কাব্যত্বকে সত্য করতে হলে আজকালকার মানুষের সুখ-দুঃখের গভীর এবং বিপুল স্পন্দনগুলির সঙ্গে কাব্যকে সংযুক্ত করতে হবে, তা না হলে কাব্যের মূল উৎস শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এই মত বরোধের মধ্যে আপাততঃ যে-সব তর্কবিতর্ক শোনা যায়, তার পিছনে আসল যে কথাটি লুকিয়ে আছে সেটা হ'ল এই যে সমাজ খোলস বদলাচ্ছে, সুতরাং যে সমাজ গজমোতিমিনারে বাস করার সমাজ ছিল—সেখানে যেমন গজমোতিমিনারের কাব্য না হওয়াই অস্বাভাবিক ছিল তেমনি আজ যখন সমাজে গজমোতিমিনারে বাস করবার লোক নেই তখন আর সে কাব্য বলিষ্ঠ জীবনের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে পারে না, অসার এবং অলীক হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্তই নতুন নতুন বিষয়বস্তু, নতুন আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি, আর কাব্যকে যথাস্থানে না রাখার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠেছে।

সেই রকম শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথাটা উপলব্ধি করা কর্তব্য যে আমাদের জীবন এবং আমাদের সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা চলতে পারে না। এ কথা আমরা অনেক সময়ই মুখে স্বীকার করে নিলেও কাজে স্বীকার করি কম। সাহিত্যে যেমন সামাজিক বিবর্তনের একটা স্তরে ধুয়া ওঠে যে আর্ট হচ্ছে আর্টেরই জন্ত, তেমনই শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই মনোভাবের প্রকাশ হতে পারে এই যুক্তির মধ্যে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্য বা বিজ্ঞানের চরম মূল্য তার নিজের মধ্যেই, তার ব্যবহারিক মূল্য দিয়ে তার প্রকৃত দাম যাচাই হয় না। যে সময় বলি, শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় রাজনীতির প্রবেশ নিষেধ তখনই এই যুক্তি আমরা আওড়াতে থাকি। অর্থাৎ বলতে চাই যে আমাদের শিক্ষার্থীদের সমাজ-বিচ্ছিন্ন করে কাঁচের ঘরে রেখে দিতে হবে—সেখানে তারা যে শিক্ষা পাবে সেটা হচ্ছে 'বিশুদ্ধ' শিক্ষা, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে। ইংরেজী, ফরাসি, জার্মান সাহিত্যের কাব্যরাজি পড়ব, সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার হতে রস সংগ্রহ করব, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জানব আলোছায়া শব্দের রহস্য—এগুলির রসাস্বাদন করাতেই তো এদের চরম মূল্য।

কিন্তু এ কথা যে কত অসার তা সামান্ত চিন্তা করলেই বুঝা যায়। আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, সমাজ যে ভাবে গড়ে উঠতে চায় শিক্ষার দ্বারা সেই গড়ে ওঠাকে সহজ এবং সুন্দর করে তুলতে হয়, বর্তমান পুরুষে যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন মিটল না ভাবীকাল যাতে সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন মেটাতে পারে ভবিষ্যৎ পুরুষকে সেই ভাবে গড়ে তুলতে হয়। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই এই কথার পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছে। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য যখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রসারিত হ'ল এবং ইংরেজ-তনয়দের গরম দেশে বসবাস আরম্ভ করতে হ'ল সেই সময়ই বিলাতে ট্রপিক্যাল অসুখের চিকিৎসা শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। সমাজের দাবি না মেটালে সমাজ ভেঙে পড়বেই।

সেইরকম, বর্ত্তমানে এদেশে লিবারেল এডুকেশন নামে যে শিক্ষা স্কুল কলেজে চলছে সে শিক্ষা যে লিবারেল নয়, এডুকেশনও নয়, সেকথা সকলেই বুঝতে পারেন। ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনার সময় প্রয়োজন ছিল বহু কেরাণীর এবং ইংরেজী-জানা লোকের। সেই কারণে ইংরেজী, অন্ততঃ মামুলি ইংরেজী, শেখাবার প্রয়োজন হতেই বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে নি তা নয়। এক দিকে সুযোগ পেতেই, আমরা এরই মধ্য দিয়ে আমাদের আপাত-প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে বিলেতী সাহিত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলাম এবং বিলেতী রাষ্ট্রিক-সামাজিক স্বাধীনতার রস আহরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম। বাংলাদেশে গত শতাব্দীতে এই পালাই চলেছে। এই চেষ্টা আবার অন্ত দিক হতে সহায়তা লাভ করেছিল। ডিরোজিও

প্রভৃতি কোন কোন উচ্চমনা ব্যক্তির সাহায্যে। তাঁরা এই শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করে তার মধ্য দিয়ে নতুন যুগের অনাস্বাদিতপূর্ব রস প্রচুর মাত্রায় আমাদের মধ্যে ঢেলে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তার গ্রহীতারও অভাব ছিল না। রামমোহন হতে শুরু করে অনেকেই এই রসকে আমাদের সমাজে প্রবেশ করাবার কাজে উদ্‌যোগী ছিলেন, ফলে নতুন কালের যে চেতনা সে সময় জগতে প্রসারিত হচ্ছিল বাঙালী তার সঙ্গে যেখানে যতটা যোগ রাখতে পেরেছে সেখানে তার নেতৃত্বও হয়ে উঠেছে অবিসম্বাদিত।

কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদি উদ্দেশ্যকে এইভাবে অতিক্রম করে যাওয়া কারও কারও পক্ষে সম্ভব হলেও সামাজিক ভাবে একথা স্বীকার করতে হবে যে এ শিক্ষার প্রধান মূল্য ছিল ব্যবহারিক মূল্য—বি-এ-তে ভাল ফল হলে ডেপুটিগিরি মেলা কঠিন হ'ত না। সুতরাং কথাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, তখন আমাদের সমাজের আর্থিক ঋদ্ধি ও সামাজিক প্রতিপত্তির জন্ত যা প্রয়োজন তা পূরণ করতে পেরেছিল বলেই সে শিক্ষাব্যবস্থার সমাদর ছিল বেশী। তার উপর প্রতিভাবানেরা তার সাহায্যে যে নতুন রস আহরণ করতে পেরেছিলেন সেটা হচ্ছে উপরি-পাওনা, তাতে ঐ শিক্ষাব্যবস্থার নিছক ব্যবহারিক রূপটা কিছু চাপা পড়ে তাকে লিবারেল এডুকেশন আখ্যায় ভূষিত করার আরও সুবিধাই হয়েছিল। বস্তুত: সেই মেকলে-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাব্যবস্থাই যে কিছু কিছু মাত্র রূপ বদলে এখনও টিকে রয়েছে তার প্রধান কারণ এই-ই। যে সময়ে মেকলের সমাজ একেবারে ডোডোপাখীর মতই অন্তর্হিত, বি-এ পাস করলে ডেপুটিগিরি দূরের কথা কেরাণীগিরিও মেলে না সে সময়ও যে মেকলে-ব্যবস্থার কঙ্কালটার উপরে আমরা কেবলই খড়মাটি চাপাচ্ছি সে কেবল এই আশায় যে তার আর্থিক মূল্য থাক আর নাই থাক তার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশ-বিদেশের ভাবধারার সঙ্গে যোগাযোগ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তর হবে।

কিন্তু এ কৈফিয়তও যাঁরা দেন তাঁরাও আসলে নিজেদের অক্ষমতার সাফাই গাইবারই চেষ্টা করেন। শিক্ষার সাহায্যে দেশ-বিদেশের নব নব চেতনা ও জ্ঞানধারার সঙ্গে সংযোগ সূত্র স্থাপন করতে হবে এটি শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম মৌল উদ্দেশ্য হলেও এ কথা অস্বীকার করা কিছুতেই চলে না যে, সমাজ যাতে আর্থিক সচ্ছলতার উপায় শেখে তার ব্যবস্থা করাও শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনাহারে সাহিত্য-চর্চাও হয় না আর আণবিক বোমার যুগে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করতে হলেও বিজ্ঞানেই বিজ্ঞানের শেষ এ কথা বলে তার ব্যবহারিক মূল্যকে ত্যাগ করা চলে না। অভাব-অনটনের মধ্যেও যেমন মানুষের অন্তরের প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তেমনিই সেই প্রাণশক্তি বজায় রাখতে হলে শেষ পর্যন্ত তার আহার জোগাবার ভারও সমাজকেই নিতে হবে। যত দিন এই শিক্ষার আর্থিক মূল্যও ছিল উপরি-পাওনাও ছিল তত দিন পর্যন্ত এ শিক্ষাকে বাহবা দেওয়া খুবই সহজ ছিল। কিন্তু যখন এই শিক্ষার আর্থিক মূল্য শূন্যের কোঠায় পৌঁছল তখন যাঁদের উপর দায়িত্ব ছিল এমন নতুনতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে সমাজে আর্থিক ঋদ্ধিও ফিরে আসতে পারে তাঁরা সে দায়িত্ব পালন না করে শুধু উপরি-পাওনার লোভ দেখিয়ে জাতিকে সেই শিক্ষার চোরাবালিতে মজিয়েছেন।

একথা মানতে হয় যে আমাদের আর্থিক ঋদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে পরাধীনতা, এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানতে হবে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার মধ্যেও যেটুকু ব্যবস্থা করতে পারতেন সে ব্যবস্থা না করে তাঁরা গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে সেই অচল ব্যবস্থারই চেহারা বদল করে সচল করবার নিষ্ফল চেষ্টা করে আসছেন। দলে দলে বি-এ এম-এ পাস করা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের অজানা নয়। এম-বি পাস করতে সে টাকাটা মোট খরচ হয়, পাস করার পর সেই টাকাটা কে ক'বছরে উপার্জন করতে পারেন তার একটা হিসেব নেওয়াও বোধ হয় মন্দ নয়। শিল্পশিক্ষা, ব্যবসাশিক্ষা, অন্যান্য কার্যকরী শিক্ষা, এবং সাংবাদিকতা প্রভৃতি আমাদের নতুন নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা কি বহুদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল না? উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় বছর বছর যে বিরাট্ অপচয় (অর্থাৎ যে অর্থ, শক্তি ও সময় ব্যয় হয় তার উপযুক্ত ফলের অভাব) হয়ে আসছে সে কি বহু পূর্বেই বন্ধ করার জন্ত চেষ্টিত হওয়া উচিত ছিল না? মাধ্যমিক শিক্ষার সময়েই বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার গোড়াপত্তন করার জন্ত বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল না? মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের বিরোধিতা যখন আমরা করি তখন আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত সংস্কারের চেষ্টা করাও কর্তব্য।

পূর্বেই বলেছি, এমন এক সময় ছিল যখন এই শিক্ষা উদর এবং হৃদয় দুই-ই ভরিয়েছে। তার পর যখন এই শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য ক্রমেই কমতে লাগল তখন আমরা এই বলে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম যে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি আমাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং স্বাধীনতাস্পৃহা বাড়ে তাহলে সেই তো পরম লাভ। আর্থিক ঋদ্ধি সম্ভব হোক্ বা নাই হোক্ এ শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু এখন আমাদের দেশে রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্ট জাগ্রত এবং স্বাধীনতাবোধ যথেষ্ট তীব্র—অন্তত: এতটা তীব্র যে তার জন্ত এই অচল ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে জাতিকে অকারণে স্বার্থত্যাগ করতে বলা অর্থহীন। বরং প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা, অর্থাৎ এখন আমাদের যে যে শিক্ষা দরকার, তার ব্যবস্থা করতে হবে, স্বাধীনতাবোধকে আরও দৃঢ়, বাস্তব করতে হবে, জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।

বিশেষত: ক্রমে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে সময় বর্তমান ব্যবস্থার ফাঁকি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। [illegible]নীতি আমাদের আর ছেলেখেলা নেই, তা নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রের প্রসারের যুগে প্রসাদকণিকা অধীন দেশগুলির ভাগ্যেও এসে পড়ে; কিন্তু যে সময় ধনতন্ত্র নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে টলমল, যুদ্ধে প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে সে সময় তার দক্ষিণা যোগাবার ভার পড়ে অধীন দেশগুলিরই উপরে—তাদের

উপর শোষণ অসহনীয় হয়ে ওঠে। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভারতবর্ষই তার জলন্ত উদাহরণ। সুতরাং এখন এই অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ করা শৌখিন বক্তৃতার কর্ম নয়—তা সত্যি সত্যি বন্ধ করতে হলে সমস্ত জাতিকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দৃঢ় ভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, মনে রাখতে হবে এ হ'ল সাম্রাজ্যবাদের মরণ-কামড় হতে উদ্ধার পাবার লড়াই। সেই-জন্য রাজনীতি যদি করতেই হয় তা আর এলোমেলো শৌখিন ভাবে করা চলবে না। যদি ভারতের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষদের মনে এই অহঙ্কারই থাকে যে তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তার প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মূল্য থাক্ বা নাই থাক্ সে শিক্ষা রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে সহায়তা করেছে, আমরা এখন তাঁদের বলতে পারি যে এতদিন পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষায় পরোক্ষভাবে যদি রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষিত হয়ে থাকে তার জন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন আর ঐ রকম পরোক্ষ প্রভাব বা ফাঁকা ফাঁকা কথা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যদি সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে চান তাহলে প্রত্যেক স্কুল-কলেজে শেখাবার ব্যবস্থা করুন আমাদের উপর শোষণের কাহিনী। পড়াবার ব্যবস্থা করুন দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস। ছেলেরা দেশরক্ষা বাহিনীর সৈনিক হয়ে গড়ে উঠুক।

বলা বাহুল্য তা সম্ভব হচ্ছে না। অন্য দিকে, শোষণ কঠোর-তর হতে হতে আমরা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে সময় আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা আর না করলেই নয়। জাতি কি মরে যাবে? অনাহারে অর্ধাহারে কি জাতি দাঁড়াতে পারবে? খাবার-দোকানের সামনে দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা অনাহারে মারা গেল—অথচ তার কোনো প্রতিকার আমরা করতে পারি নি, এ ক্লৈব্যের পরিচয় তো গত দুর্ভিক্ষে আমরা পেয়েছি। তবে আর সমস্ত জাতির ক্লৈব্যের সহায়তা করে আমাদের লাভ কি? আমাদের দেশের লোকের হাতে শিক্ষার যেটুকু ভার আছে তাঁরা এ সম্বন্ধে তাঁদের দায়িত্ব, তা সীমাবদ্ধ হলেও, আর এড়াতে পারেন না।

শিক্ষার সংস্কার সেইজন্য আমাদের আশু প্রয়োজন এবং তা করতে হলে আমাদের সামাজিক পটভূমিকা ভুললে চলবে না। আমাদের আর্থিক দাবি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম বস্তুত: একই আন্দোলনের দুটি দিক। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রেও উভয় দিকের দাবি সংযুক্ত করতে পারলে যুগোপযোগী একটি নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারা যায়। সে দুটির সংমিশ্রণ কি ভাবে হতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষাব্রতীদের চিন্তা করা দরকার।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারের যে সমস্ত কথা শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। সার্জেন্ট-পরিকল্পনা নিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস সম্প্রতি হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষকদের মাইনে কত হবে, ঘরবাড়ী পাকা হবে কি কাঁচা হবে এই সব কথাই বেশী আছে। নতুন যুগের শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষার contents কি হবে এ সব প্রশ্নের কোনও উত্তরই তার মধ্যে খুঁজে পাই নি। আজকাল শিক্ষা-সংস্কারের কথায় শুধু ভাবাবেগ নিয়ে থাকলে চলবে না, তার আর্থিক দিক্‌টাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য এ কথা অস্বীকার করি না। কিছুদিন হতে পরীক্ষায় ছেলেদের ফল ভাল হচ্ছে না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়েছেন। হয়ত ফল এইরকম খারাপ হবার একাধিক কারণ আছে; পাঠ্য-তালিকা অতি বৃহৎ, পাঠ্য বিষয় ভাল করে পড়াবার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে আজকাল যথার্থ শিক্ষক পাওয়া যায় না। মফস্বলে এবং শহরে ভাল শিক্ষক, যাঁরা মন-প্রাণ দিয়ে শুধু পড়াবেন, পাওয়া ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে। তার কারণ, আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হয় তাতে সংসার চলে না। কেরাণীর চেয়েও ইস্কুল-মাষ্টার আজ কৃপার বস্তু। আমরা শিক্ষকদের উপর খানিকটা দাবি করতে পারি যে তাঁরা কিছু স্বার্থত্যাগ করুন, কিন্তু সে দাবিরও একটা সীমা আছে। সমাজে সবাই যখন চোরাবাজারী কারবারে ফেঁপে উঠছে তখন কোন্ যুক্তিতে আমরা শিক্ষকদের বলব উপবাসী থাকতে? টাকার তো কম্‌তি নেই, অনেকের পকেটই তো ফেঁপে-ফুলে উঠল, তখন শিক্ষকরা স্বার্থত্যাগ করবেন কিসের জন্য? এইসব চোরাবাজারীদের স্বার্থে? সুতরাং শিক্ষকদের উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা শুধু আমাদের সামাজিক দায়িত্ব নয়, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দাবি। শিক্ষা-সংস্কারের কোন চেষ্টাই আর এই দিকটিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

কিন্তু তা সত্বেও ভুললে চলবে না যে অর্থকরী দিকটা যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, শিক্ষার সংস্কার বলতে শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষার বিষয়-বস্তুর সংস্কারই প্রধান। আমরা উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়-বস্তুর সংস্কার না করলে আসলে কিছুই হবে না। সেইজন্য সেইদিকে চিন্তা করার সময় এসেছে। পূর্বেই বলেছি, কোনও সংস্কারই তার সামাজিক পরিবেশের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। আর সমাজের প্রাণস্পন্দন ও গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এসব বিষয়ে কোনও ব্যবস্থাই চলতে পারে না। যখন এই ব্যবস্থা হয়েছিল তখনও তার বৃহত্তর প্রয়োজনটা ছিল সামাজিক, এখন যখন সমাজ বদলাচ্ছে তখনও তার পরিবর্তন সেই কারণে দরকার হয়ে পড়েছে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সেদিক থেকে সব চেয়ে আশ্চর্য। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা এখনকার নয়ী তালিম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করব না, সেগুলির বিবরণ বহু জায়গাতেই প্রকাশিত হয়েছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সঙ্গে সকলেই যে সম্পূর্ণ একমত হবেন তা আশা করা যায় না। হয়ত একথা সত্য যে একটু বেশী প্র্যাক্‌টিকাল হতে গিয়ে শিক্ষার মধ্যে যে উদার সংস্কৃতির আহ্বান থাকা দরকার সে আহ্বানকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তার মধ্যে যন্ত্রশিক্ষা বৃহৎ-শিল্পশিক্ষার ভিত্তিও হয়ত ততটা নেই। তা ছাড়া তার পিছনে কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের বর্তমানের গ্রামগুলি। এ কথা আমরা নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে আজকের দিনে ভারতীয় গ্রামগুলির যে চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে চেহারা অচল, সে চেহারা না বদলালে কোনও কাজই চলতে পারে না। সুতরাং যদি গ্রামের কথা গ্রামের পরিবেশ ও গ্রামের প্রয়োজন ভুলে

রেখে কোনও পরিকল্পনা করতে হয় তাহলে সে গ্রাম আজকের গ্রাম না হয়ে আগামী কালের গ্রাম হওয়াই ভাল। কিন্তু কথা তা নয়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সব চেয়ে প্রশংসার কথা এই যে তার ত্রুটিবিচ্যুতি যতই থাক্ না কেন, সে শিক্ষা-সংস্কারের আসল কথাটী ভোলে নি। সমাজের পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা প্রয়োজন, তার পরিবর্ত্তন ও গতিভঙ্গীর দিকে নজর রেখে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা দরকার এই সহজ সত্যটি উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মূল্য এমনিতে যত, তার বৃহত্তর মূল্য এইখানে, তার সবচেয়ে বড় কথা এই দিক-নির্দেশ। আমাদের সমাজ বদলাচ্ছে সুতরাং তার জন্য যা দরকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা করতে হবে। এখনও আমাদের গ্রামীণ সমাজ যায় নি, গ্রামের ছেলের যা যা বাস্তব সমস্যা সেগুলির সমাধান করতে হবে—এই সহজ উদ্দেশ্য নিয়েই ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সৃষ্টি। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সব চেয়ে বড় কথা হ'ল এই সকল বলিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে এদিক হতে এতটা অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গী আর কোনও পরিকল্পনায় নেই।

কিন্তু ওয়ার্ধা পরিকল্পনাও যথেষ্ট নয়। আরও এগোতে হবে। যে গ্রামকে মনে রেখে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা করা হয়েছে সে গ্রামও আমাদের দেশে বেশী দিন থাকবে না, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়, তার চেহারাবদল শীঘ্রই করতে হবে। তা ছাড়া ভারতবর্ষ ক্রমেই জগৎ-সমস্যার সঙ্গে অতি দ্রুত জড়িয়ে যাচ্ছে। সে কারণে জগতে যে সমস্ত বিপুল প্রত্যাশা এবং আদিম প্রয়োজন জনগণকে আলোড়িত করছে তার সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের রাখতেই হবে। সেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাজনীতি ছাড়াও অর্থনীতি সমাজনীতির নানা প্রশ্ন উঠে পড়ছে এবং পড়বেও। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। তা ছাড়া যে যুগ এগিয়ে আসছে তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবী একমাত্র গ্রামেরই থাকবে তা নয়। শহর এবং কলকারখানা এদেশে স্থায়ী আসন গেড়েছে, তাদের সুনিয়ন্ত্রিত বিবর্ত্তন বিবর্দ্ধনই আমাদের কাম্য। সুতরাং শুধু হস্তশিল্প শেখালে চলবে না। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পও শেখাতে হবে এবং ভালভাবে শেখাতে হবে। অর্থাৎ যন্ত্রশিল্প যেন এমনভাবে শিক্ষা হয় যে আমরা যেন ফিটার বা মেকানিককে এঞ্জিনিয়ার না বলে এমন লোককে তা বলি যিনি শুধু কলকব্জা চালান আর মেরামত করেন না, দুটো চারটে নতুন কলকব্জা বার করতেও পারেন। শিক্ষার অন্য ক্ষেত্রেও এইরকম উচ্চ আদর্শ স্থাপন দরকার। দার্শনিক যেন এমন লোককে বলি যিনি কেবল দর্শনের ইতিহাস আর অপর লোকের রচনার তর্জ্জমা জড় করেন না, নিজেও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু এ সব হচ্ছে পরের কথা; মূল কথা হচ্ছে, সংস্কারের ভঙ্গীটা কি হবে। সে দিকে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা আসল সমস্যাটির চমৎকার দিক্‌নির্দেশ করেছে, সেই দিক্-নির্দেশ বুঝে আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে যার মূল থাকবে সমাজে যার মধ্যে উদার সংস্কৃতি বা আর্থিক ঋদ্ধি কোনটিই উপেক্ষিত হবে না এবং যা আমাদের আগামী কালের দাবি মেটাতে পারবে। শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা-গুলির মধ্যে একদেশদর্শিতা পরিহার করা হোক; শুধু টাকা বা শুধু আদর্শ কোনটিই একক ভাবে যথেষ্ট নয়। গোড়ার কথাটা অর্থাৎ সামাজিক ঘটনার বেড়া আমাদের বিচরণ-ক্ষেত্রকে কোনদিকে এবং কোনখানে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে তা আগে বিবেচনা করা হোক। তা না হলে আমরা কত বড় ইমারত তুলব, কি ধরণের ইমারত তুলব এবং তাতে কত টাকা খরচ হবে এ সব আলোচনা বৃথা।

বজ্রপ্রকাশ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শরীর অসুস্থ, শয্যায় আশ্রয় লইয়াছি। হৃদয় উদ্বিগ্ন। বিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সহসা দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বেকার এক ঘটনা স্মৃতিপথে জাগরিত হইল।

ভবানীপুরে পদ্মপুকুরের একটি ধর্ম্মমন্দিরে শাস্ত্রালোচনা করিতেছি। বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে। গৃহে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। পল্লীও নির্জ্জন। অনুকূল আবেষ্টনীতে চিত্ত আমার বিষয়বস্তুতে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সহসা কাহার পদধ্বনিতে একাগ্রতা ভগ্ন হইল।

সম্মুখে যাহা দেখিলাম তাহা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইহাও কি সম্ভব? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। দ্বারদেশ আলোকিত করিয়া, রজতগিরিনিভ, কুন্দেন্দুধবল, রক্তাম্বরধারী, দীর্ঘাকৃতি কে এই পুরুষ! হিমালয় হইতে হৈম-বতীরমণ কি মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন! এ যুগে কি ইহাও বিশ্বাস করিব! আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মুগ্ধ বিস্ফারিত নয়নে একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব পুরুষের দিকে চাহিয়া আছি। সহসা তাঁহার প্রশ্নে আমার চেতনা হইল।

—"আমি কি ভিতরে আসিতে পারি?" আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলাম। তিনি তাঁহার পরিচয় দিলেন:

—"আমি সন্ন্যাসী। ধর্মজিজ্ঞাসু হইয়া এখানে অনধিকার প্রবেশে, আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি।"

আমি তখন আত্মস্থ হইয়াছি। কহিলাম, "আমি আর্য-সমাজের ধর্ম্মোপদেশক। যদিও ধর্ম্মালোচনা এবং ধর্ম্মোপদেশ দানই আমার কার্য, তথাপি আপনার ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। আমিই আপনার নিকট জিজ্ঞাসু। আপনার পরিচয় দিয়া আমার ধর্মপিপাসা শান্ত করুন।"

বহু অনুনয়ের পর তিনি তাঁহার পরিচয় দিলেন।

—"মার্কিন দেশের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে আমার জন্ম।

প্রভৃত আড়ম্বর ও বিলাসিতার মধ্যে শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলাম। নানা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত তখন পূর্ণ, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গও আমার ভবিষ্যতের উপর যথেষ্ট ভরসা রাখেন। কিন্তু সহসা একদিন আমার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আত্মীয়স্বজনের আশা-ভরসা নির্মূল হইয়া গেল। কেমন করিয়া তাহাই বলিতেছি :

"একদিন আমি এক পাঠাগারে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছি, এমন সময় এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আমাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে পূর্বে কখনো দেখি নাই। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু তাঁহার সেই আহ্বানে আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! সে কি অসাধারণ অক্ষিযুগল। আমি মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

ধীরে ধীরে আমার মনোভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল। মনে হইল তিনি আমার পরম পরিচিত। জন্মজন্মান্তরে নিবিড় স্নেহ-বন্ধনে পরম বিশ্বাসে, একত্রে আমাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। বহুযুগের সুপ্তস্মৃতি আলোড়িত করিয়া সেই তিনি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার অপেক্ষা আপনার জন আর আমার কেহ নাই। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া আমি তাঁহাকেই অনুসরণ করিলাম। কোথায় পড়িয়া রহিল আমার বিলাসভবন! কোথায় ভাসিয়া গেল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা!

তিনি আমায় দীক্ষা দিলেন। যাহাকে বলে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা! সে কি কঠোরতা! সে কি নিদারুণ আত্মনির্যাতন। দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া এই অগ্নিপরীক্ষা চলিল। অনেকেই ইহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সরিয়া গেলেন। কেবল মাত্র দুই জন মার্কিন যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। গুরুর আদেশে জীবসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা এখন পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি।"

স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় তাঁহার এই আশ্চর্য কাহিনী শ্রবণ করিলাম।

প্রশ্ন করিলাম, "আপনার গুরু কোন দেশীয়?"

উত্তর হইল, "জানি না।"

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "কোন্ ধর্মাবলম্বী?"

উত্তর হইল, "তাহাও জানি না।"

আশ্চর্য হইলাম, তথাপি প্রশ্নপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম "কোন্ ভাষা-ভাষী?"

উত্তর হইল, "তাহাও জানিতে পারি নাই। বহু ভাষাই তাঁহার মাতৃভাষার ন্যায় অধিগত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মাতৃভাষা কি তাহা জানিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও নিষেধ। তাঁহার শিক্ষাই এই। 'মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ বলিয়াই জানিবে। দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, সর্বধর্ম-সম্প্রদায়ের উপরে দেখিবে মানুষকে। মানুষ—ইহাই মানুষের একমাত্র পরিচয়। তাহাকে বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া খণ্ডিত করিবে না। বিশ্ব তোমাদের দেশ। মানবমাত্রই তোমাদের আত্মীয়। ধর্মমাত্রই তোমাদের ধর্ম।"

"তিনি আমাদের সকল ধর্মই সমান ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়াও আমার অন্তরের ক্ষুদ্রতা দূর হইল না।

প্রশ্ন করিলাম—"আপনার গুরুদেবের বর্ণ কিরূপ?"

তিনি বলিলেন—"আমার ন্যায়ই তাঁহার দেহের বর্ণ শ্বেত।"

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—"তাঁহার চক্ষু কৃষ্ণ না কপিশবর্ণ?

উত্তর হইল—"কৃষ্ণবর্ণ।"

মুখে তাঁহার মৃদুহাসি। বলিলেন—"তিনি ভারতবাসী হইলেও হইতে পারেন। তবে ইউরোপেও কৃষ্ণচক্ষু দুর্লভ নহে।"

আমার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন—"আমার গুরুর কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই সাধক শ্রেণীর প্রবর্তয়িতা যে ভারতবাসী ছিলেন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এখন এই শ্রেণীর মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশের বহু সাধক স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। উহা আর এখন কোন বিশেষ জাতির বা বিশেষ দেশের মানববিশেষের অধিকৃত নহে।"

প্রশ্ন করিলাম—"সকল ধর্মগ্রন্থই আপনারা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু উহার মধ্যে আপনাদের অপেক্ষাকৃত প্রিয় কোন ধর্মগ্রন্থ আছে কি?

উত্তর হইল—সকল ধর্মগ্রন্থই আমাদের অধ্যয়নের বিষয় হইলেও গীতাই আমরা বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করি। এই বলিয়া তিনি একখানি গীতা বাহির করিলেন। দেখিলাম, ভাষ্য ও টীকা বর্জিত, কেবল মূল পাঠ সমন্বিত ভগবদ্গীতার এক অভিনব সংস্করণ। তিনি বলিতে লাগিলেন—"গীতার ভাষ্য বা টীকা পাঠে আমাদের নিষেধ আছে। গুরুদেব বলিতেন, "ভাষ্যকারগণের প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া গীতার অর্থগ্রহণের চেষ্টা করিবে। ঐ রূপেই উহার সম্যক্ অর্থ যথাসময়ে অধিগত হইবে।"

"আমরা তাঁহার উপদেশ পালন করিতেছি। আমাদের সমস্ত কর্মপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস এই গীতা।

—"সম্প্রতি তিব্বত হইতে আসিতেছি। সেখানে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা লাভ করিলাম। আর এক অপূর্ব রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এই বিশ্বে অমৃতের ভাণ্ডার রহিয়াছে। উহা কখনও নিঃশেষ হইবে না।"

সহসা প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করিয়াছেন?"

আমি কহিলাম—অতি সামান্য।"

তখন তিনি পরমোৎসাহে আমার সহিত বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, ইহাতেও তাঁহার অধিকার রহিয়াছে। তাঁহার নিকট এ বিষয়েও নূতন শিক্ষা লাভ করিলাম।

বহুক্ষণ ধরিয়া বিস্তৃত ধর্মালোচনার পর তিনি আমাকে বলিলেন—"ভারতবাসীর নিকট অনেক বিষয়েই আমাদের শিক্ষালাভ হইবে। সেইজন্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আজ আমি বহু জ্ঞান লাভ করিলাম।"

তাঁহার এই মন্তব্যে আমি লজ্জিত হইলাম। আমার ক্ষুদ্রতা, তাঁহার নিকট আমি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছি,

তাহাতে আমার লজ্জা না হইবে কিরূপে? যে ভারতবর্ষের শিক্ষা—ভ্রাতরো মানবাঃ সর্বে, ভবনং ভুবনত্রয়ম্—(মানব মাত্রই আমাদের ভ্রাতা, ত্রিভুবন আমাদের বাসগৃহ) সেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, আমি তাঁহার গুরুর জাতিবর্ণ জানিবার অধীর আগ্রহে চিত্তের কি সংকীর্ণতাই না প্রকাশ করিয়াছি!

তিনি বলিলেন—"তিব্বতে অবস্থানকালে সেখানকার লামাগণ আমাকে একটি তিব্বতী নাম দিয়াছেন। উহার সংস্কৃত কি হইবে, আপনি কি তাহা বলিতে পারেন?"

তিব্বতী অক্ষরে লিখিত দুইটি তিব্বতী শব্দ, তিনি তাঁহার সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। শব্দ দুইটি হইতেছে—"দোজেয়োদ"। "দোজে"এর অর্থ "বজ্র" এবং "য়োদ"এর অর্থ, "জ্যোতিঃ","আলোক","প্রকাশ" ইত্যাদি। সুতরাং নামের সম্পূর্ণ অর্থ "বজ্রজ্যোতিঃ", "বজ্রালোক", বা "বজ্রপ্রকাশ" হইবে। পরে তিনি বজ্রপ্রকাশ নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সহিত আমার আরও দুই বার দেখা হইয়াছিল। তিনি বলেন, তাঁহার ভ্রাতা (ধর্মভ্রাতা) ব্রহ্মদেশ হইতে শীঘ্রই কলিকাতা আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

বজ্রপ্রকাশের দেহে একটি মাত্র কাষায় বসন দর্শন করিয়াছিলাম। শরীরে আর অন্য কোনো পরিচ্ছদ ছিল না। চরণ পাদুকাবিহীন, নগ্ন। ইহা আমার মনকে পীড়িত করিল। আমি উদ্বেগের সহিত তাঁহাকে কহিলাম:—"ভ্রাতঃ, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে পাদুকা ব্যতীত ভ্রমণ উচিত নহে, উহা বিপজ্জনক।"

তিনি স্মিতবদনে কহিলেন: "ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সন্ন্যাসীর উহা ভাবিবার নহে। আমাকে যদি এ জগতের প্রয়োজন না থাকে, পরজগতে যাইতেই হইবে। আর এখানে আমার প্রয়োজন থাকিলে, থাকিতেই হইবে। তাহার অন্যথা হইবে না। জীবন-মৃত্যুকে আমরা এইভাবে দেখিতে শিক্ষালাভ করিয়াছি।"

আশ্চর্য এই মার্কিন দেশবাসী সন্ন্যাসী! আশ্চর্য ইঁহার শিক্ষা! তর্ক করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তি রহিল না, নীরবে বসিয়া রহিলাম।

পরে এই সন্ন্যাসী হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত বাংলার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান কলহজর্জরিত আমাদের এই মাতৃভূমিতে তাঁহার সেই অপূর্ব মানব-ধর্মের সঞ্জীবনী সুধা বিতরণ করেন।

সেই রজতগিরিনিভ, তুষারকান্তি, রক্তাম্বরধারী বজ্রপ্রকাশ আজ কোথায় তাহা জানি না। যে মার্কিন দেশের নিভৃত-গোপনে আজ বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরি হইতেছে, হয়ত সেই দেশেরই কোনো নিভৃত স্থানে, নিপীড়িত নর-নারায়ণের সেবায়, তিলে তিলে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন।

ঐ মারণাস্ত্র ও তাহার আবিষ্কারকদের লইয়া মার্কিনগণ গৌরব করিতেছেন। কিন্তু এই অপূর্ব মানবধর্ম ও তাহার বর্তিকাবাহী অবজ্ঞাত বজ্রপ্রকাশকে বরমাল্য দানে বরণ করিবার যথার্থ গৌরবের দিন তাঁহাদের কবে আসিবে?

মৎস্য-কন্যা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

গভীর অতল নীল সমুদ্রের অরণ্যের ছায়
শুনেছি ঘুমায়ে থাকে মৎস্য-কন্যা অনেক প্রবাল-বিছানায়;
আঁকাবাঁকা লোনা নীল জল
ফেনার কুসুম রচি কন্যা-দেহে পরায় শিকল
আর বার শিশিরের কণা সম ঝরে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সমুদ্র শিহরে।
তখন অনেক রাত, ঘুমে বুঝি পৃথিবীর চোখ বুজে আসে
হিমসিক্ত বাতাসে বাতাসে;
কেউ আর জেগে নেই, ঘুমে সব মরে গেছে—বিলুপ্ত-চেতন,
ঘুমায় পাহাড়-মাঠ-বন।
জেগে আছি শুধু আমি, শুভ্র রাত—তারা-ঝলমল,
আর জল—নীল জল করে টলমল।

কন্যার নিশ্বাস লেগে কেঁপে ওঠে ঢেউ সাগরের,
তারায় তারায় কথা ফিস্‌ফাস্—দূর গগনের,
একটি স্ফুলিঙ্গ-কণা তার
আমারে ঘিরিয়া কাঁপে এক, দুই, বহু শত বার।
কন্যার নয়ন ঘিরে স্বপ্নের ইশারা
কথায় বিচ্যুত লাখ' তারা;
দুই বাহু প্রসারিয়া জ্যোৎস্না-শুভ্র ঢেউয়ের চূড়ায়
কন্যা-তনু ভেসে ভেসে যায়
উত্তাল হাওয়ায়।

রাত ক্রমে মিশে আসে। মিলায় অতল জলে কন্যার শরীর,
জেগে থাকে নীল জল মুক্তাময় সমুদ্রের তীর
অচপল স্থির।
খুঁজে ফিরি তাকে
যে-কন্যা সমুদ্রজলে প্রবালে মুক্তায় শুয়ে আঁখি মুদে থাকে।

পুস্তক-পরিচয়

শকুন্তলা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের দান অবিস্মরণীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরই বলিতে গেলে প্রথম ইহাকে শ্রী ও সুষমামণ্ডিত করেন। শকুন্তলা তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক।...বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া আমি কালিদাসের এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি।" তিনি শকুন্তলার উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় সুললিত এবং সরস গদ্যের যে উপহার প্রদান করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। বাংলার গদ্যরচনারীতি ঈশ্বরচন্দ্রের লেখায় অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করে। কালিদাস, বাল্মীকি এবং সেক্সপীয়রের সহিত পাঠকসমাজের পরিচয় স্থাপন করাইয়া দিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। এই পরিষৎ-সংস্করণে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্দ্দশ সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে। সম্পাদকীয় ভূমিকায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। পুস্তকে বিদ্যাসাগরের একখানি নূতন ছবি আছে। শকুন্তলায় ঈশ্বরচন্দ্র যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাঙালী পাঠকের চির-আদরের বস্তু।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভারতীয় সাধনার ঐক্য—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থী, বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন অনতিপ্রাচীন লৌকিক সাধন-পদ্ধতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য সাধারণের নিকট বিশেষ অপরিচিত। বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ ইহাদের কিছু কিছু মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা এই সব সাধনপদ্ধতির স্বরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটও সুস্পষ্ট হইয়াছে মনে হয় না। এজন্য দরকার এই সকল গ্রন্থের বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত আলোচনা। বর্ত্তমান গ্রন্থে আংশিক ভাবে এইরূপ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সমস্ত সাধনপদ্ধতির সহিত প্রাচীন পদ্ধতির, বিশেষ করিয়া তান্ত্রিক পদ্ধতির, ঐক্য সুস্পষ্ট। গ্রন্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয়। তবে ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভবপর হয় না। আশা করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া শিক্ষিত সমাজে অপেক্ষাকৃত অনাদৃত অথচ শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে সমাদৃত সাধন-পদ্ধতিগুলির মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে সহায়তা করিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। সান্যাল এণ্ড কোং, ৮৫, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪০+।০। মূল্য ১॥০

বর্ত্তমান জগৎ ধীর গতিতে উন্নতি চায় না। তাই আজিকার গতি বিপ্লবের গতি, পথও বিপ্লবের পথ। অবশ্য বিপ্লব অর্থে রুশ বিপ্লব বা ফরাসী বিপ্লব নহে, আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে এই গ্রন্থে বিপ্লব কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিপ্লব শব্দের এই প্রয়োগ অবৈজ্ঞানিক হয় নাই। পৃথিবীর অগ্রগামী দেশসমূহের নারী-বিপ্লব গত শতাব্দীর মাঝামাঝি আরম্ভ হয়। সুতরাং এ আন্দোলন এদেশে খুবই অল্পদিনের হইলেও পাশ্চাত্ত্যেও যে খুব বেশী দিনের সে কথা বলা চলে না। ভবিষ্যৎ সমাজ এই নারী-প্রগতির দ্বারা শুধু যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইবে তাহা নয়, নারীই হয়ত ভবিষ্যতের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবে। এদেশের নারী-আন্দোলনকে সম্পূর্ণ বিদেশের আমদানী বলা চলে, কারণ দেশের আবেষ্টন নারী-আন্দোলনের অনুপযুক্ত হইলে কোন পরিবর্ত্তনই সম্ভব হইত না। প্রত্যেক সমাজেই নারীর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার কর্ম্মপদ্ধতিরও বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজ জাগতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী কেন তাহার গতানুগতিক পন্থা বদলাইতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। সাধারণ সংস্কারমূলক মামুলি সমালোচনা করিয়া সমস্যাটি এড়াইয়া গেলে ইহার সমাধান সম্ভব নহে। লেখক বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়াছেন এবং সময় সময় কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণতা দেখাইলেও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার চিন্তাপ্রণালী, আলোচনা-পদ্ধতি, যুক্তিবিন্যাস প্রভৃতিতে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠকগণ নিজেদের চিন্তার খোরাক পাইবেন।

লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সাল হইতেই এদেশের নারী-আন্দোলনের প্রারম্ভ একথা মানিয়া লইলেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিপ্লব খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ শিক্ষাহীনতা। স্বাধীনতার অভাব দেশের সকল আন্দোলনকেই ব্যাহত করিতেছে, বিশেষ করিয়া নারী-আন্দোলনকে। শিক্ষা ও সাহিত্য, চিকিৎসা-বিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় নারী-সমাজ অগ্রসর হইলেও এই বিরাট্‌ দেশের পল্লী অঞ্চলে অগণিত নারী আজও অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবনযাপন করিতেছে। সকল উন্নতিই মোটামুটিভাবে নগরের মুষ্টিমেয় নারীর মধ্যে আবদ্ধ। নারী বিপ্লব বলিতে যাহা বুঝায় বাংলা দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাহা সুরু হইয়াছে বলা যায়।

বাঙালী পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া বর্ত্তমান নারী-প্রগতি সম্পর্কীয় তথ্য, চিন্তা, যুক্তি প্রচুর পরিমাণে পাইবেন। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ফণ্টামারা—অনুবাদক শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৩৩। মূল্য দুই টাকা।

ফণ্টামারা ইতালীয় লেখক ইগনাজিও সিলোনের লেখা একখানি অপূর্ব উপন্যাস। ফুসিনো হ্রদের উত্তরে অতি প্রাচীন এক গ্রাম ফণ্টামারা, —অধিবাসীরা দরিদ্র কৃষিজীবী। তাদেরই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবনকথা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, বিশেষতঃ ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ে অনেক আশা করা সত্ত্বেও পরে তাদের সে আশা যে নৈরাশ্যে পরিণত হয়েছে তারই করুণ কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ।

শ্রীযুক্ত দিলীপ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থখানিকে বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকের বিশেষ উপকার সাধন করলেন। ইংরেজী সংস্করণের দু-এক জায়গায় এমন কয়েকটি ছত্র চোখে পড়ে যা অশ্লীলতার পর্য্যায়-ভুক্ত। দিলীপবাবু সেগুলি সযত্নে পরিহার করে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। তরজমার ভাষা কিন্তু সর্বত্র ত্রুটিশূন্য নয়। বাংলা গ্রন্থে 'এক পূজনীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল' (৭৪ পৃ.), 'বেরার্ডো অক্লান্তভাবে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে লাগলো' (১১২ পৃ.) প্রভৃতি পড়লে অথবা সংলাপাংশে 'হে পূজনীয়! আমরা নিশ্চয় জানি…' প্রভৃতি দেখলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে,—এ ঠিক বাংলা পড়ছি ত? 'ড়'-কে 'র'-এ পরিণত করে অনুবাদক বার-বার প্রাদেশিকতা-দোষের পরিচয় দিয়েছেন,—যেমন 'সাড়া'র স্থলে 'সারা', 'ষাড়ে'র স্থলে ষার (২৭ পৃ.) 'মুষড়ে'র জায়গায় 'মুষরে' ইত্যাদি।

এ ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে দিলীপবাবুর বাংলা অনুবাদ ভবিষ্যৎ বাঙালী পাঠকের বিশেষ মনোরঞ্জন করবে—এরূপ আশা করবার কারণ আছে।

শ্রীতারাপদ রাহা

গভর্মেণ্ট ইনস্‌পেকটার—নিকোলাই গোগোল: অনুবাদক—শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী। সঞ্চয়ন পাবলিশার্স; ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

রুশ-লেখক নিকোলাই গোগোলের কোন পুস্তক আমাদের সাহিত্যে ইহার পূর্ব্বে ভাষান্তরিত হয় নাই। গোগোল ছিলেন রুশ-সাহিত্যের এক নূতন যুগের অগ্রদূত। তাঁহার সম্বন্ধে বিখ্যাত রুশ-লেখক ডষ্টয়ভস্কি বলিয়াছিলেন, "আমরা সকলেই গোগোলের 'ক্লোক' হইতে বাহির হইয়াছি।" 'ক্লোক' গল্পটি কেরানি জীবনের বাস্তব ছবি। রেভিজর বা গভর্ণমেণ্ট ইনস্‌পেকটর একখানি ব্যঙ্গনাট্য। তদানীন্তন রুশ-সরকারের একটি শাসনবিভাগের দুর্নীতিপরায়ণতা ও অধঃপতন ইহার বিষয়বস্তু। রচনা-নৈপুণ্যে ও প্রকাশভঙ্গিমায় নাটকখানি অনবদ্য। ইহার চমৎকার অনুবাদটি আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভক্ত মনোমোহন—উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী শিষ্য ভক্তপ্রবর মনোমোহন মিত্রের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে। মনোমোহন পরমহংসদেবের দৈবী কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। যে বৈশিষ্ট্য মনোমোহনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহা ছিল তাঁহার গভীর ও তেজোদীপ্ত ভাবোন্মুখতা।

এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বহু পুরাতন, অজ্ঞাত ও বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মূল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

টাওয়ার অব লণ্ডন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজির সহিত বাংলার ছেলেমেয়েদের পরিচয় সাধন করাইবার কাজে যে কয়জন সাহিত্যিক ব্রতী হইয়াছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। ইতিপূর্ব্বে তিনি "কুয়ো ভেডিস" এবং "দি ম্যান ইন্ দি আয়রন মাস্ক" অনুবাদ করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকখানি জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক হ্যারিসন এইন্সওয়ার্থের "টাওয়ার অব লণ্ডনে"র ভাবানুবাদ। "টাউয়ার অব লণ্ডনে"র সঙ্গে সম্রাট ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের ভাগ্নী জেনের জীবনের যে বিষাদমাখা ঐতিহাসিক কাহিনী বিজড়িত তাহার উপর কল্পনার রং চড়াইয়া এইন্সওয়ার্থ এই অপূর্ব্ব, বিয়োগান্ত রোমান্স রচনা করিয়াছেন। এই বিরাট্ গ্রন্থ হইতে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী অংশ নির্ব্বাচনে অনুবাদক মাত্রাবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং মূল রচনার প্রতি তিনি অবিচার করেন নাই, কিন্তু বইয়ের মলাটে বা টাইটেল-পেজে এইন্সওয়ার্থের নামটি উল্লিখিত থাকিলে অধিকতর সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইত। সম্রাজ্ঞী জেনের স্বামী গিলফোর্ড ডাড্‌লির পাশ্বচরের নামের প্রকৃত উচ্চারণটা জানিয়া লওয়া অনুবাদকের উচিত ছিল। 'চোলমণ্ডলে' শুনিলেই প্রাচীন ভারতের পরমভট্টারক সামন্ত নৃপতিদের নামের কথা মনে পড়ে।

আবৃত্তিধারা—শ্রীঅতনু গুপ্ত। আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

লেখক তাঁহার 'প্রাণখোলা কৈফিয়তে' বলিয়াছেন—"একে কাঁচা লেখা, তাহাতে মৌলিকতা নাই সুতরাং এই বই প্রকাশ করিবার বিশেষ সার্থকতা নাই।" লেখকের এই অকপট স্বীকৃতি প্রশংসনীয়। বইখানিতে সাহিত্যিক গুণপনার পরিচয় হয়ত নাই কিন্তু এক দিক দিয়া ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। বিদ্যালয়ের ছেলেদের আবৃত্তি এবং অভিনয়ের জন্যই লেখক এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এ ধরণের পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বিরল বলিয়া তাঁহার উদ্যম প্রশংসার্হ। পুস্তকের বহিঃসৌষ্ঠবও অনবদ্য। ছেলেমেয়েরা বইখানি হাতে পাইয়াই খুশি হইবে।

রূপকথা—শ্রীত্রিভঙ্গ রায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার রূপকথা। জাতির প্রাণকেন্দ্র হইতে স্বতঃউৎসারিত এই রূপকথার ভাষায় যাদু আছে। কথার এই যাদুমন্ত্র বলেই রূপকথার রাজা দক্ষিণারঞ্জন বাংলাদেশের ছেলে-বুড়া সকলের মন জিতিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্টা অনেক হইয়াছে কিন্তু শ্রীত্রিভঙ্গ রায়কে তাঁহার উপযুক্ত অনুগামী বলিতে পারি। ত্রিভঙ্গবাবু রূপদক্ষ শিল্পী রূপেই সুপরিচিত, কিন্তু তুলি এবং কলম দুইটিই যে তাঁর হাতে সমান তালে চলে, তাহার পরিচয় রূপকথার বিচিত্রিত গল্পগুলিতে জাজ্বল্যমান।

এই গল্পগুলিতে আছে প্রকৃত রূপকথার স্বাদ। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আবার হারানো শৈশবের সেই কল্পলোকে ফিরিয়া গিয়াছি। বাংলার গীতকথা (লোকের) যে একটি বিশিষ্ট ঢং আছে, এই পুস্তকে লেখক তাহা হুবহু বজায় রাখিয়াছেন। এই বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বলা 'পাষাণকুমার' 'মাণিক অঙ্গুরী', 'কাণাকড়ি', 'বিদ্যে বড় না বুদ্ধি বড়' এই চারিটি গল্প বাংলা 'রূপকথা'-সাহিত্যের আসরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই মনে হয়। আংটি পরানো ইঁদুরের লেজে কামড় দিয়া ইঁদুর-বৌয়ের সাগর পাড়ি দেওয়ার বর্ণনা পড়িয়া এবং ছবি দেখিয়া ছেলেমেয়েরা আমোদও পাইবে প্রচুর। প্রচ্ছদপটে পরিমিত সরল রেখা ও সুনির্ব্বাচিত বর্ণসমাবেশে অঙ্কিত তেপান্তরের মাঠের উপর করধৃতকরবাল, অশ্বারূঢ় রাজপুত্রের ছবিটি শিশুদের কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া সুদূরাভিমুখী করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিষের বাঁশী (২য় সং)—কাজী নজরুল ইসলাম। নূর লাইব্রেরী, ১২।১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রথমে 'অগ্নিবীণা—দ্বিতীয় খণ্ড' নামে বিজ্ঞাপন দিয়া পরে এই নূতন নামকরণ করিয়া কবি এই কবিতার বইখানি প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হইবামাত্র সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া এতদিন ইহার প্রচার বন্ধ ছিল। ইহাতে সমাজ ও দেশের সকল প্রকার অধীনতা ও অনাচারের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ অগ্নিময়ী বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ের প্রচণ্ড রুদ্র রূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্ম্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। এই সঙ্গে কবি দেশবাসীকে অভয়মন্ত্রের মাভৈঃবাণী ও যুগান্তরের নবজীবনের জয়গান শুনাইয়াছেন। জাতির এই দুর্দ্দিনে এই বইখানি মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।

জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী (২য় সং)—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

যুগপৎ রাশিয়ার যুদ্ধঘোষণায় ও আণবিক বোমার আক্রমণে জাপানের পরাজয় ঘটিলেও ক্ষুদ্র জাপান ব্রিটেন, আমেরিকা, ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজ ও চীন প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একক আক্রমণ চালাইয়া যেরূপ দুর্ব্বার বিক্রমে প্রায় চারি বৎসরকাল বিজয়াভিযান চালাইয়াছিল তাহা উপন্যাসের ঘটনা অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। হংকং, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, জাভা, মালয় ও বর্ম্মা ছয় মাসের মধ্যে ঝটিকাবেগে দখল করিয়া জাপান যে অসমসাহসিকতা ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। এই পুস্তকে এই ছয় মাসের আক্রমণ পর্ব্বই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, যুদ্ধের শেষ অধ্যায় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক ও 'যুগান্তর'-সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত এই জাপানী যুদ্ধের সমসাময়িক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও লেখকগণকে ইতিহাসের উপাদান যোগাইবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি ও গতি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক প্রচুর মানচিত্র এই পুস্তকের একটি বিশেষত্ব, স্মরণীয় ঘটনার তারিখগুলির ক্রমসন্নিবেশ আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। সাধারণ পাঠক এবং রণনীতি ও সমরবিদ্যার পাঠার্থী উভয়ের পক্ষেই বইখানি অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রবিনহুড—শ্রীতারাপদ রাহা। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

সচিত্র উপন্যাস। আটশো বছর আগে ক্রুসেড-অভিযাত্রী সিংহবীর্য্য ইংলণ্ডরাজ রিচার্ড ও তদীয় অত্যাচারী ভ্রাতা কাউণ্ট জনের রাজত্বকালে নর্ম্যান ব্যারণ ও মোহান্তদের অত্যাচারে স্যাক্সনগণ সকল প্রকারে নিপীড়িত ও পদদলিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় লক্সলীর স্যাক্সন জমিদার রবিনহুড শেরউডের মহারণ্যে এক বিদ্রোহী দল গঠন করিয়া এই অত্যাচারের অবসান করিতে বদ্ধপরিকর হন। রবিনহুড ছিলেন ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয়, লাঠি, তরবারি ও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ যোদ্ধা। ছোট্ট জন, সন্ন্যাসী টাক, স্কারলেট ও মাচ প্রভৃতি এক এক বিদ্যায় পারদর্শী মহারথী কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচরও তাহার দলে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। অবশেষে গুণগ্রাহী রাজা রিচার্ড ক্রুসেডে অর্থসাহায্যকারী রবিনহুডের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ও তাহাকে পুরস্কৃত করেন। রবিনহুড অসমসাহসী বীর হইলেও নানারূপ কৌশল ও ছলের সাহায্যে সংখ্যাধিক শত্রুকে পরাজিত করিতেন। তাহার এই কূটবিদ্যার খেলা ও কয়েকজন বাছাই অনুচরের হাস্যজনক কার্য্যাবলী পাঠকের চিত্তে প্রচুর আমোদ সঞ্চারিত করে। কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও সাধারণ পাঠকমাত্রেই এই বইখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহা অনুবাদ নহে, কিন্তু ইংরেজী মূল গ্রন্থের ন্যায়ই সুখপাঠ্য ও কৌতূহলপ্রদ। এইরূপ শক্তিমান লেখকগণের হস্তে আমরা দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

তোমারই—শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। পৃ. ১২১। দাম দুই টাকা।

উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন নয়। প্রেম ও বিবাহ, ভাবুকতার প্রাচুর্য্য ও নৈতিক শিথিলতা, মনস্তত্ত্বের রহস্য ও আদর্শবাদ—এই সব জটিলতার ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনী সরস ও সজীব।



যে-সব প্রশ্ন গ্রন্থকার নিজেই উত্থাপিত করিয়াছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছেন। ইহাতে লেখকের মনন-শীলতা ও মতামতের দৃঢ়তার পরিচয় আছে। লেখকের ভাষায় রবীন্দ্র-গদ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট; বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ফেনিল। চরিত্রসৃষ্টিতে নৈপুণ্যের পরিচয় থাকিলেও তাহা প্রাণবন্ত হয় নাই; নায়কনায়িকা যেন লেখকের হাতে ক্রীড়নক, তাঁহার আদেশেই যেন চলিতেছে ও কথা বলিতেছে। কাহিনীতে ঘটনার বৈচিত্র্য আছে কিন্তু গাঁথুনি হালকা। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এই উপন্যাসখানি খুবই উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

এ যুদ্ধের সেনাপতিরা—শ্রীসুধীরকুমার সেন। কালী প্রকাশালয়। ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

আণবিক বোমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছে। ইহা খুবই আকস্মিক সন্দেহ নাই, কিন্তু দীর্ঘ ছয় বৎসর যাবৎ এশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডের বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রু মিত্র সকল দলের সেনাপতিবর্গ যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও কম বিস্ময়কর নহে। গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্রসহযোগে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকা ইহার মধ্যে দ্বিতীয় মহাসমরের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ইহার একটি যোগ্য ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

(১) রামায়ণে ক খ, (২) মহাভারতে-দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী। এস্. গুপ্ত এণ্ড সন্স, ৪৯/২এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ।৵০ ও ।৵০।

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ও বিষয়বস্তু লইয়া ছেলেমেয়েদের বর্ণ-পরিচয় রচনার প্রয়াস এই বোধ হয় প্রথম, এবং সত্যই অভিনব। পুস্তক দুইখানিই যে উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য হইয়াছে, ইহার বহুল সংস্করণেই তাহা সুপ্রকট। বই দুইখানি কাহিনী অনুগ নানা চিত্রে সুসজ্জিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলায় কুষ্ঠরোগ

ভারতবর্ষের যে-সমস্ত প্রদেশে কুষ্ঠরোগের দরুন জনস্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে বাংলা তাহাদের অন্যতম। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং হায়দরাবাদেও এই রোগের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক কুষ্ঠ-নিবারণী-সমিতির (British Empire Leprosy Relief Association) গবেষণাকেন্দ্র কলিকাতায় অবস্থিত।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ২১,০০০ জন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক কুষ্ঠ-নিবারণী-সমিতির বঙ্গীয় শাখার কর্মীদের অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইল, বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীর প্রকৃত সংখ্যা কম-সে-কম ইহার দশ গুণ। মোটামুটি একথা বলা যায় যে, গোটা বাংলাদেশে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা দুই লক্ষ হইতে তিন লক্ষের মধ্যে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর-বঙ্গের রংপুর ও জলপাইগুড়ি এই কয়টি জেলাতেই কুষ্ঠরোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী।

বাংলা-সরকার কুষ্ঠব্যাধি প্রতিষেধককল্পে বিভিন্ন কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক কুষ্ঠ-নিবারণী-সমিতির বঙ্গীয় শাখায় বার্ষিক ১০,০০০ টাকা সাহায্যও দিয়া থাকেন। কলিকাতার এলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠ হাসপাতাল সরকারী কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কুষ্ঠ-রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ক্লিনিক আছে। রোগ পরীক্ষা করাইবার জন্য বৎসরে ১৫০০ জন রোগী এখানে আসিয়া থাকে। প্রতি সপ্তাহে তিন শতেরও অধিক রোগী এই ক্লিনিকে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়। এ ছাড়া কোন কোন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও এদিক দিয়া কিছু কিছু কাজ করিয়া থাকে। লেপার মিশনের অধীনে দুইটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। এগুলিতে আন্দাজ ৫০০ রোগীর স্থান সঙ্কুলান হয়। কলিকাতার প্রেমানন্দ কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের অধীনে দুইটি ক্লিনিক আছে, তাহাতে জনসাধারণের, এমন কি ভিক্ষুকদেরও পর্য্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। মফস্বলে, মেদিনীপুরে শিলদা পেডি লেপার ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে চারিটি কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় আছে। তা ছাড়া আসানসোলেও 'লেপ্রসি বোর্ডে'র অধীনে একটি কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় আছে। সমগ্র বাংলাদেশে রাণীগঞ্জ, বাঁকুড়া, শিলদা লেপার কলনি, আসানসোল লেপার হসপিট্যাল এণ্ড সেটেলমেণ্ট, চন্দ্রঘোনা, কালিম্পং, এলবার্ট ভিক্টর লেপার হসপিটাল, গোবরা এই সাতটি কুষ্ঠ-চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে রোগীদের থাকিবার ব্যবস্থা আছে। সেগুলিতে সবসুদ্ধ মাত্র আট শত জনের স্থান সঙ্কুলান হয়। সমগ্র প্রদেশে কুষ্ঠ 'ক্লিনিকে'র সংখ্যা দেড় শত মাত্র।

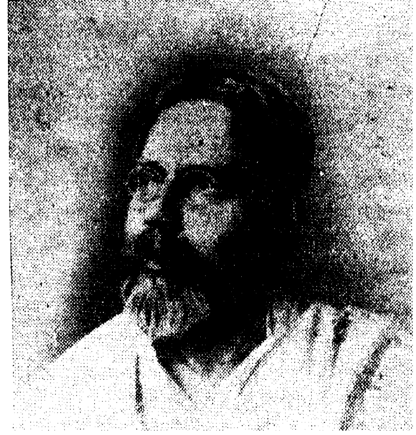
বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিকে কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য তৎপর হইতে হইবে। কিন্তু শুধু এই উপায়েই এই সমস্যার সমাধান হইবে না। যেখানে কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় নাই সেখানে সরকারী হাসপাতাল এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু কেবল চিকিৎসা দ্বারা এই রোগ সংক্রমণ নিবারণ করা যায় না বলিয়া রোগীদের স্বতন্ত্রীকরণ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত। সকল কুষ্ঠরোগীর দ্বারাই রোগ সংক্রামিত হয় না। চিকিৎসকদের মতে বাংলাদেশের কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২৫ জনের দ্বারা উক্ত রোগের সংক্রামণ হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র প্রদেশে রোগ-সংক্রমণকারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজারের মধ্যে। বাংলাদেশে যতগুলি কুষ্ঠ-চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে মাত্র আট শত জনের অধিক রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে না। এমতাবস্থায় চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সুখের বিষয় বাংলা গবর্ণমেণ্ট বাঁকুড়ার স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় পাঁচ শত রোগীর জন্য একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

সরকার এবং চিকিৎসা বিভাগ ছাড়া, কুষ্ঠরোগীদের প্রতি সমাজেরও কর্তব্য রহিয়াছে। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পিতামাতা এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি সর্ব্বসাধারণের সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়া উচিত। 'পুওর হোমে'র ধরণে 'হোম' বা আশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা, স্বতন্ত্রীকৃত রোগীদের পরিবারে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ, কুষ্ঠরোগীদের সন্তানসন্ততিদের হোমে রাখিয়া প্রতিপালন ইত্যাদি নানাভাবেই সমাজহিতৈষীরা জনকল্যাণব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন।

বাংলাদেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরণের সমাজ-কল্যাণ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না; পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধি-

বাসীরা কিন্তু এই গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। যেমন ধরা যাক ব্রাজিলের কথা। সেখানকার লোকসংখ্যা প্রায় বাংলাদেশের সমান। কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সেখানে আশি হাজার মাত্র, বাংলাদেশের তুলনায় ঢের কম। কিন্তু সেখানে কুষ্ঠরোগীদের কল্যাণকল্পে এক মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমগ্র দেশে ইহার অধীনে ১৪০টি ছোট-বড় সংঘ আছে। কুষ্ঠরোগীদের এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই এই সমস্ত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ব্রাজিলে ১৮টি ষ্টেটে প্রতিষ্ঠিত ২২টি 'হোমে' সাকুল্যে ২৫০০টি শিশুর তত্ত্বাবধান করা হয়। তাহাদের জন্য নার্শারী, কিণ্ডারগার্টেন এবং কৃষি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। ছেলেরা ক্ষেতে এবং বাগানে নিয়মিতভাবে কাজ এবং খেলা করে আর বালিকারা রান্নাবান্না এবং ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ শিখে।

ব্রাজিলের দৃষ্টান্তে আমাদেরও উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দুর্গতদের দুঃখহরণকল্পে বিভিন্ন সমাজসেবা-সঙ্ঘ, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির একযোগে কাজ করা উচিত।



পাঁচকড়ি দে

পাঁচকড়ি দে

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার বাংলার সুপরিচিত ডিটেক্টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। ডিটেক্টিভ উপন্যাস রচনায় যেমন তাঁহার দক্ষতা ছিল, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মানুষ হিসাবে তিনি অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন।

হরিমোহন রায়

যুক্তপ্রদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও প্রবাসী বাঙালীদের অন্যতম নেতা হরিমোহন রায় গত ১৯শে নবেম্বর ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করিয়া হরিমোহনবাবু যুক্তপ্রদেশে যান এবং সেখানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই যুক্তপ্রদেশের আইনজীবীদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। হরিমোহনবাবু সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল এলাহাবাদ বার এসোসিয়েশ্যনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহকর্মী পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু, সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশবিখ্যাত আইনব্যবসায়িগণ ফৌজদারি আইন-কানুনে হরিমোহনবাবুর ব্যুৎপত্তির কথা স্বীকার করিতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত হরিমোহনবাবুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রামানন্দবাবুর এলাহাবাদে অবস্থানকালে হরিমোহন "Bengali Reunion Mela" নামে নিয়মিতভাবে প্রবাসী বাঙালীদের একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতেন, তা ছাড়া বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

প্রিয়লাল দাস

বিগত ১৬ই নভেম্বর, বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক প্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল মহাশয় ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে আগ্রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা পুলিশ কোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু অপরিসীম কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও অক্লান্তভাবে সাহিত্য-সাধনা করিয়া তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রিয়লালবাবুর ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথমে তিনি ইংরেজীতেই লিখিতে সুরু করেন এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শেষে অর্চনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের প্ররোচনায় তিনি মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অর্চনা পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করে। তাঁহার বহু প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাসমূহও অলঙ্কৃত করে। আমাদের দেশ 'ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে ইংরেজ কবিদের লেখা কবিতাবলীর আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রিয়লালবাবু বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন। খাঁটি সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি এবং উন্নত ধরণের সাহিত্য-রসবোধ এই দুইটিরই তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বাংলা গদ্যের ষ্টাইলও ছিল প্রাঞ্জল, মধুর এবং অননুকরণীয়। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তাহার অবদান খুব কম নহে। "এষার কবি" এবং "রবীন্দ্রনাথ" নামক দুইখানি পুস্তক তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সমালোচনামূলক যে সমস্ত প্রবন্ধ বিভিন্ন বাংলা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে, সেগুলি একত্রিত করিয়া কয়েক খণ্ড বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়লালবাবু ভগবদ্ভক্ত, নিরহঙ্কার অমায়িক ও বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জলধর সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক তাঁহার রচনার অনুরাগী ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ও প্রিয়লালবাবুর নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তোমারে বাসিয়া ভালো

শ্রীকরুণাময় বসু

তোমারে বাসিয়া ভালো স্বপ্ন দেখি অনন্ত আকাশ,
নদীতে হাঁসের খেলা মেঘরাঙা সোনার গোধূলি ;
দিগন্তের পার হ'তে উড়ে-আসা ফাল্গুন-বাতাস,
শ্রাবণ-রাত্রির শেষে জেগে ওঠা যুঁইফুলগুলি।

তোমারে বেসেছি ভালো, এ পৃথিবী তাই ভালো লাগে,
আমারেও জানি তুমি কোন দিন ভুলিতে পারো নি ;
এ জন্ম-শাশ্বতী প্রেম আজ নয় বহু বর্ষ আগে
এনেছে অমৃত দীপ,—দীপান্বিতা তাই এ ধরণী।

গোধূলি-পাণ্ডুর স্নিগ্ধ আকাশের নীলাঞ্জন মায়া
প্রেমের অঞ্জন করি তব চক্ষে আঁকিয়া দিলাম ;
আমার পরশমণি দিল তব নবজন্ম কায়া,—
দেহের অতীত তীরে স্বপ্নময় মূর্তি অভিরাম।

আমার প্রেমেরে ছাড়া তুমি শুধু মাটির প্রতিমা,
প্রাণহীন, ভাবহীন, প্রাত্যহিক তুচ্ছতায় ভরা ;
আমার এ ভালোবাসা আনিয়াছে দুর্লভ মহিমা,—
সুদূর গৌরবজ্যোতিঃ, তাই তুমি দূরের অপ্সরা।

তুমি আমি ক্ষণস্থায়ী, দুদণ্ডের ক্ষুদ্র ইতিহাস,
প্রেমের অম্লান আজ্ঞা এনে দেয় স্বর্গের আভাস।

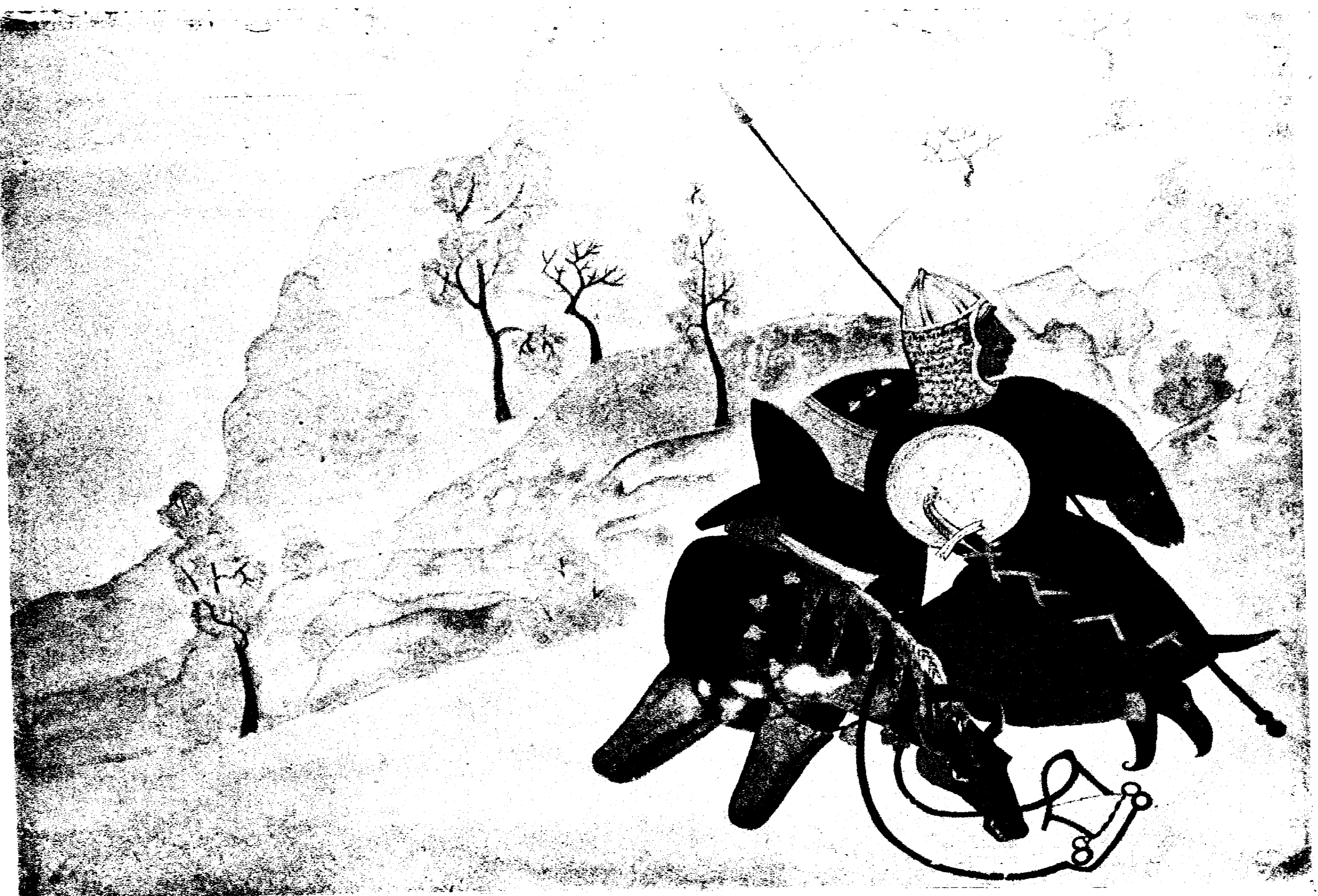
মহাত্মা গান্ধী

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

দূরে রাত্রি গরজায়। তৃপ্তিহীন দানবের মূঢ় অট্টহাসি
পৃথ্বীর হৃদয় ভেদি বজ্র হানে সুশ্যামল ছায়াতরুশিরে ;
সহসা ঝঞ্ঝার মাঝে কোন্ ক্ষেপা বাজাইল ভৈরবের বাঁশী,
বন্ধন-বেদনা মাঝে মুক্তি দিল কারাবাসী সহস্র বন্দীরে ?
তোমারে চিনেছি আমি শীর্ণ-রিক্ত সজ্জাহীন নগ্ন ক্ষপণক ;
চিনেছি তোমারে আমি, বক্ষে তব মুক্তি-মন্ত্র শাশ্বত ভাস্বর।
দণ্ডধারী হে বৈরাগী, দেবতাত্মা ভারতের নির্ভয়-কথক,
তোমার অমৃত বাণী ভরেছে সবার চিত্ত শিশু-নারী-নর।

পশ্চিম সমুদ্রতীরে নির্যাতিত মানবের চিতা বহ্নিমান্,
স্রোতহীন এ নদীর বক্রকূলে লেগেছে কি প্রাণের জোয়ার ?
সহসা নৈঃশব্দ্য ভেদি গরজিল তারস্বরে একা'র আহ্বান।
পরম আশ্বাসে চাহি অন্নহীন জনগণ ভুলে ব্যথা-ভার।
ধূলি হ'তে তুলে লও পদপিষ্ট মানুষের মলিন কঙ্কাল,
নূতন প্রভাত লাগি রাঙিয়া উঠুক পুনঃ দিক্‌চক্রবাল।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



রাজপুত রাণা

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



লণ্ডনের সরকারী গার্ডের ঈষ্টারের আগেকার বৃহস্পতিবারে ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবেতে সম্রাট কর্ত্তৃক বিতরিত মুদ্রাসমূহ (মণ্ডি মানি) বহিয়া লইয়া যাইতেছে



লণ্ডনের একজন সহকারী গার্ড বালকদের হাতে এক একটি দীর্ঘ বেত প্রদান করিতেছে। আগেকার দিনের [illegible]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫২

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিলাতী নববর্ষ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর এই প্রথম বিলাতী নববর্ষ আসিয়াছে যাহাতে শান্তিপর্ব্ব আরম্ভ হইবার কথা। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে শান্তির নমুনা এই যুদ্ধক্লিষ্ট জগৎ পাইয়াছিল এবারও সেই নমুনার অনুযায়ী কার্য্যক্রমই চলিতেছে মনে হয়। যুদ্ধের অজুহাতে এ দেশে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' ডাকিয়া আনেন আমাদের কর্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের নন্দী ভৃঙ্গীদল। এখন ইউরোপের বিজিত দেশগুলিতে সেই কর্তৃপক্ষের উচ্চতম অধিকারীবৃন্দ এবং তাঁহাদের সহযোগী দল কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ব্যাপারে। বলা বাহুল্য সে সকল দেশের অসামরিক আবালবৃদ্ধবনিতা এখন ভীষণ বিপদ্‌গ্রস্ত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর দিকে তাকাইয়া আছে। মধ্য-ইউরোপের দুর্দ্দান্ত শীতের মধ্যে সেখানে না আছে কয়লা যে আগুনে শীত নিবারণ হইবে, না আছে খাদ্য যে শরীর সবল থাকিয়া শীতের প্রকোপ সহ্য করিবে, উপরন্তু অধিকাংশ শহরের অর্দ্ধেক ঘরবাড়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

জার্ম্মান নাৎসী দল তাহাদের বিরোধী দলের লোককে, বিশেষ ইহুদীদিগকে, এক এক বেড়াজালে ঘেরা ছাউনিতে পুরিয়া না খাওয়াইয়া, অত্যাচার ও অনাহারে মৃত্যুমুখে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, ইহা এখন সর্ব্বত্র প্রচারিত সংবাদ। আমেরিকার "ওয়ার্লডওভার" প্রেসের সংবাদদাতা বলেন, নাৎসীদিগের ঐ সকল শাস্তিদানের ছাউনির বন্দীরা যে দৈনিক খাদ্য পাইত তাহার উত্তাপ পুষ্টির (ক্যালরি) পরিমাণ ছিল ১৫০০। এখানে বলা প্রয়োজন যে সাধারণ লোকের সাধারণ আবহাওয়ার অবস্থায় দৈনন্দিন ৩০০০ ক্যালরি আবশ্যক। যাহাই হউক, এখন মধ্য-ইউরোপে বিজেতাদিগের ব্যবস্থায় ভিয়েনার জনসাধারণ পাইতেছে ৭৬০ ক্যালরি এবং টিরোল অঞ্চলে ৮৫০। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের জন্ত সারাদিনের বরাদ্দ এক পোয়া দুধ, তাহাদিগের মাতারা নিজেরাই খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়, সুতরাং শিশুদিগের খাওয়াইবে কি? এই সংবাদের পর বলা বাহুল্য মধ্য-ইউরোপের বিজিত জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই এই নববর্ষে ইহলোকের আশা ছাড়িতে বাধ্য হইবে।

আমাদের দেশে বিলাতী নববর্ষের বিলাতী অভিনন্দন ঠিক মতই হইয়াছে। অর্থাৎ, যে বিলাতী দল এই কয় বৎসর এদেশে বিরাজ করিয়া দৈহিক ও বৈষয়িক হিসাবে যে উপকার লাভ করিয়াছেন এই বৎসরে মানসিক দুর্ভাবনার অন্ত হওয়ায় তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে, উৎফুল্লচিত্তে আনন্দ-উৎসবে মাতিয়া এ দেশের লোককে কৃতার্থ করিয়াছেন। জনসাধারণ কিন্তু এখনও দুর্ম্মূল্য বাজারের চাপে এবং অসংখ্য বাধাবিঘ্নের ও দুঃখকষ্টের তাপে জর্জ্জরিত। উপরন্তু আসিতেছে কর্ম্মচ্যুতির আঘাত এবং তাহার পর অনশনের চিন্তা। সর্ব্বোপরি চলিতেছে রাজনৈতিক খেলা, যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পঞ্চমবাহিনী ঘুষের ও ব্ল্যাক মার্কেটের টাকায় পুষ্ট এবং সরকারী চাকুরীর দুর্গপ্রাকারে সুরক্ষিত হইয়া মহা-উল্লাসে দেশবাসীর সর্ব্বনাশের দিন ডাকিয়া আনিতেছে।

বাংলায় যুদ্ধোত্তর সমস্যা

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, বাঙালীর বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনের সমস্যাও ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বস্ত্রসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণের দৌলতে জনসাধারণের নাগালের বাহিরে, অপকৃষ্ট খাদ্য চতুর্গুণ মূল্যে সংগ্রহ করিয়া বাঙালী শুধু কঙ্কালসার দেহটি জীবিত রাখিতে পারিতেছে। নিজের ও সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা ভাবী বংশধর বাঙালীকে দেহে মনে ও আত্মায় দুর্ব্বল করিয়াই তুলিবে। ইহার প্রতিকার-চিন্তায় বাংলার জননায়কদের এখন হইতেই মন দেওয়া দরকার।

যুদ্ধ থামিবার পর এ আর পি, সাপ্লাই আপিস, কারখানা, কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতিতে যাহারা চাকুরী করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল বা সংসারে সাহায্য করিতেছিল তাহাদের অনেকেরই কাজ গিয়াছে। যাহাদের যায় নাই তাহাদেরও শীঘ্রই যাইবে। নোটিশ প্রায় সকলেই পাইয়াছে। আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে বাংলায় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বেকার-সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করিবে। জীবনযাত্রার ব্যয় কমে নাই, সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্দ্ধারণের সময় এক এক ধাপে চারি গুণ, পাঁচ গুণ করিয়া দাম বাড়াইয়াছেন। কমাইবার সময় এই অসম্ভব বর্দ্ধিত হারের টাকায় দুই বা চারি পয়সা হারে অতিশয় ধীরে ধীরে দাম কমাইতেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইহাতে দুর্দ্দশার চরম তো হইবেই, দরিদ্রের অবস্থাও কম মারাত্মক হইবে না।

যুদ্ধে যাহারা যোগদান করিয়াছিল, সরকার সাধ্যমত গত

কয় বৎসরে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এখন সৈন্যদল ভাঙিয়া দিবার সময় তাঁহারা শুধু পদচ্যুত সৈন্যদের অসন্তোষ নিবারণের কথাই চিন্তা করিতেছেন। যে সব যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তার সবগুলিরই মূলকথা পদচ্যুত সৈন্যদের বিলি-ব্যবস্থা। ইহার জন্য প্রথমেই কতকগুলি ইংরেজ ও ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর চাকুরী হইয়াছে। তারপরেই সৈন্যদের ব্যবস্থা। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই পদচ্যুত সৈন্যদের অসন্তোষ নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা ছড়ানো হইতেছে এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। বিভিন্ন স্কীমের নামে ঐ সব স্কীম ব্যর্থ হইতে বাধ্য জানিয়াও উহাতে টাকা ঢালিয়া পদচ্যুত সৈন্যদের খুশী রাখা হইতেছে। পঞ্জাবে ইহা সুরু হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য স্থানেও শীঘ্রই হইবে ইহা মনে করা অন্যায় নয়। বাংলা-সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উহাতে দেশের প্রকৃত অধিবাসী যাহারা সেই কৃষককুলের মূল অভাব দূর করিবার প্রস্তাব বিশেষ কিছুই নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলার পরিণতি

আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী ত্রয়ের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল গঠন করিয়া গবর্মেণ্ট যে মামলা চালাইতেছিলেন তাহার শেষ হইয়াছে, রায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। ক্যাপ্টেন শাহ্‌নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সায়গল ও লে: ধীলনের প্রতি সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে কোর্ট মার্শাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতি উহা মকুব করিয়া দিয়াছেন। যে কোন অবস্থাতেই কোন সৈনিকের পক্ষে আনুগত্য পরিহারপূর্ব্বক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অতি গুরুতর অপরাধ এই যুক্তি দিয়া কোর্ট মার্শাল ইঁহাদিগের প্রতি সেনাদল হইতে পদচ্যুতি ও বাকী মাহিনা প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। প্রধান সেনাপতি এই আদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই মামলা লইয়া সারা ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন হইয়াছে। কলিকাতার ন্যায় অন্যান্য বহু স্থানে মামলার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ, সভা ও শোভাযাত্রা হইয়াছে। অনেক স্থানে পুলিসের লাঠি ও গুলী চলিয়াছে, অনেকে আহত ও নিহত হইয়াছে। ইঁহাদের মুক্তিতে দেশবাসী মনে করিতে পারে যে দেশের জাগ্রত জনমতের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, সাম্রাজ্যবাদী গবর্মেণ্ট ইহা মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের ছাত্রছাত্রীরা দেখাইয়া দিয়াছে যে জাতি এখনও একেবারে মরে নাই, জাতির অন্তরের প্রাণশক্তি, যৌবন শক্তির স্পন্দন এখনও অবশিষ্ট আছে।

রায়দানকালে কোর্ট মার্শাল বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের" বিরুদ্ধে, State-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা, "রাষ্ট্রের" নিকট যে আনুগত্য আছে তাহা পরিহার করা অপরাধ। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম অপরাধকেই এত দিন রাজদ্রোহের রূপ দেওয়া হইত, এই মামলায় উহা বদলাইয়া রাষ্ট্রদ্রোহের আকার দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষ রাষ্ট্র নয়, ইংরেজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষকে বিশ্বজগতে রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াইলেও ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হইয়া যায় না। ভারতবর্ষের সৈন্যদল ভারতীয় করদাতাদের প্রদত্ত অর্থ হইতে বেতন পায় ইহা সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত মনিব ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট। যুদ্ধের প্রারম্ভেই ভারতীয় সৈন্য ভারতের বাহিরে প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দল উহার প্রতিবাদ করেন এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট উহাতে কর্ণপাত না করায় পরিষদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। কোন "রাষ্ট্রের" কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকে এই ভাবে উপেক্ষা করিয়া সেই "রাষ্ট্রের" সৈন্যদলকে কোন বিদেশী শক্তি নিজের যুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিত না ইহা নিশ্চিত। যুদ্ধের পরেও ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিছক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় নিজেদের প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্য কাজে লাগাইতে বিরত হয় নাই।

ভারতবর্ষ রাষ্ট্র নয়, ভারতবর্ষ বর্তমানে ইংরেজের অধীনস্থ দেশ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীরা ভারতবর্ষের লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিয়া "রাষ্ট্রের" স্বার্থবিরোধী বা আনুগত্যনাশসূচক কোন কাজই করেন নাই।

মুক্তিলাভের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়কত্রয় বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। তিন জনেই দেশের মুক্তি-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন শাহ্‌নওয়াজ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যে মুহূর্ত্তে ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করিবে সেই মুহূর্ত্তে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয়েরা ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে। এই ভারতীয়েরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হইলেও নেতাজীর নেতৃত্বে সাড়ে তিন বৎসর কাল পরস্পর ভাইয়ের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ থাকিয়া একত্র লড়াই করিয়াছে। তাহাদের ভিতর হইতে ব্রিটিশের যাবতীয় প্রভাব, যাবতীয় কুশিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।"

বাহির হইতে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, গান্ধীজীর নির্দ্দিষ্ট পথে ভিতরের সংগ্রামের দ্বারা দেশের লুপ্ত স্বাধীনতা অর্জ্জনে তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়া মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের সহায়ক হইবেন, সমগ্র দেশবাসী আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের উপর এই ভরসা রাখে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বাঙ্গালোর অধিবেশনের প্রধান সভাপতি মি: আফজল হোসেন ভারতীয় কৃষি খাদ্য ও জনসমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। গত দুর্ভিক্ষের পর হইতে দেশের কৃষি ও খাদ্যসমস্যা লইয়া আলোচনা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে সেই হারে খাদ্য উৎপাদন কিরূপে করা যায় ইহা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা এবং গবর্মেণ্ট বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। উপদেশ ও সৎ-পরামর্শ যথেষ্ট পরিমাণেই বর্ষিত হইতেছে ইহার জন্য উচ্চপদও অনেকগুলি সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু কৃষকের আসল সমস্যা যাহা ছিল তাহাই রহিয়া গেল। সেদিকে বৈজ্ঞানিক অথবা গবর্মেণ্ট কেহই যথার্থ মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন না।

মি: আফজল হোসেন প্রথমেই বলিয়াছেন যে কৃষি ও খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গেলে সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ নির্ভুল হওয়া

দরকার। তিনি দুঃখ করিয়াছেন আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থা নাই। শুধু নাই তাহা নয়, আমাদের দেশে উহার অপপ্রয়োগের যে দৃষ্টান্ত মেলে পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে তাহার তুলনা আছে কি না জানি না। গত দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাংলা সরকার এবং ভারত-সরকারের প্রতিনিধির দল সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে 'প্রমাণ' করিয়া দিয়াছিলেন যে বাংলায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মজুত চাউল অনেক আছে, ১৯৪৩ এর অজন্মায় কিছু কম চাউল উৎপন্ন হইলেও ভয়ের কারণ নাই, চাউলের অভাব হইবে না। দুর্ভিক্ষ কমিশনের সদস্যরূপে মিঃ আফজল হোসেন সংখ্যাতত্ত্ব লইয়া সরকারী কারসাজী কি ভাবে চলিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন এবং রিপোর্টে তাঁহার পৃথক মন্তব্যে এ সম্বন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন। বাংলাদেশের সাধারণ লোকে অনুমান করিয়াছিল যে দুর্ভিক্ষের বৎসরে পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ধান বিশেষ কিছু থাকিবে না এবং ঐ বৎসর এক-তৃতীয়াংশ ধান কম উৎপন্ন হইবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মোটা বেতনভোগী শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয়বিধ সরকারী বিশেষজ্ঞের হিসাব সর্বৈব ভুল, নিরক্ষর কৃষকের ধারণাই সত্য। ঘাটতির পরিমাণও ইঁহাদের আন্দাজী হিসাবের সঙ্গেই মিলিয়া গেল। মিঃ আফজল হোসেন দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে তাঁহার স্বতন্ত্র মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "ধানজমির, ফসল উৎপাদনের এবং খোরাকী ধানের পরিমাণ, এমন কি জনসংখ্যার হিসাব সম্বন্ধেও যে-সব সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আদৌ অমূলক নয়। স্বীকার করিতেই হইবে যে ধানজমির পরিমাণ অত্যন্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে, একর প্রতি কত ধান উৎপন্ন হওয়া সম্ভব তাহার হিসাবও ভুল। ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচারের হিসাবও নির্ভরযোগ্য নয়। যেখানে সংখ্যাতত্ত্বের এই শোচনীয় অবস্থা, সেখানে ব্যাপার কি দাঁড়াইবে তাহার হিসাব পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এরূপ হিসাবের যাথার্থ্য অন্যান্য উপায়ে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করাও অসম্ভব।" কমিশন তাঁহাদের মূল রিপোর্টেও সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যন্ত অল্প বেতনের এবং সাধারণত অস্থায়ী অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদের দ্বারা যে ভাবে মূল তথ্য সংগৃহীত হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব একমাত্র এ দেশের বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের পক্ষেই সম্ভব।

দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মিঃ আফজল হোসেন ভাল ভাল উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু পথ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে দৈনিক "ভারতে"র মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"ডাঃ হোসেন আমাদের জানাইয়াছেন যে, দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন একদশমাংশ বাড়াইতে হইবে এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ফল দেড়গুণ, শাকসব্জী দ্বিগুণ, তেল সাড়ে তিনগুণ এবং দুধ মাছ মাংস ও ডিম চারগুণ বেশী উৎপাদন করিতে হইবে। পরামর্শ সমীচীন সন্দেহ নাই, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব তাহাও নিঃসন্দেহ, কিন্তু উহা ঘটিবে কিরূপে ? দেশের কৃষির মূল সমস্যাগুলি দূর না হইলে ইহার একটিরও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ফসল বাড়াইতে হইলে চাই ভাল বীজ, সার ও কৃষিঋণ। এই তিনটির একটিও কৃষকের প্রাপ্য নয়। বীজ সরবরাহের নামে সরকারের কতকগুলি পোষ্যের অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়, অত্যন্ত চড়া দরে সার বিক্রয় করিয়া লাভ করে ব্রিটিশ কোম্পানী, চাষী থাকে যে তিমিরে সেই তিমিরে। সমবায় সমিতিগুলির অপমৃত্যুর পর চাষীর কৃষিঋণ প্রাপ্তির পথ বন্ধ, কৃষিঋণের নামে সরকার যে টাকা যে ভাবে বিতরণ করেন তাহাতে ঋণ খাড়ে কাজ হয় না। কৃষিঋণ গ্রহণের জন্য সদরে যাতায়াত, হোটেল খরচ, সর্বোপরি টাকা বাহির করিবার জন্য ঘুষের কড়ি গণিয়া দিবার পর আসল কাজের জন্য উদ্বৃত্ত অল্পই থাকে। কৃষকের এই সব মূল ও প্রাথমিক সমস্যা দূর না হইলে সরকারী দপ্তরখানায় বা বৈজ্ঞানিকের বৈঠকে বসিয়া পরিকল্পনা ফাঁদিলে সুরাহা কিছুই হইবে না।"

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন ছিল, বাঙালী যখন ইংরেজের পদানত হয় নাই, তখনকার বাঙালী ভাল খাইতে ও ভাল পরিতে পারিত। শুধু তাই নয়, বাঙালীর তৈরি কাপড়ের পোষাক পরিয়া সমাজে চলাফেরা করাই ইংরেজ মহিলাদের ফ্যাসান ছিল। বাংলার মসলিন ও মুর্শিদাবাদের রেশম ইউরোপের লোভনীয় বস্তু ছিল। ব্রিটেনে বাংলার কাপড় আমদানী আইনের জোরে বন্ধ করিয়া ইংরেজকে তাহার বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। বাঙালীর অবস্থা তখন এত সচ্ছল ছিল যে বিদেশজাত কোন ব্যবহার্য্য দ্রব্যই বাংলায় আনিতে হইত না। পণ্য বিক্রয় করিয়া বাঙালী সোনা রূপা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিত না। ইংরেজ আগমনের পর বাঙালীর উপার্জনের সকল পন্থা রুদ্ধ হইয়াছে,স্বাধীন বাংলার সেচ-ব্যবস্থা ইংরেজের শাসনে নষ্ট হইয়া তাহার কৃষিও সর্বনাশ হইয়াছে। আজ কৃষিসম্বল বাঙালীর একমাত্র ভরসা বরুণদেব—অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি তো দূরের কথা, দেরিতে বর্ষা নামিলেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। স্বাধীন বাঙালীর ভোজনবিলাসিতা ও উত্তম ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহের দৃষ্টান্ত বাংলা-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে আছে, ইহার কিছু পরিচয় আমরাও দিয়াছি। বাঙালীর অন্নবস্ত্র সংস্থানের ভার ইংরেজের হাতে যাওয়ার পর হইতে বাঙালীর ধ্বংসের ও সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত হইতেছে।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য দর্শনে মার্কিন সাংবাদিকের সহানুভূতি

ভারতবর্ষ, চীন ও ব্রহ্মদেশে ঘুরিয়া জনৈক মার্কিন সেনা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যাহা দেখিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া তিনি তাহা নিউ ইয়র্কের ডেলী ওয়ার্কার নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ ইংরেজ ও আমেরিকান যুবক আসিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের অবস্থা সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া স্বজাতিদের তাহা জানাইয়াছেন। আলোচ্য রচনাটি তাহারই একটি নিদর্শন। উহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"ভারতের জনগণের যে দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা অবর্ণনীয়। পৃথিবীর কোনও দেশে যে এরূপ অবস্থা থাকিতে পারে, তাহা কেহ স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, বিংশ

শতাব্দীতেও যে এই অবস্থা থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতেও কি রকম লাগে!

"আমি সমগ্র আসাম, বোম্বাই ও কলিকাতায় ঘুরিয়া নিদারুণতম দারিদ্র্যকে দেখিয়াছি। অনাহারে মানুষকে মৃত ও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পল্লী অঞ্চলে দেখিলাম, মহামারীতে লোক মরিতেছে, তাহাদের দেহ পচিতেছে। মানবিকতার দিক দিয়া এই মানুষগুলিকে হাসপাতালে দেওয়া উচিত ছিল।

"ভারতীয়দের সহিত যাহাতে আমরা মিশিতে না পারি, তাহার জন্য আমাদের উপরে নিরাপত্তা-রক্ষার আইন ও স্বাস্থ্য-হানির ওজর চাপানো হইয়াছে। অবশ্য স্বাস্থ্যহানির সম্পর্কে ওজর মোটেই ভিত্তিহীন নহে। ভারতের অধিকাংশ লোকের মুখে কোনও ভাবের প্রকাশ নাই এবং জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতায় তাহাদের দেহ হইতে যেন সকল উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছে। ভারতের জনগণ গড়পড়তা বাঁচে ২৯ বৎসর মাত্র।

"বইয়ের দোকানে তাকগুলি দেখা যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে বইয়ে ঠাসা। তাহারা জানে যে, পৃথিবীতে এমন এক দেশ আছে, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করে না, যেখানে বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতির পটভূমিকায় নিরাপদে ও শান্তিতে একই সঙ্গে বাস করিতেছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সহরের রেল ষ্টেশনে 'আজিকার সোভিয়েট রাশিয়া' নামক আমাদের গ্রন্থখানির অনুরূপ সাময়িক পত্রাদি পাওয়া যায়।

"সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভারতবাসীর জীবন-ধারণের মান যে উন্নততর হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। কারণ ইহাতে শ্রমশিল্পবিস্তার এবং দেশের অব্যবহৃত সম্পদের সদ্ব্যবহার হইবে, যাহা এখন মোটেই নাই।"

ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রের অন্যায় প্রচারকার্য্য

কিছুদিন যাবৎ আমরা লক্ষ্য করিতেছি ভারতবর্ষের বড় বড় সমস্যা লইয়া ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে সরাসরি মত প্রকাশ না করিয়া চিঠিপত্রের স্তম্ভে উদ্দেশ্যমূলক চিঠি ছাপাইয়া বিবিধ প্রকারে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। দিনকাল বুঝিয়া এই সতর্কতা স্বাভাবিক, কিন্তু শিখণ্ডীর মত আড়াল হইতে এইপ্রকার শর সন্ধান দেশের লোক ধরিতে পারিতেছে এটা তাঁহাদের জানা দরকার।

আপাততঃ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রথম, আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্রয় মুক্তিলাভ করিবার পর কোন কোন পত্রে লেখা হইয়াছে যে, 'উইলিয়াম জয়েস বা জন আমেরীর যখন দেশদ্রোহী বলিয়া ফাঁসী হইয়াছে, তখন ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল কেন?' জন আমেরী বা জয়েস নিজের দেশের শত্রুর সহিত যোগ দিয়া দেশের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে, অতএব ইহারা দেশদ্রোহী। আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করিয়াছে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য, দেশের বিরুদ্ধে নয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে ইঁহাদের অপরাধ হইয়াছে কিনা তাহা ইংরেজের বিচার্য্য। কিন্তু ভারতবাসী বুঝে যে ইঁহারা দেশদ্রোহিতা তো করেনই নাই, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জ্জন করিতেই ইঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই জন্যই ভারতবাসী ইঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এদেশের বিলাতী সংবাদপত্র-সমূহের বিরোধিতা নূতন নয়। স্বাধীনতার কথা লিখিতে গিয়া দেশী সংবাদপত্রগুলি পদে পদে বিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লিখিয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলির গায়ে আঁচড়টি মাত্র লাগে নাই। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের একটি কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। রমেশচন্দ্র সিভিলিয়ান ছিলেন, এবং তাঁহার রাজভক্তি সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ইংরেজেরা অনেকেই প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে কোন কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, দেশবাসীও তাঁহাকে কংগ্রেস-সভাপতির পদে বৃত করিয়া সম্মানিত করিতে দ্বিধা করে নাই। দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন, এ দেশে প্রেস আইন নামে যে আইন আছে—যাহা দেশবাসীর প্রতিই প্রযুক্ত হয়, বিদেশী উহার কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—তাহা প্রবর্ত্তনের সময় দেশবাসী তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের শ্বেতাঙ্গ সভ্য অনেকেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এমন কি কয়েকজন উচ্চপদস্থ 'শ্বেতাঙ্গ' সিভিলিয়ানও ইহার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভারতের যে সকল সংবাদপত্রের বিলাতী মালিক সেগুলি সমস্বরে এই ভারতীয়দিগের স্বাধীনতা লোপের কার্য্যাবলীর অনুমোদন করে।

দ্বিতীয় বিষয়, নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের উদ্যোক্তৃদের প্রতি কটাক্ষপাত। ষ্টেটসম্যানে নামধামহীন একটি পত্রে মহিলা-সম্মেলনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাদিগকে দেবদাসী ব্যবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে সব কুপ্রথা আছে ইহা তাহার অন্যতম, তবে মাদ্রাজ ছাড়া আর সর্ব্বত্রই ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে। আবে দুবোয়া হইতে সুরু করিয়া ক্যাথারিন মেয়ো পর্য্যন্ত অনেকেই এই সব কুপ্রথার কথা প্রচার করিয়া ভারতবাসীকে বিশ্বসমাজে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবে দুবোয়া ভুল বুঝিয়া তাহা সংশোধন করিয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজেরা সেই সংশোধিত অনুবাদ প্রকাশিত হইতে দেন নাই। তাঁহার ভুল বইখানিই প্রচারিত রাখিয়াছেন এবং সুবিধামত উহা হইতেই "প্রমাণ" উদ্ধৃত করেন। পত্রলেখিকা ব্রিটিশ মহিলাটির প্রচারকার্য্য নূতন নয়, আমরা ইহাতে বিস্মিতও হয় নাই। লেখিকার জানা উচিত, ভারতবর্ষে ইম্‌মরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট (Immoral Traffic Act) নামে একটি আইন আছে। ইনি যদি বা না জানিতে পারেন, ষ্টেটসম্যান-সম্পাদক ইহা অবশ্যই জানেন। লেখিকা সময়মত নিকটবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঘটনাটি জানাইলে তাহাতে সুফল হইবার আশা ছিল, অবশ্য কুৎসা প্রচার উহার দ্বারা হইত না। যে ধরণের প্রথার বিরুদ্ধে লেখিকা আপত্তি জানাইয়াছেন সেই সব কুপ্রথা বন্ধ করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোক্তৃরা তাহার অন্তর্ভুক্ত, ব্রিটিশ মহিলাটির ইহা জানা উচিত।

ব্রিটিশ মহিলাটির এই কুৎসা প্রচারে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ নাই এমন নয়। নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের গত 'অধিবেশনে উহার সভানেত্রী শ্রীমতী হংস মেহ্‌তা উইমেন্স অক্সিলিয়ারী

কোর সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই নারীবাহিনীতে যে সব দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে প্রশ্রয় দানের প্রতিবাদ তিনি করিয়াছেন এবং অভিযোগ করিয়াছেন যে এই বাহিনীতে দুর্নীতি এত বিস্তার লাভ করিয়াছে যে কতকগুলি জারজ সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইংরেজ মহিলাদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় নারীবাহিনীতে (W.A.C.I.) দুর্নীতির প্রশ্রয় দানের অভিযোগে ব্রিটিশ মহিলার ক্রুদ্ধ হইবার কারণ হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু ষ্টেটসম্যান ইহা ছাপিয়া কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন? শ্রীমতী হংস মেহটার অভিযোগের পর উচিত ছিল দুর্নীতির প্রতিকারে ব্রতী হওয়া। তাহা না করিয়া ইঁহারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের দ্বারা স্বীয় দুষ্কর্ম্ম ঢাকিবারই চেষ্টায় অগ্রণী হইয়াছেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘে সর্ যদুনাথের অভিভাষণ

গত ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও কর্ম্মীদিগের সভা শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন সর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সর যদুনাথ তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অনেক কথাবার্তা হয়। আমি লক্ষ্য করিতাম যে, তাঁহার হৃদয়ে একটা গভীর ক্ষোভ ছিল এই বলিয়া যে, বর্তমান জগৎসভায় ভারতবর্ষ অজ্ঞাত অখ্যাত। সত্য বটে প্রাচীন যুগে এই আর্যভূমি জগৎকে অতুলনীয় অমূল্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপহার দিয়াছিল কিন্তু আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারত বিদেশ হইতে শুধু লইয়াছে, কিছু মূল্যবান দান জগৎকে দিতে পারে নাই।

"বর্ত্তমান সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রণালীকে তিনি ষ্টীম-রোলারের মতন মনে করিতেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়া চলিলে সব ছাত্র চাপে পিষিয়া একাকার হইয়া যায়, প্রতিভা স্ফুরণের বা ব্যক্তিগত পার্থক্যের পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়। সব ছাত্র এক ছাঁচে ঢালা মধ্যম শ্রেণীর লোক হইয়া জীবন কাটায়, ইহাদের মধ্যে কেহই মৌলিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় না। শিক্ষাযন্ত্রের চাপে এবং এক ছাঁচের মাল প্রস্তুত করিবার চেষ্টার ফলে ছাত্রদের কোমল মনোবৃত্তিগুলি অঙ্কুরেই মরিয়া যায়। সাহিত্য কলা প্রভৃতির প্রকৃত রস সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ত লোপ পায়ই, নিজে রস আস্বাদন করাও জীবনে ঘটে না।

"তাহার উপর ডে-স্কুলে আসা যাওয়া করিলে অথবা পুলিস ব্যারাকের মত হোস্টেলে বাস করিলে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হইতে পারে না। স্কুলটি যদি প্রকৃত শিক্ষার আদর্শে চালিত হয় এবং প্রাচীন আশ্রমের মত শিক্ষক ও ছাত্রেরা একত্র এক পরিবারের মত বাস করিবার নিয়ম মানিয়া চলে তবেই এই দুটি মহান উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

"মা যেমন সন্তানকে অহরহঃ বুকে রাখিয়া রক্ষা করেন, তাহার দেহমনকে গড়িয়া তোলেন—ঠিক সেই মত এই আশ্রম রবীন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন ছাত্রদের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, ইহাই সর্বপ্রধান লাভ, ইহাই জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা যে, তাহারা রবীন্দ্রনাথকে কত বৎসর ধরিয়া পিতা, বন্ধু, শিক্ষক রূপে পাইয়াছিল; তাঁহার সংস্পর্শে প্রকৃত মানুষ হইবার অতুলনীয় সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

"বিশ্বভারতীর পুরাতন ছাত্রদের অন্তর এখানে বদ্ধমূল হইয়াছে, কিন্তু তাহারা নিজ কাজে বাহিরে কর্মজগতে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত। আমি প্রার্থনা করি যে তাহারা এই আশ্রমের ও বাহিরের জ্ঞানক্ষেত্রের মধ্যে যোজক হইয়া নানাস্থান হইতে পণ্ডিত, উপদেষ্টা, কর্মী আনিয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করিতে, পূর্ণাঙ্গ করিতে সহায়ক হউক। অর্থবলই একমাত্র বল নহে, প্রধান বলও নহে। জগতে মানুষই বড়—এই মানুষ আনিয়া দাও।"

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সপ্রু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলি রিপোর্ট-প্রণেতারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সবগুলির সহিত অনেকের মতের মিল না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি ও অভিমত ধীর ও স্থির ভাবে সকলেরই বিবেচনা করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের সর্বপ্রধান সমস্যা বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। ইহা লইয়া কমিটি যথেষ্ট আলোচনা করিয়া যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর। শিল্প, বাণিজ্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক আদান-প্রদানের দ্বারা সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছিল। চিরকাল হিন্দু-মুসলমান বিরোধে প্রবৃত্ত থাকিতে পারে না বুঝিয়া এই দুই সম্প্রদায় উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে ও একে অপরের সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ক্ষমতাশালী ও সাম্রাজ্যলোভী বিদেশীর আগমনে এই ক্রমবিবর্তনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই কৃত্রিম বাধার জন্য হিন্দু-মুসলমান-মিলন-প্রচেষ্টা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই।

কমিটি রায় দিয়াছেন, "পৃথক নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে জীবন্ত অভিশাপ। ইহা রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অথবা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। পঞ্জাব ও বাংলার সম্বন্ধে কমিটি বলিয়াছেন যে, জাতি সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে বিচার করিলে মুসলমানদের পৃথক জাতীয়তা স্বীকৃত হইতে পারে না। ধর্ম্মই যদি পৃথক জাতীয়তা ও দেশ বিভাগের ভিত্তি হয় তাহা হইলে অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ও পৃথক জাতীয়তা দাবি করিতে পারে।" ধর্ম্মের ঐক্যই যদি জাতি ও দেশ গঠনের ভিত্তি হয় তাহা হইলে মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, আরব, তুরস্ক, ইরাণ, আফগানিস্থান প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যসমূহই আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে বজায় থাকে কেন? ধর্ম্মই যদি একজাতীয়ত্বের ভিত্তি হয় তবে কি তুর্কী, আরব, পারসিক, আফগান ও বাঙালী মুসলমানকে এক জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

পাকিস্থান সমস্যা কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে পাকিস্থানের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান

ত হইবেই না বরং আরও নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়া শুধু দেশরক্ষার কথা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে দেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিলে তাহাতে উভয়ের নিরাপত্তাই ব্যাহত হইবে। কমিটি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সৌকর্য্যের দিক হইতে ভারতবর্ষ বিভাগ অন্যায় উপদ্রব ব্যতীত আর কিছু নয়।"

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্য অথবা প্রদেশ বিশেষের ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে সপ্রু কমিটি তাহাতে ঘোর আপত্তি জানাইয়াছেন। পাকিস্থান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবির পরিণাম কি দাঁড়াইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া কমিটি বলিতেছেন,

"অবস্থা এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে, মিঃ জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনা পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু ও শিখ, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা কেহই মানিয়া লয় নাই। রাজাজীর প্রস্তাব মিঃ জিন্না যেমন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু ও শিখগণও তেমনি বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মিঃ জিন্নার অখণ্ড পাকিস্থান এবং রাজাজীর কিয়দাংশিক প্রস্তাব কোনোটাই বিভিন্ন দলের মতৈক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং সর্ব্বদাই ইহার প্রবল বিরুদ্ধতা হইবে। মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে যে, পাকিস্থান পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে যে দুইটি মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদের বিরাট্ হিন্দুস্থানের অন্তর্বর্ত্তিতায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াই থাকিতে হইবে। এমন একটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র কি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে? তাহাকে কি হিন্দুস্থানের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে না?

অতঃপর কমিটি অর্থনৈতিক সাব-কমিটির তিনজন সদস্যের দুই জন ডাঃ মাথাই ও সর হোমি মোদির অভিমতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যে অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজন এবং আধুনিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী যে নিরপত্তা-ব্যবস্থা, তাহা কেবল হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের পারস্পরিক সহযোগিতায়ই সম্ভব কিন্তু উক্ত সাব-কমিটির অপর সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মতে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে পাকিস্থান আদৌ সম্ভাব্য পরিকল্পনা নহে।

সপ্রু কমিটি ও যুক্ত নির্ব্বাচন

যুক্ত নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তার প্রতিই সপ্রু কমিটি সবচেয়ে বেশী জোর দিয়াছেন। আমরাও মনে করি যে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় অবিলম্বে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবেশলাভের পর হইতে যুক্ত নির্ব্বাচনই ছিল রীতি। সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি কায়েম করিবার জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা ধীরে ধীরে নানা অছিলায় পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনের দ্বারা হিন্দু মুসলমান উভয়কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছেন। পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যে লাভ হইয়াছে আর কোন কৌশলে তাহা হয় নাই। পৃথক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কমিটির অভিমত এই:

"যে পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা প্রারম্ভে একটি সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইত আজ তাহাই মীমাংসিত সত্যের রূপ লইয়াছে। এখন যুক্তি দেখানো হইতেছে যে, কোন মুসলমান প্রার্থীর নির্ব্বাচনে যদি হিন্দুর হাত থাকে তাহা হইলে সে কখনও তাহার সম্প্রদায়ের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টও অপর পক্ষে, এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন এবং এই কথাই তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা সঙ্কুচিত করিলে মুসলমানগণ তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মনে করিবে। তথাপি মুস্লিম নেতৃবৃন্দ ১৯৩২ সাল পর্য্যন্তও যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের যে দ্বিধাপূর্ণ মনোভাব তাহা এই সঙ্গত সন্দেহেরই উদ্রেক করে—তাহারা ব্রিটিশ শাসনকে কায়েম রাখিবার জন্য গতানুগতিক ভেদনীতিরই পক্ষপাতী।"

কমিটি বলিয়াছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকুক কিন্তু নির্ব্বাচক মণ্ডলী যৌথ ভিন্ন পৃথক হইতে পারিবে না। ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের বনিয়াদ যৌথ নির্ব্বাচনে হইলে দেশের বহু সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে দূরীভূত হইবার উপায় হইবে। অনুন্নত হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের কথাও কমিটি বলিয়াছেন। শাসনতন্ত্র রচনায় ইঁহাদের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভাবী শাসনতন্ত্রে ইঁহাদের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার আইনানুগ উপায়ে রক্ষা করিবারও বন্দোবস্ত থাকিবে।

গণ-পরিষদ সম্বন্ধে কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে উহাতে বর্ণ হিন্দু ও মুসলমানের সমান আসন থাকিবে। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিত্বের যে অনুপাত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং এ যাবৎকাল ইংরেজের আওতায় মুসলমানেরা যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কমিটির প্রস্তাবিত বর্ণ হিন্দু মুসলমানের অনুপাতে তাহার তুলনায় খুব বেশী অদলবদল হইবে না। যৌথ নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে এই অনুপাতেও আমাদের ভীত হওয়ার হেতু নাই, কারণ দেশের সমস্যা ও প্রয়োজন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে না দেখিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থবিবেচনা করিয়া যে সব প্রতিনিধি গণ-পরিষদে আসন গ্রহণ করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে হিন্দু মুসলমানরূপে দেখিব না, দেশবাসীর নিকট তাঁহারা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভারতবাসীরূপেই প্রতীয়মান হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু যেমন মৌলানা মহম্মদ আলি, ডাঃ আনসারী বা মৌলানা আজাদের নেতৃত্ব নত মস্তকে মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তেমনি যৌথ নির্ব্বাচক মণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিদেরও তাহারা নিজেদের ও দেশেরই প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

আমাদের ধারণা, যৌথ নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে এবং ত্যাগ যোগ্যতা ও জনসেবার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইলে মুসলমান বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণেরও প্রয়োজন থাকিবে না। ইহা অবাস্তব কল্পনা নয়, সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন

উদয়পুরে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিশেষ-ভাবে দেশীয় রাজ্যসমূহের নয় কোটি প্রজার অবস্থা আলোচনার জন্ম এই সম্মেলন আহুত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের অপর ৩০ কোটি লোকের ভাগ্যের সহিত এই নয় কোটি লোকের ভাগ্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, পণ্ডিতজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে ইহা সর্বাগ্রে স্মরণ করাইয়া দেন। ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভারতবাসী কিছুতেই থাকিতে পারিবে না, তাহাদিগকে এক অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে। দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের জনসাধারণের সহিত পা মিলাইয়া চলিতে চাহিতেছে, ১৯৪২ সালে ও তাহার পরে তাহারা প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে। কিন্তু দেশবাসীরা অগ্রসর হইলেও তাহাদের প্রভুরা অচল রহিয়াছেন। প্রাচীন স্বৈরশাসন-পদ্ধতি বজায় রাখিবার জন্ম তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টও ভারতে তাঁহাদের প্রাধান্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ম দেশীয় রাজ্যের অধিপতিদিগকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শাসনপদ্ধতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আজও ইহারা ব্যক্তিগত ও বংশগত প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

পণ্ডিতজী বলেন, দেশীয় রাজ্যের অধিপতিদের উপলব্ধি করা উচিত যে ভারতবর্ষ বিরাট্ পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। আর অধিক কাল তাঁহারা বিদেশী শক্তির আশ্রয়ের অন্তরালে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। বিদেশী শক্তির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করিয়া এবার প্রজাবৃন্দের উপরেই তাঁহাদের নির্ভর করা উচিত। যে সব দেশীয় রাজ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে না, প্রতিবেশী প্রদেশের সহিত তাহাদের যুক্ত হওয়া উচিত। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের হুকুমে পশ্চিম ভারতের কতকগুলি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য বড় রাজ্যের সহিত যুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। পণ্ডিত জবাহরলাল ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য একত্র হইয়া বড় রাজ্য গঠন তাঁহার মতে সঙ্গত নহে। ইহাতে রাজ্যের মূল ও প্রাচীন শাসনপদ্ধতিই বজায় থাকে, ইহার পরিসর বাড়ে এই মাত্র। ইহার ফল এই হয় যে, ছোট ছোট রাজ্য-গুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ভারত সরকার যে সব অসুবিধা ভোগ করেন সেগুলি দূর হয় কিন্তু ব্রিটিশ ভারত হইতে উহা সমান ভাবেই বিচ্ছিন্ন থাকে। পণ্ডিতজীর অভিপ্রায় বড় রাজ্য-গুলি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির সহিত সমান তালে অগ্রসর হউক আর ছোট রাজ্যসমূহ পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির সহিত যুক্ত হইয়া দেশের সর্ববিধ প্রগতির ফল ভোগ করুক। গণতান্ত্রিক গবর্মেণ্টে রাজারা নেতারূপে বিগুমান থাকিলে আপত্তির কোন কারণ থাকে না।

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের মূল নীতি ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিত জবাহরলাল বলেন, "দেশীয় রাজ্যসমূহে আমরা দায়িত্ব-শীল গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। আমরা চাই দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন ভারতের অংশরূপে অবস্থান করুক। ভারতীয় ফেডারেশনের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তারতম্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাদৃশ্য থাকা সঙ্গত। ভারতবর্ষের অংশবিশেষ স্বাধীন এবং অংশবিশেষ পরাধীন থাকিতে পারে না।"

কংগ্রেসী আমলে মুসলিম স্বার্থের বিপদ সম্বন্ধে মিঃ ফিলিপ্‌সের উক্তি

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত মিঃ ফিলিপ্‌স অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের জন্ম ভারতবাসীর আগ্রহ ঐকান্তিক ইহা তিনি বুঝিয়া-ছিলেন এবং এই সত্য কথা বলিবার জন্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। রুজভেল্টকে প্রদত্ত তাঁহার একটি রিপোর্ট আমেরিকান সাংবাদিক ড্র্ পিয়ার্সন প্রকাশ করিয়া দেওয়ার পর যে আন্দোলন হইয়াছিল এবং সেই সময়ে চার্চিলপন্থী ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ হইয়া পড়িবার পর মিঃ ফিলিপ্‌সের আর ভারতে আসা সম্ভব হয় নাই।

সম্প্রতি মিঃ ফিলিপ্‌সের আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিনি মুসলিম লীগের কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। লীগ সম্বন্ধে তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে লীগের অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু কংগ্রেসের রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রভুত্ব করার অজুহাত দেখাইয়া ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের বিরুদ্ধে লীগ যে যুক্তি দেয় তাহাও অচল। ফিলিপ্‌স বিশ্বাস করেন যে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমানই সকল ধর্মের কৃষক ও শ্রমিকদের সহিত যোগ দিবে। বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যেমন ভাবে দেখা যাইতেছে তাহা আর বিদ্যমান থাকিবে না। ভারতীয় রাজনীতির নিরপেক্ষ দর্শক মাত্রেই ইহা বিশ্বাস করেন। মিঃ ফিলিপ্‌স বলিতে চান যে অদূর ভবিষ্যতেই সমস্ত মুসলমান জনসাধারণ সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলিয়া অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিবে না।

লীগের পাকিস্থান দাবির মূল কারণ সম্বন্ধে মিঃ ফিলিপ্‌স বলেন,

"কংগ্রেস রাজত্বে যে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হইবে একথা মুসলিম লীগের নেতারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কয়েক বছরের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হি[illegible] গবর্মেণ্টের ক্ষমতা দখল করিতে পারিবে না। দুই একটি প্রদেশ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশেই তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবে বর্ত্তমান থাকিবে, কেন্দ্রীয় পরিষদেও তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হইবে না। ইহাই হইল মুসলিম লীগের আপশোষ; এই জন্যই মিঃ জিন্না ও অন্যান্য লীগ নেতারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন এবং পাকিস্থান দাবী করেন।"

"কংগ্রেস সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া বসিবে বলিয়া যে মুসলমান জনসাধারণ ব্রিটিশ শৃঙ্খল হইতে মুক্তি চাহে না এ কথার কোন ভিত্তি নাই। অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন সাধিত হইলে মুসলিম লীগেরই ক্ষতি হইবে বেশী। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে একতা পরিদৃষ্ট হয় তাহা কৃত্রিম। অন্য সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মতই মুসলমান ধর্মের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে। পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে মুসলমান ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অল্পাধিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে চেতনাবোধ আসিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বুঝিতে শিখিয়াছে যে ধর্ম এক হইলেই সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণীর স্বার্থ এক হয় না; পক্ষান্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন।"

মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুরই ন্যায় জাতিভেদ আছে, আশরাফ ও আতরাফ মুসলমান সমাজের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান চলে না। বিভিন্ন জাতির মুসলমানের মধ্যে পঙ্‌ক্তি-ভোজনেরও বাধা-নিষেধ আছে। নিম্ন জাতির মুসলমান উচ্চজাতির মুসলমানের গোরস্থানে সমাধি-লাভের অধিকারও পায় না। ১৯০১ সালের সেন্সস রিপোর্টে ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। আমরা ইহা লইয়া পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। ১৯০৫ সালে ছোটলাট সর ব্যামফিল্ড ফুলারের 'সুয়োরাণী' রাজনীতি প্রবর্তনের পর হইতে সরকারী নথিপত্রে মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত জাতিভেদের উল্লেখ বন্ধ হইয়াছে এবং হিন্দুর ভেদগুলিকেই বড় করিয়া দেখানো হইতেছে। পৃথক নির্বাচনের কৌশলের দ্বারা কি ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ঐক্য বজায় রাখা হইতেছে ও হিন্দু-মুসলমানে ভেদ সৃষ্টি চলিতেছে, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী মিঃ ফিলিপ্‌সের চোখে তাহা স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যকারী লীগ নেতাগণকেই দায়ী করিয়াছেন।

কংগ্রেস সম্বন্ধে মিঃ ফিলিপ্‌সের উক্তি

কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে মিঃ ফিলিপ্‌স তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন:

"ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বরাবর ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার অভিপ্রায়েই কংগ্রেস আইন সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্যই কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির উপর কঠোর তত্ত্বাবধান করিত এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবার নিমিত্ত মন্ত্রীসভাগুলিকে আদেশ দিয়াছিল। কংগ্রেস ক্রমশঃই ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর সমর্থন লাভ করিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী হইতেছে দেখিয়াই মিঃ জিন্না অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস দেশের অন্য সমগ্র প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিয়া দিতে চাহে। কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টা সফল হইলে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

"ফ্যাসিষ্ট গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে স্বরাজ লাভ করিয়া যাহাতে ভারতীয়েরা নিজেরা শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারে তাহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। কংগ্রেস যত দিন মন্ত্রিত্ব করিয়াছিল তত দিন তাহার লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা লাভের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করা।

"ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার দিন মিঃ জিন্না মুক্তি দিবস পালনোপলক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করিয়াছিলেন, মুসলিম লীগেরই বিভিন্ন বিবৃতিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বকালে কয়েকটি স্কুলে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনানুযায়ী বনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন এবং উর্দু ভাষা শিক্ষার বিলোপ সাধনের উপর ভিত্তি করিয়াই বলা হয় যে কংগ্রেস মুসলিম সংস্কৃতি বিলোপ করিতে চাহে। রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক বিষয়ে যে অভিযোগ করা হয় তাহার কোন ভিত্তি নাই।

"কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বকালে সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল বলিয়া যাহা বলা হয় মূলতঃ তাহার কোন ভিত্তি নাই। যে কোন কংগ্রেসী প্রদেশের চেয়ে যে সব প্রদেশে লীগ মন্ত্রিত্ব কায়েম ছিল সেই সব প্রদেশেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ বেশী হইয়াছিল। পঞ্জাব এবং বাংলা প্রদেশেই হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামা চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রাবল্য হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য দায়ী অন্য যে কোন কারণের চেয়ে কম দায়ী নহে।"

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্না ও তাঁহার লীগের অভিযোগ যে কতদূর ভিত্তিহীন ভারতবাসী তাহা ভাল করিয়াই জানে। জমিয়ত-উল-উলেমা প্রমুখ মুসলমান ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির পণ্ডিতেরা উহা কোন দিনই বিশ্বাস করেন নাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষদুষ্ট নিরক্ষর মুসলমানদেরই উহা বিশ্বাস করানো হইয়াছে। লীগের এই মিথ্যা প্রচার ব্রিটিশের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে নীরব। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রকৃত সত্য জানিবার সুযোগ পৃথিবীর লোকের ঘটিল, ফিলিপ্‌স রিপোর্টে আমাদের এইটুকুই লাভ।

পাকিস্থান অবাস্তব—মুসলমান নেতার অভিমত

কাশ্মীরের জননায়ক শেখ আবদুল্লাহ্ নিখিল-ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সহ-সভাপতি। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মুসলিম লীগ ও জিন্না সাহেবের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবির সমালোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে কোন ভারতবাসীর পক্ষেই উহা স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ক্ষতি হইবে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি গভীর সন্দেহ বদ্ধমূল হইতেছে ইহা অস্বীকার না করিয়া তিনি বলেন যে এই সন্দেহের কারণ অনুসন্ধান করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব উহা দূর করা সকলের কর্তব্য। তাঁহার মতে লীগ-নেতারা এই ব্যাধির যে প্রতিকার স্থির করিয়াছেন তাহা ইহার প্রকৃত প্রতিকার নয়।

শেখ আবদুল্লাহ্ বলেন যে পাকিস্থান পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে না। যদি মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া গিয়া নূতন এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তাহা হইলেও হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলি হইতে কোটি কোটি মুসলমানকে পাকিস্থানে অপসারিত করা সম্ভবপর হইবে না। মসজিদ, সমাধিমন্দির প্রভৃতি মুসলমান সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদানগুলিকেও কিছু পাকিস্থানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না। তাহার উপর পাকিস্থান অর্থনৈতিক ব্যাপারেও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। হিন্দুস্থানদ্বারা বেষ্টিত পাকিস্থানকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে হিন্দুস্থানের উপর বাধ্য হইয়া নির্ভর করিতে হইবে। পাকিস্থান প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবর্ষ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইবে—তাহার মধ্যে একটি শিক্ষিত ও বিত্তশালী এবং অপরটি অশিক্ষিত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

শেখ আবদুল্লাহ্ বলেন যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য জিন্না সাহেব তাহাদের এক ঈশ্বর, এক কোরান ও এক নবী বলিয়া যে নজীর দেখাইয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়াছে যে, শুধু ধর্ম্মের ভিত্তিতে কখনও কোন জাতি গঠিত হইতে পারে নাই। আরব ও তুর্কিগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও এক জাতীয়ত্ব দাবি করেন না।

ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হইলে তাহারা আর যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিতে চাহিবে না, কারণ তখন উহারা বুঝিবে যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকাই সুবিধাজনক। ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দু-মুসলমান তাহাদের কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অন্যান্য জাতিকেও সাহায্য করিতে পারিবে। চিন্তাশীল মুসলমান জননায়কেরা কত দ্রুত মুসলিম লীগের কলুষিত প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রগতিশীল চিন্তাধারা কিরূপে মুসলমান সমাজকে জাতীয় কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে, শেখ আবদুল্লাহ্‌র মন্তব্য তাহারই পরিচয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ-নির্বাচনে লীগের জয়

কেন্দ্রীয় পরিষদ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ যতগুলি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল তাহার সবগুলি তাহারা দখল করিয়াছে, এই আনন্দে আত্মহারা হইয়া লীগ ভারতব্যাপী বিজয়োৎসব ঘোষণা করিয়াছে। ত্যাগ ও দুঃখময় সংগ্রামের দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার অর্জ্জন করে কংগ্রেস, লীগ তারপর আসিয়া উহাতে মোটা ভাগ দাবি করিয়া বসে ইহাই মুসলিম লীগ রাজনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই "বিজয়োৎসবে"র দ্বারা কোন কোন মুসলমান নেতা ও পত্রিকা প্রমাণ করিতে চাহেন যে লীগের পাকিস্থান দাবির পিছনে সমগ্র 'মুসলিম ভারত' সমবেত হইয়াছে। পাকিস্থানই ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজের একমাত্র কাম্য ও সর্ব্বপ্রথম দাবি। কিন্তু সত্যই কি গত নির্বাচনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে? দৈনিক "আজাদে" লীগের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের হিসাব বাহির করিয়া লীগের দাবি প্রমাণ করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে আমাদের মতে তাহা ভ্রান্ত ত বটেই, মাইনরিটির স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এত দিন যে সব সমস্যা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে তাহা আরও ঘোরালোই হইয়া উঠিয়াছে। হিসাবটি এইরূপ :

প্রদেশ	লীগের পক্ষে ভোট	লীগের বিরুদ্ধে ভোট
বোম্বাই	৫২০৩	৩১০
যুক্তপ্রদেশ	২৩,৪৭০	৬৭১০
মাদ্রাজ	৮৬৭২	৭৬১
পঞ্জাব	৮৫৫৩	১৮০১
বিহার	১২৩৫	২৪৯
সিন্ধু	১৭,১৬৫	৭৮৮৭
আসাম	৪৪৯৭	৬৯৭
বাংলা	৬৭,২৩০	৩৭১৯
	১,৩৬,০২৫	২২,১৩৪
সীমান্ত প্রদেশ	৫৩৮৩	৮১৫৯

এই তালিকায় কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, যে সব স্থানে যৌথ নির্ব্বাচন আছে মুসলিম লীগ সেখানে প্রার্থী দাঁড় করাইতেই সাহসী হয় নাই। সীমান্ত প্রদেশে এবং দিল্লীতে কংগ্রেসী মুসলমান প্রার্থীর বিরুদ্ধে লীগ বেনামে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও হারিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গুণ্ডামির জোরে একমাত্র বাংলা দেশে লীগ যত ভোট পাইয়াছে, সারা ভারতবর্ষে তাহার সমান পাইয়াছে। সরকারী কর্মচারিগণ তলে তলে লীগকে সাহায্য না করিলে এবং পুলিস লীগের গুণ্ডামি বন্ধ করিলে লীগের বিরুদ্ধে বাংলায় যত ভোট হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশী হইত।

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৪১-এর সেন্সাস অনুসারে ৭ কোটি ৯৪ লক্ষ। ইহার শতকরা এক ভাগেরও কম কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মুসলিম ভোটের সংখ্যা ৭ লক্ষের অধিক নহে। ইহার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ৩৬ হাজার লোক পাকিস্থান দাবি সমর্থন করিয়া ভোট দিতে আসিয়াছে। অর্থাৎ ভোটদাতাদের শতকরা ১৬ ভাগও মুসলিম লীগের এই "জীবন-মরণ" সমস্যা সম্বন্ধে ভোট দিতে আসে নাই, পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিলে বিপদের লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই ইহা জানিয়াও অগ্রসর হয় নাই কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটদাতারা বিত্তশালী এবং শিক্ষিত। পাকিস্থান সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলমানদের শতকরা ৮৪ জনের কোনরূপ উৎসাহ নাই গত নির্বাচনে তাহাই প্রমাণিত হইল।

যাহারা ভোট দিয়াছে তাহাদের অনুপাত পক্ষে শতকরা ৮৬ এবং বিপক্ষে শতকরা ১৪। সীমান্ত প্রদেশ বাদ দিয়া এই হিসাব। সীমান্ত প্রদেশের শতকরা ৯২ জন মুসলমান, কাজেই সেখানকার যৌথ নির্বাচন পৃথক নির্বাচনেরই সদৃশ ইহা মনে করা অন্যায় নয়। সীমান্তে পাকিস্থানের পক্ষে পাঁচ হাজার ও বিপক্ষে আট হাজার ভোট হইয়াছে। বিপক্ষের আট হাজার হইতে শতকরা আট ভাগ হিন্দু ভোট বাদ দিলেও দেখা যায় সাত হাজারের বেশী মুসলমান পাকিস্থানের বিপক্ষে ভোট

দিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে মিলাইয়া পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছে শতকরা ৮২ জন ও বিপক্ষে দিয়াছে শতকরা ১৮ জন।

মিঃ জিন্নার দাবি এই যে, ভারতের শতকরা ২৫ ভাগ মুসলমান মাইনরিটি শতকরা ৭৫ ভাগ হিন্দুর অধীনে বাস করা বিপজ্জনক মনে করে। পাকিস্থান-দাবির ইহাই তাঁহার সর্বপ্রধান যুক্তি। যদি তাহাই হয়, তবে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা যে ১৮ ভাগ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে মুসলিম লীগের গুণ্ডামি ও নানাবিধ ভয়প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্যে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে, শতকরা ৮২ ভাগের অধীনে তাহাদের কি অবস্থা হইবে? কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ জিন্না এই নির্বাচনের পর কিছুতেই শতকরা এক শত জন মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব আর দাবি করিতে পারেন না, দেশের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণের ভয় এবং শত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দাঁড়াইয়াছে কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটে ইহাই সর্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সিমলা সম্মেলনে পাকিস্থান বিরোধী জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা পাঁচটির মধ্যে একটি আসন চাহিয়া কোন অন্যায় করেন নাই ইহাই আজ প্রমাণিত হইল।

মালয় ও ব্রহ্মে ভারতীয়দের দুর্দশা

নাগপুরের হিতবাদ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণি মালয় ও ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুই স্থানের প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দশার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা বস্তুতই বেদনাদায়ক। কোন স্বাধীন দেশ বিদেশে তাঁহার স্বজাতীয় প্রবাসী ভ্রাতাদের এই লাঞ্ছনা কখনও ঘটিতে দিত না, ঘটিবার সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার যথোপযুক্ত প্রতিকার করিত। ভারতবর্ষ স্বাধীন নয়, পরাধীন এবং যাহার অধীন—বিদেশের অত্যাচারী হয় সে নিজে নতুবা তাহারই অনুরক্ত কোন গবর্মেণ্ট। প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি নির্মম অত্যাচারের কাহিনী ভারতবাসীকে তাহার রাজনৈতিক অক্ষমতা, অসহায়তা ও পরাধীনতার কথাই বারবার স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতবাসীর স্বাধীনতার সঙ্কল্প দৃঢ়তর করিবার জন্য হয়ত ইহারও প্রয়োজন আছে।

শ্রীযুক্ত মণি জানাইয়াছেন যে মালয় ও ব্রহ্মদেশে যে সব সম্প্রদায় বসবাস করে তাহাদের মধ্যে ভারতীয়দের উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নেকনজর সবচেয়ে বেশী। এখনও বহু ভারতীয়কে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হইতেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহাদিগকে যখন তখন ডাকিয়া পাঠান হয়। ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে ইঁহাদিগকে শত্রুর মুখে ফেলিয়া শাসনকর্তারা নিজেরাই পলাইয়াছিল। এ সব লাঞ্ছনার উপর আছে খাদ্যাভাব। যুদ্ধের আগে যে সব পরিবারের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল তাহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই যৎসামান্য খাদ্য খাইয়া কোনমতে বাঁচিয়া আছে।

শ্রমজীবীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা বাড়াইয়াছে সত্য কিন্তু দ্রব্যমূল্য যে পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় উহা কিছুই নয়। বহু ভারতীয় শ্রমজীবীর জীবিকা সংগ্রহের কোন উপায় নাই।

ব্যাঙ্কক-রেঙ্গুন রেলপথ নির্মাণের সময় বহু ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার নিহত হইয়াছে। এ সংবাদ ভারতে অনেকেই এখনও জানেন না। এই সকল হতভাগ্য পরিবারের লোকেরা অন্নবস্ত্রের সন্ধানে মালয়ের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভারতীয় স্ত্রীলোককে চট দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া চলাফেরা করিতে প্রায়ই দেখা যায়।

ব্রহ্মদেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া শ্রীযুক্ত মণির ধারণা হইয়াছে যে ব্রিটিশের ব্রহ্ম পুনরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভারতবিরোধী মনোভাব আবার তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের গবর্মেণ্টের আমলে ঐ ভাব তথায় বিদ্যমান ছিল না। ভারতীয়দের সম্পত্তি লুঠতরাজ ব্রহ্মদেশে আজকাল নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয়েরা ব্রহ্মদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করুক বর্মীরা ইহা চায় না। এই সব অত্যাচার হইতে ভারতীয়দের রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই গবর্মেণ্ট করেন নাই এবং করিবার যে বিশেষ কোন ইচ্ছা আছে তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মালয়ে ভারত-সরকারের যে এজেণ্ট আছেন, ভারতীয়দের রক্ষার চেষ্টা করার চেয়ে রিপোর্ট লেখাই তাঁহার বড় কাজ। কংগ্রেস ভিন্ন আর কেহ তাহাদিগকে রক্ষার চেষ্টা করিবে না এই বিশ্বাস ক্রমেই প্রবাসী ভারতীয়দের মনে বদ্ধমূল হইতেছে।

বাঁকুড়ায় অন্নবস্ত্রের অভাব

এ বৎসর বাঁকুড়ায় আমন ধান কম জন্মাইবার ফলে এই জেলার দরিদ্র জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা ঘটিয়াছে। যথাসময়ে পর্যাপ্ত সাহায্য না পাইলে এই জেলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। বাংলা দেশে বাঁকুড়া সবচেয়ে ছোট জেলা। হিন্দু মুসলমান সমস্যাও এখানে নাই। এই ক্ষুদ্রতম জেলাটির কয়েক লক্ষ লোককে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইবার জন্য বাংলা-সরকারের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। 'বাঁকুড়া দর্পণ' পত্রিকায় (১লা জানুয়ারী) তথাকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে গুরুত্ব-বোধে আমরা তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম। সরকারের মুখ চাহিয়া থাকা বৃথা বুঝিয়া স্থানীয় জনসাধারণ নিজেরাই আত্মরক্ষায় অগ্রণী হইয়াছেন। বাহিরের সাহায্য অপরিহার্য, ইঁহারা তাহা পাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

"বাঁকুড়া আজ আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবলে। দুঃখ দুর্দিনের কৃষ্ণ মেঘ বাঁকুড়ার উপর আবার ঘনিয়ে উঠছে। জেলার কতকাংশ এর মধ্যেই দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত। অনশন ও শীতের ক্লেশে লোক সব পীড়িত ও অবসন্ন। ছোট ছোট চাষী, ভূমিহীন মজুর নিঃস্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই প্রধানতঃ অধিকতর দুঃখভোগ করতে হচ্ছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর এই সব শ্রেণী জীবনীশক্তিহীন হওয়ার ফলে তাদের রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা একেবারেই হারিয়েছে। খাদ্যশস্যের মধ্যে আমন ধানই এই জেলার প্রধান ফসল। গত বৎসর ধান ভাল জন্মায় নাই। এ

বৎসর সমগ্র জেলায় গড়ে স্বাভাবিক উৎপন্নের হয় আনা হবে কি না সন্দেহ।

দুর্গত অঞ্চলে সরকার কর্তৃক বর্তমানে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তা একেবারেই অপ্রচুর। এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সহৃদয় দেশবাসী ও বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠান-গুলি অগ্রসর হয়ে মুক্তহস্তে দান ও দায়িত্বভার গ্রহণ না করলে বাঁকুড়ার পথে ঘাটে অনাহারে মৃত্যুর মর্মস্পর্শী দৃশ্য নিবারণ করা সম্ভব হবে না—এই জেলাকে পুনরায় গত পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

বাঁকুড়ার খাদ্যাভাবজনিত দুঃখ, দুর্দশা ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রতি দেশবাসী ও বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদিকে কর্মক্ষেত্রে আহ্বান ও স্থানীয় সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরামর্শ দ্বারা দুর্গত অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে সাহায্য বিতরণের কাজে তাদের সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই সকল বিষয়ে স্থানীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে "বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটী" (Bankura District Relief Co-ordination Committee) নামে একটি প্রতিনিধিমূলক সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই সমিতি এক দিকে যেমন অর্থসংগ্রহ ও আবশ্যক হলে প্রাথমিক সাহায্য দানের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, অন্য দিকে তেমনই আবার সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যাতে সাহায্য বিতরণের কাজ সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তা লক্ষ্য রাখবে। বলা বাহুল্য এই কাজের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন।

সমিতির ধনভাণ্ডারে অবিলম্বে মুক্তহস্তে দান করে বাঁকুড়ার দুর্গত অঞ্চলে বহু নরনারী ও শিশুর জীবন রক্ষার গভীর দায়িত্ব-পূর্ণ প্রচেষ্টায় সমিতির সহায়তা করার জন্য আমরা সহৃদয় দেশ-বাসীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। মানবতার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না বলে ভরসা করি।"

সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা:—(১) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, কোষাধ্যক্ষ, বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কো-অর্ডিনেসন কমিটি, নূতনগঞ্জ, বাঁকুড়া (বেঙ্গল)। (২) শ্রীজগন্নাথ কোলে, কোলে-বিল্ডিং, ১৩৭ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যবহার

রোলাণ্ড কমিটি মৈমনসিংহ, মেদিনীপুর, ঢাকা, বরিশাল ও ২৪-পরগণা এই কয়টি জেলা ভাঙিয়া ছোট করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অতিশয় সঙ্গোপনে এই সুপারিশ কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য ইহার সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কমিটি কতকগুলি উচ্চপদ সৃষ্টির সুপারিশ করিয়াছিলেন, অতি দ্রুত সেগুলিতে লোক ভর্তি করা হইতেছে। কমিটি বিভাগীয় কমিশনারের পদ তুলিয়া দিতে বলিতেছেন, সেটা করিবার অবসর বাংলা-সরকারের এখনও হয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুষ, চুরি, দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার বন্ধ করিবার যে সব সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার একটিও এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। নিম্নে দৈনিক 'ভারতে' প্রকাশিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত অসহায় জনসাধারণের সম্পর্ক পরিস্ফুট হইবে। ঘটনাটি অল্প দিনের; উহা এই:

জনৈক বৃদ্ধা মুসলমান স্ত্রীলোকের একমাত্র পুত্র জাহাজ-ডুবি হইয়া মারা যায়। স্ত্রীলোকটির নিকট দুইখানি চিঠি আসে,উহার একটি ছিল তাহার প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরের সহানু-ভূতিপূর্ণ বাণী, দ্বিতীয়টিতে সামরিক বিভাগ জানাইয়াছেন যে, বৃদ্ধাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজারখানেক টাকা দেওয়ার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তদনু-সারে স্ত্রীলোকটি আলিপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে গিয়া টাকা চাহে। টাকা সে পায় না অথচ টাকা পাওয়ার তদ্বিরে তাহার প্রায় দুই শতাধিক টাকা কেরাণীদের ঘুষ দিতে খরচ হইয়া যায়। অবশেষে নিঃসহায় নিঃসম্বল স্ত্রী-লোকটি আলিপুরের জনৈক প্রবীণ উকীলের নিকট কাঁদিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করে। উকীল ভদ্রলোক একটি দরখাস্ত লিখিয়া স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, অর্থাৎ তাঁহার খাস-কামরার সম্মুখে উপস্থিত হন। বলা আবশ্যক, আলিপুরের কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এই অজুহাতে সেখানে জমা-দারেক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মোতায়েন হইয়াছেন। ইহার দ্বারা চব্বিশ-পরগণা জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সুন্দরবনের জলাভাব,বিদ্যাধরী নদীর অপমৃত্যু প্রভৃতি কোন একটি সমস্যারও সমাধান হয় নাই। এ সব সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা দৈনন্দিন কাজও যে ইঁহারা কিরূপ তৎপর-তার সহিত সাধন করেন তাহারও নমুনা আলোচ্য ঘটনাটি হইতেই মিলিবে। উকীল ভদ্রলোকটি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কার্ড পাঠাইলে অতিশয় বিরক্তিভরে তিনি কার্ডের কোণে লিখিলেন, "কি চাই?" উকীল জবাবে লিখিলেন, "একটি আবেদনপত্র দাখিল করিতে চাই?" আবার লিখিত প্রশ্ন—"কিসের আবেদন?" উকীল লিখিলেন, "যুদ্ধে একটি স্ত্রীলোকের পুত্র মারা গিয়াছে। তাহার ক্ষতিপূরণের আবেদন।" তখন উপদেশ আসিল, "ইহা আমার এক্তিয়ার নহে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে হইবে।" বলা আবশ্যক হাকিম এবং উকীলের মধ্যে বোধ হয় মাত্র ৮ কিম্বা ১০ ফুট পরিমিত স্থানের ব্যবধান ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ব্যাপারটি জানিতে চাহিলে এক মিনিটের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। ম্যাজিষ্ট্রেট ও জনসাধারণের মধ্যে এই দূরত্ব রচনা, এই পর্দার ব্যবধান প্রত্যেক জেলার প্রায় প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ্য আপিসে ইঁহারা বসেন না, খাস-কামরাই ইঁহাদের কর্মস্থান।

অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের উপদেশানুসারে অতঃপর সেই উকীল মহাশয় স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই বাঙালী। ঘরে পর্দা আছে কিন্তু চোখে নাই। উকীল মহাশয়ের আবেদন শুনিয়া ইনি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওই তো আপনাদের দোষ।

আপনারা কেবলই কেরাণীদেরই দোষ দেখেন। স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই টাকা লইতে আসে নাই, আসিলে কেন সে পাইবে না?" উকীল ভদ্রলোকটি সাধারণ সমব্যবসায়ী অপেক্ষা একটু ভিন্ন ধরণের; তিনিও দৃঢ়কণ্ঠে জানাইলেন যে, স্ত্রীলোকটি টাকা লইতে আসিয়াছে, বহু টাকা ঘুষ দিয়াও টাকা আদায় করিতে পারে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে তিনি উহাকে লইয়া লাট-প্রাসাদে ধর্ণা দিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন টাকা দেওয়ার আদেশ দেন এবং সেই দিনই উহা প্রদত্ত হয়।

চিঠি, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ ভারত-সরকারের একটি বিরাট্ একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। ইহার সহিত কিছুদিন যাবৎ টেলিফোন যুক্ত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে বিদেশীর গর্ব্ব করিবার উপযুক্ত এই একটি মাত্র বিভাগই ছিল, এই যুদ্ধের সময় অন্যান্য সরকারী বিভাগের ন্যায় উহারও কর্ম্মদক্ষতা রসাতলে গিয়াছে। কলিকাতার এক প্রান্তের চিঠি অপর প্রান্তে পৌঁছাইতে আগে যেখানে কয়েক ঘণ্টা লাগিত এখন সেখানে অন্ততঃ তিন দিন লাগে। ২০০ মাইল দূর হইতে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম কলিকাতায় বিলি হইতে আগে ঘণ্টা দুই তিনেক লাগিত, এখন লাগে অন্ততঃ পক্ষে তিন দিন। কোম্পানীর হাতে টেলিফোন লোকের কাজে লাগিয়াছে, সরকারের হাতে আসিবার পর হইতে উহার ব্যবহার দুঃসাধ্য ও অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার কারণ আছে। গতযুদ্ধে সরকার জনসাধারণকে দোহন করিয়া সহজে অর্থাগমের যে সব সহজ পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন, পোষ্ট টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ তাহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৪ পর্য্যন্ত পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে প্রায় ১৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে; এই সব টাকা সাধারণ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যয় করা হইয়াছে। ডাক-মাশুল হ্রাসের কথা সরকার একবারও বিবেচনা করেন নাই, বরং টেলিফোনের মাশুল বাড়াইয়াছেন। যুদ্ধের ছয় বৎসরে ভারত-সরকারের পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ ভারত-বাসীর টাকায় পুষ্ট হইয়াছে, এবং ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজের সংবাদ আদান-প্রদানেই সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। যাহাদের অর্থে এই বিভাগ পরিচালিত হইয়াছে, উপেক্ষিত হইয়াছে তাহারাই।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। কিন্তু পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাধারণ স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা এখনও সমানই রহিয়াছে। ইহার কি প্রতিকার নাই?

যানবাহন সমস্যা

যুদ্ধ থামিবার পরও দেশের যানবাহন সমস্যার কোন উন্নতিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। রেলে ভ্রমণ এখনও সমান দুর্ঘটই রহিয়াছে। লাইন উপড়াইয়া রেলের ইঞ্জিন-গাড়ী প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার সময় রেলকর্ত্তৃপক্ষ যে অসাধারণ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই। অতি ধীরে গাড়ীর সংখ্যা বাড়িতেছে। বার্থ রিজার্ভেশনের অবস্থা এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকিলে অথবা ঘুষ দিলে রিজার্ভেশনের অসুবিধা আগেও হয় নাই এখনও হয় না। এত দিনে এই পাপ দূর হওয়া উচিত ছিল।

মফস্বলের বাস সার্ভিসগুলির অবস্থাও পূর্ব্ববৎ। যে নাম-মাত্র পেট্রোল ইহারা পায় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। চোরাবাজারে পর্য্যাপ্ত পেট্রোল পাওয়া যায়, গবর্মেণ্ট ইহা জানেন। কলিকাতার রাস্তায়, বিশেষতঃ ঘোড়দৌড়ের দিন রেসের মাঠের নিকটে, গাড়ীর সংখ্যা দেখিলে বড়লোকদের পেট্রোলের অভাব আছে ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। যে সব মধ্যবিত্ত লোক পেট্রোল সস্তা হইলে গাড়ীতে যাতায়াত করিতে পারিতেন অসুবিধা তাঁহাদেরই। পেট্রোলের কণ্ট্রোল তুলিয়া দিলে এবং উহার দাম কমাইলে বহু লোকে নিজ নিজ গাড়ী ব্যবহার করিতেন, ইহাতে ট্রাম ও বাসের ভীড় অনেক কমিত।

কলিকাতার ট্রাম ও বাসের অবস্থা ত মারাত্মক। সার্কাস ও জিমনাষ্টিক না জানিলে ট্রামে বাসে উঠা-নামা দুঃসাধ্য, বিপজ্জনক ত বটেই। দুর্ঘটনা যত হয় তাহার সব প্রকাশিত হয় না কিন্তু যতটা প্রকাশিত হয় সভ্য গবর্মেণ্টের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট লজ্জাজনক। অথচ কলিকাতার যানবাহন সমস্যার সমাধান এক দিনে করা যায়। বাসগুলিকে গত ট্রাম ধর্ম্মঘটের সময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পেট্রোল দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ট্রামের অভাবে শহরের জীবনযাত্রা কঠিন হইলেও একেবারে অচল হয় নাই। বাসগুলিকে যে দিন এই ভাবে পেট্রোল দেওয়া হইবে সেই দিন হইতে কলিকাতার যানবাহন সমস্যা অনেক সহজ হইয়া যাইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ট্রামের সংখ্যা বাড়ানো সময়সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু বাসের যাতায়াত বৃদ্ধি যে কোন দিন করা যাইতে পারে, অবশ্য পেট্রোল-রেশনিং তুলিয়া দিয়া পেট্রোলের চোরাই কারবার বন্ধ করিবার ইচ্ছা যদি গবর্মেণ্টের থাকে।

তারপর রাজপথে দুর্ঘটনা। প্রত্যেকটি লোকের জীবন অনিশ্চিত। গাড়ী চাপা পড়া তো দৈনন্দিন ব্যাপার, লরীর ধাক্কায় গাড়ী বা বাসের যাত্রী নিহত বা জখম হওয়াও প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সব লরী দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তাহাদের প্রায় সবগুলিই সামরিক লরী। ইহাদের অসতর্ক চালনা এবং বেপরোয়া গতিবেগই অধিকাংশ দুর্ঘটনার কারণ। যুদ্ধের সময় কলিকাতার রাজপথে বেপরোয়া বেগে ধাবিত হইয়া ইহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছে ইহা না হয় বুঝিলাম, নিরীহ নাগরিক ইহাদের চক্রতলে পিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যরক্ষায় সাহায্য করিয়াছে তাহাও না হয় উপলব্ধি করিলাম; কিন্তু যুদ্ধের পর এই বেপরোয়া ছুটাছুটির হেতু কি? আমরা পূর্ব্বেও লিখিয়াছি যে বাসের ন্যায় মিলিটারী লরীর যাতায়াতপথে সময়ের হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। রাস্তার মোড়ে শুধু গতিবেগ নির্দ্দেশক সাইন বোর্ড টাঙাইয়া ইহাদিগকে সংযত করা সম্ভব নয় তাহা ত প্রমাণিতই হইয়াছে। সামরিক বিভাগের কাজ অনেক কমিয়াছে। সামরিক লরীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করা এখন সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ডাঃ অজিতমোহন বসু

বিগত ১৩ই পৌষ ডাক্তার অজিতমোহন বসু তাঁহার কলিকাতার বাড়িতে হৃদরোগের আক্রমণে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতায়, এবং বোধ হয় ভারতবর্ষে, প্রথম বৈদ্যুতিক রশ্মির ব্যবহারে চিকিৎসার প্রচলন করেন এবং অসংখ্য রোগীকে নানা দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা হইতে উপশমের পথ দেখান। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ঐ বিভাগ খোলা হয় তখন ডাক্তার অজিত বসু তাঁহার বহুমূল্য যন্ত্রপাতি সেখানে দান করেন যাহার ফলে অনেক দুঃস্থ স্ত্রীলোকের সুচিকিৎসার একটি নূতন পথ খোলা হয়। পরে তাঁহার নিজের গৃহেও পুনর্ব্বার যন্ত্রপাতি বসাইয়া, অন্ধ রোগীদের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বন্ধুবান্ধব অনেকেরই চিকিৎসা তিনি সযত্নে বিনামূল্যে ত করিতেনই, উপরন্তু অনেক অল্প পরিচিত এমন কি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকও তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছে।

অজিতমোহন ময়মনসিংহের এক সম্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর নাম ভারতের শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদিগের নামতালিকার পুরোভাগে অবস্থিত। তাঁহার পিতা মোহিনীমোহন বসু অল্লায়ু হইলেও এদেশের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁহার মাতুল জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। এইরূপ পরিবারের সন্তান অজিত মোহন নিতান্ত নিরহঙ্কার ও অমায়িক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি প্রকৃতিপূজারী স্বাস্থ্যোন্নয়নে উৎসাহী ছিলেন এবং বন্ধুদের মধ্যে খোলা মন, মুক্তহস্ত, রোগে-শোকে, উৎসবে প্রকৃত বান্ধবরূপেই পরিচিত ছিলেন। যাঁহারা খেলা-ধূলার সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন কলিকাতার স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ইঁহারই উৎসাহে এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র স্বর্গত হেমেন্দ্রমোহন বসুর সহায়তাই স্থাপিত হয়। ৬৩ বৎসর বয়সে ইঁহার অকালমৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা তাঁহার অসংখ্য বন্ধু পরিজনের প্রত্যেকে অনুভব করিতেছেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

মীরাটে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের মূল সভাপতি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার অভিভাষণে বলেন, দেশে নূতন যুগ আসিতেছে। সর্বজগতের কল্যাণে ভারতকে তার আপন স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। নূতন বিশ্ব রচনায় ভারতের দায়িত্ব কতখানি তাহা আজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সেই মহাব্রতে কে কোন্ ভার গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অভ্রান্ত সাধনায় তার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতীয় লোকশিক্ষার কথা আলোচনা করিয়া সভাপতি বলেন,

"শিক্ষার দিক দিয়ে এক সময় ভারতে ছিল সব তপোবন ও তক্ষশিলা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিভালয়। সেগুলি যখন গেল তখনও বাংলাদেশ টোল চতুষ্পাঠী খুলে জ্ঞানের প্রদীপটি বজায় রেখেছিল। তা ছাড়া সর্বসাধারণের জন্য ছিল পুরাণ-পাঠ, কথকতা, যাত্রা, রামায়ণ গান, কীর্ত্তন, বাউল গান প্রভৃতির আয়োজন। উত্তর-বঙ্গে গম্ভীরা ও বিহু, পূর্ব বঙ্গে রয়ানী নীল পূজা, পশ্চিম বঙ্গে গাজন প্রভৃতির উৎসব লোকের আনন্দের ক্ষুধা মেটাতো। লোকের মধ্যে তখন নৃত্য ছিল, গীত ছিল, অভিনয় প্রভৃতি ছিল, ঢাকার জন্মাষ্টমী প্রভৃতির মিছিল ছিল। সেই যুগে মজলিশে ও বৈঠকে যে আনন্দ ছিল আজ সভা-সমিতিতে তা নেই। আলিপনায়, সিঁড়ি-চিত্রে, কাঁথাশিকা প্রভৃতি কাজে ছিল লোকশিল্প।"

বাংলাদেশের এই সব লোকশিল্প ও সাহিত্য সম্পদাদি উদ্ধার করিতে ও শিক্ষার কাজে লাগাইতে হইলে সমবেত সাধনার দরকার।

অভিধান ও বিশ্বকোষ প্রণয়ন এবং বাংলা ভাষায় অপর ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক অনুবাদ সম্বন্ধে সভাপতি যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই :

"অভিধান ও বিশ্বকোষের কাজে বহু লোকের সমবেত সাধনা চাই। বাংলা অভিধানের কাজে একা শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় চল্লিশ বছরের সাধনায় একটা বড় অভাব মোচন করে এনেছেন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষার কাজে মহারাষ্ট্রী ও হিন্দী সাধকেরা এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু পণ্ডিতেরা অনেকটা কাজ করেছেন। বাংলাদেশেও এই সময় এই কাজে হাত দিয়েছিল কিন্তু সেই কাজ বেশি দূর এগোয় নি।"

"বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ ও নানা মতের ধর্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কতক হয়েছে, কতক হয় নি। যা হয়েছে তাও এখন দুর্লভ। কালীবর বেদান্তবাগীশ, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতির লেখাও এখন দুষ্প্রাপ্য। সেই সব গ্রন্থ এখন সুপ্রাপ্য হওয়া দরকার। যেগুলির এখনও বাংলা অনুবাদ হয় নি তার অনুবাদ হওয়া চাই। বিদেশী সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভ্রমণ চরিত-কথা ও কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের যথাযোগ্য পরিচয়ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থাকারে না পেলে চলবে কেন?"

"ভারতের নানা প্রদেশের সাধক সন্তদের বাণী ও চরিত-কথা বাংলাতে পাওয়া দরকার। তামিল শৈব ও বৈষ্ণবদের কথা, গ্রন্থসাহেব, কবীর, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তদের পরিপূর্ণ পরিচয় বাংলা ভাষাতে না থাকলে আমাদের শিক্ষা অপূর্ণ থাকবে। বাংলাদেশেও বৈষ্ণব শৈব শাক্ত ও বাউল প্রভৃতি নানা মতের গান ও লোকসাহিত্য লোকের কণ্ঠেই রয়েছে। দিন দিন তার ক্ষয় হচ্ছে। এই সব অমূল্য ধন যাতে নষ্ট না হয় তা কি দেখতে হবে না?"

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা

বাংলার প্রবীণতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতার সাহিত্যিকগণের উদ্যোগে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় অভিনন্দিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। কবিকে একখানি মানপত্র এবং তাঁহার হস্তে অর্ঘ্য স্বরূপ ১০০১৲ টাকার একটি তোড়া প্রদান করা হয়। কবিকে সম্বোধন করিয়া মানপত্র পাঠ, সম্বর্দ্ধনার প্রত্যুত্তরে কবির বাণী এবং অভিভাষণ সভাস্থল হইতে নিখিল-ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বেতারে প্রচারিত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদের অধ্যাপক

পণ্ডিত হরিনন্দন ঝা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন এবং প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য সংস্কৃত শ্লোক এবং বাংলা কবিতায় উহার অনুবাদ আবৃত্তি করেন।

কবিশেখর কালিদাস রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে কবি করুণানিধান বাংলাদেশের জীবিত কবিগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহার বয়স এখন ৬৮ বৎসর। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি এখনই আর বাজারে পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগের পাঠকদের নিকট ইনি অপরিচিত বলিলেই হয়। কবি করুণানিধান চিরদিন নীরবে কাব্যের উপাসনা করিয়াছেন। আত্মপ্রকাশের জন্ম তিনি যুগোপযোগী কোন আয়োজনই করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁহার সহজাত কবিত্বশক্তিকে উন্মেষিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি গুরুর অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। তাঁহার রচনার একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। কবি "বর্ষাচিত্রে" বিশ্বকে দেখিয়াছেন বৃষ্টিজলের চিকের মধ্য দিয়া। সৃষ্টির স্বপ্নরহস্যময় রূপ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। করুণানিধান এই রূপমুগ্ধতার কবি। রসসৃষ্টিকে তিনি বাস্তবজীবনের অভিব্যক্তি বা বাস্তব জগতের চিত্র মাত্র মনে করেন না—তিনি মনে করেন কাব্যলোক দুঃখ ক্লেশ ভরা বাস্তব জগৎ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার আশ্রয়। তিনি রূপের কবি, স্বপ্নের কবি, আনন্দের কবি।

সভাপতি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন, করুণানিধান প্রথিতযশা, কিন্তু তিনি যশের আকাঙ্ক্ষী নহেন। ভাষার এত বড় নিপুণ চিত্রকর এমন অপরাজেয় শিল্পী বিরল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণরূপ ও লাবণ্য এমন করিয়া কে ফুটাইতে পারে? তিনি প্রিয়া প্রেম ও যৌবনের কবি। যাঁর মদির যৌবন অফুরন্ত প্রীতিময় ও গীতিময় আজ সেই সাথীহীন মানসযাত্রী স্বর্ণ মরালকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আমাদের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কবি করুণানিধান বলেন,

"বাণীর এই দীনতম সেবকের প্রতি অযাচিত প্রীতির নিদর্শন আপনাদের এই চারু-চন্দন-মাল্য এর উপযুক্ত পাত্র আমি মোটেই নই; সংসারের নানা দুঃখকষ্টের ঘূর্ণাবর্তে আমি বাণী-সেবার সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র। কতখানি কৃতকার্য হয়েছি সে বিচারের ভার রইল আপনাদের হাতে। প্রথম যৌবন হতেই কবিতা পড়তে আমার খুব ভাল লাগত, কাব্য-সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার আমার মনকে নাড়া দিত। সেই বিচিত্রা অপরাজিতা চিরদিনই আমার নেপথ্যবর্তিনী রয়ে গেলেন। ধ্যানেই তাঁর মূর্তি দেখতে পেতাম, অনিরূপ্য সেই লীলাময়ী মোহিনীর মায়া! কবিতা-লেখার খেলায় আমি আনন্দ পেতাম। আমার দেশবাসীকে সেই আনন্দের কতটুকুই বা দিতে পেরেছি, আর কি-ই বা করেছি যার জন্ম আপনারা আমাকে এই মানপত্র দিলেন। আপনাদের এই দান আমার শিরোধার্য। এইটুকুই আমার যাত্রার পূর্ণ পাথেয়। আমার জগৎ এখন স্মৃতির জগৎ। কালো প্রজাপতি এসে বসেছে আমার সাদা গোলাপের পাঁপড়িতে।

এই না জীবন, মানব-জীবন
ফুল ফোটা, ফুল-ঝরা!

"আজ এই অভিনন্দন সভায় দাঁড়িয়ে হারানো দিনের কত পুরানো কথাই মনে পড়ছে। কত অপরাহ্নে, কত সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হতাম সেকালের সেই সাহিত্য-আসরগুলিতে। সেই সব দিনের কাহিনী গুছিয়ে বলবার শক্তি আমার নেই। অতীতের সেই অমর মুহূর্তগুলি আজও আমার অন্তরের অন্তরে মুখর হয়ে রয়েছে। আজ আমি সেই মিলনোৎসবের উল্লাসে বঞ্চিত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়েছি। তবে প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ যে আজও ঘোচে নি সেইটুকুই সকলের চেয়ে বড় কথা আর কি বলব?"

সময় হয়েছে নিকট
এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

(রবীন্দ্রনাথ)

"লহ গো সবে আমার নমস্কার,
হৃদয়-ভরা প্রীতির ফুলহার।
লিখিত এই ছত্রগুলির মাঝে
অ-লিখিত ভাবের বীণা বাজে।
মনের কথা রৈল মনে বন্ধু মোর,
নয়ন কোণেই রৈল জমে নয়ন-লোর॥"

সরকারী কৃষিঋণ আদায়ের নমুনা

নিম্নলিখিত সংবাদটি দৈনিক কৃষকে (২২শে পৌষ) প্রকাশিত হইয়াছে:

"গুসকরা হইতে ১॥ মাইল পূর্বে ভাতার থানার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে ৮নং কালেকটরীর জনৈক ব্যক্তি আসিয়া কৃষি-ঋণ আদায় করিতেছেন। যে সময় উক্ত গ্রামে কৃষি-ঋণ দেওয়া হয় সে সময় তিনকড়ি রায় উদ্যোগী হইয়া সকলকে টাকা আদায় দিয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে ধান্য মোটেই জন্মে নাই এবং তিনকড়ি সকলকে তাগাদা করিয়া টাকা আদায় করিতে পারে নাই। গত ১৭ই পৌষ তিনকড়ি যখন দুধের ঘড়া লইয়া গুসকরা আসিতেছিল সেই সময় সেই ব্যক্তি তিনকড়ির হাত হইতে দুধের ঘড়া লইয়া সঙ্গের চৌকিদারকে দেয় ও তাহার বাটীর ভিতর গিয়া থালা ঘটি বাটি ক্রোক করে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর দুধের ঘড়াটি ফিরাইয়া দেয় ও কোন্ তারিখে টাকা দিবে তাহাও বণ্ডে লিখিয়া লয়। তিনকড়ি খুব গরীব।"

বাংলা-সরকারের কৃষি-ঋণ দানের নমুনা সুবিদিত। চার-পাঁচ জন কৃষককে একত্র হইয়া উহা লইতে হয় এবং এক এক দল সাধারণত এক শত টাকার বেশী পায় না। ইহার জন্ম তাহাদিগকে সদরে যাতায়াত এবং সদরে থাকিবার জন্ম খোরাকী খরচ করিতে হয়। হোটেল খরচ বাঁচাইবার জন্ম তাড়াতাড়ি টাকা আদায় করিতে গেলে ঘুষ না দিয়া উপায় নাই। ফলে হাতে টাকা আসে সামান্যই অথচ ঋণ বাড়ে। এই ঋণের টাকা কি ভাবে আদায় হয় তাহার সামান্য একটি নমুনা উপরোক্ত সংবাদে পাওয়া যাইবে। লীগ মন্ত্রিত্বের দাপটে সমবায় সমিতি মরিয়াছে, কৃষকের ঋণ প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা এখন কৃষি-ঋণ। কিন্তু ইহা পরিমাণে কম, ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী এবং ইহার আদায়ের পন্থা নিষ্করুণ ও কঠোর। এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া উচিত।

টাঙ্গাইল মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে টাঙ্গাইল মহকুমা প্রাথমিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। টাঙ্গাইল মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দেড় হাজার প্রাথমিক শিক্ষক উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতনের হার ও তাঁহাদিগের আর্থিক দুর্দশার কথা আলোচনা করেন এবং শিক্ষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্ত অনুরোধ করেন। সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতেই শিক্ষকদের অবস্থা বুঝা যাইবে।

১। প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের হার নিম্নলিখিত ভাবে বাড়াইতে হইবে—

প্রথম শিক্ষক— মাসিক ৫০৲ হইতে ৮০৲ টাকা
দ্বিতীয় শিক্ষক— „ ৪৫৲ „ ৭৫৲ „
তৃতীয় শিক্ষক— „ ৪০৲ „ ৭০৲ „

২। সরকারী কর্মচারীরা প্রাথমিক শিক্ষকগণের অপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ বেশী বেতন পাইয়াও সস্তায় রেশন পাইয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষকেরা এই সুবিধা পান না। সম্মেলন দাবি করিয়াছেন যেন তাঁহাদিগকেও ঐ ভাবে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়।

৩। বাংলা-সরকার পল্লী উন্নয়ন কার্যে শিক্ষকগণের সহায়তা গ্রহণ করুন এবং তজ্জন্ত স্তায্য পারিশ্রমিক দান করুন।

৪। সরকারী নিয়মানুযায়ী শিক্ষকদের ছুটির ব্যবস্থা করা হউক।

৫। অন্তান্ত সরকারী কর্মচারীদের স্তায় শিক্ষকদের জন্ত প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা করা হউক।

৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের সন্তানসন্ততিগণের বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হউক।

৭। ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেলে শিক্ষকদের বেতন যাহাতে বন্ধ না করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

দাবিগুলি অতি সামান্ত এবং সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ইচ্ছা থাকিলে গবর্মেণ্ট অনায়াসেই এগুলি পূর্ণ করিতে পারেন। ইংরেজের যুদ্ধে শিক্ষকদের সহায়তার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের জন্ত ভাতা, সস্তা রেশন প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয় নাই ইহা বুঝা যায়। বর্তমান গবর্মেণ্টের নিকট ইঁহাদের অবস্থার প্রতিকারের আশা করিয়া কোন ফল হইবে আমরা ইহা মনে করিতে পারিতেছি না। তবে নির্বাচনের পর বাংলায় প্রতিনিধিমূলক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইলে তাঁহারা যাহাতে শিক্ষকদের প্রতি আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্য না দেখান তার জন্ত আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

ব্রিটেনে ভারতীয় নাবিকদের বাসের অসুবিধা

লণ্ডনে স্বরাজ ভবনের উদ্যোগে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় নাবিকদের বিলাতে বাসস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘের বোম্বাই শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনকর দেশাই বিলাতী পান্থনিবাসগুলিতে ভারতীয় নাবিকদের অবস্থার কথা বলিতে গিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ লিভারপুলের নিকটবর্তী একটি পান্থনিবাসের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এটি একটি বন্দীশালার মত। যে অবস্থায় ভারতীয় নাবিকগণকে এখানে বাস করিতে হয় তাহা মর্যাদাহানিকর। অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে শত শত নাবিককে গো-মহিষাদি পশুর স্তায় বাস করিতে হয়। শীতের দিনে উপযুক্ত আচ্ছাদনের অভাবে পান্থনিবাসের অধিবাসীরা চূড়ান্ত দুর্ভোগ ভোগে।" ব্রিটিশ নাবিকদের সহিত ভারতীয় নাবিকদের অবস্থার তুলনা করিয়া দীনকর দেশাই বলেন যে এই তারতম্যের তুলনা অনেকটা স্বর্গের সহিত পাতালের তুলনার মত। লিভারপুলে ভারতীয়দের ভারপ্রাপ্ত যে সরকারী কর্মচারী ছিলেন তিনিও স্বীকার করেন যে পান্থনিবাসের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং অবস্থার উন্নতি সাধন তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। লণ্ডনের হাই কমিশনারের পক্ষ হইতেও ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা হয় নাই।

ব্যালট পেপারের ব্ল্যাক মার্কেট?

ব্রিটিশ রাজত্বে বাংলায় বসিয়াই আমরা চাল, ডাল, লবণ, তেল, কাপড়, ঔষধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ব্ল্যাক মার্কেট দেখিয়াছি। বাড়ীভাড়া, চাকুরি, কণ্ট্র্যাক্ট প্রভৃতিরও ব্ল্যাক মার্কেট দেখা গিয়াছে। কিন্তু আসামের কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি মহকুমা হইতে ব্যালট পেপারের ব্ল্যাক মার্কেটের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা অন্ত সমস্ত ব্ল্যাক মার্কেটকেও হার মানাইয়াছে। হাইলাকান্দি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির আফিস সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র শীল এই সংবাদ দিয়াছেন; ২৪শে পৌষ তারিখের "দৈনিক কৃষক" পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। মৈমনসিংহ জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে ব্যালট পেপার সম্পর্কে কারসাজি করিবার অভিযোগ করিয়া সর আবদুল হালিম গজনভী এটর্ণীর চিঠি দিয়াছেন। ব্যালট পেপার লইয়া কি ব্যাপার চলিতেছে সে সম্বন্ধে ভারত-সরকারের তরফ হইতে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। প্রদেশগুলিতে যে ধরণের অভিযোগ উঠিতেছে তাহাতে প্রাদেশিক সরকারের উপর এই তদন্তের ভার প্রদত্ত হইলে লোকে আশ্বস্ত হইতে পারিবে না। নূতন কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন আসন্ন। ইহা লইয়া সেখানেও আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। পত্রটি এই—

"বিগত এসেম্বলী ও লোক্যাল বোর্ড ইলেকশনে দেখা গিয়াছে যে অনেক ভোটদাতা ব্যালট পেপার বাক্সে না দিয়া পকেটে পুরিয়া বা অন্ত কোন অসদুপায়ে ফেরত লইয়া আসেন এবং বাহিরে উহা প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষের এজেণ্টের নিকট নগদ মূল্যে বিক্রী করেন।

এইরূপে ক্রীত একাধিক ব্যালট পেপার একত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বস্ত একজন ভোটদাতা মারফতে ঈপ্সিত বাক্সে ফেলিয়া দেওয়া হয়।"

দার্জিলিং জেলা পৃথক করিবার প্রস্তাব

দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জানাইতেছেন এই জেলাটিকে একটি স্বতন্ত্র চীফ কমিশনারের প্রদেশে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিবৃতিটি এই :

"ইউরোপীয় এসোসিয়েশন ও চা বাগানের মালিকেরা সমবেতভাবে দার্জিলিং জেলাকে বাংলা হইতে আলাদা করিয়া একটি প্রদেশ গঠন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আরম্ভের সময় ইঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ঠিক এই খেলাই খেলিয়াছিলেন কিন্তু তখন সকলের চেষ্টায় এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়।"

"আমি গুর্খা, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি সমস্ত পার্বত্য জাতীয় ভ্রাতাদিগকে এই অপকৌশল ব্যর্থ করিবার জন্য ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি।"

দার্জিলিং এ দেশের সাহেবদের গ্রীষ্মাবাস এবং তাঁহাদের মতে হয়ত ইহাই এ জেলার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। এখানে বাঙালীর প্রবেশ বড় একটা পছন্দ করা হয় না সম্ভবত: এইজন্য যে বাঙালীর সহিত সংস্পর্শে আসিয়া ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি ধীরে ধীরে কংগ্রেস-সেবক হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের প্রয়োজন ঘটিলেই দার্জিলিঙে বাঙালীর প্রবেশ বন্ধ অথবা বাধা-নিষেধের দ্বারা কণ্টকিত করা হয়। আগামী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার পূর্বেই তলে তলে চা-বাগানের ইংরেজ মা'লকেরা ও ইউরোপীয় এসোসিয়েশন দার্জি'লংকে বাংলা হইতে পৃথক করিয়া খাস তালুকে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা বিচিত্র নয়।

পরলোকে রজনীকান্ত গুহ

সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিক্ষাবিদ্ রূপে তিনি দেশবাসীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। গ্রীক, লাটিন ও ফরাসী ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। মূল গ্রীক হইতে অনূদিত তাঁহার 'সক্রেটিস' গ্রন্থখানি বাংলা-সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হইয়া থাকিবে। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী ছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সকলের আদর্শস্থল ছিল। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কোন কাজ করিতেন না।

আত্মসম্মানবোধ ও জাতীয়তাবোধ তিনি সারাজীবন অম্লান রাখিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া উহার জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণে তিনি মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেন নাই। রজনীকান্তের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার সরল অনাড়ম্বর জীবন বিবৃত করিয়া যে খসড়াটি পঠিত হয় তাহার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও স্বদেশপ্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

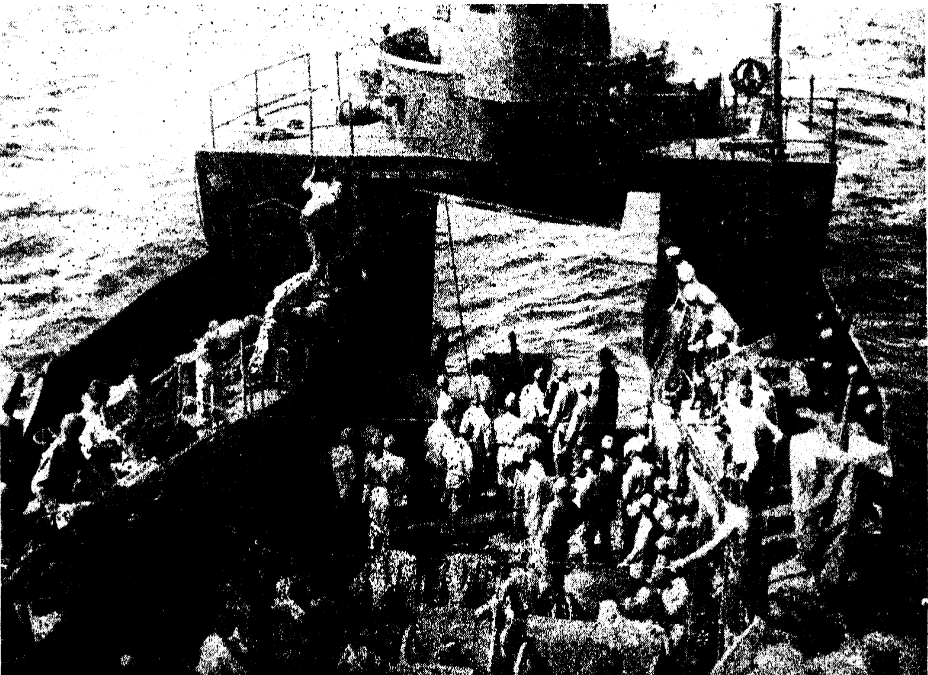
"ঘরে ও বাইরে তিনি পুরামাত্রায় স্বদেশীভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাকে কখনও বিলাতী বস্ত্রদ্রব্য ব্যবহার করিতে দেখি নাই। ১৯০৫-৬ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অশ্বিনীবাবুর সহিত তিনিও ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি ছিলেন অশ্বিনীবাবুর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। এই আন্দোলনের সময় তিনি প্রায়ই বরিশাল, বাঁকীপুর, বারাণসী, কলিকাতা প্রভৃতি শহরে ওজস্বিনী ভাষায় রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদান করিতেন। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে মহামতি গোখলের সভাপতিত্বে বারাণসীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে বরিশালের প্রতিনিধিরূপে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ দেশনেতৃগণ বরিশালে আগমন করেন তখন রজনীকান্ত ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির এক জন বিশিষ্ট সদস্য। এক বিরাট্ শোভাযাত্রা যখন অধিবেশন মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন তিনি সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুলিসের নির্যাতন সহ্য করেন।

"এই সময় তাঁহার সুচিন্তিত রাজনৈতিক প্রবন্ধদ্বয় 'ইংরেজ শাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ' এবং 'স্বদেশী আন্দোলন ও উহার ত্রিবিধ কার্য্য' 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সহিত ব্রজমোহন কলেজ ও বরিশালের স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন। রজনীকান্ত তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি আছেন বলিয়াই আমরা গবর্মেণ্টকে কম গ্রাহ্য করি।' উহার উত্তরে সার আশুতোষ বলিলেন, 'না, তা করিবেন না, আমি না থাকিলে গবর্মেণ্ট আপনাদিগকে মারিয়া পুঁতিয়া ফেলিত।'...

"এই সময়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে তাঁহার সহিত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আলাপ ও আলোচনা হয়। ১৯১১ সালে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'মেগাস্থিনীসের ভারত-বিবরণ' প্রকাশিত হয়। বাখরগঞ্জ জেলায় ব্রজমোহন কলেজ ছিল তখন নবজাগ্রত দেশপ্রীতির উৎসমুখ স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল; মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও রজনীকান্তের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই কলেজের বহু অধ্যাপক ও ছাত্র সেই অগ্নিময় যুগে দিকে দিকে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতেছিলেন। সেইজন্য গবর্মেণ্ট ইস্তাহার দিলেন যে, ব্রজমোহন কলেজের কোন ছাত্র উপযুক্ত হইলেও সরকারীবৃত্তি পাইবে না। ইহার ফলে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে অত্যন্ত কমিয়া গেল। রজনীকান্ত অশ্বিনীবাবুকে বলিলেন, 'প্রথম যৌবনে মাত্র দশ টাকা বেতনে রামমোহন রায় সেমিনারীতে শিক্ষকতা করিয়াছি। যদি দরকার হয় তবে এখানেও আমি দশ টাকা বেতনে অধ্যক্ষতা করিব।'...এইরূপ ছিল তাঁহার স্বদেশ ও শিক্ষাব্রতের জন্য আত্মত্যাগ। শীঘ্রই গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বরিশাল ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তখন সার আশুতোষ তাঁহাকে বলিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ খালি হইলেই আপনাকে নিয়োগ করিব।'...দুই বৎসর পরে সার আশুতোষ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানেও স্বদেশী মনোবৃত্তির জন্য সরকারের কুনজরে পড়িয়া, অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়।"



কাউন্টি এজেণ্ট রে ষ্টোন কর্ত্তৃক উন্নত ধরণের জল-নির্গমন-প্রণালী প্রদর্শন



মার্কিন নৌ-বাহিনীর নির্দ্দেশে জাপানী সৈন্যেরা একটি অবতরণ-ব্যবস্থাযুক্ত জাহাজ হইতে কামান গোলা ইত্যাদি জাপানের সইও দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে



কলিকাতার লাট-প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের মিলিটারি সেক্রেটারি

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল (নোবেল পুরস্কার, শান্তি,—১৯৪৫)

ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পথ আর পথ বলিয়া মনে হয় না। রথে চাপিয়া সে যেন চলিয়াছে। অকারণ আনন্দে দেহ ও মন লঘু; অবকাশের হাল্‌কা মেঘের সঙ্গে সমতা রাখিয়া সে মন ছুটিতেছে। নগরী-বক্তা—

আরে মশাই একটু চোখ চেয়ে চলবেন।

এক্সকিউজ মি। অনুপম পাশ কাটাইল।

আজকালকার ছেলেগুলো কি! নতুন চাকরি পেয়ে সবাই বনে গেছে লাটসাহেব।

অনুপম আপন মনে হাসিল। লাটসাহেব কি মনের আনন্দে ফুটপাথের মানুষকে ধাক্কা মারিয়া চলেন?

বাবুসাব থোরা মেহেরবাণি করকে—

হিন্দুস্থানী ভিখারীটা বহুক্ষণ হইতে পিছু লইয়াছে। করুণার চেয়ে বিরক্তি জন্মাইয়া ওরা মানুষকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য করে। আজকালকার ভিখারীগুলাও তাই। অহোরাত্র চীৎকার করিতেছে—দেহি—দেহি। অভাব বাড়িয়াছে বলিয়াই কি ক্ষুধার প্রচণ্ডতা বাড়িয়াছে! হিন্দুস্থানীটাকে একটা আনি দিয়া ধমকাইল, ভাগ।

সে ভাগিল—আরও অনেকে আসিল। ভং সনায় কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না—অপমান কাহারও গায়ে বিঁধে না। নির্লজ্জ কাঙালপনার কি বীভৎস রূপ!

বড় রাস্তার উপর জনপ্রবাহ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সারি সারি ট্রাম বাস স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া। একখানি বাস ঘিরিয়া জনতার চাপ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা।

অনুপম ভিড়ের মধ্যে গিয়া মিশিল। জনতা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল—শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্ত্রী আসিতেছে, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীও আসিতেছে। তোবড়ানো বাসটা ট্রাম-লাইনের মাঝখানে কাত হইয়া রহিয়াছে, ফার্ষ্ট এড্‌-প্রাপ্ত আরোহীগণ মৃদু আর্ত্তনাদ করিতেছে। জনতা পাতলা হইলে—অনুপম দেখিল—অপরাহ্নের আলোয় ট্রাম-লাইনের খানিকটা চক্‌ চক্‌ করিতেছে। সূর্য্যের লাল কিরণে নহে—ট্রাম-লাইনটা রক্তেই ভিজিয়া গিয়াছে এবং চক্‌ চক্‌ করিতেছে। একটি আহত মহিলা বিশৃঙ্খল বেশবাসে সেই চকচকে লাইনে মাথা রাখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন—তাঁহার এলায়িত কালো চুল ভিজা জব্‌ জব্‌ করিতেছে। তাঁহার পাশেই একটি দশ-বারো বছরের ছেলে—হাত পা ছুঁড়িয়া কাতরাইতেছে। ছেলেটির ডান হাতের চামড়া খানিকটা উঠিয়া সাদা হাড় বাহির হইয়াছে—বাঁ পা খানিতেও যেন চোট্‌ লাগিয়াছে। এইটুকু মাত্র দেখা গেল—এবং তাহাই যথেষ্ট। মিলিটারী লরির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা লইয়া গরম গরম যে-সব বক্তৃতা হইতেছে—তাহাও অনুপমকে ঠিক মত স্পর্শ করিল না। যুদ্ধের মমতা তার কাছে খুব বড় নহে—এবং যুদ্ধের নিষ্ঠুরতাও সব সময়ে প্রত্যক্ষগোচর নহে। খানিকটা সময় ঐ আলোচনাতে কাটে; চাল চিনির দুষ্প্রাপ্যতা যুদ্ধের কঠোরতাকে কিউ'র লাইনে কিছুক্ষণ প্রত্যক্ষগোচরও করায় কিন্তু সে সময় অবিচ্ছিন্ন নহে। চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেশনের সুবন্দোবস্ত ঘটিয়াছে—এবং রেশনিং চালু হইলে কিউ অজগর অদৃশ্য হইবে। কেবল বার বিশেষে কেরোসিন তৈল সংগ্রহের কালে তার ভীতিপ্রদ মূর্ত্তিটা প্রকট হইয়া উঠিবে হয়ত। সে আর কতক্ষণ। যুদ্ধ নির্ব্বিঘ্ন জীবনযাত্রাকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। বাহিরের বিরাট্‌ পৃথিবী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে জিঘাংসায় প্রমত্ত। ভিতরের যুদ্ধ—সংসার তার প্রচণ্ড বেগ সংঘাতে চঞ্চল। অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধের ফল সংসারে অপরোক্ষ ভাবে পৌঁছিতেছে। মানুষ মরিতেছে ও মরিবে। না খাইতে পাইয়া যাহারা শহরে আসিয়াছে—না হাঁটিতে পারিয়া যাহারা যানবাহনের আশ্রয় লয়—তাহাদের দুর্ঘটনাকে ঠেকাইবে কে? মৃত্যু জড়ধর্ম্মী নহে—যুদ্ধ-উদ্যম তাহার বোঝা বাড়াইয়া দিয়াছে শুধু।

অনুপমের করিবার কিছুই নাই। উৎসাহী লোকের চেষ্টায় অ্যাম্বুলেন্স আসিবে—শান্তিরক্ষকের চেষ্টায় লাইন মুক্ত হইয়া যানবাহন চালু হইবে। একটা রিপোর্টও যথারীতি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। কাল সকালের কাগজে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে মানুষকে কয়েক মিনিট সচেতন করিবে। তারপর কর্ম্মে-প্রমোদে কান্নায়-হাসিতে এই ক্ষীণ অভিযোগটুকুও কোথায় তলাইয়া যাইবে। হাজার পাউণ্ডের বোমার ঘায়ে শিল্প-সমৃদ্ধ শহরের ধ্বংস-কাহিনীর ফাঁকে এই রসা রোডে সংঘটিত অতি ক্ষুদ্র এক অসামরিক ঘটনাকে জীয়াইয়া রাখাও কঠিন! সুতরাং সে পথ চলিতে লাগিল। দুইটা সূচি পর পর আছে। সাহিত্যের বিতর্কিকা-সভা সন্ধ্যার মুখে বসিবে কিন্তু ভ্যারাইটি শোয়ের আয়োজন? অপরাহ্ণে? ঠিক মনে পড়িতেছে না। গীতাদের বৈঠকখানা ছোট হইলেও চমৎকার। চিত্তহারী নির্জ্জনতা আছে। বড় জানালার ওপিঠে রৌদ্রদীপ্ত দুপুর—পথকে করে জনবিরল, বাড়িতে আনে কর্ম্ম ও আহার-ক্লান্তির আলস্য। ভিখারীগুলাও অপরাহ্ণে চেঁচাইবে বলিয়া অনাহারে খানিকটা ঝিমায়। বড় রাস্তা হইতে গতিশীল ট্রামের ঘর্ঘর নাদ এখানে পৌঁছায় না, শুধু মাথার উপর বায়ুযানের চংক্রমণ শব্দ। সে শব্দও কান-সহা হইয়াছে। যুদ্ধ থামিলে ঐ বায়ুযান অসামরিক জনকেও প্রভূত ভাবে সেবা করিবে। তখন রেলের কদর কমিয়া যাইবে—সময়ের মূল্য বাড়িবে। এই বাড়তি সময় পাইয়া মানুষ করিবে কি?

এই—এই অনুপম। বাঃ—চিনতেই যে পারিস নে!

কে, সুনীল?

তবু ভাল। চলেছিস তো হাজরা রোডে?

হাজরা রোডে? না, না,—

সুনীল তাহার হাত ধরিয়া টানিল, আরে—পালাচ্ছিস কেন।

ব্যাপার কি? অনুপম হাসিল।

মানে, নাচের ট্রায়াল—

বিশেষ আপত্তি ছিল না—তবু হাসির সঙ্গে অনুপম বলিল, এইমাত্র একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গেল।

সুনীল গতিহীন ট্রামশ্রেণীর পানে চাহিয়া বলিল, তাই তো হেঁটে যাওয়ার দুর্ভোগ! জ্বালাতন—অ্যাকসিডেণ্ট যেন লেগেই আছে।

দুর্ঘটনার বিবরণ সুনীলও শুনিতে চাহিল না, অনুপমও বলিবার আগ্রহ বোধ করিল না। জীবনের কার্য্যসূচিকে বিঘ্নিত করে বলিয়াই দুর্ঘটনাকে অবহেলার সঙ্গে দেখা স্বাভাবিক। সমস্যা অনেক রকমের আছে বলিয়াই একটিতে মগ্ন হইবার অবসর বড় কম।

পথ চলিতে চলিতে সুনীল বলিল, মিলিটারি লরির কাজ তো?

অনুপম উত্তর দিল না। মিলিটারি লরি সম্বন্ধে মানুষের মন্তব্য তার জানা আছে। প্রতিকারহীন আক্ষেপ—যুদ্ধ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য অথবা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার উল্লেখ।

সুনীলই বলিল, যাই বল—এত বড় ব্যাপারে ও আর কতটুকু। ও হবেই।

হবেই? সাবধান হওয়ার দরকার নেই?

দরকার গতির। স্পীড লিমিট তোমাদের কোডে আছে—ওদের সেটা কর্ত্তব্যচ্যুতি।

মানুষকে চাপা দিয়ে কষ্ট হয় না?

যন্ত্র কখনও মানুষকে মমতা করে!

মমতা? কথাটি বিদ্যুৎ গতিতে মনের অন্ধকার কোণে রেখা টানিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। যে যুগ পিছনে পড়িয়া রহিল—তাহারই পুরাতন শব্দসমষ্টির মধ্যে ওটি অন্যতম। কত করুণ কাহিনী ও কাব্যের বর্ণাবেশে ওটির অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে মৃত্যু এত সুলভ ছিল কি? আকস্মিক মৃত্যু? দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু? সে মহার্ঘ্য ও ভয়ঙ্কর ছিল বলিয়াই সস্তা ভাববিলাসিতায়—মমতার সৃষ্টি করিয়া কাব্যে—কাহিনীতে অশ্রুনদীকে বহাইবার উদ্যম ছিল। রঙ্গমঞ্চে দেখিতে দেখিতে চোখের উপর একটা যুগ শেষ হইয়া গেল। গিরিশ-অমর চন্দ্রের বক্তৃতা দানীবাবুর সঙ্গেই শেষ হইয়াছে—পুরাতন অভিনয় ধারা—যায় নাটকসমেত। সে যুগের রঙ্গমঞ্চকে তার ভাল মনে পড়ে না—শুধু বিজাতীয় জরি-চুম্‌কি-সলমা সজ্জিত ঝকমকে ভারী পর্দার মত জেলজেটের পোষাক—লম্বা তলোয়ার, অদ্ভুত ধরণের শিরস্ত্রাণ আর ষ্টেজ চ'ষে হাত পা নাড়িয়া বক্তৃতা শৈশব-স্মৃতিতে লাগিয়া আছে। আজ তাহা গবেষণার বিষয়—হাসির খোরাক। তবু বুড়োরা কত মমতার সঙ্গে সেই যুগের বর্ণনা করেন।

মঞ্জুলিকার নাচ দেখিতে দেখিতে এই সব কথাই বারবার মনে উঠিল।

সে নৃত্যভঙ্গিমাও আর নাই। (চোখের কুৎসিত ভঙ্গিমা এবং নিতম্বের স্থূল আন্দোলনও নহে।) ভারী পেশোয়াজটা দুই হাতে টানিয়া—কখনো বা ঝাঁপাইয়া চরকিবাজীর মত ঘুরপাক খাওয়া—মনে হইলেই হাসি লাগে। তবে একথা ঠিক স্থূলভাবে যে আবেদন নারীদেহের লাস্যে ভঙ্গিমায় মূর্ত্ত হইয়া আসরকে বিশৃঙ্খল হল্লোড়ে পরিণত করিত—সূক্ষ্ম ভাবে সেই আকৃতিই মনের সৌন্দর্য্যের পরদায় ঘা দিয়া—স্থূল কামনার বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া দেয়। প্রায় নগ্ন দেহবল্লরীর আবেদন—দেহাতীত কামনাকে উদ্দীপ্ত করে না নিশ্চয়। তবু এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৃষ্টিকে ধরা যায়।

সুনীল সেই কথাটাই কানে কানে বলিল।

অনুপম বলিল, মঞ্জুলিকার নাচ তুমি দেখনি এর আগে?

দেখেছি—দূর থেকে।

সেই তো ভাল। ষ্টেজের অ্যাক্‌টিং উইংসের পাশে বসে তারিফ করা যায় না।

কিন্তু সম্পূর্ণ গুণভাগ নিয়ে মনের আশাও তেমন মেটে কি! সম্পূর্ণতা যেন দূরের বস্তু।

কিসের আশা? অনুপম প্রশ্ন করিল।

সুনীল তাহার বাহুমূলে ক্ষুদ্র চিমটি কাটিয়া কহিল, আমরা সাধারণ কাদা দিয়ে তৈরি মানুষ—

অনুপম পুনরায় প্রশ্ন করিল, নাচ দেখতে এসে নাচের আর্ট ছেড়ে—নাচিয়ের সমালোচনা অবান্তর নয় কি?

মোটেই নয়। যাকে আশ্রয় করে নাচের বিকাশ তিনিই তো সেরা। ফুলটা শুধু গন্ধে বা রঙে সুন্দর নয়।

তোমার যুক্তি ভাল। অনুপম হাসিল।

জানিস—এই মঞ্জুকে একদিন ফিরপোর হোটেলে—

আঃ—ওর উদয়শঙ্করী পোজটা চমৎকার।

অত জানি না। নাচের গ্রেসটাই আমার কাছে আসল।

মুদ্রা বুঝি অচল?

সুনীল মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল, মুদ্রা কখনও অচল হয়? যদিও ওর স্ফীতিটা আজকাল বেড়েই চলেছে।

তাতে লাভ—না লোকসান?

লাভ তো বটেই। যুদ্ধের বাজারে আক্রা শুধু চাল চিনি। শহর দিয়ে চলতে চলতে দেয়ালগুলোতে খালি নজর রেখে চললে দেখবি—নতুন সংস্কৃতির চাষ-আবাদে আমরা সত্যই মনোযোগী হয়েছি।

অর্থাৎ?

ইম্‌প্রেসারিওর অভাব নেই—অভাব নেই নাম করা নাচিয়ে, গাইয়ে, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের। একটু যত্ন করে তোড়া বেঁধে সাজিয়ে ফেলতে পারলেই—ইন্‌ফ্লেশনের টাকা জলের স্রোতের মত নিম্নভূমি রঙ্গমঞ্চের মারফৎ তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের গহ্বরে এসে জমবে।

তুইও যে সিনিক হলি!

সত্যি না। এই সব দেখে ভারি আনন্দ হয়। যুদ্ধ জন্তু প্রকাণ্ড গুরুভার জিনিস—তার ষ্টীম-রোলারের চাপে যতই থেঁতলে যাবার মত হচ্ছি—এই সব প্রমোদ সূচির ফাঁক দিয়ে ততই আমরা আত্মরক্ষা করছি। এটা স্বাভাবিক। ইস্ দেখলি না পোজটা—? মুখে একটা অব্যক্ত আনন্দধ্বনি করিয়া সুনীল অনুপমের পিঠে অন্তরঙ্গ ভাবে একটা চাপড় মারিল।

নাচের সূক্ষ্ম কলারসে অন্তরের সৌন্দর্য্যপিপাসা উথলিয়া উঠিবার সঙ্কেত এ নহে, এ স্থূল মাংস-কামনার একটা ব্যক্ত উচ্ছ্বাস মাত্র। অনুপম নিজেও কম মুগ্ধ হয় নাই। পুরুষকে

লীলা-কলার দ্বারা নারীই শুধু জাগাইতে পারে—নারীই শুধু চালাইতে পারে! ট্রাম লাইনের দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। নিশ্চল নারী দেহ—রক্তমাখা তার আলুলায়িত কেশ—চকচকে ইস্পাতের দেহও শোণিত-প্রলেপে উজ্জ্বল। সেটা রক্তের বহিঃ-প্রকাশ—কাজেই নগ্ন বিভীষিকায় কামনাকে অনবরত ঘা মারিতেছে; আর ভঙ্গিতে—ভাবে যে রক্ত অতি সূক্ষ্ম চৌম্বক শক্তির মত রক্তকে আকর্ষণ করে—তা কামনাকে শোভায় বা স্বাদে কামার সামীপ্যে লইয়া যায়। ইনফ্লেশনের অর্থ পকেটের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে।

তার পর কয়েকটি নূতন মেয়েকে নাচের ভঙ্গিমা শেখানো হইল। মঞ্জুর মতই ওদের সৌন্দর্য্য আছে। রূপসজ্জায় ওরা নিখুঁত—কেহ কেহ রঙে বা দেহছাঁদে মঞ্জুকে ছাড়াইয়া গেছে। ঈষৎ ছেলেমানুষি ভাব—অকারণে হাসি কানের কাছে অবাধ্য অলকগুচ্ছকে লীলাভঙ্গি সহকারে মাঝে মাঝে সরাইয়া দেওয়ার কালে সুগাছি কঙ্কনের উঁচু পা'লশে বিদ্যুৎ-আলোর ঝলসানি, কাঁধের কোঁচানো শাড়ীটায় সুদৃশ্য মুক্তা-খচিত একটি পিন্ আটকানো—ইত্যাদি খুঁটিনাটি চিত্ত-উদ্দীপক ব্যবস্থাগুলি নিখুঁত—কিন্তু মঞ্জুর মন-ভুলানো দেহছন্দ ও মুদ্রা এখনও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। আয়ুধের শোভা আছে—ধারও আছে, একটু পালিশ করিয়া লইবার অপেক্ষা শুধু।

ও কে জানিস? প্রফেসার কে মিত্তিরের মেয়ে সুরমা। এবার এম-এতে সংস্কৃত নিয়েছে। আর ওর পাশে—তৃপ্তি বোস। যাদুকর বসুর একমাত্র কন্যা। বাবার ইন্টারন্যাশনাল ফেম আছে—মেয়েও তাই জোগাড় করতে চায়, অবশ্য আর এক পথে। তার সামনে সুরুচি ব্যানার্জ্জি—ব্যারিষ্টার ব্যানার্জ্জির—

পরিচয় দেওয়া শেষ হইল না—একজন আধাবয়সী লোক উঠিয়া সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমরা কাল ঠিক করেছি এবারকার চ্যারিটির টাকা শুধু আর্ট বা ক্লাবের পোষণে ব্যয় করব না, কিছুটা দুঃস্থদের দিয়ে দেব।

একজন সুবেশ যুবক বলিল, তাতে লাভ! সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়ার প্রয়োজন?

বক্তা সেদিকে ফিরিয়া কহিলেন, প্রয়োজন আছে বই কি। হিউম্যানিটারিয়ান—

বাংলাতে বলুন।

বক্তা বিপন্ন মুখে কহিলেন, ওর বাংলা না বললেও আশা করি কেউ ভুল মানে করবে না। মানে দুর্গত জনগণের কল্যাণে—

ওদের কল্যাণ সাধন করব আমাদের কি এমন ক্ষমতা!

সবাই তাই করছে। একের ক্ষমতায় অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু সকলের চেষ্টা—

বাজে বাজে, যারা মরে তাদের জীইয়ে রাখার কোন মানে হয় না। গামলায় সিঙি মাছ জীইয়ে রাখার মত শুধু কষ্ট বাড়ানো।

আর একজন প্রশ্ন করিল, কার কষ্ট?

কষ্টটা আমাদেরই। ওরা উপদ্রবের মত আমাদের সর্ব্বদা ব্যস্ত করছে। যাদের ঘর ভেঙেছে—পরের ঘরে হানা দেওয়া তাদের বন্ধ করা উচিত।

ভাগ্যি আইন তোমার হাতে নেই!

হাসির একটা স্রোত উত্তাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু প্রস্তাবকারী ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিলেন।... জীবনকে বাঁচাইবার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করে। নিজের জীবন এবং পরের জীবন। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ভারতের শিক্ষা। সে শিক্ষা অবশ্য পুরাতন, কিন্তু নূতন মোড়কে নূতন ভঙ্গিমায় বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রশংসা ক্লাবে, বন্ধুর ঘরে, সভা-সমিতিতে, সাহিত্য-সভায় এমন কি ভোজনের টেবিলেও সংক্রামিত হইয়াছে। পুরাতনের দোষ-ভাগটুকু অসার নীরের মত বর্জ্জিত হইয়াছে। মমতা? নূতন বিধানে ওটিকে বিলুপ্ত করিয়া যুক্তিকে দাঁড় করানো হইয়াছে। যে বিধান মানিয়া লওয়াতে মানব-সমাজের কল্যাণ যথেষ্ট।

ব্রাভো—সাবাস—মার্ভেলাস।

বক্তৃতা শেষে ঘর্ম্মাক্ত মুখে বক্তা আসন গ্রহণ করিলেন। সুদৃশ্য রুমালখানা মুখের উপর চাপিয়া উৎসাহপ্রদীপ্ত করতালির ধ্বনিটুকু নীরবে খানিকক্ষণ উপভোগ করিলেন।

জানালার বাহিরে একটা মিশ্র কোলাহল বহুক্ষণ হইতেই উঠিতেছে। দুর্গত জনেরা চেঁচাইতেছে। কোথাও কোন সভা জমিলে, পার্টি বসিলে ওরা ভাবে ভোজের ব্যবস্থাও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মোটরের রঙ বা পালিশ বা মডেল দেখিতে ওরা ব্যগ্র নহে, তবু মোটর ঘিরিয়া ওদের কোলাহল জমে। লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূমিতে—পুরানো কৃপাকণার সন্ধানে ওরা প্রভূত পরিশ্রম করে। সভা মাত্রেই যেমন ভোজনের আসর নয়—মোটর মাত্রেই তেমনই পুরানো জিনিসকে সর্ব্বপ্রকারে লালন করিবার চেষ্টা নাই। ভোজ্যলোভীদের ভুল তাকে আবার নূতন করিয়া ভুলও তাহারা করে।

লঘু ভোজের ব্যবস্থা ছিল। পুডিং, চপ, নিমকি এবং মাংসের সঙ্গে চা। ক্লাবের সভ্যেরা সকলেই কিছু সাধারণ নহেন। পথে কয়েকখানি মোটরও দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য অবশ্য জলযোগের আয়োজন নহে, এটিও রিক্রিয়েশনের একটি অঙ্গ। দামী বস্ত্রগুলার মূল্যও উঁহারা পূরণ করিয়া দেন।

মেয়েদের সকলের মোটর নাই, উৎসাহী মোটরওয়ালারা একটা লিফ্ট অফার করিতেছে। একটু ঘুরিয়া বালিগঞ্জ প্লেসে যাইতে হয়—পেট্রোলের রেশনিং আছে। তা হোক, পিছনের কালো বাজারে এবং আরও অনেক কৌশলে পেট্রোলটা প্রচুর পরিমাণে জোগাড় না হউক—তরুণী মেয়েদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়ার মত কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। আইন ভ্রূকুটি দেখায় গরীবদের, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে; পাতি বুর্জ্জোয়াদের কাছে তার অন্য অর্থ।

সুনীল বলিল, যুদ্ধ মিটলে আমিও মোটর কিনব একখানা।

অনুপম বলিল, মোটর তখন অচল হয়ে যাবে। প্লেনে করে মানুষ এবাড়ি-ওবাড়ি না করুক—এদেশ-ওদেশ তো করবেই।

ঠিক কথা, ছোট একখানি জিপ্‌সি মাথ্‌জয় রাইডের জন্য—কতই আর দাম হবে! ফোর্ডের কারখানায় ফোর্ডের মোটরের মতই প্রচুর জন্মাবে।

একটি মেয়ে সুনীলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, উঠছেন যে মিঃ রয়?

সুনীল কব্জি উল্টাইয়া বলিল, আর এক জায়গায় এন্‌গেজ-মেণ্ট আছে—

আপনার বন্ধুকে তো চিনতে পারলুম না।

ওহো—মাপ করবেন। ইনি একজন উদীয়মান লেখক অনুপম—

নমস্কার—ভারি মিষ্টি আপনার লেখা।

অনুপম মৃদুহাস্যে মাথা নামাইল। বুকে গৌরব বোধ, মুখে লজ্জায় মেদুরতা।

আসুন না একদিন আমাদের আলাপনীতে—ওখানে অনেক নামকরা সাহিত্যিক আসেন।

ধন্যবাদ।

সুনীল বলিল, রেখা দেবী সাহিত্যের বহু বিভাগেই কিছু কিছু চর্চ্চা করে থাকেন। ওঁকে আমরা কলা-লক্ষ্মী বলে থাকি।

রেখা দেবী সলজ্জে মাথা নামাইয়া ও চক্ষুর অপরূপ ভঙ্গি করিয়া কহিল, আপনি এমনও অপ্রস্তুত করেন লোককে!

অপ্রস্তুত! ঝরণায় আপনার কবিতা বেরয় নি? সঙ্গীত-বিজ্ঞানে স্বরলিপি? বঙ্গদেশে—সেই বাল্মীকি ছবিখানা নিয়ে অত হৈ চৈ হ'ল—সেটা কার?

রেখা কহিল, জ্যাক্‌ অব অল ট্রেড মার্কা আমরা—ওঁদের মত কিছুতে তেমন নাম করতে পারি নি ত।

নাম আপনার লুকোনো থাকবে না। নিশ্চয় জানবেন—

রেখা আড়চোখে অনুপমের পানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা আপনি কি আমার লেখা পড়েছেন?

সত্য বলিতে কি অনুপম পড়ে নাই। কিন্তু উদীয়মান লেখকের পক্ষে সাহিত্যের খুঁটিনাটি সংবাদ না জানাটাও গৌরবের নহে। অবশ্য বিখ্যাত হইবার পর অনায়াসে লেখা পড়িয়াও লেখা পড়িবার অবসর হয় নাই বলা চলে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখকরা (এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া অল্প-প্রসিদ্ধরাও) সহসা মতামত প্রকাশে কার্পণ্য করেন। কিন্তু অন্তরে তাঁহারা সচেতন।

অনুপমের নিজেরই জীবনে এমন দুই-একটা ঘটনা ঘটিয়া গেছে।

কোন একজন স্রষ্টা-সাহিত্যিক একবার তাহাকে তাঁহার ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। সত্য বলিতে কি অনুপম সেটি প্রথম সংখ্যা হইতে পড়িতেছিল। একখানা মাসিকে কতটুকু বিষয়বস্তুই বা থাকে—বিজ্ঞাপন সমেত সবটা শেষ করিতে বড়জোর দিন দুই লাগে! কিন্তু নভেলখানা তার ভাল লাগে নাই, কেমন যেন নিমন্ত্রণের দায়ে জোড়াতাড়া দিয়া লেখা। সাহিত্য-সাধনায় খুব বেশি দূর অগ্রসর না হইলেও—দরদ ও তাগিদের লেখার পার্থক্য সে বুঝিতে পারে। অপ্রিয় সত্য কথা সে বলিতে পারে নাই। বলিয়াছিল, ধৈর্য্য থাকে না বলিয়া মাসের পর মাস বড় উপন্যাসের অনুসরণ করা কঠিন। সবটা শেষ হইলে—ছাপান বই হাতে না পৌঁছুক অন্ততঃ মাসিকগুলি একত্র করিয়া সে পড়িয়া ফেলিবে। সাহিত্যিক ক্ষুণ্ণ হইয়া আর কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আলাদা কথা। রেখা দেবী লিখিয়াছেন ছোট একটি কবিতা—এক নিশ্বাসে যা পড়া যায়। এবং রেখা দেবীকে প্রথম আলাপেই অখুশী করিবার ইচ্ছাও তার নাই।

হাসিমুখে সে কহিল, নিশ্চয় পড়েছি। চমৎকার।

সুনীল বলিল, কতকগুলো অমর লাইন পর্য্যন্ত আমার মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবৃত্তি করিল:

রাতের তারার মত তোমার কামনা-আঁখি
মন-বাতায়নে মোর—কি যেন লইল দেখি।

রেখা তাহাকে থামাইয়া সলজ্জকণ্ঠে কহিল, সীন ক্রিয়েট করবেন না।

অনুপম বলিল, চমৎকার লাইন দুটি!

কি রে রেখা—আর একটি তরুণী আলাপ-সূত্রে উঁকি মারিল।

এই ইনি—উদীয়মান লেখক গাইয়ে অনুপম—রেখা বিষন্ন মুখে সুনীলের পানে চাহিল।

সুনীলও পাদপূরণ করিতে পারিল না। আলাপটা ঘটে দক্ষিণ-কলিকাতার কোন একটি গানের মজলিসে। গায়কের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিলেও পদবী-পুচ্ছের খবরটা তার জানা নাই।

নবাগতা মেয়েটিরও সৌজন্যবোধ আছে। সে যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া কহিল, ভারি আনন্দ হ'ল।

রেখা বলিল, আমাদের আলাপনীতে ওঁকে আসবার জন্য বললুম।

বাঃ—বেশ হবে রেখা! কাল আসবেন?

অত্যুৎসাহী মেয়েটিকে সম্পূর্ণ নিরাশ না করিয়া অনুপম বলিল, এর মধ্যে হয়ে উঠবে না—আসছে রবিবার—

রেখা বলিল, ওঁরা লেখক মানুষ—ওঁদের ফুরসত কম। যেটুকু সময় সৃষ্টিকার্য্যে দিতে পারেন—তা অনর্থক নষ্ট করবার জন্য অনুরোধ করা উচিত নয়। অনুপমের পানে ফিরিয়া হাসিমুখে কহিল, বুঝি সব—অথচ আপনাকে নিয়ে একদিন আলাপ না জমালে তৃপ্তি হচ্ছে না। জানিস দিদি—একদিন দুপুর বেলায় বসে লিখছিলাম। দুপুরের আকাশে একটা চিল পাক খেয়ে চলেছে, রোদের তাপে ওর ক্লান্তি নেই—। বেশ মুডের সঙ্গে লিখছি—মণ্ট নাচতে নাচতে ঘরে না ঢুকে—

লঘু জলযোগ শেষে সকলে আসন ত্যাগ করাতে বেশ কোলাহল উঠিল। দুরন্ত মণ্টুর মতই—অরসজ্ঞ গুঞ্জনের ধ্বনি রেখার একান্ত সাধনার মর্ম্ম কথাটি শেষ করিতে দিল না।

আচ্ছা—নমস্কার। আসবেন নিশ্চয়।

ক্রমশঃ

খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি

শ্রীগণেশচন্দ্র কর্মকার, এম্-এস্‌সি

উত্তাপ, প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আমরা বাকি উপকরণগুলি যথা—খনিজ পদার্থ, জল ও ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

খনিজ পদার্থ

রক্ত, অস্থি, দন্ত প্রভৃতির উৎপত্তি ও গঠনের নিমিত্ত কতকগুলি খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। এগুলিও দেহগঠনের প্রয়োজনীয় উপকরণ। আমাদের দেহে কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থ কি কি পরিমাণে আছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া গেল :

৪ নং তালিকা

দেহের ভিন্ন ভিন্ন খনিজ পদার্থের পরিমাণ (পূর্ণবয়স্ক যুবক)

ক্যালসিয়াম	১০৫০	গ্রাম
ফস্‌ফরাস	৭০০	"
পটাসিয়াম	২৪৫	"
গন্ধক	১৭৫	"
সোডিয়াম	১০৫	"
ক্লোরিন	১০৫	"
ম্যাগনেসিয়াম	৩৫	"
লৌহ	২·৮	"
তাম্র	অতি অল্প পরিমাণ	

শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে উপরি-উক্ত সবগুলি খনিজ পদার্থের এবং ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি পদার্থের প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও লৌহের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং আমাদের খাদ্যে ইহাদের অভাব হইবার সম্ভাবনাও আছে। সেইজন্ত ইহাদের বিষয় দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। সোডিয়াম ও ক্লোরিন (সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সংমিশ্রণে যে লবণের সৃষ্টি হয় সে লবণ আমরা খাদ্যের সহিত প্রত্যহ গ্রহণ করি) এই দুইটি পদার্থও আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজনে লাগে। উপবাসের সময় এবং ঘামিলে ও মূত্র ত্যাগ করিলে এই লবণের ব্যয় অত্যন্ত বেশী হয়। সেইজন্ত অধিক দিন উপবাসকালে লবণজল খাইতে হয়। আমাদের খাদ্যে এই উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং তাহার উপর আমরা ভাত ও তরকারির সহিত যেটুকু লবণ গ্রহণ করি তাহা অধিকন্ত। যদি ইহা বাদ না পড়ে তাহা হইলে ইহার অভাবের ভয় খুব কম।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস

ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও অক্সিজেনে মিলিয়া ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট নামক এক পদার্থের সৃষ্টি হয়। আমাদের দন্ত ও অস্থির বেশীর ভাগই ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট দিয়া গঠিত। সেইজন্ত যে সকল ছোট ছোট শিশুর অস্থি বর্দ্ধনশীল তাহাদের ও প্রসূতিদের এই দুই পদার্থের প্রয়োজন খুব বেশী। ক্যালসিয়ামের অভাবে আমাদের হৃৎপিণ্ড ঠিকমত ধুকধুক করে না, মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া অঙ্গসঞ্চালনে সে রকম সাহায্য করে না এবং দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে রক্তস্কন্দন (clotting) হয় না ও রক্তপাত বন্ধও হয় না। আমাদের দেহের অস্থিগুলি সর্ব্বদাই কিছু কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মলের সহিত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রূপে নির্গত হয়। সুতরাং শিশুদের যেমন অস্থিগঠনের জন্ত ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন যুবক ও বৃদ্ধদের তেমনি সেই ক্ষয় পূরণের জন্তও এই পদার্থের প্রয়োজন। ডিম, দুধ, মাছ ও শাকসব্জীতে এগুলি বেশ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। কিন্তু এই সকল খাদ্য সুলভ নয় বলিয়া ইহাদের অভাবের ভয় খুব বেশী। যে সমস্ত শিশু আহারের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পায় না তাহাদের অস্থি পুষ্ট ও সবল হইতে পারে না। সুতরাং শিশুদের ও প্রসূতিদের খাদ্যে এই দুই পদার্থের অভাব যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে [illegible] করিয়া লক্ষ্য রাখা উচিত। ক্যালসিয়াম শোষণে ভাইটামিন ডি-র প্রভাব সবচেয়ে বেশী। ভাইটামিন ডি-র অভাব হইলে আমরা যতই ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস খাই না কেন ইহারা ঠিকমত শোষিত হইবে না এবং আমাদের দেহের অস্থিকে পুষ্ট ও সবল করিতেও পারিবে না। আর একটি বিষয় স্মরণে রাখা দরকার—আমাদের খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত। যদি ক্যালসিয়াম বেশী ও ফসফরাস কম হয় কিম্বা ক্যালসিয়াম কম ও ফসফরাস বেশী হয় উভয় ক্ষেত্রেই এগুলি ঠিকমত শোষিত হয় না এবং রিকেট রোগ দেখা দেয়। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমান সমান কিম্বা ক্যালসিয়াম অপেক্ষা ফসফরাসের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বেশী—ইহাই ক্যালসিয়াম ফসফরাসের উপযুক্ত অনুপাত। আমাদের দৈনিক কতটা পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজন তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :

৫ নং তালিকা

দৈনিক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজন

বয়স	ক্যালসিয়াম গ্রাম	ফসফরাস গ্রাম
শিশু, ৬ মাস হইতে ৩ বৎসর	০·৮	১
বালক ৩ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর	১	১·২৫
কিশোর, ১৩ বৎসর হইতে ২২ বৎসর	২	২·৫
যুবক	০·৭৫	১
প্রসূতি	২	২·৫

একগ্রাম ক্যালসিয়াম পাইতে হইলে প্রায় ১ সের দুধের প্রয়োজন, অথচ আমাদের দেশের সাধারণ লোকের তাহা সংগ্রহ করিবার সঙ্গতি নাই। প্রসূতিদের প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। সুতরাং দুধ, ডিম যদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না যায় তাহা হইলে খাদ্যে ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট, ক্যালসিয়াম

গ্লুকোনেট কিম্বা ক্যালসিয়াম গ্লিসারোফসফেট পৃথক ভাবে যোগ করা কর্ত্তব্য।

লৌহ

রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত কণিকাগুলি যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তন্মধ্যে লৌহ প্রধান। লোহিত কণিকাগুলির মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামে এক পদার্থ আছে, তাহা লৌহ এবং অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা গঠিত। রক্তের লোহিতবর্ণের জন্য এই হিমোগ্লোবিনই দায়ী। হিমোগ্লোবিন ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্যাস বহন করিয়া দেহের বিভিন্ন কলাকে দেয় এবং সেখান হইতে কারবন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস লইয়া আসিয়া ফুসফুসে ফেরত দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে হিমোগ্লোবিন তথা লৌহ আমাদের কত উপকারী।

প্রাণীর দেহে সর্ব্বদাই রক্তের ক্ষয় ও সৃষ্টি হইতেছে। নূতন রক্ত সৃষ্টির জন্য লৌহ এবং অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন। যে-সকল দরিদ্র ভাত ভিন্ন অন্য কোন ভাল খাদ্য খাইতে পায় না তাহাদের রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। ম্যালেরিয়া রোগেও রক্তাল্পতা হয়। ম্যালেরিয়ার বীজাণুগুলি রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে বৃদ্ধি পায়। কিছুকালের মধ্যে রক্তকণিকাগুলি ফাটিয়া যায় এবং এই ভাবে রক্ত নষ্ট হয়। যাহার কয়েক বার ম্যালেরিয়া হইয়াছে তাহার রক্ত অত্যন্ত তরল ও অল্প। হুকওয়ার্ম রোগে এক জাতীয় কীট দেহের অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া রোগীর রক্ত শোষণ করে বলিয়া রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা রক্তাল্পতা রোগে বেশী ভোগে, বিশেষতঃ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। বোধ হয় এ অবস্থায় শিশু মাতার দেহের সঞ্চিত লৌহের খানিকটা টানিয়া লয়। রক্তাল্পতা হেতু অনেক স্ত্রীলোক ঘন ঘন এবং ছোট ছোট শ্বাস প্রশ্বাস লয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই রক্তাল্পতা রোগ অন্য যে কোন দেশের জননীদের অপেক্ষা ভারত-জননীদের বেশী; ইহার কবলে পড়িয়া কত জননী অকালে প্রাণত্যাগ করেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুধে লৌহের ভাগ খুব কম, তথাপি শিশুদের পক্ষে ইহার অভাব হয় না। তাহার কারণ এই যে শিশুরা মাতৃগর্ভ হইতে তাহাদের যকৃৎ ও প্লীহায় যথেষ্ট লৌহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং যত দিন তাহারা স্তনদুগ্ধ পান করে তত দিন তাহাদের লৌহের অভাব হয় না। কিন্তু যদি তাহাদিগকে অধিক দিন ধরিয়া স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য খাদ্য না দেওয়া হয় তাহা হইলে কিছুকাল পরে তাহাদেরও রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে শুধু লৌহেই রক্তাল্পতা রোগ দূর হয় না, সঙ্গে কিছু তাম্র বর্ত্তমান থাকারও প্রয়োজন। খাদ্যে যে পরিমাণ লৌহ থাকে তাহার কিয়দংশ শরীরে শোষিত হয়। শিশুদের দুই মাসের পর শরীরের প্রতি সের ওজন হিসাবে দৈনিক প্রায় ০·৫ মিলিগ্রাম * লৌহ ও ০·১ মিলিগ্রাম তাম্রের প্রয়োজন। যুবকদের দৈনিক ১০ মিলিগ্রাম লৌহের প্রয়োজন এবং যুবতী ও শিশুদের ১২·৫ মিলিগ্রাম প্রয়োজন। তাম্রের প্রয়োজন লৌহের এক পঞ্চমাংশ। ঋতুকালে স্ত্রীলোকদের রক্তস্রাব হয় বলিয়া এই সময়ে তাহাদের লৌহের প্রয়োজন খুব বেশী। নবজাত শিশুদের যকৃৎ ও প্লীহায় যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ থাকে এবং সেই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের দৈনিক প্রায় ২০ মিলিগ্রাম লৌহের প্রয়োজন। প্রসূতিদের খাদ্যেও এই পরিমাণ লৌহ থাকা উচিত।

ভাত ও দুধে লৌহ খুব কম আছে। বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় যকৃৎ, ডিম, মাছ, মাংস, থোড়, কাঁচকলা প্রভৃতিতে। ইহা ভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজীতেও পাওয়া যায়।

* ১০০০ মিলিগ্রামে ১ গ্রাম হয়

জল

জীবনধারণের জন্য জল অপরিহার্য্য। খাদ্যে সাধারণতঃ তিন-চতুর্থাংশ জল থাকে। আমাদের দেহে যে নানা প্রকার রস আছে তাহারও তিন-চতুর্থাংশ কি আরও বেশীর ভাগ জল। খাদ্য জলে মিশ্রিত হইয়া তরল হয় বলিয়া পরিপাকের সুবিধা হয়। জল ছাড়া পাচক রস খাদ্যের সহিত ভাল ভাবে মিশ্রিত হইতে পারিত না ও খাদ্যকে সহজে হজম করাও যাইত না। আমরা যে জল খাই তাহা নিষ্কাষণ হইবার প্রধান পথ তিনটি, যথা ফুসফুস, শরীরের ত্বক্‌ ও মূত্রাশয়। প্রাণীর শরীরে যত প্রকার রস আছে—যেমন রক্ত, পাচক রস ইত্যাদি, ইহাদের প্রত্যেকটি জল মিশ্রিত। আমাদের দেহ যেমন একখানা অস্থির দ্বারা গঠিত হইলে আমাদের চলাচলের অসুবিধা হইত সেই রূপ জল বিনা আমাদের দেহ-রসের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত না। আমাদের দেহে জলের অভাব হইলে আমরা পিপাসা অনুভব করি এবং তখন জল পান করিয়া সেই অভাব পূরণ করি। সুতরাং দেহে জলের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। শিশুদের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় ভ্রম হইয়া থাকে। কোন শিশু কাঁদিলে মাতা মনে করেন শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু সকল সময় ইহা সত্য নহে। তাহারা পিপাসার্ত্ত হইলেও কাঁদিয়া থাকে এবং মাতার এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

পূর্ব্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্ব্বোহাইড্রেট, খনিজ পদার্থ ও জল খাইয়া যে কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে। কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নহে তাহা পরে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইল। ইউরোপীয় বিজ্ঞানী হপকিনস কতকগুলি ইঁদুরকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কৃত্রিম খাদ্য খাইতে দিয়াছিলেন। ঐ কৃত্রিম খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্ব্বোহাইড্রেট এবং খনিজ পদার্থ যথোপযুক্ত পরিমাণে ছিল। কয়েক দিন পর দেখা গেল যে ইঁদুরগুলির ওজন কমিতেছে এবং তাহারা এক এক করিয়া মরিয়া যাইতেছে। যখন তিনি তাহাদিগকে একটু করিয়া দুধ খাইতে দিলেন তখন বাকি ইঁদুরগুলির প্রত্যেকটি বাঁচিয়া গেল এবং তাহাদের দেহের ওজনও বাড়িতে লাগিল। খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব তখন জানা ছিল না বলিয়া তিনি শুধু এই কথাই বলিলেন যে দুধের মধ্যে প্রোটিন, স্নেহ-

দ্রব্যাদি ব্যতীত আরো কিছু আছে যাহা আমাদের প্রাণধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইগুলি না হইলে শুধু যে দেহের ওজন কমে তাহা নয়, নানা প্রকার ব্যাধিও দেহকে আক্রমণ করে।

হপকিনস এই পরীক্ষা ১৯০৬ সালে করিয়াছিলেন। সে যুগে লোকের ধারণা ছিল যে ব্যাধি সাধারণতঃ বীজাণুর দ্বারাই সংঘটিত হয়। সুতরাং লোকে হপকিনসের কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। আমেরিকাতেও সেই যুগে অসবর্ণ ও মেন্‌ডেল নামে দুই জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী দেখাইলেন যে কেবল মাত্র কৃত্রিম খাদ্য খাইয়া কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। দেখাইলে কি হইবে; বিজ্ঞানীরা যাহা আজ প্রমাণ করেন, জনসাধারণ তাহা বেশ কয়েক বৎসর পরে গ্রহণ করে।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর যখন নাবিকদের জাহাজে করিয়া অনেক দিন ভ্রমণ করিতে হইত তখন তাহারা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হইত। তাহারা এই ব্যাধিকে 'নাবিক সঙ্কট' (Calamity of Sailors) এইনাম দিয়াছিল। তাহারা জানিত যে টাটকা শাকসবজী ও ফলমূলের রস খাইলে এই রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কেন তাহারা জানিত না। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বেরিবেরি অত্যন্ত সাধারণ রোগ ছিল এবং বার্লি, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাইলে এই রোগ সারিয়া যাইত, কিন্তু আরোগ্যের কারণ তাহাদের অজ্ঞাত ছিল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইজম্যান (Eijkman) আতপ চাউল বা কলে ছাঁটা চাউল খাওয়াইয়া কতকগুলি মোরগের মধ্যে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বীজাণুবিদ্‌গণের (bactereologist) প্রভাব তাঁহার উপরও কম ছিল না, সুতরাং তিনি বলিলেন যে চালে অন্ধবিষ (toxin) নামে এক প্রকার পদার্থ আছে এবং ইহাই এই রোগের কারণ। ক্ষতিকর কোন পদার্থ দেহে প্রবেশ করিলে কিম্বা দেহের মধ্যে উৎপন্ন হইলেই রোগ হয়—তখনকার মত ছিল এই। খাদ্যদ্রব্যে কোন উপকরণের অভাব হইলে যে হইতে পারে এই ধারণা তখন ছিল না। যাহা হউক, ইজম্যানের পরীক্ষায় আমরা অনেকখানি সত্যের আলো পাইয়াছি, সেজন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে হোল্ট (Holst) এবং ফ্রলিচ (Frolich) কয়েক প্রকার শস্য খাওয়াইয়া গিনিপিগদের মধ্যে স্কার্ভি রোগের সৃষ্টি করিলেন এবং পরে দেখাইলেন যে টাটকা শাকসবজী দিয়া এই রোগগ্রস্ত প্রাণীগুলিকে নিরাময় করা যায়। তার পর হপকিন্‌সের পরীক্ষার ফল ১৯১২ সালে মুদ্রিত হইল। সুতরাং তখন দৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হইল যে বেরিবেরি, স্কার্ভি প্রভৃতি রোগ খাদ্যে কোন প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ঘটিলে হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত রোগ বীজাণু-ঘটিত নয়।

অসবর্ণ, মেন্ডেল, ম্যাককলাম, ডেভিস এবং আরও দুই এক জন বিজ্ঞানী মিলিয়া ঠিক করিলেন যে দুধে এমন দুই প্রকার উপকরণ আছে যাহা আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়: এক প্রকার উপকরণ দুধের জলে থাকে এবং আর এক প্রকার দুধের স্নেহ পদার্থে থাকে। ফাঙ্ক ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই সমস্ত অপরিচিত উপকরণের নাম দিলেন ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। দুধের স্নেহপদার্থে যে ভাইটামিন থাকে তাহার নাম দিলেন ভাইটামিন 'এ' এবং দুধের জলে যে ভাইটামিন থাকে তাহার নাম দিলেন ভাইটামিন 'বি'। ইহাই গেল ভাইটামিন আবিষ্কারের প্রথম কথা। বর্ত্তমানে আরও অনেকগুলি ভাইটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন এক এক করিয়া তাহাদের কথা বিবৃত হইবে। ভাইটামিন অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে খাদ্যে থাকে এবং আমাদের দেহের উপর এগুলির প্রক্রিয়া প্রণালী সম্বন্ধে আমরা সকল ক্ষেত্রে এখনও সবিশেষ জানি না।

ভাইটামিন 'এ'

ভাইটামিন 'এ' টাটকা শাকসব্‌জী, গাজর, দুধ, ঘি, ডিম, মাছের ও অন্যান্য প্রাণীর যকৃতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কচুরী পানায় ভাইটামিন 'এ' যথেষ্ট পাওয়া যায় কিন্তু ইহা আমাদের খাদ্য নহে। ভাইটামিন 'এ' এই পানা হইতে বাহির করিয়া লইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং সে প্রচেষ্টাও বর্ত্তমানে চলিতেছে। ইহা সাধারণতঃ তৈল বা ঐ জাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়, জলে হয় না। ভাইটামিন 'এ' খুব শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিবার সময়। রন্ধনের সময় ভাইটামিন 'এ' যত শীঘ্র নষ্ট হয় তত শীঘ্র আর কোন ভাইটামিন নষ্ট হয় না। ভাইটামিন 'এ' উত্তাপ এবং অতিবেগুনী (আল্‌ট্রাভায়োলেট) আলো সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যত অল্পক্ষণ জ্বাল দিয়া রন্ধন করা চলে ততই ভাল। দুধ একবার ফুটিলেই উনুন হইতে নামান উচিত। কোন কিছু ভাজিবার সময় এই ভাইটামিন আরও বেশী নষ্ট হয়।

আমাদের দৈনিক এক মিলিগ্রাম ভাইটামিন 'এ'-র প্রয়োজন। শিশুদের, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ও প্রসূতিদের প্রয়োজন আরও বেশী—প্রায় দুই মিলিগ্রাম্। 'এ' ভাইটামিনের অভাবে যে যে ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তাহা বিবৃত করা হইল :

১। রাত্রিকালে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়। অনেক দিন ধরিয়া এই ভাইটামিনের অভাব হইলে চক্ষুর কোণে এক প্রকার ক্ষত হয় এবং রোগী চক্ষুর সম্মুখে নানা প্রকার ছায়া দেখে। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত চোখের মণি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসে। ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ নরনারী অন্ধ—এই ভাইটামিন 'এ'র অভাবে।

২। প্রাণীর দেহের ওজন বৃদ্ধি ক্রমশঃ ব্যাহত হইতে থাকে এবং শেষে ওজন বৃদ্ধি না হইয়া কমিতে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়।

৩। যাহাদের শরীরে ভাইটামিন 'এ' কম তাহারা সাধারণতঃ বেশী রোগপ্রবণ হয়। সুতরাং ভাইটামিন 'এ'-কে রোগ-প্রতিষেধক বলা হয়।

৪। ভাইটামিন 'এ'-র অভাবে শরীরের ত্বক্ শুকাইয়া ফাটিয়া যায় এবং খসখসে হইয়া যায়। কখন কখনও ত্বকের উপর ছোট ছোট গুটি বাঁধে (papules)—উহা উরুর পিছনে, হস্তে এবং স্কন্ধে প্রথম দেখা দেয়।

ভাটামিন 'বি'

ভাইটামিন 'বি' গম, আটা, কড়াই, মটর, ইষ্ট (yeast) ও চালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গম যাঁতায় ভাঙ্গিয়া লইলে ভাইটামিন 'বি' প্রায় সম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভাঙিবার সময় কলে গম যে পরিমাণ গরম হয় তাহাতে ভাইটামিন 'বি' খুব সামান্য নষ্ট হয়। ভাইটামিন 'বি' চালের উপরিভাগে থাকে এবং ধান সিদ্ধ করিবার সময় ইহা চালের ভিতর খানিকটা প্রবেশ করে। ভাইটামিন 'বি' আতপ চালে প্রবেশ করিবার এই সুযোগ পায় না, কারণ আতপ চাল সিদ্ধ করা হয় না। ভাইটামিন 'বি' জলে দ্রবীভূত হয় কিন্তু কোন তৈলাক্ত পদার্থে হয় না এবং সেই কারণে ইহার যে অংশ উপরিভাগে থাকে তাহা চাল ধুইবার সময় এবং সিদ্ধ করিবার সময় জলের সহিত চলিয়া যায়। কিন্তু যে অংশ চালের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তাহা সহজে বাহির হইতে পারে না। আতপ চালে সমস্ত ভাইটামিন 'বি' উপরিভাগে থাকে এবং চাল ধুইবার ও সিদ্ধ করিবার কালে ইহা জলের সহিত ধুইয়া যায়। এই দিক হইতে সিদ্ধ চাল আতপ চাল অপেক্ষা বেশী উপকারী। চাল বারে বারে ধোয়া উচিত নয়, কারণ যত বার ধোয়া যায় ততবার খানিকটা করিয়া ভাইটামিন 'বি' নষ্ট হয়, এবং প্রথম বার ধোয়ায় বেশী নষ্ট হয়। উপরন্তু চাল ধুইবার পরও যেটুকু ভাইটামিন 'বি' থাকে রন্ধনের সময় তাহার এক অংশ ফেনের সহিত চলিয়া যায়। সুতরাং ফেন ফেলিয়া দিলে আমরা কতকটা ভাইটামিন 'বি' হারাই বলিয়া, উচিত হইতেছে কম জলে ভাত রান্না করা যাহাতে ফেন আর ফেলিতে না হয়।

ভাইটামিন 'বি' চালের উপরিভাগে থাকে এবং সেই কারণে ধান কলে ছাঁটাই করিবার সময় ইহার অধিকাংশ কুঁড়ার সহিত উঠিয়া যায়। কলে এক বার ছাঁটাই করিলে শতকরা ৫০ ভাগ ভাইটামিন 'বি' নষ্ট হয়, দুই বার ছাঁটাই করিলে ৭৫ ভাগ এবং তিন বার ছাঁটাই করিলে ৭৫ ভাগেরও বেশী নষ্ট হয়। ধান ঢেঁকিতে ছাঁটাই করিলে ভাইটামিন 'বি' নষ্ট হইবার সুযোগ থাকে না, কারণ ঢেঁকিতে ছাঁটিলে বেশী কুঁড়া বাহির হয় না। সেই কারণে ঢেঁকি ছাঁটা চাল কলে ছাঁটা চাল অপেক্ষা বেশী উপকারী। সাদা ময়দা বা আটাতে ভাইটামিন 'বি' প্রায় থাকে না। সাধারণ রন্ধনে যে উত্তাপ লাগে তাহাতে ভাইটামিন 'বি' বেশী নষ্ট হয় না।

আমাদের দৈনিক প্রায় এক মিলিগ্রাম ভাইটামিন 'বি'-র প্রয়োজন। প্রসূতিদের ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রয়োজন ইহার প্রায় দুই গুণ। কোন কোন প্রাণী নিজের দেহের মধ্যে ভাইটামিন 'বি' প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু মানুষ পারে না। ভাইটামিন 'বি'-র অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি হয়, যেমন :

১। ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে শরীরের তাপ কমে।

২। হজমের ব্যাঘাত ঘটে।

৩। শরীরের ওজন কমে।

৪। শরীরে, বিশেষ করিয়া হাত পায়ে জল জমিয়া ফুলিয়া যায়। প্রথম প্রথম রোগী এবং অপর লোক মনে করে যে রোগীর দেহ পুষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহা সত্য নহে।

৫। হৃৎপিণ্ডের ওজন বৃদ্ধি পায়। ইহার বামভাগ স্ফীত হয় এবং ফলে ইহা ধুকধুক করিতে ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া পড়ে। কঠিন কাজ করিবার সময় অনেক স্বাস্থ্যবান্ লোকও খুব হাঁপাইয়া উঠে ও শেষে মরিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে ভাইটামিন 'বি'-র অভাবে বাম হৃৎপিণ্ড স্ফীত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং শেষকালে আর ধুকধুক করিতে পারে না।

৬। শিশু-বেরিবেরি। শিশুদের এক প্রকার বেরিবেরি হয় এবং তাহার ফলে তাহারা বমি করে ও সবুজ রঙের মলত্যাগ করে। তাহাদের নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। শিশুরা ক্ষীণ স্বরে কাঁদে। ইহাকে বেরিবেরি কান্না বলে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা না করিলে রোগী অনেক সময়ে মারা যায়।

ভাইটামিন 'সি'

টাটকা শাকসবজী, ফলমূল, কাঁচা টমাটো, আমলকি, লেবু, আম প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যায়। ভাইটামিন 'সি'-র উপকারিতা বহু পূর্ব্বে রাজা অশোকের সময় পর্য্যন্ত জানা ছিল, কিন্তু তখন কেহ ভাইটামিন 'সি' বলিয়া জানিত না। রাজা অশোক এক সময় সিংহলের রাজাকে এক ঝুড়ি আমলকি ফল উপহার দিয়াছিলেন। লোকে কিন্তু তখন বুঝে নাই যে আমলকির ভিতর ভাইটামিন 'সি' আছে বলিয়া তাহারা আমলকি ফলকে এত ভাল বাসিতেছে। রন্ধনের সময় ভাইটামিন 'সি' অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সেই কারণে কিছু টাটকা ফলমূল, টমাটো প্রভৃতি প্রত্যহ খাওয়া উচিত। কোন খাদ্যদ্রব্য শুকাইয়া রাখিলে তাহার ভাইটামিন 'সি' প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। ভাইটামিন 'সি' একপ্রকার টক জাতীয় পদার্থ এবং জলে দ্রবীভূত হয়। আমাদের দৈনিক প্রায় ২৫-৩০ মিলিগ্রাম ভাইটামিন 'সি'-র প্রয়োজন। ভাইটামিন 'সি'-র অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। নির্ব্বীজিত (sterilised) কৃত্রিম খাদ্য খাইলে ভাইটামিন 'সি'-র অভাব হইবার সম্ভাবনা বেশী। তখন দাঁতের মাড়িতে ঘা হয়, দাঁত দিয়া রক্ত পড়ে, দাঁত আলগা হইয়া যায়, দেহের অস্থি দুর্ব্বল হয়, প্রত্যেক সন্ধিতে ক্ষত হয় এবং ফুলিয়া যায়।

ভাইটামিন 'ডি'

ভাইটামিন 'ডি' দুধ, মাখন, ঘি, ডিম, মৎস্য-যকৃতের তৈল, প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে ইহা প্রায় থাকে না বলিলেই চলে। ভাইটামিন 'ডি' জলে দ্রবীভূত না হইয়া তৈলাক্ত পদার্থে দ্রবীভূত হয় এবং রন্ধনের সময় যে উত্তাপ লাগে তাহাতে ইহা নষ্ট হয় না। আমাদের ত্বকের নীচে একপ্রকার পদার্থ আছে যাহার উপর প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ পড়িলে ভাইটামিন 'ডি' উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেহের উপর অরুণ আলোক সম্পাত স্বাস্থ্যের সহায়ক।

ভাইটামিন 'ডি'-র অভাবে রিকেট রোগ হয়, অর্থাৎ দেহের অস্থি সুগঠিত ও সুদৃঢ় হয় না। রোগ বৃদ্ধি পাইলে পা এবং জানু বক্র হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া ছোট শিশুদের। ইহার কারণ এই যে ভাইটামিন 'ডি' ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হইতে অস্থি নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করে। ইহার অভাবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষিত হইয়া অস্থিতে গিয়া সঞ্চিত হইতে পারে

মায়ার্স বলতে থাকেন হাতের একখানা তাদের দিকে চোখ রেখে।

"সম্ভবতঃ আমার খুড়ো," মিসেস ম্যাকলিয়ারি বললে উৎসাহিত ভাবে।

"এবার আর ভুল হবে না আমার, যা বলব সব ঠিক ঠিক মিলে যাবে," মিসেস্ মায়ার্স বললেন পঞ্চম থাকের তাস ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে। "দেখো মিস্ জোন্স, এবার যে তাস উঠেছে এর চেয়ে ভাল তাস কারো বেলায় উঠতে দেখি নি আজ পর্য্যন্ত। এই বছরের শেষ দিকে বিয়ে হবে তোমার···বিয়ে হবে খুব ধনী একজন যুবকের সঙ্গে। যুবকটি হয় বনেদী বড় লোক, না হয় মস্ত ব্যবসাদার, কারণ ভ্রমণের দিকে ঝোঁক তার খুব বেশী, কিন্তু তোমাদের মিলনের পথে বিস্তর বাধা এসে পড়বে। একজন আধাবয়সী লোক তোমাদের মিলন ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করবে—তা করুক, তুমি হাল ছেড়ো না কিছুতেই, বিয়ে হয়ে গেলে অনেক দূরে চলে যাবে তুমি, সম্ভবতঃ সমুদ্রের ওপারে। আমার দক্ষিণা হচ্ছে এক গিনি, তবে ও টাকাটা আমি দিই খ্রীষ্টান মিশনে গরীব কাফ্রীদের উপকারের জন্যে।

হাতব্যাগটা থেকে একটি পাউণ্ড আর একটি শিলিং বার করে মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি উচ্ছ্বসিত ভাবে বললে, "আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মিসেস্ মায়ার্স। আচ্ছা, আপনি যে-সব বাধা-বিপত্তির কথা বললেন তার সংস্রব এড়িয়ে আমি যদি বিনা ঝঞ্ঝাটে ভাগ্যফলটা পেতে চাই তাহলে কত দক্ষিণা দিতে হবে আমায়?"

"তাসকে ঘুষ দিয়ে বশ করা চলে না," গম্ভীরভাবে বললেন মিসেস্ মায়ার্স—"তোমার খুড়ো করেন কি?"

"খুড়ো কাজ করেন পুলিসে—মানে গোয়েন্দা বিভাগে।" মিথ্যাটা মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি বললে নিতান্ত সহজ সুরে।

"তাই নাকি?" বৃদ্ধা তাসের তাড়াটা থেকে তিনখানা তাস টেনে নিলেন চট্ করে। "তোমার খুড়োর সময়টা ভাল যাচ্ছে না মোটেই। ওঁকে তুমি বোলো, বড় একটা বিপদ রয়েছে ওঁর সামনে। বেশী যদি জানতে চান উনি, তাহলে আমার কাছে আসতে পারেন অনায়াসে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কত অফিসারই তো আসা-যাওয়া করেন আমার কাছে—ভাগ্যফল জানতে। ওঁরা যা জানতে চান খোলসা করে বলেন আমাকে—আমিও চেষ্টা করি ওঁদের উৎকণ্ঠা দূর করতে।···খুড়োকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে—বিপদটা খুব সাংঘাতিক। ওঁর কথা মনে রাখব আমি—উনি কাজ করেন, কোথায় যেন বললে—গোয়েন্দা বিভাগে? নামটা হ'ল মিঃ জোন্স? ওঁকে বলো, আমি ওঁকে সাহায্য করতে সব সময় প্রস্তুত···আমার সঙ্গে দেখা করেন যেন।"

চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মিঃ ম্যাকলিয়ারি বললেন, "ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে ঠেকছে। তোমার মৃত খুড়োর সম্বন্ধে স্ত্রীলোকটির অত্যধিক কৌতূহল রীতিমত সন্দেহের উদ্রেক করে। তাছাড়া ওর আসল নাম মায়ার্স নয়, মাইয়ার হোফার···আর ওর বাড়ি ল্যুবেকে। জাতিতে ও জার্মান—শয়তানের ধাড়ী।" মিঃ ম্যাকলিয়ারি গর্জ্জন করে ওঠেন, এক মুহূর্ত্ত চুপ করে আবার তিনি বলতে থাকেন, "যেমন করে হোক, ওর কৌশল ব্যর্থ করতে হবে। ওর মতলব ভাল নয়, কৌশলে লোকের মনের কথা বের করে নেওয়াই ওর পেশা। কর্ত্তাদের আমি জানিয়ে দেবো ব্যাপারটা···দেখি কি হয়।"

মিঃ ম্যাকলিয়ারি সত্যিই ব্যাপারটা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করলেন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কর্ত্তৃপক্ষও এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন নিশ্চয়ই রহস্যজনক কিছু একটা আছে এর মধ্যে, ফলে দু'চার দিনের মধ্যেই মিসেস্ মায়ার্সকে হাজির হতে হ'ল মিঃ কেলি জে-পির এজলাসে।

"মিসেস মায়ার্স, আপনার সম্বন্ধে কি এ সব শুনছি? আপনি নাকি তাস দেখে ভাগ্যফল বলেন?" ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন গম্ভীর মুখে।

"ধর্ম্মাবতার! পয়সা রোজগারের জন্য একটা কিছু করা আমার দরকার। এই বয়সে আমি তো আর নাচঘরে গিয়ে নাচতে পারি না।" জবাব দিলেন মিসেস্ মায়ার্স।

"হুঁ" ম্যাজিষ্ট্রেট কতকটা সায় দিলেন তাঁর কথায়, "কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আপনি নাকি তাসের ব্যাখ্যা যথাযথ করেন না। এটা অত্যন্ত খারাপ। ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় জানেন? লোকে এসে আপনার কাছে চাইলে চকোলেটের কেক আর আপনি তাদের দিলেন কিনা মাটির গোটাকতক ঢেলা! এক গিনি দক্ষিণার বিনিময়ে লোকে নিশ্চয়ই নির্ভুল গণনা দাবি করতে পারে।···আপনি যখন ভাগ্য গণনা করতে জানেন না তখন এ ব্যবসা করেন কেন?"

"কেউ ত অভিযোগ করে না বড় একটা," বৃদ্ধা বললেন আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে, "লোকে যা চায় তাই-ই ভবিষ্য-দ্বাণী করি আমি। এতে ওরা যে আনন্দটা পায় তার দাম কম নয়। আর আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলেও যায় প্রায়ই। একজন মহিলা আমায় বলেছিলেন, আমি তাঁর ভাগ্যফল যে-রকম নির্ভুল বলেছি তেমনটি আর কেউ পারে নি, আর আমি তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তাও নাকি যথেষ্ট উপকার করেছে তাঁর। তিনি থাকেন সেণ্ট জন্স্ উডে এবং সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছেন স্বামীর বিরুদ্ধে···"

"ও সব বাজে কথা রাখুন," ম্যাজিষ্ট্রেট থামিয়ে দেন মিসেস্ মায়ার্সকে, "আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী রয়েছে একজন। মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি, এবার বলুন আপনার বক্তব্য।"

"তাস দেখে মিসেস্ মায়ার্স আমায় বলেছিলেন," বলতে সুরু করে মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি, "বছর শেষ হবার আগেই বিয়ে হবে আমার, আর আমার ভাবী স্বামী হবে একজন ধনবান যুবক, তার সঙ্গে আমায় যেতে হবে সমুদ্রের ওপারে।"

"সমুদ্রের ওপারে? তার মানে?" ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করেন অনুসন্ধিৎসুভাবে।

"ইস্কাবনের নহলা ছিল দ্বিতীয় থাকটাতে, মিসেস্ মায়ার্স তাই দেখে বলেন, ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে" জবাব দেয় মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি।

"ধ্যেৎ!" ম্যাজিষ্ট্রেট গর্জ্জন করে উঠেন বিরক্তিভরে।

"ইস্কাবনের নহলা হচ্ছে আশার প্রতীক। ভ্রমণের সূচনা করে ইস্কাবনের গোলাম—আর সেই সঙ্গে যদি থাকে রুইতনের সাতা তাহলে বুঝতে হবে ভ্রমণটা হবে দীর্ঘ এবং তাতে লাভও হবে কিঞ্চিৎ। মিসেস্ মায়াস, আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবেন না আপনি। সাক্ষীকে আপনি বলেছেন, বছর কাবার হবার আগেই ওঁর বিয়ে হবে একজন ধনী যুবকের সঙ্গে। কিন্তু বছর তিনেক আগেই ওঁর বিয়ে হয়ে গেছে গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ম্যাকলিয়ারির সঙ্গে; আর মিঃ ম্যাকলিয়ারিও লোক খুব চমৎকার। মিসেস্ মায়ার্স, এই অসঙ্গতির কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?"

"আশ্চর্য্য বটে!" বৃদ্ধা অবাক্ হয়ে তাকালেন মিসেস্ ম্যাকলিয়ারির মুখের দিকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এ রকম ভুল মাঝে মাঝে হয় বৈ কি। এই মেয়েটি যখন আমার কাছে আসে তখন ওর পোষাক-পরিচ্ছদে খুব আড়ম্বর ছিল বটে, কিন্তু ওর বাঁ হাতের দস্তানাটা ছিল ছেঁড়া। তা থেকে আমার ধারণা হয়, ওর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কিন্তু ওর বড়মানুষি করবার সখ আছে। তাছাড়া ও আমায় বলে ওর বয়স কুড়ি, কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে ওর বয়স পঁচিশ—"

"চব্বিশ," মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি বললে প্রতিবাদের সুরে।

"ও একই হ'ল—চব্বিশ আর পঁচিশে তফাৎ কতটুকু। বিয়ে করার ইচ্ছাও প্রকাশ করে ফেলেছিল—অর্থাৎ কি না ও আমায় জানিয়েছিল ও অবিবাহিত। কাজেই আমি এমন কয়েকখানা তাস নিলাম সাজিয়ে যাতে ওর বিয়ে আর ধনবান স্বামী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। ভাবলাম এই উপায়ে মেয়েটিকে যতটা খুশি করা যাবে আর কিছুতেই ততটা পারা যাবে না হয়ত।"

"আর আপনি যে বাধাবিপত্তির কথা বলেছিলেন, আধা-বয়সী ভদ্রলোক, সমুদ্রপারে যাত্রা—সে সবের মানে?" মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি জিজ্ঞাসা করে বিমূঢ়ের মত।

"তোমার কাছে যে টাকাটা নেব তার বিনিময়ে বেশী কিছু না বললে চলবে কেন? একটা গিনি নিয়ে মাত্র দু'চারটি কথা বলে বিদায় দিই কি করে?" মিসেস্ মায়ার্স বলেন সহজ কণ্ঠে।

"যাক, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই আপনার." ম্যাজিষ্ট্রেট গম্ভীরভাবে বলেন মিসেস্ মায়ার্সকে। "তাস দেখে আপনি যে ভাবে ভাগ্যফল বলেন তা নিছক জুয়াচুরি। তাসের ব্যাখ্যা সহজ নয়—রীতিমত গবেষণা দরকার। অবশ্য এ সম্বন্ধে নানা মত আছে নানা জনের, তবে আমার যতদূর স্মরণ হয়, ইস্কাবনের নহলায় ভ্রমণ বোঝায় না। খাদ্যে ভেজাল দেয় যারা কিংবা বাজে জিনিস বিক্রী করে যারা তাদের যেমন জরিমানা দিতে হয়, আপনাকেও তেমনি জরিমানা দিতে হবে পঞ্চাশ পাউণ্ড। তা ছাড়া মিসেস্ মায়ার্স এ রকম একটা সন্দেহও রয়েছে যে আপনি গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে এদেশে এসেছেন। আমি অবশ্য আশা করি না যে, আপনি এ অভিযোগ স্বীকার করবেন।"

"এ অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা," মিসেস্ মায়ার্স জবাব দেন দৃঢ় কণ্ঠে।

"থাক, ও সম্বন্ধে আমরা বেশী [illegible]তে কিছু চাই না—প্রমাণ নেই যখন। কিন্তু যেহেতু আপনি বিদেশী এবং জীবিকা নির্ব্বাহের আপনার কোন সদুপায় নেই, আপনাকে আর এ-দেশে আমরা থাকতে দিতে পারি না, আপনাকে যেতে হবে অন্যত্র। বিদায়, মিসেস্ মায়ার্স···ধন্যবাদ, মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি। ···হ্যাঁ, একটা কথা না বলে পারছি না—ভাগ্যফল সম্বন্ধে এই মিথ্যাভাষণ অত্যন্ত লজ্জাকর ও গর্হিত। আশা করি, এটা স্মরণ রাখবেন, মিসেস্ মায়ার্স।"

"এখন আমি করি কি? সবে যখন পসারটা একটু জমিয়ে এনেছি তখনই কিনা···" মিসেস্ মায়ার্স বললেন একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

বছরখানেক পরে গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ম্যাকলিয়ারির সঙ্গে দেখা হ'ল মিঃ কেলির।

"চমৎকার আজকের দিনটা!" খোশ মেজাজে বললেন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেলি। "খবর সব ভাল তো? মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি আছেন কেমন?"

মিঃ ম্যাকলিয়ারির মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। "মিসেস্ ম্যাকলিয়ারি?···ও, তিনি বেশ ভালই আছেন···তিনি···কি জানেন, মিঃ কেলি," ইতস্ততঃ করেন মিঃ ম্যাকলিয়ারি, "তিনি তো নেই এখানে···মানে তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমার···"

"বল কি, মিঃ ম্যাকলিয়ারি?" বিস্ময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের দুই চোখ কপালে ওঠে,—"অ্যাঁ! আমি যে এ ভাবতেও পারিনি কোন দিন! অমন চমৎকার মেয়েও শেষে···"

"মেয়েদের কথা আর বলবেন না মশায়—সবাই সমান। কোথাকার একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া ওর রূপ দেখে গেল মজে আর ও—ও কিনা তাকে দিলে আস্কারা!···ব্যাপারটা গোড়ায় জানতাম না আমি—জানলাম যখন, তখন ওদের আশনাইটা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। ছোঁড়াটার নাকি টাকা-পয়সা আছে বিস্তর, মেলবোর্ণের ব্যবসাদার।···আমি অবশ্য স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম অনেক, কিন্তু—" মিঃ ম্যাকলিয়ারি হাতের একটা ভঙ্গী করে নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করলেন, "সবই নিষ্ফল হ'ল। এক হপ্তা আগে ওরা রওনা হয়েছে অষ্ট্রেলিয়ায়।"*

---

* চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত কথাশিল্পী Karel Capek-এর "The Fortune Teller" গল্পের অনুবাদ।

বিহারের লোক-সঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

বিরহ

বিবাহে, পূজা-পার্ব্বণে, শিশুর জন্ম উপলক্ষে বিহারের লোক-সঙ্গীতের পরিচয় কিছু দিয়েছি। এবার বিহারবাসিনীর বিরহ-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। গানগুলি নারীদের রচিত, তবে কোন কোন গানের রচনাভঙ্গী দেখে মনে হয় পুরুষের হাতও আছে হয় রচনায়, নয় পরবর্ত্তী সংযোজনায়। নারীর কণ্ঠেই এই গানগুলি শুনেছি, কিন্তু 'ঝুমুর' গান পুরুষ ও নারী বহু স্থলে একত্রে অথবা পুরুষরাই কেবল করেন। মেয়েদের সমবেত নৃত্য চলে। শীতের বা বর্ষার রাত্রে, অন্য অবসর সময়ে, সুকণ্ঠী নারী একাই কিংবা সহেলী ও পরিবারস্থ অন্য নারীরা মিলে গান করেন। মধ্যে মধ্যে দ্বিপ্রহরে জঙ্গলে মাঠে একত্র কাজ করবার সময় ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রাম করেন, দূর হতে শোনা যায়, তাঁদের সমবেত সঙ্গীতের সুর। ধানের বীজ বপন করতে করতে চলে গান—পা ফেলে ফেলে পিছিয়ে আসেন, এক হাতে কচি ধানের চারা, অন্য হাত মাটিতে নামছে; দ্রুত একটির পর একটি ধানের চারা পোঁতা হচ্ছে। হাঁটুর কাছে কাপড় পরা, ঝুঁকে থাকতে পারেন একাদিক্রমে কয়েক ঘণ্টা (সেইজন্য ধান রোপণের কাজ মেয়েদের। পুরুষদের যদি একান্তই কাজ করতে হয় তবে তাঁদের পেছনে বসবার জন্য থাকে খাটিয়া। সেই ঝুঁকে-পড়া অবস্থায় সার বেঁধে মেয়েরা গান গাইতে থাকেন, কখনও বিরহ, কখনও মিলনের গান।

গাইবার ভঙ্গীতে একটানা সুর, প্রথম কলির সঙ্গে সুরে দ্বিতীয় তৃতীয় কলির কোন পার্থক্য নেই এবং থাকলেও তা কদাচিৎ। শহরের লোক-সঙ্গীতের আসরে সুকণ্ঠীর সংখ্যা অল্প, গ্রামে বিস্মিত হয়ে দেখেছি, অধিকাংশ স্থলেই গায়িকা সুকণ্ঠী।

লোক-সঙ্গীতের প্রচলন শহরে ও গ্রামে সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে কমে এসেছে তার কারণও বর্ত্তমান। তার জন্য হা-হুতাশ করবার প্রয়োজনও হয়ত নেই। গান মানুষের মন ভোলা-বার বস্তু, সময়ের পরিবর্ত্তনে বিশেষ ঢং বা রুচির পরিবর্ত্তন হতে পারে, এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু গানের প্রয়োজনই চিরকাল তাকে বাঁচিয়ে রাখবে মানুষের কণ্ঠে। পুরাতন গানগুলি যা একদা অসংখ্য নর-নারীর সুখ ও দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ক্রমশঃ কালের গতিতে তাদের স্থলে নব নব সঙ্গীতের সূচনা হয়েছে। চিরদিনই তাই হয়ে এসেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বের গান এগুলি না হতেও পারে; যে গানগুলি মানুষের অবহেলায় বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে গেছে তার পরিচয় আজ আর পাওয়া কঠিন, হয়ত আংশিক ভাবে কিছু পাওয়া যাবে এই গানগুলিতেই।

যে গানগুলির পরিচয় আমি দেবার চেষ্টা করেছি, সেগুলি সংগ্রহ হয়েছে গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধা নারীদের কাছে বহু ক্ষেত্রে। তরুণীরা কোথাও অজ্ঞতা, কোথাও বা অবজ্ঞাভরে হেসে বা ভ্রূকুঞ্চিত করে জানিয়ে দিয়েছেন, "এ গান পুরোনো 'সেকেলে' তাই তাঁরা গান না।"

বিহারবাসিনীর 'বারমাসিয়া' (বারামাস্যা)

১

প্রথম মাস আষাঢ় হে সখী
সাজি চলত জলধার হে,
ই প্রীতি কারণ সেত বান্ধল
সীয়া উদ্দেশে শিরি রাম হে।

২

শাওন হে সখী সর্ব্ব সুহাওন
রিমি ঝিমি বরিষয়ে বুন্দ্ হে
ই প্রীতি কারণ সেত বান্ধল
সীযা উদ্দেশে শিরি রাম হে।

৩

ভাদো হে সখী রৈণি ভেয়াওন
দুজে আঁধারিয়া রাত হে,
লৌকা যে লৌকে রামা
বিজুরী যে চমকে;
সো দেখি জিয়ারা ডরায় হে।

৪

আশ্বিন মাস সখী আশ লাগিয়ে গেল
আশ না পুরিল হমর হে
এ আশ পুরে রামা কুবরী সরত* কে
জিন স্বামী রখল লুভাই হে।

৫

কাতিক মাস সখী গঙ্গা সনানে
সভে সখী পেন্হে রামা পাট পীতম্বর
হম সখী লুগরী পুরান হে।

৬

অগহন হে সখী, অগ্রসুহাবন
চকোয়া চকৈয়া রামা, খেল করত হে
সেহ দেখি জিয়ারা লুভায় হে।

৭

পুষ হে সখী ফুহ, পড়িয়ে গেল
ভিঁজি গেল লম্বী লম্বী কেশ হে
চোলিয়া যে ভিঁজে রামা, কাটাও কে,
যৌবনা ভিঁজয়ে অনমোল হে।

৮

মাঘ হে সখী জাড়্ পরিয়ে গেল
থর থর কাঁপে করিজা হে
সভে সখী বসে রামা পিয়াকে সঙ্গে হো
হমর পিয়া পরদেশ হে।

---

*ত—উত এর মত উচ্চারণ হবে।

৯

ফাগুন হে সখী ঋতু বশন্ত হে
সভে সখী খেলে লাল গুলাল হে
সভহি খেলে রামা পিয়াগুয়া কে সঙ্গ,
হমর পিয়া পরদেশ হে।

১০

চৈত হে সখী বেলা ফুলিয়ে গেল
সভ সখী ফুলে রাম, পিয়াকে সঙ্গ হো
হমর ফুলওয়া মলিন হে

১১

বৈশাখ হে সখী আদিত খর ভেলা
জিয়ারা তাপিত হমার হে

১২

জেঠ হে সখী, গিয়া ঘর আয়লৈ
পুরি গেল আশ হমর হে।
ই প্রীতি কারণ সেত বান্ধল
সীয়া উদ্দেশে শিরি রাম হে—

"প্রথম মাস আষাঢ় এসেছে, হে সখী, ঝর ঝর ধারে বর্ষণ হচ্ছে—আমার মনে পড়ল সেই প্রেমের কাহিনী যার জন্য শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্দেশে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছিলেন। সেই কাহিনী আর আমার জীবনের সত্য, এতে কতই না পার্থক্য। শ্রাবণ মাস এল, সুন্দর সবুজে চারদিক শোভিত হয়ে উঠেছে, রিম ঝিম বারি বর্ষণ হচ্ছে—হে সখী, আবার আমার মনে পড়ল সেই রাম-সীতার কাহিনী, এমন প্রেম তাঁদের ছিল যার জন্য সমুদ্রবন্ধন হয়েছিল। তারপর ভাদ্র মাস এল, ঘন বর্ষা, অন্ধকার রাত্রি, মেঘের ভয়ানক গর্জ্জন, বিদ্যুতের চমক দেখে আমার হৃদয় ভয়ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। হায়, এই কি সেই প্রেম যার জন্য একদা প্রেমাস্পদকে লাভ করবার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন হয়েছিল, আর আজ তার এই গতি!

আশ্বিন মাস এল, আমার মনে নব আশার সঞ্চার হয়েছে কিন্তু আশা পুরে কই? সে আশা তো কুব্জা সতীনেরই (কুবরী সরত) পূর্ণ হ'ল সে আমার স্বামীকে লোভাতুর করে রেখেছে। তারপর কার্ত্তিক মাস এল, সখীরা গঙ্গায় পুণ্য স্নান করে নব নব পীত পট্টবস্ত্র ধারণ করলেন, আমার কিছুই নেই—এই ছিন্ন বস্ত্র সার।

অগ্রহায়ণ এল, চতুর্দ্দিক পাকা শস্যে সোনার মত উজ্জ্বল ও সুশোভিত হয়ে উঠেছে, চকোর-চকোরী ক্রীড়ামত্ত, আমার হৃদয় প্রিয়ের সঙ্গ লাভ করবার জন্য বৃথাই ব্যাকুল হ'ল। পৌষ মাসে কুয়াশায় অন্ধকার, শিশিরবিন্দুর প্রাচুর্য্যে আমার দীর্ঘ কেশরাজি সিক্ত হয়ে যায়, চিত্র-বিচিত্র অঙ্গবস্ত্র ভিজে যায়। মাঘ মাস এল—শীতে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। আমার সখীরা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন, আমার প্রিয়তম কোন্ প্রবাসে রইলেন!

তারপরে এল ফাল্গুন মাস। বসন্তের আবির্ভাবে ফাগ-খেলার ধুম লেগেছে। সখীরা তাঁদের প্রিয়জনদের সঙ্গে আবির-গুলাল খেলছেন, আমার একাকী দিন কাটছে। চৈত্র মাসে বেল ফুলের সমারোহ, এই বিশেষ ঋতুর নাতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়ায় সখীরা সুশ্রী হয়ে উঠেছেন, আমার সর্ব্বাঙ্গ মলিন, কারণ আমি নিরানন্দে দিন যাপন করছি।

বৈশাখের দিনে সূর্য্যদেব প্রখর তাপে ধরণী তপ্ত করছেন, আমার হৃদয়ও বিরহে তাপিত হয়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস এল, এবার আমার স্বামী গৃহে এলেন, আমার বৎসরব্যাপী বিরহ-বেদনা দূর হ'ল—আহা কি এই প্রেম, এর জন্যই রামচন্দ্রকে সেতুবন্ধন করতে হয়েছিল।"

বারমাস্যা গানগুলি সবই প্রায় এইরকম—খুব সামান্যই পার্থক্য। এই বিশেষ গানটির রচনাকৌশলও সুন্দর। প্রথম অংশ অপেক্ষা শেষাংশ দ্রুতগতি ও অধিক করুণ হয়ে এসেছে দীর্ঘ বিরহের বেদনায়। যত দিন যায় ততই বিরহিণীর চিত্ত অধীর হয়ে উঠে। প্রথম দিকে সে বেদনায় সতীনের বিরুদ্ধে জ্বালা ছিল, পুরাকালের রাম-সীতার কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে নিজের অবস্থার তুলনায় সমস্ত প্রেমের উপরই ধিক্কার ছিল, ক্রমশঃ তা দুঃখের অশ্রুতে গলে কোমল হয়ে এসেছে। সখীদের সঙ্গে সর্ব্বদাই নিজেকে তুলনা করে বিরহিণী দুঃখ করছেন, জ্বালার ভাগ অল্প।

এই গানটিতে মাস পরিবর্ত্তনের যে লক্ষণগুলির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে স্থলে স্থলে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে, তা গভীর পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই ধরণের গান কোন্ বিগত যুগে অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিরা রচনা করেছেন তা ভাবলে তাঁদের স্বাভাবিক কবি-প্রতিভাকে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও চিরদিন আগ্রহ ভরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন।

চঞ্চল ভাবন তেজিহে সুন্দর
যঁহা বৈসে রঘুবংশী কুমার
বিনু সোনাকে কৈসন আভরণ
বিনু মোতিয়ে কিয়া মনোহর।
অঙ্গন মোর লেখে বিজুবন্দ
দুনিয়া সগরো আঁধার
সেজ পর কারী নাগীন
দুঃখ অব সহলো ন যায়।
বিনু বে মাইয়া বিনু কৈসন নৈহার
স্বামী বিনু কৈসন শশুরার?
বিপদ না গেলু নদীয়াকে তীর
দহওয়া গেলৈ সুখায়ল,—
বিপদ না গেলু মব বিরিছ (বৃক্ষ) তর
বিরিছ ভেলৈ পাত্ ঝর্।
বিপদ না গেলু নৈহর মোর
ভৌজি লেলিহান—লুলুহার।

"আমার সমস্ত সুখ-কল্পনা ধাবিত হয়েছে যেখানে রঘুবংশ-কুমার বিরাজ করছেন। কল্পনা সুন্দর কিন্তু প্রিয়বিরহে যে কাতর তার আর কি আনন্দ? সোনা না হলে অলঙ্কার কি, আর মণি-মুক্তা না হলে অলঙ্কারের শোভাই বা কি? সুখ কল্পনায় পুলকিত হবার মত চিত্ত কোথায়? স্বামী-বিরহে সবই নিরানন্দ।

আমার অঙ্গন শূন্য—সমস্ত জগৎ অন্ধকার। আমার শয্যা যেন বিষধর সর্পের আবাস—শয়ন করতে ভয় হয়। আর এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য হয় না। জননীর অবর্ত্তমানে পিতৃগৃহ অন্ধকার, স্বামীর অনুপস্থিতিতে শ্বশুরগৃহ নিরানন্দ।

দুঃখে তাপিত হয়ে নদীতে শীতল অবগাহনে গেলাম, আমার ন্যায় দুঃখিনীর স্পর্শে নদী শুষ্ক হ'ল, জুড়াবার জন্য বৃক্ষ ছায়ায় গেলাম, বৃক্ষের পাতাও ঝরে গেল। দুঃখ পেয়ে সান্ত্বনার আশায় পিতার গৃহে গেলাম—সেখানে ভ্রাতৃবধূর অবহেলা। আমার মত স্বামীহীন দুর্ভাগিনীর কোথাও স্থান নেই।"

সেই চিরন্তন দুঃখের কাহিনী, বিরহ-বেদনার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের পীড়ন সর্ব্বত্র। এই গানটির সঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদের তুলনা করা যায়, রাধার বিরহ-বর্ণনায় নদী শুষ্ক হয়, শীতল বাতাস উষ্ণ হয়। এই গানটিতে সাধারণ রমণীর দুঃখ বর্ণনা করা হয়েছে। মাতৃহীন গৃহে ভ্রাতৃবধূর লাঞ্ছনা—গৃহে বাহিরে কোথাও তার সান্ত্বনা নেই।

এইল আষাঢ় মাস গরজে গগনবা
চৌহদিসে ঘটা লাগে ভেয়ানবা
পিয়া পরদেশ গেল।
নীরা ঢারকে নয়নবা দিন গুনি গুনি
তন্ মোরা ছিন্ ভেল' বদন মলিন,
ঠাঢ় ভেলা কঙ্গন হামারি।
যে মোরে কহি দেতো পিয়াকে আওনবা।
তাক্ দে বৈ হাথকে কঙ্গনবা।
থির করু থির করু অপনি মনোআ
উ যে আয় যৈতো সাঁঝে বিহানিয়া।

"আষাঢ় মাস এল—মেঘের গুরু গর্জ্জন, চারিদিক ঘনঘটাচ্ছন্ন—আমার প্রিয় আছেন প্রবাসে। চোখের জলে বিরহের দিন গণনা করছি—আমার দেহ শীর্ণ হ'ল—মুখ মলিন হ'ল। দেখ সখী, আমার মণিবন্ধের কঙ্কণ ঢিলা হয়ে গেছে।

যে আমার প্রিয়ের আসবার দিনটি বলে দেবে তাকে আমার এই কঙ্কণ দান করব।"

সখী সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তোমার মন স্থির কর, ধৈর্য্য ধর, তোমার প্রিয়তম আসবেন—সকালে না হয় সন্ধ্যায়!"

অবশ্য কোন বিশেষ সকাল অথবা সন্ধ্যা তার কোন নির্দ্দেশ নেই। গানটি গাওয়া হয় ঝুমুরের তালে—ছন্দ দেখেই তা বোঝা যাবে। গানটিতে এমন একটি ঢঙ আছে যা ঝুমুরের তালের সাহায্যে চটুল রসসৃষ্টি করে—করুণ রস নয়। যেন অল্পবয়সী আদরিণী সখী বায়না ধরেছেন 'সে কেন আসে না—যদি বলতে পার কবে আসবে তবে এই কঙ্কণই দিয়ে দেব' এবং তার অপেক্ষাকৃত গম্ভীরা সখী সান্ত্বনা দিচ্ছেন 'সকালে নয়, সন্ধ্যায় নিশ্চয় আসবেন তিনি,—ধৈর্য্য ধর।'

একে নারী পতরী, লচকি কমর বা
দোসরা হি কোমল শরীর হে বিদেশীয়া।
"সাদিয়া করিকে ঘরে বৈঠেলে অপনি গেলে পরদেশ।
এইসন উমরিয়া হমম বৈরীয়া
কৌন মোর হরতইরে ক্লেশ।
অপনে না এইলে—পাতিয়া না লিখলে
ইয়াদ না পরলৈ বিদেশী হো
বারহ বরষ পরদেশ বৈঠালে
ধনি তোর কঠিন কলিজা হো।
বাট বটইয়া—তুঁহু মোর ভাইয়া
লে যাও বহিন কে সন্দেশ হো"
"তোহার বালম কে চিনহি ও না জানিও
কে কর হাথে দেবো পাতিয়া?"
"হমর বালম কে বড়ে বড়ে আঁখিয়া?"
ভৌর গুঞ্জিত আঁখিয়া,
উঁচে লিলর—চন্দন কে টিকা
বিজুরী চমকে দাঁতিয়া!
হমর বালম হে পূরব বাণিজিও
বৈঠল তোরৈ রাজ দরবারিয়া।"

একে তো ক্ষীণ কটি, ক্ষীণাঙ্গী নারী, তায় কোমলা,—তাঁকে বিবাহ করে ঘরে এনে নিজে প্রবাসে চলে গেছেন স্বামী। স্ত্রী বলছেন, "এই বয়সই আমার বৈরী। শৈশবে এসেছিলাম তারপর বারো বছর কেটে গেছে, স্বামী বিদেশে, আমার মনঃকষ্ট কে আর নিবারণ করবে? তিনি আসেন না, পত্রও লেখেন না হয়ত, আমাকে তাঁর আর স্মরণই হয় না। ধন্য কঠিন প্রাণ তাঁর! হে পথচারী, তোমরাই আমার ভাই, আমার পত্র তাঁর কাছে নিয়ে যাও।"

পথিক বলেন—"তোমার স্বামীকে আমরা চিনি না—কার হাতে তোমার পত্র দেব?" স্ত্রী স্বামীর পরিচয় দিচ্ছেন—"আমার স্বামীর ভ্রমরকৃষ্ণ বড় বড় চক্ষু, উন্নত ললাট চন্দনলিপ্ত, শুভ্র দন্তরাজি যেন বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল। তিনি পূবদেশে বাণিজ্য করতে গেছেন—হয়ত বা সেখানে রাজদরবারে কাজ করছেন!"

স্বামীর পরিচয় হিসাবে যেমনই হোক, পূর্ব্বদেশে ব্যবসা করছেন এমন যে বহু উন্নতললাট, কৃষ্ণচক্ষু, শুভ্র দন্তরাজিসমন্বিত লোক আছেন—সরলা গ্রামবধূকে এ কথা বলে নিরাশ করবে এমন কঠিন প্রাণ কার? সুতরাং—

"ছিয়া হে বিদেশীয়া ধিকার তোহার,
ধনী ভেলো বিরহ বিয়োগ হে—

"ছি ছি প্রবাসী, তোমায় শতধিক। তোমার স্ত্রী বিরহে মৃতপ্রায় আর তুমি বিদেশে রয়েছ।" পত্র শুধু যে যথাস্থলে পৌঁছাল তাই নয়, পত্রবাহক উদাসী স্বামীকে রীতিমত ধমকে দিলেন। এ রকম সার্থক সমবেদনার পরিচয় অন্যান্য সঙ্গীতে বিরল।

পুরীতে আবিষ্কৃত একটি মূর্তি

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

পুরী হইতে যে রাস্তাটি গুণ্ডিচাবাড়ীর পাশ দিয়া কণারকের অভিমুখে গিয়াছে, সেটি যেখানে ঠিক শহরের সীমানা ছাড়াইয়া যায় তাহার অল্প দূরে সিদ্ধ মহাবীরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি ভদ্র-জাতীয়। দেখিলে খুব পুরাণো বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু মহাবীরের মূর্তির কারুকার্য খুব ভাল, পুরানো হওয়াই সম্ভব। মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণের নিকট শুনিলাম, ইহা নাকি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের সময়কার মন্দির।

এই মন্দিরের দেওয়ালে কতকগুলি অসম্বন্ধ মূর্তি খচিত আছে। শিল্পশাস্ত্রের প্রথা অনুসারে যেখানে যেরূপ মূর্তি হওয়ার কথা তাহার পরিবর্তে এলোমেলো ভাবে কয়েকটি মূর্তি যত্রতত্র বসান আছে।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দাস ওড়িশার ইতিহাস এবং সাহিত্যের সম্বন্ধে আজীবন গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার আবিষ্কৃত রায় রামানন্দের ভণিতাসম্বলিত পদাবলী অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিরে একটি মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হন এবং আমাকে তাহার সংবাদ দেন। এই আবিষ্কারটিকেও সূর্য্যনারায়ণ বাবুর একটি বড় কীর্তি বলিয়া আমি মনে করি।

ওড়িশা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মন্দিরের গায়ে অসংখ্য মূর্তি খোদাই করা আছে। বেশীর ভাগই নরনারী, দেবতা, ফুল লতাপাতা বা নানাবিধ অলঙ্কারের চিত্র। কিন্তু শিল্পিগণ কেমন ভাবে মন্দির গড়িতেন তাহার চিত্র কোথাও এতাবৎকাল পর্যন্ত দেখা যাই নাই। কেবল খাজুরাহোতে একখণ্ড পাথরের গায়ে ছয়জন ভারবাহী একটি বাঁকের মাঝখানে দড়ি দিয়া ঝুলান একখণ্ড বড় পাথর বহিয়া লইয়া যাইতেছে এবং একজন বর্ধকি পাথর কাটিতেছে ইহার একটি চিত্র আছে। কিন্তু সিদ্ধ মহাবীর মন্দিরে নূতন আবিষ্কৃত মূর্তিটি এক দিক দিয়া খাজুরাহোর মূর্তি অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

মূর্তিটির বিষয়বস্তু হইল এই: একটি মন্দির গড়া হইতেছে, উপরে দুই জন বর্ধকি পাথর কাটিতেছে সম্মুখে ছত্রধারী রাজা হাত তুলিয়া হয়ত কোনও নির্দেশ দিতেছেন। তাঁহার মাথায় ছাতা। মন্দিরের যতদূর পর্যন্ত গড়া হইয়াছে সেখান হইতে





উপরে—সিদ্ধ মহাবীর মন্দিরে মন্দির গড়ার চিত্র।

নীচে—সম্মুখে রাজা, পিছনে আশীর্ব্বাদরত কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী, তাহার পর সৈনিক।

মাটি পর্যন্ত একটি ঢালু ভারা বাঁধা হইয়াছে। এই ভারার উপর দিয়া চারজন মানুষ একটি ভারী পাথর বহিয়া তুলিতেছে। পাথরখানির সঙ্গে প্রথমে একখণ্ড দীর্ঘ কাঠ বাঁধা হইয়াছে, সেই কাঠের দুই প্রান্তে দড়ি বাঁধা। প্রতি দিকের দড়ির ভিতর দিয়া এক একটি বাঁক। প্রতি বাঁকের দুই প্রান্তে কাঁধ দিয়া দুই জন ভারবাহী পাথরটিকে তুলিয়া ধরিয়াছে। এইরূপ ঝুলান অবস্থায় ভারা বাহিয়া পাথরটিকে উপরের দিকে তোলা হইতেছে।

ঢালু ভারাটির সম্বন্ধেও কথা আছে। ভারার নীচে তিনটি খুঁটি খোদিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে পূর্বকালে মন্দির গড়িবার সময়ে যতখানি গাঁথা হইত, ততখানি মাটি দিয়া চারি পাশ হইতে ভরাইয়া একটি গড়ানিয়া পথ তৈয়ারি করা হইত এবং সেই মাটির ঢালু অবলম্বন করিয়া উপরে পাথর তোলা হইত। এরূপ অনুমানের কিন্তু জনপ্রবাদ ভিন্ন অপর কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু সিদ্ধ মহাবীরে খোদিত মূর্তিটি হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, খুঁটির উপরে ঢালু ভারা বাঁধা হইত। ইহা মাটির হইতে পারে না, কাঠের হওয়াই সম্ভব।

তবে একটি প্রশ্ন রহিয়া যায়। খুব বড় পাথর, যাহা মানুষের পক্ষে কাঁধে ঝুলাইয়া লওয়া সম্ভব নয়, সেগুলি তুলিবার তবে কি ব্যবস্থা ছিল? এই প্রসঙ্গে কণারকের মন্দির সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে গবর্মেণ্ট যখন কণারকের মন্দিরের সংস্কার করান তখন সেখানকার নবগ্রহ মূর্তি সম্বলিত পাথরখানি সরাইয়া কলিকাতা বা অন্য কোনও যাদুঘরে পাঠানোর প্রস্তাব হয়। মূর্তিগুলি একখণ্ড বিশাল পাথরের উপর খোদাই করা ছিল, এবং এক সময়ে জগমোহনের পূর্ব দরজার উপরে, জমি হইতে বোধ হয় ৪০-৫০ ফুট উর্দ্ধে স্থাপিত ছিল। কলিকাতায় আনার পূর্বে প্রথমে বড় পাথরখানির খোদিত অংশ ফালির মত কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু তাহার পরেও দেখা গেল, পাথরের এই পাটাটিও ভারি কম নয়। তখন কণারকের মন্দির হইতে দুই মাইল দূরে সমুদ্রকূল পর্যন্ত লোহার লাইন পাতার বন্দোবস্ত হয়। ট্রলির উপরে চাপাইয়া পাথরটিকে সমুদ্রের ধারে লইয়া অবশেষে জাহাজে তুলিয়া দিবার আয়োজন করা হয়।

কিন্তু নবগ্রহ মূর্তিটিকে নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসিগণ পূজা করিত, তাহারা গবর্মেণ্টের নিকট আপত্তি জানায়। ইতিমধ্যে মূর্তিটি মন্দির হইতে প্রায় সিকি মাইল দূর পর্যন্ত সরাইয়া আনা হইয়াছিল। যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত মূর্তিটি আর সরান হইল না, গবর্মেণ্ট স্বীয় চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু নবগ্রহ সম্বলিত পাথরখানি খোলা মাঠের মাঝখানে পড়িয়া রহিল। গ্রামবাসিগণ তখন নিজেদের চেষ্টায় মূর্তিখানিকে যথাস্থানে পূজার জন্য ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন করিল।

প্রথমে মন্দিরের ভাঙ্গা পাথর কুড়াইয়া তাহারা সিকি মাইল পাকা পথ করিয়া ফেলে। তাহার পর নাকি পাথরের গোলা কাটিয়া মূর্তিটিকে গোলার উপরে শোয়াইয়া আস্তে আস্তে গড়াইয়া মন্দিরে ফেরত আনে।

ঘটনাটির সংবাদ আমি কণারকের কাছে লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, কোনও প্রকাশিত রিপোর্টে পড়ি নাই। কিন্তু কণারকের মন্দিরে পাথরের গোলা আজ পর্যন্ত একটিও দেখি নাই। জঙ্গলে বড় বড় গাছের গুঁড়ি সরাইবার জন্য রলা পাতা হয় তাহা অবশ্য দেখিয়াছি। অর্থাৎ ভারী জিনিষ সরাইতে হইলে বল-বেয়ারিং না হইলেও অন্তত রোলার-বেয়ারিঙের ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, ইহা মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যায়। সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিরের ঢালু ভারার যে ছবিটি আছে, ভারী পাথর হয়ত তাহার উপর দিয়া রলার সাহায্যে গড়াইয়া তোলা হইত, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

যাহাই হউক, এই চিত্রটি হইতে আমরা মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাক্ষাৎ খানিক প্রমাণ পাই, ইহা পরম লাভের বিষয়।

এখন একটি প্রশ্ন বাকি থাকিয়া যায়। মূর্তিটি কত পুরানো? মূর্তি যে মন্দিরগাত্রে অসম্বদ্ধ অবস্থায় খচিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিরের সঙ্গে ইহার কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নাই। কিন্তু মূর্তিটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করার ফলে আমার একটি কথা মনে হইয়াছে। মূর্তিটি বেলে পাথরের উপরে খোদাই করা। পাথরটি সূক্ষ্ম পরীক্ষায় ধরা পড়ে, ইহা কণারকে ব্যবহৃত বেলে পাথর হইতে অভিন্ন। জল বৃষ্টির দ্বারা ক্ষয়ের পরিমাণও ঠিক কণারকেরই মত হইয়াছে। মূর্তিটি কণারক হইতে আনা বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কণারকে ইতস্তত অসংখ্য খোদাই করা পাথর পড়িয়া আছে। আজকাল সেগুলি সরান নিষেধ, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া লোকে কণারকের ছোট বড় মূর্তি অন্যত্র লইয়া গিয়াছে, তাহা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ঘুরিলে টের পাওয়া যায়। হয়ত কোন সময়ে এমনি ভাবেই কেহ এইরূপ কয়েক খণ্ড খোদাই করা পাথর আনিয়া সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিরগাত্রে চুণ বালির সাহায্যে জুড়িয়া দেয়।

এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে মূর্তিটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু উহা সত্য কিনা যাচাই করিবার এখন আর কোন উপায় নাই। না থাকিলেও ওড়িশার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে মূর্তিটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

মহাকবি অশ্বঘোষ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

ভারতীয় পটভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্যে কোন ঐতিহাসিকের উদ্ভব দেখা যায় না। ফলে প্রতিভার বরপুত্র অশ্বঘোষ প্রমুখ বহু কবি-মনীষীর সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানিবার উপায় নাই। প্রাকৃতিক কারণে এই সকল কবির রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা সহজসাধ্য ছিল না। ইহার ফলে অনেক কবির নাম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈদেশিক আক্রমণও এই অমূল্য গ্রন্থরাজির ধ্বংসের আর একটি কারণ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান ভারতীয় পটভূমিকায়

একটি স্মরণীয় যুগ। বৌদ্ধযুগে যে সমস্ত মহাকবির আবির্ভাব হয়, অশ্বঘোষ তাঁহাদের অন্যতম।

মহাকবি এবং দার্শনিক অশ্বঘোষের সময় নির্ধারণ করা সহজ নয়। কিংবদন্তী আছে যে, অশ্বঘোষ কণিষ্কের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার 'সুত্রালংকারে' দুইটি গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি গল্পে কণিষ্কের রাজত্বকালের উল্লেখ দেখা যায়। এই গল্পানুসারে অশ্বঘোষ কণিষ্কের পরবর্তী। কিন্তু কিংবদন্তীর সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং বলিতে হয়—এই গল্পের কণিষ্ক নাম অথবা সমস্ত গল্পটাই প্রক্ষিপ্ত কিংবা কণিষ্ক অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী। কণিষ্কের সময়ের একটি শিলালেখের কথা অনেকে বলেন। তাহাতে অশ্বঘোষ-রাজ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ-রাজ এবং অশ্বঘোষ একই ব্যক্তি বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কণিষ্কের সময় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দ বলিয়া মনে করেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ৪২০ খ্রীষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। সুতরাং অশ্বঘোষ এই সময়ের পূর্ববর্তী ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। 'চরকসংহিতা' খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে লিখিত। ইহার প্রণেতা চরক। কথিত আছে, চরক সম্রাট কণিষ্কের স্ত্রীকে কঠিন ব্যাধির হাত হইতে আরোগ্য করেন। তিনি কণিষ্কের রাজ-সভায় স্থান পান। বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। কণিষ্কের স্থাপিত সংঘের সভাপতিগণের নামের তালিকায় নাগার্জুনের নাম লিখিত আছে। নাগার্জুনের পূর্বাচার্যগণের তৃতীয় আসনে আমরা অশ্বঘোষকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বর্তমান ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও অশ্বঘোষকে এই সময়ের বলিয়া নির্দেশ করেন। *Life of Vasuvandhu* পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, অশ্বঘোষ কাত্যায়নের সমসাময়িক। কিন্তু কাত্যায়নের সময় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং সময়ের এতটা ব্যবধান কোনক্রমেই সঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না।

নরিম্যান প্রণীত *Literary History of Sanskrit Buddhism* পুস্তকে দেখা যায় অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সুবর্ণাক্ষীর পুত্র ও সাকেতনগরের অধিবাসী। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমতঃ, তিনি সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত হন ; পরে মহাযান দলভুক্ত হইয়াছিলেন। কণিষ্ক গোঁড়া সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। গান্ধার এবং কাশ্মীর মতাবলম্বী বৌদ্ধদের মধ্যে মতানৈক্য বহুকাল ছিল। উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য কণিষ্ক 'কুণ্ডলবনে' বৌদ্ধশ্রমণদের এক সভা আহ্বান করেন। অশ্বঘোষ এই মহতী সভায় যোগদান করেন। এই সভাতেই বৌদ্ধদর্শনের প্রসিদ্ধ 'বিভাস' নামক টীকার উৎপত্তি হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে নাগার্জুন 'শূন্যবাদ' রচনা করিয়া বৌদ্ধজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। মহাযান পন্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং প্রভাববিস্তারে 'শূন্যবাদ' বিশেষ সাহায্য করে। এই সময় অশ্বঘোষ আচার্য এবং ভদন্ত আখ্যায় ভূষিত হন।

'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' একখানি দর্শনশাস্ত্র। অশ্বঘোষ এই গ্রন্থের প্রণেতা। এই পুস্তকে তৎকালীন বৌদ্ধদের অনেক মত বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ্য জাতিবিভাগের উপর আক্রমণ করিয়া ইহা লিখিত। ইহা 'বজ্রসূচি' নামেও অভিহিত। ডাঃ উইনটারনিজ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"The Vajrasucika-Upanisad, which teaches that only he who knows the Brahman as the One without a second, is a Brahmin, is not of very late origin."

এক সম্প্রদায় শঙ্করকে ইহার প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহার একটি বর্ণনায় অশ্বঘোষের নাম আরোপিত দেখা যায়। বিশেষতঃ আচার্য শঙ্কর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। গীতিকার হিসাবেও অশ্বঘোষ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' একটি অপরূপ ছন্দোবদ্ধ অবদান। সঙ্গীতের ঝঙ্কারের সহিত মানব হৃদয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তার মানসে ইহা লিখিত। 'সূত্রালঙ্কার' বা 'কল্পনা মণ্ডিতিকা' নামে অশ্ব-ঘোষের আর একখানি দর্শনশাস্ত্রের বই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পুস্তকখানি সংস্কৃত ভাষায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৪০৫ অব্দের চীন ভাষায় ইহার একটি অনুবাদ দেখা যায়। মহাযানের যোগাচার পদ্ধতি ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' একখানি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, মানুষ পার্থিব ভোগবিলাসে বিভোর, তাহারা মুক্তি সম্বন্ধে উদাসীন। তাই কাব্য রসাস্বা-দনের ভিতর দিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করা সহজসাধ্য। কাব্য-খানি আটাশ সর্গে সম্পূর্ণ। বুদ্ধের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত। চীন ভাষায় কাব্যখানির সমুদয় অংশ আছে। সংস্কৃত ভাষার চতুর্দশ সর্গ মাত্র নেপালে পাওয়া গিয়াছে। নেওয়ারী ভাষার দুইখানি পুস্তক হইতে কাউয়েল সাহেব এই চতুর্দশ সর্গ মুদ্রিত করেন। অশ্বঘোষের কাব্যখানি কোন্ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। কাউয়েল সাহেব বলেন, 'ললিতবিস্তর' অবলম্বনে এই কাব্যখানি বিরচিত। বর্তমান আকারে 'ললিতবিস্তর' যে অশ্বঘোষের সময়ে বর্তমান ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'ললিতবিস্তরে'র মূল অংশটি সাদাসিধা সংস্কৃত গদ্যের সহিত গাথার সংমিশ্রণে রচিত। অশ্বঘোষের কবিতা শিল্পচাতুর্যের অভিনব বিকাশ। তিনি বুদ্ধের গৃহত্যাগকালে জরা-ভীতি ও সুন্দরী স্ত্রীলোক-গণের প্রলোভনের বর্ণনা করিয়াছেন। রাত্রিকালে সিদ্ধার্থের স্রস্তবসনা, নিদ্রিতা পুরঙ্গনাগণের শয়নকক্ষ পরিদর্শনের কথা পঞ্চম সর্গে উল্লিখিত আছে। অনুরূপ দৃশ্য রামায়ণে দেখা যায়। হনুমান দশাননের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতা মহিষীগণের সৌন্দর্য দর্শন করিতেছে। পার্থিব সুখের অনিশ্চয়-তায় বীতস্পৃহ সিদ্ধার্থকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পত্নীগণের কৌশলজাল বিস্তারের বর্ণনা অশ্বঘোষের লেখনীতে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পত্নীগণের আচরণে তিনি ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রতি অধিকতর বীতরাগ হইয়া পড়েন। এই দৃশ্য সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের একটি কারণ। 'বুদ্ধচরিতে' ইহা আখ্যান-ভাগের প্রধান উপাদান। কিন্তু রামায়ণে ইহা কেবলমাত্র

সৌন্দর্য-বর্ণনে অনাবশ্যক পরিবেশন। সম্ভবতঃ ইহা রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ। 'বুদ্ধচরিত' অবলম্বনে ইহা রচিত হইতে পারে। কিন্তু রামায়ণে অশ্বঘোষের প্রভাব বিদ্যমান—ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ রামায়ণ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত। ডাঃ উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন,

"The Buddhacarita of the great Buddhist poet Asvaghossa is an ornate epic (Kavya) in Sanskrit, for which the poetry of Valmiki certainly served as a model. On the other hand we find, in a spurious portion of the Ramayana, a scene which is most probably an imitation of scene of the Buddhacarita. Now as Asvaghosa is a contemporary of Kaniska, we may conclude that at the beginning of the second century A.D., the Ramayana was already regarded as a model epic, but that it had not yet received its final form to such an extent as to exclude further interpolations."

জ্যাকোবির মতেও রামায়ণ অশ্বঘোষের পূর্বে লিখিত। কারণ বৌদ্ধ যুগের সাকেতনগরের উল্লেখ রামায়ণে নাই। আবার বুদ্ধ কিংবা যবন শব্দের ব্যবহার মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না। ইহার উল্লেখ রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশে দেখা যায়। মার ও তাহার বিকটাকৃতি অনুচরবর্গের প্রলোভনের বিরুদ্ধে অশ্বঘোষ বুদ্ধের যে তেজস্বী ব্যক্তিত্ব চিত্রিত করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

অশ্বঘোষের রচনাতে রামায়ণের যে প্রভাব রহিয়াছে তাহা একটু মনোযোগসহ দেখিলেই বুঝা যায়। সারথি সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে সমস্ত অযোধ্যাবাসী শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। তেমনি ছন্দককে শূন্যরথে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কপিলাবস্তুর অধিবাসিগণ ক্রন্দন করিতে থাকে। শুদ্ধোদন রাজা দশরথের মতই পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়েন। রমণীগণ সিদ্ধার্থকে দেখিবার জন্য বাতায়নপথে সমবেত হন; কিন্তু শূন্যরথ দেখিয়া গভীর দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া অন্তঃপুরকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সারথি রাজসমীপে শোকের বার্তা বহন করিয়া উপস্থিত হয়। একই ভাবে আবার সিদ্ধার্থের নতুন জীবনের দুঃখ-কষ্ট যশোধরাকে ব্যথিত করিয়া তুলে। তাঁহার শোক রামচন্দ্রের বনবাসজনিত কষ্টে ব্যথিতা সীতার শোকের অনুরূপ।

'সৌন্দরনন্দ' অশ্বঘোষের আর একখানি কাব্য। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের সিদ্ধি লাভের কথা সুন্দররূপে এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে কপিলাবস্তুর নির্মাণ ও বর্ণনার ভিতর দিয়া অশ্বঘোষের বীরত্ব ও পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধীয় জ্ঞান সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে রাজা শুদ্ধোধনের বর্ণনা এবং সর্বার্থসিদ্ধ ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের জন্ম-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তৃতীয় সর্গে 'তথাগতে'র বর্ণনা পাই। 'তথাগত' শব্দের অর্থ 'যে ব্যক্তি যথার্থ পথে ভ্রমণ করিয়াছেন'। এই শব্দে সাধারণতঃ বুদ্ধদেবকে বুঝায়। চতুর্থ সর্গে নন্দের স্ত্রী সুন্দরীর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা ও স্ত্রীর নিকট হইতে নন্দের 'তথাগতে'র নিকট গমনের কথা জানিতে পারি। পঞ্চম সর্গে নন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুদ্ধদেব তাঁহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে সম্মত করান। ষষ্ঠ সর্গে সুন্দরীর সকরুণ বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম সর্গে পত্নীবিরহে অশান্ত নন্দের বিলাপ এবং দেবতা নৃপ ঋষি আদির স্ত্রীলোকে আসক্তির পৌরাণিক উপাখ্যানের দোহাই দিয়া প্রিয়ার সহিত পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য নন্দের তর্কের অবতারণা দেখা যায়। অষ্টম সর্গে স্ত্রীচরিত্রের দোষ দেখানো হইয়াছে। নবম সর্গে মদাপবাদ বর্ণিত হইয়াছে। মদগর্বে স্ফীত কার্তবীর্যার্জুন, নমুচি দৈত্য প্রমুখ পুরাকালের বীরগণের পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া নন্দকে সাবধান হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দশম সর্গে সংসারের প্রতি নন্দের গভীর আসক্তি দেখিয়া বুদ্ধদেব তাঁহাকে ধর্মপথে আনিবার জন্য দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। পথে হিমালয়ে একটি কাণা বানরীকে দেখাইয়া বুদ্ধদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সুন্দরী এবং বানরীর মধ্যে কে রূপে ও চেষ্টায় অধিকতর সুন্দর। উত্তরে নন্দ হাসিয়া বলিলেন—রমণীগণ-মুকুটমণি সুন্দরীর সহিত কোন ক্রমেই ইহার তুলনা সম্ভবে না। স্বর্গের অপ্সরাগণের রূপে মুগ্ধ নন্দকে অনুরাগ দ্বারা অনুরাগ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া বুদ্ধ বলিলেন—সুন্দরী এবং অপ্সরার মধ্যে কে অধিক সুন্দর। ইহাতে নন্দ বলিলেন—বানরী ও সুন্দরীর মধ্যে যে প্রভেদ, অপ্সরা এবং সুন্দরীর মধ্যে ততটা প্রভেদ। অপ্সরাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য নন্দ কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। একাদশ সর্গে আনন্দ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন যে, কামের প্রার্থনা দুঃখময়। সুকর্মের অবসানে মানব পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ সর্গে, নন্দ স্বর্গ-সুখ আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বুদ্ধদেবের শরণ লইলেন। বুদ্ধের উপদেশমত তিনি নির্জনে তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তিনি অপ্সরা দর্শনে যেরূপ প্রিয়তমা পত্নীকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ নির্বাণ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অমৃতপ্রাপ্তির পর বুদ্ধের নির্দেশমত তিনি জগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিলেন। সুন্দরীও তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কাব্যের পরিসমাপ্তি হইল।

নাট্যকার হিসাবে অশ্বঘোষের সবিশেষ পরিচয় পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। তবে তাঁহার একখানি নাটকের কিয়দংশ তাতার দেশের মরুভূমি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক অমূল্য বস্তু ভারতের বাহিরে নীত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অশ্বঘোষের লিখনভঙ্গী সরল। এ সম্বন্ধে কীথ বলিয়াছেন,

"It aims at sense rather than mere ornament; it is his aim to narrate, to describe, to preach his curious but not unattractive philosophy of renunciation of selfish desire and universal active benevolence and effort for the good, and by the clarity, vividness, and elegance of his diction to attract the minds of those to whom blunt truths and pedestrian statements would not appeal."

দুঃখময় সংসারে জীবগণ যাহাতে মুক্তির পথ, অমৃতের আস্বাদন পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হয়—এই আদর্শে অশ্বঘোষ অনুপ্রাণিত। বুদ্ধ শুধু নিজ মুক্তির জন্য ব্যাকুল নহেন—সংসারে মোহগ্রস্ত মানবগণ যাহাতে পুনর্জন্মের হাত হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষফল নির্বাণলাভে সমর্থ হয় তিনি সেই পথ নির্দেশ করিয়া দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা এক নূতন দর্শন।

সুন্দরীকে পরিত্যাগ নন্দের পক্ষে হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া আমাদের মনে হইতে পারে; অপ্সরার প্রতি তাঁহার ভালবাসার আকর্ষণের একটা হাস্যোদ্দীপক দিক রহিয়াছে। কিন্তু পরিণামে সিদ্ধার্থের মত তিনি মানবকল্যাণে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শুদ্ধোধনের চরিত্র যেরূপ দশরথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় তেমনি সুন্দরী আমাদের চোখের সম্মুখে সীতার প্রতিমূর্তিরূপে ভাসিয়া উঠেন। আবার যশোধারার মধ্যে সীতা-চরিত্র অনেকটা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তিনি প্রিয়জনের কষ্ট স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন,—

'শুচৌ শয়িত্বা শয়নে হিরণ্ময়ে, প্রবোধ্যমানো নিশিতূর্য্যনিস্বনৈঃ
কথম্ বত স্বপ্স্যতি সোঽদ্য মেব্রতী ; পটৈকদেশান্তরিতে
মহীতলে।'

অশ্বঘোষ করুণ-রস সম্বন্ধেও যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,

'মহত্যা তৃষ্ণয়া দুঃখৈর্গর্ভেণাস্মি যয়া ধৃতঃ
তস্যা নিষ্ফলযত্নায়াঃ কাহম্ মাতুঃ ক সা মম।'

এই কল্পনা রামায়ণের আদর্শের অনুরূপ। কিন্তু অশ্বঘোষ তাঁহার নিপুণ তুলিকা সাহায্যে আদর্শ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সহজ অথচ মনোরম চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে তিনি যে বিশেষ সিদ্ধহস্ত নীচের বর্ণনা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়,

'তথাপি পাপীয়সি নির্জিতে গতে ; দিশঃ প্রসেদুঃ প্রবভৌ
নিশাকরঃ
দিবো নিপেতুর্ভুবি পুষ্পবৃষ্টয়ো ; ররাজ যোষেব বিকল্মষা
নিশা।

অশ্বঘোষ নৈশ অন্তঃপুর-কক্ষের নিদ্রিতা রমণীগণের যে সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা রামায়ণের তরঙ্গ-উদ্বেলিত ফেনিল হাস্যোজ্জ্বল সমুদ্রের সহিত তুলনীয়—

'বিবভৌ করলগ্ন বেণুরন্যা ; স্তনবিস্রস্তসিতাংশুকা শয়ানা
ঋজুষট্পদপংক্তিজুষ্ট পদ্মা ; জলফেনপ্রহসত্তটা নদীব।'

ভারবি এবং কালিদাসের উপর অশ্বঘোষের প্রভাব বিদ্যমান আছে। ভারবি কাব্যজগতে তাঁহার অর্থগৌরবের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবনীও তমসাচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় ৫৫০ অব্দে বিরাজমান ছিলেন। কীথ তাঁহার সৃজনী প্রতিভা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"His style at its best has a calm dignity which is certainly attractive, while he excels also in the observation and record of the beauties of nature and of maidens."

সুতরাং দেখা যাইতেছে অশ্বঘোষের ন্যায় তিনিও সৌন্দর্য-বর্ণনায় নিপুণ ছিলেন।

'প্রিয়েঽপরা যচ্ছতি বাচমুন্মুখী ; নিবদ্ধদৃষ্টিঃ শিথিলাকুলোচ্চয়া
সমাদধে নাংশুকমাহিতং বৃথা ; বিবেদ পুষ্পেষু ন পাণিপল্লবম্।'

অশ্বঘোষ 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের তৃতীয় সর্গে 'উদ্গতা ছন্দঃ' ব্যবহার করিয়াছেন। অনুরূপ ছন্দ ভারবির 'কিরাতার্জুনী'য় কাব্যের দ্বাদশ এবং 'শিশুপাল বধে'র পঞ্চদশ সর্গে দেখা যায়। সুতরাং ভারবির উপর অশ্বঘোষের প্রভাব অস্বীকার করিবার কোন হেতু থাকিতে পারে না।

কালিদাস অশ্বঘোষ ও নাট্যকার ভাসের পরবর্তী কালের। গুপ্তযুগ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ। কালিদাস এই যুগেই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিয়মাবলী মানিয়া চলিতেন। তাঁহার 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ে গুপ্ত যুগের প্রভাব সুস্পষ্ট রহিয়াছে। গুপ্ত-রাজগণের শক্তির কেন্দ্র পাটলিপুত্র নগরীতে ছিল; পরে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শাসন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালন মানসে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহার সভায় কালিদাস, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক প্রমুখ নবরত্ন বিরাজ করেন। 'বিক্রমোর্বশীতে' বিক্রমাদিত্য উপাধির সঙ্কেত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালিদাস খ্রীষ্টীয় ৪০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। কারণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত খ্রীষ্টীয় ৪১৩ হইতে ৪৫৫ অব্দ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেন। যদিও কালিদাস অশ্বঘোষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত তথাপি প্রাঞ্জলতা এবং উৎকৃষ্টতায় তিনি অনেকাংশে অশ্বঘোষকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় সৃজনী শক্তির বলে, নিপুণ তুলিকায় অশ্বঘোষের কাব্যের পারিপার্শ্বিক ঘটনা, আখ্যানবস্তুর নবরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'র তৃতীয় সর্গে দেখা যায়—

'বাতায়নেভ্যস্চ বিনিঃসৃতানি
পরস্পরোপাশ্রিত কুণ্ডলানি।
স্ত্রীণাং বিরেজুর্ মুখ পঙ্কজানি
সক্তানি হর্ম্যেষ্বিব পঙ্কজানি॥'

অনুরূপ চিত্র কালিদাস রঘুবংশে দিয়াছেন—

তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈঃ
ব্যাপ্তান্তরা সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষঃ
সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্।

'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের 'সোঽনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থে' অনুরূপ প্রতিধ্বনি কুমারসম্ভবে 'শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ' শ্লোকটিতে শুনা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালিদাস অশ্বঘোষের পরবর্তী যুগের।



শিল্পীর শিক্ষা

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

সত্যিকারের যে শিল্পী তার ছাত্রজীবনের শেষ হয় না, এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। যাঁরা শান্তিনিকেতনে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুর সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা শিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এ কথাটা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পীদেরও ছাত্রজীবন বলে একটা সময় আছে এবং সে সময়টাতে সবাইকেই ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর



"জলকে"

কাছে শিখতে হয়, এ শিক্ষাকে অবহেলা করলে চলে না। যদি এ শিক্ষাতে নিষ্ঠার অভাব থাকে তবে শিল্পীর গোড়াপত্তন কাঁচা থেকে যায়।

শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র হিসাবে মাষ্টার মশায়ের (নন্দলাল বসু) কাছে ছিলুম। সেখানকার ছাত্রজীবন শেষ করে চলে এসেছি, সেও দেখতে দেখতে অনেক বছরই হয়ে গেছে।

মনে আছে শান্তিনিকেতনে থাকতে আমার সমসাময়িক, কলাভবনের একটি ছাত্র কিছু কাজ করত না, বেশীর ভাগ সময় কেবল ঘুরে বেড়াত, এর ওর ছবি আঁকা দেখে বেড়াত, লাইব্রেরির পুঁথিপত্র ঘেঁটে একাকার করত—চায়ের দোকানে গিয়ে পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেত আর কলাভবনের বারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকত মাঝে মাঝে। বছর দুই এমনি করে তার কাটল, মাষ্টারমশাই ভাবনায় পড়লেন। তার বাবাকে চিঠি লিখে তাকে কলাভবন থেকে নিয়ে যেতে বলবেন কিনা ভাবছিলেন। ছেলেটার হবে না চিত্রকর্ম্ম শিক্ষা, কেবল মিছামিছি সময় নষ্ট করছে। দায়িত্ব আছে ত গুরু-গিরির, ছেলেটার মাথা খাওয়া ত চলে না।—কিন্তু শেষে অভাবনীয় ব্যাপার। তিন বছরের পর হঠাৎ ছাত্রটির হাত খুলল। একটার পর একটা করে কতকগুলো ছবি আঁকলে। মাষ্টারমশাই বড় খুশী হলেন সে সব ছবি দেখে। একদিন বললেন "দেখলে ত ছেলেটার কাণ্ড। সবাই কি আর এঁকে শেখে, কেউ কেউ মনের ভেতর তৈরি হতে থাকে। ছেলেটার ওপর অবিচার করছিলাম ভেবেছিলাম কিছু হবে না। কে বললে হয় নি, এ ছবিগুলি আঁকলে কেমন করে তবে? শিল্পী-মনের পরিচয় যে এতে রয়েছে—এ ত ভরে গেছে আগেই, আমাদের মার্কার অপেক্ষা রাখে নি।"



প্রসাধন

এই ত গেল একটি ছাত্রের কথা। কিন্তু সব ছাত্রই ত আর সমান নয়। দেখে হোক এঁকে হোক, যা করে হোক, শিখতে হবে ছাত্রাবস্থায়, এ বিষয় সন্দেহ নেই।

চার বছর কলাভবনে কাটলে পর মাষ্টারমশাই একদিন বললেন—এ বারে বড় হয়েছ, রইলে ত এখানে কিছুকাল, এ বারে চরে বেড়াও নিজে নিজে। যেমন মুরগী তার

ছানাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের আগলে আগলে পোকামাকড় ধরতে শিখিয়ে দেয় কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা খেতে হয় তা দেখিয়ে দেয়। তারপর একটু বড় হলে মুরগীর আর দায়িত্ব থাকে না, তখন বাচ্চাগুলোর নিজেদেরই চরে খেতে হয়।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থা ত কাটল। পড়লাম অথৈ জলে। ছাত্রজীবন ছিল ভাল। টাকা আসত বাড়ী থেকে—সবই তাতে



ছুরিতে শান দেওয়া হইতেছে

কুলিয়ে নিতে হ'ত। এখন করি কি? বাইরের দিক দিয়ে ছাত্রজীবন ত শেষ হ'ল, চরে খাবার অনুমতি পেয়েছি। অথচ চরে খেতে ঠিকমত শিখি নি। দু-তিন বছর ঘুরে কাটিয়ে দিলাম। কোথায় মাদ্রাজ, মাদুরা, সিংহল, মহাবলীপুরম, অজন্তা, ইলোরা এলিফ্যাণ্টা। সম্বল সামান্য, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, পুরী-তরকারির ওপর নির্ভর—আর কাঁচা লঙ্কার 'পকড়ি'।



সাঁওতাল গোলাবাড়ী

মাদ্রাজের দিকে অবশ্য চার-পাঁচ আমায় চমৎকার ভাত, সম্বর দৈ পেতাম। এই করে ঘুরে ঘুরে বোম্বাই শহরে পৌঁছে পাথর কুঁদে মূর্ত্তি গড়তে ইচ্ছে হ'ল। মাদ্রে সাহেবের প্রকাণ্ড স্টুডিও সমুদ্রের ধারে চোপাটিতে। সেখানে জুটলাম। টাকাকড়ি ফুরিয়ে এল—ছবি আর বিক্রী হয় না। কত আর ঘোরা যায়। বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছবি বিক্রী করা পোষায় না, মনটা দমে যায়।

পরীক্ষার পড়ার ভয়ে একদিন স্কুল পালিয়েছিলাম; অদৃষ্টের পরিহাস, জুটলাম এসে শেষ পর্য্যন্ত স্কুলেই—ছাত্র হিসাবে নয় মাষ্টারের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে। ছবি আঁকি, মূর্ত্তি গড়ি,—



সাঁওতাল কুটীর

ছেলেরা আসে দলে দলে, সব বড়লোকের ছেলে। আমি ছাত্রাবস্থায় খরচ করতাম চল্লিশটি টাকা,* এখানে এসে দেখি ছেলেদের জন্যে মাথাপিছু খরচ হয় চল্লিশকে চার দিয়ে গুণ করলে যত হয় তারও বেশী। এও অদৃষ্টের পরিহাস, মেনে নিতেই হ'ল। ছেলেরা আসে কাজ করে। এদেরই মধ্যে দু'চারটি মনোযোগী ছাত্র জুটে গেল, চিত্রল থেকে এসেছিল দু'তিনটি মুসলমান ছাত্র তারা বেশ কাজ করছিল। আর একটি রোগা লম্বা ছেলে, শান্ত স্বভাব, বয়স তের কি চৌদ্দ, আসত মাঝে মাঝে, ছবিও আঁকত। এখানে ছেলেরা ত কেবলমাত্র ছবি আঁকতে বা মূর্ত্তি গড়তে আসে না। তাদের পড়াশুনা করতে হয়, খেলাধুলা করতে হয়। ড্রিল ও দৌড়ঝাঁপ না করা এখানে মহা পাপ এ একরকম ভালই—তারই সঙ্গে একটু-আধটু ছবি আঁক, শিল্প-চর্চ্চা কর এই আর কি। যার কথা বলছিলাম, সেই ছেলেটি নিজেকে খুঁজে পেলে ছবি আঁকার ঘরে আর খেলার মাঠে। এরই পরিচয় দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

ছেলেটির নাম শ্রীঅজিত কেশরী রায়। উড়িষ্যা দেশের কটক শহর থেকে সে সুদূর দেরাদুনে 'দুন' স্কুলে এসেছিল পড়তে। বাড়ীর সবাই হয়ত ভেবেছিলেন ছেলেটি হবে একটি বড় "লীডার" বা অফিসার। তার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না,

* আঠার টাকা কলাভবনে শেখবার জন্য, খাওয়া-খরচ পনর টাকা, বাকীটা হাতখরচ।

সে চেষ্টা করতে লাগল শিল্পী হবার জন্তে। এখান থেকে পড়া শেষ করে সে বার হ'ল, কেউ বললে তাকে "আর্মি"তে যোগ দিতে, কেউ বললে "নেভি"। কিন্তু এখানকার আর্ট স্কুলেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নিরূপিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আত্মীয়-স্বজন এবং তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল। চিত্রকলার চর্চ্চা করবার জন্তে সে গেল শান্তিনিকেতনে। সেখানে গিয়ে পাঁচ বছর ছাত্ররূপে কাটালে কলাভবনে। শুনতাম অজিত শান্তিনিকেতনে কাজ করছে মন্দ নয়। বড় চুপচাপ ছবি আঁকে, কাঠ-খোদাইয়ে (wood-cut) তার হাত হয়েছে ভাল। উড্‌কাট সে শিখছে মাষ্টার মশায়ের ছেলে শ্রীবিশ্বরূপ বসুর কাছে। এই সবে শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবস্থা শেষ হয়েছে। পাঁচ বছর পরে সে এক দিন আবার দেরাছনে এসে হাজির। তার আঁকা রঙীন ছবিগুলো, উড্‌কাট প্রিণ্টগুলো দেখতে লাগলাম। শান্তিনিকেতনের ছাপ লেগে আছে তার ছবিতে। সেই সাঁওতাল গ্রাম—বল্লভপুরের রাস্তা, কোপাই নদী, তালতলা, সাঁওতালনীদের চুল বাঁধা—এমনিতর নানা বিচিত্র দৃশ্যাবলী চোখের সামনে ভাসতে লাগল। এ সব জায়গা ত আমার খুব পরিচিত। অজিতের ছাত্রাবস্থা শেষ হয়েছে—এখন তারও চরে বেড়াবার সময় হয়েছে। শান্তিনিকেতন থেকে সে নিয়েছে যা নেবার। এখন তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। শান্তিনিকেতনে বনস্পতির ছায়ায় সে নির্ভাবনায় কাটিয়েছে, এখন তাকে বিচ্ছিন্ন হতে হ'ল। ছাত্রজীবনের অবসান হ'ল বটে, কিন্তু আসল ছাত্রাবস্থা প্রকৃত পক্ষে এখন থেকে হ'ল সুরু। এখনই তার বাড়বার সুযোগ, যদি না সে বিভ্রান্ত হয়। বিভ্রান্ত হবে না আশা করা যেতে পারে, কেননা শান্তিনিকেতনে সে ছাত্রাবস্থা শেষ করেছে মাষ্টার মশায়ের কাছে। শিল্পীর বীজমন্ত্র সে শিখে নিয়েছে নিশ্চয়ই। গুরু যে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন সে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে গেলে সারা জীবন ধরে কঠোর সাধনা করা চাই। এ কথাটাই আমরা সব সময় মনে রাখি না।



রূপালী জলরেখা

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি শিল্পী শ্রীঅজিতকেশরী রায় কর্তৃক অঙ্কিত]

ক্ষয় নাই, জয় তোর

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নির্ভীক নেই তোর মৃত্যুর ভয়,
ব্রহ্মের রসলোক ঝর্ণার জল,
স্বর্গের সন্তান মৃত্যুঞ্জয়,
মর্ত্তের নর তুই রণচঞ্চল
দর্পের রাক্ষস দেয় হুম্‌কার,
সুন্দর সত্যের চম্‌কায় প্রাণ,
ধার্ম্মিক সজ্জন নেই ঘুম কার,
গর্জ্জন কর্ তুই দেবসন্তান।

ভোগসুখ সংসার হোক ভাগবত
অর্পণ কর ভাই তনুমনধন,
আজ সব মুক্তির জাগবার পথ,
অমৃত তোল্ কর্ গণমন্থন।
হুঙ্কার ছাড়্ বল্ ধর্ম্মের জয়,
বন্দন- জয় গাক্ হিন্দুস্থান,
চল তুখ ভঞ্জন মৃত্যুঞ্জয়,
ক্ষয় নাই জয় তোর দেবসন্তান।

উপনিষদে জ্ঞান ও কর্ম্ম

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

উপনিষদের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অনুভব করা। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মকে অনুভব করা যায় না। চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হইলে সকল কামনা হইতে মুক্ত হইতে হয়। তাহার জন্ম কর্ম করা প্রয়োজন। অন্যায় কর্ম করিলে আমাদের চিত্ত অশুদ্ধ হয়। সংকর্ম নিষ্কাম ভাবে করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই ভাবে সংকর্ম করা ব্রহ্ম-উপলব্ধির সহায়ক। একজ বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণগণ অনাসক্তভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন।"১ দান ও তপস্যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ইহা সহজেই বুঝা যায়। যজ্ঞের দ্বারাও চিত্ত শুদ্ধ হয় কারণ যজ্ঞ করিতে হইলে উপবাস করিতে হয়, অর্থব্যয় করিতে হয়, সাবধানে অনেক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে হয়, মন্ত্রের দেবতার ধ্যান করিতে হয়। কর্মের প্রয়োজনীয়তা অন্ত উপনিষদেও বলা হইয়াছে। ঈশ উপনিষদ বলিয়াছেন, "কর্ম করিতে করিতে এক শত বৎসর জীবিত থাকিবে এইরূপ ইচ্ছা করা উচিত।"২ কেন উপনিষদ বলিয়াছেন, "তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং কর্ম (হইতেছে) উপনিষদের ভিত্তি।"৩ কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে প্রথমে যজ্ঞ করিতে শিক্ষা দেন পরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে যজ্ঞ করা প্রয়োজন। মুণ্ডক উপনিষদ বলিয়াছেন যে যজ্ঞসকল সত্য এবং সে সকল সর্বদা অনুষ্ঠান করা উচিত।৪ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে দেবকার্য্য (অর্থাৎ যজ্ঞ) এবং পিতৃকার্য্য (অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ) কখনও অবহেলা করিবে না।৫ ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন যে ধর্মের তিনটি স্কন্ধ বা বিভাগ ; যজ্ঞ, অধ্যয়ন (বেদপাঠ) এবং দান প্রথম বিভাগের অন্তর্গত।৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাক্য পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে।৭ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সকল প্রসিদ্ধ উপনিষদেই যজ্ঞ বা কর্ম করিতে বলা হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদের একটি বাক্য কেহ কেহ যজ্ঞবিরোধী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যজ্ঞবিরোধী নহে। বাক্যটির অনুবাদ এইরূপ : "এই সকল যজ্ঞ দুর্বল ভেলার স্থায়। যাঁহারা ইহাকে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুর অধীন হন।"৮ এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ : "যাঁহারা স্বর্গ লাভের ইচ্ছায় যজ্ঞ করেন তাঁহারা স্বর্গ ভোগ করেন কিন্তু স্বর্গে চিরকাল থাকিতে পারেন না, পুণ্য ফুরাইলে স্বর্গভোগও শেষ হয়, তখন পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ; জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ব্রহ্মলাভ, ব্রহ্মলাভ করিতে পারিলে আর দুঃখময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। স্বর্গের আশায় যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মলাভ হয় না।" এই বাক্যটি মুণ্ডকের ১ অধ্যায় ২ খণ্ডে আছে। এই খণ্ডের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, সর্বদা যজ্ঞ করা উচিত।৯ সুতরাং যজ্ঞ নিষেধ করা মুণ্ডকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। স্বর্গের আশায় যজ্ঞ করার নিন্দা করিয়া নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিতে বলা হইয়াছে।

যজ্ঞ সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইল মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে সেই মত প্রকাশ করিয়াছেন।১০ শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণও এ বিষয়ে এক মত, যদিও অন্য কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন উপনিষদের ঋষিগণ বৈদিক কর্মের বা যজ্ঞের বিরোধী। Macdonell লিখিয়াছেন—

"Though the Upanishads form a part of the Brahmanas they really represent a new religion which is in virtual opposition to the ritual or practical side." —(*History of Sanskrit Literature*, p. 215).

Max Muller লিখিয়াছেন :

"In these Upanishads the whole ritual or sacrificial system of the Vedas is not only ignored but directly rejected as useless, nay as mischievous. The ancient gods of the Vedas are no longer recognized."—(*Origin of Vedanta*, p. 6).

Deussen লিখিয়াছেন :

"The Atman doctrine is fundamentally opposed to the Vedic cult of the gods and the Brahminical system of the ritual."—(*Religion and Philosophy of the Upanishads*, p. 21).

Winternitz লিখিয়াছেন :

"While the Brahmins were pursuing their barren sacrificial science other circles were engaged in those highest questions which were at least treated so admirably in the Upanishads."—(*History of Sanskrit Literature*, p. 237).

Garbe, Hartel, Hume প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এইরূপ লিখিয়াছেন। যদিও সকল প্রধান উপনিষদে সুস্পষ্ট ভাবে বৈদিক কর্ম করিতে বলা হইয়াছে তথাপি বিলাতী পণ্ডিতগণ

১ "তম্ এতং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।"

২ কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ।—ঈশোপনিষদ্

৩ তস্যৈ তপোদমঃকর্ম ইতি প্রতিষ্ঠা।—কেনোপনিষদ্

৪ তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামাঃ।—মুণ্ডক

৫ দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।—তৈত্তিরীয়

৬ ত্রয়োধর্ম স্কন্ধাঃ, যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ।—ছান্দোগ্য ২।২৩

৭ তমেতং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।—বৃহদারণ্যক

৮ প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তং অবরং যেষু কর্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যে অভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি।—মুণ্ডক ১।২।৭

৯ তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামাঃ।—মুণ্ডক ১।২।১

১০ সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ।—ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৬

প্রায় সকলেই কেন এরূপ ভুল করিলেন ইহা আশ্চর্যের বিষয়। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, ইহা হইতেই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উপনিষদে বৈদিক কর্মকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। সেইরূপে যেহেতু উপনিষদে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে ইহা হইতেই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উপনিষদে বৈদিক দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হয় নাই। কিন্তু এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতায় বিশ্বাসের সহিত কোনও বিরোধ নাই। এক জন রাজা থাকিলেও যেমন রাজ্যে কতকগুলি রাজকর্মচারী থাকিতে পারে, সেইরূপ এক জন ঈশ্বর থাকিলেও তাঁহার অধীনে অনেক দেবতা থাকিতে পারেন। অন্ততঃ উপনিষদের ইহাই মত। প্রায় সকল উপনিষদেই ইন্দ্রাদি দেবতার কথা আছে। ঈশোপনিষদের শেষে অগ্নিদেবতার প্রতি প্রার্থনা আছে যেন তিনি মৃত্যুর পর আত্মাকে সুন্দর পথে পরলোকে লইয়া যান।১১ কেন উপনিষদে বলা হইয়াছে যে সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।১২ কঠ উপনিষদে যম বলিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য দেবতাগণও আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।১৩ মুণ্ডকোপনিষদ বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতেই দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।১৪ তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদেও দেবতাগণের উল্লেখ বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ম্যাক্সমুলর বলিলেন যে উপনিষদে প্রাচীন দেবতাগুলিকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা এই যে বেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগ যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা জ্ঞানের অল্পতা হেতু এক ঈশ্বরের কল্পনা করিতে পারেন নাই বলিয়া বহু দেবতার কল্পনা করিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিদের অধিক জ্ঞান হইয়াছিল এজন্য তাঁহারা বহু দেবতার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা অংশেও এক ঈশ্বরের উল্লেখ বহু স্থলে পাওয়া যায়। যথা—ঋগ্বেদ সংহিতার পুরুষসূক্তে বলা হইয়াছে (১০।৯০)—"এই সকল বস্তুই ঈশ্বর, যাহা কিছু ছিল যাহা কিছু হইবে।"১৫

বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী ঈশ্বরের ক্ষুদ্র অংশমাত্র, তাঁহার অধিকাংশ স্বর্গে অমৃতরূপে অবস্থান করে।১৬ হিরণ্যগর্ভসূক্তে (ঋগ্বেদ সংহিতা ১১।১২১) বলা হইয়াছে, দেবগণ ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন।১৭ সকল দেবতার মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।১৮ নাসদীয় সূক্তে (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১২৯) বলা হইয়াছে ঈশ্বরই জগতের অধ্যক্ষ।১৯ ঋগ্বেদ সংহিতা ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে একই সত্যবস্তুকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নানা নামে অভিহিত করেন, যথা—ইন্দ্র, যম বায়ু।২০ ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৮২।৩ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর আমাদের পিতা ও বিধাতা।২১ অতএব ইহা বলা যায় না যে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা অংশের রচয়িতারা এক ঈশ্বরের কল্পনা করিতে পারেন নাই। উপনিষদের ঋষিগণ যে নিজদিগকে সংহিতার ঋষিগণ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মনে করেন নাই তাহা ইহা হইতেও বুঝা যায় যে উপনিষদ নিজ উক্তির সমর্থনে সংহিতা হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।২২

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ উপনিষদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। ভারতীয় কৃষ্টির সহিত তাঁহাদের পরিচয় অল্প। তাঁহাদের সংস্কার অন্যরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রখ্যাতনামা ভারতীয় পণ্ডিতগণও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হিরিয়ান্না (মহীশূর) লিখিয়াছেন:

"The Upanishads primarily represent a spirit different from and even hostile to ritual."—(*Indian Philosophy*, p. 48).

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) লিখিয়াছেন,

"The Upanishads do not require the performance of any action but only reveal the ultimate truth and reality."—(*History of Indian Philosophy*, p. 28).

অধ্যাপক আর ডি রাণাড (এলাহাবাদ) লিখিয়াছেন,

"The spirit of the Upanishads is baning a few exceptions entirely antagonistic to the sacrificial doctrine of the Brahmans."—(*Upanishadic Philosophy*, p. 6).

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

"The Upanishads expound a new religion which is opposed to the sacrificial ceremonial."—(*Hindu Civilization*, p. 118).

সর্ এস্ রাধাকৃষ্ণন লিখিয়াছেন,

"Men sat down to doubt the gods they ignorantly worshipped."—(*Indian Philosophy*, pp. 71-72).

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সাধুগণ উপনিষদের তত্ত্বগুলি অনুভব করিবার জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসরণ করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ ভ্রমে উপনীত হইয়াছেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবে উপনিষদ শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে তাহাতে এইরূপ ভ্রান্ত মতের প্রচার হইতেছে। ছাত্রদের ধারণা হইতেছে যে বেদে পরস্পরবিরোধী বাক্য আছে এবং বেদের অধিকাংশই অজ্ঞব্যক্তিদের রচনা। অথচ যে মতের উপর এই ধারণা হইতেছে সেই মতই ভ্রান্ত। বেদই হিন্দুধর্মের ভিত্তি, বেদে অবিশ্বাস হেতু হিন্দু ছাত্রের ধর্মে অবিশ্বাস হইতেছে। ধর্মবিশ্বাস না থাকিলে বিদ্যা বুদ্ধি নিষ্ফল

১১ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্।—ঈশ

১২ তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিব অন্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ তেহি এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুঃ।—কেন

১৩ দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা।—কঠ

১৪ তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ।—মুণ্ডক

১৫ পুরুষ এব ইদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং।

১৬ পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি

১৭ উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ

১৮ যো দেবেষু অধি দেব এক আসীৎ

১৯ যোঽস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

২০ একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ

২১ যোনঃ পিতাজনিতা যো বিধাতা

২২ তদেতৎ ঋচা অভ্যুক্তং—প্রশ্নোপনিষৎ ১।৭

হয়। আর এক কারণে বেদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। বৈদিক সভ্যতার অসাধারণ জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, বৈদিক সভ্যতা এখনও জীবন্ত। কেবল জীবন্ত নহে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষের এখনও আবির্ভাব হইতেছে যাঁহারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন, পার্থিব জগতেও মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—সমগ্র জগৎ যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ নেতা ও কবি বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বৈদিক সভ্যতা বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই বেদের জন্মস্থান ভারতবর্ষে বেদসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার না হয় এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

* লেখক কর্তৃক মান্দ্রাজ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বনে লিখিত।

জাগো দুর্গম-পথ-যাত্রী

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

আলোক নিভেছে, আসিতেছে নেমে নিবিড়
আঁধার-কালো রাত্রি।
পথের নিশানা যায় নাক চেনা, ওগো দুর্গম-পথ-যাত্রী।
সাহসেতে বাঁধ বক্ষ তোমার, গতি হোক তব দুর্বার,
ভ্রুকুটি-ভঙ্গে পাষাণপ্রাচীর ভেঙ্গে কর তবে চুরমার।
তোমার চোখের সহজ দীপ্তি আলোকেরে করে সন্ধান,
সন্ধ্যা-তারকা বর্তিকা লয়ে করে তাই তোরে আহ্বান।
রজনীর কালো যবনিকা নয় পথের পরম ভয়-দাত্রী,
বক্ষে জাগাও দুর্জ্জয় পণ, ওগো দুর্গম-পথ-যাত্রী।

নিবিড় ঘোরালো আঁধার ঘনালো, হারায়ো না পথ হে পথিক।
দুর্ব্বার-গতি-চঞ্চল পদে, দলিত কর হে সব দিক।
বাধা ও বিঘ্ন হউক তীক্ষ্ণ, মুছে যায় যদি পথ-চিহ্ন,
নব পথ তুমি করিবে সৃষ্টি সকল কুহেলি করি' ছিন্ন।
তোমার আশায় আজি নিরাশায় নিখিল ভুবন উন্মুখ,
আঁধারের পিছে প্রভাতের আলো চেয়ে থাকে পথ সম্মুখ।
সূর্য্যের মত বাজায়ে তূর্য্য করিয়া দীর্ণ দুখ-রাত্রি
বরাভয় লয়ে জাগো নির্ভয়ে ওগো দুর্গম-পথ-যাত্রী।

অক্ষত পদ হবে বিক্ষত, কণ্টকে পথ আছে কীর্ণ,
কল্পলোকের বিভীষিকা যত হয়ত বা হবে অবতীর্ণ,
হয়ত বা বাধা তুলে রবে মাথা আড়াল করিয়া তব পন্থা,
ভুলাতে নিমেষে মায়া-মৃগ-বেশে আসিবে কতই সুখ-হন্তা,
নামিবে ঝঞ্ঝা অট্টহাস্যে, ধূলায় ধরণী হবে পূর্ণ,
জীবনের কত স্বপন-সৌধ কত যে সাধনা হবে চূর্ণ,
আশা-নিরাশায় দুলিবে হৃদয়, তবু যেতে হবে ওরে যাত্রী,
আঁধারের কেশ-গুচ্ছ ছিঁড়িয়া দূর কর এই ক্রূর রাত্রি।

দৈত্য দানব নাচে তাণ্ডব, সুপ্তি-মগ্ন রহে শিব,
বীভৎসতার গাহে জয়গান যত নির্জ্জিত নির্জ্জীব।
অন্তরে তাই সুন্দর নাই, রক্ত-লোলুপ ধরাতল,
সিন্ধু মথিয়া ওঠে নাক সুধা, ওঠে আজ শুধু হলাহল।
অলীকের পিছে সকলে ছুটিছে, রহে তুচ্ছের মোহে মত্ত,
দূর হতে তাই দূরে সরে যায় চির-সুন্দর চির-সত্য।
ত্রাণের গীতিটি আনো প্রাণে প্রাণে, দূর কর এই দুখ-রাত্রি,
দুর্ব্বার বেগে দুর্জ্জয় বীর জাগো দুর্গম-পথ-যাত্রী।



শক্তি — শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আর্যা নিবেদিতার নারী আদর্শ

স্যার যদুনাথ সরকার

আমরা যদি কোন মহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার নাম জড়াইয়া দিতে চাই, তবে আমাদের প্রথমেই জানা উচিত ভারতীয় নারী সম্বন্ধে তাঁহার কি আদর্শ ছিল। আমাদের শিল্পকলা, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মত তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু নারী শিক্ষা সম্বন্ধে তেমন কিছু হয় নাই। ঐ বিষয়ে অনেক বার তাঁহার সঙ্গে এবং একবার তাঁহার সহকর্মিণী আমেরিকাবাসিনী শিক্ষাব্রতী ভগিনী কৃষ্টিনের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হয়।

কলিকাতা শহরের উত্তর প্রান্তে বোসপাড়া লেনে কয়েকটি বালিকা লইয়া একটি বাড়িতে The House of the Sisters নাম দিয়া সেখানে বাস করিয়া নিবেদিতা তাঁহার শিক্ষা-কল্পনার কার্যকরী সূত্রপাত করেন, কিন্তু অন্য কাজের আহ্বানে কিছু দিন পরে তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতে হয়, তিনি উহাকে পূর্ণ পরিণতি দিতে পারেন নাই।

বর্তমান সময়ে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সার ও অসারের ভেদ না বুঝিয়া আমরা বিদেশের বাহ্যিক চালচলন অথবা নব নব মতবাদের হুজুকে মত্ত হইয়া উঠি, তাই ভারতীয় নারীদের স্থান ও কর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিব।

নিবেদিতা সর্বপ্রথমে চাহিতেন যে বঙ্গনারীরা নির্ভীক হইবে, যেমন আমাদের জাতীয় জাগরণের অতি প্রত্যুষে দেশভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন—

"অতএব জাগো, জাগ গো ভগিনী,
হও বীরজায়া, বীরপ্রসবিনী।"

আমাদের দেশে আগেকার সাহিত্য ও সমাজে মহিলার আদর্শ ছিল যে তিনি পবিত্র হইবেন। সেটা ভাল কথা; কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি অতীব কোমল ও অবলা হইবেন, ঘরের বাহিরে ভয়ে জড়সড়, বিশ্বব্যাপক এক লজ্জায় অবসন্ন হইয়া বাহিরের জগতের দিকে তাকান মাত্র যথাসম্ভব অন্তঃপুরে লুকাইয়া বাঁচিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করা ভুল। এমন হইলে তাঁহার দ্বারা পরের সাহায্য করা, বিশ্বজগতের কাজে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব হইবে। নিবেদিতা বলিতেন যে ইহা হিন্দুনারীর পবিত্র আদর্শের সত্য সত্যই বিরোধী। এতদিনে আমরা অনেকে তাঁহার এই মত মানিয়া লইয়াছি। যেমন ধর্মজগতে বিবেকানন্দ আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া ঘোষণা করিলেন—ন অয়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—অর্থাৎ দুর্বল যে সে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, যুদ্ধক্ষেত্রেও যেমন ধর্মসাধনায়ও তেমনি, বীর, সবল হওয়া চাই। নিবেদিতা বলিতেন যে বাঙালী মহিলারা যদি ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়াটাকে আদর্শ মনে করেন, তবে তাঁহাদের নিত্য চকিত চঞ্চল চিত্ত কখনও মনুষ্যত্বের উচ্চস্তরে উঠিতে পারিবে না, তাঁহারা গোবেচারা জীব হইয়া থাকিবেন। প্রাচীন আর্য্য নারীগণ যে সাহস, স্বাবলম্বন, কার্যদক্ষতা, প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন সেই গুণগুলি যদি আজকালকার মাতা ও কন্যারা হারাইয়া থাকে তবে তাহা সমস্ত জাতির ক্ষতির কারণ হইবে। এইজন্য আমাদের পুরাণ, ইতিহাস আদিতে তিনি কোন কর্মঠ তেজস্বিনী নারী-চরিত্রের কথা পড়িলে আনন্দিত হইতেন, চাহিতেন যে আবার সেইরূপ নারীর যুগ ভারতে ফিরিয়া আসুক। বীর স্বাধীন-গতিশালিনী অথচ বিশুদ্ধ চরিত্রা কত কত স্ত্রী রাজপুত ও মারাঠা ইতিহাসে বিখ্যাত; তাঁহারা ভারতের কন্যা ছিলেন, এই আর্যভূমি আবার সেরূপ সন্তান প্রসব করুক, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা ছিল।

বোধগয়াতে একটি প্রকাণ্ড গোল পাথরের বেদী আছে, তাহার উপর আগাগোড়া তিব্বতী বজ্রের চিহ্ন অঙ্কিত। বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে ভগবান বুদ্ধ যখন সুদীর্ঘ কঠোর ধ্যানের পর মানবহিতকর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বসিবার জন্য এই বজ্রাসন পাঠাইয়া দেন। ঐ স্থানে বেড়াইবার সময় নিবেদিতা বলিলেন, "মানবের হিতের জন্য যে নিজকে নিঃশেষে দান করে, সে দেবতাদের কাজের জন্য বজ্রের মত কঠিন এক অজেয় শক্তি হয়।" সেইজন্য ঐ বজ্রচিহ্ন তিনি ভারতের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং তাহাই তাঁহার গ্রন্থের উপর অঙ্কিত করেন। আচার্য জগদীশ বসুও ঐ চিহ্ন সাদরে লইয়াছেন।

আধুনিক ভারতীয় নারীর নিকট এই উচ্চতর পূর্ণ মানবতার দাবি, জগতের প্রগতিতে সাহায্য করিবার দাবি, নিবেদিতা করিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, মলয় পবন, কোকিল কূজন, বসন্তের ফুলরাশি, নৃত্যগীত এই-গুলিমাত্র গোপিনীদের ঘিরিয়া আছে। সেজন্য নিবেদিতা তাহাদের বর্জ্জন করিয়া কালীর উপাসনা প্রচার করিতেন। বাংলাদেশে পৌঁছিয়া তাঁহার প্রথম ইংরেজী বক্তৃতার বিষয় হইল—Kali the Mother! সে সভায় কোন নামজাদা হিন্দুনেতা সভাপতি পাওয়া গেল না, কালী নাম শুনিয়া কলিকাতার সভ্য সমাজ চমকিয়া উঠিলেন।

কিন্তু কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। কালী নারী বটে, কিন্তু তিনি পাপের, অত্যাচারের, অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের ধ্বংস করেন। এই সংহার-কার্য মানবের রক্ষার জন্য, জগতের হিতের জন্য, জ্ঞানের উন্নতির জন্য আবশ্যক, সুতরাং এই নারীদেবতা, এই শক্তিরূপিণী, ভয় বা ঘৃণার বিষয় নহেন, তিনি এক রকমে মাতা ও জগতরক্ষাকারিণী। অযোগ্যতা, ভ্রান্তবিশ্বাস, অর্থাৎ অসত্যকে ধ্বংস করিতে না পারিলে মানব সমাজের উন্নতি হইতে পারে না; সভ্যতার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ইহাই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে বিশ্বযুদ্ধ হয় তাহার শেষে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক গেডিস এদেশে তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন,—

"Darwin's law of the survival of the fittest is your goddess Kali. The Germans are now firing it back at England,"—

অর্থাৎ এ জগতে যাহা কিছু অকর্মণ্য অপটু বা মেকী তাহার

বিনাশ অনিবার্য, কালের গতিতে তাহা লোপ পাইবেই। ইহাই কালীর নির্মম কাজ।

সুতরাং নিবেদিতার আদর্শে বর্তমান ভারতের নারীকে সংসারক্ষেত্রে যোদ্ধা কর্মী নেতাদের পাশে স্থান লইতে হইবে। জ্ঞানের জগতে যত অগ্রগতি, যত আবিষ্কার হইতেছে তাহা হইতে ভারতনারী দূরে থাকিলে চলিবে না। যখন আমরা ভারতীয় নারীদের পতিসেবা, আত্মত্যাগ, দয়া, দাক্ষিণ্য আদি গুণের প্রশংসা করিতাম, নিবেদিতা বলিতেন, "এগুলি ভাল বটে, কিন্তু যথেষ্ট নহে। যোগ্য ভারতীয় মহিলা মনীষী পতির গবেষণাকার্যে সাহায্য করিবে, তাঁহার যথার্থ সহধর্মিনীরূপে তাঁহার নির্বাচিত সত্য-আবিষ্কার-ব্রতে সঙ্গিনী হইবে", যেমন মাদাম কুরী তাঁহার স্বামী অধ্যাপক কুরীর সঙ্গে একত্র বিজ্ঞান-মন্দিরে কাজ করিয়া রেডিয়াম-আবিষ্কার করেন, এবং সেজন্ত ঐ দুজনে যুক্তভাবে নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিক্স পান।

নিবেদিতা ভারতকে এত ভালবাসিতেন, এই আর্যভূমির প্রাচীন কীর্তি ও আধুনিক অবনতি ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ এত কাঁদিত যে তিনি সর্বদাই চাহিতেন আমাদের কলেজ অধ্যাপকগণ নিজ নিজ বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর গবেষণা করুক, যাহা প্রকাশিত হইলে বিশ্বজগতে ভারতের নাম আবার পরিচিত হইবে, গৌরবের স্থান পাইবে। নিবেদিতা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে এত ভক্তি, এত সম্মান করিতেন তাহার কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, ভারত এত দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া জগৎ-সভার মাঝে অজ্ঞাত অখ্যাত ছিল, কিন্তু জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে সেই দূর সিন্ধুতীরে গিয়া নিজ প্রতিভাবলে বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত পণ্ডিত-সভায় ভারতের জন্ত উচ্চ আসন কাড়িয়া লইলেন, সেখান হইতে জয়মাল্য আনিয়া লজ্জানতশির ভারতজননীর পদতলে তাহা অর্ঘ্য দিলেন। যেমন ১৮৯৩ সালে শিকাগো নগরের বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জগৎ-সভায় পরিচিত করিয়া দিয়া এই ধর্ম ও সংস্কৃতির মহত্ব জগৎকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লন।

নিবেদিতা বলিতেন, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, উপন্তাস প্রভৃতি বিভাগে প্রাচীন ভারত অমূল্য সৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছে; এখন চাই exact sciences, technical and mechanical arts, অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানে, রসায়নে, নব্য চিকিৎসা শাস্ত্রে, ইতিহাসে ও কার্যকরী বিভায় আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্মিগণ মৌলিক গবেষণা করিয়া তাহার মূল্যবান ফল প্রকাশ করিয়া সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা অর্জন করিবে। এইরূপ কাজের জন্ত তাহাদের উপর দেশের দাবি সর্বাগ্রে, এর জন্ত আমাদের অধ্যাপকগণ ও অন্তান্ত গবেষকেরা তাঁহাদের সব সময়, সব শক্তি ব্যয় করুন। যখন আমি বলিলাম যে আমাদের দেশের সব শিক্ষিত লোক বিবাহিত, তাহাদের অনেকটা সময় নিজ ছেলেমেয়েদের জন্ত ভাবিতে হয়, তাহাতে নিবেদিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, "I wish all the children were dead," 'মরুক গে সব কাচ্চাবাচ্চাগুলো!' ইহা হইতে দেখিবেন যে ভারতজননীর হীন দশার জন্ত কত গভীর লজ্জা তাঁহার হৃদয় ভরিয়া ছিল।

কিন্তু এই কথাগুলি হইতে কেহ যেন না ভাবেন যে নিবেদিতা আদর্শ হিন্দুনারীকে ব্লু ষ্টকিং অর্থাৎ চশমাধারী বিরলকেশ, শুষ্কহৃদয় পণ্ডিতানী কিম্বা রণচণ্ডী করিয়া তুলিতে চাহিতেন। তিনি তাহাদের জ্ঞানচর্চা দ্বারা মনীষী পতির উপযুক্ত সহচরী হইতে, পতির গবেষণা-কার্য সহজ করিতে, তাঁহাকে প্রকৃত উৎসাহ দিতে বলিতেন মাত্র।

দ্বিতীয়ত, নিবেদিতার আদর্শ ছিল যে আমাদের মহিলাগণ, কি ধনী কি দরিদ্র, কি বুদ্ধিমতী কি সরলা, সমাজের সব স্তরের নারীই সুকুমার কলাগুলির নিজ নিজ সাধ্যমত চর্চা করিয়া ঘরে ঘরে আলোক আনন্দ ও সৌন্দর্য্য বোধ আনিয়া দিবে। এজন্য বহু মূল্য ছবি বা কার্পেট, প্রস্তরমূর্তি বা শৌখিন আসবাব দরকার হয় না। যদি নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত ও বিকশিত রাখা যায় তবে কত দরিদ্রের গৃহিণীরাও আলিপনা, কাঁথায় ফুল-কাটা, আসন বুনন প্রভৃতি সাধারণ উপায়ে এক অদ্ভুতপূর্ব শোভা বাড়ি বাড়ি আনিয়া দিতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা নারীরই এই সৌন্দর্যানুভূতি অধিক পরিমাণে থাকে। সুতরাং গৃহসজ্জার কাজ গৃহলক্ষ্মীরাই করিবেন। এইজন্য লৌকিক কাহিনী, লৌকিক গীতি, folk-lore, folk-songs এবং গ্রাম্যকলা নিবেদিতার এত আদরের বস্তু ছিল, তাঁহার লেখার মধ্যে ইহার সহানুভূতিপূর্ণ উল্লেখ ও প্রশংসা অনেক আছে।

তারপর তিনি দেখাইতেন, যে, এই সাধারণ লোকের আজন্ম অন্তর-নিহিত সৌন্দর্য্য বোধকে যদি উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে আমাদের জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক শ্রমগুলির মধ্যে আর দাসত্বভাব থাকিবে না, শ্রমিকেরা বুঝিবে যে work is worship, শিল্পকার্য ঈশ্বর পূজনের একটি পন্থা; শ্রমিক মজুরী পায় বটে, কিন্তু সে একজন শিল্পী, একজন সৌন্দর্য-সৃষ্টিকর্তা, ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা মজুর নহে। তিনি বার বার বলিতেন যে প্রাচীন ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মূর্তিতে, আসবাব ও অলঙ্কারে যে কারুকার্য্য করা হইত তাহা এত ভাল হইয়াছে এই কারণে যে কারিগরগণ নিজ নিজ কার্যকে দেব-উপাসনার একটি প্রণালী বলিয়া মনে করিত, নিজ নিজ কাজ ভাল হউক, অপর শিল্পীর কাজকে ছাড়াইয়া উঠুক এই বলিয়া একটা অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ তাহাদের মনে থাকিত, সুতরাং গা ঢিলা দিয়া, ফাঁকি দিয়া, মেকি মাল চালাইয়া প্রতারণা করা তখন ঘটিত না। বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগে শ্রমিকগণ ধনীর দাস মাত্র, অর্থলোভী অন্নমাত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহাদের জীবন এত শ্রীহীন, এত কলুষিত, এত বিষাদময়। ইহার প্রতিকার প্রধানত নারীর দ্বারাই কুটিরে কুটিরে করিতে হইবে; নারীর দ্বারাই চারুকলার উৎকর্ষ সাধন সহজে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল, যাঁর সমাধি-স্থান তাজমহলে, তাঁহার এক বন্ধু ও সহচরী ছিলেন একজন বিদুষী পারসিক রমণী, নাম সিত্তি উন্ নিসা। ইনি শাহ-জাহানের কন্যাদের শিক্ষয়িত্রী হইয়া এদেশে আসেন; এবং বাদশাহের সংসারে সব অনুষ্ঠানে ঘর সাজান, জিনিস সাজান, অলঙ্কার নির্বাচন প্রভৃতি ইনিই করিতেন এবং এই কাজে তাঁহার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রকাশ পাইত। এই গুণবতী মহিলার জীবনী লিখিয়া The Companion of an Empress

নাম দিয়া আমি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশ করি। নিবেদিতা তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া আমাকে এক প্রশংসাপত্র লেখেন।

এই ত গেল বাহিরের কথা। তাহার পর বাঙালী শিক্ষিত ঘরের গৃহিণীদের সকলে মিলিয়া গোছাইয়া লইয়া সমবেত চেষ্টা করার ক্ষমতা ও কার্যে পটুত্ব দেখিয়া নিবেদিতা খুব আনন্দিত হইতেন। এক বার কোন এক বাড়িতে অথবা মঠে বৃহৎ জনভোজনের অর্থাৎ মহোৎসবের দিনে আমাদের সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েরা অল্প সময়ের মধ্যে বিনা তর্কে আবশ্যক কাজে লাগিয়া গেলেন, বড় গিন্নী প্রত্যেককে নিজ দক্ষতা বা বয়স অনুসারে এক একটি জিনিসের ভার দিলেন—অমুক মহিলা হিসাব করিয়া তরকারি ওজন করিয়া দিবে, অমুক অমুক তাহা কুটিবে, অমুক মশলা পিষিবে, অমুক রাঁধিবে, অমুক পরিবেশন করিবে ইত্যাদি। দু-কথায় সব নির্দেশ শেষ হইল, অমনি সকল মহিলাই নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজে লাগিয়া গেল এবং বিনা গোলমালে বিনা ঝঞ্ঝাটে ঐ মহাভোজন ব্রতটা সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বাঙালী মেয়ের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এইরূপ বৃহৎ কার্য করিবার স্বাভাবিক শক্তিকে নিবেদিতা বার বার প্রশংসা করিতেন।

বর্তমান ভারতের সন্তান আমরা যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাবে ও মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠি, অথচ নবীন বৈজ্ঞানিক যুগের যত জ্ঞান যত কৌশল যত সুনীতি তাহা গ্রহণ করি ও আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করি, আমরা যেন জাতিভেদ বা ধর্মভেদকে বড় না ভাবিয়া, একত্র দলবদ্ধ হইয়া দেশের সেবা করি, তবেই এই ভারত আবার স্বাধীন হইবে এবং সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে পারিবে, বিশ্বজগতে মাথা তুলিতে পারিবে, ইহাই নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা, ইহাই নিবেদিতার আদর্শ, এবং এই পথ অনুসরণ করাই তাঁহার জীবনেরই সাধনা ছিল।

জাতীয়তার মহাব্রত বিশ্বমানবতার বিরোধী নহে, কারণ তিনি বার বার বলিতেন যে প্রাচীন ভারতের মন্ত্র ছিল সব শ্রেণীর সব ধর্মের মিলন, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা, সর্বত্র গুণের আদর। এই জন্য তিনি বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের বিরোধী বা পৃথক বস্তু বলিয়া কখনও স্বীকার করিতেন না, বলিতেন যে এ দুটি ধর্ম একই গাছের দুই শাখা মাত্র, দুটির ভক্তগণ পাশাপাশি থাকিয়া শান্তিতে নিজ নিজ পথে চলিত। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক সিসিল বেণ্ডল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে নেপালে গিয়া যে কতকগুলি মন্দিরের শিলালেখ আনিয়া ছাপিলেন, তাহার একটিতে লেখা আছে যে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ও ভূমিদাতার অভিপ্রায় যে হিন্দু ও বৌদ্ধরা পাশাপাশি গৃহে সদ্ভাবে বাস করিয়া নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান করুক। এই সংবাদ যখন নিবেদিতাকে দিলাম তখন তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,—ঠিক ত। যে কথা আমরা এতদিন বলিয়া আসিতেছি তাহার এই প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ। ভুলিবেন না যে নিবেদিতা হিন্দু ধর্ম-সম্প্রদায়ের জয়গান বা কুসংস্কার সমর্থন করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন না, সমস্ত ভারতীয় জাতি ও ধর্মের মধ্যে যেখানে সত্য কথা, প্রকৃত কলা, আদর্শ চরিত্র দেখিতে পাইতেন তাহারই পূজা করিতেন। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা ছিল, এবং নিবেদিতা বিবেকানন্দের মন্ত্র-শিষ্যা, গুরুর ঐক্যবাণী, গুরুর ধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এই কার্যে লোকশিক্ষা তাঁহার হাতের যন্ত্র ছিল। অতএব নিবেদিতার নামে উৎসর্গীকৃত, নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্যালয় সফল হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার আদর্শ বড় মহৎ, বড় কঠিন ছিল; আমরা যেন ইহাকে কখনও ভুলিয়া না যাই।

শুভ রাত্রি

শ্রীকরুণাময় বসু

আমারে ভুলিয়া যেও, বনান্তের সরু পথ ধ'রে
করুণ চাঁদের মতো অস্ত যেও দিগন্তের শেষে ;
উড়িবে পথের ধূলি, চক্ষে মোর অশ্রুজল ভ'রে
আবার আসিব ফিরে জীবনের রৌদ্র মরুদেশে।
কৈশোরের স্মৃতিগুলি দেবদারু-পাতার কম্পনে,
পাণ্ডুর চাঁদের চোখে, শ্রাবণের মেঘের আভাসে
জেগে রবে মূর্তিমতী নব নব ঋতু আবর্তনে,
সোনার ফসল-ক্ষেতে, ছলছল মনের আকাশে।
তোমারে ভুলিয়া যাবো, সময়ের পাখী যায় উড়ে,
পারুল মালঞ্চবীথি ফুলে ফুলে ভরি' ওঠে পুনঃ ;
বসন্তের পাখী ডাকে উর্ধ্বস্বরে পরাণ-বন্ধুরে,
তোমার বসন্তরাত্রে তার ডাকে মোর বাণী শুনো।
জীবনের কথাগুলি মুছে দিক বিস্মৃত অধ্যায়,
নূতন পথের সুরু তারাশূন্য আকাশের নীচে ;
মেরুর দিগন্ত পারে গর্জমান ঝড়ের সন্ধ্যায়,
অলক্ষ্মী অলক্ষ্য হ'তে চিরকাল আমারে ডাকিছে।
তুমি রবে স্পর্শাতুর রজনীর উত্তপ্ত শয্যায়,
মরুর প্রান্তর হ'তে শুভরাত্রি জানাই আমায়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার ও ভারত

শ্রীনিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

বিশ্ব-ব্যবস্থায় গলদ যখন প্রকট রূপ লাভ করে তখনই হয় যুদ্ধের সূচনা; আর সেই যুদ্ধের অবসানে আশাহত মানব নূতন ব্যবস্থা সৃষ্টির নেশায় ওঠে মেতে। গত যুদ্ধের সংঘাতে তৎকালীন বিশ্বব্যবস্থার প্রতীক স্বর্ণমান গেল ভেঙে; নিরঙ্কুশ, অবাধ মুদ্রা প্রসারই হ'ল রীতি। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার অজুহাতে ও বহির্বাণিজ্য পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে নিয়তির বিধান বলে একে মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির পরই বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার গরজ যখন দেখা দিল তখনই এরূপ এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়ল যার ফলে নাকি বিভিন্ন দেশগুলো মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক লেন-দেন ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যেককে করে তুলবে শক্ত, সমর্থ ও সমৃদ্ধ। বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলো, যেমন ইংলণ্ড জার্মানী ইত্যাদি বহির্বাণিজ্যের অবাধ অগ্রগতির জন্য ব্যাকুল হয়ে সনাতনী স্বর্ণমানে গেল ফিরে, কারণ স্বর্ণমানই বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থের বিনিময়-হারকে স্থির রেখে পারস্পরিক লেন-দেন কার্যকে বাধাবিমুক্ত রাখে। কিন্তু স্বর্ণমানের স্বভাবজাত অসুবিধাগুলো ব্যতিরেকেও উহার পুনঃ গ্রহণ প্রণালীর মধ্যেই এত গলদ নিহিত ছিল যে অচিরেই এই ব্যবস্থা বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল। ভুয়া প্রেষ্টিজ রক্ষার মোহে পড়ে ইংলণ্ড পাউণ্ড-ষ্টার্লিঙের মূল্য যুদ্ধ-পূর্ববর্তী কালের তুল্য করে ফেলল; কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে (cost-price equilibrium) এই বর্দ্ধিত মূল্যের কোন সামঞ্জস্য রইল না। ষ্টার্লিঙের আভ্যন্তরীণ মূল্যের থেকে পরদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রযুক্ত মূল্যকে বেশী করে দেখান হ'ল; ফল হ'ল এই যে, ইংলণ্ডের রপ্তানী গেল কমে, এবং ঘাটতি পূরণ করার জন্য স্বর্ণের নির্গমন সুরু হ'ল। প্রধানতঃ এই কারণেই ইংল্যাণ্ড থেকে স্বর্ণমানকে বিদায় দিতে হ'ল। তার পর স্বর্ণমানের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এর কার্যকারিতার পক্ষে বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। যে মুদ্রা-বিনিময়ের হারের স্থিরতাই স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও অপ্রতিহত বাণিজ্য প্রসারের আকর, সেই বিনিময়-হারের স্থিরতাই আবার পূর্ণ-নিযুক্তিরূপ (full employment) আধুনিক মুদ্রানীতির বিরুদ্ধাচারী অথবা এর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। বিগত যুদ্ধ-পরবর্তী কালে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয়ে উঠল, ভিন্ন ভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্ব-স্ব মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এক একটি সার্ব্বভৌম ও স্বাবলম্বী রাষ্ট্র গঠনে বদ্ধপরিকর হ'ল তখন পূর্ণ-নিযুক্তিরূপ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়াল চরম লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকারই যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। পৃথিবীর নানা দেশে দেখা দিল সমাজতন্ত্রী শাসকদল—যেমন ফ্রান্সে Front Populario এবং ইংলণ্ডে Labour Govt.; এবং এই সকল শাসকদলের লক্ষ্য হ'ল নির্দ্ধারিত নিম্ন হারে সমস্ত শ্রমিককে কাজ জোগান। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাহিদা যখন এরূপ তখন এটা স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই বহির্জগতের আলোড়নকে স্বর্ণমানের স্থাবরীকৃত বিনিময়-হারের সাহায্যে ভেসে এসে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করতে দিতে নারাজ। স্বর্ণমানের এই দ্বন্দ্বকে দোষ-বিমুক্ত করে স্বর্ণমানকে, তথা যে-কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থাকে, কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় শুধু কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা যথা—

(১) উত্তমর্ণ দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশকে অবাধ ঋণ দান অথবা আদায়ীকৃত অর্থ অধমর্ণ দেশে লগ্নি করা।

(২) উত্তমর্ণ দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশ হতে প্রাপ্য টাকার বিনিময়ে দ্রব্যাদি ক্রয়। কিন্তু উপরি-উক্ত প্রণালী দ্বারা স্বর্ণমানের কার্য্যকারিতা রক্ষার চেষ্টা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে উত্তম, বিশেষতঃ, যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষণস্থায়ী ঋণ-ভাণ্ডারের অবাধ সঞ্চরণ দেশ-বিদেশে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার সৃষ্টি করে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রচেষ্টাকে বারংবার ব্যর্থ করে দিতে লাগল। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে এ সকল উপায় শুধু সাময়িক ব্যবস্থাতেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত। দীর্ঘস্থায়ী ঋণদান-ব্যবস্থা ঋণের মূলগত কারণকে দূর না করে শুধু ঋণের বোঝাকেই বাড়িয়ে তুলবে ক্রমবর্দ্ধমান হারে। পরে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করে দেখব কি ভাবে এই ব্যবস্থাকে ব্রিটন উড্‌স্ পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া হয়েছে এবং কি প্রকারে ঋণের পরিমাণ একটি সুনির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে।

স্বর্ণমানের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, উহার পুনঃ গ্রহণ-প্রণালীর ভিতরকার গলদ ও যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালের অস্বাভাবিক অবস্থা,—যেমন রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি, অনিশ্চয়তা, ক্ষণস্থায়ী আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের অবাধ সঞ্চরণ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ মিটাবার চাহিদা প্রভৃতির জন্য পুনঃপ্রবর্ত্তিত স্বর্ণমান ভেঙে পড়ল ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। যে স্বর্ণমান জগদ্দল-পাথরের মত চেপে থেকে বেকার-সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যাকে জটিলতর করে তুলছিল তাকে বিদায় দিয়ে লোকেরা মনে করল এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই ইংলণ্ডের ন্যায় বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলো বুঝতে পারল যে এ ধারণা শুধু কল্পনা-বিলাসীর স্বপ্ন। স্বর্ণমান ত্যাগ করে অবাধ মুদ্রানীতি গ্রহণ করার ফলে ধ্বংসোন্মুখ শিল্পগুলো পুনরুজ্জীবিত হতে লাগল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কট দেখা দিল কয়লা, লৌহ, কার্পাসজাত দ্রব্য প্রভৃতি শিল্পগুলোতে, যাদের উন্নতি নির্ভর করে বৈদেশিক চাহিদার ওপর। এখানেই হ'ল পৃথিবীর মুদ্রাব্যবস্থার উভয় সঙ্কটের সূচনা (Currency dilemma of the thirties)। দেশের প্রধান শিল্পের যখন এই শোচনীয় অবস্থা, এবং বহির্বাণিজ্য হ্রাস পাবার ফলে এহেন দেশগুলোই যখন উপবাস করে মরবার উপক্রম তখনই স্বর্ণমানের প্রকৃত রহস্য সম্বন্ধে

জন্মাল সম্যক্ প্রত্যয় এবং সুরু হ'ল বিগতের প্রতি শোকগাথার অজস্র বর্ষণ। বিলীয়মান স্বর্ণমানের ভৌতিক উপদ্রবেরও সূচনা হ'ল এখান থেকে। কারণ আপাতদৃষ্টিতে দুইটি পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই হ'ল তখন মুদ্রা-ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য। প্রত্যেক দেশই আবার নিজ নিজ রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরস্পরবিরোধী দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করল। এরূপ ফাসিষ্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জার্ম্মানী স্বাবলম্বী হবার প্রয়াসে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকেই (Exchange control) আশ্রয় করল, কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় বহির্বাণিজ্যে অধিকতর আগ্রহশীল দেশগুলো বিনিময় হারে সাম্যরক্ষাকারী ভাণ্ডার (Exchange Equalisation Account) নামক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করল যার ফলে নাকি বিনিময় হার 'stablized' না হয়ে হ'ল 'steady', এবং সাময়িক ক্ষণস্থায়ী কারণগুলো কর্তৃক বিনিময়হারে দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধনের দরুন বহির্বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টির প্রণালীকে সংশোধন করা হ'ল। কোন কোন দেশ আবার গ্রহণ করল পূর্ব্বানুবর্ত্তী বিনিময়-ব্যবস্থাকে (Forward Exchange)। এ ভাবে সুরু হ'ল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও দেশের জাতীয় জীবনের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা।

কিন্তু এ ব্যবস্থায় সন্তোষ লাভ করা গেল না। ব্যবস্থাগুলোর এরূপ তাৎপর্য্য যে তারা হ'ল ইংরেজীতে যাকে বলে: "Neither fool proof nor knave proof" অচিরেই এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দোষত্রুটি প্রকটিত হতে লাগল। "মুদ্রা-বিনিময়-হারের সাম্যরক্ষাকারী ভাণ্ডার" স্থাপনের ফলে বাণিজ্য সঙ্কোচন বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু দেশের রপ্তানী অধিকমাত্রায় বাড়িয়ে তোলবার ও বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়-হার নিম্ন করার পন্থা অবলম্বিত হতে লাগল, এই সাম্যকারী মুদ্রাভাণ্ডারের সহযোগিতায় তা পুষ্ট হয়ে উঠল। ১৯৩৬ সালে তৎকালীন ইংলণ্ডের অর্থসচিব নেভিল চেম্বারলেন এক বক্তৃতায় এ ভাণ্ডারের মহিমা কীর্ত্তন করলেন, এবং ফ্রান্স কর্তৃক আনীত অভিযোগ খণ্ডনকল্পে প্রচার করলেন,

"The sole purpose of the Exchange Equalisation Account is to smooth out fluctuations in foreign exchanges and never to depreciate the sterling exchanges so as to gain an undue advantage for British export."

কিন্তু বিনিময়-হারের অবৈধ নিম্নকরণ ব্যতিরেকে অন্য কি প্রকারে ৩২০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ইংলণ্ড সঞ্চয় করতে সমর্থ হ'ল তা আজও কারও বোধগম্য হ'ল না।

এরূপ প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়-হারের অবৈধভাবে হ্রস্বতা সাধন, শুল্কপ্রাচীর সৃষ্টি ইত্যাদি প্রতিহিংসা উদ্দীপক ব্যবস্থা অবলম্বনই হ'ল দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ববর্ত্তী কালের অর্থনৈতিক জীবনের স্বরূপ। আজ আর কারও অবিদিত নেই কি ভাবে এই প্রতিহিংসামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথকে রুদ্ধ করে, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া জীইয়ে রেখে, মৈত্রীর বন্ধনকে টুটে ফেলে জানিয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর বুকে এই মহাপ্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের আগমন-বার্ত্তা। ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার সমাধি রচিত হ'ল এই বিশ্বযুদ্ধের ক্রোড়ে।

যুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব্ব থেকেই পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা গবেষণা করতে সুরু করেছেন যুদ্ধোত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা এই যুদ্ধকে চিরবিদায় দিয়ে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। কোন আন্তর্জাতিক বিধানই, সে যে রকমই হোক না কেন, যে বিশ্ব-শান্তির নিদান এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ খুব কমই আছে। অর্থনৈতিক, বিশেষতঃ মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হ'ল সেটা রূপ পেল ব্রিটন উড্‌স নামক পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে। এ পরিকল্পনাটি এর পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি পরিকল্পনা যথা—লর্ড কেইন্সের ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার মর্গান্থানের ইউনিটাস পরিকল্পনা ও কানাডীয় পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনেরই ফল। এবার আমরা এ পরিকল্পনার ঈষৎ ব্যাখ্যা করে গিয়ে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের আলোচনা করব।

আট হতে দশ বিলিয়ন ডলারের একটি ভাণ্ডার সৃষ্টি করা হবে। সভ্যদের চাঁদার দ্বারা ভাণ্ডারটি হয়ে উঠবে পুষ্ট। এ চাঁদায় প্রত্যেক দেশের আনুপাতিক অংশ নির্ভর করবে দুটি বিষয়ের ওপর, যথা:—১। দেশের বাণিজ্যের জেরবাকিতে (balance of trade) পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব; ২। দেশের সঞ্চিত স্বর্ণ অথবা স্বর্ণের গুণসম্পন্ন বিনিময় সাহায্যকারী কোন মুদ্রার (gold exchange) পরিমাণ। প্রথমটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়টি ধার্য্য করার কারণ হ'ল এই যে প্রত্যেক দেশকে তার আনুপাতিক অংশের শতকরা অন্ততঃ ২৫ ভাগ অথবা উহার মোট স্বর্ণসঞ্চয়ের ১০ ভাগ প্রদান করতে হবে স্বর্ণদ্বারা এবং অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ দেশীয় মুদ্রা কিংবা সরকারের কাগজ দ্বারা পূরণ করলেই চলবে। এ ভাণ্ডারের কার্য্য হ'ল প্রধানতঃ দুটি—আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি কি ভাবে উত্তমর্ণ দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশকে ঋণদানের কার্পণ্য হেতু অধমর্ণ দেশের স্বনিয়ন্ত্রিত মুদ্রানীতির ওপর দেখা দেয় অশুভ প্রতিক্রিয়া, আর যার ফলেই নাকি স্বর্ণমানকে দিতে হয় বিদায়। এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে উক্ত ভাণ্ডারের কার্য্য হ'ল অধমর্ণ দেশকে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা পর্য্যন্ত বাণিজ্য সম্পর্কে এর উত্তমর্ণ দেশের মুদ্রা ঋণদান। মাত্রা ধার্য্য করা হবে এ ভাবে যে, কোন দেশই কোন অবস্থাতে মুদ্রাসঙ্ঘের কাছে তার আনুপাতিক অংশের (200% of members quota) চেয়ে অধিক হারে ঋণী থাকতে পারে না। কিন্তু এরূপ অধমর্ণ দেশ অনায়াসেই আবার স্বর্ণের বিনিময়ে ভাণ্ডারের নিকট হতে যত খুশী বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে পারে। এ বিধানগুলোর উদ্দেশ্য হ'ল অধমর্ণ দেশ কর্তৃক গুরু ঋণভার সৃষ্টির পথে অন্তরায় উপস্থিত করা।

প্রত্যেক দেশই মুদ্রাসঙ্ঘের নিকট হতে নিজ নিজ আনুপাতিক অংশের দ্বিগুণ পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ধারস্বরূপ পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই যে, ভাণ্ডারে গচ্ছিত কোন বিদেশী মুদ্রার পরিমাণের অধিক মুদ্রাভাণ্ডার কি প্রকারে অধমর্ণ দেশকে ধার দিতে সক্ষম হবে? এটা সম্ভব একমাত্র যদি ভাণ্ডার মুদ্রা ঘাটতির দেশ হ'তে (scarce currency country) সেই দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এই সংগ্রহকরণ প্রণালী দুই প্রকারের। প্রথমতঃ, ভাণ্ডার কর্তৃক এরূপ দেশের নিকট

হতে মুদ্রাধার কয়ণ। পরে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করে দেখব যে, যে মুদ্রাভাণ্ডারের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে শুধু একটি আন্তর্জাতিক লেন-দেন মেটানোর যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করা (International clearing agency), এ সংজ্ঞাটির দ্বারা তার ভিতরে ব্যাঙ্কিং ব্যাবসাকে প্রবেশ লাভ করতে দিয়ে এর স্বরূপকেই বদ্‌লে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ভাণ্ডার কর্ত্তৃক স্বর্ণের বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়।

আমরা দেখেছি, বিনিময় হারের অবাধ ওঠা-নামাই ছিল চতুর্থ দশকের মুদ্রা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। আর যার ফলেই নাকি বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন জরুরি করে তুলল। কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের আনুকূল্যে স্বাধীন মুদ্রানীতি পরিচালনা করার তাগিদও কম নয়। এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করা হ'ল মুদ্রাভাণ্ডারের দৌলতে। ভাণ্ডারের নিকট প্রাপ্য ঋণদ্বারাও যখন বহির্বাণিজ্যের জের-বাকিতে ঘাট্‌তি পূরণ করা সম্ভব নয় তখনই বুঝতে হবে যে গুরুতর গলদ বিদ্যমান রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে (cost-price equilibrium)। সুতরাং শুধু সাময়িক ব্যবস্থারূপ ঋণদান প্রণালীই যথেষ্ট নয়; গলদ দূর করতে হলে ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। ব্যবস্থাটি হ'ল সার্ব্বভৌম ও স্বাধীন মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য সেই মুদ্রা-বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তনের সুযোগ। প্রত্যেক দেশেরই স্বকীয় মুদ্রা প্রথমাবস্থায় স্বর্ণের সহিত একটি নির্দ্দিষ্ট হারে বাঁধা থাকবে; কিন্তু কালক্রমে যদি আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার তাগিদে, অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রব্য-বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তনের ফলে, অথবা এই যন্ত্রমোহের যুগে দেশ-বিশেষের যান্ত্রিক সংস্কার সাধনের আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্য, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হার সামঞ্জস্য-হীন হয়ে পড়ে, তা হলে তার পরিবর্ত্তন সাধনই হ'ল প্রকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং ব্রিটন উড্‌স পরিকল্পনায় এ ব্যবস্থা করা হ'ল যে—কোন্ দেশ কর্ত্তৃক বিনিময়-হারের শতকরা দশভাগের পরিবর্ত্তন হচ্ছে তা শুধু সেই দেশেরই ইচ্ছাসাপেক্ষ; কিন্তু পরবর্ত্তী দশ ভাগের পরিবর্ত্তন নির্ভর করবে ভাণ্ডারের বিবেচনার ওপর। ভাণ্ডার স্থির করবে বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ প্রার্থনাকারী দেশের জেরবাকিতে ঘাটতি কোন সাময়িক কারণদ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কিনা, মূলধনের সঞ্চরণের সহিত এর কি সম্বন্ধ বিদ্যমান, অথবা উক্ত দেশের আভ্যন্তরীণ খরচা ও মূল্যের ভারসাম্যের তুলনায় এর মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-মূল্য অযথা স্ফীত করা হয়েছে কি না। বিচার করে যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জেরবাকিতে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়, তা হলে দৃষ্টি রাখতে হবে যেন ততটুকুই নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয় যাহাদ্বারা নাকি জেরবাকির ঘাটতি ঠিক পূরণ করা সম্ভব হবে, কিন্তু কোন প্রকারেই তার অধিক নয়।* এরূপে বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের বিবেচনাধীন হওয়ার ফলে, প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রা-বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের পথে অবৈধ প্রতিবন্ধকতা নিরাকৃত হয়ে একে করে তুলবে ছন্দোবদ্ধ ও সাবলীল; কিন্তু যতি কসে আঁটতে হবে বিবেচনা করে, খাম-খেয়ালির ওপর নির্ভর করে নয়।

আমরা দেখেছি যে গূঢ় জটিল অর্থনৈতিক বিধানে অধমর্ণ দেশের ওপর চাপ দেওয়া হয়েছে তার প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে ও সঙ্ঘের বিবেচনাসাপেক্ষ মুদ্রা-বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদানদ্বারা। কিন্তু খাঁটি স্বর্ণমানের একটি গুণ হচ্ছে এই যে, এ ব্যবস্থার ফলে গূঢ় জটিলতা লাঘবের দায়িত্ব শুধু অধমর্ণ দেশের ওপরই ন্যস্ত না হয়ে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ উভয়ের ওপরই ন্যস্ত হয়; ফলে, প্রণালীটি উভয়ের পক্ষেই সহজসাধ্য হয়। এই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের আওতায় উত্তমর্ণ দেশের ওপর জটিলতা লাঘবের ভার কতটা ন্যস্ত হয়েছে সেটাই হবে এখন আমাদের বিচার্য্য বিষয়।

যখন কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত জেরবাকি ক্রমাগত অনুকূল থাকায় এর উদ্বৃত্ত অংশ বেড়েই চলে, তখন বিদেশী কর্ত্তৃক উক্ত দেশের মুদ্রার চাহিদা মেটানো ভাণ্ডার দ্বারা সম্ভব নাও হ'তে পারে। এরূপ অবস্থায় উক্ত দেশের মুদ্রাকে Scarce Currency বলে ঘোষণা করে ভাণ্ডার কর্ত্তৃক এর সরবরাহ বন্ধ করাও দেনাদার দেশগুলোকে নিজ নিজ বিনিময়-হার হ্রাস করার ক্ষমতাদানই হবে ভাণ্ডারের কার্য্য। যে দেশের মুদ্রা Scarce Currency বলে ঘোষণা করা হবে, সে-দেশের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের এরূপ অর্থনৈতিক চাপ দেওয়া হবে যার ফলেই সে সব দেশের জেরবাকিতে উদ্বৃত্ত অংশ কমে আসতে বাধ্য হয়। এ চাপ তিন প্রকারের, যথা:—(১) উদ্বৃত্ত অংশের আধিক্যের ওপর ভাণ্ডার কর্ত্তৃক করস্থাপন।

(২) মুদ্রা প্রসারের দ্বারা আভ্যন্তরীণ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করা, মূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস ও বেকার সমস্যার অবসান ঘটান।

(৩) অধমর্ণ দেশকর্ত্তৃক বিনিময় হার হ্রাসের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উত্তমর্ণ দেশ কর্ত্তৃক স্বীয় অর্থনৈতিক জীবনে ও জেরবাকিতে সাম্যাবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যেরই আলোচনা করা গেল। কেউ কেউ এ পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে স্বর্ণমানেরই পুনরুত্থানকে দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে স্বর্ণমানের পুনরুদ্ধারের কোন সঙ্কল্পই এতে নিহিত নেই। এটা সত্য যে, স্বর্ণের বিশিষ্ট মর্য্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা-হিসাবে ও আন্তর্জাতিক বাজার-সম্মানের (credit) ভিত্তিস্বরূপ, উভয়তঃই। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধের উপায়রূপে এর গৌরব আজ আর অক্ষুণ্ণ নেই; সেই একত্র আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে ভাণ্ডারে গচ্ছিত দেশীয় মুদ্রার উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ দ্বারা, স্বর্ণের স্থান আজ বহুলাংশে অধিকার করেছে ভাণ্ডারে গচ্ছিত দেশীয় মুদ্রার সমষ্টি এবং বাস্তবিক পক্ষে কোন আদর্শ মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণের স্থান নাম সম্পূর্ণ বাহুল্য, কারণ আদর্শ আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার

* দ্রষ্টব্য—Meade—*Economic Basis of a Durable Peace,* পৃষ্ঠা ১০৮।

ভিত্তি হ'ল সমষ্টিগত ক্রেডিট, আর যা নাকি সমষ্টিগত শুভেচ্ছারই বাস্তব রূপ।

"Should collective good-will become tangible, vigorous and progressive, ideal international money based on pure credit will come more and more into its own; gold may continue so long as it behaves rationally or sensibly or may altogether loose its monetary status."*

লর্ড কেইন্সের ব্যাঙ্কর পরিকল্পনায় এরূপ একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে আশ্রয় করেই বিশ্ব-মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে তুলবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ-সঞ্চয়িতা আমেরিকার চাহিদায় এবং এই শঙ্কাকুল ও ঝঞ্ঝাপূর্ণজগতে—যেখানে শঠতা ও অবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান সে স্থানে আন্তর্জাতিক মুদ্রার একটা বাস্তব রূপ অস্বীকার সহজসাধ্য নয় বলে স্বর্ণের স্থান হ'ল অবিসংবাদিতরূপে সত্য। ভাণ্ডারের আওতায় স্বর্ণের বহুবিধ প্রয়োগ ও ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এ ভাণ্ডার সৃষ্টি দ্বারা স্বর্ণমানের পুনরুত্থানের, অথবা বিভিন্ন দেশ কর্তৃক স্বাধীন মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ক্ষমতার ওপর অবৈধ অথবা গুরুতর হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনাই এতে নেই। কারণ, স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য্য ব্যবস্থা দুটি:

১। একটা নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ও দেশীয় মুদ্রার ভিতরে একটি হতে অন্যটিতে অবাধ রূপান্তর।

২। দেশের মুদ্রা-প্রসার কিংবা মুদ্রা-সঙ্কোচন পুরামাত্রায় নির্ভরশীল হবে দেশের স্বর্ণপরিমাণের ওপর।

উপরি-উক্ত কোন বিধানই প্রস্তাবিত অর্থভাণ্ডারের আওতায় আসে না। দেশীয় মুদ্রা স্বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেও পারে, নাও পারে। দেশীয় মুদ্রাব্যবস্থাকারী যদৃচ্ছাক্রমে মুদ্রার প্রসার বা সঙ্কোচন সাধন করতে পারেন, দেশের জমাখরচে ঘাটতি পূরণের জন্য বা বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে যে-কোন মুদ্রাব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন, মুদ্রাভাণ্ডারের ভ্রূক্ষেপ করবার কিছুই নেই। দেশের আভ্যন্তরীণ মুদ্রানিয়ন্ত্রণের ওপর ভাণ্ডারের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে শুধু তখনই যখন নাকি সেই দেশের মুদ্রাকে Scarce Currency বলে ঘোষণাদ্বারা ক্রমাগত উদ্বৃত্তসৃষ্টি বন্ধ করবার প্রয়াসে ভাণ্ডার কর্তৃক করস্থাপন, বিনিময়-হার উর্দ্ধগকরণের অনুরোধ প্রভৃতি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

"No regulation obliges a member to any monetary policy within its own realm with the one exception of presumably rare case of a member whose deposit with the fund has been declared scarce and may be requested to exchange its own currency. Nor is there any other provision which would require a member to pursue any particular monetary or other policy."†

বিশ্বব্যবস্থা রক্ষার খাতিরে দেশের স্বাধীন মুদ্রানিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ। পরস্পরবিরোধী দুই উদ্দেশ্যের কি অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন! স্বর্ণমানের পুনঃপ্রবর্ত্তনের কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না, কারণ ভাণ্ডার সৃষ্টির দ্বারা যে ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে সে কোন মুদ্রামানই নয়।

"Clearly it (the Bretton Woods Plan) imposes no gold standard of any kind on members. In fact, it provides for no monetary standard at all. It only im- on members fair play in international dealings especially, non-interference with an individual's obligation to pay a foreigner, once that individual has been allowed to enter into such obligation against foreigner's

কোনরূপ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক সৃষ্টির কল্পনাও এই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত নয়।

এবার ভারতবর্ষের দিক থেকে এ পরিকল্পনাটিকে বিচার করে দেখা যাক। কোন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পেছনেই নিহিত আছে অবাধ বাণিজ্য-সৃষ্টির গরজ, যে বাণিজ্য শুল্ক সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির বাধাবিমুক্ত হয়ে দুর্ব্বার গতিতে বেড়ে চলবে সমস্ত দেশকে স্থানিক শ্রম-বিভাগের অন্তর্নিহিত সম্পদ দ্বারা পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে। এ ভাণ্ডারের যাঁরা রক্ষক হবেন তাঁদের অধিকাংশই শিল্প-জগতে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর প্রতিনিধি; ভারত কিংবা শিল্পে অনুন্নত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি এর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থান পান নাই। বাণিজ্যের অবাধ প্রসারই হচ্ছে এই শিল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থের পরিপোষক। কিন্তু, বর্ত্তমানে শিল্পে অনুন্নত, কিন্তু শিল্প-সম্ভাব্যতায় পরিপূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে অবাধ বাণিজ্য স্বার্থের পরিপন্থী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই উভয় প্রকারের দেশই একই অর্থনৈতিক স্তরে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একক সর্ব্বজনীন ব্যবস্থাই পক্ষপাতিত্বশূন্য, ন্যায্য বিধান বলে বিবেচিত হতে পারে না। একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যোগদানকারী হতে পারে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমপর্য্যায়ভুক্ত দেশসমূহ। এটা অনুধাবন করতে পেরেই বিখ্যাত সংরক্ষণ-ব্যবস্থা-প্রচারকারী ফ্রেডারিক লিষ্ট শিল্পসম্ভাব্যতা-পূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে কতকগুলি সংরক্ষণ-ব্যবস্থার বিধান দিলেন যার ফলে এরূপ দেশগুলো বর্ত্তমানের শিল্পোন্নত দেশ-গুলোর সমকক্ষ হয়ে কালক্রমে অবাধ বাণিজ্যরূপ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যোগদান করতে সমর্থ হয়। এমন কি, অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রবর্ত্তনকারাদের শেষ ও শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র (অবশ্য, কার্ল মার্ক্স ব্যতিরেকে) জন ষ্টুয়ার্ট মিলও উক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের পক্ষে এ মুদ্রা-ভাণ্ডারের নীতি গ্রহণ করবার ফল হবে ভারতের উদীয়মান মূল-শিল্প-সমূহের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছাদিত হওয়া, নূতন শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত ও ভারতকে একটি পরিপূর্ণ কৃষি-প্রধান দেশে পরিণত করার সাফল্যজনক চক্রান্ত।

এ যুদ্ধের দরুন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনসম্পদের মালিকানায় আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে।* শিল্পহীন দেশে মূর্ত্তন শিল্পের গোড়াপত্তন, ঋণ-ইজারা সাহায্যে আন্তর্জাতিক ঋণদান

---

* Dr. H. L. Dey—International Monetary Fund—Indian Journal of Economics, January, 1945.

† Bretton Woods Monetary Conference.—*Economica*, November, '44.

* Bretton Woods Monetary Conference.—*Economica*, November, '44.

* বিশদ বিবরণের জন্য Report of the Committee of the League of Nations on "Transaction from War to Peace Economy" দ্রষ্টব্য। (part 1)

দ্বারা যুদ্ধ পরিচালন, বৈদেশিক সম্পত্তি বিক্রয় প্রভৃতির ফলে ধনী দেশ হয়ে পড়েছে গরীব, আর গরীব দেশ নিজেকে দেখেছে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী রূপে। এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হচ্ছে ব্রিটেনের নিকট ভারতের ঋণ শোধ করার পরেও ভারতের ১২০০ কোটি টাকা প্রাপ্য। পরো ৪২ বৎসরের ভারতের বাণিজ্যের হিসাব করলে আমরা দেখতে পাই যে এ সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শুধু তিনটি বৎসর ব্যতিরেকে ভারত দ্রব্য-বিনিময়ের জেরবাকিতে বরাবরই উদ্বৃত্ত দেশ বলে বিবেচিত হয়েছে; কিন্তু এর এই উদ্বৃত্ত অংশ নিঃশেষিত হয়েছে "অদৃশ্য আমদানী"র (Invisible import) চাহিদা মেটাতেই। কিন্তু আজ যখন যুদ্ধের কল্যাণে ভারতের আর্থিক ভাগ্যবিপর্যায় ঘটে গেল, তখন সে এই অদৃশ্য আমদানীর কারণ রূপ ঋণভার থেকে নিজেকে মুক্ত করল এবং তদুপরি প্রভূত অর্থের অধি-কারী হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালে ভারত শুধু দ্রব্য-বিনিময়ের জেরবাকিতেই নয়, পরন্তু সমগ্র লেন-দেনের হিসাব বিবেচনায় (balance of payments) একটি উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কোন দেশই ক্রমাগত উদ্বৃত্ত দেশ হিসাবে কাটিয়ে দিতে পারে না, কারণ এর মুদ্রা Scarce currency বলে ঘোষিত হবার পূর্ব্বেই উদ্বৃত্ত অংশ কমাবার জন্যে এর ওপর চাপ দেওয়া হবে। ভারতের বাণিজ্যের স্বরূপ বিবেচনায় আমরা দেখতে পাই যে এর উদ্বৃত্ত অংশ কমাবার উপায় হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ, অধমর্ণ দেশ হতে এর উদ্বৃত্ত মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্যাদি আমদানী। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের রপ্তানীর হ্রাস সাধন। কিন্তু আমদানী বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্বনের মধ্যে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত দ্রব্যাদির (consumers goods) আমদানী বৃদ্ধি দ্বারা ভারতের শিল্পোন্নয়নকে ব্যাহত হতে দেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য যন্ত্রাদি ও কাঁচামাল প্রয়োজনীয় হলেও ভারত অপরের বিবেচনা সাপেক্ষ কোন অকেজো (obsolete) যন্ত্রাদি গ্রহণে কিংবা অন্যায্য মূল্যে এর সংগ্রহণ নীতিতে রাজী হতে পারে না। উত্তমর্ণ দেশ অধমর্ণ দেশ থেকে কোন্ কোন্ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে তা নির্ভর করবে উত্তমর্ণ দেশের অভিরুচির ওপর এবং কোনক্রমেই অধমর্ণ দেশের ওপর নয়—মুদ্রা-ভাণ্ডারের মূল নীতিতে এ ধারাটি সন্নিবেশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমদানী বৃদ্ধির উপায়টি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় রপ্তানীর হ্রাস সাধনই হ'ল অবশিষ্ট পন্থা, কিন্তু এ ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কোন অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলেও বহির্বাণিজ্যের অবাধ প্রসাররূপ এ ভাণ্ডার স্থষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। কিন্তু ভারতের স্বার্থের পরিপোষক কোন ব্যবস্থা অব-লম্বন কি ভারতের ওপরই নির্ভর করবে?

তীর্থযাত্রী

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এইসব মানুষের ভীড়ে,
জগতের মাঝে
প্রত্যহের সদাব্যস্ত কর্ম্মকাণ্ড কাজে
তবু তো আমরা চিনি তীর্থযাত্রীটিরে।
মুক্ত নীলাকাশতলে
যেখানে সূর্য্যের দীপ্তি তেপান্তরে জ্বলে,
যেখানে আকাশ
শঙ্কাশূন্য দ্বিধামুক্ত থাকে বারো মাস,
অরণ্যের জটিল গভীরে
সেখানেও চিনি এই যুগান্তের তীর্থযাত্রীটিরে

রাত্রি হলে চাঁদ এসে বাতায়নতলে
গলিত পিণ্ডের মতো জ্বলে।
স্বপ্নমুগ্ধ স্তিমিত নয়নে
তাল-তমালের ফাঁকে
সে-রূপ দেখেছে বহুজনে;
তারপর ছায়াময় বনানীর পাতাদের ভীড়ে
দেখেছি সে তীর্থযাত্রীটিরে।

যখন নদীর ঢেউ প্লাবিত করেছে উপকূল,
বাতাসের বেগ সুপ্রখর;
উন্মোচিত তৃণদল নদীতীরে দুলেছে দোদুল
জলে-জলে অশান্ত নির্ঝর,—
আমরা তখনো দেখি দূর নীলে বৃষ্টিঝরা তীরে
যুগান্তের তীর্থযাত্রীটিরে।

আলস্য-মন্থর দিনে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনে
শৈশবে ও বার্দ্ধক্যে যৌবনে
আমরা বেঁধেছি বহু নীড়
রক্তস্রাবী ক্ষণস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী বিচিত্রিত বিপুল গভীর;
সংসারের সমুদ্র-শিয়রে
বহু বাসা ভেঙে গেছে অশ্রুজলে ঝড়ে,—
তবু সচকিত কোনো ক্ষণদীপ্ত মনের গভীরে
দেখি সেই তীর্থযাত্রীটিরে॥

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-সম্প্রসারণে কাউন্টি এজেন্ট

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ আর্থিক উন্নতির দিক দিয়া সমগ্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এক দিকে যেমন নব নব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করিয়া শিল্পের উন্নতি বিধান করিতেছে, অন্তদিকে তেমনি সরকারের আনুকূল্যে



পূর্ব্ব-যুক্তরাষ্ট্রের বেরগেন কাউন্টির এজেন্ট রে ষ্টোন। পিছনে বেরগেন কাউন্টির মানচিত্র।

ব্যাপক কৃষি-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ফলে দেশের ধন-সম্পদ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদীজলনিয়ন্ত্রণ, ক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীতে সার প্রয়োগ, ইত্যাদি বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আমেরিকাবাসী ভূমিলক্ষ্মীর নিকট হইতে অপর্য্যাপ্ত সম্পদ আহরণ করিতেছে। আমেরিকাবাসী বুঝিতে পারিয়াছে যে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে শুধু শিল্পোন্নয়নই যথেষ্ট নহে, কৃষির উন্নতি বিধানের জন্তও সমভাবে মনোযোগী হওয়া অত্যাবশ্যক। যাহাদের কর্ম্মিষ্ঠতায় যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন এই প্রচেষ্টা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে, তন্মধ্যে কাউন্টি এজেন্টদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলের জোতদার চাষী দুগ্ধব্যবসায়ী এমন কি পল্লীবধূদের নিকটেও কাউন্টি এজেন্ট একজন হিতৈষী ব্যক্তি রূপে বিশেষভাবে পরিচিত। পল্লীবাসীমাত্রেই তাঁহাদ্বারা উপকৃত হয়।

উক্ত এজেন্টের সরকারী খেতাব হইতেছে—"ইউ. এস. কৃষি-সম্প্রসারণ এজেন্ট"—তাঁহার আসল কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োগ দ্বারা কৃষিকর্ম্মের উন্নতিবিধান। চাষবাসের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কাউন্টি এজেন্ট সরকারের সঙ্গে চাষী ও জোতদারদের যোগসূত্র স্থাপনে প্রভূত সহায়তা করেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরীক্ষণাদির অফুরন্ত সুযোগ লাভ করায় তাঁহার প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে সেই জন্য চাষীকে তিনি কৃষিকার্য্যের উন্নততর এবং অভিনব প্রণালীসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করিয়া তুলিতে সমর্থ হন।

ফেডারেল এবং ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট যৌথভাবে কাউন্টি এজেন্টকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি ষ্টেটের প্রত্যেকটিকেই কতকগুলি সবডিভিসনে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ সবডিবিসনগুলিকেই বলা হয় কাউন্টি। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কাউন্টির সংখ্যা ৩০৭৫ এবং মাত্র কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলিতেই কাউন্টির বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে



কাউন্টি এজেন্ট রে ষ্টোনের নিকট একজন তরুণ কৃষি-কর্ম্মকারী কুক্কুট-শাবককে টিকাদান-প্রণালী শিখিয়া লইতেছে।

অবস্থাভিজ্ঞ এক এক জন স্থানীয় ব্যক্তি কাউন্টি এজেন্টের পদে নিযুক্ত আছেন। অধিকাংশ ষ্টেটেই উক্ত পদপ্রার্থীর নিম্নোক্ত দ্বিবিধ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। প্রথমত: তাঁহাকে ষ্টেটের কোন-একটি কৃষি কলেজের ডিগ্রিধারী হইতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত: কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

প্রথমে জোতদারমণ্ডলী এজেন্ট নির্ব্বাচন করেন তারপর যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগ তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কৃষি-বিভাগ কতকগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত,—সম্প্রসারণ-বিভাগ (Extension service) তন্মধ্যে একটি প্রধান। কাউন্টি এজেন্ট ইহার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁহার কর্ম্মতৎপরতায় উক্ত বিভাগের কার্য্য সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করে।

ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট কাউন্টি এজেন্টের মাহিনার অন্তত:



রে থ্রোন একজন সহকারী সহ (বাঁদিকে) একটি তরীতরকারির ক্ষেত্রে উত্তাপ প্রয়োগে কীট পতঙ্গাদি বিনাশ-কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। পিছনে বাষ্প-উৎপাদক যন্ত্র।

অর্দ্ধেক প্রদান করেন, বাকী খরচ বিভিন্ন ষ্টেট কাউন্টি-জোতদারসঙ্ঘ এবং ষ্টেট কলেজসমূহ বহন করেন।

এজেন্টের উপর দ্বিবিধ দায়িত্ব ভার অর্পিত। স্থানীয় লোকেরা জমি হইতে অধিকতর শস্য উৎপাদন দ্বারা যাহাতে চূড়ান্ত উপকার পাইতে পারে সেই দিকে যেমন তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, তেমনি পৌনঃপুনিক কৃষিকর্ম্মের দরুন জমির উৎপাদিকাশক্তি যাহাতে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় সেই জন্য কি ভাবে উপযুক্ত সার প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেত্রের তদ্বির করিতে হয় তৎসম্বন্ধেও তাঁহাকে কাউন্টির কৃষি কর্ম্মকারীদের হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করিতে হয়।

এজেন্ট বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক সময় আপিসে কাজ করেন। তখন তিনি কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেন, উন্নত ধরণের কৃষি প্রণালী সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ যথাস্থানে প্রেরণ করেন, প্রশ্নাদির জবাব দিয়া লোকের কৌতূহলনিবৃত্তি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেন এবং বহুলপ্রচারিত কৃষিবিষয়ক পত্রিকা-সমূহের জন্য প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার কর্ম্মব্যস্ত বৎসরের বাকী অর্দ্ধেক অতিবাহিত হয় ক্ষেত্রকর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রচেষ্টায়। ঐ সময় তিনি জমি এবং চাষবাস সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য জোতদারদের এবং চাষীদের সঙ্গে প্রায়ই মোলাকাৎ করেন। এমনিভাবে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়।

বহু কাউন্টিতে এজেন্ট কৃষিকলেজের একজন তরুণ গ্রাজুয়েট এবং 'হোম ডিমনষ্ট্রেশন এজেন্টে'র পদে নিযুক্ত একজন মহিলার সহযোগিতা লাভ করেন। গার্হস্থ্য অর্থনীতি, খাদ্যাদি সংরক্ষণ এবং টিনজাত করার আধুনিকতম প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার ভার উক্ত মহিলা-কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিসম্প্রসারণ বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কাউন্টি এজেন্টরা প্রত্যেক কাউন্টির অধিবাসীদিগকে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রায়শঃই দেখা যায় যে, এজেন্টের কৃষিসম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় জোতদার এবং কৃষকগণ সমবেতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যোগদান করেন। স্থানীয় এবং জাতীয় এই উভয়বিধ কৃষি-সমিতির অধীনে কাজ করার দরুন কাউন্টি এজেন্ট তাঁহার অঞ্চলের সমস্যাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং সেইজন্য ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হন। কি যুদ্ধকালে কি শান্তির সময়ে অথবা বন্যা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়-জনিত দুর্য্যোগের দিনে,—সকল অবস্থায়ই কাউন্টি এজেন্ট দেশ ও সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিয়া থাকেন।

কোন কোন দিক দিয়া কাউন্টি এজেন্ট তাঁহার অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট গ্রাম্য চিকিৎসকের মতই অপরিহার্য্য।



রে থ্রোন একজন কৃষি-কর্ম্মকারী সহ একটি কপিক্ষেতে কীট-পতঙ্গাদি বিনাশক তরলবিন্দু নিক্ষেপ অবলোকন করিতেছেন।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এদেশের কৃষি এখনও আদিম ও অনুন্নত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। আমেরিকার দৃষ্টান্তে কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য আমাদেরও অবহিত হওয়া উচিত। সম্প্রতি আমাদের দেশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য বহু পরিকল্পনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশের উন্নতিমূলক পরিকল্পনায় কৃষিকে মুখ্যস্থান না দিলে সব কিছুই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত,'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া'র দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সভাপতিরূপে মিঃ ডি. এন. ওয়াদিয়ার নিম্নোক্ত কথাগুলি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য :

"India's life-blood is agriculture. Industrialisation alone without agricultural reconstruction and development might have retrograde effects on its economy."

ওমর খৈয়ামের দেশে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক

নিশাপুর ওমরের জন্মভূমি—একথা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগছে, এই ঘেঁষাঘেঁষি মাটির ঘর-ভরা সঙ্কীর্ণ শহর—নোংরা, গেরুয়া রঙের ধুলায় ভরা সরু সরু রাস্তা, গ্রাম্য-সারমেয়ের ডাকে মুখরিত গণ্ড শহর—কবির জন্মস্থান। এই শহরের এমনি এক কুঁড়েতেই কি কবিস্বপ্ন পাপিয়ার ডাকে গোলাপের ঘুম ভাঙিয়েছিল। প্রচণ্ড তাপে ভরা উষর ভূমির ধারে স্নিগ্ধ দ্রাক্ষাকুঞ্জ, বুলবুলকূজিত নিষ্প্রভ আকাশ, আর শ্রান্ত পথিকের ক্লান্ত দেহ আর সাকিতে ভরা পান্থশালা রূপ পেয়েছিল।...

আমাদের গাড়ি থামতেই এক দল ইরাণী ভিক্ষুক ঘিরে দাঁড়াল। এমন অদ্ভুত ভিক্ষুক আমি দেখিনি। তারা প্রত্যেকে হাত ধরাধরি করে আমাদের ঘিরে ফেললে।

—এই নিশাপুর!—আমাদের সঙ্গী দোভাষী বললে।

আমরা এক হাঁটু ধুলো-ভরা রাস্তায় ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামলাম। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি পলকে চতুর্দ্দিক ঘুরে স্বস্থানে ফিরে এল।

সুলতানের গগনচুম্বী প্রাসাদ মিলিয়ে গেছে ধুলায়—ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সাকির লঘুপদ-নৃত্য-মুখরিত পান্থশালা; কোন গোলাপ-বাগের চিহ্ন নেই,—ধুলার নদী সরু পথের দুই ধারে। তথাপি এই শহর এক দিন গুঞ্জরিত হ'ত বুলবুলের গানে, মদালস সুর্ম্মা-আঁখি ঘুরে বেড়াত এরই আকাশে, দ্রাক্ষাকুঞ্জে। মনে পড়ে গেল আরবযাত্রীর রোজ-নামচায় এর বর্ণনা। ওমরের জন্ম-সময়ে বা তারই কাছাকাছি ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দের রওনক। এই ধুলায় ভরা গণ্ড শহর বাগদাদের চেয়েও খ্যাতি পেয়েছিল। এখানকার সুন্দর পঞ্চাশটি রাস্তা দুনিয়ার সংবাদ বহন করত। তুরস্ক-শিল্পের আধার মসজিদ, বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার, সুরক্ষিত নগরী তার সংস্কৃতি, আর রওনকের জীবন যোগান দিয়েছিল কবির মধুবর্ষী কাব্য আর দর্শনের প্রেরণায়।

ভ্যাপসা গন্ধ আর কদর্য্যতা জানিয়ে দিল আমরা বাজারের কাছে এসেছি। নিশাপুরের প্রাণস্বরূপ এই বাজার যেন প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে ক্ষমা চাইল। আমরা রুটির দোকান ছাড়িয়ে গেলাম, উল্টো তাওয়ায় পাতলা কাগজের মত রুটি তৈয়ারি করছে। ভাঙা বেঞ্চ আর টেবিলের উপর গেলাসে করে সাজানো, শুকনো ফুলে-ভরা, জনপূর্ণ কাফিখানা ছাড়িয়ে চলতে চলতে পথের পাশে গর্ত্তের মত ছোট জানালার দিকে নজর পড়তেই দৃষ্টি থমকে গেল। এখনও রয়েছে সেই কুমোর—আমি হলফ করে বলতে পারি এই কুমোর ওমরের সময় যেমন ছিল আজও ঠিক সেই রকমই আছে। পুরানো আমলের চাকী বনবন্ করে ঘুরছে, তারই ওপর কাদামাটি[illegible] আঙুলের চাপে গড়ছে মাটির বাসনকোসন। করেক[illegible] দাঁড়িয়ে পড়লাম, লক্ষ্য করতে লাগলাম মাটির বাসনগুলির দিকে। সাধারণ পারসিক কাঁচের কলসী আর গামলা, আদিম তাদের গড়ন, রং-চটা বিবর্ণ পালিস—আমার মনে কবির দার্শনিক তত্ত্ব উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল :

> "One evening at the close,
> Of Ramzan, ere the better Moon arole
> In that old potter's shop I alone
> With the clay population round in Row."

কুমোরের সন্দিগ্ধ আর বিস্মিত চাহনি এড়িয়ে নজর পড়ল দোকানে ওঠার সিঁড়িতে। সিঁড়ি বললে ভুল হবে—কারুকার্য্য করা ফটকের ভগ্ন অংশ দরজার সামনে রাখা হয়েছে। এ ফটকের অংশ হয়ত কোন এক পান্থশালার দুয়ার ছিল—যে অগণিত যাত্রী আসত যেত, সেই ভাঙা কাহিনীর টুকরো যেন লেখা রয়েছে এই মণ্ডনশিল্পের মধ্যে। গর্ব্বে মাথা তুলে একদা দাঁড়িয়েছিল—এখন সামান্য মাটির ঢেলা।...

মনে দার্শনিক চিন্তার উদ্রেক হ'ল, মনে পড়ল কবির চিরন্তন বাণী :—

> "Think, in this better'd caravansari,
> Whose Doorways are alternate Night and Day
> How, Sultan after Sultan with his pump
> Abode his hour or two and went his way."

যাত্রীদলের মুখরোচক গল্প, ইতিহাসের পুঁথির পাতায় নিশাপুরের কাহিনী—সব কিছু ঢেকে দিলে এই ভগ্ন ফটকের টুকরোগুলো—এ যেন বলছে—হে পথিক, সবই মিথ্যে এ দুনিয়ায়, পড়ে দেখ এই ভগ্নস্তূপে—অদৃশ্য অক্ষরে যে কাহিনী রয়েছে লেখা! কত সুলতান বাদশাহের সৈন্যদল রাঙা করে দিয়েছে এই পথ তাদের রক্তে; প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, ভূমিকম্প বারবার বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছে সোনার দেশ, সে কাহিনী কোন ইতিহাসের পাতায় নেই। যদি তোমার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হয়—তা হলে দেখতে পাবে অনেক অজানা ও গোপন কাহিনী লেখা রয়েছে, আমার ভগ্নজীর্ণ প্রতি অঙ্গে।

চমক ভাঙল সঙ্গীদের ডাকে। তারা বাজারে টুকিটাকি সওদা করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

পদের হাণ্ড্রেডওয়েট ট্রাক ধুলো উড়িয়ে ষ্টার্ট দিল। দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এবার কোথায় যাচ্ছি।

ওমরের সমাধি দেখতে—

আঁকা-বাঁকা ধূলি আকীর্ণ পথে ঝাঁকানি দিতে দিতে ট্রাক নিশাপুরকে তিন মাইল পেছনে রেখে থামল।

এখানে ওমর তাঁর শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন।—দোভাষী বললে।

তুর্কি বাস্তুশিল্পের কাজ করা মিনার, থমসমিবিষ্ট পাইনগাছায়

ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। মিনার দেখে মন খুশীতে ভরে উঠল আমাদের গাড়ি মিনারের কাছে থামল।

আপনি যে মিনার দেখছেন এটি মুহম্মদ মুহরুকের দরগা। বড় সাধু ব্যক্তি ছিলেন তিনি।—মিনারের সামনে মাথা নুইয়ে সশ্রদ্ধ ভাবে দোভাষী বললে।

—যাকে বলে খাঁটি পয়গম্বর,—সৈহীদ সুলতান জ্যান্ত পুড়িয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

মুহরুকের সমাধির পাশ দিয়ে, খানিকটা পথ এগিয়ে ঈষৎ অন্ধকারাবৃত সমাধি-স্তম্ভের সামনে দাঁড়ালাম।

ওমরের সমাধি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ভাবে এ সমাধি তৈরি হয়েছিল, আজও তা সেই ভাবে আছে। কোন নক্সা উৎকীর্ণ নেই, ছোট সাধারণ সমাধি, চুণের আস্তরণ দেওয়া।

ওমরের মত দার্শনিকের সমাধি এমনই নিরাভরণ হওয়াই উচিত। শুকনো গোলাপ পাতার মর্ম্মরধ্বনি নেই,—নেই দীর্ঘ ছায়া-ঘেরা নাসপাতি বীথি। পোড়ামাটিতে ঢাকা বাগান যেন দূর-স্মৃতির চিতাভস্ম। স্মরণ হ'ল সমসাময়িক এক জনের রোজনামচায় উল্লিখিত কবির উক্তি—তার একান্ত মনের কামনা। একদিন কবি তাঁর বন্ধুদের কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন —"আমার সমাধি হবে এমন স্থানে, যেখানে বৎসরে দু-বার করে পথের ধূলি ঢাকা পড়বে ফুলের কুঁড়িতে।"

পারস্যের নির্মেঘ নীলাকাশের গায়ে, তুরস্কীয় নক্সা-কাটা মসজিদের পাশে—সাধাসিধা চুণের আস্তরণ দেওয়া দার্শনিক-কবির সমাধি! সাধন-গর্ব্বী মুহরুকের মাৎসর্য্য-ভরা দম্ভের সামনে কবির বাণীমূর্ত্তি। মনে পড়ে :—

" . . . .
One thing is certain and Rest is lies
The flower that once has blown for ever dies."

* * *

ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় ডি, আই, এস-এর মধ্যস্থতায়। উৎসব ঠিক নয়, নিছক আমোদের জন্ত এ ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষিত, সবে কলেজ ছেড়ে তিনি রোজগারের ধান্দায় ঘুরছিলেন এমন সময় যুদ্ধ বাধল। সাপ্লাইয়ে কণ্ট্রাক্টারী করেন। বাঙালীর প্রতি প্রবল অনুরাগ—মিঃ দের মারফতে তার সঙ্গে পরিচয়। সম্পূর্ণ বাদশাহী চালে সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রচুর খাদ্য ও পানীয়, উদার আতিথেয়তা, জঙ্গী-জীবনে স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

সুরু হ'ল কবি-প্রসঙ্গ, ভদ্রলোক বললেন, "আপনি বড় শক্ত প্রশ্ন করলেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এমন একজনও দেখতে পাই না, যিনি সাদি বা হাফিজের প্রভাব থেকে মুক্ত। বুলবুলের মতই চিরকাল পারস্যের গুলবাগে ধ্বনিত হবে সাদি বা হাফিজের কণ্ঠ।"

—ওমরের স্থান কি সেখানে নেই।—বিনা ভূমিকায় মাঝখানেই প্রশ্ন করলাম।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন—পুওর পোয়েট, দু-একটা রুবাইতের সের রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে আমরা গণিত আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ্ বলেই জানি। তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি ভেবে পাই না, আপনারা ওমরের কাব্যপ্রতিভা আর দর্শনজ্ঞানের এত প্রশংসা কেন করেন, যাকে সাদি বা হাফিজের তুলনায় পূর্ণচন্দ্রের কাছে মাটির প্রদীপ বলা চলে।

সাদি বা হাফিজ সম্বন্ধে আমার ভালরকম জানা নেই, কিন্তু ওমরের কবি-প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না—বিশেষ করে এই যুদ্ধের পর পৃথিবীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ওমরের মত কবি-দার্শনিকেরই প্রয়োজন।

পকেট থেকে ওমরের রুবাইতের অনুবাদখানা তাঁর হাতে দিলাম।

বইখানি নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন, এডওয়ার্ড ফিট-জেরাল্ডকে অনুরোধ করতে ইচ্ছে করছে সাদি বা হাফিজের কাব্যানুবাদ করতে। তা হলে আপনারা পারস্যের আত্মার সঙ্গীত শুনতে পাবেন।

ঐ দেশীয় কালো পোষাকে সজ্জিত এক মহিলা প্রবেশ করলেন।

—মাফ করবেন, আর এক দিন এবিষয়ে আলোচনা করা যাবে। এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সম্প্রতি এঁর স্বামী এঁকে তালাক দিয়েছেন, ইনি এখন বড় নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছেন।

হাত তুলে অভিবাদন জানালাম।

টেগোরের আগমনের পর থেকেই বাঙালী সম্বন্ধে আমার মনে বড় কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে, এই গরীবখানায় আপনাকে পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে।—হৃদ্যতার সুরে মহিলাটি বললেন।

জাতীয় গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

একটু পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা টেগোর কোথায় থাকেন, কেমনভাবে থাকেন, ওঁর সের হাফিজ না সাদির মত।

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম বাধা দিয়ে যুবকটি বললেন—আজ থাক এই সব আলোচনা, আজকের দিনটা শ্রেফ আনন্দ করেই কাটানো যাক।

মহিলাটি মৃদু হাসলেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলো সেই হাসির স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

খুব ভাল কথা, সাদির গজলে আজকের এই সন্ধ্যাটিকে মধুময় করে তুলুন।

বিনীত কণ্ঠে মহিলাটিকে অনুরোধ জানালাম।

সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি অনুরণিত হয়ে উঠল গজলের সুরে।

সোভিয়েট শিক্ষার রূপ ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

প্রশান্ত মহাসাগরের দুই পাড়ে বর্ত্তমান জগতের দুই আজব দেশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। আমেরিকার সব কিছুই বিরাট; যেমন বিপুল তার অর্থ তেমনি ব্যাপক তার যন্ত্রশিল্প। অভ্রংলিহ তার এক একটা প্রাসাদই এক ইন্দ্রপুরী। তার একটা জাতীয় পরিকল্পনার টাকার অঙ্ক গরীব দেশের লোক আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। উড়ন্ত কেল্লা, হাওয়াই জাহাজ আর আণবিক বোমা আমেরিকাকেই মানায়।

রাশিয়া প্রহেলিকাময় নূতন দৈত্যের দেশ। আরব্যোপন্যাসের ধীবর জালে-ওঠা কলসীটার ঢাকনি খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের প্রভাবমুক্ত দৈত্য বিশাল দেহ ধারণ করে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। জারের শাসনমুক্ত সোভিয়েট রাশিয়ার নব জাগরণও তেমনি ধারণাতীত, বিস্ময়কর। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বলদৃপ্ত নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষায় রাশিয়া যে অদ্ভুত সহনশক্তি, অধ্যবসায় ও সার্থক রণনীতির পরিচয় দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তা এক নূতন অধ্যায়। উৎকট স্বজাতিপ্রেমিক দাম্ভিক রণনেতা চার্চিল পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, হিটলার রাশিয়ায় তাঁর রণশক্তির যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন, তা সামাল দিয়ে ওঠা রাশিয়া ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে রাষ্ট্রের ঘুণধরা কাঠামো বহিঃশত্রুর আক্রমণে ধ্বসে পড়েছিল সেই দেশ এই অল্পকালের মধ্যে এমন কি উপাদানে পুনর্গঠিত হয়ে উঠল যে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ যান্ত্রিক বাহিনীর কঠোর আঘাত সহ্য করে ততোধিক প্রচণ্ডতার সঙ্গে তা আবার ফিরিয়ে দিয়ে আক্রমণকারীকেই ধরাশায়ী করে ফেলল? সোভিয়েটের এই অপ্রত্যাশিত শৌর্যের মূল উৎস কোথায়, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। এর উৎস আত্ম-সচেতন দেশপ্রেমিক জনগণ। বিয়েট্রিচ কিং *Education in USSR* পুস্তকে বলেছেন:

> The Soviet forces fighting, and so brilliantly beating back, the hitherto unconquered Nazi forces, consist of men who are the products of Soviet education, . . . Again, it is the new generation that has opened up the Arctic, that is making the desert flourish, introducing new crops and contributing to new cultures.

বিপ্লবোত্তর যুগের তরুণেরা প্রাণশক্তিতে উচ্ছল; দিকে দিকে তাদের কর্ম্মধারা ধাবিত হয়েছে। মেরুপ্রদেশে তারা গড়েছে উপনিবেশ, মরুভূমিতে ফলিয়েছে সোনা, উদ্ভাবন করেছে নূতন নূতন ফসল। তারা হয়েছে এক নব সভ্যতার রচয়িতা।

মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে রাশিয়ায় রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতি শিক্ষা—এক কথায় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, জগতে তা নিয়ে আলোচনার অন্ত নাই। এর উদ্দেশ্যে প্রশংসা বর্ষণ হয়েছে যেরূপ অজস্র, বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে ততোধিক। আমাদের দেশের মিনু মাসানির মত উৎসাহী সমাজতান্ত্রিকও শেষ পর্য্যন্ত বলেছেন:

"আগামী কালের ঐতিহাসিকরা হয়ত ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক জগতে 'সুবাহ কজ়ব' বা মিথ্যা প্রভাত আখ্যা দিবে। আমরা ম্যাথু আরণল্ডের ভাষায়

> 'Between two worlds one dead
> The other powerless to born.'

এমনি একটি জগতে বাস করছি।"

অর্থাৎ, রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু সমাজতন্ত্রের সূচনা হয় নি। তার পরিবর্ত্তে, বার্ণহামের কথায় হয়েছে ম্যানেজার বা পরিচালকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (Managerial Revolution)।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কতখানি সার্থক হয়েছে সে আলোচনার মধ্যে না গিয়ে (যদিও সে আলোচনা খুবই বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে) আমরা সোভিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ ও তার অভাবনীয় সাফল্যের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করব।

প্রাক্-বিপ্লব শিক্ষার অবস্থা

জারতন্ত্রে রাশিয়ায় শিক্ষার অবস্থা ছিল শোচনীয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ থেকে ৯৯.৭ জন লোক ছিল অক্ষরজ্ঞানবর্জ্জিত। উসপেনস্কি, পিসারেভ, শাটস্কি প্রভৃতি চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষাজগতে আলোড়ন সুরু করেছিলেন কিন্তু তখনকার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক অবস্থায় আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রের উদাসীনতা এবং বিরূপ মনোভাব শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষক সম্প্রদায় ছিল অবহেলিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট। পল্লী অঞ্চলে ভগ্ন জীর্ণ গৃহে গুটিকতক ছেলে কোন রকমে বসে পাঠ অভ্যাস করত—এই ছিল অধিকাংশ নিম্ন শিক্ষায়তনের অবস্থা। জারের মন্ত্রীরা বলেছিলেন: ১২৫ বৎসর হচ্ছে ন্যূনতম সময় যার মধ্যে শিক্ষা আবশ্যিক করা চলতে পারে। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এ কাজ সম্ভবপর নয়।

স্বেচ্ছাচারের রথচক্র অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় দেশবাসীর বুকের ওপর দিয়ে অবাধ গতিতে চলে। তাই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পক্ষে জ্ঞানালোকের পথ রুদ্ধ করে দেশে অজ্ঞানের অন্ধকারকে স্থায়ী করার প্রয়াসই স্বাভাবিক। কিন্তু বিপ্লবের স্রষ্টারা বুঝেছিলেন যে, দেশবাসীর সর্ব স্তরে জ্ঞানের কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের জড়তা দূর করতে না পারলে, নূতন জীবনাদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করতে না পারলে নববিধান স্থায়িত্ব লাভ করবে না। ফলতঃ জনগণের উদ্যম, আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করবে নূতন রাষ্ট্রের ভাবী রূপ। লেনিন বরাবর বলে এসেছেন উচ্চ-শিক্ষিত দেশবাসীই হবে সমাজতন্ত্রের ধারক এবং বাহক।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ প্রথম থেকেই শিক্ষাবিস্তারকে

তাঁদের আদর্শের জীবনকাঠি হিসাবে মুখ্যস্থান দিয়ে আসছেন। বিপ্লবের পরের বৎসর ১৯১৮ সালে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও আবশ্যিক করার আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল কিন্তু বিপুল ভাঙাগড়ার মধ্যে এ আইন কার্যে পরিণত করা ঘটে উঠল না। ১৯৩১ সালে, দেশের অবস্থা যখন আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হ'ল। সারা দেশে জেগে উঠল সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাময় কর্মচাঞ্চল্য। সোভিয়েটের নূতন শাসন-বিধিতে (The New Constitution of 1936) 'নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য' অধ্যায়ে আছে :

Article 121 : Citizens of the USSR have the right to education.

This right is ensured by universal compulsory elementary education, by a system of state stipends for the overwhelming majority of students in higher schools, by instruction in schools in the native language, and by the organisation in factories, state farms, machine-tractor stations and collective farms of free industrial, technical and agricultural education for the working people.*

রাষ্ট্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় আশানুরূপ ফল যে ফলেছে তা শিক্ষার ক্রমপ্রসারতা দেখেই বুঝা যাবে। জারের আমলে ১৮৯৭ সালে রাশিয়ায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা ২১·২ জন ; ১৯৩৯ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ জনে ; ১৯৪৪ সালে শতকরা ১০০ জনে ! তার মানে সোভিয়েট রাষ্ট্র যখন ঘোরতর জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখনও তার শিক্ষা-বিস্তারের উদ্যম কিছুমাত্র শ্লথ হয় নি ; বরং এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই নিরক্ষরতা দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করে রাশিয়া অসাধারণ জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে ষোলটি রাষ্ট্র-সমবায়ে সোভিয়েট রাশিয়া গঠিত তাদের মধ্যেকার অনুন্নত সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলির শিক্ষার জন্য সোভিয়েট শিক্ষাবিদ্‌দের ৪৬টি নূতন বর্ণমালা উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

শিক্ষার ক্রম

জীবনকে সমগ্রভাবে ধরে তার বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্র করেছে। রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যেক শিশুই সম্পদ বলে গণ্য হয়। কে বলতে পারে তার মধ্যে ভাবী মহামানবের গুণাবলী নিহিত নাই? এরাই তো রাষ্ট্রের ভাবী পরিচালক, ভবিষ্যতের নাগরিক। তার জন্মকাল থেকেই তাই রাষ্ট্র তার কল্যাণ-চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ (Commissariat of Health)। ১৯৩৬ সালে আইন করে কারখানা ও কৃষি সমবায়গুলিতে শিশু-লালনাগার তৈরি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখানে মাতা ও তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়। তারপর আট বৎসর বয়স পর্যন্ত নার্শারি স্কুলে শিশুর শিক্ষা। শিক্ষা-বিভাগের নির্দেশে কারখানা এবং কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিই এ সবের পরিচালনা করে। আট বছর থেকে পনর বছর পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষা ; এর মধ্যে দুই স্তর—আট থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক, ১২ থেকে ১৫ অবধি মধ্য শিক্ষা (middle education)। এ পর্যন্ত সকল শিক্ষাই অবৈতনিক। তারপর পনর থেকে আঠার বছর বয়সের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা (secondary education)।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ করার পর ছাত্রগণ নিজ নিজ সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুযায়ী সাধারণ স্কুল (academical school) অথবা বিভিন্ন অর্থকরী বিদ্যার পথ বেছে নিয়ে টেক্‌নিক্যাল স্কুল (Technicum), কৃষি স্কুল, নানাজাতীয় যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। এ সব বিদ্যায়তনে বেতন দিয়ে পড়তে হয় কিন্তু মেধাবী ছাত্রের পক্ষে বিনা বেতনে সরকারী অর্থানুকূল্যে পড়ার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছু ছাত্রকে সাধারণ স্কুলে পাঠ শেষ করে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। বলা বাহুল্য, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য তীক্ষ্ণধী ছাত্রদিগকে বাছাই করে নেওয়া হয়ে থাকে। তবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা সাবলীল সজীবতা আছে যে, যে-কোন উচ্চাভিলাষী যুবক জীবনের যে-কোন কর্মক্ষেত্র থেকে স্বচেষ্টায় প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পায়।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৭ বছর পূর্ণ হবার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ আবশ্যিক শিক্ষা শেষ করে অন্ততঃ শিল্পবিদ্যালয়ে দু-বছর না পড়ে কোন বালকবালিকাই জীবিকার্জনে নিযুক্ত হতে পারে না।

ইংলণ্ডে আবশ্যিক শিক্ষার মেয়াদ ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। ইদানীং এই শিক্ষাকাল আরও দু-বছর বাড়িয়ে দেবার জন্য দেশময় আন্দোলন চলেছে। সার রিচার্ড লিভিংষ্টোন *The Future in Education* গ্রন্থে বলেছেন :

To cease to be educated at 14 is as unnatural as to die at 14.

চৌদ্দ বছর বয়সে শিক্ষা শেষ করা চৌদ্দ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার মতই অস্বাভাবিক।

বিলাতের নূতন শিক্ষা-বিলে এ কথা স্বীকার করে ষোল বছর পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাশিয়ায় যেমন কৃষক-মজুর, শিক্ষক, যন্ত্রচালক সকলেরই কর্মক্ষেত্রের সকল স্তর থেকেই শিক্ষালাভের সুযোগ আছে, বিলাতেও সেইরূপ সুযোগ দেবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষাসংক্রান্ত শ্বেতপত্রে (White Paper) উল্লিখিত হয়েছে :

'Education is a continuous process conducted in successive stages'—throughout life, if we want to be an educated democracy and to be among the races of the future.—(H. C. Dent : *A Landmark in English Education,* p. 15).

রাশিয়ার অনুকরণে কৃষি বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকদের শিক্ষার জন্য ই. কুর্সাস্ কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব করা

---

* রাশিয়ার কর্মী (working people) বললে সমগ্র অধিবাসীকেই বুঝায় ; কেননা সেখানে সুস্থ সবল ব্যক্তির নিষ্কর্মা হয়ে অপরের অর্জিত খাদ্য গ্রহণ করা আইনতঃ নিষিদ্ধ। কাজ নাগরিকের সম্মানজনক কর্তব্য। শাসনবিধির দ্বাদশ নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য :

Article 12 : Work in the USSR is a duty and a matter of honour for every able-bodied citizen, on the principle : He who does not work shall not eat.

হয়েছে ; এখানে কর্মীরা সপ্তাহে এক দিন করে উপস্থিত হয়ে শিক্ষালাভ করতে পারবে। শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে যে, কর্মজীবনে প্রবেশকারী যুবকদের প্রথমে কিছুদিন অর্দ্ধেক সময় কাজ এবং বাকি অর্দ্ধেক সময় এইরূপ কলেজে শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার ব্যয় ও পরিচালনা

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, রাশিয়ায় পনর বছর পর্য্যন্ত যাবতীয় শিক্ষাই অবৈতনিক। তার পরবর্ত্তী শিক্ষায়তনে বেতন ধার্য করা হয় বটে, কিন্তু তার পরিমাণ সামান্য। মোট খরচের শতকরা ৯৬'৪ ভাগ টাকা সোভিয়েট সরকার বহন করেন, বাকি ৩'৬ ভাগ আদায় হয় ছাত্র-বেতন থেকে। শিক্ষা বাবদ এদেশে ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের জন্য ব্যয় হয় ৭৮৭ কোটি টাকার ওপর অর্থাৎ জনপ্রতি শিক্ষার খরচ পড়ে বার্ষিক প্রায় ৪৩ টাকা। শিক্ষার ব্যয় কেন্দ্রীয় সোভিয়েট ও স্বতন্ত্র রিপাব্লিকগুলি একযোগে বহন করে। কারখানা বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষা-খাতে অর্থ সাহায্য করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার খরচ উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ত্তমান ভারতে প্রায় ৪০ কোটি লোকের বাস। শিক্ষার জন্য এখানে বছরে খরচ হয় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ জনপ্রতি বার আনার মত। সারা বাংলাদেশে খরচ হয় অনুমান ৩ কোটি টাকা—জনসংখ্যার মাথাপিছু আট আনা! সার্জ্জেন্ট-পরিকল্পনায় সমগ্র ভারতের জন্য আজ থেকে ৪০ বৎসর পরে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এতে বড়লাট বাহাদুর জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের এত টাকা খরচ করার সামর্থ্য নাই। ইংলণ্ডে আজ শিক্ষার জন্য সেখানকার লোকসংখ্যার হিসাবে জনপ্রতি ৫০ শিলিং ব্যয় করা হয়; আমাদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হলেও মাথাপিছু আট টাকার বেশী পড়বে না। জনকল্যাণকর কোন প্রচেষ্টার জন্ম রাষ্ট্র কতখানি অর্থ, উদ্যম ও অনুপ্রেরণা নিয়োজিত করেছে তা দেখেই বুঝা যায় শাসকগণ তার ওপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণ শিক্ষাব্যবস্থাকে তাঁদের রাষ্ট্রিক স্বপ্ন সফল করার, আদর্শকে রূপায়িত করে তোলার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। কাজেই শিক্ষা রাষ্ট্রনীতিঘেঁষা হওয়া স্বাভাবিক। এঁদের কাছে শিক্ষার এক অর্থ জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান সঞ্চার। কেন্দ্রীয় সোভিয়েট শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু প্রত্যেক ইউনিয়ন এবং স্বায়ত্তশাসনশীল রিপাব্লিককে নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষাপরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে। এদের শিক্ষা-বিভাগ (Commissariat of Education) নার্শারি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এক বিরাট্ যন্ত্রের ছোটবড় চাকার মত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিত হচ্ছে।

পাঠ্য বিষয়

সোভিয়েট শিক্ষার এক বিশিষ্টতা এর পাঠ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য। খেলাধুলা, নাচ, গান-বাজনা, ছবি আঁক[illegible]রকম যন্ত্রপাতি এঞ্জীন, উড়োজাহাজ প্রভৃতির মডেল তৈরি করার মধ্য দিয়ে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে থাকে। এর সঙ্গে ক্রমে আসে ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, সাহিত্য, বিদেশী ভাষা।

স্কুলের ব্যয়ে শিশুদের বছরের মধ্যে চার-পাঁচ বার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যবস্থা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত। উপযুক্ত শিক্ষকের সাহচর্য্যে দল বেঁধে দেশ ভ্রমণ যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। ছাত্রদের দেশের সঙ্গে, দেশবাসীর সঙ্গে বাড়ে ঘনিষ্ঠতা, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

রাশিয়া বিরাট্ দেশ। এর সকল অঞ্চলে জনসাধারণের জীবন-যাপন প্রণালী বা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় এক প্রকার নয়। শহরের এবং পল্লীর জীবনও বিভিন্ন। কাজেই সমাজ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যবিষয় নির্দ্ধারিত হয়েছে। মানুষকে জীবনের উপযুক্ত করে তোলার নাম শিক্ষা। প্রাকৃতিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের তারতম্য অনুসারে তাই শিক্ষার বিষয়বস্তু স্বাভাবিক ভাবে পৃথক হতে বাধ্য। সুতরাং পল্লী অঞ্চলের স্কুলে—যেখানে কৃষি লোকের উপজীবিকা—হাতে-কলমে কৃষিসংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা করা বাধ্যতা-মূলক।

সোভিয়েটের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়। সিনেমাযন্ত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, কাচচিত্র (Slides) প্রভৃতির সহায়তায় শিক্ষকগণ ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানপাঠ সরস ও হৃদয়গ্রাহী করেন। তা ছাড়া জীববিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুলে নানারকম জীবজন্তু (Live Corner), মাছ প্রভৃতি জলচর প্রাণী (Aquarium) রাখা হয় এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষার জন্য আছে সযত্নরচিত উদ্যান (Nature Corner)।

দেশের সুস্থ এবং বিকলাঙ্গ বালকবালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেই রাষ্ট্র ক্ষান্ত হয় নি, বয়স্কদের জন্য ব্যাপক শিক্ষাসত্র খুলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪০ সালে পাঁচ কোটি বয়স্ক ব্যক্তি শুধু সাধারণ জ্ঞান আহরণ নয়, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান এবং শিল্পভবনে এক এক নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিল।

আমাদের শাস্ত্রবচনে আছে 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'; যে-কোন কর্ম্মসাধনের জন্যই সুস্থ সবল কার্য্যক্ষম দেহ চাই। কিন্তু আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ের ক্রমক্ষীয়মান স্বাস্থ্য দারুণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শতকরা ৯০টি বালকের যেখানে পুষ্টিহীনতা ও অপরিণত গড়ন, সেখানে তাদের কাছ থেকে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক চালনা আশা করা নিষ্ফল। সোভিয়েট রাষ্ট্র ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। প্রতি স্কুলে আছে স্থায়ী ডাক্তার, নার্স ও ঔষুধপত্রের ব্যবস্থা। তা ছাড়া প্রতিষেধক হিসাবে যাতে ছাত্রদের খাদ্যে পুষ্টির অভাব না ঘটে সে দিকে স্বাস্থ্যবিভাগ রীতি-মত সজাগ।

স্কুল ও গৃহ

মানুষ গড়া রাষ্ট্রের কাজ। ছাত্রদের পিতামাতাও রাষ্ট্রেরই

অঙ্গ। কাজেই অভিভাবকগণ শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা করেন মানুষ তৈরির কাজে এবং ছাত্রদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশসাধনের অনুকূল পরিবেশ রচনায় যত্নবান হন। বিয়েট্রিচ কিঙের কথায়

The home, too, is linked up with the school by means of active and effective parents' councils, by the organisation of parents' courses in the school, by consultations with education specialists in the school and by teachers' visits to the homes.

শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সোভিয়েট শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ব্যাপকতা, সজীবতা এবং রাষ্ট্রের অপরিসীম আন্তরিকতা। যদিও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবর্তিত এক নূতন ব্যবস্থাকে (socialist creed) প্রতিষ্ঠা করবার প্রেরণা নিয়েই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে, তবু উন্নতির বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত এত বড় দেশের এত ব্যাপক পরীক্ষণের সাফল্য বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। দেশের আপামর জনসাধারণকে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শেখানোর কৃতিত্ব কম নয়। ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্সে হিটলার পঞ্চম বাহিনীর সহায়তা পেয়েছিলেন যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু রাশিয়ায় তিনি কুইসলিং খুঁজে পান নি।

Long before the war conscious Soviet citizen put the community before himself, worked and laboured not chiefly for his own good but for the good of the community, without the bait of great riches or power. Above all Soviet education has stimulated the ordinary citizen to an eager desire for knowledge and culture, it has given him a high intellectual and artistic as well as high moral standard.—(*Education in the USSR*, p. 20).

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—কর্তৃপক্ষের সমালোচনা-সহিষ্ণুতা। শিক্ষা বিভাগ পাঠ্য-বিষয় নির্ধারণ করে শিক্ষক এবং শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে প্রচার করেন বর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনমূলক সমালোচনা আহ্বান করে। তা ছাড়া সোভিয়েট পত্রিকাগুলি সর্বদাই শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে সমালোচনা করে থাকে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিশ্বাস দোষ-ত্রুটি চোখের সামনে না থাকলে তা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর নয়; পরন্ত কোন সমস্যার সমাধানে বহুজনের মস্তিষ্ক নিয়োজিত হলে উপায় আবিষ্কার করা সহজ হয়ে আসে। বিয়েট্রিচ কিং বলেছেন :

Soviet education is continually criticized for its shortcomings in the Soviet press, both specialized and national; partly because of this it does more or less keep abreast of life, and because of the active interest shown in education by all sections of the community, it never lags far behind.

ইংরেজ মহিলা ডিয়েনা নেভিন সোভিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতে গিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পরের দোষ-ত্রুটির খোলাখুলি সমালোচনা করতে দেখে প্রথমে বিস্ময়ে সঙ্কুচিত হয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনিই অকুণ্ঠ প্রশংসায় এ প্রথাকে অভিনন্দিত করেছেন। কারণ কাউকে অপরের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা অথবা কারো প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করা হয় না; পরস্পরের সহযোগিতায় নিজ নিজ দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে নিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আত্মনিয়োগ করাই সেখানে শিক্ষকের কর্ত্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—শিক্ষকের সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য। এঁরাই জ্ঞান-যজ্ঞশালার ঋত্বিক—ভবিষ্যৎ জাতির স্রষ্টা। এদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক, আত্মোন্নতির সুযোগ, বসবাসের সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্র অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। শিক্ষক সোভিয়েটতন্ত্রে একজন অতি প্রয়োজনীয় সম্মানিত ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রচারক। ভাল কাজের জন্য সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ কর্তৃক এঁরা পুরস্কৃত এবং সম্মানে ভূষিত হন। মাসিক ৩২৫ রুবলের কম কোন শিক্ষকের বেতন নাই; শহরের মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মাহিনা ১০০০ রুবল পর্য্যন্ত হতে পারে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়ে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যাপক ব্যবস্থা। ডিয়েনা নেভিন *Children in Soviet Russia* পুস্তকে বলেছেন :

"ছোটদের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় ৩৯টি স্বতন্ত্র লাইট রেলওয়ে আছে, এই রেলওয়েগুলি সম্পূর্ণভাবে তাদের অধীনে। এই রেল চালনার জন্যে প্রায় এক লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিযুক্ত আছে—তারা নিজেরাই ষ্টেশন মাষ্টার, টিকিট কলেক্টার, এঞ্জীন-চালক, এঞ্জীনিয়ার সমস্ত কিছু। শুধু রেলওয়ে নয়, নৌবহরের ব্যবস্থাও তাদের জন্যে করা হয়েছে। অর্থাৎ সোভিয়েটের কিশোর-কিশোরীরা দেখছে, শিখছে নতুন জিনিস। বড় হয়ে তারা রাষ্ট্র চালাবার ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে ?" (অনিলকুমার সিংহ অনূদিত : 'সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা-ব্যবস্থা', পৃ. ১৯০)

এ সব ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া অন্যান্য সকল সভ্য দেশকে বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে; একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।



মাটির মায়া

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

ইন্দ্রনাথ বিছানায় পড়িয়া বৃথাই এপাশ-ওপাশ করিয়াছেন—সারারাত্রির ভিতরে একটুও ঘুমাইতে পারেন নাই। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে—গাঢ় অন্ধকার ক্রমে তরল হইয়া একটা কুয়াশার মত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে আজ এই গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কুড়িটি বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া আশেপাশের আরও কয়েকটি গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার ইন্দ্রনাথ, আই. এম. এস। ইন্দ্রনাথ '২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে জেল খাটিবার পর তাঁত ও চরকা লইয়া সেই যে এই গ্রামে আশ্রম গড়িয়া বসিয়াছেন আর কোথাও এক পা নড়েন নাই। নিজের হাতে একদল কর্ম্মী গড়িয়া উঠিয়াছে সেবাব্রতে ব্রতী হইয়া, গ্রামে গ্রামে দুঃস্থ হিন্দু-মুসলমানের বাড়ীতে দিন রাত চরকার গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে। অসহায় পল্লীবাসীদের চিকিৎসার ভার, শিক্ষার ভার, সকল প্রকার আপদ-বিপদের ভার, ইন্দ্রনাথ নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। বাধা-বিপত্তিও যে না পাইয়াছেন এমন নয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ভিতরে কেহ কেহ তাঁহাকে সুনজরে দেখেন নাই। ধনী শিক্ষিত মুসলমান সেরাজুল হোসেন সব সময় তাঁহার বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছেন। সমস্ত ঝড়ঝাপটা হাসিমুখে সহ্য করিয়া একান্ত মনে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজ এমনি করিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার এই আশ্রম কোথায় ভাঙিয়া যাইবে—আশেপাশের যে সমস্ত অধিবাসীর সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে নিবিড় ভাবে—আজ বানের জলে খড়কুটার মত তাহাদেরও কে কোথায় ভাসিয়া যাইবে কে জানে? হঠাৎ বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া উঠিল—ডাক্তারভাই জেগে আছেন? ইন্দ্রনাথ তড়াক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জবাব দিলেন—কে?

বাহির হইতে জবাব আসিল—আমি—আমি সেরাজুল হোসেন।

—সেরাজুল ভাই? এত রাত্রে?—ইন্দ্রনাথ চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া একটি মোমবাতি ধরাইলেন। দরজা খুলিতে খুলিতে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—হঠাৎ কি মনে করে এই ভোরবেলা? সেরাজুল হোসেন বিছানার এক পাশে আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাঁহার পাকা লম্বা দাড়ি বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিছানার উপরে গড়াইয়া পড়িল। ইন্দ্রনাথ তাঁহার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে টানিয়া লইয়া সহানুভূতির সুরে বলিলেন—কি হয়েছে ভাই? সেরাজুল হোসেন সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—সত্যি, করেই কি ভাই গ্রাম আমাদের ছেড়ে যেতেই হবে? কথাটা ভাবলেই যে আমার বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিটতে থাকে—দুই চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে পানি পড়তে থাকে? আমার এত সাধের গ্রাম—এত সাধের বাড়ী?

ইন্দ্রনাথ বলিলেন—কাল নোটিশ দিয়ে যাবার পর থেকে আমিও যে শুধু এই কথাই ভাবছি ভাই—সারাটা রাত্রি একটুও ঘুমোতে পারি নি—কিন্তু কোন কুলকিনারাও ত পাচ্ছি নে।

সেরাজুল হোসেন বলিলেন—কাল দুই বার আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম—রাত বারটার সময় শেষ বার আপনাকে না পেয়ে ফিরে গেছি। অত কথা বলব কি ভাই—কাল পাঁচ ওক্ত নমাজ পর্য্যন্ত পড়তে পারি নি। আচ্ছা আমাদের গ্রাম নিয়ে ওরা কি করবে ডাক্তারভাই। ইন্দ্রনাথ জবাব দিলেন হয়ত সৈন্যের ছাউনি করবে কিম্বা ভিটেমাটি সমভূমি করে গাছপালা কেটে 'এরোড্রোম' তৈরি করবে—এমনি একটা কিছু হবে। খোদা, খোদা! সেরাজুল হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—আমার সাতপুরুষের ভিটা। আমার সাতপুরুষের কত লোক যে আছে এই মাটির তলায়ই ঘুমিয়ে। তাদের ছেড়ে আজ আমি কোথায় যাব ডাক্তারভাই? পুনরায় সেরাজুল হোসেনের গলা ধরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—দেশকে যে কি জন্যে আপনারা মা বলে ভাবতেন তা এতদিনে বুঝতে পেরেছি ভাই! এই গাঁয়ের মাটি যে আজ মার চেয়ে আমাকে বেশী করে টান্‌ছে।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন—আমার দুঃখটাই কি কম ভাই, আজ বিশটা বছর ধরে যে আশ্রম গড়ে তুললাম—সে আশ্রম যাবে কোথায় টুকরো টুকরো হয়ে, যাদের আপনার ভাই মনে করে সেবা করলাম, তারা যাবে কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে। আমার সারাটা জীবনের সাধনা যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল ভাই।

সেরাজুল হোসেন বলিলেন—একটা কাজ করুন না ভাই, একবার আপনাদের বড় বড় কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে যুক্তি করে দেখুন না যদি কোন উপায় হয়। ইন্দ্রনাথ নিরুৎসাহের সুরে বলিলেন—কিন্তু কোন ফল হবে না, পাশের গ্রাম আর মাঠটা এরই ভিতরে 'একোয়ার' করে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, রাশি রাশি মিলিটারীর মালপত্র এসে পড়েছে। আমাদেরও ওরা নিশ্চয়ই উঠিয়ে দেবে। তার পর অনেকক্ষণ দুই জনের চুপ-চাপ কাটিয়া গেল। দিনের আলো ততক্ষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আশ্রমের কর্ম্মীরা ভজনগান সুরু করিয়া দিয়াছে। সেরাজুল হোসেন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া ফুলবাগানের পাশ দিয়া আম-কাঁঠালের গাছের সারির ভিতর দিয়া নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। ইন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সারাটা আশ্রম আজ যেন তিনি নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছিলেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ফাঁকা মাঠের উপরে খান দুই চালা ঘর লইয়া হয় আশ্রমের পত্তন। তখন মাত্র ইন্দ্রনাথ আর জনতিনেক কর্ম্মী মহা উৎসাহে আশ্রমের কাজে লাগিয়া যান—তারপর বৎসর কয়েকের মধ্যে তাঁহার সহকারীরা আশ্রম ছাড়িয়া রীতিমত সংসারী হইয়া আর দশ জন সংসারী লোকের ভিড়ের ভিতরে একেবারে মিশিয়া গেলেন। তবু কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এত বড় আশ্রম গড়িয়া উঠিল—পঁচিশ বিঘা জমি, খান কুড়ি ঘর, বাগান,

পুকুর আর ত্রিশ জন কর্ম্মী লইয়া আজিকার এই আশ্রম যেন ইন্দ্রনাথের নিকট একটা পরম বিস্ময়। নিজের শিশুসন্তানের সারা অঙ্গে পিতা যেমন করিয়া স্নেহদৃষ্টি বুলাইয়া থাকেন—ইন্দ্রনাথ তেমনি করিয়া দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সারা আশ্রমটি দেখিতেছিলেন। আশ্রমের প্রতিটি তরুলতা যেন আজ তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল—মৌন ভাষায় কত কি বলিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ টস্ টস্ করিয়া তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সকলের অলক্ষ্যে দুই চোখ মুছিয়া ফেলিয়া পুকুরের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। সংসারত্যাগী ইন্দ্রনাথ, কামিনী-কাঞ্চনের মোহমুক্ত ইন্দ্রনাথ আজ এমনি করিয়া এই আশ্রমের মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়া আছেন। সারা আশ্রম কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ভজন শেষ হইবার পর কাটাই ঘরে সুতাকাটা চলিতেছে—বুনানীর ঘর হইতে ঠকাঠক মাকু চলার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কেরা সকালবেলার পাঠ লইবার জন্ত বিদ্যামন্দিরে সমবেত হইয়াছে। প্রতিদিনের কার্য্যসূচীর আজও এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই—শুধু যিনি সকল কর্ম্মের মূলাধার তিনিই আজ পালাইয়া বেড়াইতেছেন।

২

আরও দশ-বারটা দিন কাটিয়া গেল। একমাসের নোটিশ কিন্তু তবু সারাটা গ্রামের মধ্যে পাঁচ-সাত ঘর লোকের বেশী উঠিয়া যায় নাই। সে দিন ইন্দ্রনাথ কি একটা কাজে যেন পাশের একটি গ্রামে যাইতেছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি এ কয়দিন ইন্দ্রনাথ আশ্রমের চারি পাশে সারাটা গ্রামে এবং আশেপাশের গ্রাম ও মাঠগুলিতে বৃথাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আশ্রম ছাড়িতে হইবে, এই গ্রাম ছাড়িতে হইবে, এই দিগন্তপ্রসারী মাঠ ছাড়িতে হইবে—তাই এ কয়দিন যেন অতি প্রিয় আবেষ্টনীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছিলেন। সনাতন বাগ্দীর বাড়ী একেবারে পথের ধারে। তাহার দশ-বার বৎসরের ছেলে মাধা ঘরের পাশের ছোট্ট একটুকরা জমিতে রাতদিন খাটিয়া গুটি কয়েক ফুলের গাছ লাগাইয়াছিল। মাধা কি একটা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া জল ঢালিতেছিল—ইন্দ্রনাথ সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন—কি করছিস রে মাধা। মাধা মাথা তুলিয়া বলিল—টগর গাছটার গোড়ায় জল দিচ্ছি গো! ইন্দ্রনাথ মাধার ফুলবাগানের বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাগানটির ভিতরে দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলেন—ছোট বাগানটি নানা ফুলগাছে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মাধা বলিল—একটু দাঁড়ান ডাক্তারবাবু, একটা বড় পোঞ্চমুখী জবা নিয়ে যান। বলিয়া ছেলেটি নাচিতে নাচিতে গিয়া একটা পঞ্চমুখী জবা তুলিয়া আনিয়া ইন্দ্রনাথের হাতে দিল।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন—কিন্তু এ বাগানে আর শুধু শুধু জল ঢেলে করবি কি মাধা—এ সব ছেড়ে যেতে হবে যে। মাধা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কুথায় ডাক্তারবাবু?

—যার যেখানে ইচ্ছে, এ গাঁয়ে আর কেউ থাকতে পারবে না।

—মাধা পুনরায় বলিয়া উঠিল—আমার ফুলবাগান?

ইন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—ওসব কি আর রাখবে রে—বাড়ী-ঘর-দোর-বাগান সব চষে ফেলে দেবে।

মাধা বিচলিত হইয়া উঠিল। ইস্ তা আর লয় ডাক্তারবাবু। আমি দিনরাত ঘর যাব নি—ভাত খাব নি, শুয়ার মারা ফালা লিয়ে পাহারা দিব। বলিয়া মাধা একেবারে মিলিটারী ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইল।

সনাতন একখানি খড়ের ঘরের চালের উপরে বসিয়া ঘরে খড় দিতেছিল, ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। সেখান হইতে সে বলিয়া উঠিল ডাক্তারবাবুর যে কুথা নুটিশ দিলেই হলো? ঘরবাড়ী ছেড়ে কেউ কখন যায়?

ইন্দ্রনাথ অবাক হইয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন, যেমনি বাপ তেমনি বেটা, এক জন ফুলগাছের গোড়ায় অতি যত্নে জল ঢালিতেছে আর এক জন নির্ব্বিকার ভাবে ঘরের চালে খড় গুঁজিতেছে।

সেরাজুল হোসেনের বাড়ীর পশ্চিম পাশে একটি আম-কাঁঠালের বাগান—তাহার পরেই ছোট একটি মাঠ। রাস্তাটি এই বাগানের কাছে আসিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পরেই আল-পথ। ইন্দ্রনাথ রাস্তাটি ছাড়িয়া আল-পথ ধরিয়া চলিয়াছেন এমনি সময় একটি দশ-বার বছরের ছেলে দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

—বুড়ামিয়া ছায়েব আপনার ডাকৃতিছে ডাক্তার বাবু! সেরাজুল হোসেনকে এ অঞ্চলে সবাই বুড়া মিয়া সাহেব বলিয়া জানে। ইন্দ্রনাথ ছেলেটির সহিত চলিলেন। ছেলেটি আসিয়া সেই আম-কাঁঠালের বাগানে ঢুকিল। ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন বুড়া মিয়া সাহেব কোথায় খোকা?

—এই তো বাগানের মধ্যি। বাগানের ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, এটি এঁদের বংশের কবরস্থান। ইন্দ্রনাথ বাগানের ভিতরে ঢুকিয়া দেখেন পাশাপাশি প্রায় পনর-কুড়িটি কবর পর পর রহিয়াছে। সম্ভবতঃ কয়েকদিন পূর্ব্বে কবরের স্থানগুলির উপরের ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক প্রান্তে একটি কবরের পাশে সেরাজুল হোসেনকে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। ইন্দ্রনাথ কাছে যাইতেই সেরাজুল হোসেন দাঁড়াইয়া বলিলেন, আসুন ডাক্তার ভাই! ইন্দ্রনাথ সেরাজুল হোসেনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এ কি আপনার কোন অসুখ করেছে নাকি?

সেরাজুল হোসেন জবাব দিলেন, কই না তো?

—এখানে বসে বসে কি করছেন?

—এটা আমাদের বংশের গোরস্থান। আমার ঠাকুরদার বাবা, তাঁর বাবা এমনি করে পাঁচ পুরুষের কবর আছে সাজানো। এটি আমার বাপজানের কবর। এর পাশের জায়গাটায় যে আমার অধিকার ডাক্তার ভাই! আমার নিজের জায়গা ছেড়ে, আমার পাঁচ পুরুষের কবরস্থান ছেড়ে আমি মাটি পাব কোন গো-ভাগাড়ে বলুন তো?—সেরাজুল হোসেনের গলা ধরিয়া আসিল।—ইন্দ্রনাথ তাঁহার কথার কোন জবাব না দিয়া বলিলেন,—আপনার শরীর সত্যি ভাল নাই ভাই, এমন করে এই ঠা[illegible] বাতাসে ঘুরে বেড়াবেন না। একটু ওষুধ পত্তরের ব্যব[illegible] [illegible]তার। দেখি হাতটা।—বলিয়া ইন্দ্রনাথ

তাঁহার হাত ধরিয়াই বলিয়া উঠিলেন, একি এ যে বেশ জ্বর চলছে। চলুন বাড়ী চলুন বুকটা একবার দেখতে হবে। বলিয়া ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে জোর করিয়া বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

৩

আরও সপ্তাহ খানেক পরে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। সে দিন গভীর রাত্রে মাইলখানেক দূরে একটি গ্রামের পাশে কয়েকবার জাপানী এরোপ্লেন বোমা বর্ষণ করিয়া গেল। নিদ্রিত গ্রামবাসিগণ বজ্রধ্বনিরবে একেবারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। যে ব্যাপার ইহাদের কল্পনারও অগোচর ছিল তাহাই গেল ঘটিয়া। প্রাতঃকালে খবর পাওয়া গেল পাশের গ্রামের কয়েকখানি কুঁড়েঘর জ্বলিয়া গিয়াছে এবং কয়েকজন নিরীহ গ্রামবাসী হতাহত হইয়াছে। কিন্তু জাপানীদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, মিলিটারী কোন লক্ষ্য-বস্তুর উপরেই তাহারা বোমা-বর্ষণ করিতে পারে নাই। সরকারী নোটিশে ও প্রচারে যাহা হয় নাই, এই জাপানী বোমা বর্ষণে তাহাই হইল—প্রত্যহ দলে দলে লোক প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল। পাঁচ-সাত দিনের ভিতরে সমস্ত গ্রাম এক প্রকার জনশূন্য হইয়া উঠিল। মাইল কুড়ি দূরে একটি নদীর ধারে আশ্রমের স্থান মনোনীত হইয়াছে। এই কয়দিন ধরিয়া গরু-মহিষের গাড়ী বোঝাই করিয়া আশ্রমের আসবাবপত্র সেখানেই প্রেরিত হইতেছিল। আশ্রমের তরুণ কর্ম্মীরা মহা উৎসাহে বাঁধাছাঁদা করিতেছিল। ইন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন অনেকখানি নির্লিপ্ত—কোন কাজে কোন প্রকার উৎসাহ পাইতেছিলেন না।

আজ কয়েকখানা গাড়ীতে অবশিষ্ট আসবাবপত্রগুলা বোঝাই করিয়া এইমাত্র নূতন স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া গেল। আশ্রমের কর্ম্মিগণকে গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে বলিয়া ইন্দ্রনাথ উদাস ভাবে একটি পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দায় স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। দৃষ্টি ছিল সুদূর আকাশের নীলিমার দিকে নিবদ্ধ। মনের কোণে একে একে কত কি ভাসিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছিল। দীর্ঘ কুড়িটি বৎসরের একটানা ইতিহাস দীর্ঘ কুড়িটি বৎসরের সাধনার পর এই প্রতিষ্ঠা। এ যেন চারা গাছকে অতি যত্নে লালন-পালন করিয়া ফলবান করিয়া তুলিবার পর তাহার মূলোচ্ছেদ করা। বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করা চলিবে না, তাহা হইলে গন্তব্যস্থানে আজ আর পৌঁছানো সম্ভব হইবে না। ইন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েকবার এদিক ওদিক ঘুরিলেন, সারাটা আশ্রমে আজ এ কি গভীর নীরবতা! পরিত্যক্ত ঘরগুলা খাঁ খাঁ করিতেছে, কোন দিকেই যেন আজ দৃষ্টি ফেরানো যায় না। পর পর কুড়ি-পঁচিশখানা ঘর। ইন্দ্রনাথ বিশ্রামমন্দিরটির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই মাত্র গত বৎসর গৃহখানি শেষ হইয়াছে। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের পছন্দমত তৈরি করিয়াছিলেন ঘরখানা। উঁচু করিয়া পোঁতা বাঁধাইয়াছেন, পুরু করিয়া দেওয়াল দিয়াছেন। ভাল ইঁট, ভাল বালি, আর ভাল সিমেণ্ট যোগাড় করিতে কত বেগই না পাইতে হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ ঘরটির ভিতরে ঢুকিয়া এক বার এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন। [illegible] মিনিট চুপ করিয়া বারান্দার রেলিঙের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন ফুলবাগানের ধারে। সমস্ত আশ্রমের কর্ম্মীরা কত যত্নে গড়িয়া তুলিয়াছে এই বাগান, বাংলাদেশের দূরদূরান্ত হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নার্শারী হইতে কত ফুলের চারা ও কলম আনিয়া বসানো হইয়াছে। ইহার প্রতিটি গাছের সহিত আছে ইন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয়। আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দেখিলেন—মা সূর্য্য তো আকাশে অনেকটা দূর উঠিয়া আসিয়াছে, আর দেরি করা চলিবে না। তাড়াতাড়ি বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন। হঠাৎ শেষপ্রান্তের একটি বেলফুলের গাছের দিকে তাঁহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল। এ কি এই ফাল্গুনের প্রথম দিকেই গাছটায় এবার ফুল ধরিয়াছে! আগাইয়া আসিয়া কয়েকটি শ্যামল পাতার অন্তরাল হইতে আবিষ্কার করিলেন ফুলটিকে। মস্ত বড় ফুল, চমৎকার সুগন্ধ ছাড়িয়াছে। ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশী হইয়া ফুলটি তুলিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু ফুল তোলা হইল না, হঠাৎ তাঁহার হাতখানা থামিয়া গেল। ফুলটি না তুলিয়া সমগ্র ঝাড়টিকেই নিজের বুকের ভিতরে চাপিয়া ধরিলেন, নিজের মাথা ফুলটির কাছে আগাইয়া লইয়া কয়েকবার ঘ্রাণ লইলেন, নাকে-মুখে স্পর্শ লইলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুতবেগে পথ বাহিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিলেন।

সেরাজুল হোসেনের বাড়ীর কাছে আসিয়া থামিলেন। সেই যে সেদিন সেরাজুল হোসেনের সহিত দেখা হইয়াছিল, আর কোন খবর তাঁহার জানেন না। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে যেন সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। ভিতরের দিকের একটি ঘরের বারান্দায় সেরাজুল হোসেনের ছোট ছেলে আহম্মদকে দেখিতে পাইলেন। আহম্মদ মুখ বাড়াইয়া বলিলেন এদিকে আসুন ডাক্তারবাবু। ইন্দ্রনাথ আগাইয়া আসিলে বলিল, বাপজান গত রাত্রে মারা গেছেন।

—মারা গেছেন?

—হ্যাঁ! কিন্তু কই কোন খবর তো আর জানি না, সেই যে দিন—

আহম্মদ বাধা দিয়া বলিল, সেই থেকেই অসুখ। কত বার আপনাকে খবর দিতে যেতে চেয়েছি তিনি কিছুতেই ওষুধ খাবেন না বলে জিদ করেছেন। কাল সকালবেলা বড় ভাই বাড়ীর মেয়েছেলেদের নিয়ে আমার ভগ্নীপতির বাড়ীতে রাখতে গেছেন, এদিকে আজ এই বিভ্রাট।

সেরাজুল হোসেনের দীর্ঘদেহ একখানি পাতলা চাদরে ঢাকা দেওয়া ছিল। ইন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন। বাড়ীর বাহিরে আসিলে সেই আম-বাগানের দিক হইতে কথাবার্ত্তার টুকরা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ বুঝিলেন, সেরাজুল হোসেনের জন্য কবর খোঁড়া হইতেছে। আগাইয়া আসিলে দেখিতে পাইলেন সত্যই সেই দিনের সেরাজুল হোসেনের সেই নির্দ্দেশিত স্থানটিতে কবর খোঁড়া হইতেছে। অবশেষে সেরাজুল হোসেনের শেষ ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। ইন্দ্রনাথ সেখান হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে পথে নামিয়া আসিলেন।

গবেষণার প্রণালী

স্যার যদুনাথ সরকার

কোনো একটি পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে তাহার জন্য একটি বিশেষ প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। আর ঐ কাজের জন্য কারিগরগুলিকে, তাহাদের আবশ্যক বিশেষ গুণগুলি আছে কিনা দেখিয়া লইয়া, তাহাদের ঐ কাজের জন্য আবশ্যক বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া তবে কাজটি আরম্ভ করিতে হইবে। এরূপ গোড়াপত্তন শক্ত করিয়া না বাঁধিলে, কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে না।

মৌলিক গবেষণার উদ্দেশ্য, জগতের এ পর্যন্ত সংগৃহীত জ্ঞানের উপর আরও কিছু নূতন তত্ত্ব যোগ করিয়া দেওয়া, আমাদের পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ যাহা জানিতেন তাহা হইতে আমাদের আরও একটু অগ্রসর করিয়া দেওয়া। যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তেমনি ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে সত্যই বলা হয়, continual supersession is the rule of progress, অর্থাৎ আমাদের কবির ভাষা একটু বদলাইয়া বলি, "ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, শুকনো পাতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার জায়গা নে।"

অতএব আমাদের প্রথম জানা আবশ্যক যে, জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান বা দর্শনের কোনও একটি শাখায়—আজ সভ্যজগৎ কতটা জানিতে পারিয়াছে। এইটি বেশ করিয়া বুঝিয়া, জ্ঞাত তত্ত্বের শেষ সীমানা হইতে জঙ্গল কাটিয়া অজ্ঞাতের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, সত্যের রাজ্য আরও একটু বিস্তৃত করিতে হইবে। এজন্য পরিপূর্ণজ্ঞানযুক্ত পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত আসিয়া আমাদের গবেষণা-পিপাসী ছাত্রকে বলিয়া দিবেন, "ঠিক এইখান থেকে তুমি কাজ আরম্ভ করবে।" মহা ভুল হইবে যদি আমরা সদ্যপালকরা একজন মেধাবী ছাত্রকে একটা বৃত্তি দিয়া, লাইব্রেরির দ্বার খুলিয়া বলিয়া দিই, "যা ভিতরে গিয়ে মনের সুখে চর্ গে। দুবৎসর পরে রিপোর্ট দিস কি পেয়েছিস।" ধর্মসাধনায় যেমন, ঠিক তেমনি জ্ঞানযোগের সাধনার কাজেও সদ্গুরু চাই, নচেৎ সিদ্ধি হইবে না।

বর্তমান জগতে গবেষণার সব ক্ষেত্রে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় এবং যে পরিমাণে আমরা এই পদ্ধতি অবিচলিত ভাবে অক্লান্ত চেষ্টায় অনুসরণ করি, তাহার উপর গবেষকের নিজ আরব্ধ কাজে সফলতা নির্ভর করে, শ্রম পণ্ড হয় না।

বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ত ছাত্র পাইলে তাহাকে আরম্ভ করিবার ঠিক স্থানটি দেখাইয়া দিয়া এবং কোন্ অদৃষ্ট লক্ষ্যে অবশেষে পৌঁছিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া, তাহার জ্ঞানগুরু একটি উপকরণপঞ্জী অর্থাৎ bibliography রচনা করিয়া দিবেন। ইহার আবশ্যকতা দেশে অনেকেই জানেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহার্ঘ চেয়ারে আসীন প্রধান প্রোফেসরও অনেক সময় ইহাতে অবহেলা করেন। হয়ত বলেন, অমুক বড় ইতিহাসের অমুক অধ্যায়ের শেষে যে গ্রন্থপঞ্জী ছাপা আছে তাহা দেখিয়া পড়। এরূপ ভাসা ভাসা উপদেশের মত বিড়ম্বনা আর নাই। আমি অনেক ডক্টরেট থীসিস পরীক্ষা করিবার সময় এই অবহেলার বিষময় ফল দেখিয়া, ব্যর্থ ছাত্রদের দুর্ভাগ্য ভাবিয়া কাঁদিয়াছি।

এইরূপ উপাদানপঞ্জী রচনা করিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক ক্ষুদ্র শাখায় এক এক জন বিশেষজ্ঞ গুরু আবশ্যক, এক জন সার্বভৌম পণ্ডিত জ্ঞানের সব ক্ষেত্রকে সমান সফলতার সহিত আয়ত্ত করিতে পারেন না। শুধু এখানকার গবেষণামন্দিরে নহে, মহাধনী প্রদেশবিস্তৃত বিশ্ববিদ্যালয়েও সব বিষয়ে, অথবা একটিমাত্র বিষয়েরও সব শাখায়, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই, ক্ষতি নাই। মধু অন্বেষণে ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যায়, তেমনি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এক গুরু হইতে অন্য গুরুর নিকট যাইবে। ছাত্রটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের খোঁজে লাহোর, পুনা বা লক্ষ্ণৌ যাইবে, এবং তথা হইতে উপদেশ ও উপাদানপঞ্জী আনিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া শান্ত মনে নিজ কাজ করিবে, যাহা লাহোর, পুনা বা লক্ষ্ণৌয়ে তাহার পক্ষে তত সহজ নহে। জ্ঞানের বড় বড় সব ক্ষেত্রে গবেষণার পথপ্রদর্শক এখানে নাই বলিয়া গবেষণার কাজ ঠেকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ প্রাথমিক শিক্ষায় তৈয়ারি হইয়া অন্যত্র ভ্রমণ করিবে, যেমন মধ্যযুগে এবং এখনও ইউরোপের গ্রাজুয়েটগণ বিদেশে পণ্ডিতদের চরণে বসিয়া জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিত ও করে।

আমরা দেখিলাম যে প্রথমে চাই ছাত্র ও বিষয়নির্বাচন, তারপর চাই গুরু বা বিশেষজ্ঞ পথপ্রদর্শক; তৃতীয় আবশ্যক উপকরণসংগ্রহ।

গবেষণার ক্ষেত্র বাছিয়া লইবার পর দেখিতে হইবে যে তাহার জন্য আবশ্যক গ্রন্থ-উপকরণ এখানে আছে কি না। না থাকিলে সেই বিষয়টি নির্বাচন করা অতি হাস্যকর বিড়ম্বনা হইবে। ধরুন ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস সমাজ ধর্ম শিল্প-বাণিজ্য কলা এগুলির বিষয়ে গবেষণা করিবার সংকল্প হইল। তখন ঐ ঐ বিষয়ে অত্যাবশ্যক প্রামাণিক গ্রন্থ, অভিধান, ম্যাপ, হস্তলিপি, মুদ্রা ও শিল্পদ্রব্যের ছবি, এ সবগুলিতে এখানকার লাইব্রেরি পূরণ করিতে হইবে। যাহা এখানে আছে তাহার তালিকা পড়িয়া এক এক বিশেষজ্ঞ তাঁহার নিজ গবেষণার বিষয়ের জন্য যে যে বই বা হস্তলিপির কপি আবশ্যক তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন, এবং সেগুলি এখানকার জন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, এক বৎসরে না হউক পাঁচ ছয় বৎসরে। ম্যাপ, মুদ্রার তালিকা, প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনগুলির ছবি—এ সব আবশ্যক, এগুলিকে মূল্যবান ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, কাজ হইবে না। প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান ও এনসাইক্লোপীডিয়ার নূতন সংস্করণ আনানো আবশ্যক।*

---

* শান্তি[illegible]র আশ্রমিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী-চরিত্র

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

ন্যায়-অন্যায়ের বোধ সকল দেশে, সকল কালে সভ্য মানুষের মজ্জাগত। অসভ্য সমাজে চিন্তাধারা সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ, সেখানে তাই এই ভালকে মন্দ থেকে পৃথক করে দেখবার ক্ষমতা,—এই বিবেক-বুদ্ধি বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। সভ্য সমাজেও দেখা গেছে মানুষের যুক্তির উৎসমুখ যখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হয় ধর্ম্মের নামে, নয় সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক অনুশাসনে, হয় ক্ষমতা লোলুপ প্রমত্ততায়, নয় ভোগ-বিলাসজনিত অবনতিতে, তখন অসভ্যদের মতই চিন্তার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে, বিচারের স্থান অধিকার করেছে আচার।

মানুষ জন্ম হতেই কতকগুলি সংস্কার নিয়ে বেড়ে ওঠে। এগুলি বহুলোকের বহুদিনের অভিজ্ঞতা হতে সঞ্চিত। এর মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে। সুসংস্কারও আছে, কুসংস্কারও আছে। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্র মানুষকে সব জায়গায়তেই বাড়াতে হবে তা সে ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই হোক, অনুশাসনই হোক আর সংস্কারই হোক। যুক্তি দিয়ে, বোধ দিয়ে প্রত্যেক ব্যবস্থা, প্রত্যেক সংস্কারকে পরখ করে দেখতে হবে যা রক্ষণীয় তাকে রাখতে হবে, যেটা বর্জনীয় তাকে ছাড়বার সৎসাহস যেন থাকে। ধীশক্তি দিয়ে এই যে বিশ্লেষণ এই হ'ল প্রাণের পরিচয়, প্রাণের প্রমাণ। যেখানে ধীশক্তি অনগ্রসর, বিশ্লেষণ রুদ্ধ, সেখানেই মৃত্যুভীতি, সেখানেই জড়ত্ব।

কিন্তু পুরানো ব্যবস্থার প্রতি মানুষের এমন একটা প্রবল আকর্ষণ আছে যে তা মন্দ বুঝেও ছাড়তে কষ্ট হয়। অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মনে জড়ত্বের সঞ্চার হয়, তাই সে দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে সেই জড়ত্বকে চূর্ণ করতে এই কষ্ট। সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে তাই তো উঠেছিল প্রবল আন্দোলন, চীনারা একদিন আফিং ছাড়তে ভীষণ হৈচৈ করেছিল। আজ আমাদের দেশে জাতিভেদের কঠোরতা প্রায় বিলুপ্ত হলেও সামান্য যেটুকু আছে তাকে ছেড়েও ছাড়তে পারছি না। জাতীয় মঙ্গল ব্যাহত হচ্ছে, জাতীয় ঐক্যে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, তবু চৈতন্য নেই। পুরানো অন্যায়ের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এ হ'ল এক রকমের মোহান্ধতা। বিষয়ী লোকের বিষয়াসক্তির মতই এও মানুষের বন্ধনের কারণ হয়, মুক্তিকে দূরে ঠেলে রাখে।

মনু একদা যে সব বিধান দিয়েছিলেন তখনকার কালে হয়ত সে সবের দরকার ছিল। সে সব বিধানের কতকগুলির প্রয়োজন আজও যে শেষ হয়ে যায় নি তাও স্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে যে বিধান আজ যুক্তিতে টেঁকে না, যা অন্যায় তাকেও অবনত শিরে মানতে হবে, এ মনোভাব দাসমনোবৃত্তিরই সামিল।

এমনি এক বিধান হচ্ছে নারীর সম্বন্ধে, যে নারী চেষ্টাসত্ত্বেও তার স্বামীকে ভালবাসতে পারে নি। এ নারীর কি কঠোর দণ্ডবিধান মনু করেছেন তা আমরা জানি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী এ নারীর কি বিচার করেছেন সেটা দেখা যাক। শৈবলিনীর বিচার বঙ্কিমচন্দ্র কি নিজে দিয়েছেন, না মনুকে বিচারাসন ছেড়ে [illegible] দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন?

শৈশব হতে শৈবলিনী প্রতাপকেই ভালবাসত। প্রতাপের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল না, সে তার দোষ নয়। বিয়ে হ'ল সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং বয়সে অনেক বড় চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। শৈবলিনী বিশেষ একটা অছিলায় লরেন্স ফষ্টারের সঙ্গে পালিয়েছিল, সুযোগ পেয়েও ফিরে আসে নি, সে কেবল প্রতাপকে পাবারই আশায়। লরেন্স ফষ্টারকে সে যে চোখেই দেখুক, ভালবাসার চোখে নয়। প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যেই সে মিথ্যা করে মীরকাশিমকে জানিয়েছিল যে সে প্রতাপের স্ত্রী। প্রতাপের সঙ্গে যখন তার দেখা হ'ল, সে সত্য গোপন করে নি, বলেছিল প্রতাপকেই ভালবাসে। প্রতাপ তাকে পরিত্যাগ করলেন, কারণ সে পরস্ত্রী। প্রতাপ তাকে স্বামী-অনুরাগিণী হবার উপদেশ দিলেন, শৈবলিনী সে উপদেশ পালন করতে প্রতিজ্ঞা করল, কিন্তু পারল না। এই সব হ'ল শৈবলিনীর অপরাধ, তার বিরুদ্ধে এই নালিশ। এই অপরাধের জন্যে, এবং এ অপরাধ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তাকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে সে কি ঠিক হয়েছে?

কেউ যেন না মনে করেন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি কিছুমাত্র কম। বঙ্কিমের ঋণ আমরা কোন দিনই শোধ করতে পারব না। স্ব-জাতির মুক্তি-মন্ত্রদাতা তিনি, সাহিত্যক্ষেত্রে ভগীরথের মত সাধনা করেছিলেন তিনিই, তাই ত রবীন্দ্রযুগ সম্ভব হয়েছে, তাই তো বঙ্গভাষায় ভাবমন্দাকিনীর এমন সুবিপুল সমারোহ। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভক্তিভাজনের প্রতি যতরকম উৎপীড়ন আছে, অহৈতুকী ভক্তিই তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎপীড়ন।

একই দোষ যদি পুরুষ ও নারী দুজনেই করে তা হলে উভয়েই সমান দোষী এবং সমান শাস্তির যোগ্য, এ কথা আজ সর্ব্বদেশে স্বীকৃত। আমাদের দেশের 'পীনাল কোডে'র ভাষায় 'he' বলতে 'he' ও 'she' দুই-ই বোঝায়, তবু সচরাচর দেখতে পাই সমান অপরাধে অপরাধী হলেও পুরুষের চেয়ে নারীই কম দণ্ড পায়। তার কারণ বিচারক পুরুষ, নারীর প্রতি গুরুদণ্ড বিধান করতে এই যে তাঁর বাধে, এ তাঁর ভদ্রমনের পরিচয়। কিন্তু পুরুষবিচারকের হাতে এর উল্টোটা ঘটতে দেখলে কি মনে হয়? যদি দেখি পুরুষ ও নারী একই দোষ করেছে, কিন্তু বিচারক পুরুষকে দিলেন সম্মান আর বিধান করলেন নারীর জন্য প্রচণ্ডতম শাস্তি, তা হলে কি মনে হয়?

প্রতাপ আর শৈবলিনী, দুজনে দুজনকে ভালবাসতেন। ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তা হলে দুজনেই সমান অপরাধী। প্রতাপ যে শৈবলিনীকে ভালবাসতেন, রূপসী যে নামে মাত্র তাঁর স্ত্রী ছিলেন, তাঁর প্রেমের সিংহাসনে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল সে মূর্ত্তি যে শৈবলিনীর, এ কথা প্রতাপের মৃত্যুকালের উক্তি থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু পরস্ত্রীকে মনে মনে ভালবাসার অপরাধে প্রতাপকে তো কোন শাস্তি পেতে হ'ল না। পরপুরুষকে মনে মনে ভালবাসার জন্যে শৈবলিনীর দণ্ড হ'ল জীবন্ত নরকভোগ। এ কি রকম বিচার?

চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহে শৈবলিনীর কোন হাত ছিল না। চন্দ্রশেখর ছেলেমানুষ নন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যে অবস্থায় তিনি প্রতাপ ও শৈবলিনীকে গঙ্গায় ভেসে যেতে দেখেছিলেন, তাতে কি একবারও তাঁর মনে হয় নি তাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা থাকতে পারে? একটু অনুসন্ধানও তো করতে পারতেন। বিবাহে কন্যার সম্মতি তখনকার সমাজে সম্পূর্ণ অবান্তর ব্যাপার, কেমনা, মেয়েরা তো বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে হয়। তবু সুপণ্ডিত চন্দ্রশেখর সকল অবস্থা দেখে একটু অবহিত হতে পারতেন না কি? তা তিনি হন নি। গ্রন্থকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন, চন্দ্রশেখর তখন রূপমুগ্ধ। তাঁর হ'ল মোহ, আর শাস্তি হ'ল শৈবলিনীর, এটা কি ঠিক?

প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী, দ্বিতীয় বার গঙ্গাবক্ষে তিনি শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে স্বামী-অনুরাগিণী হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এতে প্রতাপের মহত্ত্ব সুপরিস্ফুট, কিন্তু ইন্দ্রিয়জয় কি প্রতাপ একাই করেছিলেন? শৈবলিনী কি করেন নি? এক জন করেছিলেন স্বেচ্ছায়, কর্ত্তব্যবোধে, আর এক জন হয়ত কতকটা অনিচ্ছায়, কতকটা আদেশ-উপদেশে। কিন্তু শাস্তি পেতে হ'ল শুধু শৈবলিনীকে। সে কি যেমন-তেমন শাস্তি! তার ফলে সে পাগল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতাপ যে রূপসীকে ভালবাসতে পারেন নি, মনে মনে চিরদিন তিনি যে শৈবলিনীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কই তার জন্যে কোনও যমদূত, কোন নরকের দূত ত তাঁকে তাড়না করলে না? এই কি সুবিচার? একে মনুর বিচার বলুন, কিছু বলবার নেই। কিন্তু এই কি মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার? যিনি দেবীচৌধুরাণীর মধ্যে দেবতার প্রতিচ্ছায়া দেখে যুক্তকরে স্তব করেছিলেন "যদা যদাহি ধর্মস্য" ইত্যাদি, এ বিচার কি তাঁর?

কেউ হয়ত বলবেন, কেন প্রতাপ ত জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন, তবে আর তাঁর দণ্ড কম হ'ল কিসে? বঙ্কিম কিন্তু প্রতাপের মৃত্যুকে প্রায়শ্চিত্ত বলেন নি, বলেছেন এ বীরের মৃত্যু, প্রত্যেক বীরের একান্ত প্রার্থিত এ মৃত্যু।

আবার কেউ কেউ হয়ত বলবেন দাম্পত্য প্রেমের অভাব স্ত্রীলোকের পক্ষে যত বড় অপরাধ, পুরুষের পক্ষে তত বড় নয়; এবং সকল অবস্থাতেই পতি পরম গুরু, অতএব শৈবলিনীর প্রপীড়িত বিবেক অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে এই নরক-বিভীষিকা, এই মস্তিষ্কবিকৃতি সৃষ্টি করেছিল এবং এ তারই আত্মোন্নতির জন্যে। এর উত্তরে প্রথমে বলি, দাম্পত্য প্রেমের অভাব স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান অপরাধ, তার মধ্যে তারতম্য করাটা গায়ের জোরে, এতে যুক্তি নেই। আর আত্মোন্নতি? স্বামীকে যখন ভালবাসতে পারল না তখন তার অনুতপ্ত বিবেক (অথবা গ্রন্থকারের বিধান) তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করল, এটা কেমনতর আত্মোন্নতি? এ যদি খুব ভাল আত্মোন্নতির ব্যবস্থা হয়, তবে পুরুষের বেলা এ ব্যবস্থা নেই কেন? এই আত্মোন্নতির ফলে শৈবলিনী কোনদিন কি স্বামীকে ঠিক তেমনি করে ভালবাসতে পেরেছিল, যেমন ভাল সে প্রতাপকে বাসত? তা ত মনে হয় না। মনের ওপর জুলুম করলে ভালবাসা মন থেকে সরে গিয়ে অবচেতন মনের ভিতর লুকিয়ে যায়। এ ত রোগ সারানো হ'ল না, রোগ লুকানো হ'ল। আর কেউ না বুঝুক, চেষ্টা করলে চন্দ্রশেখর নিজেই বুঝতে পারতেন, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তোত্তর স্বামীপ্রেম অনেকখানিই ছলনা,—তার নিজের অজ্ঞাতসারে ছলনা। মনু যাই বলুন, ভালবাসার ওপর জুলুম চলে না, জবরদস্তি করে প্রেম হয় না।

কেউ কেউ হয়ত আঁতকে উঠে ভাববেন, তা বলে শাসন থাকবে না? শাসন না থাকলে যে ঘর ভেঙে যাবে! তাঁরা কি জানেন না, ভালবাসার অভাবেই ঘর ভাঙে, জুলুম-জবরদস্তির অভাবে ভাঙে না। যেখানে সত্যিকারের ভালবাসা নেই, সেখানে জোর খাটিয়ে ভালবাসা আদায় করতে যাওয়া মূর্খতা। জুলুম করে আর-যা-কিছু কেড়ে নিতে পার, কিন্তু অন্তরের ভালবাসা আদায় করতে পার না। নরকাগ্নিতে ঝলসে মারা, ডাণ্ডসের পিটুনি, এ সবই ত জুলুম।

ছোট একটা তুলনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক যদি না থাকে, রাষ্ট্র তা হলে ভঙ্গুর। জোর করে শ্রদ্ধা জাগাবার চেষ্টা ইতিহাসে প্রতিবারই ব্যর্থ হতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রে যা সত্য, গৃহেও তাই, কেমনা, রাষ্ট্র যে বৃহত্তর গৃহ। স্থূল হস্তে সকল কিছু পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার পক্ষপাতী যারা তাদের কথা ধর্তব্য নহে, কিন্তু এ সূক্ষ্ম অনুভূতি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর রচনায় পেলুম না, এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই।

ভালবাসা অন্যায় নয়, সংযমহীনতাই অন্যায়, গ্রন্থকার একথা প্রতাপের চরিত্রেই বুঝিয়েছেন। তা হলে শৈবলিনীকে তিনি অন্য পথে নিয়ে যেতে কি পারতেন না? যে পথে নিয়ে গেছেন সেই কি তার একটি মাত্র মুক্তি-পথ? যথেষ্ট সংশয় আছে তাতে।

নরনারীর ভালবাসা যখন দেহকে অতিক্রম করে অন্তর-লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হতে তাতে আর গ্লানি নেই, ক্লেদ নেই, তখন থেকে সে অমৃতের বার্ত্তা বহন করে। প্রেমাস্পদের প্রতি এই কামনা-বিহীন নিষ্কলুষ প্রেম ক্রমে আপনার পথ দেখতে পায়, সকল প্রেমের আধার যিনি তাঁরই দিকে সঞ্চারিত হতে থাকে। ক্ষুদ্র একটি বাতির গায়ে গা লাগিয়েই তো প্রথম আগুন জ্বালাতে হয়। তারপর যতই সে ঐ ক্ষুদ্র বাতিটিকে অতিক্রম করে, ততই আপন শক্তিতে আপন তেজে আকাশের দিকে তার সহস্র শিখায় সমুজ্জ্বল অঞ্জলি তুলে ধরে। শৈবলিনীর প্রেমকে প্রতাপের চিতায় অগ্নিস্নাত পবিত্র করে সকল প্রেমের উৎস যিনি তাঁরই মধ্যে কি অপরূপ রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই সুযোগ হারিয়েছেন। যা চিরকালের হতে পারত, তাকে মান্ধাতার আমলের আদর্শে বিচার করে বসে আছেন।

রাসায়নিক নাগার্জুন

শ্রীদিলীপকুমার মালাকার

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান নূতন নূতন উদ্ভাবন দ্বারা মনুষ্য-সমাজকে বিস্ময়িত করিয়া দিতেছে। এক দেশ হইতে আর এক দেশে বিমান হইতে বোমা বর্ষণ এবং আণবিক বোমার আবিষ্কার ইত্যাদি মানুষকে দিন দিন আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে। সাধারণ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা তাহা হইতেও বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাকে বলে "আলকেমি"। প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই 'আলকেমি' বিষয়ক চর্চায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ইহার ফলে রসায়ন-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বর্তমান যুগেও রসায়ন-শাস্ত্রের যে এতখানি উন্নতি হইয়াছে তাহাও পূর্বেকার ভারতীয় রাসায়নিকদের এ সম্বন্ধে চর্চার ফলে সম্ভব হইয়াছে। রাসায়নিক নাগার্জুন উক্ত আলকেমির প্রধান আবিষ্কর্তা। তিনি যে শুধু আলকেমি বিদ্যার চর্চায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ধাতুর জারণ, মারণ এবং তির্যক পাতন প্রক্রিয়ায়ও পারদর্শী ছিলেন।১ ইহা ব্যতীত শরীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পারদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও অবগত ছিলেন। নাগার্জুনকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে।২ আমরা ইতিহাসে একাধিক নাগার্জুনের উল্লেখ দেখিতে পাই। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন এবং রাসায়নিক নাগার্জুন একই ব্যক্তি নহেন এবং সন তারিখেরও মিল নাই। দার্শনিক নাগার্জুন বর্তমান ছিলেন কণিষ্কের সময়।৩

বিখ্যাত ঐতিহাসিক কহ্লন লিখিয়াছেন, নাগার্জুন ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ লাভের দেড় শত বৎসর পর বর্তমান ছিলেন এবং তাঁহার সময় বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। তিনি ষড়-হৃদবনে বাস করিতেন।৪,৫ যাহা হউক ইনিই বৌদ্ধ মহা-যানবাদী। ইনি বোধিসত্ত্ব লাভ করেন।৬ ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার গুরুর নাম রাহুল ভদ্র এবং শিষ্যের নাম আর্য্যদেব।৭ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, নাগার্জুন খ্রীষ্ট জন্মের ৩৩ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।৮ নাগার্জুনের লিখিত পুস্তকগুলি (ক) মাধ্যমিক সূত্র, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগের নাম 'সম্পৃতি সত্য' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম পরমার্থ সত্য।' 'সম্পৃতি সত্যে' মায়ার ব্যাখ্যা এবং পরমার্থ সত্যে আছে সমাধি বা চিন্তা। (খ) মাধ্যমিক কারিকা।৯ (গ) ধর্মসংগ্রহ।১০ (ঘ) শত সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।১১ (ঙ) সুহৃল্লেখ।১২ (চ) প্রজ্ঞা-মূলক শাস্ত্রটিকা।১৩ (ছ) বিবাদ সমন (?) শাস্ত্র।১৪ (জ) বিগ্রহব্যাবর্তনী।১৫ (ঝ) মহাযান বিংশক।১৬ (ঞ) সুহৃল্লেখ। এই গ্রন্থে রাজা সাতবাহনকে প্রদত্ত তাঁহার সদুপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি এখন তিব্বতী অনু-বাদে তিব্বতে সংরক্ষিত আছে।১৭ (ট) মূলজ্ঞান।১৮ (ঠ) ধর্মধাতুস্তোত্র।১৯ (ড) সূত্রসংগ্রহ।২০ বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জুনের একখানি জীবনচরিত পাওয়া যায়। তা[illegible] অনুবাদ[illegible] করিয়াছেন কুমারজীব। ইহা চীনা ভাষায় লিখিত।[illegible] পুস্তকে নাগার্জুনের জীবনী পাওয়া যায়।২২ যাহা হউক, পূর্বে যে সকল গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্ভবত সবগুলিই মহাযান দার্শনিক নাগার্জুন লিখিত। অবশেষে আরও একটি পুস্তকের নাম পাওয়া যায় তাহা সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত 'শে রব্ ডং বু' (সংস্কৃত নাম প্রজ্ঞাদণ্ড)। এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন তিনি একজন সমাজতাত্ত্বিক এবং নীতিশাস্ত্র-বিদ্। এই তিব্বতী পুস্তকটি সম্পাদনা করিয়াছেন W. L. Campbell। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন নাগার্জুন বর্তমান ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ শতকে।২৩ যাহা হউক, এই নাগার্জুন সম্ভবতঃ পূর্বোল্লিখিত নাগার্জুন হইতে ভিন্ন। তাঁহার পুস্তকের প্রথম কথাগুলি :—

দুষ্টলোকদের আয়ত্তে আনিবে।
জ্ঞানীরা বোধিসত্ত্ব লাভ করিবে।
তোমার ধনভাণ্ডার মহৎকার্য্য দ্বারা পূর্ণ কর।
এবং নিজের দেশবাসীকে রক্ষা কর।

ইনিও ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। আরও এক জন নাগার্জুনের নাম পাওয়া যায় তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি নালন্দা বিহারের অনেক উন্নতিসাধন করেন।২৪ Tson khapa (lo-ssan—Tagpa) ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে মঞ্জুশ্রী তাঁহাকে উপদেশ দেন—"যাও ভারতবর্ষে যাও, সেখানে যাইয়া নাগার্জুন, অতীশ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস।"২৫ ইনি বৌদ্ধ ছিলেন। বিক্রমশিলা বিহারের প্রধান প্রবেশ পথের দুই দিকে প্রাচীর-গাত্রে নাগার্জুন এবং অতীশ দীপঙ্করের মূর্তি খোদিত ছিল।২৬ এই নাগার্জুনই চর্যাপদ রচয়িতা।২৭ তিনি একটি চর্যাপদ রচনা করেন নাগার্জুন গীতিকা।২৮ বিধুশেখর শাস্ত্রী সপ্তম শতাব্দীর এক জন নাগার্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন।২৯ বোধ হয় ইনি পূর্বোক্ত নাগার্জুন। বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা রাসায়নিক নাগার্জুনকে লইয়া। রাসায়নিক নাগার্জুন দার্শনিক এবং অন্যান্য নাগার্জুন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি এবং তাহাদের মধ্যে সন তারিখেরও অনেক পার্থক্য আছে।৩০

নাগার্জুন ছিলেন নাগ বংশের এবং সম্ভবতঃ শিশুনাগ বংশের। নাগ-অর্জুন, আসল নাম অর্জুন এবং জাতিতে নাগ। শেষ পর্য্যন্ত নাগার্জুন নাম উপাধিতে দাঁড়ায়। তাই অনেক নাগার্জুনের নাম পাওয়া যায়।

রাসায়নিক নাগার্জুন ছিলেন একজন। ভৌতিক শাস্ত্রবিদ্, তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ ও লৌহশাস্ত্রবিদ্ নাগার্জুনের নাম পাওয়া যায়। এতগুলি নাগার্জুন একই সময় বিদ্যমান ছিলেন। এক এক ঐতিহাসিক এক এক নাগার্জুনের অবস্থিতি-কাল নির্ণয় করিয়াছেন। রাসায়নিক নাগার্জুন বর্তমান ছিলেন খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে। তাঁহার রচনা এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তিনি ছিলেন রাজা শালিবাহনের বন্ধু।৩১ হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট বলেন শালিবাহনের সহিত নাগার্জুনের

বন্ধুত্ব ছিল। সাতবাহন রাজবংশের অপর এক নাম ছিল শালিবাহন।৩২ সাতবাহন রাজবংশ সুরু হয় ২৫৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে এবং শেষ হয় সম্ভবতঃ ২২৫ অথবা ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে।৩৩ নাগার্জুন সম্ভবত সাতবাহন রাজবংশের শেষ রাজার বন্ধু ছিলেন। মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলায় নাগার্জুনি কোণ্ডার (অর্থ নাগার্জুনের স্থান) পাহাড়ের গায়ে যে সমস্ত শিলালেখ পাওয়া যায় তাহা তৃতীয় শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।৩৪ কোগল বলেন নাগার্জুনি কোণ্ডার পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীপর্বত। তিব্বতীয় উপাখ্যানে পাওয়া যায় নাগার্জুন শেষ বয়সে এখানে অবস্থান করিতেন। এই সময়েই পর্ব্বতগাত্রে নানা প্রকার ভাস্কর্য্য ও ক্ষোদিত লিপি পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া মনে হয় যে ইহা তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের।৩৫ পর্য্যটক য়ুয়ান চুয়াং-এর বিবৃতিতে পাওয়া যায় যে, নাগার্জুন এক পর্বতকে আলকেমি বিদ্যার প্রভাবে স্বর্ণে পরিণত করিয়াছিলেন।৩৬ সম্ভবত সেই পর্ব্বতটি নাগার্জুনি কোণ্ডা। তাহা ছাড়া য়ুয়ান চুয়াং লিখিয়াছেন যে, নাগার্জুন ১০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ৫২৯ বৎসরেরও বেশী বাঁচিয়াছিলেন।৩৭ অনেকে বলেন তিনি আগে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।৩৮ কিন্তু তিনি যে প্রথমেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হন তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে এবং তাহার বাসস্থান ছিল বিদর্ভ (বেরার) নগরে।৩৯ কথা-সরিৎসাগরে নাগার্জুন সম্বন্ধে ইহা বিবৃত আছে :—

চিরায়ু নামে এক প্রাচীন নগরে, চিরায়ু নামে এক রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার আয়ু ছিল দীর্ঘ। তাঁহার মন্ত্রীর নাম নাগার্জুন। তিনি ছিলেন রাসায়নিক। নাগার্জুন রাজা চিরায়ুকে একরকম রাসায়নিক পদার্থ সেবন করাইয়াছিলেন, যাহাতে রাজা দীর্ঘজীবী হইতে পারিয়াছিলেন। নাগার্জুনের জন্ম হয় বোধিসত্ত্বের অংশে। এক দিন তাঁহার ছোট ছেলে, যে তাঁহার সব সন্তানদের মধ্যে বাঁচিয়াছিল, বায়না ধরিল যে তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে যাহাতে সে অমরত্ব লাভ করিতে পারে। স্বর্গ হইতে যখন ঔষধ আসিতেছিল তখন ইন্দ্র ভাবিলেন যে ইহা কি লইয়া যাইতেছে, তাই দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন, "যাও নাগার্জুনকে আমার বার্তা দাও, তুমি সাধারণ মন্ত্রী হইয়া এক বিপ্লব বাধাইয়া তুলিতেছ দেখিতেছি? তুমি সৃষ্টিকর্ত্তাকে জয় করিতে চাও নাকি? 'জল প্রাণ' অথবা 'সিন্দু রসায়ন' দিয়া কি তুমি বিপ্লব বাধাইতে চাও? যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত লোককেই অমর করিয়া দাও তবে দেবতা আর মানুষে কি প্রভেদ থাকিবে? তাহা হইলে মানুষ দেবতাদের নিকট আত্মবিসর্জন দিবে না; মানিবে না। তবে আমার উপদেশমত 'জলপ্রাণ' তৈয়ারি বন্ধ কর, না হইলে তোমাকে বধ করা হইবে। তুমি তোমার পুত্রের জন্য যে ঔষধ তৈয়ারি করিয়াছ তাহা এখন স্বর্গে।" এই বলিয়া ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পাঠাইয়া দিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া নাগার্জুনকে বার্ত্তা দিলে নাগার্জুন মনে মনে ভাবিলেন, "যদি তিনি ইন্দ্রের কথা না শোনেন তবে তাঁহাকে বধ করা হইবে। সুতরাং 'জলপ্রাণ' অথবা 'সিন্দু রসায়ন' তৈয়ারি বন্ধ করা যাক।" নাগার্জুন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন, "আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে মান্য করি। সুতরাং আমি আমার 'জল-প্রাণ' তৈয়ারি করা বন্ধ করিলাম। আপনারা যদি না আসিতেন তবে পাঁচ দিনের মধ্যে 'জলপ্রাণ' তৈয়ারি করিয়া জগতের মানুষদের অমর করিয়া দিতাম।" ইহার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গে যাইয়া এই সুসংবাদ দিলে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এ সময় সম্রাট চিরায়ু রাজপুত্র জিবহরকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করেন। রাজপুত্র জিবহর যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হইবার পর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার মাতার নিকট গমন করেন। তাহার মাতা রাণী ধনপরা বলিলেন, "হে! জিবহর তুমি বিনা কারণে কেন এত উৎফুল্ল হইতেছ? তুমি মনে ভাবিও না যে, তুমি ভবিষ্যতে রাজা হইবে। কারণ রাজা অমর। বৃদ্ধ মন্ত্রী নাগার্জুন রাজাকে তাঁহার উদ্ভাবিত রাসায়নিক পদার্থ সেবন করাইয়া অমরত্ব লাভ করাইয়া দিয়াছে। রাজা আট শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিতেছেন। এই আট শত বৎসরের মধ্যে কত যে রাজপুত্র আসিল ও মরিল তাহার হিসাব নাই। তাহার মধ্যে কেহই সিংহাসন পায় নাই। আরও কত শত বৎসর বাঁচিবে তাহা কে জানে।" তখন রাণী জিবহরকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, "যদি তুমি সিংহাসন লাভ করিতে চাও তো আমার কথা শুন। আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী নাগার্জুন প্রতিদিন পূজা শেষ করিয়া আহারের পূর্ব্বে দান করিবার সময় বলেন, "এখানে কি কোন প্রার্থী আছে? কে কোন্ জিনিষ চাও? কাহার কি জিনিষ দরকার?" ঠিক সেই সময় তুমি সেখানে যাইয়া বলিবে, 'আমি আপনার মাথাটি চাই', সে অত্যন্ত সত্যবাদী ও ধার্মিক সুতরাং যে যাহা চায় সে তাহাই পায়। সে তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিবে এবং তোমাকে তাহার মাথাটি দিবে। ইহা দেখিয়া এবং শুনিয়া রাজা তাহার বন্ধুর মৃত্যুতে দুঃখে হয় মারা যাইবে না হয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইবে। তখন তুমি সিংহাসনে বসিতে পারিবে।" জিবহর তাহার মাতার নিকট এ সব শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং মাতার কথামত তার পর দিন মন্ত্রী নাগার্জুনের বাড়ীতে গেল। মন্ত্রী নাগার্জুন আহারের পূর্ব্বে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কার কি প্রয়োজন জানাও।" ঠিক সেই সময় রাজপুত্র তাঁর বাড়ীতে ঢুকিয়া তাঁহার মাথাটি প্রার্থনা করিল। নাগার্জুন বলিলেন, "হে প্রিয় সন্তান, আমার মাথা দিয়া তোমার কি প্রয়োজন বল। এ ত শুধু মাংস, রক্ত এবং চুলে ভর্ত্তি। যদি তোমার কোন কাজে লাগে তবে কেটে নিয়ে যেতে পার।" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার ঘাড় বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু রাসায়নিক ঔষধের গুণে তাহার ঘাড় এত শক্ত ছিল যে রাজকুমার কিছুতেই তাহা কাটিতে পারিল না। অনেক তরোয়াল ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ঘাড় কাটিল না। ঠিক সেই সময় রাজা এই সব ব্যাপার জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নাগার্জুনের ঘরে ঢুকিয়া মন্ত্রীর মাথা কাটিতে রাজকুমারকে বারণ করিলেন। কিন্তু নাগার্জুন তাহাকে বলিলেন, 'আমার পূর্ব্বজন্মের কথা এখন স্মরণ হইতেছে। আমি আমার মাথা নিরানব্বই বার দিয়াছি। এইবার লইয়া এক শ বার পূরণ হইবে [illegible] কিছু বলিবেন না। আমি আপনার

আমার কোন প্রার্থীকে ফিরাইয়া দেই নাই। সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হউক।" এই বলিয়া সে রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার রসায়নাগার হইতে এক প্রকার ঔষধের গুঁড়া লইয়া তরোয়ালে মাখাইয়া দিলেন। এইবার রাজকুমার আসিয়া এক কোপে নাগার্জুনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন যেমন করিয়া পদ্ম ফুল কাটা হয়। তখন রাজা ভীষণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং তার নিজের জীবন দিতে চাহিলেন। ঠিক সেই সময় স্বর্গ হইতে বাণী আসিতে লাগিল, "ওহে সম্রাট্ এমন কাজ করিও না। তোমার বন্ধু নাগার্জুন এজন্য দুঃখ করে না। সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না। সে এইবার বুদ্ধের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া রাজা চিরায়ু আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। বনে যাইয়া রাজা আধ্যাত্মিক চর্চা করিতে লাগিলেন। যুবরাজ জিবহর সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু নাগার্জুনের পুত্রেরা জিবহরকে হত্যা করিয়া তাহাদের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। রাণী ধনপরা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা চিরায়ুর আর এক পত্নীর সন্তান ছিল নাম তার শতায়ু। সে তারপর সিংহাসনে বসিল।৪০

পর্য্যটক উয়ান-চুয়াঙের লেখা হইতে নাগার্জুন সম্বন্ধে কিছু জানা যায়: "... নাগার্জুন বিদর্ভবাসী (কোশল) ছিলেন।৪১ সেখানকার রাজা ইয়েনচেঙ (অথবা সাতবাহন) ছিলেন শতায়ু এবং রাজার আয়ু বর্দ্ধিত হইয়াছিল রাসায়নিক নাগার্জুনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। সেই রাজার পুত্র রাজসিংহাসন পাইবার অভিলাষে তাহার মাতার নিকট রাজার জীবনের গোপন রহস্য জানিল। ইহা জানিয়া রাজপুত্র নাগার্জুনের অথবা পুউসের নিকট গেল নাগার্জুনের প্রাণ লইতে। নাগার্জুন শুষ্ক ঘাসের তলোয়ার দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর রাজারও মৃত্যু হইলে রাজপুত্র সিংহাসনে বসেন। রাজা ইয়েনচেঙ তাঁহার রাজ্যে নানা পাথর কাটিয়া সুন্দর পথ এবং বাসস্থান তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। নাগার্জুন এই সমস্ত পাহাড় আলকেমি বিদ্যার দ্বারা স্বর্ণে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি যে সব পাহাড় সোনায় পরিণত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আলকেমিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আলকেমিবিদ্, পদার্থবিদ্, ভৌতিক বিদ্যার পারদর্শী এবং তিনি চীনে পরিচিত ছিলেন পদার্থবিদ্ ও চক্ষু-রোগের চিকিৎসক হিসাবে।"৪২

কানিংহাম বলেন যে, প্রাচীন বিদর্ভ অথবা বেরার বর্তমান নাগপুর।৪৩ তিব্বতী উপাখ্যানে নাগার্জুন সম্বন্ধে জানা যায়, "বিদর্ভ নগরে এক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিত। অনেক দিন যাবৎ তাহার সন্তানাদি হয় নাই। এক রাত্রে সে স্বপ্ন দেখে যে সে যদি এক শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় তবে তাহার এক পুত্র জন্মিবে। পুত্র (নাগার্জুন) জন্মগ্রহণ করিলে তাহার পিতামাতা বহু জ্যোতির্বিদ্‌দের ডাকিয়া ভাগ্য গণনা করিলে তাহারা বলিলেন যে নাগার্জুনের পিতামাতা যদি আরও এক শত ব্রাহ্মণ ভোজন করান তবে নাগার্জুনের আয়ু আরও সাত বৎসর বাড়িত হইবে, নহিলে আ[illegible] যখন সাত বৎসর কাটিয়া যাইবার সময় হইয়া আসি[illegible] পিতা-মাতা নিজের চক্ষের সামনে পুত্রের মৃত্যু দেখিবেন না বলিয়া তাহাকে কয়েকজন লোক দিয়া এক নির্জন বনে পাঠাইয়া দিলেন। বালক নাগার্জুন অনেক দিন যাবৎ দুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন; এমন সময় এক মহাবোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর খসর্পণ তাঁর কাছে আসিয়া উপদেশ দিলেন যে, তিনি যদি মৃত্যুর হাত এড়াইতে চান তো তিনি যেন মগধের প্রধান নলেন্দ্র বিহারে যান। তিনি নলেন্দ্র বিহারে গেলে বিহারাধ্যক্ষ শ্রীসরহভদ্র নাগার্জুনকে ভিক্ষু-পদে দীক্ষিত করিলেন। ঠিক সেই সময় সে দেশের উপর দিয়া এক দুর্ভিক্ষ চলিয়া গেল। এই দুর্ভিক্ষে তাহাদের বিহারে অর্থের টানাটানি পড়িল। অধ্যক্ষ ইহাতে ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই অর্থাভাবে তাহাদের অন্যত্র অর্থের সন্ধান করিতে হইল। নাগার্জুন ঠিক করিলেন যে, মহাসমুদ্রের অপর পারে যাইয়া সেখানে থাকিয়া আলকেমি বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া এই দুর্ভিক্ষ দূর করিবেন। মহাসমুদ্রের অপর পারে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে এক সাধু ছিলেন যিনি আলকেমি বিদ্যা ভাল করিয়া জানিতেন। কিন্তু সে মহাসমুদ্র পার হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। নাগার্জুন তাঁর সম্মোহন-বিদ্যাবলে দুইটি গাছের পাতার উপর চড়িয়া সমুদ্রের অপর পারে সেই ছোট দ্বীপে উঠিলেন। সেখানকার সাধু নাগার্জুনকে দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। নাগার্জুন আলকেমি বিদ্যা শিক্ষা করিবার কথা বলিলে সেই সাধু সম্মোহন বিদ্যা শিখিতে চাহিলেন। নাগার্জুন তাহাকে উক্ত বিদ্যা শিখাইলে সাধু নাগার্জুনকে আলকেমি শিক্ষা দিলেন। আলকেমি শিখিয়া নাগার্জুন নলেন্দ্র বিহারে চলিয়া আসেন। নলেন্দ্র বিহারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। তিনি নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। নাগার্জুন উত্তর কুরু দর্শন করিয়া নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসেন, সেখানে তৈয়ারী করেন নানারকম চৈত্য ও মন্দির। বিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং আলকেমি শাস্ত্রে গবেষণা ও প্রচার করেন নিজ গ্রামে। সরহের মৃত্যুর পর তিনি হইলেন নলেন্দ্র বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন মাধ্যমিক দর্শন।৪৪ নাগার্জুন সম্বন্ধে আরও একটি উপাখ্যানে আছে, এক দিন চাঢ় দেশে উত্তর কুরুতে এক নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, সেখানকার এক অধিবাসী তাহার কাপড় লইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি তাহার নিকট তাঁহার কাপড় ভিক্ষা করিলে সেই লোকটি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, কারণ সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু ছিল না, সকল সম্পত্তির উপরেই ছিল সকলের সমান অধিকার। যে যখন খুশি ব্যবহার করিতে পারিত। তিনি সেখানে প্রায় তিন মাস থাকিয়া তাহাদের রাজ্যে সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, কারণ সেখানকার রাজা তখন নাবালক মাত্র। নাম ছিল তার জাতক। রাজা জাতক বড় হইলে নাগার্জুনকে প্রভূত অর্থ দান করেন। নাগার্জুন নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নানা চৈত্য মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। বিজ্ঞান, ভেষজ-বিদ্যা,

জ্যোতির্বিদ্যা ও আলকেমিতে পারদর্শী হইতে লাগিলেন। সরহ-ভদ্রের মৃত্যুর পর তিনি প্রধান অধ্যক্ষ হন।৪৫

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আলবিরুনি বলেন, নাগার্জুন ভারতের প্রসিদ্ধ রাসায়নিক এবং তাঁহার বাসস্থান সোমনাথের নিকট দুর্গ দাইহকে আলবিরুনির এক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।৪৬ হয়ত হিন্দু রসায়নের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াই আলবিরুনি নাগার্জুনের অবস্থিতি-কাল তাঁহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তিন জন নাগার্জুনের নাম দিয়াছেন। প্রথম জন লৌহশাস্ত্র-বিদ্ নাগার্জুন, দ্বিতীয় জন সিদ্ধ নাগার্জুন, যিনি আলকেমি-বিদ্ এবং তৃতীয় জন হইতেছেন মাধ্যমিক সূত্রের দার্শনিক নাগার্জুন।৪৭ সিদ্ধ নাগার্জুন৪৮ সম্ভবত পূর্ব্বোক্ত নাগার্জুনেরই নামান্তর। ডল্বনাচার্য্যের মতে নাগার্জুন সুশ্রুতের সংস্কর্ত্তা এবং উত্তর ভাগের রচয়িতা।৪৯ বৃন্দ ও চক্রপাণি বলেন নাগার্জুনের রাসায়নিক সূত্র সকল পাটলিপুত্রে প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত আছে। "নাগার্জুনেন লিখিতা তম্ভে পাটলিপুত্রকে"।৫০ নাগার্জুন তির্য্যকপাতন প্রক্রিয়া এবং ধাতুর জারণ ও মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ আছে।৫১ সপ্তম শতাব্দীর হর্ষচরিতে নাগার্জুনের লৌহশাস্ত্র বিষয় আলোচিত হয় এবং পাতঞ্জলির পূর্ব্বে বলিয়া অনুমিত হয়।৫২

(i) (Prechloride of Mercury), (ii) (Sulphide of Mercury), (iii) (Vermilation from lead), (iv) (Copper from Sulphate of copper), (v) (Zinc from Calanine), (vi) (Copper from pyrites).

এইগুলির তিনি আবিষ্কর্ত্তা ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন।৫৩ নাগার্জুনের লিখিত পুস্তকের মধ্যে এইগুলির নাম পাওয়া যায়,—(১) আরোগ্য মঞ্জরী।৫৪ (২) রসেন্দ্র ভঙ্গ।৫৪ (৩) রসরত্নাকর।৫৪ (৪) রসার্ণব।৫৪ (৫) সিদ্ধ নাগার্জুনীয়।৫৫ (৬) যোগসার।৫৬ (৭) কোকশাস্ত্র বা রতিশাস্ত্র।৫৭ (৮) সিদ্ধ-নাগার্জুন কক্ষপুটম্।৫৮ (৯) যোগশতক।৫৯ মণ্ডকল্পের শেষ কয় পঙ্‌ক্তিতে নাগার্জুনের লেখা পাওয়া যায়—

নমো বুদ্ধায়। নাগার্জুনং মহাপ্রাজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং। সুসংক্ষিপ্ত চিকিৎসার্থ আর্য্যদেবা মহাতপাঃ॥ কারুণ্যাত্তু সর্ব্ব-সত্ত্বানাং দারিদ্র্যানাম্ তথা পরম্। প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যাসারং সম্পরিপৃচ্ছতি॥ কথাময়ো পচরেণ রোগোপশমনং ভবতু। ইত্যাহ ভগবান মণ্ডকল্পং সর্ব্বসুখাবহম্॥ ক্ষীরেণ সঃ কিবেতু মণ্ডং মাসমাত্রং নিরন্তরং। রসায়নগুণেস্তত্ত্ব ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। জীবেত্তুং বর্ষশতং পূর্ণং সর্বরোগবিবর্জিতঃ। তুষ্টি পুষ্টি মতঃ শ্রীমান বলি পলিত বর্জিতঃ॥ পিবেত্তু ত্রিকুট চূর্ণেন সদ্যোজ্বরা বিনাশনম্। পীতবা বিড়ঙ্গ চূর্ণেন দন্তরোগং বিনাশয়েত্তু॥ পীতবা এরণ্ডচূর্ণেন হৃদয় শূলবিনাশনম্। গুহ্য শূলংগুড়েনৈব শর্কর মিশ্রিতাং পিবা॥ জীবা অতিসার যূপশাময়েত্তু॥ গোমূত্রং মিশ্রয়িত্বা সান্নিপাত বিনাশনম্। কণ্টকারি চূর্ণেন নহক্কি...৬০

রসার্ণব অমূল্য গ্রন্থ। তন্ত্র-শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় রসার্ণবও হর-পার্বতীর কথোপকথন ছলে লিখিত। রাসায়নিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত নানাপ্রকার যন্ত্রাদির মনোজ্ঞ বিবরণ রসার্ণবে প্রদত্ত হইয়াছে। দোলাযন্ত্র, গর্ভযন্ত্র, হংসপাক যন্ত্র প্রভৃতি বিবৃত করিতে গিয়া ভগবান ভৈরব প্রথমেই বলিয়াছেন—'রস, উপরস, ধাতু; একখণ্ড বস্ত্র, এক জোড়া হাপর, লৌহ-যন্ত্রাদি,' পাথরের খল ও পেষণ যন্ত্র; একটি কোষ্ঠি-যন্ত্র; একটি বাঁকনল......কিছু গোময়; কাষ্ঠ; বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা নির্ম্মিত যন্ত্র, এক জোড়া সাঁড়াশী, নানা ধরণের লৌহ এবং মৃৎপাত্র, তুলাদণ্ড ও ছোট-বড় ওজন; বংশ এবং লৌহনল, চর্ব্বি; অম্ল, লবণ, ক্ষার, বিষ, এই সমস্ত পদার্থ প্রথমে সংগ্রহ করিবে এবং অতঃপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবে।৬১ রসার্ণব তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"বিশিষ্ট সাধকেরা জীবনের সর্ব্বোচ্চ কামনা পূরণে ইহার ব্যবহার করেন বলিয়া ইহার নাম পারদ।

আমার অঙ্গ হইতে ইহার উৎপত্তি, হে দেবি! ইহা আমারই সমান। আমার দেহের ইহা ধর্ম, সুতরাং ইহাকে বলে রস।

ষড়দর্শনের মতে মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এরূপ মোক্ষ করতলন্যস্ত আমলকীবৎ অনুভূত হয় না। সুতরাং পারদ ও ঔষধাদির দ্বারা দেহকে রক্ষা কর্ত্তব্য।"৬২

রসরত্নাকর রাজা শালিবাহন, রত্নঘোষ ও নাগার্জুনের কথোপকথন ছলে লিখিত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ইহার রচনা-কাল দিয়াছেন সপ্তম হইতে অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের ভিতর।৬৩

রসরত্নাকরে নাগার্জুন বলিতেছেন—"আমি এখানে পারদের (রস) শুদ্ধিকরণ সম্বন্ধে বলিব। আহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাজাবর্ত্ত (acciasirisa) গন্ধক পলাশ নির্য্যাসের দ্বারা পরিশোধিত হয় এবং রৌপ্যকে ঘুঁটের আগুনের উপর তিন বার সেঁকিলে সোণায় পরিণত হয়।২॥

calaurini এবং তাম্র তিন বার একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেঁকিলে সোনায় পরিণত হয়॥৩॥

রৌপ্য ও সীসক মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলে রৌপ্য বিশুদ্ধ হয়॥১৩॥" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে সময় ছাত্রগণ কিরূপ যত্নশীল ছিল তাহা নাগার্জুন প্রণীত রসরত্নাকর গ্রন্থে রসশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি পাঠ করিলেই জানা যায়। যথা—

দ্বাদশানি চ বর্ষাণি মহাক্লেশৈঃ কৃতো ময়া
যদি তুষ্টাসিমে দেবী সর্ব্বদা ভক্তিবৎসলে।
দুর্লভং ত্রিষুলোকেষু রসবন্ধং দদস্বমে।

অর্থাৎ, আমি দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। হে দেবি যদি আপনি সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এ তিন লোকের দুর্লভ রসায়ন-জ্ঞান প্রদান করুন।৬৪

এই গেল রসরত্নাকর সম্বন্ধে। 'যোগসার' পুস্তকটি রসায়ন ও ঔষধবিষয়ক। তাহার প্রথম ও শেষ কয়েকটি শ্লোক এই। ধাত্রীং কলানাং নবরসে যড়কে বিপচতুদ্ধৃত শর্করা সৈন্ধবোপেতং তণ্ডুসিদ্ধং সর্ব্বগুণিনা। ধাত্রীং...লকং ঘৃতম্।—শেষ শ্লোক,—

পুষ্টি বর্ণবলোত্সাহমাগ্নিদীপ্তরতন্ত্রিতাম্।
করোতি ধাতু সাম্যক নিত্যকালে নিষেবিতা॥৬৫

কোকশাস্ত্র অর্থাৎ রতিশাস্ত্র বা আদিশাস্ত্রের গ্রন্থের সূচনায় আছে...নাগার্জুন তপোধন নর্ম্মদাতীরে আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। [illegible] তাহার শিষ্য মহাতপা ভূতি ঋষি, আসিয়া তাঁহার কাছে [illegible] সম্বন্ধে জানিতে চান। এই পুস্তকটির

আগাগোড়া নারী-জাতির বর্ণনা। কত প্রকার নারী, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ, দেহের আকৃতি, স্বভাব ইত্যাদি বর্ণিত আছে। এই পুস্তক যৌনবিষয়ক।

অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগীর ভাষায়,

"এই মহাপুরুষের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ সম্যক্ তথ্য যাহাতে অবগত হইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে সুধী-বৃন্দকে বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি। আমরা গেবার; প্যারাসেল্সস্; এভিসেনা, এগ্রিকোলার, সহিত পরিচিত কিন্তু ভারতের নাগার্জুন, চক্রপানি প্রভৃতি প্রাচীন রাসায়নিকগণ আমাদের অপরিচিত এ জাতীয় কলঙ্ক আর কতদিন থাকিবে?"

প্রবন্ধের পাদটীকা

১। শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ পৃঃ ১১৪৭।

২। পঞ্চানন নিয়োগী—আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। পৃঃ ৪৬।

৩। Beal, S.—*Life of Huen Tsang*, pp. Intro. xx.

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—"বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য" পৃঃ ৪৪-৪৫ কলিকাতা ১৯৩৯। রাহুল সাংকৃত্যায়ন—"নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর" প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৯০৭ পাদটীকা।

Smith, V. A.—*Oxford Ancient Indian History*, p. 134. *La Grande Encyclopedie*—Vol. 24, p. 704. Kern, H.—*Manual of Indian Buddhism*, pp. 6. Waddle, L. A.—"A Historical Basis for the Question of King 'Menandar'" in *Journal Royal Asiatic Society of Great Britain*, 1897, pp. 228.

সিদ্ধ নাগার্জুন কক্ষপুটম্—বসুমতী, ১৩৩৯ পৃঃ (ছ)

Okakura, K.—*Ideas of the East with Special Reference to the Art of Japan*, Introduction by Sister Nivedita, p. xv, and pp. 73-74, London, 1930.

শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ পৃঃ ১১৪৫।

Sakkalia, H. D.—*The University of Nalanda*, p. 16. Kimura—*Mahayana and Hinayana and Origin of Mahayan*, p. 11. Mukerjee, R. K.—"The University of Nalanda" in journal, *Bihar Orissa Research Society*, Vol. xxx, Pt. II, p. 133, June, 1944. Law, N. N.—*Studies in Indian History and Culture*, pp. 170-171. Sarkar, B. K.—*Positive Background of Hindu Sociology*, Vol. I, p. 365, and *Creative India*, p. 39. Keith, A. B.—*Buddhist Philosophy in India and Ceylon*, p. 229. Bhattacharyya, V.—*Mahayanavimsaka of Nagarjuna*, p. Intro. 3-4.

ইনি বলেন বৌদ্ধ মহাযান-দার্শনিক ছিলেন দুইজন—প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সপ্তম শতাব্দীতে।

Maharastriya Jnanakosa, edited by Dr. S. V. Ketker, Vol. 16, (1925).

৪,৫। কহ্লন—রাজতরঙ্গিণী, প্রথম খণ্ড—শ্লোক ১৭২, ১৭৩ এবং ১৭৭ কলিকাতা, ১৯১৭।

৬। *The Mythology of all Races*, Vol. VI. *Indian Mythology*, p. 210.

৭। Ayengar, K. S.—*Ancient Indi[illegible]—Maritime Activity*, p. 58. *Maharastriya Jnanakosa*, ed[illegible]ted by Dr. Ketkar, S. V., Vol. 16 (1925).

নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ (Hir[illegible]on) Vol.

শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ পৃঃ ১১৪৫

Sakkalia, H. D.—*The University of Nalanda*, p. 16. Kimura—*Mahayana and Hinayana and Origin of Mahayana*, p. 11. Kern, H.—*Manual of Indian Buddhism*, p. 112. *History of Bengal*, edited by Majumdar, R. C., p. 348, Dacca, 1943.

৮। Vidyabhusan, S. C.—"Pratitya Samrit Pada or Dependent of Origination" in *Journal of the Buddhist Text and Anthropological Society*, Vol. VII, Pt. I, pp. 4-5, 1899.

৯। Keith, A. B.—*History of Sanskrit Literature*, p. 71.

১০। Mm. Haraprasad Sastri—*A Catalogue of Palm-Leaf and Selected Paper*, MSS. Belonging to Durbar Library, Nepal, p. 160, Calcutta, 1915. *Buddhism, a List of Reference in the New York Public Library*, p. 23, 1916.

১১। Bidyabhusan, S. C.—"Pratita Samrit Pada or Dependent Origination" in *Journal of the Buddhist Text and Tnthropological Society*, Vol. VII, Pt. I, pp. 4-5, 1899. Keith, A. V.—*Buddhist Philosophy in India and Ceylon*, p. 230.

১২। Keith—*op. cit.*, p. 230.

১৩। Beal, S. Rev.—"Chong-Lun or Prajna Mula Sastra Tika" in *Indian Antiquary*, Vol. IV, p. 99 and Vol. X, p. 87.

৪। *Hwui-Kan-Lun*—(Vivadasana Sastra by Nagarjuna and translated by Rishi Vimoksharanga and others in A.D. 541.) in Bunio Nanjio's *Catalogue of Chinese and Japanese*.

১৫। Giuseppe Tucci—Predinnag Buddhist on Logic from Chinese Sources—Gaikwad's *Oriental Studies*, p. xiii, Int.

১৬। Bhattacharya, B.—*Mahayan Vimsaka of Nagarjuna*, Calcutta, 1931. (এই পুস্তিকাখানার মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই।)

জাপানের পণ্ডিত সুসুমু যমগুচি ১৯২৭ সালে *The Eastern Buddhist* (vol. iv no. 1-2 p. 56-57, 167-176) পত্রিকায় স্বকৃত ইংরাজী তর্জ্জমার সহিত ইহার তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাযান বিংশকের তিব্বতী ও চীনা নাম যথাক্রমে হইয়াছে—থেগ. প. ছেন. পো. নি. শু. এবং চীনা অনুবাদে তা শাঙ এর-শি সুঙ হুঙ; ইহার আক্ষরিক অর্থ মাহাযান গাথা (অথবা কারিকা) বিংশক শস্ত্র। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই নামের অথবা ঠিক এইরূপ নামের আরও দুইখানি পুস্তিকা আছে মহাযান বিংশতি (তিব্বতী নাম থেগ, প, ছেন, পো, ঞি, শু) ও তত্ত্ব মহাযান বিংশক (তিব্বতী নাম দে, খো, ন, ঞিদ, প, ছেন, পো, ঞি, শু)। মহাযান বিংশকের রচয়িতা যে নাগার্জুন তাহা তিব্বতী ও চীনা উভয় অনুবাদ হইতে জানা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে একাধিক নাগার্জুনের উল্লেখ দেখা যায়। মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক নাগার্জুন সুপ্রসিদ্ধ। চুরাশি জন সিদ্ধের মধ্যে অন্যতম নাগার্জুন, এই প্রসিদ্ধি আছে। তিব্বতী তঞ্জুরের গ্রন্থ-তালিকায় তন্ত্রবৃত্তি (র্গ্যুদ'গ্রেল) প্রকরণে নাগার্জুনের রচিত বলিয়া বহু পুস্তক উল্লিখিত হইয়াছে।

...প্রথম নাগার্জুনকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ পাওয়া যায় না। প্রথম নাগার্জুন আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ও দ্বিতীয় নাগার্জুন সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ছিলেন বলিয়া ধরা যায়। এই দুই নাগার্জুনের কে এই পুস্তকের রচয়িতা তাহা মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। প্রথম পুস্তকখানি অনুবাদ করেন কাশ্মীরের পণ্ডিত আনন্দ (জয়ানন্দ) ও তিব্বতের ভিক্ষুকীর্ত্তি ভূতিপ্রজ্ঞ দেগে-লোঙ, প্রসাম (?) (ব্যার শেস হব) আর দ্বিতীয় পুস্তিকাটি অনুবাদ করিয়াছিলেন ভারতের পণ্ডিত চন্দ্রকুমার ও ভিক্ষু শাক্যপ্রভ (দেগে লোঙ-শা, ক্য'ওদ)। চীনা অনুবাদ করেন দীনপাল (শিহু) ইহা খ্রীষ্টীয় দশম শতকে (৯৮০-১০০০) করিয়াছিলেন। চীনা অনুবাদের নাম তা-শান'ড-শি-লুন (মহাযান গাথা বিংশতি-শাস্ত্র)। চীনা অনুবাদ হইতে জানা যায় ইহা দশম শতকে এবং তিব্বতী অনুবাদে জানা যায় যে ইহা অষ্টম শতকে প্রচলিত ছিল। প্রথম ও শেষ শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি। "যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নহে এমন বিষয়কেও যিনি দয়া করিয়া উপদেশ দিয়াছেন সেই ধীসম্পন্ন অচিন্ত্যশক্তি, বীতরাগ, বুদ্ধকে নমস্কার" ॥১॥ "যিনি জানেন যে, এই লোক অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন তাঁহার এই সমস্ত কল্পনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে" ॥২৩॥ (বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাযান বিংশক—হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনা লেখমালা, প্রথম ভাগ পৃ. ১৯০-২২৯।)

১৭। ইহা ভাবিবার বিষয় যে সুহৃল্লেখ গ্রন্থখানি দর্শনের না রসায়নের। প্রবোধচন্দ্র বাগচী—"বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য", পৃ. ৪৪-৪৫।

১৮। Das, S. C.—"Life and Legend of Nagarjuna" in *Journal Asiatic Society of Bengal*, p. 119, Vol. Ll, Pt. 1, 1882.

১৯। *Op. cit.*, p. 119,

২০। *Op. cit.*, p. 119,

২১। Bunionanjio—*Catalogue of Chinese and Japanese Books and Manuscripts*, in Bodolian Library, Appendix II, No. 59.

বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী—"চীনের সভ্যতা গঠনে ভারতবাসীর কৃতিত্ব"—গৃহস্থ, আষাঢ় ১৩২০। হরিমোহন দাসগুপ্ত—"আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক কয়েকটি কথা" গৃহস্থ, ভাদ্র ১৩২৪।

২২। *Shang Yewlup*—a Biographical Dictionary—author, Lianpinyii. Bunionanjio— *Catalogue of Chinese Works*, Vol. I.

২৩। Campbell, W. L.—*She Rab Dong Bu*, p. iii.

২৪। "University in Ancient India" in *Journal of Buddhist Text and Research Society*, Vol. VII, Pt. IV, p. 21, 1905.

রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৩

২৫। Das, S. C.—"Life and Legend of Tsankhapa (Lo-ssan-Tagha)" in *Journal Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol. LI, Pt. I, p. 54, 1882. Das, S. C.—*op. cit.*, in *Journal Buddhist Text Society*, Vol. I, p. 11.

২৬। Samaddar, J. N.—*Glories of Magadha*, pp. 150-151.

২৭। Majumdar, R. C.—*History of Bengal*, Vol. I, p. 358, footnote 6.

২৮। যোগশতক By Nagarjuna, 12 × 12 inches folia 28 pierced by a hole toward the left line, 5 on a page slokas 500, Date—N.S. 452-1332 A.D. Charracter newari in Mm. H. P. Sastri—*A Catalogue of Palm-leaf* MSS in Durbar Library, p. 78. Keith, A. V.—*History of Sanskrit Literature*, p. 511.

২৯। Bhattacharyya, B.—*Mahayana Vimsaka of Nagarjuna*, pp. 3-4.

জীবনীকোষ পৃ. ১১৪৮ (ইনি বলেন চর্য্যাপদ রচয়িতা নাগার্জুন সপ্তম শতাব্দীর)

৩০। Mm. H. P. Sastri—*Report on the Search of Sanskrit Manuscript*, p. 9.

৩১। Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. I, p. Int. iii-iv, Vol. II, p. Intro. xxiii. Watters, T.—*On Yuanchwang's Travels in India*, Vol. II, p. 207. Seal, B. N.—*Positive Background of Ancient Hindus*, pp. 63-64.

পঞ্চানন নিয়োগী—আয়ুর্ব্বেদ ও নব্যরসায়ন পৃ. ৪৮

৩২। Hemchandra—Prakrit Grammar. Bhandarker, R. G.—*Early History of Deccan*, p. 29, 1895. Mazumder R. C.—*Ancient Indian History*, p. 156. Rapson, E. J. —*The Cambridge History of India*, Vol. II, p. 531.

৩৩। Mazumder, R. C.—*Ancient Indian History*, p. 156. Smith, V. A.—*Early History of India*, p. 184, 1904. Rapson, E. A.—*The Cambridge History of India*, Vol. II, p. 600.

৩৪। *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 54, 1938, p. 3. Coomarswamy, A. K.—"Nagarjuni Konda and Amaravati" in *Rupam*, 1929, Nos. 38-39, p. 79.

৩৫। M. A. S. I., *op. cit.*, p. 5.

৩৬। Watters, T.—*On Yuanchwang's Travel in India*, Vol. II, pp. 201-204, 206. Das, S. C. *J. A. S. B.*, Vol. LI, p. 49.

৩৭। Watters, T.—*On Yuanchwang's Travel in India*, Vol. II, p. 202.

৩৮। Ketkar, S. V.—*Maharastriya Jnanakosa*, Vol. 16.

৩৯। *Mystic Tales of Lama Taranath*—translated from Germ. by Dr. B. N. Datta, p. 9.

শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনী-কোষ—পৃ. ১১৪৫

Ketkar, S. V.—*Maharastriya Jnanakosa*, Vol 16. Lyall, E.—*Indian Antiquity*, Vol. IV, pp. 141-142. Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. I, p. Intro. xxxiv.

পঞ্চানন নিয়োগী—বৈজ্ঞানিক জীবনী

Das, S. C.—"Life and Legend of Nagarjuna" in *J. A. S. B.*, Vol. LI, Pt. I, pp. *Sumpakhan Polyor*—edited by S. C. Das.

৪০। সোমদেব ভট্ট—কথাসরিৎসাগর edited by Pandit Durgaprosad and Kasinath Pandurang Parab, pp. 216-219, and English translation by C. H. Tawney, pp. 376-379.

(কথাসরিৎসাগর সম্পাদনা করেন সোমদেব ভট্ট ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই সমস্ত উপাখ্যান সংগ্রহ করেন আর্য সংঘসেন ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এবং তাঁহার শিষ্য গুণবৃদ্ধি ইহা চীনা ভাষায় অনূদিত করেন। নাগার্জুন সম্বন্ধে লিখিত আছে কথাসরিৎসাগরের প্রথম দিকে। সুতরাং মনে হয় উহা সংঘসেন দ্বারা সংগৃহীত হয়। তাহা হইলে নাগার্জুনের কার্য [illegible] হয়।)

৪১। S. C. Das—*J. A. S. B.*, Vol. LI, p. 115.

৪২। Watters, T.—*On Yuanchwang's Travel in India*, Vol. II, pp. 201-204, 206. Das, S. C.—*J. A. S. B.*, Vol. LI, p. 119.

৪৩। Cunningham—*Ancient Geography of India*, p. 520.

৪৪। *Sumpakhan*—Pycce Paljor Pag Sam. Jonzang—edited by S. C. Das, pp. 85-86, Calcutta, 1908. Das, S. C.—"Life and Legend of Nagarjuna" in *J. A. S. B.*, Vol. LI, pp. 115-120.

পঞ্চানন নিয়োগী—বৈজ্ঞানিক জীবনী পৃ. ১৪৪-৫।

Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. X I, *Mystic Tales of Lama Taranath*—trans. from Germ. by B. C. Dutta, p. 54.

৪৫। Das, S. C.—"Life and Legend of Nagarjuna" in *J. A. S. B., Vol. LI*, Pt. I, p. 118, 1882. Sumpakhan—*Pycce*, pp. 85-86.

৪৬। Alberuni's *India*, Vol. I, p. 189.

৪৭। Seal, B. N.—*Positive Science of the Ancient Hindus*, p. 62. Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. II, pp. 130-131.

৪৮। Hiralal—*Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the C. P. and Berar*, Nagpur, 1926, p. 578, No. 6464 সিদ্ধনাগার্জুনীয়— author—Nagarjuna, subject—Vaidyaka, owner—Govindram of Malakheri (Hoshangabad Dist.).

"University in Ancient India" in *Journal Buddhist Text Society*, Vol. VII, Pt. IV, p. 20, 1906.

৪৯। Seal, B. N.—*Positive Science of the Ancient Hindus*, p. 62. Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. I, p. Intro. liii-liv.

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত গুহ "আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব," সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩১০, পৃ. ৯৪, গণনাথ সেন "আয়ুর্বেদ ও বঙ্গ-সমাজ"—আর্থিক উন্নতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ পৃ. ১০৫। জীবনীকোষ পৃ. ১১৪৬।

৫০। Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. I, p. Intro. liii-liv.

৫১ Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. II, p. 61.

Seal, B. N.—*Positive Science of the Ancient Hindus*, pp. 63-64.

৫৩। Sarkar, B. K.—*Hindu Achievements in Exact Science*, pp. 40-41. Alberuni's *India*, Vol. I, p. 189.

৫৪। পঞ্চানন নিয়োগী—আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন পৃ. ৮৯।

Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. I, pp. Intro. xi-xli. Keith, A. B.—*History of Sanskrit Literature*, pp. 511-2.

৫৫। Hiralal—*Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in C. P. and Berar*, p. 578, Nagpur, 1928, No. 6464.

৫৬। Mm. Haraprosad Sastri—*A Catalogue of Palm-leaf and Selected paper MSS* belonging to Durbar Library, Nepal, Vol. I, p. 235, 1905.

৫৭। Published in Calcutta, 1919, Keith, A. B.—*History of Sanskrit Literature*, p. 470.

৫৮। বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক কলিকাতায় প্রকাশিত।

Roy, P.C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. I, p. xl-xli.

৫৯। Mm. H. P. Sastri—*Report on the Search of Sanskrit MSS*, p. T, (1895-1900) (the word 'yogacataka' means hundred prescriptions or mixtures.

৬০। Mm: Haraprosad Sastri—*A Catalogue of Palm-leaf and Selected paper MSS*. Belonging to Durbar Library, Nepal, Cal. 1915, Vol. II, pp. 36-37.

৬১। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—হিন্দু রসায়নী বিদ্যা পৃ. ২৮

৬২। ঐ পৃ. ২৫,

৬৩। Roy, P. C.—*History of Hindu Chemistry*, Vol. II, p. Intro. xli.

৬৪। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—"হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব।" প্রবাসী ১৩২২, পৃ: ৫৪৯।

৬৫। Mm. Haraprosad Sastri—*A Catalogue of Palm-leaf and Selected paper MSS*. Belonging to Durbar Library, Nepal, 1905, Vol. I, p. 235.

পুস্তক-পরিচয়

জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজির অর্থনীতি—অনাথগোপাল সেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য দেড় টাকা।

বর্ত্তমান যন্ত্রযুগের আয়ু দেড়শত বৎসর বলা চলে। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২-৯৮) হইতে পশ্চিমের জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। যত দিন কুটীরশিল্প ও পালের জাহাজ ছিল তত দিন এই উন্নতির গতি মন্দা ছিল। কিন্তু শিল্পে বাষ্পশক্তির প্রয়োগ হইতেই উন্নতির গতি খুব দ্রুত হইতেছে। অতঃপর বিদ্যুৎশক্তি মানুষকে আরও গতিবেগ দান করিয়াছে। ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শক্তি মানুষের আয়ত্তে আসিয়াছে। অভাবের সৃষ্টি ও তাহার পূরণ বর্ত্তমান সভ্যতার রূপ। কিন্তু এত যান্ত্রিক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের সুখ বাড়িয়াছে কি ? ধনতন্ত্রের মজ্জাগত অন্তবিরোধ তাহাকে ধ্বংসের দিকেই লইয়া চলিয়াছে। এই কারণে ভবিষ্যতেও যুদ্ধ অনিবার্য্য। সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবই এই জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ পথেই আবার ফ্যাসিজমেরও উদ্ভব। কেহ কেহ বলেন ইহা ধনতন্ত্রের নগ্নমূর্ত্তি। কিন্তু ফ্যাসীবাদীরা ইহাকে জাতীয় সমাজতন্ত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। ধনতন্ত্র, মার্কসীয় সাম্যবাদ, গণতান্ত্রিক সাম্যবাদ এবং জাতীয় সাম্যবাদ প্রত্যেকটিই নিজ নিজ আদর্শে মানবের আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে চায়। কিন্তু ইহাদের কোনটাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক বিধানের সুব্যবস্থা করিয়া কৃষক শ্রমিক কিম্বা বঞ্চিত দুর্গতদের দুঃখ দূর করিতে পারে নাই। এইখানেই গান্ধীবাদ জগতকে নূতন আলো দেখাইয়াছে। এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ দ্বন্দময় জগতে গান্ধীবাদই মানবের পারস্পরিক সহযোগিতার সার্থকতার আদর্শ প্রচার করিতেছে। এই যন্ত্রযুগে একমাত্র মহাত্মাই আবার চরকার বাণী শুনাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মানুষ যন্ত্রের দাস হইয়াছে, স্বাধীনতার নামে মনুষ্য-জাতিকে কলের পুতুলে পরিণত করা হইয়াছে, গান্ধীজি তাহা সত্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এ জন্যই দ্বিধাহীন ভাবে এই চলমান বিরাট্ সভ্যতাকে তিনি সত্যকার মানবতার পথে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। মানুষের মহত্ব, তিনি যেমন বুঝিয়াছেন এরূপ কেহ বুঝে নাই এ জন্যই মহাত্মার নিকট আজিকার জড়-জগতের সকল উন্নতি ছোট হইয়া গিয়া মানুষের মনুষ্যত্বই গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ শহর অপেক্ষা গ্রাম, কারখানা অপেক্ষা কুটীর, জনসমুদ্র অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব, অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা দান, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে।

অনাথবাবুর অননুকরণীয় ভাষায় বিষয়বস্তু সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের জটিল 'বাদ'গুলি এরূপ পরিষ্কার ভাবে বুঝানো হইয়াছে যে, কি কারণে মহাত্মা গান্ধীর পথই শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিতে পাঠকের কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না। আজ এই অহিংসা-ব্রতী কুটীর-শিল্পের বাণীপ্রচারক ক্ষুদ্রকায় মানুষটির বাণী রণক্লান্ত পৃথিবীর বুকে সত্যই শান্তি আনিতে পারিত যদি পাশ্চাত্ত্যের জাতিসমূহ 'গতির' মোহ এড়াইয়া মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখিত তাহারা কোন্ ধ্বংসের দিকে ছুটিয়াছে।

এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

দিবানিদ্রা—শ্রীহিরন্ময় ঘোষাল। এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

এই গল্পের বইয়ের পরিচয়-লিপিতে লেখক বলিয়াছেন, 'গল্প-সাহিত্যের প্রথম উপাদান হ'ল আবহ। এই কাহিনীগুলিতে যদি দিবানিদ্রার একটি আবিষ্ট অনুভূতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়ে থাকি—তো এই সমষ্টির নাম 'দিবানিদ্রা' সার্থক হয়েছে বলতে হবে। সে কথা পাঠকও স্বীকার করিবেন। বাস্তব-বোধ ও কল্পনা-দৃষ্টি কোনটিই লেথকের ন্যূন নহে; খুঁটনাটি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও দক্ষ লেখনীর মুখে ধরা পড়িয়াছে। 'ফাউলকারী' ও 'মাংস' গল্প দু'টি করুণরসে অভিষিক্ত। 'কাঁধকাঠে'র কোন কোন কাহিনী ও 'ব্রজেশ্বরীর দিবাস্বপ্ন' দিবানিদ্রার আবেশে ও অস্বস্তির ভারে মনকে আবিষ্ট ও পীড়িত করিয়া তুলে।

প্রাচীরপত্র—শ্রীঅনিলকুমার সিংহ। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস। ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। দাম—দু টাকা।

অধিকাংশ গল্পেই তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ছবি ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুঁজিবাদীর লালসা—দরিদ্র ও মজুর শ্রেণীকে যে কি ভয়াবহ ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সমাজ মনুষ্যত্ব ও নীতিধর্ম্ম অন্নের জন্য কি ভাবে বিকাইয়াছে—তাহার বীভৎস ও করুণ ছবি এই গল্পগুলিতে পাওয়া যায়।

বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ চমৎকার।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাঙালীর পরিচয়—শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু, এম-এসসি, পি-আর-এস। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃ. ৬৬+২খানি ম্যাপ+২ পৃষ্ঠা ছবি।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস এবং অন্যান্য জাতির সহিত তাহার রক্তের কি সম্পর্ক, এ সম্বন্ধে কৌতূহল শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে হওয়া স্বাভাবিক। অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসু আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সূচনায় তিনি মানবজাতির উৎপত্তি এবং ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বাঙালী জাতির রক্ত-সম্পর্ক বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল গবেষণা হইয়াছে, তিনি তাহার সহিত সুপরিচিত এবং পাঠককে আধুনিকতম গবেষণার বিষয়ও জানাইতে কসুর করেন নাই।

বিষয়টি দুরূহ এবং সংক্ষেপ করিবার ফলে কোথাও কোথাও আলোচনাও কঠিন হইয়াছে। তাহা হইলেও তিনি যে গবেষণাগার হইতে অবতরণ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে বিজ্ঞানের ডালি ধরিয়াছেন, এ জন্য অধ্যাপক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। বাঙালী পাঠক বইখানি পড়িয়া লাভবান হইবেন, ইহাতে শিখিবার জিনিষ অনেক আ ।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

অতসী—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অতসী কবিতার বই। গীতিকবিতার নয়, গল্প-কবিতার বই। অতসী, মঞ্জুশ্রী, মন্দাকিনী, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি দশটি গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সাহিত্যে একদা গল্প-কবিতার প্রবর্ত্তন করেন। গল্প-কবিতার সেই ধারা সাবিত্রীপ্রসন্ন ক্ষুণ্ণ করেন নাই। সাধারণতঃ গল্পগুলি গদ্যচ্ছন্দে রচিত। রচনার গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং বেগবান।

"দেবতার পূজায় লাগে যে ফুল
ঠাঁই যার পূজার সাজিতে
ঠাঁই পেলে না সে মানুষের ঘরে।"

গল্প বলিবার পদ্ধতি মনকে আকর্ষণ করে। মন এবং প্রকৃতির ঘন-সন্নিবেশ অনেক সময় বক্তব্যকে স্ফুটতর করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। গল্প ও কাব্যের মধ্য দিয়া যে সামাজিক সমস্যাসমূহ স্বতই ফুটিয়া উঠিয়াছে সেগুলি আমাদের চিন্তাকে উদ্রিক্ত এবং বিচারবোধকে জাগ্রত করে।

'অতসী'র অনেকগুলি গল্প-কবিতার করুণ আবেদন পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিবে।

পুনরাবৃত্তি—শ্রীবাণী রায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এখানি ছোট গল্পের বই। লুক্রেশিয়া, মীডিয়া, ক্যামেলিয়া, নার্সিসাস, সেমেলি, মহাশ্বেতা, সাফো—এই সাতটি গল্প আছে। নামগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে সাধারণ গল্পের বই যেমন হয় 'পুনরাবৃত্তি' তেমন নয়। গ্রীক-রোমক পুরাণেতিহাসের আলোকসম্পাতে বর্ত্তমান কালের নায়কনায়িকার কার্য্য এবং মনোভাব সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে তৃপ্তি-বিধায়ক বলে গল্পগুলি সে পর্য্যায়ের নহে, পাঠের পর মনের উপর এগুলি বরং একটা উত্তাপ ও অতৃপ্তির স্প রাখিয়া যায়। লেখিকার শক্তি আছে। চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া একটা নূতন ভঙ্গীতে গল্প বলিবার যে প্রয়াস লেখিকা করিয়াছেন সে চেষ্টায় তিনি সফল হইয়াছেন। আবেগ ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় চরিত্রগুলি তীব্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দু-একটি গল্পে লেখিকার যে দুঃসাহস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। রচনার নূতনত্ব রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত গল্পগুলির প্রতি আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জাগেনি যে নীতি—শ্রীপ্রভাস ঘোষ। পি. ঘোষ, ১৭ ঝামা-পুকুর লেন, কলিকাতা। পৃ. ২০৪, মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একখানি আদর্শমূলক সামাজিক উপন্যাস। যে সকল দুর্নীতি বঙ্গসমাজের বিভিন্ন অঙ্গকে পঙ্গু করে তার অগ্রগতি রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সমূলে উচ্ছেদ করে জাগরণের নূতন নীতি প্রবর্ত্তন করবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করেছেন। এই জন্য উপন্যাসে তিনটি চরিত্র বিশেষ করে সৃষ্টি করা হয়েছে: বৈজ্ঞানিক পি. চৌধুরী, তদীয় প্রথমা স্ত্রী সুনীতি ও কনিষ্ঠ পুত্র অসীম। অসীম অবশ্য পি. চৌধুরীর দ্বিতীয়া স্ত্রী সুমতির সন্তান। সুনীতি বিদুষী, আধুনিকা ও বৈজ্ঞানিকা। নিরঙ্কুশ ভাবে বিজ্ঞান সাধনা করবেন বলে সুনীতি চৌধুরী বংশধর সন্তানের জননী হতে রাজী হন নি। সেইজন্যই পি. চৌধুরীর দ্বিতীয় দারগ্রহণ। অসীম ইঞ্জিনীয়ার, বিহারের সপ্তগ্রামে কর্ম্মরত—অনুসন্ধিৎসু তার মন, 'পেনফ্রেণ্ডের' চিঠির প্রভাবে হিন্দু-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব জানতে উৎসুক। হঠাৎ এক দিন পিতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে সে বাড়ি এল কিন্তু প্রচলিত বিধি মানলে না। ফলে প্রাচীনপন্থী সংস্কারান্ধ অনেকের সঙ্গেই বাধল তার সংঘর্ষ। এ সকল সংঘাতের ভিতর দিয়ে লেখক এক দিকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর দুর্নীতিকে উদঘাটিত করে দেখিয়েছেন, অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক পি. চৌধুরী, সুনীতি, অসীম ও পল্লী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বীরভদ্র তার নবনীতির আদর্শ।

আদর্শ নরনারীর মুখ দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখক যে বক্তৃতা শুনিয়েছেন তা পড়তে গিয়ে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা আছে। অসীমের বড় মা (সুনীতি) ম্যাদা[illegible] কুরীর সমগোত্রা, কিন্তু ম্যাদাম কুরী যে শুধু বৈজ্ঞানিকা নন, তিনি ত স[illegible]ানের জননী, রক্তমাংসের মানুষ—নূতন নীতি জাগানিয়া বড় মা শুধু অবা[illegible]ব আদর্শ।

লেখকের ভাষা সতেজ ও সরল, মন দরদী [illegible] সংস্কারমুক্ত। গ্রন্থের বিষয়-বস্তু অনেক পাঠকের মনে আনন্দ ও জ্ঞানে[illegible] [illegible]গাবে।

[illegible]তারাপদ রাহা

রবি-তর্পণ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

পাঁচটি কবিতা এবং তিনটি নাটিকা লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ। সবকয়টিতেই লেখক কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। রচনায় অসাধারণ কাব্যসৌন্দর্য না থাকিলেও আন্তরিকতা পরিস্ফুট।

চয়ন—শ্রীবাদলকুমার মুখোপাধ্যায়। ব্যা-মা-বো গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কয়েকটি কবিতা ও গদ্য কবিতা। সম্পূর্ণ কবিত্বহীন নহে। কিন্তু যখন "মদের বোতল সামনে রেখে, পাওয়া সব prohibition-এর স্বপ্ন দেখে" তখন আমাদের রসবোধ বিদ্রোহ করে।

শেষচূড়া—শ্রীঅশোকবিজয় রাহা। মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। দাম বার আনা।

সমতলের দেশে কবি আনিয়াছেন পাহাড় ও সমুদ্রের গান। সে গান সুর-মধুর। দুই-এক স্থানে সুরের প্রবাহ বাধা পাইয়াছে ভাষার দুর্বলতায়।

পলিমাটি—শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী ভবন, ১১ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এখনও পলিমাটিতে ফসল ফলে নাই। 'দগ্ধদিন উটপাখী', 'লালচেউ', 'জাপানী বোমারু', 'স্বর্ণঈগল'—প্রভৃতি আধুনিক শব্দবিন্যাসে কবি নূতনত্ব সৃষ্টির প্রয়াসী।

শাশ্বতী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মালাকার। ভারতী ভবন, ১১ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

রূপক-নাটিকা। কয়েকটি মতবাদ বা তত্ত্বকে চরিত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। রস-সৃষ্টি হয় নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মহিম ডাকাত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পি ৬৫-১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এক শত বর্ষ পূর্ব্বে কোম্পানীর রাজত্বকালে দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে সমগ্র বাংলায় ভীষণ ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। দেশের প্রসিদ্ধ জমিদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকেই ডাকাতি একটি লাভজনক ব্যবসা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। থানার ফাঁড়িদার ও দারোগা এবং জমিদারগণ অধিকাংশ স্থলে ডাকাতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিল। মহারাণী স্বহস্তে রাজত্ব গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্ট ডাকাতি ও অরাজকতা দমনে মনোনিবেশ করিয়া একজন Commissioner for the Suppression of Dacoity নিযুক্ত করেন। সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামি দমনে গবর্ণমেণ্টের সুনাম না থাকিলেও কৃতিত্ব সহকারে ডাকাতি দমনপূর্ব্বক প্রজাগণের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়া তৎকালে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এই উপন্যাসখানি The Bengal Administration Report 1859-60 অবলম্বনে এই সময়ের পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহিম ডাকাতের কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছে। রঘু ডাকাত, ভবানী পাঠক প্রভৃতির ন্যায় এই ডাকাতগণ দরিদ্রের বন্ধু ও ধনী অত্যাচারীর যম ছিল না, পরন্তু নরহত্যা, ভৈরবী সাধনার জন্য নারীহরণ ও অসহায় পথিকের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত ছিল, ইহাদের নৃশংস কার্য্যাবলী পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। পূর্ব্ববঙ্গের নদীবহুল জলপথে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। দুর্দ্ধর্ষ ও কৌশলী মহিম ডাকাতের কার্য্যকলাপ বর্ত্তমানের ডিটেকটিভ উপন্যাস অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলজনক। কিশোরগণ আতঙ্কমিশ্রিত উদ্দীপনার সহিত এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি পড়িয়া বাংলার ইতিহাসের এক শোচনীয় অধ্যায়ের সহিত পরিচিত হইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

অন্তরাল—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা লেখককে এই নাটক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু বিবাহবন্ধনহীন অবৈধ মিলনের ফলে কোন কুমারী যদি নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য সন্তান লাভ করেন তাহা হইলে সমাজের নিকট তিনি অপরাধিনী বলিয়া গণ্য হন এবং তাঁহার গর্ভজাত সন্তানও সমাজে যোগ্য মর্য্যাদা লাভ করে না। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, এই সামাজিক বিধানের মূলে মুখ্যভাবে রহিয়াছে অর্থনৈতিক কারণ। তাঁহার মতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতৃক থেকে পৈতৃকে পরিণত হওয়ার দরুনই একপতিত্বের আদর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, তাই অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্যেই তিনি এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়াছেন। কিন্তু E. Westermarckএর *The History of Human Marriage* প্রভৃতি নৃতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক আলোচনা করিলে দেখা যায় একপতিত্ব প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রধান কারণ হইয়াছে একনিষ্ঠতার প্রতি আদিম জাতিসমূহের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। আসামের খাসীয়াদের মধ্যে matriarchy বা মাতৃতন্ত্র প্রচলিত, কিন্তু তাহাদের সমাজে এক নারীর বহু পতি গ্রহণ প্রথা কোন কালে ছিল না। খাসিয়াদের সম্বন্ধে যাঁহার মত প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় সেই গার্ডন সাহেব তাঁহার *The Khasis* নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—

"There is no evidence to show that polyandry ever existed among the Khasis."

যাহা হউক, বিষয়টি বিতর্কমূলক এবং ইহার আলোচনার স্থান এখানে নয়।

এ তো গেল নাটকের তত্ত্বের দিক এবং 'এহ বাহ্য'; আসল দিক অর্থাৎ রসসৃষ্টির দিক দিয়া নাটকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। সংলাপ রচনায় লেখক যেমন সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তেমন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিতে। ভবতোষ, রমেশ, মাধবী আর ঝরণা এই কয়টি চরিত্রকে রক্তমাংসের জীব বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় বাস্তব-জগতে ইহাদিগকে যেন আমরা দেখিয়াছি। এই তথাকথিত শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত নরনারীদের কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক বাংলার সমাজ-জীবনের স্রোতোধারা জটিল পথে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সিচুয়েশন সৃষ্টির ক্ষমতা লেখকের আছে বলিয়া—'তা ছাড়া উপায় কি—আর উপায় কি। আমি যে আজ...মা।' ঝরণার এই আকুল উক্তি একেবারে মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাহার অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে।

আশার কথা সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মোড় ফিরিতেছে। কল্পনা ও রোমান্সের সুদূর নীহারিকা-লোক হইতে বাস্তবের ধূলিমলিন পরিবেশের মধ্যে নামিয়া আসিয়া তাহা সত্যাশ্রয়ী ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে। 'অন্তরাল' নাটকে দিগিন্দ্রবাবু আধুনিক কালের সেই বাস্তব ও নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন।

তর্পণ চুঁচুড়া, অক্ষয় শতকোৎসবের ব্যবস্থাপকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৯০, মূল্য আট আনা।

সম্প্রতি চুঁচুড়ায় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের শতকোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 'তর্পণ' পুস্তকখানি এই উপলক্ষ্যেই প্রকাশিত। ইহাতে অক্ষয়চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার বহু রচনাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সূক্তি-সমুচ্চয় নামক অধ্যায়ে তাঁহার অনেক মূল্যবান উক্তি 'সূত্রে মণিগণাঃ ইব' একত্রে গ্রথিত হইয়াছে। সাহিত্যস্রষ্টা এবং সাধারণীর সম্পাদক রূপে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমযুগের বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার সাহিত্য-গুরু নহেন—তাঁহার সাধারণী পড়িয়াই রাজনীতির ক-খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ-পড়া পর্য্যন্ত শিখিয়াছি।" অক্ষয়চন্দ্র যে কত বড় মনীষার অধিকারী ছিলেন বিপিনচন্দ্রের কথাগুলিই তাহার প্রমাণ। "তর্পণ" হইতে এই বিরাট্ পুরুষের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী কর্ম্মপ্রতিভা সাহিত্য-সাধনা এবং রচনা-নৈপুণ্যের আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা

গত ২রা ডিসেম্বর কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় পাঁচ সহস্র বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার আর্ট সোসাইটির পক্ষে মেয়র শ্রীদেবেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রখানি উপস্থাপিত করেন। সর মীর্জ্জা ইসমাইল দীর্ঘ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের গুণকীর্ত্তন করিয়া চিত্র উন্মোচন করেন। ধূপ, ধুনা, চন্দন, সুগন্ধপূরিত আবহাওয়ার মধ্যে কলিকাতা হইতে আগত কুমারী রমা ঘোষের নেতৃত্বে মাঙ্গলিকসম্ভার লইয়া পঞ্চ কন্যা (পুষ্পকুলকারণী, সুশীলা টৈণ্ডান, সবিতা মুখোপাধ্যায়, বি-এ, রাজ-কুমারী বেড়ুয়া, অরুণা বাগচী) চিত্র বরণ ও পুষ্পাঞ্জলি রবীন্দ্র-সঙ্গীতসহ প্রদান করেন।

সেই সঙ্গে কলিকাতার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি প্রতিকৃতি (শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর প্রদত্ত) এবং ঠাকুর-বংশের লেখক ও লেখিকাদের ২২৫ খানি পুস্তক সম্বলিত "টেগোর ফেমিলি কলেকশন" হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সার মীর্জ্জা ইসমাইল দ্বিজেন্দ্রনাথের চিত্রও উন্মোচন করেন। এই পুস্তকসংগ্রহে বিশ্বভারতী ১৭২ খানি পুস্তক (তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই ১৫৬খানি দান করিয়াছেন) সর রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া চিত্রদ্বয় ও পুস্তকসংগ্রহ সাগ্রহে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় মূক-বধির কল্যাণ-প্রচেষ্টা

বাংলাদেশে মূক-বধিরদের কল্যাণ-প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়েই কলিকাতায় তাহাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে, রাজধানী হইতে মফস্বলে এই কার্য্য প্রসারলাভ করে এবং বরিশাল, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া প্রভৃতি শহরে মূক-বধিরদের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের বাড়িটি দখল করায় সম্প্রতি ৭১ নম্বর তারক প্রামাণিক রোডের একটি ভাড়াটে বাড়িতে ইহার কার্য্য পরিচালনা হইতেছে।

বাংলাদেশে মূক-বধির বিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। এখানে তাহাদের শিক্ষার জন্য বৎসরে মাথাপিছু এক শত টাকা মাত্র খরচ করা হয়। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এতদ্বিষয়ক ব্যয়ের পরিমাণ মাথাপিছু যথাক্রমে ১০০ পাউণ্ড ও ১,১৪০ ডলার। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া এবং কুমিল্লার মূকবধির বিদ্যালয় দুইটি সরকারের নিকট হইতে একটি পয়সাও সাহায্য পায় না।

ভারতীয় মূক-বধির শিক্ষক মহাসঙ্ঘ (Convention) ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রদর্শনমূলক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিয়া এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অধিকাংশ দৈনিক এবং মাসিক পত্রের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মূক-বধিরদের হাতের কাজের একটি প্রদর্শনী সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লেডি লিনলিথগো এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই মূকবধিরগণ সমাজকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু আইন তাহাদিগকে ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধে রোমান আইনের বিধানও তথৈব চ। ফ্যাক্টরী আইনের বিধানে যোগ্যতা এবং শিক্ষাসত্ত্বেও তাহারা পৈতৃক বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে পারে না। স্পার্টানদের মধ্যে তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিবার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু মূক-বধির শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতিদ্বারা ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তোলা অসম্ভব নয়। তাঁহাদের প্রযত্নে বহু মূক-বধির ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। নানা কারুশিল্প শিক্ষার ফলে তাহারা আজ স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ নং তারক প্রামাণিক রোডে মূক-বধির কারিগরদের যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাহার উদ্বোধন করিতে গিয়া লাটপত্নী মিসেস কেসি উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠা এবং কর্ম্মিষ্ঠতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

মূক-বধির সমস্যা দেশ ও সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা। ইহার সমাধানকল্পে সরকার এবং দেশবাসী উভয়েরই সজাগ হওয়া উচিত। সার্জেণ্ট কমিটির নিখিল-ভারত যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় রিপোর্টে মূক-বধিরদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব ও আলোচনা ছিল তাহা সরকার কর্ত্তৃক ত্রুটিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া মূক-বধির শিক্ষক মহাসঙ্ঘ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে স্মারকলিপি দাখিল করেন তৎসম্বন্ধে সরকার এখনও উদাসীন। হিন্দু আইনের সংশোধনকল্পে রাও-কমিটি যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে পিতৃবিত্তে মূক-বধির সন্তানের দাবি স্বীকৃত হইয়াছে। মানবতার দিক দিয়া কাহারও এই বিলের বিরোধিতা করা উচিত নয়।

মূক-বধির মহাসঙ্ঘ বয়স্ক মূক-বধিরদের জন্য একটি শিল্প-শিক্ষা-কেন্দ্রের (Industrial Home) প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভব করিয়া আসিতেছেন। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিকল্পনা তাঁহারা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন। "মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা" দিবার এ সকল বিভিন্নমুখী কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বার্ষিক দুই টাকা চাঁদা দিলে মূক-বধির মহাসঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট সভ্য (Associate member) হওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণ ৫০, বণ্ডেল রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদারের নিকট জ্ঞাতব্য।

কিরণচন্দ্র রায় স্মৃতিভাণ্ডার

যাদবপুর এঞ্জীনিয়ারিং কলেজের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক পরলোকগত কিরণচন্দ্র রায়ের কৃতিত্ব কম নয়। তিনি এক জন সমাজহিতৈষীও ছিলেন। বর্দ্ধমানের বন্যার

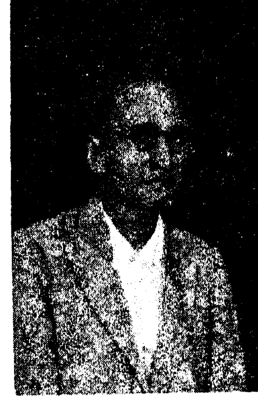
সময় দুর্গতদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কিরণচন্দ্র যাদবপুর এঞ্জীনিয়ারিং কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডারে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। টাকাকড়ি কিরণচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদকের নিকট কলেজ অফ্ টেক্‌নোলোজি, যাদবপুর, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিহারে যে-সব প্রবাসী বাঙালী, বিহারবাসী বাঙালীদের সুখসুবিধা ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মজঃফরপুরের হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি মজঃফরপুরের বিখ্যাত উকিল ছিলেন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বেতিয়া-রাজ এষ্টেটের উকিলের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত আইনজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে আর কেহ ছিল না। আইন ছাড়াও নানা বিষয়ে এবং বিবিধ দেশী ও বিদেশীয় ভাষায় তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত, আরবি, জার্ম্মান, ফরাসী ও গ্রীক ভাষার নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার কার্য্য শুধু ওকালতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত স্থানীয় মুখার্জ্জি সেমিনারী স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি খুব উন্নতি লাভ করে। এখন এটি শহরের অন্যতম উচ্চ ইংরেজী স্কুল। বহু বাঙালী ও বিহারী ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। স্থানীয় হরিসভা স্কুলটির সেক্রেটারীর কার্য্যও তিনি কিছুদিন করিয়াছিলেন। উক্ত স্কুলটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলার মাধ্যমে শিক্ষালাভের একমাত্র স্কুল। ইহা ছাড়া তিনি কিছুকাল বাঙালী সমিতির মজঃফরপুর শাখার সহকারী সভাপতির কার্য্য করেন। বাঙালীদের ওরিয়েণ্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি এক জন।



হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৭ই পৌষ সন্ধ্যায় তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স চুয়াত্তর বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মত ধর্ম্মপ্রাণ সরল ব্যক্তি আজকাল বিরল।

ইন্দুপ্রভা দেবী

'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' ও 'দৈনিক বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ইন্দুপ্রভা দেবী সম্প্রতি

কাশীধামে ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎই তিনি নানা অসুখে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র কৃতী পুত্র রামচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর তিনি একেবারে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়েন। পুত্রের মৃত্যুর মাস দুই পরে তাঁহার স্বামী পরলোকগত হন। উপর্য্যুপরি এই দুইটি প্রচণ্ড শোকের আঘাত সামলাইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না, কিছুকাল জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়া তিনি ইদানীং সকল জ্বালাযন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

ইন্দুপ্রভা একজন সাধ্বী, ধর্ম্মপরায়ণা এবং দানশীলা মহিলা ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য। ইন্দুপ্রভাও রামকৃষ্ণদেবের প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনকে তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, দশ হাজার নগদ টাকা ও প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র এবং একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য খড়দহের নিকটবর্ত্তী রহড়া গ্রামের ৪ খানি বাগানবাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন। তদুপরি শ্বশুরের স্মৃতিরক্ষার্থে তৎকর্ত্তৃক উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ জন্য তিনি ছয় লক্ষাধিক টাকা দান করেন।

চন্দ্রকুমার দে

পল্লীগীতিকার অক্লান্ত সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ময়মনসিংহ-গীতিকা রচনায় চন্দ্রকুমারের সংগৃহীত উপকরণ হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার 'ময়মনসিংহের পল্লী কবি কঙ্ক' ইত্যাদি কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনাথগোপাল সেন

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিখ্যাত লেখক, কাশিমবাজারের মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী অনাথগোপাল সেন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। কিছু কাল যাবৎ তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুর দিনও তিনি যথারীতি দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন, হঠাৎ বিকালের দিকে বিশেষ অসুস্থতা বোধ করেন এবং রাত্রে অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

অনাথগোপালের পৈতৃক বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রাম নামক স্থানে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। 'টাকার কথা' নামক অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তকখানা লিখিয়াই তিনি সাহিত্যিক মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং বাংলার অন্যান্য বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক পুস্তকখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অর্থনীতির দুরূহ এবং জটিল তত্ত্বসমূহকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বক্তৃতাও বেশ উপভোগ্য হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে তিনি অর্থনীতির অধ্যাপনা করিতেন।

অনাথবাবু একজন নীরব দেশসেবক ছিলেন। প্রথম ময়মনসিংহে আইনজীবী রূপে তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবন সুরু করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। "জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি" নামক তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকখানাও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় অনাথবাবুর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন

কানপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে এক জন কৃতী প্রবাসী বাঙালীর তিরোধান হইল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল চিকিৎসাব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া কানপুরে তিনি যে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা যে-কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মশক্তি শুধু চিকিৎসাক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা তিনি বাঙালী-অবাঙালী সকল সম্প্রদায়ের নিকটই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা। ১৯২২ সালে প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটির প্রবর্ত্তন হয় এবং ইহা যে প্রবাসে আজ সকল বাঙালীর প্রধান মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে তাহারও মূলে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে ডাঃ সেনের কর্ম্মতৎপরতা। তিনি ছিলেন ইহার প্রাক্তন সভাপতি। স্বদেশী লীগের সভাপতিরূপে তিনি মাতৃভূমির সেবা করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা বিস্তারেও তিনি যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন কানপুরে তৎপ্রতিষ্ঠিত দুইটি বিদ্যালয়ই তাহার প্রমাণ। প্রবাসে বাংলার অন্যতম মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানরূপে সুরেন্দ্রনাথ স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।



জীবন-ভার
শ্রীভবানীপ্রসাদ মিত্তল

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মশতকোৎসব

বিগত দশই ও এগারই পৌষ চুঁচুড়ায় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মশতকোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন সকালে কদমতলায় সাহিত্যাচার্য্যের পৈতৃক বাটীতে পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম এ মহাশয় মঙ্গলাচরণ করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। ঐ দিনকার উৎসবে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং প্রবাসীর তরফ হইতে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র যোগদান করেন। উৎসবস্থলে প্রদর্শিত অক্ষয়চন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যসম্ভার, তাঁহার রচনার পাণ্ডুলিপি এবং তাঁহার নিকট লিখিত দেশবিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিকদের পত্রাবলী দর্শকদের নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

অপরাহ্নে হুগলী মহসীন কলেজে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে অক্ষয়চন্দ্রের 'ভাই হাততালি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনা পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রমুখ সাহিত্যিকেরা অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বক্তৃতা করেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রেরিত অভিভাষণটি সভাস্থলে পঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উক্ত কলেজেই শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের পৌরোহিত্যে উদ্‌যাপিত হয়।

শতকোৎসবের উদ্যোক্তারা এই উপলক্ষে 'তর্পণ' নামে অক্ষয়চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।



রজনীকান্ত গুহ
(ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা বিবিধ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)

১২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৫২ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিগত মহাযুদ্ধের কারণ

ঘরে ও বাহিরে এখন যে হাওয়া বদলের চিহ্ন দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, যে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল তাহার ঘাত-প্রতিঘাত হয়ত বা অন্যভাবে চলিতে আরম্ভ হইবে। এই যে মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল এবং ইহার ২৭ বৎসর পূর্ব্বে যে মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছিল সেগুলির সম্পর্কে পুঁজিবাদী দেশগুলির ইতিহাসে অনেক রকম লেখা হইয়াছে এবং হইবে। প্রথম মহাযুদ্ধে যত দিন জার্ম্মানীর জয়পতাকা অগ্রসর হইতেছিল তত দিন সারা জগতে দিবারাত্র গণতন্ত্রবাদী মিত্রপক্ষের অধিকারীবর্গের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার তত্ত্বকথা সম্পর্কিত তারস্বরে চিৎকার শোনা গিয়াছিল, যুদ্ধের হাওয়া যখন ফিরিল তখন তাঁহাদেরও বক্তৃতার ধরণ ফিরিয়াছিল। এইবারও ঐ প্রকারই ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু এখন মনে হইতেছে বুঝিবা কালনেমীর লঙ্কাভাগে কিছু গলদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গতবারে যুদ্ধের শেষে বিজেতার দল—বিশেষতঃ ইংরেজ ও ফরাসী—যে ভাবে একদিকে স্বাধীনতা ও সাম্যের মন্ত্র জপ করিতে এবং অন্য দিকে পরস্বাপহরণ এবং দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য লোপে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন এবারেও সেইভাবে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখন গোল বাধাইয়াছে সোভিয়েট রুশ। সোভিয়েট রুশ যে এখনও সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় "সভ্যতা"র চরমে উঠিয়া প্রকৃত বিড়ালতপস্বীর ভেক গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহার নিদর্শন স্টালিনের মস্কো হইতে বেতার বক্তৃতায় পাওয়া যায়। জগৎ এতদিন শুনিয়া আসিয়াছে যে জগতে স্বাধীনতা ও শান্তিস্থাপনের অন্তরায় যে সকল দুষ্কৃত তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই এই দুই মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নামিতে হইয়াছিল। আজ কিন্তু স্টালিনের মুখে অন্য কথা শুনা যায় যথা :

"যুদ্ধ আকস্মিকভাবে আসে নাই—অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। উহা একচেটিয়া স্বার্থবাদের পরিণতি। কতকগুলি পুঁজিবাদী দেশ কাঁচামালের ব্যাপারে নিজকে অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যবান মনে করে এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা অবস্থার পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হয়। উহার ফলেই যুদ্ধ দেখা দেয়।

"মার্কসপন্থীরা বারবারই বলিয়াছেন, বিশ্ব-অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আক্রমণ ও সশস্ত্র সংগ্রামের উপরই গঠিত হইয়াছে। সমসাময়িক বিশ্বে ধনতন্ত্রবাদের প্রগতি কখনও শান্তির পথে চলে না—সঙ্কট ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াই উহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

"আসল কথা এই যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অসাম্য সাধারণতঃ সমগ্র বিশ্বের অবস্থাকে বানচাল করিয়া দেয়। কাঁচামালের ব্যাপারে যাঁহারা কম সৌভাগ্যবান, তাঁহারা অস্ত্রের সাহায্যে অবস্থা নিজেদের অনুকূলে আনিতে চেষ্টা করেন। যুদ্ধকালে পুঁজিবাদী বিশ্ব বিভিন্ন বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রপ্তানী বাজার যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে হয়ত যুদ্ধকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইত। কিন্তু বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ত্তমানে যে পুঁজিবাদ রহিয়াছে, তাহাতে উহা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা প্রথম মহাযুদ্ধকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও সংঘটিত হয়। যাহারা দেশ, গবর্মেণ্ট ও পার্টির সামনে নিজেদের মুখরক্ষা করিতেই চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সকল মুখোস সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফলে খসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের সকল দোষ-ত্রুটি নগ্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

স্টালিনের এই উক্তি তাঁহার যুদ্ধের মিত্রদের কর্ণে মধু বর্ষণ করিবে না ইহা সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও সন্দেহের স্থান নাই যে সোভিয়েটের মুখপাত্রগণের এইরূপ বেখাপ্পা খাঁটি কথা, ও বেয়াড়া আচরণের ফলে পাশ্চাত্য "সভ্যজগতে" বেশ কিছু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। মেটারনিখ্‌ ও মাকিয়াভেলির কূটরাজনীতির লীলাভূমি ইউরোপে এতদিন সাম্রাজ্যবাদের যে ঐকতান আজ দেড় শতাব্দী যাবৎ সমানে বাজিতেছিল তাহার মধ্যে এই প্রথম তাললয় ভঙ্গের চিহ্ন দেখা দিল। এই রসভঙ্গের শেষ নিষ্পত্তিতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় নিশ্চিত, তবে সেটা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সম্প্রতি ইহার ফলে দুর্ব্বল ও উৎপীড়িত জাতিবর্গের অল্পবিস্তর অদৃষ্টের ফের হইবেই এবং যে যে দেশের নেতৃবর্গ সজাগ ও সাহসী সে সকল দেশই স্থায়ী ভাবে সুফল অর্জ্জনে সমর্থ হইবে। অন্য দিকে যে সকল অভাগা দেশের নায়ক অদূরদর্শী, অবিবেচক বা ভীরু তাহাদের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন থাকিয়াই যাইবে, কেননা, ইতিহাসের চাকা এত দিনে নূতন দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে একথা যে কূপমণ্ডূক বুঝিতে অক্ষম সে পথ নির্দ্দেশ করিবে কি করিয়া?

বলপ্রয়োগের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিপ্রয়োগ

সোভিয়েট রুশের এইরূপ আচরণের ফলে দূর ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী জাতিবর্গ অস্ত্রবল ছাড়িয়া বুদ্ধিবল আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট সাত দফা শর্ত্ত লইয়া স্বাতন্ত্র্যবাদী ইন্দোনেশিয়গণের সহিত বুদ্ধি পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই সাত দফার প্রত্যেকটির—বিশেষতঃ চতুর্থটির, যাহাতে রাজপ্রতিনিধির কয়েকটি বিশেষ অধিকারের কথা আছে—বিচার ঠিক ভাবে না করিতে পারিলে ইন্দোনেশিয়গণের অবস্থার উন্নতি সুদূরপরাহতই থাকিবে। ফ্রান্সও তাহার সাম্রাজ্যে ঐরূপ এক ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও দুই নৌকায় পা দিয়াই চলিতেছেন। এক দিকে উচ্চতম অধিকারিবর্গ আন্তর্জাতিক অবস্থা দেখিয়া অস্ত্র চালনা যুক্তিযুক্ত নহে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া বুদ্ধি-কৌশলের প্রয়োগের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন, অন্য দিকে এদেশে দমননীতি চালক রক্তপিপাসু সারমেয়কুল এই সুদীর্ঘ চার বৎসর কাল নিরস্ত্র জনসাধারণের রক্তাস্বাদন করিবার পর হঠাৎ পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহাদের ধারণা এদেশের অন্তর্বিরোধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়া এবং স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা রক্তপ্লাবনে ডুবাইয়া তাহারা সাম্রাজ্য শাসনের বাগডোর পূর্ব্বের ন্যায়ই হাতে রাখিতে পারিবে।

লিখিবার সময় কলিকাতায় আবার গুলি চলিয়াছে, আবার নিরস্ত্র বালক ও শিশুর রক্তে "ইউনিয়ন জ্যাক্" রঞ্জিত করা হইয়াছে। যত দিন এদেশের কর্ত্তারা তাঁহাদের "রক্ষক" দলকে সভ্যজগতের নিয়মকানুন মানিতে শিখাইতে না পারিবেন, তত দিন এদেশে শান্তির আশা করা বৃথা। এবং এদেশে শান্তির স্থাপনা না হইলে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য্য অস্তাচলের পথে দ্রুতই চলিতে থাকিবে একথা এখন অনস্বীকার্য।

লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা

লর্ড ওয়াভেল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের ইচ্ছা স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল। তিনি চাহেন যে এদেশের প্রতিনিধিবর্গ এখন তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দের সহিত সহযোগিতা করে এবং শান্তি ও সৌজন্যের হাওয়া চালিয়া ব্যবস্থাপক সভায় জাতীয়বাদীদলের উষ্মা নিবারণ করে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার প্রধান ও বিষম ভুল এই যে তিনি এই অসহযোগিতা ও উষ্মার মূল কারণ ধরিতে পারেন নাই। যত দিন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের স্থায়ী কর্ম্মচারীবর্গ এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সহিত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য সহযোগ রাখিবে, যত দিন এদেশের পুলিস বিনা বাধায় দেশের লোকের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে, তত দিন বড়লাটের পক্ষে শান্তির আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন বৃথা।

এই সেইদিন কলিকাতায় সুভাষ-দিবসে এই নগরীর ইতিহাসে বৃহত্তম শোভাযাত্রা বিনা বিবাদ-বিসম্বাদে অতি শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে নগর পরিক্রমা করিল। পুলিস "শান্তিরক্ষা" করে নাই, সুতরাং শান্তিভঙ্গ হয় নাই। আজ অকস্মাৎ আবার সেই হরতাল হট্টগোল, চতুর্দ্দিকে বিক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ। লর্ড ওয়াভেল যদি সত্যই এদেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহেন তবে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে এদেশে শাসকের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিতে হইবে। সভ্যজগতে অনুরূপ অবস্থায় কি ব্যবস্থা হয় তাহা সবিশেষে দেখিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা এদেশে করিতে হইবে। দেশশাসনের নামে নিরস্ত্রের উপর এরূপ আক্রমণ কারণে অকারণে যেন না ঘটে এই ব্যবস্থা যত দিন না হয় তত দিন এদেশের অশান্তি ও আন্দোলন কোন মতেই ক্ষান্ত হইতে পারে না।

নির্ব্বাচনে সরকারী পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

মুসলমান নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহের নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এরূপ অভিযোগ উঠিয়াছে। অভিযোগ বিশ্বাস করিবার মত ঘটনাও অনেকগুলি ঘটিয়াছে। গত কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগের মুখপত্র "ডন" লিখিয়াছিলেন যে লীগ-বিরোধীরা যেন ইষ্টকবৃষ্টির দ্বারা অভ্যর্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সেই সময়েই ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। লীগ-মুখপত্র এই উক্তি প্রত্যাহার করেন নাই। ইহা অপেক্ষা অনেক কম প্ররোচনা-দানের অভিযোগে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ সরকারের হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছে, কিন্তু 'ডনে'র এবং লীগের অন্যান্য পত্রিকাসমূহে অনুরূপ বা ততোধিক উত্তেজনামূলক মন্তব্য বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা গবর্মেণ্ট করেন নাই।

এদেশে গবর্মেণ্ট বলিতে লোকে লাট বড়লাট বুঝে না, গবর্মেণ্ট বলিতে জনসাধারণ চেনে ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব, মহকুমা হাকিম ও থানার দারোগা প্রভৃতিকে। গবর্ণর কেসি নির্ব্বাচনে গুণ্ডামি বন্ধ করিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরও লীগওয়ালাদের গুণ্ডামি বন্ধ হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের সহায়তায় উহা অব্যাহত ভাবেই চলিয়াছে। প্রায়ই এ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, আমরা শুধু দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হইব।

মৈমনসিংহ জেলার গফরগাঁও গ্রামে লীগ সম্মেলনের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র কৃষকেরা বিক্ষোভ প্রকাশ করিলে পুলিস তাহাদের উপর গুলি চালাইতে ইতস্ততঃ করে নাই। নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি, সার নাজিমুদ্দীন প্রভৃতি লীগনায়কেরা ট্রেন হইতে অবতরণের সময় বিরোধী দল বিক্ষোভ প্রকাশ করিলে পুলিস তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। লীগ নেতাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল অথবা তাঁহাদিগকে জনতার আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গুলি চালাইতে হইয়াছিল এমন কথা পুলিসও বলিতে পারে নাই। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার পর লীগের অধিবেশন সুরু হয় এবং পুলিস বশম্বদ ভৃত্যের ন্যায় বাহিরে প্যাণ্ডাল পাহারা দেয়। অপর পক্ষে এই জেলাতেই সর আব্দুল হালিম গজনবীর নির্ব্বাচনের সময় লীগওয়ালা গুণ্ডারা লাঠি, রামদাও ইত্যাদি লইয়া তাঁহার কর্ম্মীদের আক্রমণ করিয়াছে মৌলবী ফজলুল হক যে বাসে যাইতেছিলেন তাহা ভাঙিয়া দিয়া লোকজনকে মারপিট করিয়াছে, সর আব্দুল হালিমের পক্ষের অনেক লোককে মারাত্মক ভাবে আহত

করিয়াছে, অথচ এই সকল ক্ষেত্রেই পুলিস নিরপেক্ষ দর্শকরূপে বিরাজ করিয়াছে। মৈমনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইয়াছে তথাপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা গবর্ণর ইহাকে সংযত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। এই ব্যক্তির সাহস এত দূর বাড়িয়া গিয়াছে যে গফরগাঁওয়ে উপরোক্ত ঘটনার পর ইনি কৃষকপ্রজা দলের বহু বিশিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীদের কোন না কোন অছিলায় মামলা সোপর্দ্দ করিয়া এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে মামলা লইয়াই ইঁহাদিগকে বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। ক্ষমতার অপব্যবহারের ও উহার প্রকাণ্ড প্রশ্রয় দানের এরূপ দৃষ্টান্তই আজকাল নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় ঘটনাও এই জেলারই অপর একটি স্থানে ঘটে। ভৈরববাজার ষ্টেশনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরকে রেলগাড়ীতে চড়াও হইয়া লীগের গুণ্ডারা মারপিট করে ও তাঁহাকে আহত করে। এক্ষেত্রেও ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষ ও পুলিস নীরব দর্শকরূপেই বিরাজিত ছিল।

প্রাদেশিক নির্ব্বাচন আসন্ন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কয়টি আসন দখল করিতে পারেন তাহার উপর বাংলার ভাবী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন নির্ভর করিবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকেন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ, এই অঞ্চলে মুসলমান আসনের সংখ্যাও সব চেয়ে বেশী। শ্রীহট্টে জমিয়েত উল উলেমার সহিত লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও দেখা গিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট অঞ্চলেই তাঁহাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। সুতরাং লীগের বর্ত্তমানে লক্ষ্য পূর্ব্ববঙ্গ, এবং এইজন্য এই অঞ্চলেই লীগের গুণ্ডামি সবচেয়ে বেশী। কৃষক-প্রজা দল, জমিয়েত-উল উলেমা প্রভৃতির এক একটা কর্ম্মসূচী আছে, লীগের তাহা নাই। এই নির্ব্বাচনে লীগের একমাত্র বক্তব্য "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান"। ইহার জন্য কলিকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে অবগুণ্ঠনমণ্ডিত পুলিসের সম্মুখে ছোরা, লাঠি ও টিনের তলোয়ার নাচানও হইয়া গিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ইহারই জের চলিবে তাহা জানা কথা, বিশেষতঃ লীগ যেখানে জানে পুলিস ও গবর্ন্মেণ্ট কর্ম্মচারী তাহারই দলে আছে।

গবর্ন্মেণ্টকে আমরা একটি সোজা প্রশ্ন করিতে চাই। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য কায়েম রাখিবার জন্য লীগকে জীয়াইয়া রাখা প্রয়োজন, তাঁহাদের এ মনোভাব বুঝা যায়; কিন্তু সেই স্বার্থ সাধন করিতে গিয়া তাঁহারা প্রকাশ্যে পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করিতেছেন কি না? এখনও কি তাঁহারা বলিতে চান যে নির্ব্বাচন ব্যাপারে গবর্ন্মেণ্ট নিরপেক্ষ? জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা যেখানে লীগের বিরুদ্ধে শান্তভাবে মৌখিক প্রতিবাদ জানাইতে আসিয়াছে সেখানে তাহাদের উপর গুলি চালাইতে গবর্ন্মেণ্ট মুহূর্ত্তের তরেও কুণ্ঠিত হন নাই, অথচ জাতীয়তাবাদী দলের লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে লীগের গুণ্ডার হাতে মারাত্মক ভাবে আহত হইতে দেখিয়াও পুলিস হস্তক্ষেপ করে নাই। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, লীগ গুণ্ডাদের হাতে উপদ্রুত লোককে উদ্ধার করিবার জন্য পুলিস অগ্রসর হইয়াছে এমন কথাও আমরা শুনি নাই। গবর্ন্মেণ্টের স্থায়ী কর্ম্মচারিদিগের অযোগ্যতা, অপদার্থতা এমনকি দুর্নীতিপরায়ণতা বহুক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; অবশিষ্ট আছে স্বাতন্ত্র্যবিরোধী প্রচ্ছন্ন চক্রান্তে পটুত্ব। এই গুণ্ডামির মুখোস যত শীঘ্র খসিয়া পড়ে ততই ভাল।

যশোহরে সৈয়দ নৌশের আলির উপর আক্রমণ

যশোহর হইতে আবার এক ভীষণ গুণ্ডামির সংবাদ আসিয়াছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত স্থানীয় কোন কর্ম্মচারী এই গুণ্ডামির প্রশ্রয়দাতা। গত কয়েক বৎসরে বহু লীগওয়ালা মুসলমান কর্ম্মচারী অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা হাকিম প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। লীগের প্রতি ইঁহাদের প্রকাণ্ড পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বহুবার বহুক্ষেত্রে উঠিয়াছে, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট উহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যে সব লোককে অবিলম্বে পদচ্যুত করা সরকারের কর্ত্তব্য ছিল, সেই সব কর্ম্মচারীর অত্যাচার তাঁহাদের প্রশ্রয়ে আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় হওয়া উচিত নয়, অথচ এদেশে তাহাই ঘটিতেছে। ২৮শে মাঘ তারিখের দৈনিক বসুমতীতে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে।

> যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার নহাটা গ্রাম হইতে মুসলিম লীগের দলবদ্ধ গুণ্ডামীর আর এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী লীগের পেশাদার গুণ্ডা ও ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালগণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার বঙ্গীয় পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ নৌশের আলির সমর্থকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় ঢাল, সড়কি ও লাঠিসহ হানা দেয় এবং সমবেত শান্ত জনসাধারণকে যথেচ্ছভাবে মারপিট করিতে থাকে। তাহাদের মারপিটের ফলে বহু লোক সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে এবং সম্পত্তির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সৈয়দ নৌশের আলি সভায় কয়েক মিনিট বক্তৃতা করিবার পরই এই আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল যথেচ্ছ মারপিট চলে। রাজ-কাছারীর প্রাঙ্গণে এই সভা হইতেছিল। সৈয়দ নৌশের আলিকে রাজ-কাছারির অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।
>
> রাজ-কাছারিও লীগ গুণ্ডাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সৈয়দ নৌশের আলির সমর্থক মৌলবী হবিবর রহমান মাগুরা হইতে একখানি মোটর গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াছিলেন। গুণ্ডারা সেখানি ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করে। পূর্ব্ব পরিকল্পনা ও পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারেই এই আক্রমণ চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোন কোন মহলের ধারণা যে, কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সরকারী অফিসার এই ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।
>
> প্রকাশ, লীগ গুণ্ডাদের আক্রমণে মিঃ নৌশের আলির সমর্থকগণও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং গুণ্ডাদের আক্রমণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শান্ত করিয়া বলেন যে, তাঁহারা কংগ্রেসের সেবক। হিংসা ও গুণ্ডামী তাঁহাদের নীতিবিরুদ্ধ।

মিঃ নৌশের আলি যে মোটরলঞ্চে মহাটায় গিয়াছিলেন, গুণ্ডারা তাহার উপরও চড়াও হয়; কিন্তু লঞ্চের চালক প্রাণভয়ে লঞ্চ লইয়া পূর্ণ বেগে পলায়ন করে। গুণ্ডারা কতকগুলি নৌকা লইয়া মোটরলঞ্চের পশ্চাদ্ধাবন করে; কিন্তু লঞ্চ পূর্ণ বেগে চলিতে থাকায় তাহারা ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসে।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যশোহরের অন্যান্য মহকুমায় এইরূপ কোন গুণ্ডামী না হইলেও মাগুরা মহকুমায় দলবদ্ধ ভাবে লীগ দলের এই দ্বিতীয় গুণ্ডামী।

সিন্ধুতে লীগ মন্ত্রিত্ব

সিন্ধুর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার পর লোকে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহাই ঘটিয়াছে। সিন্ধু-লাট সর্ ফ্রান্সিস মুদী সংখ্যালঘু লীগ দলকেই মন্ত্রিত্বের গদীতে বসাইয়া দিয়াছেন।

গবর্ণরের এই কাজ যেমন অপরূপ তেমনই নিয়মতন্ত্রবহির্ভূত হইয়াছে। পরিষদে লীগ দল ও কংগ্রেস কোয়ালিশন দল সংখ্যায় সমান সমান, উভয়েরই সদস্যসংখ্যা ২৮। একজন শ্রমিক সদস্য আছেন, তিনি কংগ্রেস-সমর্থক। অতএব কংগ্রেসের পক্ষে ২৯, লীগের পক্ষে ২৮ জন সদস্য পরিষদে থাকিবেন। তিন জন ব্রিটিশ।

লীগদলকে মন্ত্রিত্ব গঠনে আহ্বান করায় নিয়মতান্ত্রিক রীতি তিন বার ভাঙা হইয়াছে। প্রথম, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বাদ দিয়া সংখ্যালঘু দলকে মন্ত্রিত্ব গঠনে আহ্বান; দ্বিতীয়, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দলকে বাদ দিয়া উহা অপেক্ষা সংখ্যায় কম নিছক সাম্প্রদায়িক স্বার্থসর্ব্বস্ব দলের একটিমাত্র সম্প্রদায়ের হাতে মন্ত্রিত্ব গঠনের ভার অর্পণ; তৃতীয়, মন্ত্রিমণ্ডলে সংখ্যালঘু শক্তিশালী দলের প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য রাজকীয় উপদেশ-পত্রে যে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ। কংগ্রেসকে ধাপ্পা দিয়া হিন্দু মন্ত্রী সংগ্রহের যে চাল লীগওয়ালারা চালিতে গিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

গবর্মেণ্ট ও লীগ উভয়েরই চক্রান্ত ও নিয়মতান্ত্রিক ন্যায়নিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি বলিয়াছিলেন, কোন প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবে না। আসামে লীগের মন্ত্রিত্বলাভের আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের নির্ব্বাচন ফল যত দূর প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ দুটি প্রদেশেও লীগ মন্ত্রিত্ব গঠনের আশা বাতুলতা, লীগকর্ত্তারা ইহা বুঝিয়াছেন। সিন্ধুতে লীগ ২৭টি আসন দখল করিলেও ভোটসংখ্যা বিবেচনায় দেখা যায় লীগ ও জাতীয়তা-বাদী দল প্রায় সমান শক্তিশালী। নির্ব্বাচন কেন্দ্র ভাল ভাবে গঠিত হইলে জাতীয়তাবাদী দলের যেখানে অন্ততঃ ১৫টি আসন পাওয়া উচিত ছিল, সেখানে তাঁহারা পাইয়াছেন মাত্র ৮টি। সুতরাং পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আশা পরিত্যাগ করিয়া লীগনায়কেরা এবার ইংরেজ লাটের সহিত চক্রান্তের সাহায্যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

লর্ড ওয়াভেল হইতে সুরু করিয়া খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বিনয়রঞ্জন সেন পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে দেশবাসীকে আবার এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। সংবাদটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, ভয়াবহ তো বটেই।

সর্ব্বপ্রথমে সংবাদটি প্রকাশ করেন মিঃ বিনয়রঞ্জন সেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃত-প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার মূল কথা এই যে, (১) ঘূর্ণীবাত্যা ও অনাবৃষ্টির দরুণ দেশে এবার ভীষণ খাদ্যাভাব ঘটিবে, (২) যে সব স্থানে রেশন চালু হইয়াছে সে সব স্থানের কর্ত্তৃপক্ষকে বরাদ্দ খাদ্য কমাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, (৩) খাদ্যশস্যের রিজার্ভ তাঁহারা মজুত করিতে পারেন নাই, এবং (৪) গত বৎসর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য তাঁহারা আমদানী করিয়াছেন প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষের ভাবগতিক দেখিয়া স্বদেশবাসীদের জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে এবার যে দুর্ভিক্ষ হইবে, বাংলার গত দুর্ভিক্ষ তাহার কাছে চড়ুইভাতি বলিয়া মনে হইবে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এবার দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেই বেশী হইবে। লর্ড ওয়াভেল স্বয়ং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও আসিয়াছেন।

বাংলার গত দুর্ভিক্ষের দায়ি গবর্মেণ্ট প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত যে দুর্ভিক্ষের জন্য সরকারের অদূরদর্শিতা, অযোগ্যতা ও কর্ম্মচারীদের অসাধুতা প্রকৃতপক্ষে দায়ী। আবার যে দুর্ভিক্ষ আসিতেছে তাহার জন্যও দেশবাসী প্রধানতঃ ভারত-সরকারকেই দায়ী করিবে।

১৯৪৩ সালের ১৫ই জুলাই গ্রেগরী কমিটি দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত-সরকারকে যে সব মূল্যবান সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন তাহার একটিও তাঁহারা প্রতিপালন করেন নাই। এই সব পরামর্শ অনুসারে গত আড়াই বৎসর কাজ হইলে আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারিত, ইহা জোর করিয়াই ভারতবাসী বলিবে।

গ্রেগরী কমিটি প্রথমেই বলিয়াছিলেন দেশে ফসলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেমন দরকার, বাহির হইতে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করাও তেমনই প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ভারত-সরকার সব সময়ে নিজের হাতে পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত না রাখিলে খাদ্যসমস্যা সমাধানের কোন কূল-কিনারাই পাইবেন না। কমিটি ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে এই রিজার্ভ গঠন করিলেই ভারত-সরকারের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না, এই পাঁচ লক্ষ টন ফসল হাতে থাকিলে তবেই তাঁহাদের পক্ষে রেশন এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল করিয়া চালান সম্ভব হইবে। এই রিপোর্ট রচনায় সময়, ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ খুব তীব্র ভাবেই চলিতেছিল, তথাপি সব দিক বিবেচনা করিয়াই কমিটি বলিয়াছিলেন, এই পরিমাণ ফসল সংগ্রহে ভারত-সরকারের অক্ষমতার সঙ্গত কারণ নাই। এ বৎসর পৃথিবীর সবদেশেই ফসল কম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই সকলেরই টানাটানি পড়িতেছে, কিন্তু গত দুই বৎসর এরূপ হয় নাই। গত বৎসর ভারত-সরকার আন্তরিক চেষ্টা করিলে অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডায় অতিরিক্ত গমের চাষ করাইয়া তাহা আনিয়াও

ব্যবস্থা করিতে পারিতেন বলিয়াও আমরা মনে করি। ভারতবর্ষে যে সব বিদেশী সৈন্য মোতায়েন ছিল তাহাদের জন্যই প্রতিবৎসর প্রায় ৮ লক্ষ টন খাদ্য জোগাইতে হইয়াছে। ভারত-সরকার চেষ্টা করিলে এই পরিমাণ খাদ্য সরবরাহে ব্রিটিশ আমেরিকান কম্বাইণ্ড বোর্ডকে বাধ্য করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই করেন নাই।

গ্রেগরী কমিটির দ্বিতীয় পরামর্শ, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি। ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের নামে ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারেরা লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করিয়াছেন। গ্রেগরী কমিটির মূল বক্তব্য এই ছিল যে বেশী জমিতে আবাদ করার চেয়ে যে জমি চাষে আছে তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা অবিলম্বে করা দরকার। জমির সারের ব্যবস্থা ও সেচ-প্রণালীর উন্নতি হইলে খুব শীঘ্র ফসল উৎপাদন বাড়িতে পারে ইহা তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন। সার সম্বন্ধে তাঁহারা পরামর্শ দিয়াছিলেন যে বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট ভারতবর্ষে তৈরি করার বন্দোবস্ত খুব শীঘ্রই করা যায় এবং এরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ভারত-সরকার ঋণ ও ইজারা চুক্তি অনুসারে আমেরিকা হইতে আনাইয়া দিতে পারেন। ভারত-সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, কারণ ইহাতে ইম্পি-রিয়াল কেমিকাল কোম্পানীর ক্ষতি হইবার কথা। প্রস্তাবিত কারখানার মালিকানা লইয়া বহু দরকষাকষির পর ব্যাপারটা প্রায় ধামচাপা পড়িয়াই রহিয়াছে। যে বড়লাটের আমলে ইহা ঘটিয়াছিল, সেই লর্ড লিনলিথগো দেশে ফিরিয়া ইম্পিরিয়াল কেমিকাল কোম্পানীর ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। সেচবিষয়ে ভারত-সরকারের পরামর্শদাতা সর উইলিয়াম ষ্টাম্প বলিয়াছিলেন, বড় বড় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে সময় লাগিবে কিন্তু নলকূপের সাহায্যে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন সহজ, অবিলম্বে দেশের বহু স্থানেই উহা করা যায়। কূপ এবং পুকুর খুঁড়িয়া ও পরিষ্কার করিয়াও ক্ষেতে জল সেচে অনেক সাহায্য করা যায়। গ্রেগরী কমিটি প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু ভারত-সরকার উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নাই।

গ্রেগরী কমিটির তৃতীয় পরামর্শ, অবিলম্বে গো-হত্যা নিবারণ। ভারতীয় কৃষিতে গবাদি পশুর আবশ্যকতা মূর্খেও বুঝিতে পারে, বুঝিতে পারেন নাই ভারত-সরকার। সৈন্যদলের উদরপূর্ত্তির জন্য নির্ব্বিচারে গো-হত্যা নিবারণার্থ অবিলম্বে আইন করিতে কমিটি পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন অন্যান্য আইনের ন্যায় এই আইনে ফাঁকি দিবার কোন ছিদ্র যেন রাখা না হয়। ইহার পর প্রাদেশিক সরকারেরা একটা লোক-দেখান হুকুমনামা জারী করিয়াছেন কিন্তু উহাতে বেশী কাজ হয় নাই। ইহা ছাড়া গবাদি পশুর খাদ্য সরবরাহের প্রয়ো-জনীয়তা সরকার একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। বাংলায় লবণের অভাবে বহু গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। সৈন্যদলের কবল হইতে যে সব পশু রক্ষা পাইয়াছে, গো-মড়কে তাহারাও মরিয়া উজাড় হইয়াছে।

গ্রেগরী কমিটির চতুর্থ পরামর্শ, লাঙলের ফাল, কোদাল, কাস্তে প্রভৃতি কৃষকের প্রয়োজনীয় লোহার যন্ত্রপাতি স্বল্প মূল্যে প্রয়োজনানুসারে সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হউক। ইহার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য কমিটি বলিয়াছিলেন ব্রিটেন নিজে কৃষকের যন্ত্রপাতিকে যুদ্ধের সরঞ্জামের (মিউনিশনসের) তালিকাভুক্ত করিয়াছে। এখানে ভারত-সরকারের ইস্পাত কণ্ট্রোলের দৌলতে কৃষকের যন্ত্র-পাতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া কৃষিকার্য্যে বাধাসৃষ্টি করিয়াছে।

গ্রেগরী কমিটির পঞ্চম পরামর্শ, পাট ও তুলা প্রভৃতির চাষ কমাইয়া খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি। তুলা সম্বন্ধে সামান্য কিছু করা হইলেও পাটের চাষে বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়াছে। যে জমিতে পাটচাষ হইলে যথেষ্ট হইত তাহার বহু বেশী জমিতে চাষের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজ-আমে-রিকার স্বার্থে ভারত-সরকারের নির্দ্দেশে এরূপ ঘটিয়াছে।

উডহেড কমিশন গ্রেগরী কমিটির সুপারিশগুলি সময়োপ-যোগী এবং কার্য্যকরী বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং দেখিয়া-ছেন উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। উডহেড কমিশনও বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার আন্তরিক চেষ্টা করিলে বার্ষিক দশ লক্ষ টন গম আমদানী এবং পাঁচ লক্ষ টন রিজার্ভ গঠনের আবশ্যকতা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে দিয়া স্বীকার করাইতে ও তদনুসারে কাজ করাইতে পারিতেন। তাহা না করিয়া দুর্দ্দিন ডাকিয়া আনিয়া শেষমুহূর্ত্তে ভারত-সরকার কম্বাইণ্ড বোর্ডের নিকট চাউল ভিক্ষার জন্য একজন আপিসের কেরানী পাঠাইয়া কর্ত্তব্য সমাধান করিতে চাহিয়াছেন। ইহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবাসার খাদ্যসরবরাহের দায়িত্ব কাহার? দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বহির্ব্বাণিজ্য উভয়েরই স্বাভাবিক গতি সরকারী কণ্ট্রোলের দৌলতে কণ্টকিত ও বিপর্য্যস্ত। বাহিরের খাদ্য আমদানী করা দেশবাসীর পক্ষে যেমন অসম্ভব গ্রেগরী কমিটির পরামর্শানুসারে কাজ করাও তেমনি অসাধ্য। সামান্য চেষ্টা হয়ত সম্ভব হইতে পারে, স্বাবলম্বনের ক্ষুদ্রতম চেষ্টাও প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় ইহাও স্বীকার করি, কিন্তু সমস্যার ব্যাপক সমাধান সরকারী চেষ্টা ভিন্ন সম্ভব নয়।

শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির আত্মপ্রকাশ

দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর গুপ্ত জীবন যাপনের পর শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি আত্মপ্রকাশ করিয়া কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে বক্তৃতা করেন। তাঁহার নামে যে ওয়ারেণ্ট ছিল ভারত-সরকার তাহা প্রত্যাহার করাতেই এই আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে। তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুলিস চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

দেশবন্ধু পার্কের সভায় শ্রীমতী অরুণা দুই লক্ষ নরনারীকে সম্বোধন করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

> "নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট জানাল, ধরবার ক্ষমতা তাদের নেই এবং আমাকে ধরার ক্ষমতা নেই বলেই আজ ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আমার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা তোলার পরে বাইরে এসেও নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হচ্ছে না। তার চেয়ে যে রকম জীবন এতদিন যাপন করছিলাম সেই

জীবনই বেশী স্বাধীন বলে মনে হচ্ছে। সেই জীবনে ভাল কাজ করেছি। আমার কাজ দেখে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আবার আমাকে ধরতে পারে। যারা বাইরে বাইরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদেরও স্বাধীন বলা চলে না। যত দিন না নাগরিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয় তত দিন স্বাধীন বলে মানব না।

যে গোলামি নষ্ট করার জন্য এই স্থির করে বেরিয়েছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চুরমার করে দিয়ে ঘরে ফিরব সে কাজ সফল হয় নি। স্বাধীনতা আমরা পাই নি। জেলে বন্দীদের উপর কি রকম ব্যবহার করা হয় তা আপনারা প্রত্যহই শুনছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দিগণ ও কাকোরী মামলার বন্দিগণ এবং ভারতের বিভিন্ন কারাগারে যে সমস্ত বন্দী আছেন তাঁদের সকলকে যত দিন আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে না পারব তত দিন ভারতের স্বাধীনতা আগতপ্রায় সে কথা আমরা বলতে পারব না।"

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের মর্ম্মবিদারী অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমতী আসফ আলী বলেন,

"সে সময় আমি কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম। এক দিন রাত্রির অন্ধকারে একটি মৃতদেহে আমার পা ঠেকে। সে অভিজ্ঞতা এখনও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। শিশু-ক্রোড়ে মাতার কাতরোক্তি, ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কাতর ক্রন্দন—মা একমুষ্টি ভাত—সেই কাতরোক্তি আমি কখনও ভুলতে পারব না। সে কেউ ভুলতে পারবে না। তার প্রতিশোধ দেশবাসী নেবে। ৩৫ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা গেল। তাদের বাঁচান গেল না। এই দুর্ভিক্ষের কথা শুনে নেতাজী বাংলায় চাল পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাণে এতটুকু করুণার উদ্রেক হ'ল না। সে চাল আনার কোনই ব্যবস্থা হ'ল না।"

ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হইবে ব্রিটেন কর্ত্তৃক সেই তারিখ নির্দ্ধারণের কথা আলোচনা করিয়া শ্রীমতী অরুণা বলেন, সে ভার ব্রিটেনের নহে। ভারতে জনসাধারণ যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইবে তখন তাহারাই সেই তারিখ স্থির করিবে। বৈপ্লবিক ভারত সুগঠিত ভারত সেই তারিখ নির্দ্ধারণ করিবে। সে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ওয়াভেলের প্রয়োজন হইবে না।

শ্রীমতী অরুণা অক্লান্ত কর্ম্মী। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার, পল্লীবাসীদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথাই তিনি বিশেষভাবে সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন। আগষ্ট-আন্দোলনে মেদিনীপুর, বালিয়া, সাতারা, অষ্টি চিমুর প্রভৃতি গ্রামের জনসাধারণ সাড়া দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহারাও আর পিছনে পড়িয়া নাই। তিনি বলেন এই আন্দোলনে জনতা যে পথে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে কংগ্রেসকেও সেই পথেই চলিতে হইবে। কারণ জনতার দ্বারাই কংগ্রেস গঠিত। বিদেশী বর্জ্জনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচার চালাইতে বলেন।

বিনাবিচারে আটক বন্দীদের অবস্থা

আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে আটকবন্দী ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া ব্রিটিশ শ্রমিকদলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির কাছে এক পত্র লিখিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃসহ অবস্থার কথা বিবৃত করিয়াছেন। কারাগারের অত্যাচার সম্বন্ধে ডাঃ লোহিয়া বলিতেছেন:

"আমাকে প্রহার অথবা আমার পায়ের মাথায় সূচিবিদ্ধ করা হয় নাই সত্য; কিন্তু শুধু প্রহার ও বেত্রাঘাত দ্বারা মৃত্যু ঘটান অথবা মৃত্যুর উপক্রম করা এবং মানুষের মুখে বলপূর্ব্বক বিষ্ঠা নিক্ষেপ যদি অত্যাচার বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে এই প্রকার অত্যাচার এবং তদপেক্ষাও কঠোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আপনাকে আমি দুই একটি ঘটনার কথা জানাইতেছি। বোম্বাই প্রদেশের এক পুলিস ঘাঁটিতে এক ব্যক্তি বিষ খাইয়া এবং যুক্ত প্রদেশের এক জেলে অপর এক ব্যক্তি কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অত্যাচার হইতে চির অব্যাহতি লাভ করে। কতজন গ্রেপ্তারের পরে প্রহার অথবা নির্য্যাতনের ফলে মৃত্যু বরণ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তবে দেশের তিন শতাধিক কারাগারের মধ্যে উড়িষ্যার এক জেলেই ২৯ অথবা ৩৯ জন রাজনৈতিক বন্দী মৃত্যুমুখে পতিত হয়—ঠিক সংখ্যাটি আমার স্মরণ হইতেছে না।"

তরুণী বন্দী কুমারী উষা মেটা সম্বন্ধে ডাঃ লোহিয়া লিখিতেছেন:

"বোম্বাই প্রদেশের এক জেলে কুমারী উষা মেটা নাম্নী এক তরুণী স্বাধীনতা বেতার পরিচালনার অপরাধে চারি বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। এই তরুণী স্পেনীয় বা রুশ হইলে আপনার দেশবাসীরা তাহাকে বীরাঙ্গনা বলিয়া পূজা করিত। কুমারী মেটাকে এক বৎসর আটকবন্দীরূপে এবং আরও কয়েক মাস বিচারাধীন বন্দীরূপে রাখা হয়; বিচার ব্যবস্থার এইরূপ ত্রুটি না হইলে এতদিনে তাহার পূর্ণ দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। এক্ষেত্রে আমি আরও জানাইতে চাই যে, তাহার এবং তাহার সহকর্ম্মীদের বিচারের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

"আট হইতে দশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সাধারণ অপরাধীরূপে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, তা ছাড়া, প্রায় সকলকেই কারাগারে আটক করিয়া রাখা হইতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দশ ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়, কারণ এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিচার করিয়া দেখিতে পান যে তাহাদিগকে একজন ডাহা মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্যের উপরেই দণ্ডিত করা হইয়াছে।"

সুভাষচন্দ্র বসুর পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি

গত ২৩শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুভাষচন্দ্র বসুর পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের অনুষ্ঠানদ্বয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রায় সমস্ত গৃহে সে দিন জাতীয় পতাকা তোলা হয়। সন্ধ্যায় আলোকসজ্জায় মহানগরী অপূর্ব শোভা ধারণ করে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দেশপ্রিয় পার্ক হইতে ৮ মাইল দূরে উত্তর প্রান্তে দেশবন্ধু পার্কে একটি দুই মাইল ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা গমন করে। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় এত বৃহৎ ও সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা আর দেখা যায় নাই। লক্ষ লক্ষ লোক

রাজপথের দুই পার্শ্বে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া শোভাযাত্রার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। পথিপার্শ্বস্থ গৃহসমূহের ছাদ ও বারান্দা প্রভৃতি স্থান জনাকীর্ণ হইয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধীর ভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া থাকিয়া জনতা অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়।

শোভাযাত্রাটিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক উহাতে যোগদান করে। পুরোভাগে থাকে অশ্বারোহী একদল শিখ, তার পর খাকসার দল। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শ্বেত বসনে ভূষিত স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা দল পূর্ণ শৃঙ্খলার সহিত আট মাইল পথ অতিক্রম করে। শোভাযাত্রার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দুইটি বৃহদাকার প্রতিকৃতি ছিল, একটি আবক্ষ ও অপরটি পূর্ণদেহ। শোভাযাত্রার শেষে ছিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ। একটি লরীর উপর দাঁড়াইয়া জনতাকে প্রত্যভিবাদন জানাইতে জানাইতে তিনি অগ্রসর হন।

কলিকাতার শোভাযাত্রায় পুলিশ কৃতিত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করে নাই, কোন গোলযোগও তাই হয় নাই। বোম্বাইয়ে ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। বোম্বাইয়ের শোভাযাত্রাটি পথিমধ্যে আটক করিয়া পুলিশ জানায় মুসলমান প্রধান অঞ্চলের মধ্য দিয়া উহা যাইতে দিলে অশান্তি ঘটিবার আশঙ্কা আছে সুতরাং উহা ভিন্নরূপে চালিত করিতে হইবে। শোভাযাত্রীরা পুলিশের এই অসঙ্গত জিদে আপত্তি করে। পুলিশের এই অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে শহরের সর্ব্বত্র অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। ২১শে নবেম্বরের গুলিচালনার পর পুলিশের কার্য্যের প্রতিবাদে কলিকাতায় যে তীব্র গণবিক্ষোভ দেখা দেয় বোম্বাইয়েও তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। মুসলমান নেতারা জানাইয়া দেন যে শোভাযাত্রা মুসলমান পাড়ার ভিতর দিয়া গেলে তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ ছিল না, তাঁহারা উহা বন্ধ করিবার জন্যও পুলিশকে বলেন নাই। পুলিশও শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকানদের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে বোম্বাইয়ে যে রক্তপাত হইয়াছে তাহার কারণ সাম্প্রদায়িক নয়, উহা সরকারের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ। কলিকাতার ন্যায় বোম্বাইয়েও কংগ্রেস কর্ম্মীদের চেষ্টায় শহরের শান্তভাব ফিরিয়া আসে।

পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধি দল ও গ্রামবাসী

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধিদল শুধু শহরে বড়লোকদের সহিত আলোচনায় সকল কাজ না সারিয়া কয়েকটি গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদের সহিত মাঝে মাঝে কথা বলিয়াছেন। পঞ্জাবের একটি গ্রামে তাঁহারা যে জবাব পাইয়াছেন তাহাতে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান হওয়া উচিত। নিরক্ষর গ্রামবাসীর মুখে মুক্তিকাম ভারতবাসীর মনের কথা কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত বাক্যালাপ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে :

মিঃ সোরেনসেন—আপনি কোন্ দলের লোক ? পাকিস্থান সম্বন্ধে আপনার কি কোন ধারণা আছে ?

শিখ কৃষক—আমাদের গ্রামে হিন্দু মুসলমান ও শিখ অত্যাবশ্যকীয় সম্ভাবের সহিত বাস করিতেছে। আমরা পাকিস্থান বা শিখস্থানের কোনটাই চাই না।

মিঃ সোরেনসেন—আপনি কি স্বাধীনতা চান ?

শিখ কৃষক—নিশ্চয়ই চাই। আমরা ব্রিটিশদের যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিয়াছি। তাহারা আমাদের নানারূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে একটাও রক্ষা করে নাই।

মিঃ সোরেনসেন—আপনি কি পাকিস্থান চান ?

শিখ সৈনিক—না। পাকিস্থান আসিলে দেশ বহুধা বিভক্ত হইবে। আমরা সকলে একত্রে বসবাস করিতে চাই।

মিঃ সোরেনসেন—আপনি কি স্বাধীনতা চান ?

শিখ সৈনিক—নিশ্চয়ই চাই। স্বাধীনতা কে না চায় ?

মিঃ সোরেনসেন—আপনার গ্রামের মুসলমানগণ কোন্ দলের ?

শিখ সৈনিক—তাঁহাদের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী মুসলমান।

মিঃ সোরেনসেন—আমাকে শ্রমিক সরকার এখানকার তথ্যানুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের জানাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন।

গ্রামবাসী—আপনি তথ্য বিকৃত করিয়া জানাইবেন ত ?

মিঃ সোরেনসেন—না।

নোট অর্ডিনান্স

ভারত-সরকার অকস্মাৎ এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া পাঁচ শত টাকা ও তদূর্দ্ধ মূল্যের নোট অচল করিয়া আদেশ দেন যে কতকগুলি শর্ত্ত সাপেক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐগুলি ভাঙাইতে হইবে। এই আদেশের কারণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে বহু কোটি মূল্যের হাজার টাকার নোট লোকের হাতে হাতে রহিয়াছে এবং ব্ল্যাক মার্কেটের মূলধন রূপে খাটিতেছে। এই সব নোট ব্যাঙ্কে জমা না পড়ায় উহার উপর ট্যাক্স আদায়ও সম্ভব হইতেছে না। সরকারের হিসাবে ইহাতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ট্যাক্স অনাদায়ী রহিয়াছে। অর্ডিনান্সটি জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং বহু লোকে হাজার টাকার নোট অর্দ্ধেক মূল্যে বেচিয়া ফেলে। ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধের নামে সরকার যে আদেশ দেন সেই হুকুমনামাকে কেন্দ্র করিয়াই আরও কয়েকটি নূতন ব্ল্যাক মার্কেট সৃষ্টি হয়।

দেশে যুদ্ধের সময় যখন অবাধে ব্ল্যাক মার্কেট চলিতেছিল সরকার তখন তাহা নিবারণের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, অধিকন্তু নানা প্রকারে মুনাফাখোর চোরাকারবারীদের প্রশ্রয়ই দিয়া আসিয়াছেন। উক্ত অর্ডিনান্স জারীর পর তাঁহাদের কার্য্যের নানা সমালোচনা সংবাদপত্রসমূহে হয়। কেহ কেহ অভিযোগ করেন, ব্ল্যাক মার্কেট নিবারণ অর্ডিনান্সের উদ্দেশ্য নয়, লুঠের বখরা ট্যাক্সরূপে আদায় করাই সরকারের আসল অভিপ্রায়। আতঙ্কের ফলে বড় ও চালাক মুনাফাখোরেরা ছোটখাট মুনাফাখোরদের সঞ্চিত নোট অল্প দামে কিনিয়া লইয়া আরও এক দফা লাভ করিয়াছে। বহু লোক ও প্রতিষ্ঠান উহাতে সহায়তা করিয়া ভাগ পাইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নোট অর্ডিনান্স জারীর নিম্নলিখিত হিসাবটি দেখিলেই ভারত-সরকার অবাধে হাজার টাকার নোট বাহির করিতে দিয়া ব্ল্যাক মার্কেটের মূল ধন সরবরাহে

কি ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে। হিসাবটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৪৪-৪৫ সালের বার্ষিক বিবরণী হইতে গৃহীত।

	পাঁচ টাকার নোট	দশ টাকার নোট	একশত টাকার নোট	হাজার টাকার নোট
৩১. ১২. ১৯৩৯	৪৫·৬৩	১৮·২৯	৭৫·৫৭	১৩·৭৯ কোটি টাকা
৩১. ১২. ১৯৪৪	১৪৮·৮০	৩৬৩·৩৮	৩৮২·৫১	১০০·১৩ " "
বৃদ্ধির হার	২৩০ %.	২৭০ %.	৪০৪ %.	৬২১ %.

১৯৪৫ সালের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, যত দূর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় হাজার টাকার নোটের পরিমাণ প্রায় ১৬০ কোটি টাকা হইবে। পাঁচ শত ও দশ হাজার টাকার নোট এই হিসাবে আমরা ধরিলাম না এই জন্ত যে উহাদের পরিমাণ কম। এ পর্য্যন্ত হাজার টাকার নোটের বৃদ্ধির হার অন্ততঃ দশগুণ অর্থাৎ ১০০০%. ইহা মনে করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। এই নোটগুলি ব্যাঙ্কে জমা না পড়িয়া ব্ল্যাক মার্কেটে খাটিতেছে ইহা জানিয়াও ভারত-সরকার সেগুলিকে ব্যাঙ্কে আনিবার ব্যবস্থা করেন নাই। উহা করা কিন্তু কঠিন ছিল না। নোটের চেহারা বদলাইয়া দিয়া লোকের বাড়ী সঞ্চিত নোট ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে বাধ্য করা যায় বহু দেশের মুদ্রাপরিচালক কর্ত্তৃপক্ষ ইহা করিয়াছেন। হাজার টাকা এদেশে নম্বরী নোট, উহার ভাঙানী বা বদলে নূতন নোট দেওয়ার সময় নাম ঠিকানা ব্যাঙ্কে টুকিয়া রাখিলেই চোরাকারবারীরা সতর্ক হইত, ট্যাক্স আদায়ের পক্ষেও সহায়তা হইত। ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করা সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলে তাঁহারা সতর্ক ও ধীরভাবে অগ্রসর হইতেন। এ ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই।

ব্ল্যাক মার্কেট সম্বন্ধে সরকারের মনোভাব আজকাল অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। নিজেদের প্রয়োজনে তাঁহারা উহার সৃষ্টি করিতে দ্বিধা করেন না। প্রয়োজন যত দিন থাকে ততদিন মুনাফাখোর ও ঘুষখোর বন্ধুদের বাঁচাইয়া রাখিতে তাঁহাদের আগ্রহ যথেষ্ট থাকে। ব্ল্যাক মার্কেটের বিরুদ্ধে জনমত বড় বেশী তীব্র হইয়া উঠিলে হঠাৎ এক একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া দেশবাসীর ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে সরকার একান্ত সাধু, দেশের লোকেরা সব অসাধু ও চোর, অতএব সরকার আর কি করিতে পারেন? নোট অর্ডিনান্সের বেলায়ও ইহাই দেখা গেল।

সেলস্ ট্যাক্স বৃদ্ধি

বাংলা-সরকার সেলস্ ট্যাক্সের পরিমাণ আর এক দফা বাড়াইয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের বিনা অনুমতিতে বিদেশী লাটসাহেব তাঁহার বিদেশী পরামর্শদাতাদের সহিত আলোচনা করিয়া এই কাজ করিয়াছেন। দেশের প্রতিনিধিদের বিনা অনুমতিতে ট্যাক্স বসানো অন্যায়—রাজনীতির এই মূল সূত্র উপেক্ষা করিতে গিয়া ইংরেজকে আমেরিকা হারাইতে হইয়াছিল, এই অন্যায় আমাদের উপর চালাইতে গিয়া ইংরেজ শাসকেরা বাংলাদেশকে অনাচারক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

সেলস্ ট্যাক্স পৃথিবীর বহু দেশে আছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সেলস্ ট্যাক্সের ন্যায় বীভৎস ও বিরক্তিকর ট্যাক্স পৃথিবীর আর কোথাও নাই। প্রধানতঃ বিলাসদ্রব্যের উপর এই ট্যাক্স বসে, বাংলায় উহা চাপানো হইয়াছে দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর—ধুতি, শাড়ী, জুতা, জামা, তেল, সাবান, দাঁতের মাজন ইত্যাদি হইতে সুরু করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। ট্যাক্সের হার সকলের বেলায় সমান, পঞ্চাশ টাকার কেরানীকে যে হারে উহা দিতে হইবে পাঁচ হাজার টাকা বেতনের ইংরেজ কর্ম্মচারীর বেলায়ও সেই একই হার। সেল্স ট্যাক্সের আনুপাতিক চাপ বড়লোকের তুলনায় গরীবের উপর অনেক বেশী পড়ে।

বাংলা-সরকারের ঘুষখোর ও অযোগ্য কর্ম্মচারীদের দোষে কোটি কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে, এখনও হইতেছে। এই বিপুল ঘাটতি পূরণ করিতে টাকার দরকার, তাই গরীবের উপর ট্যাক্স। গত কয়েক বৎসরে সরকারী কর্ম্মচারীদের অসদুপায়ে সঞ্চিত সম্পত্তির হিসাব লইবার জন্ত বহুবার দেশবাসী দাবি করিয়াছে, সরকার উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সাহাবুদ্দীন, সতীশ মিত্র প্রভৃতির ন্যায় সরকারের প্রিয় পোষ্যদের হাত দিয়া সরকার চোখ বুঁজিয়া কোটি কোটি টাকা নষ্ট হইতে দিয়াছেন, এবম্বিধ অপচয় এখনও চলিতেছে। লাভের টাকা ইস্পাহানির, লোকসানের কড়ি করদাতার, এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া চাউলের কারবার অবাধে চলিয়াছে, উডহেড কমিশনের বিরূপ সমালোচনার পরও বাংলা-সরকার সংযত হন নাই। ব্যয়সঙ্কোচ বা মিতব্যয়িতা বাংলা-সরকার কোন মতেই অবলম্বন করিবেন না, তাঁহাদের যথেচ্ছ ও অন্যায় কার্য্যের লোকসানের টাকা দেশবাসীকেই গণিয়া দিতে হইবে, এমনি একটা অনমনীয় মনোভাব বাংলা-সরকারের প্রত্যেক কাজেই যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

চট্টগ্রামে সৈনিকদের অত্যাচার

চট্টগ্রাম শহরের কয়েক মাইল দূরে কসাইপাড়া নামক গ্রামে সৈন্যদলের সংশ্লিষ্ট কয়েক শত শ্রমিক হানা দিয়া ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে, নারীর সম্ভ্রমহানি করিয়াছে এবং সম্পত্তি লুঠ করিয়াছে। চট্টগ্রামের মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এ সম্পর্কে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহার একাংশ এইরূপ:

> থানা পাঁচালাইশ গ্রাম কসাইপাড়া নিবাসী বাদশা মিঞার স্ত্রী এক বৃদ্ধাসহ নিকটবর্ত্তী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। আই, পি, সি, অর্থাৎ সামরিক পাইওনিয়ার কোম্পানীর কয়েকজন শ্রমিক সৈনিক উক্ত গ্রামে পায়চারি করিতে গিয়াছিল। তাহারা কুমতিপ্রায়ে উক্ত যুবতীকে আক্রমণ করে। যুবতীর চিৎকারে গ্রামবাসী কয়েকজন দৌড়াইয়া গিয়া উক্ত সৈনিকদিগকে উত্তম-মধ্যম দিয়া উক্ত যুবতীটিকে উদ্ধার করিয়া আনে। সৈনিকেরা তাড়া খাইয়া অনতিদূরস্থ তাহাদের ক্যাম্পে গিয়া অন্ত মিলিটারীর সাহায্য লইয়া পেট্রোলসহ সন্ধ্যার পর গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রামের ৩০।৪০ খানি বাড়ীর গৃহাদিতে পেট্রোলের সাহায্যে আগুন ধরাইয়া দেয়। সেখানে তাহারা লুটপাটের যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিল। ইহাতে ৫০।৬০ খানি ছোট বড় গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। এ সময় তাহারা স্ত্রীলোকের উপর

পাশবিক অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। লোক যাহাতে বাড়ীর সীমার বাহিরে যাইতে না পারে, তজ্জন্ত রীতিমত পাহারা দিতেছিল। বহু গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পুড়িয়া গিয়াছে। একজন বয়স্ক লোক পুড়িয়া মারা গিয়াছে। কয়েকজন আগুনে ঝলসিয়া আহত হইয়াছে। গৃহসামগ্রী কিছুই রক্ষা পায় নাই। সামরিক ও মিলিটারী শ্রমিক কোম্পানীর কয়েকশত লোক আগুন লাগাইবার জন্ত গিয়াছিল।

এই ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইবামাত্র কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষকপ্রজাদল, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি সকল দলের লোক একত্র হইয়া উহার প্রতিবাদ করেন এবং দুর্গতদের সাহায্যে অগ্রসর হন। প্রতিবাদের ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখিয়া সরকারেরও টনক নড়ে, তাঁহারা শ্রমিকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দিয়াছেন।

সৈনিক কর্ত্তৃক সাধারণের উপর অত্যাচার নূতন নয়। আগষ্ট-আন্দোলনের সময় সৈন্যদল মেদিনীপুরে নারীর উপর অত্যাচার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়াও সরকার অপরাধীদের ধরিয়া দণ্ডিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, জনমত তীব্র না হওয়া পর্য্যন্ত এই পাশবিক ব্যবহার বন্ধ করিতেও অগ্রণী হন নাই। সৈন্য ও পুলিশ জনসাধারণের ধন প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার পরিবর্ত্তে উহার হন্তারকই হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পর চট্টগ্রামের অবস্থা

যুদ্ধের সময় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে চট্টগ্রামের অধিবাসী-দিগকে যে নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে তাহার জের আজও শেষ হয় নাই। যুদ্ধের দরুণ সমগ্র ভারতবর্ষ যে দুর্ভোগ ভুগিয়াছে চট্টগ্রামের লাঞ্ছনার তুলনায় তাহাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। সেন্সরের কড়াকড়ির জন্ত চট্টগ্রামের অবস্থার কথা জনসাধারণ জানিতে পারে নাই। চট্টগ্রামের কংগ্রেস-কর্ম্মীরা গান্ধীজীকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলে পর দেশবাসীও উহা এখন জানিতে পারিয়াছে। আতঙ্কগ্রস্ত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বঞ্চিতের বঞ্চনা সুরু হওয়ার পর চট্টগ্রামের কি অবস্থা হইয়াছিল, রিপোর্টের নিম্নোক্ত অংশ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে :

> ১৯৪২ সালের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে বড় বড় সরকারী আপিস ও ব্যবসাদার প্রতিষ্ঠানের আপিসগুলি চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া ফেলা হইল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যবসায়ী-দের হুকুম দিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের মালপত্র সমস্ত চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। কেমন করিয়া যে সরাইতে হইবে তিনি তাহার কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। নৌকাগুলি সব সরকার দখল করিয়া চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া ফেলিলেন। মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী ও সাইকেল সমস্ত নিঃশেষে কুমিল্লায় সরাইয়া ফেলা হইল। পথে কত ঘোড়া মরিয়া গেল, গাড়ী ভাঙিয়া ধ্বংস হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। চাউল, দাইল, চিনি ও তৈল এবং জীবন-ধারণের পক্ষে ঐরূপ অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় যথেষ্ট জিনিস দ্রুতগতিতে চট্টগ্রামের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছিল। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুণ ঐ সকল জিনিসপত্র এবং সামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহা আর শহর হইতে সরান গেল না।
>
> ১৯৪২ সালের ১০ই এপ্রিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শহরের সমস্ত ব্যবসায়ীকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করিয়া তাহাদের বলিলেন, "আর কেন? শত্রু তো আসিয়া পড়িল। আকিয়াব এখন তাহাদের হাতে, যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে পারে। কাজেই আপনাদের খাদ্যশস্য প্রভৃতি যাহা এখানে আছে তাহা লইয়া অবিলম্বে রওনা দিন। আগামীকালের অপেক্ষায় আর বসিয়া থাকিবেন না; কারণ সে কাল আর হয়তো কোন দিনই আসিবে না। যাহা বলিবার বলিলাম, ইহাতেও যদি আপনারা জিনিষপত্র না সরান তবে আমি সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিব, কারণ শত্রুর হাতে খাদ্যসামগ্রী পড়িবে ইহা তো আমি হইতে দিতে পারি না।"
>
> এই কথাগুলি একেবারে হুবহু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজের মুখের কথা। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই সকল কথার পর যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল তাহা বর্ণনার অতীত, এবং পরদিন চট্টগ্রাম শহর মরুভূমিতে পরিণত হইল এবং যানবাহনের অভাব যাহা হইল তাহা ধারণা করা অসম্ভব।

ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসেই চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ঐ সময় কক্সবাজার মহকুমায় চাউলের দর ছিল টাকায় আধ সের, অর্থাৎ আশী টাকা মণ। স্থানীয় সংবাদপত্রে জিনিষপত্রের দর বা স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত না। বাহির হইতে চট্টগ্রামে এই সময় সহস্র সহস্র ভাড়াটিয়া শ্রমিক আমদানী করা হইয়াছিল। স্থানীয় সঞ্চিত চাউল হইতেই ইহাদের খাদ্য সরবরাহ হইত। সামরিক বাহিনীর খচ্চরগুলিকে খাওয়াইবার জন্ত মিলিটারী কনট্রাক্টরেরা বহু ধান ক্রয় করে, ইহার বিরুদ্ধে জনৈক ভারতীয় ডেপুটি কালেক্টর প্রতিবাদ জানাইলে জনৈক ব্রিটিশ কর্ম্মচারী নাকি মন্তব্য করেন যে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন অপেক্ষা মিলিটারী খচ্চরগুলির জীবন অধিক মূল্যবান।

যুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রামে যে-সব কুফল দেখা দিয়াছে তাহা মোটামুটি এইরূপ :—

(১) সামরিক লোকজনদের দ্বারা বহু অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তাহার তদন্ত বা বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

(২) সৈনিকদের সহিত সংস্পর্শজনিত কুৎসিত ব্যাধির প্রসার এবং এই সব ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসার জন্ত চিকিৎসা-গারের অভাব।

(৩) বহু নারী অনশনের জ্বালায় বিপথগামিনী হইতে এবং সৈনিকদের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হয়। ইহার কুফল সহজেই অনুমেয়।

(৪) সামরিক কনট্রাক্ট ইত্যাদির দ্বারা কতিপয় ব্যক্তি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যে কোন মূল্যে ভূমি ও সম্পত্তি ক্রয় করে। ইহার ফলে কতিপয় ব্যক্তির হস্তে বিপুল সম্পত্তি হস্তা-

জরিত হয় এবং দরিদ্রের সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়।

(৫) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বহু ব্যাধির প্রসার হয় এবং জনসাধারণের জীবনীশক্তি সাধারণভাবে কমিয়া যায়।

(৬) সহস্র সহস্র অনাথ বালক-বালিকার উদ্ভব। ইহাদের যত্ন করিবার পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। ইহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার বা অন্যান্য ভবিষ্যৎ সমস্যার বিষয় ভাবিবারও কেহই নাই। ইহাদের ভিতর বালিকার সংখ্যা বালক অপেক্ষা অধিক।

(৭) খাদ্য, আশ্রয়, জীবিকা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিবার নাম করিয়া জেলে সম্প্রদায়ের বহু নরনারীকে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেছে।

স্থানীয় কর্ম্মীদের উত্তম ভিন্ন প্রতিকারের কোন উপায় নাই এই কথা মনে রাখিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। সরকারের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা বৃথা।

সাহেবনগর কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠান লুঠের মামলা

সৈন্য ও পুলিসের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা থাকে বলিয়া ইহারা যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারে তাহার জন্য গবর্মেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক এবং এরূপ ঘটনা ঘটিলে ইহাদের আদর্শ দণ্ড হওয়া উচিত। অথচ আমাদের দেশে ইহার বিপরীত ব্যাপারই দেখা যায়। গুরুতর অপরাধের সহিত জড়িত পুলিসের প্রতি অনুকম্পার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সাহেবনগর কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি পুলিস কর্ত্তৃক লুঠের মামলায় কলিকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়াছেন তাহাতে ন্যায়বিচার হইয়াছে বলিয়া দেশবাসীর পক্ষে মনে করা বিশেষ কঠিন। এই লুণ্ঠন ব্যাপারে একজন দারোগা এবং একজন কনেষ্টবল জড়িত ছিল। একজন উকীল এবং আরও কয়েকজন আসামীও ছিল। আলিপুরের সেসন জজের আদালতে তিন মাস ধরিয়া বিচার চলিবার পর জুরীরা ইহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং জজ দারোগাকে পাঁচ বৎসর, কনেষ্টবলকে চারি বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ দেন এবং অন্যান্য আসামীদেরও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে আপীলে বিচারপতি রক্সবার্গ ও বিচারপতি এলিস ইহাদের কারাদণ্ড কমাইয়া দারোগার ছয় মাস ও কনেষ্টবলটির চারি মাস করিয়া দিয়াছেন। ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই উহার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ছিলেন।

আগষ্ট-আন্দোলনকালে ঐ অঞ্চলে গৃহদাহের ঘটনা ঘটে এবং একটি ডাকঘর, আবগারী আপিস এবং মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর কাছারির উপর আক্রমণ হয়। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠান ভবনে খানাতল্লাস করিয়া শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নীর বাসগৃহ আটচালাটি শীল করা হয়। ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণে বলা হয় যে, দারোগা প্রতিষ্ঠানের চাকর-বাকরগণকে বিতাড়নের নির্দ্দেশ দেয়। ১৭ই হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে কয়েকটি সভা হয়। ঐ সমস্ত সভায় প্রতিষ্ঠানটি লুণ্ঠনের বিষয় আলোচনা করা হয়। ২৮শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন এবং ৩০শে অক্টোবর ও ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই নবেম্বর প্রতিষ্ঠান এবং আটচালা লুঠ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ধান চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

মুক্তির পর হরিপদবাবু ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরে অভিযোগ দায়ের করেন। ঐ অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া এই মামলা রুজু করা হয়। দারোগাকে ১৯৪৩ সালের কোন এক সময়ে সাসপেণ্ড করা হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গৃহ ভাঙ্গিয়া চুরি করার ষড়যন্ত্র করিবার এবং ঐ ষড়যন্ত্র অনুসারে ঐ সমস্ত অপরাধ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

বাহাদুরগড় বন্দীশিবির

বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যদের উপর যে বর্ব্বর অত্যাচার হয় তাহার প্রতিবাদকল্পে দেওয়ান চমনলাল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। ব্রিটিশ, মুসলিম লীগ ও সরকারী সদস্যদের ভোটের জোরে প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই উপলক্ষে যে ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় বন্দীশিবিরের ইংরেজ অধ্যক্ষগণ বর্ব্বরতায় নাৎসী বা জাপানী বন্দীশিবিরের অধ্যক্ষদের চেয়ে কোন অংশে কম যান না। শিবিরে বহু মুসলমান বন্দীও ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে আহত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ ও সরকারী সদস্যদের সহিত মুসলিম লীগ হাত মিলাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ঘটনাটির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল তাহা হইতেই উহার নৃশংসতার যথেষ্ট পরিচয় মিলিবে:

> বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৮০০ লোককে কাঁটা-তারের পিঞ্জরে পৃথক করিয়া রাখা হয়। তাহাদের মধ্যে জনৈক অসুস্থ ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ শ্রমসাধ্য কাজ করিতে বলা হইলে সে ঐ কাজ করিতে অক্ষম হয়। জনৈক সুবেদার মেজর তাহাকে সঙ্গীনের দ্বারা খোঁচা মারিবার আদেশ দিলে গার্ড সেই হুকুম পালন করিতে অস্বীকার করে। জনৈক ব্রিটিশ মেজরকে উহার কথা জানান হইলে তিনি আসিয়া পিঞ্জরস্থ লোকদিগকে অপমান করেন। অতঃপর জনৈক ব্রিটিশ কর্ণেল আসিয়া ছিয়াত্তর জন ভারতীয় অশ্বারোহী সৈনিককে তলব করেন এবং পিঞ্জরের লোকদিগকে বেয়নেট চার্জ্জ করার আদেশ দেন। অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রত্যেকেই সেই আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে। কর্ণেল তখন একদল গুর্খাকে তলব করেন। তাহারা পর্য্যন্ত বেয়নেট চার্জ্জ করিতে অসম্মত হয়। পরদিন পিঞ্জর হইতে তিন শত লোককে একটি শূন্য পিঞ্জরে লইয়া তাহাদিগকে দুই ঘণ্টাকাল মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়। তাহারা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন আরও প্রহরী তলব করা হয় এবং তাহারা ক্লান্ত লোকদিগকে বেয়নেট চার্জ্জ করে। ফলে চৌত্রিশ জন জখম হয়। এক ব্যক্তির দেহের পাঁজ

স্থানে আঘাত লাগে। পিঞ্জরের লোকদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমানও ছিল। বীরের মত তাহারা সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করে। বেয়নেট চার্জ্জ যখন চলিতেছিল তখন বন্দীরা 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি করিতে থাকে। তখন এক অদ্ভুত ধরণের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিন ফুট দূরে দুইটি খুঁটি পুতিয়া তাহাতে এক ব্যক্তিকে হস্তপদ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। এক ব্যক্তি এই ব্যবস্থায় সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের উপর এই শ্রেণীর অত্যাচার নূতন নয়। গত ২৫শে নভেম্বর নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরে সাত শত বন্দীর উপর গুলী চালান হয়; তন্মধ্যে পাঁচ জন মারা যায়।

দেওয়ান চমনলালের অভিযোগের উত্তরে সমর বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে শিবিরের নিরস্ত্র লোকদের উপর বেয়নেট চার্জ্জ করা হইয়াছিল। বিয়াল্লিশ জন বন্দীর গায়ে ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়াছে, নয় জনের পিছনের চামড়া বেয়নেটের খোঁচায় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

নেত্রকোণা মহকুমার গ্রামে পুলিসের অত্যাচার

গ্রামবাসীদের উপর পুলিসের দলবদ্ধ অত্যাচার যে এখনও চলিতেছে তাহার সর্ব্বশেষ প্রমাণ নেত্রকোণার ঘটনা। রংপুর জেলার বৈদ্যের বাজার গ্রামে পুলিসের বর্ব্বরতা গবর্ন্মেণ্ট অত্যাচারীদের পক্ষে সাফাই গাহিয়া ধামাচাপা দিয়াছেন। নেত্রকোণার ঘটনাটি ১৬ই জানুয়ারী ঘটিয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট এখনও পর্যন্ত কর্ত্তব্যভ্রষ্ট পুলিস কর্ম্মচারীদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই। ঘটনাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়।

গত ১৬ই জানুয়ারী সকালে কালমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অধীনে প্রায় ৩৬ জন সশস্ত্র পুলিস বারহাট্টা থানার চিরাম গ্রামে হানা দিয়া অমানুষিক অত্যাচার করে। ফলে ২২খানি বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে; পুলিস ঘরদ্বার ভাঙিয়া ধান, চাউল, কেরোসিন সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। কাপড়-চোপড় পোষাক ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া ফেলা হইয়াছে। নগদ টাকা সমস্ত লুঠ হইয়া গিয়াছে।

মাছ ধরা লইয়া ঘটনার সূত্রপাত। একটি বিল কোন এক ইজারাদারকে ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা যথারীতি বিলে মাছ ধরিতে গেলে, ইজারাদার পুলিস ডাকিয়া আনে। পুলিসবাহিনী আসিয়া উক্ত চিরাম গ্রামে হানা দেয় এবং প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ক্ষতি করে। গ্রামে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।

ফুড কমিটির দুর্নীতি

লীগ মন্ত্রিমণ্ডল বাংলার গ্রামে গ্রামে ফুড কমিটি নামে এক অপূর্ব্ব বস্তু গড়িয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির মুসলমান মাতব্বরেরা সাধারণতঃ ইহার প্রধান পাণ্ডা। গ্রামবাসীর অন্নবস্ত্র সরবরাহের ভার কতকগুলি মনোমত লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া গ্রামে গ্রামে লীগ সংগঠন এবং লীগওয়ালা ভাগ্যান্বেষীদের হাতে টাকা দেওয়া এই সব কমিটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং সে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সার্থকও হইয়াছে। ফুড কমিটি গঠনের সময়ই উহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ হইয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। উহাদের দুর্নীতিপরায়ণতা ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে পদে পদে লোকে অভিযোগ করিয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট তাহার কোন প্রতিকার করেন নাই। ধীরে ধীরে উহাদের বিস্তৃত কার্য্যকলাপ প্রকাশিত হইতেছে এবং স্বরূপ আরও ভাল করিয়া প্রকটিত হইতেছে। দৈনিক ভারতে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> দুর্নীতির জন্য ডেণ্ডারগণসহ কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন ফুড কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, সভ্য ও ডেণ্ডারগণের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন ফুড কমিটির সভাপতি কাজেমালী হালদার, সম্পাদক আবদুল আজী এবং অনিল ও সুরেন্দ্র নামে দুইজন ডেণ্ডার দুর্নীতি, অতিলাভ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে ভারতরক্ষা আইনের ৫০৩ (৪৫) ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত অভিযোগে সাধারণ ফুড কমিটির সভাপতি লালমোহন পাল, সম্পাদক একলাজুদ্দিন হালদার এবং বেচু কাজী, অমরচান সূত্রধর ও ওমান খাঁ নামে তিন জন সভ্যও ২ (৪৬) ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। উভয় দলই জামিনে খালাস আছে। স্থানীয় সংবাদে জানা যায় যে, ফুড কমিটির জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষাই হয় নাই, হিসাবের রেজেষ্ট্রী ও কোনরূপ হিসাব নাকি নাই, প্রায়রিটি তালিকা না থাকায় বিতরণে চূড়ান্ত যথেচ্ছাচার চলিতেছে, অধিকাংশ স্থানেই সরকার-প্রবর্ত্তিত রেশন কার্ডে জিনিষ বণ্টন না করিয়া হাতে লেখা শ্লিপে বণ্টন করা হয়, দুই-শতাধিক মিথ্যা রেশন কার্ডে জিনিষ বিতরণ করা হইতেছে, কোনরূপ ক্যাশ-মেমো দেওয়া হয় না। রিজার্ভের জিনিষ-পত্রের বিতরণে পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি রহিয়াছে এবং শ্লিপ দিয়া একই পরিবারের সকলের নামে একবারে শতাধিক গজ কাপড়ও বিতরণ করা হইয়াছে, নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা বেশী দরে জিনিষ বিক্রী করা হয়, সম্পাদক ও সভাপতির আত্মীয়গণের মধ্য হইতেই ডেণ্ডার নিযুক্ত করা হইয়াছে ও চতুরতার সহিত ব্যবসা করা হইতেছে এবং সর্ব্বোপরি সম্পাদকের বহু রকমের নামে ব্লক রাখায় সুযোগ লইয়া দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা চোরাবাজারী ও দুর্নীতির রাজত্ব চালাইয়া যাইতেছে। এই সব গুরুতর অভিযোগসমেত পর পর ১৮খানা গণ-দরখাস্ত কমিটি পরিবর্ত্তন ও উপযুক্ত তদন্তের দাবি করিয়া এই ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, সার্কেল অফিসার, মহকুমা কণ্ট্রোলার প্রভৃতির কাছে পাঠান হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহারা তদন্তের কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। অধিকন্তু অধিকাংশ দরখাস্তই নাকি আপিস হইতে চুরি গিয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে; এমন কি পুলিশ এজাহারেও গুরুত্ব না দেওয়াতে কোর্ট ফি দাখিল করিয়া দরখাস্ত করিলেও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। অবশেষে জনসাধারণ মহকুমার সকল দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীর

কাজে ব্যর্থ হইয়া এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের সাহায্যে উপরস্থ কর্ম্মচারীদের গোচরীভূত করে। ফলে এই সম্পর্কিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার সম্ভব হইয়াছে এবং জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ইউনিয়ন ফুড কমিটির মধ্যে তুইজন সরকারী কর্ম্মচারী ভিলেজ ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার ও এসিসট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টার এক্স-অফিসিও হিসাবে থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা এই দুর্নীতির প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহারাও এই দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত আছে বলিয়া বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

গত দুই বৎসরাধিক কাল যাবৎ অন্নবস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে গ্রামে গ্রামে এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহা শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারতে এই পাপ বিস্তৃত হইয়াছে। আমেরিকান এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশের রেশনিং বিভাগের প্রধান ইন্‌সপেক্টর শ্রীযুক্ত আর কে দেশপাণ্ডে গবর্ণরের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ এই যে, অতিলাভের জন্ত তিনি যে সব ব্যক্তির অপরাধের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সংশ্লিষ্ট অফিসারেরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করিতে দেন নাই।

খাদ্যদ্রব্যের অপচয়

দৈনিক কৃষকে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

> ফরিদপুর শহর হইতে অনধিক দূরবর্ত্তী অম্বিকাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের সংলগ্ন গুদামসমূহে গবর্মেণ্টের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রচুর পরিমাণ আটা, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ছিল। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দ্রব্য গত ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে রক্ষিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত মরণোন্মুখ মানুষের ভাগ্যে তখন উহা মিলে নাই। দীর্ঘকাল গুদামে থাকার ফলে সেই সমস্ত আটা ও ময়দা পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ ঐ দূষিত পচা আটা ও ময়দা নিকটবর্ত্তী স্বল্পসলিলা ক্ষীণস্রোতা নদীতে ফেলিয়া দিয়াছেন।
>
> দ্রব্যগুলি এতই প্রচুর ও দূষিত ছিল যে, তাহার ফলে অল্পকাল মধ্যে নদীর জল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মৎস্যসমূহ মরিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। নদীর তীরবর্ত্তী অধিবাসিগণ তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জলের এই দুরবস্থায় বিপন্ন ও ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

সরকারী গুদামের খাদ্যদ্রব্য অপচয় এখনও বন্ধ হইল না। দুর্ভিক্ষের বৎসরেও অনেক হাজার মণ খাদ্য অযত্নে ফেলিয়া রাখার জন্ত নষ্ট হইয়াছে। খোলা রেলওয়ে ষ্টেশনে হাজার হাজার মণ ধান বৃষ্টিতে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। অথচ একটু তৎপর ও মনোযোগী হইলেই এই সব অপচয় বন্ধ করা যায়। বিকৃত খাদ্যদ্রব্য প্রথমে পশুর খাদ্যরূপে বিক্রয় করা সুরু হইল, দেখা গেল মুনাফাখোরেরা ঐগুলি কিনিয়া আবার চোরাপথে সাধারণ লোককেই উহা বিক্রয় করে। তারপর সুরু হইল খাদ্যদ্রব্য দিয়া কম্পোষ্ট সার তৈরি, হাওড়ার যে ময়দানে হাজার হাজার মণ খাদ্য ঢালিয়া সার দেওয়া হইয়াছে সেখানে কত ফসল গজাইয়াছে গবর্ণর কেসির গবর্মেণ্ট তাহা জানাইলে ভাল হইত। অতঃপর গবর্মেণ্ট মৎস্যকুলের জন্ত দরদী হইয়া উঠিয়া বিকৃত খাদ্য পুকুরে ঢালিতে আরম্ভ করিলেন ফলে যে মাছ এমনি বাঁচিত সেগুলিও মরিল। এবার সুরু হইয়াছে নদীতে ঢালা। দুর্ভিক্ষে লোক আহার্য্য পাইবে না ইহা তো বলিয়া দেওয়াই হইয়াছে, পানীয় জলও যাহাতে না পায় সে দিকেও দেখিতেছি গবর্মেণ্ট এবার দৃষ্টি দিয়াছেন।

রেশনের চাউলের নমুনা

কুমিল্লার একটি বিংশতিবর্ষীয়া তরুণী বধূ রেশনের কদর্য চাউল খাওয়া উপলক্ষ্য করিয়া কি ভাবে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন তাহার বিবরণ জানা গিয়াছে। কদর্য চাউল সরবরাহের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের কি দুর্দশা হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে তাহাও জানা যাইবে :

> ঘড়ি-ব্যবসায়ী শ্রীপ্রফুল্ল ভৌমিকের পত্নী প্রিয়বালা ভৌমিক রেশনের চাউল খাওয়াতে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বামীকে ভাল চাউল সংগ্রহের জন্য বলেন। স্বামী চাউল সংগ্রহে অক্ষমতা জানাইলে মহিলাটি দুঃখে ও ক্ষোভে নাকি সকলের অজ্ঞাতসারে ফটোগ্রাফির বিষাক্ত ঔষধ সেবন করেন। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তিনি হাসপাতালে নীত হইলে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।
>
> কুমিল্লা শহরে রেশন-প্রথা, বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চল হইতে চাউল আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারীর ফলে নাগরিকগণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। রেশনের নিকৃষ্ট চাউল পল্লী অঞ্চলের চাউলের তুলনায় ৩৲৪৲ বেশী অর্থাৎ আশীর মাপে ১৫৲ দেওয়া হইতেছে। শহরে রেশনের চাউল খাওয়ার ফলে পেটের পীড়া ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে।
>
> সম্প্রতি পুলিস সুপার কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকের উপর বে-আইনীভাবে চাউল আমদানীর অভিযোগ করিয়া তাহাদের কৈফিয়ৎ দাবি করিয়াছেন। তন্মধ্যে সিভিল সার্জ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ জন ডাক্তার, ডেপুটি সিভিল সাপ্লাই অফিসার, টাউন ফুড কমিটির সেক্রেটারী, কন্ট্রাক্টার রায় সাহেব শ্যামদাস ক্ষেত্রী প্রভৃতি এবং দুইজন পুলিস সাব-ইন্‌স্পেক্টর আছেন।

রেশনের চাউল যাহাতে কদর্য না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা গবর্মেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য, এজন্য সুদক্ষ ইন্‌সপেক্টর থাকা উচিত, আড়াই বৎসর আগে গ্রেগরী কমিটি ভারত-সরকারকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত করা ভারত-সরকার কোন সময়েই তেমন আবশ্যক মনে করেন নাই, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রকাশ্য বাজারে উচিত মূল্যে আহার্য্য ক্রয়ের অধিকার যাহাদের নাই, যাহাদের খাদ্য সরবরাহ সরকারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাহাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব অসীম, এই মূলনীতি ব্রিটেনে স্বীকৃত হইয়াছে ও তদনুসারে কাজ হইয়াছে। এ দেশে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অধীনস্থ ভারত-সরকার এবং তাঁহাদের অধীনস্থ প্রাদেশিক সরকারসমূহ জনসাধারণের সুখ-সুবিধাবিধান ত দূরের কথা, রোগীর পথ্য পর্য্যন্ত সরবরাহেরও যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই।

বুদ্ধিমান ও বিত্তবান লোকেরা আপন পথ খুঁজিয়া লইবেন ইহা অবধারিত। কুমিল্লাতে তাহাই ঘটিয়াছে। পরাধীন

দেশে রেশনিং মানুষকে যে কি ভীষণ অলস ও স্বার্থপর করিয়া তোলে আমাদের দেশে বহু ঘটনায় তাহা দেখা গিয়াছে। যাহার ঘরে পুরাণ চাউল বা মিশ্রি বা সাগুদানা প্রভৃতি রোগীর পথ্য আছে, অপরের প্রয়োজনে তাহার ভাগ দিতে সেও কুণ্ঠিত হয়। নিজের প্রয়োজনে হঠাৎ সে উহা পায় কোথায়? দেশের সহিত সম্পর্কহীন অসাধু, দাম্ভিক ও স্বার্থসর্বস্ব বিদেশী এবং তাহাদের ক্রীতদাসদের হাতে রেশনিং-প্রথা চূড়ান্ত ক্লেশ ও লাঞ্ছনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

খানাকুল থানা বোরো বাঁধ কমিটি

খানাকুল থানা বোরো বাঁধ কমিটির প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইঁহাদের কার্য্য বিবরণীতে দেখা যায় স্বল্পমাত্র সংগঠন শক্তিও ঠিক ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে বাংলার বহু স্থানে নদী-নালার সামান্য সংস্কার সাধন বা সাময়িক বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির দ্বারা শস্যোৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বিখ্যাত সেচ-বিশেষজ্ঞ এবং নবীন মিশরের প্রাণদাতা সর উইলিয়ম উইলকক্স কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় বাংলার নিজস্ব সেচ ব্যবস্থার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, বাংলার চাষী নিজ নিজ এলাকায় নদীর সংস্কার নিজেরা করিত এবং এই কাজ পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। ইংরেজ শাসনে ইংরেজ ট্রাষ্টীরা আমাদের অন্নবস্ত্র-সংস্থানের ভার গ্রহণ করিবার পর বাঙালীর স্বাবলম্বন ঘুচিয়াছে, দুর্ভিক্ষ তাই আজ আমাদের নিত্য সঙ্গী।

খানাকুল কমিটির কার্য্য দেখিয়া আমাদের ভরসা হইতেছে অবস্থা হয়ত এখনও একেবারে আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই। অন্নের জন্য ইংরেজ সরকারের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে দুর্ভিক্ষে মরাই সার হইবে এই কথা বুঝিয়া বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিলে এখন হইতেই ফসল উৎপাদন সম্বন্ধে বাঙালীকে সম্পূর্ণ রূপে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। গবর্ন্মেণ্ট যেখানে পদে পদে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সেই ঘন অন্ধকারে আশার আলো প্রতিফলিত করিয়া দেশকে বাঁচিবার পথের সন্ধান দিয়াছেন এজন্য বাঙালী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

বাঁধের সাহায্যে জল সেচ করিয়া ইঁহারা অর্থব্যয়ের ৮।১০ এমন কি ২০ গুণ পর্য্যন্ত অধিক মূল্যের ফসল পাইয়াছেন। দেখা গিয়াছে কৃষকেরা স্বেচ্ছায় খরচের টাকা আদায় দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। শুধু নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা তাঁহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হয়। এই পথে কৃষক সংগঠন ও আর্থিক কল্যাণ উভয় দিকেই অগ্রসর হওয়া যায়।

বাঁধ কমিটির কাজ

খানাকুল থানা হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের বন্যাপীড়িত ও অজন্মাক্লিষ্ট অধিবাসিগণ দুঃসময়ে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের নিকট জানান যে কর্ম্মিগণ যেন রত্নেশ্বরী নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বোরো ধান্য উৎপাদনের উপায় করেন।

তদনুসারে হুগলী জেলা বন্যা-সাহায্য-সমিতির উদ্যোগে ইং ১৯৪৪ সনের ২২এ অক্টোবর তারিখে রাজহাটি গ্রামে জনসভায় এই খানাকুল থানা বোরো বাঁধ কমিটি গঠিত হয়।

কমিটির সভাপতি শ্রীগৌরহরি রক্ষিত (সেনহাট গ্রাম) ৬৯০০৲, কোষাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৯১০০৲ এবং হুগলী জেলা বন্যা-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীরতমণি চট্টোপাধ্যায় ৫০০০৲ মোট ২১ হাজার টাকা ধার লইয়া বাঁধের কার্য্য আরম্ভ, অগ্রসর ও সম্পূর্ণ হয়। বাঁধ নির্ম্মাণকল্পে ৮৮৫৲ টাকা এককালীন দান সংগ্রহ হয়।

১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ১০ই জানুয়ারী (১৯৪৫) তারিখের মধ্যে ভুরেড়া ও গোপালদহে প্রধান বাঁধ দুইটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় এবং তাহার ফলে অধিকাংশ গ্রাম ধান্যক্ষেত্রে বোরো চাষের প্রথম জল পায়।

দৈব-দুর্বিপাকে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ছোটনাগপুর-পাহাড় অঞ্চল হইতে হঠাৎ বেশী জল নামিয়া ভুরেড়া ও গোপালদহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেচ কর্ম্মের ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। জল দেওয়ার প্রথম মুখেই বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত প্রধান বাঁধ দুইটি এইরূপে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কর্ম্মিগণ মহা পরীক্ষার মধ্যে পড়েন। যাহা হউক, ধৈর্য্য, সাহস ও উপায়কুশলতার বলে পুনরায় ৮ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বাঁধগুলি পুনর্নির্ম্মিত হয়। গোপালদহ বাঁধের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া ৭৭৫ ফুট দাঁড়ায়।

ভুরেড়ার প্রথম বাঁধ হইতে কারকদহের শেষ বাঁধের মধ্যে নদীপথে ব্যবধান আন্দাজ প্রায় ১০ মাইল। ভুরেড়া ও গোপালদহে বাঁধ বাঁধিয়া যে সেচের কাজ সুরু হয়, ঐ অঞ্চলের ৫০ খানি গ্রামের মাঠে জল দিয়া সেই কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য কর্ম্মিগণ আনুষঙ্গিক আরও ১৩টি বাঁধ বাঁধেন।

ইহার ফলে ৫০টি গ্রামে প্রায় ১১ হাজার বিঘা জমিতে সেচের জলে বিঘাপ্রতি কম পক্ষে ৫ মণ ধরিয়া ৫৫ হাজার মণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। ঐ অঞ্চলে এই ধানের ৮৲ টাকা মণ দর ধরিলে উৎপন্ন ধান্যের মূল্য হয় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ইহা ছাড়া সেচের জল পাইয়া ঐ অঞ্চলের পিঁয়াজ, আলু, আক, তিল প্রভৃতির ক্ষেতে যে ফলন বেশী হয় তাহারও আনুমানিক মূল্য হয় প্রায় এক লক্ষ টাকা।

নদীর জল এইরূপে প্রণালী বাহিয়া বহু বিল ও নদীতে পড়িয়া মৎস্যবৃদ্ধিরও সহায়ক হয়।

এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ৫০খানি গ্রামের মাঠে মাঠে বোরো বাঁধের জল-পাওয়া জমির পরিমাণ যে ১১ হাজার বিঘা দেখান হয়, আসলে তাহা আন্দাজ ১৫ হাজার বিঘা হইবে। কারণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ঐ সকল জমির ঠিকমত মাপ লওয়ার সুবিধা ছিল না।

কমিটি বিঘাপ্রতি ২।০ টাকা চাঁদা ধার্য্য করেন। ইহা বিঘা-করা উৎপন্ন ফসল-মূল্যের শতকরা মাত্র ৬৲। ২৬ হাজার টাকা চাঁদানী জলকরের মধ্যে প্রায় ২১ হাজার টাকা চাষীরা স্বেচ্ছায় কমিটিতে আদায় দিয়াছেন।

পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় এই কার্য্য সম্ভব করিয়া তোলা কর্ম্মীদের ও চাষীদের কৃতিত্ব। এ ক্ষেত্রে চাষীরা হাত পাতিয়া কারও দান গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু

নিজেদের দেয় চাষানীর বেশীর ভাগ শোধ করিয়া তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন।

কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ অসীম উৎসাহের সহিত অপরিচিত এই নূতন কাজে ঝাঁপ দেন এবং অশেষ শ্রম ও ততোধিক ধৈর্য্য স্বীকার করিয়া বহু অসুবিধার মধ্যে আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। নদীর চরে 'কেশের' কুঁড়েতে মাসের পর মাস বাস করিয়া ইঁহারা কাজের তত্ত্বাবধান করেন।

এই বাঁধের দ্বারা পঞ্চাশটি গ্রামের মোট ৪৭০০টি গৃহস্থ পরিবার উপকৃত হইয়াছে। ইঁহাদের আয়ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত্ত পত্রে দেখা যায় প্রথম বৎসরেই কমিটি স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছেন ও মোট ২১ হাজার টাকা ঋণের মধ্যে ১৬ হাজার টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কমিটির সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য উদ্যোক্তারাই সর্ব্বাগ্রে নিজেরা ঋণ দিয়া সেই টাকায় কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

সব ভাল কাজেই বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা থাকে, এ ক্ষেত্রেও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে বাধা সবচেয়ে বেশী আসিতেছে জমিদার, গ্রামের মোড়ল ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে। মাটি লইবার অনুমতি দানের জন্য জমিদার ও নায়েব যথারীতি টাকা আদায় করিয়াছেন। সম্পন্ন লোকেরা বাঁধ কাটিয়া ভেড়ীতে জল লইয়াছেন কিন্তু টাকা দেন নাই। কুমারহাট নামক গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জমিতেই বেশী ধান হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে অর্দ্ধেক টাকাও আদায় হয় নাই। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "যে টাকা বাকী পড়িয়া আটকাইয়া আছে তাহা সমস্তই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট। কমিটির সম্পাদক গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বহু তাগাদা দিয়াও টাকা আদায় করিতে পারেন নাই।" অথচ সাধারণ চাষীরা স্বেচ্ছায় সমস্ত টাকা দিয়াগিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইলে এই সব হীনচেতা স্বার্থপর লোকদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের উপায় হইত। ঘুষখোর-মুনাফাখোর শাসিত বর্ত্তমান বিদেশী গবর্মেণ্ট ইহাদিগকেই সমর্থন করিলে আমরা আশ্চর্য্য হইব না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে ত্রুটি-বাহুল্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ছাত্র অকৃতকার্য্য হয়, তাহাদের অধিকাংশই অকৃতকার্য্য হয় ইংরেজীভাষা পরীক্ষায়। ইহার কারণ ও প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষা বিভাগ একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টটির সারমর্ম্ম এই—

গত পাঁচ বৎসরের বিভিন্ন পরীক্ষায় ইংরেজী প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করিয়া কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রশ্নাবলী যথাযথ হয় নাই। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ইংরেজী প্রশ্নপত্র সম্পর্কে কমিটি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্রশ্নপত্রের রচনায় ত্রুটিই এত অধিকসংখ্যক ছাত্রের ইংরেজীভাষায় অকৃতকার্য্য হইবার কারণ বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন; গত পাঁচ বৎসরের প্রশ্নপত্রগুলি এইরূপ ত্রুটিবহুল যে উহার মধ্য হইতে উপযুক্ত প্রশ্নাবলী বাছাই করিয়া বাহির করা এক দুরূহ ব্যাপার। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ইংরেজী কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নপত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নপত্রে এইরূপ সমস্ত প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যেগুলি সাধারণতঃ বি-এ অনার্স কোর্স অথবা এম-এ পরীক্ষার প্রশ্ন হিসাবে মনোনীত করা হয়।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমিটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরেজী প্রশ্নপত্রের অনুবাদ অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্য যে সমস্ত অনুচ্ছেদ নির্দ্দিষ্ট হয় সেগুলি খুবই কঠিন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ভাষা হইতে ইংরেজী করিবার জন্য যে সমস্ত অনুচ্ছেদ দেওয়া হয় তাহার তুলনায় বাংলা অনুচ্ছেদগুলি অত্যধিক কঠিন হইয়া থাকে। এই কারণে অন্যান্য ভাষাভাষী পরীক্ষার্থী অপেক্ষা বাঙালী পরীক্ষার্থীর অধিক অসুবিধা ঘটে। উপরোক্ত কারণেই হয়ত বা আসামী ছাত্রগণ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকে।

বি-এ পাশ ও অনার্স এবং এম-এ প্রশ্নপত্র সম্বন্ধেও কমিটি সমালোচনা করিয়াছেন। কমিটির মতে নির্ব্বাচিত পাঠ্য-তালিকা হইতে মামুলি ধরণের প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমালোচনামূলক প্রশ্নের ধরণ, রচনার বিষয়-বস্তু, ব্যাকরণের প্রশ্ন ও সারমর্ম্ম লিখিবার জন্য যে সমস্ত অনুচ্ছেদ দেওয়া হয় সেইগুলির পরিবর্ত্তন করার অনুকূলে কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্নপত্রের রচনায় প্রশ্নকর্ত্তারা যেন আর একটু সময় ও মন দেন তার জন্য কমিটি অনুরোধ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিতেও বলিয়াছেন। রিপোর্টের উপসংহারে কমিটি প্রশ্নকর্ত্তাদের কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

প্রশ্নপত্র রচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিশ্রমিকের হার নিম্নোক্তরূপ :—

ম্যাট্রিকুলেশন	—২৫৲ টাকা
ইণ্টারমিডিয়েট	—৩২৲ "
বি-এ ও বি-এসসি	—৩২৲ "
বি-কম	—৩২৲ "
এম-এ ও এম-এসসি	—৬৪৲ "
এম-এল	—৭৫৲

পারিশ্রমিকের হার বেশী নয় ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ যে-সব পরীক্ষার উপর নির্ভর করে তাহাদের জন্য প্রশ্নপত্র রচনায় দায়িত্ববোধ বলিয়া কি কিছু থাকিবে না? ছাত্রছাত্রীদের গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে লেখাপড়া করিতে হইতেছে তাহা কাহারও অজানা নয়। বই নাই, খাতা নাই, কাগজ নাই, মফস্বলে রাত্রে পড়িবার আলো নাই, একটা পেন্সিলের দাম দশ গুণ বাড়িয়াছে—এই সব অবস্থার মধ্যেও যাহারা পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হয় তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে

প্রশ্ন-রচয়িতারা সামান্য কয়েকটা টাকার লোভে পরাঙ্মুখ হন, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত না হইলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

এ দেশে শিক্ষা বিস্তার ইংরেজ চায় না। শিক্ষা বিস্তারের পথে যত রকমে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব তাহা করিতে সরকারের চেষ্টার ত্রুটি কখনও দেখা যায় নাই। সরকারী প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র-রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট ইহা পছন্দ করেন নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্যদানে কুণ্ঠা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে টাকা দেওয়ার আগ্রহে তাহা বারবার দেখা গিয়াছে। কমিটির রিপোর্টে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার যে স্বপ্ন সর আশুতোষের জীবনের সাধনা ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হইয়াছে।

ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাসীনতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শুধু প্রশ্নপত্র রচনা নয়, পাঠ্যতালিকা প্রণয়নেও ছাত্রদের শিক্ষার চেয়ে টাকা রোজগারের দিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশী আগ্রহ দেখা যায়। ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি রচনাবলী স্থির করিবার সময় কাহাদের জন্ত উহা বাছা হইতেছে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় না ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রতি বৎসর দুই-তিনটি রচনা বদলাইয়া দিয়া ছাত্রদের নূতন বই কিনিতে বাধ্য করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক তদন্তের সময় আসিয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা

নিখিল-ভারত জাতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথন ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারসমূহের পুনর্গঠনের জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বর্ণনা দিয়াছেন।

পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য হইতেছে অন্যূন ৫০ হাজার লোক-সংখ্যা বিশিষ্ট ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শহরে এক একটি করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা। এই হিসাবে রঙ্গনাথন মনে করেন যে, প্রদেশের রাজধানী এবং দেশীয় রাজ্য মিলাইয়া ২০টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শহর অঞ্চলের জন্ত ৫ হাজার এবং গ্রামাঞ্চলের জন্ত পাঁচ হাজার, এই মোট সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজন হইবে। এই সকল গ্রন্থাগারের কাজ-কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্ত মোট ৪৫ হাজার শিক্ষিত লাইব্রেরীয়ানেরও দরকার হইবে। প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার স্থানীয় লোকদের এবং আংশিকভাবে প্রাদেশিক সরকারকে বহন করিতে হইবে। যে জনসংখ্যা গ্রন্থাগারগুলির সুবিধা পাইবে তাহাদের মাথাপিছু বছরে এক টাকা করিয়া সরকার যদি ব্যয় বরাদ্দ করেন তদ্দ্বারা গ্রন্থাগারসমূহের ব্যয় সহজেই নির্ব্বাহ হইতে পারে।

পরিকল্পনাটিতে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রতিবৎসর পরি-কল্পিত গ্রন্থাগারগুলির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আনুমানিক ১৪ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। কর প্রভৃতি র্ধায্য করিয়া স্থানীয় গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে সাত কোটি টাকা উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাকী সাত কোটি টাকা ফেডারেল গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে মঞ্জুর করিবার প্রয়োজন হইবে।

পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করা মোটেই কঠিন নয়। গ্রন্থাগারের সহিত জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধ অতি নিবিড়। জাতীয় শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনার সহিত গ্রন্থাগার যোগ না করিলে অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়াই দেশের জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবে বিভিন্নরূপে জ্ঞানলাভ করিতে সহজেই সমর্থ হইবে এবং ইহার দ্বারা নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রচুর সহায়তা হইবে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন জন্ম-শতবার্ষিকী

কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সর যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। কবি নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ও দেশাত্মবোধের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সন্তোষ-কুমার বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র-কৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার নন্দী নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কবির কাব্যের একটি নূতন সঙ্কলন প্রকাশ করিবার জন্ত উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করেন।

সভাপতি সর যদুনাথ সরকারের অভিভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"চট্টগ্রামে মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বাংলায় অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইয়া আসিতেছে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার চর্চ্চা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা ঐ কাব্যগুলিকে অত্যন্ত আদর করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় লিখিত কতকগুলি পুঁথি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথিগুলি বাংলা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও চট্টগ্রামে দুইজন প্রথম শ্রেণীর কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

"প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছিলেন—

—"হায় কি হল দেশের দশা।
হেম-নবীনের আর নাইক জারীজুরী"—

কিন্তু সে কথা যদি সত্য হয়, যদি বাংলা নবীন সেনকে ভুলিয়া থাকে, তবে বাংলার শিক্ষিত সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে।

"সে যুগে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শেলী ও নবীন-চন্দ্রকে বাংলার 'বাইরন' বলিতাম। ইহার কারণ এটা নয় যে 'বাইরনে'র মত নবীনচন্দ্রও ক্লিওপেট্রা জাতীয় স্বাধীন নায়িকার গৌরব গান গাহিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই নহে যে, 'পলাশীর যুদ্ধে'র স্থানে স্থানে বাইরনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড' হইতে নিছক অনুবাদ বসান হইয়াছে যদিও তাহাতে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহার মূল কারণ নবীনচন্দ্র ঠিক বাইরনের চক্ষে বাহ্য প্রকৃতিকে দেখিতেন। নিসর্গের দৃশ্য এবং মানব-হৃদয়ের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা তিনি সর্ব্বদা মানিতেন এবং তাহার দৃষ্টান্তও দিতেন।

"নবীনচন্দ্রের প্রতিভার কি আশ্চর্য্য স্ফুরণ দেখিতে পাই। তাহার জোরে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যখানি যেন পূর্ণ বেগবতী স্রোতস্বতীর মত নৃত্যপরা।

"নবীনচন্দ্র বাঙালীর হৃদয়ে সহানুভূতি জাগাইবার জন্য সিরাজ চরিত্র মিথ্যা করিয়া অঙ্কিত করেন নাই। তিনি নবাবের সব দোষ, সব পাপ স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুদের মধ্যে পতিভক্তির আদর্শ সীতা ও সাবিত্রী; নবীনচন্দ্র পরম পতিব্রতা বেগমের চিত্র আঁকিয়া আমাদের ক্ষণেকের জন্য সিরাজের সব দুষ্কর্ম ভুলাইয়াছেন। নবাবকে যেন উচ্চতর সোপানে তুলিয়াছেন। অথচ সব কথা বলিবার পর কবি ন্যায় বিচারকের মত ঐ ঘটনাটির উপর ঠিক ঐতিহাসিক মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধ হইতে ভারতে যে নবযুগের সূচনা হয়, একথা ভুলিলে ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হইবে। নবীনচন্দ্র তাহা ভুলেন নাই। তিনি তাহা তাঁহার কাব্যে স্বীকার করিয়াছেন।

"নবীনচন্দ্রের প্রতিভা এই একখানি গ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধে'ই নিঃশেষ হয় নাই। তাঁহার 'রৈবতক', 'প্রভাস' ইত্যাদি মহাভারতীয় কাব্যগুলি শেষ বয়সের রচনা। তখন হৃদয়ের রক্তের উচ্ছ্বাস কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু মস্তিষ্কের চিন্তা আরও গভীর আরও সূক্ষ্ম হইয়াছে।

"নবীনচন্দ্র শুধু কবি ছিলেন না। তাঁহার গদ্য রচনাও অতি উপাদেয়। তাঁহার আত্মজীবনী দীর্ঘ হইলেও অতি সুপাঠ্য এবং সেই যুগের সমাজ ও নেতাদের অতি মূল্যবান চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।"

যতীন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় উদারনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা ও বিশিষ্ট এটর্নী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি একরূপ শয্যাগত ছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ বসু কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলেন স্বনামধন্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু। এটর্নী হিসাবে যতীন্দ্রনাথ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও জাতীয়তাবাদী নেতা এবং রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য এবং উদারনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি লিবারাল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে তিনি জাতীয় কল্যাণকর সকল কাজে যোগ দিয়াছেন। বাংলায় পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন-প্রণেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে পুলিস যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহার তদন্তের জন্য একটি বে-সরকারী কমিটি গঠিত হইলে তিনি তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তদন্তের পর স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতিতে তিনি মেদিনীপুরের পুলিসী অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং পৃথক নির্ব্বাচন প্রণালীর তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং সব সময় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথের জীবনের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার মধুর অমায়িকতা, নির্ম্মল চরিত্র ও আদর্শ সাধুতা। কখনও কোন কাজে তিনি সরকারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির তিরোধানে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সুরেন্দ্রনাথ হালদার

বাংলার স্বদেশী যুগের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও বাংলা দেশের শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের মৃত্যুসংবাদে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। স্বদেশী যুগে আভিজাত্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া যে সব বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার স্বদেশীব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এদেশে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হইবার পূর্ব্বে সেই স্বদেশী যুগেই কতিপয় বন্ধুর সহযোগে প্রিণ্টার্স ইউনিয়ন, ট্রামওয়ে ইউনিয়ন, রেলওয়ে ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠন করিয়া তিনি এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবী নায়কেরা অভিযুক্ত হইলে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য যে আয়োজন হয় সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইহা ছাড়া বহু স্বদেশী মামলায় পক্ষ সমর্থনের আয়োজন তিনি করিয়া দিয়াছেন। অমায়িক, নিরহঙ্কার বাংলার এই সুসন্তানের সংস্পর্শে যাঁহারা একবার আসিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি তাঁহারা কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

সর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

সর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে সর উপেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার স্থান সকলের উর্দ্ধে। সর উপেন্দ্রনাথই সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক যিনি একটি রোগ ধরিয়া তাহার মূল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া রোগের প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে রোগ বিস্তার বন্ধ করিয়াছেন। কালাজরের ন্যায় একটি মারাত্মক ও ব্যাপক রোগ সর উপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গবেষণার ফলে প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। যে গবেষণা করা উচিত ছিল গবর্মেণ্টের, তাহা একাকী তিনিই সাধন করিয়া সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগ ও ম্যালেরিয়া লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নাই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর উপেন্দ্রনাথের দান অবশ্য এই আবিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; চিকিৎসক ও রাসায়নিক হিসাবেও তিনি বিপুল সম্মান ও মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বহু বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স এণ্ড মেডিসিনের ডীন ছিলেন। দুই বার তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়ান্সেরও সভাপতি ছিলেন।







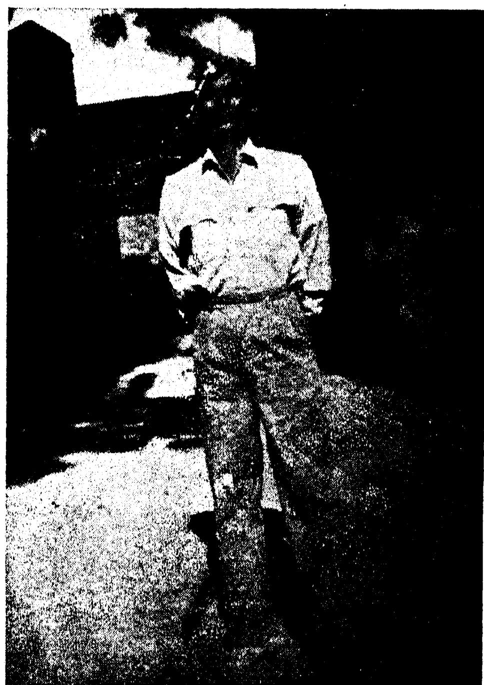


উপরে : (বাঁদিক হইতে) মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ খাঁন, কর্ণেল পি. কে. সাইগল ও কর্ণেল জি. এস. ধিলন। (দক্ষিণে) লেঃ কর্ণেল বুরহান উদ্দীন,
নীচে : (বামে) জেনারেল মোহন সিং। (দক্ষিণে মেজর সিঙ্গারা সিং ও মেজর ফতে খাঁন।









উপরে : (বামে) মেজর জেনারেল জে. কে. ভোঁসলে, (দক্ষিণে) কর্ণেল কে. রায়
নীচে : (বামে) কর্ণেল এস. এম. হোসেন ও কর্ণেল হবিবুর রহমান, (দক্ষিণে) কর্ণেল এস. এ. মল্লিক।

[বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত]

রবীন্দ্রনাথ, সি. এফ্. এণ্ড্রুজ ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পত্রাবলী

রাখী-বন্ধনের রাখী-সহিত কার্ড

16 Oct. 1905

মধ্যের ডানদিকের পৃষ্ঠায়—

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

কর প্রকোষ্ঠেষু

ভাই ভাই এক ঠাঁই

ভেদ নাই, ভেদ নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০শে আশ্বিন ১৩১২

১৬ই অক্টোবর ১৯০৫।

তাহার বামদিকের পৃষ্ঠায়—

বন্দে মাতরম্।

এক দেশ এক ভগবান

এক জাতি এক মহাপ্রাণ।

বাহিরের পৃষ্ঠায়—বাংলার মাটি ইত্যাদি ১৩ পংক্তি।

ওঁ

বোলপুর

[May 1910]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার প্রেরিত বইগুলি ও পত্র কিছুকাল হইল পাইয়াছি—নানা ব্যস্ততায় এ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারি নাই—ক্ষমা করিবেন।

রাসমালা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। দেখি যদি কিছু সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু মুস্কিল এই, মনটা ওদিকে নাই আবার এ সব কাজ জবরদস্তি করিয়া হয় না। [টীকা ১]

মাঝে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল আবার সেই দিকে চলিয়াছি। ছুটিতে স্থির হইয়া বসা ঘটিল না। কোথাও যাইব মনে করিয়াছিলাম—এইখানকার এই মাঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেও মন সরে না।

রথীন্দ্র বিদ্যালয়ে একটি বেশ ভাল magic lantern দিয়াছে—কবে ইহার মধ্য দিয়া আর একদিন আপনি জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন? মাঝে মাঝে এক একবার দর্শন দিয়া যাইবেন। [টীকা ২]

অজিত [চক্রবর্ত্তী] ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তি পাইয়া আগামী সেপ্টেম্বরে অক্সফোর্ডে যাত্রা করিবেন। তাঁহার সহিত আপনার এখানে পরিচয় ঘটিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া এখানেই তিনি অধ্যাপনার কার্য্য করিবেন। ইতি—২৫শে বৈশাখ ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা ১।—আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করি যে "কথা" (প্রথম সংস্করণের) ঐ কটি ব্যালাড্ লিখিয়া তিনি কেন ক্ষান্ত হইয়াছেন, ওগুলি ত অতি উপাদেয় এবং যে কোন সাহিত্যেই অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি উত্তর করিলেন, বৌদ্ধ অবদান, টডের রাজস্থান প্রভৃতি আধার গ্রন্থ তিনি ব্যবহার করিয়া শেষ করিয়াছেন; ফর্বস্ সাহেবের রচিত *Ras Mala or the Hindoo Annals of Goozerat* হইতে কতকগুলি ঘটনা লইয়া আরও কটি ব্যালাড্ লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ বইখানা এখন হারাইয়া গিয়াছে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে "জয় পরাজয়" গল্পের নায়ক কবি-শেখরের নামটি ঐ রাসমালা হইতে লওয়া। তখনও অক্সফোর্ড ছাপাখানা রাসমালা পুনর্মুদ্রণ করে নাই; কিন্তু আমার কাছে যে পুরাতন সংস্করণ ছিল তাহাই রবীন্দ্রনাথকে ডাকে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তিনি আরও নূতন ব্যালাড্ লিখিবেন, আমাদের এ আশা পূর্ণ হইল না, কেন হইল না তাহার কারণ এই পত্রে দিয়াছেন।

টীকা ২।—আমি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও মুসলিম সৌধ ও দৃশ্যের প্রায় এক শত ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন স্লাইড নিজের খরচে প্রস্তুত করাইয়া শান্তিনিকেতনে উপহার দিই, এবং এই পত্রের পূর্ব্বকার বোলপুর-প্রবাসের সময় তাহার কতকগুলি দেখাইয়া ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করি। কবি উপস্থিত ছিলেন।

ওঁ

বোলপুর

June 1910

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

দীনেশ বাবুর পুত্র শ্রীমান অরুণ সহসা বাড়ি ছাড়িয়া পাটনা অভিমুখে কোথায় আসিয়াছে। সে আমাদের আশ্রমের ছাত্র—সম্প্রতি এফ, এ পাস করিয়াছে। তাহার ভাই ও ভগ্নীপতি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন। পত্রবাহকদের মুখে সমস্ত কথা শুনিতে পাইবেন।

আশা করি আপনার খবর ভাল। বিদ্যালয় খুলিয়াছে—অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

Oct, 1910

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শকুন্তলার অনুবাদের প্রুফ কয়েক দিন হইল পাইয়াছি। [টীকা ৩]

বিদ্যালয়ের ছুটি আসন্ন প্রায়। ছেলেরা অভিনয় করিবে তাহারই আয়োজন করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলিয়া এত

দিন আপনাকে চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ একটা অভিনয় হইবে এবং আগামী কল্য আর একটা অভিনয় হইয়া বিদ্যালয়ের ছুটি হইবে।

আপনি যে ভাবে তর্জ্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার শোভা পায় ইংরাজিতে তাহা কোনো মতেই উপাদেয় হয় না এই জন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইংরাজিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত বক্তব্য বিষয়টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়।

আপনি শুনিলাম কোথায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। একবার মনে করিয়াছিলাম আমাদের অভিনয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিব কিন্তু আপনার আসা সম্ভবপর হইবে না আশঙ্কা করিয়া এবং নিশ্চিত দিন স্থির না হওয়াতে আপনাকে ডাকিতে পারি নাই।

আশ্রমে আবার কবে দেখা দিবেন? ইতি ১৭ই আশ্বিন, ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা ৩।—কবি শকুন্তলার যে সমালোচনা তাঁহার "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থে প্রকাশ করেন তাহারই (মাঝে মাঝে কিছু বাদসাদ দিয়া) ইংরেজী অনুবাদ আমি *Modern Review*এ "Sakuntala: its Inner Meaning" এই নামে (Februay 1911 pages 171 etc.) ছাপাই। ঐ বৎসর ঐ বিষয়ে আমার আর একটি অনুবাদ "Beauty and Self-Control নামে September 1911 সংখ্যায় (pages 225 etc.) বাহির হয়।

ওঁ

শিলাইদ, নদিয়া
[Oct. 1910]

সবিনয় প্রীতি সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের picture post cards সংগ্রহ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—আপনি যে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ইহাতে বড় আনন্দ লাভ করিলাম। [টীকা ৪]

আমি ছুটির কয়টা দিন শিলাইদহে পদ্মাতীরেই কাটাইবার আয়োজন করিয়াছি।

৭ই পৌষের উৎসবে বিদ্যালয়ে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল—তখন বোধ হয় আপনাদের ক্রিষ্ট্‌মাসের ছুটি আরম্ভ হইবে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক, ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা ৪।—বেলজিয়ম ও লুকসেমবুর্গে ছাপান ভারত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পিক্‌চার পোষ্টকার্ড প্রায় তিন শত বৎসরে কিনিয়া আমি শান্তিনিকেতনে দান করি।

ওঁ

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
[Dec. 1910]

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার প্রেরিত ছবিগুলি আজ পাইয়াছি। সেগুলিকে সাজাইয়া একটি ফ্রেমে বাঁধাইয়া লইবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।

ক্রিষ্ট্‌মাসের সময় জগদানন্দ, ক্ষিতিমোহন বাবু প্রভৃতি কয়েকজন অধ্যাপক এক্‌জিবিশন দেখিবার জন্য এলাহাবাদ যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—কিন্তু আমার এখান হইতে নড়িবার ইচ্ছা নাই। আপনি সে সময় আসিলে আনন্দ লাভ করিব।

ময়মনসিংহে বোধ হয় আগামী সরস্বতী পূজার সময় সাহিত্য সম্মিলন বসিবে। ডাক্তার বসু সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন—তিনি আমাকে সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিবেন—সহজে নিষ্কৃতি দিবেন বলিয়া আশা করি না। উত্তরবঙ্গ সম্মিলনীর সঙ্গে তাহার দিনক্ষণে কাটাকাটি হইতেও পারে। ভাঙা শরীর লইয়া অধিক নড়াচড়া করিতেও পারি না। এই সকল কারণে এখনো কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আলোচনা হইতে পারিবে। ক্রিষ্ট্‌মাসের ছুটিতে ডাক্তার বসু শিলাইদহে পদ্মার চরে আমার সঙ্গ ইচ্ছা করিয়াছেন—কিন্তু মাঘোৎসবের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই জন্য সে সময়ে কোথাও যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭,

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[টীকা—ঐ সম্মিলনের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সভাপতির অভিভাষণ লিখিবার পর প্রাতে রবীন্দ্রনাথের চেহারা কেমন হয় তাহার একখান ফটো অজিত চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে পাই, তাহা এখনও আমার নিকট আছে।]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
[April 1911]

প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার শরীর ভাল নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। ১লা বৈশাখের উৎসবে আপনার প্রত্যাশায় ছিলাম। আসিলেন না দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম হয়ত ২৫শে বৈশাখ আসিবেন।

মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী লিখিয়াছেন তিনি বিদ্যালয় খুলিলে আষাঢ় মাসে এখানে আসিবেন। অতএব এই সময়ে এখন আপনার গতিবিধির কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে না।

এখানে কলেজ স্থাপনের পরামর্শ করিতে কলিকাতায়

আশু মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন আমাকে টাকা জমা দিতে হইবে না—জামিন হইলেই চলিবে। অবশ্য ক্লাসের ঘর ও সাজসরঞ্জামে টাকা লাগিবে। এ টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব কিনা সন্দেহ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মনে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হইলে পরামর্শ করা যাইবে।

আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব এখানকার ছেলেরা করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ যে উৎসব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সম্ভবত তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশনের দিনে—সে কবে আমি জানি না। সে সভায় আমি উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি না—যদি কোন মতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কোথাও পালাইতে পারি সে চেষ্টা করিব।

আমার জন্মোৎসবের ভার যদি সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত চাঁদার টাকা লইয়া তাঁহারা সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন একটা কাজের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। ও দিকে দৃষ্টি দিয়া কোনো ফল হইবে মনে করি না। এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরের উদ্যোগ আয়োজনে আমি যে কিরূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি তাহা অন্তর্যামীই জানেন। আপনার নিরাময় সংবাদ পাইলে নিশ্চিন্ত হইব। নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানিবেন। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১৮।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
[Postmark 31 Aug. 1911]

প্রিয়বরেষু—

এবার আমাদের পূজার ছুটি সম্ভবত ৮ই আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইবে। ৬ই অথবা ৭ই আশ্বিনে শারদোৎসব হইবার কথা। সে সময়ে আপনি যদি আসিতে পারেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। তখন রামানন্দ বাবুও আসিবেন কথা আছে। ছুটির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিতান্ত দায়ে না পড়িলে আমি কোথাও যাইব না—অতএব আপনি যখনি আসিবেন দেখা হইবে। বায়ু পরিবর্ত্তনে আপনি কি বিশেষ উপকার পান নাই? আমার শরীরটাও ভাল চলিতেছে না। যকৃৎটাই বিকল হইয়াছে। ইতি বৃহস্পতিবার।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
Nov. 1913

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

পাইওনিয়র আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ইহার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়া আছি। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই আসিবেন। ছেলেরা ৮ই পৌষে অচলায়তন অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে দেখা হইলে অনেক কথা হইবে। ইতি ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এতদিন কলকাতায় ছিলেম। বিশেষ কাজের তাড়ায় আগামী কাল মঙ্গলবার ভোর বেলায় বোলপুরে রওনা হতে হবে। শুক্রবার পর্য্যন্ত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের এই সুযোগ হারাতে হল। ইতি সোমবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বোটে চড়িয়া জলে জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি—১১ই মাঘের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ডাঙায় নামিতে হইবে। তাহার পরে কবে পশ্চিমে যাত্রা করিব এখনও নিশ্চয় বলিতে পারি না—কারণ, বিদ্যালয়ের কাজে অনেকদিন গাফিলি করিয়াছি কিছুদিন সেখানে স্থির হইয়া বসিতে না পারিলে ক্ষতি হইবে। হয়ত ফাল্গুন চৈত্রে কিছুদিনের ছুটি মিলিতে পারে তখন আপনাকে খবর দিব—কিন্তু আমার প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করিবেন না—সম্মান আমার পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। ইতি ২৯ পৌষ [টীকা ৫]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা ৫।—পাটনায় যে হেমচন্দ্র লাইব্রেরি ও বাঙ্গলা সাহিত্য সভা আছে, তাহার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একবার পাটনা আনাইয়া স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীদের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতে চাই; উনি কতকটা সম্মত হন। উঁহার একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ আনিয়া কলিকাতায় ৩০০খানা প্রিন্ট প্রস্তুত করাইয়া আমার কাছে রাখি, ঐ সম্মেলনে বিতরণ করিবার জন্য। সে সভা আর আমার সময়ে হইল না। কয়েক বৎসর পরে বদলি হইবার সময় ঐ সুন্দর ছবিগুলি এমনি বিতরণ করিয়া দিলাম।

আজ অনেকটা ভালো আছি কিন্তু দুর্ব্বলতা আছে। এ জায়গাটি ভালো লাগচে। ইতি

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা। বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইএর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাকান্ত; জন্ম ৫ই মে ১৮৯৯, শান্তিনিকেতনে বাস (১ ডিসেম্বর ১৯১২—১০ মার্চ ১৯১৬, ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে), পরে বম্বের B.Sc. এবং বার্লিনের Ph.D. হয়—মৃত্যু ২৮ নবেম্বর ১৯২৫।

শ্যামকান্ত সরদেশাই একদা শান্তি-নিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোন ছাত্র আমরা দেখি নি। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়—কিন্তু বোধশক্তিবান যে-চিত্রবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারিদিকের পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমগ্রনীভূত ক'রে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে তা অল্পই দেখা যায়। সেই শক্তি ছিল শ্যামকান্তের। তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল,—কিছুই তার কাছে বিদেশী ছিল না। সে আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। আমরা তাকে সকলেই ভাল বেসেছিলুম।

তার সময়কার এমন কোনো ছাত্র আমাদের ওখানে ছিল না বাংলা ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল স্বাভাবিক। এই দুই পথ দিয়াই তার মন আমাদের আশ্রমের আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই বিস্তারিত করতে পেরেছিল। দূর গৃহ থেকে এসেছিল শ্যামকান্ত, কিন্তু আপন হৃদয় মনের শক্তিতে সে আমাদের একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল, এবং এখনো নিকটেই আছে। ইতি ১০ই জুন ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Uttarayan
Santiniketan. Bengal.
[Thurs. 26 Apr. 1934]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

থীসিস সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই। সেই কারণে নাম সই করে দেওয়া গেল।

এবার চলেছি সিংহল অভিমুখে সে সংবাদ বোধ করি খবরের কাগজে পেয়ে থাকবেন। জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হয়ে যাব তার পরে সেখানেও তীরে বসে সমুদ্রের হাওয়া খাবার সুযোগ ঘটবে। এই হাওয়া খাওয়াটার সঙ্গে* স্থূলতর অন্নের সংযোগ সাধন করতে হবে। সেই কথাটা চিন্তা করলে মন ক্লিষ্ট হয়—কিন্তু ভিক্ষুকের ভাগ্য কিছুকাল ধরে পশ্চাতে থেকে তাড়না করছে—ঝুলিটা প্রশংসাবাক্যেই বেলুনের মতো ফুলে ওঠে—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে

বলতে বলতে দীর্ঘপথ বেয়ে ফিরে আসি। দুঃখের কথা আর দীর্ঘতর করব না।

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ইতি ১৩ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা Ph.D. thesisএ আমরা দুজনে যুক্তপরীক্ষক ছিলাম।

উর্দু-কবি ও দেশহিতৈষণা

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

ফারসী কবিদের খ্যাতি এক সময় দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেখ সাদী, হাফেজ, ওমর খৈয়াম এবং আরও অনেকে জগতের কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু মূল্যবান অবদান দিয়ে গেছেন যা আজও আমাদের নিকটে সমাদৃত হয়ে থাকে।

ফারসী কবিগণ প্রধানতঃ দুটি বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করে কবিতা রচনা করতেন। তাঁদের কবিতায় প্রেম ও ভালবাসার কথাই বিশেষ রূপে ব্যক্ত হয়েছে। কেউ কবিতা রচনা করেছেন ইশ্‌ক হকীকী নিয়ে, আর কেউ করেছেন ইশ্‌ক মজাজী নিয়ে।

'ইশ্‌ক হকীকী'কে বিষয়বস্তু করে আজ যে কয়টি কবিতা রচিত হয়েছে তা অনুপম। আর 'ইশ্‌ক মজাজী' নিয়ে বহু কবি অজস্র কবিতা রচনা করেছেন, যা ক্ষণিকের জন্য প্রভাব বিস্তার করে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বাংলায় এ দুটি কথার মানে, 'প্রকৃত প্রেম' ও 'কৃত্রিম প্রেম।'

বলা বাহুল্য উর্দু ভাষার কবিগণ উভয়বিধ ধারার কাব্য-রচনাতেই তাঁদের ফারসী কবিভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিলেন।

হিন্দী ভাষার মহাকবি চন্দ্‌বরদাই অবশ্য তাঁর রচনায় বহু আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু মুসলমানগণ যখন এদেশে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন তখন থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সব ভাষার অজস্র শব্দসম্ভার হিন্দী ভাষায় প্রবেশ করে উক্ত ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করলে। ক্রমে কথ্য হিন্দী ভাষার সঙ্গে ঐসব শব্দের সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষা সৃষ্টি হল যার নাম উর্দু। শাজাহান বাদশার সময় এই ভাষার উর্দু এই নামকরণ হয়।

আরবী ভাষায় উর্দু কথাটির মানে হ'ল "লস্করের বাজার"। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হ'ত লস্করের বাজারে, যেখানে দেশ-বিদেশের লোক সমবেত হ'ত। এই হাটুরেদের ভাষারই নাম হয় উর্দু। উর্দুর আর এক নাম হ'ল 'রেখ্‌তা'। হরফের দিক দিয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও হিন্দী ও উর্দু ভাষার ব্যাকরণ-বিধি একই প্রকার।

উর্দু ভাষায় ফারসী কবির কবিতা 'ইশ্‌ক হকীকী' ধারা অনুযায়ী রচিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। কবি আজাদ উর্দু কবিতায় আধুনিকতা ও বিশুদ্ধ রুচির প্রবর্ত্তন করেন।

গালিবকে উর্দু ভাষার কবি-সম্রাট বলা হয়ে থাকে। তাঁর সময় থেকেই উর্দু সাহিত্যেও দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা-রচনার নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। গালিবের সমসাময়িক কবিদের কবিতা আলোচনা করলেই দেখা যায়, তখনকার প্রত্যেক উর্দু-কবিই পাঠকের মনে এই বিশ্বাসই জাগাতে চেষ্টা করেছেন যে, দেশসেবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মানুষের আর কিছু নেই। তাঁরা ফারসী ও আরবী সাহিত্য থেকে রচনার উপকরণ আহরণ না করে ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ এবং ইসলামের অতীত গৌরব-কাহিনী থেকে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। আরব ও পারস্য দেশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা-গুলো আধুনিক নয়। জাতীয় উন্নয়ন, সংস্কৃতির আদর্শ এ সকল কথাই আধুনিক কবিরা তাঁদের রচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করছেন। তাঁদের কবিতায় মার্জ্জিত রুচি এবং উন্নত রসবোধের পরিচয় পাই আর দিন দিনই তা অধিকতর সমাদৃত হচ্ছে।

কবি হাফিজ বলছেন

জিন্দ্‌গী, জিন্দাদিলী কা নাম হাঁয়
মুর্দা দিল খাক্‌ জিয়া করতে হাঁয়।

কি ওজস্বিনী ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ বাণী!

এর অনুবাদ অন্য ভাষাতে করতে গেলে মূলের রসটুকু বজায় রক্ষা করা কঠিন।..."বাঁচতে হলে মানুষের মত বাঁচতে হবে, অদম্য সাহস ও বীরপনায় তা যেন পরিপূর্ণ থাকে। ভীরু, নপুংসকের দল বৃথাই জীবন ধারণ করে।"

আর একজন উর্দু-কবি সৌদা। তাঁর কবিতায় মিস্টিসিজম ও করুণ রসের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়।

তিনি বলছেন

* ● সমুন্দর-কর দিয়া নাম উস্‌কা নাহক সবনে কহ্‌ কহ্‌ কর
হুয়ে যে জমা হুম আঁশু মেরী আখোঁ সে বহ্‌ বহ্‌ কর।

সমুদ্রে যে অপার জলরাশি, সে ত আমারি চোখের জল; বৃথাই লোকে তাকে সমুদ্র বলে।

কবি মোমিনের কবিতায় তত্ত্বদর্শনের প্রাধান্য দেখা যায়। তিনি বলছেন

তুম মেরে পাশ হোতে হো গোয়া,
জব কোই দুস্‌রা নহী হোতা।

আমাকে যখন সবাই ছেড়ে যায়, তখন তুমিই আমার একমাত্র সাথী—চিরসাথী।

কবি মীরতকী বলছেন—

তারে তো যে নহী, মেরী আহোঁ যে রাত কী;
সুরাখ্‌ পড় গয়ে হাঁয়, তমাম্‌ আসমান মেঁ।

আকাশে তো তারা নেই; আমার দীর্ঘনিশ্বাসে ও হা-হুতাশে রাত্রির কালো আবরণে কতকগুলি ছিদ্র হয়ে গিয়েছে।

কবি নসীর বলছেন—

জিসে তু শীর্গ সমঝে হো, ওহ হাঁয় খার্‌;
লগে হাঁয় পাঁও মে, নিকলে হাঁয় সর্‌ মে।

যাকে তুমি মাথার শিং মনে করে আনন্দ পাচ্ছ, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছ তা তো শিং নয়—সে যে পায়ের বেড়ী—সুদৃঢ় শৃঙ্খল মাত্র।

কবি মোমিনের আর একটা কবিতার দুটি চরণ—

উম্র সারী তো কটী, ইশ্‌ক বুতা মেঁ 'মোমিন';
আখিরী ওক্ত মেঁ ক্যা, খাক্‌ মুসল্মা হোঁগে।

সমস্ত জীবনটাই তো ভোগ-বিলাসে কাটালে এখন শেষ সময় কি শুধু চিতাভস্মেই পরিণত হবে?

কবি জৌকের কবিতাও অতি উচুঁদরের। তাঁর একটি কবিতা,

খুলতা নহী দিল বন্দ্‌ হী রহতা হায় হমেশা;
ক্যা জানে কি আ জাতা হায়, তু ইস্‌মে কিধর সে।

শৃঙ্খলিত, অবরুদ্ধ মন তোমাকে (মুক্তিকে) খোঁজে কিন্তু পায় না; কিন্তু এই অবস্থায়ও তোমার দর্শন অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে থাকি।

গালিবের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গী নিজস্ব। অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জনাময়, রসমাধুর্য্যপূর্ণ তাঁর কবিতা-গুলি প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

দিল কে ক ফোলে জল্‌ উঠে, সীনা কে দাগ্‌ সে;
ইস্‌ ঘর কো আগ লগ্‌ গই; ঘর কে চিরাগ্‌ সে।

অন্তরে অন্তর বেদনা জলন্ত অগ্নিশিখায় তার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে; গৃহের দীপ-শিখা সমস্ত গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

গালিব প্রমুখ কবিদের পূর্ব্বে এ ধরণের কবিতা উর্দু ভাষায় রচিত হ'ত না। তখন বর্ণনার বিষয় ছিল নিতান্ত মামুলি ধরণের—যেমন, সুন্দরীর কেশের বাহার, নর্ত্তকীর সজ্জা, ভোমরা ও ফুল এই সমস্ত অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে 'লজ্জাদার' কাহিনী-মূলক কবিতা রচিত হ'ত, কিন্তু কবি আজাদ তার মোড় ফিরিয়ে দেন ও তাকে আধুনিক রুচি ও রসবোধ পরিতৃপ্তির উপযোগী করে তোলেন।

আমরা বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর উর্দু কবিদের রচনা পড়তে পাই না, যা পাই তা অতি পুরাতন ও ওঁচা—বটতলার বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গেই বরং তার মিল আছে। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশে উর্দুর প্রচার অতি অল্প ও মুষ্টিমেয় লোকের

মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কবি ইক্‌বালের 'হিন্দুস্তান হমারা' নামক উঁচুদরের গানটির রসোপভোগের সৌভাগ্য হতেও অধিকাংশ বাঙালী পাঠক বঞ্চিত। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

সারে জহান্ সে অচ্ছা হিন্দুস্তান হমারা;
হম্ বুলবুলে হাঁয় ইস্‌কে; এই গুলিস্তান্ হমারা।
গুরবৎ মেঁ হম্ অগর হাঁয় রহতা হয় দিল বতন মে;
সমঝো ওহী হমে ভী দিল হো জহাঁ হমারা।
পরবত্ জো সবসে উঁচা হম্‌সায়া আশমান কা;
ওহ সন্তরী হমারা ওহ পাশওয়ান হমারা।
গোদী মেঁ খেলতী হঁয় জিস্‌কী হজারোঁ নদিয়াঁ;
গুলসন হয় জিসকে দম্‌সে রশ্‌কে জিনাহ হমারা।
এ আবরুদ্‌ গঙ্গা; ওহ দিন হয় যাদ তুনকো;
উত্‌রা তেরে কিনারে, জব কারাওঁয়া হমারা।
মজহব নহী শিখাতা, আপস মে বৈর করনা;
হিন্দী হাঁয় হম্ ওতন হয় হিন্দুস্তান হমারা।
য়ুনান মিস্র রোমা সব মিটগয়ে জ হাঁন্‌সে;
অব তক মগর হয় বাকী নামো নিশান্ হমারা।
কুছ বাত্ হয় কী হস্তী মিট্‌তী নহী হমারী;
সদিয়োঁ রহা হয় দুশ্‌মন দৌড়ে জমা হমারী।
ইক্‌বাল কোই মহরম অপনা নহী জহান্ মেঁ;
মালুম ক্যা কিসী কো দরদে জীন্দা হমারা।

শুধু এই একটি মাত্র গান রচনা করে গেলেও ইক্‌বাল অমর হয়ে থাকতেন। অত্যন্ত সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় গানটি লিখিত। কবি কি দরদ দিয়েই না লিখেছেন—"মজহব্ নহী শিখাতা আপস্ মে বৈর্ করনা; হিন্দী হাঁয় হম ওতন (বতন) হয় হিন্দুস্তান হমারা"।—ভাই ভাই ও পাড়া-পড়শীর বিরোধ কবিকে কতই না মর্ম্মবেদনা দিয়েছে। তাই তিনি বলছেন, "ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করা আমাদের সাজে না। আমরা হিন্দুস্থানের অধিবাসী—হিন্দুস্থানই আমাদের 'ওতন'—(বতন= আবাস) আমাদের জন্মভূমি। এই গানটিতে কবির অতুলনীয় দেশভক্তি ও হিন্দু-মুসলমানের গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষার কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনায়াস অভিব্যক্তি।

কবি হালী ও কবি আকবরের এক ধরণের প্রসিদ্ধ কবিতা আছে যাকে বলা হয় 'অস্‌আর'।

হালীর উক্তি—

জহান্ মেঁ 'হালী' কিসীপর অপনে সিবাস ভরোসা
না কিজিয়ে গা,
এহ ভেদ হয় অপনী জিন্দ্‌গী কা বস্ ইস্ কা চর্চা
না কিজিয়ে গা।

—এর মর্ম্মার্থ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল চলরে"।

আবার হালী বলছেন—

হোগী ন কদ্র জান্‌কী কুরবান্ কিয়ে বগের।

আত্মবলি ও সর্ব্বস্বত্যাগ ব্যতিরেকে জনগণের নিকটে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না।

আমাদের বিলাসিতা, অপব্যয়-প্রবণতা ও পরানুকরণ-স্পৃহা কবি আকবরকে অপরিসীম বেদনা দিয়েছে। তাই দেশবাসীকে অবহিত হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন—

কোই মরে তো পুছোঁ কি ক্যা লে গয়া ওহ সাথ;
বিলকুল কবুল বহল হয়, ওহ ছোড় ক্যা গয়া।

যে মরে গেছে সে কি নিয়ে গেল তা কেউ জিজ্ঞেস করে না—কারণ তা করা বৃথা; কি দিয়ে গেল আমাদের, তাই জিজ্ঞেস করে।

আবার বলছেন—

ইশক নাজুক মিজাজ হয় বেহদ্;
অক্ল কা বোঝা উঠা নহী সক্‌তা।

বিলাসী ও দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরা গভীর ও জটিল সমস্যা সমাধানের ভার বইতে পারে না।

'কাঠ-মোল্লা'দেরও তিনি ছাড়েন নি। তাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

মৌলবী গো কি হাঁয় সামসুল উলেমা ফির ভী হাঁয় সুস্ত;
রেগঁতে ফিরতে হঁা, গরবানয়ে ঐ জার কী তরহ্।

মস্ত বড় বিদ্বান সামসুল-উলেমা খ্যাতিপ্রাপ্ত মৌলবীদের আজ এ কি সকরুণ দশা দেখছি—তেজ বীর্য্য সব লুপ্ত হয়ে গেছে। শবের ন্যায়, মৃতের ন্যায় এরা অক্ষম অকর্ম্মণ্য। এদের সঙ্গে মোলাকাৎ হয় যেখানে-সেখানে।

বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকেও কবি ধিকার দিচ্ছেন—

কাফী হয় আকীরোঁ কো কবানীন্ গবরমেণ্ট;
মজহব কী জরুরত তো গরীবোঁ কে লিয়ে হয়।

বড়দের জন্তেই সুখ-সুবিধা দিতে গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত, কিন্তু গরীবদের প্রতি তার কর্ত্তব্য শুধু আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ জাতীয় কবিতা শুধু কল্পনা-বিলাস নয়; দেশের দুর্দ্দশা, দুর্গত জনসাধারণের কঠোর দারিদ্র্য কবির অন্তরে গভীর বিষাদের সঞ্চার করেছে, এই উক্তিগুলি সরল ভাষায় তাঁর অন্তরের আকুল আকূতি।

আজাদের পরবর্ত্তী কবিদের কবিতা পড়বামাত্রই তাঁদের অপূর্ব্ব স্বদেশহিতৈষণার তেজোগর্ভ বাণী পাঠকচিত্তকে দেশাত্ম-বোধে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

বাণীমাধুর্য্যে ও আখ্যানবস্তুর মহনীয়তায় উর্দ্দু শায়রীর ক্রমবিকাশ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সমন্বয় তাতে হয়েছে।

ব্রিটিশের দেওয়া শাসন-সংস্কারের প্রসঙ্গে আকবর ব্যঙ্গ করে বললেন—

মেহের বাণী সে বুঝে গোদাম কী কুঁজী তো দী;
লেকিন অব গেঁহু নহী, বাঁকী ফকৃত ঘুন ক্যা করে।

অনুগ্রহ করে গুদামের চাবি তো আমায় দিলে; কিন্তু গুদামে গম নেই—তা শুধু ঘুণে ভরা—এ নিয়ে আমি কি করব।

এমনিধারা উর্দ্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে তাঁদের অনেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়গান করেছেন এবং ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে বন্দনা করেছেন।*

*এই প্রবন্ধ লিখতে আমি সদ্ গর্ভ শ্রীরামশরণ সাহেবের হিন্দী ভাষার ইতিহাস, রামনরেশ ত্রিপাঠীর প্রবন্ধাবলী ও মিশ্র বন্ধু বিনোদ গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি।

ের প্রশংসায়
করব, মুনাফা
তার মজ্জায়।



সফল অভিযান

পরিমল গোস্বামী

অন্ধকার রাত্রি।

কলকাতা শহরে এ রকম অন্ধকার কখনও কেউ ভাবতে পারে নি।

আলোক নিয়ন্ত্রণের অন্ধকার নয়, ব্ল্যাক আউটের নিরেট অন্ধকার।

কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটি বাড়ি। অন্যান্য বাড়ির মতো এ বাড়িটিও কালো আবরণে আত্মগোপন করে আছে। খুব কাছে গিয়ে দেখলে তবে বোঝা যায় এটি একটি দোকান, দশ-বারোটি তালা বুকে নিয়ে রহস্যময়ী রাত্রির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে। কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই, যেন বিভীষিকাময় কঠিন কালো নিস্তব্ধ সমুদ্রে ভাসমান একখানি ভৌতিক জাহাজ।

একটু দূরে গলির মোড়ে অন্ধকার আরও নিবিড়।

চারদিক থম থম করছে। আশেপাশের বাড়িতে কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন নেই, কিছুক্ষণ আগেও ছিল, কিন্তু রাত্রি এখন একটা। অনেক দিন সাইরেন বাজে নি, কিন্তু কখন বাজবে কে জানে? এক বছর আগের অভিজ্ঞতা আছে সবার। সাইরেন বাজলে ঘুম ভেঙে যায়—হানাদারী বিমান চলে গেলেও আর ঘুম আসতে চায় না, তাই সবাই আজকাল যত আগে পারে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু গলির মোড়ে এক জোড়া চোখ তখনও জাগ্রত।

চোখের মালিক একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তার চোখে ঘুম নেই। তার দেহ মনে ক্লান্তি নেই। তার হাতের কঠিন পেশী কখনও ফুলে উঠছে, কখনও শিথিল হচ্ছে।

ঠুং ঠাং শব্দ করে বড় রাস্তা দিয়ে একখানা রিকশ চলে গেল। মধুর শব্দ। সমস্ত শহরের বুকে যেন ঐ একটুখানি প্রাণপ্রবাহ। ও যেন শেলীর স্কাইলার্ক, আর ওর শব্দ অনন্ত শূন্যে অশরীরী একটি পাখীর গান।

কিন্তু সে ধ্বনি গলিতে অপেক্ষমান যুবকের কানে পৌঁছল না। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এসে জড়ো হয়েছে তার দৃষ্টিতে। হয়তো তো মুহূর্তের ভুলে তার এত সাধনা ব্যর্থ হবে।···কিন্তু সে কি তখন গাইবে—ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল, চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে? না সে প্রেমিক নয়। তার মনে কবিত্ব নেই। সে সকল রম্য ভাবের বাইরে। এখানে যেটুকু রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে সে শুধু প্রহরার রোমান্স।

খট্ ক'রে শব্দ হ'ল না বাড়িটির আশের দরজায়? যুবকের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, তার সমস্ত পেশী লোহার মত শক্ত হ'ল।

সে দেখতে পাচ্ছে দরজাটা একটুখানি খুলেছে। ও কি টর্চের আলো? তবে এত নিষ্প্রভ কেন? টর্চের মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে আলোর জোর কমান হয়েছে। তাছাড়া টর্চের লেন্সটিও নীচের দিকে ফেরানো। যুবক দেখতে পাচ্ছে দু-তিন জন লোক বগলদাবা ক'রে এক একটা বাণ্ডিল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে।

আর দেরি নয়—জাগরণ তার সফল।

যুবক হিংস্র বাঘের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি লোকের ঘাড়ে। বাকী লোকগুলো দুপদাপ শব্দে ছুটে পালিয়ে গেল।



ধৃত ব্যক্তির মুখে কোনো কথা নেই। সাহায্য প্রার্থনা ক'রে চীৎকার নেই। তার সমস্ত গা কাঁপছে যুবকের কঠিন স্পর্শে।

এই যুবক আর কেউ নয়, ভবানীচরণ। সে এ পাড়ার তরুণদের নেতা।

"কেন আপনি গোপনে মাল চালান করছেন এ ভাবে?" ভবানী ধৃত ব্যক্তিকে এক ঝাঁকানি দিয়ে প্রশ্ন করল।

কে এই ধৃত ব্যক্তি?

ইনিও সুপরিচিত। নাম শশধর দাস। বিখ্যাত স্বদেশী কাপড়ের ব্যবসায়ী। সে ভবানীর নিষেধ সত্ত্বেও এই পাপের

মধ্যেই ভাসী। শশধর ভবানীকে কথা দিয়েছিল করবে না, উঁচুদরের গান ায়ের সঙ্গে তার নাকি সম্পর্ক নেই।

বাঙালী পাঠক েবারে অশিক্ষিত নয়, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু চাকরির মোহ তার ছিল না। এককালে আদর্শবাদী ছিল, এবং সেইজন্যেই গোলামি না ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ে ঢুকেছে। সে আজ দশ বছরের কথা। স্বদেশী কাপড় ছাড়া আর কিছু সে বিক্রি করে না। বিলিতি কাপড় সে আজ পর্যন্ত ছোঁয় নি। সে স্বদেশী কাপড়ের এই সীমাবদ্ধ পণ্য নিয়েই শুধু প্রতিভাবলে অনেক উন্নতি করেছে। সে এমন চমৎকার কথা বলতে পারে, বড় বড় আদর্শের সব কথা, যাতে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় —এবং তাকে শ্রদ্ধা করে। অথচ আজ তার মুখ নীচু হ'ল ভবানীর কাছে। অন্তত ভবানী তাই মনে করল।

ভবানী কিছুদিন ধরে শুনছে শশধর চোরা কারবারে নেমেছে। সবাই বলছে এ কথা। তার চালচলনে যে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে সেটা লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। আগের মত খদ্দেরের সঙ্গে সে প্রাণখুলে আলাপ করে না। আগে তার ব্যবহার অমায়িক ছিল, এখন হয়েছে কৃত্রিম, কর্কশ, এবং প্রায় অভদ্র।

তার অধঃপতনের কথাটা সবার কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে হঠাৎ। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে সবাই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে—বিশেষ ক'রে কোনো সৎ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো অসৎ কথা প্রচার হ'লে লোকের মনের একটি দিক যেমন তাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, আর একটা দিক তেমনি কথাটাকে বড়ই পছন্দ ক'রে বসে। গুজবে কি কোন সত্য নেই?

তা ছাড়া ঠিক সেই সময়েই গবর্নমেণ্ট থেকে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন প্রচার হতে লাগল, গুজবে বিশ্বাস ক'রো না এবং তাতে শশধরের ক্রেতাদের মনে গুজব বিশ্বাসের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। লোকে যে শুধু বিশ্বাস করল তাই নয়, অনেকে প্রত্যক্ষদর্শী সাজল, এবং বলতে লাগল চোরাবাজারে মাল বিক্রি করতে তারা নিজে চোখে দেখেছে।

ভবানী চুপ করে রইল না। সে গোপনে গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারল কথাটা কিছু পরিমাণে সত্য। কিন্তু এর প্রতিকার কি? শশধরকে সে শ্রদ্ধা করে। চোরাবাজারকে সে ঘৃণা করে। ওকে যদি পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে সে নিজেই মনে শান্তি পাবে না, কিন্তু প্রশ্রয় দেওয়া আরও কঠিন। তাই সে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে গোপনে তাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে এল। শশধর হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা, কিন্তু ভবানী হাসে নি, ব'লেছিল সাবধানে থাকবেন। এ রকম একবার নয়— দু-তিন বার তাকে শশধরের কাছে যেতে হয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই আবার জোর গুজব রটল—শশধর গোপনে কাপড় চালান করছে। ভবানী বড় দমে গেল।

কিন্তু প্রমাণ তো কিছু নেই, অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। সে ঠিক করল নিজের চোখে দেখে তবে সে তার সন্দেহ ভঞ্জন করবে। দিনের বেলা শশধরকে অনুসরণ করার জন্যে সে নিযুক্ত করল তার এক অনুচরকে, রাত্রের জন্যে নিযুক্ত হ'ল সে নিজে।

ক'দিন পরে আজ সে শশধরকে হাতে হাতে ধরেছে।

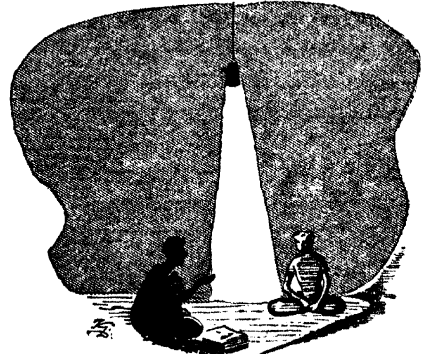
গায়ে তার ভীষণ শক্তি। শশধর তার হাতে যেন শশকের মত অসহায় হয়ে পড়ল। ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা নেই তার, প্রবৃত্তিও আছে বলে মনে হ'ল না। সে শুধু জিজ্ঞাসা করল, "তুমি···ভবানী?"

"হ্যাঁ, আমি ভবানী, কিন্তু তাতে আপনার কিছু সুবিধা হবে না।"

"সুবিধার কথা ভাবছি না, তুমি কি করতে চাও বল।"—শান্ত ভাবে শশধর বলল।

"আমি কি করতে চাই সে কথা পরে হবে। আপনি কেন গোপনে মাল চালান করছেন এ ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর চাই আগে। তার পর আপনার ব্যবসার পাট উঠিয়ে দিতে চাই চিরদিনের মতো। কারণ আপনি সমাজের শত্রু, ভালমানুষের মুখোশ পরে বেড়াচ্ছিলেন এত দিন, সেই মুখোশটা খুলে দিতে চাই।"

শশধর বলল, "তা হ'লে হাত ছাড়, পালাব না, আলোটা জ্বালি—আমাকে আগে আলোটা জ্বালতে দাও।"



ভবানী হাত ছেড়ে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইল। শশধর আলো জ্বালল। ঢাকা-দেওয়া মৃদু আলো গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ফরাসের উপর।

শশধর বলল, "দরজাটা বন্ধ ক'রে কাছে এসে বসো। তোমাকে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।"

দু-জনে পাশাপাশি বসল।

শশধর একটুখানি নীরব থেকে বলতে লাগল, "তোমার বয়স কম, ধৈর্যও কম, কিন্তু একটু ধৈর্য ধর।"

শশধরের নির্বিকার ভাব দেখে ভবানী অবাক হয়ে গেল। এই ভদ্র মুখোশধারী লোকটার কি চক্ষুলজ্জাও নেই? ভবানীর চোখে মুখে তখনও বিজয়ীর দৃঢ়তা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শশধর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবানীর দিকে চেয়ে বলল, "শুনবে আমার কথা?"

"সংক্ষেপে হয় তো শুনব। কিন্তু এর পরেও কি কিছু বলবার আছে আপনার?"

"আছে, শোন।"

শশধর বলতে লাগল, "ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—"

ভবানী বাধা দিয়ে বলল, "ছেলেবেলার কথা থাক।"

"না। অভিযানে এসেছ যখন সবই শুনতে হবে। শোন, বাঙালী ব্যবসা করতে জানে না, বাঙালীরা চাকরি করতে পেলে আর কিছু চায় না—"

ভবানী আবার বাধা দিয়ে বলল, "কে বলেছে এ কথা?"

"বলেছে তোমাদেরই দেশের লোকেরা। বলেছে—কিন্তু যাক শোন। সামান্য মূলধনে অনেক টাকা লাভ করা যে কত গৌরবের এ কথা যে আমার নয়, এ কথা স্বীকার কর? অমুক হিন্দুস্থানী দু-আনার জিনিষ কিনে রোজ দু টাকা মুনাফা করে, আর বাঙালী বি এ, এম-এ পাস ক'রে তিরিশ টাকা মাইনের গোলামি করে—এ কথা কে শুনিয়েছে এত দিন? বাঙালীই শুনিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে এই কথা শুনতে শুনতে আমার মনে ধিক্কার জন্মে যায়। তাই তো এসেছি ব্যবসার পথে।"

ভবানী এ কথায় বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, "আপনার জীবনী শুনতে আসি নি—কি বলতে চান সোজা ভাষায় বলুন।"

"বলতে চাই যে তোমাদের দেশেরই মনীষীরা ব্যবসার মোটা লাভের কথা কি সগৌরবে প্রচার করেন নি এত দিন?"

ভবানী বিরক্ত ভাবেই বলল, "হ্যাঁ, করেছেন।"

শশধর বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলল, "করেছেন! হুঁ—তা হ'লে জ্ঞান দেখছি।—"

বলতে বলতে তার মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তা ফুটে উঠল। সে যেন অধৈর্যে ছটফট করতে লাগল আরও কিছু বলবার জন্যে। কটমট ক'রে ভবানীর দিকে চাইতে লাগল, যেন তার মুখ থেকে আর একটি কথা উচ্চারিত হলেই সে ফেটে পড়বে। কিন্তু ভবানী কোনো কথাই বলল না। সেও অপেক্ষা করে রইল শশধর কি বলতে চায় শোনবার জন্যে।

শশধর আর ধৈর্য রাখতে পারল না। সে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল, "চারদিকে বাঙালী পেয়েছে কেবল বিদ্রূপ আর ধিক্কার। কেন? না, বাইরের লোকেরা এসে টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে বাংলা দেশ থেকে। বাঙালী তরুণেরা কেবল শুনেছে, বাঙালী নির্বোধ। শুনে শুনে মন বিদ্রোহ করেছে। সে সব কথা মনে কেটে কেটে বসেছে। আজও তার দাগ মেলায় নি। আজও সেই সব শুভার্থীদের ধারালো কথার ধ্বনি কানে বাজে মাঝে মাঝে। কিন্তু শোন ভবানী, তোমরা তরুণের দল, তোমাদের আমি ভালবাসি। আমিও এককালে তরুণ ছিলাম—তোমাদেরই মতো দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ব্যবসার পথে এসেছি। কিন্তু ব্যবসা মানেই তো লাভ করা—আর লাভ করার মধ্যেই তো আছে অসাধুতা। কখনও তো ভাবি নি যে ব্যবসা করব অথচ লাভ করব না। ভাবি নি তো যে লাভ করব—অথচ সাধু থাকব। যত লাভ তত বাহবা! যত বেশি লাভ, তত বেশি খাতির! পাই নি খাতির এতদিন আমার দ্রুত সাফল্যে? পেয়েছি। তোমরাই খাতির করেছ। এখন জ্বলে চলবে কেন? তুমি ভবানী আজ চোরাবাজার দমনের অভিযান চালাচ্ছ, তুমিও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের গুণগান করেছ। আমারই কাছে বসে কত ফোর্ড—কত রকফেলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছ। তা আমার মনে আছে। ব্যবসা করব, মুনাফা করব, এই হ'ল ব্যবসায়ীর ধর্ম। এ ধর্ম তার রক্তে, তার মজ্জায়। আজ হঠাৎ আইনের বলে সে পথ যদি বন্ধ হয় তবে আইনটাকেই বড় ক'রে দেখা তোমার মতো শিক্ষিত লোকের পক্ষে কি সত্যই বাড়াবাড়ি নয়?"

"ভবানী স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল শশধরের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা। তার এই প্রশ্নে সে যেন চমকে উঠল। সে সংক্ষেপে বলল, "লোকে যে কাপড়ের অভাবে আজ মারা যাচ্ছে, এ অবস্থায়—"

শশধর বজ্রকণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে উঠল, "লোকের মারা যাবার দুঃখ কবে থেকে অনুভব করতে সুরু করেছ? যুদ্ধ তো সে দিন বেধেছে—তার আগে চিরদিনই এ দেশের লোক ভাত কাপড়ের অভাবে মারা গেছে। কোন্ ব্যবসায়ী তাদের দুঃখে গ'লে কাপড় আর চাল বিতরণ করেছে দেশের কোটি কোটি লোককে? কোনো অবস্থাতেই, ব্যবসায়ী তার ধর্ম ছেড়েছে? লজ্জা করে না বলতে? আজ হঠাৎ তোমাদের এই নীতিজ্ঞান দেখে আমি বিচলিত হচ্ছি। বহু কালের অসুখ। কিন্তু অসুখের মূলে না গিয়ে এসেছ তার সহস্র লক্ষণের একটিকে আইনের ওষুধে সারাতে। বলছি, পারবে না। কিছুই পারবে না। শুধু নিজেকে ভোলাবে।"

শশধর উত্তেজিত ভাবে এক অদ্ভুত প্রেরণার বলে আধ ঘণ্টা ধরে ভবানীর সম্মুখে তার সমস্ত কথা বলে ফেলল। ব'লে হাঁফাতে লাগল। ভবানীর সমস্ত সাধু সঙ্কল্প সেই স্রোতে ভেসে গেল। সে কোনো কথাটি না ব'লে নীরবে সেখান থেকে মোহাবিষ্টের মতো উঠে গেল।



সমস্ত রাত তার ঘুম হ'ল না।

পরদিন সকালে উঠেই সে শশধরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বিকেলে আবার দেখা হ'ল তাদের।

এই ভাবে মাসখানেকের মধ্যে দু-জনে ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হয়ে উঠল।

এর পর আরও কয়েক মাস কেটে গেছে। ভবানী এম-এ পাস ক'রে বেকার ছিল, এখন তার আয় মাসে দু শ' থেকে পাঁচ শ টাকা।

শশধরের কাপড়ের গাঁট সে একাই রাত্রে চালান করে। তার দৈহিক শক্তি এত দিনে সার্থক হ'ল এইটে বুঝতে পেরে সে খুশি আছে।

খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি

শ্রীগণেশচন্দ্র কর্মকার, এম্-এস্‌সি

বিভিন্ন উপকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এখন আমাদের জানা দরকার যে দৈনিক আমরা যে খাদ্য খাইতেছি তাহা আমাদের শরীর ধারণের পক্ষে যথেষ্ট কি না আর যদি যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে কোন্ কোন্ উপকরণের অভাব আছে। ইহা জানিতে পারিলে আমরা সেই অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিব এবং সম্ভব হইলে সেই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টাও করিতে পারিব। এই বিষয় ঠিক করিবার পূর্ব্বে আমাদের জানিতে হইবে যে আমরা যে সমস্ত খাদ্য খাইতেছি তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন উপকরণগুলি কত পরিমাণ আছে এবং তাহার পর হিসাব করিয়া বলিতে পারিব যে আমাদের খাদ্য সুষম কি না। সেই কারণে খাদ্যের বিশ্লেষণ-তালিকা দেওয়া গেল। (৬নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

আমরা বাজারে যে ভাইটামিন ঔষধ কিনিয়া থাকি তাহার পরিমাণ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিটে থাকে। সুতরাং পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ও মিলিগ্রামের সঙ্গে বিভিন্ন ভাইটামিনের কি সম্বন্ধ তাহা বলিয়া দেওয়া ভাল।

ভাইটামিন 'এ'	—১ মিলিগ্রাম		=৩২০০	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট
ভাইটামিন 'বি'	১	,,	=৩৩৩	,,
ভাইটামিন 'সি'	১	,,	=২০	,,
ভাইটামিন 'ডি'	১	,,	=৪০,০০০	,,

এখন এক জন সাধারণ মধ্যবিত্ত বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। সে দৈনিক যে পরিমাণ খাদ্য খায় তাহার তালিকাও দেওয়া হইল। (৭ ও ৮নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

প্রদত্ত তালিকায় ক্যালরীর পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য কতকগুলি খাদ্যোপকরণের পরিমাণ কিছু বেশী বলিয়া মনে হইবে। ইহার কারণ মাত্র কয়েকটি খাদ্য ঐ তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। একই দ্রব্য আমরা প্রতিদিন খাইয়া থাকিতে পারি না। প্রতিদিনের খাদ্যে কিছু না কিছু বৈচিত্র্য থাকিয়াই যায়। মাছ যেদিন কম খাই সে দিন হয়ত ডিম, মাংস, ডালার তরকারি বা এইরূপ কোন প্রোটিন-প্রধান খাদ্য খাওয়ায় আমাদের মাছের পরিমাণ কম থাকা সত্ত্বেও প্রোটিনের অভাব ঘটে না। সুতরাং তালিকাভুক্ত পরিমাণগুলি আনু-মানিক; খাদ্য নির্ব্বাচনের সময় শুধু উপকরণগুলির মোটামুটি ওজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে।

আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যত বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য হইতে সংগ্রহ করা যায় ততই ভাল। কারণ এমন কোন খাদ্যোপকরণ থাকিতে পারে যাহা এখনও হয়ত আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আমরা নানা প্রকার খাদ্য খাই বলিয়া তাহার কোন অভাব উপলব্ধি করিতে পারি না। উপরন্তু ইহাদের অভাবজনিত লক্ষণ হয়ত অনেকদিন পরে প্রকাশ পায় —হয়ত শত শত বৎসর পরে। সুতরাং যাহারা বেশী কৃত্রিম খাদ্য আহার করে তাহাদেরই ভয়ের কারণ বেশী।

উপসংহার

বৈজ্ঞানিক পরিপুষ্টি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান জন্মাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে রোগ সাধারণতঃ বীজাণু হইতেই হয়। কিন্তু উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে প্রমাণিত হইল যে বীজাণু ভিন্ন অন্য কারণেও আমরা অনেক প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে পারি। সময়ে সময়ে পুষ্টির অভাব-জনিত রোগ আমাদের দেহকে এইরূপ দুর্ব্বল করিয়া দেয় যে তখন ইহা সহজেই বিভিন্ন প্রকারের বীজাণুর আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়। তখন বীজাণু-ঘটিত যে সমস্ত রোগ হয় তাহারই চিকিৎসা চলিতে থাকে। সুতরাং ডাক্তারগণও রোগের সঠিক কারণ সকল সময়ে নির্ণয় করিতে পারেন না এবং আমরাও চিকিৎসায় সুফল পাই না। পুষ্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প বলিয়া রোগের প্রকৃত কারণ অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকে।

পুষ্টির অভাবজনিত রোগ অনেক কারণে হইতে পারে। প্রথম হইতেছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শারীরিক বিকলতা; ইহা জন্মাইবার পূর্ব্ব হইতেই শরীরে আশ্রয় পায়, ও জন্মাইবার পর উপযুক্ত খাদ্যাদির সুব্যবস্থা সত্ত্বেও চিকিৎসাদ্বারা সারাইতে যথেষ্ট বেগ দিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই চিকিৎসার বাহিরে থাকিয়া যায়। পুষ্টির অভাবজনিত রোগের দ্বিতীয় কারণ হইতেছে শরীরের কোন বিশেষ অবস্থা। বাল্যকাল এবং গর্ভাবস্থায় ভাইটামিন, আমিষ জাতীয় প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন খুব বেশী। খাদ্যে

ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে অনুপম ভাবিল—সত্যই কি রেখা দেবী আমার লেখা পড়িয়াছেন, না সাহিত্যে সর্ব্বজ্ঞতা বজায় রাখিবার জন্য আমায় আপ্যায়িত করিলেন? সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক—মনের মধ্যে যে আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ হইতেছে—সেটি অকৃত্রিম। প্রশংসার অর্থ প্রশংসাই—তা যে রূপেই সে আসুক।

সুনীল বলিল, গুডবাই, বাসে আর যাব না

একটা ভিখারী আসিয়া হাত পাতিল। সুনীল তাহার প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিল না। আজকাল 'মাপ কর' বলিলে গেঁয়ো ভিখারীগুলা শহুরে বিনয়ের মর্য্যাদা রাখে না। নির্ব্বাক প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া কোন ছায়াছবির—কোন নাচের—কোন মেয়ের ভাবনায় তন্ময়চিত্ত হইলে (অন্ততঃ ঐরূপ ভান করিলেও) ওদের কোলাহল কানে পৌঁছায় না। ওরাও ক্লান্ত হইয়া—অন্যত্র চলিয়া যায়। ট্রামে উঠিয়া সুনীল চলিয়া গেল।

অনুপম আর ট্রামে উঠিল না—হাঁটিয়াই চলিল। সুমিত্রাদের বাড়ি কতটুকুই বা! আর হাঁটিতে বেশ লাগিতেছে। ঈষৎ শীতল প্রকৃতির হৃদ্যতা—প্রশংসা-উত্তপ্ত মস্তিষ্কের তাপ জুড়াইয়া দিতেছে। না—একটু জোরে না হাঁটিলে—যথাসময়ে সাহিত্য-সভায় যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। সুমিত্রা নিশ্চয় রাগ করিয়া আছে। সুমিত্রার রাগের মূল্যও অস্বীকার করা চলে না। দক্ষিণ কলিকাতার অভিজাত সমাজের প্রবেশপত্র ও। অনুপম ছিল বাগানের কোন কোণে—কোন এক গাছের ফোটা ফুল—যার গন্ধ উত্তরমুখী বায়ুকণায় ছিল পরিব্যাপ্ত। সেই বায়ু-প্রবাহকে দক্ষিণমুখী করিয়াছে সুমিত্রা এবং ফোটা ফুলটিকে বাগান হইতে তুলিয়া বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইয়াছে।

কিন্তু গীতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া মনে হইতেছে—বায়ুর দাক্ষিণ্যটাই এ ক্ষেত্রে বড় কথা। সর্ব্ব ঋতুতে বায়ু এক মুখেই প্রবাহিত হয় না। এই সংস্কৃতি-পিপাসু সমাজকে—সুন্দর ও প্রতিভাযুক্ত জিনিষের সন্ধান রাখিতেই হয়। যুদ্ধের মরশুমে ভূগোল না-জানাটা যেমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তেমনি সংস্কৃতিবান প্রতিভাকে পরিচিতি করাইয়া নিজেকে মহনীয় করা। অনুপমকে ফুলদানিতে সাজাইয়া আসলে গোত্র-গরিষ্ঠে সুমিত্রার বৈঠকখানাই উজ্জ্বল হইয়াছে

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথে আ[illegible]ই—ভাগ্যে আকাশে চাঁদ আছেন। নগরীর নটীরূপের [illegible]াস হিম-ছাঁকা মরা জ্যোৎস্নায়ও কিছু কিছু মিলিতেছে[illegible] পথ চলিতে গেলে অনিবার্য্য সংঘাত-আশঙ্কায় দেহ হিসা[illegible]ঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া উঠে না। ব্ল্যাক-আউটের শহর [illegible]লে জ্যোৎস্নার রূপ ধরাও ত কঠিন!

স্বতঃই তুলনা আসে সেই [illegible]—অন্ধকার ঠেলিয়া আলো যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে [illegible] ফুটিতে পায় না। তুলনা আসে—গোলকধাঁধার মত কবন্ধমূর্ত্তি বাড়িটার, নোনাধরা বোবা দেওয়াল—বহুযুগ সঞ্চিত নিরানন্দ যেখানে স্যাঁৎসেঁতে মেঝের মতই মনের উপর গুরুভারে চাপিয়া আছে। তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় না অথচ সে তুলনাকে ঠেকাইয়া রাখাও দুষ্কর। ইচ্ছা যেখানে অন্ধকারে পথহারা—আশা স্তিমিত, উদ্যম পঙ্গু—আনন্দ রুগ্ন এবং তৃপ্তি আকাশকুসুম—সেখানে মানুষ থাকে কোন্ সাহসে? নিরুপায় মানুষ নির্ব্বিবাদে আলস্যে কেন মানিয়া লয় ভীরু অদৃষ্টবাদকে! কত অনায়াসে না পোষণ করে—কোনমতে বাঁচিয়া থাকার লাভকে! কিন্তু এসব চিন্তা অনুপম করে না। চাকরির বর্ম্মে আজকাল তার দেহ সুরক্ষিত। দক্ষিণ-কলিকাতার দাক্ষিণ্য প্রকাণ্ড এক অতলস্পর্শ গহ্বরের কথা ভুলাইয়া দিয়াছে, অদৃষ্টবাদকে সে সমস্ত মন দিয়া ঘৃণা করে। তবু মাঝে মাঝে ভীরু আশঙ্কার মৃদু পদশব্দ শুনা যায়। চিন্তা মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সুমিত্রারা সহজে যে দুর্গ দখল করিয়া আছে—রূপে-প্রসাধনে-গন্ধে-গানে, মর্ম্মরধ্বনিতে ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য্য-প্রলেপে যে দুর্গের কক্ষ-অলিন্দ-চত্বর-প্রাঙ্গণ সুঅলঙ্কৃত—সেখানে বিপ্লবের বহ্নিকণা অদৃশ্য ভীতির কল্পনায় মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়। আর্য্যামির সূক্ষ্ম মসলিনের পর্দ্দার ওপিঠে অনার্য্যসুলভ মসীবর্ণ দেখা যায়। অনুপম জোর করিয়া অস্বীকার করে—সেই ভিত্তিকে! উপার্জ্জন! তাহার মত প্রতিভা কি অর্থ উপার্জ্জনের নির্জ্জীব রূঢ়তায় নিঃশেষ হইয়া যাইবে? গানের পথ ধরিয়া সাহিত্যের কমলবনে পৌঁছিবার এই যে ইঙ্গিত—এর অর্থ আজ অনুপমের কাছে—অস্পষ্ট নহে। সুধা না হউক—সুভোজ্য ত বটেই।

সহসা একটা মিশ্র কোলাহল কানে আসিল—বহু দূরের উত্তাল জনস্রোতের ক্ষীণ ঢেউ ফুটপাথের এই প্রান্তেও আছড়াইয়া পড়িল।

ওদিকে যাবেন না মশাই—ফিরুন।

কেন বলুন তো?

একটি যুবক অনুপমের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। মিটিং হচ্ছিল—কোথা থেকে একদল ছোকরা এসে চীৎকার সুরু করলে—তারপর—ইয়া ইয়া থান ইঁট। ইঁটিয়ে মিটিং ভেঙ্গে দিলে—মশাই।

কিসের মিটিং?

যুবক আর একটু আগাইয়া আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুপমের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, আজকের কাগজে দেখেন নি, গান্ধী-জিন্না আলোচনার জন্যে—

ওঃ! তা ইঁট মারলে কারা?

যারা ওসব আন্দোলন সহ্য করতে পারে না। ভুঁইফোঁড় সব পার্টির অভাব নেই তো বাংলায়।

শুধু বাংলায়! আর এক জন প্রৌঢ় মন্তব্য করিল, সারা ভারতবর্ষ এই পার্টি-বাদ নিয়ে মশগুল। এক একটি পার্টির

নৌকায় চড়ে—এক এক জন সুবিধাবাদী নেতা সংসার-নদী পার হবার উদ্যোগ করছেন। তরেও যাচ্ছেন বেশ।

আমরাও বেশ দেখছি—বসে বসে। যুবকটি মন্তব্য করিল।

আর এক জন যুবক বলিলেন, আমাদের করবার আছেই বা কি। কখন ওরা ওঠে—কখন ওরা বক্তৃতা সুরু করে—আমরা তা টের পাই কি।

প্রৌঢ় বলিলেন, পাই বই কি—ভোটের একটা টুকরো—একদিন ছুঁড়ে ফেলি—ওদের দিকে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে। একদিন গাড়ি চড়ি—পোলাও খাই—কিংবা মানের মহিমায় স্ফীত হয়ে ভোট ভিক্ষা দিয়ে অহঙ্কৃত হই। ওরা সে সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।

সবাই তো ভোট জুটিয়ে ভবনদী পার হন নি।

তাঁদের সম্বল আমাদের তথাকথিত ন্যাশন্যাল মন। তাদের সম্বল—ধর্ম্মের জিগির—জাতিত্বের ভুয়ো ভাববিলাস—সাংসারিক সুখসুবিধা-লাভের দিল্লীকা লাড্ডুর প্রলোভন। অখণ্ড ভারতের কল্পনায় ঐহিক লাভের অঙ্কটা বড্ড ছোট দেখায় যে!

অনুপম বক্তার পানে চাহিল।

আপনি কংগ্রেসের লোক বুঝি?

দোহাই আপনার—কংগ্রেস বলতেও অখণ্ড একটি জিনিসকে বোঝায় না। তারও শাখা-উপশাখা আছে। দলীয় মনোভাব—মিটিং—ইঁট মারামারি আছে। আদর্শ দিয়ে আদর্শকে চাপা দেবার অপকৌশল আছে।

তাহ'লেও কংগ্রেস একমাত্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান—

বেশি শক্তিটা ভাল নয়।

অনুপম অগ্রসর হইতেই যুবকটি কহিল, একটু সাবধানে যাবেন।

প্রৌঢ় হাসিয়া কহিলেন, ইঁটের পাল্লা অতদূর পৌঁছবে না। মুখ ফিরাইতেই চাঁদের আলোয় প্রৌঢ়ের ললাটের রক্তরেখা পরিস্ফুট হইল।

অনুপম অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনিও—ইস্ কপালে আপনার রক্ত!

হাঁ—খদ্দরের জামাটা দেখে—ওরা আসল নকল চিনতে পারে নি। হাসিয়া প্রৌঢ় আঙুল দিয়া কপালের রক্তধারা মুছিয়া লইলেন।

ইহারা চলিয়া গেলেও—অনুপম খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল সেখানে। এই রক্তরেখা নাচের ছন্দকে সেই মুহূর্তে হরণ করিয়া লইয়াছে। বৌবাজারের মাথায় বাঙালীর পাঁঠার দোকানে—শিকে দোদুল্যমান সদ্যহত পশুদেহনিঃসৃত শোণিত ধারা—ট্রাম লাইনের দুর্ঘটনাপ্রসূত শোণিতার্দ্র সেই মেয়েটি—এবং কংগ্রেস সভায় প্রহৃত এই ভদ্রলোকটির ললাটের শোণিতধারা—সব রক্তের রক্তই এক। ওর মধ্যে সংস্কৃতির চিহ্নমাত্র নাই—পশুত্বের প্রচারটাই প্রবল। প্রভেদ মাত্র কোনটা সকালের প্রথম সূর্য্যোদয়ের মহিমায়—কোনটা অপরাহ্নের বর্ণ-বিলাসে—কোনটা শুক্লাতিথির রূপালী জ্যোৎস্নায় চন্দ্র-কলঙ্ক রেখায় চিহ্নিত।

আরও একদল পথিক চলিয়া গেল। তার পর আরও এক দল।

সভাপতি ঘায়েল হয়েছে?

হঁ—অ্যাম্বুলেন্স এলো—দেখলি না।

ছেলেরা এই রকম গুণ্ডামি করে কেন?

বাইরে—পার্টি গড়তে হলে শক্তির দরকার হয় না? হিটলারের জীবনচরিত পড়িস নি?

সেই আদর্শ—আমাদেরও যে নিতে হবে—

ওরে বিবেকানন্দ বলেছেন—রজোগুণ—

বক্তা দূরে চলিয়া গেল—শেষটা শোনা গেল না। না গেলেও বুঝা গেল—রাজনৈতিকতার ধুয়া উঠিয়াছে। বাহিরের যুদ্ধই বাঙালীকে উত্তপ্ত করে নাই—এর বীজ অনেক আগে হইতেই জমিতে ফেলা ছিল। সারহীন জমি এবং বীজ রুগ্ন—তথাপি তাজা ফসলের স্বপ্ন দেখার বিরতি নাই।

অনুপম চলিতে লাগিল। লেখার মধ্যে পলিটিক্সের ঝাল মিশাইব কি? শুধু মিষ্টত্বে পাঠকের মুখ মারিয়া গিয়াছে—স্বাদ বদলানো দরকার। কিন্তু রাজনীতি আমাদের ধাতে সইবে তো? যাহাদের রাজ্য নাই তাহাদের নীতিটা কি? তাহাদের কাছে ফ্যাসিবাদের আর মার্কসবাদের ভালো-মন্দের সূক্ষ্ম প্রভেদটা সহজে চোখে পড়িলেও কর্ণগ্রাহ্য তো? উপরের সতর্ক দৃষ্টি—কখনো ভ্রূকুটীতে—কখনো প্রসন্নতায়—পর প্রত্যাশায় পাল্লাকে একবার টানিতেছে—একবার বা ঝুঁকাইয়া দিতেছে। সেই দৃষ্টির ছায়ায় আমাদের সমস্ত স্লোগান—নীতি আদর্শ—বার বার বিপর্যস্ত হইতেছে—এ সত্যটা আর অস্পষ্ট নহে, বরং নগ্নরূপে প্রতিষ্ঠিত। তবু কিসের মাতনে এই চীৎকার—রক্তপাত? পথ চলিতে চলিতে নিজেকে বারংবার প্রশ্ন করিল—অনুপম।

একি—আপনি কোথা থেকে?

সু'মজ্ঞাদের বাড়িতে ঢুকিবার মুখে কে প্রশ্ন করিলেন। অনুপম মুখ ফিরাইয়া দেখে—ফুটপাথের ধারে একখানি চক্‌চকে মোটর দাঁড়াইয়া আছে? প্রশ্নটা মোটরের গর্ভ হইতেই আসিল।

কে? ও আপনি—

অনুপম অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়া মাথা নামাইল। তাঁহাদের অফিসার বাবু সাহেব সস্ত্রীক মোটরে বসিয়া আছেন। চাঁদের আলোয় ভিতরটা ভাল করিয়া দেখা যায় না—মোটরের পালিশ-পিছল সুপ্রসাধিত দেহটা শুধু সম্পদের ইঙ্গিত দিয়া মনকে শ্রদ্ধাযুক্ত করে। তা ছাড়া আপিস-প্রভু বলিয়া সম্ভ্রমটা উগ্রভাবেই অনুপম প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। মাথা নীচু করাটা অশোভন নহে—যুক্তকর ললাটে ঠেকানোও হয়ত মানায়—কিন্তু ভিতরের দীনতা মাখানো সঙ্কোচ নিজের সম্ভ্রমকে ক্ষুন্ন করিতেছে।

বাবু সাহেব হাসিয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন,...একটা পার্টি আছে—সেখান থেকে যাব সিনেমায়। হাঁ ভাল কথা—আপনারা চলে যাবার পর হেড আপিস থেকে একটা টেলিগ্রাম এলো—বড় সাহেব আসচেন। আপনার সঙ্গে যাচ্ছি দেখা

হবে—কিংবা কাছে-পিঠে যাদের পাবেন—বলবেন কাল পাকুয়ালি যেন তাঁরা আপিস যান।

যে আজ্ঞে, মামা বাবু—বলিয়াই অনুপম উত্তর দিল।

চালাও।—ফট্ করিয়া একটা শব্দ হইল—এঞ্জিনের অস্পষ্ট গোঙানির শব্দে মোটরের মসৃণ দেহ নড়িয়া উঠিল। অনুপমের কানে গেল ভিতর হইতে কচি মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন হইতেছে, ও লোকটা কে বাবা?

আঃ—তুই এমন বোকা। ও বাবার আপিসের কেরাণী। শুনলি না—

মোটর অল্প ধোঁয়া ছাড়িয়া ও প্রচুর শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। সেই ধোঁয়া ও শব্দ অনুপমের বুকে আসিয়া আশ্রয় লইল।

হাঁ খুকী—আপিসটা তোমার পিতৃদেবেরই বটে—এবং আমি সেখানকার বশম্বদ ভৃত্য। চব্বিশ ঘণ্টার চাকর নহিলে প্রমোদ অভিযান মুখে ব্ল্যাক্ আউটের রাস্তায় আমাকে চিনিয়া আদেশ দিতে পারিলেন কোন্ অধিকারে? ওঁর কোন্ রাজসিক মহিমায় আমার স্বাধীন নাগরিকত্ব সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মোটরের অভিনবত্বে না পদমর্য্যাদার গুরুত্বে? না—মানিব না ওঁর আদেশ—এই অসময়োচিত অভদ্র আদেশ। মাথা নাড়িয়া অস্বীকৃতির ভঙ্গিতে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিল অনুপম। তার পর চার দিকে চাহিল। অদূরেই সুমিত্রাদের বাড়ি। বাড়ির বাহির দিকের ঘরগুলির জানালা বন্ধ। আর একটা বড় বাড়ি দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ আড়াল করিয়াছে। আর জানালা খোলা থাকিলেও অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দূরের মানুষকে চেনা সহজ নহে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অনুপম ভাবিল, আপিসের প্রভুগুলা কি অহঙ্কৃত। ওই সাদা বাড়িটার বাহিরে যে এত বড় জগৎ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে ওঁরা সম্পূর্ণ অচেতন। তাঁহার আপিসের লেজার ঘাঁটিয়া ফাইল দুরস্ত রাখিয়া—চিঠি পত্রের জবাব ঠিকমত দিয়া দশটা পাঁচটার উপর দুই এক ঘণ্টা ফাউ খাটিয়া যে কেরাণীর দল অপযশ হইতে তাঁহার সুশাসনকে (?) অব্যাহত রাখে—তাহাদের তিনি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু মনে করেন না? তাহাদের গুণপনার বার্ত্তা—ওই সঠিক নিয়মের নিরিখেই নির্ণীত। বাহিরের সভ্যতায় সংস্কৃতিতে—জ্ঞানে মনীষায় যে জগৎ বিস্তৃত তাহার সংবাদ ওঁরা রাখিতে জানেন না। কৃপা হয় ওই দাস মনোভাবাশ্রিত জীবগুলির উপর। ওঁরা বাহিরের জগৎকে বড়জোর জানেন—মোটরের চাকচিক্যে—পার্টির জাঁকজমকে—সিনেমার সস্তা কালচার বিলাসে—এবং শাড়ি গহনা পিয়ানো রেডিয়োর কৌচ সোফা টেবিল ছবি আয়না অয়েল পেন্টিংের সুবিন্যস্ত অলঙ্করণে। সত্যিই ওঁদের ওপর কৃপা হয়।

উনি কে? চিন্তাগ্রস্ত অনুপমের কাঁধে হাত রাখিয়া সমীর প্রশ্ন করিতেছে।

অনুপম মনে মনে অস্বস্তিবোধ করিয়া সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

সমীর হাসিয়া বলিল, ভদ্রলোক হাত নেড়ে এত কি বলছিলেন? নিমন্ত্রণের কথা নয়—নিশ্চয়।

অনুপম শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাঁ নিমন্ত্রণের কথাই—নইলে অত ঘটা করে পথের মাঝে ধরবেন কেন। একটু থামিয়া বলিল, উনি আমাদের অফিসার।

সমীর আর কোন প্রশ্ন করিল না। শুধু কহিল, আশা করি সাহিত্যসভায় যেতে পারবে?

নিশ্চয়। চলিতে চলিতে বলিল, চাকরিটা মনে করছি ছেড়ে দেব।

এই যুদ্ধের বাজারে?

সমীরের প্রতিপ্রশ্নে অনুপমের সঙ্কল্প শিথিল হইয়া গেল। তবু মুখে হাসি টানিয়া কহিল, যুদ্ধের বাজারে অনেকেই তো অনেক কিছু করছেন।

হঁ—সেটা নঙর্থক নয়। এখন অর্থের সচ্ছলতা হয়েছে—চাকরির দৌলতে, কালো বাজারের দৌলতে। শেষেরটা নিশ্চয় ধরবে না।

ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।

এবং সাহস নেই। মাষ্টার কেরাণী এরা নীতিবাদের ভীরুতাকে আশ্রয় করে মাটি হয়ে গেল—এত বড় যুদ্ধটার কোন সদ্ব্যবহারই করতে পারলে না।

আচ্ছা সমীর—পাবলিশিং বিজ্‌নেস এ বাজারে ভাল চলে না?

পেপার কন্ট্রোলের জুজু দেখানো আছে। অবশ্য আমাদের মত ভাল ছেলেদের জন্যই জুজু ঝোলানো আছে—যারা ডেয়ার-ডেভিল গোছের—

অনেক নতুন কোম্পানী হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে—সবাই কি—

কারু সাধুত্বে আমি আস্থা রাখি না—হতে পারেন অনেকে অন্ধ পথের পথিক। সে অন্ধ পথটাও তোমার পক্ষে সুগম হবে কি!

অনুপম কহিল, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

তাহলে চাকরির খুঁটিতে হেলান দিয়ে চেষ্টা চালাও। সত্যিই যাদের নিয়ে গল্প ফেঁদে বসেছ—তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে—তাদের এক জন হয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তো!

সে কথা অনুপম মনে মনে স্বীকার করে। তেরশো পঞ্চাশ—গল্পের—প্রবন্ধের অনেক রসদ সরবরাহ করিতেছে—এবং করিবে, কিন্তু তেরশো পঞ্চাশের দুর্গতদের ভাঙাইয়া যে উপার্জ্জন যুদ্ধের চড়া বাজারেও জীবনধারণকে খানিকটা সুসহ করিয়াছে—তাহার সামান্যতম অংশও দুর্গত-সাহায্য ভাণ্ডারে দিবার কল্পনা তো মনের কোণে ঠাঁই পায় নাই। যাহাদের জন্য এই ভয়াবহ ছবি সাহিত্যে বর্ণাঢ্য ভাষায় আঁকা হইল তাহারা এর উত্তাপটুকু অনুভব করিবে না—(অনুপম প্রশ্ন করিল—আমরাও করিতেছি কি?) এর রঙ ও রেখাকে কলাকুশলতাও করিবে কিনা সন্দেহ—শুধু আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধির মাপকাঠিতে ও অনুভূতির রসায়নে তেরশো পঞ্চাশকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়া এই যুদ্ধের হৃদয়হীন বর্ব্বরতার কু-শাসনের এবং অর্দ্ধ-সভ্যতার উপর ধিক্কার দিয়া নিজেদের সৌভাগ্যবান বোধ করিবে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনায় তেরশো পঞ্চাশ না আসা পর্য্যন্ত আমরাও তা করিয়াছি। নিজেকে দিয়া উত্তর পুরুষদের তুলনা করিল অনুপম। একই গাছের দুই রকম বীজ হয় না, যদিও জমিবিশেষে ফসলের তারতম্য ঘটে।

সুমিত্রা সাজসজ্জা শেষ করিয়া চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করিতেছে। সুমিত্রার পিতা এইমাত্র চা পান করিয়া উপরে চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রিতে তাঁহার খাইবার হাঙ্গামা কিছু নাই। ফল ও মিষ্ট আনা আছে, জাল-দেওয়া দুধটা গরম করিয়া দিতে হইবে। দুটি কমলালেবু, একটি আপেল ও আধখানা বেদানার দানার সহিত ওই গরম দুধে কিছু খই মিছরীর গুঁড়ার সঙ্গে মিশাইয়া তিনি রাত্রির লঘু আহার সারিয়া শয্যা আশ্রয় করিবেন। সভা হইতে ফিরিয়া আসিতে কিছু দশটা বাজিবে না। আসিবার সময় ভীম নাগের দোকান হইতে চারিটি টাটকা সন্দেশ আনিলেই চলিবে।

আপনি বড্ড দেরি করেছেন।

হাঁ, নৃত্য-বিতানে এক জন বন্ধু ধরে নিয়ে গেল।

রবিবারটা পুরো এখানে কাটাবার কথা ছিল, কিন্তু বন্ধু-দেরও তো ফেলা যায় না।

সুমিত্রার মন্তব্যে অনুপম লজ্জিত হইল না, খুশীই হইল। ক্রমবর্দ্ধমান বন্ধুর সংখ্যা গৌরবেরই জিনিস।

আমরা অবশ্য পুরোনো বন্ধু। সমীর মন্তব্য করিল।

অনুপম বলিল, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।

তা বাড়ুক, স্বাদে কম। আমরা কোয়ান্টিটির ভক্ত নয়, কোয়ালিটির।

সমীরের মন্তব্যে অনুপম কহিল, সোনার চেয়ে চকচকে—হলেই—

আহা—দামের কথা কে ভাবছে—জৌলুসের কথাই আগে।

দামের কথাটা বুঝি—

অনুপমকে বাধা দিয়া সমীর বলিল, ও কথা বুঝুন যাঁদের বণিক-মনোবৃত্তি। আমরা তো আর সমুদ্রের ঢেউ নই—তার মাথায় ফেনা। যে ফেনায় চাঁদের আলো পড়ে কাশফুলের মত দেখায়।

দাদা শীগগির চা খেয়ে নেবে কিনা?

সুমিত্রার রোষকটাক্ষে সমীর চায়ের কাপ টানিবার ভঙ্গি করিয়া কহিল, ঢেউ ভেঙ্গে গেলেও ফুল মিলিয়ে যায় না—মনে রাখিস।

কোথায় যায় ফুল?

কোথায় যায় হে অনুপম? তীরেই জমা হয়—এবং খা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়। তখন তা থেকে ওষুধ তৈরি হয়ে আর একদিক থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

ভারি তো ওষুধ। সুমিত্রা তাচ্ছিল্যভরে কথাটা উড়াইয়া দিল।

ভারি তো। যদি সেকালে অজ পাড়াগাঁয়ে জন্মাতিস—আর গাল ফুলতো—আর ডাক্তারি ওষুধ না মিলতে—

অনুপম বাবু আপনার হ'লো?

সমীর কথাটা বলছে মন্দ নয়।—

'শোভা দেখে মন—তার বয়স আলাদা,

আর— ওষুধ খোঁজে দেহ তার বয়সও আলাদা।'

হোক আলাদা—ও নিয়ে আর এক সময় কবিত্ব করবেন। সুমিত্রা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশ্চর্য্য অনুপম—সাহিত্য সভায় যাবার আগে একটু দার্শনিকত্বও করতে পারব না।—আজ সুমিত্রার যুদ্ধং দেহি ভাবটা প্রবল।

অনুপম নিঃশব্দে চা ও খাবার শেষ করিল।

রেডি? বারান্দায় সুমিত্রার কণ্ঠস্বর।

সমীর লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—এ-টেন-সন এবং মার্চ্চের ভঙ্গিতে ভিতরের পর্দ্দা ঠেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুমিত্রাও হাসিতেছিল। কহিল, দাদা আজ মুডে আছে। যাবে বলে বোধ হচ্ছে না।

না না, যাবে বৈকি।

ওয়ান মিনিট প্লীজ। সিঁড়ি দিয়া সমীর তর তর করিয়া নামিয়া আসিল। বাস আর ট্রাম?

হণ্টন। সুমিত্রা অগ্রণীর হইল। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশসেবার প্রেরণা

শ্রীতারাপদ দাশ

প্রথম স্তবক

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন এক মহাসমুদ্রবিশেষ। তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী লোকোত্তর প্রতিভার আদি অন্ত নাই—উহা সমুদ্রের মতই অতলস্পর্শ। বঙ্গসাহিত্যোদ্যানেও রবীন্দ্রনাথের নব নব উন্মেষশালিনী সৃজনীশক্তি পদলালিত্যে, ভাবের গভীরতায়, শব্দযোজনায় এবং ব্যঞ্জনা-শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশে অপরূপ স্বর্ণচম্পকের মত পাপড়ি মেলিয়া প্রস্ফুটিত। উহার রূপ ও সুবাস যুগযুগান্তর ধরিয়া সাহিত্যামোদী বিশ্বজনের মনোহরণ করিতে থাকিবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য-সৃষ্টির শুধু একটা দিক দেখাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে। আমাদের দেশের একদল লোকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ আজন্ম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিতপালিত ধনীর দুলাল। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় লইয়াই ছিলেন তিনি মশগুল। তাই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে দেশের জনসাধারণের প্রতি সেরূপ দরদ ও সহানুভূতি দেখা যায় না। কিন্তু যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের কার্য্য-কলাপ গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক, জনসাধারণের বন্ধু এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সমস্ত ভারতেও খুব কম ছিলেন এবং আছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলনে। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র প্রথমে কাব্যে এই স্বদেশ-প্রেরণার আবাহন করেন। কিন্তু

তাঁহারা এইজন্য বাঙালী-চরিত্র অবলম্বন করেন নাই—রঙ্গলালের অবলম্বন ছিল—রাজপুত জাতি। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে' প্রথম বাঙালীকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশপ্রীতির অবতারণা করেন। যাহা হউক, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধকে প্রকৃষ্টভাবে রূপায়িত করিতে প্রয়াস পান। তবে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'ই জনসাধারণের মর্ম্ম-বেদনা সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রথম প্রকাশ পায়।

এইবার আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কিরূপে জাতীয়তা-বোধের এই প্রেরণা উত্তরোত্তর রবীন্দ্র-সাহিত্যে পরিস্ফুট হইল। এই প্রসঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির অধীনে থাকিয়া দেশাত্মবোধক সাহিত্যসৃষ্টিতে যে কত বাধাবিঘ্ন, তাহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথ জাতির উদ্বোধনে যেরূপ অকুতোভয়ে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার পক্ষে যুগধর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যগণ অপেক্ষা কিছু অনুকূল ছিল সন্দেহ নাই—কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হইতে যখন দেশের মধ্যে সমাজের উচ্চশিক্ষিত স্তরে রাষ্ট্রীয় চেতনা নীরবে ধীরে জাগ্রত হইতেছিল, তখন কবির পূর্ণ যৌবনাবস্থা—রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও মধ্যবয়সে জাতীয় আন্দোলনের ক্রম-বর্দ্ধমান পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাগ্যবিধাতাদের রুদ্ররোষ ও শ্যেনদৃষ্টি দিনের পর দিন প্রখর ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতে-ছিল। এতৎসত্ত্বেও স্বদেশী যুগের বাংলা তথা সারা ভারতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের ওজস্বিনী ভাষায় ও সঙ্গীতের উদাত্তস্বরে জাতির প্রাণে যে উন্মাদনা, যে প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। কবি নিজের বংশমর্য্যাদা, আভিজাত্যের সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এবং স্বদেশের জন-সমুদ্রের যৌবন-জল-তরঙ্গের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় দেশের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতেন ও গান গাহিয়া বেড়াইতেন। যাঁহারা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কস্মিন্ কালেও দেশের সাধারণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চান নাই, তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন। যদিও স্বদেশী যুগে জাতীয় ভাবধারা দেশের সর্ব্বস্তরে পৌঁছায় নাই, তবু কবি কতকটা অন্তর্দৃষ্টিবলে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে জাতির জীবনস্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করিলেন। তখন তাঁহার সত্যিকার জীবনের উপলব্ধি হইল—কবির মনোজগতে আসিল আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—ফলে সৃষ্টি হইল 'কথা ও কাহিনী'র অনেকগুলি সুন্দর কবিতা।

এই সময়েই তাঁহার রচিত স্বদেশী গান দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে পথে, ঘাটে, মাঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে
•••যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন জানে না কে ॥

এই সময়েই কবি গাহিলেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

তিনি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যেন নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন। তাঁহার হৃৎকন্দর থেকে স্বতঃই উৎসারিত হইল—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে ॥

দেশের এই সময়কার নবজাগ্রত হৃৎস্পন্দনের অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অমূল্য জাতীয় সঙ্গীত।

"অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী।"

* * *

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক•••
মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী"•••

এই সকল গান এখনও প্রত্যেক স্বদেশভক্ত সন্তানের প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগায়। কবি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া-ছিলেন, দেশসেবককে "অভী" হইতে হইবে। কাপুরুষের দ্বারা দেশের বা জাতির কোনও কাজ সম্ভবে না। তাই তিনি গাহিলেন,

"আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু-বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥"

দেশসেবকের শুধু সাহস ও উদ্যম থাকিলেই চলে না। তার স্বাবলম্বনও দরকার। এখানে স্বাবলম্বন বলিতে স্বদেশের দ্রব্যজাত ব্যবহার অর্থাৎ স্বদেশী গ্রহণও বুঝায়। স্বদেশের সাদাসিধে পরিচ্ছদও বিদেশী সুন্দর ও মূল্যবান পরিচ্ছদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। এই স্বদেশী গ্রহণ মন্ত্রে আমাদের দীক্ষা চাই। কবির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হইল—

"হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে,
এনেছি পূজার দান ॥
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয় ॥
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন,
তাই আমাদের দিয়ো।"

এইজন্ত পণ করিয়া, দৃঢ় সংকল্পে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। তাই—

"নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা ;
পরের ভূষণ, পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন, না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।"

কবি এতেও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি দেশজননীর প্রতি জনসাধারণের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রীতির উদ্রেক করিবার জন্য তাঁহার অপরূপ রূপ বরাভয়দায়িনী মূর্ত্তি, তাহাদের মানসচক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। কবির কল্পিত এই প্রতিমা বাঙালীর নিকট বহু পূর্ব্ব কাল থেকেই পরিচিত। এ আমাদের শক্তি সাধকের কালী করালী বরাভয় মূর্ত্তি।

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন বরণ।"

দ্বিতীয় স্তবক

বাংলা ১৩০০ সালে রচিত "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দশ-বার বৎসর আগেই কবি-হৃদয়ে দেশের ডাক পৌঁছিয়াছিল। তিনি উহাতে সম্পূর্ণ ভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে ভাবের উৎকর্ষে, সাবলীল বর্ণনায় এবং ব্যঞ্জনা-শক্তিতে অনবদ্য কিন্তু আমরা উহাতে নিভৃতে সাহিত্য-সাধনায় রত কবির বাহিরের জীবন ও জগতের 'রস রূপের' অর্থাৎ দেশের সত্যিকার জীবনে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য হৃদয়ের প্রবল আকুলি-বিকুলি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। ইহার আদ্যন্ত দুর্গত, নির্যাতিত অবমানিত মানব-সন্তানের দীনতা-হীনতা ও গ্লানির প্রতি কবিচিত্তের সহানুভূতিতে ভরা। কবির অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবিতার মত উহার মধ্যে এমন একটি দুরন্ত গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে যে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত উহার সহিত অনিবার্য্য বেগে ছুটিতে থাকে এবং কবির সহিত তাহারও প্রাণে দেশসেবার ও বাহিরের কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রবল আকুতির সৃষ্টি হয়। কবিতাটি হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল। দেশের মূক জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কবি উদাত্তস্বরে বলিতেছেন—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার,
বহি' চলে মন্দ গতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি'
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি'
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে
নাহি জানে কা'র দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

পরক্ষণেই কবি এই মর্ম্মন্তুদ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা। ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।"

তার পর কবি এই দুর্গতদের সেবায় দেশবাসীকে উদ্বোধিত করিবার জন্য তাহাদের দুঃখময় জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন।

"বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির ইতিহাসে 'কথা ও কাহিনী'র যুগ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 'কথা' গ্রন্থখানির অধিকাংশ কবিতাই ১৩০৬ সালে লিখিত। কবির বয়স তখনও চল্লিশের নীচে। হৃদয়ের গভীরে তাঁহার দেশসেবার জন্য প্রবল আগ্রহ। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন তখনও বস্তুগত হইয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় তাঁহার দেশাত্মবোধ অভিনব উপায়ে নিজের পথ করিয়া লইল। যেন স্বদেশী যুগের পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিয়াই কবি বাংলার নরনারীর জন্য ভারত-ইতিহাসের স্বাধীনতার কতিপয় মূর্ত্ত বিগ্রহের উচ্চ আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। রাজপুত, মারাঠা ও শিখ, ভারতের এই তিন সমরকুশল বীর-জাতির অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী ও স্বদেশ-প্রেমের অতীত কাহিনীগুলি কবি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া সরস ও জীবন্ত করিয়া তুলিলেন।

স্বদেশী যুগ হইতে অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত বীরত্ব-গাথা সহস্র সহস্র দেশবাসীর হৃদয়ে দেশপ্রীতির প্রেরণা যোগাইয়াছে। বাংলার তরুণদের উপর ইহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। 'কথা'র কবিতাসমষ্টির মধ্যে 'গুরুগোবিন্দ' শীর্ষক কবিতাটি অনেক পূর্ব্বে রচিত। ইহাতে যমুনার নির্জ্জন তীরে শিখগুরু ভবিষ্যৎ দেশসেবার আশায় কি কঠোর দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সাধনায় রত ছিলেন, তাহাই অপরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুচরদের কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আকুল আহ্বান, দেশব্যাপী অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নিজ হৃদয়ের অধীর উন্মাদনা, সমস্তই শিখগুরু অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, তাহার দেশসেবার উপযুক্ত সময় আসে নাই। নেতার যোগ্যতার অভাবে পৃথিবীর সকল দেশেই বড় বড় কাজ পণ্ড হইয়াছে। এই অযোগ্যতার অন্যতম কারণ—কর্ম্মক্ষেত্রে সফলকাম হইতে হইলে যে আত্মিক সাধনা ও মনোবল

সকয়ের দরকার সে সম্বন্ধে অনেক নেতাই সম্যক অবহিত নন। সেইজন্য এই কবিতাটি নেতৃত্বকামীদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। এইবার কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাক্। অনুচর-দের আকুল আহ্বানে শিখগুরু বলিতেছেন—

"তোমাদের হেরি চিত্ত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত অনল শত শিখা মেলি'
সর্প সমান করি উঠে কেলি
গঞ্জনা দেয় তরবারী যেন
কোষ মাঝে ঝন ঝন।
হায় সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি,
হাতে লয়ে জয় তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

'শিবাজী-উৎসবে' রবীন্দ্রনাথ ছত্রপতি শিবাজীর—
"একধর্ম্ম রাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি"—
এই মহান্ আদর্শের জয়গান করিয়াছেন।

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণির একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"

বণিকের মানদণ্ড রাতারাতি রাজদণ্ডে পরিণত হইল, এ এক অঘটন ঘটন—কিন্তু যে হতভাগ্যেরা ইহা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল কবির বর্ণনাচাতুর্য্যে তাহারা চিরকাল ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিল।

"...বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে—
অয়ি ইতিবৃত্ত কথা ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী
তোমার লিখন 'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।"

শিবাজীর মত এক জন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে 'দস্যু' বলিয়া বিদ্রূপ করায় কবি এই কয়েক ছত্রে বিদেশীয় ইতিহাসকে 'মিথ্যাময়ী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং সেই অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিকের সত্যকার চিত্র জনসাধারণের নিকট উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—শিবাজীর সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় এই উদ্দেশ্যে। উপসংহারে কবি বাঙালীকে শিবাজীর জাতীয় ভাবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মারাঠীদের সহিত একত্রে জাতীয় জীবন গঠন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতির উচ্চাদর্শের কথা আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে প্রাচীন ভারতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়, কারণ উঁহার আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর তিনি বর্ত্তমান ভারতের স্বাদেশিকতার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়া-ছিলেন। বাল্যকালেই কবিহৃদয় তাঁহার পিতার আদেশে উপনিষদের গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। উহার অনুরণন তাঁহার চিত্তলোকে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়া-ছিল। ইহার মূর্ত্ত বিকাশ তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের রচনা 'নৈবেদ্যে' দেখিতে পাই। প্রাচীনের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কিরূপে তিনি বর্ত্তমানের আত্মবিস্মৃত ভারতকে প্রেরণা যোগাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই কবিতাগুলিতে বুঝা যায়।

কবি প্রার্থনা করিতেছেন,—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
..........................ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি দণ্ডে পলে পলে।
এই আত্ম-অবমান অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু......চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো।"

বস্তুতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যে ওজস্বিনী ভাষায় স্বদেশসেবার প্রেরণামূলক রচনা বহু স্থানে বিচিত্র ভঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে। উহার যে কোনও ছত্র হইতে আমরা স্বদেশসেবার যাত্রাপথের পাথের,—মনের বল সঞ্চয় করিতে পারি।

'সুপ্রভাত' কবিতায় একস্থানে রহিয়াছে—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

'সবুজের অভিযান' শীর্ষক কবিতায় কবি স্পষ্ট উদাত্ত স্বরে দেশের মুক্তিপথের অগ্রদূত যুবকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি ভীরু, জরাগ্রস্ত দেশবাসীকে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিবার জন্য, আমাদের অচলায়তন সমাজের পূজাবেদীকে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য, তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

জগদ্দল পাথরের মত যে অন্যায়, যে মিথ্যা আচার-বিচার হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের সমাজ-জীবনের বুকের উপর চাপিয়া আছে, যাহার অক্টোপাশ বন্ধনে আমরা অহর্নিশ জর্জ্জরিত, তাহার ভার কবি আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাই আকুল আবেগে তিনি বলিতেছেন—

"শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'।"

তারপর 'ভারততীর্থ' ও 'অপমানিত' কবিতার ছত্রে ছত্রে আমরা ভারত সভ্যতার উদার ও শাশ্বত ধারা এবং হিন্দু

সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যতার ফলে উহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার চিত্র স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি।

এইবার কাব্যসাহিত্য ছাড়িয়া কবিগুরুর লিখিত কতকগুলি ভাষণ ও চিঠিপত্রে তাঁহার স্বদেশপ্রেমের কথা আলোচনা করিয়া আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ছিলেন অনেকটা ভারতীয় তথা বাংলার সমস্যা নিরাকরণে ব্যস্ত। তবে তাঁহার জাতিপ্রেমে পাশ্চাত্ত্য Nationalism-এর উগ্র ঝাঁঝ কোনও দিনই ছিল না। পশ্চাত্যের সর্ব্বনাশা জাতীয়তাবাদের ফলে জগতের যে অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহার উল্লেখও তিনি বহু বার করিয়াছেন। তারপর পাশ্চাত্ত্য দেশভ্রমণ করার পর, পৃথিবীর নানা জাতির নানা বর্ণের লোকের সহিত মিশিয়া কবির মনোজগতে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার দৃষ্টি তখন সমস্ত বিশ্বে সম্প্রসারিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় সমস্যা জাগতিক সমস্যার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। তখন হইতে সুরু হইল তাঁহার বিশ্বমৈত্রীর উদারবাণী প্রচার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার পরিণত বয়সের স্বপ্ন। শান্তিনিকেতনকেও তিনি অনেকটা এই আদর্শে বিশ্ববিদ্যাপীঠে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শেষের দিকে তিনি যখন স্বদেশী যুগের মত জাতীয় আন্দোলনে আর সক্রিয় ভাবে যোগদান করিতে পারিতেন না, তখন অনেকে তাঁহাকে আমাদের জাতির সুখ-দুঃখের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি আজীবন জাতির দুর্দ্দিনে, তাহার সংশয়-সঙ্কটের মধ্যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন, ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া অকুতোভয়ে দেশের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বজ্রনির্ঘোষে বিরোধীপক্ষকে সে যত বড় শক্তিধরই হউক না কেন, জাতির মর্ম্মকথা জ্বালাময়ী ভাষায় শুনাইয়া গিয়াছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি তদানীন্তন ভারতের রাজপ্রতিনিধিকে যে নির্ভীক চিঠি পাঠাইয়া 'স্যর্' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তার পর রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সময় কলিকাতার টাউন হলে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর কিছু আগেও 'সভ্যতার সঙ্কট' এবং মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির প্রত্যুত্তর হিসাবে যে বজ্রগর্ভ বাণী ভারতবাসী তথা জগদ্বাসীকে শুনাইয়াছেন, তাহাই চিরদিন সাক্ষ্য দিবে ভারতীয় জাতীয়তার নির্ভীক পুরোহিতরূপে তাহার অমূল্য অবদানের। তাঁহার 'স্যর্' উপাধি ত্যাগের চিঠির এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the method of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote."

আবার ঐ পত্রের শেষে বলিতেছেন—

"The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation."

মিস্ র‍্যাথবোনের '*So called appeal to Indians*' শীর্ষক খোলা চিঠির উত্তরে কবি লিখিলেন—

"The Lady has ill served the cause of her people by addressing so indiscreet, indeed impertinent challenge to our conscience. It is sheer insolent self-complacency on the part of our so-called English friends to assume that had they not taught us, we would still have remained in the dark ages···Through the official British Channels of education in India have flowed to our children in schools not the best of English thought but its refuse, which has only deprived them of a wholesome repast at the table of their own culture."

ঐ চিঠিরই অন্যত্র দেখিতে পাই—

"I look around and see famished bodies crying for bread···I look around and see riots raging all over the country. When crores of Indian lives are lost, our property looted, our women dishonoured, the mighty British arms stir in no action. Only the British voice is raised from overseas to chide us for our unfitness to put our house in order."

কবি তাঁহার অভিভাষণে 'সভ্যতার সঙ্কটে' সভ্যতাভিমানী ইংরেজকে লক্ষ্য ক'রে তাহাদের ভারত-শাসন তথা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তঃসারহীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন তাহার প্রতিধ্বনি প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের হানাহানির মধ্যেও আমরা শুনিতে পাইয়াছি। যত দিন এই ধ্বংসলীলা, এই ভদ্রবেশী বর্ব্বরতার অবসান পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য না ঘটিতেছে, তত দিন কবিগুরুর বাণী বিশ্বের শান্তিকামী নরনারীকে অনুপ্রাণিত করিবে। তিনি উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন—
"সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্নবস্ত্র, শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ···।"

···"পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধারক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি।"

···"মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভেতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত বাতাস কলুষিত ক'রে দিয়েছে।"

আজ আমরা কি এই বাণীর সত্যতা বাস্তব জীবনে প্রতিপদে অনুভব করিতেছি না?*

---

* নিউ দিল্লী ইউনিয়ন একাডেমী হলে পঠিত।

আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন মহিলাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসার দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া মাদ্রাজী শিষ্যদের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"...and their women—they are the most advanced in the world. The average American woman is far more cultivated than the average American man. The men slave all their life for money, and the women snatch every opportunity to improve themselves."

(Complete works of Swami Vivekananda, vol. V, p. 18)

বাস্তবিক বহু বৎসর ধরিয়াই কি রাষ্ট্র-সেবায়, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারে সকল বিষয়েই মার্কিন নারী-সমাজ দুনিয়ার আর সকল দেশের নারীজাতিকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুত প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্বন্ধে স্বামীজী মহীশূরের মহারাজাকে লিখিয়াছিলেন, "তার পর আমেরিকান্ মহিলাগণের অবস্থার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব আপনার হাতে লইতেছে, আর আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক।" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ পৃ. ৭২)।

স্বামীজী যখন এই কথাগুলি লেখেন তাহার পর অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল অতীত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মার্কিন মহিলারা আরো বিবিধ অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। এমন কি, ইদানীং গবর্ণমেণ্টের কোন কোন উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করিতে পর্য্যন্ত তাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন। কিরূপ অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং তুমুল আন্দোলন দ্বারা মাত্র পঁচিশ বৎসর আগে মার্কিন নারী সমাজ ভোটাধিকারিণী হইয়াছেন তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বিগত পৌষ মাসের প্রবাসীতে "রাষ্ট্রের সেবায় মার্কিন নারী" নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

মার্কিন-মহিলা-প্রগতির মূলে রহিয়াছে উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ। এই উচ্চশিক্ষার দৌলতেই মার্কিন নারীসমাজ নিজেদের কল্যাণের পথকে বাছিয়া লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন।

মহিলাদের জন্য আমেরিকায় যে-সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলির বিভিন্নমুখী ব্যাপক কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আমেরিকার যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কথা আলোচনা করিতেছি তাহার উন্নত আদর্শ, শিক্ষাদান-প্রণালীর ধারা ইত্যাদি হইতে আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ব্যক্তিগণও প্রচুর ভাবিবার খোরাক পাইবেন। উক্ত কলেজটির নাম ভাসার কলেজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো বেসরকারী কলেজসমূহের অন্যতম এই বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষায়তনটি নিউইয়র্ক হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্তী পাউকিপসি নামক শহরে অবস্থিত।

যাবতীয় বেসরকারী মহিলা কলেজের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রচুর অর্থানুকূল্য লাভ করিয়া ধীরে ধীরে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মেথু ভাসার নামক জনৈক মার্কিন মানব-হিতৈষী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ভিত্তিপত্তন করেন। কলেজটি প্রকৃতপক্ষে খোলা হয় কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর হেনরি নোবল ম্যাকক্রাকেন ইহার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার আমল হইতেই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার অর্থবলও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ৯৫০ একর জমি এই বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন সূত্রে ইহা যে আর্থিক সাহায্য পায় তাহার পরিমাণ প্রায় ১০,৮০০,০০ ডলার। আর্থিক সচ্ছলতার দরুন এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে ছাত্রী এবং কর্তৃপক্ষ (Faculty) উভয়কেই নানাবিধ বৃত্তি প্রদান এবং টাকা ধার দিয়া সাহায্য করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য



মার্কিন স্থপতি জেমস রেনউইক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভাসার কলেজের আদি ও প্রধান অট্টালিকা

বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও এখানে আছে। এখানকার গবেষণা-সাহায্য-ভাণ্ডারটি বহু জনের দানে দিন দিন অধিকতর পুষ্ট হইতেছে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বেসরকারী মহিলা কলেজ-সমূহে অধ্যয়নকারিণী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ২২৩,৮৩০ জন। প্রতি বৎসরই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল ছাত্রীসমাজের মধ্যে অনেকে ভাসার কলেজে স্থান পাইবার জন্ম আবেদন করিয়া থাকে। উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহাদের শিক্ষা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক আবেদন-পত্র মঞ্জুর করিয়া থাকেন।



অনায়াসে ব্যবহার্য্য ভাসার কলেজের গ্রন্থাগার

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সকল স্তরের এবং বিদেশাগত ষোল হইতে বাইশ বৎসরবয়স্ক বার শত তরুণীকে ভাসার কলেজে ভর্ত্তি করা হয়, তাহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল কলেজসংলগ্ন বহু কক্ষবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্রুত উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করায় আবেদনকারিণীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া যায় এবং যোগ্যতা অনুসারে তন্মধ্যে অনেককেই এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা আত্মকর্তৃত্বের ক্ষমতা ভোগ করে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে।

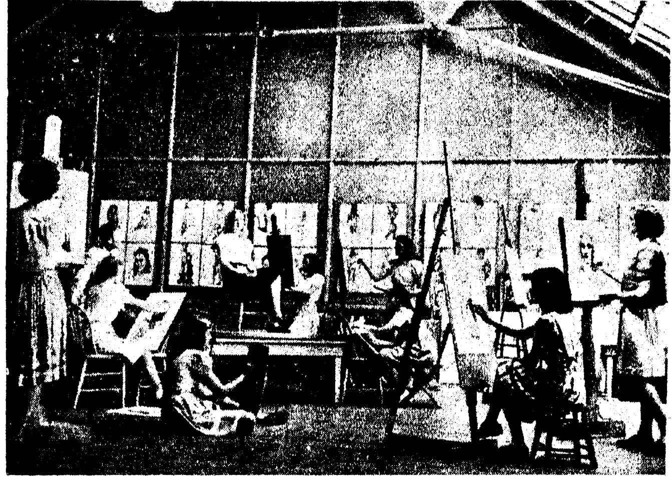
ভাসার কলেজের ছাত্রীরা যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম পুরাপুরি ভাবে মানিয়া চলে সে বিষয়ে কড়া নজর রাখা হয়। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কেনীয়ন হল নামক ব্যায়ামশালায় কসরত এবং সম্বৎসরব্যাপী ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। টেনিস খেলায় অনুরাগিণী ছাত্রীদের জন্ম বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের মধ্যেই টেনিস-কোর্ট নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। স্কুয়াস, বাস্কেটবল এবং ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদির কোর্টগুলি পরস্পর সন্নিহিত ভাবে অবস্থিত। কেনীয়ন হলটি এক বিরাট্ ব্যাপার। তাহাতে কন্দুক ক্রীড়ার জন্ম সুঁড়ি পথ, তীর ছোঁড়ার ফাঁকা জায়গা, বেড়া-ঘেরা একটি কক্ষ এ সমস্ত তো আছেই, তদুপরি আছে ব্যায়াম, যৌথ ভাবে কাজ করিবার প্রণালী এবং নৃত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্ম বিভিন্ন কক্ষ। রৌদ্র-স্নানের জন্ম একটি উন্মুক্ত স্থান এবং একটি ঝুলানো জলাশয়ও এই বিরাট্ হলেরই অঙ্গ। যাবতীয় ব্যায়াম এবং ক্রীড়াদি অনুষ্ঠিত হয় শরীরচর্চ্চা-শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধানে। স্বাস্থ্য-বিভাগের সহ-যোগিতায় উপরি-উক্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষ, ছাত্রীরা যাহাতে অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।



কলেজ-প্রাঙ্গণে বৃক্ষচ্ছায়াতলে প্রেসিডেন্ট হেনরি নোবল ম্যাকক্রাকেন ছাত্রীদিগকে ইংরাজী পড়াইতেছেন। এই ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর শিক্ষাদান-প্রণালীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়

ভাসার কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদিগকে গণতান্ত্রিকতা এবং নাগরিক জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদিগকে এ-বি ডিগ্রী প্রদান করা হইয়া থাকে, তা ছাড়া কলা (Arts) এবং

বিজ্ঞানে (Science) যথাক্রমে এ-এম এবং এম-এস নামক আরো দুইটি ডিগ্রী ছাত্রীরা লাভ করিতে পারে। ব্যাপক অর্থে কলা বলিতে যাহা বুঝায়, যদিও কলেজের শিক্ষাদান-প্রণালী মুখ্যত: তাহার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা সত্ত্বেও ইহার পাঠ্যতালিকা প্রণয়নে এবং শিক্ষা প্রদানে এবম্বিধ পদ্ধতি অনুসৃত হয়, যাহাতে শিক্ষার্থিনীরা সমসাময়িক জীবন এবং চল্‌তি দুনিয়ার বিচিত্র ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবিবর্ত্তন এবং সংস্কৃতি, রোমক ভাষা, গ্রীক সভ্যতা, স্পেনীয়-মার্কিন সংস্কৃতি এ সমস্ত বিষয় ভাসার কলেজের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রীদিগকে পুনর্গঠন-বিষয়ক সমস্যা এবং ইহার মূলনীতিসমূহ বিশ্লেষণ-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতে হয় এবং উত্তর জীবনে শিক্ষা-বিভাগ, এঞ্জীনিয়ারিং, চিকিৎসা-বিভাগ, পৌর-শাসন বিভাগ, বৈদেশিক সরকারী কর্ম্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিবার প্রাথমিক প্রস্তুতি তাহাদের এই শিক্ষায়তনেই হয়।



ভাসার কলেজের ষ্টুডিওতে মডেল দৃষ্টে চিত্রাঙ্কনরত ছাত্রীগণ

Euthenics এখানকার শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এই বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা দৈনন্দিন জীবনে কলা এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ-পূর্ব্বক কি ভাবে জীবনযাত্রা-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করা যায় ছাত্রীরা সেই বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হয়। Euthenics শিখাইবার জন্য এই কলেজের অন্তর্গত একটি গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাভবন আছে। ইহাতে ছাত্রীদের পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, নার্স এবং সমাজসংস্কারকগণ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই অভিনব পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে ইচ্ছুক একদল চীনা ছাত্রী এই শিক্ষাভবনে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা এবং দক্ষিণ-আমেরিকার ছাত্রীদের এই শিক্ষায়তনে আমন্ত্রণ করা হয়।

ভাসার কলেজের ছাত্রীগণ লাইব্রেরিতে পুস্তক-পত্রিকাদির খোলা-তাক (open shelf) ব্যবস্থার বিশেষ পক্ষপাতী, কেননা এই পদ্ধতির দরুন পুস্তকাগারের যাবতীয় পুস্তক-সংগ্রহ অনায়াসে তাহাদের অধিগম্য হয় এবং যখন প্রয়োজন তখনই চট্‌ করিয়া যে-কোনো পুস্তক এবং পত্রিকা তাহারা সরাসরি তাক হইতে পাড়িয়া আনিয়া কাজ চালাইতে পারে। সাহায্যপ্রার্থী শিক্ষার্থিনীকে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন।



ভাসার কলেজের বিরাট্ বক্তৃতা-ভবন 'রকফেলার হলে'র একটি কক্ষে বক্তৃতা শ্রবণ ও নোট লিখনরত ছাত্রীগণ

যুদ্ধের সময় আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ছাত্রীদের এ-বি ডিগ্রী লাভের জন্য তিন বৎসরের একটি আলাদা কোর্স নির্দ্ধারিত হয়। ইহার সূচনা হয় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ইহার পাশাপাশি পুরানো চার বৎসরের কোর্সও চালু রহিয়াছে, কলেজের পরিবর্দ্ধিত



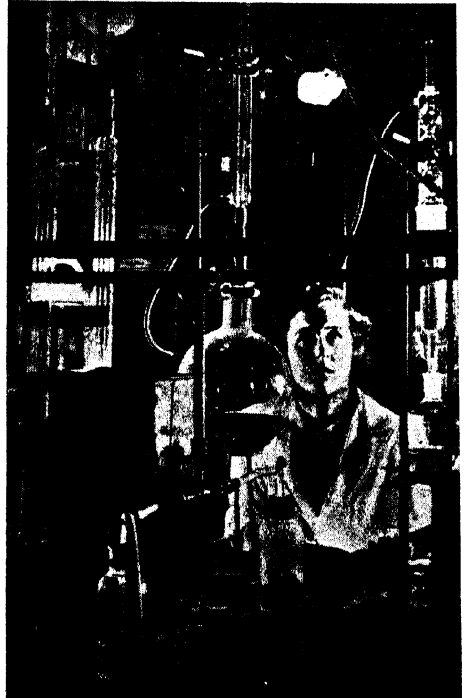
পাউকিপসি শহরের উপকণ্ঠস্থ কলেজের ছাত্রবন্ধুদের সহিত ভাসার কলেজের একটি সান্ধ্য আসরে নৃত্যরতা ছাত্রীগণ

কারিকুলাম এই উভয় ব্যবস্থাকেই স্থান দিয়াছে; তদুপরি সমর-বিভাগের কোনো কোনো চাকুরির উপযোগী শিক্ষাদানের জন্ত নূতন নূতন নানা কোর্সেরও প্রবর্তন হইয়াছে।

ভাসার কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা উদার, সঙ্কীর্ণতার স্থান সেখানে নাই এবং শুধু পুথিগত বিদ্যা অধিগত করার মধ্যে ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণ পরিসমাপ্ত নহে। আনন্দের ভিতর দিয়া জ্ঞানলাভ সেখানকার মূলমন্ত্র। সেইজন্ত ছাত্রীদের জীবন ক্লাস-রুম আর গবেষণাগারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন হইয়াছে ভাসার কলেজে। তাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা, কনসার্ট পার্টি, কলা-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিবিধ আয়োজনের আর অন্ত নাই। শিক্ষাবিষয়ক ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনার আনুষঙ্গিক সমবায় বসবাস-পদ্ধতি (Co-operative living system) অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রীকে ছাত্রী-নিবাসে প্রত্যহ একটি ঘণ্টা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকিতে হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও খেলাধুলা, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত-সম্মেলন ইত্যাদি বিত্তালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে যেগুলির সংস্পর্শ নাই, এরূপ নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার সময়ের অভাব তাহাদের হয় না।

নাট্যকলার অনুশীলনও এই কলেজের অন্ততম শিক্ষণীয় বিষয়। নাট্যকলা কোর্স অধ্যয়নকারিণীরা Experimental Theatre (পরীক্ষামূলক রঙ্গালয়) নামক উদারপন্থী মার্কিন মহিলা-নাট্য-নিকেতনের অভিনয় প্রচেষ্টায় অংশভাক্ হইয়া থাকে। অন্তান্ত ছাত্রীরা, নাট্যকলা যাহাদের পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে কিন্তু নাটক ও অভিনয়ের প্রতি যাহাদের অনুরাগ আছে—ফিলালেথিক নামক ছাত্রী-নাট্য-সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়। উক্ত সমিতির উদ্যোগে বৎসরে তিনটি নাটক অভিনীত হয়। তন্মধ্যে একটি নাটকের অভিনয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় বিদ্যায়তনের বাহিরে সাময়িকভাবে নির্ম্মিত কোনো রঙ্গ-মঞ্চে। নবনাট্যকলার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য।

ভাসার কলেজে মামুলি পাঠ্য-তালিকার বহির্ভূত আর যে-সমস্ত কলাবিদ্যা শিক্ষা-দানের বন্দোবস্ত আছে নৃত্যকলাও তন্মধ্যে একটি। এইজন্ত আধুনিক নৃত্যকলায় অনুরাগিণী ছাত্রীদের লইয়া একটি নৃত্য-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে নৃত্য-কলার আঙ্গিক এবং নৃত্য-পরিকল্পনা (Dance composition) সম্বন্ধে অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং ইহাদের বিকাশ সাধন। ছাত্রীরা শুধু যে নৃত্যকলার ঔপপত্তিক (theoretical) দিক লইয়াই আলোচনা করে তাহা নয়, নৃত্যানুষ্ঠানগুলিতে তাহাদিগকে সক্রিয়ভাবে যোগদান



ভাসার কলেজের গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারত একজন ছাত্রী

করিতে হয়। নৃত্য-শিক্ষাকে গণ্য করা হয় দেহানুশীলন শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ বলিয়া। ইহাতে সুইস সুরকার এমিল জ্যাক ডালক্রোজের উদ্ভাবিত ডালক্রোজ-পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ছন্দোময় অঙ্গচালনার সঙ্গে সুরের সমন্বয় এই নৃত্যকলাকে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তোলে। সমিতির সভ্যগণ সপ্তাহে এক বার একত্র সমবেত হইয়া ঐকতান সম্বলিত নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করে। বসন্তকালে এক বার ইহারা কলেজের যাবতীয় শিক্ষক এবং ছাত্রীদের আমন্ত্রণ করিয়া সকলের সমক্ষে নিজেদের পরিকল্পিত নৃত্যকলা প্রদর্শন করে।

সঙ্গীতশিক্ষা ভাসার কলেজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে সঙ্গীত বলিতে নৃত্য গীত বাদ্য এই তিনটিকেই বুঝায়—"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।" এক কথায় ইহাকে বলা হয় তৌর্য্যত্রিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বৎসর হইল স্কুল-কলেজে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু নৃত্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া উক্ত বিদ্যাকে অঙ্গহীন করিয়া রাখিয়াছেন। ভাসার কলেজ কিন্তু তৌর্য্যত্রিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রীদের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ সঙ্গীত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

অশীতি বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে ভাসার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মেথু ভাসার এই প্রতিষ্ঠানটির ভাবী বিপুল সম্ভাবনা এবং শিক্ষা-সম্প্রসারণের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিলেন আজ তাহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু যে বাহিক উপকরণ-বাহুল্যে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার কর্ম্মতৎপরতা বাড়িয়াছে তাহা নয়, ইহার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের তালিকার মধ্যে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত কলা-বিদ্যা এবং চলতি দুনিয়ার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলিয়া চলিবার উপযোগী শিক্ষা এই দুইটির অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হওয়ায় ইহার শিক্ষাদান-প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ভাসার কলেজের কথা বলিতে গিয়া আমাদের দেশের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়, যেখানে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সেটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী, সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যগীতবাদ্য এবং অভিনয়-কলায় দক্ষতার কথা শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত।

এদেশের মেয়েদের মধ্যে মার্কিন মহিলাদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষার প্রসার হোক ইহা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অন্যতম প্রধান স্বপ্ন। দীর্ঘকালান্তরেও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। উত্তরকালে হয়তো তাঁহার কোনো যোগ্য উত্তরসাধকের সাধনায় তাঁহার সেই স্বপ্ন কর্ম্মে রূপায়িত হইয়া উঠিবে, ভাসার কলেজের মত বিরাট্ মহিলা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এদেশেও গড়িয়া উঠা সেদিন অসম্ভব হইবে না।

অন্তরালে

শ্রীসব্যসাচী রায়

মাস ছয়েক পরে কাল হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ব্যারিষ্টার সেনের বাড়ীতে, পার্টিতে।

এত দিনের ব্যবধানেও প্রথম দর্শনেই যে পরস্পরকে চিনতে পেরেছিলাম অবলীলাক্রমে, তাই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে।

ছয় মাস আগে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, মাত্র একবার; কালকের মত সেও অমন এক পার্টিতে—জাষ্টিস্ মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যার জন্মোৎসবে

তার পর আর দেখা হয় নি—কালকেই হ'ল আবার। আমাকে মনে করে রেখেছ দেখলাম—না হলে বহুদিন আগেকার ক্ষণিক আলাপ মনে থাকবার তো কথা নয়।···

খুব আশ্চর্য্য নয় অবশ্য। খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক বিদ্রোহী লেখক আমি—আকৃতিও সুন্দর বয়স অল্প এবং অভিজাত বংশের ধনৈশ্বর্য্য, সবকটিরই অকৃপণ সমাবেশ আমার মধ্যে—প্রথম আলাপ থেকেও আমাকে অনেক দিন মনে করে রাখবার মত যোগ্যতা আছে বই কি আমার।

আর তোমাকে আমি মনে করে রেখেছিলাম, কারণ···।

···পার্টির ভীড়, কৃত্রিম সামাজিকতা আর কায়দামাফিক চালচলন অনেকক্ষণ বরদাস্ত করেছিলাম কাল—করে চলতেই হয়। কিন্তু কতক্ষণ আর চালান যায় তেমন করে। দু-জনেই তাই এক ফাঁকে সরে পড়েছিলাম—যত্ন করে ছাঁটা সবুজ কচি কোমল ঘাসবিছানো লনের ওধারে, পাতাবাহারের ঝাড়ের ওপাশটায়। ওদিকে ছিল না লোকজনের ভীড়, গোলমাল।

শুক্ল পক্ষ। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটা তিথি ছিল বুঝি কাল। পাশের ইউক্যালিপটাসের সারিগুলি আর সেন সাহেবের বাড়ীর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের বাইরের ঘনবৃক্ষসমাবেশ; ভিতরের সাজান বাগানের স্নিগ্ধমধুর ফুলগন্ধ; বসন্তের অগ্রদূত, শীতাবসানের স্বল্পাশ্চরণ জাগান মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস—এ সবের উপরে নির্জ্জনে দুজনার সান্নিধ্য—কি রকম একটা আবেশমধুর মায়া যেন সৃষ্টি করেছিল।

তুমি অস্ফুটস্বরে বললে, "কি সুন্দর লাগছে চারদিক, যেন একটা রূপকথার রাজ্য।"

একটু থেমে আবার বললে তুমি, "রূপকথা পড়তে আমার কত ভাল লাগে। রূপকথা, পরীদের গল্প—এই সব। সত্যি; ভারী ভাল লাগে আমার।"

আমি কোন জবাব দিইনি, হেসেছিলাম একটু।

তুমি এবার একটু আদুরে, একটু আবদেরে, একটু অভিমানী অনুযোগভরা কণ্ঠে বললে, "আজকাল কেউ আর রূপকথা লিখতে চায় না। পরীর গল্পও নয়। কেন যে লেখে না, বুঝি না আমি। আমার ক-অ-ত্তো ভাল লাগে যে—" ডাগর চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকালে তুমি এবার।

চোখে বুঝি কাজল দিয়েছিলে—তোমার চোখের মোহিনী শক্তি অনুপেক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

"আচ্ছা, আপনি লেখেন না কেন রূপকথা? অন্ততঃ একটা পরীর গল্প?"

"আমি যে রিয়ালিষ্ট লেখক।" অল্প হাসির সঙ্গে বললাম।

"ইস্—রিয়ালিষ্ট। বস্তির মত নোংরামির বর্ণনা ছাড়া বুঝি আর রিয়ালিজম্ হয় না? জীবনে কি আর কিছু নেই?"

নৃত্যচঞ্চল তোমার নয়নতারা।

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কি আছে বলুন?"

"আর কি আছে? আর কিছুর সন্ধান পান না জীবনে?" তোমার চোখে যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল, "আচ্ছা—আজকের এই সময়টুকু——ঠিক এই মুহূর্ত্তটুকু, এই চারপাশের দৃশ্যগুলি এই যে আমরা এখানে রয়েছি দু-জনে, এই আকাশ, ঐ চাঁদ, ফুল-গন্ধবাহী বাতাস, এ সবের মাঝে কিছুই পান না আপনি? এ সবের কোন সত্য অর্থ নেই বলেন?···আমার তো রূপকথার মত সুন্দর লাগছে। অথচ এ সবের একটিও তো মিথ্যে নয়।"

উচ্ছ্বাসময়ী তরুণী নারীর যৌবন-চাঞ্চল্য। আমি বললাম না কিছু। স্মিত হাসির সঙ্গে তোমার ওভারকোটটা—সেটা আমার হাতেই ছিল, তুলে ধরলাম। বললাম, "আচ্ছা—এবার এটা গায়ে দিয়ে নাও দেখি—এখনও ঠাণ্ডা যায় নি।"

হঠাৎ 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলে বই কি তুমি। তুমি কোন কথা বললে না—আমি তোমার দেহে ওভারকোটটা সযত্নে অতি ধীরে ধীরে চড়িয়ে দিতে লাগলাম।

বাঁ হাতটা হাতার মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে তুমি বললে—আবার—খানিকটা তরল চপল কণ্ঠস্বরে—"লিখবে একটা রূপকথা, একটা পরীর গল্প? বল না? অন্ততঃ আমার খাতিরেও লিখবে একটা?" সপ্রশ্ন দৃষ্টি তোমার স্বপ্নালু।

আমার মুখে কথা নেই।

শাড়ীর আঁচলটা তোমার সরে গিয়েছিল খানিকটা বুক থেকে। অতুলনীয় দেহের রহস্যমধুর গোপনতা সৃষ্টিকারী তোমার স্বচ্ছ ব্লাউজের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছিল তোমার অন্তর্বাসের মদিরতাময় অস্পষ্ট আভাস। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল—ক্ষণিকের জন্য মাত্র—সুন্দর, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, এমব্রয়ডারী করা চারটে ফুলের অপূর্ব্ব সুন্দর নক্সা তোমার ব্লাউজে।

পরীর গল্প শুনতে চাও, প্রচুর ঐশ্বর্য্যে লালিতাপালিতা হে ধনী কন্যা! শুনতে চাও রূপকথা?

তোমার ব্লাউজের এমব্রয়ডারী করা ঐ চারটে ফুল দেখে মনে পড়ে গেল একটা রূপকথা আমার।

হ্যাঁ, পরীর গল্প! ঐ এমব্রয়ডারীর ফুল কটি তার সঙ্গে জড়িত। শুনবে তুমি?

গল্পটির আরম্ভ কিন্তু অতি সাধারণ। কর্ম্মচঞ্চল, কোলাহল-মুখর শহর থেকে বহু দূরের কোন এক ছায়াশীতল পল্লীগ্রামের মাঠে ঘাটে বাটে, প্রকৃতির ক্রীড়াঙ্গনে বর্দ্ধিতা একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে গল্পের সুরু। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সে।

পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ ছিল তার যথেষ্ট। তোমাদের মত মেট্রো-ফিরপো-গার্ডেনপার্টি-চারিণী কায়দাদুরস্ত শিক্ষিতা মেয়ে সে ছিল না বটে, কিন্তু তবুও তার ছিল শিল্পী প্রাণ, সুন্দরের আরাধনা করবার অদম্য স্পৃহা!

শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছ—নয় কি?

ভারী সুন্দর কাঁথা সেলাই করতে পারত সে, সুন্দর নক্সাকাটা কাঁথা, ফুল-লতা-পাতা, এই সব কত কি।

কৃপামিশ্রিত হাসি হাসছ বুঝি? তা কি করবে বল? গরীব গ্রাম্য মেয়ে সে, বহুমূল্য, অতি সূক্ষ্ম মলমল কিনে তাতে রং-বেরঙের দামী রেশমী সুতোর কাজ ক'রে প্রিয়তমকে উপহার দেবার তার সামর্থ্য কোথায় তোমাদের মত? পুরানো কাপড় শাড়ীর রঙীন পাড়ের সুতো তুলে তুলে সে তারই সাহায্যে নিজের শিল্পসাধনার পরিচয় দিয়ে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করত। গ্রামের মধ্যে নাম ছিল তার খুব এইজন্য। এই ধরণের কাজ অনেকেই তাকে দিয়ে করিয়ে নিত; সেও ভালবেসে করত।

ঘটনাক্রমে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল এক শহরবাসীর সঙ্গে, বৌবাজারের কোন এক বড় দোকানে হিসেব লেখার কাজ করত বুঝি তার স্বামী। মাইনে অল্পই।

বিয়ের পরে মেয়েটি জীবনে প্রথম রেলগাড়ি চাপল। প্রথম শহর দেখল। যে-সে শহর নয় আবার একেবারে সবচেয়ে সেরা শহর—তোমাদের কলকাতা!

মেয়েটির কষ্ট হতে লাগল খুব। তুমি শহুরে মেয়ে—খোলা-মেলা জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত, পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সে বন্দিজীবনের দুঃখ কি তুমি ঠিক বুঝতে পারবে? তোমরা তো তোমাদের রবিঠাকুরের কবিতা পড়েই গ্রাম্য বধূর উদ্দেশ্যে আহা-উহু কর আর অশ্রুবিগলিত হও! ঠিক কি রকম লাগে তা কি আর ধারণা করতে পার?

কালক্রমে হয়ত মেয়েটির সে অসুবিধা সয়ে যেত, স্বামীকে পেয়ে হয়ত সুখী জীবন যাপন করতে পারত সে, কিন্তু···

অল্প দিন পরেই তার স্বামী পড়ল অসুখে। অসুখের সূত্রপাত হয়েছিল বোধ হয় বহু পূর্ব্বেই। যা হয়ে থাকে সাধারণতঃ স্বল্প উপার্জ্জনকারী অস্বাস্থ্যকর স্থানের বাসিন্দা, অপ্রচুর অনুপযুক্ত আহার্য্যপ্রাপ্ত কর্ম্মজীবীদের—ঘুসঘুসে জ্বর আর কাসি! শেষে অল্প অল্প রক্তের ছিটা সেই সঙ্গে!

প্রথম প্রথম অসুস্থ শরীর নিয়েই সে কাজে যেত। কামাই হ'ত প্রায়ই তবু; মাইনে কাটা যেতে লাগল; আয় কমে গেল, তবু সে কাজে যেতে ছাড়ে না।

মেয়েটি শঙ্কিতা হয়ে উঠল। কিই বা বয়স তার, কিই বা অভিজ্ঞতা—নাগরিক জীবনের সঙ্গে কিই বা পরিচয় তার। বেচারী অহরহ মানসিক অশান্তিউদ্বেগজনিত নিদারুণ যাতনা ভোগ করতে লাগল। টাকা চাই—টাকা। স্বামীর আয় কমে যাচ্ছে—হয়ত শেষে একেবারেই চাকরি থাকবে না। যা কামাই হচ্ছে আজকাল—মনিবের ত খিটিমিটি লেগেই আছে। টাকা চাই—সংসারযাত্রানির্ব্বাহের জন্য। স্বামীর চিকিৎসার জন্য, ঔষধপথ্য আহার্য্যের জন্য টাকা চাই—টাকা।

কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? মেয়েটি অস্থির হয়ে উঠতে লাগল।

শেষে একদিন একটা সুবিধা হয়ে গেল। প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীরা মেয়েটির সূচিশিল্পদক্ষতার কথা জানত। তারা জানত মেয়েটির সাংসারিক অবস্থা—ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ওরকমটা স্বভাবতঃই হয়ে থাকে। তারাই কেউ কেউ বুদ্ধি দিল ওর শিল্পক্ষমতাকে কাজে লাগাতে। তারাই আবার নানা রকম সাহায্য করে সুবিধা করে দিল তার! প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এনে দিল কেউ; কেউ বা মেয়েটির হাতের তৈরি কাজ বিক্রী করে দিতে রাজী হ'ল।

আশ্চর্য্য হচ্ছ তুমি—নয়? আন্তরিকতার ওরকম অযাচিত আদান-প্রদান কিন্তু সত্যি সত্যিই হয় ঐ শ্রেণীর লোকদের মাঝে।* আরও আশ্চর্য্যের কথা বলে মনে হবে হয়ত, তোমরা যখন শুনবে

এই রকম করে ক্রমে ক্রমে কিন্তু মেয়েটির বেশ অর্থোপার্জ্জন হতে লাগল। নিজস্ব স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল মেয়েটির সে কথা ত আগেই বলেছি। তা ছাড়া ভাল সরঞ্জাম উপকরণ পেয়ে, সৃষ্ট জিনিষের বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন করতে পারার উৎসাহে, তার শিল্পক্ষমতা আরও উন্নত, মার্জ্জিত সুন্দর শিল্পসম্মত হয়ে উঠতে লাগল। অনেক খেটেখুটে নানান জায়গা থেকে সে নানারকম সেলাই, বোনা, এমব্রয়ডারী শিখে আসত। তার হাতের কাজের চাহিদা আর মর্য্যাদা বেড়ে যেতে লাগল। তার হাত এক দিনের জন্যও ফাঁকা থাকতে পারে না আর। বরং অনেক সেলাইয়ের কাজ জমা হয়ে পড়ে থাকে। মেয়েটির হাতেরও বিরাম নেই সারাদিন।

কিন্তু এদিকে তার স্বামীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। অসুখ বেড়ে চলল তার। দিনের পর দিন একাদিক্রমে বেচারা শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হ'ল। কাজে যেতে অপারগ হয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ভাবে আয় কমে যেতে লাগল তার।

মেয়েটি উদ্বিগ্ন শঙ্কাকুল নেত্রে তাকায় তার স্বামীর দিকে; উদ্গত অশ্রু চেপে রেখে হাতের কাজে আরও বেশী মনঃসংযোগ করে; রাত্রি জেগে কাজ করে। এইভাবে কোন রকমে স্বামীর ক্ষীয়মান উপার্জ্জন নিজে পুষিয়ে নিতে লাগল।

তুমি বোধ হয় এতক্ষণে নিতান্তই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছ। ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবছ বোধ হয়—বা রে, এর মধ্যে আবার পরী কোথায়? রূপকথার নাম করে কি সব আজেবাজে বকছে দেখ। কিন্তু আর বেশী দেরি নেই। স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়ান, মধুর চাঁদিমায় নেচে বেড়ান তোমার পরী, আর তোমার কল্পনামাথান স্বপ্নছড়ান মায়াজড়ান রূপকথার দেশ এই এল বলে সব—বেশী দেরি নেই আর।

সে কথা থাক এখন।···

···এদিকে মেয়েটির স্বামী শেষ পর্য্যন্ত পুরোপুরি শয্যাগত হয়ে পড়ল। চাকরিও গেল তার।

মেয়েটি পড়ল একা। সেই অনভিজ্ঞা, অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়েটি এবার একা শুরু করল যুদ্ধ তোমাদের শহুরে সভ্যতার বিরুদ্ধে। বিরামহীন চলল তার কাজ।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য কি জান? যা তোমার রূপকথাতেই ঘটা সম্ভব সেই রকম এক আশ্চর্য্য ঘটনা। মেয়েটির স্বামী কায়েমী ভাবে শয্যাগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মতলাষ্ট্রীটের যে বনেদী বড় পোষাক-পরিচ্ছদবিক্রেতা ও নির্ম্মাতা দোকানটিকে তুমি এত কৃপা কর, তোমার সাজসজ্জার যাবতীয় চাহিদা মেটাবার জন্য যে প্রকাণ্ড দোকানটি সর্ব্বদা উন্মুখ, তৎপর হয়ে থাকে, সেই দোকানটিরই এক কর্ম্মচারী এই মেয়েটির কাছে হাজির হ'ল সেলাইয়ের অর্ডার নিয়ে। দৈবাৎ কি ভাবে বুঝি মেয়েটির হাতের কাজ কর্ম্মচারীটির চোখে পড়ে গিয়েছিল। ঐ রকম বড় বড় দোকানে তোমার মত অনেক আতুরে ধনীর দুহিতা নিজেদের খেয়ালমাফিক যে-সব বিশেষ রকম সূক্ষ্ম জিনিষের চাহিদা উপস্থিত করেন, সে-সব মেটাতে সমর্থ, সূচীশিল্পে পারদর্শী কর্ম্মীর নিরন্তর প্রয়োজন হয়। দোকানের এজেন্টরা খুঁজে-পেতে ঐ রকম শিল্পী কর্ম্মীর সন্ধান আনে, তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়; বিনিময়ে তাদের যা দেয়, তার চেয়ে তোমার মত জামাকাপড়ের পিছনে অজস্র অর্থব্যয়কারিণী ধনীকন্যাদের কাছ থেকে বহুগুণ বেশী অর্থ তারা নিজেরা লাভ করে। বুঝলে হে চিত্তবিমোহিনী প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী কুমারী! তোমার নানাবিধ চিত্তচমৎকারী সাজপোষাকের জন্য তুমি খুশীমনে অকাতরে যত টাকা ঐ দোকানে অকুণ্ঠিত হস্তে বিলিয়ে দাও, তার শতাংশের এক ভাগও বোধ হয় তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছয় না, যারা রাত জেগে, টিম্‌টিমে বাতির স্বল্প আলোতে, সাবধানে খেটে খেটে, বহু পরিশ্রমে, উপযুক্ত আহারাভাবে জীর্ণ হয়ে, নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে তোমার সাজ-পোষাকগুলিকে অপূর্ব্ব সুন্দর, শোভন করে তোলে! তুমি বোধ হয় স্বপ্নেও কল্পনা কর না যে, গত এক বছরেরও বেশী সময় তুমি যে-সব মহার্ঘ, সূক্ষ্মকারুকার্য্যময় পোষাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে তোমার অতুলনীয় দেহসৌষ্ঠব আরও শতগুণে সুষমামণ্ডিত করে পার্টিতে, সভাতে, আসরে, নানা জায়গায় আমার মত কত-শত যুবকের চিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছ, কত মধ্যবয়স্কের মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিয়েছ, কত প্রৌঢ়বয়স্কের মনে অনুরাগসঞ্চার করেছ, সেই সব বেশবাসের সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারী যা মেশিনে হয় না, তার বেশীর ভাগই করেছে ঐ মেয়েটি, গভীর বিনিদ্র রজনীতে, স্বল্প প্রদীপালোকে, রুগ্ন স্বামীর শিয়রে বসে বসে! দোকান থেকে ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে তোমার পোষাক এসে না পৌঁছলে হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে যায়, একদিন বা একবেলা দেরি হয়ে পড়লেই অনুযোগ অভিযোগের আর লেখাজোকা থাকে না; দোকানের মালিক স্বয়ং ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, বারবার ক্ষমা-প্রার্থনা করেও হয়ত তোমার বিরক্তির অপনোদন করতে পারেন না, ভবিষ্যতে আর কখনও এরকম হবে না বারবার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিশ্চিন্ত বোধ করেন না। কিন্তু তুমি কি কদাচ কল্পনা করতে পার ওহে সুন্দরী, ঐ রকম বিলম্ব ঘটবার প্রকৃত কারণ? মাঝে মাঝে মেয়েটির স্বামীর হয়ত অসুখ বেড়ে ওঠে, তার পরিচর্য্যাতেই সময় কেটে যায় মেয়েটি সময় পায় না সেলাই-এ হাত দেবার; হয়ত বা মাঝে মাঝে অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ তার নিজেরই শরীর ভেঙে পড়ার দরুণ কাজে ব্যাঘাত ঘটত কি না কে জানে। এ কথাগুলি কি রূপকথার চেয়েও কম আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে তোমার?

আর মাঝে মাঝে ওরকম একটু দেরিতে তোমার আর ক্ষতি হয়েছে কতটুকু? হয়ত বা কোন পার্টিতে পৌঁছতে আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে অথবা হয়ত যে জামাটা তুমি জীবনে দুই দুই বার পরেছ, সেটা আবার তৃতীয় বার পরতে হয়েছে (অবশ্য একটা জামা জীবনে তিন তিন বার পরা একটা নিদারুণ ঘটনা সন্দেহ নেই), কিন্তু ঐ বিলম্বের জন্য মেয়েটিকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে তা কি তুমি জান? তোমার পোষাকনির্ম্মাতা দোকানের কর্ম্মচারীর কাছে কি কম কু-কথা শুনতে হয়েছে মেয়েটিকে? চুক্তি-অনুযায়ী সময়মত কাজ শেষ করে দিতে না পারায় উচিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে কত সময়।

নাঃ, তুমি এবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। তোমার পরী কোথায়? তোমার রূপকথা?

কালকে রাত্রে, ব্যারিষ্টার সেনের বাড়ীতে, যে ব্লাউজটি দ্বারা তোমার লোভনীয় তনুকে আবৃত করেছিলে, হঠাৎ ঐটির অর্ডার

তুমি দিয়েছিলে, বিশেষ করে এই পার্টির জন্যই। সময় ছিল অল্পই; বারবার করে তুমি বলে দিয়েছিলে যেন সময়মত পাওয়া যায় ব্লাউজটি, আর্জেণ্ট কাজ বলে অগ্রিম ডবল মজুরী দিয়েছিলে, তুমি বলেছিলে যেন দুটি ফুল এমব্রয়ডারী করে দেওয়া হয়, অতি সূক্ষ্ম কাজ হওয়া চাই কিন্তু, এই ছিল তোমার ইচ্ছা, আদেশ, অনুরোধ।

কিন্তু তুমি ত জান না, তোমার অর্ডার মেয়েটির হাতে গিয়ে পড়বার ঠিক পরেই তার স্বামীর অসুখ আবার সাময়িকভাবে বেড়ে গেল। মেয়েটির মনের অবস্থা কি করে বোঝাই তোমায়, দোকানের কর্ম্মচারী বারবার করে অর্ডারটির গুরুত্বসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে মেয়েটিকে সচেতন করে দিয়ে গিয়েছিল। সময়ও ছিল বড় অল্প, এদিকে এই অবস্থা।

পার্টির দিন সকালবেলা ব্লাউজটি তোমাকে দেবার কথা ছিল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা দোকানের কর্ম্মচারী গেল মেয়েটির কাছে এমব্রয়ডারী করা শেষ হয়েছে কি না খোঁজ নিতে।

মেয়েটি তখন পর্য্যন্ত তাতে হাতই দিতে পারে নি।

কি করে পারবে? স্বামীকে নিয়েই সে ছিল ব্যস্ত অহর্নিশি। এই সবেমাত্র স্বামীর অবস্থা একটু ভাল হয়েছে। এইবার সে কাজে হাত লাগাবে ভাবছিল।

দোকানের কর্ম্মচারীকে সে কিন্তু এসব কিছুই বলল না। বলল কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অল্প একটু বাকী আছে মাত্র। পরদিন ভোরেই এসে নিয়ে যায় যেন।

কর্ম্মচারীটি চলে গেল বটে, কিন্তু বারবার করে আবার জানিয়ে দিয়ে গেল যে ভোরবেলাই ব্লাউজটা চাই অতি অবশ্য; খুব ভোরেই সে আসবে নিয়ে যেতে।...

লোকটা চলে যাবার পর মেয়েটি বসল সেলাই নিয়ে। সুরু করল কাজ।

কিন্তু এবার সে আর পারছে না; ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, রোগীর সেবা, রাত্রিজাগরণ, আশঙ্কা, উদ্বেগ, সব মিলিয়ে তাকে জীর্ণ করে ফেলছিল, গভীর অবসাদে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল সে।

আজকে তার চোখে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে কাজ করবার সময়। কয়েক মাস থেকেই তার চোখের ব্যারাম দেখা দিয়েছে। রাত জেগে অল্প আলোতে সূক্ষ্ম কাজ করার ফল আর কি—শারীরিক দুর্ব্বলতা ত' সেই সঙ্গে আছেই। চোখ দিয়ে জল পড়ে, যন্ত্রণা হয়, আজ যেন বেশী হচ্ছে মনে হয়।

মেয়েটির মাথার ভিতরটা কি রকম করছে যেন। শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আকুলভাবে সে প্রার্থনা জানাতে লাগল ভগবানের কাছে—শক্তি দাও, শক্তি দাও, হে ভগবান! অন্ততঃ আজকের রাতের মত কাজ করবার ক্ষমতাটুকু আমার কেড়ে নিও না প্রভু! এই কাজটা আজকের রাতের মধ্যে আমাকে শেষ করতে দাও ভগবান।

হঠাৎ মাথাটা তার খালি খালি হয়ে গেল। বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল বুঝি মেয়েটি! হাত পা বোধ হয় অসাড় হয়ে গেল তার। শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে কিন্তু সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

এ কি? সেলাইয়ের কাজ তার দ্রুত হয়ে চলেছে! কি করে হচ্ছে এটা? আপনাআপনি? নাকি তার আঙ্গুলেরই কাজ হয়ে চলেছে? সে নিজে ত কিছুই অনুভব করতে পারছে না। হাত পা আঙুল, সমস্ত দেহ তার অসাড় হয়ে গেছে যেন।

তবু কাজ এগিয়ে চলেছে। দ্রুতবেগে—অতিদ্রুত! এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? মেয়েটি জ্ঞানহারা হয়ে পড়ল!...

কাজ এগিয়ে চলেছে।...

পরীর হাতের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী পরশমণির সন্ধান তুমি পেলে কি এবার—ওগো রূপৈশ্বর্য্যগরবিনি?...

...ভোর না হতেই দোকানের কর্ম্মচারী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে। দরজার কপাট ঠেলতেই খুলে গেল। দেখতে পেল মেয়েটি নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে—হাতের কাছেই ব্লাউজটি রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

কর্ম্মচারীটি তাড়াতাড়ি সেটি তুলে নিল শেষ হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে। তুলে ধরেই সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় সুন্দর! এ রকম কাজ এর আগে কোনদিনই কোনখানেই পাওয়া যায় নি। মুগ্ধনেত্রে কর্ম্মচারীটি দেখতে লাগল।

কিন্তু একি? এমব্রয়ডারীর ফুল করার কথা ছিল দুটি মাত্র এখানে যে চারটি করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় মেয়েটি ভুল করে দুটির জায়গায় চারটি করে ফেলেছে।

তা হোক—দুটির জায়গায় চারটি। জিনিসটা কিন্তু ভারী সুন্দর হয়েছে। বোধ করি এতে আরও সুন্দর হয়েছে।

সত্যিই তাই। ভুল করেই দুটির জায়গায় চারটি হয়ে গেছে। তাতে কিন্তু তুমি অখুশী হও নি মোটেই। এত সুন্দর কাজ দেখে বরং আরও আনন্দোৎফুল্ল হয়েছ।

দোকানের কর্ম্মচারী নিদ্রিতা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল। শ্রান্তির কালিমামাখা পাণ্ডুর মুখখানি দেখে মায়া হ'ল তার—ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছা করল না। ব্লাউজটির প্রাপ্তি-স্বীকার একটা লিখে, আর মেয়েটির প্রাপ্য যা মজুরী, একসঙ্গে রেখে দিল মেয়েটির কাছে এমন ভাবে যাতে ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেললেই সে দেখতে পায়।

কিন্তু হায় ঘুম ভাঙ্গলেও মেয়েটী তা দেখতে পারে না। দৃষ্টি-সম্পূর্ণ হারিয়েছে সে চিরতরে।

ধনীর দুলালী! তোমার রূপকথার লোকে কি ওই ঘটনার মত ঘটনা কল্পনায় আনতে পারে? পারে না!

কিন্তু তবু এটা সত্যি।

বাঙালীর ব্যায়াম-চর্চ্চা

শ্রীশান্তি পাল

যাঁহারা প্রাচীন লোকদিগের মুখে বাংলাদেশের সেকালের কথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই শুনিয়া থাকিবেন যে, সে যুগের তুলনায় এ যুগের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। সে যুগে পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা ও কুস্তির আখ্‌ড়া ছিল। লোকে দৌড়-ঝাঁপ, জোরে হাঁটা, সাঁতার কাটা, বাচ খেলা প্রভৃতি রীতিমত অনুশীলন করিত। কলিকাতার কথা ধরা যাক্। এক ছয়ের পল্লী ও তাহার উপকণ্ঠে কত লাঠি খেলা, কুস্তি ও ব্যায়াম-চর্চ্চার আখড়া ছিল তাহার অন্ত নাই। শহরের অলিতে-গলিতে কুস্তি ও লাঠি খেলার অনুশীলন হইত। অম্বিকা গুহ, অতীন বসু, হরিশ দাস (হরে জেলে), গোঁসাই পাত্র, কালী দত্ত (ল্যাংড়া কালী), সীতারাম দোবে, ভূতনাথ দে, হরিদাস বসু (বাঘা হরে), মাঝি, সাগর ভট্টাচার্য্য, জিতেন মিত্র, নীন সিং, জিষ্ণু ঘোষ (নেড়া) প্রভৃতি কুস্তিগীরদিগের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব কুস্তির আখড়া ছিল। সেই সকল আখড়ায় সকাল বিকাল নিয়মিত কুস্তির চর্চ্চা হইত। কোন কোন আখড়ায় লাঠিখেলারও অনুশীলন হইত।

তখনকার দিনে মল্লযুদ্ধ ব্যাপারে অম্বিকা গুহ মহাশয় একাধারে প্রচারক ও আচার্য্য ছিলেন। মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে তাঁহার বসতবাড়ীতে একটি বড়রকমের কুস্তির আখড়া ছিল। সেকালে অম্বুবাবুর নির্দ্দেশমত সকলেই নিজ নিজ আখড়ায় কুস্তির চর্চ্চা করিতেন। অম্বুবাবুর অনেক ছাত্র পালোয়ান বলিয়া খ্যাতিলাভও করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তুলসী পাঠক, গোঁসাই পাত্র, রামদাস পাত্র, ত্রৈলোক্য বসাক, অতীন বসু, কানাই সেন, নগেন দত্ত, বনমালী ঘোষ, রজনী দত্ত, যোগীন দত্ত, ক্ষেত্র গুহ, যতীন গুহ প্রভৃতি মল্লবীরদিগের খ্যাতি সমগ্র ভারতে, এমন কি ভারতের বাহিরে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ক্ষেত্র গুহের আখড়াটি মোহনবাগানে অবস্থিত ছিল। যতীন গুহের আখড়া ছিল বিডন রো-তে। পঞ্জাবের বিখ্যাত মল্লবীরগণ এখানে প্রায়ই আনাগোনা করিতেন। যতীন গুহ ও বনমালী ঘোষ ইউরোপ এবং আমেরিকার নামজাদা কুস্তিগীরদিগকে পরাজিত করিয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই আখড়ার ছাত্রদের মধ্যে ঋষি ঘোষ, প্রকাশ ঘোষ, নগেন ঘোষ, মাণিক গুহ, রতন গুহ প্রভৃতি কুস্তিবিদ্যায় যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করেন। দেখা যায় যে এক সময় বাংলাদেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সকলেরই মধ্যে কোন না কোন প্রকার ব্যায়ামের প্রতি আসক্তি ছিল। এখানে পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"১৩ আগষ্ট ১৮২৫।৩০ শ্রাবণ ১২৩২। কুস্তি লড়াই"—বর্ত্তমান মাসে নবম দশম দিবসে বৈকালে মোং বর্দ্ধপুরের শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ জমিদারের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালী তাঁহারা দুই ২ জন এক ১ বার মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায়। যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্তি হয়। এই কুস্তি দর্শনে হুষ্টমনে ঐ স্থানে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব লোকেরা ও আর আর ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে জমিদার মহাশয় সকলের উত্তমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন।"

"৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬।১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩। নবীন কুস্তিগীর"—"শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। বিহিত বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৬ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালি নামক গ্রামে অভিনব জনৈক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চটোপাধ্যায় নামক যাঁহার ভোজনের বৃত্তান্ত ইহার পূর্ব্বে শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র প্রভৃতিতে উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ঐ কুস্তিগীর বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিস্তর বর্ণন বাহুল্য যে হউক কিন্তু এতদ্রূপ বলবান ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ এ-সকল বিদ্যাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্মদাদির বোধ হয় যে এতৎ প্রদেশস্থ অতি বিখ্যাত রাধা-গোয়ালা ও তাহার পুত্রদ্বয় এবং আর আর বিলক্ষণ বলবান ও যাঁহারা এমত কুস্তিগীর কার্য্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তিদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং যে সকল কর্ম্ম বিষয়ে তাহা তিনি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছেন এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অথবা এতদ্বিষয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা রাখেন তবে তিনি ঐ নবীন কুস্তিগীর চটোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্য তাবত্ জ্ঞাতাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহানগরস্থ ভাবদৈশ্বর্য্যশালী মহাশয়-দিগের অস্মদাদির বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই যে কোন মহাশয় স্বীয় ২ বহির্দ্বারে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিদিগকে দ্বারপালস্থ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চটোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বালিগ্রামের দক্ষিণ পল্লীস্থ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লিপি প্রেরণ করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বার্ত্তা দর্পণে অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—কস্যচিৎ বালি নিবাসী দ্বিজাদিসমূহ সজ্জন গণনাং।"*

কুস্তি ও লাঠিখেলা ছাড়া সে সময়ে জিমনাষ্টিকের অনুশীলনও কম ছিল না। যোগীনচন্দ্র পাল, নবগোপাল মিত্র, বেণীমাধব ঘোষ, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল বসু, প্রিয়-লাল বসু, রাধিকা রায়, ভোলানাথ মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বসাক, নারাণচন্দ্র বসাক, রাখালদাস প্রামাণিক, গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২১২-১৩।

নিজ নিজ আখড়ায় বাঙালীর ছেলেমেয়েদের রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। অনেক বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ সে সময় সার্কাস পার্টিতে যোগদান করিয়া দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সত্যবিজয় সাহা, বিপিন ঘোষ, রমণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বসাক হরাইজণ্টাল বারের খেলায় অভূতপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঘোড়ার উপর খেলায় হরিদাস পাল, মন্মথনাথ দে ও ফণীন্দ্রনাথের জুড়ি সেকালে ছিল না। ব্যাঘ্রক্রীড়া বীর বাদলচাঁদের ও শ্যামাকান্তের কথা বোধ হয় অনেকেই এখনও বিস্মৃত হন নাই। বাদলচাঁদ একা দুই তিনটি বড় বাঘ লইয়া খেলা দেখাইতেন। খেলা দেখাইতে দেখাইতে কখনও সেই বাঘের মুখের মধ্যে নিজের মাথা পুরিয়া দিয়া দর্শকদের মনে ভীতিমিশ্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেন। সার্কাসের পার্টিতে যোগদানকারিণী বাঙালী মেয়েদের মধ্যেও আমরা যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় পাই। সুশীলাসুন্দরী ও মৃন্ময়ীসুন্দরী সার্কাসের হাতীর পিঠে বাঘ তুলিয়া দিয়া তাহার উপর নানারূপ ক্রীড়াকৌশল দেখাইতেন এবং খেলার শেষে জগদ্ধাত্রী রূপে বাঘের পিঠে বসিয়া গান গাহিতেন। সেই গানগুলি মতিলাল বসু মহাশয়ের রচনা। তাহার কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"বিধির বিধান, বাঙালীর সন্তান
হতমান প্রাণ আজি ভুবনে
তাঁহার দয়াতে সে দশা ঘুচাতে
এ লীলা দেখাতে ব্রত জীবনে।
যারা আজীবন—যুঝে আমরণ
হইল মিলন ব্যাঘ্র-বারণে।
দেখ তাহা ভুল জগতে অতুল
বিরচে শার্দ্দুল-বন্ধু বন্ধনে।
কাঁদায়ে কল্পনা, গঞ্জে বাধাসনা
বঙ্গ বীরাঙ্গনা বরে মরণে।
যাতনা রবে না পুরিবে বাসনা
উদ্যম সাধনা দমে শমনে।"

মৃন্ময়ীসুন্দরী যে কেবল বাঘ লইয়া খেলা দেখাইতেন তাহা নহে, তিনি যুগল অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। কুমুদিনী ও রাজলক্ষ্মী দোদুল্যমান ট্রাপিজের উপর নানারূপ খেলা প্রদর্শন করিয়া দর্শকদের মুগ্ধ করিতেন। প্রমীলাসুন্দরী বুকের উপর একখণ্ড ভারী পাথর চাপাইয়া তাহার উপর হাতী তুলিতেন। মৃন্ময়ীসুন্দরী যে সময় খেলা দেখাইতেন সে সময় এই গানখানি গীত হইত—

"উদিল আনন্দ রবি মেঘমুক্ত অম্বরে
ঘুচিল বিষাদ ছবি যুক্ত বঙ্গ অন্তরে।
পেয়েছ অনেক দুঃখ পেতে পার কিছু সুখ
যদি দেখ তুলে মুখ তলাইয়া ভিতরে।
ধাইছে তুরঙ্গ দ্রুত নাচিছে বিহঙ্গ মত
চকিছে চপলা কত যেন চক্র চত্বরে।
বঙ্গবীর অনুপন্নি সঙ্গে করি বঙ্গনারী
যে রঙ্গ করিছে হেরি অঙ্গ উঠে শিহরে
বঙ্গ ভ্রাতৃ সঙ্গে নারী শান্তিভঙ্গ গুঞ্জরে।"

মতিলাল বাবুর আর একখানি গান সমস্ত খেলার উপসংহারে গীত হইত। গানখানি এই—

"দেশের সন্তান হতে বাড়ে যদি কিছু মান
সহায় হইয়া সবে উৎসাহ করগো দান।
তমসা হৃদয়ে জোছনা ফুটায়ে
নিরাশা নাশিয়ে দুরাশা ছুটায়ে
লুটায়ে দিতেছে প্রাণ।
প্রাণ আহুতি দিয়ে দেশ উন্নতি সাধে
বাঙ্গালীর মেয়ে অশ্বারোহী কাঁধে
ছেলে কাঁধে বীর চলিছে অবাধে
তারের উপর দুচাকার যান।
গরজে বিকট মটর শকট
চাহিছে ছুটিতে করিয়ে দাপট
রোধে তাহে ভীম না ক'র কপট
ভীম বলে বলীয়ান্।"*

সে সময় কলিকাতায় বিশেষ করিয়া এক ও দুয়ের পল্লীতে ব্যাপকভাবে ব্যায়ামের অনুশীলন হইত। অন্যান্য পল্লীতে যে হইত না এমন নহে, সিমলা, শুঁড়িপাড়া, দর্জ্জিপাড়া, চোরবাগান, নেবুতলা, বেনেটোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজার অঞ্চলেও ব্যায়াম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যুগের বাঙালী দেহানুশীলনে এতদূর অবহিত ছিল যে অভিজাত পরিবারের ছেলেরাও নিয়মিতভাবে ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন। এমন কি নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) এবং রবীন্দ্রনাথও যে ছোটবেলায় গায়ে মাটি মাখিয়া রীতিমত কুস্তি লড়িতেন তাহা অনেকেরই জানা আছে। সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড কুস্তির আখড়া ছিল। এই সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি "অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্তে" (পৃ. ১২১) লিখিয়াছেন :

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শারীরিক নিয়মাদির বিষয় প্রচারিত হইবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ বাটিতেও অঙ্গ চালনার এক প্রকার প্রণালী আরব্ধ হয়। তথায় দেবেন্দ্রবাবু, অক্ষয়বাবু, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন।"

বাটীর যে অংশে আখড়াটি ছিল সেই অংশটিকে সকলে গোলাবাড়ী বলিতেন। সেই আখড়ায় বাটীর প্রায় সকল ছেলেই ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন। এই ব্যায়ামচর্চ্চার রেওয়াজ রবীন্দ্রনাথের কিশোরকাল পর্য্যন্ত ছিল। কবি কৈশোরে পেশাদার পালোয়ানদের কাছে নিয়মিত কুস্তি শিক্ষা করিতেন। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওস্তাদ কুস্তিগীর ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের গৃহেও সেকালে ব্যায়াম চর্চ্চা হইত। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ পাড়ার ছেলেরা প্রাতিদিন সকালে অম্বিকাবাবুর আখড়ায় গিয়া নিয়মিত

---

* স্বর্গত মতিলাল বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত স্নেহলাল বসুর সৌজন্যে এই গান তিনখানি প্রাপ্ত।

কুস্তির চর্চা করিতেন এবং বৈকালে লেখকের পিতৃদেব সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের নিকট লাঠিখেলা ও সাঁতারের তালিম লইতেন। আমাদের গৃহসংলগ্ন পুষ্করিণীতে পল্লীর প্রায় সকল ছেলেই সাঁতার কাটিতেন। আমাদের আত্মীয় যোগীন পাল ছিলেন লাঠিখেলায় ওস্তাদ। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকগণ তাঁহার নিকটও লাঠিখেলা শিখিতেন।

যোগীন পালের পরবর্ত্তীকালে হুগলীর কাঞ্চন সর্দ্দারের সুযোগ্য শিষ্য অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বড়-লাঠিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পুলিন দাস, শৈলেন মিত্র, অমর বসু প্রমুখ লাঠিয়ালের নাম বাংলাদেশে কাহারও অবিদিত নাই। ইঁহারাও বড়-লাঠির রং, ছুট, মার ও হারোয়া খেলায় সিদ্ধহস্ত। হায়দ্রাবাদের সৈয়দ মার্ত্তাজের শিষ্য নিত্যানন্দ গোস্বামী, যদু-গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লাঠিয়ালেরা ছোট-লাঠিতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। সরলা দেবী প্রবর্ত্তিত বীরাষ্টমীর উৎসব-অনুষ্ঠানে লাঠিখেলার বিশেষ আয়োজন হইত। সে সময় সৈয়দ মার্ত্তাজ বালীগঞ্জের আখড়ার ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। ঐ আখড়ার ছাত্রেরা তলোয়ার ও ছুরি খেলিতেন। যোগীন বাবুর জিমনাষ্টিকের আখড়ায় লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, অসি-চালনা প্রভৃতির নিয়মিত চর্চা হইত। ঐ আখড়াটি বর্ত্তমানে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের যেখানে শ্রীমানী বাজার অবস্থিত, সেইখানে ছিল। আহিরীটোলায় শ্যামাকান্ত বাবুর কোন আখড়া ছিল না। তিনি কলিকাতায় আসিলেই সাধারণতঃ মহৎ আশ্রমে উঠিতেন এবং তাঁহার ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টির সাজসরঞ্জামগুলি পান্তির মাঠে—বর্ত্তমানে যে স্থলে বিদ্যাসাগর কলেজের হোষ্টেল রহিয়াছে—রাখিতেন। মহৎ আশ্রমে থাকাকালীন শ্যামাকান্ত বাবু এই অঞ্চলের ছেলেদের ব্যায়াম সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেন।

বাঙালীর সার্কাস সম্বন্ধে যোগীন পালের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি এবং স্বনামধন্য নবগোপাল মিত্র মহাশয়ই বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত শরীর-চর্চা প্রবর্ত্তন করেন। যোগীনবাবু নীরব কর্ম্মী ছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্ম্মিষ্ঠতার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ পায় নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তিনি সর্ব্বপ্রথম সার্কাস পার্টির সৃষ্টি করেন। যোগীনবাবুর গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস সে সময় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরবর্ত্তীকালে মতি বসু, প্রিয় বসু, অতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যায়ামবিশারদেরা অনেক বাঙালীর মেয়েকে স্বাস্থ্য-চর্চায় সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই সকল মেয়ে ট্রাপিজ ও তারের উপর কসরৎ, লম্ফ-ঝম্প, লাঠি ও ছুরিখেলা, অসিক্রীড়া, তীর ধনুক এমন কি বন্দুক ছোঁড়ায়ও সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অতীনবাবু এক সময় স্কুল-কলেজের মেয়েদের মধ্যে ঐ প্রকার ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার সেই সাধু সঙ্কল্প অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। সে কালে ব্যায়াম সম্বন্ধে দেশের মনীষীরা যে কিরূপ চিন্তা করিতেন তাহা হিন্দু মেলার নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানটির বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়:

"মহা ব্যায়াম প্রদর্শন—জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার উদ্যোক্তাদের একটি বিশেষ কার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চা প্রবর্ত্তন। জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে এইটি একান্ত আবশ্যক তাহা তখনকার শিক্ষিত সমাজ একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয় বিশেষভাবে উক্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া মেলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন।"১

জাতীয় বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যায়াম চর্চা ক্রমে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। ব্যায়ামবিদ্যা প্রবর্ত্তনে জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' (৭ই বৈশাখ ১২৮০) লেখেন—

"স্বদেশহিতৈষি সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়ই বঙ্গদেশে ব্যায়াম বিদ্যার প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই কয়েক বৎসর মধ্যে ইহা এতদূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছে যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজেরাও হিন্দু ছাত্রবৃন্দের অঙ্গচালনা কৌশল দর্শনে মহা মহা তুষ্ট হইয়াছেন। অধিক কি জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের একজন উত্তীর্ণ ছাত্র [শ্যামাচরণ ঘোষ] মেং ক্যাম্পবেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস শ্রেণীর ব্যায়াম শিক্ষকের পদলাভ করিয়াছে।"২

আর এক স্থলে আছে—"৪॥ টার সময় ব্যায়াম আরম্ভের কথা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণতা জন্য এক ঘণ্টা পরে হইল। লোকের জনতা বিস্তর হইয়াছিল। সাধারণতঃ ব্যায়ামের বৈচিত্র্য নব নব কৌশল আশাতীতরূপ অঙ্গচালনের পারিপাট্য, সুপ্রণালীবদ্ধ লম্ফ-ঝম্ফ, কুর্দ্দন, উত্থান, পতন, দণ্ডারোহণ, আবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন, ক্ষিপ্রতা, ধাবন প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া দর্শক মাত্রেই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। এবং পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ ও বাহ্ ধ্বনিতে রঙ্গভূমি নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"হুগলীর শিক্ষক শ্যামাচরণ ঘোষ সমুদয় ব্যায়ামের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু দীননাথ ঘোষ এবং সুযোগ্য ছাত্র যোগীন্দ্রনাথ পাল ও রাজেন্দ্রলাল সিংহ ইঁহারা সামান্য গুণপণা প্রদর্শন করেন নাই। শুঁড়িপাড়ার সুরথচন্দ্র দে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং বিপিনবিহারী মণ্ডলের কৌশল দর্শনে দর্শকগণ মহা সন্তুষ্ট হইয়াছিল।"৩

হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল বাবুর উদ্যমের সম্বন্ধে সেকালের সংবাদপত্রই সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙালী জাতি দৈহিক ব্যাপারে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীনতা অর্জ্জন বা রক্ষা করিতে গেলে জাতিকে সুস্থ, সবল হইতে হইবে। জাতিকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিবার জন্য ব্যায়ামচর্চার প্রয়োজন। তাই তিনি শত শত বাধা-বিঘ্ন ও সামাজিক সমস্যা উপেক্ষা করিয়া জাতির কল্যাণ-কামনায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমেলায় নানাবিধ বীরোচিত ব্যায়ামেরও প্রবর্ত্তন করেন। সে সময় মেলায় লাঠিখেলা, লাঠিতে ভর করিয়া লাফাইয়া উঠা বা পড়া, কুস্তি, এক কাঁধ হইতে অন্য কাঁধে ঢেঁকি লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘুরানো, ঢেঁকিতে কাপড় বাঁধিয়া তাহা

১,২,৩। জাতীয়তার নবমন্ত্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত।

দাঁত দিয়া ধরিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দূরে নিক্ষেপ করা, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়া ডিঙানো, বাচখেলা, ছুরিখেলা, তীর ছোঁড়া, বন্দুক ছোঁড়া, বল্লম ছোঁড়া প্রদর্শিত হইত। মেলার কর্তৃপক্ষের দোষ-ত্রুটি দেখিলে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কিরূপ তীব্র সমালোচনা করিতেন তাহার নমুনা কিঞ্চিৎ এ স্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। শরীর চর্চ্চা সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা বলিতেছেন,—

"আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। শারীরিক বল বীর্য্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ করুন। আমরা বোধ করি কৃষ্ণকামিনীর চারু কার্য্যের পারিপাট্যতার কথা শুনা অপেক্ষা অনেকে মেলায় ঘোড়দৌড়ে দুজন বিকলাঙ্গ হইয়াছে, লাঠিখেলায় একজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ছুঁড়াতে একজন মরিয়াছে শুনিয়া অসংখ্য গুণে সন্তুষ্ট হইতেন।"৪

আর এক স্থলে বলিতেছেন,—"আমরা যখন দেখিব হিন্দুমেলার সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি মল্লবেশধারী হিন্দু সন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাঙালীরা তেজস্বী অশ্বগণকে অবলীলাক্রমে ও অশেষ কৌশলে সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দু সন্তানগণ বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহপূর্ব্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পর প্রবৃত্ত হইতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে, কেহ আহত পদে, কেহবা আহত হস্তে, কেহবা আহত মস্তকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন ও তদুপলক্ষে পুলিশ আসিয়া নবগোপাল বাবুর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, সেইবার জানিব হিন্দুমেলার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।"৫

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তখনকার দিনে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে ভুলিতেন না। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ নেতারা নবগোপাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুলে ব্যায়ামশিক্ষা করিতেন। সেকালে দেশের জমিদারের ছেলেরাও পিছাইয়া ছিল না। ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা, দাঁড়-টানা, শিকার-শিক্ষা প্রভৃতি তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পার্শ্বনাথ সেন, জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (মনুবাবু) শিকারে অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। নড়ালের রাইচরণ রায় সম্পর্কে অমৃতবাজার বলিতেছেন—"রাইচরণ বাবু বাল্যকালাবধি ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া স্বহস্তে অন্যূন দেড়শত মনুষ্যহন্তা ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে তলোয়ার দিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাঘ্র বধ করিতেন।"৬ শ্যামাকান্ত বাবু বনের বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেন। তাঁহার বীরত্বের কাহিনী এখনও প্রাচীনদের মুখে শোনা যায়। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস এক সময় ব্রেজিলে সার্কাস পার্টিতে খেলা দেখাইতেন। তিনি একটি খাঁচায় আট-দশটি বাঘ ও সিংহের সহিত একা খেলিতেন। হরিদাস বাবু বনের বাঘের সহিত লড়াই করিয়া 'বাঘা হরে' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। শান্তিপুরের আশানন্দ ঢেঁকির কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। সেকালে লাঠিখেলায় তাঁহার জুড়ি ছিল না। চোর ডাকতেরা তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত। শোনা যায় যে এক সময়ে তিনি লাঠির অভাবে ঢেঁকি ঘুরাইয়া ডাকাতদের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। সেই সময় হইতে সকলেই তাঁহাকে আশানন্দ ঢেঁকি বলিয়া ডাকিতেন। আসলে ইনি ব্রাহ্মণ সন্তান। হুগলী জেলায় বালি গ্রামে রাস উৎসব উপলক্ষে শশী সর্দ্দারকে ঐরূপ ঢেঁকি ঘুরাইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি লাঠি দিয়া অনেক বন্য বরাহ মারিয়াছেন।

সেকালে নদীতীরবর্ত্তী পল্লীর ছেলেরা দাঁড়-টানা, হাল-ধরা ও সাঁতারের নিয়মিত চর্চ্চা রাখিতেন। গঙ্গার ধারে পল্লীর ছেলেমেয়েরা যে বহুকাল ধরিয়া সাঁতার ও বাচ খেলার চর্চ্চা করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতপ্রবর রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক স্থানে বলিতেছেন—"সন্তরণে কেহ নিমাই পণ্ডিতের সমকক্ষ ছিল না। তিনি অসাধারণ সন্তরণপটুতা প্রদর্শন করিতেন। গঙ্গায় তিনি··· বেগে সন্তরণ করিতেন,···এই রূপ বহুবার তিনি গঙ্গায় এক পার হইতে অপর পারে সাঁতার দিয়া যাইতেন। তাঁহার ন্যায় দ্রুত সন্তরণপটু আর কেহ ছিল না। তাঁহার মত দৌড়িতে কেহ পারিতেন না। সন্তরণে তিনি সকলকে পরাজিত করিতেন।"

মেয়েদের সাঁতার সম্পর্কে সমাচার দর্পণ বলিতেছেন—"স্ত্রীলোকের সাহস—কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছিল। তাহাতে ক্রীড়াচ্ছলে কুতূহলে সন্তরণ দ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল, ইহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।"

হিন্দুমেলার উদ্যোগে গঙ্গায় বাচ খেলা সম্পর্কে সোমপ্রকাশ বলিতেছেন :—"শনিবার মেলার উদ্যোগপর্ব্ব রবিবারই মেলার দিন। প্রাতঃকালে বাছ খেলা হইয়াছিল। কোন্নগর ও দক্ষিণেশ্বরের নৌকাই বাছ খেলায় এককালে গঙ্গার অপর পার হইতে চিৎপুরে কালী সিংহের ঘাটে উপস্থিত হয়। এই দুই নৌকাই পুরস্কার পাইবে স্থির হইল।"৭ হিন্দুমেলার সেই অনুপ্রেরণা আজিও ক্ষীণ হইয়া যায় নাই। বাঙালীর ছেলেরা নিজেদের দৈহিক শক্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যমে বিরত হন নাই। জাতীয় আন্দোলনও তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের কিছুকাল পরে কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরে নূতন উদ্যমে ব্যায়ামচর্চ্চা চলিতে থাকে। কলিকাতার অনুশীলন সমিতিতে প্রত্যহ তিন চার শত বাঙালীর ছেলে লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, তলোয়ারখেলা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবক মাম সিং পালোয়ানের কাছে কুস্তির তালিম লইতেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াই-এম-সি-এর কলেজ বিভাগ সর্ব্বপ্রথম

৪,৫,৬। জাতীয়তার নবমন্ত্র।

৭। জাতীয়তার নবমন্ত্র।

বাঙালী ছেলেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রবর্তন করেন। ঐ সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষেরা বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ মিল্‌টন কিউবকে নিযুক্ত করেন। তখন বলাই চট্টোপাধ্যায়, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ দত্ত ও জগৎ শীল প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী বাঙালী যুবক এই ব্যাপারে যোগদান করেন।

তারপর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ন প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ পি এল রায়ের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এই খেলা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। ঐ বৎসর তিনি তাঁহার বালীগঞ্জের বাড়ীতে একটি আধুনিকতম ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি করেন। এই শিক্ষায়তনে প্রাচ্য ভূখণ্ডের চ্যাম্পিয়ন প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ কিড্ ডিমিলভাকে আনাইয়া তাঁহারই সহযোগিতায় মিঃ রায় সকল সম্প্রদায়ের লোককে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি অনেকগুলি বাঙালী, আর্মেনিয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে ফণী মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার এই বিষয়ে উৎসাহী যুবকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রসিদ্ধ পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ অলরিভার্সকে নিযুক্ত করেন। অলরিভার্স এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ছয় বৎসরের অধিককাল যুক্ত থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের যুবকদের শিক্ষা দেন।

এই সময়ে কলিকাতায় নানাস্থানে মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৩১ কিম্বা ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ পি এল রায় কর্ত্তৃক 'বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন লিঃ' (বর্ত্তমানে ইহা উঠিয়া গিয়াছে) প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বৎসর পরে স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার ঐ ফেডারেশনের সঙ্গে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নেতৃত্বে আন্তঃস্কুল-কলেজ মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জে. কে. শীল মাদ্রাজে ব্যায়ামচর্চ্চা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সহযোগিতায় স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার প্রতিষ্ঠা করেন। পঙ্কজ গুপ্ত, সন্তোষ দত্ত, বিশ্বনাথ দাস, সন্তোষ মল্লিক, পাঁচুকালী সাহা, পৃথ্বীশ্বর মিশ্র, ডাঃ শম্ভু মুখোপাধ্যায়, শরৎ দত্ত ও বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক ঐ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য হন। পৃথ্বীশ্বর বাবু সমিতির সর্ব্বপ্রথম সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বেঙ্গল অ্যামেচার ফেডারেশন নব কলেবর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় ঐ সঙ্ঘের সভাপতি হন। এই সময়ে কয়েকজন উৎসাহী বাঙালী যুবক বাঙালীদের মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব পূরণ করিবার জন্য বেঙ্গলী বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফিজিক্যাল কালচার নামক প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তাগণ মুষ্টিযুদ্ধ প্রচার ও প্রসারের জন্য কম চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারাও দেশ-বিদেশে গিয়া বাঙালী ছেলেদের এই বিষয়ে উৎসাহিত করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান ১১৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে কলিন্স ইন্‌ষ্টিটিউটে যায়। তারপর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটির কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক খণ্ড জমি লাভ করেন। বর্ত্তমানে স্কুলটি ঐ স্থানে অবস্থিত।

অলরিভার্সের শিক্ষকতায় প্রতিষ্ঠানটির সভ্যগণ যথেষ্ট উন্নতি করেন। দুই বৎসর শিক্ষা করিবার পর তাঁহারা জ্যাক কর্জ্জন সার্কাসের মুষ্টিযোদ্ধাদের সহিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। সার্কাসের খেলায় জয়লাভ করিবার পর জে. কে. শীল বাঙালী ছেলেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচার ও প্রসারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। তিনি নিজে এক শত সাঁইত্রিশটি মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া পর পর একাশিটিতে জয়ী হন; কুড়িটি অমীমাংসিত থাকে। জগৎ শীল সাউথ আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন মিঃ পারসী ভেঞ্জানের সহিত দশ রাউণ্ড, বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা পারসী ওয়েলকামের সহিত দশ রাউণ্ড এবং মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা স্যাণ্ডো ম্যাস ব্যারিনোর সহিত ছয় রাউণ্ড মুষ্টিযুদ্ধ করেন। তিনি প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। ঐ সঙ্ঘের আর একটি ছাত্র রাখাল বাঁড়ুজ্যে সিভিল মিলিটারী বক্সিং-প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রাখাল বাবু এমেচার মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাণ্টম ওয়েটে অল-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ পাইয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেন।

বর্ত্তমানে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে নলিনী চট্টোপাধ্যায় ও পি. কে. ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ করা আবশ্যক। অশোকবাবু ইংলণ্ডে থাকাকালীন এই বিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। তিনি অনেক বাঙালীর ছেলেকে নানাবিধ ব্যায়াম অনুশীলনে উৎসাহিত করেন। এই দিকে বিষ্ণু ঘোষ, নীলমণি দাস, বিজয় মল্লিক, রণজিৎ মজুমদার প্রমুখ ব্যায়ামবিদের দানও কম নহে।

একালে যদিও বহু স্থানে স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ও স্কুল-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের সহায়তায় ব্যায়ামাগার স্থাপিত হইয়াছে তথাপি দেখা যাইতেছে যে মাত্র কতিপয় লোক বা ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই দৈহিক ব্যায়ামচর্চ্চা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক বা ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে এখনও তেমন মনোযোগী হন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। পৃথিবীতে দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শক্তিতে উন্নত জাতিরই প্রভাব বেশী। তাই আমাদিগকেও আজ পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিমান জাতির মত দৈহিক শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের ন্যায় আবার ব্যাপকভাবে ব্যায়ামের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যোগ্য মর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করিবার জন্য দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাকে সফল করিতে হইলে এবং স্বাধীনতা লব্ধ হইবার পর তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে জাতির লুপ্ত স্বাস্থ্য আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

আমেরিকার কথা

শ্রীসুনীলপ্রকাশ সোম

ক্রিষ্টোফর কলম্বস ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকান জাতির সৃষ্টি হয়। মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই আমেরিকা শিল্পে বিজ্ঞানে আশাতীত উন্নতি-লাভ করিয়া গৌরব ও সমৃদ্ধির উন্নততম শিখরে আরোহণ



ওয়ালুয়া জলপ্রপাত—হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ

করিয়াছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছে আমেরিকায়। সেখানকার ঐশ্বর্য্যের বিপুল সমারোহ হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। সমগ্র দেশটি কলকারখানা, ট্রাম, রেল-লাইন ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন। আমেরিকার প্রধান নগর নিউ-ইয়র্কে লোকসংখ্যা এতই বেশী যে, মৃত্তিকার নিম্নে সুড়ঙ্গপথ দিয়া এবং ঊর্দ্ধপথে মঞ্চের উপর দিয়াও রেলগাড়ী জনস্রোত বহন করিয়া থাকে। আমেরিকার গৃহগুলি কেবল যে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত ও উত্তোলন-যন্ত্র (lift) সমন্বিত তাহা নহে, এখানকার অনেক বিপণিতে চলন্ত সোপানাবলী জনতার দ্রুত চলাচলের সহায়তা করে। আকাশস্পর্শী অট্টালিকাগুলির প্রতি অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় আমেরিকার সভ্যতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কিন্তু কি অর্থনৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক, সকল দিক দিয়াই এই মহাদেশটিই সকলের অগ্রগামী। আমেরিকার সমস্তই বিরাট্ ব্যাপার। এ দেশের ধন-সম্পদ এতই অপর্য্যাপ্ত যে অন্যান্য দেশের ন্যায় ক্রোরপতিগণ এখানে ধনকুবের বলিয়া গণ্য হন না। এখানে ক্রোরপতির সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া বিশেষ ধনশালী ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইলে multi millionaire (বহুক্রোরপতি) বিশেষণটি প্রয়োগ করিতে হয়। অগণিত মুদ্রার অধীশ্বর এই সকল ধন-কুবেরের অর্থের সঠিক পরিমাণ যে কত তাহা গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে, দু-হাতে খরচ করিয়াও তাহা তাঁহারা নিঃশেষ করিতে পারেন না। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহাদের অর্থগৃধ্নুতার নিবৃত্তি নাই। ধনিকের এই মনোবৃত্তি হইতেই সেখানে Trust এবং Monopolyর সৃষ্টি। শ্রমিক ও মজুরের অর্থ শোষণ করিয়া ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায় সেখানে দিন দিন ধনগর্ব্বে অধিকতর স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিক শক্তি-প্রভাবে আমেরিকা অসাধ্য সাধন করিতেছে। সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময় নায়েগ্রা প্রপাতের বিপুল উদ্দাম জলরাশি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া আমেরিকানরা কলকারখানা চালাইতেছে।



মাভাদা জলপ্রপাত, কালিফোর্ণিয়া

ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আধুনিক আমেরিকান জাতির উৎপত্তি। তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জাতি বলিয়া গর্ব্ব করে। কিন্তু তাহাদের উন্নতি আসলে জড়জাগতিক (materialistic), আধ্যাত্মিক নহে। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের রথচক্রে আরোহণ করিয়াই যেন তাহাদের সভ্যতা জয়-যাত্রায় বাহির হইয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন সর্ব্বশক্তিমান

'ডলার' মুদ্রাই তাহাদের ঈশ্বর এবং কুবেরের উপাসনাই তাহাদের ধর্ম্ম। কাব্য এবং সাহিত্য, দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পই তাহাদিগের জীবনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অর্থকরী বিদ্যার চর্চ্চার দিকেই আমেরিকাবাসীদের



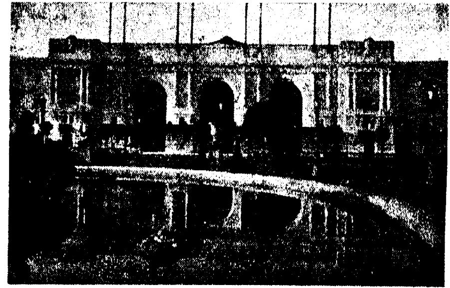
শ্রমিক সঙ্ঘের আপিস পোর্টল্যাণ্ড

অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। গগনস্পর্শী অট্টালিকাসমূহ, বিবিধ ও বিচিত্র যানবাহন, কলকারখানা প্রভৃতিই তাহাদের নিকট সভ্যতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন্ দেশের লোকে কি পরিমাণে লৌহাদি খনিজ পদার্থ হইতে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করে, বিলাসদ্রব্যের বহর কোথায় কিরূপ এই সমস্তই হইল তাহাদের নিকট কোন্ দেশ কি পরিমাণ সভ্য তাহা যাচাই করিবার মাপকাঠি। তবে একথা স্বীকার্য্য যে তাহাদের জাতীয় গৌরববোধ এবং দেশপ্রীতি অতুলনীয়।

আমেরিকার শহরগুলির তুলনায় পল্লীতে অনেক কম লোকের বাস। পল্লীর রাস্তাঘাটও তেমন সুগম নহে। স্থানে স্থানে রাস্তা এত অসমতল ও কর্দ্দমাক্ত যে যান-বাহন যোগে তাহা অতিক্রম করিতে হইলে সময় সময় বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট অন্ততঃ পাঁচ শত টাকা থাকা দরকার। পাছে কোন ভিক্ষুক আসিয়া অকর্ম্মণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অথবা বেকার অবস্থায় কেহ আমেরিকাবাসীর সাহায্যপ্রার্থী হয় সেইজন্য এই নিয়ম। যদি কোন স্ত্রীলোক একাকিনী আসে তাহা হইলে কুড়ি দিনের জন্য তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে তাহার কোন আত্মীয় জামিন হইয়া তাহাকে যদি উদ্ধার না করে তাহা হইলে সে আমেরিকায় বাস করিবার পৌর অধিকার লাভ করিতে পারে না। তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কানা, খোঁড়া প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব নিজ নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করা হয়। যে কয়দিন তাহারা স্বদেশের জাহাজ না পায়, সে কয়দিন তাহারা মার্কিন গবর্ণমেণ্টের নজরবন্দী অবস্থায় থাকে।

আমরা ছয় জন ভারতবাসী এক জাহাজে আমেরিকায় গিয়াছিলাম। সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে পৌঁছিবামাত্রই আরোহীদিগকে স্বাস্থ্য ও শুল্ক বিভাগের বিধি নিষেধ মানিতে হয়। জেটিতে নামিবার পর আমাদের বাক্সগুলি আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারীর নিকট দিয়াছিলাম। হোটেল ঠিক করিয়া সেখান হইতে টেলিফোন করিলেই লট-বহর আসিয়া পৌঁছাইবে। আমেরিকায় হোটেলের অভাব নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সান ফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছিয়া যে-কোন হোটেলে ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহাতেই বাধা পাইয়াছি। হোটেলের কর্ম্মচারী জানাইয়াছে 'বড়ই দুঃখিত, স্থান নাই'। দীর্ঘ পথ পর্য্যটনের পর ক্লান্তি বোধ করিয়া বিশ্রামস্থল খুঁজিতেছি এমন সময় এক জন ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন ?" উত্তর করিলাম আমরা ইণ্ডিয়া হইতে আসিয়াছি—আমরা ইণ্ডিয়ান। তিনি বলিলেন, "বুঝেছি আপনারা হিন্দু, হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছেন বলুন—এখানে ইণ্ডিয়ান বলিলে আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান বুঝায়। আপনারা বোধ হয় হোটেলে স্থান পাইতেছেন না। ইহার কারণ এই যে হোটেলের লোকেরা আপনাদের Mulatto (আমেরিকার কাফ্রি বর্ণসঙ্কর) মনে করিতেছে। এ সব হোটেলে কাফ্রিরা থাকিতে পায় না। আপনারা খেয়া-নৌকায় করিয়া ওপারে যান, সেখানে অনেক ভাল হোটেল

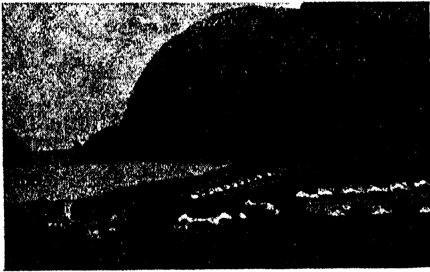


মিউনিসিপ্যালিটির সভাগৃহ, ক্যালিফোর্ণিয়া

আছে—আপনাদের কোন কষ্ট হইবে না। তবে হোটেলে গিয়া প্রথমে হোটেলের কর্ম্মচারীকে বলিবেন যে আপনারা হিন্দু আর টুপি খুলিয়া দেখাইবেন যে, আপনাদের চুল কাফ্রিদের মত কোঁকড়ানো নহে।" আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়িলাম। যাই হোক, ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া ইলেক্ট্রিক ট্রামে চড়িয়া বার্কলীতে পৌঁছিলাম এবং সেখানকার হিন্দুস্থান নালন্দা ক্লাবে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয়ও জুটিল।

বর্ণবিদ্বেষ (colour prejudice) আমেরিকার ন্যায় পৃথিবীর অপর কোন স্থানে আছে কিনা সন্দেহ, অবশ্য এই বর্ণবিদ্বেষ উৎকট আকারে দেখা দেয় কেবল জাত-কাফ্রি এবং বর্ণসঙ্কর কাফ্রিদের সঙ্গে ব্যবহারে, হিন্দুদের বেলায় ইহার উদগ্র অভিব্যক্তি দেখা যায় না। আমেরিকানরা গণতন্ত্রের উপাসক বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে কিন্তু তাহারা কাফ্রিদের যে প্রকার ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে তাহা প্রশংসনীয় নহে। এ বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাফ্রিদের চুল মোটা ও কোঁকড়ানো। যদি কোন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান পরিবারে একটি কুঞ্চিতকেশ সন্তান জন্মায় তাহা হইলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাহার পিতামাতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

আমেরিকার অনেক শহরে কাফ্রিরা শ্বেতাঙ্গদের সহিত এক ট্রামে ও ট্রেনে যাইতে পায় না, কিন্তু কালিফোর্নিয়া ও পশ্চিম দিকের অন্যান্য অঞ্চলে কাফ্রিদের জন্য ট্রেনে ও ট্রামে তেমন কোনও আলাদা বন্দোবস্ত নাই। অনেক হোটেল আছে যেখানে কাফ্রিদের পক্ষে অবস্থান করা ত দূরের কথা, এক গ্লাস জল পাইবারও আশা নাই। কোন কোন হোটেলে খাদ্যাদি পায় বটে, কিন্তু তাহা দ্বিগুণ মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যদি কোন শ্বেতকায়া রমণী কাফ্রি পুরুষকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার অপমানের সীমা থাকে না। আমেরিকার জ্যান্ত পোড়াইয়া (Lynch Law) মারার প্রথা সভ্য জগতের কলঙ্কস্বরূপ। কাফ্রিরা অধিকাংশই গরীব। দাস্য-বৃত্তিই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়।



কুষ্ঠাশ্রম—হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ

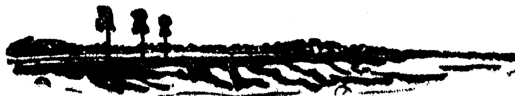
আমেরিকার শহরগুলিতে সঙ্কীর্ণ গলি নাই। বড় বড় এভিনিয়্যুগুলি এক দিকে ও অপেক্ষাকৃত ছোট ষ্ট্রীটগুলি অপর দিক হইতে আসিয়া এভিনিয়্যুগুলির ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা আধুনিক বোম্বাই শহর দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার রাস্তা নির্ম্মাণ-প্রণালী কতকটা বুঝিতে পারিবেন। রাজপথগুলি বেশ প্রশস্ত, কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিয়্যু বা বোম্বাইয়ের মহম্মদ আলি রোডের অপেক্ষাও বেশী চওড়া। সান্ ফ্রান্সিস্কো, লস্ এঞ্জেলস, শিকাগো, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি বড় বড় শহরে ছোট বাড়ী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দিকে তাকানো যায় নজরে পড়ে প্রশস্ত রাজপথ আর তাহার উভয় পার্শ্বে অভ্রভেদী বিরাট্ সৌধশ্রেণী। কুড়ি পঁচিশ তলা হইতে সুরু করিয়া ছাপ্পান্ন তলা পর্য্যন্ত বাড়ী আমেরিকার অনেক বড় শহরে আছে। এক একটি বাড়ী এত বড় যে তাহাতে দুই হাজরেরও বেশী কক্ষ আছে। এই কক্ষগুলি উচ্চতায় এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কিছু কম নহে। এই সব বাড়ীতে বড় বড় আপিসও আছে। রাত্রিকালে এই সব সৌধ বাতায়ননিঃসৃত বৈদ্যুতিক রশ্মিচ্ছটা পথচারীদের চোখ ঝলসাইয়া দেয়।

আমেরিকার সমস্ত প্রধান শহরের বাড়ীতে ট্রামে, ট্রেনে ও ষ্টীমারে বাষ্পীয় তাপ ব্যবহার করা হয়। বাহিরে দারুণ শীত, হয়ত বরফ পড়িতেছে; কিন্তু বাড়ীর ভিতরে বা ট্রামে, ট্রেনে আতপ্ত বসন্তকালের আরাম উপভোগ করা যায়। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলায় প্রকাণ্ড বাষ্পীয় তাপোৎপাদক যন্ত্র (steam boiler) আছে। বাটীর রক্ষক



কালিফোর্ণিয়ার একটি শীতাবাস ও আঙ্গুরের বাগান

তাহার সাহায্যকারীদের লইয়া দিবারাত্র এই বয়লার ঠিক করিয়া রাখে। এই বয়লার হইতে নিঃসৃত উষ্ণ বাষ্প প্রত্যেক ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে যত Radiators আছে সবগুলিকে গরম করিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক হোটেলের ঘরগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো ও গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের জন্য বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত আছে। রান্নাঘর এমন পরিষ্কার যে দেখিলে বৈঠকখানা বলিয়া ভ্রম হয়। রন্ধন করিবার জন্য বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের চুল্লী, খাদ্যাদি রাখিবার জন্য রেফ্রিজারেটর, বাসন রাখিবার জন্য দেওয়ালের গায়ে কাঠের দুই তিনটি আলমারী এবং বাসন ধুইবার জন্য দুইটি ও কাপড় কাচিবার জন্য দুইটি Sink, রান্নাঘরের ভিতর যথাস্থানে সংস্থাপিত আছে। স্নানাগারে আছে শ্বেত পোরসিলিনের বৃহৎ টব। তাহার ভিতর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া স্নান করা যায়। একটি ঠাণ্ডা জলের ও একটি গরম জলের নলধারা যথেচ্ছা জল ব্যবহার করা যায়। দুইটি পাইপ একসঙ্গে খুলিয়া দিলে সেই ছয় ফুট লম্বা টবটি তিন মিনিটে জলপূর্ণ হইয়া যায়। বিলাসিতার প্রতি আমেরিকাবাসীদের অতিরিক্ত মোহ নিন্দনীয় বটে কিন্তু পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার প্রতি তাহাদের অনুরাগের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আমেরিকানরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে বা মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ ও পরমাণু বোমার আবিষ্কারেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে নাই, যান্ত্রিক সভ্যতার সর্ব্ববিধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহারা সমগ্র জগতকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।



উড়িষ্যার লোক-সাহিত্য

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্তা ...মায়া গুপ্তের লিখিত "বিহারের লোক সঙ্গীত" নামধেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বিহারবাসিনীর 'বারমাস্থা গান' লেখিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারে প্রচলিত বারমাস্থা গানের অনুরূপ গান বা গাথা উৎকলদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর গান বা গাথা উৎকল সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে আরম্ভ হইয়াছিল ভাষাতত্ত্ববিদেরা ইহা বলিয়া থাকেন। উৎকল দেশে এবম্বিধ গাথা লোকমুখে শুনা যায়। উৎকলীয় নারী ও পুরুষের মুখে মুখে ইহা প্রচলিত আছে। এবম্বিধ বহু গাথা মুদ্রিত হইয়া দেশে প্রচলিত হইতেছে। কালগর্ভে কত গাথা বিলীন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত *Typical Selections from Oriya Literature* গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রন্থের প্রারম্ভে এ শ্রেণীর দুই-চারটা গান বা গাথা সন্নিবিষ্ট করিয়া এগুলিকে উৎকল-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের রচনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

"Kesava Koili *alias* Yasoda Koili by Markandeya Das is perhaps the earliest known Oriya poem. Looking to the fact that since very remote time it has been customary with the boys and girls all over Orissa to commit this piece to memory, Sir W. W. Hunter suggested that this Koili must be five hundred years old ; Mr. M. Chakravartty, for want of any definite proof, has stated that it is about three hundred years old. It is strange that no scholar has as yet referred to the Artha Koili by Jagannath Das, on the evidence of which work the age of Kesava Koili can be clearly proved to be not less than four hundred years old. Jagannath Das flourished during the early years of sixteenth century A.D., and he composed Artha Koili to give a spiritual interpretation of the text of the Kesava Koli. As all the words occuring in the Kesava Koili have been commented upon by Jagannath, it is undoubted that the text of the Kesava Koili remains unchanged, and we now get quite a correct text ; for this reason this piece is of high philological value. It is evident that the Koili in question was very popular and time-honoured in the time of Jagannath Das, and as such the time suggested by Hunter may easily be accepted as fairly correct. To be on the safe side we may say that the early years of the rule of the Solar dynasty is the time when Kesava Koili was composed. The character of a Koili is that it is a menologue, and the person whose words the poet versifies, discloses his thoughts to a cuckoo bird addressing the bird as O Koili, this address portion forms the burden of the poem.

I could get only four lyrics which are of old time of their composition. They all have been grouped together under the head Koili lyrics. Kesava Koili is certainly the oldest, and Baramashi Koili (*i.e.*, the Season Koili) seems not much removed in date from the Kesava Koili."

বারমাস্থা গান বৎসরের বারটি মাসের সম্বন্ধে রচিত। প্রতি মাসের নৈসর্গিক অবস্থা ও কৃত্যের উপর ভগবান রামচন্দ্রকে বা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া একটি করিয়া পদযোজনা পূর্ব্বক বারটি মাসে বারটি পদে বারমাস্থা গান শেষ করিতে হয়। বিহারের বারমাস্থা উৎকলে বারমাসী কোইলী নামে প্রচলিত আছে। কোইলী বা কোকিলকে সম্বোধন করিয়া গাথা রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম বারমাসী কোইলী। লেখিকা বিহারের বারমাস্থা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে আনন্দিত করিয়াছেন। বিহারে প্রচলিত বারমাস্থা গানের অনুরূপ উৎকলে প্রচলিত একটি বারমাসী কোইলী গাথা সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রকাশ করিলাম। বিহারে যে আদর্শে এবম্বিধ গাথা রচিত হইয়াছে উৎকলের আদর্শ তদনুরূপ বটে।

. আরে বাবু চাপধারী। কিংদণ্ড হেলা তোহর।
কান্দি কউশল্যা বোলন্তি কৈকেয়ী অরজিব কেঁউশিরী লো।
কোইলী শুন লো॥
এহি মগুশির মাস। কাকর পরে বিশেষ।
শীতল পবন বহে ঘন ঘন মো পুত্র করিব কিস লো।
কোইলী শুন লো॥
পুষমাসে বড় শীত। কষ্ট দিএ অপ্রমিত।
বিনা বসনরে বৃক্ষ কবল রে কি দুঃখ ন হেব জাত লো।
কোইলী শুন লো
মা ঘরে তচ্ছু অধিক। গরীব দুঃখদায়ক।
অমূল্য সুপাতি তেজি রঘুপতি বুলই কানন যাক লো।
কোইলী শুন লো॥
ফাগুনে ফগু খেলরে। মাতিচ্ছন্তি ঘরে ঘরে।
মো অক্ষুনীধন মোঠঁ হোই ভিন্ন অলাইলা শোকনীরে লো।
কোইলী শুন লো॥
চইত্র মাসর খরা। নীরস করই ধরা।
শরীরক্ক ঝাল বহে অনর্গল পরাণ হোএ ধাবয়া লো।
কোইলী শুন লো॥
বইশাখ খরা চাহিঁ। বাহারকুনোহে যাই।
কেঁউ বৃক্ষ মূলে জীবন বিকলে থিব মোর পুত্র রহিলো।
কোইলী শুন লো॥
জ্যেষ্ঠে মো জ্যেষ্ঠ নন্দন। জানকী সহ লক্ষ্মণ।
নানা পক্ক ফল খোজি বুলুথিবে বিধির এ বিড়ম্বনা লো।
কোইলী শুন লো॥
আষাঢ় মাসরে মেঘ। গরজই যেহ্নে বাঘ।
বেলে বেলে দিশ হুঅই অদৃশ্য ঘোটি যাএ চউদিগ লো।
কোইলী শুন লো॥
দেখ ধারা শিরাবণ। জল পড়ে অনুক্ষণ।
ঘর বাট নাহিঁ মো দুঃখি সংখালী কিরূপে কাটিব দিন লো।
কোইলী শুন লো।
ভাদ্রব হেলে প্রবেশ। সুনির্ম্মল বণ বণ।

অতি সুকুমারী জনককুমারী মনে ভালুখিব কিস লো।
কইলী শুন লো ॥
আশ্বিনে চন্দ্রকিরণ। করই মন হরণ
কেতেমেতে কেতে উৎসব করন্তে ঘরে থিলে রঘুগণ লো।
কোইলী শুন লো ॥
এ মহা কার্ত্তিক মাস। ভণিলে শঙ্কর দাস।
সীতা সঙ্গে যেমি রঘুকুলমণি ভোগ কলে বারমাস লো।
কোইলী শুন লো ॥

উৎকলের পুরী অঞ্চলে এক শ্রেণীর জাতি বাস করে তাহার নাম কেলা। তাহারা গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এ জাতিকে 'যাযাবর' জাতি বলা যাইতে পারে। এ জাতির মেয়েরা গান করিয়া বিবাহিতা রমণীদের শরীরে উল্কি রচনা করিয়া থাকে। বংশদণ্ডের উপর দড়ির সাহায্যে বালিকা ও রমণীরা নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শনপূর্ব্বক দর্শককে আনন্দিত করিয়া থাকে। এই অভিনয় উৎকল দেশে বাঁশরাণী (বাঁউশরাণী) নাট নামে অভিহিত হয়। মেয়েদের সাহস, ধৈর্য্য দেখিয়া মনে হয় ইহারা অবলা নয়। বংশদণ্ডের উপর বসিয়া গায়িকা মধুর কণ্ঠে বারমাসী কোইলী সঙ্গীত করিয়া দর্শকচিত্তে আনন্দবিধান করে। এইরূপ একটি কোইলী সঙ্গীত এখানে প্রদত্ত হইল।

মার্গশীরে শীত করে গুরু
পলঙ্কদুপাতি কৃষ্ণ খোড়িহন্তি সরুলো কোইলী ॥(১)
পুষরে সে অনন্ত মুরতি
তাঙ্ক শিরে চড়াঅন্তি পাখুড়া সেবতী লো কইলী ॥(২)
মাঘরে সে মহাদেব কায়ে
কর হর নেত প্রভু শঙ্খচক্র বাহেলো কোইলী ॥(৩)
ফগুনরে গোবিন্দঙ্ক দোলী
ফগুগুণ্ডবরি কৃষ্ণ খেলন্তি চাচেরি লো কোইলী ॥(৪)
চৈত্ররে চিত্রিত পুত্তলী
বৃন্দাবনে থাই কৃষ্ণ বজান্তি মুরলী লো কোইলী ॥(৫)
বৈশখরে মহারুদ্র খরা
শীতল চন্দন অঙ্গে বউলর মালা লো কোইলী ॥(৬)
জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবস্নাহান
স্নাহানকু বিজে কলে প্রভু ভগবান লো কোইলী ॥(৭)
আষাঢ়রে শ্রীগুণ্ডিচাযাত
নন্দী ঘোষ রথে চড়ি বিজে জগন্নাথ লো কোইলী ॥(৮)
শ্রাবণরে চতুর্দ্দিকে পাণি
খটিচ্ছন্তি কামিনীয়ে গন্ধ পুষ্প ঘেনি লো কোইলী ॥(৯)
ভাদ্রবরে পাচিপড়ে কিয়া
রাধাঙ্কু ন দেখি কৃষ্ণ আকুলিত হিয়া লো কোইলী ॥(১০)
আশ্বিনরে কুঁঙারিয়া জহ্ন
লক্ষ্মী সঙ্গে জুয়া খেলে মত্ত ভগবান লো কোইলী ॥(১১)
কার্ত্তিকরে রাই দামোদর
সুবর্ণ কখারু কুলে পূজন্তি শঙ্করো লো কোইলী ॥(১২)

বিহারে প্রচলিত গাথার সহিত এই গানের তুলনা করিলে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যূন পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এবম্বিধ গাথা প্রচলিত আছে বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এই সময়কার উৎকলীয় ভাষার নমুনা এই গাথার মধ্যে পাওয়া যায়।

মৃত্যু-মঙ্গল

শ্রীগোপাললাল দে

হৃদয় হইতে মর্ম্ম দিলাম ছিঁড়ে,
মৃত্যু, গ্রহণ করো!
অনাদি-কালের রে নাগিনী বিভীষিকা,
মা'র সন্তানে জটিল জঠর ভরো!
এই যে ধরণী করুণ জননী-রূপা,
খাড়া রয়েছে শ্যামশোভাসম্ভারে,
সরসী-তড়াগে মহাসমুদ্রে ছেয়ে,
সরস হয়েছে লক্ষ নদীর হারে;
আলোকোত্তাপে সুখ-নিকেতন গড়ি
অগণ্য মুখে অন্ন দিতেছে দান,
এই যে আকাশ-পরিমাণ প্রাণবায়ু,
সবই শুধু তার রক্ষিতে সন্তান।
অহরহ শিশু প্রসব করিছে মাতা
বাঁচাতে ব্যাকুলা জাগর যামিনী দিবা,
তুই অজগর অতর্ক অভিযানে
শুধু ভক্ষিবি বালক কিশোর যুবা?
কি ঘটিল গেহে একবার দেখিবি না?
কত অসহায় আছে কার মুখ চেয়ে?
কত বিজ্ঞান তার প্রজ্ঞায় বাঁচে,
নব ইতিহাস কার কল্পনা ছেয়ে?
ওরে বুভুক্ষু কাঙাল সর্ব্বনাশা,
বিনিময়ে কিছু চাহিলি না কেন আগে;
সকল অর্থ সব সামর্থ্য দিয়ে
জননী তাহারে বাঁচাতো যে অনুরাগে।
ওরে ও অবুঝ, কোন কথা বুঝিবি না?
কভু দাঁড়াবি না ফিরে?
অশ্রু-বিলোল ধরণী কাঁদিবে প'ড়ে?
তবে নিয়ে যাও, মর্ম্ম দিলাম ছিঁড়ে।

কেরানীর আশা

শ্রীআশুতোষ বাগচি

সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীর বুকে বিচিত্র গাছপালা সৃষ্টি ক'রে প্রকৃতি জীবধাত্রী বসুংধরাকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত ক'রে রেখেছে। এর মধ্যে বৃহৎ বনস্পতি আছে, খর্বকায় গুল্ম আছে, অতি-ক্ষুদ্র শষ্প আছে। এরা আমাদের শুধু সহস্র রকমের অভাবই দূর করে না, এদের ফুল-ফল-পল্লবের সমারোহ আমাদের নয়ন মন-প্রাণকে বর্ণ-গন্ধ-রসে মুগ্ধ তৃপ্ত নন্দিত করছে। অশোক-কৃষ্ণচূড়া-চম্পক-বকুল গাছ তাদের ঘন পল্লবের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় তাপদগ্ধ ধরণীকে শীতল আরামপ্রদ করে সত্য; কিন্তু যখন বসন্ত সমাগমে অশোক-কিংশুকের শাখা-প্রশাখা রাশি-রাশি ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে, আর তাদের লালিমা আকাশকে প্রগল্ভ, বকুলের মদিরগন্ধ বাতাসকে ব্যাকুল ক'রে তোলে তখনি তাদের উদ্ভিদ-জীবন সার্থক হয় ধন্য হয়। আবার, অকিঞ্চন ঘেঁটুগাছেও ফুল ফোটে। গ্রামপ্রান্তে তারও শুভ্র-হাসি রাখাল বালকের সরলহৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলায়। ঘেঁটু যদি তার ফুল ফোটানোর সৌভাগ্য থেকে কোনো কারণে বঞ্চিত হয় তবে শুধু তারই জীবন যে ব্যর্থ হয় তা নয়, প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়টিও বিড়ম্বিত হয়। অশোক-বকুলের সঙ্গে ঘেঁটুর তুলনা কেউ করবে না এটা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতি যখন অশোক-বকুলের পাশেই ঘেঁটুকেও জায়গা দিয়েছে তখন মনে হয় তারও একটা মূল্য আছে।

উদ্ভিদ-জগতের মত মানব-জগতেও ছোট-বড় সুন্দর-কুৎসিত কালা-ধলা সামান্য-অসামান্য বিচিত্র রকমের মানুষ আছে। বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য সব মানুষের শারীরিক মানসিক ও চারিত্রিক শক্তি সমান বা এক রকম হয় না। সকলেই কালিদাস-সেকসপিয়ার-শেলী-রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা, কিংবা দা ভিঞ্চি-রাফাএল-রেমব্রাঁ-নন্দলালের শিল্পী প্রতিভা, কিংবা নিউটন-ডারুইন-ফ্রয়েড-আইনষ্টাইন-এর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু স্বভাবত সব সুস্থ-দেহ মানুষেরই কোন-না-কোন রকমের কিছু-না-কিছু শক্তি থাকবার কথা। কিন্তু ইতিহাসের অভিব্যক্তি যেভাবে হয়ে এসেছে তাতে অধিকাংশ মানুষই আত্মবিকাশের স্বল্পতম সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত রয়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধি তার হৃদয়কে গত দেড়শ' বছরে এতটা পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে যা গত পাঁচ ছ-হাজার বছরে যায় নি। মানব-সভ্যতার ছন্দোভঙ্গ হয়েছে তাতে। ফলে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তলায় পড়ে আছে, যারা "সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় যারা এই তলার মানুষ—তা সে শ্রমজীবী কিংবা বুদ্ধিজীবী যাই হউক যাদের জীবনে ফুল ফোটে নি, ফল ধরে নি আমি তাদেরই একজন, তাই এই তলার মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগ আছে আমার। এই তলার মানুষদের সম্বন্ধেই দু-একটি কথা বলতে চাই।

প্রথমেই বলা দরকার যে এরাও উপরের দীপশিখার দিকে মুগ্ধ ও লুব্ধ দৃষ্টিতে চায়, এদের মনের গলতেও আলো জ্বেলে সভ্যতার দীপালি উৎসবে যোগ দিতে চায়—অর্ধাশনে ছিন্ন মলিন বসনে আলো বায়ুহীন এঁদো স্যাঁৎসেতে ঘরে কোন রকমে "শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" এরাও বইতে চায় না। ভাগ্য এদের উপর বিরূপ—এই মিথ্যা সান্ত্বনাই এদের বাঁচিয়ে রেখেছে কোন-রকমে। উপরের ভাগ্যবান লোকেরা তলার এই ভাগ্যহত অসহায় মানুষগুলিকে অনেক সময় ঠিক মনুষ্য পর্যায়ের জীব ব'লে মনে করে না। তাদের কাছে এরা কতকটা ভারবাহী পশু—খানিকটা যন্ত্রের মত বিবেচিত হয়। তাদের হুকুমে কাজ ক'রে যাওয়াটাই যেন এদের একমাত্র কর্ম আর কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম-সাধনেই তাদের একমাত্র অধিকার—'মা ফলেষু কদাচন।' তাদের সৃষ্ট জীবন-দর্শন, তাদের রচিত আইন-কানুন এই সমাজ-ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে নিরন্তর প্রয়াস পেয়ে এসেছে। রৌদ্রে জলে-শীতে কঠোর পরিশ্রমে জমী চাষ ক'রে পাট ক'রে বীজ বুনে আগাছা সাফ ক'রে কৃষক যেমন দেবতার দয়ার জন্য ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, যদি সুবৃষ্টি হয় কোন বিপদপাত না হয় তবে ফসল ফলে আর তার যৎসামান্য অংশ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পেলেই বহু ভাগ্য মনে করে, শ্রমিক যেমন মোট ব'য়ে, গাড়ি টেনে, কিংবা ধূল-ধুম্র সমাকীর্ণ কারখানায় কিংবা সূর্যালোকশূন্য নীল আকাশের আড়ালে খনি গর্ভে প্রাণপাত পরিশ্রমে অপর্যাপ্ত শিল্প-সামগ্রী উৎপন্ন ক'রে তার কণামাত্র উচ্ছিষ্ট নিজের প্রাণধারণের জন্য পেয়েই সন্তুষ্ট তেমনি অন্যত্রও তলার মানুষেরা দিনের পর দিন কাজ ক'রে যায় সরকারী, আধা-সরকারী বা সদাগরী আপিসে বা দোকানে কিংবা ইস্কুল পাঠশালায় —উপরের দিকে তাকিয়ে। যৎসামান্য যা পায় তাতে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকাই চলে—অনেক সময় তাও চলে না—তবু তাদের এই অপারমেয় বঞ্চনার জন্য "নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি', মানবেরে নাহি দেয় দোষ।"...কর্মে তার অনুরাগ নাই, আনন্দ নাই, মনে মনে একটা একটানা অসন্তোষ পোষণ ক'রে 'দিনগত পাপক্ষয়' করে যায়। কিন্তু এই একান্ত অবাঞ্ছনীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতিকারে তার উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, সাহস নাই, এমন কি সে চিন্তাও তার মনে উদয় হয় না ঐক্য ও সংঘবদ্ধ হয়ে যে কাজ করবে তাতেও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ছোট স্বার্থের লোভ ও ভয় তাকে বাধা দেয়। একান্ত স্বতন্ত্রভাবে সে উপরওয়ালার দয়ার ভিখারী হয়ে করজোড়ে অপেক্ষা ক'রে থাকে।

সভ্য মানুষের সমাজে যে সব কাজ না করলে সমাজ অচল হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার কোনটাই অনাবশ্যক নয় একথা সকলেই মানেন। অতএব সকল কাজেরই যে একটা মূল্য ও গৌরব আছে নানা কারণে সে-বোধ এদের মধ্যে জাগে নি। তাই একটা হীনতাবোধ থাকে তার মনে তার জীবিকা (vocation) সম্পর্কে এবং সেজন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে

সে সর্বত্র এমন ভাবে মাথা হেঁট ক'রে চলে যাকে বিনয় বা নম্রতা ব'লে লোকে ভুল করে না।

বেঁচে থাকবার জন্ত মানুষকে দায়ে প'ড়ে যেখানে খাটতে হয় সেখানে আছে প্রকৃতির জবরদস্তি, আর মানুষ এই জবরদস্তিকেই সবচেয়ে ঘৃণা করে। মানুষ চায় প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ জয়ী হতে; কিন্তু এইখানে তাকে হার মানতে হয়। মানুষ যদি জীবনধারণের ও সমাজস্থিতির জন্ত আবশুক কাজ ফেলে পালিয়ে যায় তবে ত সম্পূর্ণ বিনাশ। কিন্তু সেই কাজ যদি সে কর্তব্যজ্ঞানে খুসিমনে করে তবে কাজও হয় সুন্দর এবং তার নিজেরও তাতে গৌরব। পাচিকা বেতন নিয়ে রান্না করে পেটের দায়ে, এতে সে লজ্জিত; আবার সে-ই যখন আপন পুত্র-কন্তার জন্ত রান্না করে তখন সে নিজে হয় আনন্দিত আর তার তৈরি অন্ন হয় তখন অমৃত। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যে যেখানে যে-কাজে নিযুক্ত আছে বুঝতে হবে জীবিকার দিক থেকে সে সেই কাজেরই যোগ্য নতুবা তার কর্মক্ষেত্র হ'ত অন্যত্র। যাই হউক, অবস্থার গতিকে যে শ্রেণীর মানুষ তলায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছে এবং উপস্থিত মত সেই কাজেরই যোগ্য তারা যদি সেই কাজ খুসিমনে করতে পারত, তবে তারাও খানিকটা সুখী ও সন্তুষ্ট হতে পারত কাজও হ'ত ভাল। কিন্তু তা হয় নি, হচ্ছে না। তবু এই তলার মানুষের মধ্যেও অনেক ব্যতিক্রম আছে যেমন আছে উপরওয়ালাদের মধ্যে। তলার মানুষদের মধ্যে যারা অত্যন্ত সাধারণ এখানে তাদের কথাই বলছি। যাঁরা অসাধারণ তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা যদি সমাজ-ব্যবস্থার বিপাকে অস্থানেও গিয়ে পড়েন তবু তাঁদের ভিতরকার আগুন নেভে না। এ রকম দু'চার জনের নাম করা যেতে পারে। যেমন ফরাসী সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল—বলজ্যাক, একদিন যিনি ছিলেন ব্যাঙ্কের কেরানী। ভক্তকবি রামপ্রসাদ ছিলেন জমিদারী সেরেস্তার মুহুরী। আমাদের শরৎচন্দ্র প্রথম যৌবন কাটিয়েছিলেন বর্মামুলুকে সরকারী আপিসে। মাক্সিম গর্কির কথা ত বলতেই নেই। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। সাধারণ মানুষের কথাতেই ফিরে আসি। তাদের মধ্যে এমন মানুষ অনেক আছে—আজকাল তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে—যারা তাদের জীবিকাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে এবং যাদের জীবন-দর্শন হচ্ছে work is worship—কর্মই পূজা। একটা সমগ্র কাজের যে অংশটুকু তাদের ভাগে পড়ে তাদের করণীয় সেই টুকরো কাজকে তারা তুচ্ছ মনে ক'রে অবহেলা উপেক্ষা করে না, সমস্ত প্রাণ দিয়ে সযত্নে সেটুকু নিখুঁত ক'রে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে। সে কাজের কোথাও কোন প্রকাশ নেই, সুতরাং তার কোন গৌরবও নেই; তাই ব'লে পশমের কাজের উল্টো পিঠের মত তাঁদের কাজকে তারা কুৎসিত হতে দিতে পারে না। এতে পরোক্ষে তাদের একটা মহৎ লাভ হয় এই যে কাজের গর্বে তাদের অহংকৃত হবার ফাঁক থাকে না। জীবিকা সম্পর্কে তাদের মনে কোন হীনভাবোধ না থাকায় আত্মমর্যাদা রক্ষা করেও সকলের সঙ্গেই সসম্মান ব্যবহারে করে—একটু নিচের লোকের সঙ্গে রূঢ় উদ্ধত ব্যবহার, আর সামান্য উপরের লোকের সামনে দাস্তভাবের লজ্জাকর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে না।

মানুষের মনোবৃত্তিগুলি (faculties) যথাসময়ে অনুশীলনের সুযোগে ব'ঞ্চত হ'লে শুকিয়ে যায়—atrophied হয়ে যায়। এদের অনেকেরই উদরান্ন-সংগ্রহ-চেষ্টায় উদয়াস্ত সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে যায়—চিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির চর্চা কি উৎকর্ষ সাধনের এতটুকু উদ্বৃত্ত সময় কিংবা সামর্থ্য থাকে না। এঁদের কারও হয়ত স্বাভাবিক সুকণ্ঠ ও সুরবোধ আছে, কারও বা চিত্রাঙ্কনে কি মূর্তি নির্মাণে কি কবিতা রচনায় অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে, কারও বা গণিতে-বিজ্ঞানে সহজাত শক্তি ও স্বাভাবিক অনুরাগ আছে; কিন্তু সেই সহজাত শক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে যে অবকাশ এবং যে বিশেষ শিক্ষা দরকার তার কোন সম্বলই নেই এঁদের—না অবসর, না অর্থ। যে ফুল ফুটতে পারত—হয়ত সে ঘাসের ফুল কি ঘেঁটু ফুল—সে ফুল ফুটতে পেল না। অনেকেই জানেন যে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু একদা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কেরানীগিরির শিক্ষালাভের জন্ত। যদি সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে কোন ইংরেজ সদাগরের আপিসের মোটামোটা লেজার বইয়ের নিচে তিনি চাপা পড়তেন তবে আজ আমাদের কলা-লক্ষ্মীর কি দশা হ'ত। ভাগ্যক্রমে ঐ শিক্ষাগ্রহণে তাঁর মন ছিল একান্ত বিমুখ এবং তাঁর অভিভাবকের ছিল সঙ্গতি। তাই ফাঁড়া কেটে গেল। মনীষী রামানুজনের জীবন লোকচক্ষুর আড়ালে অস্ফুট থেকে যেত হাজারো কেরানীর মধ্যে, যদি গুণ-গ্রাহী বিদেশীর নজরে না পড়তেন তিনি। আমার গ্রামের একটি যুবককে জানি—সে বালক বয়সেই কারও কাছে না শিখে সুন্দর মাটির মূর্তি গড়তে পারত। বড় হয়ে সে এখন নিজ গ্রামে ও প্রতিবেশী গ্রামে পূজাপার্বণে প্রতিমা তৈরি ক'রে থাকে। সে-সব প্রতিমা পেশাদার কুমোরের গড়া প্রতিমাকে হার মানায়। পরে সে প্রতিমা রং করতে ও চালচিত্র করতে শিখেছে। সে একদিনের তরেও কোন শিক্ষালাভের সুযোগ পায় নি। দরিদ্র লোহার কামারের ছেলে সে, অল্প বয়সেই পিতৃহীন হয়, প্রাথমিক পাঠশালাতেও পুরোপুরি পড়তে পায় নি। কে বলতে পারে তেমন যোগাযোগ হ'লে সে এক জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর গৌরব অর্জন করত না? এমন কত ছিল, কত আছে। এই রকম শক্তি দিয়ে প্রকৃতি যে মানুষকে পৃথিবীতে আনে তাদের বেশীর ভাগই তলার দিকের মানুষ যারা মাথা গুনতিতে অধিক অথচ যাদের জীবনের প্রকাশ নেই।

যাক, যাদের কথা বলছিলুম অর্থাৎ যারা আপিসের সাহেব বড়বাবু কিংবা ইস্কুলের সেক্রেটারি-মেম্বার মশাইদের স্তবস্তুতি ও গুণগানের গুঞ্জনে মশগুল হতে পারে নি তাদের অন্তরে মানুষের ভিতরকার পরম অসন্তোষ (divine discontent) যা আদিম বর্বর মানুষকে তিলে-তিলে পলে-পলে মনুষ্যত্বে উন্নীত করছে সেই অমূল্য অনির্বাণ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উজ্জ্বল রয়েছে। তারা সকল হীনতার মধ্যে, শুপ-রাশি-নাশী চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও মনে এই আশা পোষণ করে যে তাদের জীবন ব্যর্থ হলেও ভাবী মানব-সমাজ এমন ভাবে রচিত হবে যখন মানুষ মানুষকে বঞ্চনা করবে না, বর্তমানের অন্ন-বস্ত্র-সংগ্রহ চেষ্টার অনিবার্য ঈর্ষ্যাদ্বেষ এবং ইতর জীবের মত কাড়াকাড়ি হানাহানি থাকবে •

না। জীবনধারণের জন্ম একলা-একলা পাগলের মত ছুটোছুটি ক'রে ফিরতে হবে না, সুসভ্য সুসম্বদ্ধ সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল সহৃদয় সমাজ-ব্যবস্থা প্রত্যেকের যথোচিত কর্ম সংস্থানের এবং সর্ববিধ অভাব মোচনের ব্যবস্থা করবে। জীবন-সংগ্রাম হবে জীব-লীলায় রূপান্তরিত, লোকালয় হবে নিরাময় শুচি শোভন সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ; সর্বোপরি, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সুপ্ত শক্তির চর্চা ও উন্মেষের সম্পূর্ণ সুযোগ ও সমস্ত সুবিধা পাবে। একদিকে এই অবিসংবাদী সত্য সকলেই উপলব্ধি করতে পারবে যে এ সংসারে প্রত্যেকটি মানুষকে বিশ্বজগতের সকল মানুষের উপর নির্ভর করতে হয়, কেউ অনন্যনির্ভর হয়ে বাঁচতে পারে না; আবার কেউ একলা নয়, বিশ্বমানব-সমাজ তাকে বুকে ক'রে ধ'রে আছে, তার ভয় নেই, ভাবনা নেই। অন্য দিকে এই সত্যটিও মনে প্রাণে অনুভব করবে যে পৃথিবীর এক প্রান্তের একটি মানুষের কর্মের ফল পৃথিবীর সকল মানুষকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভুগতে হয়—যেমন হচ্ছে আজ হিটলার-মুসো-তোজোর সমাজদ্রোহী নিষ্ঠুর কর্মের। আবার রলাঁ-রবীন্দ্রনাথের পুণ্য-জীবন ও প্রাণদ বাণী দেশ-দেশান্তরের নরনারীর হৃদয়ে শুভ-বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং চিরমধু-নিষ্যন্দ প্রেম-পদ্মকে বিকশিত ক'রে তুলছে।

বিশ্বব্যাপী সেই পরম শুভদিনের আবির্ভাবের জন্য আমরা তলার মানুষ নম্র হৃদয়ে প্রতীক্ষা ক'রে আছি। *

অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৫এ প্রদত্ত বক্তৃতা।

আলোচনা

"শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে"

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে কিছুদিন যাবৎ সাময়িক পত্র ও পত্রিকায় বাগ-বিতণ্ডা চলেছে। তবে নিজের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজে কি বলেন তাই আসল কথা—এবং তাতেই হওয়া উচিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ মত এবং তাঁর জবানীতে আমার এই পত্র বা নিবন্ধ লিখিত। আমি এখানে আরও জানাতে পারি যে পূর্ব্বে "উদ্বোধন" পত্রিকায় শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ করেছিলেন, তা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞাতসারে এবং পূর্ণ অনুমোদন গ্রহণ করে। আর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও 'প্রবাসী'তে যা লিখেছেন তা শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতসারে ঘটে নি। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ মত লিখিত আমার একখানি পত্র মাদ্রাজের *Sunday Times* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্য ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন এই :

(১) সুরেশচন্দ্রের বিবৃতি ("প্রবাসী", বৈশাখ ১৩৫২) ছিল চন্দননগরে যাওয়ার পথে যা ঘটেছিল তাই নিয়ে। সে-সম্পর্কে কয়েকটি যে গুজব রটেছিল—যথা, ঐ পথে যেতে যেতেই শ্রীঅরবিন্দ শ্রীযুক্তা সারদা দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, নিবেদিতার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল—এই সব ঘটনা-বিপর্যায় সুরেশচন্দ্র ধরিয়ে দিয়েছেন। রামবাবু পরে সুরেশচন্দ্রের বিবৃতি সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন, তবে গুজবী ঘটনাগুলি সেদিন নয়, আর একদিন ঘটেছিল, এই নূতন তথ্যের অবতারণা করেছেন।

(২) চন্দননগরে যাওয়ার পথে শ্রীঅরবিন্দ উদ্বোধন আপিসে গিয়েছিলেন—এই গল্পাংশ এখন পরিত্যক্ত হয়েছে এবং নিবেদিতা ঘাট পর্য্যন্ত এসে বিদায় নিয়ে যান এটুকুও ছেঁটে ফেলা হয়েছে, বর্ত্তমানে রাখা হয়েছে এই অংশটুকু যে বোসপাড়ায় গিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দেখা করে আসেন। আসল কথা শ্রীঅরবিন্দ বোসপাড়ায় যান নি, নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন নি—সুরেশচন্দ্রের বিবৃতিতে এ কথা স্পষ্ট। আসলে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দের এই চন্দননগরে যাত্রার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এক আধ দিন পরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে খবর পাঠান কর্ম্মযোগিন-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে, তখনই তিনি ব্যাপারটি জানতে পেরেছিলেন। কারণ সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে একান্ত আকস্মিক ভাবে। ঠিক কি হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন—তাঁর কথা এই : একদিন কর্ম্মযোগিন-আপিসে তিনি শুনলেন যে আপিস শীঘ্র খানাতল্লাসী হবে, তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে; তখনই তিনি হঠাৎ "আদেশ" পেলেন চন্দননগরে চলে যেতে এবং সেই মুহূর্ত্তেই। তিনি কাজও করলেন সেই অনুসারে—সঙ্গী সাথী কাউকে কিছু বললেন না, একান্ত গোপনে সকলের অজ্ঞাতে (তখন উপস্থিত আমরা যে কয়েকজন ছিলাম অবশ্য তাদের ছাড়া) মিনিট পনরর মধ্যে ব্যাপারটি ঠিকঠাক হয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ ঘাট পর্য্যন্ত রামবাবুর অনুসরণ করলেন, সুরেশচন্দ্র আর বীরেন ঘোষ (রামবাবু বলছেন ধীরেন, তা নয়) চলল আর একটু পিছনে। একখানা নৌকা ডাকা হ'ল, তিনটি প্রাণী তাতে উঠে রওনা হয়ে গেল। সোরগোল কথাবার্ত্তা দেখা-শুনা পথে কোথাও কিছু ঘটে নি। চন্দননগরে অবস্থানও গোপন ছিল, অল্প কয়েকজন মাত্র জানত—চন্দননগর ছেড়ে পণ্ডিচেরী যাত্রাও ঐ রকম গোপন ও অল্প কয়েকজনের মাত্র জ্ঞানগোচর ছিল। লুকিয়ে থাকবার জন্যে একটা জায়গার বন্দোবস্ত করতে শ্রীঅরবিন্দ কখনও রামবাবুকে বলেন নি—এ রকম বন্দোবস্ত করবার সময়ও ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ কাউকে খবর না দিয়েই রওনা হয়ে গেলেন, এই মনে করে যে চন্দননগরে দু'এক জন যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁরা একটা জায়গা তাঁর জন্যে কোন মতে করে দেবেন। শ্রীযুক্ত

মতিলাল রায় প্রথমে তাঁর বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে রাখেন—তিনি এ কথাটি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কাউকে জানতে দেন নি। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা অনুসারে এই হ'ল সত্য ঘটনা।

(৩) শামসুল আলমের হত্যা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার মতলব করছে—এ ধরণের কথা নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন আলাপ কখন হয় নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না; কারণ এ রকম সংবাদ শ্রীঅরবিন্দকে কেউ কখন দেয় নি। আর নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে লুকিয়ে পড়তে (go into hiding) কোন দিন পরামর্শ দেন নি। আসলে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে চন্দননগরে যাত্রার কোন সম্বন্ধই নাই। ঘটনাটি এই। এ সব ব্যাপারের অনেক পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দকে নিবেদিতা জানান যে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য তাঁকে দেশান্তরে আটক রাখা (deportation), আর পরামর্শ দেন বৃটিশ রাজ্য ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে এবং সেখান থেকে কাজ করতে—লুকিয়ে পড়তে নয়। শ্রীঅরবিন্দ সে পরামর্শ গ্রহণ করলেন না—বললেন, একটা খোলা চিঠি তিনি লিখবেন এবং আশা করেন তাতে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হবে। এই পত্রখানিই "কর্ম্মযোগিনে" My Last Will and Testament নামে প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা পরে শ্রীঅরবিন্দকে জানান বাস্তবিকই চিঠিখানিতে কাজ হয়েছিল, অতঃপর নির্ব্বাসনের আর কোন কথা ওঠে নি।

(৪) বলা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ আর শ্রীদেবব্রত বসু শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করবার জন্যে নাকি প্রার্থনা করেন, দেবব্রতবাবুকে গ্রহণ করা হ'ল, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে প্রত্যাখ্যান করা হ'ল। শ্রীঅরবিন্দ স্বপ্নেও কোন দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চান নি, চলিত কোন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চান নি। এ কথা সকলেরই বেশ জানা উচিত যে, সন্ন্যাসকে শ্রীঅরবিন্দ কোন দিন তাঁর যোগসাধনার অঙ্গ বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর সাধনার মূল কথা হ'ল আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত জীবনযোগ। এই ছিল চিরকাল শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ—অন্য রকমের আদর্শ কখনও গ্রহণ করেন নি। একবার নৌকাযোগে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে তিনি বেলুড় মঠে যান, তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিনিট পনরর জন্যে তাঁর আলাপ হয়—কিন্তু সাধনার বিষয়ে নয়। স্বামীজী গবর্ণমেণ্টের নিকট থেকে একখানি পত্র পেয়েছিলেন, তিনি শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ চান গবর্ণমেণ্টের পত্রের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন কি না—শ্রীঅরবিন্দ বলেন প্রয়োজন নেই, স্বামীজীরও সেই মত ছিল। মঠ দেখে শ্রীঅরবিন্দ ফিরে চলে আসেন—এর বেশি আর কিছু ঘটে নি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে এই আলাপের আগে বা পরে, পত্রযোগে বা মৌখিক ভাবে, সাক্ষাতে বা পরোক্ষে কখনও তিনি কোন মঠে যোগ দিতে চান নি, সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চান নি।

(৫) এই সময়ে কারো না কারো কাছে থেকে কোন প্রকার দীক্ষা শ্রীঅরবিন্দ নিয়েছিলেন বা নিতে চেয়েছিলেন, এই ধরণের গুজব রটেছে দেখা যাচ্ছে। যারা এই কাহিনী প্রচার করছে তাদের নিশ্চয়ই জানা নেই যে, শ্রীঅরবিন্দ এ সময়ে যোগের শিক্ষানবিস মাত্র ছিলেন না, কারো না কারো নিকট থেকে দীক্ষার বা নির্দ্দেশের তাঁর প্রয়োজন ছিল তা নয়।

(৬) "স্বতঃ-লিখন" (automatie writing) সম্বন্ধে রামবাবু যা বলেছেন সবই তাঁর স্বকপোলকল্পিত, সত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করবার কোন রকম মতলব তাঁর ছিল—তাই যদি থাকত তবে লেখা আর "স্বতঃ-লিখন" হয় না, হয় ছল বা ভণ্ডামী; সচেতন মন যে লেখা চালিত করে নিয়ন্ত্রিত করে তা স্বয়ংক্রিয় (automatic) হতে পারে না। আসলে শ্রীঅরবিন্দ এই রকম লেখায় হাত দিয়েছিলেন কতকটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে জিনিষটি কি, আর কতকটা নির্দ্দোষ আমোদের জন্যে।

(৭) রামবাবুর আর একটি চমৎকার গালগল্প—শ্রীঅরবিন্দ দিন পনরর মধ্যে তামিল ভাষা শিখে একেবারে একখানা কবিতা লিখে ফেলেছেন আর প্রশ্ন করলে গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন "একটা ভাষা আয়ত্ত থাকলে, সব ভাষাই অল্পে শেখা যায়।" গল্পটি সর্ব্বৈব কাল্পনিক। তামিল কবিতা দূরে থাক, তামিল গদ্যের একটি সম্পূর্ণ বাক্যও কোন দিন শ্রীঅরবিন্দ লেখেন নি, কি বলেন নি। কর্ম্মযোগি-ধর্ম্ম আপিসে একজন "নায়ার" (যাঁর মাতৃভাষা মালয়ালম, তামিল নয়) কয়েকদিন মাত্র এক তামিল পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু লেখা শ্রীঅরবিন্দকে পড়ে শোনাত ও ব্যাখ্যা করত—শ্রীঅরবিন্দ শুধু বসে শুনতেন।

(৮) জ্যোতিষ সম্বন্ধে কাহিনীটির তথ্য এই—শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় এ বিষয়ে পড়াশুনা একটু করেছিলেন, এর মধ্যে কি সত্য আছে বুঝবার জন্যে। সে সময়ে কিছু কিছু টুকে রেখেছিলেন একটা খাতায়—সে গুলিকে রামবাবু শ্রীঅরবিন্দের একখানি পূর্ণ-পরিণত জ্যোতিষিক গ্রন্থে রূপান্তরিত করেছেন। এ রকমের পুস্তক কিছু ছিল না, আর্য্য পাবলিশিং হাউসেও প্রকাশিত বা প্রকাশনীয় কিছু নাই। শ্রীঅরবিন্দ কোন দিনই জ্যোতিষী বা জ্যোতিষশাস্ত্র-লেখকের পদ গ্রহণ করবার অভিলাষী হন নি।

(৯) এখন শেষ একটা মায়ারচনার কথা বলতে হয়—মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে গাড়ী-ঘোড়া সমন্বিত যে অভিযানের ছবি রামবাবু এঁকেছেন তার গোড়াতেই যে বিসমিল্লা! কারণ মৃণালিনী দেবী কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অর্থাৎ সঞ্জীবনী আপিসে থাকতেন না—শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, আলিপুর জেলের পর থেকে চন্দননগর যাত্রা অবধি তিনি কৃষ্ণকুমার মিত্রের ওখানে থাকতেন বটে—কিন্তু মৃণালিনী বরাবরই ছিলেন শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষের পরিবারে। সুতরাং রামবাবুর গঠিত সৌধের ভিত্তিটাই ধ্বসে গেল।*

* এই প্রসঙ্গে আর কোনো বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে না। প্রবাসীর সম্পাদক।

নন্তু

শ্রীসাধনা কর

নন্তু এক দিন অবাক হয়ে দেখল—সেজোকাকার ছেলে অন্তুটা তো নতুন বৌদির সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে তুলেছে। যখন-তখন গিয়ে বেশ অপ্রতিভ ভাবে বৌদির সঙ্গে খেতে বসে। জোর করে গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে। ন'দি, ছোড়'দ, বীণা, কমলা ওদের হাঁকিয়ে দিয়ে বলে হিংসাসে ভাগো, গোলমাল মৎ করো। এটা আমাদের ঘুমোবার সময়।

সবাই খুব হেসে ওঠে। অন্তুটা বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁকি দিয়ে চোখ বোজে। মুচকি মুচকি হাসে। বৌদির সঙ্গে গল্প করে কত। চোখে-মুখে কথা-বলিয়ে ছেলে, তার উপরে বৌদি শ্রোতা, অন্তুর মুখে খই ফুটে চলে। নন্তু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে—আরে অন্তুটা তো কম বাহাদুর নয়।

অবশ্য সে শহুরে ছেলে। বছর দশেক বয়সেই চালাক, চটপটে। সহজে লজ্জা পায় না, ভড়কায়ও না। নয় তো বিয়েবাড়ি বরযাত্রি গিয়ে অত লোকজন হৈ-চৈয়ের মধ্যে মিশে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যাওয়া তার কল্পনার বাইরে ছিল। অন্তুর জন্যেই তো সে দেখতে পেয়েছিল—কনে নতুন-বৌদি বসে আম খাচ্ছেন। সে বিস্ময় এখনো নন্তু ভোলে নি। এখানেও কি না অন্তুই আগে ভাব জমিয়ে বসল। দাদার নাম-দেওয়া অশোক বনের চেড়ীর দল—ন'দি, ছোড়দি, বীণা, কমলা সারাক্ষণ বৌদিকে ঘিরে বসে। বাড়িতে লোকজন পাড়াপড়শী গিস্ গিস্ করছে। একজনের পর একজন এসে বৌ দেখছে, কাপড় জামা দেখছে, গয়না দেখছে। একবার, দুবার তিনবার দেখছে খুঁটে খুঁটে করছে কত প্রশ্ন। নতুন বৌদি নিজেই ভয়ে ভাবনায় সারা। ছেলেদের সঙ্গে কথা তো বলেনই না, যা গল্প করেন ঐ বীণা কমলা ন'দি ছোড়দির সঙ্গে। এই বোনগুলির জ্বালাতেই অন্ত নন্তু বৌদির কাছে পাত্তা পায় নি। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েই নন্তু অন্য দিকে মন দিয়েছিল, কিন্তু দেখে সে অবাক অন্তুটা সব বাধা ঠেলে বৌদির সঙ্গে কেমন ভাব জমিয়ে তুলেছে। নিজের বৌ'দ, তবু নন্তু দু-চারটের বেশী কথাই বলে নি। মনে একটা ঘা লাগল। নন্তুও বৌদির সঙ্গে খাতির করতে গেল এগিয়ে। অন্তুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বৌদির সঙ্গে খেল। বড়োদের জুতোর মধ্যে ন্যাকড়া ভরে পায়ে ঢুকিয়ে অন্তুরই মতো মচমচ শব্দ করে ঢুকল গিয়ে পূবের কোঠায় যেখানে বৌদি বীণা ওদের সঙ্গে গল্পে মগ্ন। জুতোর শব্দে চমকে উঠে আধখলা ঘোমটা তুলতেই বৌদি শিশুনে শোনেন খিল্ খিল্ হাসি। বৌদি অপ্রতিভ। বাহাদুরী দেখিয়ে নন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল গিয়ে মিরগাছে, অন্তুর থেকে আরো উঁচুতে। দেখে বৌদির সে কি ভয়, বিস্ময় কৌতূহল কিন্তু তবু সে অন্তুর মতো অতটা ভাব কিছুতেই জমাতে পারল না। স্বভাবত লাজুক মুখচোরা সে, তার উপরে যে বৌদির সম্বন্ধে তার এত ঔৎসুক্য, যে বৌদিকে তার এত ভালো লাগে তাঁর কাছে যেতেই নন্তুর বুক দুরু দুরু। আনন্দে লজ্জায় সঙ্কোচে সমস্ত মন চঞ্চল, উত্তেজিত। বৌদি আদর করে কাছে ডাকলে সে ছুটে আগে পালিয়ে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখে—অন্তুটা বৌদির কোলে চেপে দস্যিপনা করে ঘোমটা খসিয়ে ফেলছে, কপালের সিঁদুর কপালময় লেপে দিয়ে দাঁড়িয়ে আদরে আবদারে জোর জবরদস্তিতে কেমন মজা করছে। দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দেখে নন্তুর মুখ কালো। মনে খচ করে বেঁধে কাঁটা। আমারই তো আপন বৌদি। অন্তুটা কি যে, বেশী তার বাড়াবাড়ি। একটু লজ্জা-সঙ্কোচ নেই।

সে দিন বিকেলে নন্তু আর সইতে পারলে না। বৌদির কাছে তারা দুজনেই ছিল। অন্তুটা অনর্গল বকেই চলেছিল। তারা থাকে পাটনায়। কলকাতা মামাবাড়ী, মাসি থাকেন রাঁচী। মায়ের সঙ্গে অনেক শহরই সে দেখেছে। বৌদির কাছে সে-গল্পই করছিল। তার হাত মুখের একটা ভঙ্গি আছে, কথা বলার কায়দা যথেষ্ট। বৌদি বেশ মনোযোগ দিয়েই তার গল্প শুনছিলেন। বৌদির চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশংসা মেশানো। দেখে দেখে নন্তু মনে মনে জ্বলছিল। বৌদির কাছে যে অন্তু অনেকটা প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে। এক সময় হঠাৎ নন্তু অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠল—বা বা অন্তুটা যেন এক নিশ্বাসে কথা বলে চলে। শহর বুঝি এতই ভালো। আমাদের এখানেও দুর্গাপূজার সময় বিসর্জ্জনের সময় কত মজা হয় বাচ খেলা হয়—মাঝখানেই অন্তু একেবারে হো হো শব্দে হেসে উঠল—ওমা কি বলে সহরের সঙ্গে এই পচা পাড়া-গাঁয়ের তুলনা। সে সব মজা তুই জানবি কি করে, বুঝতেও পারবি নে। সহরে তো কখ্খনো যাস্ নি। সে সব বুঝবেন বৌদি। ঢাকা গিয়েছেন, কুমিল্লা গিয়েছেন। সহর কত ভালো, না বৌদি ?

বৌদি বোধ হয় সায় দিয়েই একটু হাসলেন, অন্তু উজলে উঠে বললে—তুই তো ভাঁহা গেঁয়ো। দাদার বিয়েতেই মাত্র স্টীমার চাপলি। ট্রেন মোটর সে সব তো দেখিসই নি।

রাগে নন্তুর ব্রহ্মতালু অবধি দাউ দাউ করে উঠল। চোখ লাল করে বললে—দেখি নি তো তোর কি। অমন করে কথা বলবি তো ঘুসির চোটে দেবো দাঁত ভেঙে।

অন্তু ঠোঁট উল্টিয়ে বললে—গেঁয়োরা শুধু মারামারিই করতে জানে।

এর পরে একটা কাণ্ড ঘটে যেত। নন্তু হাতের মুঠি বাগিয়ে এগিয়ে এসেছিল, বৌদি বাধা দিলেন—"ছিঃ ঝগড়া মারামারি করতে নেই নন্তু। অন্তু কেমন গল্প বলছিল, শোন না চুপ করে। বলতো অন্তু রাঁচীর হুড্রু ফল্সের কথা। সেখানে দিনেও বুঝি বাঘ বেরোয় ? খুব পাহাড় জঙ্গল ? পঞ্চমুখে অন্তু গল্প বলতে সুরু করলে। নন্তু অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে রেখে একটুক্ষণ দাঁড়াল। এক সময় কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দায় এসে একবার থমকে দাঁড়াল। একবার গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারল। দেখলে নতুন বৌদি একমনে গল্প শুনছেন। মুখ ফিরিয়ে সে ধীরে ধীরে নদরের দিকে চলে গেল।

প্রথম দিন নতুন-বৌদির জন্যেই বিপদ ঘটতে পারল না। দ্বিতীয় দিন অন্তু-নন্তুতে বেশ একটা লড়াই বেধে গেল। দুপুরে বৌদিকে নিয়ে তারা একটা মজা করেছিল। বৌদিটা বড় ঘুম-কাতুরে, যখন-তখন যেখানে-সেখানে তার ঝিমুনি ধরে। ভালো তো বেহুঁস। পিসতুতো বড়-বৌদি, বিয়ে-না-হওয়া ন'দি, ছোড়দি একজত মুচকি মুচকি হাসেন। বলেন—কি গো রাত্রে বুঝি ঘুমোবার আর নাম করো না। খুব বুঝি—।

লজ্জায় নতুন বৌদি আবীর রাঙা। দ্রুত বাধা দিয়ে বলেন—যা, মোটেই রাত জাগিনে।

তবু কি ছাড়ান আছে। পিসতুতো বৌদি দিদিরা সব অনেক কথা বলেন। নতুন বৌদি নাস্তানাবুদ।

অন্তু-নন্তু তাঁদের কথার মানে বোঝে না বিশ্বাসও করে না। সারারাত না ঘুমিয়ে মানুষে কেন থাকে, কেমন করে থাকতে পারে, তাই তাদের বোঝা অসাধ্য। সন্ধ্যা হতে না হতে সেই যে তারা বিছানায় শোয়, উঠতে বেলা আটটা। তারপরে অবশ্যি সারাটা দিনের মধ্যে দুষ্টুমি করে ঘুমোবার অবসর মেলে না। কিন্তু নতুন বৌদি যা ঘুমোন, যেন দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ। সে দিন দুপুরেও তিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন, নন্তুকে ডেকে নিয়ে অন্তু এসে চুপি চুপি ঢুকল ঘরে। ফিস ফিস করে বললে—আয় নন্তু একটা মজা করি। বৌদির চুলে আর বীণাদির চুলে গিঁট বেঁধে রাখি।

বৌদিকে নিয়ে মজা তারা প্রায়ই করে থাকে। অন্তুর মাথাতেই খেলে বুদ্ধি—নন্তু শুধু তার সঙ্গী থাকে। সে দিন কিন্তু অন্তুর মাথাতেই একটা ভাল ফন্দি এসে গেল। বললে—না না। তার থেকে বরঞ্চ এক কাজ কর্। কাজল লতা থেকে কাজল এনে বৌদির গোঁফ এঁকে রাখ।

মহা উৎসাহে অন্তু বললে—সেই ভাল।

অতি সাবধানে গোঁফ এঁকে রেখে অন্তু নন্তু পা টিপে টিপে ফিরে এল।

খানিক পরেই পাশের বাড়ীর মণ্টুদা এসে উপস্থিত। তিনি নন্তুর দাদা সুবীরের সমবয়সী, বন্ধু। বিয়েতে আসতে পারেন নি। সেদিন বাড়ী এসে বিশ্রাম করে খেয়ে দেয়েই এ বাড়ি এসে হাজির—"কোথায় রে, সুবীর কোথায়। বাপস্, এরই মধ্যে অন্দর মহলের কুণো বেড়াল। বেরো, শীগগীর বেরো বলছি। বউ কই, বউ দেখি। খুব নাকি সুন্দর বউ! তাঁর হাঁকডাকে সবাই বারান্দায় জড়ো। মণ্টু-দা সবুর করতে নারাজ। "আগে নতুন-বৌ দেখি, পরে কথা-বার্ত্তা।"

নন্তুর মা হেসে বললেন—"দাও গো বড় বৌ, ওকে বউ দেখিয়ে দাও। পুবের কোঠায় রয়েছে বুঝি।"

বাধা দিয়ে মণ্টুদা বললেন, "তা হবে না, সাজিয়ে এনে বৌ আমাকে দেখানো চলবে না। আমি নিজে গিয়েই দেখব। চলুন বড়বৌদি।"

বড়বৌদিকে এক রকম টানতে টানতে নিয়েই মণ্টু এসে দাঁড়াল পুবের কোঠার দোরে। পরক্ষণেই তার উচ্চ হাস্য-রোলে বাড়িঘর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। সুবীর এগিয়ে এল—"কি হল রে।"

—"দেখে যা, দেখে যা··এ কি বিয়ে করে এনেছিস, অন্ধ! হো হো হো হো।"

মহাবিস্মিত কৌতূহলী সুবীর এগিয়ে এসে উঁকি মারলে। নতুন-বৌ তখনো অঘোরে ঘুমিয়ে। তার মাথার ঘোমটা খুলে খসে-পড়া চুলের রাশি থরে-বিথরে ছড়ান। গভীর নিশ্বাসে থর থর কাঁপছে বক্ষ বাস। কিন্তু ঠোঁটের উপরে···! সুবীরও সশব্দে হেসে ফেললে। হকচকিয়ে জেগে নতুন-বৌ উঠে বসল। অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকাল এঁদের দিকে। অপরিচিত লোক দেখে টেনে দিলে ঘোমটা। সবাই হাসিতে উচ্ছল। পিসতুতো বৌদি হাসতে হাসতে বললেন—"ও সুষমা, তোর এ কি হ'ল। ঘুমোতে ঘুমোতে গোঁফ গজিয়ে গেল যে!"

—গোঁফ! নতুন-বৌ মুখে হাত দিতেই হাতে লেগে গেল কাজলের ছোপ। সবার প্রচণ্ড হাস্যধ্বনিতে দারুণ অপ্রস্তুত নতুন-বৌ মুখ ফিরিয়ে রইল। আরও কিছুক্ষণ হাসি-মস্করা করে মণ্টুদারা চলে যেতেই অন্তু এসে ঢুকল ঘরে। মহা উল্লাসে বললে—"কি বৌদি, কেমন জব্দ। আর অত ঘুমোবে?"

বৌদি তার গাল টিপে দিয়ে বললেন—"এ সব তোমারও বুদ্ধি—আমি জানি। এমন দুষ্টু ছেলে, বাবাঃ। এত বুদ্ধি মাথায় খেলে!"

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে নন্তুর মুখ শুকনো। এখন বৌদির কাছে যেতে তার সাহসই হয় নি। এত অপ্রস্তুত হয়ে বৌদি না জানি কতই রাগ করেছেন। যখন শুনবেন বুদ্ধিটা নন্তুর, আর হয়তো তার সঙ্গে কথাই বলবেন না। কিন্তু নন্তু তো মণ্টুদাদের কাছে বৌদিকে অপ্রস্তুত করতে চায় নি। তিনি কি তা বুঝবেন? অন্তু যখন লাফিয়ে গিয়ে বৌদির কোলের কাছে দাঁড়াল, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নন্তু থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ভারী অবাক হয়ে দেখলে বৌদি তো মোটে রাগ করলেন না! উল্টে অন্তুর কত আদর! নন্তুর সমস্ত দেহ মন ছুটে যেতে চাইল, গিয়ে বলতে ইচ্ছে করল—বুদ্ধিটা তার, অন্তুর নয়। একটু এগিয়েও গেল সে। কিন্তু দরজা অবধি গিয়ে আর যেতে পারল না। সব রাগ পড়ল অন্তুর উপরে। সে কি না একবারও নন্তুর নাম করলে না! আদর, প্রশংসা নিজে নিয়ে নিলে! শুম্ হয়ে নন্তু দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। এক সময় অন্তু যেই বেরিয়ে এল, সেও পেছন পেছন এল বারান্দায়। দাঁতে দাঁত চেপে বললে—"তুই এমন মিথ্যা-বাদী কেন রে!"

—"আমি মিথ্যেবাদী!"

—"নিশ্চয়ই। গোঁফ আঁকবার বুদ্ধিটা বুঝি তোর?"

অন্তু হেসে বললে—"ওঃ, এতদিনে তো ভারী একটা বুদ্ধি বাতলে দিয়েছিস! গোঁফ তো আমিই আঁকলাম, তোর এত সাহসই হ'ত না।"

"—না হ'ত না! তুই খুব জানিস? বৌদি তো আমার, তোর কি!

অন্তু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ফেললে—"তোর! তোর ক্ষমতা ছিল বৌদির সঙ্গে ভাব করবার? আমার পেছন ঘুরে বেড়িয়ে তবু একটু—"

আর যায় কোথায়? তীব্র অপ্রিয় সত্যি কথায় আঁতে

লাগল ঘা। নন্তু একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্তুর উপর।—বড় বেশী ডেমাক হয়েছে, ওর পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, বললেই হ'ল।

দেখতে দেখতে দুজনের মধ্যে বিষম লড়াই বেধে গেল। জড়াজড়ি করে দুজনে বারান্দায় গড়িয়ে চলল। অন্তু নিজেকে রক্ষা করতেই অস্থির। রুদ্ধ আক্রোশে নন্তু দু হাতে তাকে কিল মেরে খামচা দিয়ে অবরুদ্ধ রাগের প্রতিশোধ নিতে লাগল। চেঁচামেচিতে সবাই এল ছুটে। দোষ চাপল নন্তুর ঘাড়ে।

অন্তু দুদিনের জন্য বাড়ি এসেছে, তার অনেক আদর। তা ছাড়া নন্তুই ঝগড়া বাধিয়েছে। তার স্বভাব চাপা, কিন্তু একটু উগ্র, জেদী ধরণের, সবাই সেটা জানত। মা বাবা এসে নন্তুকে মারলেন, বকলেন। দাদা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখলেন চিলেকোঠার ঘরে। অন্তুকে এদিকে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হ'ল। নতুন-বৌদি তার ঘরে নিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলেন। চিলেকোঠার জানালা দিয়ে নন্তু সব দেখতে পেলে। মা বাবার মারের কথা তার মনে রইল না, চিলেকোঠায় বন্ধ হয়ে থাকাটাকে সে শাস্তি বলেই গণ্য করলে না। শুধু স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চিলেকোঠার জানলা দিয়ে—পুবের কোঠার ভিতরটা যেখান থেকে সুস্পষ্ট চোখে পড়ে।

সেজো কাকা দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন। বিয়ের পাঁচ ছ'দিন পরেই চলে গেলেন। অন্তু গেল, নন্তুর মনে প্রথমটা একটা ধাক্কা লাগল। দুজনে তারা প্রায় সমবয়সী, বছর খানেক, বছর দেড়েকের ছোটবড়। দেশে অন্তু বড় একটা আসে না। এবার এসে নন্তুর সঙ্গেই তার বিশেষ খাতির হয়েছিল। অন্তু আর নতুন বৌদি মিলে বলে কয়ে তাকে শান্ত করে সেদিনের ঝগড়াও দিয়েছিলেন মিটিয়ে। যাবার সময় অন্তু কেঁদেছিল। নন্তুকে বলেছিল—আমি তো আবার কবে আসব ঠিক নেই, তোর কত মজা, বৌদিকে নিয়ে থাকতে পারবি।"

তার দুঃখ-ভারাক্রান্ত স্বরে নন্তুর সেদিন এমন লাগল! সান্ত্বনা দিয়ে সে বলেছিল—"তোর তো আরও বেশী মজা। শহরে যাচ্ছিস…।"

অন্তু কতক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল—"শহরে যদি বৌদিকে পেতাম।—"

বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। মুখ শুকনো করে অন্তু যখন চলে গেল, নন্তু মুখে একটা ক্যাকাসে হাসি টেনে এনে কেমন এক ভাবে তাকিয়ে রইল—যে হাসি হাসে বর্ষণোন্মুখ-মেঘ-বিচ্ছুরিত গোধূলি-আলো। পিসিমা যেই বললেন—"নন্তুর মুখটা দেখ। বেচারারা একসঙ্গে দুজন ছিল, খেলা করত, আমোদ ফূর্তি করত, নতুন-বৌয়েরও খারাপ লাগছে।" নন্তু দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। বাড়ীর পেছনে তাদের জামতলাটাতে বসে রইল চুপ করে। প্রথম উচ্ছ্বাসটা কেটে যেতেই মনে পড়ল বৌদির কথা।—এবার, এবার তো সে নতুন-বৌদিকে একা পাবে। আর তো কেউ তার বাধা সৃষ্টি করতে আসবে না। এখন সে দেখে নেবে, কেমন সে বৌদির সঙ্গে ভাব জমাতে পারে না।

নন্তু মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সে দিনের ঝগড়ার পরে যদিও তাদের আবার ভাব হয়েছিল—তবু গোপন মনে নন্তু কেবলই চাইছিল—অন্তু চলে যাক্, তবেই সে বৌদিকে পাবে, একান্ত আপন করে পাবে, যেমন করে পেয়েছে অন্তু। সেই তো ইচ্ছে ক'রে নন্তুকে বৌদির সঙ্গে ভাব জমাতে দিচ্ছে না। এ ধারণাটা নন্তুর বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। নয় তো সে কেন নন্তুর বুদ্ধির কথাটা বৌদিকে জানাল না। মারামারি করে নন্তু যখন এত মার খেয়ে একটুও কাঁদলে না, অন্তু কেঁদে ফেললে। এ নিশ্চয় শুধু বৌদির আদর পাবার জন্যে। সে তাই কেবলই চাইছিল—অন্তুরা কবে যে চলে যাবে। জামতলার থেকে বাড়ি আসতে আসতে নন্তু খুশি হয়ে ভাবলে এবার সে নিষ্কণ্টক। যাক্।

কিন্তু দিন দুই পরেই নন্তু দেখল বৌদির সঙ্গে ভাব জমানো হচ্ছে না। অন্তুতে তাতে অনেক তফাৎ। অন্তুর মতো অতি সহজে আবদার ধরে রাত্রে সে বৌদির কাছে শুতে পারে না। বৌদি ডাকলেও শোবার সাহস তার হয় না। দাদাকে তার চিরকালের ভয়। অন্তুর মত ফস ক'রে বৌদির হাতের কলম টেনে নিয়ে বলতে পারে না—"বৌদি, তোমার বাবার চিঠি পরে লিখো, আগে আমাদের একটা গল্প বলতেই হবে। বলো, এক্ষুনি।"

অত কথা তার মুখেই যে জোগায় না। অন্তু থাকতে বরং তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সে খানিকটা সপ্রতিভ ছিল, এখন নিজের লজ্জায় সংকোচে মুখচোরা সে আরও পড়ল পিছিয়ে। বৌদির সঙ্গে খায়, কথাও বলে, গল্পও শোনে, এমন কি বৌদি তাকে আদর করে চুল আঁচড়ে সেণ্ট ঢেলে দেন। কিন্তু নন্তুর মন ভরে না। অন্তুর মত সে তো নিজেকে ধরা দিতে পারছে না। সেই উত্তাল আনন্দ তো জাগছে না, যেমন জাগাতো অন্তু। বৌদিও একদিন এই ধরণের কথাই বললেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নন্তু আনে ডাঁসা পেয়ারা, বড় বড় কালজাম। নিজের হাতে কিছুতে বৌদিকে দিতে পারে না। এমন লজ্জা করে! কখনও সে বেছে বেছে ভাল পেয়ারাগুলি বৌদির পাশে রেখে যায়। কখনও বা ছোট ভাইবোনদের হাতে দেয় পাঠিয়ে। বারবার করে বলে—"আমার নাম করিস কিন্তু, বুঝেছিস ?"

দু-তিন দিন পরে হঠাৎ সেদিন তাকে ধরে ফেলে বৌদি কাছে টেনে নিলেন।—"চুপি চুপি পেয়ারা পাঠিয়ে দিয়ে লুকিয়ে থাকা কেন, নন্তু? এমন লাজুক কেন তুমি। অন্তু হলে দেখতে, পেয়ারা এনে দিয়ে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে কত আনন্দ করত। মজা করত। বেটাছেলেদের অমনি চালাক চতুর হতে হয়, বুঝেছ? নয় তো লোকে বোকা বলে।"

নন্তু বুঝলে, প্রাণের গভীরে দাগ কেটে গেল, সে বুঝলে! নিজের অক্ষমতায় লজ্জায় আঘাত খেয়ে সে অত্যন্ত ম্লান হয়ে গেল। ম্রিয়মাণ হয়ে বৌদির আদর গ্রহণ করলে। নিবিড় ব্যথায় ভাবলে—অন্তু, এখনও অন্তু বৌদির মনে লেগে আছে।

বৌদির বাবা সেদিন বৌদিকে নিতে এলেন। নন্তুর

নিতান্ত ইচ্ছে যাবার। বারবারই চুপি চুপ মার কাছে বলতে লাগল—"আমি যাব মা, বৌদির সঙ্গে আমিও যাব।"

মা বললেন—যাস্ এখন। বৌ ত তোকে নিয়েই যেতে চাইছে।

নন্তু শুনে মুহূর্ত্তে কথাটা পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র করে দিলে, মহা উৎসাহে কাপড় জামা নিয়ে বৌদির কাছে গেল। তাঁর বাক্সে দেবে। বৌদিও সেদিন খুব উৎফুল্ল। কত কথা বলছেন, বাক্স গোছাচ্ছেন। আগ্রহে নন্তুর জামাকাপড় নিলেন। বাক্সে রাখতে রাখতে হঠাৎ বলে উঠলেন—"অন্তুটার ভারি ইচ্ছে ছিল আর একবার আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে যাবার। বারবারই সেকথা বলত। দাদা যে আসতে দেরি করে ফেললেন নয় তো সে যেতে পারত।"

নন্তুর আর সহ্য হ'ল না। গুমরে উঠে বললে—তোমার ত সব সময়েই শুধু অন্তু আর অন্তু! আমরা যেন কিছু না। তাকেই তুমি···।"

শুনে বৌদি তার দিকে ফিরে তাকালেন। আগের থেকেই জানতেন, অন্তুর উপরে নন্তুর একটা ঈর্ষা আছে। নন্তুর মুখ দেখেই ভাবটা বুঝলেন। চাপা হেসে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন—"সব্বার থেকে বেশী···"

এক মুহূর্ত্তে নন্তুর সমস্ত আনন্দ উৎসাহ নিভে গেল। বৌদির কথা শুনতেও আর দাঁড়াল না। তীব্র একটা কটাক্ষ হেনে বেগে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে—"সব্বার থেকে বেশী ভালোবাস গে। আমার তাতে কি, আমার কিছুই হবে না।"

এতদিন নন্তু অন্তুর দিকটাই দেখেছে, বৌদিও যে তাকেই সবথেকে বেশী ভালবাসেন, এ খেয়াল তার মোটেই হয় নি। কথাটা শুনে সে দিকটা চোখে পড়ল। সে কেবলই ভাবতে লাগল—"বেশ ত, অন্তুকে বেশী ভালবাসুক গে বৌদি, তাতে কি হয়েছে। আমার তাতে কিছু হবে না।"

রাত্রি আটটাতে ষ্টীমার। কিছু বেলা থাকতে থাকতেই বৌদির দাদা বৌদিকে এবং সুধীরকে নিয়ে চলে যাবেন। সবাই প্রস্তুত, নন্তুর দেখা নেই। সে যে দুপুর থেকে কোথায় গেছে কেউ জানে না। নতুন বৌ বারবার লোক পাঠিয়ে এদিক সেদিক খোঁজ করালে। প্রথমটা পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় বারে খোঁজ মিলল উকীল পট্টীতে। বললে—"আমি যাব না বলগে বৌদিকে।"

আবার লোক এসে তাড়া দিয়ে বললে—"বৌদি তোমাকে শীগ্‌গীর যেতে বলেছেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন যে।"

নন্তু তখন অন্যমনে ফুটবল খেলছে। কথাটা বোধ হয় তার কানেই গেল না।

যে এসেছিল সে বললে—"তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন, নেহ বিস্তু হাত-পা ধরে হিঁচড়ে টেনে। তুমি না কি রাগ করে এসেছ, বৌদি বললেন যে।"

শুনে অভিমানটা বেড়ে উঠল। বৌদি তবে তার রাগ বুঝেছেন। কিন্তু এ সময় সে কিছুতে যাবে না। অন্তুকে তিনি বেশী ভালবাসুন গে, এখন তাকে আবার ডাকাডাকি কেন।

লোক এসে ডেকে ডেকে সাধাসাধি ক'রে ফিরে গেল। সবে যখন ঝিকিমিকি বেলা, কাক লো নিঃসীম নীল আকাশতলে পাড়ি দিয়েছে, সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে অঙ্গনে, গাছ থেকে গাছতর হয়ে আসছে কালো জল—নন্তু বাড়ি ফিরে এল। নতুন বৌদিদের নৌকা তখন অনেকক্ষণ ছেড়ে চলে গেছে। নৌকার আঘাতে ক্ষীণ জলের ধারা, ছোট ছোট ঢেউগুলি কখন গেছে মিলিয়ে। বৌদিকে বিদায় দিতে এসে ঘাটে যারা জটলা পাকাচ্ছিল, একে একে তারাও ফিরছে ঘরে। নন্তুকে দেখে মা বলে উঠলেন—"হ্যাঁরে বোকাটা, এতক্ষণ ছিলি কোথায়। বৌর সঙ্গে গেলি নে কেন রে। তোকে সে কত ভালবাসে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে গেল। এই নে দেখ, তোকে লজেন্স খেতে একটা টাকা দিয়ে গেছে। খাবার নিয়ে বসে বসে তোর জন্যে ঢেকে রেখে গেছে রান্নাঘরে। হাত-পা ধুয়ে খা গিয়ে যা। বোকা, কিসের জন্যে গেলি নে।"

নন্তু কোনো কথা বললে না। শুধু তার ঠোঁটটা কেঁপে উঠল। সবাই ফিরে গেল ঘরে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল, আকাশে তারা ফুটতে লাগল, খালের জল অতি মৃদু ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে বয়ে যেতে লাগল। সেই অনন্ত আকাশের নীচে রাত্রির ঝাপসা অন্ধকারে পৃথিবীর এক কোণে ছোট্ট নন্তু একটা বিরাট্ অভিমানের ভার—একটা সুতীব্র ব্যথা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে ব্যথার ছন্দে বাজতে লাগল—কেন রাগ করে গেলাম না। কেন একটুক্ষণ আগে জানলাম না বৌদি আমাকে এত ভালবাসেন। তিনি নিশ্চয় মনে ব্যথা পেয়ে গেলেন।

ডুকরে উঠে রুদ্ধকণ্ঠে নন্তু বললে—"যাবো বৌদি, আমি যাবো, যাবো।"

কিন্তু খাল ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে বহুদূর-যাত্রী বৌদির কানে সে কথা পৌঁছল না।

শঙ্খমর্ম্মর

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

["Sea-Shell Murmurs"—Eugene Lee Hamilton]

মুলুবেলাস্তরপরে সাগরশঙ্খের বুকে সিন্ধুর কল্লোল
পুরাতন আবাসের স্মৃতি সে যে ঘোষিছে নিয়ত
উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ সমুদ্রের, প্রাণে আনে দোল।

সিন্ধুর কল্লোল সে কি? অশান্ত রক্তের ধ্বনি নহে সে আমার?
আশা ভীতি, ক্ষোভ—তার তালে তালে নহে ও স্পন্দন?
হৃদয়-আবর্ত্ত সাথে ঊর্ম্মিমালা সরে বারবার?

অন্তরের অন্তরালে সমুদ্রশঙ্খের সম কিসের আহ্বান?
মরলোক পরপারে স্বরগের অস্ফুট আভাস—
অদৃষ্ট সুদূর হ'তে কর্ণে মোর বাজে তারি তান।

মূঢ় আমি, ভাবি কভু; প্রতিধ্বনি অবাস্তব—ছলনা কেবল
শব্দময় ধমনীর গুঞ্জরণ শুনি' মোরা শুধু
মত্ত হই মিথ্যা লোভে—স্বপনমুখর হৃদিতল।

পুস্তক-পরিচয়

রাজনারায়ণ বসু—সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৪৯—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

ভারতবর্ষের উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। আজ যে সকল বিরাট্ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দেশের মনকে বিপুলভাবে আন্দোলিত করিতেছে তাহার মূলে তাঁহার চিন্তার প্রেরণা দেখিতে পাই। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তখনকার দিনের উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিয়া সিনিয়র স্কলার হন। মধুসূদন, ভূদেব প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী। সেকালের ইংরেজী শিক্ষায় চূড়ান্ত পারদর্শিতা লাভ করিলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার যে অসীম অনুরাগ ছিল তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাইকেলের "ক্যাপটিভ লেডী" পাঠ করিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন লেখেন, প্রত্যেক কবিযশঃপ্রার্থীর মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা করা কর্ত্তব্য। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে হেয়ার-স্মৃতি-সভায় স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলিয়াছিলেন, "পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্ত হয় না এবং আত্মভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই।" রাজনারায়ণ বসু রচিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়া নবগোপাল মিত্রের মনে 'হিন্দু মেলা'র ভাব প্রথম উদিত হয়। জাতীয় মহাসভার জন্মগ্রহণের বহুপূর্ব্বে ভাবী কংগ্রেসের আদর্শ তাঁহার রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'মহা হিন্দু সমিতি নামক একটি মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব' বিষয়ক "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" হিন্দু মহাসভারই পূর্ব্বাভাস। রাজনারায়ণ ইংরেজী ভাষায় এগারখানি এবং বাংলা ভাষায় ষোলখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "সে কাল ও এ কাল" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু এবং 'আদি সমাজে'র ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচরণ ও সাহিত্য-রচনার মূলে রহিয়াছে তাঁহার অসীম স্বদেশভক্তি। রাজনারায়ণ জানিতেন সকল পার্থিব বিষয়ে বাহ্য পরিবর্ত্তন স্বভাবসঙ্গত, উন্নতি পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন জাতীয় জীবনের মূল ধারাটি অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার গতি ভিন্নমুখী করিতে যাওয়া অন্যায় ও অস্বাভাবিক। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে এই বিরাট পুরুষের সুষ্ঠু এবং সুসম্পূর্ণ পরিচয় দান করিতে গ্রন্থকার যে সমর্থ হইয়াছেন পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। সুনির্ব্বাচিত রচনার নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়া রাজনারায়ণের আদর্শ ও চিন্তা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশী যুগের নেতা অরবিন্দের তিনি মাতামহ। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে তাঁহারই নিকট জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণকে কংগ্রেসের পিতামহ বলা হয়। এ নাম সত্যই সার্থক। লিপিকুশল যোগেশচন্দ্রের 'রাজনারায়ণ বসু' পাঠ করিয়া আজিকার পাঠক একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা



ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্জো ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

মহর্ষিদেবের ব্যাখ্যান তাঁর সুগভীর ব্রহ্মসাধনার অমৃতময় ফল। এই ব্যাখ্যানের প্রতি পৃষ্ঠা তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, পরমাত্মার সহিত নিবিড় যোগ এবং উচ্ছ্বসিত ঈশ্বর প্রেমের পরিচয় দেয়। জ্ঞানী, ভক্ত, বিশ্বাসী, পণ্ডিত যিনিই এই ব্যাখ্যান পাঠ করিবেন, তিনিই তৃপ্ত হইবেন, উপকৃত বোধ করিবেন, নূতন প্রেরণা পাইবেন। এমন কোন্ সৌন্দর্যপ্রিয় কবি আছেন যিনি "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" শীর্ষক ব্যাখ্যানটি পড়িয়া বিশ্বরাজের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইবেন। "আমি এখন ভূলোকেও নাই দ্যুলোকেও নাই, সেই পরমলোকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি।" এই বাণী পাঠ করিয়া কোন্ সাধকের চিত্ত সেই দিব্যানুভূতি লাভের জন্য ব্যাকুল না হইবে?

"তোমাকে দেখিতে দেখিতেই যেন আমার জীবন অবসান হয় এবং জীবনান্তে তোমার নূতন রাজ্যে জাগ্রত হইয়া যেন আবার তোমার মহিমা গান করিতে পারি" এই প্রার্থনায় যেন সকল বিশ্বাসীর সকল ভক্তের প্রাণের প্রার্থনাই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাখ্যান সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই সমান আদরণীয়।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

জনক-জননী-জনন—কমলাকান্ত। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, ৮ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ১৩১, মূল্য আড়াই টাকা।

মধুমতীর প্রতিবেশিনী জলেশ্বরী বন্দিনী। ইস্পাতে গড়া সরকারী সেতু জলেশ্বরীর জলধারাকে লুপ্তপ্রায় করে ধাতিসাঁর অধিবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিরক্ষর গ্রামবাসীরা ব্রত মানত তুকতাক ইত্যাদি করে নদীর পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী,—আধুনিক তরুণের দল কোদাল চালিয়ে নদীর সংস্কারকার্য্যে ব্রতী। ফলে গ্রামে নবীন ও প্রবীণ দুই দলে সংঘর্ষের সৃষ্টি। সেই সংঘর্ষ বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক গ্রামবাসীদের বিচিত্র চরিত্র উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। সংঘর্ষের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে একটি বেদনামধুর প্রেমের কাহিনী,—নায়ক তার তরুণ ব্রাহ্মণ বাদল, নায়িকা বনবাসী ওঝার মেয়ে উলুপী। বাদল অপরের অলক্ষ্যে সাবল চালিয়ে মজানদী জলেশ্বরীকে স্রোতস্বিনী করে তুললে, কিন্তু প্রাণ হারালে সেই স্রোতেরই জলে।

গ্রন্থকারের মন দরদী, ভাষা আবেগময়,—রচনা-শৈলী অতি আধুনিক। পাঠকের চমক লাগাতে গিয়ে উপন্যাসের কাহিনীকে তিনি অনুজ্জ্বল করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে অদ্ভুত বর্ণনা চোখে পড়ে,—যেমন 'কালো গ্রামো লিলি করে,'—'ও খোঁটা উপড়ানো ছেলে,'—উৎসাহের দৌড়ে চলা মাঝে মাঝে উচোট খেত'—ইত্যাদি।

উলূপীর বাবা নাকি ভদ্রবংশীয়—বিশেষ কোন কারণে ওরা সমাজে নিন্দিতা মেয়েকে নিয়ে ধাতিসাঁর কুচিবাগানে এসে বাস করছে, আর বাদল যায় সেখানে সাপের মন্ত্র শিখতে। এ কাহিনী শরচ্চন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র এক অধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।

শ্রীতারাপদ রাহা

বুকের ঋণ—শ্রীগৌরগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীহরি নারায়ণ সিংহ। গড়বাটি, পোঃ বুড়া শিবতলা। দাম দেড় টাকা।

নয়টি ছোট গল্পে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। দু-একটি বাদে বাকি গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নাই। কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

পরকীয়া (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, ৮ নম্বর শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

উপন্যাসখানি যে পাঠকমহলে সমাদৃত হইয়াছে তাহা ইহার একাধিক

সংস্করণ হইতেই বুঝা যায়। ইহার চরিত্রগুলি জীবন্ত, ভাষা এবং বর্ণনা-ভঙ্গীও চমৎকার, বিষয়বস্তুতেও অভিনবত্ব আছে। গ্রন্থখানির বহিঃ-সৌষ্ঠবও সুন্দর।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

পার্ল বাক—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রূপশ্রী পাবলিশার্স, ২১, ডব্লু সি বানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫২, মূল্য দশ আনা।

বিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা পার্ল বাক ১৮৯২ সালের জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ছিলেন মিশনারী। কন্যার জন্মের চারি মাস পরে এই শিশুকে তাঁহারা চীনদেশে তাঁহাদের কর্ম্মস্থলে লইয়া আসেন। এই মার্কিন বালিকা ইংরেজী শিখিবার পূর্ব্বে চীনা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইয়াংসি নদীর তীরে চিনিয়াং শহরে পার্ল বাকের বাল্যকালের কিছুদিন কাটিয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনের মধ্যে এক চীনা বুড়ীর নিকট বালিকা পার্ল চীনমুল্লুকের বিচিত্র গল্পগুলি শুনিত। পরে যখন পার্ল নিজে গল্প লিখিতে সুরু করিল তখন তাহার মাতা তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু এত ছোট বয়সের লেখা হইতেই তাহার মা বুঝিয়াছিলেন যে মেয়ের লেখার হাত আছে।

সাংহাই বোর্ডিং-স্কুলে পড়া শেষ করিয়া পার্ল আমেরিকায় পড়িতে যান। আমেরিকায় পাঠ্যাবস্থায় তিনি লিখিতে সুরু করেন এবং ছাত্র-মহলে সুলেখিকা বলিয়া নাম করেন। ১৯১৭ সনে অধ্যাপক জন্ এল বাকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২২ সাল হইতে তিনি নিয়মিত ভাবে লেখা সুরু করেন। ১৯২৫ সনে তাঁহার 'ইষ্ট উইণ্ড-ওয়েষ্ট উইণ্ড' নামক প্রথম উপন্যাস লিখিত হয়। ১৯২৭ সনে নানকিঙে রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া অতি কষ্টে জীবন বাঁচান। ইহার পরে কিছুদিন জাপানে বাস করিয়া ১৯২৯ সনে আমেরিকায় ফেরেন। ১৯৩০ সনে চীনে ফিরিয়া তিনি "দি গুড আর্থ" নামক উপন্যাসখানি শেষ করেন। বিক্রয়ের দিক দিয়া এই পুস্তক একটি নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। পরে এই বই কুড়িটি ভাষায় অনূদিত হয়। পার্ল বাক ১৯৩৮ সনে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পান। বর্ত্তমান সময়ে পার্ল বাকের মত দরদী সাহিত্যিক কমই আছেন। নিপীড়িত জাতিসমূহের, বিশেষতঃ চীনা ও ভারতবাসীর তথা এশিয়াবাসীর জন্য তাঁহার দরদ সুবিদিত। চীনের দুঃখ, দারিদ্র্যের চিত্র তাঁহার সাহিত্যে যেরূপ ফুটিয়াছে এরূপ আর কোথাও নহে। তাঁহার সহানুভূতি জাতি ও দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করিয়া যে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহা মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচনা করে।

লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় পার্ল বাকের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু। ১৬ বি, অশ্বিনী দত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০।

কলিকাতা বাংলার রাজধানী এবং যে পৌর-প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার পরিচালনা ও শাসনভার ন্যস্ত আছে, তাহা সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রিত ও বাঙালীর একান্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্যের এই বৃহত্তম নগরী ও ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা শহরের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তার উহার কর্পোরেশনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ এবং উহার গঠন ও শাসন ব্যবস্থার বিষয় জানা সকল বাঙালীরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ও নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী মহাশয় এই বইখানি লিখিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রথম তিনটি সুলিখিত অধ্যায়ে ঐ সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে কর্পোরেশনের বার্ষিক আয়ব্যয়, জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, আলোকের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, যানবাহনাদি, বাজার ও কলিকাতার লোকসংখ্যা, স্বাস্থ্যবিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এই সঙ্গে কলিকাতার অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান-সমূহ যথা বাঙলার গবর্ণমেণ্ট, পোর্ট-ট্রাষ্ট, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট ও পুলিশবিভাগ এবং ইলেকট্রিক কর্পোরেশন, গ্যাস কোম্পানী, টেলিফোন দমকল, রেডিও প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এক কথায় কলিকাতা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ডাক্তারের দিগ্বিজয় (ষ্টোরি অফ ডাঃ ডুলিট্ল)—অনুবাদক শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹।

আমরা ইতিপূর্ব্বে 'রাশিয়ার রাজদূত' বা 'মাইকেল ষ্ট্রগফে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে এই লেখকের অনুবাদ-কুশলতার পরিচয় দিয়াছি। এই কৌতুকপূর্ণ উপন্যাসখানি সরস ও স্বচ্ছন্দ বর্ণনায় মৌলিকত্বের দাবি করিতে পারে। হিউ লফটিং লিখিত এই গ্রন্থখানি ছেলেবুড়ো সকলকেই আনন্দ দান করিবে। পোড্লবির ডাক্তার ডুলিট্ল ভালমানুষ সুচিকিৎসক কিন্তু পশুপক্ষীর প্রতি মাত্রাধিক প্রীতিবশতঃ মানুষের ডাক্তারি ছাড়িয়া পশুপক্ষীর ডাক্তারিই সমীচীন মনে করিলেন। অবশেষে ভাগ্যান্বেষণের তাড়নায় ও বানররাজ্যে মড়ক সারাইবার জন্য সুদূর আফ্রিকায় তাঁহার যাত্রা সুরু হইল। তাঁহার আফ্রিকা-অভিযান ও প্রত্যাবর্ত্তনের রোমাঞ্চকর কাহিনী ছেলেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করিবে। পশুপক্ষীর ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রাণীজগতের দরদী বন্ধু এই সদাশয় ডাক্তারের দিগ্বিজয়কাহিনী শিশু-সাহিত্যে এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। আফ্রিকার কৃতজ্ঞ জানোয়ারগণ এখনও ডাক্তারের কথা স্মরণ করিয়া উন্মনা হয়। বহু রেখাচিত্র বইটিকে মনোজ্ঞ ও সুরসাল করিয়াছে। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকার শিশুসাহিত্যে এক নূতন জিনিষ উপঢৌকন দিয়াছেন।

গল্প হলেও সত্যি (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ৸৹ ও ।৶৹।

ভারতের ও বাংলার মনীষিগণের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় গ্রন্থকার যে টুক্‌রা কাহিনীগুলি লিখিয়াছিলেন, সেইগুলি একত্র করিয়া এই দুই খণ্ড পুস্তকের আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বইটিতে ভারতের ও বাংলার, যাঁহাদের বিষয় সমস্ত বাঙালী ছেলেমেয়েরই জানা উচিত, সেই দেশপূজ্য বরণীয় মহাপুরুষগণের জীবন সম্বন্ধে এমন এক একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়া লেখক তাঁহাদের কিশোরদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে তাঁহাদের বিষয় জানিতে অধিকতর আগ্রহশীল হইয়া উঠে। গল্পগুলি এমন প্রাণবন্ত ও সরসভাবে লিখিত হইয়াছে যে পড়িবামাত্র মহৎ জীবনের প্রতি উদ্দীপনা ও আবেগে চিত্ত ভরিয়া উঠে। প্রথম খণ্ডে প্রত্যেক গল্পের সহিত মনীষিগণের একটি রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে সকলের চিত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই এবং অনেক মনীষীর জীবন-কথা বাদ পড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটিদ্বয় সংশোধন করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডকে পূর্ণাঙ্গ করিবেন, এরূপ আশা গ্রন্থকার দিয়াছেন। দুই খণ্ড পুস্তকেরই তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। বইটি যে কতদূর সময়োপযোগী ও সুকল্পিত হইয়াছে, অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ প্রচুর কাটতিই তাহার প্রমাণ।

দক্ষিণ-ভারতে বঙ্গবালিকা—কুমারী হৈমন্তী দাসগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান—মুরাদপুর, পাটনা। মূল্য ১৸৶৹।

বয়সে অল্প ও স্কুলের ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও বইখানি লেখিকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বাহুল্যবর্জ্জিত সহজ ও সরল বর্ণনার গুণে ভ্রমণপ্রিয় পাঠকের তৃপ্তি সাধন করিবে। লেখিকা পিতার সহিত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল দর্শনীয় স্থানেই ঘুরিয়াছেন, উত্তর ভারত সম্বন্ধেও তাঁহার একখানি ভ্রমণকাহিনী লিখিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—স্বামী শঙ্করানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার পূর্ব্বপ্রকাশিত পরমহংস চরিতাবলীর সাহায্যে ধারাবাহিক চৌদ্দটি অধ্যায়ে এই চরিত-কথা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ভক্তসমাগম এবং ইয়ং বেঙ্গলদের আগমন-প্রসঙ্গ হইতে উল্লেখযোগ্য কোন কোন ভক্ত ও ভক্তিমতীদের নাম বাদ পড়িয়াছে কেন বুঝা গেল না। ভাষা বেশ সহজ ও ভক্তিভাবপূর্ণ। অল্পের ভিতর এরূপ সুমহান্ জীবনালেখ্য দর্শনের সুযোগদানের প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। এ জাতীয় মহজ্জীবন কথা যত বেশী প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে ততই দেশ ও জাতির ভিতর সহজ সরল মহাপবিত্র মানব-জীবনের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ প্রসারিত হইয়া শান্তির মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রাত্রি—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি-১৩ গণেশ-চন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। পৃ. ৪২৩, মূল্য পাঁচ টাকা।

বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গী এই উভয় দিক দিয়াই এই বিরাট্ উপন্যাসটির অভিনবত্ব আছে। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী তরুণ-তরুণী ইহার পাত্রপাত্রী। যুগধর্ম্মের প্রভাবে রাজনীতিই ইহাদের প্রায় সকলেরই ভাবনা এবং সাধনা। কেহবা আদর্শবিচ্যুত হইয়া উন্মার্গগামী। ইহাদের মনস্তত্ত্ব এবং মতবাদ বিশ্লেষণে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাই এবং বর্ত্তমান বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্ম্মকে রসবস্তুতে পরিণত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হই।

উপন্যাসটি মননপ্রধান,—মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি ত্রুটির পরিচয় পাই যাহা রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করিয়াছে। পাত্রপাত্রীদের সংলাপ স্থানে স্থানে বক্তৃতাভারাক্রান্ত এবং কাহিনী অপেক্ষা চিন্তা, বর্ণনা অপেক্ষা বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিবার দিকে লেখকের মানসিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে রসবোধ পীড়িত হইলেও আসলে লেখক যে খাঁটি শিল্পীমনের অধিকারী তাহার পরিচয় মেলে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসিকতায়, ভাষার প্রসাধননৈপুণ্যে এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায়। তাঁহার ভাষার বেগ এবং স্থানে স্থানে বর্ণনার আবেগ মনকে মুগ্ধ করে।

উপন্যাসটিতে বিংশ শতাব্দীর অভিশাপে অভিশপ্ত, ভাবুক রাজনৈতিক কর্ম্মী, অর্থের উপাসক, সাহিত্যিক সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ব্যর্থ সাধনার ছবি জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া সঞ্চয়ের সাধনায় রত হইয়াছিল নায়ক(?) সুদাস, কিন্তু শেষে পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যেও তাঁর নিঃসঙ্গ আত্মার মর্ম্মবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তমিস্রাবৃত রাত্রির আকাশ, তার অন্তরের অন্তরতম স্থলে আসিয়া পৌঁছে বুভুক্ষু নরনারীর ক্রন্দন "একটু ফ্যান দাও।" যাদের বঞ্চিত করিয়া তার এই ভোগৈশ্বর্য্য তাদের আর্ত্তনাদ তার চিত্তকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। রাত্রির অন্ধকারে বুভুক্ষুর মিছিল দেখিয়া ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর আদর্শবাদী প্রবীরের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এই চরাচরব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখিতে পায় একমাত্র কমুনিষ্ট প্রবীরের বোন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত অনু। "সেই বিরাট্ দরিদ্রের মন কি আজ বাংলার নিঃস্ব প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। তাঁর ব্যাকুল কামনা মাটিতে জন্ম নেবে না কি তার পর? বাংলার কঙ্কালের উপর তৈরি হবে না তার ছবি?" অনুর এ অনুভূতি পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকেও নবীন আশায় উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। রাত্রির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া জাতির জীবন-প্রভাতের জয়গান যেন তাহারও কানে আসিয়া পৌঁছে।

মহানগরী—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩৫২, মূল্য ৪৲ টাকা।

অগণিত জনপরিপূর্ণ কর্ম্মরথচক্রঘর্ঘরধ্বনিমুখরিত সদা প্রাণচঞ্চল মহানগরীর অন্তর-সত্তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কথাশিল্পী লাভ করিয়াছেন বিরাটের স্পর্শ। সুদূরপ্রসারিত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, দিকচিহ্নহীন ঊর্ম্মিমুখর মহাসমুদ্র ও নিঃসীম নীলাকাশের মতই মহানগরীর বহুধাবিচিত্র বিকাশ এর প্রবহমান জীবনধারা তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছে অনন্তের অনুভূতি। নায়কের জবানিতে তিনি বলিয়াছেন, "মহাকাশের টুকরা ও মহাসমুদ্রের অংশ দিয়া তৈয়ারী এই মহানগরী"। এই মহানগরীর বিরাট্ পটভূমিকায় যে অনন্ত প্রাণলীলা—সকল সাধনা ও অপসাধনা, সফলতা ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া উঠিতেছে তাহাই তাঁহার রসকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া এই উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। উপন্যাসখানা পড়িলে মনে হয় এ শুধু কাহিনীবর্ণন বা চরিত্রচিত্রণ নয়, এ যেন মহানগরীর আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনের সার্থক প্রয়াস। মহানগরীর বুকে পাশাপাশি চলিয়াছে আলো আর অন্ধকারের লীলা। ইহার একদিকে আছে উপচীয়মান সম্পদ আর বিলাসোপকরণের প্রাচুর্য্য—আর এক দিকে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য অজ্ঞানতা অশিক্ষা কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত অন্ধকার আর দুর্গত নরনারীর মর্ম্মভেদী হাহাকার। মহানগরীর যে দিককার ছবি লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত ও সংস্কৃতিবান সম্প্রদায়ের স্বর্গলোকের ছবি। ইহারই সম্বন্ধে নায়ক সুপ্রিয় বলিতেছে—"সে শহরের জ্ঞানে মানুষের ললাট ও চক্ষু প্রোজ্জ্বল, মননশক্তিতে তার সাহিত্যে বিশ্ব-সাহিত্যের সগোত্রীয়, কর্ম্মপ্রবাহে কালস্রোত সেখানে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবহমান।" মহানগরীর এই আলোকোজ্জ্বল দিক রামপদ বাবুর সন্ধানী রশ্মি সম্পাতে সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মহানগরীর আংশিক ছবি—প্রদীপের নীচেই গভীর অন্ধকার।

উপন্যাসের কাহিনীটি রসঘন: নায়ক সুপ্রিয় কবি, রোমান্সধর্ম্মী ও ভাববিলাসী তাহার মন। পল্লীর দুঃখদৈন্যময় আবেষ্টন হইতে মহানগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও অভিজাত দেশনেতা নীতীশবাবুর পরিবারে আসিয়া শুধু যে জীবন সম্বন্ধেই তাহার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল তাহা নয়, আশ্রয়দাতার কন্যা ইলার সাহচর্য্যে তাহার অন্তরগুহাশায়ী সুপ্ত প্রণয়দেবতারও জাগরণ হইল, কিন্তু সেই দেবতার অভিষেক হইল ভোগৈশ্বর্য্যের জাঁকজমকের মধ্যে নহে, বিরলোপকরণ অনুর গৃহে তার মৌন আত্মসমর্পণে। নীতিশবাবুর চরিত্রটি লেখকের সার্থক সৃষ্টি। বাহিরের দিক দিয়া তাঁহার জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাহ্যিক সফলতার পিছনে তাঁহার জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী, সম্পদের মধ্যেও তাঁর অতৃপ্ত আত্মার বুভুক্ষার কথা এমনি দরদ দিয়া লেখক বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা পাঠকচিত্তে গভীর রেখপাত করে। উপসংহারে বিপ্লবের আগুনে রেবা আর স্মরজিতের আত্মাহুতির কাহিনী করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

চিত্র পরিচয়

পটমঞ্জরী

বিয়োগিনী কান্তবিশীর্ণগাত্রা
স্রজং বহন্তী বপুষা চ শুষ্কা।
আশ্বাস্যমানা প্রিয়য়া চ সখ্যা
ব "পটমঞ্জরীয়ম্॥
সংগীত দর্পণম্ শ্রীদামোদরমিশ্রকৃত।

পটমঞ্জরী একটি রাগিণী বিশেষ। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার ধ্যান নিম্নলিখিত রূপ—কান্তা মনোরমা, বিশীর্ণগাত্রা, প্রিয়-বিরহকৃশ, মাল্যধারিণী, ধূসরাঙ্গী পটমঞ্জরী প্রিয়সখী দ্বারা আশ্বাস্যমান হইতেছেন।

দেশ-বিদেশের কথা

হিন্দু তীর্থযাত্রী-রক্ষা-সমিতি

বিগত ১২ই জানুয়ারী তারিখে ডায়মণ্ড হারবারের জেটি ভাঙিয়া পড়ায় যে কি শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থযাত্রী শত শত হিন্দু নরনারী এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেকে গুরুতর রূপে আহত হয়। এ ধরণের শোকাবহ ব্যাপার ভবিষ্যতে আর যাহাতে না ঘটে সেইজন্য কলিকাতার ৫নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ হিন্দু তীর্থযাত্রী-রক্ষা-সমিতি বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এই সমিতির সভাপতি এবং কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার কবিরাজ সত্যব্রত সেন ইহার সাধারণ সম্পাদক। ডায়মণ্ড হারবারের দুর্ঘটনার পর ১৪ই জানুয়ারী তারিখে এই সমিতির প্রতিনিধিবর্গ এক সভায় সমবেত হইয়া বিষয়টি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার মূলগত কারণগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ষ্টীমার কোম্পানীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তীব্র নিন্দা করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হিন্দু তীর্থযাত্রী-রক্ষা-সমিতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত মেলা অনুষ্ঠিত না হইলে এ ধরণের এবং অনুরূপ অন্যান্য দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে কার্য্যকরী উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সমিতি শীঘ্রই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া একটি সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন।

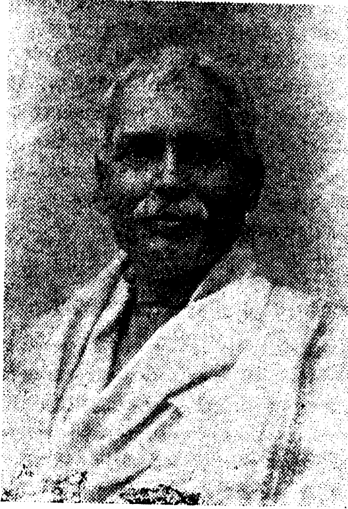
সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কপিলমুনি মন্দির সংরক্ষণও আর একটি গুরুতর সমস্যা। দ্বীপের তটভূমি বৎসরের পর বৎসর যে ভাবে ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাতে শীঘ্র এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে মন্দিরটি অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা ষোল আনা বিদ্যমান। সুতরাং সমগ্র হিন্দু-সমাজেরই এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। হিন্দু তীর্থযাত্রী-রক্ষা-সমিতি দ্বীপের কোনো নিরাপদ স্থানে কপিলমুনি মন্দিরটির পুনর্নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অবিলম্বে একটি সর্ব্বভারতীয় সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, এই প্রস্তাব হিন্দুমাত্রেরই আন্তরিক সমর্থন লাভ করিবে।

প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

কটকের ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রলাল বসু মহাশয়ের পুত্র রেভেন্‌শা কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅমিয় বসু এ বৎসর (১৯৪৬) উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ-কলেজ বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চ্যান্সেলর্‌স্ পুরস্কার পাইয়াছেন। সমস্ত উৎকলবাসী ছাত্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত লক্ষণ নায়েক স্মৃতি-প্রতিযোগিতাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও আই-এস্‌সি পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট স্কলারশিপও লাভ করিয়াছিলেন।

অঘোরনাথ অধিকারী

গত ২৯শে ডিসেম্বর সুযোগ্য শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।



অঘোরনাথ অধিকারী

অঘোরনাথ পাবনা শহরের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যার্জ্জন সমাপ্তির পর তিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং বঙ্গভঙ্গের আমলে আসামে, শিলচর নর্ম্যাল ট্রেনিং স্কুলের সুপারিটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। এই বিদ্যায়তনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। আসামে অবস্থানকালে অঘোরনাথ কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার অনুন্নত পাটনী সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার আদমসুমারী সম্পর্কিত গবেষণার ফলে তিনি ইংলণ্ডের 'রয়াল এ্যানথ্রপলজিক্যাল সোসাইটি'র সভ্য মনোনীত হন। সুরমা-উপত্যকা শিক্ষক-সম্মেলনের তিনি প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। বালিগঞ্জ মহিলা-বিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম ছিলেন। গড়িয়াহাট বাজারের প্রতিষ্ঠাও অংশতঃ তাঁহারই উদ্যমে হইয়াছিল। কলিকাতা নাগরিক-সংঘের তিনি একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন এবং ইহার সহকারী সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি এই সংঘের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'কলিকাতা-বাসী'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি একজন সুবক্তাও ছিলেন। বহুবাজার ও বালিগঞ্জের নারী-কল্যাণ আশ্রম ইত্যাদি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অঘোরনাথের রচিত শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকসমূহের মধ্যে 'বিবিধ-বিধান', 'পদার্থ পরিচয়' ইত্যাদি সুধীজনসমাদৃত।

সুরেন্দ্রনাথ দে

বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিৎ গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দে, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) বাহাত্তর বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দেবশঙ্কর দে ছিলেন রিপন কলেজের অধ্যাপক।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাস করেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যায় উপাধিলাভ করেন। প্রথমে উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বিজ্ঞান-শিক্ষকরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়, তারপর তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, শেষে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাসায়নিকের পদলাভ করেন। শেষোক্ত পদে তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। বেঙ্গল পাবলিক হেলথ লেবরেটরী নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার সময় হইতেই সহকারী রাসায়নিক রূপে ইহাতে তিনি যোগ দেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই উদ্যোগে ডি. পি. এইচ. ক্লাস খোলা হইবার পর রাসায়নিকের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ক্লাসেও তিনি অধ্যাপনা করিতেন। অতঃপর তিনি নব প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল আবগারী গবেষণাগারে (Excise Laboratory) প্রধান রাসায়নিকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বহু রাসায়নিক সমিতি এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনিই তাঁহার সৌজন্য, সততা, সরলতা এবং আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইতেন।

কৃতী প্রবাসী বাঙালী

শ্রীযুক্ত ঊষানাথ চট্টোপাধ্যায় এবৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ডক্টর অব সায়ান্স উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।



শ্রীঊষানাথ চট্টোপাধ্যায়

ইতিপূর্ব্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভ করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এখন পর্য্যন্ত ডি-ফিল এবং ডি-এসসি এই উভয় ডিগ্রি তিনি ব্যতীত অপর কেহই পান নাই। তাঁহার গবেষণা এদেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রশংসা লাভ করিয়াছে। উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে তাঁহার উল্লেখ আছে।

জেলা-সাহিত্য-সম্মেলন

সম্প্রতি বাঁকুড়া ও খুলনায় দুইটি জেলা-সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয় রামচন্দ্রপুরে শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে। এই উপলক্ষ্যে নির্ম্মিত "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মণ্ডপ", "চণ্ডীদাস" ও "রামাই পণ্ডিত" তোরণ এই সম্মেলনকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়াছিল।

দক্ষিণ শ্রীপুরে অনুষ্ঠিত খুলনা জেলা সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবি শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত, উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী। "প্রফুল্লচন্দ্র রায়" মণ্ডপ, "রবীন্দ্র" "শরৎ" "সুভাষ" তোরণ সম্মেলনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ যদি স্ব-স্ব জেলায় এই ধরনের সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন করেন তবে তাহাদ্বারা বাংলা সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।



কলিকাতায় কবি করুণানিধান সম্বর্দ্ধনা। উপবিষ্ট (বামদিক হইতে) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

'জাপানীজ্ নিউজ্ এজেন্সী'র শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। তিনি বিগত ১৮ই আগষ্ট জাপানে এক বিমান-দুর্ঘটনার ফলে গুরুতররূপে আহত হন। ঐ দিনই মধ্যরাত্রিতে হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তাঁহার পরলোকগমনে ভারতীয় জাতীয় জীবনে যে অপরিসীম ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুভাষচন্দ্র আজীবন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই আজ শোকাভিভূত ও স্তম্ভিত।

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার রাজধানী কটক শহরে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রায় বাহাদুর স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু তাঁহার পিতা। তিনি বহুকাল সরকারী উকীল রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন ও কটক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পিতা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য জানকীনাথ তাঁহার সবকয়টি পুত্রকে ইউরোপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় গবর্ণমেন্টের নীতির তীব্র প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে জানকীনাথ পরলোকগমন করেন।

সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী দেবীও একজন ধর্ম্মপরায়ণা ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। পুত্রদিগের যথাকর্ত্তব্য যত্ন লইতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার প্রভাব তাঁহার সবকয়টি পুত্র-কন্যার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রভাবতী দেবী ১৯৪৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

সুভাষচন্দ্রকে মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র অত্যধিক স্নেহ করিতেন। সুভাষচন্দ্রও কোন কাজ শরৎচন্দ্রের অনুমতি ব্যতিরেকে করিতেন না।

কটকের এক প্রোটেষ্ট্যান্ট স্কুলে সাত বৎসর পড়িবার পর সুভাষচন্দ্র র‍্যাভেন শ' কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। উক্ত বিদ্যালয় হইতেই তিনি ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানলাভ করেন।

উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। উক্ত কলেজ হইতেই তিনি ১৯১৫ সালে আই-এ পাস করেন। সুভাষচন্দ্র অতঃপর বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে মিঃ সি. এফ. ওটেন নামে একজন ইউরোপীয়ান অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করিতেন যে, ভারতীয় ছাত্রমাত্রেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সম্মান-বোধ সুভাষচন্দ্রের মনে এরূপভাবে জাগরূক ছিল যে, তিনি উক্ত অধ্যাপকের আচরণে বিশেষ ভাবেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন।

একদিন মিঃ ওটেন তাঁহার স্বাভাবিক ঔদ্ধত্যের বশবর্ত্তী হইয়া একটি ছাত্রকে চপেটাঘাত করেন। ইহাতে উক্ত কলেজের ছাত্র-সমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাহারা ধর্ম্মঘট করে। সুভাষচন্দ্র উক্ত ধর্ম্মঘটের প্রধান নেতা ছিলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিক্ষোভ দমনে ভীত হইয়া উঠেন এবং ছাত্রদের অনুকূলে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ইহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত মিঃ ওটেন ছাত্রদের সহিত ব্যবহারে সংযত হইয়াই চলিতেন; কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। অচিরেই পুনরায় তাঁহার স্বভাবগত অহমিকা প্রকাশ পাইল। একদিন তিনি পুনরায় কতকগুলি ছাত্রকে অপমানিত করিলেন। ইহাতে কয়েকজন ছাত্র মিঃ ওটেনকে ভীষণভাবে প্রহার করেন। কলেজের অধ্যক্ষ ভবিষ্যতে এইরূপভাবে কলেজের শান্তিভঙ্গ হইতে পারে ভাবিয়া জনকয়েক ছাত্রকে কলেজ হইতে বিতাড়িত করেন। সুভাষচন্দ্রও ছিলেন ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুভাষচন্দ্রের উপর এই মর্ম্মে এক আদেশ দেন যে, তিনি দুই বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই দিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় অধ্যয়ন করিবার অনুমতি লাভ করেন ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতেই তিনি ১৯১৭ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর তিনি ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তখন তিনি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান লইয়া এম্-এ পড়িতেছিলেন। নয় মাস পরে ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস্ পরীক্ষা দেন এবং উক্ত পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই সময় তিনি মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপজ সহ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিগ্রিলাভ করেন।

১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে 'অসহযোগ আন্দোলন' প্রবর্ত্তনের জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সমগ্র দেশবাসী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন। সুভাষচন্দ্র তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে এই সময় তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পদ ত্যাগ করিলেন। উক্ত উচ্চ রাজকীয় পদ তিনি কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তদুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

'I had passed the Indian Civil Service in England in 1920, but finding that it would be impossible to serve both masters at the same time—namely, the British Government and my Country—I resigned my post in May, 1921 and hurried back to India, with a

view to taking my place in the national struggle that was then in full swing.'

১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অবশেষে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার পরামর্শমত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন।

ঐ বৎসরেই মে মাসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সর্ব্ব-বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রচারকার্য্যের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর কংগ্রেস ও খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে, তাহার প্রতিবাদে কংগ্রেস-নেতা ও বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সমস্ত সভ্যকে বঙ্গীয় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান জানানো হয়। এই সূত্রে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য কয়েক-জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২২ সালে সুভাষ-চন্দ্র কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই বৎসর উত্তরবঙ্গে এক প্রবল বন্যা হয়। উক্ত বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চলের জনগণের সাহায্যকল্পে তিনি তথায় গমন করেন। উত্তরবঙ্গের সেবা-কার্য্যে সুভাষচন্দ্র অসামান্য সংগঠনশক্তি ও অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত তিনি 'ভারতীয় জাতীয় মহাসভা'র গয়া অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯২৩ সাল হইতে তিনি 'বাংলার কথা' নামক এক দৈনিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। পরে দেশবন্ধু পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পত্র পরিচালনাদির ভার গ্রহণ করেন।

১৯২৪ সালে 'স্বরাজ্যদল' কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ইহাতে উক্ত দল অন্যান্য দল অপেক্ষা ভোটাধিক্যে জয়ী হওয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন।

সুভাষচন্দ্র মাত্র ছয় মাস কাল চীফ একজিকিউটিভ অফি-সারের কার্য্য করেন। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর কলিকাতায় ডেপুটি পুলিস কমিশনার 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারের পর কিছুদিন আলিপুর ও বহরমপুর জেলে আটক রাখিয়া সুভাষচন্দ্রকে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হয়। মান্দালয়ে কারাবাসকালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে ও তাঁহার শরীরে ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৯২৭ সালের ১৫ই মে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সুভাষ-চন্দ্র মুক্তিলাভ করেন।

'ভারতীয় জাতীয় মহাসভা'র ত্রিচত্বারিংশৎ অধিবেশন ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং রূপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনা করেন। ১৯২৭ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩০ সালে তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগারে থাকা কালেই আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ঐ বৎসরেই ২৩শে সেপ্টেম্বর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৩২ সালে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এক বৎসর কারারুদ্ধ থাকিবার পর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইউরোপে গমন করিবার অনুমতি দেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যদিও তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতের বাহিরে অবাধ স্বাধীনতা দেন নাই।

ইউরোপে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র তাঁহার পিতার অসুস্থতার সংবাদ অবগত হন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত ইউরোপ ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে রওনা হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যেদিন তিনি ভারতের উপকূলে অবতরণ করেন সেইদিনই তাঁহার পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেইজন্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও সুভাষচন্দ্র পিতাকে জীবিত দেখিতে পান নাই। তিনি ইহার পর কিছু-দিনের জন্য পৈতৃক বাসভবনে থাকিতে মনস্থ করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এক সপ্তাহের মধ্যে ইউরোপে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন। সুভাষচন্দ্র স্বদেশে একমাস থাকিতে চাহিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"Incarceration in my country is better than freedom abroad."

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ১৯৩৪ সালের ১০ই জানুয়ারী পুনরায় সুভাষচন্দ্রকে ভারত ত্যাগ করিতে হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু সরকার তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি স্বাধীনভাবে ভারতে ফিরিতে পারিবেন না। সুভাষচন্দ্র এই নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করিয়াই ভারতে চলিয়া আসেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবা-মাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাঁচ বৎসরকাল বন্দীজীবন অতিবাহিত করিবার পর ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার একপঞ্চাশত্তম অধিবেশন হরিপুরায় অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য চারি জনের নাম উল্লিখিত হয়। ইঁহারা হইলেন সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু ও খান আবদুল গফ্‌ফার খাঁন। কিন্তু আর তিন জন নিজ নিজ নাম প্রত্যাহার করায় সুভাষচন্দ্রই ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

ইহার পর বৎসর তিনি ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ত্রিপুরীর অধিবেশন একটি বিশেষ স্মরণীয়

ব্যাপার। উক্ত নির্ব্বাচনে সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত ভোটের সমষ্টি ছিল ২৯৫৭। তন্মধ্যে সুভাষচন্দ্র পাইয়াছিলেন ১৫৮০টি ভোট; ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া পাইয়াছিলেন ১৩৭৭টি ভোট।

এই সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনার ফলেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য পদত্যাগ করেন।

যখন সুভাষচন্দ্র দেখিলেন যে মৈত্রীস্থাপনের সকল পথ বন্ধ তখন তিনি দেশে একতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁহার পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর করিলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতাদের এইরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হন। স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এই সময় 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি দল গঠন করিলেন।

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ তিনি রামগড়ে অনুষ্ঠিত আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই বৎসরই জুন মাসে তাঁহার নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবি উত্থাপিত হয়। গবর্ণমেণ্ট ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু তিনি দেশবাসীর অন্তরে যে দেশাত্মবোধের বহ্নি জ্বালাইয়া গেলেন তাহা নির্ব্বাপিত হইল না, আন্দোলন চলিতে লাগিল। ইহার ফলে বাংলা-সরকার হল্‌ওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত করিতে বাধ্য হইলেন।

ঐ বৎসরই ৩০শে আগষ্ট 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় 'হিসাব নিকাশের দিন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, এবং তাহার কারাদণ্ডও হয়। কারাবাস কালেই তিনি বিনা বাধায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৪০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্র লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া নির্জ্জন গৃহে ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই নিভৃত বাসকালে তাঁহার সহিত মৌলানা আজাদের কয়েকখানি পত্র বিনিময় হয়।

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র স্বীয় বাসগৃহ হইতে রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট হন। ঐ বৎসরই ৩রা ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দেন। ইহার কিছুকাল পরে এক গুজব রটিয়াছিল যে সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তিনি হয় রোম নয় বার্লিনে অবস্থান করিতেছেন।

১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ লণ্ডন হইতে রয়টার কর্ত্তৃক বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, শ্রীযুক্ত বসু জাপানের উপকূলে বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। টোকিও হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত সংবাদে আরও জানানো হয় যে, দলবল সহ সুভাষচন্দ্রের 'স্বাধীন ভারত কংগ্রেসে'র অধিবেশনে যোগদানের নিমিত্ত টোকিও আসিবার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই উক্ত সংবাদ ভ্রান্ত বলিয়া খবর পাওয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই 'বোম্বে ক্রনিকেলে'র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা জানান যে, সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরীতে আছেন এবং জার্ম্মান অধিনায়ক হের হিটলার তাঁহাকে 'ভারতের ফুয়েরার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা আরও বলেন যে, তিনি জার্মানীতে পররাষ্ট্র-দূতের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অবশেষে এমন কথাও শুনা গেল যে, জাপান যখন ভারত জয় করিতে উদ্যত তখন সুভাষ-চন্দ্র 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' নামক এক সৈন্যবাহিনীকে ভারতের দিকে চালিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের অপচেষ্টা আজ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতকে বৈদেশিক শক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্তই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তিনি আত্মত্যাগের যে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসে বিরল।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী কমলা

শ্রীমতী কমলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিন্দীতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন ভারতীয় ভাষাসমূহের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যেই তিনি সর্ব্বাধিক নম্বর পাইয়াছেন। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি অনার্স লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে 'প্রেমচাঁদ' সম্পর্কে গবেষণা-কার্য্যে রত আছেন। এম্-এ পরীক্ষাকালে তিনি তাঁহার গবেষণার একটি খসড়া প্রদান করেন।

শ্রীমতী কমলা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদের কন্যা। ঈশ্বরীপ্রসাদ নিজেও এক জন লেখক ও সমালোচক।

"বাঙালীর ব্যায়াম-চর্চ্চা"

(সংযোজনী)

শ্রীশান্তি পাল

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সাঁতারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গুণেন্দ্রনাথ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বাগানে (চাপদানী) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী বাগানে (পেনিটির ছাতুবাবুর বাগান) থাকিতেন। কথিত আছে, সাঁতার কাটিবার পূর্ব্বে তাঁহারা পরস্পর বন্দুকের আওয়াজ করিয়া জলে নামিতেন। তারপর সাঁতরাইয়া ভাগীরথীর মাঝ-খানে আসিয়া উভয়ে মিলিত হইতেন। তখন উভয়ে মিলিয়া গঙ্গার এক তীরের দিকে যাত্রা করিতেন।

* * *

ভারতবিখ্যাত গোঙা পালোয়ান কলিকাতায় আসিলে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে উঠিতেন। ঠাকুরবাড়ীর কুস্তির আখড়ার একটি নাম ছিল "চোরের আখড়া"। ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের মধ্যে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি চোরের আখড়ায় নিয়মিত শরীরচর্চ্চা করিতেন।

বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণের প্রতি

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে দৈনিক সংবাদপত্রাদি যেরূপ উচ্চহারে বিজ্ঞাপনের মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ লইয়া অত্যধিক লাভবান হইয়াছেন, সে তুলনায় উচ্চমূল্যের হোয়াইট প্রিন্টিং কাগজে সবিজ্ঞাপন মাসিকপত্র মুদ্রণ করিয়া বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার আমরা খুব সামান্যই বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমরা অতিরিক্ত লাভের আশায় না মাতিয়া যুদ্ধাবসানে কাগজের মূল্য হ্রাস হইলে যুদ্ধকালের ঘাটতি পূরণ হইবার আশায় ছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের মূল্য আশানুরূপ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা শীঘ্র ত দূরের কথা বহু বিলম্বেও হইবে কিনা সন্দেহ! এরূপ অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার মহার্ঘতা এবং মুদ্রণ-ব্যবসায়ে অপরিমিত ব্যয়-বাহুল্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইলে বিজ্ঞাপনের মূল্য সম্ভবপর হারে বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিউজপ্রিণ্টিং-এর মত কম মূল্যের খেলো কাগজে ছাপিয়াও যে সব মাসিকপত্র বহু পূর্ব্ব হইতেই যে হারে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতেছেন, আমাদের এই বৃদ্ধি সেই হারকে কিছুতেই অতিক্রম করিবে না।

আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তায় এই যৎসামান্য বৃদ্ধির হার আমাদের শুভানুধ্যায়ী বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণ প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের চির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রক্ষা করিবেন, এই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

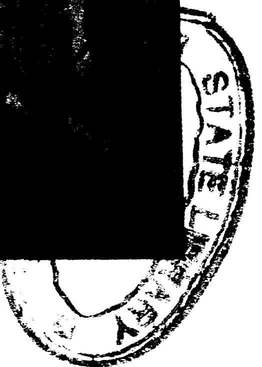
আগামী ১৩৫৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে চলিত হারের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে বিজ্ঞাপনের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে। যাঁহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতে লিখিত চুক্তি আছে, তাঁহাদের চুক্তিকাল অতিক্রম হওয়ামাত্র নূতন হার ধার্য্য হইবে। এই বর্দ্ধিত হার নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বিজ্ঞাপনমূল্যের হার

	সাধারণ	সূচী
পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲	৬৫৲
অর্দ্ধ "	৩২৲	৩৫৲
সিকি "	১৮৲	২০৲
সিকি কলাম ও অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	১০৲	১২৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার মূল্য স্বতন্ত্র)

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস : প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।



ব্রহ্মকুণ্ড, রাজগৃহ
শ্রীবিমল রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কোপে স্বাধীনতাকামী ইন্দো-চীন



প্রাচীন কালের প্রস্তরনির্ম্মিত সর্পমূর্ত্তি, সম্মুখে বালক-বালিকা



হুয়ে নামক স্থানে স্বামী সহ আনামী রাজকন্যা



দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রদান রত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদলীয় নেতা অধ্যাপক রবার্ট রিচার্ডস

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ষ শেষ

ইতিহাসের কয়েক পাতা উল্টাইবার পর আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতে চলিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতিরই ইতিহাস এই সঙ্গেই নূতন অধ্যায়ের অন্তর্গত হইবে কিন্তু কাহার ভবিষ্যতে কি অঙ্কপাত হইবে তাহা নির্ভর করে কোন দেশের কর্ণধারবর্গ কিরূপ সজাগ ও সতেজ তাহারই উপর। অতীত শেষ হইয়া ভবিষ্যৎ সামনে আসিয়া পড়িতেছে এ কথা সকল দেশেই ঘোষিত হইতেছে, আমাদের দেশেও সেরূপ ঘোষণার কোনও অভাব নাই। তবে এ দেশের সহিত অন্য দেশের কিছু প্রভেদ আছে এই কারণে যে এখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা আপাততঃ স্থির হইবে তর্ক ও মন্ত্রণা সভায়, যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, এবং বিচারের সময়ও আসন্ন। স্বাধীন দেশগুলিতে জনমতের প্রভাবে নেতৃবর্গ কর্ত্তব্যপথের নির্দ্দেশ ইতিমধ্যেই দিতে বাধ্য হইয়াছেন, যদিও সেই কর্ত্তব্যপথ কোথায়ও সরল বা বিপদ বৈষম্যমুক্ত দেখা যায় না। বিজিত দেশে বিজেতৃবর্গেরই দম্ভপূর্ণ ঘোষণা শোনা যাইতেছে, বিজিতের দল নির্ব্বাক-নিস্পন্দ, ম্রিয়মাণ। অন্য কয়েকটি অনুন্নত দেশে ধর্ষিত প্রপীড়িত দেশবাসীর অবস্থা বাঘ ও মহিষের যুদ্ধে উলুখড়ের অবস্থার সমতুল, বিশেষে ইরাণের পরিস্থিতি এখন অতিশয় শঙ্কাপূর্ণ। ইন্দোচীনে পরাজিত ফরাসী শাসকবর্গ অন্যের শক্তিসামর্থ্যের বশে, অপরের চেষ্টায়, স্বাধীনতা পাইবার পর নির্লজ্জভাবে অতীতের অনাচার, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের পথ অস্ত্রবলে ভবিষ্যতে খুলিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পর এখন বুদ্ধিকৌশলের আশ্রয় লইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ শাসকও সেই চেষ্টায় ব্যস্ত, কেবলমাত্র ভারতেই শাসকবর্গ, কার্য্যকারণবশতঃ, স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যবাদের নীতি ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন। আমাদের নেতৃবর্গ আমাদের বলিতেছেন এখন ধীরস্থিরভাবে ভবিষ্যতে কি আসে তাহার প্রতীক্ষা করিতে, প্রথম হইতেই অবিশ্বাসের হাওয়ায় না টলিতে এবং এই পরামর্শ সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এখন নেতৃবর্গের সমস্ত দৃষ্টি এক দিকেই নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, বিচার সভায় আলোচ্য বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও চিত্তবিক্ষেপকারী প্রবন্ধের অবতারণা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু নেতৃবর্গের উচিত প্রতি পদে অতি সাবধানে চলা এবং দেশবাসীর মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ করা। নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহাদের যদিওবা থাকে তাহা হইলেও একথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান যে তাঁহাদের দায়িত্ব এতই গুরুভার যে তাহা নিজ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করা বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ ও আলোড়নের ফলে অগ্নিময় প্রস্তরদ্রব বহিয়া চলে। তাহা আশপাশের ভূমিস্তর ভাঙ্গিয়া গলাইয়া চলিতে থাকে, অগ্নিপ্লাবনের উত্তাপ কমিয়া যাইলে স্রোত ক্রমে স্থানবদ্ধ হয়, কিন্তু যেখানে এই ঘটনা ঘটে সেখানের প্রাকৃতিক অবস্থার স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটে। সমতল অঞ্চল পাহাড়ে প্রস্তরে ভরিয়া যায় আবার অনেক ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী ভাঙ্গিয়া উপত্যকায় পরিণত হয়। মাটির উপরের ভাগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মাটির নীচে ভূগর্ভেরও অনেক অদল বদল ঘটে। প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের ফলে, ফুটন্ত রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ জলস্রোতের প্রভাবে নূতন খনিজ উৎপন্ন হয়, প্রাচীন খনিজ স্তর পরিবর্ত্তিত হয়। কালের প্রভাবে, প্রাকৃতিক শক্তির সাধারণ কার্য্যফলে এই সকল অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বা তাহার অভাব সে অঞ্চলের লোকের অবস্থায়ও বিশেষ পরিবর্ত্তন আনে।

মনুষ্যজগতে জাতিসমষ্টির মধ্যে যে সকল ঘাত-প্রতিঘাত —অর্থাৎ যুদ্ধ বিপ্লব—ঘটে তাহাও ঐরূপ গভীর নিহিত বিদ্বেষ বহ্নির উত্তাপ ও আলোড়নের ফল। প্রাকৃতিক অগ্নি-প্লাবনের ন্যায় উহারও গতিবিধি নির্দ্ধারণ মনুষ্যশক্তির অতীত, উহার ফলে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাও ভূগর্ভস্থিত খনির জন্মের ন্যায় মানুষের চক্ষুর অগোচর। যে ভূস্তরের উপর অগ্নিপ্লাবন চলিয়া যায় তাহাতে বা প্লাবনের দ্রবে যদি যথেষ্ট মৌলিক বা যৌগিক ধাতু বা অন্য মূল্যবান পদার্থ থাকে তবেই সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তেমনিই যদি যুদ্ধবিপ্লব মনুষ্যসমাজ গঠনের উপযুক্ত মালমশলা যোগায় বা তাহার সুযোগ গ্রহণের উপযুক্ত লোকসমষ্টি তাহার দ্বারা প্রভাবিত হয় তবেই সে দেশের জাতীয় জীবনে নূতন তেজ, নূতন সংস্কৃতি দেখা দেয়, সে দেশের জাতীয় জীবনে পুনর্জ্জাগরণ আরম্ভ হয়। কিন্তু জাগরণের সময় নির্দ্দেশ

করে সজাগ প্রহরী, খনির সন্ধান দেয় নিপুণ ভূতত্ত্ববিদ। জাতির ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করে নিপুণ বিশেষজ্ঞ পরিবেষ্টিত নেতৃমণ্ডল, খনির কার্য্য চালায় কর্ম্মতৎপর ও বিচক্ষণ চালকবর্গ এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত কলা-কৌশল বিশারদগণ ও সুদক্ষ শ্রমিক। কোন ক্ষেত্রেই কপাল ঠুকিয়া বা একমাত্র নিজ বুদ্ধিমত্তার উপর বিশ্বাস করিয়া চলিলে সুফল আসে না। দৈবদুর্ব্বিপাকের ফলে কাহারও হয় সুযোগ কাহারও বা সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হয় সেই-ই যে চতুর্দ্দিক দেখিয়া বুঝিয়া অগ্রসর হয়।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কোনও দলের বা কোনও লোকের একলার সৃষ্টি নহে। এবং উপরন্তু এদেশের ভবিতব্য এখন কাহারও সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে। ইংরেজ অভিজ্ঞ ও বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার ফলে কুশলী। সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। চারি দিকের আবহাওয়ার উপর তাহার দৃষ্টি আছে এবং সে বিশেষতঃ বহির্জ্জগতের উপর তাহার কার্য্য-প্রকরণের প্রতিক্রিয়ার বিষয় অতিশয় সচেতন। ইংরেজের প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের অভিসন্ধির উপর কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিজেদের দেশের উন্নতি ও উপকার। সে উন্নতি ও উপকারের পথ যতই প্রশস্ত হয় ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু সে পথ ও আমাদের পথ সকল ক্ষেত্রে এক না হওয়াই সম্ভব। সুতরাং দুই দিকেই লাভ-ক্ষতির হিসাবের নিরূপণ অতি সুদক্ষভাবে হওয়া উচিত। উপরন্তু বিগত চল্লিশ বর্ষাধিক এদেশে সাম্রাজ্যবাদ অনুমোদিত যে ভেদনীতি চলিয়াছে তাহার বিষময় ফলে দেশ এখনও পীড়িত এবং দেশে সুবিধাবাদ এখনও জাগ্রত। এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের নেতৃবর্গের অতি সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। যেন সাময়িক সুবিধা বা মেকী জয়লাভের জন্য তাঁহারা দেশে স্থায়ী বিপদ না ডাকিয়া আনেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এ দেশের ভবিষ্যৎ এখন কাহারও সম্পূর্ণ আয়ত্তে নাই, সুতরাং এ কথাও বলা প্রয়োজন যে অনেক বিষয়ে আমাদের হরিষে-বিষাদের জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। স্বরাজ আসিতেছে নিশ্চয়, কিন্তু স্বরাজ ও সুদিন এক সঙ্গে না আসিতেও পারে।

ভারত-সরকারের বাজেট

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অর্থসচিব সর আর্চিবল্ড রোলাণ্ডস ভারত-সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৫৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘাট্‌তি হইবে উহার চেয়ে কম, ১৪৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ১৯৪৬-৪৭ সালে মোট ৪৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। আগামী বৎসরেও অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার দেড় বৎসর পরেও যুদ্ধের ব্যয়ই থাকিবে বাজেটের সবচেয়ে বড় বরাদ্দ। সাধারণ শাসনের জন্য যত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ ধরা হইয়াছে সমর বিভাগের জন্য। ১৯৪৫-৪৬ সালে যুদ্ধের ব্যয়-বাবদ ৩৯৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৪৫-এর এপ্রিল হইতে এই খরচ আরম্ভ হইবার কথা। ঐ বৎসরেই যে মাসে জার্ম্মানীর সহিত এবং আগষ্ট মাসে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বাজেট আরম্ভের ছয় মাসের মধ্যে দুইটি যুদ্ধই শেষ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ব্যয় অর্দ্ধেক কমা ত দূরের কথা, মাত্র ১৮ কোটি টাকা কম খরচ হইয়াছে। ছয় মাস যুদ্ধ না থাকা সত্ত্বেও এত টাকা কি বাবদ কেন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত হিসাব কেন্দ্রীয়-পরিষদের সদস্যেরা দাবি করিবেন আশা করি। আগামী বৎসরও সমর বিভাগের জন্য ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহাও অস্বাভাবিক বেশী হইয়াছে দেশবাসী ইহা মনে করে, কেন্দ্রীয় পরিষদের অনেক সদস্যও তাহাই বলিয়াছেন। সরকারের কৈফিয়ৎ এই যে, সৈন্যদের কর্ম্মচ্যুত করিতে সময় লাগিবে, তাহার জন্য এই বরাদ্দ প্রয়োজন।

সমর বিভাগের ব্যয় আগামী বৎসরও এত বেশী হওয়ার আর একটি কারণ-স্বরূপ অর্থসচিব বলিয়াছেন যে জাপানে ভারতীয় সৈন্য ও নৌবহর মোতায়েন করিয়া জাপান শাসনের সুযোগ ভারতবাসীকে দিয়া তাহাদের সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবাসীর ইহাতে দুই কারণে আপত্তি আছে। প্রথমতঃ এই যুদ্ধ তাহার অভিপ্রেত ছিল না, ইংরেজের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আপত্তি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে উহাতে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশে, বিশেষতঃ এশিয়ায়, সৈন্য মোতায়েন করিয়া সঙ্গীন উঁচাইয়া মোড়লী করিবার ইচ্ছা ভারতবাসীর নাই; এরূপ কার্য্য আমরা গুরুতর অন্যায় বলিয়া মনে করি। যুদ্ধে জাপান পরাজিত হইয়াছে, আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার সৈন্য ও নৌবহর চূর্ণ হইয়াছে। ইহার পর জাপান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাই ক্ষাত্রধর্ম্মসম্মত ছিল। ইংরেজ ও আমেরিকা পরাজিত জাপানের বুকে চাপিয়া বসিয়া তাহার ধর্ম্ম সমাজ শিক্ষা প্রভৃতিতে যে ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ভারতবাসী তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, এরূপ ব্যবহার সভ্যতার আদর্শ সম্মত বলিয়া তাহারা মনে করে না। এই অন্যায়ের মধ্যে ভারতবাসী যাইতে চাহিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষকে এই ভাবে জড়াইয়া লওয়ার আসল অর্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আর্থিক দায়ের একটা মোটা অংশ ভারতীয় করদাতাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া, ইহা দেশের লোক আজকাল বুঝিতে শিখিয়াছে। ইংরেজের প্রয়োজনে ইংরেজের স্বার্থে ভারতীয় করদাতারা একটি পাই-পয়সাও ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক, আমরা আশা করি কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যেরা ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

কর সম্বন্ধে অনেক অদলবদল হইয়াছে। অতিরিক্ত লাভকর উঠিয়া গিয়াছে। কোম্পানীর লভ্যাংশের উপর এবং ম্যানেজিং এজেন্সির কমিশনের উপর মোটা হারে কর না বসাইলে ইহাতে যুদ্ধোত্তর দেশের উন্নতির পরিকল্পনায় বাধা ঘটিবে। অতিরিক্ত লাভকর পণ্যমূল্য বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ ছিল সত্য, কিন্তু যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ভারতবর্ষের দেশী ও বিলাতী কারখানার মালিকেরা সরকারের সহিত ভাগে কারবার করিয়া এত পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে ইহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন না করিলে ক্রেতৃ-সাধারণের পক্ষে শোষণ হইতে রেহাই পাওয়া কঠিন হইবে। এই বাজেটেই গরিবের উপর ট্যাক্স অনেকাংশে

কমানো যাইত বলিয়া আমরা মনে করি। তাহা না করিয়া বরঞ্চ নানাদিকে তার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অর্থসচিব সুপারির উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইয়াছেন। ফলে দেশী সুপারিরও দাম বাড়িয়া সুপারি-ব্যবসায়ীদের অন্যায় লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়ে সুপারির দর ছিল মণকরা দশ বা এগারো টাকা। উহার উপর ট্যাক্স বসানোর ফলে গত কয়েক বৎসর যাবৎ সুপারির দাম বাড়িয়া পঞ্চাশ টাকা মণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাজেট প্রকাশের পর উহা আরও বাড়িয়া প্রায় আশি টাকা হইয়াছে। গরিবের একটি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের দর এইরূপে আটগুণ বাড়াইয়া দেওয়া আমরা গুরুতর অন্যায় বলিয়া মনে করি। সুপারি ছাড়া তামাকের উপরও চড়া হারে ট্যাক্স বসানো হইয়াছে। দেশলাই এবং লবণের ট্যাক্স কমাইয়া গরিবদের একটু স্বস্তির নিশ্বাস তাঁহারা ফেলিতে দিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ভারত-সরকারের অর্থ-সচিবের বক্তৃতায় বুঝা যায় তাঁহারও ধারণা এ দেশের গ্রামবাসী সাধারণ লোকদের হাতে অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছে, সুতরাং গরিবের উপর ট্যাক্স না কমাইলেও চলে। এই ধারণা সর্ব্বৈব মিথ্যা। সরকার কর্ত্তৃক কৃষিজাত পণ্যক্রয়ের সময় গ্রামবাসী প্রকৃতপক্ষে কত টাকা পাইয়াছে তাহার একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হইলেই দেখা যাইত গ্রামবাসীর হাতে অতিরিক্ত টাকা তো জমেই নাই, অধিকন্তু জিনিষপত্রের উচ্চ মূল্যের জন্য সে যাহা হাতে পাইয়াছে জীবনধারণের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। ফলে বহুলোক পুরানো পুঁজি ভাঙিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, ভিটামাটি ছাড়া হইয়া পথে পথে ঘুরিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। ভারত-সরকারের বাজেটের সবচেয়ে বড় গলদ—গরিবকে স্বস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা উহাতে করা হয় নাই।

অতিরিক্ত লাভ-করের বদলে অনুরূপ কর স্থাপন করিয়া অতিরিক্ত লাভ-করের অর্দ্ধেক আন্দাজ আয়ের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান বাজেটে যৌথ কারবার ইত্যাদিতে শতকরা পাঁচ টাকার বেশী ডিভিডেণ্ড প্রদত্ত হইলে সেই আয়ের উপর যে কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা দ্বিগুণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যদিকে বিদেশে মৃত্যুর পর সম্পত্তির উপর যেরূপ শুল্ক ধরা হয় সেইরূপ "ডেথ ডিউটি" এদেশে স্থাপন করার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় নূতন বিল অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসবে পণ্ডিত নেহরু

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন প্রধান অতিথি। প্রথমে ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ইংরেজী ভাষায় লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া পণ্ডিত নেহরু মৌখিক বক্তৃতা করেন। প্রথমেই তিনি বলেন, "কাজের চাপে আমি আমার মুখের কথা ছাপাইয়া হাতে লইয়া আসিতে পারি নাই। আজকার এই অনুষ্ঠানে হৃদয়গ্রাহী বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু বক্তৃতা করিবার মত ভাল বাংলা আমি জানি না বলিয়া বাধ্য হইয়া আমাকে ইংরেজীতে বলিতে হইতেছে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

"ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, ভারতীয় শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়কে এখন হইতেই স্বাধীন ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিবার জন্য পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে", ইহাই পণ্ডিতজীর সর্ব্বপ্রধান বক্তব্য। ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ পাল বলেন স্বাধীনতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত ছাত্রসমাজের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ সবচেয়ে বড় কাজ। পণ্ডিতজী তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন স্বাধীনতা সমাগত, সুতরাং স্বাধীন ভারতের সমস্যা সমাধানে এখনই ছাত্রদের মন দিতে হইবে। সর্ব্বশেষে চ্যান্সেলার সর ফ্রেডারিক ব্যারোজ বলেন, পণ্ডিতজীর সহিত তিনি একমত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আসন্ন।

ভারতে পৌনে দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের অবসান আজ সকল ক্ষেত্রেই সূচিত হইতেছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের কোন সমস্যার সমাধানই করিতে পারে নাই। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ এই ব্যবস্থারই ফল। বাংলার দুর্ভিক্ষে বুঝা গিয়াছে আমাদের দেশেও এই সমাজ-ব্যবস্থা চলিবে না, সাধারণ মানুষের মূল অধিকার স্বীকার করিয়া উহা অব্যাহত রাখিবার উপযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। কাজ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। বাংলার দুর্ভিক্ষের পর বিদেশী গবর্মেণ্ট পশুবলের জোরে কয়েকদিন টিকিয়া থাকিতে পারে, স্বদেশী গবর্মেণ্ট একদিনের মধ্যে ভাসিয়া যাইত।

ভারতবর্ষ বহু সহস্র বৎসর এশিয়ার সকল দেশের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব আজও সুস্পষ্ট। ইংরেজই প্রথম ভারতবর্ষকে বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। বাহিরে যাওয়ার সমস্ত স্থলপথ ও জলপথ এমনভাবে পাহারা দেওয়া হয় যে ইংরেজের অনুমতি ভিন্ন কাহারও ভারতের বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। এইভাবে ভারতবর্ষকে এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরেজ ভারতবাসীকে আচারে ব্যবহারে ও মনোভাবে মেকী সাহেব করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে; এই বিরাট্ দেশকে এশিয়ার বুক হইতে উৎপাটিত করিয়া ইউরোপের সহিত জুড়িয়া দিতে চাহে। ভারতবাসীর চোখ ফুটিয়াছে, আর সে ইংরেজের নকলনবিশ হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছুক নয়।

ভারতের স্বাধীনতা শুধু ভারতের মঙ্গলের জন্যই নয়, এশিয়ার মানবসমাজের কল্যাণের জন্যই ভারতের মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। এশিয়ায় ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও পশ্চিম-এশিয়াকে দাবাইয়া রাখিতে হইলে ভারতবর্ষে ঘাঁটি না করিয়া উপায় নাই। সামরিক দিক হইতে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অথবা পরাধীনতার উপর নির্ভর করে। এশিয়ার সমস্ত অনুন্নত দেশ ভারতকে তাহাদের নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করে। সমগ্র এশিয়ার উপর ভারতের প্রভাব অসীম। অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত পুনর্ব্বার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে

পারিবে। স্বাধীন ভারত নিজেই তাহার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি নির্দ্ধারণ করিবে।

স্বাধীন ভারতের নেতৃত্বে পূর্ব্বগরিমায় এশিয়ার পুনরভ্যুদয় ঘটিতেও বিলম্ব হইবে না। দুই মহাযুদ্ধে ইউরোপ বিধ্বস্ত হইয়াছে, বিশ্বের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর কেন্দ্র আমেরিকায় সরিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে এশিয়াও তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইতে বাধ্য হইবে। দ্রুতগতিতে এশিয়া কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেকার গৌরবময় অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে ইহা অনিবার্য্য। এই পরিবর্ত্তন কি ভাবে কোন্ পথে আসিবে পণ্ডিতজী তাহা বলিতে পারেন নাই। সামরিক শক্তির দিক দিয়া তিনি বিচার করেন নাই। তিনি বলেন আমরা এমন এক অবস্থার মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি যে পৃথিবীর দেশগুলি আজও যদি সামরিক শক্তির কথাই চিন্তা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহারা পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। সামরিক শক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে ইহার সমাধান করিতে হইবে। সামরিক শক্তি অপেক্ষা প্রাণশক্তি অনেক বড়, আত্মার বল অনেক উচ্চ। এই প্রাণশক্তি যখন মানুষকে অগ্রগতির পথে লইয়া যায় তখনই মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। এশিয়ার বহু জাতি ও ভারতবর্ষ এই প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই আজ তাহাদের এই দুরবস্থা। অতীতে তাহারা প্রভূত পরিমাণেই এই শক্তির অধিকারী ছিল। পণ্ডিতজী বলেন আমরা আবার এই প্রাণশক্তি ফিরিয়া পাইতেছি। ভাবীযুগের পৃথিবীতে এশিয়া আবার মানুষকে শান্তির সন্ধান দিবে, আর সেই মহান্ ব্রত পূর্ণ করিবার নেতৃত্ব আসিবে ভারতবাসীর হাতে। এই নূতন ভারতের উপযুক্ত করিয়া নরনারী গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

ছাত্রসমাজের সমস্যা ও দায়িত্ব

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসবে ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তিনি ছাত্রসমাজের কয়েকটি গুরুতর সমস্যা ও দায়িত্বের কথা গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাংলার ছাত্রসমাজের সম্মুখে আজ যে সমস্যা, যে দ্বিধা, যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, যে ভাবাদর্শের সংঘাতে ছাত্র-মন আজ দোলায়িত হইতেছে তাহার মধ্যে ডাঃ পালের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ বিশেষ অর্থব্যঞ্জক হইবে।

প্রথমতঃ এই কথা ডাঃ পাল অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে জাতীয় জীবনের সর্ব্বগ্রাসী অভিশাপ পরাধীনতা এবং পরাধীন জাতির পক্ষে নৈতিক আদর্শ ও আত্মিক মহত্ত্ব বজায় রাখা বিশেষ দুরূহ। যে দুর্নীতির উপরে পরাধীনতার কাঠামোকে স্থায়ী করা হয়, সেই দুর্নীতি জাতির সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি স্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণশক্তিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। কাজেই আজ যখন বাংলার নরনারীকে নৈতিক আদর্শের উপদেশ দেওয়া হয় তখন এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে একমাত্র স্বাধীনতার উন্মুক্ত আকাশেই নৈতিক মহত্বের বিকাশ সম্ভব। অন্নাভাবে প্রপীড়িত, রুগ্ন, শীর্ণ নরনারীর পক্ষে চরিত্রবল সঞ্চয় করা অত্যন্ত দুরূহ। এই প্রসঙ্গে ডাঃ পাল পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ উইলিয়ম কোভের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। ভারতের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির জন্য লর্ড সিংহের মন্তব্যের উত্তরে মিঃ কোভ বলেন, "আমি লর্ড সিংহকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, যে জাতি অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে সেই জাতি কি ভাবে চরিত্র গঠন করিতে পারে।" মিঃ কোভ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে ভারতীয়গণ চরিত্রগঠনে সমর্থ হইবে ইহা আশা করা অন্যায়।

ডাঃ পাল আর একটি সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ছাত্রদের কর্ত্তব্য ও রাজনীতির সম্বন্ধ সম্পর্কে যে বিতর্ক চলিতেছিল সেই বিষয়ে তাঁহার ইঙ্গিত অর্থপূর্ণ। যে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা এতকাল 'গোলামখানা' বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে প্রাজ্ঞ ভাইস-চ্যান্সেলার তীব্র ভাষায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে আজ প্রত্যেক ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান।

এই সন্ধিক্ষণে ছাত্রশক্তিকে নিরন্তর সন্দেহের দোলায় পীড়িত করা নেতৃবৃন্দের পক্ষে বুদ্ধির কাজ নয়, এবং ডাঃ পালের এই কঠোর নির্দ্দেশ বাংলার ছাত্রসমাজ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে পরাধীনতা জীবনে যে দুর্নীতি আনে তাহাতে ছাত্রদের কি করিবার আছে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্রবৃন্দ এই মুহূর্ত্তে কি কাজ করিতে পারে।

এ কথা যেমন সত্য যে পরাধীন দেশে চরিত্রগঠন অসম্ভব, তেমনই একথাও সত্য যে এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করা একমাত্র ছাত্রসমাজেরই সাধ্যায়ত্ত। বাংলার ছাত্রসমাজের কাছে আজ সমস্যা বহুবিধ। সমগ্র দেশ যখন দুর্ভিক্ষ, অনশন ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছে তখন এক দল দায়িত্বজ্ঞানহীন, নীচমনা মুনাফাখোর কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী এই মৃত্যুকে আরও ভয়াবহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অভাব ও দুরবস্থা শুধু দেহকেই ধ্বংস করে না, মনকেও বিনষ্ট করে। কাজেই আমাদের ভয় দেশের দুর্নীতি দেশের দুঃখকে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিবে। এই সময় একমাত্র ছাত্রদের উপরেই জাতির আশা, তাঁহারাই নিঃস্বার্থ কর্ম্মদ্বারা এবং সঙ্ঘবদ্ধ সক্রিয় প্রতিবাদদ্বারা দুর্নীতির প্রভাব দূর করিতে পারেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামেও ছাত্রদের বর্ত্তমান দায়িত্ব সুস্পষ্ট। বাংলার প্রধান সমস্যা আজ আসন্ন খাদ্যাভাব। এই দুর্ভিক্ষ যাহাতে আমাদের আলস্য, অজ্ঞতা এবং লোভের ফলে আরও ভয়াবহ না হয় সেইজন্য ছাত্রদের উচিত দেশের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা। বহু ছাত্র গ্রামাঞ্চল হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসেন। তাঁহারা যদি সেই সব অঞ্চলের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় কোন কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদে একত্র করেন তবে একটি বিশেষ উপকার সাধিত হয়। এইজন্য প্রথমতঃ কলিকাতায় ছোট ছোট দল গঠন করিয়া কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে নির্দ্দেশ লওয়া দরকার এবং সেই নির্দ্দেশ অনুসারে গ্রামে গ্রামে কাজ করা

দরকার। সম্মুখে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ। ছাত্রগণ উৎসাহী হইলে এই সময়ে প্রচুর কাজ হইতে পারে এবং সরকারী ও বেসরকারী দুর্নীতি ও মিথ্যাপ্রচারের বাহিরে সত্য সংবাদ লাভের অন্ততঃ খানিকটা উপায় হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বোপরি বাংলার ছাত্রদলের আজ প্রয়োজন সাময়িক উত্তেজনার বিলাস ত্যাগ করিয়া নিয়মানুগত এবং সংগঠিত হইয়া দেশের গঠনমূলক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া। নিয়মানুবর্ত্তিতা ভিন্ন এবং অভিজ্ঞ লোকের যুক্তির সাহায্য ভিন্ন তাঁহাদের কোন উদ্যমই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইতে পারে না।

শহীদ রামেশ্বরের মৃত্যু

গত বৎসর ২১শে নবেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের বিচারের প্রতিবাদে ছাত্রেরা কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা বাহির করে তাহার উপর গুলিবর্ষণে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। করোনারের আদালতে এই মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক তদন্ত হয়। করোনার এবং জুরীরা রায়ে বলিয়াছেন, "ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও ম্যাডান ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ইন্সপেক্টর হ্যামণ্ডের আদেশে পুলিস যে গুলী চালাইয়াছিল মস্তকে তাহারই একাধিক আঘাত পাইয়া ২১শে নবেম্বর তারিখে রামেশ্বরের মৃত্যু ঘটে। এই গুলী চালাইবার আদেশ অসঙ্গত হইয়াছিল এবং যাহারা সে আদেশ দিয়াছিল আইন তাহাদিগকে যে অধিকার দিয়াছে তাহারও সীমা তাহারা লঙ্ঘন করিয়াছে।" করোনারের আদালতের এই সিদ্ধান্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে রামেশ্বরকে অবৈধভাবে হত্যা করা হইয়াছে। করোনারের তদন্তের সময় দেখা গিয়াছে গবর্মেণ্ট ও পুলিস শুধু যে দেশের লোকদের ভুল বুঝাইবার জন্য কারণে-অকারণে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া থাকেন তাহা নহে, করোনারকে ভুল বুঝাইবার জন্যও পুলিস মিথ্যা সাক্ষী দিতে ও জিজ্ঞাসিত হইয়াও সত্য গোপন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। যে ইন্সপেক্টর হ্যামণ্ড নিজের দায়িত্বে গুলী চালাইতে আদেশ দিয়াছিল সে যে আগাগোড়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে ছাত্রপক্ষের সমর্থনকারী কাউন্সেল এবং করোনারের জেরায় তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হ্যামণ্ড তাহার অপরাধ চাপা দিবার জন্য যে সব কৈফিয়ৎ দিয়াছে করোনার এবং জুরীরা তাহা বিশ্বাস করেন নাই, দেশবাসীও করে না। দেখা গিয়াছে শোভাযাত্রীদের উপর গুলী চালাইবার সঙ্গত কোন কারণই ছিল না। তবুও পুলিস ছাত্রদের অঙ্গের ঊর্দ্ধভাগ লক্ষ্য করিয়াই গুলী চালাইয়াছে, হত্যা করিবার জন্যই গুলী করিয়াছে। বে-আইনী গুলী চালাইয়া পুলিসও যদি মানুষকে হত্যা করে তাহা হইলে পুলিস নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয়।

৭ই মার্চ করোনারের রায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার এক সপ্তাহের মধ্যেও পুলিস হত্যাকারী সার্জ্জেণ্টকে খুঁজিয়া বাহির করে নাই, ইন্‌স্পেক্টর হ্যামণ্ডকেও নরহত্যার আদেশ দানের অভিযোগে বিচারার্থ চালান দেয় নাই। গবর্ণর সর ফ্রেডারিক বারোজ শুভেচ্ছা লইয়া এদেশে আসিয়াছেন, বাংলার শুভকামনাও তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। এই ছাত্র-হত্যার হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তিদানে তিনি যদি অগ্রসর না হন তাহা হইলে তাঁহার শুভ কামনার অসারতাই প্রতিপন্ন হইবে। পুলিস হ্যামণ্ডের নামে মামলা না আনিলে রামেশ্বরের আত্মীয়বর্গেরই তাহা করা উচিত। নরঘাতককে বিনা বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া সমগ্র সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, উহাকে পুলিসে বহাল রাখা ত রীতিমত বিপজ্জনক।

পঞ্জাবের শিক্ষা

পঞ্জাবে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস-ইউনিয়নিষ্ট-অকালী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে ব্যর্থকাম লীগের নেতা মিঃ জিন্না ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁর পরাজয়ের বেদনা ও গ্লানি ঢাকিবার জন্য উষ্মা বুঝা যায়। লীগের এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে লোকে অসন্তুষ্টও হইবে না, তাঁহাদের উগ্র মন্তব্যে চটিবেও না।

পঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট দলের ব্যর্থতাও বড় কম নয় এবং ইহার জন্য মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর নেতৃত্বই বিশেষভাবে দায়ী। মুসলিম লীগের সহিত ইউনিয়নিষ্ট দলের বিরোধ বরাবরই তিনি ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্ব্বাচনে তিনি লীগের বিরোধিতা করেন নাই এই বলিয়া যে লীগের ন্যায় ইউনিয়নিষ্ট দলও পাকিস্থানের সমর্থক এবং লীগের রাজনৈতিক কর্ম্মসূচীর সহিত তাঁহাদের নীতিগত প্রভেদ কিছুই নাই। শুধু পঞ্জাবের ব্যাপারে লীগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে তিনি অনিচ্ছুক। পঞ্জাবের অশিক্ষিত জনসাধারণ এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিবার মত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন আজও হয় নাই। লীগের এবং পাকিস্থানের সমর্থন বা বিরোধিতার অর্থ তাহাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু একই সঙ্গে লীগ মানা ও না-মানা, পাকিস্থান চাওয়া ও না-চাওয়ার কৌটিল্য নীতি বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের এখনও হয় নাই। ইহারই জন্য বিভ্রান্ত পঞ্জাবী মুসলমান লীগের সহজ রাজনীতি বুঝিয়া তাহাকে ভোট দিয়াছে, ইউনিয়নিষ্ট প্যাঁচ বুঝিবার সাধ্য তাহাদের হয় নাই।

বাংলাদেশেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখানেও মৌলবী ফজলুল হক সাত বৎসর প্রধান মন্ত্রীগিরি করিয়া কৃষক-প্রজার অনেক মঙ্গল সাধনের পর আজ তাহাদেরই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। লীগ-নায়ক খাজা নাজিমুদ্দীনকে পরাজিত করিয়া যিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি লীগে যোগ তো দিলেনই, অধিকন্তু লীগের লাহোর সম্মেলনে পাকিস্থান প্রস্তাব তিনিই আনিলেন, হিন্দুর উপর "সাতানা" করিবার হুমকী তিনিই দিলেন এবং হাজার জহরলাল পকেটে রাখিবার বাহ্বাস্ফোট করিতেও দ্বিধা করিলেন না। এইভাবে তিনি নিজেকে লীগের সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিবার আয়োজন তিনিই করিয়াছেন, ঋণসালিশী আইন, মহাজনী আইন প্রভৃতি পাস করাইয়া এবং জমি হস্তান্তরের সেলামী রদ করাইয়া কৃষকের প্রভূত উপকার তিনিই করিয়াছেন, তথাপি কৃষক আজ ফজলুল হককে চিনিতে পারিতেছে না যেন। লীগের সহিত কোয়ালিশনে বাধ্য হইলেও কৃষক-প্রজাদলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিলে এবং লীগের সহিত আপনাকে অভিন্ন করিয়া না

তুলিলে দেশের লোক আজ ফজলুল হককেই চিনিত, তাঁহাকেই চাহিত, তাঁহার দলকেই নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত করিত। তাহা না করিয়া তিনি আজও কেন দুই নৌকায় চড়িবার আয়োজন করিয়াছেন? সৈয়দ নৌশের আলি ও মৌলবী আশ্রফউদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী পরাজয়ের সম্ভাবনা জানিয়াও কংগ্রেসের নামে নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা লোকে বুঝে, ইঁহাদিগকে যাহারা ভোট দেয় তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই তাহা দেয়, ভবিষ্যতে ইঁহারাই শক্তিশালী দল গঠনে সহায়তা করিতে পারিবেন। কিন্তু ফজলুল হকের কথায় ও কাজে লোকে বিভ্রান্ত হয়; তাঁহারই কৃত জনকল্যাণের ফল ভোগ করে লীগ। ইউনিয়নিষ্ট দলের মন্ত্রিত্বকালে মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর নেতৃত্বে পঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে, তথাপি লীগ সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের জন্য তাঁহারও দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ধুরন্ধর রাষ্ট্রবিদদের সভায় ডিপ্লোম্যাসি চলে, রাজনৈতিক কূটনীতি ও হেরফের সেখানেই ফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণকে লইয়া যে রাজনীতি, সেই রাজনীতির ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের মারপ্যাঁচ চলে না।

অধিকাংশ মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দু শিখ ও অল্প কয়েকজন মুসলমান লইয়া গঠিত দলের মন্ত্রিত্ব লীগ সহ্য করিবে না বলিয়া নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি হুমকি দিয়াছেন। অথচ ইঁহারাই কয়দিন আগে সিন্ধুতে লীগের ন্যায় একটি মাত্র সাম্প্রদায়িক দল বিশেষ কর্ত্তৃক তথাকার সমগ্র হিন্দু সমাজ এবং মুসলমানদের একটা বড় অংশের উপর মন্ত্রিত্ব তাঁহারাই সমর্থন করিয়াছেন। মাইনরিটির উপর মেজরিটির কর্ত্তৃত্বের অধিকার আছে ইহাই যদি লীগ নেতাদের প্রকৃত বক্তব্য হয়, তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডল শুধু হিন্দু লইয়া গঠিত হইলেও তাঁহাদের আপত্তি করিবার কি যুক্তি থাকে? সেখানে কেন তবে মুসলমানের হিস্যা আদায়ের জন্য এত দরকষাকষি চলে? সিন্ধুর জন্য যে রাজনীতি, পঞ্জাবে তাহা চলিবে না, পঞ্জাবে যাহা প্রযোজ্য কেন্দ্রীয় সরকারে তাহা চলিবে না, লীগের এই যে পরস্পরবিরোধী রাজনীতি তাহারই নাম সুবিধাবাদ। এই সুবিধাবাদী রাজনীতি হইতেই পাকিস্থানের উদ্ভব। মিঃ জিন্না বলিয়াছেন পঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদে অন্যায় ভাবে মেজরিটি মুসলমানকে মাইনরিটিতে পরিণত করা হইয়াছে। পঞ্জাবে মোট ১৭৫টি আসনের মধ্যে ৮৬টি মুসলমান, মেজরিটি হয় ৮৮টিতে। যে সম্প্রদায় দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে কর্ত্তৃত্ব করিবার দাবি রাখে, অথচ ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুইটি লোককেও দলে পায় না, গবর্মেণ্ট পরিচালনার কোন অধিকার, কোন দাবিই তাহার নাই। মুসলমান আসনেরও সবগুলি লীগ সেখানে পায় নাই ইহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ জীয়াইয়া রাখিবার জন্য ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র রচনায় উহার ইংরেজ-প্রণেতারা কারসাজির কোন ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু প্রথম নির্ব্বাচনের পর দ্বিতীয় দফায় বেলাতেই উহার শঠতা অশিক্ষিত লোকের কাছেও ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সীমান্ত, সিন্ধু ও পঞ্জাবে তাহারই পরিচয় মিলিতেছে।

খাদ্য ও রাজনীতি

ভাবী দুর্ভিক্ষের আগমন যতই নিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে খাদ্য লইয়া রাজনীতি না করিবার জন্য সরকারী আর্ত্তনাদ ততই প্রবল হইতেছে। কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যেও কেহ কেহ এই সরকারী মনোভাব সমর্থন করিয়াছেন, মিঃ জিন্না ত আগ্রহেই উহা করিয়াছেন। খাদ্য লইয়া রাজনীতি না করিবার ধুয়া তুলিয়া দেশের সমস্ত আহার্য্য কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার জন্য সরকারের উদ্বেগ বুঝা যায়, যায় না বুঝা কংগ্রেস ও অন্যান্য জননায়কদের সমর্থন। খাদ্য কি রাজনীতির উর্দ্ধে এখনই আছে, না কখনও ছিল? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে খাদ্য লইয়া এতদিন অতি নিকৃষ্ট ও স্বার্থপর রাজনীতি চলিয়াছে, ব্রিটেনের স্বার্থে ও প্রয়োজনে রাজনৈতিক কারণে ভারতবাসীকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিয়া প্রায় অর্দ্ধ কোটি লোককে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আরও কয়েক কোটি লোকের শ্মশান-যাত্রার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

খাদ্যসমস্যা রাজনীতির উর্দ্ধে রাখিবার জন্য সরকারী প্রচারকার্য্যের শঠতা একমাত্র গান্ধীজীকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। বড়লাট হইতে সুরু করিয়া আর পাঁচ জনের ন্যায় তিনিও বাগানে সব্জী গজাইতে ও আহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে সকলকে পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু ঐ সঙ্গে তিনি দুইটি কথা বলিয়াছেন যাহা অপর কেহ বলিতে সাহস করেন নাই এবং যাহা শুনিয়া বাংলার দুর্ভিক্ষকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন চটিয়া আগুন হইয়াছেন।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, লোকায়ত্ত কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ না হইলে খাদ্যসমস্যার সমাধান অসম্ভব। লর্ড ওয়াভেল গান্ধীজীর অন্যান্য পরামর্শ সমীচীন বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার এই দুটি মূল বক্তব্য এড়াইবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা অতি সহজেই ধরা পড়ে।

ভারতবর্ষে গত দুর্ভিক্ষ কাহার সৃষ্টি এবং আগামী দুর্ভিক্ষের জন্যই বা দায়ী কে? ইহার মূল কি রাজনীতি নয়? ইউরোপের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা ইংরেজের পররাষ্ট্র নীতি, এই রাজনৈতিক কারণেই যুদ্ধে ইংরেজের যোগদান। ইংরেজের যুদ্ধ, নিছক রাজনৈতিক কারণে এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার সুযোগে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঐ ইংরেজের যুদ্ধে আমাদের জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জাপান ও আমেরিকার যুদ্ধে অবতরণের কারণও রাজনৈতিক এবং আমাদের দেশের গবর্মেণ্টের উপর আমাদের হাত নাই বলিয়াই এ যুদ্ধে ইংরেজ ও আমেরিকার যুদ্ধের বোঝা বহিবার জন্য আমাদের ঘাড় পাতিয়া দিতে হইল। ইংরেজ ও আমেরিকার সৈন্য আসিয়া আমাদের দেশে মোতায়েন হইল। ইহারা কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক এরোপ্লেন গোলাগুলি সবই আনিল, আনিল না শুধু খাবার। সুতরাং ইংরেজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সৈন্যদের আহার্য্য সংগ্রহের বিপুল দায়িত্ব চাপিল আসিয়া আমাদের ঘাড়ে। খোরাকও বড় কম নয়। বৎসরে প্রায় আট লক্ষ

টন খাদ্য ইহাদের দিতে হইল, এক-একজন গোরা সৈন্য আমাদের প্রায় পাঁচগুণ খাইল, অপচয় করিল কত তাহার হিসাব নাই। গ্রেগরী কমিটি বলিয়াছিলেন, বৎসরে দশ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী হইলে আমাদের এ দুরবস্থা হইত না; আমদানী তো দূরের কথা প্রায় ঐ পরিমাণ খাদ্য আমাদের অতিরিক্ত ব্যয় হইল সৈন্যদের জন্য।

এ ত গেল ঘরের খরচ। ইংরেজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের খাদ্য বিভাগ জাহাজ পাঠাইয়া আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য লইয়া গিয়াছেন। ১৯৪২ সালে মান্দ্রাজ ও বাংলা হইতে বহু লক্ষ টন খাদ্য রপ্তানী হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের বৎসরের প্রথম দিকে পর্য্যন্ত এই রপ্তানী চলিয়াছে। বাংলার মন্ত্রীদের না জানাইয়া এবং জানিতে পারিবার পর তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের হুকুমে চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ইহা কি তবে রাজনীতি নয়? দেশে প্রকৃত লোকায়ত্ত সরকার থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারিত না।

ভারতবর্ষে কৃষি সম্বন্ধে একটা ব্যাপার পরিষ্কার দেখা যায়। প্রতি পাঁচ বৎসরে এক বৎসর ভাল ফসল জন্মে, এক বৎসর অজন্মা হয় এবং তিন বৎসর মোটামুটি রকমের ফসল পাওয়া যায়। সুজন্মা বৎসরের সঞ্চিত ধান ভাঙিয়া অজন্মার বৎসরে লোকের চলে। ভারত-সরকার খুব ভাল করিয়াই ইহা জানেন, তাঁহারাই ইহার নাম দিয়াছেন Agricultural Cycle। যুদ্ধের জন্য আমদানীর পথ যেখানে বন্ধ, সেখানে কিছু ধান সর্ব্বদা মজুত থাকা উচিত, ইহা জাতীয় সরকার বুঝিত; ইংরেজ বুঝিবে না কারণ তার গরজ বেশী, বুঝিলে তাহারই বিপদ। সুতরাং বাড়তি ফসলের নাম করিয়া এই সঞ্চিত ধন রপ্তানী হইয়াছে ইংরেজের স্বার্থে, ইংরেজের প্রয়োজনে, ইংরেজের রাজনৈতিক প্যাঁচে। আমরা এই ঘোরতর অন্যায় জানিয়া বুঝিয়াও উহাতে বাধা দিতে পারি নাই, কারণ আমাদের গবর্মেণ্ট ইংরেজের রাজনীতি মানিয়া চলে, আমাদের স্বার্থ দেখে না।

খাদ্য লইয়া রাজনীতি করা মিঃ জিন্না ও সর নাজিমুদ্দীন পছন্দ করেন না কেন তাহার কারণ বুঝা আদৌ কঠিন নয়। গত দুর্ভিক্ষে দেশব্যাপী মড়কের ব্যবস্থা করিয়া মুসলিম লীগ যে অপরিমেয় অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছে তাহার ভাগ্যে এমন আর কখনও ঘটে নাই। এক-একটি মানুষ মারিয়া হাজার টাকা হিসাবে বাংলার মুনাফাখোরেরা দুর্ভিক্ষের কয়মাসে মোট দেড় শত কোটি টাকা লাভ করিয়াছে ইহা উডহেড কমিশনের হিসাব। এই টাকার অধিকাংশ গিয়াছে লীগ-ওয়ালাদের এবং তাহাদের অনুচরবর্গের পকেটে এবং ইহারই জোরে বাংলায় লীগ রাজত্ব কায়েম রাখিবার জন্য নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্য চলিতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসরে বাংলায় ঘুষ চুরি ও দুর্নীতির প্রত্যক্ষ অর্থকরী ফল লীগ ভোগ করিয়াছে। রাজনৈতিক কারণে বাছিয়া বাছিয়া লীগের লোকদের মহকুমা হাকিমের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। লীগ-মার্কা ফুড কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের হাতে দেশবাসীর অন্ন সরবরাহের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং বহুস্থলে মহকুমা হাকিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহারা গ্রামাঞ্চলে লীগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে। খাদ্য লইয়া রাজনীতি না করিবার জন্যই মৌলবী ফজলুল হক সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিতে চাহিয়া তার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য সর জন হার্বার্টের হাতে পদত্যাগ-পত্র দিয়াছিলেন। নিছক রাজনৈতিক কারণেই—লীগের স্বার্থে—গবর্ণর হার্বার্ট সে সময় বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিলেন। খাদ্যের উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব তখন ছিল ইংরেজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। বাংলার চাউল তখন তাহাকে নিজের দখলে আনিতে হইতেছে, জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রাশিয়াকে রাজনৈতিক কারণে গম পাঠাইতে হইতেছে, পারস্যে মোতায়েন ইংরেজ সৈন্যকে খাবার পাঠাইতে হইতেছে, মালয় জাপ-কবলিত হওয়ার পর সিংহলের ধানক্ষেতে রবারের চাষ করিয়া সেখানেও রাজনৈতিক কারণে চাউল পাঠাইতে হইতেছে। কাজেই সমগ্র ভারতের খাদ্যের উপর ব্রিটিশ ও ভারত-সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব তখন রাজনৈতিক কারণেই একান্ত অপরিহার্য্য। ঘুষের লোভে আত্মবিক্রয় করিয়া ইংরেজের এই জঘন্য রাজনীতিতে যোগ দিয়া দেশবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেও যাহারা কুণ্ঠিত হইবে না তেমনই বিশেষ একটি মন্ত্রীদলের প্রয়োজন ইংরেজের সেদিন হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন পূর্ণ করিল লীগ। লীগ-মার্কা চাউলের এজেণ্টদের খাতাপত্র তলব করিয়া হিসাব পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। উডহেড কমিশন ভারত-সরকারকে ইহা বলিয়া হয়রান হইলেন, কিন্তু ভারত-সরকার অচল। লীগ কি করিতেছে তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন কিন্তু বাধা দেওয়ার উপায় তাঁহাদের ছিল না, তাঁহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহাদের সহায়তা ছিল একান্ত প্রয়োজন। লীগ জানে দুর্ভিক্ষের অর্থ কি, কাহার প্রয়োজনে, কিসের স্বার্থে দুর্ভিক্ষ আসে তাহা ভাল করিয়া জানিবারই সুযোগ লীগের নেতারা পাইয়াছে তাই লোকায়ত্ত জাতীয় সরকারের নামে ইহারা শিহরিয়া উঠে। খাদ্য লইয়া রাজনীতি না করিবার পরামর্শ আজ হঠাৎ কেন চারি দিক ঘোষিত হইতেছে সে কথাও আজ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে।

বিক্রয়-কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ

বাংলা সরকার ৯৩ ধারার সুযোগে ছয় মাসের মধ্যে দুই বার কর বৃদ্ধি করার ফলে এই প্রদেশের ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই সহ্যশক্তি সীমা বিচ্যুত হয়। বস্তুতপক্ষে এই বিক্রয়-কর বাংলা-সরকার যেরূপ অযথা উচ্চহারে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অন্য প্রদেশে সেরূপ হয় নাই। অন্য প্রদেশে প্রতি ১০০৲ টাকায় চারি আনা হইতে টাকায় এক পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয়-কর আছে। দুইটি প্রদেশে এই কর একেবারে নাই। সেস্থলে বাংলায় টাকায় দুই পয়সা হইতে বাড়াইয়া শেষে চার পয়সা পর্য্যন্ত কর স্থাপন করা হয়। বিক্রয় করের বিরুদ্ধে প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ প্রতি-রোধের পর হরতাল প্রত্যাহৃত হইল। বাংলা-সরকার জানাইয়াছেন, নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বেকার তিন পয়সা ট্যাক্স বহাল থাকিবে। এই তিন সপ্তাহ কলিকাতার নাগরিকেরা জিনিষপত্রের অভাবে নিদারুণ অসুবিধা নীরবে

সহ্য করিয়াছে, বাংলার বহুস্থানে হরতাল হওয়ায় এবং কলিকাতা হইতে মাল না পাওয়ায় মফস্বলের অধিবাসীদের কম অসুবিধা সহিতে হয় নাই। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং নেতাদের অনুরোধে সাময়িক ভাবে হরতাল প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই হরতালের দ্বারা দেশের হিন্দু-মুসলমান ক্রেতা ও বিক্রেতা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দূর হয় নাই।

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বিক্রয়-কর বসাইবার সময় এমন কোন অঙ্গীকার গবর্মেণ্ট করেন নাই যে, যুদ্ধের পর উহা তুলিয়া দেওয়া হইবে। বিক্রয়-কর বসাইবার সময় অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দি তাঁহার বক্তৃতায় বার বার ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য সরকারের তৎকালীন আয়ের সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে এবং ইহার ফলে জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য টাকা পাওয়া যাইতেছে না। ইহারই জন্য তিনি বিক্রয়কর স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী বিক্রয় কর দুই পয়সা করিবার জন্য বিল উত্থাপন করিলে সেই সময়ে যে বিতর্ক হয় তাহাতে দেখা যায় ব্যবস্থা-পরিষদের বহু সদস্য এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ভুল বুঝান হইয়াছে। বিক্রয়-কর সাময়িক ট্যাক্স এবং উহা হইতে লব্ধ সমস্ত টাকা গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া তাঁহাদের বুঝিতে দেওয়া হইয়াছিল, বহু বক্তা এই কথা তখন বলিয়াছিলেন। কোন একটা বিশেষ করের টাকা বিশেষ কাজের জন্য বরাদ্দ করিয়া রাখা কর-নীতিসম্মত নয়—এই অভিযোগ ১৯৪১ সালেই হইয়াছিল। বিক্রয়-করের টাকা কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে তাহার পরিকল্পনা উপস্থিত করিবার দাবি তখনই ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে উঠিয়াছিল। অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দি আশ্বাস দিয়াছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ এবং গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি কার্য্যেই প্রধানতঃ উহা ব্যয়িত হইবে, কিন্তু কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা তিনি দেন নাই। ১৯৪৪ সালে বাংলা-সরকার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া প্রথম বার বলেন যে, ঘাট্‌তি পূরণের জন্যই বিক্রয়-কর বসান হইয়াছে এবং উহা তুলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই।

এই বিতর্কে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত করেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের আমলেই বিক্রয়-কর বৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। ঐ সময় তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন এবং ভারত-সরকারের অর্থসচিব স্যর জেরেমি রেইসম্যানের সহিত বিক্রয়-কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা হয়। স্যর জেরেমি উহা না বাড়ানই ভাল বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং এই প্রস্তাব তখনকার মত পরিত্যক্ত হয়। নাজিম-গোস্বামী-পাইন মন্ত্রিসভা বিক্রয়-কর দ্বিগুণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। নামমাত্র ব্যয়ে ট্যাক্স আদায়ের এই সহজ পথে পা দিবার জন্য তাঁহাদের লোভ দুর্ব্বোধ্য নয়।

বিক্রয়-কর দুই পয়সা করিবার সময় অন্যান্য দেশে বিক্রয়-করের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। বিলাতের কথা বেশী করিয়া বলা হইয়াছে যে সেখানে বিক্রয়-কর লব্ধ আয় অত্যন্ত অধিক কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বিলাতের বিক্রয়-কর কেবলমাত্র বিলাস দ্রব্যের উপর ধার্য্য হয়, কোন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর সেখানে বিক্রয়-কর নাই।

বিক্রয়-কর যখন এক পয়সা ধার্য্য হয় তখন জাপানী যুদ্ধ বাধে নাই, জিনিষপত্রও অগ্নিমূল্য হয় নাই। ইহার পর নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে, ট্যাক্সও বাড়িয়াছে। গরিবের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে নাই। বাংলার পাটচাষী এই যুদ্ধের মধ্যে এক বৎসরের জন্যও পাটের ন্যায্য দাম পায় নাই। ধানের দরও খুব কম লোক ছাড়া আর সকলেই প্রায় পায় নাই। সরকারের এজেন্টরা কি দরে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে ধান কিনিয়াছে সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ও বেসরকারী অনুসন্ধান হইলেই চাষীরা কিভাবে ধানের ন্যায্য দরে বঞ্চিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। এই যুদ্ধে মুষ্টিমেয় বড়লোক কোটিপতি হইয়াছে, কতকগুলি কণ্ট্রাক্টর টাকা করিয়াছে। কিন্তু দেশের শতকরা যে ৭৫ জন কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা পয়সা ত পায়ই নাই, দারিদ্র্য তাহাদের আরও বাড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা যুদ্ধে সরকারের গোলামি করিয়াছে তাহাদের কোন কষ্ট হয় নাই, মরিয়াছে উকীল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি এবং বে-সরকারী আপিসের চাকুরীজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বাংলা-সরকার ইহাদিগেরই বোঝার উপর শাকের আঁটির ছলে আর এক বোঝা চাপাইয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন যে, লোকে এবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে।

জনমতের চাপে বাংলা সরকার এক ধাপ পিছাইতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু দেশ ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। বিভাগের পর বিভাগ বৃদ্ধি, কথায় কথায় বিলাতী এক্সপার্ট আমদানী, কারণে-অকারণে বাংলার বাহিরে নির্ব্বোধ ও অকেজো কর্ম্মচারী জ্ঞান বৃদ্ধির অজুহাতে বিদেশ ভ্রমণে পাঠাইয়া অনাবশ্যক খরচ, ব্যয়-সঙ্কোচে এবং অপচয় নিবারণে অনিচ্ছা যে সরকারের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের খামখেয়ালীর ঘাটতি পূরণের জন্য বিনা প্রতিবাদে সর্ব্বস্ব দানে দেশবাসী আর অগ্রসর হইবে না, বিক্রয়-করের সক্রিয় প্রতিবাদ তাহারই সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। শতছিদ্র কলসে এইভাবে ক্রমাগত জল না ঢালিয়া কয়েকজন অসৎ কর্ম্মচারীর কঠোর কারাদণ্ড এবং সহস্রাধিক অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীকে দণ্ডদান ও বরখাস্ত করিলে বাংলা-সরকারের যে আয় বৃদ্ধি হইবে তাহা টাকায় আট আনা বিক্রয়-করেও হওয়া সম্ভব নহে।

নাবিক বিদ্রোহ ও বর্ণসমস্যা

বোম্বাই ও করাচীতে যে নাবিক বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়াছিল তাহা আমাদের জাতীয় চেতনার এক নূতন রূপ। বিদ্রোহের ঘটনাবলী নূতন করিয়া বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। নাবিকদের কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির বিবৃতিতে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে সমর বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসনের কৈফিয়তে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই বিস্ফোরণের মূল কারণ বহুদিনের বৈষম্যমূলক ব্যবহার।

এই নাবিকগণ বিগত কয়েক বৎসর পৃথিবীর নানাস্থানে অপরিসীম ধৈর্য্য এবং অসম সাহসের সহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের বিন্দুমাত্র আত্মিক প্রেরণা ছিল না। তবুও তাহারা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া বিজাতীয় শক্তিকে সাহায্য করিয়াছে। যুদ্ধে যোগদান করিবার সময় এই নাবিকদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন ও আশ্বাস দিয়া উৎসাহিত করা হইয়াছিল। সেই সকল আশ্বাস পালন করিবার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহও এই কয় বৎসর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের হয় নাই। তবুও এই নাবিকগণ কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণায় নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়া চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে।

আজ যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মহানুভব ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের চিরাচরিত নীতি হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। সমগ্র যুদ্ধের সময় যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার ভারতীয় নাবিকেরা সহ্য করিয়া আসিয়াছে আজও তাহার ব্যত্যয় হইবার সময় আসে নাই। সেই অন্যায় ব্যবস্থা কায়েম থাকিতেই নাবিকদের ধৈর্য্য টলিয়াছে। তাহারা তাহাদের দাবি জানাইয়াছে। এই দাবিগুলি যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বেতন ও ভাতা সম্পর্কে যে বৈষম্য চলিয়া আসিয়াছে তাহার অবসান তাহারা দাবি করিয়াছে। যে জঘন্য খাদ্য খাইয়া তাহারা ব্রিটিশ প্রভুদের রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা পরিবর্ত্তনের জন্য তাহারা আবেদন করিয়াছে। বর্ণবৈষম্য শুধু বেতন, ভাতা, খাদ্য ও বাসস্থানেই শেষ হয় নাই, যুদ্ধাবসানে নাবিকদের ছাড়িয়া দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতেও ব্রিটিশ ও ভারতীয় নাবিকদের প্রতি ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য করা হইয়াছে। দিল্লীতে নৌবহরের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ এই সব দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু যখন বিদ্রোহের আগুন চারি দিকে ভয়াবহ আকস্মিকতায় সঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল তখন কর্ত্তৃপক্ষ শুধু উচ্চকিতই হন নাই, ভাইস-এ্যাডমিরাল গডফ্রে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে চূড়ান্ত মূর্খতার পরিচায়ক এই বিদ্রোহ তাহারা কোন ক্রমেই সহ্য করিবেন না, প্রয়োজন হইলে সমগ্র নৌবহর তাঁহারা ডুবাইয়া দিবেন। প্রধান মন্ত্রী এট্‌লী সাহেব আরও তৎপর হইয়া খাস বিলাতী নৌবহরের কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিতে ভুল করেন নাই।

নাবিক-বিদ্রোহ আজ শান্ত হইয়াছে, সর্দার প্যাটেলের নির্দ্দেশে ভারতীয় নাবিকগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু এই যে অনভিপ্রেত এবং দুঃসাহসিক বহিঃপ্রকাশ ইহা হইতে কয়েকটি জিনিষ আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে এই বিদ্রোহ অশান্ত ভারতের চূড়ান্ত সংগ্রামের আভাস।

এই সাধারণ অভিব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই বিদ্রোহের একটি বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। আজ পৌনে দুই শত বৎসর যাবৎ ভারতবাসী সামাজিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে ঘৃণিত বর্ণবৈষম্য লক্ষ্য করিয়াছে এই বিদ্রোহ তাহারই সক্রিয় প্রতিবাদ। ভারতীয় নাবিকগণ স্পষ্টই এই কথা বুঝাইয়া দিয়াছে যে ভারতীয় নাবিক যদি ব্রিটিশ নাবিক হইতে কোনক্রমেই হেয় না হয়, তবে এই ব্যবস্থার অবসান অবশ্যম্ভাবী। আর ভারতীয় নাবিক যে সর্ব্বতোভাবে ব্রিটিশ নাবিকের সমকক্ষ তাহার অকাট্য প্রমাণ এই কয় বৎসরে বহুবার পাওয়া গিয়াছে। সমগ্র এশিয়ায় আজ এই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ বণিকের বর্ণবিদ্বেষ আমরা বহুকাল মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছি। সেই বণিক সম্প্রদায় এই ঘৃণিত মনোবৃত্তি লইয়াও সভ্য সমাজে প্রভুত্ব করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে এই বর্ণবিভেদের দিন শেষ হইয়াছে। চামড়ার রং দেখিয়া মূল্য যাচাই করিবার দুঃসহ স্পর্দ্ধা আজ বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে।

জঙ্গীলাট আশ্বাস দিয়াছেন যে এই বিদ্রোহের জন্য সমষ্টিগত শাস্তি দান করা হইবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইতে পারে। আমাদের আশঙ্কা এই অজুহাতে কোনপ্রকার শাস্তিদান করিলে তাহার ফলাফল শুভ হইবে না। যে দায়িত্ববোধহীন এবং অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদের ঔদ্ধত্যের ফলে এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল তাহাদের শাস্তিবিধান না করিয়া ভারতীয় নাবিকগণকে শাস্তি দিলে মূল সমস্যার সমাধান হইবে না, বরঞ্চ নূতন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিবে। সর্ব্বোপরি যে মূল কারণ এই বিদ্রোহ ডাকিয়া আনিয়াছিল, সেই বর্ণবৈষম্যের পূর্ণ অবসান প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি লইয়া বিংশ শতাব্দীতে নেতৃত্বের স্পর্দ্ধা করা চলিবে না।

উইমেন্স অক্সিলিয়ারি কোরে দুর্নীতি

বোম্বাইয়ের ব্লিৎস পত্রিকায় উইমেন্স অক্সিলিয়ারি কোরের অন্তর্গত একশত মহিলার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রে তাঁহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে "অবিশ্বাস্য নৈতিক দুর্নীতির" অভিযোগ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের নিকট তদন্তের জন্য আবেদন করিয়াছেন। পত্রে সামরিক আদালতের হস্তক্ষেপও দাবি করা হইয়াছে। ব্লিৎস-সম্পাদক জানাইয়াছেন যে স্বাক্ষরকারিণীগণ প্রথমে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া তাঁহাদের দাবি জানাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করিয়া দেখিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পরামর্শের পর তাঁহারা অনশন ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখেন।

পত্রলেখিকারা লিখিয়াছেন:

"সরল বালিকাগণকে মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ করিয়া ঘর ও পরিবার হইতে বাহির করিয়া আনা

হইয়াছে। তাহাদিগকে ব্রিটিশ ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্লেটুন কমাণ্ডারদের অধীনে অপরিচিত ও অস্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে। প্লেটুন কমাণ্ডারগণ আমাদেরই সম্মুখে অসৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং অনেক সময় প্রতারণা করিয়া আমাদিগকে লোভের খর্পরে আকর্ষণ করেন। আমাদের অনেকেই এই খর্পরে পড়ে। মজ্জাগত অসৎ প্রবৃত্তির বশে যে তাহারা লুব্ধ হয়, এমন নহে—দুঃসহ জীবনযাত্রা আরাম উপকরণের অভাব বৈচিত্র্য-লিপ্সা এবং প্রধানতঃ অজ্ঞতাই তাহাদিগকে এই পদে টানিয়া নামায়।

"আমাদের প্রতি নির্দ্দয়তা এবং অমার্জ্জনীয় অবঅবহেলা দেখান হইয়াছে। মদ্যপান, বিলাস, নৃত্য, অফিসারদের সহিত মেলামেশা—ইহা ছাড়া আমাদের অন্য কোন কাজ নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু অফিসারদিগকে আনন্দদানের জন্য আমাদিগকে দূর-দূরান্ত স্থানে পাঠান হইয়াছে। কখনও কখনও ব্যারাকের নিকটে আমাদের বাসস্থান দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন সময় অফিসারদের সহিত একই বাড়িতে আমাদিগকে থাকিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে উপরতলায় এবং আমাদিগকে নীচের তলায় থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। ধর্ষণ, বলপূর্ব্বক গর্ভোৎপাদন, গর্ভপাত, যৌনব্যাধি, আত্মহত্যা অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। বহু কুমারীকে বাধ্য হইয়া মাতৃত্ব বরণ করিতে হইয়াছে।"

পত্রে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। অধস্তন কর্ম্মচারীদের অবস্থার উন্নতি করিবার কোন অধিকার ভারতীয় অফিসারদের ছিল না। উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটির সম্মুখে ভিন্ন অন্যত্র কিছু বলা ভারতরক্ষা আইনে নিষিদ্ধ ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই বিষয়টি আলোচনার্থ উত্থাপিত হইলে সমর বিভাগের সেক্রেটারী অভিযোগের গুরুত্ব উড়াইয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মূল অভিযোগগুলির একটিও তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আত্মহত্যা, জারজ সন্তানের জন্মদান, যৌনব্যাধি প্রভৃতি সমস্ত অভিযোগই মূলতঃ সত্য, মিঃ ম্যাসনের বক্তৃতায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। একই বাড়িতে সৈন্যদের সহিত নারীদের বৎসরাধিক কাল রাখা হইয়াছিল ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও মিঃ ম্যাসন প্রকাশ্য তদন্তে রাজি হন নাই।

ভারতীয় তরুণীদের স্বাবলম্বী হইবার সুযোগদানের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে উইমেন্স অক্সিলিয়ারী কোরে ভর্ত্তি হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছিল। দেশের সংবাদপত্রসমূহ চটকদার বিজ্ঞাপন ছাপিয়া এবং নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বহু অধ্যক্ষা উহার প্রচার কার্য্য করিয়া গবর্মেণ্টের এই কাজে সাহায্য করিয়াছেন। কিছুদিনের মধ্যেই অক্সিলিয়ারী কোরের দুর্নীতির কথা অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের গত বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীমতী হংস মেটা এ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করেন। টাইমস পত্রিকায় চিঠিখানি প্রকাশিত হইবার পর জানা গেল গবর্মেণ্ট ভারতরক্ষা আইনে কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া ভারতীয় তরুণীদের অতি কুৎসিত ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিয়াছেন। অবৈধ গর্ভধারণ এবং যৌন ব্যাধির বিস্তারের সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাধিক্য এখানে বড় কথা নয়, একটিমাত্র তরুণীকেও এই ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেওয়া সমগ্র গবর্মেণ্টের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া আমরা মনে করি। এই কোর গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গোড়া হইতেই অনেকের মনে সংশয় জাগিয়াছে, বর্ত্তমানে সে সংশয় আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। যে দুর্নীতি উহাতে এই কয় বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে তাহা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজের গরজে ইংরেজ সমাজ তাহার তরুণীদের যে ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিতে পারে ভারতবর্ষ তাহা পারে না। এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক ছিল না। যুদ্ধে লিপ্ত গৃহ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন বিদেশী সৈন্যদের লালসার আগুনে আহুতিদানের জন্য ভারতীয় তরুণীদের প্রলুব্ধ করা হইয়াছে এবং ভারতরক্ষা আইনের জোরে উহার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে ভারত-সরকার লিপ্ত হইতে ভয় পাইবেন ইহা জানা কথা। কিন্তু দেশনায়কদের কর্ত্তব্য ভুলিলে চলিবে না। একটি বে-সরকারী কমিটি গঠন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্তের আয়োজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদেশী গবর্মেণ্ট যাহা করিবে না, দেশের আস্থাভাজন নেতাদের দ্বারা কি তাহা হইতে পারে না? কর্ত্তৃপক্ষ এবং সৈন্তেরা সাক্ষ্যদানে সঙ্কুচিত হইলেও নারীদের নিকট হইতেই প্রচুর তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

নিরস্ত্র নরনারীর উপর ব্রিটিশ সৈন্যের অত্যাচার

নাবিক বিদ্রোহের পর বোম্বাই শহরে যে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটে তাহার এক বিবরণ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ব্রিটিশ অফিসার প্রকাশ করিয়াছেন। লণ্ডনের "ডেলী ওয়ার্কার" পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে দেশবাসীর নাগরিক মূল অধিকারের উপর যে ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ইংরেজ সরকারের প্রয়োজনে ভারতবাসীকে যে ভাবে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ ও বাসস্থানে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারই বিষময় ফল আজ ফলিতে সুরু করিয়াছে। সৈন্য ও পুলিসের দ্বারা কৃত যে-কোন অত্যাচারের প্রতিবাদে মানুষ চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠে; সামরিক শক্তির প্রতীক মিলিটারী লরী ও সরকারী শক্তির প্রতীক গৃহ প্রভৃতিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রতিবাদ ব্যক্ত করিতে চাহে। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে একটি আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইয়াছে, দেশী ও বিদেশী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদেরা ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। দেশবাসীর মনের এই গভীর অসন্তোষ নিবারণের কোন উপায় না করিয়া গবর্মেণ্ট পশুবলের সাহায্যে এখনও উহা দমনের চেষ্টা করিতেছেন, ফলে অসন্তোষ আরও তীব্র হইতেছে এবং অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ক্রমেই অধিকতর ব্যাপক ও ধ্বংসমূলক হইতেছে। সরকারী পশুবল কিরূপ নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা হইতেছে, "ডেলী ওয়ার্কারে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের আবাসস্থল প্যারেলের এক

রাস্তায় আমি পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। পথে বহু লোক চলাচল করিতেছিল; তাহারা জনতা নহে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা ত নহেই। হঠাৎ বিন্দুমাত্র সতর্কতামূলক ধ্বনি না করিয়া একখানি উন্মুক্ত লরী ব্রিটিশসৈন্যে বোঝাই হইয়া পথের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, রাইফেল ও 'ব্রেনগান' লইয়া পথচারীদের উপর গুলিবর্ষণ সুরু করিল। পথচারীরা নিকটস্থ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা করিল, আমিও চেষ্টা করিলাম, সেনাবাহিনী আমাদের প্রতি গুলিবর্ষণ সুরু করিল। কুড়ি-জন আহত হইল, চারিজনের জীবনান্ত ঘটিল। ইহার পশ্চাতে কি ছিল? উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কেহ কেহ "শয়তানকে উচিত শিক্ষা" দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কাজেই সশস্ত্র টহলদারী সেনা নিরস্ত্র পথচারীদের ইচ্ছানুযায়ী গুলিবর্ষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। পথে কোন এম্বুলেন্স ছিল না; জনগণ নিজেদের চেষ্টায় ব্যবস্থাদি করিল। পরে আমি ডি লেসলি রোডে সেনাদলকে লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া গুলী করিতে দেখিয়াছি। চারি জন নিহত হইল, ষোল জন আহত হইল। অনেক সংবাদপত্রে 'দায়িত্বহীনতা'র কথা প্রচার করা হইয়াছে; কিন্তু সেই সমস্ত সংবাদপত্র আপনাদের জানায় নাই যে, ক্যাসাল ব্যারাকের ধর্মঘটীদের আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; খাদ্য ও জল না দিয়া তাহাদের আটক করা হইয়াছিল; যখন তাহারা জলের জন্য বাহিরে আসিল, তখন তাহাদের উপর চলিল গুলিবর্ষণ। তাহারা তোমাদের নিকট জনতার নৃশংসতার কথা রটনা করিয়াছে। কিন্তু তাহারাই আমাদের নিকট একথা গোপন রাখিয়াছে যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাযাত্রার দুই জন লোকের উপর মিলিটারী লরী ধাক্কা দেওয়ায় প্রথমে পাথর ছোঁড়া হয়। স্বেচ্ছাচারী গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে গৃহ ও জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য জনগণের ইহাই ছিল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। প্রায় প্রত্যেক বারই ব্রিটিশ সৈন্যই গুলীবর্ষণ করে। আমি কোন ভারতীয় সৈন্য দেখি নাই। আমি শুনিয়াছি সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই এই দমনকার্য্যে কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করেন নাই।

কলিকাতায়ও এইরূপ ব্যাপারই দুই বার ঘটিয়াছে। ২১শে নবেম্বরের ছাত্র শোভাযাত্রার গতিপথ পুলিস রোধ করিয়া দাঁড়াইলে ছাত্রেরা রাজপথে বসিয়া পড়ে। ইহার পর উপবিষ্ট ছাত্রদের উপর ঘোড়া চালাইয়া এবং গুলিবর্ষণ করিয়া পুলিস চূড়ান্ত বর্ব্বরতার পরিচয় দেয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী রশিদ আলির কারাদণ্ডের প্রতিবাদের পর সরকারী বর্ব্বরতা আরও চরমে উঠে। গবর্ণর কেসি এবার মিলিটারীর উপর শহরের আন্দোলন দমনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে বেপরোয়া গুলিবর্ষণের অধিকার দেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সৈন্যেরা চৌরঙ্গি ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে ব্রিটিশ জনবহুল অঞ্চলে ছাত্র শোভাযাত্রা দলের একটি একাদশবর্ষীয় বালককে সঙ্গীনের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাজপথে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। সঙ্গীনের খোঁচায় বালকটির উদর এমন ভাবে ছিন্ন হয় যে তাহার অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহারই সঙ্গীরা বালকটিকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে লইয়া যায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়। পরে পরিচয় পাইয়া জানা যায় বালকটির নাম দেবব্রত দাস, বালিগঞ্জ জগবন্ধু স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। এত বেপরোয়া গুলিবর্ষণ চলে যে তেতলার বারান্দায় দণ্ডায়মান দুইটি বালকবালিকা নিহত হয়।

বর্ব্বরতার নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটিও উল্লেখযোগ্য:

"কলিকাতা মেডিকেল স্কুল ষ্টুডেণ্টস ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সাহা সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি বুধবার সন্ধ্যার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ের নিকট ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে গুলীবর্ষণের সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে গমন করেন। তিনি ও ভারতীয় জাতীয় এম্বুলেন্স বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকগণ আহতদের সাহায্য দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া সৈন্যগণ কর্তৃক একজন আহত ব্যক্তিকে প্রজ্বলিত লরীর অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখেন। অতঃপর সৈন্যগণ উক্ত আহত ব্যক্তিকে অগ্নি হইতে তুলিয়া পদাঘাত করিতে থাকে। শ্রীযুক্ত সাহা ও এম্বুলেন্স বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকগণ উক্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তাহাদের নিকট দিতে বলেন। অনেক বচসার পর উহাকে তাহাদের নিকট দেওয়া হয়।"

২১শে নবেম্বরের গুলিতে নিহত শহীদ রামেশ্বরের মৃত্যু সম্পর্কিত তদন্তে করোণার আদালতে পুলিসী বর্ব্বরতার যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা দেখিয়া গবর্ণর কেসি ফেব্রুয়ারী মাসের গুলিবর্ষণে নিহতদের মৃত্যু সম্পর্কে করোণারের তদন্ত বন্ধ করিয়া দেন।

মিঃ কেসির শাসনকাহিনী

বাংলার লাট মিঃ আর, জি, কেসি বিদায় লইয়াছেন। বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি এক বেতার-বক্তৃতায় তাঁহার শেষ বাণী জানাইয়া গিয়াছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি কলিকাতার সাম্প্রতিক অবাঞ্ছনীয় ঘটনাবলীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, বাংলার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজনের কথা আলোচনা করিয়াছেন, আমাদের সহযোগিতার জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। বিদেশে আমাদের জন্য কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি আমাদের শুভকামনা জানাইয়াছেন। এই সকল উদার ভাষণের সঙ্গে তাঁহার শাসনকালের ঘটনাবলীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়গুলি পরিষ্কার হইবে। মিঃ চার্চ্চিলের মনোনয়নে কেসি সাহেব ১৯৪৪ সনের জানুয়ারী মাসে এখানে আসেন। তাঁহার সম্মুখে যে বিরাট দায়িত্ব ছিল তাহা দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যে বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তি দরকার দেখা গিয়াছে তাহা তাঁহার ছিল না। মুনাফাখোর ও সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি বিন্দুমাত্র কমিল না। ৯৩ ধারা শাসিত প্রদেশে মৃত্যু বাড়িয়াই চলিল। মিঃ কেসি তখন সস্তায় নাম কিনিতে উৎসাহিত হইলেন। কিছুদিন চলিল বাজার ও বস্তি দর্শন। ইহাদের যে কি উন্নতি হইয়াছে তাহা যে কোন বাজার বা বস্তীতে পদার্পণ করিলেই বুঝা যাইবে। তারপর সুরু হইল শাসন-সংস্কার-প্রচেষ্টা। মিঃ কেসি বাংলার আমলাতন্ত্রকে উন্নত

করিবার জন্য বেতারযোগে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। টাকা খরচ হইল, নূতন নূতন লোক নিয়োজিত হইল; উন্নতি কি হইল তাহা অজ্ঞাত।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্ত্তন আসিল; গণ-আন্দোলনের ঢেউ বাংলায়ও জাগিল। বিদায় লইবার অভিমুখে মিঃ কেসি উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে চাহিলেন। কলিকাতার রাজপথ দুই বার ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও মিঃ কেসি ব্রিটিশ সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি কিছুতেই ব্রিটিশ সম্মান ডুবিতে দিতে পারেন না। কিন্তু বুলেট বর্ষণ সহ্য করিয়াও ছাত্র শোভা-যাত্রা লালদীঘি পরিক্রমণ করিল, মিঃ কেসির সাধের সম্মান লালদীঘির জলে চিরতরে ডুবিল। তারপরের ঘটনা বিক্রয়-কর বৃদ্ধি মিঃ কেসির শেষ অবদান।

এক দুর্ভিক্ষের সময় মিঃ কেসির আগমন। আর এক দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যখন ঘনাইয়া আসিতেছে তখন তিনি সহসা মাতৃভূমির ডাক ("the pull of one's country") শুনিতে পাইলেন, এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বিদায় লইলেন। কলিকাতার রাজপথের রক্তে তাঁহার কীর্ত্তি অমর হইয়া রহিল।

বাংলার কৃষকের অবস্থা

মৌলানা মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বাঙালী কৃষকের অবস্থার বিশদ পরিচয় দিয়াছেন। উহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, চির-স্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত জমিতে জমিদারেরা সরকারকে রাজস্ব দেন একর প্রতি ৵১০ আনা, কিন্তু প্রজাদের নিকট হইতে ইঁহারা আদায় করেন একর প্রতি ৭॥০ আনা। কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদারেরা প্রতি একরে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা উসুল করিয়া থাকেন। বর্গা-চাষীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। চট্টগ্রাম জেলার হিসাবে দেখা যায় তাহাদের নিকট হইতে জমিদার ও তালুকদারেরা জমির তারতম্য অনুসারে একর প্রতি ২৫ হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া থাকেন।

ইংরেজ শাসকেরা এবং তাঁহাদের অধীনস্থ ভারতীয় কর্ম্ম-চারীরা কৃষকের হাতে টাকা জমিতেছে বলিয়া থাকেন। এই ধারণা যে কত ভুল মৌলানা সাহেব তাহারও হিসাব দিয়া-ছেন। তাঁহার প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশটুকু হইতেই তাহা বুঝা যাইবে:

"১৯৩২-৩৩ সালে সর্ব্বপ্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৯৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মাত্র। তাহাদের মোট জমিদার, তালুকদারের খাজনা দিতে হইয়াছে ১৭ কোটি টাকা আর ৮ কোটি টাকা, মহাজনের সুদ দিতে হইয়াছে অন্যূন ২৫ কোটি টাকা। জমিদার, তালুকদারের খাস জমির খাজনা একর প্রতি ২৫ টাকার কম নহে। মোট খাজনা দাঁড়াইবে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কৃষকের সর্ব্বপ্রকার খরচের সমষ্টি বার্ষিক সাড়ে বাষট্টি কোটি টাকার কম নহে। কৃষকের মোট আয় ৯৮ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে খরচের বরাদ্দ ৬২॥ কোটি টাকা বাদ দিলে থাকে ৩৬ কোটি টাকা মাত্র। এই টাকা হইতে চাষের খরচ বাদ দিলে বাংলার অধিবাসীবর্গের বাঁচিবে জনপ্রতি ১৮ টাকা মাত্র। দৈনিক ছয় পয়সার বেশী নহে। ইহা লইয়াই কৃষককুলকে অনশনে, অর্দ্ধাশনে, বিনা বস্ত্রে বা অর্দ্ধবস্ত্রে দিন কাটাইতে হয়। অথচ বিলাতে এক এক জন লোকের আয় খরচান্তে বার্ষিক হাজার টাকার কম নহে। ভারত-বাসীর বার্ষিক ১৮ টাকা আর বিলাতবাসীর হাজার টাকা।"

লীগমন্ত্রীদের আমলে বাংলার অবস্থা

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত দুই বৎসরে লীগমন্ত্রীদের আমলে বাংলার জনসাধারণের কি দুরবস্থা হইয়াছে, "নবযুগ" তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম কীর্ত্তি দুর্ভিক্ষ এবং ৩৫ লক্ষ বাঙালীর জীবন নাশ। নবযুগ লিখিতেছেন, "ইঁহার মধ্যে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ যে মুসলমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৫ লক্ষ মুসলমান হত্যা জিন্না-মার্কা পাকিস্থানের প্রথম বনিয়াদ।"

দুর্ভিক্ষে লীগমন্ত্রীদলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলের মুখপত্র নবযুগের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিতেছেন:

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া লীগ মন্ত্রীসভা সন্তুষ্ট হয় নাই। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে যখন কলিকাতার রাস্তায় হাজার হাজার নরনারী অনাহারে মরিতেছে, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লক্ষ লক্ষ নরনারী, বালক, বৃদ্ধ ক্ষুধায় তিলে তিলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তখন হক্‌সাহেবের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা, জমিয়ত, কংগ্রেস, মহাসভা সমস্ত পার্টির পক্ষ হইতে আইন সভায় দাবি করা হইল যে, বাংলাকে দুর্ভিক্ষ প্রদেশ ঘোষণা করিয়া সরকারীভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হউক। লীগ মন্ত্রী-সভার নির্দ্দেশে আইন সভার সমস্ত লীগী মেম্বর সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া বাংলাকে দুর্ভিক্ষ প্রদেশ ঘোষণা করিতে দিল না। সে প্রস্তাব পাশ হইলে সরকারের খরচে জন-সাধারণের জন্য খোরাকের বন্দোবস্ত করিতে হইত, কাজেই তাহা বাতিল করিয়া লীগমন্ত্রী ও সদস্যেরা লক্ষ লক্ষ বাঙালী নরনারীর প্রাণনাশের জন্য সাক্ষাৎভাবে দায়ী হইল। দুর্ভিক্ষ ঘোষণা হইলে কেবল যে সরকারী খরচে মাথাপিছু তিন পোয়া চাউল বরাদ্দ হইত তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খাজানা ও ট্যাক্স বন্ধ হইয়া গরীব জনসাধারণ বাঁচিবার পথ পাইত। লীগ মন্ত্রীসভা সে প্রস্তাব ত মানিল না, এবং যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাহায্যদানে অগ্রসর হয়, তাহাদের পথে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করে। লীগ মন্ত্রীসভার অন্যায় জেদ ও অসঙ্গত লোভের ফলে লক্ষ লক্ষ নির্দ্দোষ নরনারীর প্রাণহানি হইয়াছে, হাজার হাজার সোনার সংসার জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। নিদারুণ অভাবের তাড়নায় নিরুপায় নারী ও বালিকা দেহধারণের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়া সমস্ত সমাজের ভিত্তি শিথিল করিয়াছে। এক দিকে অভাবের এই দারুণ হাহাকার এবং বাঙালীর জীবন ও নীতি সমস্যা, অন্যদিকে লীগ মন্ত্রীসভা সরকারী গুদামে হাজার হাজার মণ ধান ও

চাউল পচাইয়া নষ্ট করিয়াছে, পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ হইতে অল্প মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া বাংলার দুঃস্থ জনসাধারণের কাছে অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও প্রাণের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে লীগ মন্ত্রীসভার এই ব্যবহার, সেখানে লীগের সাধারণ সদস্য যে লোভের জন্য নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

দুর্ভিক্ষে মিঃ জিন্না বাংলায় আসেন নাই। এখানে মুসলমান নরনারী যখন অনাহারে মরিতেছে তখন করাচীতে মুসলমান যুবকযুবতী পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি এরোপ্লেন হইতে পুষ্পবৃষ্টির বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

লীগ মন্ত্রীদের তৃতীয় কীর্ত্তি বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজাদল কাপড়ের সুব্যবস্থা করিবার জন্য যে প্রস্তাব আনে লীগ সভ্যদের ভোটে তাহা বাতিল হইয়া যায়। খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য দলগত স্বার্থের খাতিরে কয়েকজন ধনীর হাতে সমস্ত ফসল ক্রয়ের ভার দিয়া চোরা কারবার ও অনাচারের যে পথ তাঁহারা খুলিয়াছিলেন কাপড়ের ব্যাপারেও ঠিক সেই পন্থাই অনুসৃত হয়।

লীগ মন্ত্রীদের চতুর্থ কীর্ত্তি ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত রোগী-দের কুইনাইনের সরবরাহে অক্ষমতা। ইহাদের নিয়ন্ত্রণ-কৌশলে চোরাবাজারে ভিন্ন কুইনাইন মিলে নাই। এ সম্বন্ধে নব-যুগের উক্তি এইরূপ :

> যে ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও বহু-পরিমাণে চোরাবাজারে গায়েব হইয়া গিয়াছে। কোথায় দুইটি যুবক একটু রাজনীতির কথা আলোচনা করিল, এ খবর যে পুলিস জানিতে পারে, সেই পুলিস লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউলের চোরা গুদাম অথবা হাজার হাজার পাউণ্ড কুইনিনের চোরাবাজার আবিষ্কার করিতে পারিল না, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এমন কি সরকারী কর্ম্মচারীরাও চোরাবাজারের কথা জানিয়া অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার ভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছেন। গ্রামবাসী ও শহরবাসী সকলেই জানেন যে, লীগের খাতায় নাম না লিখাইলে কাপড় মেলে না এবং গ্রামে, শহরে ও ইউনিয়নে লীগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ কাপড়, কেরোসিন, কুইনিন, নুন, ও চিনির ডিলারী লাভ করিয়া চোরাবাজারের যে হাট বসাইয়াছেন তাহাতে বাংলার শহর ও গ্রামের গরিব হিন্দু মুসলমান একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল।

লীগ মন্ত্রীদের আমলে করবৃদ্ধি

লীগ মন্ত্রীদের পঞ্চম কীর্ত্তি কৃষি আয়কর ও অন্যান্য কর বসাইয়া দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন। যুদ্ধের আগে বাংলার যে বাজার ছিল এখন উহা তাহার দ্বিগুণ। পাট শুল্ক ও আয়-করের অংশ পাইলেও দরিদ্রের উপর কর অত্যধিক বাড়িয়াছে। সরকারী খরচ বাড়িয়াছে বহুগুণ। লীগ মন্ত্রীরা রাজস্বের টাকা জনসাধারণের স্বার্থে খরচ না করিয়া কেবলমাত্র নিজেদের বশম্বদ ও অনুগত লোককে রাজনৈতিক কারণে মোটা মাহিনার চাঁকুরী দিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে যে হাজার হাজার নূতন চাকুরী সৃষ্টি হইয়াছে, কৃষকপ্রজার সন্তান বা বাঙালী মুসলমান উপযুক্ত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা পায় নাই, লীগের নেতাদের অর্দ্ধশিক্ষিত আত্মীয়স্বজনেরা অযোগ্য হইয়াও শত শত টাকা বেতনের কাজ পাইয়াছে। ইহাদেরই আমলে বিক্রয়-কর দ্বিগুণ হইয়াছে এবং নূতন কৃষি আয়কর বসিয়াছে। দরিদ্র দেশবাসীকে ফতুর করিয়া ইহারা নিজেদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সেই টাকা ছড়াইয়াছে। কৃষি আয়করে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার এই যে গরিব প্রজার উপর আয়কর বসিল কিন্তু লক্ষ-পতি ইংরেজ চা-বাগানের মালিকেরা সেই কর হইতে রেহাই পাইল।

লীগ মন্ত্রীদের ষষ্ঠ কীর্ত্তি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন। যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বর্ত্তমানে প্রচলিত তাহার গলদ বার বার দেখান সত্ত্বেও সংশোধনের কোন চেষ্টাই লীগ মন্ত্রিসভা করে নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষা-কর সকল কৃষক-প্রজাই দেয় কিন্তু শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। এই আইনের ফলে গ্রাম অঞ্চলের স্কুলের সংখ্যা কমান হইয়াছে এবং বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। কৃষক ট্যাক্স দিয়াই মরে কিন্তু তাহার সন্তানের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয় না। শিক্ষকের বেতনও অতিশয় কম এবং বহু ক্ষেত্রেও তাহাও সময় মত দেওয়া হয় না বলিয়া দুর্ভিক্ষের পর বহু বিদ্যালয় হয় উঠিয়া গিয়াছে নতুবা কোন রকমে নামে মাত্র বাঁচিয়া আছে।

লীগ মন্ত্রীদের সপ্তম কীর্ত্তি পাটের দরের ব্যাপারে কৃষকের স্বার্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলা। বাংলার এই সোনার সুতার সোনা গেল বিদেশী বণিকের পকেটে, চাষীর ভাগ্যে রহিল শুধু ম্যালেরিয়া। বাংলার গরিব চাষী পাট পচাইবার হাড়ভাঙা খাটুনির উপযুক্ত মজুরী যুদ্ধের মধ্যে একটি বৎসরের জন্য পায় নাই। কৃষকপ্রজাদল বরাবরই পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছে। লীগওয়ালারা বলিয়াছে পাটের দর বাঁধা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত লীগ মন্ত্রীদেরই আমলে পাটের দর বাঁধা হইল কিন্তু উহা পাটচাষীর স্বার্থে নিম্নতম দর নয়। বিদেশীর স্বার্থে উহার উচ্চতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বাংলার পাটচাষী পাট বেচিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাবে যে টাকাটা পাইতে পারিত ইংরেজ বণিক ও লীগ মন্ত্রীদের কারসাজিতে উহারা তাহাতে বঞ্চিত হইল। ইংরেজের চরণাশ্রিত লীগ মন্ত্রীরা প্রভুদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য এইভাবে কোটি কোটি মুসলমান প্রজার সর্ব্বনাশ সাধনেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

'ইসলাম বিপন্ন' নয়

সম্প্রতি এলাহাবাদে এক বিরাট্ জনসভায় মেজর-জেনারেল শাহ নওয়াজ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা পাকিস্থান-উৎসাহী মুসলিম নেতৃবৃন্দের কর্ণে প্রবেশ করিলে আমরা সুখী হইব। শাহ নওয়াজ বলিয়াছেন, "এই কথা বলা নিরর্থক যে ভারতবর্ষে ইসলাম বিপন্ন। ইসলাম বিপন্ন হইয়াছে ইন্দোনেশিয়ায় যেখানে ইস্লাম ব্রিটিশের দ্বারা পদদলিত হইতেছে।" তিনি আরও বলেন, "ইসলামের প্রধান শত্রু ব্রিটেন। যদি ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায় তবে সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম বিভেদও লোপ পাইবে।"

এই প্রসঙ্গে বাদিতে শাহ নওয়াজ যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "হিন্দুস্থান চাই, না

পাকিস্থান চাই"—ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে প্রশ্ন আজ ইহা নয়। আজ তাহাদের স্থির করিতে হইবে, তাহারা গোলামি চায় না স্বাধীনতা চায়। ব্রিটিশশাসনে আজ যখন ভারতবর্ষের প্রতিটি ইঞ্চি স্থান গোলামি স্থানে পরিণত হইয়াছে, তখন পাকিস্থান বা শিখিস্থান প্রতিষ্ঠার কথা বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? অধিকন্তু পাকিস্থান দাবির মূলে রহিয়াছে ত্রাস, সুতরাং এই দাবি ইস্‌লাম বিরোধী।"

ধর্ম্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিই পাকিস্থানের দাবির ভিত্তি। বিংশ শতাব্দীর সমাজ গঠনে এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির নিরর্থকতা এবং অনিষ্টকারিতা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই মনোবৃত্তি বিশেষ ক্ষতির কারণ। স্বাধীন দেশে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি অর্থহীন কিন্তু পরাধীন দেশে ইহা মারাত্মক। আজ যখন সমগ্র জাতি বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে, তখন আমাদের সমস্ত সংগ্রাম মাত্র একটি রূপই পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সংগ্রাম ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতবাসীর, সাম্রাজ্যবাদী শোষকের সঙ্গে নিষ্পেষিত দেশবাসীর। গণ-আন্দোলনের বিরাট্ চেতনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ যে কত অকিঞ্চিৎকর তাহা গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে। আজ যখন হিন্দু ও মুসলমান গণশক্তি এক মহৎ সংগ্রামে একত্র হইবার প্রয়াস পাইতেছে তখন লীগ নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া সাম্প্রদায়িক কলহের বীজ নূতন করিয়া ছড়াইতেছেন। প্রত্যেক প্রদেশেই যখন পাকিস্থানী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে তখন মিঃ জিন্না নব উৎসাহে তাঁহার মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে মুসলিম জনশক্তিও আজ ধীরে ধীরে বুঝিতে শিখিতেছে যে পাকিস্থানের মোহে গোলামিস্থান বরণ করা বিবেচনার কাজ হইবে না।

ধান চাউল সংগ্রহ-ব্যবস্থা

বাংলার নূতন গবর্ণর সর ফ্রেডারিক বারোজ তাঁহার প্রথম বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে হইলে যাহারা খাদ্যশস্য উৎপাদন করে না বা করে নাই এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট খাদ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার। এইরূপ লোকদের তিনি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, শহরের অধিবাসী, ঘাটতি অঞ্চলের বাসিন্দা এবং শহর ও গ্রামের দুঃস্থ অধিবাসী। এই লোকদিগকে সরবরাহের জন্য সরকারের হাতে চাউল মজুত থাকা প্রয়োজন বলিয়া আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীরা গত তিন বৎসর যাবৎ মনে করিয়া আসিতেছেন এবং তদনুসারে কাজ করিয়া কয়েক লক্ষ মণ অমূল্য খাদ্যসম্পদ নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবস্থাগুণে শহরের লোকদের কতকটা সুবিধা হইয়াছে বটে, কারণ তাহা না করিলে গবর্মেণ্ট চালানো কঠিন হয়। কিন্তু লাটসাহেব যাহাদিগকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন তাহাদেরই লাঞ্ছনার ও দুর্দ্দশার চরম হইয়াছে, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনায় ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই। ইহাদের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় হইলেই হইল এবং সে ব্যবস্থা খুব ভাল ভাবেই করা হইয়াছে। বাঁকুড়ার ব্যাপারে দেখা যাইতেছে ঘাটতি অঞ্চলের দুর্দশা মোচনে লাটসাহেবের নদিচ্ছা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সেখান হইতেই অতত্র চাউল রপ্তানী হইতেছে।

শস্য সংগ্রহ ব্যাপারে গবর্মেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবার জন্য নূতন গবর্ণর আবেদন করিয়াছেন। যাহারা শস্য মজুত করিয়া রাখিবে লাটসাহেব তাহাদিগকে সমাজের শত্রু বলিয়াও আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু কৃষকের গোলা হইতে ধান চাউল টানিয়া বাহির করিয়া যাহারা উহা পচাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহারা সমাজের শত্রু কি মিত্র গবর্ণর সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ইহার জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :

> বাংলার লাট সর ফ্রেডারিক বারোজ যে সকল সমাজ-বিরোধী লোক খাদ্যশস্য মজুতকারীদের তাহাদের উদ্বৃত্ত শস্য না ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে তাহাদের সম্পর্কে বাংলার জনসাধারণকে সতর্ক করিয়াছেন। আমি বাংলার গ্রামবাসীদের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের শিক্ষা বিস্মৃত না হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছি। আমি পূর্ণ দায়িত্বের সহিতই এই পরামর্শ দিয়াছি। আমি সর্ব্বত্র গ্রাম্য কর্ম্মীদের খাদ্যশস্য, পঞ্চায়েৎ ও খাদ্যশস্য ব্যাঙ্ক সংগঠনের জন্য বলিয়াছি। আমি তাঁহাদের বলিয়াছি যে, তাঁহারা যেন খাদ্য বণ্টন ও বরাদ্দের জন্য দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর না করেন। ১৯৪৩ সালে সরকারী দালাল কর্ত্তৃক খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন সম্পর্কে তাঁহারা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে অতঃপর তাঁহারা আর এ সম্পর্কে শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লাটের বক্তৃতা শ্রবণে একান্তই আগ্রহহীন। তাছাড়া গ্রামবাসিগণ খাদ্যশস্য মজুত করিবার কৌশল জানেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিলে খাদ্যশস্য মনুষ্য-খাদ্যের অনুপযোগী বিকৃত পদার্থে পরিণত হইবে না। চোরা কারবারী ও দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা কি সমাজের শত্রুতা? ব্রিটিশের নিকট হইতে চরিত্র সংক্রান্ত প্রশংসাপত্র না পাইলেও আমাদের চলিবে। আমরা তাহাদের অপমানজনক বক্রোক্তি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।
>
> বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাহারা সরকারকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না। সরকারী দালালগণ ইতিমধ্যেই গোপনে রাত্রির অন্ধকারে খাদ্যশস্য স্থানান্তরিত করিতেছে। জনসাধারণকে পূর্ব্ব হইতেই এবিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

শস্য সংগ্রহ ও মজুত রাখা সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থার উপর বাংলার জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারাইয়াছে। এই ব্যবস্থায় দেশের লাভ যদি কিছু হইয়া থাকে তাহা গবর্মেণ্ট জানেন, দেশের লোক ইহার লোকসান বাবদ বহু কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়াছে এবং দেখিয়াছে ইহাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই নাই। শস্য সংগ্রহ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন অবিলম্বে দরকার। সরকারের ঘুষখোর দুর্নীতিপরায়ণ এবং অযোগ্য

কর্ম্মচারীদের হাতে শস্য সমর্পণ করিতে দেশবাসী আর চাহিবে না।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত

বাঁকুড়া জেলায় অন্নাভাবে লোকের এখনই কিরূপ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে, শ্রীমতী রে, কা রায় এক বিবৃতিতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বাঁকুড়া জেলার নিদারুণ খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে জনসাধারণ অবহিত আছেন। বর্ত্তমান বৎসরে শস্যহানির ফলে ঐ অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। জল সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। নদী ও অন্যান্য জলাশয়গুলি শুকাইয়া গিয়াছে। পানীয় জলের জন্য সামান্য যে কয়েকটি কূপ আছে তাহাও বহু ব্যবধানে অবস্থিত। কায়িক পরিশ্রমে অসমর্থ ঐরূপ শতকরা মাত্র ১·৪৫ হইতে দুই জন অধিবাসীকে সরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এতদঞ্চলে শতকরা সাত হইতে দশ জন অধিবাসী সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও কায়িক পরিশ্রমে অসমর্থ। যাহারা কায়িক পরিশ্রম করিতে সক্ষম তাহাদিগকে খাটুনির বিনিময়ে গবর্মেণ্ট হইতে পাঁচ আনা করিয়া মজুরি দেওয়া হইয়া থাকে। এই স্বল্প আয়ে তাহাদের পরিজন পোষণের কথা দূরে থাক তাহাদের নিজেদেরই ভরণ পোষণ চলে না। আমি সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার মধ্যে পারম্পর্য্যের অভাব লক্ষ্য করিয়াছি। গোলগাড়িয়া গ্রামের অধিবাসীরা আমার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, খাটুনির বিনিময়ে সরকারী সাহায্য পাইবার জন্য তাহারা কয়েকবার পাঁচ-ছয় মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াও কোনরূপ কাজ বা সাহায্য পায় নাই।

চাষীরা এযাবৎ কায়ক্লেশে দিনযাপন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহাদের অবস্থারও দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। গ্রামের পর গ্রামে আমি আবালবৃদ্ধবনিতাকে মহুয়া ফুল ও তেঁতুলের বীজ সংযোগে প্রস্তুত এক প্রকার মাড় খাইতে দেখিয়াছি। যাহাদের চাউল সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য আছে তাহারাও জীবনধারণের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ চাউল পায় না। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই সমস্ত অঞ্চলে 'আনাজ তরকারি' বা মৎস্য আদৌ পাওয়া যায় না। দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান আয়ের মধ্যে যাহাতে ক্রয় করা সম্ভব হয় তজ্জন্য সরকার হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করা উচিত।

জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত বে-সরকারী সাহায্য ও পুনর্বসবাস ব্যবস্থা কমিটিগুলি গত অক্টোবর মাসে অবস্থা যখন সঙ্গীন হইয়া উঠে সেই হইতেই কাজ করিয়া আসিতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন, গোয়েন্কা ট্রাস্ট, ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই কমিটির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কমিটির পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় সেবাকার্য্য করা হইতেছে, যদিও অর্থাভাবের জন্য এ কার্য্য আশানুরূপ প্রসারলাভ করিতে পারিতেছে না।

জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। শতকরা অন্ততঃ বার হইতে পনর জন অধিবাসীর অবস্থা জীবনধারণের নিম্নতম মানেরই নীচে। তাহাদের অনাহারক্লিষ্ট অবস্থা দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত না হইলে তিন সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যেই ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় পল্লী-অঞ্চলের ন্যায় মৃত বা মরণোন্মুখ, কঙ্কালসার মানুষের মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখা যাইবে। বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্চলের লক্ষণ দৃষ্টে মনে হয়, এবার ১৯৪৩ সাল অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক লোককে অনাহারক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

এই সঙ্গে ১০ই মার্চ্চ তারিখের "যুগান্তরে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। সংবাদটি যুগান্তর পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা পাঠাইয়াছেন :

> বাঁকুড়া, ৭ই মার্চ্চ—বাঁকুড়া সরকারী গুদামে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার মণ চাউল মজুত আছে ও উক্ত গুদামের চাউল নাকি অখাদ্য বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।
>
> গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাঁকুড়া সরকারী রেশনিং দোকানে চাউলের অত্যন্ত অভাব পড়িয়াছে। ইহার ফলে বহু সরকারী কর্ম্মচারী চাউলের অভাবে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, উক্ত গুদামজাত অখাদ্য চাউল বহু সরকারী কর্ম্মচারী লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।
>
> বাঁকুড়া জেলা হইতে বহু চাউল রপ্তানী হইয়া যাইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বাঁকুড়া বাজারে বর্ত্তমান চাউলের মূল্য ১৩৷১৪ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। বাজারে ভাল চাউলের আমদানি কমিয়া যাইতেছে।

দেশবাসীকে অন্ন সরবরাহের দায়িত্ব গবর্মেণ্ট তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। এই দায়িত্ব পালনে ইঁহাদের চরম অক্ষমতা দুর্ভিক্ষের সময় প্রমাণিত হইয়াছে তথাপি সরকারের চৈতন্য হয় নাই। পূর্ব্ব ব্যবস্থা এখনও বহাল আছে এবং ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস অযত্নে নষ্ট হইতেছে। ধান চাউল সংগ্রহ এবং উহা মজুত রাখিবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন উডহেড কমিশনও তাহার নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু বাংলা-সরকার সতর্ক হন নাই। বাঁকুড়ার অবস্থা খারাপ ইহা বিগত আগষ্ট মাসেই দেখা যায়। গত অক্টোবর মাসেই সর্ব্বদল সহযোগে সাহায্য সমিতি গঠিত হয়। বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি অক্টোবর হইতে অদ্যাবধি এই পাঁচ মাসে ঐরূপ সমিতিকে কোনও সাহায্য করিয়াছেন বা বাধা দিয়াছেন সে বিষয়ে তদন্ত আমরা দাবী করিতেছি। বাঁকুড়ার কোন স্থলে মড়ক ঘটিলে এই ব্যক্তির দায়িত্ব জ্ঞানের অভাবের এবং সরকারী অবহেলার সাক্ষাৎ পরিচয় দেশবাসী পাইবে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা বাঁকুড়া। শাসনকার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য জেলার আয়তন ছোট করা প্রয়োজন ইহা বার বার আমাদের শোনান হয়, রোনাও কমিটি ইহা জানাইয়াছেন এবং বড় বড় জেলাগুলি ভাঙিয়া ছোট করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। জেলার আয়তন ছোট হইলেই যদি শাসনকার্য্য

সহজ হয় তবে বাঁকুড়ার এই দুর্দশা কেন ? মেদিনীপুরের ন্যায় বৃহৎ জেলার যে অবস্থা, বাঁকুড়ার অবস্থা তার চেয়ে কোন দিক দিয়াই ভাল নয়।

ঘাট্‌তি অঞ্চল হইতে চাউল রপ্তানী

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে চাউল রপ্তানীর সংবাদ আসিতেছে। ঘাট্‌তি অঞ্চল হইতেও এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে জানাইয়াছেন যে কয়েক দিন যাবৎ তথা হইতে ধান ও চাউল রপ্তানী হইতেছিল। উহাতে স্থানীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এই অঞ্চলে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহাতে স্থানীয় অভাব মেটে না। তৎসত্ত্বেও গবর্মেণ্ট এখান হইতে ধান চাউল রপ্তানী করিতেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা এই রপ্তানী বন্ধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হয়। গরুর গাড়ীর চালক, মোটর চালক, মুটে প্রভৃতি এই চাউল রপ্তানী ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা করিতে অসম্মত হয়। ব্যবসায়ীরাও অসহযোগ করে। ইহার ফলে এই অঞ্চল হইতে চাউল সংগ্রহ অসম্ভব হওয়ায় রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে।

বাংলা-সরকারের চাউল সংগ্রহ এবং উহা গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা এত বেশী ত্রুটিপূর্ণ যে বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের হাতে কোনক্রমেই চাউল সংগ্রহের ভার ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় দেশের লোকসান, সরকারের প্রিয়পাত্র এজেণ্ট-দের লাভ। এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের দাবি দেশবাসী গত দুই বৎসরাধিক কাল যাবৎ জানাইতেছে, উডহেড কমিশনও উহা বদলাইতে বলিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান বন্দোবস্তে যে সব কর্ম্ম-চারীর লাভ তাহারা ইহাতে বাধা দিয়াছে, ভবিষ্যতেও দিবে। মাস দুয়েকের মধ্যেই প্রতিনিধিমূলক নূতন গবর্মেণ্ট গঠিত হইবে। সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে যে ক্ষতি হইবে বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের খেয়ালমত কাজ করিতে দিলে তাহার চেয়ে কম ক্ষতি হইবে না। আলিপুর দুয়ার যাহা করিয়াছে বাংলার অন্যান্য স্থানের অধিবাসী, বিশেষতঃ ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসি-বৃন্দ সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া ধান ও চাউল রপ্তানীতে বাধা দিলে অন্যায় হইবে না। বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট দেশবাসীর অন্ন-সংস্থানে সম্পূর্ণ অক্ষম তো বটেই, অনেক সময় ইঁহাদের কার্য্য-কলাপে সমূহ বিপদের আশঙ্কাই ঘটে, গত তিন-চারি বৎসরে খাদ্যের ব্যাপারে তাহা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। জন-সাধারণ নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করিবার জন্য প্রস্তুত না হইলে আবার এক দুর্ভিক্ষে লাখে লাখে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

পাটচাষীদের দুর্গতি

গত কয়েক বৎসরে বাংলার চাষীকে নানা ভাবে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে। মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও সরকারী এজেণ্টরা কৃষক সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ইহার মধ্যে পাটচাষীদের দুরবস্থা হইয়াছে সবচেয়ে বেশী।

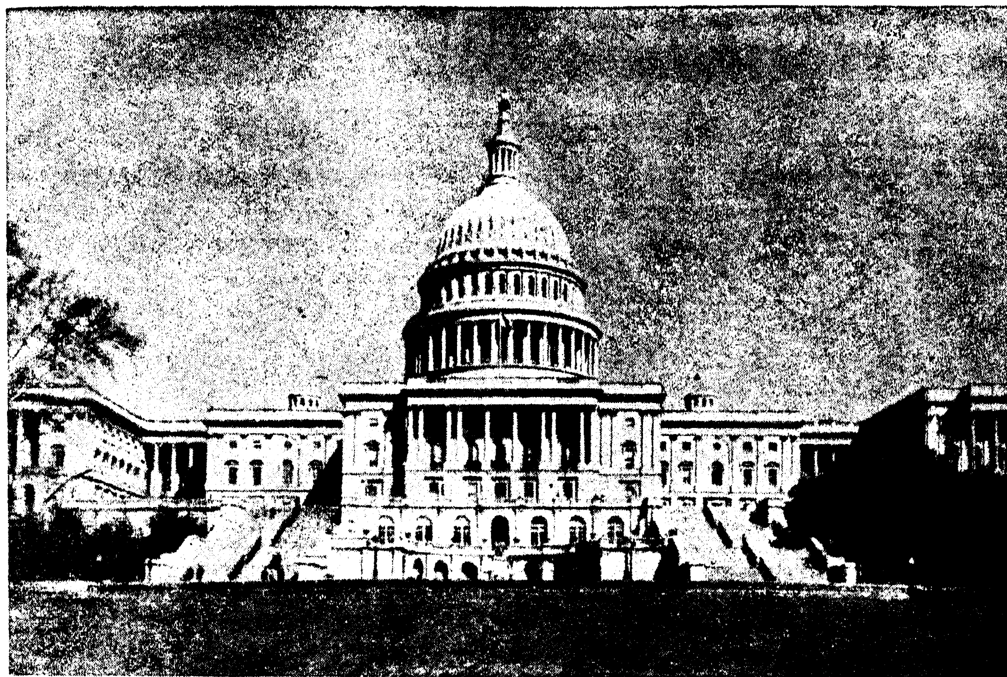
আমেরিকা চট ও বস্তা প্রভৃতি যে সব জিনিষ ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করে তাহার সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছে। ফলে এখানেও কাঁচা পাটের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এই দর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পাটচাষীর অবস্থা বিবেচনা করা হয় নাই। গবর্মেণ্ট কাঁচা পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য অন্যায়ভাবে কম করিয়া দিলেন এবং প্রভাবশালী চটকলের মালিকেরা তৈরি মালের দাম এমন করিয়া ঠিক করিলেন যাহাতে পাটচাষীগণ যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধপূর্ব্ব দাম অপেক্ষাও কমদামে পাট বিক্রী করিতে বাধ্য হইল এবং মিলের মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিল।

এই ব্যবস্থার ফলে জুট মিলগুলি ফাঁপিতে লাগিল এবং অসহায় চাষীগণ খরচা পোষায় না এত কম দামে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। গত কয়েকমাস আগেও পাটচাষীগণ অতিশয় কম দামে তাহাদের কাঁচামাল বিক্রয় করিতেছিল। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এত কম দামে যুদ্ধের সময় কোন অর্থকরী ফসল বিক্রয় হয় নাই। ইহার ফলে চাষীরা ১৯৪৫-৪৬ সালের উৎপন্ন পাটের চার ভাগের তিন ভাগ খরচ পোষায় না এত কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। দুই-একটি উদাহরণ দিলেই ইহা পরিষ্কার হইবে। যে পাকা গাঁইটের নিয়ন্ত্রিত দর ৭১ টাকা, দুই মাস আগেও তাহা ৫৮ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। বিগত বৎসরে অধিকাংশ সময়েই নারায়ণ-গঞ্জে কাঁচা পাটের বাজার দর নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষাও ১ টাকা বা ১৷৷০ টাকা কম ছিল। মিলগুলি হয়ত আইন বাঁচাইবার জন্য নিয়ন্ত্রিত দরেই মাল কিনিয়াছে। কিন্তু মিলের এজেণ্টরা চক্রান্ত করিয়া খুচরা বিক্রয়কারিগণকে ঠকাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

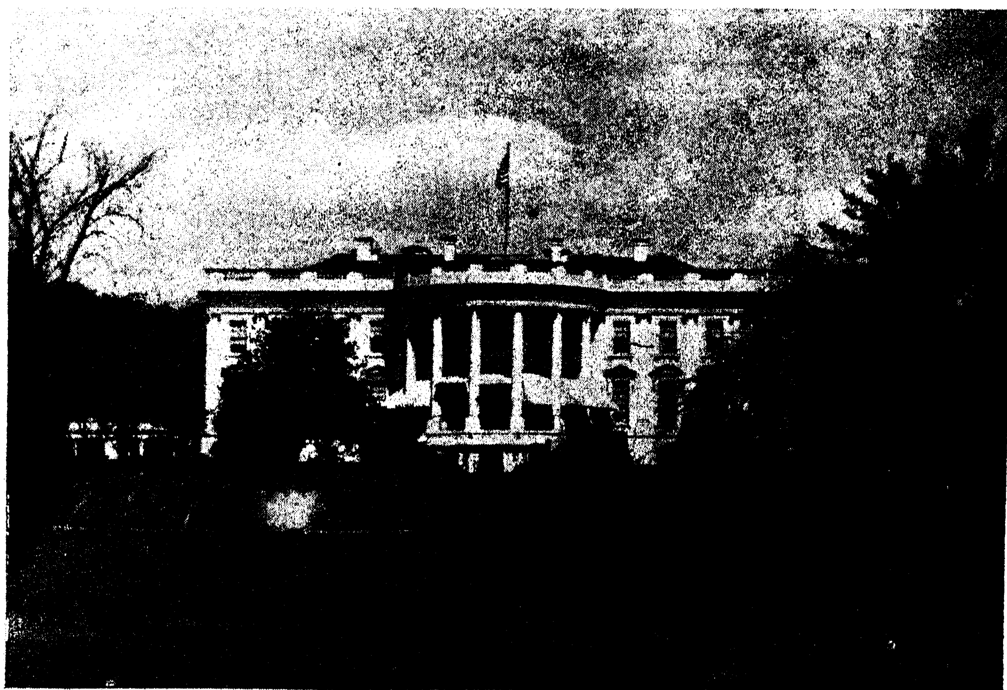
অনেকে মনে করিতে পারেন পাটচাষের ব্যাপকতার ফলে এবং উৎপন্ন শস্যের বহুলতার ফলেই মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কাঁচামালের পরিমাণ বিগত বৎসরে যথেষ্ট কম ছিল। সরকারের ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যে ইহার ফল চাষীদের পক্ষে লাভজনক হয় নাই। সম্প্রতি কাঁচা পাটের দাম অনেকটা বাড়িয়াছে। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি চাষীর উপকারে লাগে নাই; চাষীদের হাতে এখন দুই আনা শস্যও নাই। অন্যায় দামে চাষীর নিকট হইতে সংগৃহীত পাট লইয়া ফাটকাবাজেরা এখন মোটা লাভ করিতেছে।

এই সম্পর্কে বর্ত্তমানে পাট ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থার দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। অনুমান হয় যে ১৯৪৫-৪৬ সনে ভারতীয় চটকলগুলির জন্য ৬২ লক্ষ গাঁইট পাটের দরকার হইবে। ইহা ছাড়া বিদেশে রপ্তানীও ১৮ লক্ষ গাঁইট হইবে। কিন্তু কলিকাতায় ৭১।৭২ লক্ষ গাঁইটের বেশী পাট গ্রামাঞ্চল হইতে আমদানী হইবে না। এই পর্য্যন্ত ৫১ লক্ষ হইয়াছে, আর হয় তো ২০ লক্ষ হইবে। কাজেই আগামী মরশুমে কাঁচা পাটের চাহিদা খুবই ব্যাপক থাকিবে।

এই চাহিদার ফলে পাটচাষীদের অবস্থার উন্নতি সকলেই আশা করিবেন। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধা থাকিলে চাষীদের লাভের আশা সুদূরপরাহত। আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া ভারত-সরকার পাটের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন—ফলে চাষীরা শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু পাট-চাষীদের এই দুর্গতির কথা চিন্তা করিয়া এবং আগামী বৎসরের টান যোগানের পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া কাঁচা পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্যের নিয়ন্ত্রণ অবিলম্বে তুলিয়া দেওয়া উচিত।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস-ভবন, ওয়াশিংটন



হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন। এই ভবনটি যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের আবাস ও কর্মস্থল



স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি, নিউইয়র্ক



ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ

(বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত)

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের পত্র

Sarkar-abas,
Darjiling, 31st May, 1922.

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমি এই মে মাসের প্রথম হইতে এখানে আছি, সুতরাং আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠের রেজিষ্টরি পত্র কটক হইতে ঘুরিয়া এখানে পৌঁছিতে দেরি হইয়াছে। বিশ্বভারতীর গবর্ণিং বডির সদস্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও, দুইটি গুরুতর কারণে ঐ পদ অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

প্রথমতঃ। আমি এখন দূরে থাকি, এবং আর কয়েক বৎসর পরে পেন্সন লইয়াও নিম্ন বঙ্গে বাস না করিবার ইচ্ছা। সুতরাং শান্তিনিকেতনের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা, নূতন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব। বৎসরে একবার মাত্র বার্ষিক অধিবেশনে দেখা দিলে চলিবে না। যেখানে কাজ করিতে পারিব না, সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা আমি নিজের পক্ষে লজ্জাকর ব্যবহার এবং ঐ সংস্থানটির প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করি। এই যেমন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভা (Council) এ এত বাহিরের ও দূরের লোক যে ৩০জন সদস্যের মধ্যে অনেক অধিবেশনে সাত জনও জোটে না, অধিবেশন পণ্ড হয়। এলাহাবাদের উকীলগণ না আসিলে কোরম্ হয় না। যেখানে স্থানীয় পণ্ডিত ও কার্য্য-দক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নাই, সেখানে স্বাধীন আত্মনিবদ্ধ (self-contained) ইউনিভার্সিটি হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ। পূর্ব্বে যে শান্তিনিকেতনকে দেখিয়াছি তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রেরা চরিত্র দেহ এবং হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত করিয়া, পরে তাহারা মামুলী কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্কটা সংসারের উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত; অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার অভাব, বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে বোলপুরের কাজটা যে কাঁচা হইতেছে তাহা আপনিই আমাকে বলিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি বৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাই (১) প্রতি বিভাগে সর্ব্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং সেই প্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা (অর্থাৎ intellectual discipline and exact knowledge) পূর্ব্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমণ্ডলী, (৩) শিক্ষায় পরিপক্ব সচ্চরিত্র একনিষ্ঠ প্রধান নেতা। এই তিনটি থাকিলে টাকা বা জিনিষের অভাব বাধা হয় না, এবং সে অভাবও বেশী দিন থাকে না।

আমাদের মামুলী কলেজের I. A. ও B. A. শ্রেণী চারিটি প্রকৃতপক্ষে বিলাতের ভাল সেকেণ্ডারি স্কুলের কাজ করে; আর এদেশে প্রকৃত কলেজের কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এম্ এ ক্লাস হইতে আরম্ভ হয়। ঐ I. A. এবং B. A. ক্লাসে চারি বৎসর খাটিয়া তবে আমাদের ছেলেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়িবার ও নিজে কাজ করিবার উপযুক্ত হয়। বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাই স্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ পণ্ডিত মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে তৃতীয় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোষ্টগ্রাজু-য়েট বিভাগ)ও বেশ কার্য্যকর হইবে, যদি ছাত্র আসে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের চারিটি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই। যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত হইয়াছে, সে কিরূপে রিসার্চ-অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে ও তাঁহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না; কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি—অর্থাৎ উচ্চ general knowledge এবং দুই বা তিন বিষয়ের সূক্ষ্ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ তাহাদের ঘটে নাই; তাহাদের মধ্য-ভাগটা কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, যে ছাত্র এম্-এর ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায়, তাহার পক্ষে পূর্ব্বেই বি-এতে অর্থনীতি ও শাসনশাস্ত্র এবং একটি ভাষা রিসার্চ-বর্জ্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত জানিলে চলিবে না, গ্রীসীয় হিষ্ট্রী, মিসর ব্যাবিলনের ইতিহাস এবং Political philosophyতে অগ্রে বি-এ পাস করা আবশ্যক, নচেৎ তাহার মনটা সংকীর্ণ থাকিয়া যাইবে। সিলভ্যাঁ লিভির বক্তৃতা শুনিয়া ফল পাইতে হইলে, আগে ভারতীয় দর্শন, পালি সাহিত্য, ভাল জানা চাই; এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত ইণ্ডোচায়না সম্বন্ধে কতকগুলি বই পড়িয়া রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ exact knowledgeএ পরের অর্জ্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া তাহার পরে ও উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌঁছিতে পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (ইহাকে grind বলিতে পারেন) মামুলী কলেজে হয়, বোলপুরে নহে।

তাহার উপর বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge

এবং intellctual disciplineকে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষককে, সেবকগণকে, হৃদয়হীন শুষ্ক-মস্তিষ্ক "বিশ্বমানবে"র শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে। তাহারা শুধু ভাবের দিকে, synthesis of knowledgeএর দিকে তাকায়। কিন্তু এই synthesisএর অত্যাবশ্যক ভিত্তি যে exact knowledge তাহা শেখে না; বরং শেখাটা অনুচিত কুশিক্ষা বলিয়া মনে করে। এই যেমন আকাশে এরোপ্লেন উড়িতেছে দেখিয়া আমাদের মনে হয়, আহা! কি সুন্দর, এইরূপ উড়াই মানব মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ কাজ ও সুখ! কিন্তু কত শ্রমের, কত শুষ্ক তপস্যার, কত exact knowledgeএর ফলে এরোপ্লেনের সৃষ্টি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাবি না। ইহার আবিষ্কারের পূর্ব্বে অসংখ্য পতঙ্গ ও পক্ষীর দেহ ছুরি এবং অণুবীক্ষণ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া, পক্ষ ও দেহের আনুপাতিক ওজন এবং আয়তন, পক্ষের ভিতর দিয়া শক্তিবাহক রগের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করা, শুষ্ক exact knowledgeএর পুঁজী সংগ্রহ করা, এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষা, প্রাণত্যাগের পর প্রাণত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছিল। এরোপ্লেন আনন্দে সৃষ্ট হয় নাই।

তেমনি, আচার্য্য বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ সকলেরই প্রাণ, উত্তেজনা ও ক্লান্তি এবং মৃত্যু আছে। আমরা অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠি—"বাঃ! ইহাই ভারতের নিজস্ব মানসিক সম্পদ। আমাদের উপনিষদের যুগের পিতামহগণই ত বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রাণ আছে।" আমরা বুঝি না যে প্রাচীন ঋষিরা ভাবের উন্মেষে ঐ কথা বলেন; কিন্তু আচার্য্য বসুর প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভীষণ শুষ্ক, তিনি exact knowledgeএর সাহায্যে বিজ্ঞানাগারে পদে পদে পরীক্ষা করিয়া সেই পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া, এক ইঞ্চকে কোটি ভাগে বিভক্ত করিয়া—তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; অবিশ্বাসীকে হাত দিয়া সেই পরীক্ষা করাইয়া তাহাকে নিজমতে দীক্ষিত করিতে পারেন।

তেমনি পালি ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ সংস্করণের পশ্চাতে কি অগাধ পরিশ্রম রহিয়াছে! এই সব সংস্করণের সম্পাদক ম্লেচ্ছ পণ্ডিতগণ গণিয়া ঠিক করিয়াছেন যে ললিত-বিস্তারে তৃতীয়ার একবচন কোথায় এবং কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে; বৃহদ্দেবতায় দেবগণের উপাধি ও গুণগুলির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। আর আমরা আর্য্যসন্তান এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ হাতে করিয়া আত্মম্ভরিতার সহিত উপর-চালাকী করিতেছি; ভাবগদগদ হইয়া general remarks ঝাড়িতেছি; আর লেফ্‌ম্যান্ ও ম্যাক্‌ডোনেলের শুষ্কশ্রমের প্রতি, তাহাদের exact knowledgeএর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি।

আমি এখনও মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্ত্তমান ভারত জগতকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য, তস্য ভাষ্য, নব্যন্যায়ের কচকচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নক্‌সা; অথবা মুঘলচিত্রের সাত নকলের খাস্ত। ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতেও জগতকে exact knowledge দিতে পারে, প্রাচীন বা মধ্য যুগের scientific ইতিহাস রচনা করিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি rechauffe বা অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া "জগৎসভার মাঝে" গ্রহণীয় নূতন জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে পারে।—এ বিশ্বাসটাকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহি না।

বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে। সেখানে যে বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই scientific method এবং exact knowledgeএর বিরোধী। যেমন বৈষ্ণবেরা ভক্তি-বিগলিত-অশ্রু হইয়া সব জিনিষ অস্পষ্ট দেখে, তেমনি বোলপুরের ছাত্রগণ শেখে ভাবের (emotion) বাষ্পের আবরণ দিয়া জগতের দিকে তাকাতে, প্রথম হইতেই বসুধৈব কুটুম্বকং বলিয়া তাহারা অণুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দূরবীক্ষণই ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের কোনটাকেই ছাড়িলে পূর্ণতা লাভ করা যায় না।

আপনি দেখিতেছেন আমি কি অকাট্য দুরারোগ্য ফিলিষ্টাইন্। তাহা হইবেই ত। আমি পেশাদার গুরুমহাশয়, মস্তিষ্কের (হৃদয়ের নহে) পণ্ডিত তৈয়ারি করিবার চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদের আবির্ভাব বা নূতন আদর্শ-প্রণালীর কথা শুনি, সেখানেই দেখিতে যাই। সতীশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ন্যাশানাল কলেজ দুবার, বোলপুর তিনবার এবং গুরুকুল একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্ব্বাঙ্গীণ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনি যখন পদ্যে, ধর্ম্ম ব্যাখানে বা গল্পে বেদান্তের নির্যাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আমি তাহা পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লই, কারণ আপনার যুক্তিদ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট, আপনার ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট, তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। আর, আমি জানি যে আপনি নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তবে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যখন বোলপুরের দশ বছরের ছেলে—ষোল বছরেরই হউক না,—"বিশ্বমানব" "অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা" প্রভৃতি কথা আওড়াইতে থাকে, তখন পুঁটিমাছের মুখে তিমিমাছের গলার আওয়াজের মত এগুলি অসঙ্গত শুনায়। আমাদের মামুলী কলেজে পাস করা ছেলেরা যে রাজনৈতিক মঞ্চে নৃত্য করিতে করিতে "ডেমক্রেসি" "কনষ্টিটিউশন্" "সেল্‌ফ্-ডিটার্মিনেশন" প্রভৃতি বুলী আওড়ায় তাহাও ঠিক এইরূপ মূল্যের জিনিষ।

কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। মামুলী কলেজে আমরা পেশাদার গুরুমশায়রা ছাত্রের হৃদয়টার দিকে তাকাই না, শুধু মস্তিষ্কটা শানাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই অভাবটা বাহিরের গুরুমহাশয়—সংসার হউক, আপনার কাব্য হউক, প্রকৃতির দৃশ্য হউক,—পরে পূরণ করিয়া দেয়, কারণ হৃদয়টা শূন্য থাকিতে পারে না,—(যেমন টেনিসন্ তাঁহার Palace of Artএ সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন।) বোলপুরের ছাত্রেরা যে আমাদের পেটেন্ট করা প্রস্তর চক্রে মস্তিষ্ক শানায় না, exact knowledge, বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellectual discipline যে শেখে না, শেখা অন্যায় মনে করে—তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পূরণ হইতে পারে না। একমাত্র তরুণ বয়স এবং কলেজের শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাই এই অভ্যাস, এই দিকে মনের ঝোঁক আনিয়া দিতে পারে। বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে ইহা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এই রকম [অপরিপক্ক] ছাত্রেরা রিসার্চ ক্লাসে উঠিয়া, মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে—ভাসাভাসা synthesis বাদে,—কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না,—অন্ততঃ তাহাদের শ্রমফল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য হইবে না। শুধু সংস্কৃত পড়িয়া যাঁহারা পণ্ডিত হইয়াছেন, আর যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শন অভ্যাস করিয়া তাহার সঙ্গে বা পরে সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়াছেন, এই দুই শ্রেণীর মনের দৌড় ও ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ শেষোক্ত পণ্ডিতেরাই প্রকৃত মূল্যবান গবেষণা করিতে পারেন।

আর একটা উপমা দিলেই আমার মনের ভাব পরিষ্কার হইবে, এবং আমি যে কি ভীষণ ফিলিষ্টাইন্ সে সম্বন্ধে আপনার পূর্ব্ব-স্নেহবশতঃ যদি দু একটা সন্দেহ থাকে তবে তাহাও লোপ পাইবে। "ইণ্ডিয়ান আর্ট" ভারতের নিজস্ব জিনিষ, ইহা "জগৎ-সভার" নিকট ভারতের অমূল্য অন্যত্র-অপ্রাপ্য দান, এই বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি। আমরা বলি যে রবিবর্ম্মার ছবিতে ভাব নাই, তাহা দাসোচিত নকল। এই মত প্রচারের ফলে অবনীন্দ্র বাবু ও নন্দলাল ভিন্ন আর সব নব্য ইণ্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা কাজটি ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নাই, শরীর-বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে নানা পরীক্ষা (studies অথবা sketches) করিয়া চিত্রের উপযোগী অঙ্গ-ভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই, এক লাফে ভাবের ছবি আঁকিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এই সব ছবির যাহা ভাল তাহাকে অজন্তার বা মুঘল-চিত্রের নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না, অধিকাংশই কাঁচা ও খারাপ। ঠিক শিশুর আঁকা ছবি বা cave-menএর আঁকা মেয়াদ্ চিত্রের মত—শুধু রংগুলি তাদের চেয়ে ভাল। কিপ্লিং-এর একটা গল্প আছে যে একজন ভবঘুরে সাহেব এদেশে এসে প্রথম এক্কা দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "How thruly orienthal !' ইণ্ডিয়ান আর্টের চরম আকাঙ্ক্ষা কি এই যে সাহেবেরা [ইহা দেখিয়া] বলিবে How truly oriental অর্থাৎ বিশ্বজগতের সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে না? কালা আদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন standard আছে তাহা দিয়াই ইহার বিচার করা হইবে?

রবিবর্ম্মার চিত্রে ভাব নাই, সত্য; কিন্তু রবিবর্ম্মাই কি ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির দৃষ্টান্ত? র‍্যাফেল, লীটন্, টার্ণনার বা রুইজডেলএর চিত্রে ত ভাবের অভাব বা [প্রকৃতির] দাসোচিত অনুকরণ [আছে একথা] কেহ বলেন নাই; অথচ তাঁহাদের কীর্ত্তির পশ্চাতে কত anatomy, observation of Nature, "Studies" অর্থাৎ খষড়া চিত্র আছে, তাহার পর তাঁহাদের হাত ঠিক হয়। Sir Frederick Leighton তাঁহার Flaming June নামক ছবিতে তন্দ্রা-জড়িত রমণীর মাথার নীচে দেওয়া ডাইন হাতের ভঙ্গির জন্য ১৬।১৭টা স্কেচ করেন, পরে তাহার একটি বাছিয়া লন, এবং তাহা ছবিতে বসান। সেই মত র‍্যাফেলের স্কেচ [Cartoons] আছে।

অথচ আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্টের গুরু হইতে নবীনতম শাগ্‌রেদ পর্য্যন্ত সকলে "Art is not photography," "The imitation of Nature is a slavish practice, unworthy of a true artist," "Expression is higher than fidelity to life," এই সব বুলী আওড়ান এবং ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতিকে জঘন্য গালাগালি দেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ সমালোচনা করিতে তাহার ভূমিকায় এইরূপ রুচি ও যুক্তির গালাগালিকে টাইম্‌স্ পত্রিকা ছয় সাত মাস হইল লক্ষ্য করিয়াছে।

ইহার ফলে ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষানবিসের হাত ঠিক করিতে যে পরিশ্রম, যে প্রকৃতির অনুকরণ আবশ্যক তাহাকে দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহংকারের সহিত ত্যাগ করিয়া একেবারে ভাব প্রকাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার ফল, প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি। সেই মত বোলপুরের ছাত্রেরা exact knowledgeকে ঘৃণা করিয়া এক লাফে synthesis of knowledge এবং ভাবপ্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিতেছে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান আর্ট এবং সিন্‌থেসিস্-বাদ এ দুটা অলসতার ওজুহাত হইয়াছে। মামুলী কলেজের ছাত্রগণ অলস হইলে বা ঢিলে কাজ করিলে লজ্জা বোধ করে [এবং শাস্তি পায়]; আর ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ এরূপ করাকে গৌরবের বিষয় এবং মানসিক স্বাধীনতার চিহ্ন বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে।

আমি কেন এ সম্বন্ধে ফিলিষ্টাইন্ তাহা বলিতেছি। যদি বোলপুরের ছাত্রগণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি বা চিত্রকর হইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহাদের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান হইতাম না। কিন্তু দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে বঙ্গমাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন, আর দু শ' বৎসর বাদেও যে, তাঁহার দ্বিতীয় আসিবে না, এরূপ আমার বিশ্বাস। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রদিগকে এই আমাদের মতই সাধারণ সাংসারিক লোক বলিয়া বিচার করিতে হইবে, মামুলী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে।

The winds of genius blow where they list, মামুলী কলেজ এই সর্ব্বোচ্চ মনীষীদের সৃষ্টি করিতে পারে না; বোলপুরও পারিবে না। তবে মামুলী কলেজে সেই মত কোন অজ্ঞাত ক্ষণজন্মা কবি শিল্পী ছাত্ররূপে আসিলে, আমরা তাঁহাকে পিশিয়া ফেলি, বোলপুরে তিনি রক্ষা পাইবেন।

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, এজন্য যে কি কষ্ট অনুভব করিতেছি তাহা আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মীদের সমাজে এই বিশ্বভারতী সংস্থানের সহিত আপনার খ্যাতি জড়িত থাকিবে। আমি ঊনত্রিশ বৎসর কলেজে পড়াইয়াছি, এবং আমার মৌলিক গবেষণা ছাড়িয়া দন,—আমি শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের অবস্থার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি। এখন যদি আপনার প্রস্তাবিত পন্থার বিপদ আপনাকে বলিয়া না দিই তবে আপনাকে প্রতারিত করিব।

বিনীত
শ্রীযদুনাথ সরকার

শান্তিনিকেতন
[Postmark 3 June, 1922]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে কোনো কারণে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সেজন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়াছি এবং সেই জন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম।

আমার কাজের বিরুদ্ধে আমার দেশের লোকের একটা প্রতিকূল ধারণা আছে, ইহা আমার পক্ষে বিষম বাধা। কিন্তু আপনার মধ্যে সেই বিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে আপনার চিঠির মর্ম্ম এখনো স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। বিশেষতঃ আপনি অনেকবার এখানে আসিয়াছেন, সকল প্রকার অভাব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এখানকার প্রতি স্নিগ্ধভাব রক্ষা করিয়াছেন; আপনি যে এখানকার আবহাওয়া বা কার্য্য প্রণালীকে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন এমন আভাস তখন আপনার নিকট হইতে একবারও পাই নাই।

আপনি বলিয়াছেন, "বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge ঘৃণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ কাজের শিক্ষক ও সাধকগণকে 'হৃদয়হীন, শুষ্ক-মস্তিষ্ক', 'বিশ্বমানবের শত্রু, বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয়।" একথা যদি সত্য হয় তবে আমার এই বিদ্যালয় কেবল যে নিষ্ফল তাহা নহে, ইহার ফল বিষময়। কিন্তু একথার আপনি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

এতকাল পর্য্যন্ত এখানে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। এখানে বেশীর ভাগ কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প কিছু বিজ্ঞান। যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্ত্তি হইয়াছে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন দেশে ত হাইস্কুল যথেষ্ট আছে তাহার উপর আর একটা বোঝা বাড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য এই যে এদেশে হাইস্কুলে ছাত্রেরা যেটুকু শেখে এখানকার ছাত্রেরা অন্ততঃ সেইটুকুই শিখিত। আপনি কি কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্বল্প পরিমাণ শিক্ষার মধ্যেই accurate knowledge উপহাস করিতে দীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটি মত দাঁড়াইয়া গেছে যে, প্রমাণ সঙ্গত প্রণালীতে যে মনস্বীরা জ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা "বিশ্বমানবে"র শত্রু?

একথা আপনার জানা আছে যে, যথোচিত পদ্ধতিতে আমি নিজে শিক্ষালাভ করি নাই। মনে করিতে পারেন সেই অশিক্ষাবশতই জ্ঞানান্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি অশ্রদ্ধা করি,—এবং সেই অশ্রদ্ধা আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এখানকার অপরিণত-বুদ্ধি বালকদের মনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন তবে আমাকে আপনি জানেন না ইহার বেশী আর কিছু বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইলাম, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, সত্যের দোহাই দিয়া আমি বলিব যে, "সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ সঙ্গত অনুসন্ধান প্রণালীর প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা আছে; আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, এমন কি হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও প্রামাণিক পদ্ধতির চর্চ্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি।

আপনার প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তিগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্য-সন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। আমাদের দেশের অনেকে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য তাঁহাদের সাধনা এরূপ বিশুদ্ধ নহে। আপনার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই এখানকার কাজে আপনার সহায়তা পাইবার জন্য এমন আগ্রহের সহিত বারম্বার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনাকে যদি "বিশ্বমানবে"র শত্রু বলিয়া মনে করিতাম তবে আপনার সংস্রব এমন করিয়া কামনা করিতাম না।

আচার্য্য বসুর অনুসন্ধান-লব্ধ তত্ত্বগুলিকে দেশের যে একদল লোক প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের ঝুলির মধ্যে গুপ্ত আছে বলিয়া কল্পনা করেন, আপনার পত্রে আপনি তাঁহাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আপনার চেয়ে আমি তাঁহাদিগকে কম অশ্রদ্ধা করি না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুরাতন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীকে যাঁহারা অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করেন আপনি তাঁহাদের কথাও লিখিয়াছেন। আমি যে সে দলের নহি আপনি যদি তাহার প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা আলোচনা করিবেন, আমি তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া, প্রামাণিক প্রণালী অনুসারে শাস্ত্র আলোচনা ও উদ্ধার করিবার জন্য, যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। এখানকার লাইব্রেরিতে তাহার প্রমাণ আছে।

আমার এখানে ভাবাবেশের অস্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোন কোন বন্ধুমহলেও প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি—কিন্তু তাঁহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাঁহাদের ধারণা নির্ম্মল নহে, কিন্তু আপনার মধ্যেও এইরূপ প্রতিকূলতা যদি এমন প্রবল আবেগে উগ্র হইয়া ওঠা সম্ভবপর হয় তবে তাহা আমার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমনি কার্য্যোপযোগী, তাহার কার্য্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী বহুব্যাপক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাঁসপাতাল সমেত একটি শিক্ষা-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীঘ্রই ছোট আকারে তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে "বিশ্বমানবে"র বিরুদ্ধতা করা হয় বলিয়া এখানকার কেহই মনে করেন না। কিন্তু আপনারা কি বলেন যে, ভাবুকতার কোন সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল বিজ্ঞান ও এই সকল কারখানার কাজ শিখাইলেই exact knowledge-এর সাহায্যে ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে?

আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে "খ্রীষ্টপূর্ব্বযুগে রচিত বেদান্তে"র নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নবন্যায়ের কচকচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নক্‌সা"র উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যাহাকে "বোলপুরের বায়ু" বলেন সে কি কেবল এই সকল ফসলেরই উপযোগী? বেদান্তের নূতন ভাষ্য ও নব্যন্যায়কে বিদ্রূপ করিতে পারি এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই। কিন্তু "কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ ও আলিপনার নক্‌সা" সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ ও আর্ট-সমালোচকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে—দেখিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশের প্রতি তাঁহাদের মানসিক বায়ু পরিশুদ্ধ বলিয়াই এগুলিকে তাঁহারা বহু মূল্য গণ্য করেন, আমার ইচ্ছা যে আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিশুদ্ধ হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞানসাধনায় বিজ্ঞানের যে স্থান আছে তাহাকে সকলে সম্মান করিতে শেখে।

আপনার চিঠির ভাষা হইতে বুঝিলাম "বিশ্বমানব" "বসুধৈব কুটুম্বকং" প্রভৃতি ভাষা ও ভাবের প্রতি আপনি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। অসংযতভাবে এই সকল শব্দের অমিত ব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। আমার দ্বারা হয়ত তাহা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু আমার বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন ছাত্রদের মধ্যে আমি একজনকেও জানি না যে ব্যক্তি বিশ্বমানব বা বসুধৈব কুটুম্বকং লইয়া প্রবন্ধে বা গ্রন্থে, বক্তৃতায় বা কবিতায় কোনো আলোচনা করিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র ছাত্রকে জানি যাহার মন ভাবাবিষ্টতায় অভিভূত। কিন্তু মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য সাধনে প্রকৃতি দেবীর নিজের কি কোন হাত নাই, আমাদের আশ্রমের "ভক্তি-বাষ্পাকুল বায়ুর" আর্দ্রতাতেই কি মন তৈরি হইয়া উঠে? এখানকার একটি ছাত্র চুরিও করিয়াছে সেজন্য কি এখানকারই বায়ু দায়ী? বৈজ্ঞানিক বায়ুতে কোনো বিকার কাহারও ঘটে না?

আমার ব্যক্তিগত প্রভাবকেই হয়ত আপনি দোষ দিতে চান। সে সম্বন্ধে আমার দুটি মাত্র কথা বলিবার আছে। আমার জীবনে আমি ভাবাবেগের যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি কি ভাবাকুল হইয়া কেবলি

রসবিলাসে জীবন কাটাইলাম? আমি কি কাজের জন্য কোন উদ্যোগ কোন ত্যাগ কোন সাধনা করি নাই? সেই সাধনায় কি কাঠিন্য নাই? চিন্তাকে বাক্যে প্রকাশ করাতেই কি কেবল যাথাতথ্যের প্রয়োজন, কাজে প্রকাশ করিতে কি শৈথিল্য-ত্যাগ ও বুদ্ধি এবং কল্পনার সংযম লাগে না? অতএব আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে কেবল ভাবাবেশের জড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে আমি অর্থাভাব এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার অভাবের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, আর সেই কঠোর সাধনার কোন প্রভাবই তাহাদের উপর কাজ করিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের "এরোপ্লেন" কি কেবল ভাবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল "আনন্দেই সৃষ্ট" হইয়াছে, ইহার মধ্যে সঙ্কল্প নাই, চিন্তা নাই, পরীক্ষা নাই, দুঃখ নাই? এখানকার ছাত্রেরা কি তাহা দেখিতে পায় না?

দ্বিতীয় কথা, আমার শিক্ষা, আমার মতি এবং চরিত্র যাহা করিতে পারে তাহার বেশী কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার সামর্থ্যের অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই আপনাদের মত জ্ঞানের সাধকদিগকে চাহিয়াছিলাম। যদি পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনা-প্রণালী শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম। এখানে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে করেন না—তাঁহারা নিজেরা পরামর্শ করিয়া কাজ করেন। আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে যদি আমার অভিমান থাকিত তবে আমি নিজেই কর্ত্তৃপদ লইতাম। এখানকার বায়ু একমাত্র আমার ভাবাবেশের দ্বারা কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ আপনি যদি সন্ধান করিতেন তবে জানিতেন আমার ভাবের সঙ্গে এখানকার অনেক অধ্যাপকের ভাবের মিল নাই, আর এখানকার ছাত্রদের পনেরো আনা রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমার ভাবের প্রতি আস্থা রাখে না। তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্যকে আমি বাধা দিই না, ইহাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত ও বিস্মিত চিত্তে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। আপনার মনে আমি ক্ষোভের কোন্ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার এরূপ বিরুদ্ধতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। আপনি "ফিলিষ্টাইন," আপনার কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী "বিশ্বমানবে"র ক্ষতিকর, এমন কথা আমি কোনোদিন প্রকাশ্যে বা গোপনে আভাসেও প্রকাশ করি নাই, কারণ ইহা আমার চিন্তাতেও আসিতে পারে না। আপনার পত্রে বাংলার আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে উগ্রতা আছে তাহাতে সন্দেহ হয় তাঁহাদের সঙ্গে হয়ত আপনার বাদ-প্রতিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। আমি তাহা জানিও না এবং তাঁহাদের আলোচনায় ঘরের কোণেও কোনদিন যোগ দিই না,—যদিও একথা স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ করি যে, বাংলার আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে ও আর্ট-সাধনা সম্বন্ধে আপনি যে মত যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি মিলি না।

আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন। এই কারণে আমার কর্ম্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞা-মিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতায় আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের এখানে ত্রুটির অভাব নাই, ত্রুটি অন্যত্রও আছে, কিন্তু যথাবিহিতরূপে আপনি কি তাহার সন্ধান ও যথোচিতভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বিশ্বভারতীর সঙ্কল্প মাথায় লইয়া ভারতবর্ষে যখন ফিরিলাম তখন সহায়তার জন্য সর্ব্বপ্রথমে আপনাকেই সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব; তৎসত্ত্বেও ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সত্যসাধক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[Received at Darjiling, 6th June 1922.]



ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সভাটা সংবাদপত্রে বিজ্ঞা ত হইয়াছে। নামকরা প্রেসিডেণ্টের নামের সঙ্গে একজন ম প্রধান অতিথিও আছেন। বঙ্গসাহিত্যে হাইফেন চিহ্নের মত দুটি যুগকে তিনি সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেকাল বলিতে যে পুরাতত্ত্বে মন বিমুখ হয় তেমনটা স্তিমিত তিনি নন, একাল বলিতে যে উগ্র প্রগতিবাদকে সহজে পরিপাক করা যায় না তেমন তীক্ষ্ণতাও তাঁর নাই। দুটি দলই ভাবে বিরূপাক্ষ সোম দলীয় মনোভাবে গঠিত নন, অথচ দুটি দলই আশা রাখে যুক্তির জোরে এবং ভালবাসার দাবিতে তাঁহাকে দলের প্রভাবে আনিবেই। পশ্চিমের কোন সমৃদ্ধ শহরে—সম্মানজনক পদমর্য্যাদায় তিনি সমাসীন। এই শহরের তীব্র মতবাদের আঁচ কণ্ঠস্বরের মারফত তাঁর দেহে লাগে না—কিন্তু মাসিকের মারফত সে অগ্নিরূপের সঙ্গে তাঁর পরোক্ষ পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে দ্ব্যর্থ ভাষায় দুটি দলকেই তিনি সমর্থন করেন। ভাষার হেঁয়ালির মাঝে আসল বক্তব্যকে এমন ভাবে মিশাইতে সুদক্ষ তিনি—যে কোন পক্ষই অস্ত্রাঘাতের চিহ্নে জ্বালা অনুভব করিয়া তাঁহাকে সোজাসুজি যুদ্ধে আহ্বান করিবার সুযোগ পায় না। জলের মধ্যে হাঙরে অঙ্গ কাটিয়া লইলে জলে-ডোবা অঙ্গে যেমন চেতনা জাগে না—তেমনই ক্ষুরধার তাঁর লেখনী-অস্ত্র। দ্ব্যর্থজাল ভেদ করিয়া তার অর্থ উদ্ধার করা—ডাঙ্গায় হাঙর-কাটা মানুষটিকে তুলিয়া ফেলার চেয়েও কম কঠিন নহে। বারোমেসে সভাপতির চেয়ে তিনিই এ সভার প্রধানতম আকর্ষণ।

সভাপতি প্রাক্-রবীন্দ্রদলীয় নন, তাঁর সমসাময়িক। গলিত দন্ত, পলিত কেশ। চেয়ারে সর্বক্ষণ সোজা হইয়া বসিতে পারেন না—একবার বাঁয়ের হাতলে—একবার ডান দিকের হাতলে কাত হইয়া জরাজীর্ণ মেদবহুল দেহটিকে ক্লান্তি হইতে রক্ষা করেন। চোখের চশমা ভেদ করিয়া স্তিমিত দৃষ্টি তাঁর—সভা সূচির কার্য্যতালিকায় পৌঁছায় না—পার্শ্ববর্ত্তী কোন সদস্যকে তাঁর হইয়া ঘোষণা করিতে হয়। কথাও সব শ্রুতিস্পর্শ করে কিনা সন্দেহ, কিন্তু মাথা নাড়িয়া সব লেখারই তারিফ করেন তিনি। সদা সহাস্য মুখ। বঙ্কিম-সাহিত্যকে নস্যাৎ করিয়া যে লেখক স্পর্দ্ধা ভরে নিজ কালের জয় ঘোষণা করেন—এবং বঙ্কিম-সাহিত্যকে মাথায় তুলিয়া যিনি ভাবাবেগে বিগত কালের মহিমায় অশ্রু মোচন করেন—দুই জনেই সভাপতির স্মিত হাস্যের দুই রকম অর্থ বুঝেন না। এক জনকে উঁচুতে বসাইয়া—নিজেদের নিরঙ্কুশ লেখনীকে অবাধে চালনা করিবার সুবিধাকে তাঁহারা সকৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করেন। সে ব্যক্তি যদি অজাতশত্রু হন—বক্তাকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে।

মাতিবৃহৎ হলঘরে অনেকেই আসিয়াছেন। অনেক গুণী—মানী—যশস্বী সাহিত্যিক। বাংলা-সাহিত্য যাঁহাদের লেখনীর আঁচড়ে—সহস্রদল পদ্মের মত নিত্য পাপড়ী উন্মোচন করিতেছে। শ্রী ও স্বস্তিরূপিণী বাণী সেই বিকশিত স্বর্ণ-সহস্রদলে পা রাখিয়া যুগের বন্দনা সার্থক করিবেন—এই আশাও প্রবল। যুদ্ধোত্তর যুগে নূতন বিশ্বে—নূতন চিন্তাধারার সঙ্গে নূতন সাহিত্য রচিত হইবে। অনেক নূতন সাহিত্যিক সেই দিকে সাগ্রহে চাহিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পাখী-কাকলিধ্বনির মতই কবি-বিহঙ্গেরা অত্যাসন্ন প্রভাতের বন্দনা গাহিতেছেন। রাজার সভায় যে কবি রাজ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নিজের অশন বসন সম্মানের সংস্থান করেন—তিনি মৃত। রাজার স্থান নূতন বিশ্বে নাই—রাজস্তুতি বিদ্রূপের বিষয়।

যথানিয়মে সভাপতি সভাসীন হইলেন। প্রধান অতিথি বসিলেন ডাহিনে—বামে সাধারণ সম্পাদক— অর্থাৎ ঘোষক। কোথায় হারমোনিয়মের মৃদু আওয়াজ শোনা গেল—মিষ্ট গলায় একটি মেয়ে গান ধরিল।

গানের রেশ করতালিধ্বনিতে মিশিয়া গেল। সভাপতি উঠিয়া অস্ফুট অশ্রুতস্বরে কি ঘোষণা করিলেন।

একটি আঠার বছরের যুবক একখানি চটি একজারসাইজ বই হাতে ডায়াসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পাতলা ছিপছিপে গৌরবর্ণের ছেলেটি। চোখে চশমা—গায়ে আদ্দির হাত ঢিলা পাঞ্জাবী—বুকপকেটে দামী ফাউণ্টেন পেন—এবং গলার একটি বোতাম খোলা। চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা—গোঁফের রেখাটি সবে দেখা দিয়াছে, কি সযত্নে কোলাম্যানি প্যাটার্ন করা—বুঝা দুষ্কর। পায়ে লাল রঙের শুঁড়তোলা চটি—পরনে মোটা মিলের ধুতি। ছেলেটি বিনয়ে মাথা নামাইয়া অকারণে লজ্জার অভিনয় করিল না। স্পষ্ট গলায় বলিল, কবিতার যুগ শেষ হয় নি—কবিতা থেকে সস্তা ভাববিলাস—বা রোমান্টিসিজম্ শুধু শেষ হয়েছে। ছন্দের বাঁধন কেটে—কবিতা আজ বলশালিতা লাভ করেছে। তাতে লাভ হয়েছে—সোজা কথা সোজা করেই বলতে পারা যায়। ন্যাকামি ঢঙে—অনুপ্রাসে—মিলে—উপমায় তাকে নটীর মত সজ্জাবাহুল্যে—ভারগ্রস্ত হতে হয় না। অনেকে আপত্তি তোলেন—শিল্পদৃষ্টি নিয়ে—রসসৃষ্টি নিয়ে। পারিপার্শ্বিক দৃষ্টিকে যেমন বদলে দেয়—যুগের ভিয়ানশালায় রসের পাকও তেমনি ভিন্নতর। মিষ্টি মাত্রই জিহ্বাকে স্বাদবিহ্বল করে না।

সভাপতির বাম পার্শ্ব হইতে সম্পাদক বক্তাকে চুপি চুপি কি বলিলেন। ছেলেটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কবিতা পড়বার অনুমতি আছে শুধু—মুখে আর কিছু বলব না। শুধু একটি অনুরোধ আপনাদের জানাচ্ছি—আমার কবিতায় দুর্ব্বোধ্য যদি কিছু থাকে, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

সত্যিই দুর্ব্বোধ্য সে কবিতায় কিছু ছিল না। শহরের সৌন্দর্য্যে যে রাহু-দৃষ্টি লাগিয়াছে তাহারই মর্ম বর্ণনা। মোংরা ভিখারীর দল (ওদের ভিখারী ছাড়া আর কি-ই বা বলা

যায় ?) শহরকে ব্যঙ্গ করিতেছে। শাসনমহিমা খর্ব্ব করিবার জন্য ওদের এই ষড়যন্ত্র। ওরা জানে না—ক্ষুধায় 'ফেন দাও' 'ভাত দাও' বলিয়া চেঁচাইলে সুখী মানুষকে বিরক্ত করাই হয় শুধু। সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে কত জোরে চেঁচাইতে পারে ওরা ? আকাশের বিস্তারে সে স্বর দেশ-দেশান্তরে ভাসিয়া যায় না—বাতাস বদ্ধ গলির সৌধশ্রেণীতে প্রতিহত হইয়া তেমনই নিঃশব্দে মরিয়া যায়। ছবিতে কাঙালপনা ফুটাইয়া মানুষকে সচেতন করা বৃথা। উদাসীন মেঘের মাথায় চাপিয়া বৃষ্টি মরুভূমি পার হইয়া যায়। কাগজে এই যে আর্ত্তনাদ—এতো সমবেদনাপ্রসূত নহে, নিজ জীবনের মমতায়—স্বাস্থ্যহানির শঙ্কায় এই—প্রতিকার প্রার্থনা। আবর্জ্জনা সরিয়া যাক— এই আমাদের প্রার্থনা।

করতালি ধ্বনির মধ্যে ছোকরা আসন গ্রহণ করিল।

সমীর বলিল, আমি হলফ করে বলতে পারি—ছোকরা —কোন দিন কোন ভিখারীকে একটা পয়সা দেয় নি।

তুমি তো সবই জান।

সুমিত্রার প্রশ্নে সমীর হাসিয়া বলিল, অরুণ সেনকে জানি বই কি। রজত সেনের দুখানা মোটরের একখানা মাত্র পেট্রোলের অভাবে পথে বেরয় না। সেখানা রজত বাবুই হিসাব করে ব্যবহার করেন—ওকে হেঁটেই আসতে হ'য়েছে।

তাতে কি ?

ক্ষোভটা স্বাভাবিক। ওর শ্লেষটা শাণিত—কিন্তু মর্ম্মভেদী নয়।

কার মর্ম্মভেদী নয় ?

যাঁরা এইমাত্র শুনলেন ভিখারীর কান্নার চেয়ে—ওর—লেখাটাই জমেছে বেশী।

লেখারও দরকার আছে।

চুপ—চুপ।

প্রণব দাসের গল্প সুরু হইয়াছে। বিষয়বস্তু অভিন্ন। পল্লীর জন্য আক্ষেপ—মহামন্বন্তরে—বাংলা কোন্ রসাতলে নামিতেছে—তাহারই মর্ম্মন্তুদ ছবি। খানিকটা পল্লীর স্বর্ণযুগ লইয়া আক্ষেপ আছে—খানিকটা চাষা এবং মজুরদের লইয়া মহামন্বন্তরের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বলন্ত চিত্র। শহরের পথে যে আবর্জ্জনা স্তূপ জমা হইয়াছে—তাহাদের আশা-বেদনায় ভরা পূর্ব্ব ইতিহাস।

প্রণব দাস বসিলে—আশা সোম উঠিয়া বলিল, সভাপতির অনুমতি নিয়ে একটা কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

সভাপতির কানে সম্পাদক কি বলিলেন। হাস্যমুখে সভাপতি অনুমোদন করিলেন।

আশা সোম কহিল, মানে—প্রণববাবুর গল্পের সমালোচনা আমি করছি না, শুধু জিজ্ঞাসা করছি—এই মাত্র যে চিত্র উনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তা কোন্ গ্রামের ?

ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, সারা বাংলা জুড়ে যে মন্বন্তর চলেছে—তাতে বিশেষ কোন একটি গ্রামের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আশা সোম বলিল, আমি লেখককে জিজ্ঞাসা করছি। কেননা সম্প্রতি গ্রাম সম্বন্ধে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা জন্মেছে। তাতে করে কোন সম্পন্ন চাষা সর্ব্বস্ব খুইয়ে শহরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে এমন কথা শুনি নি। বরং শুনেছি—মন্বন্তর চাষাকে কিছু পাইয়ে দিয়েছে।

বলেন কি! আর একটি তরুণ প্রশ্ন করিল।

দুর্দ্দশা যা হয়েছে তা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। যারা দিন-মজুরি করে খায়—যাদের সামান্য দু-এক বিঘে জমি আছে—বা যে দেশে—যেমন মেদিনীপুর—বন্যায় ধান নষ্ট হয়ে গেছে।

কে এক জন বলিল, মনে করুন না উনি—মেদিনীপুরের কোন গ্রামের কথা লিখেছেন।

প্রণব দাসের পানে চাহিয়া আশা সোম বলিল, তাই নাকি ?

প্রণব দাস বলিল, সত্য বলতে কি—গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম।…কুড়ি বছরে মাত্র একবার কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম লাষ্ট ইভাক্যুয়েশনে। তা সে-ও ঠিক পাড়াগাঁ নয়—জেলা শহর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—লেখকের কাছে নগ্ন বাস্তবের কোন দাম আছে কি ? রাজধানীর রাস্তায় যাদের নিত্য দেখছি—যাদের সঙ্গে দু' মিনিট আলাপ করে চির-জীবনের সমস্যা কোথায় বুঝতে পারছি—তাদের গাঁয়ে না গেলে তাদের কথা লিখতে পারা যায় না—এ বড় হাস্যকর কথা। লেখকের কারবার অনুভূতি নিয়ে। যিনি যত তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন তাঁর লেখা তত হৃদয়গ্রাহী।

আশা সোম বলিল, তাহলে বলতে চান—লেখকের অভিজ্ঞতাটা গৌণ জিনিস। ওটা না থাকলেই লেখা খোলে ?

একটা চাপা কৌতুক-হাস্য সভাগৃহকে ছুঁইয়া গেল।

আরক্ত মুখে প্রণব দাস বলিল, আমি তা বলিনি। অভিজ্ঞতা থাকলে ত ভালই—না থাকলেও লেখায় আটকায় না।

কবি-সাহিত্যিকরা সর্ব্বকালেই নিরঙ্কুশ।

হাস্যধ্বনি প্রবল হইবার মুখে সম্পাদক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আমার মনে হয়—সব লেখার শেষে আলোচনা হলে ভাল হয়।

কয়েকটি কবিতা এবং কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হইল। কবিতাগুলিতে সময়ের ছোঁয়া আছে—প্রবন্ধও মন্বন্তর ও যুদ্ধের সমস্যায় মানুষের নীতি আদর্শভ্রষ্টের প্রতি তীব্র সমালোচনা।

গীতা কখন আসিয়া অনুপমের পিছনে বসিয়াছে। আশা-প্রণবের বাদানুবাদ শেষ হইলে বলিল, প্রণববাবু ঠিক বলেছেন। দুঃখের ছবি আঁকতে হলে দুঃখ পেতেই হবে এর কোন যুক্তি নেই।

সুমিত্রা বলিল, না হলে দুঃখের কথাটা বলবে কি করে ?

তুমি জান না সুমিত্রাদি—যারা দুঃখ ভোগ করে তারা দুঃখের কথা বলতে পারে না। ভাবে অভিভূত হলে প্রকাশের স্বচ্ছতা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজে দুঃখ কতখানি পেয়েছিলেন—

সুমিত্রা বলিল, বাইরের খাওয়া-শোওয়া, আরাম-বিলাসের অভাবে যে দুঃখ জন্মায় তার জাত আলাদা। সে অত্যন্ত স্থূল। মনের গভীর স্তরে যে অভাববোধ জাগ্রত—দুঃখের আসল রূপ সেইখানে। সে দৃষ্টি—সে অনুভূতি সকলের থাকে না।

গীতা বলিল, আমি শুধু এইটুকু বুঝি—সৃষ্টির জন্ত চাই আলাদা ক্ষমতা। অনুভব করব-অথচ অভিভূত হব না এমন মন। যে দৃষ্টি ফটোগ্রাফির নয়—অয়েল পেন্টিঙের।

জলে না ডুবে সাঁতার শেখা আর কি! সুমিত্রা হাসিয়া উঠিল।

গীতা আরক্ত মুখে প্রত্যুত্তর দিতে চাহিতেছিল—সভাপতি হাত নাড়িয়া সকলকে নিঃশব্দ হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

অনুপম গীতার পানে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিল। অর্থাৎ তোমার প্রত্যুত্তরটি আমি সমর্থন করি।

সে হাসি সুমিত্রার দৃষ্টি এড়াইল না।

সম্পাদক কহিলেন, গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় আজকের প্রোগ্রামটা ভারি হয়ে পড়েছে, আর দুটো স্পেশ্যাল মিটিং না হলে সবগুলি পড়ার অসুবিধা। আমি প্রস্তাব করি—আগামী সপ্তাহে—

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কে একজন বলিল, আমরা জাতীয় সাহিত্য-সমিতির নামী লেখক—অপূর্ব্ব হালদারের লেখাটি শুনতে চাই।

কজি উল্টাইয়া সম্পাদক সভাপতির কানের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। পরে বলিলেন, সভাপতি বলছেন—যেগুলি পড়া হ'ল তার আলোচনা আছে—প্রধান অতিথি মহাশয়ের বক্তৃতা আছে। দশটার কম আপনারা রেহাই পাবেন না। তবু যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে—

ওঁর লেখাটি ছোট—মাত্র দশ মিনিট লাগবে।

বেশ। বলিয়া নীচু হইয়া সভাপতির কানে কানে কি বলিতেই তিনি ঘোষণা করিলেন। সভাপতির মুখভাব কেমন স্তিমিত বোধ হইতেছে। রঙীন চশমার মধ্যে চোখের দৃষ্টি বুঝা না গেলেও—মুখের হাসিটায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্য নাই।

অপূর্ব্ব হালদার ডায়াসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষয়া গোছের ছোটখাট লোকটি, সাদাসিধা পোষাক। পায়ের জুতা—গায়ের কামিজ—মাথার চুল—চোখের চশমা—বুকের ফাউন্টেন পেন কোনটাতেই প্রচার-লালসা নাই, অর্থাৎ তিনি সুপ্রচারিত। বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে। রসসাহিত্যিক তিনি, সম্প্রতি প্রবন্ধ বিভাগে ও নাট্য বিভাগে অগ্রসর হইয়া বাংলা সাহিত্যের আর দুটি দিককে সমৃদ্ধ করিবার ভার লইয়াছেন। কবিতাটা লইয়া মাথা ঘামান না। তাঁহার বিশ্বাস—রোমান্সের সঙ্গে কবিতা লেখার নিকট সম্বন্ধ। মনের আনন্দ অকারণ উচ্ছ্বাসে যখন কূল ছাপায় তখন কবিতার পত্রপুটে তাহাকে ধরিয়া রাখাই মানায়। কিন্তু আপন আনন্দে গান গাওয়ার মত—সে সুর সে ছন্দ কয়টি মনকেই বা স্পর্শ করিতে পারে। প্রেমে-পড়া সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে, এবং নিতান্ত গদ্যময় জীবনে ও বিলাস না থাকাই বাঞ্ছনীয়। মহাযুদ্ধের যুগে—মহামন্বন্তরের কোলে বসিয়া প্রেমের কবিতা পড়িবার দুষ্প্রবৃত্তি খুব ধনী লোকেরও নাই। ধনবৃদ্ধির মোহ কবিতার স্বপ্নছায়াতরা কুঞ্জ বিতানকে ঢাকিয়া দিয়াছে। খাদ্যাভাবের চিন্তা—সংস্কৃতি-চিন্তাকে আগাছা-বর্দ্ধিত উদ্যানের গোলাপ চারার মত পিষিয়া মারিতেছে। জনগণ-উদ্বোধনকারী লেখা মাত্র এ যুগে সচল। মূল খাদ্যের কথা, স্বাস্থ্যের কথা—চাল-চিনি-আটা-নুন-কয়লা-আলু-সমস্যাপীড়িত শহরে সাহিত্যটা সমস্যা মাত্র নাই। সাহিত্যের মাধ্যমে ওই সমস্যাগুলিকে যিনি যত তীক্ষ্ণ করিয়া ছড়াইতে পারেন—তাঁহার দাবিকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। অপূর্ব্ব হালদার এই লেখকদের সগোত্রীয়। জন-সাহিত্য নামে যে দলটি এতকাল ছায়ায় ঢাকা অবহেলিত কোণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল—এই দুঃসময়ের আলোয় সে কয়েকটি শাখা বিস্তার করিয়াছে। তার সে শাখাগুলি দিন দিন সতেজ হইতেছে। অপূর্ব্ব হালদার প্রমুখ কয়েকজন রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রতিভা এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করায় এটি মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে এঁদের হাতেই সাহিত্য শ্রীলাভ করিবে—এই আশা পোষণ স্বাভাবিক।

সমীর বলিল, অপূর্ব্ব হালদারকে কে না জানে! লিখে—কলকাতায় দুখানা বাড়ি করেছেন—বালিগঞ্জে একটা প্লট দেখা চলছে।

আমাদের লেখকেরা না খেতে পেয়ে মারা যান—এ ইচ্ছা বোধ হয় আমরা করি না।

সুমিত্রার শ্লেষাত্মক প্রশ্নে সমীর কহিল, হাঁ—মাইকেল আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন—গোবিন্দ দাসও তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তার পর আরও অনেক সাহিত্যিকের ভাগ্যে তাই ঘটতো—যদি না সিনেমা থাকতো—জমিদারি—ইন্সিওরেন্স—চাকরি—বা নিদেন পক্ষে পাবলিশিং বিজ্‌নেস থাকতো।

নিছক সাহিত্য নিয়ে বাঁচতে পারে তেমন যুগ বুঝি আসবে না? তাহলে আমাদের সাহিত্যের মূল্য কি?

মূল্য মূল্য বলে গলা ফাটাই আমরা—মূল্য দিই কখনও?

চুপ—চুপ।

অপূর্ব্ব হালদারের লেখাটি জমিয়াছে। ভাষার উপর দখল আছে—প্রকাশভঙ্গীও মনোহরণ করে। পাঠ শেষে সভাগৃহ নিস্তব্ধ হইল।

খন্ত—খন্ত।

খন্ত-লেখক হাসি মুখে আসন গ্রহণ করিলেন।

ওঁর কিন্তু লেখায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা।

হাঁ—। কিন্তু প্রাণ কম।

প্রাণ!—

সে দিন পথ দিয়ে আসছিলাম—ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রামের ধারে একটা ভিখারী ওঁর কাছে হাত পাতলো—উনি এমন মুখভঙ্গী করলেন—

সে হ'ল ব্যক্তিগত ব্যাপার—লেখার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি।

লেখা পড়ে যে ব্যক্তিকে আমরা মনে মনে তৈরি করে নিই—তা প্রায়ই মিথ্যে হয়ে যায় কিনা!

যাক—আমাদের কাছে সাহিত্যের বস্তুই আসল।

কিন্তু শুধু লিখে কলকাতায় দুখানা বাড়ি করা—

আরে—শুধু লিখে—কিউ লাইন বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। চক্রবৃদ্ধি হারে ওঁর আয়—

অ্যা—! অথচ গদ-সাহিত্য নিয়ে—

চুপ—চুপ—

একটু থামিয়াই আলোচনা আরম্ভ হইল। পাশে রোগা মত একজন আধাবয়সী লোক বসিয়াছিলেন। বেশবাসে তাঁহাকে দুঃস্থ বলিয়া মনে হয়। সমীরের পানে ফিরিয়া তিনি ক'হলেন—আপনি ঠিক বলেছেন। যারা ওর ভেতরের খবর জানে না—তারা ওকে নিয়ে গলাবাজী করে আর হাততালি দেয়। আসলে উনি হার্টলেস ক্রীচার।

আপনি জানেন? প্রতিবাদের ভঙ্গিতে একজন প্রশ্ন করিল।

ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, জানি না আবার! তবে আমরা অধমর্ণ—আপনি বলতে পারেন—আমার প্রচার বিদ্বেষমূলক।

টাকা ধার দেওয়াটা দোষের—না নেওয়াটা? প্রশ্নকারীর কণ্ঠে বিদ্রূপের সঙ্কেত।

যাদ বাল দুইই—আপনি রাগ করবেন। কিন্তু সে কথা তো আসল নয়। আসল হচ্ছে—লেখার সিনসিয়ারিটির কথা। আমরা যা নই—লেখার মধ্যে তাই হতে চাই। গণ-সাহিত্যিক হতে হলে গণ মনোভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন নয় কি?

প্রতিপ্রশ্নে প্রতিবাদকারী অল্পক্ষণ নির্বাক থাকিয়া কহিল, অবশ্য প্রয়োজন।

গণ-আনিষ্টজনক কাজ করা—বা চিন্তা করা তাঁর স্বভাব-ধর্ম্মের বিপরীত। অথচ আমাদের দেশে—আচরণের সঙ্গে চিন্তায়—চিন্তার সঙ্গে কার্য্যের সম্পর্ক নাই বললেই হয়। বাইরের স্বাধীনতা হারিয়েছি এবং মনও আমাদের সুস্থ নয়। জনগণের জিনিস ভুলে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছি বেশ।

আপ'ন পারেন নি বলে—

হাঁ—হিংসে কিছু হয়ই তো। অস্বীকার করব না। আপনাদের তথাকথিত সাম্যবাদও হিংসার খোলস ছাড়তে পারে নি।

তাহলে রাশিয়ায়—

তুলনা দেবেন না মশায়—সব মাটি সমান নয়।

মাটি সমান না-ই হোক—মটোর দোষটা কি?

দোষ? বক্তা খানিক থামিয়া যেন বল সঞ্চয় করিলেন। দোষ অনেক। দুর্ব্বল হিংসার বিষ—আর সবল হিংসার আগুনে যা তফাৎ। ওরা স্বাধীন—ওদের মনের তেজ আর আমাদের মনের তাপ—এক নয়।

তাই পরস্পরের প্রতি সেই দ্বেষ ছড়িয়ে আমরা আনন্দ পাই। পরনিন্দার মত এমন অকৃত্রিম আনন্দ—

চুপ—চুপ—

প্রধান অতিথির বক্তৃতা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বাদপ্রতিবাদ সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। দুঃস্থ ভদ্রলোকের কয়েকজন সমর্থক জুটিয়া গেলেন—তাহারাও বিতর্কে যোগদান করিয়া সতেজে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। আলোচনা নহে—কিছুটা যুক্তি, বেশির ভাগ জিদ। ভালকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাল এবং মন্দকে পরিপূর্ণ মন্দ প্রমাণ করিতে জিদটা যুক্তির চেয়ে বেশী কার্য্যকরী। সাহিত্য রহিল ডায়াসের উপর—জীবন নামিয়া আসিল সুধীবৃন্দের নিম্নভূমিতে। কোলাহলটা সুতরাং প্রবল হইল।

সমীর বলিল, আর কেন—এই জমজমাটের মধ্যে বসে থাকা অসম্ভব।

সু'মত্রা বিরক্ত হইয়া কহিল, এদের ডিসেন্সি জ্ঞান নেই।

অনুপম উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি সভাভঙ্গের ঘোষণাবাণী প্রচার করিলেন।

অনুপম গীতাকে খুঁজিতেছিল। আশ্চর্য্য—সে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। পাশে সুমিত্রাও নাই। নির্গমন পথে ভদ্র ভাবের ঠেলাঠে'লি সুরু হইয়াছে। ঘরের মধ্যেও ছোটখাটো বৃত্ত। চারিদিকে তর্ক ও আলোচনার ঢেউ।

সমীর বলিল, ঢেউ গুনে লাভ নেই, বাইরে চল।

অনুপম বলিল, লেখার সিনসিয়ারিটি থাকা দরকার।

সমীর মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছুমাত্র না। উত্তমর্ণ না হতে পারলে সে কথা কে করবে স্বীকার! পুঁজির দোষ যতই দিই না—পুঁজিতেই সব।

পুঁজিবাদ—

পৃথিবীর প্রাণ। সমীর উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। পুঁজি-বাদের বিরুদ্ধে লিখে দ্বারস্থ হব পুঁজিপতির, প্রকাশকের, প্রেস-মালিকের, সম্পাদকের—

সম্পাদকের!

নয়ই বা কেন! কাগজ পরিচালনা করেন যিনি—তাঁরও মতটা মানতে হয়। কাগজ বার হয় যাঁর মূলধনে—তিনি সম্পাদক নন, সম্পাদকের পরিচালক।

থাক থাক। তোমার মতে লেখাটি হবে আমাদের জীবনের মত।

ঠিক বলেছ—ভেতরে আর বাইরে থাকবে পুরোপুরি অমিল।

কথাটা হয়ত রহস্যের মত শুনাইল। কিন্তু অনুপমের শ্রুতি স্পর্শ করিল না। সে চাহিয়াছিল ডায়াসের নিম্নে বামদিকের কোণে। গীতার সোনালী পাড়ের শাড়ীটা ভিড়ের মধ্যে চিনিয়া লওয়া যায় এবং যে তরুণ কবিটি কবিতা পাঠের পূর্ব্বে খানিকটা গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিয়াছিলেন—তাঁহার আদ্দির পাতলা পাঞ্জাবীটা হাওয়ায় উড়িয়া শাড়ীর পাড়ে সংলগ্ন হইয়াছে। মুখোমুখি না হউক—উহার পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে। অনুপমের বুকের ভিতরটা চিন্ চিন্ করিয়া উঠিল। অদম্য কৌতূহলের বেগ দমন করিতে না পারিয়া সে সুমিত্রাদের পাশ হইতে ইচ্ছা করিয়াই যেন ভিড়ের চাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কাল পাঁচটায় থাকবেন তো?

নিশ্চয়। কিন্তু কবিতার খাতাখানি নিয়ে যাবেন—সবটা না শুনে ছাড়ব না।

সে তো আমার সৌভাগ্য। তবে বেশি তো লিখি নি—একটা খাতা—তাও সবটা ভরে নি।

বেশি মিষ্টিও মুখ মেরে দেয়। একটা লেখাই একজনের প্রতিভা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ করে দেয়।

অনুপম ভিড়ের চাপেই ফিরিয়া গেল। হাতের শক্ত মুঠার কি যেন সে চাপিয়া ছিল। ভিড়ের বাহিরে আসিয়া মুঠা খুলিল। মুঠার মধ্যে বস্তু কিছু নাই—ঘামে হাতের তালুটা ভিজিয়াছে শুধু।

গীতার কি দোষ। সাহিত্যরসপিপাসু মনখানি তার অত্যন্ত কোমল হয়ত। হয়ত সে ভাবে-ভরা বাষ্প। উপরে উপরে উঠিয়াও মেঘ-সংঘাতে তরল হওয়াই তার ধর্ম্ম।

এ যুগের কবি—এ যুগের গল্প-লেখকদের আমরা এই যুগের গাথাকার রূপে দেখতে চাই। যে অতীত কান্নাহীন—যে ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট তার জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই—কি বলেন আপনি ?

প্রশ্নটা ভিড়ের মধ্য হইতে কে কাহাকে করিল—বুঝা গেল না—অনুপমের বুকে তার ধ্বনিটা আসিয়া বাজিল। সে মানিয়া লইল—এই যুগের এইটিই সার্ব্বজনীন প্রশ্ন। তাহাকেও উত্তর দিতে হইবে। গীতাদের মনোরহস্য অন্ত যুগের কবি-স্রষ্টারা মানিবেন কি করিয়া।

বাহিরের ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথার দপ্‌দপানি কমিয়া গেল।

আচ্ছা সমীর—তুমিও তো লিখতে পার।

পারি না।

কেন—তোমার কথায় বোধ হয়—এ যুগের গলদ কোথায় তা তুমি জান।

তারপর ?

এ যুগ কি চায়—

সত্যি বুঝি না ভাই। নদীর স্রোতে শ্যাওলা ভাসে—ভাসাটাই তার সুখ। সে তার লঘুত্ব বুঝলেও স্রোত আটকে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই।

যে দোষ বোঝে সে দোষ কাটাতে পারে না ?

না—ঐটাই তার মস্ত দোষ। সমালোচনা আগুন নয়—আগুন জ্বালাবার সামান্ত উপকরণ মাত্র।

আগুন কি ?

সৃষ্টি। যে জিনিষ বিধাতা সবাইকে দেন না।

অনুপম বলিল, সৃষ্টিরও সাধনা দরকার। সে সময় আমরা দিতে পারছি কই।

যা দিয়েছ তাই হয়েছে সৃষ্টি। হয়ত বৃহৎ কিছু নয়—অটুট কিছু নয় তবু তা সৃষ্টি।

তাতে লাভ ?

আনন্দ।

আনন্দ !

বলতে সঙ্কোচ বোধ হয়—বিলাস বলতে পার।

তুমি ঠাট্টা করছ।

মোটেই না। বিলাস খারাপ জিনিস নয়—যেমন খাওয়াটা নয়—সিনেমা দেখাটা নয়—গাড়ি চড়া নয়—বই পড়া নয়। ওদের সঙ্গেও তো জীবনের যোগ রয়েছে। হাল্কা জীবন হয়ত। তবু তা এই যুগেরই জীবন। সমীর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

ট্রাম ষ্টপেজ পর্য্যন্ত অনুপম আর কোন কথা কহিল না। ট্রামে উঠিয়া সে হাত তুলিয়া সমীরকে বিদায় জানাইল শুধু।

আলোর একটা রেখা অন্ধকার চিরিয়া ছুটিয়াছে। যেটুকু চলিতেছে—সেইটুকুই আলো; বাকিটা অজানার অন্ধকার আলোকে উদরস্থ করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। রাত দশটার মধ্যে ব্ল্যাক আউটের শহর নিঃঝুম মারিয়া আসিয়াছে। আগে শহরে রাত্র হইত না—সে শহরের স্মৃতিও আজ কল্পনাতীত। আবার শহর কবে পূর্ণাঙ্গ শহর হইবে—সেই পূর্ণতার রূপ ধ্যানে আনাও দুষ্কর।

সকাল হইতে এত রাত্রি পর্য্যন্ত যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে তাহাও রোমন্থন করিতে আলস্য বোধ হয়। একটি ছুটির দিন হইতে আর একটি ছুটির দিনের তফাৎ কম। সুমিত্রা, গীতা, রেখা বসু, মঞ্জুলা—এরাও ক্ষণ-দীপ্তিময় ফানুসের বাতি। তার দিনানুদিন ঘটনাগুলিও। আপিসে বসিয়া বাড়িকে ভুলা সহজ—সিনেমায় বসিয়া আপিসের কথা মনে আসে না। নাচে, সাহিত্য-সভায়, গানে, রেঁস্তোরায় এই বিস্মৃতির প্রতিযোগিতা। সুমিত্রা, গীতা, রেখা বসু…

বাবু টিকিট—

ভাগ্যে পকেটে কয়েকটি আনি ও ডবল পয়সা ছিল। যে মেয়েটি সকালে চুলের কাঁটা কি ফিতা কিনিতে দিয়াছিল—অখ্যাত গলির সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর ভিখারীগুলার সঙ্গে তাহাকেও চকিতে মনে পড়িয়া গেল।

কিন্তু ছোট একটু আলো বিরাট্ অন্ধকারের বুক চিরিয়া তীব্র বেগে ছুটিয়াছে—তাহাকে মুহূর্ত্তের কোন বিন্দুতে বন্দী করা কঠিন।

বাঃ, লেখার প্লট মাথায় আসিতেছে। এই সব লইয়া বেশ লেখা যায়।

হাঁ গীতাদের সুখী করিতে এই ক্ষণবিস্মৃতিময় ঘটনাগুলিতে দুর্ব্বল অনুভূতির প্রলেপ লাগাইয়া সে গল্প লিখিবে। এ যুগের চিন্তাকে অকপথে মুক্তি দেওয়া কঠিন।

অনুপম নিঃশব্দে হাসিয়া উঠিল।

শেষ

বেদের আর্য কাহারা ?

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এক আদিম শ্বেতকায়, উজ্জ্বলকেশ, নীল চক্ষু আর্য জাতির পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পৌরাণিক বা mythical আর্য জাতির বাস ছিল ইউরেশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে অথবা রুশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ককেশাস, ভলগা এবং নীপার নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে। নীপার নদীর গতি অনুসরণ করিয়া আর্যজাতির কয়েকটি দল বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমে পোলাণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। অপর কয়েকটি দল ভলগাতীরের ও ককেশাস অঞ্চলের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব বা পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই দলের কতকগুলি গোষ্ঠি ক্রমে ইরাণ হইতে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করে

অনুমান খ্রীঃপূঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের মধ্যে। প্রাক্‌-বৈদিক আর্য জাতির অনুমানমূলক ইতিহাসের সারমর্ম এইরূপ।

এই প্রাক্‌-বৈদিক বা পরবর্তী বৈদিক আর্যজাতি সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের গবেষণার কোনরূপ আলোচনা এখানে করা হইবে না, শুধু ঋগ্বেদে আর্য পদের কিরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় সংক্ষেপে তাহার অনুসন্ধান করা এবং এই অনুসন্ধানের ফলে কি প্রকার সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব তাহার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঋগ্বেদে আর্য পদের যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহা কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ঋগ্বেদে আর্য ও অর্য এই দুইটি পদের প্রয়োগ দেখা যায়, অনার্য পদের প্রয়োগ দেখা যায় না।

প্রথমে আর্য পদের সায়ন কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দেখা আবশ্যক। সায়নের মতে আর্য অর্থ বিদ্বাংস স্তোতার, কর্মসংযুক্তানি, কর্মানুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি ইত্যাদি। কর্ম এখানে বৈদিক ক্রিয়া কর্ম অর্থাৎ স্তোত্র পাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি বুঝাইতেছে। দস্যুগণ স্তোত্রহীন ও যজ্ঞহীন, এজন্য তাহাদিগকে অকর্মা বলা হইয়াছে। অর্য পদের অর্থ সায়নের মতে স্বামীরূপ। অর্য ইন্দ্র অর্থাৎ স্বামীরূপ ইন্দ্র। "ঋ" ধাতুর অর্থ চাষ করা, সুতরাং আর্য অর্থ কৃষক এবং আর্যগণ আপনাদিগকে কৃষক বলিয়া পরিচয় দিতেন, এ ব্যাখ্যা ভাষাবিজ্ঞানীর। সায়নের ব্যাখ্যামতে আর্য ও অর্য দুইটি পদই নির্দিষ্ট গুণবাচক পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, স্তোত্র ও কর্মসংযুক্ত ব্যক্তিই আর্য। কিন্তু দেখা যাইবে ঋগ্বেদে আর্য পদের অনেকগুলি প্রয়োগ ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কোন ঋষি যখন আর্য শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন দেখা যায় তখন বুঝিতে হইবে যে আর্য পদের অর্থ আর গুণবাচক নাই, সম্ভবতঃ স্তোত্র রচনা ও পাঠ এবং যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান যাহাদের কর্তব্য সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের নাম আর্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আর্য পদের অর্থ শুধু গুণবাচক বলিয়া গ্রহণ করিলে দেব-রহিত, ইন্দ্রহীন আর্য, এই বর্ণনার সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সুতরাং এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে গুণবাচক পদ জাতিবাচক হইয়া দাঁড়াইলে নির্দিষ্ট গুণহীন ব্যক্তিও আর্য নামে অভিহিত হইতেন। সে যাহা হউক, প্রাচীন বেদব্যাখ্যাতাদিগের মনে যে আর্য পদের কোন জাতিবাচক সংজ্ঞা বা racial sense ছিল না ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আর্য ও অর্য পদের প্রয়োগগুলির একটি শ্রেণী-বিভাগ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে দেব দেবী এবং ব্যক্তি-বিশেষ, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে এই দুই পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর্য পদ শত্রু সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রয়োগ আছে, পরে সেগুলির উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথম মণ্ডলে অনুমান ৬, দ্বিতীয় মণ্ডলে ৩, তৃতীয় মণ্ডলে ১, চতুর্থ মণ্ডলে ৪, পঞ্চম মণ্ডলে ১, ষষ্ঠ মণ্ডলে ৩, সপ্তম মণ্ডলে ১০, অষ্টম মণ্ডলে ৬ এবং দশম মণ্ডলে ৫ বার আর্য ও অর্য পদের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ছাড়া আরও দুই-চারিটি প্রয়োগ থাকা সম্ভব। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে বসিষ্ঠ কুল আর্য ও অর্য পদের প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়াছেন।

দেবদেবীগণের মধ্যে ইন্দ্রকে কয়েকবার অর্য বলা হইয়াছে। মিত্র বরুণ ও বিশ্বদেবকেও অর্য বলা হইয়াছে। উষাকে বলা হইয়াছে অর্যপত্নী। রাজন্যবর্গের মধ্যে ত্রসদস্যুকে অর্য, সৎপতি ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। এক স্থানে পবীরু নামক এক ব্যক্তিকে অর্য বলা হইয়াছে। অর্য পদের এই সকল প্রয়োগ হইতে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না এবং এই পদের প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে গুণবাচক দেখা যায়।

প্রথম মণ্ডলের একটি ঋকে কক্ষীবান ঋষি বলিতেছেন যে অশ্বিদ্বয় আর্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা যব বপন করিয়া, অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বজ্রের দ্বারা দস্যু বধ করিয়া তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঋকের "দস্র মনুষায়"-কে "আর্যায়"-এর বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিলে আর্যগণ যজ্ঞ-পরায়ণ এই ধারণা পাওয়া যাইতেছে। অন্য একটি ঋকে বলা হইয়াছে যে ত্রিজগৎবিক্রমী বিষ্ণু আর্যকে প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ দিয়াছেন। এখানে আর্য অর্থে সম্ভবতঃ ঋত বা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ঋত্বিক বুঝাইতেছে। যজমান ও আর্যের মধ্যে একটা পার্থক্য সূচিত হইতেছে। কিন্তু ঐ মণ্ডলের অন্য একটি ঋকে দেখা যাইতেছে যে দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ বলিতেছেন যে ইন্দ্রে যুদ্ধ আর্য যজমানকে (যজমানামার্যম) রক্ষা করেন। এখানে আর্য যজমানের বিশেষণ। যজমান বলিতে যদি ঋষিকুল হইতে পৃথক্ যজমান গোষ্ঠী বুঝায় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সেই গোষ্ঠীকেও আর্য বলা হইতেছে, ঋত্বিক ও যজমান এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হইতেছে না। এখানে সায়নের আর্য পদের ব্যাখ্যা খাটে। অঙ্গিরাকুলের সব্য ও কুৎস ঋষি দুইটি ঋকে আর্য পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। একটিতে আর্য ও দস্যু এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা করা ও অন্যটিতে এই দুই দলের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহা প্রকাশ করা হইতেছে। সব্য বলিতেছেন, কাহারা আর্য এবং কাহারা দস্যু অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর (জানীহ্যার্যান্ চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শসদব্রতান্)। এখানে কুশযুক্ত যজ্ঞ যাহারা করে তাহাদিগকে আর্য বলা হইতেছে। বজ্রধারী ইন্দ্র কর্তৃক দস্যুদিগের নগর ধ্বংস করিবার কথা উল্লেখ করিয়া কুৎস ঋষি বলিতেছেন, (আমাদের স্তুতি) অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর, আর্যগণের বল ও যশ বর্দ্ধন কর। মূলে ঋকের প্রথম পাদে দাসদিগের নগর ধ্বংসের কথা বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পাদে দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলা হইয়াছে। এই উভয় কার্য্যের ফলে আর্যদিগের বল ও যশ বর্দ্ধিত হইবে। দাস ও দস্যু উভয়কে আর্যদিগের শত্রু বলা হইতেছে। কিন্তু সন্দেহ উপস্থিত হয় যে দাস ও দস্যু অভিন্ন, তাহারা পৃথক্ জাতীয় শত্রু নহে। এইরূপ সন্দেহ আরও অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। যাহা হউক, আর্য এবং দাস ও দস্যু ইহারা দুইটি বৈরীভাবযুক্ত পক্ষ ইহা জানা যাইতেছে। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি বলিতেছেন যে দেবগণ আর্যের জন্য অগ্নিকে জ্যোতিরূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন (জ্যোতিরিদার্যায়)। আর্যগণ প্রথম হইতে

অগ্নির উপাসক এই তথ্য এখানে পাওয়া যাইতেছে। উপরের কয়েকটি ঋক হইতে দেখা যাইতেছে যে আর্য পদ দাস ও দস্যুর প্রতি শত্রুতাযুক্ত, দেবগণের প্রিয়, অগ্নির উপাসক ও যজ্ঞপরায়ণ একটি সম্প্রদায় বা জাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মণ্ডলের একটি ঋকে বলা হইয়াছে "যে ধন অর্য পূজা করে"। অর্য পদের "স্বামীরূপ" ব্যাখ্যা এখানে খাটিতেছে না। গৃৎসমদ একটি ঋকে আর্য ও দস্যুর উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ইন্দ্র আর্যের জন্য জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরের ঋকে আর্য পদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে হইবে। "হে ইন্দ্র, যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া সকল গর্বকারী মনুষ্যকে অতিক্রম করে এবং আর্যভাব দ্বারা (আর্যেণ) দস্যুদিগকে অতিক্রম করে আমরা তাহাদিগকে ভজনা করি।" এখানে "আর্যেণ" কথাটিকে আর্যভাব দ্বারা, by Aryan ways of life, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে দস্যুদিগের সঙ্গে তুলনায় একটা উচ্চতর কৃষ্টি ও সেই কৃষ্টিযুক্ত সম্প্রদায় বুঝাইতেছে। একটি ঋকে ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র গো, অশ্ব, সুবর্ণ প্রভৃতি দিয়াছেন এবং দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন। (হত্বী দস্যূন্ প্র আর্যবর্ণমাবৎ)। সায়নের মতে আর্যবর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ জাতি। আর্য পদ এখানে সম্প্রদায় বা জাতি বুঝাইতেছে। ঋগ্বেদে যাঁহারা দস্যু এবং দাস নহে তাঁহাদিগকে আর্যবর্ণের বলিয়া মনে করিতে বাধা নাই যদিও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। এই আর্যবর্ণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন ভরত গোষ্ঠীজাত বিশ্বামিত্র ঋষি। কৌশিক কুল ঋগ্বেদীয় প্রাচীন ঋষিকুলগুলির মধ্যে পড়ে না। বর্ণ কথাটির এইরূপ ব্যবহার আর একটি ঋকে পাওয়া যায়। "হে মনুষ্যগণ! যিনি এই সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট এবং গূঢ় স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি শত্রুকে জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছেন তিনিই ইন্দ্র।" এখানে দাসবর্ণকে আর্যদিগের নিকৃষ্ট, নিগৃহীত ও লুণ্ঠিত শত্রুরূপে দেখা যাইতেছে। যদি দাসবর্ণ বলিতে দাসজাতি বুঝায়, (ঋগ্বেদে কয়েকজন দাস রাজা ও দাস শত্রুর উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু দাসজাতি বলিতে কাহাদের বুঝায় তাহার নির্দেশ নাই), তাহা হইলে আর্যবর্ণ বলিতে অবশ্য আর্যজাতি বুঝিতে হইবে; কিন্তু ঋগ্বেদে উল্লিখিত সকল ঋষিকুল ও যজমান গোষ্ঠী আর্য কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে।

ইহার পরে চতুর্থ মণ্ডলের একটি ঋকে অর্য পদের অর্থ হব্যযুক্ত মনুষ্য করা হইয়াছে। একটি ঋকে অর্য শত্রুর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, "যখন (শত্রুগণের) হিংসক অর্য শত্রুকে জানিতে পারেন।" এখানে অর্য পদের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে শত্রু বা বিদ্বেষ্টা সম্পর্কে। অন্য একটি ঋকে আর্য পদের প্রয়োগ হইয়াছে দুইজন ব্যক্তির সম্পর্কে। সরযূ নদীর পারে ইন্দ্র আর্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলেন। সায়নের মতে অর্ণ ও চিত্ররথ দুইজন রাজার নাম। কিন্তু দুইজন রাজার নামে পূর্বে আর্য পদের প্রয়োগ হইতে কি বুঝিতে হইবে? ইঁহারা দুইজন সরযূ নদীর তীর অঞ্চলে আর্য রাজা ছিলেন অথবা আর্য হইয়াও ইঁহারা ইন্দ্রবিদ্বেষী বা বামদেবের শত্রু ছিলেন? কিন্তু অর্ণ ও চিত্ররথকে আর্য বলা হইলেও তাঁহাদিগকে রাজা বলা হয় নাই। সায়নের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও এই দুই ব্যক্তির উল্লেখকে রাজন্য গোষ্ঠীগুলিও আর্য বা তাহাদের মধ্যে আর্য ছিল তাহার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এখানে এই নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে যে দুইজন আর্যকে ইন্দ্রের বা বামদেবের শত্রুরূপে দেখা যাইতেছে। একটি ঋকে বামদেব ইন্দ্রকে দিয়া বলাইতেছেন, "আমি আর্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি। আমি হব্যদাতা মনুষ্যকে বৃষ্টি দান করিয়াছি," (অহং ভূমি মদদামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়)। এখানে "আর্যায়"কে "দাশুষে মর্ত্যায়"র সঙ্গে যুক্ত করা যাইতে পারে। আর্যের এই সংজ্ঞা পূর্বেও পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম মণ্ডলের একটি ঋকে ইন্দ্র সম্পর্কে আর্যপদের প্রয়োগ দেখা যায়। এই ঋকের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট। ইন্দ্র আর্য এই ব্যাখ্যার ফলে নূতন কোন কথা পাওয়া যাইতেছে না। মূলে সুবন্ত পদের প্রয়োগ হইতে দাস ও আর্যের মধ্যে পার্থক্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

দাস ও আর্যের মধ্যে শত্রুতার ভাব ষষ্ঠ মণ্ডলের একটি ঋকে বিশদভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। "হে ইন্দ্র, আমরা শত্রুকে আক্রমণোদ্যত হইলে তুমি আমাদিগের এই সমস্ত স্তুতি দ্বারা আমাদিগের সৈন্য সকলকে রক্ষা করিয়া সংগ্রামে শত্রুসেনা বিধ্বস্ত কর। এই সমস্ত স্তুতি দ্বারা তুমি আর্যের জন্য সর্বত্র বিদ্যমান দাসদিগকে বিনষ্ট কর।" মূলে "দাসী:" শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ দাসকুল। সর্বত্র বিরাজমান দাসদিগকে বিনষ্ট করিবার প্রার্থনা করা হইতেছে আর্যদিগের স্বার্থে। এই আর্য কাহারা? যাঁহারা স্তুতির শক্তিতে বিশ্বাসী, স্তুতির বলে ইন্দ্রের দ্বারা অমিত্র সৈন্য ধ্বংস করিতে অভিলাষী। ঋগ্বেদে দেখা যায় স্তুতির এই প্রকার শক্তিতে যাঁহারা আস্থা প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা স্বয়ং স্তোত্রকার। "হে ইন্দ্র, স্তোতৃবর্গ স্তোত্র দ্বারা সূর্যের ন্যায় তোমাতে বল অর্পণ করিয়াছেন।" "ইন্দ্রের দেহ আমাদিগের স্তোত্র ও প্রার্থনা দ্বারা ভূয়মান হইয়া যেন নিয়ত বৃদ্ধি পায়।" ঋত্বিকগণ স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্রের বন্ধুত্ব লাভ করেন, স্তোত্র ইন্দ্রের অস্ত্রসমূহে শক্তি সঞ্চার করে। মধুচ্ছন্দা ঋষি বলিতেছেন, "হে শতক্রতু, স্তোমসমূহ তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছে, উক্থসমূহ তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছে, আমাদিগের স্তুতি তোমাকে বর্দ্ধন করুক।" সুতরাং উপরের ঋকের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল আর্যের জন্য তাঁহাদের স্তুতির বলে ইন্দ্র দাসদিগকে বিনষ্ট করেন তাঁহারা স্তোত্ররচয়িতা ও যজ্ঞকারী ঋষিকুল। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের অন্য একটি ঋকে বলা হইতেছে যে ইন্দ্র দস্যু ও আর্য-উভয়বিধ শত্রুই সংহার করিয়াছেন। এখানে অমিত্র দাস ও বৃত্র আর্যকে একই পংক্তিতে ফেলা হইয়াছে। বৃত্র শব্দের অর্থ এখানে hostile, এই অর্থে বৃত্র, বৃত্রাণি শব্দের প্রয়োগ অনেক আছে।

কিন্তু এই আর্য শত্রু কে? সম্ভবতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষিবংশীয়দিগকে আর্য শত্রু বলা হইতেছে। একটি ঋকে আত্মীয় ও অপরিচিত প্রতিকূলচারীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে। আর একটি ঋকে ইন্দ্রকে অনুরোধ করা হইতেছে যে সোমপানে হৃষ্ট হইয়া "আমাদের

আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকূলাচারী শত্রুকে বিনাশ কর।" অন্য একটি ঋকে দেব ও অদেব শত্রুর একসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এই আর্য শত্রু, আত্মীয় প্রতিকূলাচারী ও দেবশত্রু সম্ভবতঃ একই শ্রেণীর লোক, অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষিকুল বা ঋষি। মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষিকুল বা ঋষি বলিতে এখানে ভরদ্বাজ বংশীয়দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র বুঝাইতেছে। সূক্তকার ঋষিগণ সর্বত্র উত্তম পুরুষের ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সেই হেতু কোন বিশেষ ঋষিকুলের সূক্তকার যে সমগ্র ঋষিকুলের পক্ষে বা তাঁহাদের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলিতেছেন, এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায় না। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। এই ভরদ্বাজ বংশীয়দিগের রচিত ৬ষ্ঠ মণ্ডলেই প্রতিপক্ষ ঋষি অতিথাজকে চূড়ান্ত গালিগালাজ করা হইয়াছে। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকুলের মধ্যে শত্রুতা প্রসিদ্ধ। ঋষিকুলগুলির পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ ঈর্ষা বা professional jealousy এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। আর্যশত্রুদিগের উপরের তালিকায় যে সকল ঋষি দস্যুদিগের পৌরোহিত্য করিতেন তাঁহাদের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দস্যুগণ যে আপনাদিগের ধর্মকার্যে ঋষিদিগকে নিযুক্ত করিতেন ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ আছে। অন্য একটি ঋকে ভরদ্বাজ বলিতেছেন সৎপতি ইন্দ্র আর্য ও দাস বৃত্রদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তিনি সকল বিদ্বেষ্টাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। (হতো বৃত্রাণ্যার্যা হতো দাসানি সৎপতি হতোং বিশ্বাঅপদ্বিষঃ)।

এখানে আর্য শত্রু ও দাসকে অপদ্বিষের দলে দেখা যাইতেছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলে আর্য পদের প্রয়োগ হইতে দেখা যাইতেছে যে আর্য এবং দাস ও দস্যু দুইটি পরস্পরের বৈরী সম্প্রদায় নহে, বৈরীদলের মধ্যে আর্য আছে। মনে রাখিতে হইবে যে এই বৈরিতা মাত্র একটি ঋষিকুলের, অর্থাৎ স্তোত্রকারের কুলের সঙ্গে, সমগ্র ঋষিকুলের সঙ্গে নহে। আর্য পদের অর্থ এখানে সম্প্রদায় বা জাতিবাচক।

বসিষ্ঠ গোত্রীয়দিগের রচিত ৭ম মণ্ডলে ৫ বার দেবদেবী সম্পর্কে অর্য পদের প্রয়োগ দেখা যায়। একবার আর্যশত্রুর উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্র ও বরুণকে সুদাস রাজার দাস ও আর্যশত্রু বিনষ্ট করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। (দাসা চ বৃত্রা হতমার্যাণি চ সুদাসমিত্রাং ইত্যাদি)। এখানে একটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে। সুদাস রাজার শত্রুগণের মধ্যে দাস ও আর্য ছিল। সুদাস রাজার শত্রুগণের যে সকল উল্লেখ ৭ম মণ্ডলের প্রথম দিকে পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায় যে পুরু, ভরত, সৃঞ্জয়, চেদি প্রভৃতি অল্প কয়েকটি গোষ্ঠী ব্যতীত ঋগ্বেদের অধিকাংশ গোষ্ঠীগুলি সুদাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কে আর্য কে দাস বশিষ্ঠগণ তাহা পরিষ্কার বলিয়া দেন নাই, ব্যাখ্যাতাগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বা রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যমুনাতীরবর্তী অঞ্চলের যে সকল গোষ্ঠী ভেদের অধীনে সুদাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে অনার্য বলা হয়। সৃঞ্জয় বংশীয় কবির অধীনে পরুষ্ণি তীরবর্তী অঞ্চলের যে সকল গোষ্ঠী সুদাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকেও অনার্য বলা হয়। কিন্তু এই মতের পোষকতা করে ঋগ্বেদ হইতে এরূপ কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। অনার্যের কোনরূপ সংজ্ঞা ঋগ্বেদে নাই এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুদাসের শত্রুগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কে আর্য ও কে দাস তাহা নির্দেশ করা হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দাস ও আর্য শত্রু ছিল এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হইয়াছে। এখানে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে যাহাদিগকে এই ঋকে সুদাসের শত্রু বলা হইয়াছে তাহারা সুদাসের এবং তাঁহার পুরোহিতকুল বসিষ্ঠদিগেরও শত্রু ছিল। কিংবা গোষ্ঠীর সম্পর্কে অনু, দ্রুহ্যু, যদু, তুর্বশ প্রভৃতি গোষ্ঠীকে দাস বা আর্য কোনরূপ সংজ্ঞাই প্রত্যয়ের সঙ্গে দেওয়া চলে না। আর একটি অনুমান এই হইতে পারে যে সুদাসের আর্যশত্রু তাঁহার বা বসিষ্ঠদিগের প্রতিকূলাচারী কোন ঋষিকুল হইতে পারে। ৭ম মণ্ডলের প্রথমদিকে দেখা যায় যে ভৃগুকুল সুদাসের শত্রুগোষ্ঠীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং সুদাসের যে আর্য শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে তাঁহারা ভৃগুবংশীয় ও বসিষ্ঠদিগের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অন্যান্য ঋষিকুলের লোক হইতে পারেন।

অন্য একটি ঋকে আর্য ও দস্যুকে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে দেখা যায়। বসিষ্ঠ অগ্নিকে বলিতেছেন, তুমি আর্যের জন্য অধিক তেজ উৎপন্ন করিয়া দস্যুদিগকে স্থান হইতে বহির্গত করাইয়াছ (ত্বং দস্যূঁরোকসো অগ্ন আজ উরু জ্যোতির্জনয়ন্নার্যায়)। এই ঋকের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে অগ্নির উপাসক আর্যগণ দস্যুদিগকে তাহাদের প্রাচীন বাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বিদেশাগত শ্বেতকায় আর্যজাতির পুরাণ বিশ্বাস করিলে এই ব্যাখ্যা মতে দাঁড়ায় যে দস্যুগণ দেশের প্রাচীন অধিবাসী, আর্যগণ আগন্তুক। কিন্তু এই আর্য কাহারা? যজমান গোষ্ঠী অথবা ঋষিকুল? ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীগুলির বাহিরে এক শম্বর ও বিখ্যাত যোদ্ধা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা নাই। ঋগ্বেদের বেশীর ভাগ যুদ্ধ জল, উর্বরা ভূমি, উৎকৃষ্ট বাসস্থানের জন্য যুদ্ধ এবং এই সকল যুদ্ধ ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঘটিয়াছিল দেখা যায়। তাহা হইলে দস্যুগণের প্রতিপক্ষ যে আর্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা যে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত গোষ্ঠীসমূহ তাহা কিরূপে মনে করা যাইতে পারে? বরং এই আর্য প্রতিপক্ষকে স্তোত্রকার ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নেতৃত্ব কার্যে নিযুক্ত ঋষিকুল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। একটি ঋকে বলা হইয়াছে ইন্দ্র আর্যের গাভী উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখানে আর্য অর্থে ঋষিকুল ও যজমান গোষ্ঠী দুই দলকে বুঝাইতে পারে। একটি ঋকে জ্যোতি প্রমুখ তিন আর্য প্রজার (তিস্রঃ প্রজা আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ঋকের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট।

অষ্টম মণ্ডলের বালখিল্য সূক্তগুলির একটিতে দাস ও আর্যের একসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ইন্দ্রের স্তোতা ও ধনপালক রূপে। এ পর্যন্ত শত্রু হিসাবে এই দুই দলকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে উভয়েই ইন্দ্রের বিশ্বাসভাজন। সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে আর্য ও দাসের মধ্যে অবৈরভাবের উল্লেখ আর আছে কিনা সন্দেহ। ইহার অর্থ কি? দাস ও আর্য এই দুই দলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল অথবা

কণ্বগোত্রীয়গণ দাসদিগের পক্ষপাতী ছিলেন ? ইহার পরে ত্রসদস্যু ও পবীরুকে অর্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রসদস্যু প্রসিদ্ধ পুরু গোষ্ঠীর অধিপতি। একটি পদে আর্য পদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে হইবে। ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে, যিনি আর্যদিগকে সপ্ত সিন্ধুতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি দাসদিগের বধের জন্য অস্ত্র অবনত করুন। ইন্দ্র আর্যদিগকে সপ্ত সিন্ধুতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোথা হইতে আর্যদিগকে সপ্ত সিন্ধুতে প্রেরণ করিয়াছিলেন ? সপ্ত সিন্ধুতে যে দাসদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহার পরের কয়েকটি ঋকে গোমতী তীরে অবস্থিত বরু রাজার দানের প্রশংসা করা হইয়াছে। সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত ক্রমু, কুভা, মেহত্নুর সঙ্গে একত্রে গোমতীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সঙ্গে তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, শ্বেতী ও কুভার নাম করা হইয়াছে। এইগুলি সিন্ধুর পশ্চিমে প্রবাহিত নদী বলা হয়। গোমতীকে গোমাল হইতে অভিন্ন বলা হয়। গোমাল ডেরা ইসমাইল খান জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। দোমণ্ডি হইতে খাজুরী পর্য্যন্ত ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচীস্থানের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। পঞ্চম মণ্ডলে এক স্থানে বলা হইয়াছে ঐশ্বর্য্যশালী রথবীতি গোমতী তীরে বাস করেন, পর্ব্বতের প্রান্তভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত। কেহ কেহ মনে করেন এই গোমতী অযোধ্যার গোমতী নদী। অত্রি গোত্রীয় শাবাশ্ব ঋষি রথবীতির কন্যার প্রণয়াসক্ত তাহা প্রকাশ পাইতেছে সে যাহা হউক, সপ্ত সিন্ধু বলিতে কোন্ কোন্ নদীর কথা বলা হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে সপ্ত সিন্ধুর প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। বলা হইতেছে সপ্ত সিন্ধু যেমন সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। সমুদ্রের উল্লেখে সিন্ধু দেশের কথা আসিয়া পড়ে। পশ্চিম সমুদ্র ও তাহাতে প্রবাহিত সিন্ধুর পূর্ব্বাঞ্চলের নদীগুলির সহিত পরিচয় না থাকিলে এরূপ বলা সম্ভব হইত না। কণ্বগোত্রীয় বৈয়শ্ব ঋষি ৮ম মণ্ডলের শেষের দিকে হঠাৎ কি উপলক্ষ্য করিয়া আর্যদিগকে সপ্ত সিন্ধুতে প্রেরণ করিবার কথা বলিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহা কি আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাসের স্মরণ না বিশেষ কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যাপার ? জোরোষ্ট্রীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ভেন্দিদাদের আবেস্তা অংশে প্রাচীন আর্যজাতির কতকগুলি বসতির উল্লেখ আছে। ঐ তালিকার মধ্যে হপ্ত হিন্দু বা সপ্ত সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। এই হপ্ত হিন্দু নামের দ্বারা সিন্ধু উপত্যকার কথা বলা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইবে। এখানে যে ভাবে আর্যদিগকে সপ্ত সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে ও দাসদিগের সহিত তাহাদের বৈরভাবের ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা হইতে এবং পূর্ব্বের ও পরবর্ত্তী ঋকগুলি হইতে এরূপ অনুমান করা চলে যে আর্য বলিতে এখানে স্তোত্রকার ও যাজকদিগকে বুঝাইতেছে।

এই মণ্ডলের অন্য একটি ঋকে অগ্নিকে আর্যদিগের বর্দ্ধনকর বলা হইয়াছে। "আর্যদিগের বর্দ্ধনকর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইলে আমাদের স্তুতি সকল তাঁহার নিকট গমন করিতেছে"। সূক্তকার ঋষি "নো গিরঃ" অর্থাৎ আমাদের স্তুতি এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে স্তুতিকারগণ সেই আর্য যাহাদের বর্দ্ধনের জন্য অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরের ঋকে দেখা যাইতেছে যে দিবোদাস অগ্নিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু আহূত হইয়াও অগ্নি সহজে দেবগণের জন্য হব্যবহনের কাজ করিতে রাজি হন নাই। দিবোদাস বলের দ্বারা অগ্নিকে আকর্ষণ করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুদেশে (নাকস্য সানবে) অবস্থান করিলেন। হব্যবহনের কার্যে অগ্নিকে প্রবৃত্ত করিতে দিবোদাসের এই প্রয়াস হইতে অনুমান করিতে হয় যে দিবোদাস আর্যগণের দলভুক্ত। দিবোদাস ত্রিৎসু গোষ্ঠির অধিপতি, প্রসিদ্ধ সুদাস রাজার পিতা ও শম্বর-বিজয়ী। আর্য পদের জাতিবাচক অর্থ থাকিলে বলিতে হয় ত্রিৎসু গোষ্ঠী ও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ভরত ও সৃঞ্জয় গোষ্ঠীও আর্য। কিন্তু বলা আবশ্যক যে উপস্থিত ক্ষেত্রে সূক্তকার যতটুকু বলিয়াছেন তাহা হইতে দিবোদাসকে আর্য বলিয়া গণনা করা অপরিহার্য্য নহে।

দশম মণ্ডলে আর্য ও দাস শত্রুর তিন বার একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি ঋকে বলা হইয়াছে, তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দাস ও আর্য উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারগ হই। সূক্তটির রচয়িতার নাম নাই। দাস ও আর্যের সহিত যুগপৎ যুদ্ধ করিবার অভিলাষী সূক্তকার যে ঋষিকুলোদ্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। সূক্তকার ঋষিগণ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের যজমানদিগের হইয়া সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন। মুদ্গল ঋষি একটি ঋকে দাস বা আর্য শত্রুকে বজ্রদ্বারা অপ্রকাশ রূপে বধ করিবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। অন্য একটি ঋকে দাস বা আর্য যে কেহ দেবরহিত আক্রমণোদ্যত শত্রুর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুইটি ঋকেই দেখা যাইতেছে যে সূক্তকার ঋষি অথবা তাঁহার যজমানের সহিত যুদ্ধাভিলাষী পক্ষদিগের মধ্যে আর্য ও দাস শত্রু রহিয়াছে। দ্বিতীয় ঋকটিতে এই নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে যে আর্য ও দাস উভয় শ্রেণীর শত্রুকে "অদেব" বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে একটি ঋকে দেব ও অদেব শত্রুর উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, এখানে দাস ও আর্য উভয়কে অদেব বলা হইয়াছে। অদেব আর্য বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? আর্য ও দস্যুর মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার প্রসঙ্গে আর্যপদের যে ব্যাখ্যা প্রথম মণ্ডলের একটি ঋকে পাওয়া গিয়াছে (অর্থাৎ কুশযুক্ত যজ্ঞ যিনি করেন তিনি আর্য) তাহা হইতে আর্যকে অদেব বলিবার এই অর্থ করা যাইতে পারে যে শত্রুতাবশতঃ কুশযুক্ত যজ্ঞকারীকেও অদেব বলা হইতেছে। অন্য অর্থ এই হইতে পারে যে প্রথম মণ্ডলের উক্ত ঋকের এবং সায়নের কৃষ্টি ও গুণবাচক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও মনে করিতে হইবে যে আর্য পদের একটি জাতিবাচক সংজ্ঞা আছে। আর্য জাতির মধ্যে দেবভক্ত ও দেবশূন্য উভয় প্রকারের লোক ছিল। একটি ঋকে আর্যব্রত কথার ব্যবহার পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে যে, তাঁহারা ব্রহ্ম (স্তুতি), গো, অশ্ব, ওষধি, বনস্পতি, পৃথিবী ও পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্যকে তাঁহারা আকাশে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তম দানকারী, তাঁহারা পৃথিবীতে আর্য ব্রত প্রচার করিয়াছেন। আর্য ব্রত অর্থে আর্যদিগের আচরিত বা অনুষ্ঠিত ব্রত বুঝাইতেছে। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মণ্ডলের আর্য ভাব দ্বারা দস্যুদিগকে অতিক্রম

করিবার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। একটি ঋকে দেখা যাইতেছে, "সূর্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করিয়া দিলেন, তিনি দেখিলেন দাস জাতির সমকক্ষ আর্য জাতি," (বিদদ্দাসায় প্রতিমানমার্যঃ)। এখানে আর্যের প্রতিপক্ষ দাসের শক্তিপ্রাবল্য সূচিত হইতেছে। আর্য পদের অর্থ এখানে জাতি বা শ্রেণীবাচক। ইহার পরের একটি ঋক গুরুত্বসম্পন্ন। ইন্দ্রের মুখ দিয়া তাঁহার নিজের কীর্ত্তিসমূহ প্রচার করা হইতেছে। ইন্দ্র বলিতেছেন, কবির মঙ্গলার্থে আমি অৎককে বধ করিয়াছি, কুৎসকে রক্ষা করিবার জন্য আমি শুষ্ণকে বজ্রপ্রহারে বধ করিয়াছি, আমি দস্যুকে আর্য এই নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি (যো রর আর্যং নাম দস্যবে)। এই কবি ও কুৎস প্রসিদ্ধ ঋষি। এই দুই জন ঋষির প্রয়োজনে অৎক ও শুষ্ণ নামক দস্যুদ্বয়ের বধ ঋগ্বেদের পৌরাণিক কাহিনী এবং বিভিন্ন মণ্ডলে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই দস্যুদ্বয়ের প্রসঙ্গে ইন্দ্র হঠাৎ বলিতেছেন, আমি দস্যুদিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। ইহার অর্থ কি এই যে দস্যুগণও আর্য কিন্তু কোন্ কারণে তাহাদিগকে এই নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে? একটি ঋকে দেখা যায় ইন্দ্র বলিতেছেন যে তিনি দস্যুদিগকে সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এখানে বলা হইতেছে তাহাদিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এখানে আর্যপদের কৃষ্টিবাচক ও জাতিবাচক দুই প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। সম্ভবতঃ যজ্ঞরহিত দস্যু যজ্ঞপরায়ণ হইলে তাহাদিগকে আর্য সমাজে গ্রহণ করা হইত। এই প্রসঙ্গে অথর্ব্ব বেদের ব্রাত্যস্তোমের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব।

ঋগ্বেদীয় কতকগুলি ঋকের এই বিশ্লেষণ হইতে আর্য সম্বন্ধে কি কি তথ্য পাওয়া যাইতেছে দেখা যাউক। অর্য পদের প্রয়োগগুলি এখানে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি দেখা যায় যে অর্য পদ "সম্মানীয়" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিষ্ণু আর্যকে প্রীত করিয়াছেন ও যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন। ইন্দ্র আর্যকে পৃথিবী দান করিয়াছেন ও হব্যদাতা মনুষ্যগণকে বৃষ্টি দিয়াছেন। অশ্বিদ্বয় আর্যের জন্য যব বপন করাইয়া, অন্নের জন্য বৃষ্টি দিয়া তাহার জন্য বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্র আর্যকে সপ্ত সিন্ধুতে প্রেরণ করিয়াছেন। আর্য এখানে বিষ্ণু, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতাদিগের অনুগৃহীত, যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অনুরক্ত একটি সম্প্রদায়। অগ্নি জ্যোতি রূপে আর্যের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহার অর্থ উপাস্য দেবতা হিসাবে এই সম্প্রদায় অগ্নিকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। আর্যদিগের পশুপাল রক্ষা করিবার জন্য দেবতাদিগের উদ্যমের কথা পাওয়া যাইতেছে। আর্য ব্রত প্রচারে তাঁহাদের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আর্যেণ শব্দের প্রয়োগে আর্যদিগের বিশিষ্ট জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। আর্য বর্ণের উল্লেখে আর্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকারী একটি বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আর্য শব্দটি মাত্র কৃষ্টিবাচক, আর্য জাতি বলিয়া কোন জাতি ছিল না যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন আর্য বর্ণের উল্লেখ তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ।

কিন্তু একটু সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে। আর্য নামে আত্মপরিচয়প্রদানকারী যে জাতি বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহার physical type নির্ণয় করিবার কোন প্রকার ইঙ্গিত ঋগ্বেদে পাওয়া যাইতেছে না। বসিষ্ঠ ও অঙ্গিরাকুল সম্বন্ধে বার-দুই "শ্বিত্ন্য" (শ্বেত) পদের প্রয়োগ আর্য জাতি বা সম্প্রদায়ের ত্বকের বর্ণ নির্ণয় করিবার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। শ্বেতকায়, নীল চক্ষু, উজ্জ্বল কেশ আর্যের কোন বার্ত্তা ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায় না, অন্য অনেক বস্তুর মত এই আদর্শ আর্যকেও ঋণসূত্রে পাওয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানমতে জাতিনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন যাহাদের জাতি লক্ষণ (somatic characters) সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই, যাহারা বিশেষ কতকগুলি দেবদেবীতে বিশ্বাস করিত ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ারূপ বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ করিত এবং আপনাদিগকে আর্য বলিয়া বর্ণনা করিত এইরূপ একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠে এই জাতি বা সম্প্রদায় কাহাদের লইয়া গঠিত? ঋষিকুলগুলিই আর্য না ঋগ্বেদীয় যজমান গোষ্ঠীগুলিকেও আর্য জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে? আর্যদিগের বৈশিষ্ট্য কুশযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহা ত কৃষ্টিবাচক বৈশিষ্ট্য। আর্য শব্দের পুনঃপুন উল্লেখ হইতে মনে করা যায় যে আর্যত্ব মাত্র এই কৃষ্টিবাচক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিত না। ঋগ্বেদে আর্য পদের প্রয়োগগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় এদেশীয় বেদ ব্যাখ্যাতাদিগের মতে আর্য পদ গুণ বা কৃষ্টিবাচক হইলেও এবং ঋগ্বেদে এই মতের পোষক প্রমাণ পাওয়া গেলেও গোড়ায় আর্যপদ জাতিবাচক ছিল। এই বিশ্লেষণ হইতে আরও মনে হয় যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতে ও ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ও এই সকল মতের প্রচারক ও যজ্ঞাদির ঋত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখিবার একটা প্রয়াস ঋগ্বেদের প্রথম দিকটায় লক্ষ্য করা যায়। যজমান গোষ্ঠীগুলিকে যেন এই নাম বহন করিবার সম্মান দিতে অনিচ্ছার ভাব দেখা যায়। মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে, একটিতে যজমান সম্পর্কে ও অন্যটিতে ঋষিকুলভুক্ত না হইতে পারে এইরূপ দুই ব্যক্তি, অর্ণ ও চিত্ররথ সম্পর্কে, আর্য পদের অবিসম্বাদী প্রয়োগ দেখা যায়। যজমান সম্পর্কে আর্য পদটি একজন যজমান গোষ্ঠীর সূক্তকার ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ যজমান গোষ্ঠীর সহিত রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে ঋষিদিগের আপত্তি দেখা যায় না। তাঁহারা যজমান গোষ্ঠীগুলির কন্যা গ্রহণ করিতেন, এবং তাহা অপেক্ষা বড় কথা, তাঁহাদিগকে কন্যা দান করিতেন। ভরত গোষ্ঠীর বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দার সূক্ত ঋগ্বেদের প্রথমে স্থান পাইয়াছে, ইহা একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অনিচ্ছার ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। শেষের দিকে যে আর্য শব্দের উল্লেখ পুনঃপুন দেখা যায় সেই সকল আর্য শব্দ যে মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি এরূপ অনুমান করিলে সম্ভবতঃ ভুল হইবে।

সেই সময়কার নানা প্রকার ভঙ্গির কত না ফটো তাঁহার বাক্স বোঝাই করা আছে। দেবীপ্রসাদ বাক্স খুলিয়া কয়েকখানা ফটো লইয়া আরশির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোন ফটোতে তিনি গুরুভার উত্তোলন করিতেছেন, কোন খানিতে মাংসপেশী সঞ্চালন করিতেছেন, কোনখানিতে বা বুকের ছাতি ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেই পরিপুষ্ট, সবল দেহের দিকে তাকাইয়া দেবীপ্রসাদ মোহিত হইয়া গেলেন—এত সুন্দর সুগঠিত দেহ ছিল তাঁহার! সহসা আরশির দিকে দৃষ্টি পড়িতে আবার দুঃখে অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল। এমন সুন্দর দেহ আজ এমনি করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কে বিশ্বাস করিবে এমন সুন্দর দেহ এমনি অবস্থায় পরিণত হইতে পারে? দেবীপ্রসাদ ফটো কয়খানা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া পুনরায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দেবীপ্রসাদের একটি প্রিয় ঘোড়া ছিল, কিন্তু প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর ঘোড়ায় তিনি আর চড়েন না। পূর্ব্বে প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া এই মফঃস্বল শহরটি পরিক্রমণ করিয়া আসিতেন। কবে যে কেমন করিয়া এতদিনের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস তাঁহার চলিয়া গেল তাহা তিনিও ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। ঘোড়াটি এখনও আছে, তাহার পরিচর্য্যার জন্য এখনও পূর্ব্বেকার মতই খরচ হয়। দেবীপ্রসাদের পুত্র সতীপ্রসাদ বংশের ধারা পান নাই—দৈহিক গঠন ও শক্তি তাঁহার ভাল নয়—সারাটা জীবন লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়াই কাটাইলেন। কিন্তু পৌত্র জ্যোতিপ্রসাদ পূর্ব্বপুরুষের দেহসামর্থ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। সে-ই যখন কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিত তখন কখনও কখনও সখ করিয়া ঘোড়ায় চড়িত। রাত্রে শুইয়া শুইয়া দেবীপ্রসাদের খেয়াল হইল আবার প্রতিদিন নিয়মিত সকালে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবেন। তখনই সহিসের উপরে হুকুম হইল সে যেন ঠিক সময়ে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে। পাঁচ বৎসর পরে আবার ঘোড়ায় চড়িয়া শহরটি ঘুরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পরের দিন হইতে শরীরের সকল সন্ধিতে এমন বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন যে ইহার পর হইতে আর ঘোড়ায় চড়া হইল না।

সকাল-সন্ধ্যায় আজকাল আর তিনি বেড়াইতেই বাহির হন না। বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মত কোনমতে হেলিয়া-দুলিয়া লাঠি হাতে করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে যেন তাঁহার মাথা কাটা যাইতে চাহে। তাঁহার কেবলই মনে হইতে থাকে সে দেবীপ্রসাদ আর বাঁচিয়া নাই—তাহার অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছে।

কয়েক দিন পরে তিনি স্থির করিলেন কলিকাতা যাইবেন কলিকাতায় যে নাম-করা ডাক্তারটি তাঁহাদের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন—শক্তি চাই, ডাক্তার—স্বাস্থ্য চাই, যে কয়দিন বাঁচব—বাঁচার মত বাঁচতে চাই। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বয়স হ'ল যে প্রায় সত্তর। তা হলে ত অনেক আগেই মরা উচিত ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মকে আপনি অস্বীকার করবেন কোন্ কৌশলে? কোন যুক্তিই এখানে খাটবে না।—অবশেষে ডাক্তার কয়েকটি ভাল ভাল বলকারক ঔষধ আর একটি পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কলিকাতায় বসিয়া কয়েক দিন খাদ্যের প্রতি অতিরিক্ত নজর দিতে গিয়া তিনি পেটের অসুখ করিয়া বসিলেন। আবার কয়েক দিন লঘুপথ্য ও হজমীর সাহায্যে শরীরটা ঠিক করিয়া লইতে হইল। ঔষধের উপরে বীতশ্রদ্ধ হইলেন, দেবীপ্রসাদ ঠিক করিলেন—একটা ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিনের জন্য হাওয়া বদলাইতে যাইবেন। কয়েক দিন ধরিয়া তাহারই তোড়জোড় চলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাড়ী হইতে "তার" আসিল—জ্যোতি অত্যন্ত অসুস্থ—শীঘ্র আসুন। সমস্ত ব্যবস্থা গেল ওলটপালট হইয়া—বাঁধা-ছাঁদা জিনিষপত্র কলিকাতার ঘরে তালা দিয়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। রাত্রি দশটার ট্রেনে চাপিলেন। সারা রাত্রি তাঁহার একটুও নিদ্রা হইল না। নির্জ্জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় সারাটা রাত্রি ধরিয়া তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি হইল জ্যোতির? কোন বিশেষ কঠিন অসুখ নিশ্চয়—তাহা না হইলে এমন জরুরী "তার" আসিবে কেন? মনে মনে তিনি বার-বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, জ্যোতি ভাল হইয়া উঠুক! জ্যোতি ভাল হইয়া উঠুক! সেই দিন হইতে কি মতিচ্ছন্ন হইয়া গেল তাঁহার—তিনি তো সত্যই জ্যোতিকে ভাল চক্ষে দেখেন নাই। সেই যে জ্যোতি সেই ভারী পাথরখানা অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইয়া গেল—তিনি পারিলেন না—সেই সময় হইতে জ্যোতিকে প্রতিপক্ষের মত করিয়া দেখিয়াছেন। পুত্র সতীপ্রসাদ শৈশব হইতে রুগ্ন—পূর্ব্বপুরুষের শক্তিসামর্থ্য সে পায় নাই—ইহা দেবীপ্রসাদের নিকট কম ক্ষোভের বিষয় ছিল না, তাই জ্যোতিকে শৈশব হইতেই নানাভাবে দেহচর্চ্চার সুযোগ দিয়াছেন। আজ সেই জ্যোতিই যখন দেহসামর্থ্যে তাঁহার বংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী হইল—তখন কিনা তিনিই তাঁহাকে হিংসা করিতে লাগিলেন। ঘৃণায় ও ধিক্কারে তাঁহার নিজের মন একেবারে ভরিয়া উঠিল। এক সময়ে অল্প একটু ঘুমের ভাব আসিয়াছিল, হঠাৎ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বাড়ী পৌঁছিয়াছেন, দেখেন—চতুর্দ্দিকে কান্নার রোল পড়িয়া গিয়াছে—জ্যোতি বাঁচিয়া নাই—তাহার অসাড় দেহ উঠানে নামাইয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। দেবীপ্রসাদ যেন বাড়ীতে ঢুকিয়া জ্যোতির দেহ-আবরণ তুলিয়া লইয়া উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, জ্যোতি!—জ্যোতি! কিন্তু জ্যোতির নিস্পন্দ দেহ সাড়া দিল না—দেবীপ্রসাদ মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন।—আতঙ্কে শিহরিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। সমস্ত গা তাঁহার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, কামরার জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চোখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—তারা! তারা!—দুর্গতিনাশিনী মা! কথাগুলি যেন ক্রন্দনের মত শুনাইতে লাগিল।

সকালবেলা নিজেদের ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামিল। দেবীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি ট্রেন হইতে নামিয়া দেখেন তাঁহাকে

লইবার জন্ত পাল্কী আসিয়াছে। বেহারাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্যোতি কেমন আছে। তাহারা বিশেষ কিছু জানিত না—একজন একটু ইতস্তত: করিয়া কহিল—ভাল আছেন। দেবীপ্রসাদের কথাটি ভাল মনে হইল না। পাল্কীতে চড়িয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল বেহারারা অত্যন্ত ধীরে চলিতেছে—তিনি তাহাদের বারে বারে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—ওরে আরও জোরে চল্—জোরে চল্। বাড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন—বাড়ী হইতে ক্রন্দনের রোল ভাসিয়া আসিতেছে না তো? অধীর আশঙ্কায় তাঁহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। পাল্কী হইতে নামিয়া এক প্রকার দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলেন—দেখিলেন জ্যোতির ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে—সেখান হইতে দুই-একটি কথার টুকরা ভাসিয়া আসিতেছে। দেবীপ্রসাদ দুই-তিনটি সিঁড়ি এক এক লাফে ডিঙাইয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ডাকিলেন—জ্যোতি? জ্যোতি শুইয়া ছিল—পাশে ছিলেন তাহার মা বসিয়া। জ্যোতিই প্রথম উঠিয়া জবাব দিল—এসেছ দাদু? ভাল হয়ে গেছি আমি। দেবীপ্রসাদ উদগ্র আগ্রহে তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—ভাল হয়ে গেছিস্? আঃ—বাঁচলাম। কিছুক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—কি হয়েছিল রে। জ্যোতি হাসিয়া বলিল—সেই পাথরখানা। দেবীপ্রসাদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—পাথরখানা কি?—কাল ব্যায়াম করবার পর সেখানা ঘাড়ে করে—ছুটাছুটি করছিলাম, হঠাৎ পায়ে হ'চোট্ লেগে পড়ে যাই—বুকে আর মাথায় চোট্ লাগে—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাই—ঘণ্টা দুই পরে জ্ঞান ফিরে এসেছে—এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। দেবীপ্রসাদ তখনও জ্যোতিকে নিজের কোলের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। বলিলেন—আজই পাথরখানা আমি নদীর জলে ফেলে দেব। বাঁচালি আমায়—কি যে ভয় হয়েছিল ভাই।

কয়েকদিন পরে একদিন দেবীপ্রসাদ সতীপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিলেন—আমি কাশী যাব সতী, বাকী জীবনটা সেখানেই কাটাব, সমস্ত ব্যবস্থা করে দাও। সতীপ্রসাদ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাশী কেন?—যাবার ডাক আমি শুনতে পেয়েছি সতী, জোর করে এতদিন তাকে আমল দিই নি—কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য। কাশীবাস করবার জন্তে মনকে প্রস্তুত করতে চাই। সতীপ্রসাদ জানিতেন—প্রতিবাদ বৃথা।

যাত্রার দিন জ্যোতি দেবীপ্রসাদকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমাদের ফেলে তুমি কোথায় যাবে দাদু—আমি তোমার সঙ্গে যাব। দেবীপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন—ওকথা বলতে নেই ভাই। এ সংসারে কিছুই তো চিরদিনের নয়—ফেলে তো একদিন যেতেই হবে। তুইও যাস্ দাদু, আমার মত বয়স হোক, তখন কাশীবাসী হোস্, আজ নয়। দুই ফোঁটা চোখের জল তাঁহার আসিয়া পড়িতেছিল আর কি—তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেহারাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওরে তোরা ঠিক আছিস্ তো। তাহারা জবাব দিল—হাঁ হুজুর—দেবীপ্রসাদ যাত্রা করিলেন।

নাটালে ভারতবাসী

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই দেশ বর্ণ-বৈষম্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষের প্রধান পীঠস্থান। এখানকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী মনে করেন তাঁহারা অনন্যসাধারণ। দক্ষিণ আফ্রিকা একাধিক জাতি এবং সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে—অন্তত:পক্ষে এককালে যে ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু স্বজাতি ভিন্ন অন্ত কাহাকেও তাহার প্রাপ্য ন্যায্য মর্য্যাদা, এমন কি মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার দিতেও শ্বেতকায় শাসকসম্প্রদায় একান্তই নারাজ। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত শ্রুতিমধুর কথা ইংরেজ রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের মুখে অহরহই শোনা যায় তাহা যে একটা বিরাট্ ধাপ্পাবাজি মাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

'উত্তান-উপনিবেশ' (Garden Colony) নাটাল দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল এবং ভারতীয় বহুল প্রদেশ। ১৮৪৩ সালে কেপ প্রদেশের গবর্ণর স্যর জর্জ নেপিয়ার নাটাল ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পূর্ব্বে ইহা বুয়রদিগের অধিকারে ছিল। মহারাণীর এক ঘোষণা-পত্রে প্রচার করা হইল যে নাটাল শাসনে কোন জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে পক্ষপাতমূলক নীতি অবলম্বিত হইবে না।

("There shall not be in the eye of the law any distinction or disqualification whatever, founded upon mere distinction of colour, origin, language or creed, but the protection of the law, in letter and in substance, shall be extended impartially to all alike.")

কিন্তু শতাধিক বর্ষ কাল ইংরেজ শাসনের মধ্যে অসংখ্য বার এই নীতি পদদলিত হইয়াছে। বাক্য এবং কার্য্যের এই অসঙ্গতিকে ভণ্ডামি আখ্যা দিলে অপ্রিয় হইলেও সত্য কথাই বলা হইবে।

নাটালের শ্বেতাঙ্গ শাসক-সম্প্রদায়ের হয়ত আজ আর স্মরণ নাই যে প্রধানত: ভারতীয়দের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই নাটালের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়েরা কিন্তু জোর করিয়া নাটালে প্রবেশ করে নাই। নিজের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়াই নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া নাটাল ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করিয়াছিল। ১৮৬০ সালের ১৩ই অক্টোবর 'ট্রুরো' (Truro) জাহাজ সর্ব্বপ্রথম নাটালের জন্ত ভারতীয় শ্রমিক লইয়া বোম্বাই বন্দর পরিত্যাগ করে। ৩৪ দিন পরে 'ট্রুরো' ডার্ব্বান

বন্দরে নোঙ্গর করিল। নাটালের সর্ব্বত্র আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। কারণটা নিশ্চয়ই ভারত বা ভারতীয় প্রীতি নহে।

১৮৬০ সালের পূর্ব্বেই নাটালের শ্রমিক সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সমস্যা সমাধানের যাবতীয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৬০ সালে ভারত সরকার নাটালে 'চুক্তিবদ্ধ' (Indentured) ভারতীয় শ্রমিক পাঠাইতে সম্মত হইলেন। নাটালের ভূমি এবং জলবায়ু ইক্ষুচাষের অনুকূল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নাটালে ইক্ষুর চাষ কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য শ্রমিকের অভাবে কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছিল না। ভারতীয় শ্রমিক আমদানির ব্যবস্থা হওয়ায় শ্রমিক সমস্যার একটা সুরাহা হইল। ইহাই নাটালবাসীর আনন্দের কারণ। 'নাটাল মার্কারি'তে (Natal Mercury) মন্তব্য করা হইল—"Coolie immigration is a vitalising princple." নাটালের শ্বেতাঙ্গ ক্ষেত্র-স্বামীগণই এই শ্রমিকদিগের যাওয়ার খরচ দিয়া ছিলেন। গরজ বড় বালাই।

কিন্তু নাটালের শ্বেত উপনিবেশকে আর্থিক অপঘাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব মাথায় লইয়া যাহারা মাতৃভূমির মায়া কাটাইল, তাহাদের উপর কতকগুলি অযৌক্তিক, অসঙ্গত, অপমানজনক এবং নীতিবিরুদ্ধ বিধিনিষেধের বোঝা চাপাইয়া দিতে ঔপনিবেশিক সরকারের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা হইল না। এই সর্ত্তাধীন শ্রমিক আমদানি প্রথাই কুখ্যাত 'ইণ্ডেঞ্চার শ্রমিক প্রথা' (Indentured Labour System). 'ইণ্ডেঞ্চার' বদ্ধ শ্রমিক দলকে মাতৃভূমি হইতে বহু দূরে নির্ব্বান্ধব অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করিতে হইত। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পর তাহাদিগকে যে কোন ক্ষেত্রস্বামীর অধীনে নিযুক্ত করা যাইতে পারিত। এই সম্বন্ধে কোন কথা বলার বা মনিবের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বাস করিবার অধিকার তাহাদের ছিল না। বিশেষ অনুমতি-পত্র না লইয়া তাহারা কোথাও যাইতে পারিত না এবং তাহা-দিগকে যে কাজ করিতে আদেশ দেওয়া হইত তাহাই করিতে তাহারা আইন অনুসারে বাধ্য ছিল। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর। মেয়াদ ফুরাইবার পর তাহাদিগকে আরও পাঁচ বৎসর 'স্বাধীন' শ্রমিকরূপে নাটালে কাজ করিতে হইত। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে তাহারা চুক্তির সর্ত্তের অন্যথা করিতে পারিত না। অত্যাচার সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করিলেও মুখ বুজিয়া সহ্য করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। এই পাঁচ বৎসর কাল তাহারা নির্দ্দিষ্ট পারি-শ্রমিকের (মাসে ১০ শিলিঙ) অধিক দাবি করিতে পারিত না। অথচ 'স্বাধীন' শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের তুলনায় এই মজুরি অনেক কম ছিল। প্রচলিত দণ্ডবিধিতে তাহাদের বিচার হইত না। অতি তুচ্ছ অপরাধেও 'ইণ্ডেঞ্চার' বদ্ধ শ্রমিককে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। স্বর্গত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যথার্থ ই বলিয়াছেন,

"Such a system by whatever name it may be called, must really border on the service."

'ইণ্ডেঞ্চার' প্রথা সম্বন্ধে পি, এস, যোশীর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"It was unique in that it was an invention of the British brain to substitute it for forced labour and slavery. The indentured 'coolies' were half-slaves, bound over body and soul by a hundred and one inhuman regulations." (*Verdict on South Africa*, by P. S. Joshi, p. 43).

ইহারই ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজের যে সমস্ত স্তর হইতে কুলি সংগ্রহ করা হইত, ভারতবর্ষে তাহাদের মধ্যে আত্মঘাতের হার অপেক্ষা দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার দশ-বার গুণ অধিক ছিল।

১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হইল। কিন্তু ঐ বৎসর হইতে ব্যবসায়ে মন্দা পড়াতে এই আমদানি কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বহু শ্রমিকের 'ইণ্ডেঞ্চারে'র মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের মধ্যে অনেকে নাটালেই স্থায়ী ভাবে ঘর বাঁধিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে শাকসব্জি এবং তরিতরকারীর বাগান করিল। কেহ বা আবার মৎস্যজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করিল। ফলে নাটালের অর্থনৈতিক জীবনে তাহারা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান পূর্ণ করিল।

১৮৬০-৬৮ এই ৮ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকগণের প্রাণপণ চেষ্টা এবং পরিশ্রমে নাটালের আর্থিক অবস্থার বিরাট্ পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৮৫৯ সালে নাটালে মাত্র ১১৭৩ টন চিনি উৎপন্ন হয়। আর এই পরিমাণ বাড়িয়া ১৮৬৪ সালে ৬৯৮৫ টন এবং ১৮৬৮ সালে ৭১৯৩ টন হয়।

১৮৭০ সালে 'ইণ্ডেঞ্চার' মুক্ত শ্রমিকের প্রথম দল মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনের অধিকার পায়। প্রত্যাবর্ত্তনকারীদিগের মুখেই সর্ব্বপ্রথম চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের উপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদিগের অত্যাচারের কাহিনী যথা, সাধারণভাবে দুর্ব্যবহার, বেআইনী ভাবে বেতন দেওয়া বন্ধ করা, অসুস্থ ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা ইত্যাদি ভারতবাসীর কর্ণগোচর হয়।

এদিকে কিছু দিন পরে বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতীয় শ্রমিকের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ভারতীয়দিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নাটাল সরকার একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশনের রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে ভারতীয় শ্রমিক-দের প্রতি এতদিন যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজন। 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকদিগের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী (Protector of Indian Immigrants) নিযুক্ত করিতে কমিশন সুপারিশ করিলেন। অসুস্থ শ্রমিকদিগের চিকিৎসার জন্য আরও কতক-গুলি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হইল। যে সমস্ত ঔপনিবেশিক ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত করিলেন, কেন্দ্রগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহাদের উপর কর ধার্য্য করা হইল। 'ইণ্ডেঞ্চার' প্রথার বিলোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও এই কর আদায় করা হয়।

শ্রমিকের জন্য নাটাল আবার ভারত-সরকারের দ্বারস্থ হইল।

শ্রমিকদিগের পাথেয় বাবদ নাটালের সরকারী তহবিল হইতে ১০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ হইল। ইহাতে কেবলমাত্র ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগকারীরাই উপকৃত হইলেন। সুতরাং এই ব্যয় অবৈধ এবং পক্ষপাতমূলক। কিন্তু নাটাল সরকার একাদিক্রমে বহু বৎসর এই ব্যয় বহন করিয়াছেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে নাটালের বিশেষ অনুরোধে এবং নাটালের প্রয়োজনেই ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হইয়াছিল। এই সময়েই নাটাল সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়গণের যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার বা কেবলমাত্র তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইবে না। এই আশ্বাসেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ নাটালে একদল স্থায়ী ভারতীয় বাসিন্দার সৃষ্টি হইয়াছে।

১৮৭৪ সালের পর হইতে নাটালে পুনরায় 'চুক্তিবদ্ধ' ভারতীয় শ্রমিকের আমদানি আরম্ভ হইল। এতদ্ব্যতীত বহু ভারতীয় বণিকও এই সময় হইতে নাটালে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সমগ্র দক্ষিণ-আফ্রিকার কোথাও স্থায়ী বসতি স্থাপন করিবার কাহারও কোন আইনগত বাধা ছিল না। ভারতীয় বণিকগণ দেশের বিভিন্ন অংশে দোকান-পশার করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিত্তবান হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এই শ্রীবৃদ্ধি প্রতিবেশী শ্বেতাঙ্গ সমাজের গাত্রদাহের কারণ হইল। ভারতীয়দিগের এই সাফল্যের মূল কারণ এই যে তাঁহারা কেবল গাত্রবর্ণের জন্যই স্থানীয় অধিবাসীদিগকে নিকৃষ্ট মনে না করিয়া তাহাদিগের সহিত ভদ্র এবং সদয় ব্যবহার করেন। শ্বেতাঙ্গগণ কিন্তু এই কথা মানিতে প্রস্তুত নহেন। তুলনীয়—

"But part of their success was certainly due to their lower standard of living and one is tempted to wonder whether they also took advantage of the native by undue credit facilities or direct money-lending which might be expected under the circumstances."—*Natal's Indian Problem,* by Mabel Palmer, p. 9.

এদিকে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর 'ইণ্ডেঞ্চার মুক্ত' বহু ভারতীয় স্বাধীন শ্রমিকরূপে নাটালেই রহিয়া গেল। নাটালবাসী ইংরেজগণ বুঝিতে পারিলেন যে ভারতীয়গণ থাকিবার জন্যই নাটালে আসিয়াছেন। বহুপূর্ব্বেই তাঁহাদের বোঝা উচিত ছিল।

ইহারই ফলে নাটালে দিনের পর দিন ভারতীয় বিদ্বেষ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল। অ-শ্বেতকায় কোন জাতির স্বাধীনতা বা শ্বেতকায়দের সহিত তাহাদের সমকক্ষতার দাবি, শিক্ষালাভের আগ্রহ বা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা নাটালের শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদিগের নিকট অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য। বর্ণ-বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একটির জননী এবং ধাত্রী ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন আজ পর্য্যন্ত বিশ্ব-মানবের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের বস্তু। অথচ নাটালের ভারতীয়গণকে সর্ব্বপ্রকারে শ্বেতাঙ্গ সমাজ হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিবার কোন প্রকার অপচেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই বা হইতেছে না। আজও নাটালের সর্ব্বত্র মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার এবং সন্তরণবাপীতে (swimming pool) ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতি অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় পরিচালিত হোটেল বা চায়ের দোকানেই ভারতীয়গণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। তাহাদিগের শিক্ষা এবং ভ্রমণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র এবং ইউরোপীয়গণের জন্য ব্যবস্থার তুলনায় এই ব্যবস্থা একেবারেই নিকৃষ্ট। "কেবলমাত্র ইউরোপীয়" ('Europeans only') এই মন্ত্র নাটালের তথা সমগ্র দক্ষিণ-আফ্রিকার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্থানীয় অধিবাসী এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের কেবলমাত্র শিক্ষা-ব্রতী হওয়ার জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা নাটালের কোথাও নাই।

চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে নাটালের শ্বেত এবং অশ্বেতকায়দিগের মধ্যে কোনই মৌলিক পার্থক্য নাই। উপরে যে ম্যাবেল-পামারের (Mabel Palmer) কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তিনি নাটাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজ (Natal Technical Training College) এবং নাটাল ইউনিভার্সিটি কলেজে (Natal University College) অধ্যাপনা করেন। তিনি বলেন যে যাঁহারা ইউরোপীয় নন, তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় ইউরোপীয়গণের কোন উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব নাই,

("Have discerned no noticeable superiority in the Whites."—*Natal's Indian Problem,* by Mabel Palmer, p. 10).

আত্মরক্ষার অপরিহার্য্য প্রয়োজনেই শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদিগকে একদা প্রতিবেশী সমাজ এবং নিজেদের মধ্যে ব্যবধান রচনা ও রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রায় দাস পর্য্যায়ভুক্ত শোষিত শ্রমিকের সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার উপর নির্ভরশীল হইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেত সভ্যতা নিজেরই শ্মশান-শয্যা রচনা করিতেছে।

ধীরে ধীরে 'ইণ্ডেঞ্চার' মুক্ত শ্রমিক এবং ভারতীয় বণিকগণের শ্রী এবং সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা নাটালে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের এই অভ্যুদয় শ্বেতাঙ্গদিগের ঈর্ষ্যানলে ইন্ধন নিক্ষেপ করিল। নাটাল সরকার অনুসৃত ভারতীয় নীতি এই ঈর্ষ্যারই অভিব্যক্তি। ভারতীয়গণকে আইন-পরিষদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। যতদিন নাটাল ক্রাউন কলোনি (Crown Colony) ছিল, ততদিন ইংলণ্ডের সরকারের বিরোধিতায় এই অপচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু নাটালের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পর ১৮৯৬ সালে ভারতীয়গণকে আইন-পরিষদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। কাজেই নাটালের স্বায়ত্তশাসন কেবলমাত্র শ্বেতকায়দিগের পক্ষেই স্বায়ত্তশাসন। অশ্বেতকায়দিগের পক্ষে ইহা 'পরায়ত্ত' শাসন। এই সময়েই নাটাল সরকার প্রবাসী 'স্বাধীন' ভারতীয়গণের উপর জন প্রতি ২৫ পাউণ্ড বার্ষিক কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। লর্ড এলগিন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। ভারত-সরকার এই অন্যায় কর স্থাপনে সম্মতি দিলেন। তবে স্থির হইল যে করের পরিমাণ

২৫ পাউণ্ড না হইয়া ৩ পাউণ্ড হইবে। পুরুষের ১৬ এবং নারীর ১৩ বৎসরের বেশী বয়স হইলেই এই কর দিতে হইবে। 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকগণকে অবশ্য অব্যাহতি দেওয়া হইল। কাহারও মনে রাখিবার প্রয়োজন রহিল না যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়গণকে নাটালে বসবাস করিবার অনুমতি এবং সুযোগ ও অধিকার-সাম্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সকলেই ভুলিয়া গেলেন যে প্রধানতঃ ভারতীয় শ্রমিকগণের পরিশ্রমেই দক্ষিণ-আফ্রিকার 'উদ্যান উপনিবেশ' নাটাল অর্থনৈতিক অপঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। স্বর্গীয় গোখলের কথায় এই কর—

"Caused enormous suffering, resulted in breaking up families and driving men to crime and women to a life of shame."

তাহা ছাড়া নাটাল সরকার 'ইণ্ডেঞ্চার' মুক্ত শ্রমিকদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কারণ তাহা হইলেই নাটালে 'স্বাধীন' ভারতীয়ের সংখ্যা খুব বেশী বাড়িতে পারিবে না। কিন্তু ভারত-সরকারের বিরোধিতায় এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই।

১৮৯৩ সালে মহাত্মা গান্ধী একটি মামলা পরিচালনার ভার লইয়া এক বৎসরের জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকাতে গমন করেন। ১৮৯৪ সালে তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসিবার কথা। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি সেখানে থাকিয়া যাওয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৮৯৬ সালে নাটালের ভারতীয়দিগকে আইন পরিষদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বৎসরের শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী কিছু দিনের জন্য ভারতবর্ষে আসিলেন। দেশে আসিয়াই তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগের কথা দেশবাসীর কর্ণগোচর করেন। যথাকালে তাঁহার কার্যকলাপের বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত বিবরণ দক্ষিণ-আফ্রিকাতে পৌঁছিল। তুলনীয়—

"Reuter cabled to Natal that Gandhi had made European Natal appear in India 'as black as his own face'."—*Verdict on South Africa,* by P. S. Joshi, p. 55.

এই সংবাদ নাটালের শ্বেতাঙ্গ সমাজে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করিল। ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। তাঁহারা ভয় পাইলেন যে এই সমস্ত প্রচারের ফলে 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ।

এদিকে নাটালের ভারতীয়গণ মহাত্মা গান্ধীকে অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য তারযোগে অনুরোধ জানাইলেন। তদনুসারে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া 'কুরল্যাণ্ড' (Courland) জাহাজে সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিলেন। এই জাহাজে গান্ধী-পরিবার ব্যতীত আরও কিছু ভারতীয় যাত্রী ছিলেন। 'নাদেরী' (Naderi) নামক আর একখানি জাহাজও এই সময় ভারতীয় যাত্রী সমেত ডার্ব্বান অভিমুখে রওয়ানা হইল। এই দুই জাহাজের মোট ভারতীয় যাত্রীর সংখ্যা ৮০০ জনের অধিক ছিল না। ইহাদের যাত্রার ব্যাপারে মহাত্মাজীর কোন হাত ছিল না। ১৮৯৭ সালের প্রথম ভাগে 'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী' ডার্ব্বান বন্দরে নোঙ্গর করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ একটি সভা আহ্বান করিয়া অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে এই ভারতীয়গণের আগমন প্রকৃত প্রস্তাবে নাটাল আক্রমণেরই নামান্তর—

("denounced the arrival of Indians as an invasion upon Natal."—*Verdict on South Africa,* by P. S. Joshi, p. 55.)

'কুরল্যাণ্ড' এবং 'নাদেরীর' যাত্রীগণের অবতরণে বাধা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হইল। দাঙ্গার আশঙ্কায় নাটাল সরকার জাহাজ দুইখানিকে বন্দর ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। পরে অবশ্য এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। জাহাজ হইতে নামিয়া মিঃ রুস্তমজীর গৃহে যাইবার পথে মহাত্মা গান্ধী শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডার প্রহারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন (১৩ই জানুয়ারী, ১৮৯৭)। দৈবক্রমে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। অবস্থা ক্রমশঃ এত গুরুতর আকার ধারণ করিল যে শান্তি স্থাপনের জন্য নাটালের প্রধান মন্ত্রী মিঃ 'এসকম্বিকে' (Mr. Escombe) স্বয়ং ঘটনাস্থলে আসিতে হইল। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীর লাঞ্ছনাকারীদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য নাটাল-সরকারকে আদেশ করিলেন।

ডার্ব্বান দাঙ্গার ফলে বোঝা গেল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ কত প্রবল। ইহার পরেই নাটাল সরকার 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিক আমদানী করিবার জন্য বৎসরে যে ১০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতেছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই বৎসরই আইন করিয়া ভারতীয়গণের নাটালপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয়। নাটাল ভিন্ন অন্যান্য উপনিবেশে যাহাতে ভারতীয়গণ প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গগণ অবশ্য প্রচার করেন যে ভারতীয়গণের মঙ্গলের জন্যই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কারণ আরও অধিকসংখ্যক ভারতীয় আমদানি হইলে নাকি সমগ্র দক্ষিণ-আফ্রিকার সামাজিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া সাধারণ জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটিত।

১৯০৮ সালে আইনের বলে নাটাল-প্রবাসী সমস্ত এশিয়াবাসীর বাণিজ্য করিবার অনুমতি-পত্র (Trade licence) বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়। ইংলণ্ডের তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সচিবের হস্তক্ষেপের ফলেই ইহা হইতে পারে নাই। কিন্তু এখন হইতে নানা অজুহাতে ভারতীয়দিগকে বাণিজ্য-সনদ দিতে অযথা কালক্ষেপ করা হইতে লাগিল। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেওয়াই হইত না। তুলনীয়—

"We do what we can to restrict further Indian licences. A European licence is granted almost always as a matter of course, whereas the Indian licence is refused as a matter of course if it is a new one."

(ইহা মাবেল পামারের *Natal's Indian Problem*-এর ১০ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত জনৈক Licensing officer-এর উক্তি)।

বাণিজ্য-সনদ দেওয়া না দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা ১৮৯৭ সালে বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে এই 'লাইসেন্সিং অফিসার'-দিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ভারতীয়গণকে বিভিন্ন উপায়ে বুঝাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল যে তাহারা ঘৃণা, হেয়, অবাঞ্ছিত এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীকে একবার ডাকগাড়ীতে অন্য যাত্রীদের পায়ের কাছে বসিয়া যাইতে হইয়াছিল। ভারতীয়গণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতে লাগিল যে শ্বেতকায়গণের তুলনায় তাহারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব এবং প্রায় দাস-পর্য্যায়ের ঊর্দ্ধে কোন দিনই তাহারা উঠিতে পারিবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশেও (কেপ কলোনি ব্যতীত) ভারতীয়গণ বড় সুখে ছিলেন না বা তাঁহাদিগকে অধিকতর মর্য্যাদা দেওয়া হইত না। অবশেষে অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়াইয়া গল, তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন জন্মলাভ করিল। ১৯১২ সালে যখন এই অহিংস সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন গোখলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মিলিত রাষ্ট্রের (Union of South Africa) সচিবমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল বোথা (General Botha) আশ্বাস দিলেন যে নাটালের ভারতীয়গণের জনপ্রতি বার্ষিক ৩ পাউণ্ড হিসাবে কর দিবার আইন এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশে প্রচলিত, বৈষম্যমূলক সমস্ত আইন তুলিয়া দেওয়া হইবে। কার্য্যকালে কিন্তু এই আশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ চলিতে লাগিল। আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট সহিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন এবং সত্যাগ্রহীদিগের শিক্ষার জন্য 'টলষ্টয় ফার্ম্ম' (Tolstoy Farm) স্থাপন করিয়াছিলেন। ২২০০ ভারতবাসী প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যোগদান করিলেন। নারীরাও পুরুষের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। এদিকে নাটালের ইক্ষু-ক্ষেত্র, কয়লার খনি, রেলওয়ে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের ২২০০০ (৬০০০০ ?) কর্ম্মী ধর্ম্মঘট করিল। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যথারীতি গুলি চলিল। নিরস্ত্র এবং অহিংস ভারতীয় সত্যাগ্রহীর রুধিরে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভূমি রঞ্জিত হইল। দলে দলে সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিল। এই আন্দোলনের সংবাদক্রমে এদেশে পৌঁছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। তিনি প্রকাশ্যভাবে এবং স্পষ্ট ভাষায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive resistance) নীতির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। তুলনীয়—

"Your compatriots in South Africa have taken matters into their own hands by organising what is called passive resistance to laws which they consider invidious and unjust. They have the sympathy of India—deep and burning—and not only of India, but of all those who like myself, without being Indians themselves, have feelings of sympathy for the people of this country."

(Imperial Legislative Council-এ প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে)। ভারত সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে ভারত-সচিবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট স্যর উইলিয়ম সলোমনের (Sir William Solomon) নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত জেনারেল স্মাটসের (General Smuts) পত্রীয় আদান প্রদান চলিতে লাগিল। সলোমন কমিশন মহাত্মা গান্ধীর দাবি মানিয়া লইল। ১৯১৪ সালের গান্ধী স্মাটস চুক্তি (Gandhi-Smuts Agreement) ক্রমে বিধিবদ্ধ 'ইণ্ডিয়ানস রিলিফ য়্যাক্টের' (Indians Relief Act) দ্বারা নাটালের ভারতীয়দের উপর জনপ্রতি বার্ষিক ৩ পাউণ্ড কর তুলিয়া দেওয়া হইল এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দিগের কতকগুলি অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা হইল। জেনারেল স্মাটস বলিলেন যে এই আইনের ফলে ভারতীয় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইবে ("a complete and final settlement of the controversy")। সমস্যা কিন্তু রহিয়াই গিয়াছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ পূর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বেই ১৯১১ সালে ভারত সরকার নাটালে শ্রমিক প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৬ সাল হইতে 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিক নিয়োগ প্রথার অবসান ঘটিল। কারণ ঐ বৎসরেই 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকদের সর্ব্বশেষ দলের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। ইক্ষু-ক্ষেত্রসমূহে ভারতীয় শ্রমিকদিগের উপর মোটামুটি সদয় ব্যবহারই করা হইত এবং অল্প কয়েকটি ইক্ষুক্ষেত্রে ইহার পরও 'ইণ্ডেঞ্চার' বদ্ধ শ্রমিক দেখিতে পাওয়া যাইত। 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পারিশ্রমিকের হার মাসে ১০ বা ১৫ শিলিং হইতে বাড়িয়া প্রায় ১০ শিলিঙে দাঁড়াইল। এই বৃদ্ধির অবশ্য অন্যান্য কারণও ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাহার মধ্যে অন্যতম।

এই যুদ্ধের অবসানে নাটালে পূর্ণোদ্যমে ভারতীয় উৎসাদনের নীতি প্রয়োগ করা হইল। ১৯২১ সালে জেনারেল স্মাটস 'ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে' (Imperial Conference) ঘোষণা করিলেন,

"The whole basis of our particular system in South Africa rests on inequality . . . it is the bed-rock of our constitution . . . You cannot give political rights to the Indians which you deny to the rest of the colonial citizens in South Africa."

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ এশিয়াবাসীদিগের ভূসম্পত্তিতে অধিকার, নগরে বাস এবং ব্যবসায়ের অধিকার সঙ্কুচিত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সরকার নিযুক্ত 'লাঙ্গ কমিশন' (Lange commission) কর্ত্তৃক শ্বেতাঙ্গ-গণের দাবি সমর্থিত হইল।

১৮৯৬ সালে যখন নাটালের ভারতীয়গণকে আইন পরিষদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে তাহাদের ভোটাধিকারে কোন দিন হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু

১৯২৪ সালে তাহাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল।

১৯২৩ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স হইতে ফিরিয়া জেনারেল স্মাটস সম্বন্ধে ঘোষণা করিলেন যে ভারতীয় সমস্যা দক্ষিণ-আফ্রিকার ঘরোয়া ব্যাপার এবং কাহারও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ প্যাট্রিক ডানকান (Mr. Patrick Dancan) দক্ষিণ-আফ্রিকার আইন পরিষদে 'ক্লাস এরিয়াস বিল' (Class Areas Bill) উপস্থিত করিলেন (১৯২৩)। নাটালের ভারতীয়গণকে বাস, ভূমি এবং ব্যবসায়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, ট্রান্সভালের ভারতীয়গণের অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করা এবং ভারতীয়গণের দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবেশ কঠোর বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য। এক কথায় দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণকে সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু এবং শ্বেতাঙ্গগণের পদানত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাব ভারতীয় সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়গণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। ভারতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য তিনি ইউনিয়ন সরকারকে একটি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স (Round Table Conference) ডাকিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। সম্মিলিত রাষ্ট্রের নির্ব্বাচন আসন্ন হইয়া পড়ায় পরে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

১৯২৫ সালে 'এরিয়াস রিজার্ভেশন বিলে' (Areas Reservation and Immigration and Registration (Further provision) Bill) প্রস্তাব করা হইল যে অতঃপর শহর অঞ্চলে এশিয়াবাসীদিগের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই কেবল তাঁহারা বাস, ভূসম্পত্তি অর্জ্জন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকারী হইবেন। এই প্রস্তাবের দ্বারা 'ক্লাস এরিয়াস বিল'কে পুনরুজ্জীবিত করা হইল।

চারিদিকে যখন এই সমস্ত বে-আইনী আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উঠিল তখন দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন সরকার বাধ্য হইয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে ভারত-সরকার এবং নিজের প্রতিনিধিগণের এক বৈঠক ডাকিলেন (১৯২৬)। এই বৈঠকে আলাপ-আলোচনার ফলে 'কেপ টাউন চুক্তি' (Cape Town Agreement) সম্পাদিত হয় (১৯২৭)। এরিয়াস রিজার্ভেশন বিল' পরিত্যক্ত হইল। ইউনিয়ন সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য আদর্শে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে ঐ ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। তুলনীয়—

"Both Governments reaffirm the recognition of the right of the Union of South Africa to use all just and legitimate means for the maintenance of Western standard of life."

'Both Government' দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতেছে।

"The Union Government recognises that Indians domiciled in the Union who are prepared to conform to Western standard of life should be enabled to do so."

('কেপটাউন চুক্তি'র ১ম এবং ২য় শর্ত)। শিক্ষাবিস্তার দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে ইউনিয়নবাসী ভারতীয়গণের অবস্থার উন্নতিসাধন করিবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল। যে সমস্ত ভারতবাসী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিবেন, ইউনিয়ন সরকার তাঁহাদের গন্তব্য-স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিবার ভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বহন করিবেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকারীদিগের মধ্যে যাহাদের বয়স ১৫ বৎসরের বেশী তাহাদের প্রত্যেককে ২০ পাউণ্ড এবং ১৫ বৎসরের কম হইলে প্রত্যেককে ১০ পাউণ্ড বোনাস দিবেন। জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি একটা ভাতা পাইবেন। ভারত-সরকার প্রত্যাবর্ত্তনকারী ভারতীয়দিগের তত্ত্বাবধান করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তুলনীয়—

"The Government of India recognises the obligation to look after the Indians on their arrival in India."

('কেপটাউন চুক্তি'র ৬ষ্ঠ শর্ত)।

ইউনিয়ন সরকার এবং ভারত-সরকারের মধ্যে সংযোগ এবং সহযোগিতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন ভারতীয় 'এজেণ্ট জেনারেল' (Agent General বর্ত্তমানে High Commissioner for India) নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। তদনুসারে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রথম 'এজেণ্ট জেনারেল' নিযুক্ত হইলেন।

না ভারতবর্ষ, না দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সমাজ, কাহারও পক্ষেই 'কেপটাউন চুক্তি'র ফল আশানুরূপ হইল না। শ্বেতাঙ্গ সমাজের অসন্তোষের কারণ এই যে, ইহার ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়গণের সংখ্যা খুব বেশী হ্রাস পায় নাই। ভারতবর্ষের অসন্তোষের কারণ এই যে দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার 'চুক্তি'তে প্রতিশ্রুত বহু শর্ত্তই পালন করেন নাই। ভারতীয়গণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই করা হয় নাই, শিক্ষাবিস্তারে বরং পরোক্ষ ভাবে বাধাই দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি এবং বাসগৃহের সমুচিত ব্যবস্থা করা হয় নাই। বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া না আসিলে প্রায় সমস্ত বৃত্তির দ্বারই ভারতবাসীর নিকট রুদ্ধ। দক্ষিণ-আফ্রিকায় কোথাও ভারতীয়গণের বৃত্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। দোকান করা বা অন্য কোন বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাওয়াও ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

'কেপটাউন চুক্তি'র অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরকাল নাটালের ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু শোনা যায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের ভারতীয় বিদ্বেষ হ্রাস পাইয়াছিল বা দূর হইয়া গিয়াছিল মনে করিলে খুবই ভুল করা হইবে। ভারতবর্ষ হইতে নূতন শ্রমিক আমদানী না হওয়ায় এবং প্রত্যেক বৎসরই কিছু প্রবাসী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক কারণেই নাটালে ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছিল এবং ইহাদের মধ্যে দুই-একজন বিত্তশালীও হইয়া উঠিতেছিলেন। ইহারই ফলে ভারতীয় বিদ্বেষ আবার প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিল এবং বিবিধ উপায়ে

প্রবাসী ভারতীয়গণের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলা হইল। সরকার-অনুসৃত 'হোয়াইট লেবার পলিসি'র (White Labour Policy) ফলে বহু ভারতীয় রেলওয়ে প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত হইলেন। ন্যূনতম বেতনের হার নির্দিষ্ট হওয়াতে বহু ভারতীয় কর্মহীন হইয়া পড়িলেন। সত্যের খাতিরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ডার্বান এবং মরিস-বার্গ মিউনিসিপ্যালিটি ভারতীয় বেকারগণের দুর্দশামোচনে সামান্য কিছু সাহায্য করিয়াছে। সর্বনিম্ন বেতনের হার নির্দ্ধারিত হওয়ায় কর্মচ্যুত হয় নাই এইপ্রকার ভারতীয়-গণের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতিও ঘটিয়াছে। সেই-জন্যই এখন নাটালে কোন ভারতীয় দর্জি বা ছুতার মিস্ত্রির আয় একজন শিক্ষকের আয় অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে।

বর্ণ-বৈর এবং বর্ণবিদ্বেষ যে মানুষকে কি রকম অন্ধ করিয়া ফেলিতে পারে, নিম্নের দৃষ্টান্ত দুইটি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ডার্বানের শাস্ত্রী কলেজের (Sastri College) পরিবর্দ্ধনের জন্য মিঃ সুলতান ১৯৪২ সালে ১৭৫০০ পাউণ্ড দান করেন। ডার্বান টাউন কাউন্সিলের (Town Council) নিকট একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করা হইল। ১৯৪২ সালে কাউন্সিল এক খণ্ড জমি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইউরোপীয়-গণ প্রতিবাদ করায় এক বৎসর পরে কাউন্সিলকে এই দান প্রত্যাহার করিতে হইল। এইবার আর এক খণ্ড ভূমি দেওয়া হইল, কিন্তু এবারেও আপত্তি উঠিল। সমস্ত ১৯৪৪ সাল এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার ফলে ১৯৪৫ সালে স্কুলের জন্য যে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল, নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। পরে ১৯৪৫ সালেই এই সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়।

এদিকে নাটালের মুসলমান সম্প্রদায় ভারতীয়গণের জন্য ইটন (Eton) বা মাইকেল হাউসের (Michael House) ন্যায় একটি পাবলিক স্কুল (Public School) স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ভারতীয়দেরই জমিতে এই বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সংবাদপত্র মারফৎ যখন প্রচারিত হইল যে ইউনিয়ন সরকারের একজন মন্ত্রী প্রস্তাবিত বিদ্যালয় গৃহের ভিত্তিস্থাপন উৎসবে পৌরোহিত্য করিবেন, ইউরোপীয় অধিবাসিগণ আপত্তি তুলিলেন। অনন্যোপায় হইয়া ভারতীয়গণ ইউরোপীয়গণকে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের বিনিময়ে অন্য স্থান দিতে অনুরোধ করিলেন। কোন ফলই হইল না। দীর্ঘ দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিবার পর উদ্যোক্তাগণ যখন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানেই বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, ইউরোপীয়গণ জানাইয়া দিবেন যে তাহা হইলে তাঁহারা জোর করিয়া বাড়ী ভাঙিয়া দিবেন। ফলে, টাউন কাউন্সিলের আদেশে আজ পর্য্যন্ত এই গৃহনির্মাণ স্থগিত রহিয়াছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

নাটালের ভারতীয়গণকে নানাপ্রকার অপমান এবং অশিষ্ট আচরণ সহ্য করিতে হয়। নাটাল আইন-পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য প্রকাশ্য বক্তৃতায় ভারতীয়গণকে উইপোকার সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দোকানে সওদা করিতে গেলে সর্বশেষ ইউরোপীয় ক্রেতাটি বিদায় হইলে তবেই ভারতীয় ক্রেতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। অধিকাংশ আপিসেই ভারতীয়গণকে 'লিফ্‌ট' ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। ট্রাম এবং বাসের শ্বেতাঙ্গ কণ্ডাক্টরগণ অনেক সময় নানা অজুহাতে ভারতীয়গণকে গাড়ীতে উঠিতে দেয় না। দক্ষিণ-আফ্রিকার রেলগাড়ীর 'ডাইনিং কারে' (Dining Car) ভারতীয় যাত্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। ডাক এবং পুলিস কর্মচারিগণ প্রকাশ্য ভাবেই ভারতীয়গণের সহিত দুর্ব্যবহার করে। অতি নগণ্য কোন শ্বেতাঙ্গও ভারতীয়গণকে চোখ রাঙাইতে বা অপমান করিতে ভয় পায় না। ইহারাই মহাত্মা গান্ধীকে 'কুলি ব্যারিষ্টার' (Coolie Barrister) এবং শ্রীমতী নাইডুকে 'কুলী রমণী' (Coolie Women) আখ্যা দিয়াছে।

১৯৪৩ সালে জেনারেল স্মাটস ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন যে শ্বেতাঙ্গগণকে সর্বপ্রকারে অশ্বেতকায়ের ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইবে এবং তাহাই ইউনিয়ন সরকারের লক্ষ্য। এই বৎসরই মার্চ মাসে 'ট্রেডিং য়্যাণ্ড অকুপেসন অব ল্যাণ্ড (ট্রান্সভাল য়্যাণ্ড নাটাল) রেষ্ট্রিকশন য়্যাক্ট' (Trading and Occupation of Land (Transvaal and Natal) Restriction Act) বিধিবদ্ধ হইল। ইহাই কুখ্যাত 'পেগিং য়্যাক্ট' (Pegging Act)। ইহা দ্বারা ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের বাসস্থান সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, (এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য P. S. Joshia, 'Verdict of South Africa'. পৃ ৩১২-১৭, দ্রষ্টব্য)। এই সময়েই একটি 'জুডিশিয়াল কমিশন' (Judicial Commission) নিযুক্ত করা হইল। তাহাতে দুই জন ভারতীয় সদস্যও লওয়া হইল। কথা থাকিল যে কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের বাসস্থান, ব্যবসায়ের জায়গা ইত্যাদি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইবে। এদিকে সিনেটর সেপষ্টোনের (Senator Shepstone) উদ্যোগে ১৯৪৪ সালে আহূত প্রিটোরিয়া (Pretoria) সম্মিলনে সিদ্ধান্ত হইল যে, ভারতীয়গণও ইহাতে সম্মতি দিয়া-ছিলেন—'পেগিং য়্যাক্ট' বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণের বাসস্থান মাত্র পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে বোর্ড (Board) গঠিত হইবে তাহাতে ভারতীয় সদস্যও থাকিবেন।

উগ্র প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত জুডিশিয়াল কমিশনের রিপোর্ট দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে রাজী হইলেন না। নাটাল-সরকার কর্তৃক অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্সের বলে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের বাসস্থান এবং ভূসম্পত্তি পৃথক করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বহুক্ষেত্রে ভারতীয়গণের পূর্ব অধিকৃত গৃহ এবং ভূমি হইতে বিতাড়িত হওয়ার উপক্রম হইল। ইহার প্রতিবাদে 'জুডিশিয়াল কমিশন' কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ইহার ভারতীয় সদস্য মিঃ নাইডু এবং মিঃ কাজি পদত্যাগ করিলেন। ইউনিয়ন সরকার কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের 'অর্ডিন্যান্সে' সম্মতি দিলেন না। ইউনিয়ন সরকারের অনুরোধে 'কমিশন' আবার কাজ আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুদিন হয় রিপোর্টও দাখিল করিয়াছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে প্রাপ্ত একটি সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, নূতন করিয়া ভারতীয়গণের ভূসম্পত্তি এবং বাস-স্থানের অধিকার সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা হয়ত কার্য্যে পরিণত হইবে।

নাটাল প্রবাসী ভারতীয়গণকে কি করিয়া কোণঠাসা করা হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত তুলনামূলক তালিকাটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

	১৯২৪		১৯৪৪
সরকারী কর্ম্মচারী (ভারতীয়)	৯৫৫		২১৭
	১৯১০		১৯৩৩
রেলওয়ে কর্ম্মচারী "	প্রায় ৬০০০		৫৬২
		১৯২৫	
ইক্ষুক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক "	১৮২৭০	১১৪০০	৮০২০
	১৯২৪		
কয়লার খনিতে " "	১৭৯৫		৬০১
	১৯২৪-২৫		
কলকারখানায় " "	৯৩২		৭৪৮

অধ্যাপক ডবলু, এস, ম্যাকমিলান যথার্থই বলিয়াছেন—

"Our feet are, in truth, 'on the edge of an abyss.' Politically the European people are now in almost complete control of South African destinies, and the danger is that they look only to the well-being of the white people. But white South Africa must carry its child races along with it on the way of progress. There can be no 'vision' of a 'civilisation' that will rest on a base of serfdom and live. The policy for the future is to be judged according as it stands by those principles of freedom which have been tried in some measure, and have not been found wanting." (*The Cape Colour Question*, by Prof. W. M. Macmillan).

আর কতকাল চলিবে শক্তিহীনের উপর শক্তিমানের উৎপীড়ন? বিশ্বব্যাপী মারণ-যজ্ঞের অবসানের পর বিশ্ব শান্তি, বিশ্বমৈত্রীর অনেক কথাই ত শুনিলাম। কিন্তু বর্ণ-বৈর, বর্ণ-বিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণের বিষাক্ত নিশ্বাস যতদিন মাতা বসুন্ধরার আকাশ-বাতাস কলুষিত হইয়া থাকিবে, 'শান্তির ললিত বাণী' কি ততদিন 'ব্যর্থ পরিহাস' বলিয়াই মনে হইবে না?

স্বপ্ন-সারথি

শ্রীসুবোধ রায়

সত্যের সাথী স্বপ্ন-সারথি,
কোথায় তাহার ঘর?
কোন্ সুদূরের কল্প-লোকের
তেপান্তরের পর?
তা'রি অদৃশ্য-অশ্ব-খুরের ধ্বনি,
অন্তর মাঝে উঠে যবে রণরণি',
উন্মদ বেগে দুর্গম পথে
উল্লাসে মন ধায়,
ভাগ্য-দুর্গ লুণ্ঠন ক'রি'
আনিতে কাম্য বর।

তা'রি ইঙ্গিতে চাঁদের আঁখিতে
জ্যোছনার মায়া লাগে,
তা'রি আহ্বানে অদৃশ্য টানে
সাগরে জোয়ার জাগে।
তাহার অগ্নি-পরশে কুসুম দলে
আরতি-লগনে সুরভির ধূপ জ্বলে,
আলোক-বাণীর বারতা বহিয়া
তাহার প্রাণের আশা
অঙ্কুর হ'তে মহীরুহ মাঝে
আপনার ভাষা মাগে।

তা'রি নীহারিকা-ছায়াপথে কাঁপে
তারকার জ্যোতিশিখা,
তা'রি গতিবেগে আকাশেতে জ্বলে
উল্কার আলো-লিখা।
সুর খুঁজে পেয়ে তা'রি ছন্দের মাঝে
বিশ্বলীলায় নৃত্য নূপুর বাজে,
তা'রি সঙ্গীতে প্রাণ-তন্ত্রীতে
সুরের আঘাত লেগে
তামস লগনে জ্বলে যে গগনে
উৎসব-দীপালিকা।

সেই উৎসব মিলন মেলায়
যে করে আত্মদান,
সে-ই লভে চিরস্বপ্ন-লোকের
শিল্পীর সন্ধান।
সেই শিল্পীর রচনা-চাতুরী নিয়া
রচে ইতিহাস বুকের শোণিত দিয়া;
স্বপন-সারথি জাগে যে সেথায়
সত্য দোসর হ'য়ে,
তাহার অমর আখরের মাঝে
স্বপ্ন মূর্ত্তিমান্।

বিহারের লোক-সঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

ছট্ পর্ব্ব

পূর্ব্বে একবার ছট্ পর্ব্বের পরিচয় দিয়েছি। এই পর্ব্বটি বিহারিণীরা অতি নিষ্ঠাভরে পালন করেন। প্রচলিত বিশ্বাস এখানে এই যে যদি পূজাকালীন আচার-অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হয় তবে নাকি কুষ্ঠব্যাধি আক্রমণ করবে। অর্থাৎ নিষ্ঠার ত্রুটি যাতে না হয় তার জন্য অনুশাসন প্রবল।

ছট্ পর্ব্বের গানগুলি বহু প্রচলিত এবং প্রায় অন্যান্য সকল পর্ব্বের অনুষ্ঠানেই গাওয়া যেতে পারে। আমি কয়েকটি বিশেষ সঙ্গীতের পরিচয় দেব।

চারি পহর রাতি জল থল সেবলুঁ,
সেবলু চরণ তোহার, হে ছট্ দেব,
দরশন দেহু আপন।
মাগু মাগু তিরিয়া, কোন ফল মাগু,
আজকে মাগল ফল পাউ।
অপন লে মাগু অরধ সিন্দুর
জনম জনম এহিয়াত্।
প্রাত দরশন দেহু হে আদিত,
দরশন দেহু আপন।
পোথি পঢ়নকে বেটা মাগু,
গোড় লগনকে পুতহু,
রূপনী খেলন কে বেটী মাগু,
পঢ়ল পণ্ডিত দামাদ্।
বাহর মাগু গাইয়া ভৈঁসিয়া,
ভিতর শোভন ভাণ্ডার।
শ্বশুর লে মাগু অন-ধন-লছ্মী,
নৈহর সহোদর ভাই।
প্রাত দরশন দেহু হে আদিত,
দরশন দেহু আপন।

"রাত্রি চার প্রহর ধরে জল স্থল সেবা করেছি, হে আদিত্য (ছট্ দেবতা) তোমার চরণ সেবা করেছি। দরশন দিয়ে ধন্য কর।

আজকের পুণ্য দিবসে প্রার্থনা যেন পূর্ণ হয়। আমি স্ত্রীলোক কি আর বর প্রার্থনা করব। নিজের জন্য অম্লান সিন্দুর, অক্ষয় সোহাগ সৌভাগ্য কামনা করি। যেন বিদ্বান্ পুত্র লাভ করি, যেন এমন পুত্রবধূ লাভ করি যিনি নম্র হৃদয়ে আমার পদস্পর্শ করেন। এমন কন্যা যেন লাভ করি যে নয়নাভিরাম শৈশব খেলায় রত থাকে—জামাতা যেন পণ্ডিত হন।

বহির্ব্বাটীতে গরু মহিষ, এমন গৃহ মধ্যে প্রাচুর্য্য মণ্ডিত, শোভন ভাণ্ডার হোক। শ্বশুর মহাশয়ের জন্য অন্ন ধন ও লক্ষ্মীর সংসার কামনা করি এবং পিতৃগৃহে সহোদর ভ্রাতা কামনা করি।

"হে আদিত্য প্রাতঃকালে দরশন দাও।"

গানটিতে যাচ্ঞার প্রাচুর্য্য দেখে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। পর্ব্ব উৎসবে, সত্যনারায়ণ লক্ষ্মীর পূজায় এই যাচ্ঞার রীতিই গৃহস্থের ঘরে চলে এসেছে। অবশ্য সমস্ত সঙ্গীতেই নিজের জন্য 'দেহি দেহি' রবের বাহুল্য নেই।

এইবার যে গানটির পরিচয় দেব তার ভঙ্গী নিঃস্বার্থ ও বিনয়নম্র ভক্তের আবেদন

"গাইয়া বাছোয়া দুধ জুঠায়লৈ
অরঘিয়া কৈসে দেবো ?
গাইয়া বাছোয়া হমর সৃজল
অরঘিয়া হাম লেবো।
মালিন বেটিয়া ফুল জুঠায়লৈ
অরঘিয়া কৈসে দেবো ?
ডোমিন বেটীয়া সুপ জুঠায লৈ
অরঘিয়া কৈসে দেবো ?
মালিন বেটীয়া হমর সৃজল
ডোমিন বেটীয়া হমর সৃজল
অরঘিয়া হাম লেবো।"

"বাছুর দুধ উচ্ছিষ্ট করেছে, কেমন করে এই দুধে দেবতাকে অর্ঘ্য দান করব ? উত্তর হ'ল, বাছুর ত আমারই সৃষ্টি আমি তার উচ্ছিষ্ট দুধ গ্রহণ করব। মালী কন্যা ফুল উচ্ছিষ্ট করেছে ডোমকন্যা কুলা (সূর্পকের উপর উপচার সাজিয়ে অর্ঘ্য দেওয়ার রীতি) উচ্ছিষ্ট করেছে, নিষ্ঠাচারিণী ভয় পাচ্ছেন অর্ঘ্য দিতে, সে ক্ষেত্রেও ঐ একই উত্তর—মালীকন্যা ডোম কন্যা ত আমারই সৃষ্টি, অর্ঘ্য আমি গ্রহণ করব।"

এই গানটি গাওয়ার মূলে বোধ হয় একটি ক্ষমা ভিক্ষার ভাব আছে। গৃহস্থের আচার ত্রুটিশূন্য নাও হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণা করে পূর্ব্ব হতেই মার্জ্জনা চেয়ে রাখা হয়েছে। সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে পবিত্রই বা কি আর অপবিত্রই বা কি ?

এই গানটি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে কাজে লাগান যেতে পারে সম্ভবত।

এইবার আর একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি :

কাতিক মাস বরত এক লাগল
লাগল ছট্ এতোয়ার।
"তুঁহি বড় পাপী, বাতিয়াম' শুনলে
ন কুছ করলে দান।
"হমর স্বামী হায়, রহে ধন মোহিত,
ন কুছ কর দেলৈ দান।
হে আদিত, হম্ কৈসে পাপী নিদান্।"

কার্ত্তিক মাসে ছট্ পর্ব্ব ও পুণ্য রবিবার এসেছে—এমন দিনে তুমি কিছুই দান করলে না ? তুমি বড়ই পাপী। সখেদে নারী উত্তর দিচ্ছেন, "আমার স্বামী ধনলুব্ধ, অর্থসঞ্চয়েই তাঁর

চিত্ত রত থাকে। আমার কিছুই দান করতে দিলেন না। হে আদিত্য, কোন্ ন্যায় বিচারে আমি পাপভাগিনী হলাম?"

প্রাত: প্রাত: সীতা জানকী জাগউঁ,
'উঠহু রঘুবর স্বামী।'
'কিয়া থোর ভেলো সীতা অন-ধন লছমী
কিয়া থোর ভেলো তোর স্বামী?'
'নহি থোর ভেলো মোর অন-ধন-লছমী
নহি থোর ভেলো মোর স্বামী।
এক থোর ভেলো মোর তীরথ অস্নান
হে সরস্বতী গঙ্গা যমুন (া)'
'যব সীতা যৈবে সরস্বতী গঙ্গা
ডোলী মহপা লাউঁ দুয়ার হে।'
'ধাঁওয়ে পয়্এ তীরথ অস্নান,
তিন কুল তারব রঘুবর হে।'

'ভোর হতে সীতা স্বামীকে জাগাচ্ছেন। স্বামী জিজ্ঞাসা করছেন, সীতা, তোমার কিসের অভাব—অন্ন, ধন, লক্ষ্মী, স্বামী-সোহাগ? সীতা উত্তর দিচ্ছেন—অন্ন ধন লক্ষ্মী কিছুর অভাব আমার নেই, স্বামীও আমার অনিন্দনীয়, আমার একমাত্র কামনা আছে তীর্থস্নান করি। স্বামী বলছেন—পালকী দুয়ারে আনাচ্ছি, তীর্থস্নানে যাত্রা কর। সীতা উত্তর দিচ্ছেন, তীর্থ-যাত্রার বন্ধুর পথ অতিক্রম করব পদব্রজে, কষ্ট স্বীকার করে তীর্থযাত্রাই আমার তিন কুল উদ্ধার করবে।'

এবার যে গানটির পরিচয় দিচ্ছি তাতে সূর্য্যদেবের জননী যেন পুত্রকে জাগাচ্ছেন। গানটি ছট্ পর্ব্বের প্রভাতী অর্ঘ্যের সময় বিশেষ ভাবে গাওয়া হয়।

কাহে কে উন্চে কোঠর কোঠরী,
কাহে হমে লাগল' কিওয়ার।
সোনে কে উন্চে কোঠর কোঠরী।
রূপে লাগল কিওয়ার।
আদিত ভজলে মন—বাজতই ঝঞ্ কার।
যেহ পৈসী সুতবে আদিত দেব,
আব্ কো ভেলৈ বিহান।
জাগাবে আদিত দেব কে মাতা,
উঠ বেটা ভেলৈ বিহান।
কুষ্ঠী লোগ চরণ বৈঠলেহে
উন্‌কর করহ বিচার।
আঁধরা পুকারহৈ পহর রাত,
লংরা ভজত হৈ পহর রাত।
আঁধরে আঁখি দিহো, কোঢ়িয়াকে কায়া
নিরধনে ধনরা বহুত।
হরষৈতে সব ঘর চলি যৈতো,
বাজত 'ধনি' ঝঙ্কার।

প্রথমে বর্ণনা করা হচ্ছে আদিত্যদেবের প্রাসাদের। স্বর্ণোজ্জ্বল ঘরগুলি, রৌপ্যখচিত দুয়ার। সূর্য্যদেব নিদ্রামগ্ন, ভোর হয়েছে। সূর্য্য-জননী পুত্রকে জাগাচ্ছেন 'বাছা ওঠ, রাত্রি আর নেই। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তেরা তোমার শরণ নিয়েছে, তাদের বিচার কর। অন্ধ পঙ্গু সারারাত্রি তোমার ভজন করেছে, তাদের সহায় হও। অন্ধকে চক্ষু দান কর, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে নীরোগ দেহ দাও, দরিদ্রকে বহু ধন দাও। তারা বহু বহু করে হরষিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করবে।

প্রভাতী অর্ঘ্যদানের সময় এই গানটিও গাওয়া হয়:—

অযোধ্যা নগরিয়ে লাগলৈ বাজার
র্হিরে বেসরলুঁ নারিয়ব,
র্হিরে সুপ, কল, অমৃত।
উগহ' আদিত দেব লেহু অরঘ হমার।

"অযোধ্যা নগরীর বাজার হতে নারিকেল, কুলা, কলাদি এবং দুধ কিনেছি, হে আদিত্য উদয় হও এবং আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

ছট্ পর্ব্বের স্নানযাত্রা দেখেছেন অনেকেই। নিষ্ঠাবতীরা পদব্রজে আসেন নদী বা পুকুরে, পরিচ্ছন্ন পট্টবস্ত্র পরে, সাধ্যমত অলঙ্কারাদি ধারণ করে। শান্তসমাহিত ভঙ্গীতে পথ চলেন, বিন্দুমাত্র চপলতা থাকবে না বাক্যে বা ভঙ্গীতে, দীর্ঘ উপবাসে তাঁদের তপ:ক্লিষ্ট মুখ। অর্ঘ্য উপহার বহন করেন সঙ্গী কোন পুরুষ বা নারী। অস্তমান সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে যাবার সময় পথে বারংবার ভূলুণ্ঠিতা হয়ে সূর্য্য প্রণাম করতে থাকেন। অর্ঘ্য দেওয়া হয় আকণ্ঠ জলমগ্ন হয়ে মস্তকে অর্ঘ্যোপচার নিয়ে। সূর্য্যাস্ত হলে আবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আবার স্নানযাত্রা। প্রথম অরুণোদয় দর্শন হয় যথা-পূর্ব্বং জলমগ্ন হয়ে। প্রণামান্তে গৃহে ফিরে দীর্ঘ দুদিনের উপ-বাসের পর প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই পর্ব্ব সধবা, বিধবা, কুমারী সকলেই করতে পারেন। গৃহে মহাগুরু নিপাত হলে এক বৎসরের মধ্যে পর্ব্ব নিষেধ। পর্ব্বকালে গৃহস্থের যদি জন্ম বা মৃত্যুজনিত অশৌচ হয় তবু আরব্ধ পর্ব্ব বন্ধ হয় না, সে ক্ষেত্রে শুধু ভাবের অর্ঘ্য দেওয়ার বিধান আছে।

ছট্ পর্ব্ব আর সকল রাজসিক পর্ব্বের মতই গৃহস্থের সুখ-সৌভাগ্যের নিদর্শন।

বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্র-কলা ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রধানতঃ শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের কাহিনী এদেশের শিল্পী-গোষ্ঠী এবং শিল্পরসিক তথা শিক্ষিত-সমাজের অজানা নেই। প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকা-



সখী-সম্মেলন

দ্বারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে এই শিল্প-কলার প্রচারে কতটা সহায়তা হয়েছে সে কথাও সকলেরই সুবিদিত। পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় শিল্পকলার শৈশবাবস্থায়ই উপরি-উক্ত উভয় পত্রিকায় এ সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ রসজ্ঞ এবং সমঝদারদের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার তুলনামূলক সমালোচনাদির ফলে প্রথমোক্তটিরই শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছিল এবং ভারতীয় চিত্রকলা যোগ্য মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল গৌরবের আসনে। আজ আমাদের শিল্পীদের এবং শিল্পরসিকদের সেই পুরনো কথাই পুনরায় নূতন করে শুনিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। কেননা, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের মতই আজ আবার আধুনিক কালের অনেক শক্তিমান শিল্পীর মনে পশ্চিমের শিল্প-কলার আঙ্গিক ইত্যাদির প্রতি উৎকট মোহের নেশায় হয়েছে, নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা সুরু করেছেন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। গত বৎসরের মাঘ মাসের প্রবাসীতে 'গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের চিত্র-প্রদর্শনী' নামক প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবছরকার কোন কোন শিল্প-প্রদর্শনী দেখেও আমাদের মনে হয়েছে যে, দেশীয় শিল্প-পদ্ধতির প্রতি উপেক্ষামূলক মনোভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ নয়। এর প্রতিকারকল্পে আমাদের শিল্পীদের আত্মস্থ হয়ে নিজস্ব সম্পদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য এ সমস্যা শুধু যে আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়, চীনের চিত্রকলাও আজ এই একই সঙ্কটের সম্মুখীন। সেখানেও পুরাতনের সহিত বেধেছে নূতনের চিরন্তন সংঘর্ষ। সম্প্রতি চীনের চেংতু অঞ্চলের সেচুয়ান নামক স্থানে অনুষ্ঠিত চীনা ললিত-কলা-সমিতির এক অধিবেশনে, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পুরাতনকে নিঃশেষে বর্জ্জন করে নূতনকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সময়োপযোগী সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এসেছেন। "Problems of Modern Artists in India and China" শীর্ষক তাঁর সেই ভাষণ বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সমাধানের কার্য্যকরী ইঙ্গিত তাতে পাওয়া যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের চিত্রকলার চরম অধঃপতনের সময় পাশ্চাত্য চিত্রকলা কি ভাবে এসে আমাদের শিল্পীদের মোহাচ্ছন্ন করলে সে-সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বলছেন—

"It was at this juncture that the western school of painting very tempting in their new way of using colours and the attractive manners of realistic renderings of lights and shadows attracted the attention of the artists in India, who had forgotten the glorious traditions of the ancestors, and the Indian artists of the early nineteenth century succumbed to the temptations of accepting and copying the manners and mannerisms of the realistic methods of the west."

এই পরানুকরণ হয়ত দু' হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনার ফল আমাদের জাতীয় শিল্পকলার সর্ব্বনাশ সাধন করত, যদি না ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এদেশের কয়েকজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি জাতীয় সংস্কৃতি পারপ্লাবী এই বৈদেশিক ভাবপ্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতেন। এঁদের পুরোধারূপে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ অনন্তকাল স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি এসে এই আন্দোলনের পুরোভাগে না দাঁড়ালে আমাদের অমূল্য শিল্প সম্পদের ভাণ্ডারদ্বার হয়ত আমাদের কাছে চিরতরেই রুদ্ধ হয়ে যেত।

এই জাতীয় শিল্পান্দোলন বিশেষ ভাবে সুরু হয় পরলোকগত ই. বী. হ্যাভেলের অধ্যক্ষতাকালে অবনীন্দ্রনাথ যখন গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সেই সময়ে। তাঁর প্রচেষ্টায়, শুধু যে বাংলাদেশেই ভারত-শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা

হ'ল তা নয়, ধীরে ধীরে এই জাতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্রোতোধারা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। বাংলাদেশে আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ'ল। অতীতে বাংলার চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্য যেমন বাংলাদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি, তেমনি নব্য বাংলার এই চিত্রকলার প্রভাবও হ'ল ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী। এ সম্বন্ধে ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত "A Young Indian Sculptor" নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

"His (Abanindranath's) pupils Nandalal Bose, Asit Kumar Haldar and the rest strengthened the movement which spread all over India by members of the Calcutta School going to other provinces as Art teachers (*e.g.*, Asit Kumar Haldar at Lucknow, Sailendranath Kar and Kusal Mukherjee at Jaipur, Promod Kumar Chatterjee at the Andhra Jatiya Kala-Sala at Waltair, the Ukil brothers at Delhi, Samarendranath Gupta at Lahore, and other members of the Calcutta School and its development, the Santiniketan School in other centres of education and art, *e.g.*, the Rajkumar College at Raipur, the Aitchison College at Lahore, the Doon School at Dehra Doon, etc."

চিত্রকলার ন্যায় ভারতীয় ভাস্কর্য্যেরও একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। এই ভারতীয় ভাস্কর্য্য একদা চীন, জাপান, ব্রহ্ম ইন্দোচীন, এবং ইন্দোনেশীয়ার যবদ্বীপে গিয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাল সম্রাটদের আমলে বাংলার ভাস্কর্য্য সুদূর নেপালে গিয়ে সেখানকার শিল্পকলাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। নব্য বাংলার সাম্প্রতিক ভাস্কর্য্য-শিল্প প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখ করেছেন, এই ভারতবিখ্যাত ভাস্কর এবং শিল্পী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"Bengal gave to India one great sculptor who has acquired a pan-India distinction—Deviprosad Roy Choudhury—now principal of the Goverument School of Art in Madras."

অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতবর্ষকে এমন একজন ভাস্কর দিয়েছে যাঁর খ্যাতি সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি হচ্ছেন মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে তরুণ এবং উদীয়মান শিল্পীর শিল্পকলা সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি তিনি দেবীপ্রসাদেরই সুযোগ্য প্রিয় শিষ্য। সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ-ভারতের একটি বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিল্প-কলা বিভাগের কর্ণধাররূপে নিযুক্ত আছেন। ইতিপূর্ব্বে সুশীলকুমারের শিল্পকলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত* হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর বহু ভিনরঙা ছবি এবং সাদা-কালো রেখাচিত্রের প্রতিলিপি প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু এই উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

* Sushil Mukherjee—An Artist by Wilfrid S. Lynch (*Modern Review*, Feb. 1943)

সুশীলবাবু একাধারে রূপদক্ষ শিল্পী এবং সুযোগ্য শিল্প-শিক্ষক। এই উভয়বিধ কৃতিত্বের জন্যেই তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিল্প সমালোচক এবং রূপতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রশংসা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।



মালাবার-দুহিতা

অসিত হালদার, দেবীপ্রসাদ, সুধীর খাস্তগীর, কুশলকুমার, শৈলেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত সুশীলকুমারও প্রবাসে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বাঙালী শিল্পীদের প্রযত্নে সারাদেশে ভারতীয় চিত্রকলার এই যে প্রচার ও প্রসার একে বিংশ শতাব্দীতে বাংলার সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ের অন্যতম অঙ্গ বলা যেতে পারে। এই সাংস্কৃতিক অভিযানে সুশীলকুমার পুরোবর্ত্তী নন, তিনি অসিতকুমার প্রভৃতির পরবর্ত্তী। কিন্তু তিনি যে তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসাধক তরুণ বয়সেই সুশীলবাবু সে পরিচয় দিয়েছেন। বর্ত্তমান ভারতের শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

সুশীলবাবুর কোনো কোনো ছবিতে (যেমন—চন্দ্রালোক ও ছায়া) খাঁটি পাশ্চাত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ছবিটিতে প্রাচ্য শিল্পসুলভ রহস্যাভাস পরিস্ফুটন-প্রয়াসের পরিচয় পেয়ে একথা বুঝতে দেরি হয় না যে, শিল্পী প্রাচ্য-শিল্পের উচ্চ আদর্শ

থেকে বিচ্যুত হন নি। তাঁর শিল্পকলা অনুধাবন করলে এ ধারণাই সুস্পষ্টরূপে মনে বদ্ধমূল হয় যে, আসলে তিনি অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতিরই অনুবর্ত্তন করে চলেছেন অবশ্য গতানুগতিক ভাবে নয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তিনি যে নব নব পরীক্ষণের পক্ষপাতী তার পরিচয় এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত লিনোটাইপ এবং উড্‌কাট এই উভয়বিধ বৈদেশিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত সাদা-কালো স্কেচগুলিতে এবং আরো নানা ছবিতে সুপরিস্ফুট। এক দিকে জাতীয় শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁর যেমন সুগভীর শ্রদ্ধা, অন্য দিকে তেমনি বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতিকেও কোনো কোনো ভাব প্রকাশের বাহনে পরিণত করার দিকেও তাঁর সমান মানসিক প্রবণতা। শিল্পকলার মামুলি এবং সুগম পন্থা অনুসরণ করে তিনি অগ্রসর হন নি। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে তাঁকে বলা যেতে পারে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। নব নব পরীক্ষণ দ্বারা আবিষ্কারের পথ যে বিঘ্নসঙ্কুল সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে কখনো তিনি পশ্চাৎপদ নন। শিল্পকলার বিশেষ কোনো ফ্যাশান কিম্বা 'ইজম' বা 'বাদ' তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি মনে করেন যে, এই 'ইজম' বা বিশেষ বাদের প্রভাব এদেশের বহু উদীয়মান এবং শক্তিশালী শিল্পীর প্রতিভা বিকাশের বিশেষ পরিপন্থী হয়েছে। সুশীলবাবু সন্ধানী শিল্পী। স্বকীয় শিল্পীমনের খেয়ালে স্বতন্ত্র পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন নব নব রূপলোকের সন্ধানে। কিন্তু নূতনত্বের মোহে জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সহিত জন্মগত সম্পর্কের কথা তিনি বিস্মৃত হন নি। বিশেষ বিশেষ পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতি এবং টেক্‌নিককে নিজস্ব করে নিয়ে তিনি তার মাধ্যমে নিজের কোনো কোনো ভাব প্রকাশ করেছেন। এ অনুকরণ নয়, এ হচ্ছে শিল্পের স্বাঙ্গীকরণ। সুশীলবাবু বর্ত্তমান ভারতের সেই শিল্পীগোষ্ঠীর একজন যাঁদের আদর্শ এবং শিল্প সাধনা সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বলেছেন,

"In this assimilation of the healthy and useful items of western art forms, the fundamental principles of Indian traditions have not been sacrificed or neglected. New ways have been discovered to present old eternal ideals, solidly standing on the bed-rock of their own foundations."

সুদূর দক্ষিণ-ভারতে সুশীলকুমারের ছোট্ট ষ্টুডিয়োটিতে ঢুকবামাত্রই আপনভোলা শিল্পীর একাগ্র সাধনা এবং আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে দর্শকের মন খুশি হয়ে ওঠে। আপনি ষ্টুডিওতে ঢুকবামাত্রই একহারা চেহারা, বর্ণ আদরে শ্যাম বলা চলে, তরুণ উৎসাহী শিল্পী উঠে এসে আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে, "আমি বড় অগোছালো" একথা বলে আপনার উপবেশনের জন্যে আসন নির্দ্দেশ করবেন। তারপর ঘরের চারদিকে অসহায়ভাবে একবার তাকিয়ে স্মিতহাস্যে হয়তো বলে উঠলেন, "দেখুন, এ জায়গা থেকে চলে যাবার সময় যদি আপনার কাপড়-চোপড়ে রঙের ছোপ লেগে যায়, আশা করি, তা হলে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু দর্শক তখন অন্য জগতে, ঘরভর্ত্তি রূপসৃষ্টি দেখে আর একজন খাঁটি শিল্পীর মনের ছোঁয়া লেগে তারও তখন মনে রং ধরেছে—এ সময় তুচ্ছ পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার কথা কারই বা মনে থাকে! সেই ক্ষুদ্র কক্ষটির দেয়ালে মেঝেতে আনাচে-কানাচে চারদিকে কেবল ছবি আর ছবি, খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে চোখে আর মনে যেন রঙের নেশা ধরে যায়। ছবি ছাড়া সেখানে আছে সারা ঘর জুড়ে ছোট-বড় রকমারি ফ্রেম, আর তুলী আর জল রাখবার ছোট ছোট আধার আর অসংখ্য অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরো। শুধু রস-পিপাসা নয়, রসনার পিপাসা মেটাবার দিকেও শিল্পীর সমান সজাগ দৃষ্টি। কফির অর্ডার হ'ল, চটপট চটপটে একটি মালয়ালী ভৃত্য কফির পাত্র সহ এসে হাজির। এই ভৃত্যটি শুধু যে শিল্পীর হুকুম তামিলই করে তা নয়, এই শিল্পময় পরিবেশের মধ্যে থেকে থেকে সেও হয়ে উঠেছে দস্তুরমত শিল্পের একজন সমঝ্‌দার। "এর সামনে রেখে দিন আধ ডজন ছবির প্রতিলিপি। মনে করা যাক এর মধ্যে চারটে একদম ওঁচা—বাজে আর্টিষ্টদের আঁকা—একটি মোটামুটি ভালো বলা যেতে পারে এমন কোনো শিল্পীর কাজ, আর ষষ্ঠ ছবিটি কোনো রূপদক্ষ শিল্পাচার্য্যের অঙ্কিত। দেখবেন এগুলো নির্ভুলভাবে বেছে নিয়ে সে শ্রেণী-বিভাগ করে সাজিয়ে রাখতে পারবে।" সুশীলবাবু যখন এ কথাগুলো বলেন তখন তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে আত্মপ্রসাদের সুর।

সুশীলকুমার প্রথমে রাঁচি কলেজে শিক্ষালাভ করেন, সেখান থেকে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্ত্তি হন কিন্তু চিত্রকলার সাধনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবার উদ্দেশ্যে ইন্টারমীডিয়েট পর্য্যন্ত পড়েই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে ক্রিকেট খেলায় তাঁর খুব অনুরাগ ছিল, ওস্তাদ ক্রিকেট খেলোয়াড়রূপে তিনি যথেষ্ট নামও করেছিলেন। সুশীলকুমার তাঁর শিল্পীমন এবং শিল্পনৈপুণ্য এই উভয়ই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন তাঁর মাতৃকুল থেকে। তাঁর মামা চিত্রকলার একজন বিশেষ অনুরাগী। সুশীলকুমারের মাতা সঙ্গীত-নিপুণা, মাতার সঙ্গীতানুরাগ পুত্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। সঙ্গীতে তিনি একাধারে ঔপপত্তিকসিদ্ধ (theoretical) ও ক্রিয়াসিদ্ধ (practical) দুই-ই। সঙ্গীতশাস্ত্রে যেমন তাঁর জ্ঞান আছে তেমনি ওস্তাদ বাঁশী বাজিয়ে হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর অনেক মৌলিক সুর-রচনা (Muscial composition) অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়ো, মাদ্রাজ কর্ত্তৃক বেতারে প্রচারিত হয়ে সঙ্গীতামোদী জনসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। সুশীলবাবু বলেন যে, সঙ্গীতের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ তাঁর ছবিগুলোতে মনের আরো একটু মাধুরী মিশিয়ে দিতে সহায়তা করে।

ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে সুশীলবাবু প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। চিত্রকলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি অনর্গল বলে যেতে পারেন। সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে চিত্রকলা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানার্জ্জন করা যাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি



শীতের সন্ধ্যা

তাদের শিক্ষাদান করতে, নিজের অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার তাদের নিকট উন্মুক্ত করে দিতে তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত। যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, এই তরুণ শিল্পীর প্রমুখাৎ শিল্প-ব্যাখ্যান শুনে তাঁরা চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিগত ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় Sushil Mukherjee—An Artist নামক প্রবন্ধে Wilfrid S. Lynch সুশীলকুমারের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন,

"Mukherjee has read wisely and widely on both Indian and European Art realising as few artists do that an understanding of the works and methods of past masters is an invaluable help in attaining ease of expression of his own emotions."

সুশীলবাবুর ছবিগুলি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এই ছবিগুলোর মধ্যে রেখা ও রঙের সুষ্ঠু সমন্বয়ে যে কল্পনা ও ভাবাবেগ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, তার আবেদন সরাসরি শিল্প-রসিকের মর্ম্মস্থলে পৌঁছে তার রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে। মালাবার দুহিতা নামক রঙীন উডকাট পদ্ধতিতে আঁকা ছবিটির অঙ্কন-শৈলী পরম চিত্তাকর্ষক, রচনার বলিষ্ঠতা এবং সুসঙ্গতি মনকে মুগ্ধ না করে পারে না। সবল অথচ সরল তুলীর টানে আঁকা রাঁচির দৃশ্য নামক ছবিটি নিসর্গ-চিত্রণে শিল্পীর অনন্যসাধারণ কুশলতার পরিচায়ক। লিনো-কাট পদ্ধতিতে আঁকা 'সখী-সম্মেলন' নামক ছবিটি রচনার আত্যন্তিক সরলতা এবং আন্তরিকতার জন্যে অনাড়ম্বর অথচ অনবদ্য শিল্প সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। শীতের সন্ধ্যা নামক ছবিটিতে রচনার সৌসাদৃশ্য প্রশংসনীয়। নিরঙ্কুশ ও সাবলীল তুলি চালনার দক্ষতার সঙ্গে মর্ম্মস্পর্শী বিষাদপরিম্লান পরিবেশ সৃষ্টি-ক্ষমতার সংমিশ্রণে এটি হয়ে উঠেছে একটি সার্থক সৃষ্টি। শীতের সন্ধ্যার রহস্যময় রূপটি শিল্পীর তুলির ডগায় কি অপূর্ব্ব মহিমায়ই না ফুটে উঠেছে। ছবিটি দেখলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে, "সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে।"

সুশীলকুমার এখনো অনতিক্রান্তযৌবন। কিন্তু এরই মধ্যে শিল্প-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে তিনি ধন্য হয়েছেন। তাঁর শিল্প-সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করলে মনে হয় যে, তাঁর ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। বৎসর তিনেক পূর্ব্বে Wilfrid Lynch এঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন,

"All who see his works will realise how far he has already got and what a fine future lies ahead of him."

অর্থাৎ—"তাঁর ছবি ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করলে সকলেই বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ সাফল্য তিনি এ পর্য্যন্ত লাভ করেছেন এবং কি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার জন্যে অপেক্ষা করছে।" আশা করি এই ভবিষ্যবাণী অচিরেই সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।*

* এই প্রবন্ধ রচনায়—

"Sushil Mukherjee—An Artist", by Wilfrid S. Lynch, (*Modern Review*, Feb., 1943); "Problems of Modern Artists in India and China", by O. C. Ganguly, (*M. R.*, Feb., 1946); "A Young Indian Sculptor", by Suniti Chatterjee, (*M. R.*, Feb., 1946).

এবং একটি অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনা থেকে সাহায্য পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-প্রীতি

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনিয়াছিলাম—অন্ধেরা হাতী দেখিতে আসিয়াছে। চোখ নাই, তাই হাত দিয়া হাতীকে উপলব্ধি করিল। কানে যাহার হাত পড়িল, সে ভাবিল, হাতীটা কুলোর মত। পায়ে হাত দিয়া আর একজন ভাবিল হাতীটা থামের মত। শরীরে হাত বুলাইয়া তৃতীয় ব্যক্তি মনে করিল হাতী পাঁচিলের মত। চক্ষুষ্মান আমরা অন্ধের হস্তী-দর্শন দেখিয়া হাসিয়াছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিরাট্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে, অনুভব করিতে, উপলব্ধি করিতে গিয়া এমনি ভাবেই দেখিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ প্রতিভা, সাহিত্যে তাঁহার বিপুল দান। তাহারই একটা সামান্য অংশ তাঁহার শিশু-প্রীতি। সেই প্রীতির যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা আলোচনা করিতে গিয়া তাই অন্ধের হস্তী-দর্শনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

বালক-কাল হইতে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া আসিতেছি, তবু মনে হইতেছে, তাঁহাকে দেখা আজও শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি বিরাট্। যেখানেই দৃষ্টি ফিরাই, সেইখানেই তাঁহাকে দেখিতে পাই। তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি দেশ-প্রেমিক, তিনি শিক্ষক, তিনি অভিনেতা, তিনি সত্য-দ্রষ্টা, তিনি শিশু-সাহিত্যিক। নানা বিশেষণের দ্বারা অভিহিত করিয়াও তাঁহার বিরাটত্বের পরিচয় দিতে পারিলাম কই। সে চেষ্টা করিবও না।

বাস্তব জগতে আমরা বাস করি। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে সামান্য স্বার্থের ঠেলাঠেলি হইতে অসামান্য কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া পাঁক ছিটাইয়া জীবনকে আবিল করিয়া তুলি। তাই আমাদের চোখের সামনে যে সুন্দর অহরহ বিরাজ করিতেছে, তাহাকে দেখিবার এবং উপভোগ করিবার অবকাশ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু যিনি কবি তিনি সুন্দরের পূজারী। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে আপনার আবেগে তাঁহার বাঁশী যখন বাজিয়া উঠে, তখন মানুষ অবাক হইয়া দেখে সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে পদ্ম বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। কবির সাধনা তখন সার্থক হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা বারম্বার তাহারই পরিচয় পাইয়াছি।

দুঃখ এবং বেদনাক্লিষ্ট এই জগৎ। ইহারই বুকের উপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া ছুটিতেছে, খেলিতেছে, ধূলা উড়াইতেছে, কাদা মাখিতেছে। ক্রীড়ারত শিশুদের দিকে তাকাইয়া কবি-হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। তিনি আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলেন,

> ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
> নন্দনের এনেছে সম্বাদ।

সত্যই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নন্দনের সংবাদ আনিয়াছে। নহিলে উহাদের প্রতি এত ভালবাসা কেন? উহাদের ভালবাসে না, এমন মানুষ দেখিতে পাই না। ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসা মানব-হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক গুণ। শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া সেই স্বাভাবিকতা পরিতৃপ্তি পায়, মাতার স্নেহ-চুম্বনে তাহা অপরূপ হইয়া উঠে, রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে তাহা চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্নেহ-বিগলিত দৃষ্টিতে দেখিলেন,

> জগৎ-পারাবারের তীরে
> শিশুরা করে খেলা।

খেলা করাই শিশুর প্রকৃতি। সে খেলা সকলেই দেখে এবং প্রীতও হয়। কিন্তু যিনি রূপকার তিনি তাঁর আন্তরিক প্রীতিকে রূপায়িত করেন অপরূপ রচনায়। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা তাহাই পাইয়াছি। আগত এবং অনাগত শিশুদের জন্য তিনি যে প্রীতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি তাঁহার অতুলনীয় ভঙ্গীতে জগৎ-পারাবারের তীরে ক্রীড়ারত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন,

> জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,
> জানে না জাল ফেলা।
> ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে;
> বণিক ধায় তরণী বেয়ে;
> ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
> সাজায় বসি ঢেলা।
> রতন-ধন খোঁজে না তারা,
> জানে না জাল ফেলা।

শিশুর যে চিত্র ফুটিয়া উঠিল, বাংলা-সাহিত্যে তাহার তুলনা মিলে না। শিশুকে এমন করিয়া আঁকিতে হইলে যে দৃষ্টি দিয়া তাহাকে দেখা প্রয়োজন, তাহা অনন্যসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ সেই অসাধারণ চোখে শিশুকে দেখিয়াছেন, গভীরভাবে তাহাকে ভালবাসিয়াছেন এবং কাব্যের অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়া শিশুর পরিচয় দিয়াছেন।

> একটি দস্যু ঘরে আমার
> না যদি রয় দুরন্ত
> কোনমতে হয় না তবে
> বুকের শূন্য পূরণ ত।
> দুষ্টুমি তার দখিন হাওয়া
> সুখের তুফান জাগানে,
> দোলা দিয়ে যায় গো আমার
> হৃদয়ের ফুল-বাগানে।

ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে শিশুর প্রতি প্রীতিতে প্রদীপ্ত কবি হৃদয়ের আলেখ্যখানি। ইহার প্রতি তাকাইয়া আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া যায়। কবি কিন্তু ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এমনিতর যে দুরন্ত শিশু, যার দুষ্টুমি দক্ষিণ বাতাসের মত মধুর, তার একটা নাম থাকা উচিত। কিন্তু একটা বিশেষ নাম রাখা ভাবনার কথা হইয়া উঠে। কারণ,

> নামের খবর কে রাখে ওর
> ডাকি ওরে যা' খুসি,
> দুষ্টু বল দস্যি বল
> পোড়ার মুখী রাক্ষুসি।

ভালবাসার দাবিই সবচেয়ে বড় দাবি। সেই দাবির জোরেই যা

খুসি নামে ডাকা চলিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহা বুঝে না, তাই হাসে। কবিকে তাই একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়,

একটি ছোট মানুষ, তাহার
একশো রকম রঙ্গ ত।
এমন লোককে একটি নামে
ডাকা কি হয় সঙ্গত?

মন সায় দিয়া বলে—সত্যই ত!

এমনিতর একটি ছোট মানুষ একশো রকম রঙ্গ করিয়া খেলিয়া বেড়ায়। ইহার সঙ্গে তাহার পায়ের নূপুর বাজিয়া উঠে। মা শ্রবণ ভরিয়া শোনেন। কবি মুগ্ধ হইয়া বলেন,

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি'
তোমার সাজনা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ধরায় নন্দনের সংবাদ বহিয়া আনিয়া জগৎ-পারাবারের তীরে খেলিয়া বেড়ায়, বিশ্ব-প্রকৃতি আকুল হইয়া ইহাদের নুপুর-নিক্কণ শোনে, সূর্য্য-চন্দ্র মুগ্ধ হইয়া ইহাদের সাজসজ্জা দেখে। শিশুরা নিখিল ভুবনকে আনন্দ পরিবেশন করে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিনিময়ে তাহারা কি পায়। কবি তাহার উত্তর দিয়াছেন,

ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে,
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্ত-দলে,
আষাঢ়ে নব নীরে,
আশীস্ আসি' পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে।

বিশ্ব-প্রকৃতির আশীস্-ধারায় অবগাহন করিয়া শিশু দিন দিন বড় হইতে থাকে। এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ দেখিয়া তাহার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। যে প্রশ্নটি তাহার মনকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয়, তাহা হইতেছে—"এলেম আমি কোথা থেকে?" শিশুর অস্ফুট মনের এই প্রশ্নটি কবি শুনিতে পান। মাতার নিকট শিশুর প্রশ্নটি কবির লেখনী-মুখে প্রকাশিত হয়,

এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?

মা খোকাকে বুকে বাঁধিয়া উত্তর দেন,

ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
ভোরে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।

সন্তান-বাৎসল্যে পরিপূর্ণ মাতৃ-হৃদয়ের একখানি নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এই কথাগুলির মধ্য দিয়া। শিশুকে সমস্ত অন্তর দিয়া না ভালবাসিলে এমন করিয়া মাতৃ-হৃদয় উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কারণ মা ও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা সম্ভব নয়।

মাকে অবলম্বন করিয়া শিশু জগতে আসে, মার পীযূষ-ধারায় পুষ্ট হয়, মার হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে শিখে, চলিতে শিখে। মাতৃ-স্নেহ তার জীবনের যাত্রা-শুরুর পথে প্রধান সম্বল। তাই মার নিকট শত আবদার এবং অসংখ্য প্রশ্ন। বলে,

একদিনো কি দুপুর বেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই?

কখনো বা মার সহিত তর্ক শুরু করিয়া দেয়,

রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হয় না কেন?

আবার অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মাকে প্রশ্নও করে,

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে!
তবে পাছে যাই মা উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে?

এমনিতর নানা প্রশ্ন করিয়া শিশু জগৎকে চিনিতে চায়, বিশ্বের সহিত তাহার কি সম্পর্ক তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করে, দেহের বৃদ্ধির সহিত মনের মধ্যে জানিবার যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে থাকে তাহা পরিতৃপ্ত করিয়া দেয়। শিশুর মন লইয়া যাহাদের কারবার, ইহা সেই বৈজ্ঞানিকদের কথা। শিশুর প্রতি প্রীতিতে পূর্ণ যাঁহার মন সেই কবি উপলব্ধি করিলেন সেই সত্যকে এবং তাহা রূপান্তরিত করিলেন কাব্যের অপূর্ব্বতায়।

দিনে দিনে শিশু বড় হইতে থাকে। দিনে দিনে পৃথিবীর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। তাহার স্বল্প জীবনে যেটুকু পৃথিবীর সহিত সে পরিচিত হয়, তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। উহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। সীমাকে ছাড়াইয়া অসীমের দিকে তাহার দৃষ্টি। স্ব আবেষ্টনীর বন্ধনে মন পীড়িত হইয়া উঠে। তাই গৃহের গণ্ডীর বাহিরে, পিতা মাতা আত্মীয় ও স্বজনের শাসন হইতে দূরে একটা অজানা জগৎ তাহাকে ডাকে। অন্তরে অন্তরে অনুভব করে সেই আহ্বান। সম্মুখের জনাকীর্ণ পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। অজানা রাজ্য হইতে অজানা লোক তাহার চোখের সমুখ দিয়া অজানা দেশে চলিয়া যায়। অজানার রহস্যময় অন্তরাল সরাইয়া দিবার বাসনায় শিশু ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহাই শিশুমনের চিরন্তন রীতি। তাই যখন সে দেখে চুড়িওয়ালা "চুড়ি চাই" "চুড়ি চাই" হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া যায়, তখন তাহার

ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে
এমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।

শুধু ফেরি করিবার সাধ জাগে তাহা নয়; আরও তার নানা সাধ যায়। ফুলবাগানে মালীকে কাজ করিতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হয়, যদি অমনিতর মালী হইতে পারিতাম। কারণ তাহার গায়ে কত ধুলা-কাদা লাগে, কেহই তাহাকে নিষেধ করে না, তাহার মা আসিয়া ময়লা ধুইয়া দিয়া সাফ জামা পরাইয়া দেয় না। নিজের খেয়াল-খুশিমত কাজ করিবার স্বাধীনতা তাহার মনকে অত্যন্ত নাড়া দেয়। রাত্রে পাহারাওয়ালা পাড়ায় পাড়ায় হাঁক পাড়িয়া বেড়ায়। তাহার দিকে তাকাইয়া শিশু ভাবে, তাহার মত সুখী লোক আর কে আছে! তাই তাহার পাহারাওয়ালা হইতেও সাধ যায়। আবার এক সময়ে নদীর বুকে নৌকা দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। উহার হালটি ধরিয়া বসিয়া আছে মাঝি। ঢেউয়ের তালে তালে দুলিতে দুলিতে রৌদ্রে এবং বৃষ্টিতে, ঝড়ে এবং তুফানে দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া চলিয়াছে আর চলিয়াছে। শিশুর চিত্তে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়। সে তখন মার কাছে আবদার ধরিয়া বসে,

মা যদি হও রাজি,
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

ক্রমে লেখাপড়া শিখিবার বয়স আসে। সে তখন মাষ্টার মশাইয়ের নিকট লেখাপড়া করিতে শুরু করে। শিশুর মন অনুকরণপ্রিয়। তাই সে একদিন তাহার ছোট বোন খুকীকে লইয়া শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হয়। কিন্তু ছাত্রী বড় বেয়াড়া, তাই ব্যর্থমনোরথ হইয়া মার কাছে অভিযোগ করে,

সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি, খুকী পড়া করো,
দুহাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে,
তোমার খুকীর পড়া কেমনতর ?

যাহাকে পড়িতে বলিলে বই ছিঁড়িতে বসে, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। তাই সে নূতন ছাত্রের সন্ধান করে। মনের মত ছাত্র পায় বিড়ালছানা। হাতে বেত লইয়া মাষ্টারী করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া ঘা-কয়েক বেত ছাত্রের পিঠে বসাইয়া দেয় না। সে মিছিমিছি বেত লয় এবং অশেষ ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষকতা করে,

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
আমি ওরে বোঝাই মা কত—
চুরি করে খাসনে কখনো
ভাল হ'স গোপালের মত!
যত বলি সব হয় মিছে
কথা যদি একটিও শোনে!
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না মনে!
চড়াই পাখীর দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে!
যদি বলি চ ছ জ ঝ ঞ
দুষ্টুমি করে বলে মিয়োঁ!

লেখাপড়া শিখিয়া এবং মাষ্টার মশাইয়ের অনুকরণে মাষ্টার মশাই সাজিয়া শিশুর শিক্ষা চলে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি আসে, খেলিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। সে তখন বলে,

মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।

পড়া-পড়া খেলার মধ্যে নূতনত্ব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাতে মন আকৃষ্ট থাকে, তারপর আর তাহা ভাল লাগে না, তখন আর একটা নূতন-কিছুর দিকে মন ধাবিত হয়। ইহাই শিশু-মনের প্রকৃতি। পড়িতে পড়িতে খেলিতে ইচ্ছা করে, খেলিতে খেলিতে গল্প শুনিতে সাধ জাগে। সে তখন মার কাছে ছুটিয়া আসে। বলে,

আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি,
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি।

দ্বারের কাছে এইখানে বোস
এই হেথা চৌকাঠ,
বল আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

মার মুখে সেই তেপান্তর মাঠের গল্প। সে কথা স্মরণ হইলে শৈশবের বিস্মৃত স্বর্গের একটি মধুর চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, তেপান্তর মাঠ অতিক্রম করিয়া, অজ্ঞাত রাজপুরীর মধ্যে রুপার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোনার কাঠির সাহায্যে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য রাজপুত্রের অভিযান। শিশুমনের অপরূপ কল্পনার সম্মুখে সে কাহিনী শৈশবে একদিন যে দ্যুলোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইঙ্গিতে আজ আবার তাহা অবারিত হইয়া যায়। আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে সেই স্বপ্নময় স্বর্গে। আবার তেমনি করিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,

আমি কেবল যাই একটিবার,
সাত সমুদ্র তের নদীর পার।

শিশু যেমন করিয়া কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যায়, তেমন করিয়া কল্পলোকে বিহার করিবার মন আমরা হারাইয়া ফেলি। শৈশবের স্মৃতি আমাদের মনে জাগে, কিন্তু যে প্রীতির দ্বারা অতীতের দিনগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে মাধুর্য্যের দ্বারা শৈশব-জীবন মনোহর হইয়া থাকিয়াছিল, সেই প্রীতি এবং মাধুর্য্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়া পড়ি। মাটির বুকে পদার্পণের সঙ্গে যে নন্দনের সংবাদ বহন করিয়া আনি, তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। কি যে আমরা হারাই তাহা আমাদের বোধের অতীত হইয়া পড়ে। সেই হারানো ধনের সহিত একদিন পরিচয় করাইয়া দেন কবি। আনন্দ এবং পুলকে বিগলিত হইয়া আমরা খুঁজিয়া পাই আমাদের সেই হারাইয়া-যাওয়া শিশু আমিকে আর শিশুমনের স্বর্গীয় দৃষ্টি দিয়া দেখা মহিমময়ী মাকে। শিশুর সেই জননী শুধু তাহার অবলম্বন নহে, সে তাহার খেলার সাথী এবং পূজার দেবী। তাই তাহার সহিত লুকোচুরি খেলিতে শিশুর সাধ যায়। মাকে বলে,

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি!

তাহা হইলে মা কি তাহাকে চিনিতে পারিবে? শিশু কেমন করিয়া বুঝিয়া ফেলে, সে যেমন করিয়া যেখানেই থাকুক না কেন মা যেন কি করিয়া তাহা জানিতে পারে। তাই ফুলের মত সুন্দর শিশু ফুলের রাজ্যে আত্মগোপন করিতে চায়। কিন্তু তাহার গোপনতা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সারাদিন ফুলের রাজ্যে ফুলের খেলা খেলিয়া সন্ধ্যাকালে মার কোলে ফিরিয়া আসিবার সময় হয়। তাই সে বলে,

সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল-ঘরে,
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ ক'রে যে পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।

এই যে মা, যাহার সহিত সে এমন করিয়া লুকোচুরি খেলিতে চায়, তাহার প্রতি গভীর আকর্ষণে সারা পৃথিবী ঢুঁড়িয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ ধন আহরণ করিয়া দিবার বাসনায় মন পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহারই আবেগে সে বলিয়া উঠে,

পরতে কি চাস্ মুক্তো গেঁথে হারে ?
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর পারে।

আবার কখনও বলে,

তার চেয়ে মা আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।

শিশু মাকে গভীরভাবে ভালবাসে। সেই ভালবাসা তার জীবনের এক অতুলনীয় সম্পদ। তাহারই জোরে সে মাকে লইয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী হইতে চাহে, আবার কখন বা তাহার শরীর-রক্ষী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে। মা পাল্কী চাপিয়া চলিয়াছে। প্রকাণ্ড মাঠের মাঝে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। অকস্মাৎ যমদূতের মত লোকেরা পাল্কী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। বেহারাগুলো ভয়ে পাল্কী ফেলিয়া পলাইয়া যায়। পালায় না শুধু খোকা। কি অসীম তাহার সাহস! সেই লোকগুলার সহিত একা খোকার কি ভীষণই না লড়াই হয়! লোকগুলো পারে না, হারিয়া পালায়। বিপদ কাটিয়া যায়। তারপর বেহারারা ফিরিয়া আসে। পাল্কী চাপিয়া মা খোকার সহিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। দেশসুদ্ধ লোক খোকার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এমনিতর একটা সত্য ঘটনা যদি ঘটিত, তাহা হইলে কি মজার ব্যাপারই না হইত! কিন্তু সত্য করিয়া ত আর উহা ঘটে না। মার প্রতি গভীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া খোকার মানসলোকে এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া মিলাইয়া যায়। সত্য হইয়া থাকে শুধু মার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এবং শিশুর অপূর্ব্ব কল্পনা। কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া রূপে এবং রসে অতুলনীয় হইয়া ইহার আলেখ্যখানি চিরন্তন হইয়া থাকে সাহিত্যে। আমরা মুগ্ধ হইয়া তাহার রস আস্বাদন করি।

মাতার প্রতি শিশুর যে অনুরাগ তাহা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়া কাব্যে রূপায়িত করিতে হইলে যে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির প্রয়োজন, যে অনুপম কল্পনা-শক্তির আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই অনুভূতি এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় এই ক্ষেত্রে যেমন পাইলাম, তেমনি আরও নানা ক্ষেত্রেই পাইয়া থাকি। শিশু আকাশের চাঁদ হাত দিয়া ধরিতে চায়। ইহাতে তাহার দাদা খোকাকে বোকা বলিয়া বিদ্রূপ করে। কারণ চাঁদকে যত ছোট বলিয়া খোকা মনে করে, উহা তত ছোট নয়, বরং বহুগুণে বড়। শিশু কিন্তু দাদার যুক্তি মানিয়া লয় না। তাহার বিরুদ্ধে সে এমন অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করে যে শুধু খোকার দাদা নয় সকলকেই সেই যুক্তির কাছে হার মানিতে হয়। খোকার দৃঢ় বিশ্বাস, মার চেয়ে আকাশের চাঁদ বড় নয়। সেই মা যখন নিকটতম হয়, তখন মার মুখখানা ত আর বৃহত্তম বলিয়া মনে হয় না। অতএব চাঁদ হাতের নাগালের মধ্যে আসিলে বড় হইবে কেমন করিয়া তাই খোকা তাহার বিজ্ঞ দাদাকে বলে,

মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নীচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড় কিছু।

মার চেয়ে চাঁদ বড় নয়, বিশ্বের কোন কিছু বড় নয়। তাই মাতার প্রতি শিশুর ভালবাসা অপরিসীম। সে তাহার কল্পনার সকল ঐশ্বর্য্য উজাড় করিয়া মাকে দিতে চায়, তাহাদ্বারা মাকে বন্দনা করিতে চায়। এইখানেই তাহার ভালবাসা নিঃশেষ হইয়া যায় না। দাদা এবং বাবার প্রতিও তাহার গভীর ভালবাসা। তাহাদের জন্যও সে কল্পলোক বিহার করিয়া এমন কিছু আনিয়া দিতে চায় যাহা পার্থিব জগতে মিলে না। তাই সে বলে,

দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া
পক্ষীরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।
বাবার তরে আনব আমি তুলি
কনক-লতার চারা অনেকগুলি ;
মা তোমারে দেব কৌটা খুলি
সাত রাজার ধন মানিক একটি জোড়া।

কোলাহল-মুখর ঈর্ষা-দ্বন্দ্বে-আবিল জগতে শিশু যে কি সম্পদ বেদনার্ত্ত জীবনে শিশু যে কি আনন্দ, লোভাতুর মানবের হিংস্র কুটিলতার মধ্যে শিশু যে কি স্বর্গ, শিশুর ভালবাসা যে সেই স্বর্গের কি অপূর্ব্ব দান, তাহারই অপরূপ পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। শিশুর প্রতি গভীর প্রীতি, মায়ের মত নিবিড় স্নেহ কবি-প্রতিভাকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছিল। তাই তিনি আগত এবং অনাগত সকল শিশুর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রীতি-মাখা আশীষধারা।

অচল শিখর ছোট নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে,
যত দূরে যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাক নাই থাক
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশীষ ঝরণা।

শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মা যেমন সকল দেবতার কাছে সকল মানবের কাছে শিশুর জন্য আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লয়, তেমনি করিয়া তিনি সকলকার নিকট সকল শিশুর জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন,

এই হাসি মুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ।
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ সার্থক হউক। সকল অন্তর হইতে আশীর্ব্বাদ উৎসারিত হউক। আজিকার আর্ত্ত পৃথিবীর বুকে আগত শিশু এই আশীর্ব্বাদ-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া অমৃতের অনুসন্ধিৎসু হইবার প্রেরণা লাভ করিবে।

সোনার খাঁচা

শ্রীকমল সরকার

বিকেলের ডাকে চিঠি এল। সামান্য তিন পয়সার পোষ্টকার্ড, কিন্তু খবরটা ভারি জরুরী। দিল্লী থেকে রাজেনবাবু লিখেছেন, শীগগিরই তাঁর আপিসে একজন লোক নেওয়া হবে। পাকা চাকরি, মাইনে আরম্ভ একশ চল্লিশ থেকে। বছর বছর দশ টাকা করে বাড়বে, যোগ্যতা থাকলে হঠাৎ লাফ দিয়ে বাড়বারও সম্ভাবনা আছে। ভেতরে ভেতরে তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন—শঙ্কর রাজী থাকলে যেন পত্রপাঠ দিল্লী রওনা হয়। সামনের সোমবার আপিসে একটা নামমাত্র ইনটারভিউ হবে, তাতে তার হাজির হওয়া চাই।

পিয়নের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বনলতা পড়ে ফেললে। পড়ে প্রথমেই তার মনে হ'ল, এখানে দু'বেলা তিনটে টুইশানি করে উনি পাচ্ছেন মোটে তিরিশ। সহরের বাইরে স্কুলের ছেলে পড়াতে দশ টাকার বেশী কেউ সহজে দেয় না। তিরিশের ওপর আরও একশ' দশ! এক বছর বাদে একশ' পঞ্চাশ। তার মানে এখনকার রোজগারের পাঁচ গুণ!...এখন মানুষটির সুমতি হলে হয়। চাকরির কথা এর আগেও কতবার উঠেছে এবং চাপা পড়েছে। চাকরীর ধাত যে সকলের নয়, বনলতা তা বোঝে। এক দিক দিয়ে দেখলে, এক্ষুণি যে টাকা রোজগারের জরুরী প্রয়োজন আছে তাও নয়। জমিজমার আয় আছে, ভাসুরের অবস্থাও সচ্ছল। একটা সংসার অক্লেশে চলে যায়। কিন্তু পুরুষমানুষ রোজগারের চেষ্টাই করবে না এ আর কে চায়? ভাসুরেরও তাই মনোগত ইচ্ছে ভাই রোজগারে মন দিক। তাছাড়া এই দু বছর হতে চলল বনলতার বিয়ে হয়েছে, এখনও তার নিজের সংসার বলতে কিছু নেই। একবার বাপের বাড়ী, একবার শ্বশুরবাড়ী—যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আলাদা থাকায় অবশ্য খরচ অনেক বেশী—বাড়ীভাড়া আছে, চাকরের থাকা, খাওয়া, মাইনে, চাল ডাল, দুধ, বাজার, ধোপা, নাপিত, কাপড় জামা, সব ঐ দেড়শ'র মধ্যে সামলাতে হবে। কিন্তু বনলতা তাতে ভয় পায় না। নিজের হাতে সংসার পড়লে টেনে কষে ও আশী নব্বই টাকায় মাস চালিয়ে দেবে। সংসার বলতে ত দুটি প্রাণী। কে জানে কেমন জায়গা দিল্লী। মনে মনে ভাববার চেষ্টা করতেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল কুতব মিনারের চূড়া আর হুমায়ুনের কবর, দেওয়ান-ই আম, দেওয়ান-ই-খাসের পলাতক ঐশ্বর্য। কত দিন আগে পড়া 'সরল ইতিহাসে'র ঝাপসা ছবিগুলো কল্পনায় রঙীন হয়ে উঠল।

'চিঠিটা কিন্তু চট ক'রে দেখান হবে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বনলতা পুবের ঘরে এসে আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিলে। জানালার দিকে মুখ ক'রে যে লোকটি কাজ করছিল তার হুঁশ নেই। হুঁশ করাবার যতগুলো প্রক্রিয়া আছে সবগুলো একে একে বনলতা প্রয়োগ করলে। আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির গোছা দু'বার কাঁধের ওপর ফেললে, এদিক ওদিক মিছিমিছি ঘোরাফেরা করলে, পরিষ্কার করে নিলে গলা। কিছুতেই কিছু হয় না দেখে শেষ পর্য্যন্ত ও শঙ্করের টুলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সামনে তাকিয়ে মানুষটিকে ডাকবার কথা আর খেয়াল রইল না। আকাশ রাঙিয়ে সূর্য্য পাটে নামছে, আর ঝাউগাছের ভেতর দিয়ে তার রশ্মি এসে পড়েছে মাটিতে। আলোয় ছায়ায় লুকোচুরি। গাছতলা পেরিয়ে সবে একটা গরুর গাড়ি চলে গেল, তার চাকার পিছু পিছু চলেছে মেঠো পথের ধুলো। কতক্ষণ নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল বনলতা, মনে জাগল সম্ভ্রম। তুলির আঁচড়ে এমন ছবি ফুটিয়ে তোলা যে কত বড় ক্ষমতার দরকার তা মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে।

শেষ পর্য্যন্ত কাঁধের ওপর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে শঙ্করের হুঁশ হ'ল। তুলিটা নামিয়ে রেখে বললে, তুমি!

যাক্, এতক্ষণে ধ্যান ভাঙল। তোমার নামকরণ করেছিলেন যিনি তাঁর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করি।

আমার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে তোমারও তপস্যায় বসা দরকার—পঞ্চতপা পার্ব্বতীর মত।

অত তাত সইবে না বাপু।

আচ্ছা, কন্‌সেশান দিলুম, একদিকে আগুন জ্বাললেই চলবে। যাও, কাঠের উনুনে দুটো ডালপালা জেলে জল চড়াও দিকি। ধ্যান নইলে পুরো ভাঙছে না।

এর নাম তপস্যা?

বল কি? গরমের দিনে উনুন-তাতে বসে স্বামীর জন্যে চা করা কি ধুনী জেলে জপতপ করার চেয়ে কম হ'ল?

হাসতে হাসতে বনলতা বেরিয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ বাদে চায়ের কাপ হাতে ফিরল। আঁচল দিয়ে ঠোঁটের নীচের ঘাম মুছে বললে, সত্যি, কি সুন্দর হয়েছে ছবিটা।

আমি ঠিক তার উলটো ভাবছি।

কি রকম?

মনে হচ্ছে কিছুই হয় নি, এটা একটা অক্ষম নকল। আসল ছবিটা যদি দেখতে তাহলে বুঝতে কোথায় তফাৎ।

আসল ছবি আবার কোথায় আছে?

এখানকার মিউজিয়ামে।

তোমার হেঁয়ালি কিছু যদি বুঝি।

কেন, ছবি দেখে জায়গা চিনতে পারছ না। এই তো খাল-ধারের ঝাউগাছটা, আর এইখান থেকে পথটা বেঁকে গিয়েছে গঞ্জের হাটে।

ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বনলতা বললে, ওমা, তাইতো—

এইজন্যে কাল বেলাবেলি বেরিয়ে পড়েছিলুম। অনেকক্ষণ বসে বসে একটা স্কেচ্ করে আনলুম, কিন্তু সাধ্যি কি আকাশের সে রঙ ছবিতে ফুটিয়ে তুলি।

শিল্পীর বিনয়! এ ছবি যে দেখবে সে-ই লুফে নেবে। কতবার তোমায় বলেছি ছবিগুলো কোথাও পাঠাও—

দাতব্য?

দাতব্য কেন হতে যাবে? উপযুক্ত মূল্যে।

হ্যাঁ, 'কাঞ্চন মূল্য' বলে লোকে যেমন হরতকী কিম্বা টাকা-সিকি দিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায় করে। নতুন আর্টিষ্টের কপালে টাকা নেই, বুঝলে ?

বনলতা দেখলে, এই সুযোগ।

আমি কিন্তু দেখছি, তোমার কপালে অনেক টাকা।

গণৎকারের কাছে আজকাল পাঠ নিচ্ছ নাকি ?

মুখে কিছু না বলে, বনলতা জামার ভেতর থেকে চিঠিটা বার করলে।

চিঠি পড়ে কেন জানি শঙ্কর চুপ করে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ নীরব থাকা চলল না। চিঠির ওপর চোখ থাকলেও শঙ্কর বুঝতে পারছিল সে কি মতামত দেয় জানবার জন্যে আর একটি কাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। হাসি পেল শঙ্করের। মনের কথাটা পরিহাসের ভঙ্গীতে বললে, তুমিও যেমন, দেড়শ টাকার জন্যে হাজার মাইল দূরে চাকরি করতে যাওয়া পোষায় কখনও ?

ঠিক এই আশঙ্কাই বনলতা করছিল। কিন্তু তবু আশা-ভঙ্গের চিহ্ন ওর মুখে এমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে শঙ্করের নজর এড়াল না। কথাটাকে হাল্‌কা করার মতলবে বললে, দেশের জমিতে শঙ্করবাবু এই তো দিব্যি শেকড় চালিয়েছেন। আবার তাকে জড়িয়ে উঠেছে বনের এক লতা। স্থান পরিবর্তন করতে গেলে যে শেকড়সুদ্ধ ওপড়াতে হবে।

সে তো একদিন না একদিন হবেই। এখন না হয় একসঙ্গে চলে যাচ্ছে, কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের আলাদা থাকতে হবে তখন—

তা বটে। দাদা ফিরেছে ?

এই এলেন বোধ হয়। জুতোর শব্দ পেলুম।

আচ্ছা যাই, দাদাকে খবর দিয়ে আসি।

চিঠিতে একবার চোখ বুলিয়ে দাদা বললেন, এ আর জিজ্ঞাসা করতে। যা বলিস, জেলে ঠেঙানোর চেয়ে সরকারী আপিসের কাজে খাতির অনেক বেশী। তাছাড়া মাইনে যখন এত বেশী দেবে। তুই আর হুঁমত করিস্ নে। কালই রাজেন বাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে দে। একেবারে বিদেশবাসী হবি এই এক মনে 'কিন্তু কিন্তু' লাগছে। কিন্তু আগে তোর ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ! এই ভবিষ্যৎ নিয়ে কত জল্পনা শঙ্কর করেছে, কত ছবি এঁকেছে। একবার সে কোট-প্যাণ্ট-হ্যাট-বুট চড়িয়ে একটা আপিস ঘরে ঢুকে বসবার চেষ্টাও যে না করেছে তা নয়। সে ঘরটায় জানালার বালাই নেই, বাইরেটা দেখা যায় না, কিন্তু মাথার ওপর বিদ্যুদ্‌গতিতে ফ্যান ঘুরছে। দিনের আলো নিষ্প্রভ, কিন্তু একশ' পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব চোখ রাঙিয়ে আছে। দেয়ালের গায়ে দু'মানুষ উঁচু লোহার র‍্যাক। তার ওপর সারি সারি রাশি রাশি কাগজের বাণ্ডিল। নীচে সারবন্দী টেবিলের আড়ালে মানুষগুলো হারিয়ে গিয়েছে। সে টেবিলগুলোর সামনেটা জুড়ে কাগজ রাখবার খোপ। খোপের ভেতরে কাগজ, ওপরে কাগজ, লাল নীল লেবেল-আঁটা ফাইল, রেজিষ্টার, লেজার বই। শঙ্কর সবে একটা টেবিল দখল করে বসতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে মুক্ত জীবনের একটা দমকা বাতাস এসে তার কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে গেল।—আপিস-জীবনের যে ছবিটা সে আঁকতে গিয়েছিল সেটা আঁকা হ'ল না, সে ছবির রংই তার মনে ছিল না।

যে রঙ আছে তা জমাট বাঁধে না, তরল আনন্দে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে অনেক বড় জায়গা জুড়ে। রাঙায় আকাশ, রাঙায় মানুষ। তারপর মনের রঙ এসে ধরা দেয় ছবিতে।......ভাল কথা মনে পড়ল, তিনখানা ছবিতে এখনও রঙ দেওয়া বাকী, ক'দিন থেকে পড়ে রয়েছে। আরও দুখানা মনে মনে আঁকা হয়ে গিয়েছে, শুধু কাগজে তোলবার অপেক্ষা। কাল ভোরবেলা যদি বসা যায়—

তা দূর বটে, কিন্তু দিল্লী থাকবার মতন জায়গা। স্বাস্থ্য ভাল, মাছ দুধ তরিতরকারি বাংলাদেশের চেয়ে শস্তা। গরম কাপড়ের খরচা অবশ্য আছে, তা সেও তো ঐ একবার।

দাদার কথায় শঙ্করের চমক ভাঙল। এঁরা মনে মনে একরকম ঠিক করে নিয়েছেন যে সে দিল্লী যাচ্ছে। নেবারই তো কথা। আজকালকার বাজারে অনায়াসে মোটা মাইনের চাকরি পাওয়া লটারীতে বিশ-পঞ্চাশ হাজার পাওয়ার বেশী। কপালে মোটা হরফের পাকা লেখন না থাকলে হয় না। সকলে যেটা ভাল বলে বুঝছে, শঙ্করকে তা বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে এতেই পৌরুষে আঘাত লাগে। এক মুহূর্তে মন ঠিক করে নিয়ে শঙ্কর বললে, বেশ তো, তোমাদের সকলের যখন মত আছে কালই রওনা হয়ে পড়ি।

কাল কেন রওনা হতে যাবি ? এখনও তো বুধ, বেস্পতি, শুক্কুর, শনি, রবি—পাঁচ দিন সময় হাতে।

না, আগে যাওয়া দরকার। কলকাতায় জিনিষপত্র কিনতে এক দিন লেগে যাবে।

তাই বলে চার দিন আগে যাবি ? আবার কতদিনে আসবি তার তো ঠিক নেই। থেকে যা না দুটো দিন।

না দাদা, তুমি আর অমত ক'র না। দিল্লী পৌঁছে বাড়ী-ঘর-দোরের ব্যবস্থা আছে, আপিসের ব্যাপারও রাজেনবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। কালই যাবার বন্দোবস্ত করি।

বিদেশযাত্রার আগে হাজারটা গোছগাছ। বনলতার হাতে-পায়ের একেবারে ফুরসত নেই। কোমরে আঁচল জড়িয়ে এঘর থেকে ওঘর যাচ্ছে, ভারী বাক্স টেনে নামাচ্ছে জড়ো করছে খুচরো জিনিষের স্তূপ। যেন এক দিনে ওর দশ বছর বয়স কমে গিয়েছে। শ্রমক্লান্ত রাঙা মুখ, কপালে ঘামে-ভেজা চুল। দেখে খুশী হবার কথা। কিন্তু যে চোখ এই দু'বছর তাকে নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে তার মালিকই শুধু নির্বিকার মুখে বসে রইল। একবার কাজের ফাঁকে শুধু বললে দিল্লী যাবার নামে খুশী যে ধরে না।

ইঙ্গিতটা না বুঝে বনলতা সহজভাবে বললে, বাঃ এমন ভাল কাজ হ'ল খুশী হব না ?

কথাটা হয়তো মন থেকে বলা। কিন্তু শঙ্কর ভাবলে এই হঠাৎ খুশীর ঝলকানি কেন ? এর আড়ালে কি চাপা একটা লোভ নেই ? কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে। ছি, ছি, এ সব কি ভাবনা! টাকার দরকার শঙ্করের না থাক সংসারের আছে। এত বেশী আছে যে জীবিকার কাছে জীবনের দাবি কখনই আমল পায় না। জীবন নিয়ে যারা

মাতামাতি করতে গেছে, তারা সকলেই ঠকেছে। কত শিল্পী, কত গুণীকে তার সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য পণ্যদ্রব্যের মত মেলে ধরতে হয়েছে—তাও এমন ক্রেতার কাছে যার রসবোধ নেই। যা অমূল্য তা জলের দরে বিকিয়ে কেনা হয়েছে চাল, তেল, কয়লা। পৃথিবী এমন স্থানই নয় যেখানে আপনার খেয়ালে, আপন আনন্দে, নিজের যা ভাল লাগে তাই নিয়ে থাকা যায়। আপিস আদালত, দোকান, বাজার, ফ্যাক্টরী পথ ঘাট মাঠ—কোথায় না লোক পাগলের মত কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে অবসর কোথায় নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের, সময় কোথায় ছবি এঁকে, গান গেয়ে, গল্প লিখে সময় নষ্ট করবার? তার চেয়ে ঢের বেশী দরকারী সরকারী আপিসের কাজ। সেখানে কোটি কোটি টাকার বাজেট হচ্ছে, লাখ লাখ টাকার স্কীম তৈরি হচ্ছে। সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য—এমন সমস্যা নেই যা নিয়ে না নাড়াচাড়া হচ্ছে। সেখানে সারা দেশের আইন গড়ছে, ভাঙছে, বদল হচ্ছে। এমন যে সব আপিস, তার ভাউচার পরীক্ষা করতে, টেণ্ডার সর্ট করতে, টাইপ করে আর ড্রাফ্‌ট লিখতে লিখতে যদি এক শিল্পীর জীবন কেটে যায়, থেমে যায় তার তুলি তাতে কি এল গেল? রাজধানীর জীবনে কোথায় ভেসে যাবে আজকের এই ছবি আঁকার শখ, কোথায় থাকবে সৌন্দর্য্যপিপাসা! দপ্তরে নাম লেখাবার সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয়ের ওপর বসবে পাহারা। শুধু বাঁধা বুলি দিনের পর দিন কাগজের পর কাগজে লিখে যাওয়া, শুধু হিসেব আর অঙ্ক। শোনবার মধ্যে ওপরওয়ালার গর্জ্জন, দেখবার মধ্যে লাল নীল তকমা আঁটা কাগজের বাণ্ডিল। এই হ'ল সরকারী খাঁচা আর এরই মধ্যে থেকে খুঁটে নিতে হবে দানাপানি।

রাজেনবাবুকে অপ্রস্তুত হতে হয় নি। শঙ্কর যথাসময়ের আগে সস্ত্রীক দিল্লী পৌঁছল, যথাসময় তার নামধাম দপ্তরের খাতায় টোকা হ'ল, পে-বিলে উঠল নাম। পৃথিবীতে কোনও কিছুতেই কারও আটকায় না। শঙ্করেরও দিনের পর দিন কাটতে লাগল, মাস কাবার হ'ল, মাসের পর বছর। এমনি ভাবে দু'বছর কাটবার পর এক দিন—

আপিস থেকে শঙ্কর বাড়ী ফিরল তখন সন্ধ্যে প্রায় সাতটা। সাইকেলের ঘণ্টা শুনে বনলতা দরজা খুলে দিলে।

আজ না তোমার তাড়াতাড়ি ফেরবার কথা। কখন থেকে জামাকাপড় বদলে তৈরি হয়ে আছি।

মেরে ফেললে খাটিয়ে খাটিয়ে। আবার সঙ্গে এনেছি এক বোঝা।

আগেই বনলতার চোখ পড়েছিল, সাইকেলের কেরিয়ারে সাত-আটটা ফাইল।

দশটা সাতটা করে এসে আবার ঐ ফাইল নিয়ে বসবে! এবার থেকে আপিসেই কেন ঘর বাঁধো না! আমার কথা ছেড়ে দিই, পুরোনো হয়ে গিয়েছি, সারা দিনে দু'পাঁচটার বেশী কথা কওয়ারও ফুরসত তোমার নেই। এতো যে ছবি আঁকার শখ ছিল তা গেছে। তা না হয় যাক কিন্তু সন্ধ্যেবেলাটাও একটু বিশ্রাম নেবে না, বেড়াতে যাবে না, এতে শরীর টিকবে কি করে?

কথাগুলো শঙ্কর নীরবে হজম করলে। তারপর টাই খুলতে খুলতে বললে, অভিযোগ শিরোধার্য্য করলুম কিন্তু খিদেয় যে প্রাণ যায়।

মুখহাত ধোও, খাবার তৈরি আছে। বলে বনলতা চাকরকে হাঁক দিয়ে চায়ের জল চড়াতে বললে।

চায়ের কাপ শেষ করেই শঙ্কর বললে, কই, চল।

কোথায়?

কেন, বেরবে না?

কি দরকার কাজের ক্ষতি করে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবার?

আমি কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুত, ফিরে এসে স্যুট ছাড়ব।

অগত্যা না গিয়ে উপায় নেই। বনলতা স্লিপারটা পরে এল।

রাস্তায় নেমে শঙ্কর বললে, এখন কত ডিগ্রী?

কিসের কত ডিগ্রী?

না, বলছিলুম রাগটা নর্ম্যালে নেমেছে কিনা।

বনলতা হেসে ফেললে। তারপর বললে, যাই বল আর কর, বাড়ীতে ফাইল আনা তোমার এক বদ্‌অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সারাদিন আপিসে খাটবে, আবার বাড়ীতেও নিস্তার নেই, এ ত ভাল নয়।

কি জান, যে কাজ করতেই হবে তা মন দিয়ে করা ভাল। তাছাড়া পরিশ্রমের একটা মূল্য আছে—

ছাই মূল্য, খাটিয়েই শুধু নিচ্ছে, মাইনের বেলা ত—

খবরটা দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে শঙ্কর বলে ফেললে, মূল্য আমিও কিছু পাব বলে যেন মনে হচ্ছে।

আপিসে বুঝি? আগ্রহে বনলতার চোখ চকচক করে উঠল।

নাঃ, সে এমন কিছু নয়।

বলতেই হবে, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বনলতা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু এখন যেন কাকপক্ষী না টের পায়। আপিসে একটা নতুন সেকসান খোলা হয়েছে, আমাকে তার সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্ট করছে। কাল পরশুর মধ্যে অর্ডার বেরুবে শুনে এলুম।

এই খবর এতক্ষণ তুমি চেপে আছ। হাঁ গো, কত দেবে?

আন্দাজ কর না।

আমি মাইনের কি জানব?—তারপর সসঙ্কোচে, 'দুশো'।

আর একটু ওঠো।

আড়াইশো?

উঁহু, আরও একটু।

আরও? তিন-শ বুঝি?

সাড়ে চার-শ।

এক মুহূর্ত বনলতা নিস্তব্ধ। তারপর উৎসাহে, আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল। সত্যি? সেইজন্যে বুঝি—আমি ঠিক জানতুম—। পরের মাস থেকেই সাড়ে-চারশ করে পাবে তো?

হাসিমুখে শঙ্কর জানালে, তাই। মনে মনে অঙ্কটা কষে

একবার আবৃত্তি করে নিলে—সাড়ে চারশ। কতদিন থেকে ভাবছে একসেট সোফা সেট আর কয়েকখানা ভাল বেতের চেয়ার কিনবে, এখন আর না কিনলেই নয়। আপিসের লোকজন এখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাড়ী আসবে যাবে, চাপরাশীগুলো আসবে ফাইল নিয়ে। বাড়ীটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখলে তাদের কাছে মান থাকে না। সোফা পাততে গেলে সতরঞ্চি, কার্পেট দরকার। দরজা জানলাগুলোয় ভাল পর্দা নেই, ম্যাণ্টলপীসটা খালি পড়ে রয়েছে। মোরাদাবাদী ফুলদানি একজোড়া কি পামগাছ রাখবার একটা পট কেনবারও এতদিন ভরসা হয় নি। ছোটখাট কত কোয়ার্টারে রেডিও রয়েছে, বনলতার ভারি শখ তাদেরও একটা নেওয়া হোক। অল-ওয়েভ না হোক, অন্ততঃ লোকাল সেট তা সেও না হয় ধীরে সুস্থে হবে, কিন্তু দু একটা ভাল সুট তো এখনি না করালেই নয়। আপিসে সায়েবসুবো অনবরত সেলাম দেয়, সস্তা ছিটের প্যাণ্ট পরে অফিসারের ঘরে যেতে ভারি লজ্জা লাগে। সেদিন শঙ্কর চাঁদনীর চকে একটা কাপড় দেখে এসেছে, কি সুন্দর যে তার রঙটা।...

বনের পাখী এতদিনে সোনার খাঁচা চিনল।

নবীনচন্দ্রের দর্শন, ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব

শ্রীরমা চৌধুরী

সুভদ্রা-চরিত্র

চরিত্রাঙ্কনে মহাকবি নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা সকলেই জানেন। বিশেষভাবে, তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক। এই সব চরিত্রের মাধ্যমিকতায়, নবীনচন্দ্র দর্শন, ধর্ম ও নীতির বহু উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করে গেছেন। নবীনচন্দ্রের রচিত "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" এবং "প্রভাস" এই "নব মহাভারতত্রয়" সত্যই বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব বস্তু। "নব মহাভারত" এই নামকরণ সার্থক হয়েছে, কারণ এই মহাকাব্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা প্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীচরিত্র অবলম্বনে রচিত হলেও, এর ঘটনাবলী ও চরিত্রাঙ্কন বহু স্থলেই সম্পূর্ণ মৌলিক। শৈলজা ও সুলোচনা নারী-চরিত্র দুটি নবীনচন্দ্রেরই নিজস্ব সৃষ্টি, কারণ মহাভারতাদিতে এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্জুন-পত্নী সুভদ্রার চরিত্র অঙ্কনেও নবীনচন্দ্র যথেষ্ট মৌলিকতা দেখিয়েছেন। সুভদ্রা চরিত্রের যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা মহাভারত থেকে মাত্র আভাসে-ইঙ্গিতেই জানতে পারি, নবীনচন্দ্র তাঁর অপূর্ব রচনাশক্তি প্রভাবে সেই সব দিকই অতি জ্বলন্ত, জাগ্রত ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি সুভদ্রাকে অন্যান্য বহুদিক থেকেও ফুটিয়ে তুলেছেন যা মহাভারতে আমরা পাই না। সেজন্য নবীনচন্দ্রের সুভদ্রাকে একটি মৌলিক চরিত্র বললেও খুব ভুল হবে না।

সুভদ্রা-চরিত্র সত্যই নবীনচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থেরই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য "কুরুক্ষেত্র" থেকেই কেবল সুভদ্রা-চরিত্রের একটি-মাত্র দিক সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবারই চেষ্টা করব। সেটি তাঁর জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলা, দার্শনিকা ও সত্যদ্রষ্ট্রী ঋষি মূর্তি। এই থেকে আমরা কবির নিজের দর্শন, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় মতবাদের বিষয়ে বহু কথা জানতে পারি। সুভদ্রা সকল শাস্ত্র-পারঙ্গমা ছিলেন, এবং সুযোগ পেলেই তিনি অপর সকলকে দর্শন, ধর্ম ও নীতির নিগূঢ় তত্ত্বগুলি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। পুত্র অভিমন্যুকে তিনি স্বয়ং দর্শনশিক্ষা দিয়েছেন, এই চিত্র আমরা "কুরুক্ষেত্রে" পাই। কবি বলেছেন—

"সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্মতত্ত্বরাশি,
নিত্য, সত্য সনাতন, ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি।"

সুভদ্রার মুখ দিয়ে কবি দর্শনের যে মূলতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন তা সংক্ষেপে এই :

একমেবাদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। তিনি অব্যক্ত হয়েও বিশ্বে পরিণত হন, সেজন্য বিশ্বই তাঁর মূর্ত্তরূপ। এ স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি, কেন এরূপে বিশ্বে পরিণত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন? তার উত্তর এই যে, এ তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতি। স্বভাব বশেই তিনি বিশ্বসৃষ্টি করেন, কোন অভাব মেটাবার তাগিদে নয়, কোন বলবত্তর পুরুষ বা শক্তির ভয়ে বা আদেশে নয়।

"অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম,
অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্বসৃজন।"

প্রলয়ের পরে সর্বভূত ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে তাঁরই সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে, এবং তাঁরই প্রকৃতি পায়। সৃষ্টির সময়ে তাদের আবার নূতন সৃষ্টি হয়। এই ভাবে ক্রমাগত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে চলেছে।

এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, পরম করুণাময় ভগবানের রাজ্যে এরূপ লয় হবে কেন? কল্পপ্রলয়ের কথা বাদ দিলেও, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চতুর্দিকেই আমরা ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখতে পাই। এই নির্মম সংহার মঙ্গলময়ের বিধানে থাকবে কেন? দর্শনশাস্ত্রের একটি প্রধান প্রশ্ন ও সমস্যাই হ'ল এই—ভগবানের অনন্ত করুণার সঙ্গে তাঁরই সৃষ্ট জগতের অনন্ত দুঃখের সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব কি করে? কিন্তু কবির কাছে এ সমস্যা সমস্যাই নয়, কারণ তিনি জগদীশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী। ঈশ্বর যে মানবের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁর বিধানে যে অন্যায়, নিষ্ঠুরতা ও অমঙ্গলের লেশমাত্র নেই—এই বিশ্বাস যদি আমাদের থাকে, তাহলে জগতের আপাতদৃষ্ট অমঙ্গল, অন্যায় ও দুঃখ শোকেরও

ধর্মসঙ্গত কারণ খুঁজে পেতে আমাদের দেরি হয় না। পরম-বিশ্বাসী কবিও সেজন্য সুভদ্রার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন—

"নহে নির্দয়তা বৎস। ধ্বংসনীতি দয়াধার
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার।"

জগতের মঙ্গলের জন্যই ধ্বংসের অত্যাবশ্যকতা। যদি জগতে মৃত্যু না থাকত, তাহলে অন্নাভাবে, স্থানাভাবে জীবদের কি দশা হ'ত, তা কল্পনা করা যায় না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ না থাকত, তাহলে অধর্মের অভ্যুত্থানে জগৎ মহাশ্মশানে নিশ্চয় পরিণত হ'ত। যদি লোভীকে, পাপীকে, অত্যাচারীকে বিনষ্ট করা না হ'ত, তাহলে বিশ্বরাজ্য ত নরকই হয়ে দাঁড়াত। যদি বিষবৃক্ষ উৎপাটিত ও দাবানল নির্বাপিত করা না হ'ত, তাহলে সুরম্য বনের কতটুকু থাকত অবশিষ্ট? সেজন্য মৃত্যু, হত্যা, ধ্বংস—এসব সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, এদেরও প্রয়োজনীয়তা ও মঙ্গলময়ত্ব আছে।

"সর্বভূতহিত তরে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা নয়;
দগ্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়াময়।"

সুতরাং পৃথিবীর দুঃখশোকের জন্য ভগবানকে নিষ্ঠুরতা দোষে দোষী করা আমাদের অজ্ঞানতারই ফলমাত্র। জীবের কল্যাণের জন্যই ঈশ্বর মুহূর্তে মুহূর্তে সংখ্যাতীত ধ্বংস ও সংখ্যাতীত সৃষ্টি করছেন—এই ভাবেই জগতের স্থিতি সাধিত হচ্ছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সবই তাঁর মঙ্গলবিধানেরই ফল।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই মহান্ বিশ্বস্রষ্টাকে আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানব জানতে পারি কি করে? কবির কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা ভয় নেই, তিনি জানেন যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে জানবার একটি অতি সহজ উপায় আমাদের হাতে আছে—সেটি ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎকে জানা। জগৎ ব্রহ্মের কার্য, পরিণাম, মূর্তরূপ। অতএব জগৎকে জানলেই জগদীশ্বরকে জানা হয়। সেজন্য সুভদ্রা বলছেন—

"জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার
বিশ্বভিন্ন নাহি বৎস। সোপান দ্বিতীয় আর।"

অবশ্য বিশ্বকে জানা অর্থ, এর প্রকৃত রূপ, প্রকৃত সত্যকেই জানা, এর প্রত্যেক ব্যাপারের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা। নয় ত, চিন্তা না করেই জগৎ থেকে জগদীশ্বরের ধারণা করার চেষ্টা করলে, তিনি যে নির্দয় নিষ্ঠুর এই সিদ্ধান্তেই আমরা প্রথমে পৌঁছাই। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তাঁর শাশ্বত মঙ্গলময়, সৌন্দর্যনির্ঝর রূপটি সকল অমঙ্গল ও কুশ্রীতার মধ্যেও আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে।

জগদীশ্বর স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। সেজন্য জগতের উচ্চাবচ সব বস্তুই ব্রহ্মময়, মানুষে মানুষে ভেদ নাই। সেইজন্য সুভদ্রা সুলোচনাকে বলছেন—

"এক ভগবান্ সর্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?"

এ স্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি সব বস্তুই, সব মানবই একই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়, তাহলে আর্য্য ও অনার্য্য, পণ্ডিত ও মূর্খ, পুণ্যবান্ ও পাপীর ভেদ কি মিথ্যা? কবির মতে এই সব ভেদ মিথ্যা নয়, কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্যও নয়। একই বস্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রূপেই প্রকাশ লাভ করে, কিন্তু যদি এই সব স্থান-কাল-পাত্রের ভেদ দূর করা যায়, তাহলে বস্তুর আর ভেদ রইল কই? যেমন, একই জল নদীতে নির্মল, সরোবরে পঙ্কিল। নির্মল জলে ও পঙ্কিল জলে ভেদ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু পঙ্কিল জলের নির্মল হয়ে নির্মল জলের সঙ্গে এক হতেও ত বাধা নেই। একই ভাবে, আমাদের নিজেদের কর্মফলানুসারেই আমরা উচ্চনীচ ভাবে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু পুনরায় আমাদের কর্ম দ্বারাই উচ্চ নীচ বা নীচ উচ্চ হতে পারে। সেইজন্য অনার্য্য কন্যা জরৎকারু যখন ক্ষোভ করে বললেন—

"কিন্তু আমি নারী অনার্য্যা; আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যার!
পশুপক্ষী যেই দয়া পায় আর্য্যদের কাছে,
আমরা অনার্য্যা নাহি পাই বিন্দু তার"—

তখন—

"না বোন! অনার্য্য আর্য্য"—কহিতে লাগিলা ভদ্রা—
"একই পিতার পুত্র-কন্যা সমুদয়।
এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ সকলের
এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাশয়।
স্থানভেদে, কালভেদে, কর্মভেদে জন্মে জন্মে,
কোথায় পঙ্কিল জল, কোথায় নির্মল।
সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা কর্মে
কর অপনীত, হবে যে জল সে জল।"

পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান যদি এই ভাবে প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জীবেই নিহিত থাকেন, তাহলে সেই সেই বস্তুর অসম্পূর্ণতা, সেই সেই জীবের পাপপুণ্য, কর্মফল কি তাঁহাকে কলুষিত করে না? তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলে সর্বভূতে অবস্থিত থেকেও স্বয়ং নির্লিপ্ত ও নির্বিকারই থাকেন। সুভদ্রা অভিমন্যুকে উপদেশ দিচ্ছেন—

"নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্বব্যাপী সর্বগত
আকাশ যেমন,
সর্বদেহে অবস্থিত নির্বিকার পরমাত্মা
নির্লিপ্ত তেমন।"

সুভদ্রার মুখ দিয়ে নবীনচন্দ্র যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন তা সংক্ষেপে এই:—ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকারী। তিনি সুখের সঙ্গে দুঃখেরও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু দুঃখের প্রয়োজনও সুখের চেয়ে কম নয়। সুতরাং রুদ্র হয়েও তিনি শিব। জগৎ তাঁহার প্রতিচ্ছবি বলে, জগতের মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে জানতে পারি। তিনি জাগতিক সকল বস্তুর প্রাণস্বরূপ, অন্তরাত্মা বলে সকলেই স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, যদিও কার্যতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্ন। জগল্লীন ও অন্তর্যামী হয়েও পরমব্রহ্ম স্বয়ং নির্বিকার ও নিরঞ্জন।

এখন নবীনচন্দ্রের ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সুভদ্রা কেবল দার্শনিকা ছিলেন না, ধর্ম ও নীতি-কুশলাও ছিলেন, এবং তাঁর মুখ দিয়ে নবীনচন্দ্র ধর্ম ও নীতি-

তত্ত্বের এক সুমহান্ আদর্শের প্রচার করেন। "ধর্ম" কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সুভদ্রা বলছেন "ধর্ম স্বধর্ম পালন।" প্রত্যেক জীবেরই নির্দিষ্ট কার্য, কর্তব্যকর্ম আছে। পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী হলেও, জীবই কর্মকর্তা, ঈশ্বর নহেন। প্রত্যেক জীবেরই স্বভাব, স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, এবং সেই স্বভাব অনুসারেই জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেমন স্বয়ং ভগবান স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্মে প্রবৃত্ত হন, সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে জীব-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করেন সেরূপ মানবেরও নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে পালন করা উচিত। এই হ'ল জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সুভদ্রা পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন :—

"স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্ম্মসাধন
মানবের একমাত্র মহাধর্ম্ম সনাতন।"

এই নিষ্কাম কর্মসাধন বা স্বধর্ম পালনের কথা কবি বারংবার সুভদ্রার মুখে প্রপঞ্চিত করেছেন। তিনি পুত্রকে বলছেন যে, সংসার সরসীতে পদ্মপত্রে জলের মতই থাক, অর্থাৎ সংসারে থেকেও সংসারাসক্ত হয়ো না; মনটিকে সম্পূর্ণ নিষ্কাম রাখ, সর্ব কর্ম ব্রহ্মেই সমর্পণ কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে। বাসনা-কামনাই অশান্তির মূল কারণ। সেইজন্য সুভদ্রা জয়ৎকারুকে বলছেন—

"হৃদয় হইতে এই করাল কামনা ছায়া
মুছে ফেল, পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার।
তুমি আমি কে আমরা? যিনি করিলেন সৃষ্টি
তিনি করিলেন পূর্ণ কামনা তাঁহার।"

ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়ে নিজের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত করছেন। নিষ্কাম ভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করাই স্বধর্ম পালন। যথা, ক্ষত্রিয়কে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য। সেজন্য সম্পূর্ণ স্বার্থহীনভাবে জগৎ রক্ষাই হ'ল ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বা পরম ধর্ম—প্রয়োজন হলে ধর্ম যুদ্ধে খড়্গ ধারণ করতেও ক্ষত্রিয়ের বিমুখ হওয়া অনুচিত। যুদ্ধ-বিমুখ অভিমন্যুকে সুভদ্রা বলছেন—

"বীরত্ব প্রকৃতি তব, স্বধর্ম্ম যুদ্ধ তোমার,
ধর্ম্ম যুদ্ধ হতে শ্রেয়: ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।"

পুরুষের স্বধর্ম যেমন যুদ্ধ, নারীর স্বধর্ম তেমনি আর্তসেবা। এই কথা নবীচন্দ্র "নারীধর্ম্ম" নামে তৃতীয় সর্গে অতি সুন্দরভাবে বলেছেন। এই সর্গে আমরা সুভদ্রাকে দেখি অক্লান্ত সেবিকা, মমতাময়ী নারীরূপে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে একাদশ দিন ধরে তিনি সমানে অহোরাত্র শিবিরে শিবিরে ঘুরে আহতদের শুশ্রূষা করে বেড়াচ্ছেন—অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর মুখ মলিন বিবর্ন, চক্ষু কোটরগত, কেশভার ধূলায় ধূসর, তবু তাঁর সেবায় বিরতি নেই। তাঁর প্রিয় সখী সুলোচনা এই নিয়ে তাঁকে তিরস্কার করলে সুভদ্রার মুখ দিয়ে কবি যে সুপবিত্র, মহান্ নারীধর্মের প্রপঞ্চনা করিয়েছেন তা সত্যই জগতের শ্রেষ্ঠ নীতিধর্মের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। "রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া"—এই হ'ল রমণীর শ্রেষ্ঠ সুখ, এই হ'ল নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এরই জন্যে রয়েছে জগতে নারীসৃষ্টি। বিধাতা অগ্নি সৃষ্টি করে, অগ্নির দাহ শীতল করবার জন্য জলেরও সৃষ্টি করেছেন। সেইরূপ, পৃথিবীতে রোগ, শোক, দুঃখ সৃষ্টি করে তিনি প্রেমপূর্ণ নারীবুকও সৃষ্টি করেছেন। নারীর এই আর্তসেবায় শত্রুমিত্র ভেদ থাকা উচিত নয়—তাঁর নিকট সব জীবই সমান। শত্রুও মানুষ, একই রক্তমাংসে গঠিত। অস্ত্র যেমন মিত্রের দেহে আঘাত করে, শত্রুর দেহও কি একই রকম ক্ষতবিক্ষত করে না, একই ব্যথা দেয় না? একই ভগবান কি সর্বদেহেই অধিষ্ঠান করেন না? সেজন্য শত্রু-মিত্রের ভেদ নারীর নিকট নেই। সমভাবে, পাপী ও পুণ্যবানের ভেদও সেবিকা নারীর নিকট অর্থশূন্য। মাতা বসুধার বিশাল অঙ্কে ক্ষুদ্র উচ্চ সকলেরই সমান অধিকার, সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল সমভাবেই সেথায় বিরাজমান। সমুদ্রের অতল গর্ভে তুচ্ছ বালুকণা ও অমূল্য রত্নরাশি সমানই আদর পায়। নারীকেও হতে হবে সর্বংসহা বসুন্ধরার মতই ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য, দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের মতই উন্মুক্ত ও উদার। তাকে শিখতে হবে 'জগতের সাম্যনীতি,' তাকে গাইতে হবে 'সুধাময় প্রেমগীতি,' তাকে বিলিয়ে দিতে হবে সর্বত্র সমান প্রেম, সর্বত্র সমান দয়া', তাকে ঢেলে দিতে হবে "বরিষার ধারার মত অজস্র জননীপ্রেম" শত্রুমিত্রনির্বিচারে। তবেই হবে তার স্বধর্ম, নারীধর্ম পালন।

"আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই?"

এই নিষ্কাম জনসেবা, এই উদার বিশ্বপ্রেমই ছিল নবীনচন্দ্রের ধর্ম ও নীতিতত্ত্বের মূল কথা। তাঁর সর্বপ্রধান নায়ক-নায়িকার মধ্যেই তিনি এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং সুভদ্রার মুখেও এই কথা বারংবার বলিয়েছেন। সুভদ্রা বলছেন যে, একজন নারীর বুকে এত মধু, এত প্রেম লুকিয়ে আছে যে, স্বামী-পুত্র পরিবারকে উজাড় করে দিয়েও তা নিঃশেষ হয় না। সুতরাং সেই অনন্ত প্রেমকে অনন্ত বিশ্বে বিলিয়ে দেওয়াই হ'ল নারীর কর্তব্য।

"পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি পুত্র, মহাবিশ্বে
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়।
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি যে লো অনন্ত আছে,
প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায়।"

সুভদ্রা বলছেন—পৃথিবীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, দেখবে বিশ্বপ্রকৃতি নিষ্কামভাবে পরের সেবায় আত্মনিয়োগ করছে। স্বপ্রকৃতি অনুসারে তরু ফল ধরছে, মেঘ জল বর্ষণ করছে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা উদিত হচ্ছে কেবল জগতের হিতের জন্যই, নিজের স্বার্থের জন্য নয়। কেবল মানুষই কি এই নিষ্কাম বিশ্বে আদর্শের বাইরে পড়ে থাকবে? সেও জড় প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিষ্কাম মানবসেবায় লেগে যাক, সেই'ত তার মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব লাভেই তার প্রকৃত সুখ। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসর্বস্ব সুখ সুখই নয়, যা অপর সকলের সুখের কারণ তাহাই একমাত্র সুখ। সেইজন্য সুভদ্রা অভিমন্যুকে বলছেন—

"জগতের হিত যাহা, তাহা জলবিন্দুহিত,
জগতের হিত বৎস! তোমার হিত নিশ্চিত।"

পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে যাকে utilitarianism বা princi-

ple of the greatest happiness of the greatest number বলে, নবীনচন্দ্রও ছিলেন সেই নীতিরই প্রচারক। তিনি বলছেন যে, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ সুখের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হই বলেই আমাদের এত দুঃখ। আমরা ভাবি যে, নিজেদের বিশ্বজগৎ থেকে ছিন্ন করে এনে ঘরের কোণে একলা বসে ভোগ করলেই বুঝি বা চরম সুখ হবে। কিন্তু তা ত হবার উপায় নেই—কারণ আমরা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির, সমগ্র মানব জাতির সঙ্গেই একসূত্রে বাঁধা—তাহাদের কাটকে ছেড়ে আমাদের একা একা সুখ হবার সম্ভাবনা মাত্র নেই। গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে ফেললে সে পাতা বাঁচে ক'দিন? এই স্বার্থপ্রণোদিত দুর্ব্বুদ্ধি, ক্ষুদ্রবুদ্ধির দাস হয়েই আমরা জগতে অনন্ত দুঃখভাগী হই। প্রকৃতপক্ষে আনন্দময় ব্রহ্মের মূর্তরূপ জগৎও ওতপ্রোতভাবে আনন্দময়; কিন্তু এই আনন্দময়ত্ব উপলব্ধি করতে হবে আমাদের জগতের সঙ্গে এক হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। সুভদ্রা বলেছেন, সুখের জন্য জগৎ আকুল, সকলেই সুখ অন্বেষণ করেছে। কিন্তু এই জগৎই যে সুখময়, বিধাতারই ন্যায় নিত্যসুন্দরময়। সুখ ঝরছে অজস্র ধারায় জ্যোৎস্নায়, বইছে ঝটিকায়, গর্জন করছে জীমূতমন্দ্রে, বর্ষিত হচ্ছে বরিষায়, গাইছে কোকিলের কণ্ঠে, নিশ্বাস ফেলছে মলয়সমীরণে, ফলছে তরুদলে, ফুটছে ফুলে, ভাসছে জলে, হাসছে দিবালোকে। জগতের চারদিকেই ত সুখের প্রস্রবণ বইছে, সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস উঠছে, "সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্বময়।" তবুও একমাত্র মানুষ অসুখী, নিজদোষে, নিজ স্বার্থকলুষিত ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে একমাত্র মানুষই এই আনন্দরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে আছে।

> "কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের উঠিছে উচ্ছ্বাস।
> কি সুখসঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ।
> কেবল মানব পথভ্রষ্ট নিয়তির—।
> তাই মানবের হায়! এ দুঃখ গভীর।"

তাই আজ মানবকে স্বার্থদ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র কারাগার ভেঙে ফেলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এক হয়ে মিলতে হবে, বিশ্বহিতকেই নিজের হিত বলে বুঝতে হবে, বিশ্বপ্রেম ব্রত পালতে হবে। এমন কি কেবল তপস্যাতেও মানবের সুখ নেই, সার্থকতা নেই, যদি সে তপস্যার সঙ্গে না যুক্ত হয় পরসেবা।

> "মানুষের সুখ
> নহে গৃহে, নহে বনে, বুকে নাই হায়!
> নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্যায়। • • •
> এ মহা ধর্ম্মের
> ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত।"

নারীসমাজকে লক্ষ্য করে আজ এই কবির শুভ জন্মদিনে আমার একটি কথা বলবার আছে। নবীনচন্দ্রের ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠার মূলে শৈলজা ও সুভদ্রা; অর্থাৎ মহামহীয়সী নারীর প্রচেষ্টায় নব মহাভারত প্রতিষ্ঠিত হবে—এই আমাদের ঋষি নবীনচন্দ্রের আর্যোক্তি। হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে নবীনচন্দ্র এ মহামহিমময়ী নারী সৃষ্টি করেছেন; ফলতঃ, তুলনায় শৈলজা সুভদ্রার কাছে বাসুকি-অর্জুন চরিত্র বিশেষ ভাবে নিষ্প্রভ, মলিন। বিশেষভাবে, সুভদ্রাকে তিনি এঁকেছিলেন এক মহীয়সী দেবীরূপে—যিনি দর্শন, ধর্ম ও নীতির গূঢ় তত্ত্বের সবটুকুই আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু কেবল আয়ত্ত ও প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, স্বয়ং সে-সব নীতি কঠোর ভাবে পালনও করেছিলেন। এই সুভদ্রাই সুভদ্রাহরণকালে শত্রুব্যূহ ভেদ করে অসমসাহসে পার্থের রথ চালনা করেছিলেন, এবং অর্জুন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে চরণে রথের রশ্মি চেপে ধরে, করে ধনু নিয়ে সাত্যকির শর ব্যর্থ করে পার্থের মূর্চ্ছিত দেহসংরক্ষণ করেন। এই সুভদ্রাই আবার শত্রুমিত্র নির্বিচারে আর্ত সেবায় প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন, অনার্য্য কন্যাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, এবং আর্য অনার্যে ভেদ দূর করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন—এ সবই অবশ্য নবীনচন্দ্রের মৌলিক কল্পনা, মহাভারতে এ চিত্র আমরা পাই না। পুনরায়, পুত্রের বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তিনি তাকে যুদ্ধে যেতে বাধা ত দেনই নি, উপরন্তু উৎসাহিত করেছেন। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—জ্ঞানবিজ্ঞানে গরীয়সী, বীরত্বে অতুলনীয়া, কঠোর কর্তব্যে অনমনীয়া, অথচ বিশ্বজনীন জননীপ্রেমে মমতাময়ী, সেবাময়ী মূর্তি—এই হ'ল নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা। নারীজাতির উপর নবীনচন্দ্রের কি উচ্চ ধারণা ছিল, এবং তাঁদের উপর তাঁর কি অশেষ আশা-ভরসা ছিল, সুভদ্রা-চরিত্র থেকেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাই নারীসমাজ আজ নবীনচন্দ্রের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। তাঁরা তাঁর সামান্য প্রতিদান আজ করতে পারেন, যদি নবীনচন্দ্রের আদর্শে তাঁরা নব মহাভারত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সার্থককামা হন। ভারতের জাগ্রত নারীসমাজ নবীনচন্দ্রের জন্মদিনে আজ এবিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন।

নবীনচন্দ্র তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় যে মহান্ ত্যাগ, প্রেম ও ঐক্যের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তা আমাদেরই অতি নিজস্ব বেদবেদান্ত উপনিষদের শাশ্বতী বাণী। ভারতের মুক্তির সাধক, সত্যদ্রষ্টা ঋষি নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই বাণীই পুনরায় বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" আজ জড়বাদী পশ্চিমের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও আমাদের এই চিরন্তন বিশ্বপ্রেমের আদর্শ প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছি। সেজন্য জাতির এই চরম দুর্দিনে নবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশ্বপ্রেমের পূজারী, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবক, যুগনেতৃগণের বাণী আমাদের সযত্নে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ ও উপলব্ধি করা কর্তব্য। সর্বজনীন সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত "প্রেমময়, পুণ্যময়, শান্তিময়, সুধাময়" যে "মহান্ ধর্মরাজ্যের" স্বপ্ন নবীনচন্দ্র দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টাই হবে কবির প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

> "বুঝিবে মানবগণ, সর্বজীবে নারায়ণ,
> সর্বজীব-হিত মহাধর্ম নিরমল।
> এই নব ধর্মে; ভগি! হবে ক্রমে পরিণত
> মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল।"

নবীনচন্দ্রের সুভদ্রার এই আশা যেন শীঘ্রই সফল হয়—এই প্রার্থনাই আজ কবির শতবার্ষিক জন্মোৎসবে করছি।

সৌন্দর্য্য-প্রিয় আধুনিক কবি আরাগঁ

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

স্বদেশপ্রেমিক কবি আরাগঁর কথা বলেছি।* এখানে তার আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি—

Je vous salue ma France arrachee aux fantomes
O rendue a la paix Vaisseau sauve des eaux
Pays qui chante Orleans Beaugency Vendome
Cloches cloches sonnez l'angelus des oiseaux

Je vous salue ma France aux yeux de tourterelle
Jamais trop mon tourment mon amour jamais trop
Ma France mon encienne et nouvelle querelle
Sol seme de heros ciel plein de passereaux .

Je vous salue ma France ou les vents se calmerent
Ma France de toujours que la geographie
Ouvre comme une paume aux souffles de la mer
Pour que l'oiseau du large y vienne et se confie

Je vous salue ma France ou l'oiseau de passage
De Lille a Roncevaux de Brest au Montcenis
Pour la premiere fois a fait l'apprentissage
De ce qu'il peut couter d'abandonner un nid

Patrie egalement a la colombe ou l'aigle
De l'audace et du chant doublement habitee
Je vous salue ma France ou les bles et les seigles
Murissent au soleil de la diversite

Je vous salue ma France ou le peuple est habile
A ces travaux que font les jours emerveilles
Et que l'on vient de loin saluer dans sa ville
Paris mon coeur trois ans vainement fusille

Heureuse et forte enfin qui portez pour echarpe
Cet arc-en-ciel temoin qu'il ne tonnera plus
Liberte dont fremit le silence des harpes
Ma France d'au dela le deluge salut† (Ma France)

কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমের উৎস মস্তিষ্কের অথবা স্নায়বিক উত্তেজনা নয়, বরং বলতে পারি হৃদয়বৃত্তির গভীর অনুরাগের স্পর্শে তা সঞ্জীবিত। সেই হেতু আধুনিকতা সত্ত্বেও আরাগঁ হতে পেরেছেন সৌন্দর্য্যানুরাগী, আধুনিক হয়েও তিনি সৌন্দর্য্য-প্রিয়। এস্থলে আমি বলব কবির দৃষ্টির ও উপলব্ধির কথা। আরাগঁর জীবনের আদর্শ যাই হোক, রাজনীতিক মত ও পন্থার যেটিই তিনি গ্রহণ করে থাকুন—তাঁর কাব্য সে সবের থেকে মুক্ত। পরিপূর্ণ আদর্শবাদী তাঁকে হয়ত বলা চলে না কিন্তু তিনি যে আশাবাদী তাতে প্রশ্ন ওঠার কারণ নেই। একটা কালান্তক সর্ব্বগ্রাসী অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় হয়েছিল ; তবু তারই মধ্যে থেকে তিনি নূতন জীবনের আশা উৎসাহ আরম্ভকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন—হোক না সপ্ত বর্ণে রঞ্জিত ওই মাত্র রামধনু, তাতেই ত যথেষ্ট প্রমাণ যে বজ্রপাত আর হবে না।

Heureuse et forte enfin qui portez pour echarpe
Cet arc-en-ciel temoin qu'il ne tonnera plus*

এ থেকে যদি অনুমান করা হয় আরাগঁ স্বপ্নচারী কল্পনা-বিহ্বল তা হলে ঠিক সুবিচার করা হবে না। কবির দৃষ্টি বলছে বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সম্মুখে শান্তি, কিন্তু কোন পাণ্ডি-তিক সূত্র দিয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি, কবির এ সত্য-টিকে বাণীরূপ দানের পক্ষে একটি রামধনুই যথেষ্ট মনে হ'ল। বস্তুতঃ কবিকে প্রথমে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে হয়, তারপর উপযুক্ত আশ্রয় ও উপকরণ দিয়ে তাকে অর্থ ও ভাবের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন তিনি। আরাগঁর মধ্যে এই একটা সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—দৃষ্টিমান বলেই তিনি আবার বস্তুবাদী হয়েই সন্তুষ্ট নন, বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন তিনি। গভীর অন্তরদেশে লক্ষ্য বলেই হয়ত আরাগঁর ভাষার অর্থ ও ইঙ্গিত তীক্ষ্ণধী পাঠকের কাছে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রম সৃষ্টি করে। কবি বলেছেন—

Quand je parle d'amour mon amour vous irrite
Si je crois qu'il fait beau vous me criez qu'il pleut
Vous dites que mes pres ont trop de marguerites
Trop d' etoiles ma nuit trop de bleu mon ciel bleu†

---

*'প্রবাসী' আষাঢ়, ১৩৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† I salute Thee my France rescued from phantoms
O given back to peace Ship saved from the waters
Country that sings Orleans Beaugency Vendome
Bells bells ring the angelus of birds

I salute Thee my France with thy eyes of turtle-dove
Never too much my torment my love never too much
My France my old and new quarrel
Soil sown with heroes sky filled with sparrows

I salute Thee my France where the gales be-calmed
My France for ever which geography
Opens like a palm to the breath of the sea
That birds from over may come and nestle

I salute Thee my France where birds of passage
From Lille to Roncevaux from Brest to Montcenis
For the first time made the trial
Of what it might cost to abandon a nest

The country equally to the dove and the eagle
By audacity and by song doubly inhabited
I salute Thee my France where the wheat and the rye
Ripes in the varied sun

I salute Thee my France where the people are deft
In works done by wondering days
Which one comes from far to salute in her city
Paris my heart for three years vainly shot

Happy and strong yes thou carryest for scarf
This rainbow that proves it will thunder no more
Liberty which makes the silence of harps quiver
My France from beyond the deluge salute.

* Happy and strong yes thou carryest for scarf
This rainbow that proves that it will thunder no more

† When I speak of love my love irritates you
If I think a day to be fine you cry to me it rains
You say that my meadows are too full of marguerites
Too full of stars my night too full of blue my blue sky

ভালবাসার কথা বলি যখন, আমার ভালবাসা তোমাদের উত্যক্ত করে তোলে। আমি যদি বলি উজ্জ্বল দিনটি হয়েছে, তোমরা বলবে ঘোর বর্ষাকাল। তোমরা বল আমার তৃণভূমিগুলিতে থাকে অতিরিক্ত "মারগেরিত", আমার নিশীথিনীতে অত্যধিক তারার মেলা, আমার নীল আকাশে অতিমাত্রায় নীলিমা।

বস্তুত: আরাগঁর কাব্যের রস পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলে কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রাথমিক সূত্র হিসেবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এখানে কিঞ্চিদধিক বিস্তৃত আলোচনাই করছি—ব্যাপক দৃষ্টির মধ্যে প্রধান জিনিষগুলিকে তবে পরীক্ষা করে নেবার সুযোগ পাব। একটা কথা বারংবার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের মূল বনিয়াদ হ'ল মানস চেতনা; এই মানসিক অনুভব ও মননক্রিয়ার সূক্ষ্মতা স্থানে স্থানে উত্তম মানসের পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে—এমন একটা ক্ষেত্র কবির চেতনায় এখন অধিগত যেখান থেকে তার দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের প্রত্যেকটি স্পন্দনে একটা নূতনত্ব ও বিশেষত্ব ফুটে উঠতে চায়। এই অপ্রকাশের ব্যাকুলতা আধুনিক কাব্যের সর্ব্বত্র বিরাজ করছে। ইংরেজী কাব্যে এই অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক আকারে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এলিয়ট ইংরেজী কাব্যে প্রগতির ধারাকে নিয়ে গিয়েছেন বুদ্ধির প্রায় অলক্ষ্যের পারে—

> See, now they vanish
> The faces and places, with the self which, as it could, loved them,
> To become renewed, transformed, in another pattern.

তিনি আরও অগ্রসর হয়ে চলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন পর্য্যন্ত, এবং তা কোথাও লঘু হাস্য পরিহাসের ভঙ্গীতে নয়। পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে তিনি যে কাব্যরসভূমিতে একটা বিপ্লবের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই মুখে আজ শুনি—

> So I find words I never thought to speak
> In streets I never thought I should revisit
> When I left my body on a distant shore.

কিন্তু এলিয়ট থাক, আরাগঁর কথা বলি। মননশীলতার কথা উঠেছিল এইজন্যে যে বলতে চাই আরাগঁও অত্যন্ত চিন্তাশীল কবি—অজ্ঞান তিনি মোটেই নন, সজ্ঞান বরং যথেষ্ট সতর্ক এবং সচেতন। ফরাসী ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে তিনি নিজেকে কখনও অজ্ঞতাবোধ দ্বারা বিব্রত মনে করেন না। এতখানি জাগ্রত মন নিয়ে, জাগতিক একটা ঘোর স্থূল আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও তাঁর কাব্য কদাপি মলিন, ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও হেয় হয় নি। তাঁর শিল্পসৃষ্টি প্রাণরসের মূলসূত্রের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে। জাগ্রত জীবনের স্পন্দনে, ধ্বনির তরঙ্গে কম্পনে বর্ণের সঙ্কেতে ছটায় সর্ব্বত্র বেজে উঠেছে ধ্বংসের ক্ষয় রুগ্নতার নয়, একটা সবল এবং সুস্থতাপূর্ণ ভবিষ্যতের সুর। কাব্যের এই স্বাভাবিক সবলতা, healthy normality, প্রাচীন কবিরা অবজ্ঞা করে চলেন নি। হোমরের সমগ্র ইলিয়াড কাব্যখানির মধ্যে কি একটা উজ্জ্বল মানবিক দেহসৌষ্ঠব পর্য্যন্ত ফুটে উঠেছে, হেক্টর-বধের করুণরস সত্ত্বেও—দেবতারা আর মানুষের বাহিরে থাকতে পারেন নি, তাদের সঙ্গে তাদের মধ্যে এসে গিয়েছেন কি সহজে। আরাগঁও মানুষের এই স্বাভাবিক দিকটি ধরে চলেছেন, মানুষের জীবনে যদি রোগ প্রবেশ করে থাকে তাকে নিয়ে উৎকট বিকৃত আনন্দের রোগ-বিলাস তিনি করেন নি; ব্যাধিকে ব্যাধি বলে জেনে তাকে সরিয়ে দিতেই চেয়েছেন। আধুনিক কবি এইখানে সংস্কারক হয়ে ওঠেন, দেখুন সতীর্থ আপোলিনের বলছেন আদর্শের কথা—

> Nous voulons nous donner de vastes et d'etranges domaines
> Ou le Mystere en fleurs s' offre a qui veut le cuellir
> Il y la des feux nouvaux des couleurs jamais vues
> Mille phantasmes imponderables
> Auxquels il faut donner de la realite*

আমাদের জন্যে চাই নূতন বিপুল ক্ষেত্র, যেখানে যদৃচ্ছা সকলের জন্ম কুসুমিত হয়ে রয়েছে অজ্ঞাত রহস্য; রয়েছে নূতন অগ্নি যার সদৃশ বর্ণ আগে কখনো দেখি নি; সহস্র অচিন্ত্য কল্পনাছায়া যাদের বস্তুজগতে মূর্ত্ত করে তুলতে হবে।

আরাগঁ এখানে দেখুন অনাড়ম্বর অকপটে বলছেন—

> J'empeche en respirant certaines gens de vivre
> Je trouble leur sommeil d'on ne sait quel remords
> Il parait qu'en rimant je debouche les cuivres
> Et que ca fait un bruit a reveiller les morts†

আমার নিঃশ্বাসেই আমি কতককে বাঁচতে বাধা দিচ্ছি, তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করছি কি দুঃখে কেউ কি তা জানে। আমার ছন্দে বাজিয়ে তুলছি কাংস্যযন্ত্র—তার শব্দে মৃতও জেগে ওঠে।

অথবা যে কারুণ্য ফুটে উঠেছে,

> Nos soldats a La Rochelle
> N'ont ni vestes ni souliers
> Que vouliez-vous donc la belle
> Qu'est-ce donc que vous vouliez‡

লা রোশেল-এ আমাদের যে সৈন্যরা তাদের নেই জামা, নেই জুতো; কি চাও এখন তুমি রমণী, এখন তুমি কি চাও?

এখানেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে দেশেরই কথা, কিন্তু রূপান্তরের যে সোনার কাঠি তার সঙ্গে কবি যুক্ত করে দিয়েছেন মানুষের হৃদয়কে। হৃদয়হীন কবিতার নমুনা দেখুন,

> কৃষক, মজুর। তোমরা শরণ—
> জানি, আজ নেই অন্য গতি;

* We wish to give ourselves new and vast domains
Where the mystery in flower is offered to whoever wishes to gather it
It is there that are found new fires with colours unseen before
Thousand imponderable phantoms
To which reality must be given.

† I prevent by my very breathing some people from living
I disturb their sleep with what remorse one knows not
It seems in rhyming I strike open copper strings
And that makes a noise to awaken the dead.

‡ Our soldiers at La Rochelle
Have neither vests nor shoes
What would you like then lady
What then would you like?

যে-পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

অত্যাধুনিকের মুখে বিদ্রূপের ভঙ্গী শুনি,
বসন্ত সত্যিই আসবে? কী দরকার এসে?
বছর-বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যাম্বেলের ভীড়ে॥

একটা সূক্ষ্ম (?) রসিকতার পর্য্যন্ত চেষ্টা করা হয়েছে! শুধু কি তাই, ইনি গর্জ্জে উঠেছেন—এতদূর আসতে আরাগঁ পর্য্যন্ত সাহস পান নি—

উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে না কি
আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে?

কবির আশঙ্কার কারণ নেই, এই বিদ্রোহী পদাতিকদের কৃপায় ঈশ্বর ত বহুপূর্ব্বেই পৃথিবী থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন; এর পরে আমাদের মনে হয় কাব্য-সরস্বতীরও বা যা একটু আশা ছিল তাও বোধ হয় সমূলে বিনাশ হ'ল। নিছক কবিত্বের আর একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কবি,

প্রভু, যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না; নেবো তীর ধনুক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই:
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।

কিন্তু কাল নির্ম্মম—সত্যের মর্য্যাদা পরিপূর্ণ যাচাই করে মূল্য দান করে সে। সেই প্রবল প্রখর স্রোতে অনুভূতির জীবন্ত প্রাণ-উত্তাপহীন এই সব বুলিবিন্যাস ছিঁড়ে ভেসে যেতে বাধ্য। এই অনুভূতির উপলব্ধি হ'ল অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ যা বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে অমানবী ব্যক্ততা—

Star upon star throbbing out in the silence of the
infinite spaces....

(শ্রীঅরবিন্দ)

আধুনিক কাব্য দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেন একটা অভিনব মাত্রা আবিষ্কার করতে চায়, যেখানে সেখানে শুধু আয়তনকে গ্রহণ করা নয়, ঋজু-কুটিল ক্ষুদ্র-মহৎ স্থায়ী-ক্ষণস্থায়ী সকল বস্তুর একটা গুণ-মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত এঁকে ধরা তার মধ্যে। এই সমগ্রীকরণের সমগ্র গুণাকর্ষণের বাহিরের দিকের রূপ কি? মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন এখন হয়ে উঠেছে সমস্যাকীর্ণ জটিল—তার কঠিন বন্ধুর জীবনযাত্রার পথে পদে পদে এখন বাধা, কবি-চিত্তেও এই বিক্ষোভের তরঙ্গ এসে পড়েছে। কবি এখন আর নিজেকে পৃথক করে রাখতে পারেন না তাঁর ব্যক্তিচেতনার একটি মাত্র কেন্দ্র দিয়ে, গোটা মানুষটিকেই গ্রহণ করতে চান তিনি তাঁর কবিসত্তা হিসেবে—এমন কি মানুষের ভঙ্গুর আশা স্বপ্ন অতৃপ্তি দুর্ব্বলতা তুচ্ছতা কুড়িয়ে চন্দ্রহার গড়বেন তিনি! কবিচেতনায় এই যে একটা বিপর্য্যয় এসেছে বাহিরের আকারে পর্য্যন্ত তা ফুটে উঠেছে। ফরাসী কাব্যেরই নমুনা দেখুন—কবি নিকোলাস বোদুঁয়া (Nicholas Beauduin)—

d'abeilles
d'oiseaux
Sa voix etait pleine
de flammes
d'odeurs
Ho la douceur
de ses ferventes cantilenes
cetoines d'or Papillons verts
etait dans la plaine
les Notes visible de ce concert*

মৌমাছিদের, পাখীদের স্বরে তার সুর ভরা ছিল অগ্নিশিখা-রাজিতে সুগন্ধে। কি মিষ্টি তার আকুল গান! ঐকতানের সুরগুলি মাটির বুকে মূর্ত্ত হয়েছিল স্বর্ণকীট আর সবুজ প্রজাপতির দলে।

কাব্যরীতির শব্দসজ্জায় পর্য্যন্ত কি অভিনবত্ব! বলা বাহুল্য ফরাসীদের পক্ষে এ জিনিষ (তাঁরা বলেন Paroxysme—আমাদের ভাষায় 'মৃগীরোগ'?) সহজে গলাধঃকরণ সম্ভবপর নয়। পূর্ব্বগামীরা অত্যন্ত সংযত হয়ে চলতেন—তাঁরা জানতেন অসংযম আর সৃষ্টি সমানে চলতে পারে না, অসংযম যখন দুর্ব্বার হয়ে ওঠে তখন সৃষ্টির প্রলয়কাল উপস্থিত। কর্ণেই অথবা রাসীন পর্য্যন্ত কাব্যের ধারা সহজেই বয়ে এসেছিল। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এলেন রোমান্টিকেরা—লামা রতিন, ভ ভিঞি এবং হুগো হলেন দিকপাল। ছন্দের গঠনের নির্ভুল কর্ত্তৃত্ব নিয়ে, ভাবৈশ্বর্য্যের বৈচিত্র্যে হুগো এক যুগান্তরই এনে ধরলেন। তারপর হ'ল বস্তুবাদীদের আগমন। জীবনের অপর দিকটি—দুঃস্থতার দিকটিও দেখাতে হবে—বস্তুতন্ত্রীদের এই লক্ষ্য ছিল। বোদেলের এদের মধ্যে থেকে এক নূতন রীতির—ইঙ্গিতরীতির সূচনা ধরে দেখালেন। তাঁর হাতে বস্তু বস্তুর অধিককে ইঙ্গিত করে করে চলেছে। মালার্মে প্রতীকরীতির সাহায্য নিয়ে কাব্যের আর এক লোক উন্মুক্ত করে দিলেন; এই মালার্মের কিছু কিছু ছায়া—ভাবের গাঢ়তায়; দৃঢ়তায় নয়—ইঙ্গিতময়তায়, এসেছে আরাগঁর মধ্যে। এই সূত্রে 'দাদা'-তন্ত্রীদের (Dadaism) কথা একটু বলি। এঁরা চেয়েছিলেন প্রগাঢ় একটা পরিবর্ত্তন। শব্দের মধ্যে এনে দিতে চাইলেন নূতন নূতন অর্থ, শব্দ-যোজনার প্রচলিত ধারাকে পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করে চলতে লাগলেন। প্রথমেই যে আধুনিক কবিদের নাম করেছি, এলুয়ার, সারা এবং আরাগঁ এই তিন জনই সেই দলে ছিলেন। আরাগঁ তাঁর গণ্ডী ছাপিয়ে এখন যে কাব্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে পড়েছেন তাতে আর সন্দেহ কি? কাব্য-সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত অবান্তর কাহিনী বলতে হ'ল কিন্তু তার একটা উপকারিতা আছে। কাব্যস্রোতস্বতীর পূর্ব্বেকার থেকে একটা মোটামুটি ধারাবাহিক সূত্র পাওয়া গেলে তাতে আলোচ্য কবির বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছতর হয়ে পড়ে। আর পুরাতনের স্রোত ত পুরাকালে পুরাতনেই আবদ্ধ হয়ে নেই, বর্ত্তমানের মধ্যে তার গতির ও আবেগের সহস্র ধারা এসে মিশেছে। আরাগঁ বস্তুবাদী 'রিয়েলিষ্ট' অর্থাৎ আধুনিক।

* of bees
of birds
Its voice was full
of flames
of odours
O the sweetness
of its fervent ballads
Rose-chafers of gold Butterflies green
was in the plain
the visible Notes of this concert

তিনিই আবার রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন মানব-হৃদয়ের চিরন্তন সুরের তন্ত্রে যখন ধ্বনি তুলেছেন—

Rendez-moi rendez-moi mon ciel et ma musique

তদুপরি যুগপৎ বহুলাংশে তাঁর সৌন্দর্য্যানুভূতির ক্ষেত্রে দেখি চিত্তস্থৈর্য্যে ক্লাসিকাল গাম্ভীর্য্য।

আরাগঁর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার, শ্রী, সৌকুমার্য্য-বোধের কথা বলছিলাম। কাব্য-প্রান্তরের যে পথ দিয়ে তিনি গমনাগমন করেন তার চতুর্দ্দিক প্রভাসিত হয়ে উঠতে থাকে, ফুটে উঠতে থাকে ছবি, ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধ্বনির সুরশিঞ্জন—একটা পরিপূর্ণ কবিত্বময় আবহাওয়া। ফলত: কবিকে প্রথমেই সৃষ্টি করতে হয়—গ্রীক ভাষায় কবিতা 'Poicin' অর্থই 'সৃষ্টি করা'—জীবন্ত কবিত্বময় পারিপার্শ্বিক, একটা অদৃশ্যলোকের উপস্থিতিকে আহ্বান করে আনতে হয় তাকে,

when
No daily voice is heard of man
But higher audience brings
The footsteps of invisible things ...

(শ্রীঅরবিন্দ)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমাদের অতি পরিচিত—

অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে
মনে হ'লো সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে—

অথবা আরাগঁর দৃষ্টান্ত যদি গ্রহণ করি,

La nuit trade a venir avec ses violons
Les longs soirs a nouveau cueillent la violette *

রাত্রির দেরি হচ্ছে তার বীণকারের দল নিয়ে আসতে; দীর্ঘ সন্ধ্যা 'ভায়োলেট' সংগ্রহে লেগেছে। কাব্য অন্ত জগতের সত্যকে আমন্ত্রণ করে আনে আপনার ছন্দের মধ্যে। এই বিশ্বাতীতের দৃষ্টি এবং শ্রুতি সত্যনিষ্ঠ বাণীকে বাহন করে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যখন, কাব্য তখন মন্ত্র সৃষ্টি করে তোলেছে। এইখানে কাব্যের পরমোৎকর্ষ। শব্দ সকলই শুধু কোন একটা বস্তুকে নির্ণয় বা নির্দ্দেশ করার সহায়ক ধ্বনি মাত্র নয়। শব্দ শব্দের অতিরিক্ত অধিক কিছু বলেই তার একটি মাত্র স্ফুরণে মানুষের হৃদয় আলোড়িত করে তুলতে পারে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রই, উপনিষদের একটি মাত্র শ্লোকই মানুষকে নিয়ে যেতে সক্ষম দূরাতীত সীমাহীন লোকে। প্রত্যেক শব্দ তার নিজস্ব রূপ ধারণ করে যখন, তার স্বপদে তাকে যখন অধিষ্ঠিত করে, তার যথাযথ স্থান দান করি, নিজের শক্তি এবং সত্যকে তখন সে প্রকাশ করে। অধিকন্তু তারা তখন অবয়ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করে ওঠে। দার্শনিকেরা তাই শব্দকে ব্রহ্ম বলেছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তজ্জন্য ছন্দ সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন, এত বিধিবিধান নির্দ্দেশ করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন শব্দ ও ছন্দের ভুল উচ্চারণে ব্যবহারে মানুষের চেতনাকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করতে পারে। প্রাচীনের কথা এই পর্য্যন্ত থাক, আমরা বলতে এসেছি আধুনিকের কথা।

বলছিলাম আরাগঁ চরম আধুনিকতার যুগে বাস করে, আধুনিক কবি হয়েও এমন একটা সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার সুষ্ঠু ধারা রেখে চলেছেন যা আজকের যুগে সুদুর্লভই বলা চলে। প্রায়শ:ই সাধারণ বস্তুসমূহ তাঁর কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেগুলি কবির কাছে তাদের অন্তরতম স্পন্দনটি নিয়ে ধরা দিয়েছে। স্থূল দেহ মূর্ত্তি যেমন বস্তুর পক্ষে সত্য, বস্তুর স্পন্দনও—এই স্পন্দন এই কম্পনই ত জড়কে অচেতনকে প্রাণ দান করে—তেমনি সত্য। আরাগঁ এই ধ্বনির গভীরতার দিক দিয়ে মর্ম্মস্পর্শ করেছেন,

Liberte dont fremit le silence des harpes*

স্বাধীনতার স্পর্শে বীণানি:সৃত স্তব্ধতা কেঁপে উঠছে।

অথবা,

Qu'importe que je meure avant que se dessine
Le visage sacre s'il doit renaitre un jour
Dansons o mon enfant dansons la capucine
Ma patrie est la faim la misere et l'amour†

ক্ষতি কি সেই পুণ্য মুখখানি পরিপূর্ণ ফুটে ওঠার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, একদিন পুনর্ব্বার যদি জন্মগ্রহণ করি? নাচ, ওগো আমার শিশু—নৃত্য কর। আমার দেশ মূর্ত্তিমান ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং প্রেম।

এই যে একটা নিরহঙ্কার স্বচ্ছতা সর্ব্বত্র দেখতে পাই এর হেতু আমি বলব প্রথমত: তার মনের প্রসন্নতা—নিজের ভিতরে একটা শান্ত ঔদার্য্যের স্থিতি। তাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে একটা নিবিড় গভীরের টান,

L'aout profond murmure au coeur de la foret‡

গাঢ়-গভীর 'আগষ্ট' বনানীর অন্তরে এনেছে চাপা গুঞ্জন।

আবার মনের প্রসন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির চিত্তের বিশুদ্ধতার—যার ফলে সাধারণ জিনিষ ও ঘটনাকে তিনি টেনে তুলেছেন, উপলব্ধির স্বচ্ছ আধারে দেখে গ্রহণ করে তাকে প্রকাশ করেছেন। দূষিত পঙ্কিল অন্ধকারের মধ্যে আরাগঁ এনেছেন একটা মুক্তির শ্রীছন্দের সৌন্দর্য্যের সৌকুমার্য্যের (যা একমাত্র কালিদাসের ভাষা আশ্রয় করে বলতে পারি 'আশাবন্ধ: কুসুমসদৃশং) অবকাশ।

তথাপি কাব্যের এই শেষ পরিণতি নয়। মনে হয় ভবিষ্যতের দাবি আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, কবিমাত্রই 'সুরূপকৃত্নু' নন, তাঁকে পেতে হবে অভ্রান্ত দৃষ্টি। আধুনিক কাব্যের মধ্যেই, আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও, এই দূরাগতের বর্ত্তিকার রশ্মি কোথাও কোথাও স্পষ্ট দেখা দিতে সুরু করেছে। রাত্রি দীর্ঘ হোক অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক উষার আগমনকে প্রতিরোধ করবে কে?

Que la nuit n'est pas lougue a cause du matin§

ইতিমধ্যে আরাগঁ যদি ভবিষ্যৎ কাব্যের পথ কিছুমাত্র সুগম করে দিয়ে থাকেন তাহলেই তাঁর কাব্যসৃষ্টি সার্থক।

* The night delays ti come with her violins
The long evenings gather again the Violet

* Liberty which makes the silence of harps quiver.
† What does it matter if I die before the sacred face takes shape
Provided it is to be reborn one day
Dance o my child dance the capucine
My country is hunger and misery and love.
‡ The profound August murmurs in the heart of the forest.
§ The night is not long because of the morning.

শ্রীরামপুর

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

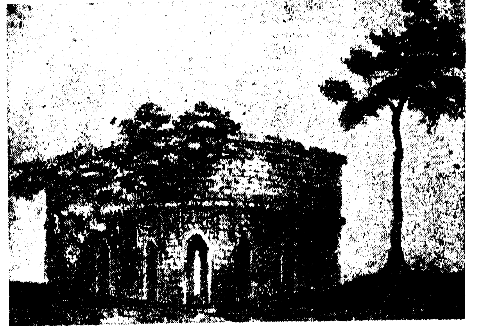
শ্রীরামপুর হুগলী জেলার একটি মহকুমা এবং শ্রীরামপুর শহর উক্ত মহকুমার প্রধান নগর; অক্ষা: ২২°৪৫´২৬´´ উত্তর এবং দ্রাঘি: ৮৮°২৩´১০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত এই স্থানটির প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির বিষয়, বৈদেশিক শাসনাধিকারের পূর্ব্বের ঘটনা অবশ্য বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে মগধাধিপতি বৈড়াল রাজের সভাপণ্ডিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের কিলকিলা বিবরণে শ্রীরামপুরের সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে: "শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাপদ: শ্রীরামাদিপুরং দিবাং ভদ্রেশ্বরস্য সন্নিধো ॥৬৬৯; তবে বিপ্রদাস কৃত 'মনসা-মঙ্গলে'ও এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে গোন্দলপাড়া হইতে দিনেমারগণ ব্যবসা করিবার জন্য শ্রীরামপুরে প্রথম আগমন করে বলিয়া জানা যায়। তাহাদের ব্যবসার সুবিধার জন্য ফরাসী এজেন্ট মঁসিয়ে ল'র (Mons Law) চেষ্টায় নবাবের নিকট হইতে তাহারা শ্রীরামপুরে যাট বিঘা জমি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাংলার নবাবের নিকট হইতে জমি সংগ্রহ করিতে ও ফরমান পাইতে তাহাদের ষোল হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে এই স্থানে দিনেমারদিগের পতাকা প্রথম উড্ডীন হয় এবং উক্ত পতাকা রক্ষা করিবার জন্য ডেনিশ গবর্ণমেণ্ট চার জন পাইক নিযুক্ত করিয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইহাদিগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়া যে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায়।

"It is recorded that the previous year had brought Siraj-ud-Dowlah a good deal of money owing to the business of establishing the Danes in Bengal."

ডেনমার্কের তৎকালীন রাজা পঞ্চম ফ্রেড্রিকের নামানুসারে তাহারা 'ফ্রেড্রিকনগর' বলিয়া শ্রীরামপুরের নামকরণ করে। শ্রীপুর, আকনা, গোপীনাথপুর, মোহনপুর ও পেয়ারাপুর এই স্থান লইয়াই ফ্রেড্রিকনগর গঠিত হইয়াছিল। দিনেমারগণ ব্যবসা আরম্ভ করিবারঅল্পদিন পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তিনি দিনেমারদিগের নিকট হইতে কয়েকখানি জাহাজ চাহিয়া পাঠান; কিন্তু তাহারা জাহাজ না দেওয়ায় নবাব বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং 'কলিকাতা আক্রমণ' সমাধা করিয়া তিনি দিনেমার ব্যবসায়ীদিগকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভারতে তিনটি স্থানে দিনেমারগণের কুঠী ছিল। দক্ষিণ-ভারতে তাঞ্জোরের নিকট ট্রানকোয়েবারে (Tranquebar), উড়িষ্যায় বালেশ্বরে এবং বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুরে একখানি চালা ঘরে তাহারা প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করে। তাহাদের শ্রীরামপুরের কুঠির অধ্যক্ষ ছিল মি: সোয়েটম্যান (Soetman); তাহারা এই স্থানে কারবার চালাইয়া সবিশেষ উন্নতি সাধন করে। কেবলমাত্র ব্যবসা করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই—শ্রীরামপুরের বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া তাহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গঙ্গার তীরে এই সুন্দর শহরটি তৎকালে ইউরোপীয়দের একটি বিশেষ বিহার-ক্ষেত্র ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় তাহারা সেণ্ট ওলাফস্ গীর্জ্জা (St Olaf's Church) নির্ম্মাণ করে।



রামপুরের এই বাড়ীতে কেরী মার্শম্যান প্রভৃতি পাদ্রীগণ উপাসনা ও পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইতেন

বিশপ হেবার শ্রীরামপুরকে একটি ইউরোপীয় শহরের মত দেখায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন:

"It looked more of an European town than Calcutta."

খৃষ্টধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বহু সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ ভারতবর্ষে আসিতে-ছিলেন। ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রেড্রিক কর্ত্তৃক ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতে প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী প্রেরিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম জিগেনবাল্‌গ (Ziegenbalg)। তিনি একজন ভারতীয়কে খ্রীষ্টান করিয়া ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ফিরিয়া যান। প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মিশনারী জন কির্ণাণ্ডার (John Kiernander) ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী ধর্ম্মযাজকরূপে বঙ্গদেশে আগমন করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডা: মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এবং তাহাদের দুই জন বন্ধু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য শ্রীরামপুরে আগমন করেন। তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহাদিগকে ফরাসী গুপ্তচর ভাবিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করেন, কিন্তু রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউনের চেষ্টায় ওয়েলেসলীর ভ্রম দূরীভূত হয় এবং মিশনরীগণ বঙ্গদেশে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ডা: কেরী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মালদহে অবস্থান করিতেছিলেন। বন্ধুগণসহ মার্শম্যান ডা: কেরীর নিকট যাইবার চেষ্টা করিলে ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সেইজন্য তাঁহারা শ্রীরামপুরে বসবাস করিতে বাধ্য হন। তারপর ডা: কেরী আসিয়া তাঁহাদের সহিত

মিলিত হন এবং এই তিন জনে মিলিয়া পরে 'শ্রীরামপুর-মিশনে'র প্রতিষ্ঠা করেন। "*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*" নামক গ্রন্থে এই তিনজন লোকহিতৈষী ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যাবলীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে।



'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান
(কোলসওয়ার্দী গ্রাণ্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে)

শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের প্রযত্নে এই স্থানে গির্জ্জা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল, কলেজ, পুস্তকালয় ও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম মুদ্রিত সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' ও সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' এবং 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' বাহির হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ও বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, সেজন্ত শ্রীরামপুরের সহিত তাঁহাদের নাম বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় কৃষ্ণদাস পাল নামক শ্রীরামপুরের জনৈক সূত্রধর বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীরামপুরের দিনেমার গবর্ণরের এবং বহু হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের সমক্ষে গঙ্গাতীরে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়। শ্রীযুত হরিহর শেঠ "পুরাতনী"তে লিখিয়াছেন যে কেরী সাহেব এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই দীক্ষাকার্য্য সাধিত হওয়ায় পাছে কেহ মনে করেন যে গঙ্গার পবিত্রতার জন্ত এই স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই জন্ত কেরী সাহেব জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার পবিত্রতা তাঁহারা স্বীকার করেন না, উহার জলকে সাধারণ জল বলিয়াই তাঁহারা জানেন।" উক্ত দিবস অপরাহ্নে অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং বঙ্গভাষায় যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টান মিশনরীগণ কর্ত্তৃক দেশীয়দের ধর্ম্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার ব্যবহার ইহাই প্রথম। কৃষ্ণদাসের স্ত্রী, কন্তা এবং গোলোক নামক আর এক ব্যক্তিও এই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনে শ্রীরামপুরে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং পরদিন প্রাতে দুই সহস্র ব্যক্তি উঁহাদিগকে নিজ নিজ বাটী হইতে ধরিয়া বিচারকের নিকট লইয়া যায়। দিনেমার বিচারক ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া জনতাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন এবং পাছে জনসাধারণ উহাদের কোনপ্রকার অনিষ্ট করে সেইজন্ত কৃষ্ণ, গোলোক ও মিশনরীদের বাটীতে দিনেমার গবর্ণর পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে দেশীয় খৃষ্টানদের প্রথম বিবাহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কৃষ্ণের কন্তার বিবাহ বাংলায় প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মতে পরিণয় এবং এই বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। বর ও কন্তা উভয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ পাদরীগণ সাক্ষীস্বরূপ উক্ত পত্রে সহি করেন।

দেশীয় খৃষ্টানদের সমাধি নির্ম্মাণও প্রথম শ্রীরামপুরেই হয়। গোকুল দাস নামক জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সমাধিই বঙ্গদেশে দেশীয় খৃষ্টানদের সর্ব্বপ্রথম সমাধি। গোকুলদাসের মৃত্যুর চার দিন পূর্ব্বেই তাঁহার সমাধির জন্ত মিশনরীগণ জমি ক্রয় করেন। প্রথম দেশীয় খৃষ্টান কৃষ্ণ পাল নিজ ব্যয়ে গোকুলের শবাধার মসলিনে আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সফলতা দেখিয়া পাদরীগণ কালীঘাটে লোক পাঠাইয়া পাঁচ শত টাকার পূজা দিয়াছিলেন। মুসলমানগণও খৃষ্টান হইবার জন্য শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিশনের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে একখানি বাড়ী ক্রয় করা হয় এবং ঐ বাড়ীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়; কাঠে খোদাই করা বাংলা অক্ষর শ্রীরামপুরে প্রস্তুত হয় এবং উক্ত অক্ষরে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ এই স্থান হইতে তাঁহারা প্রথম প্রকাশ করেন। দুই হাজার খণ্ড বাইবেল বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড। কেরী সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ উক্ত বৎসরে প্রথম মুদ্রিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালী রচিত ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য" এবং "খৃষ্টচরিত" ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত বঙ্গভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ। এই সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—

"The first prose work and the first historical one that appeared was the life of Pratapaditya by Ram Bose." (*Calcutta Review*—1850).

রামরাম বসু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গজ-কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে তাঁহার বাল্যশিক্ষা সমাধা হয়। বাল্যকালে ইনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। কেরী সাহেবের লিখিত কাগজপত্রাদি হইতে জানা যায় যে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই তিনি উপরি-উক্ত ভাষা দুইটিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইবার পর, তিনি উক্ত কলেজে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেন। তিনি অতিশয় শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং কেরী সাহেব লিখিয়াছেন যে বসু মহাশয়ের ন্যায় প্রগাঢ় অধ্যয়নপটু লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই। (বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু)

১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব ইংরেজদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত "কথোপকথন" বলিয়া আর একখানি পুস্তক রচনা করেন এবং শ্রীরামপুর হইতে উহা প্রকাশিত হয়। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ সহজ সরল চলতি ভাষায় পুস্তকখানি লিখিত এবং প্রত্যেক বাংলার অনুচ্ছেদের সহিত তাহার ইংরেজী অনুবাদও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে তৎকালের স্ত্রীলোকদিগের কলহবিষয়ক বর্ণনা হইতে তাহার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"আর শুনছিস নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চক্ষে মুখে পথ দেখে না। হ্যা দ্যাখ কালি যে আমার ছেল্যা পথে দাঁড়িয়া ছিল, তা ঐ বুড়া মাগী তিন চার ছেল্যার মা,—করিল কি, ভরন্ত কলসিড্যা অমনি ছেল্যার মাথার উপর ঢলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ঘাটের বাছা জ্বরে ঝ্যাঙরে পড়েছে। এমন গরজ সুখি, বল্লে আবার গালাগালি বকড়া করে। এ ভাতার খাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক। তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক, ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।"

কেরী সাহেব পনর বৎসর পরিশ্রম করিয়া একখানি সুবৃহৎ বাংলা ও ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন; ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম শোভন ও বিরাট্ অভিধান এবং ইহাতে আশী হাজার শব্দ আছে। ইহার পূর্ব্বে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী হইতে বাংলা (১ম খণ্ড) ও ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বাংলা হইতে ইংরেজী (২য় খণ্ড) মিঃ এইচ, পি, ফরস্টার (Mr. H. P. Forster) বাহির করেন। এই অভিধান সম্বন্ধে "সমাচার দর্পণে" (১৮ই জুন ১৮২৫—৬ই আষাঢ় ১২৩২) যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল:

"বাঙ্গালা-ডেকসিয়ানরি—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত ডাক্তর কেরি সাহেব পোনর বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাংলা ও ইংরাজি ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমেরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপ প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই সালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যে২ কর্ম্ম হইয়াছে সেই২ কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমান অংশ করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্

প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগ্দর্শনে'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

বাইণ্ড সমেত ১১০ এক শত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজি অর্থের সহিত যোগদেবকৃত গদ আছে তৎপরে আকারাদিক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।"

১৮২২ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডি সাহেব, (ইনি চল্লিশ বৎসর শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে কর্ম্ম করেন) একখানি ইংরেজী ও বাংলা অভিধান সঙ্কলন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান সাহেবও বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী বাংলা এই দুই প্রকার অভিধান প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত কেরী সাহেব ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা"র পঞ্চম সংস্করণ হইতে (শারীরস্থান বিদ্যা) Anatomyর অনুবাদ করেন; চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই-

খানিই বঙ্গভাষার প্রথম গ্রন্থ। ইহার পত্রসংখ্যা ৬৩৮ এবং মূল্য ৬৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।



শ্রীরামপুর সমাধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড সাহেবের সমাধিস্তম্ভ

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ মিশনের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় আগুন লাগিয়া সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যায় এবং সেইজন্য তাঁহাদের সাত হাজার পাউণ্ড ক্ষতি হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ, অভিধান ও একখানি তেলেগু ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। (*Life & Times of Carey, Marshman & ward,* Vol. 1)

শ্রীরামপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক জন ম্যাক (John Mack) "Principles of Chemistry" শীর্ষক একখানি ইংরেজী পুস্তক প্রণয়ন করেন। ম্যার্শম্যান সাহেবের অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করা হয়। পুস্তকখানির নাম দেওয়া হয় "কিমিয়া বিদ্যাসার"। এই পুস্তকখানিই বঙ্গভাষায় রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ, পত্র-সংখ্যা ১৬৯। কি ভাবে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নের কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবে:

"সোদিয়ামের খ্লোরিদ অর্থাৎ সামান্য লবনের ৮ ঔন্স আর গুড়াকৃত মাঙ্গানীসের কালা অক্সিজেনের ৩ ঔন্স হামামদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সের মিশ্রিত গান্ধকিকাম্লের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল্প অল্প উত্তপ্ত কর তাহাতে খ্লোরিন আকাশ নির্গত হইবে।"—কিমিয়া বিদ্যাসার, পৃষ্ঠা ৭২।

ম্যাকের চেষ্টায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র বাংলা অক্ষরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন কাগজের কল চালাইবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামপুরে ষ্টীম ইঞ্জিন আনীত হয়।

শ্রীরামপুর কলেজ মিশনরীদের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলেজের বাড়ীর জন্য জমি ক্রয় করা হয় এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কলেজ খুলিবার জন্য ডেনমার্কের রাজকীয় সনন্দ পাওয়া যায়। তাঁহাদের যত্নে এই কলেজের তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা বিভাগটি সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কলেজের সুদৃশ্য ভবনটি আজও বিদেশায় শিক্ষাবিদ্‌দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বিশ হাজার। কলেজের মিউজিয়ামে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা বাইবেল সযত্নে রক্ষিত আছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই স্থান হইতে মিশনরীগণ "দিগ্‌দর্শন—অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাই বাংলা ভাষার প্রথম মাসিকপত্র; ইহার ২৬শ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল, পরে এই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ইংরেজী সংস্করণ ১৬শ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। (*Bengali Literature in the Nineteenth Century*)

অতঃপর মিশন "সমাচার দর্পণ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) তারিখে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন; মার্শম্যান এই পত্রের সম্পাদক হন। ইহাই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া অনেকের ধারণা। রেভারেণ্ড লং সাহেবও সমাচার দর্পণকে বাংলার আদি সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (Early Bengali Literature and Newspapers, *Calcutta Review,* 1850, p. 145.) সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইত এবং দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া জনহিতৈষণামূলক প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইত। এই পত্রের চতুর্থ সংখ্যায় যে "ইস্তাহার" প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি—

"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যমত ১।০ টাকা প্রতি মাস লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১।০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস মাস এক টাকা দিতে হবেক।"

'সমাচার দর্পণের' উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"সমাচার দর্পণ।

কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকট সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না। এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা যাইত তবে কাহারও উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্তর সাহেবদের ও অন্য রাজ-কর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোক কর্ত্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।" (প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল।)

এই সাপ্তাহিক পত্র ক্রমশ: অর্দ্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল, সপ্তাহে দুই বার অর্থাৎ প্রতি শনিবার ও বুধবারে প্রকাশিত হইত। উক্ত সময়ে বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজী ভাষা শিখিবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল সেইজন্য শ্রীরামপুর মিশন এই কাগজখানাকে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী ও বাংলা এই উভয় ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন।

মার্শম্যান সাহেব ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে "গভর্ণমেণ্ট-গেজেট" নামক একখানি সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক হইলেন; তিনখানি সংবাদপত্র পরিচালনা করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া তিনি ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৪১ সমাচার দর্পণ বন্ধ করিয়া দেন। সম্পাদকের কর্ম্মবাহুল্যের জন্যই যে সমাচার দর্পণ বন্ধ হইয়া যায় তাহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত *The Friend of India* নামক সাপ্তাহিক পত্রে (২৩ ডিসেম্বর ১৮৪১) লিখিত আছে:

"The editor of the *Samachar Darpan* finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With two other journals, the *Friend of India* and the *Bengalee Government Gazette,* to attend to, it is not possible to do that justice to the *Darpan* whether in reference to the supply of editorial observations and intelligence, or to the translation of them into Bengalee, which a due regard for the interests of his subscribers and his own reputation require."

মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমাচার দর্পণ বন্ধ করিয়া দিলেও দীননাথ দত্তের চেষ্টায় ইহা পুন:প্রকাশিত হয়; এবং ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদনা করেন কিন্তু কিছুদিন পর ইহাও বন্ধ হইয়া যায়। অত:পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে টাউনসেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক তৃতীয়বার সমাচার দর্পণ 'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়' হইতে প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে

সমাচার দর্পণ।

সমাচার দর্পণের ১ম সংখ্যার প্রতিলিপি

'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' যাহা লিখিয়াছিলেন (১৫ই মে ১৮৫১) তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

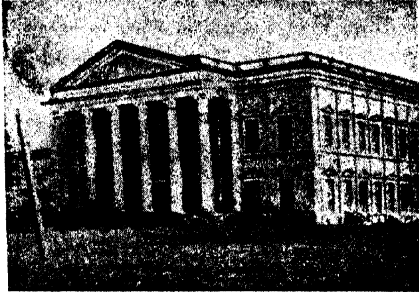
"The *Sumachar Durpun*—We are happy to perceive that this native journal has been revived. It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or died."

তৃতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ দেড় বৎসর চলিবার পর একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। ১লা বৈশাখ ১২৬০ (১২ই এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, "সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে।"

সমাচার দর্পণ ব্যতীত 'আখবারে শ্রীরামপুর' নামক পারসী-ভাষার একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে (২৫শে বৈশাখ ১২৩৩) শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' যে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সংবাদপত্রখানি নবকলেবরে 'স্টেটস্‌ম্যান' (The Statesman) নামে আজও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

বাঙালী কর্ত্তৃক পরিচালিত "জ্ঞানারুণোদয়" নামক একখানি মাসিকপত্র ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী (১৯শে মাঘ

১২৫৮) শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়, কালিদাস মৈত্র পত্রিকাখানি সম্পাদন করিতেন। পর বৎসর উক্ত পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত "চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়" ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় এবং এই প্রেস হইতেই শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা বাহির হইত। 'জ্ঞানারুণোদয়' সম্বন্ধে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :



শ্রীরামপুর কলেজ ভবন

"শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশ্ত পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।"

জ্ঞানারুণোদয়ের কর্তৃপক্ষ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই (২৪শে আষাঢ় ১২৫৯) চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে "সংবাদ শশধর" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত। কিছুদিন চলিবার পর ১২৫৯ বঙ্গাব্দেই 'সংবাদ শশধর' বন্ধ হইয়া যায়। এই বিষয়ে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে" নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"গত বৎসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 'শশধর' নামে শ্রীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন।"

১২৬৪ সালের ২রা বৈশাখ শ্রীরামপুর 'তমোহর' যন্ত্রে জে, এচ, পিটার্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া "বিজ্ঞান-মিহিরোদয়" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরে এই পত্রিকা পাক্ষিকে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর যন্ত্রালয় হইতে শ্রীমেরিডিথ টৌন্সেণ্ড কর্ত্তৃক "সত্যপ্রদীপ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এক বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬শে এপ্রিল ১৮৫১।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীরামপুর যন্ত্রালয় হইতে "The Evangelist মঙ্গলোপাখ্যান পত্র" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকাখানি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার বামদিকে ইংরেজী অংশ ও ডানদিকে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত।

শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ ব্যবসায় চালাইয়া বেশ লাভবান হইতেছিলেন, সেই সময় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত ডেনমার্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাছে এতদ্দেশস্থ দিনেমারগণও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন সেইজন্ত ব্যারাকপুর হইতে এক দল সৈন্ত আসিয়া শ্রীরামপুর দখল করে এবং উক্ত স্থান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। অল্পদিন পরে এই শহর দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ এই শহর আবার দখল করেন এবং সাত বৎসর ইহা তাঁহাদের অধীনে থাকে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে এই উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধবিরতি হইলে পুনরায় ইহা দিনেমারদের প্রত্যর্পিত হয়। কিন্তু এই সময়ে দিনেমারদিগের ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হওয়ায় দিনেমার সরকারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্ত ডেনমার্কের রাজা শ্রীরামপুর বিক্রয়ের সঙ্কল্প করেন। হরিনারায়ণ গোস্বামী দিনেমার কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ গোস্বামী কোম্পানীর মুৎসুদ্দি হইয়া ব্যবসায়াদির দ্বারা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ডেনমার্কের অধিপতি যখন শ্রীরামপুর বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন গোস্বামী ভ্রাতৃগণ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় শ্রীরামপুর খরিদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিবন্ধকতায় তাহা হইয়া উঠে নাই। (*Hughly District Gazetters.*)

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ডেনমার্কের রাজা শ্রীরামপুর, ট্রানকোয়েবার ও বালেশ্বর সাড়ে বার লক্ষ টাকায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে দিনেমারদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্ত লুপ্ত হয়। শ্রীরামপুর হইতে দিনেমারগণ চলিয়া গেলেও তাঁহাদের নির্ম্মিত গঙ্গাতীরস্থ সুরম্য অট্টালিকাসমূহ আজও তাঁহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীরামপুরের যে ভবনটি বর্ত্তমানে আদালত-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে উহা পূর্ব্বে দিনেমার গবর্ণরের আবাসস্থল ছিল। এতদ্ব্যতীত কোর্ট লেন, চার্চ্চ ষ্ট্রীট প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তারও তাঁহারা নামকরণ করিয়াছিলেন। এই রাস্তাগুলি অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্রাকারে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান সুন্দর গির্জ্জাটি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৩,৩৮৬৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করা হয়। কনভেণ্টটি অপেক্ষাকৃত নূতন সম্ভবত: ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী দিনেমারগণের ব্যবহৃত পনরটি কামান একত্রে সেণ্ট ওলাফস্ গির্জ্জার সম্মুখে স্থাপন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া একটি প্রস্তরফলকে শ্রীরামপুরের সহিত দিনেমারদিগের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে উৎকীর্ণ কথাগুলি যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল :

'This tablet has been erected to commemorate the connexion with Serampore of the Danes who after acquiring 60 bighas of land as a basis for their trading activities in Bengal governed this town and district then called Fredericknagore, from 1755 to 1845 when they sold this property to the British. In spite of the

poverty of the colony it had a reputation for great charm and cleanliness.

"The cannon were employed for the firing of salutes, when no longer required for this purpose, they were for many years scattered round the town and used as lamp posts until they were reassembled and set up in the neighbourhood of the old Danish Government House and of St. Olaf in the year 1940."

উত্তরে চাতরা ও দক্ষিণে মহেশ বল্লভপুর নামক স্থানগুলি শ্রীরামপুরের চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে এই দুইটি জায়গা শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন। চাতরা একটি প্রাচীন স্থান, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। এই মন্দির কাশীশ্বর পণ্ডিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের এক জন পার্শ্বচর ছিলেন। এই মন্দিরের এক দিকে গৌরচন্দ্র ও অন্য দিকে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান। কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশ অধুনা চৌধুরী বংশ বলিয়া খ্যাত। কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে এই স্থানে অদ্যাপি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চাতরার শীতলাদেবীও জাগ্রতা দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই স্থানে বৈশাখ মাসের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বহু ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। দেওয়ান ঘাট নামে এই স্থানে গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; রংপুরের দেওয়ান রামহরি চক্রবর্ত্তী এই ঘাটটির প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার সোপানাবলীর নির্ম্মাণ-কৌশল চমৎকার। বহুকাল যাবৎ চাতরা বাণিজ্য প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং এই স্থানের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও বহু প্রাচীন। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ডাক্তার সর নীলরতন সরকার এই বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। দশম শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস কৃত মনসা-মঙ্গলে চাতরার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মাহেশও একটি প্রাচীন স্থান। এখানকার রথের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে প্রচারিত। মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। কলিকাতার বড়বাজারের মল্লিক-বংশোদ্ভব নিমাইচরণ মল্লিক পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে ১২৬৫ সালে সত্তর ফুট উচ্চ এই সুন্দর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নিমাইচরণ মল্লিক প্রভূত বিত্তশালী, দেবদ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন এবং উইল করিয়া বত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে ও দেবসেবায় ব্যয় করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া যান।

মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে পুরী হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এখানে মন্দির নির্ম্মাণ এবং তন্মধ্যে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উপরি-উক্ত দেব ঘটনার স্মরণার্থেই প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা উৎসব মহা ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আবার ভিন্ন জনশ্রুতি এই যে, ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী পুরী তীর্থে গমন করিলে তিনি স্বপ্নে মাহেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য আদিষ্ট হন। মাহেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তিনিই উক্ত মূর্ত্তিগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। (পুরাতনী, শ্রীহরিহর শেঠ, পৃষ্ঠা ১৪)

বিগ্রহের বেদীতে নিম্নলিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছে—

৺রামতনু মল্লিক ও
শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী
১২৬৫

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবায়েতগণের বর্ত্তমান উপাধি 'অধিকারী'। মাহেশের প্রথম রথখানি এক মোদক নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন (Hughly District Gazeeteers)। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা লিখিয়াছেন যে জগন্নাথের নিত্য ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের দান বার্ষিক ১১২৲ ও রামমোহন মল্লিকের



শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দির

ট্রাষ্ট ফাণ্ডের দান ১৫০৲, খিচুড়ী ভোগের জন্য, নিমাই মল্লিকের স্বতন্ত্র দান বার্ষিক ৪৩৬৲। নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক গঙ্গার ধারে সুদৃশ্য রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। (সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্ত্তি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯)

মাহেশ-বল্লভপুরের দেবসেবা ও নিমাইচরণ মল্লিক সম্বন্ধে "সংবাদ-প্রভাকরে" (১৭ই ফাল্গুন ১২৬৪) যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

"প্রাতঃস্মরণীয় সমূহ সংক্রিয়ান্বিত বিপুল বিত্তশালী ৺নিমাই চরণ মল্লিক মহাশয় ইংরাজী ১৮০৬ সালে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ৩২০০০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিয়া পুত্রগণের প্রতি ভারার্পণ করত আপনার উইলে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বাল্মীকি পুরাণ প্রদান এবং অম্বিকার মহাপ্রভুর মন্দির, কলিকাতায়

গঙ্গাতীরে কটি ঘাট, বৃন্দাবনে দুইটা কুঞ্জ, জগন্নাথক্ষেত্রে মঠ স্থাপন আর মাহেশ, বল্লভপুর, কাঁচড়াপাড়ায় দেবসেবা প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে অনুমতি করেন।...এই স্থলে ৺নিমাই-চরণ মল্লিকের নামোল্লেখপূর্ব্বক এই মাত্র কহিতেছি, তিনি যথার্থ মানব-দেহ ধারণ করত: মানবজন্মের ও ধনের সার্থকতা করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণেরাও সাধু কেননা পৃথ্বীব্যাপিনী কীর্ত্তি স্থাপনে অনুরত হইয়া কুলের, ধনের, মনের এবং জীবনের সার্থকতা করিতেছেন।"



মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির

জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে *List of Ancient Monuments in Bengal* (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল:

"MAHESH—*Temple of Jagannath*—It is said that the Jagannath of Mahesh is about the same date with the Radhavallabh of Vallabhpur, *i.e.*, more than 350 years old. The idol Jagannath, along with Subhadra and Valarama is made of neem wood. It has a little zamindary to meet its expenses. On the occasion of Snanjatra and Car festivals, much numbers of people gather here. On the Sunday intervening between the Rathjatra and the Ultarath, this place is crowded annually by the Babus of Calcutta. This occasion is ordinarily called the Dvadasa Gopal Festival of Mahesh."

হাণ্টার সাহেবের *Statistical Account of the Hooghly District* নামক গ্রন্থে (পৃ. ৩০৬) জগন্নাথ ও রাধাবল্লভের মন্দিরের বিষয় লিখিত আছে।

মাহেশের নিকট বল্লভপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের বিগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ এবং রাধাবল্লভের নামানুসারেই এই স্থানের নাম বল্লভ-পুর হইয়াছে। কথিত আছে যে চাতরার রুদ্র পণ্ডিত দেব-বিগ্রহ নির্ম্মাণের প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং সেই অনুযায়ী গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা তৎকর্ত্তৃক বল্লভজীউ ও রাধিকার যুগলমূর্ত্তি গঠিত হয়। আবার কাহারও মতে খড়দহের বীরভদ্র গোস্বামী এই যুগল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু বিগ্রহ তাঁহার মনোমত না হওয়ায় তিনি উক্ত বিগ্রহ স্থানীয় লোকদের হস্তে দিয়া দেন। কাল কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত যুগল মূর্ত্তি এবং বল্লভজীউর বিরাট্ মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। আবার এরূপও শোনা যায় যে, প্রস্তরখণ্ড নাকি গঙ্গার উপর দিয়া ভাসিয়া বল্লভপুরের ঘাটে আসিয়া উঠে। বিগ্রহও নাকি ঘাটের ধারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত নিমাইচরণ মল্লিকের পিতা নয়ানচাঁদ মল্লিক বর্ত্তমান সুন্দর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গার ধার হইতে বল্লভজীউ ও রাধিকার যুগলমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট, দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৪০ ফুট; মন্দিরের প্রবেশপথ দক্ষিণ মুখে এবং ইহার সম্মুখে একটি সুবৃহৎ নাটমন্দির আছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাধাবল্লভজীউর এক জন ভক্ত ছিলেন এবং দেবসেবাদির জন্য তিনিও বহু অর্থ ব্যয় করেন। মন্দিরগাত্রে দাতা ও শিল্পীর নাম এবং মন্দির নির্ম্মাণের সময় উৎকীর্ণ আছে।

"রাধাবল্লভের মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই দফায় ৮৩৬৲ পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন নিমাইচরণ বিগ্রহের নিত্য সেবার জন্য ৩৬৲ আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।" (সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্ত্তি, পৃ. ২।) ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা "হুগলী জেলার বল্লভপুরে নয়ানচাঁদ 'বল্লভজী ও রাধিকা'র যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন" বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতেই ছিল; নয়ানচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বল্লভপুরের মন্দির সম্বন্ধে *List of Ancient Monuments in Bengal* নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"VALLABHAPUR—*Temple of Radhavallabha*—The temple of Radhavallabh is situated in the village of Vallabhpur, about a mile and a half from Serampore Station, in the sub-division of Serampore.

There is a tradition that Virbhadra Goswami of Khardah brought a piece of stone from the Nawab of Gaur. Out of this stone, the first image that was hewn was that of Radhavallabh and as the idol was not to his liking, he made it over to the people of Vallabhpur. According to this tradition, Radhavallabh must be more than 350 years old. But its present temple is comparatively of very recent date. Some say that it is only some 70 or 80 years old. The ruins of the old temple on the side of the river Hooghly are visible even at the present day. Of the festivals performed in honour of this deity, Snanjatra and the Car festival are very famous. Formerly on the occasions of these festivals, the idol of Jagannath of Mahesh used to come here but owing to dispute, that practice has been discontinued and a new Jagannath made by the order of late Siva Krishna Datta is exhibited at the time of such festivals. Radhava has a little zamindary of its own to meet its expenses. The temple of Radhavallabh is

of an ordinary character, having only one steeple in it. (Page 46).

শ্রীরামপুর রেল ও ষ্টেশনের অনতিদূরস্থ গোরস্থানে ডাক্তার উইলিয়াম কেরী, জন মার্শম্যান ও জন ওয়ার্ড এই তিন জন লোকহিতৈষী মহাত্মার সমাধি বিদ্যমান। এইস্থানের শ্রীরাম-পুরের সেণ্ট ওলাফ গির্জ্জায় একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকেও উঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে—

"In addition to their many other labours in the cause of religion and humanity from the opening of the church in 1805 to the end of their lives gave their faithful and gratuitous ministrations to the congregation here assembled."

উক্ত সমাধিক্ষেত্রে আর এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি আছে। তিনি হইতেছেন দিনেমার গবর্ণমেণ্টের বিচারক এবং তৎকালীন শ্রীরামপুরের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি জে এস হলেনবার্গ (J. S. Hohlenburg)। তিনি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার সমাধি-গাত্রে লিখিত আছে—

"Chief of Danish Majesty's Settlement of Fredericknagore. It was erected by a number of European and Native inhabitants in commemoration of his singular worth both public and private . . . He was distinguished for every virtue which belongs to a good Magistrate."

শ্রীরামপুরে দিনেমারগণের বিচার পদ্ধতি একটু অদ্ভুত রকমের ছিল; বিচারপতিকে মুখে গিয়া বলিলেই দিনেমার জজ বিচার করিতেন এবং বিচারের সময় বাদী বা প্রতিবাদীর জবান-বন্দী লওয়া হইত না বা কোন কোর্ট-ফীর প্রয়োজন হইত না। বিচারপতি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। এই সম্বন্ধে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দিনেমার-জজের বিচার সম্বন্ধে একটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

কোন সময়ে শ্রীরামপুরের গোস্বামী মহাশয়দিগের সহিত একটি লোকের বিবাদ হইয়াছিল; সেই লোকটি বিচারকের নিকট গিয়া নালিশ করিলেন এবং নালিশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিচারককে বিলক্ষণ উপহার সামগ্রীও দিলেন। তৎকালে তাহার গাত্রে একখানি লাল রঙের শাল ছিল। জজ-সাহেব উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'মিস্তে তুমি ঘরে জেতে কর।' গোস্বামী মহাশয় এই সন্ধান পাইয়া জজ-সাহেবকে অধিকতর উপহার সামগ্রী দেওয়ায় তিনি কহিলেন 'বাবা তোর ডর নাই, তোর ডিক্রী তোর লাকে (Luck) বুঝিতেছে।' পরদিন বাদী গলাজলী সাদা শাল এবং প্রতি-বাদী লাল শাল গায়ে দিয়া জজ-সাহেবের নিকটে গিয়া হাজির হইল।

জজ-সাহেব দেখিলেন বাদীর গায়ে সাদা শাল ও প্রতি-বাদীর গায়ে লাল শাল; বিশেষতঃ প্রতিবাদী (গোস্বামী মহাশয়) তাঁহাকে অধিকতর উপহার-সামগ্রী দিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মাটির দিকে চাহিয়া রায় দিলেন যে 'রাঙা শাল ডিক্রী।' তখন বাদী জজ-সাহেবের নিকট গিয়া দুঃখ জানাইয়া কহিলেন 'হুজুর কি হইল?' তাহাতে হাকিম কহিলেন 'বাবা আমি কি করিতে পারি; তুমি পূর্ব্ব দিন লাল শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছিলে, তাহাতে তোমাকে বাদী মনে করিয়া লাল শাল ডিক্রী দিয়াছি। এখন হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না—আমি কি করিব, তুমি নিজের দোষে লজ্জা পাইলা। (বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে, পৃ. ৮৮)।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশ, সাহাবংশ ও দে বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। গোস্বামী বংশের আদি নিবাস পাটুলি গ্রাম, সেওড়াফুলি রাজার নিকট হইতে জমি লাভ করিয়া তাঁহারা এই স্থানে বসবাস করেন এবং বিষ্ণুপুরের রাজার অনুগ্রহে শ্রীশ্রীরাধামোহন, গোপালজীউ ও শ্রীরাধিকা এই তিন দেববিগ্রহের সেবাতে নিযুক্ত হইয়া বহু নিষ্কর দেবোত্তর জমি প্রাপ্ত হন; ইঁহাদের কৌলিক উপাধি চক্রবর্ত্তী। এই বংশে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে "রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হল" নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভবনেই মিউনিসিপ্যালিটির আপিস ও শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি অবস্থিত। শ্রীরাম-পুরের সাহাবংশও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও দান ধ্যানের জন্য বিখ্যাত; এই বংশের ক্ষেত্রমোহন সাহা শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলার অনুষ্ঠান ও অনাথদিগের সেবার জন্য ট্রাষ্ট করিয়া বহু অর্থ দান করিয়া যান। শ্রীরামপুরের দে-বংশও সঙ্গতিপন্ন এবং ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামপুরের যাবতীয় জন-হিতকর কার্য্যে ইঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা তিলি বংশোদ্ভব। এই বংশের রামচন্দ্র দে ১২৩০ সালের আষাঢ় মাসে পরলোকগমন করিলে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন। ইহাই সম্ভবতঃ শ্রীরামপুরের শেষ সহমরণ। আর এক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তির নামোল্লেখ না করিলে শ্রীরাম-পুরের কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, তিনি হইতেছেন স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত। ১৩৩৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দেবসেবার ও শ্রীরামপুরের বহু জন-হিতকর কার্য্যের জন্য দান করিয়া যান।*

*প্রবন্ধে ব্যবহৃত যাবতীয় আলোকচিত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর কর্ত্তৃক গৃহীত। প্রবন্ধ রচনায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাময়িক পত্রের ইতিহাস হইতে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এজন্য উভয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।—লেখক

পেঁচার ডাক

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

সমস্ত ব্যাপারটা ভীষণ তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। মা একটুও কাঁদলে না। বলেকও না। কাঁদলে না শুধু সে-ই। ম্যানেক কেঁদে চোখ-মুখ ফোলালে, আর আমার খুব কান্না পেলেও কেমন যেন কাঁদতে পারলাম না। তার দুদিন পরে, আমি যখন বাড়ীতে একেবারে একলা, মা ছেলে পড়াতে গেছে, আর কাশ্যা গেছে বাজারে···তখন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম, তারপর হঠাৎ চুপ করে গেলাম, কারণ মনে পড়ল আমার সে কান্না কেউই শুনতে পাচ্ছে না। সমস্ত বাড়ীটা খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু কোথায় যেন কার পায়ের শব্দ, খস্ খস্ আওয়াজ, চুপি চুপি কথা। কাঠের মেঝেটা মাঝে মাঝে কটকট করে ওঠে, আর জানালার পর্দাটা দোলে আস্তে আস্তে, কে যেন এক্ষুনি সেটা সরিয়ে দিয়েছে।···কে যেন আমার পিছনে, ঠিক আমার পিছনটায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার নিশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পাই। তার নিশ্বাসে আমার মাথার চুল-গুলো একটু নড়ে উঠল। তাই ঐ খালি বাড়ীটায় একা আমার ভারি ভয় করতে লাগল, বাড়ীটার ভেতরে ঠিক যেন শাখের ভেতরকার মত শব্দ হচ্ছে।

কাশ্যার যেমন অভ্যেস, সে বাজারে গিয়ে কার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, যদিও মা তাকে বলে দিয়েছে সে যেন তক্ষুনি বাড়ী ফেরে। আমি টেবিলের কাছে জড়সড় হয়ে বসে সেই ভীষণ থমথমে নিঃশব্দ আওয়াজ শুনি। একটু নড়ে বসতেও ভরসা হয় না। হঠাৎ ওঘর থেকে আমার নাম ধরে কে যেন ডাকলে। আমার একটুও ভুল হয় নি, নিশ্চয়ই। ঠিক শুনতে পেলাম। প্রথমে চুপি চুপি পরে একটু জোরে, তারপর আরও জোরে···তারপর সব চুপচাপ। কারণ আমি তার উত্তরও দিলাম না, আর একটুও নড়লাম না। আমার বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল, আবার আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তারপর ওঘরে সব চুপচাপ আর হঠাৎ শুনি কার পায়ের শব্দ। খুব আস্তে অথচ একেবারে স্পষ্ট, হালকা জুতোর খটখট আওয়াজ। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সেই পায়ের শব্দগুলো যেন জানালার দিকে এগিয়ে চলে আস্তে আস্তে, তারপর আমি যে ঘরে বসেছিলাম তার ঠিক দোরগোড়ায় এসে যেন থেমে গেল। সে থমকে দাঁড়াল, আমিও নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করি···তখন শব্দগুলো বারান্দার দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল, শুনতে পেলাম দোরের হাতলটা আস্তে আস্তে নড়ে উঠল, ক্যাঁচ করে দোর খোলার আওয়াজ হ'ল। তারপর সেই পায়ের শব্দগুলো দোর ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে চলে গেল। আবার সব চুপচাপ।

ছবির সেই বুড়ীটা আমার দিকে বারবার তাকায় যেন আগেকার মত করে নয়। যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল, আমি ওঘরে চলে গেলাম। আগের মতই সেখানে জানলার কাছে চেয়ারখানা পাতা, তবে সেটা খালি···দোরের দিকে তাকালাম সেটা একটু খোলা যেন এইমাত্র কে বেরিয়ে গেছে। ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, কেউ নেই। সিঁড়ির দিকে দোরের হাতলটা ধরে নাড়া দিই প্রাণপণে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বারান্দাটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। চেঁচিয়ে ডাকি: দিদিমা। আবার ডাকি দিদিমা, দিদিমা। কেউ সাড়া দেয় না। তখন বুঝতে পারলাম দিদিমা নেই।

জানি, তখন মাকে ডাকলেও সাড়া পাব না, মা ছেলে পড়াতে গেছে, তাই আর না ডেকে চুপি চুপি একপা একপা করে আমাদের ঘরে ফিরে এলাম, আমি একা, একেবারে একা।

কাঞ্চা বাড়ী ফিরে জিজ্ঞেস করলে আমার খুব ভয় করছিল কিনা। বললাম, একটুও না।

তারপর সবাই খেতে বাড়ী ফিরল, কান্নায় কাঞ্চারও চোখ লাল হয়ে উঠেছে, সে সবার সামনে থালা পেতে দিলে। থালায় কেউ হাতও দিলে না। মার দিকে আমরা তাকাতে পারি না। জানি তার মনের ভেতর কি রকম করছে। মা কেমন থমথমে হয়ে গেছে, যেন সে মা-ই নয়। আগে মাকে ওরকম দেখি নি। হঠাৎ ম্যানেক্ টেবিলের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। মা কি যেন বলতে গেল, পারলে না। উঠে ওঘরে চলে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলে। ম্যানেকের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। বলেক তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে মা কাছে থাকলে কাঁদিস নি। বুঝতেও কি পারিস না?···

খুব আস্তে আস্তে চুপি চুপি বললে, ওর ওরকম গলা আগে শুনিনি। ম্যানেক তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার কান্না থেমে গেল একেবারে। আমরা চুপ করে বসে রইলাম, মনে হ'ল বলেক কি যেন ভাবছে। কি ভেবে সে মায়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে। তারপর ফিরে এসে বই নিয়ে বসল।

কাঞ্চা টেবিল সাফ করে জিজ্ঞেস করলে, আমরা বেড়াতে যাব কি না, কিন্তু তার কথার কেউই উত্তর দিলে না। ঘরের এক কোণে জড় হয়ে আছে সেই পিজবোর্ডের ইঞ্জিন লাইন, পয়েন্ট, যাত্রীদের গাড়ী, মালগাড়ী। আর সেই গাড়ীটা যেটার দিকে দিদিমা তাকাতে চায় নি—শববাহী, ক্রুশ আঁকা গাড়ীটা।

সন্ধ্যেবেলা আরও বিশ্রী লাগল। একটু রান্নাঘরে বসতে গেলাম। সেখানে নীচেকার সেই দারোয়ানের বউ বসে আছে, সেই যার স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছিল, তারপর নিউমোনিয়ায় মারা গেল। বললে, রবিবার আমাদের চিলের ছাদে সে পেচার ডাক শুনেছে। একেবারে আলসের নীচে তার বিশ্রী চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। কাকে ডাকছিল, পেঁচা ডাকতে আরম্ভ করলে কাউকে না নিয়ে যায় না। পেঁচাটা নাকি রোজ সন্ধ্যেবেলা ডাকত, পরশু অবধি সমানে ডেকেছে। দরোয়ানের বউ চোখের পাতা এক করতে পারে নি। বলে তার স্বামীকে নিয়ে যাবার আগেও ঐ পেঁচাটা ঐ রকম

করে ডাকত। পেঁচা নাকি ভারি অলক্ষুণে। ঐ চিলের ছাদে যত বার ডাকে তত বারই নাকি কেউ না কেউ···

কাশ্যা মুখে মাথায় হাত ঠেকিয়ে ঠাকুর নমস্কার করে। দারোয়ানের বউ চুপ করে। তারপর আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এবার আমাদের কি হবে? বললাম তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বলে দড়াম করে দরজা আছড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। খিল খিল করে হেসে উঠে।···ও কথা মাকে বলি না, শুধু বলেককে বললাম। সে বললে দেখলি ত। রান্নাঘরে তুই যাস কেন? ও ঠিকই বলেছে, আমি আর রান্নাঘরে যাব না।

রাত্তিরবেলা পেঁচার ডাক শুনতে পেলাম। আমার বিছানার কাছেই কোথায় এসে বসেছে। কেবল কাঁদে, উ উ উ।··· উ-উ-উ।···তার জ্বল জ্বলে চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তার চোখ রাস্তার গ্যাসের আলোর মত। তারপর হঠাৎ নিবে গেল। বুঝতে পারলাম মা ও-ঘরে আলোটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে। দোরের ছুটো ফুটো দিয়ে গোল গোল ছুটো আলো আসছিল। পেঁচা নয়, ঘুমিয়ে পড়ি।

সকালে বলেক আর য়ানেক নিজে নিজেই পোষাক পরে খাবার খেয়ে একসঙ্গে ইস্কুলে গেল। তখন পৌনে আটটাও বাজে নি। য়ানেক বাড়ী ফিরতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলেক তাকে কি বললে, তখন ওরা বেরিয়ে গেল একসঙ্গে দু-জনে। দেখতে পেলাম বলেক য়ানেকের কলারটা ঠিক করে দিলে। ওরা বেরিয়ে গেলে কাশ্যা বললে, খোকাবাবুরা তাদের জন্ত কাগজে মোড়া রুটিগুলো নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। সেই প্রথম তাদের ওরকম ভুল হ'ল। মা ভারী আশ্চর্য্য হ'ল তাদের ঐরকম ভুল হওয়া দেখে।

তারপর মা ছেলে পড়াতে গেল আর কাশ্যা গেল নীচের ঘর থেকে কয়লা আনতে। আমিও খুব তাড়াতাড়ি করতে লাগলাম। ক্যাশা ফিরে দেখে আমার পোষাক পরা হয়ে গেছে। এটা-ওটা ঠিক করে দিতে গেল, একটা বোতাম কিংবা ঐ রকম কিছু। কিন্তু সব ঠিক আছে, একটুও ভুল হয় নি। ও যেন একটু রেগে গেল, আমি ওর সঙ্গে বাজারে গেলাম। ওকে আমার হাত ধরতে দিলাম না, কারণ ওরকম হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার মানেই হয় না।

চারদিকে বরফ জমে আছে আমাদের বাড়ীর কাছে বাগান-গুলোয়, শহরের পার্কগুলোর গাছে গাছে তুষার লেগে আছে। বাড়ীর ছাদে, বেড়ার গায়ে, টেলিগ্রাফের তারে। সর্ব্বত্র। কাশ্যাকে জিজ্ঞেস করলাম তুষার মানে কি? ও কিছুই বুঝতে পারে না, শুধু আমার কথাটা ঘুরিয়ে বললে, তুষার মানে আবার কি?···ওকে আর জিজ্ঞেস করি না। ও কিছুই জানে না। বিকেল বেলা মাকে জিজ্ঞেস করব।—না হয় বলেককে, সে নিশ্চয় জানে।

সারা সকালবেলাটা আমায় আর কেউ গল্প বললে না। একটা কথাও না। উক্রাইনার কথা সিসিলির কথা। পোপ আর আমাদের দেশটাকে কারা কি ভাবে ভাগাভাগি করে নিলে সেই সব গল্প। সেই বাদেন-এ কেমন আঙুর জন্মায়, স্তেপ-এ বরফের ওপর দিয়ে কি করে ছোটে—তিন ঘোড়ার ত্রয়কা। মৎসার্টের কথা আর আলেক্সান্দের আর কারল দাদা-মশায়দের কথা যারা বিদ্রোহে মারা যায়।···উক্রাইনা নেই, সিসিলিতে আর পামগাছও নেই। রাণী য়াদ্‌ভীগাও নেই। গালিৎসিয়ার হত্যাকাণ্ডও নেই, দিদিমা নেই।

শুধু পার্কগুলো আর বাজারের ওপর তুষার জমে রয়েছে। পাহারাওলার গোঁফের উপর, পথের আলোগুলোর উপর··· সর্ব্বত্র। আর সেই তুষার না কুয়াসার মাঝখানে কোথায় গির্জ্জার চুড়োর উপরে দাঁড়িয়ে কে যেন বিউগল বাজায়। শাদা আর নীলচে। তুষার মানে কি?

পার্কের ভেতর দিয়ে বাড়ী ফেরবার সময়ে কুয়াসার মধ্যে থেকে হঠাৎ সূর্য্য উঠল। বরফে ঢাকা একটা চেষ্টনাট গাছের ডালের উপর একটা পেঁচা বসে আছে। একটুও নড়ে না, অন্ধ চোখ দুটো দিয়ে সেই সোনার সূর্য্য আর নীলরঙের দিনের দিকে চেয়ে আছে। তার মাথার উপরে অনেক উঁচু ডালপালাগুলোর উপর জমেছে এক ঝাঁক কাক আর দাঁড়-কাক। তারা যেন রেগে চিৎকার করে ক্ষেপে উঠেছে। কাল কাল পাখীগুলোর যেন প্রকাণ্ড একটা মেঘ।

নীচে মাটির উপরে জড় হয়েছে একপাল ছেলে। তারা জমে যাওয়া হাত দিয়ে বরফের তলা থেকে ঢিল খুঁজছে। দশ-বার জন ছেলে। আর পেঁচাটা একলা, তাও অন্ধ। ওরা ঢিল ছুঁড়তে লাগল কিন্তু একটাও তার গায়ে লাগে না। খানিক পরে একটা তার গায়ে গিয়ে লাগল। পেঁচাটা ডানা ঝাপটে বরফ ছিটকে নীচের একটা ডালে গিয়ে বসল। তারপর তার সেই অন্ধ চোখ দুটো দিয়ে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইল, বেচারা কিছুই দেখতে পায় না।

দাঁড়কাকগুলো আবার চারদিকে ছোঁ মেরে উড়তে লাগল। আবার ঢিলের পর ঢিল যায় তার দিকে।

কাশ্যার হাতটা শক্ত করে ধরে বললাম: চল চল শীগ্‌গির···

পোলীয় লেখক জীগ্‌মুন্ত নভাকভ্‌স্কির "উত্তমাশা অন্তরীপ" গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

রেশনিং ও বাঙালী গৃহিণী

জনৈকা বাঙালী গৃহিণী

বিলাতী দৈনিক ও মাসিক কাগজগুলি খুলিলেই দেখা যায় যে, রেশনিং ও যুদ্ধকালীন অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে ওদেশের গৃহিণীদের যে সকল অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা লইয়া তাঁহারা বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। কেহ-বা সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া রেশন-ব্যবস্থার ত্রুটি উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ-বা প্রবন্ধ লিখিয়া কি উপায়ে স্বল্প রেশনে স্বামী, পুত্র-কন্যা সকলের আহারের ব্যবস্থা করা যায় তাহা বাৎলাইতেছেন, কেহ-বা রেশন-ব্যবস্থার গলদ কি প্রকারে দূর করা যায়, নিজের বুদ্ধিবিবেচনা-মত তাহারও পথনির্দ্দেশ করিতেছেন। এ সকল লেখালেখির ফল কি দাঁড়ায় জানি না, সত্যই কি গৃহিণীদের অসুবিধার দিকে সরবরাহ-বিভাগের কর্ত্তারা দৃষ্টি দেন এবং গলদ দূর করিবার চেষ্টা করেন? না এই লেখাগুলি একেবারেই ব্যর্থ হয়?

এদেশের নজির দেখিয়া যদি ওদেশের বিচার করিতে হয় তাহা হইলে কাগজে লেখালেখি যে অর্থহীন তাহা মানিতেই হইবে। রেশন-ব্যবস্থা হওয়া অবধি তাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত বাংলা ইংরেজী দৈনিক মাসিক সকল রকম কাগজে উহার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে বিতর্ক বাদপ্রতিবাদ অনুযোগ-অভিযোগ কতই দেখা গেল, কিন্তু সরকারী দপ্তরে একবার যে কালির আঁচড় পড়িয়াছে তাহা ক্ষালন করে কাহার সাধ্য। ইহা দেখিয়াই মনে হয়, বাঙালী গৃহিণীরা যে তাঁহাদের গত তিন বৎসর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কাগজে দু' চারি ছত্রও লেখেন নাই তাহার কারণ বোধ করি তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে অরণ্যে রোদন করিয়া কোনও লাভ নাই। আর যদিও বা লাভ থাকিত বর্ত্তমান রেশন-ব্যবস্থা ও তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া তাহা দ্বারা স্বামী-পুত্র-কন্যার পেট ভরাইবার চিন্তা ও পরিশ্রমেই তাঁহাদের দিন যায়, লিখিয়া অনুযোগ-অভিযোগ করিবেন সে সময় কোথায়?

যে সকল বড় শহরে রেশনিং চালু হইয়াছে, সেখানে চাউল, আটা, চিনি, লবণ এবং কয়েকমাস হইল সরিষার তৈল পাওয়া যায়। এতদিন পর্য্যন্ত চাউল এবং আটার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার ছিল না যদিও কলিকাতা শহরের এবং অন্যান্য স্থানের রেশনের চাউলের নমুনা দেখিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকে অবাক হইয়া গিয়াছিল। আটা ত মুখে দেওয়া যায় নাই, এখনও যায় না। সকল স্তরের মহিলাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি কি গ্রামের কি শহরের অধিবাসিনী কেহই কখনও জীবনে এমন চাউলের ভাত রান্না করেন নাই।

কিন্তু বন্যার পর বস্তা পচা চাউল বাহির হইলেও এবং সেই সরবরাহ বিভাগের ভাণ্ডারের পচা চাউল জনসাধারণকে খাইতে হইলেও সে ভাণ্ডারীকে শাস্তি দিবার ত কেহ নাই, উপরন্তু হয়ত বিভাগীয় খাদ্য-বিশেষজ্ঞ সার্টিফিকেট দিয়া দিবেন যে মনুষ্যেরা এই প্রকার চাউল খাইয়া থাকে। আমরা অবাক হইয়া ভাবি যে আমরা মেয়েরা ত চিরটা জীবনই এই রান্নাঘর ভাঁড়ার-ঘর লইয়া কাটাইয়া দিলাম, সারা বৎসরের চাউল ডাল, মশলাপাতি আমরা আরও শত প্রকারের গৃহকর্ম্ম করিয়াও ঝাড়িয়া বাছিয়া ভাঁড়ারে তুলিয়াছি, ঠিক সময় রৌদ্রে দিয়াছি ঠিক সময়ে তুলিয়াছি, জিনিষ বেশী পুরাতন হইবার আগেই সেদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, একপোয়া সুজীও ঘটনাক্রমে তিক্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু শুধু মাত্র চাউল, আটা, সামান্য ডাল চিনি এবং লবণ মজুত ও সরবরাহ করিবার জন্য এই যে বিরাট্ ভাণ্ডারের ব্যবস্থা তাহার জন্য ততোধিক বিপুলসংখ্যক কর্ম্মচারীবাহিনী দশটা হইতে পাঁচটা অবিশ্রান্ত উপস্থিত রহিয়াছে এবং শুধু এই কাজের জন্যই মোটা মোটা মাহিনা পাইতেছে তবু অপচয়ের অন্ত নাই। অনেকেই দেখিয়াছেন যে প্রায়ই সরকারী বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কেমন করিয়া শস্য মজুত করিতে হইবে, কি করিলে ইঁদুরে খাইবে না, কি করিলে শুকনা ও তাজা থাকিবে ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনগুলি কাহার জন্য? আমাদের জন্য যদি হয় তবে আমাদের উত্তর এই যে কোন্ জিনিষ কেমন করিয়া রাখিতে হয় তাহা আমরা জন্মাবধি শিখিয়া আসিতেছি এবং আমাদের গৃহস্থ ঘরে কিছুই অপচয় হয় না। আর অপচয় হইবেই বা কি? এক সপ্তাহের রেশন আনা হয় সাত দিন খাইলেই যায় ফুরাইয়া, মজুত আর কি করিব? আর চাষীদের জন্য যদি হয় তবে এটা জানা ভাল যে চাষীরা নিজেদের শ্রমলব্ধ বস্তু কি করিয়া রাখিতে হয় স্মরণাতীত কাল হইতে তাহা জানে এবং আমাদের দেশের চাষীদের অপচয় হইতে দিবার মত অবস্থা নয়। ব্যবসায়ীদের জন্য যদি এই ব্যবস্থা হয় তবে তাহার উত্তর এই যে তাহারা স্বার্থের খাতিরেই সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া থাকে যেন তাহাদের মজুত মালের লোকসান না হয়। তবে কি ইহা ক্রয়কারী সরকারী এজেন্ট ও বিভাগীয় গুদাম তত্ত্বাবধানকারীদের জন্য? তাহাই যদি হয় তবে গুটিকতক সরকারী সার্কুলার ছাপাইয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেই হয়। দেশবাসীর প্রদত্ত রাজস্ব বিজ্ঞাপন দিয়া নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য কি? আর বিজ্ঞাপনের পরেও ত পচা আটা এবং বহু পুরাতন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট চাউল খাওয়া আমাদের ঘুচিল না।

তবু সবই একরকম সহিয়া গিয়াছিল। যদিও তিন বৎসরের পুরাতন চাল রান্না চাপাইয়া কয়লা ও সময়ের অসম্ভব অপব্যয় হইত এবং ভাত মুখে দিয়াও বিস্বাদ লাগিত, তবু পেট ভরিত। এখন এই মাথা পিছু দুই সের দশ ছটাকে কি যে উপায় হইবে তাহা ত আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা দুধ পাই না, মাছ কিনিবার সামর্থ্য নাই, ফল চোখে দেখি না বহুদিন, শুধু ভাত ডাল তরকারি (অতি সামান্য) দিয়া কোনও মতে আত্মীয়পরিজনের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছি, এখন আমরা কি করিব? সংসারের শ্রমসাধ্য সকল কাজই আমাদের করিতে হয়, কাজেই দুপুরে ভাত আমরা পেট ভরিয়াই খাইয়া থাকি, বিধবা স্ত্রীলোকের একবেলা খাওয়া নিয়ম সুতরাং ঐ একবার তাঁহাদিগকে উদরপূর্ত্তি করিয়া খাইতে হইবেই। তাহার উপর অধিকাংশ বাঙালী পরিবারেই ছেলেরা স্কুল

হইতে ফিরিয়া ভাত খাইবে, কাজেই দুপুরে গড়পড়তা মাথা-পিছু অন্ততঃ পাঁচ ছটাক করিয়া চাউল রান্না করিতে হয়। রাত্রে গড়ে তিন ছটাক লাগে। ইহার কম করিয়া রান্না করিতে হইলে কাহারও কাহারও আধপেটা খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। গৃহকর্ত্তাকে কিছু কম করিয়া খাওয়ানো চলে না, সন্তানদেরও পেট ভরাইয়া খাওয়ানো চাই, তবে কি নব-রেশন-ব্যবস্থায় আমাদেরই অর্দ্ধাহার করিতে হইবে?

রেশন-বিভাগ ছাড়া আর সকলেই জানেন যে আট নয় বৎসর হইতে ছেলেমেয়েরা পূর্ণবয়স্ক লোকের মতই খায়, বরং সময়ে সময়ে বেশীও খাইয়া থাকে। শরীরের বাড়ের মুখে উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়াটা তাহাদের দরকার। কিন্তু এতদিন রেশন-ব্যবস্থায় তাহারা অর্দ্ধেক খোরাক পাইত। আমাদের কোন্ সুকৃতির ফলে জানি না, সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে আট বৎসর বয়স হইতেই বালকবালিকারা পূর্ণ রেশন পাইবে। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু বলা বাহুল্য পড়াশুনা ও শারীরিক পরিশ্রম যে সকল শিশুদের করিতে হয়, এবং যাহাদের মাছ, দুধ, ফল, ডিম খাইবার অবস্থা নাই, দুই সের দশ ছটাকে তাহাদের প্রয়োজন মিটিতে পারে না। ক্যালোরী প্রভৃতি দিয়া বৈজ্ঞানিক হিসাব নাই বা করিলাম, সহজ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে এই পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ করার ফলে দেশ-জোড়া আর একদল অপরিপুষ্ট ক্ষীণজীবী বাঙালী শিশুর সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা যখন পরিণতবয়স্ক হইবে তখন তাহাদের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য বলিতে কিছুই থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে তাহারা ১৯৪৬ সালের রেশন-ব্যবস্থার শোচনীয় কুফলের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এই অল্প পরিমাণ চাউল ও আটার ব্যবস্থা হওয়ায় বাঙালী মেয়েদের মধ্যে মধ্যে অনশনেও থাকিতে হইবে। কেননা, সরকারী যতগুলি ছুটির দিন আছে, রেশনের দোকানগুলিও ততদিন বন্ধ থাকে। মনে করা যাক, সোমবারে রেশন আনার তারিখ, হঠাৎ শনিবারে কাগজে দেখা গেল যে, রেশনের বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে সোম, মঙ্গল, বুধ এই তিন দিন বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে দোকানগুলি বন্ধ থাকিবে। যে পরিমাণ রেশন বরাদ্দ তাহাতে সাত দিনের বেশী একবেলাও চলে না, কাজেই তিন দিন উপবাস করা ছাড়া আর উপায় কি?

আটা যে বাঙালীর খুব প্রিয় খাদ্য নহে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙালী ছেলেমেয়েরা এমনিতেই রুটী বেশী খাইতে চায় না, ভাতের প্রতিই তাদের রুচি ও আসক্তি তবু আটা যদি ভাল হইত, কিম্বা গম নিয়মিত পাওয়া যাইত, তবে চাউলের এই অভাবের দিনে রুটি খাইলে সুবিধাই হইত সকলের পক্ষে। কিন্তু গম ও আটা সযত্নে না রাখবার ফলে বাজারে আসিবার আগেই তাহা খারাপ হইয়া যায়। কাজেই সকলে, বিশেষ করিয়া আমরা মেয়েরাই, রেশন আনিবার সময়ে আটা না আনিবার জন্য বলিয়া দিই। পয়সা দিয়া ওঁচা জিনিষ কিনিয়া কেন সন্তানদের খাইতে দিব, বিশেষতঃ যখন তাহাদারা রুটি গড়িতে সময়ও বেশী লাগে? তবু চাউলও কম করিয়া খরচ করিতে পারিতাম, যথাসাধ্য আটাও খাইতে রাজী ছিলাম, যদি জানিতাম যে উদ্বৃত্ত খাদ্যবস্তু সত্যই যাহাদের প্রয়োজন তাহারা পাইবে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে কলিকাতা ও মফস্বলবাসিনী বহু গৃহিণীরই নিরন্নকে অন্নদান করার অভিজ্ঞতা হইয়াছে। আমি জানি অতি দরিদ্র পরিবারেও গৃহিণীরা সকলে কিছু কম করিয়া খাইয়া, কেহবা একজন কেহবা দুইজন করিয়া নিরন্নকে নিয়মত অন্ন দিয়াছেন এবং কেহই পারতপক্ষে ক্ষুধার্ত্তকে নিরাশ করিয়া বিদায় করেন নাই। এই দেওয়ায় একটা আত্মপ্রসাদ লাভ হয় এবং যে দেয় তাহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিও জাগ্রত হয়। প্রত্যেক দিন রন্ধনের আগে মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়িতে চাল তুলিয়া রাখার রেওয়াজ প্রত্যেক ঘরেই আছে। এতদিন আমরা নিজেদের শত অভাব সত্ত্বেও প্রার্থীকে দিতে পারিয়াছি এবং দেওয়া যে কত প্রয়োজন তাহাও উপলব্ধি করিয়াছি। পাড়ায় পাড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পঞ্চাশ হইতে এক শত বা ততোধিক নিরন্নকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা গত দুর্ভিক্ষে মেয়েরা অনেকেই করিয়াছিলেন। এবারে নব রেশন-স্কেলে নিজের চিন্তা ছাড়া আর কাহারও চিন্তা করিবার ইচ্ছাই লোপ পাইবার উপক্রম হইবে, নিরন্নকে বিফলমনোরথ করিয়া, হয়তো বা মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত না দিয়া বিদায় দিব, প্রতিবেশী অনাহারে থাকলেও দৃক্‌পাত করিব না, ভিখারীকে কটুবাক্য বলিয়া তাড়াইব, এই সমস্ত বিবেকবিরুদ্ধ কাজ আমাদের করিতে হইবে উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া—স্বামীপুত্রের মুখ চাহিয়া।

মাথের মধ্যভাগ হইতে যে নূতন কোটা মাথাপিছু ধার্য্য হইয়াছে তাহার প্রচলনের ফলে সরকারী হিসাবে নাকি বৃহত্তর কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে ১৬৫০০০ মণ শস্য উদ্বৃত্ত হইবে এবং ইহা দ্বারা নাকি ২৬৪০০০০ লোককে প্রতি সপ্তাহে আড়াই সের হিসাবে খাদ্য দেওয়া যাইবে। কিন্তু কে দিবে? গত দুর্ভিক্ষে আমরা গ্রামে গ্রামে অনাহারে লোকদের মরিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কাগজে-কলমে হিসাবপত্রে চাউল মজুত আছে দেখানো হইলেও লোকের হাতে তাহা পৌঁছায় নাই। গুদামে বন্ধ থাকিলেও লাল ফিতার বাঁধন খুলিয়া সে বস্তা সময়মত সাধারণের হাতে আসে নাই। ষ্টেশনে ষ্টেশনে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, মফস্বলের এজেন্টের গুদামেও চাউল ছিল, কিন্তু সেই চাউল সাধারণের হাতে আসিবার পথে এত বাধা-বিঘ্ন যে, অপরিসীম ধৈর্য্যশালী কর্ম্মী ব্যতীত আর কেহ সে দিকে হাত বাড়াইতে পারেন নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ কর্ম্মীই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাঁহাদের রিলিফ-কার্য্যের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে কোনও প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে রিলিফ কার্য্যের জন্য চাউল লইতে হইলে কত রকম দরখাস্ত পেশ ও দরবার করিতে হয় এবং অনুমতি পাইলেও ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়া 'চালান' লইয়া শহর হইতে বহু দূরবর্ত্তী গুদামজাত চাউল আনানো কত সময়, খরচ ও ধৈর্য্য-সাপেক্ষ। অনেক ক্ষেত্রে সময়মত পাওয়াই যায় না। [illegible]ক সময়ে যে দরের চাউল দিবার কথা থাকে কার্য্যকালে পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক কম দরের এবং নিকৃষ্ট ধরণের চাউল। তখন ট্রেজারীর টাকাও ফেরত পাইবার উপায় নাই, চাউলও বদল হইবে না। এই সকল নানা কারণে উদ্বৃত্ত চাউল বলিয়া

কাগজে-কলমে যাহা দেখানো হয় জনসাধারণ যে তাহা প্রয়োজনের সময় পাইবে আমাদের তাহাতে সন্দেহ আছে। মনে হয় গ্রামের লোকেরাই যে শুধু না খাইয়া মরিবে তাহা নয় সরকারী ব্যবস্থায় যাহারা রেশনপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি সেই শহরবাসী আমরাও, অর্দ্ধাহারে অর্দ্ধমৃত হইয়া থাকিব। মধ্য হইতে সরকারী গুদামে চাউলে পোকা পড়িবে এবং সরকারী হিসাবের খাতায় কয়েক হাজার টন চাউল উদ্বৃত্ত দেখা যাইবে।

তাহার পর চিনি ও লবণ। মাথাপিছু একপোয়া করিয়া লবণ বরাদ্দ করিবার কোনও অর্থই হয় না, কোনও লোকই মাসে এক সের লবণ খাইতে পারে না, এবং ইহা কিছু কম করিয়া ধার্য্য করিলে ক্ষতি ছিল না। কলিকাতায় চিনি যতদিন দেড় পোয়া মাথাপিছু মিলিত, ততদিন বোধ হয় চিনির জন্ত কাহাকেও ব্ল্যাকমার্কেটের খোঁজ করিতে হয় নাই। কিন্তু একপোয়া চিনি দ্বারা চালানো যে কিরূপ কঠিন তাহা গৃহিণী মাত্রেই অবগত আছেন। বাড়ীতে দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকিলে চিনি শিশুপ্রতি এক পোয়ার বেশীই লাগার কথা এবং লাগা উচিতও। তবে আমাদের শিশুরা পায়ই-বা কি, খায়ই-বা কি? আর কেই বা তাহাদের কথা ভাবে! ইহা ত বিলাত নহে যে যুদ্ধের সময়েও প্রত্যেক স্কুলে পাঁচ বছরের নিম্নবয়স্ক শিশুর জন্ত কমলার রস ও কড্‌লিভার অয়েলের ব্যবস্থা হইবে। সামান্ত দুধের সহিত চিনি, তাহাও জোটা দুষ্কর। অথচ অনেকেই হয়ত জানেন না যে প্রতি সপ্তাহে কত চিনি গিফ্‌ট পার্শেলে বিলাতে পাঠানো হইতেছে। স্টেটসম্যান পত্রিকার 'প্রেরিত পত্র' শীর্ষক কলমে লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে, সপ্তাহে একবার অন্তত: চা, চিনি, মাখন, সাবান, পনীর ইত্যাদি গিফ্‌ট পার্শেলে বিলাত যাওয়ার পথে কি ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা লইয়া পার্শেল প্রেরকগণ হা-হুতাশ করিতেছেন। যে কোনও বিলাতী গিফ্‌ট পার্শেল প্রেরক সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত ওজনের পার্শেল উপরোক্ত একটি বা ততোধিক জিনিস ভরিয়া পাঠাইতে পারেন। রোজ একটা পাঠাইলেও ক্ষতি নাই, বিভিন্ন নামে পাঠাইলেই হইল। এক জনকে এইরূপ পার্শেল পাঠাইবার কালে বলা হয়, "তুমি কি জান না যে ভারতে খাদ্যসঙ্কট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে?" তিনি বলেন "জান না, আমাদের কাটলেট ভাজিবার ঘি ও কেকের জন্ত চিনি পাওয়া যাইতেছে না, গৃহিণীদের দারুণ কষ্ট হইতেছে!" তিনি কয়েক পাউণ্ড কোকোজেম ও চিনি পাঠাইলেন। একবার হিসাব করিয়া দেখুন যদি মাত্র একশত জন বিদেশী বিলাতে সপ্তাহে একটি মাত্র করিয়া পার্শেল পাঠায়, তাহা হইলেই সাড়ে তিনশত সের খাদ্য বাহিরে চলিয়া যায়। এইরূপ কত পার্শেল যায় ও কত হাজার ইংরেজ তাহা পাঠাইয়া থাকেন তাহার কি কোনও হিসাব আছে? অথচ রেশন এলাকাভুক্ত আমরা একপোয়া চিনি [illegible]হে পাই, গ্রামে চিনি পৌঁছায়ই না, আর মহকুমা শহরে যে পরিবারে বার জন লোক, সে পরিবারে হয়ত মাসে তিন সের চিনি বরাদ্দ।

সরিষার তেলের কথা আর কি বলিব! যিনি সরিষার তৈল জনপ্রতি মাসে আধসের করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি যদি বাঙালী হন, তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞতার পরিসীমা নাই। বাঙালী দিনমজুর, চাষী, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, বড়লোক সকল পরিবারের গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে যে সরিষা তৈলের এই বরাদ্দ তাহাদের কতদূর অসুবিধায় ফেলিয়াছে। যাহার কোনও বিলাসিতা নাই, সেও একটু তেল গায়ে মাথায় মাখে, ছোট শিশুকে তেল না মাখাইয়া স্নান করাইবার কথা আমরা ভাবিতে পারি না, অর্দ্ধাহারের বেশী যাহার জোটে না সেরকম শিশুও যদি অল্প তেল মাখিতে পায়, আমরা দেখিয়াছি, তাহার শরীর ও মেজাজ অনেক ভাল থাকে। কিন্তু তেলের বরাদ্দ দেখিয়া প্রথমেই গায়ে মাথায় মাখা বন্ধ করিতে হইয়াছে, এবং রন্ধনও সিদ্ধ-পোড়াতে (ইহাতেও যে একটু মাখিতে হয়!) পর্য্যবসিত হইয়াছে। তেলের বরাদ্দ করিবার আগে কর্ত্তারা একবার অন্দরে নিজ নিজ গৃহিণীদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিতেন যে কতটা তেল মাসে লাগা উচিত। গরীব বাঙালীর খাদ্যের প্রধান উপকরণ কি কি তাহা কি কেহই জানেন না? আমরা ঘি কিনিতে পারি না, দুধ খাওয়াইতে পারি না, ডিম, মাছ, কালেভদ্রে জোটে, খাদ্য-তালিকায় চর্ব্বি অথবা স্নেহদ্রব্যের স্থান পূরণ করে ঐ সরিষার তৈল। মাথাপিছু ৮ ছটাক মাসে হইলে একদিনে এক জনের কতটুকু চর্ব্বি বা স্নেহপদার্থ খাওয়া হয় তাহা হিসাব করা কি এত কঠিন? আমাদের সন্তানরা যদি দৈনিক এক কাঁচ্চার বেশী (একপলারও কম) তেল না পায় তাহা হইলে তাহাদের শরীর ভাল থাকে কি করিয়া? আর কয়জনের এমন সঙ্গতি আছে যে মাখিবার জন্ত অলিভ অয়েল বা নারিকেল তৈলের বোতল দুই টাকা আড়াই টাকা দিয়া ক্রয় করিবে?

এই বরাদ্দ-ব্যবস্থা যদি স্থায়ী ভাবে কয়েক মাসের জন্তও থাকে, তবে আমি বাঙালী মেয়েদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে পরে বালক-বালিকা ও শিশুদের নানারকম রোগ দেখা দিবে নিঃসন্দেহ।

রেশন এলাকার দিনমজুর, ধোপা, ফেরীওয়ালা, মালী, মেথর, মুচি, ড্রাইভার, সরকারী অধস্তন কর্ম্মচারী, সাধারণ কেরাণী এবং সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাদের বর্ত্তমান খাদ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, জবাব পাইয়াছি, দিন আধ সের শস্য (চাল বা গম) রেশনেও ইঁহাদের কম হয়। বেলা ১২ টায় এবং রাত্রি নয়টা-দশটায় দুই বার যদি পেট ভরিয়া খাইতে হয়, তবে আধ সের দৈনিক রেশন যথেষ্ট। তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে জনপ্রতি খোরাক কিছু কিছু কমানো সকলেরই উচিত, গড়ে সওয়া তিন সের প্রত্যেক মানুষের লাগে। যাহাকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার চারি সের সাড়ে চারি সেরের কমে কেমন করিয়া হইবে তাহা ত আমরা ভাবিয়া পাই না। খোরাক দিয়া 'বদলা' (মজুর) রাখিয়া দেখিয়াছি, পরিশ্রমের পর তাহারা কমপক্ষে এক বারে আধসের চাউলের ভাত খায়। তেল যদি মাথাপিছু অন্তত: তিন পোয়ার ব্যবস্থা হইত তবে রান্নার কাজটা আমাদের এক রকম চলা সম্ভব মনে করিতাম যদিও মাথা পিছু এক সের না হইলে মাখিবার কথা ভাবা যায় না।

দলা-পাকানো পোকাধরা চাউল টাকায় চার সের করিয়া'

বিক্রয় হইতে আজও দেখিলাম। রেশন-ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষ কেন চাষীদের জিজ্ঞাসা করিয়া ধান-চাউল গুদামে রাখেন না? চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ ঘরে এমন শুকনা খটখটে ভাল 'গোলা' কি তৈয়ারি করা যায় না? বাঁকুড়া জেলার "পুরো"র মত বিশ-ত্রিশ মণী "পুরো" কি চাউল জমা করিবার জন্ত করা যায় না? সিমেণ্ট দিয়া বড় বড় "মাইট" তৈয়ার করা কি অসম্ভব? যতটা স্থান জুড়িয়া গুদাম ঘর করা হয়, ঠিক সে পরিমাণ জায়গায়ই শত শত "গোলা" বা "পুরো" বা "মাইট" বসানো যাইত। বস্তায় চাউল রাখা সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অপচয় অনেক। গুদামের নীচের দিকে যে শত শত চাউলের বস্তা থাকে, তাহা যে কত শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন। বস্তায় চাউল রাখিলে সাধারণতঃ ছয় মাসের বেশী তাহা ভাল থাকিতে পারে না। যাঁহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে বড় বড় চাউলের আড়ত রাখিতেন, কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও ত চাউল কি ভাবে বেশীদিন রাখা যায় জানিতে পারিতেন।

হয়ত কর্তৃপক্ষ আমাদের উক্তিতে কর্ণপাত করিবেন না। হয়ত এ শুধু অরণ্যে রোদন। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের সন্তানদের কথা ভাবিলে যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। বস্ত্রাভাব আছে, তাহার জন্ত ততটা ভাবি না, কিন্তু ঘরে ঘরে অন্নাভাবে শীর্ণ বালক, অপরিপুষ্টদেহা বালিকা, দুগ্ধাভাবে ক্ষীণ-প্রাণ শিশু—বাংলাদেশের এই ছবি কল্পনা করিলেই মাতৃজাতি আমাদের হৃদয় বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

এখনকার দিনে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শৈশব কালের একজন নেতৃস্থানীয়, শক্তিশালী, লেখক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অল্প লোকেই জানেন। ইহার কারণ, এই সাহিত্যসাধক আপনার জয়ঢাক আপনি বাজাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তিনি নীরবে বাণীর উপাসনা করিয়াই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। জনতার দৃষ্টির অন্তরালে তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড়ের সন্নিকটবর্ত্তী সিজা-ডুমুরদহের জমিদার-বংশ-সম্ভূত। এই বংশ নবাবী আমলের জমিদার। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতেন। বংশ-বৃদ্ধি-হেতু ডুমুরদহের একটি সরিক ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে মুরাতিপুর গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। মুরাতিপুর প্রসিদ্ধ কাঁচড়াপাড়া হইতে এক ক্রোশ এবং হালিশহর হইতে দুই ক্রোশ উত্তরে। যে ঘোষপাড়া গ্রাম কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের জন্ত বিখ্যাত, উহা মুরাতিপুরের

১৮২৪ খ্রীঃ শ্রীপঞ্চমী-সরস্বতী পূজার দিবস মুরাতিপুরে নবীনবাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর রায় এবং মাতার নাম সরস্বতী দেবী। "রায় রায়াণ" নবাবদিগের প্রদত্ত উপাধি।

নবীন বাবু নিজের অক্লান্ত চেষ্টা এবং অতুলনীয় অধ্যবসায়ের গুণে প্রভূত বিদ্যাবত্তার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দ্দু ইত্যাদি বহু ভাষাতেই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কোন কলেজে বিদ্যা অর্জ্জন করিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। অধ্যবসায় ও আত্ম-শক্তিই তাঁহার সকল উন্নতির মূলে।

প্রথম যৌবনে তিনি কয়েক বৎসর শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবুদের গৃহে কিশোরগণের শিক্ষক ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা এবং সেতার ও এস্রাজ বাজনার চর্চ্চাও তিনি তথায় করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে কাঁচড়াপাড়া নিবাসী কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নবীনকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নবীনবাবু দেবেন্দ্রনাথের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদরূপে গণ্য হইলেন। স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্তের তিনি অভিন্নহৃদয় সখা ও সহোদরবৎ ছিলেন। ১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যা "প্রবাসী"তে আমি লিখিয়াছিলাম যে, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের অন্যতম প্রাণের বন্ধু, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র, মহাপণ্ডিত ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু এই তিন জনে যেন একটি বৃন্তের তিনটি অবিচ্ছিন্ন পুষ্প ছিলেন। সে কথা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নহে।

অক্ষয়কুমারের ব্যাধি-বিড়ম্বনার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্রগণ তাঁহার পরিত্যক্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদকীয় আসনে নবীনকৃষ্ণকে আসীন করিলেন। ১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সাতিশয় যোগ্যতার সহিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদকের আসনকে গৌরবান্বিতও করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রণীত স্কুলপাঠ্য পুস্তক "জ্ঞানাঙ্কুর" দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা কালে দৈনিক সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরর" নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করিয়াছিলেন—

"When the late Babu Akshya Kumar Dutt relinquished the editorial chair of the *Tattwa Bodhini Patrika* our author for a long time edited it with conspicuous ability, preserving the continuity of the plan, the train of solid subjects and, to some extent, the masterly style of his celebrated predecessor."

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স[illegible] "তত্ত্ববোধিনী" সম্পাদিত করেন। তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (তখনও তিনি "রাজা" উপাধি পান নাই) "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং "রহস্যসন্দর্ভ" নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকাদ্বয়ে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কখন "ন. কৃ. ব." নামে তাঁহার রচনা প্রকা-

শিত হইত, কখন বা সুবৃহৎ হরকের "হেডিং" যুক্ত সভাসমিতিতে প্রদত্ত তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা, কখনও বা নামহীন এমন বহু রচনা 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হইত, যাহা তাঁহার পরবর্ত্তীকালের কোন কোন পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংকলিত ও প্রকাশিত "শিল্প-সন্দর্ভ" (বা ঐরূপ নামযুক্ত একটি পুস্তকে) নবীন বাবুর "কয়লা" সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। গুপ্তকবির "সংবাদ প্রভাকরে"র তিনি এক জন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। "গবর্ণমেণ্ট এডুকেশন গেজেটে"রও তিনি সম্পাদক ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালবিয়োগে প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগীরূপে তিনি প্রায় এক বৎসরকাল "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রের সম্পাদন-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "প্রাকৃততত্ত্ববিবেক" প্রথম ভাগ (Natural Theolgy in Bengali) পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হয়। ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় "হিন্দু পেট্রিয়টে" উক্ত পুস্তকখানির সমালোচনা করিয়াছিলেন।

নবীনবাবুর আর দুইটি চিরস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্ত্তি—৺কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারা প্রবর্ত্তিত অনুবাদ প্রচেষ্টায় তাঁহার সহায়তা। দ্বিতীয় কীর্ত্তি—"বিশ্বকোষে"র ভার নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বহন করিতে প্ররোচিত করা এবং বহুতর রচনা দ্বারা "বিশ্বকোষে"র অঙ্গ পুষ্টি করা। নগেন্দ্রনাথ বসু কৃতজ্ঞচিত্তে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সেযুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

নিম্নে নবীনচন্দ্রের কয়েকখানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম।

১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র।

(ক)

ওঁ

মুসুরি পর্ব্বত।
৩ জ্যৈষ্ঠ, শকাব্দ ৫৩।

সাদরনমস্কারাবহব: সন্তু—

তোমার ২০ বৈশাখের বিষাদময় পত্র পাইয়া বিষণ্ণ হইলাম। তোমার জীবনের শেষাবস্থায় তোমাকে একেবারে বিষাদের তমরাশি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। Cowper কবির "নিশীথের * * তুল ছন্দও তোমার হৃদয় অভিভূত করিয়াছে। তোমার বৃদ্ধাবস্থায় নিদারুণ রোগশোকাদি তোমাকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া চলিয়া গেল।

Tomorrow comes a frost, a chilling frost

সেক্সপিয়ার মহাকবির এই মহৎ বাণী তোমার অবস্থায় উপযোগী।

তুমি যে লিখিয়াছ, "আমি এখন কোথায় যাই, কি করি" এই কথাটি আমার হৃদয়ে বড়ই লাগিল। সৎ-সঙ্গ-জনিত যে যে "স্বত্ব" তাহা কখনও তামাদি হয় না। তাহা পুরাতন হইলেও তাহার অপলাপ নাই।

আবার তোমার এক এক কথায় পুরাতন কাহিনীও নূতন হইয়া উঠে। তুমি যে এত জীর্ণশীর্ণ হইয়াছ, তথাপি আশ্চর্য্য যে তোমার হৃদয় অদ্যাপি তেমনি তাজা ও মোলায়েম আছে।

আমার আহারের বন্দোবস্ত এখন অতি স্বল্প হইয়াছে। আমি আর তেমন চলিতে বলিতে পারি না, সহজে লিখিতে পড়িতেও সক্ষম নহি; এজন্য আমি তোমাকে পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে পারি নাই। আশা করি, সে ত্রুটি ক্ষমা করিবে।

তোমারই
(স্বা:) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(খ)

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং—

তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি মধ্যে ডুমুরদহে যাইয়া আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু উন্নতি দেখিয়া আমাকে যে সংবাদ লিখিয়াছ, তাহাতে আমি আপ্যায়িত হইলাম।

আমার মনের ভাব তুমি যদি গ্রহণ করিতে পার, তবে কি সম্পদে, কি বিপদে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বদাই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহী থাকিবে। কিন্তু সংসারের টান এমত যে, মন সংসার ছাড়িয়া, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উড়িতে পারে না, ইহা আমি জানি। স্বাধীনতা-বিনষ্ট-কারী দাসত্ব, বিপুল মতি ও প্রবল উৎসাহও ভঙ্গ করে।

তোমার এবারকার বাণিজ্যে কিছু লাভ হইয়াছে, শুনিলে আমি বিশেষ আহ্লাদ-মগ্ন হইব।

তোমারই
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২

কলিকাতা।

সমাদর-পূর্ব্বক-নমস্কারানিবেদনঞ্চ—

আপনি বলিয়াছিলেন যে, ১১ মাঘের "ডাইরি" পাঠাইবেন, কিন্তু তাহা তো মনের ভুল, আমার এবং আপনার। "সুরভি" নামক পত্রিকাতে যে পত্র বাহির হইয়াছে, তাহা কি আপনার?

পূজ্যপাদের যে সকল পত্র আপনার নিকট আছে, তাহা আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও কি আর দিবেন না? আমরা ভাল আছি। আপনি কবে আসিবেন? আপনার লেখা "ভারতী"র জন্য দিয়াছি। ইতি

২৭ মাঘ, ৫৯। স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী

কার্ডের ঠিকানার পৃষ্ঠায় লেখা—

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়
হালিশহর। নিয়াশ্রম।

Post Mark 9 Feb., 89.

৩

কৃষ্ণদাস পালের পত্রে নবীনবাবুর কথা উল্লিখিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য পাদটীকায় দেওয়া হইল।

Thursday, 1865.

My dear Sambhu,

I sent a man to you this morning, but you were not visible at the Dutt's. Pray, is your article ready? I shall be inconvenienced, if you don't hand it over to the bearer.

Babu Nabin Krishna Banerji* is anxious to see you. Where can he meet you?

Yours affectionately
Kristodas Pal.

এই চিঠিখানিতে ৺কৃষ্ণদাস পাল শুধু এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, ৺নবীনকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণের বন্ধু ৺শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উদ্‌গ্রীব। ঐ নামটি কাহার, শম্ভুচন্দ্র তাহার উপর ব্যাখ্যা করিয়া একটি মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—সেই টিপ্পনিটুকু "Bengal Past and Present" পত্রে Vol 9, Part I (Octobr to Decembr)—1914) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখাটী পড়িয়া সমঝদার সহৃদয় পাঠক নিঃসন্দেহ বিশেষ আকৃষ্ট হইবেন।

আমি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলারকে, নবীনকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এক পত্রে জানাইতে লিখি। তাহার উত্তরে এই মনীষী আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়' কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটী শেষ করিলাম:

Oxford, 6th May, 1899.

Dear Sir,

I know indeed the name of late Rai Nabin Krishna Banerji and his *Tattwa Bodhini Patrika.* I also know the names of several of his friends and fellow-laborers, and the excellent work they have done for the enlightenment of their country and the purification of their ancient religion . . . Few people in Europe have as yet fully appreciated the labors of these martyrs to a noble cause, but I have for many years admired their devotion to a noble cause and their perfect unselfishness. We have not many men to place by their side for disinterestedness and perseverence. There must be people who are satisfied with having sown the seed, without ever seeing the fruit, but the harvest is ever to follow. All we can do is to record their good work and to follow their gobd example.

Yours very faithfully,
F. Max Muller.

* A neglected genius, condemned to obscurity, labelled with the libel "impracticable". He had more than one tolerable opportunity, but to no purpose. With solid parts, a man of infinite jest he seems just the man to rise in the world. But he was too fine for the world. His very humour probably went against him. He possessed both high spirits and high spirit. If the world is impatient of the former, it sorely resents the latter. Babu D. N. Tagore and Babu Nabin Krishna Banerji are probably the only survivors of the elder generation of Bengali authors—the generation to which belonged Akshaya Kumar Dutt and Iswar Chandra Vidyasagore—to which the Bengali language owes its formation. Banerji succeeded Dutt in the editorship of the *Tattwa Bodhini Patrika,* the monthly magazine of the old Brahmo Samaj, which has played an important part in the religious, moral and intellectual re-generation of the Bengali people.

As long ago as 1859, he published a treatise on "Natural Theology"—the first in Bengali, which I had the privilege of reviewing in the *Hindu Patriot,* then under the strong hand of Hurrish Chandra Mukherji. It was since improved and introduced into schools—though I do not now hear of it. Perhaps it has been crowded out of the course by the obstreperous competition of baser publications.

হে আমার মহাদেশ!

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

শন্ শন্ শন্ বন্ বন্ বন্ লবঙ্গবনে ঝড়:
ভেঙে ভেঙে পড়ে রামধনু-উপকূল!
চিনির সাগরে হা-হা ক'রে ওঠে এরা কোন্ বর্বর?
মশলার বন সঙ্কট-সঙ্কুল!

জ্বলে জনপদ, দিশাহারা মাটি জ্বলে যায়, পুড়ে যায়,
এশিয়া এবার প্রেমের মিনতি ভোলো!
রক্তমশালে দারুচিনিদ্বীপে মানুষের মৃগয়ায়
বুদ্ধ তোমার তৃতীয় নয়ন খোলো!

গরুড়ের ডানা মিছিলে মিছিলে তোমার প্রভাত-তীরে
সূর্য্যমুকুরে সন্ধ্যা ঘনালো কত!
এবার নিভৃতি রাত্রির মাঠে সোনার হরিণীটিরে
নখরে নখরে ছিঁড়ে দিতে উদ্যত।

কত তারকার কালো কঙ্কাল, নীলিমা হলো যে শেষ:
কোথা দিয়ে গেল কত সময়ের ঝড়—
একটি কণাও গোপোনিক' তার—হে আমার মহাদেশ!
তাই ত তোমার শিবিরে গুপ্তচর।

মহাসূর্য্যের বহ্নিসাগরে সম্রাট-গ্রহ ক'রে
একক পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন থাক্।
কালান্তরের বিষবাঁশী বাজে চক্র-করোটি ঘোরে:
মস্তক তোলো আপাততঃ, মৈনাক!

ভেরী বাজে ওই: ধ্বনি ওঠে ওই: হাতিয়ারে পড়ে শান—
ছোটাছুটি করে কোটি কোটি পদাতিক।
নিশীথ বাতাসে থমথম করে অলখ-ফুলের ঘ্রাণ—
প্রতি তৃণ জাগে বর্শার নিশানিক।

ধেয়ানী এশিয়া, বিরাগী এশিয়া, বিবাগী এশিয়া জ্বলো—
সাগরে পাহাড়ে জেগে ওঠো লোলিহান।
ধূমের শিখায় কালো হ'য়ে যাক্' গোলার্দ্ধ ঝলোমলো:
পোষাকী ধরার আধখানা ময়দান।

এ মাটির পরে, এ মেঘের পারে আরো আছে মাটি-মেঘ:
আরেক এশিয়া তিমির-আড়ালে জাগে—
তুফানে তুফানে দেখোনি কখনো সাগরের উদ্বেগ?
পামিরের ছায়া প্রবালেরি অনুরাগে!

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে কর্ম্মকার জাতির ক্ষতি

শ্রীসুধীর মজুমদার

বঙ্গীয় কর্ম্মকার জাতির অধিকাংশই স্বর্ণ ও রৌপ্যকার, তা ছাড়া কেহ কেহ কাঁসা ও পিতলের কার্য্যও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই অর্থাৎ শতকরা পঁচানব্বই জনেরই শারীরিক পরিশ্রমলব্ধ উপার্জ্জন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আয়ের পন্থা নাই। যে পাঁচ জনের জোতজমি আছে তাহাও অপরাপর শ্রেণীর তুলনায় অতি নগণ্য। বিশেষ করিয়া এই জাতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্থানান্তরিত হওয়ার নিমিত্তই হউক অথবা ব্যবসায়ের সুবিধার নিমিত্তই হউক এক স্থানে অধিকসংখ্যক ব্যবসায়ীর বাস খুব কম। তা ছাড়া এই ক্ষুদ্র জাতির ভিতরেই সাম্প্রদায়িক বিভাগও যথেষ্ট থাকার দরুন এবং অর্থসচ্ছলতার অভাব হেতু একতাও খুব কম। ব্যবসায়ের বিভিন্নতাই হয়ত জাতির ভিতরে ঈর্ষ্যার অনলও মাঝে মাঝে প্রজ্বালিত করিয়া থাকে। বঙ্গের ১৩৩৮ সনের বন্যায় এ জাতির যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহার পূরণ আস্তে আস্তে ১৩৪০ হইতে ৪২ সন পর্য্যন্ত হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার কৃষির অবনতিই ইঁহাদের ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিল যেহেতু এই জাতির শতকরা পঁচাশি জন কর্ম্মী বা শিল্পীই কৃষকের আয়ের উপরে নির্ভর করে। তখন হইতে ৪৮ সন পর্য্যন্ত এ জাতি কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিল, তাহাদের মাত্র অন্ন-বস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা থাকিল না, কারণ থাকিবার উপায়ও ছিল না। একজন কর্ম্মীর দৈনিক আয় চার আনা হইতে পাঁচ আনা ছিল যদি সে দৈনিক হিসাবে অপরের কাজ করিত। যদি তার পরিবারে পূর্ণবয়স্ক তিন জন হইতে পাঁচ জন লোকের খোরাক জোগাইতে হয় তবে তাকে জোটাইতে হয় অন্ততঃ দুই সের হইতে তিন সের চাউল। ঐ তিন সের বা পাঁচ সের চাউলের মূল্য ৪২ সন হইতে ৪৬ সন পর্য্যন্ত ছিল পাঁচ আনা হইতে নয় আনার মধ্যে অর্থাৎ তখনই সেই সব পরিবারকে দৈনিক খাদ্যদ্রব্যের অপরাপর উপাদান ব্যতীত মাত্র তণ্ডুলের মণ্ডই খাইতে হইত দেড় বেলা অথবা এক বেলা। তাহাতে তাহাদের দেহের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল, তদুপরি যখন দাম আস্তে আস্তে বাড়িতে লাগিল তখন তাহাদের যে কি দুর্দ্দশা হইল তাহা পরে বলিতেছি।

এই সব শ্রমিকের মধ্যে যাঁহারা নিজে কাজ করিতেন বা যাহাদের নিজস্ব দোকান ছিল তাঁহারা রূপার গহনার আজুরা (বানি) পাইতেন প্রতি ভরি রূপায় দুই আনা হিসাবে এবং সোনার গহনায় প্রতি ভরি সোনায় বার আনা হইতে এক টাকা হিসাবে। একটি বালা—যার ওজন চার ভরি, তার আজুরা আট আনা। ঐরূপ আর একটি তৈয়ারী করিলে তাহার

পুস্তক-পরিচয়

সাত ভাই চম্পা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য অনুল্লিখিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বালক পত্রিকার উল্লেখ আছে। এই শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উৎসাহে ও সম্পাদনায়। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্নলব্ধ' গল্প রাজর্ষি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বালক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিজেও একজন সুলেখিকা ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক শক্তি শিশুদের আনন্দ বিধানের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনা পরিমাণে প্রচুর নয়, কিন্তু অল্পস্বল্প যাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন শিশু-সাহিত্যে তাহা স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। 'সাত ভাই চম্পা' নামক তাঁহার শিশু-নাটিকাটি প্রকাশিত হইয়াছিল বহু পূর্ব্বে; সম্প্রতি বিশ্বভারতী ইহার নূতন ও শোভন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বাংলার শিশুপাঠকদের মহদুপকার সাধন করিলেন। ছোটবেলায় ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে শোনা সাত ভাই চম্পা আর পারুলের রূপকথার নাট্য-রূপায়ণ লেখিকার নিপুণ লেখনীতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র রচনাটির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আছে এবং লেখিকার দরদ ও আন্তরিকতার গুণে করুণ রসটি নিবিড় ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। বর্ষণস্নাত প্রকৃতি যেমন হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে ঝলমল করিয়া উঠে তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, শুভ্র নির্ম্মল হাস্যরসের পরিবেশনে মাঝে মাঝে নাটিকাটির কারুণ্যপূর্ণ পরিবেশটি প্রদীপ্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বালক-বালিকাদের অভিনয়োপযোগী এমন সুন্দর নাটক বাংলা সাহিত্যে বিরল। ইহার পরিচায়িকা লিখিয়া দিয়াছেন শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, প্রচ্ছদপটের রঙীন ছবিটি গগনেন্দ্রনাথের এবং মুখপাতের ছবিটি নন্দলালের অঙ্কিত। রেখা ও লেখা এই দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে বইখানি বাহির ও ভিতর উভয় দিক দিয়াই অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়েরা বইখানি হাতে লইয়াই ছবি এবং বহিঃসৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, পড়িয়া মজা পাইবে এবং অভিনয় করিয়া দর্শকজনকে আনন্দ দিতে পারিবে। নাটিকাটিতে একটি গানের স্বরলিপিও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

চিঠি—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য। শিল্প-শাশ্বতী হইতে প্রকাশিত, প্রাপ্তিস্থান—বুক ষ্ট্যাণ্ড, ১।১।১এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এখানি উপন্যাস। চিঠির আকারে নায়কের আত্ম-অভিব্যক্তি। ভিতর ও বাহিরের মিলনেই জীবনের সার্থকতা। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়, মানুষ অন্তরে যাহা তাহা হইতে একান্ত যে ভিন্ন রূপ তাহাই বাহিরে প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়ক বিশ্বনাথের লঘু চাপল্য তাহার অন্তরের গভীরতাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে। ইহা জীবনের এক ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডিকে ফুটাইতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও কোথাও হয়ত নায়কের ব্যবহার বাস্তব সামাজিকতাকে অতিক্রম করিয়াছে, তৎ-

সত্ত্বেও জীবনের করুণ আবেদন বহুলাংশে সুব্যক্ত হইয়াছে। কাজলের সারল্য, সাহস ও অকৃত্রিমতা পাঠকের মনে রেখাপাত করিবে। লিখিবার ভঙ্গীতে স্বাচ্ছন্দ্য আছে. লেখকের ভাষাটিও ভাল, কিন্তু পরবর্ত্তী রচনায় গ্রন্থকার 'একখানা জীবন', 'একখানা কনসেপ্‌শন' প্রভৃতির 'খানা'গুলি পরিহার করিয়া চলিলে পাঠকের সহিত আমরাও সুখী হইব।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাঁশী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড। ১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গল্প-সংগ্রহ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গল্পগুলি আকারে ছোট এবং বিভিন্ন রসের পরিবেশনে সুসমৃদ্ধ। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মনে দাগ রাখিয়া যায়। বাঁশী গল্পটিতে বাঞ্চিত মানব-মনের করুণ সুরটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে; নির্ব্বংশ, মহেশ ধাড়া প্রভৃতি গল্পে সমাজের গ্লানি ও বীভৎসতা পরিপূর্ণ ভাবেই উন্মোচিত হইয়াছে। তাল গাছ, হরিণের আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গল্পে শাসন-স্বৈরাচারের মহিমা প্রকটিত। কেবলমাত্র বৈপ্লবিক বিবাহ চিত্রটি এই সংগ্রহ মধ্যে না থাকিলেই ভাল হইত। চিত্রটি লঘু তুলিকায় অঙ্কিত হইলেও নৈতিক সাধনার উপর কটাক্ষপাত বেশ তীব্র বোধ হয়।

বসন্ত রজনী—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

বসন্ত রজনী পড়িয়া মনে হয়—শক্তিমান লেখকের হাতে সাধারণ বিষয়-বস্তুও কি অসামান্য রূপ পরিগ্রহ করে। অজয়, মৃণাল, টুলু ও রাধা—এই কয়টি চরিত্রে ভালবাসার বিচিত্র আবির্ভাব ও বিস্তার লইয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। ঝরঝরে ভাষা—প্রকাশভঙ্গী মধুর এবং প্রত্যেকটি চরিত্র সজীব। উপন্যাসখানি যে পাঠকসমাজে আদৃত হইয়াছে দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

বিপ্লবী তরুণী—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস। কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—তিন টাকা। পৃ. ১৬০।

উপন্যাসের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই: নায়িকা বসুধা অসচ্চরিত্র এক যুবকের পাণিপীড়নের হাত হইতে আত্মরক্ষার মানসে বিবাহ-রাত্রিতে গৃহত্যাগ করে। অতঃপর দু-এক জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর ধাত্রীবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া স্বাবলম্বিনী হয়। এই সময়ে তাহার জীবনে ভালবাসার সঞ্চার হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভাববিলাসিতার জন্য সেই ভালবাসা সার্থক হইবার সুযোগ পায় না।

লেখক কাহিনীটিকে যথাসাধ্য করুণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রতিজ্ঞা—স্বামী বেদানন্দ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

হিন্দু সমাজকে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ধর্ম্মপ্রাণ বীর নরনারীর আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত রচিত কয়েকটি কবিতা।

অশ্রু—শ্রীশক্তিপদ কোঙার। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

ভাষার সকল নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া কবি ছুটিয়া চলিয়াছেন। "আগ্নশস্ত্রকটি" "বায়ুনিঃস্ব যুবা", "কে গো একা শুভ্রি", "সুতীব্র অগ্ন্যগিরণে আধিব্যাধিগমে" প্রভৃতি বুঝিবার জন্য নূতন অভিধানকারের প্রয়োজন।


রূপ চর্চ্চায়-
অপরিহার্য্য.
রাঙ্গাজবা
C.R. DAS'S
RANGAJAVA
TOILET POWDER
RANGAJAVA
TOILET POWDER
CALCUTTA
ANUPAMA CHEMICAL CALCUTTA

প্রণাম—শ্রীআর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়। ১নং ওয়ার্ড ইনষ্টিটিশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বারো আনা।

ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন, "বাংলাদেশের বহু গায়কগায়িকা আমার এই বইয়ে প্রকাশিত অনেক গান গেয়ে থাকেন।" রচনায় লঘু লালিত্য আছে।

ভোরের আজান—মুহম্মদ আবুবকর। নর্থ বেঙ্গল পাব্‌লিশিং হাউস। ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবি ইস্‌লামের আদর্শ লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। ইস্‌লামের সাম্য-মৈত্রীর বাণী সকলেই শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে। কিন্তু "সত্যাগ্রহী লাঠি নিয়ে ফেরে সত্যদলনতরে", বুদ্ধের "ভীরু মন" "দারাসুত ফেলি এল ছুটে তরুতলে, সংসারী ধরা তাঁর আদর্শ কেমনে লইবে গলে?," "অন্ধযুগের জাতীয় ধর্ম নিয়ে কেন টানাটানি? এই ভারতের জাতীয় ধর্ম চীন কেন লবে মানি?" এ সকল কথায় উদারতা বা নিরপেক্ষ সত্যানুরাগের সুর শুনিতে পাই না বলিয়া দুঃখ বোধ করি। বুদ্ধদেবের ধর্ম 'সংসারী ধরা' কেন লইবে অথবা 'চীন' কেন মানিবে, এ প্রশ্ন অর্থহীন। কেহ জোর করিয়া এ ধর্ম 'সংসারী ধরা'কে অথবা 'চীন'কে লওয়ায় নাই, কিন্তু তাহারা লইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আর, ধর্ম দেশকালাতীত, একথা ধর্মানুরাগীরা জানেন। তাহা না হইলে আরবের ধর্ম ভারতবাসী কেহ মানিয়া লইত না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষণিকের পরিচয়—শ্রীউমাপদ দাশ। ১২১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

"সত্য ঘটনা অবলম্বনে" রচিত এই উপন্যাসখানির লেখক বাংলা-সাহিত্যে নবাগত। তাঁহার রচনারীতি এখনো অপরিপক্ক এবং গল্পের বাঁধুনি আলগা তথাপি স্থানে স্থানে তাঁহার লেখায় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

মরু প্রদীপ—শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল, এম-এ। প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গল্পের বই। বোমাবিধ্বস্ত বর্ম্মা হইতে পদব্রজে বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী লইয়া রচিত প্রথম গল্পটি এবং অন্যান্য কয়েকটি গল্প সুলিখিত। লেখকের মন কাব্যধর্ম্মী—ছোট গল্পে উহা অনেক সময় রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করে—এই লেখকের রচনাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কয়েকটি গল্প ভাল লাগিল।

ময়নামতীর দেশ—শ্রীরঞ্জিত সিংহ। ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য এক টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত এই রূপকথার বইখানি পড়িয়া ভাল লাগিল। আজকাল রূপকথার বইয়ের কদর কমিয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে আজগুবি গোয়েন্দা-কাহিনী এবং অদ্ভুত ভ্রমণ-বিলাস-কাহিনীর পুস্তকে বাজার ছাইয়া যাইতেছে। কিন্তু শিশুমনে রূপকথার একটা নিবিড় আকর্ষণ থাকেই। সেইজন্য এই বইখানি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মহিলা সংবাদ

শ্রীমতী উমা গুপ্ত বি-এ ১৯৪৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনার্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর পক্ষে দর্শনশাস্ত্রে এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন এই প্রথম। শ্রীমতী উমা আই-এ ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হন এবং প্রতিবারেই সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। তিনি এখন পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বৃত্তি পাইয়া দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়িতেছেন।

শ্রীমতী উমা ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়বন্ধু গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা।



শ্রীউমা গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

সেবা ও জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নাম আজ দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নূতন শাখা-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ণ উদ্যমে সেখানে জনসেবা, জনসংগঠন, ক্ষাত্রশক্তির পুনরুদ্বোধন, ধর্ম্মপ্রচার, ছাত্রসমাজে ব্রহ্মচর্য্য ও বীরত্ব প্রচার, মূল হিন্দুসমাজের সহিত "নিম্ন" শ্রেণীর জাতি ও উপজাতিগুলির মিলন-সাধন, পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে প্রচার ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। নিম্নে সেবাশ্রম সংঘের বাঁকুড়া-শাখার কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাঁকুড়া জেলায় ৪টি থানায় ১৬টি কেন্দ্র হইতে এযাবৎ ঔষধ, পথ্য, দুগ্ধ, বস্ত্রাদি বিতরিত হইতেছে। প্রত্যহ গড়ে পাঁচ-সাত শত শিশু, রোগী ও অনশন-পীড়িত ব্যক্তিকে দুগ্ধ, ভাইটামিন, গ্লুকোজ, মেটোকুইন (ম্যালেরিয়ার ঔষধ), মলম ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। প্রায় ৬০০ শত ধুতি, শাড়ী ও জামা দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসী নরনারীর মধ্যে বিতরিত হইতেছে। শীঘ্রই কোনও উপযুক্ত অঞ্চলে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই দুর্দ্দিনে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মিলন-মন্দির ও রক্ষীদলগুলি সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিরন্নকে অন্নদান, পীড়িতের সেবা, পল্লীবাসীর ধন-প্রাণ-মান-মর্য্যাদা রক্ষা এবং সাধারণভাবে জোরজুলুম চুরি-ডাকাতিতে বাধাদানকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। গ্রামবাসী আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, আত্মরক্ষার ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

জেলার বিভিন্ন থানায় এ পর্য্যন্ত ৪০টি মিলন-মন্দির ও ৪৫টি রক্ষীদল স্থাপিত হইয়াছে। মিলন-মন্দিরের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু সমবেত হইয়া একদিকে নিয়মিতভাবে ভজন-কীর্ত্তন, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-চণ্ডী ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও তাহা হইতে বাস্তব জীবনে আদর্শ শিক্ষা লাভ এবং সমবেত স্তব ও বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনায় অভ্যস্ত হইতেছে; অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতির অতীতের ইতিহাস ও বর্ত্তমানের সমস্যার আলোচনা এবং তৎসহ গ্রামের যাবতীয় বিপদ-আপদ-অত্যাচার-উৎপীড়ন, অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্বিপাকের প্রতিকারে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্রতী হইতেছে। বিভিন্ন মিলন-মন্দিরগুলিতে সমবেত-ভাবে চরকায় সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়নের প্রচলন করা হইতেছে। বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদিও স্থাপিত হইতেছে।

জেলার বিভিন্ন রক্ষীদলগুলিতে শত শত বালক, যুবক ও সর্ব্ব-শ্রেণীর হিন্দু নিয়মিত লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বর্শাছোঁড়া ও শরীর-চর্চ্চায় অভ্যস্ত হইতেছে। এই ভাবে সমগ্র দেশে ধর্ম্মের ভিত্তিতে এক অখণ্ড হিন্দু সংহতি গঠিত হইয়া গ্রামরক্ষা, সমাজরক্ষা, গ্রাম-সেবা, সমাজসেবা, ধর্ম্মরক্ষা, নারীহরণের প্রতিকার, হিন্দুসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার ইত্যাদি কার্য্যে সহায়তা করিতেছে।

জেলার বিভিন্ন স্কুলে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী প্রচারকের দ্বারা নিয়মিতভাবে প্রচারকার্য্য, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদি করানো হইতেছে। এতদ্ব্যতীত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য সাধনা, সঙ্ঘবদ্ধতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, দায়িত্বপরায়ণতা এবং শরীরচর্চ্চা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

হিন্দু-সমাজ-সংগঠন, গ্রামসংগঠন ও মিলন-মন্দিরে নিয়মিত আলোচনার মধ্য দিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সমস্যার সমাধানের সুযোগ ঘটিতেছে। গ্রামাঞ্চলের বাগ্দী, বাউরী, সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহিলী ইত্যাদি আদিম জাতি মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়া হিন্দু সমাজের সহিত মিলন সূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। এমনি নানা ভাবে সংঘ হিন্দু সমাজের উন্নতিমূলক বিবিধ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশ ও জাতির মহদুপকার সাধন করিতেছে।

ডাঃ অমরেশ দত্ত

কাছাড় জেলার শিলচরনিবাসী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅমরেশ দত্ত বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বর্ত্তমান বৎসরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। আসামবাসীদের মধ্যে ইনিই সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণার জন্য ডিগ্রিলাভ প্রথম করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী স্মৃতিরক্ষা কমিটি

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ তারিখে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে পরলোকগত জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর এক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে শ্রীযুক্তা নাইডুকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। দেশ ও সমাজের হিতকল্পে জ্যোতির্ম্ময়ীর বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা সকলেই সুবিদিত। তাঁহার বরণীয় স্মৃতিকে জীয়াইয়া রাখা যে দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু স্মৃতি-বাসরে সেকথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শোকসভায় নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, "ভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর মৃত্যুতে দেশ তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীকে হারাইল।"

কি পরিমাণ চাঁদা উঠিবে তাহা সঠিক আন্দাজ করিতে না পারায় কমিটি স্মৃতিরক্ষার কোনো সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনো করিতে পারেন নাই। যাই হোক্, আশা করা যায় যে এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতি-ভাণ্ডারে সর্ব্বসাধারণ সাধ্যমত অর্থসাহায্য করিবেন। টাকাকড়ি কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এস, সি, রায়ের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

"আর্য্যস্থান ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং", ১৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

তারিণীচরণ লাহা

কলিকাতার বিখ্যাত লাহা-বংশসম্ভূত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জমিদার তারিণীচরণ লাহা মহাশয় ৩রা ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের পাঠ সমাপনান্তে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেসার্স কৃষ্ণদাস লাহা এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার সহিত সক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন। বিগত ১৯৩৬ খ্রীঃ তিনি অন্যতম অংশীদার রূপে মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানীতে যোগ দেন। এই বৎসরেই তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তিনি আধুনিক ভাবাপন্ন আদর্শ জমিদার ছিলেন। প্রজাবৃন্দ এবং কর্ম্মচারীবর্গের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রজাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকল্পে বিদ্যালয় স্থাপন, কৃষিকার্য্যের উন্নয়নের নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলায় তাঁহার জমিদারীর অন্তঃপাতী কান্দবাতে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "তারিণীচরণ লাহা হাই স্কুল" নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। একটি দাতব্য ঔষধালয়ও তিনি সেখানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বদান্যতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল, দুর্গতদের দুর্দ্দশা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার গোপন দান ছিল প্রচুর, প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিত না।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে "শিশুর নিবাস" নির্ম্মাণকল্পে তিনি ২৫,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠ এবং শিমুলতলাস্থিত দাতব্য ঔষধালয়েও তাঁহার দানের পরিমাণ সামান্য নহে।

তারিণীবাবু সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার অমায়িক স্বভাব এবং প্রকৃতিগত মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইতেন। তিনি মৃত্যুকালে ছয় পুত্র এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে অম্বুজাসুন্দরী

গত ১লা জানুয়ারী ১৭ই পৌষ রাত্রি ১২টার সময় ৭৬ বৎসর বয়সে সুলেখিকা ও ধর্ম্মগতপ্রাণা অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা পরলোকগমন করিয়াছেন। পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কান্তকবি রজনী সেনের ভগিনী। সঙ্গতিপন্ন পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি প্রথমে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। নিজের চেষ্টা আর কান্তকবির আন্তরিক সাহায্যে তিনি কিছু শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অন্তরে কাব্যশক্তির উন্মেষ হয় ও উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সংস্পর্শে তাহা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তখনকার সময়ের সমস্ত মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। "বামাবোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক ৺উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে 'ভগিনী' সম্বোধন করিতেন ও সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন। তৎকালে তিনি 'প্রীতি ও পূজা,' 'ভাব ও ভক্তি', 'প্রেম ও পুণ্য', প্রভৃতি কয়েকখানা কবিতাপুস্তক ও 'গল্প', 'প্রভাতী' 'দুটি-কথা' প্রভৃতি কয়েকখানা গল্প উপন্যাস প্রকাশ করেন। তাঁহার পুণ্যময়ী জীবনী বঙ্গমহিলা মাত্রেরই আদর্শ-স্বরূপ। প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন কাটাইলেও কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অন্তরে ভগবদ্‌ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয় ও উত্তরকালে উহা মহামহীরুহে পরিণত হয়। তাঁহার স্বামী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺কৈলাসগোবিন্দ দাশগুপ্ত যখন পুরীতে বদলী হইয়া যান তখন কবির তরুণ বয়স। এই বয়সেই জগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। সমস্ত দিন সংসারের পরিজনবর্গের সেবা করিয়া রজনীর অধিকাংশ তিনি জপ করিয়া কাটাইতেন। প্রৌঢ় বয়সে সমস্ত ভোগসুখ



অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা

ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ভগবৎ প্রেরণাতে তিনি ভাগবতের সারাংশ লইয়া সুবৃহৎ "শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" নামক পুস্তক রচনা করেন এবং পরে "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কেলিরসালাপ", "শ্রীশ্রীরামকীর্ত্তি সুধা", "শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম" প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন।

মাঝ রাতে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে শুভ্রদেহা পরীদের গানে,
মুক্তবাতায়ন-পথে দেখা যায় একফালি চাঁদ,
স্বপ্ন দেখি শুয়ে শুয়ে মদালস আধো তন্দ্রা-ধ্যানে :
পরীরা এসেছে কাছে, তাহাদের কবরীর ছাঁদ
জ্যোৎস্না-জরীর শোভা লঘুগতি তনু-ব্রততীর,
চরণ ফেলার সাথে ফুটে ওঠে কামিনী বকুল,
ঠোঁট দুটি অতুলন লজ্জারুণ ভাঙা পাপড়ির,
এল কাছে—দু'কানে দুলায়ে দিয়ে হীরামোতী-দুল।

জেগে আছি—তবুও ঘুমায়ে থেকে করি শুধু ভান,
চেয়ে চেয়ে দেখি আমি অপরূপ পরীর স্বপন,
কে জানে জাগিতে গেলে ভেঙে যাবে পরীদের গান,
একটু চুলের ঘ্রাণ তন্দ্রালসে লভি অনুখন,
সুরভি নিশাস-ধ্বনি পরীদের দোলা দেয় প্রাণ,
তখন অনেক রাত, জেগে নয় ঘুমে অচেতন।

কোথায় আসিয়াছি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রায় চারি বৎসর পরে এবার গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছি। দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের একটি ক্ষুদ্র পল্লী। ক্ষুদ্র হইলেও এক সময়ে ইহা ব্যবসায়ীদের গুঞ্জনে মুখরিত হইত। তখন গ্রামটির পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া বড় নদী বহিয়া যাইত, তীরবর্ত্তী গঞ্জে ধান চাউল নারিকেল সুপারি প্রচুর বিকি-কিনি হইত। পল্লীর সে ঐশ্বর্য্য বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। নদী এখন সামান্য খালে পরিণত, গঞ্জের গুরুত্বও আর নাই। বেপারী ব্যবসায়ী ধনী মহাজনের গতায়াতও এখন বন্ধ। সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চলের যে দুরবস্থা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে।

কালবৈশাখী গাছপালা ঘরবাড়ী ভাঙিয়া চুরমার করিয়া পল্লীর দেহে একটি স্পষ্ট ছাপ রাখিয়া যায়। গত চার-পাঁচ বৎসরে পল্লীর মনুষ্য-সমাজের উপর দিয়া এইরূপ কালবৈশাখী চলিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহার রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় আমরা কত উৎপাত সহ্য করিয়াছি। জনাকীর্ণ কলিকাতায় জনবিরলতা, আকাশ হইতে শত্রুপক্ষের বোমা বর্ষণ, আগষ্ট-আন্দোলনে জনবিক্ষোভ ও পুলিসের অনাচার, পঞ্চাশের মন্বন্তর, জনশূন্য কলিকাতায় পুনরায় জনবাহুল্য, বাড়ীওলার অত্যাচার, কণ্ট্রোল ও রেশনিঙের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ, সামরিক যানবহনের গর্ব্বোৎফুল্ল মারাত্মক গতিবিধি—কতই না আমরা দেখিলাম। এত উপপ্লবেও কিন্তু কলিকাতার রূপ বদলায় নাই। সেই রাস্তা, সেই ঘরবাড়ী, সেই কর্ম্মব্যস্ততা, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা দশ বৎসর পূর্ব্বেও যেমনটি ছিল আজও প্রায় তেমনটিই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু পল্লীর চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি তিন জনে দুই জন মুসলমান, এক জন হিন্দু। গ্রামগুলির অধিকাংশই স্বভাবতঃ মুসলমান-প্রধান, হিন্দু-পল্লী মুসলমান-পল্লী নিকটবর্ত্তী হইলেও স্বতন্ত্র। জমি চাষ করে প্রধানতঃ মুসলমানগণ, জমির প্রকৃত মালিকও তাহারা। উপস্বত্ব মালিক—জমিদার বা তালুকদার—খাজনা পাইয়াই খুশি। গত কয়েক বৎসরের ভূমিসংক্রান্ত আইনবলে জমির মধ্যস্বত্ব একরূপ লোপ পাইয়াছে। নিজ খাসে যাহার যত জমি, উৎপন্ন শস্যও সে পায় তত বেশী। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ তাহার অর্থাগমও মন্দ হইতেছে না। দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের কৃষককুল একারণে আজ কতকটা সচ্ছল। ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে ইহা আরও আনন্দের হইত যদি ইহা স্বাভাবিক নিয়মে হইত। কিন্তু কৃষিজীবী ছাড়া অন্যদের অবস্থা কিরূপ? অর্থাৎ, উপরে যেরূপ বলিয়াছি, ভূমির উপস্বত্বের উপর নির্ভরকারী মুসলমান ব্যতীত ভূমির খাজনা, ব্যবসা, শিল্পাদির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহক হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ?

গ্রামের হিন্দু-পল্লীতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ একরূপ নাই বলিলেই চলে, দুর্ভিক্ষের কবল অনেকেই এড়াইতে পারে নাই, যাহারা পারিয়াছে তাহারাও গৃহত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছে। পল্লীতে পনর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের লোক প্রায় দেখিতেই পাইবেন না। তাহারা অন্নের অন্বেষণে ঘরের বাহির হইয়াছে। আজ কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশে যে এত জনতা তাহার কারণ ইহাই। কলিকাতা ছাড়া বঙ্গদেশে সাতাশটি জেলা। এইসব স্থলে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভূমির উপস্বত্ব ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পের উপর এতদিন যাহাদের নির্ভর ছিল তাহারা অনেকেই আজ শহরে ভিড় জমাইয়াছে। কেন এমনটি হইল?

শুধু ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা পল্লীর আর্থিক প্রয়োজন মেটে না, ব্যবসা শিল্প এবং স্বল্পাংশে চাকুরী দ্বারা ইহা পূরণ হয়। ভূমির যাহারা প্রকৃত মালিক, উপস্বত্ব তাহাদেরই ভোগ্য। যাহারা প্রকৃত মালিক নয়, তাহারা ইহার ভাগ পায় না বলিলেই চলে। ছোট বড় ব্যবসা শিল্প দ্বারাই তাহাদের জীবিকার বেশীর ভাগ সংস্থান হইত। এই ব্যবসা শিল্প আজ পল্লীমায়ের কোল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কি কুক্ষণে সর্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপস 'denial policy' বা বঞ্চনা-নীতি বাৎলাইয়া গেলেন। এই নীতির ফলে শত্রু বঞ্চিত হইল না, বঞ্চিত হইল পূর্ব্বাঞ্চলের অগণিত অধিবাসী। দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের একশ' হইতে পাঁচ শ' ছয় শ' মণী নৌকা ফরিদপুরের বিলোন অঞ্চলে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া পচাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হইল। নৌকার মালিকেরা দালাল ও সরকারী কর্ম্মচারীদের সেলামী দিয়া যাহা কিছু পাইল তাহা পরবর্ত্তী ভীষণ দুর্ভিক্ষের আরম্ভেই ফুরাইয়া গেল। বাখরগঞ্জে রেলপথ নাই, বাষ্পীয় পোত স্বল্পবিস্তর যাহা ছিল, বঞ্চনা-নীতির দৌরাত্ম্যে তাহাও প্রায় শূন্যে গিয়া ঠেকিল। স্থানীয় ব্যবসা একেবারে মাটি হইয়া গেল। ইহার উপর ঐ নীতিরই ওজুহাতে প্রধান খাদ্য চাউল সরাইয়া [illegible] নিয়া শহরে গোলাজাত করা হইল। যাহাদের নগদ মূল্যে চাউল কিনিতে হয়, ব্যবসা-শিল্পাদি বন্ধ হওয়ায় তাহারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিল না। আবার তখন প্রয়োজনের তুলনায় গ্রামে এত কম চাউল ছিল যে, সামান্য অর্থ যোগাড় হইলেও চাউল

পাইবার উপায় রহিল না। ফলে হইল দুর্ভিক্ষ এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

দক্ষিণ-বাখরগঞ্জে ধান নারিকেল সুপারি এই কয়েকটিই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, কাজেই ইহার ব্যবসাও ঐ সব অঞ্চলের বহু লোক করিয়া থাকে। জমিতে যাহাদের সম্বৎসরের খোরাকি হয় না তাহারাও এই সব ব্যবসা করিয়া নিজ নিজ অভাব পূরণ করিত। ইহা ছাড়া, সর্ব্বত্র যেমন এখানেও তেমনি কাপড়, কাটাকাপড় প্রভৃতির ব্যবসাও চলিত। নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ, সরিষার তৈল, কেরোসিন, ডাল, মশলা প্রভৃতি কত জিনিষেরই না ব্যবসা ছিল। যুদ্ধের ওজুহাতে সরকার একে একে এগুলির প্রায়ই হয় নিজ হাতে লইয়াছেন, নতুবা কণ্ট্রোল করিয়া ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি রোধে সহায়তা করিয়াছেন। সরকার এখন পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যোগ্য বংশধরের কার্য্য করিতেছেন। দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের যে-সব গঞ্জ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র মাসে ধান ও চাউল ব্যবসায়ী ধনী মহাজনদের আবির্ভাবে সরগরম হইয়া উঠিত তা সবই আজ নীরব নিস্তব্ধ। বর্ত্তমানে লাইসেন্স ছাড়া খুব কম পরিমাণ ধান চাউলই স্থানান্তরে চালান দেওয়া যাইতে পারে। আর লাইসেন্স লইতে হইলে যে-সব অসুবিধা তাহা অতিক্রম করিয়া অনেকের পক্ষেই ব্যবসা চালান কঠিন। সরকারী আপিসে ব্যবসার লাইসেন্সের জন্য আবেদন-নিবেদনে দেশবাসী একেবারেই অনভ্যস্ত। যেখানে ধনী মহাজন নাই, সেখানে খুচরা ক্রেতা-বিক্রেতারা কি করিবে? লাইসেন্সের বেড়াজালে তাহারা বিজড়িত। সরকার গঞ্জে গঞ্জে কণ্ট্রোল দরে চাউল ক্রয় করাইতেছেন। স্থানে স্থানে তাহাদের চাই বা এজেণ্ট আছে। কিন্তু ব্যবসায়ের স্বাধীন গতিবিধি যেখানে ব্যাহত সেখানে সাধারণ ব্যবসায়ীর কাজ-কর্ম্ম চলে কি করিয়া? সুপারি দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের একটি প্রধান অবলম্বন। কিন্তু ইহার ব্যবসাও নানা ভাবে মাটি হইয়া গিয়াছে। পল্লীতে যে-সব লোক ধান, চাউল, সুপারি, নারিকেল, কাপড়-চোপড়, রবিশস্য, তেল, নুন, লঙ্কা, কাঠ প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত তাহারা হইতেছে বেকার। কিন্তু এই দুর্মূল্যের দিনে বেকার হওয়া মানেই তো মৃত্যু। এই কারণেই যাহারা স্বাভাবিক উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া গ্রামে বসিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, পল্লীর সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া ইহার মধ্যেই অবস্থান করিত তাহারাও আজ গৃহত্যাগী। পল্লীবাসীর দৈন্যদশা এত[illegible] চরমে উঠিয়াছে যে, তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলেকেও লেখা-পড়া চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া জীবিকার অন্বেষণে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। সমগ্র পল্লী খুঁজিয়া দেখিলে প্রাপ্তবয়স্ক লোক হয়ত শতকরা দশ জনও পাওয়া যাইবে না। সদ্যগত দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর ফলে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই বিধবার সংখ্যা বাড়িয়াছে, আর করিবার লোকাভাব। গ্রামে যখন ব্যবসা চলিত তখন স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ বিধবারা ধান ভানিয়া, সুপারির খোসা ছাড়াইয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। এখন দরের স্বাভাবিক ওঠা-নামা বন্ধ, কাজেই ধান ভানিয়া লাভের পরিবর্ত্তে লোকসানের আশঙ্কাই বেশী থাকায় এদিকে বড় কেহ ঘেঁসে না। পল্লীর, বিশেষতঃ ব্যবসাদি যেখানে বেশী চলিত তাহার এমন দুর্দ্দশা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সরকারী রেশনিং-ব্যবস্থার কল্যাণে প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্র পাওয়া দুর্ঘট, বিশেষ করিয়া বিধবাদের শাদা থানকাপড় পাওয়াই যায় না। নারী-পুরুষের মধ্যে একখানার উপর দুইখানা কাপড় খুব কম লোকেরই দেখিতেছি। প্রথমে দুর্ভিক্ষ, পরে তাহার উপরে সরকারের রেশনিং ব্যবস্থা—দুইয়ে মিলিয়া পল্লীর নরনারীকে বস্ত্রহীন করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ সর্ব্বসাধারণের বস্ত্রাভাব পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। পল্লী আজ ব্যবসা-বাণিজ্যশূন্য, অন্নবস্ত্রশূন্য, জনমানববিরল—এরূপ শূন্যতার মধ্যে দেশের শ্রী কিরূপে ফিরাইয়া আনা চলিবে?

সাধারণ লোকে ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাইতেছে। সরকার বলিতেছেন দুর্ভিক্ষ আসন্ন, অথচ লোকে যে সম্বৎসরের খোরাকি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে এমন পন্থা নাই। সরকার দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের একাধিক গঞ্জে চাউলের গোলা তৈরি করাইয়া রাখিয়াছেন চাউল খরিদ করিয়া গোলায় মজুত রাখিবার জন্য, যাহাতে অভাব ঘটিলে গোলাজাত চাউল স্থানীয় লোকেদের ক্রয়মূল্যে সরবরাহ করা যায়। কিন্তু লোকের এ আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে। চাউল গোলাজাত না করিয়া মধ্যে মধ্যে অন্যত্র চালান দেওয়া হইতেছে। কোথাও কোথাও লোকে আপত্তি করিতেছে, কিন্তু গুর্খা পুলিসের পাহারায় নাকি চালান কার্য্য চলিতেছে। লোকের মনে আতঙ্ক—এবারেও বুঝি 'এক সেরী' বাজার (অর্থাৎ, টাকায় এক সের চাউল) আরম্ভ হইবে। কিন্তু জনসাধারণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অন্নাভাবে তাহারা এবারে আর মরিতে রাজি নয়।

তবে এই দুর্দ্দশার মধ্যে আশার ক্ষীণ রেখাও দেখা যাইতেছে। এইমাত্র বলিয়াছি, জমির প্রকৃত মালিক যাহারা তাহাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ফিরিয়াছে। দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের লোকানুপাত যেরূপ তাহাতে মুসলমান কৃষককুলই আজ এই শ্রেণীতে পড়ে। অজ্ঞ কৃষকদের অর্থ হইলে ধর্ম্মপ্রচারক, উকীল, মোক্তার, মামলাবাজ, ধাপ্পাবাজেরা তাহা লুঠিয়া খায়—মামলা-মোকদ্দমাও বাড়িয়া যায়। এবারে কিন্তু ইহার অন্যথা দেখিতেছি। এখন লোকের কতকটা চৈতন্য হইয়াছে, কুলোকের পরামর্শ না লইয়া সৎকার্য্যে মনোযোগী হইয়াছে। আমি যে পল্লীর কথা বলিতেছি তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান এবং ভূমিতে প্রকৃত স্বত্ববান। তাহারা অর্জ্জিত

অর্থের কিয়দংশ স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করিতে উন্মত হইয়াছে, উপযুক্ত চালক পাওয়া গেলে স্কুলটি স্থায়ী হইতে পারে। রাস্তাঘাট নির্মাণেও কেহ কেহ অর্থব্যয় করিতেছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

আপাততঃ স্থানবিশেষের ধান্য উৎপাদনকারী কৃষককুলের অবস্থা কতকটা সচ্ছল হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পাদি বলবৎ থাকা একান্ত প্রয়োজন, কারণ, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মাণি'। কৃষির অর্থ বদ্ধিত হয় না, বাণিজ্য দ্বারাই ইহা প্রসারিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই বাণিজ্য আজ লুপ্তপ্রায়—কি কারণে উপরেই বলিয়াছি। কাজেই পল্লীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই গ্রামে ফিরিয়া ব্যবসা শিল্পে পুনরায় লিপ্ত হইতে না পারিলে শ্রী আর ফিরিয়া আসিবে না। আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবল কোটি কোটি লোককে রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ মানুষের শক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে। সেই কাজের দ্বার আজ সরকারী নীতির বলে প্রায় রুদ্ধ। মানুষকে বাঁচাইতে হইলে এই রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেওয়া আশু প্রয়োজন।

পদ্মার পারে কাশের ফুল

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

ট্রেনে যেতে দেখি—পদ্মার পারে কাশের ফুল—
হালকা হাওয়ায় দোদুল দুল। স্বপ্ন-ফুল।
শম্‌ শম্‌ শম্‌ লক্ষ কণীরা ছন্দাকুল—
তারি পাশে দোলে পদ্মার পারে কাশের ফুল।
আমি দুলি আর তুমি দোল আর ট্রেন দোলে আর
পৃথিবী দোলে,
এক ঝাঁক্‌ বক এক সার ফুল মেঘের কোলে;
ছোট ছোট ঘর। কলার বাগান। অনেক কসল।
অনেক ভুল—
অনেক ভেঙেছে। অনেক তবুও এখানে আশার
আকাশী-ফুল
অনেক দোলে
পাপ্‌ড়ি খোলে
স্বপ্ন-হাওয়ায় দোদুল দুল!
ট্রেনে যেতে দেখি পদ্মার পারে কাশের ফুল।

এখানে স্বপ্ন ওখানে ভয়,
এখানে সৃষ্টি ওখানে লয়,
আরে আরে আরে দেখো দেখো দূরে ধ্বসে
গেলো ওই পদ্মা-কূল—
ভেসে গেলো আর ডুবে গেলো আর মুছে গেলো সেই
কাশের ফুল!
অনেক স্বপ্ন! অনেক প্রলয়! অনেক সত্য!
অনেক ছল!
এই তো জীবন! এইতো কসল! এইতো ভুল!
ট্রেনে যেতে দেখি পদ্মার পারে কাশের ফুল।
ট্রেনে যেতে দেখি ডুবে মুছে গেলো কাশের ফুল!

পাতা-ঝরা গাছ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

পাতা-ঝরা গাছ ওগো, পাতা-ঝরা গাছ
আমার হৃদয়ে পশি কি কথা যে কও,
পৃথিবীর শান্ত ছায়া ফিরে তব পাছ
অ-বাণী সম্ভূতা, তবু মূর্ত্ত বাণী হও।

কোন্‌ আদি যুগে ঋষি বসি তব মূলে
ধ্যানমেত্রে হেরিলেন বিশ্ব যোগময়,
শান্তি তার ভাসিতেছে আজি ফুলে ফুলে
বনস্পতি ওষধিরে করি জ্যোতির্ম্ময়।

ঝরা পাতা, ঝরা পাতা, ঝরিতে ঝরিতে
মোর জীর্ণ ভাবগুলি ঝরাইয়া দাও,
প্রলয়ের অভিমুখে চলিতে চলিতে
ভগ্ন ছিন্ন জীর্ণ যত সাথে লয়ে যাও।

যোগী-চিত্তে জ্বলিতেছে যে শান্ত আলোক,
শান্ত আত্মা প্রতিভাত যার মহিমায়,
ঝরা পাতা মাঝে বসি—দ্যুলোক ভূলোক
গাঁথিছেন যোগীশ্রেষ্ঠ নিজ চেতনায়।

পাতা-ঝরা গাছ, তুমি যদিও নির্ব্বাক
বাণী-রূপে মোর চিত্তে রহিলে সজাগ।

ভ্রম-সংশোধন

"উত্তপ্ত বোমা" প্রবন্ধে ৪০৮ পৃষ্ঠায় (প্রথম স্তম্ভে) ১নং চিত্রে [illegible] ও ৩৪ পঙ্ক্তিতে "[illegible] গ্যাস"এর পরিবর্তে হইবে "[illegible]"।

[illegible] পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় স্তম্ভে) ১১ পঙ্ক্তিতে "মনোপ্লেনের ([illegible]রোহী বিমানের) মত" পরিবর্তে হইবে "মনোপ্লেনের ([illegible]ডানার এরোপ্লেনের) মত"।

৪০৯ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় স্তম্ভে) ২৯ পঙ্ক্তিতে "প্রায় ৩০ মাইল"-এর পরিবর্তে হইবে "প্রায় ৬০ মাইল"।

৪১০ পৃষ্ঠায় (প্রথম স্তম্ভে) ৯ পঙ্ক্তিতে "ঘণ্টায় ৫,০০০ মাইল"এর পরিবর্তে হইবে "ঘণ্টায় ৫০,০০০ মাইল"।

গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি

প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথা সময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে, সেই মাসের ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকনম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। ডাকঘর হইতে প্রতি মাসেই বিস্তর প্যাকেট অপহৃত হয়, এ বিষয় অবহিত হইয়া সকলকেই যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাঁহাদের চাঁদা যেসংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্য্যসাধনে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রবাসী

বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণের প্রতি

বিজ্ঞাপনের মূল্য বৃদ্ধির বিষয় গত সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এবারও উহা স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে জানানো হইতেছে যে, আগামী ১৩৫৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে চলিত হারের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে বিজ্ঞাপনের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে। যাঁহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতে লিখিত চুক্তি আছে, তাঁহাদের চুক্তিকাল অতিক্রম হওয়ামাত্র নূতন হার ধার্য্য হইবে। এই বর্দ্ধিত হার নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিজ্ঞাপনমূল্যের হার

	সাধারণ	সূচী
পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲	৬৫৲
অর্দ্ধ „	৩২৲	৩৫৲
সিকি „	১৮৲	২০৲
সিকি কলাম ও অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	১০৲	১২৲

(বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠার মূল্য স্বতন্ত্র চিঠি লিখিয়া জ্ঞাতব্য।)

বিজ্ঞাপনাধ্যক্ষ—প্রবাসী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস : প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।